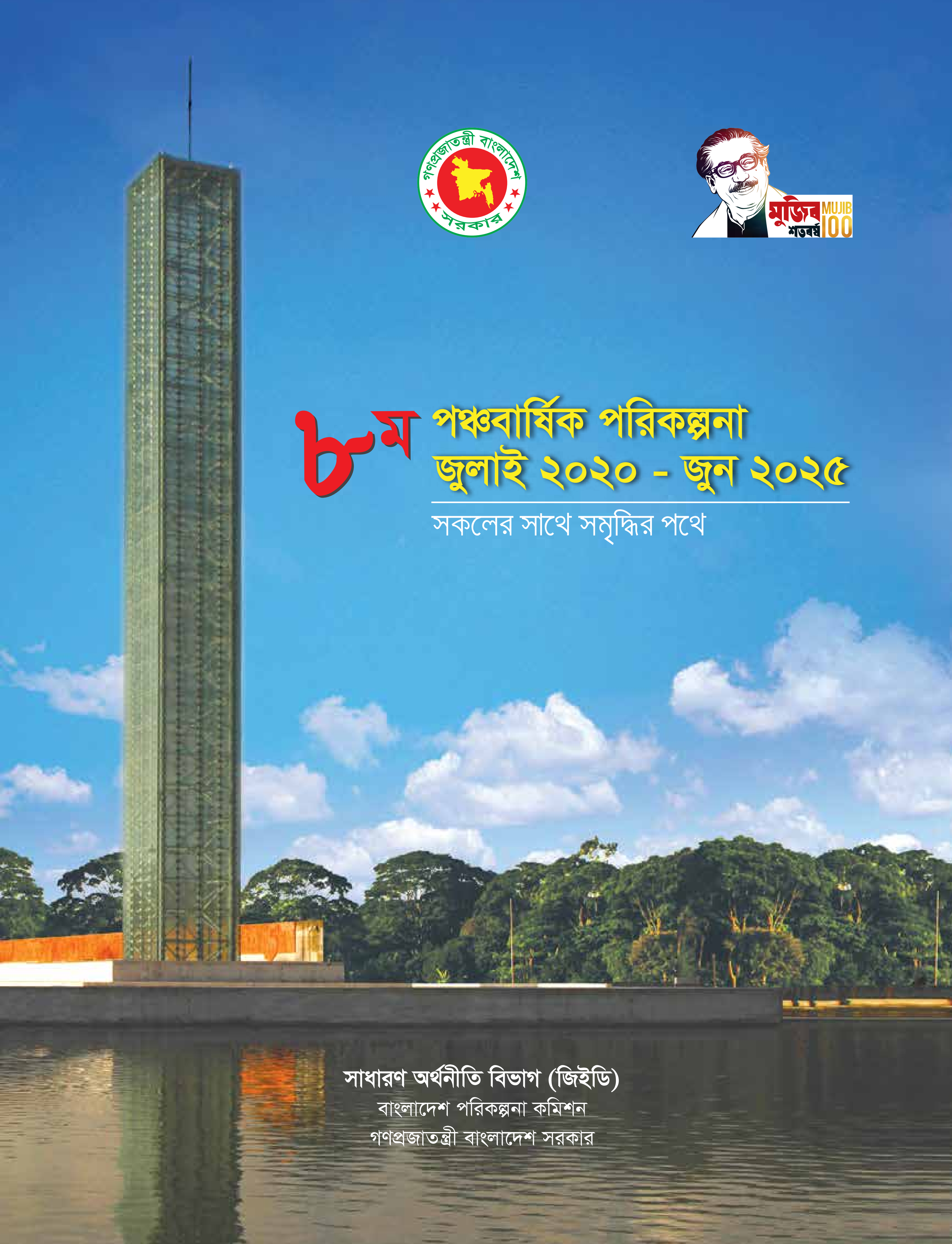

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫

সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

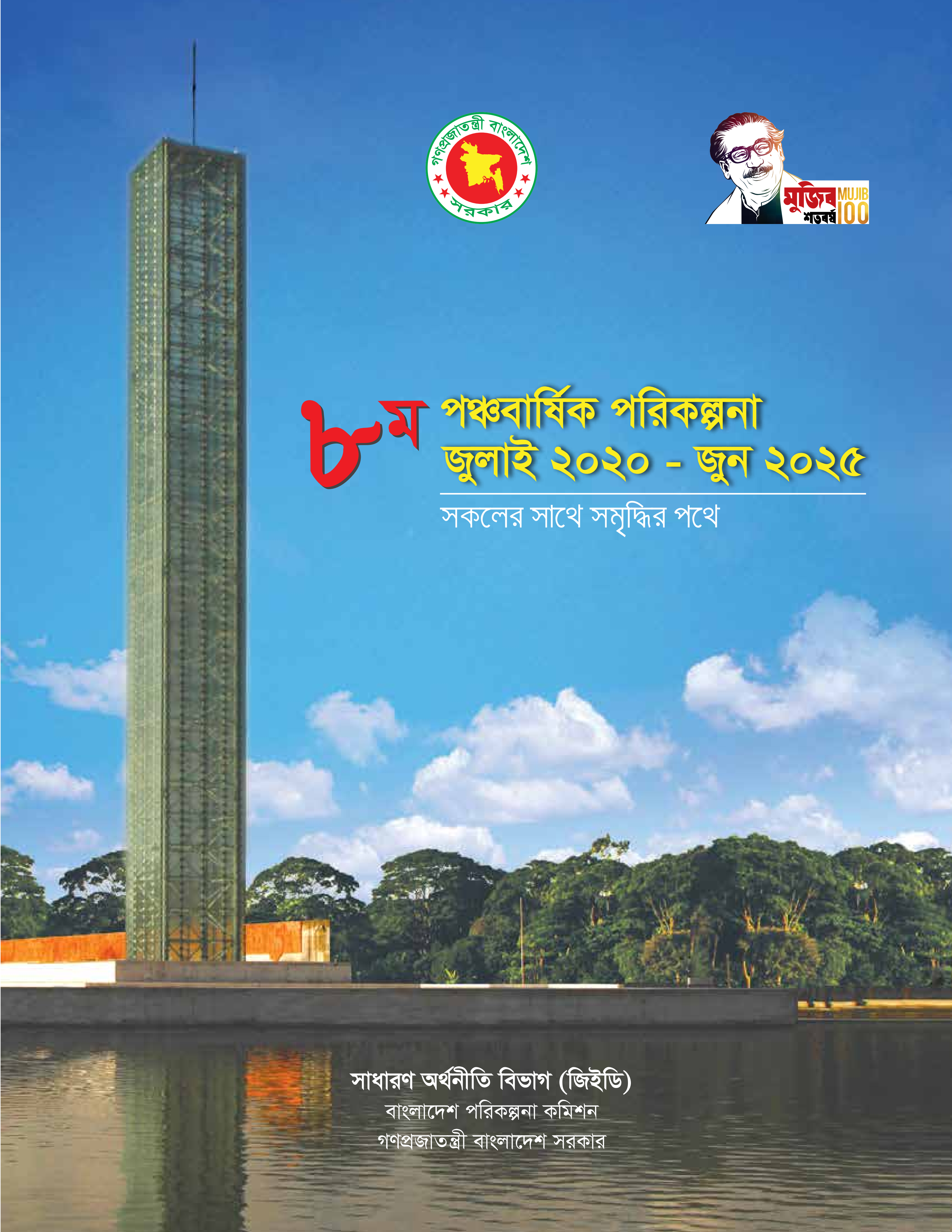

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৫

সকলের সাথে সমৃদ্ধির পথে

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫)

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

প্রকাশনায়:

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকাল বাংলা: মে ২০২১
প্রথম প্রকাশকাল ইংরেজি: ডিসেম্বর ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব © সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, মে ২০২১
সকল স্বত্ব সংরক্ষিত। কোন আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক পরিকল্পনা দলিলের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হলেও প্রকাশকের নিকট হতে লিখিতভাবে পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোন অংশই কোন আকারে বা অন্য কোন উপায়ে পুনর্মুদ্রণ বা বিলি করা যাবেনা।

এই সংস্করণ বিষয়ে জ্ঞাতব্য:
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত এ দলিলের চূড়ান্ত সংস্করণ সাধারণের অভিগম্যতার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় (website: http://www.plancomm.gov.bd)। বাংলা সংস্করণও একই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও গ্রন্থ বিন্যাস:
ড. শামসুল আলম
সদস্য (সিনিয়র সচিব), জিইডি

মুদ্রণে:
টার্টল, ৬৭/ডি, গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রিত কপির সংখ্যা: ২০০০

"No plan, however well-formulated, can be implemented unless there is a total Commitment on the part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with single-minded determination. I am confident that our people will devote themselves to this task with as much courage and vigour as they demonstrated during the war of liberation."

উপরিউল্লিখিত অংশটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের জনগণকে ২০০৯ সালের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে তৃতীয় বারের মতো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) উপহার দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের সরকারের এই ফ্ল্যাগশিপ পরিকল্পনা দলিলে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার দর্শনকে ধারণ করা হয়েছে।

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থন এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল ভঙ্গুর। আর্থ-সামাজিক সূচক সমূহে স্থবিরতাসহ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মতো গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন পরিকাঠামোতে বিরাজ করছিল অচলাবস্থা। আওয়ামী লীগ সরকার একটি সুপরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির পথ অনুসরণ করে দ্রুততার সাথে এই নাজুক অর্থনীতিতে গতিশীলতা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। প্রায় এক দশকের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮.০ শতাংশ অতিক্রম করে। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুপরিকল্পিত কৌশল, পন্থা ও নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ বছরে আমরা এ প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫১ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা এক দশকেই তিনগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩০২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। দারিদ্র্য হার ২০০৫ সালের ৪০.০ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় নারীরা আজ বেশি সক্ষম। আমরা বর্তমানে গ্রামাঞ্চলগুলোকে উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করছি। ফলে, অতীতের 'তলাবিহীন ঝুঁড়ির' অপবাদ ঘুচিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের জন্য 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের অহংকার পদ্মা বহুমুখী সেতু। একটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত দেশের সর্ববৃহৎ এ সেতুটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের একটি সংযোগ স্থাপন করবে। রাজধানী শহরে যানজট নিরসনে মেট্রো রেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার পায়রা ও মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কাজ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার পথ পরিক্রমায় অর্থনীতিতে বিদ্যুতের আগাম চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আমরা শতবর্ষব্যাপী 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছি। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হবে।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর প্রবল তান্ডব এখনো বিদ্যমান। তবে আমাদের সরকারের যথাযথ পদক্ষেপের ফলে আমরা আজ এই প্রাণঘাতী ভাইরাসকে মোকাবিলা করে এগিয়ে চলেছি। বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে একটি সন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সম্ভাব্য সকল প্রতিবন্ধকতা আমলে নিয়েই আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। দেশকে কোভিড-১৯ মহামারী থেকে পুনরুদ্ধার, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) অবস্থান থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন

এবং আগামী ২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ পরিকল্পনা দলিলে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আশা করছি এ পরিকল্পনা মেয়াদে আমরা বার্ষিক গড়ে ৮.০ শতাংশ হারে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন করব, দারিদ্র্য হার ২০.৫ শতাংশ হতে ১৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হব এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরও কার্যকর ও জোরদার করতে পারবো।

আমি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)-এর সদস্য (সিনিয়র সচিব) এর নেতৃত্বে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত জিইডি'র সকল কর্মকর্তাকে তাদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশা করি, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, এনজিও, সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠান, চিন্তাবিদ ও উদ্যোক্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলে একযোগে কাজ করবেন। একটি আত্মনির্ভরশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আর এ অর্জনের মধ্য দিয়েই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারপারসন
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

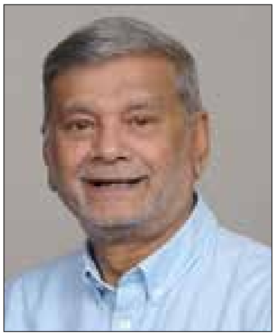

এম.এ. মান্নান, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভাইস-চেয়্যারম্যান, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) উপস্থাপন করছি। এটি ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে দ্বিতীয় 'বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এ প্রক্ষেপিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি অর্জনের এজেন্ডা সম্পন্ন করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ সহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহও (এসডিজি) অর্জনে সহায়ক হবে। আমরা এই পরিকল্পনাটি এমন একটি শুভ মুহূর্তে প্রণয়ন করেছি যখন বাংলাদেশ একই সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষ উদযাপন করছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে অনুমোদিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫), মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এজেন্ডা সম্পাদনে সহায়ক হবে। পরিকল্পনাটি যথাযথ নীতিসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি উন্নয়নের প্রসার, অন্তর্ভুক্তি উৎসাহিতকরণ, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসের লক্ষ্যে উপযুক্ত উন্নয়ন কৌশলসমূহ প্রণয়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে অর্জিত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়ের বিষয়টি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানত ৬টি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে: ১) কোভিড-১৯ পরিস্থিতি হতে দ্রুত পুনরুদ্ধার ২) জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তির একটি বিস্তৃত কৌশলসহ দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ৩) দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় একটি টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ ৪) প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং অপরিহার্য নগরায়ণের সফল ব্যবস্থাপনা ৫) অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমুহের উন্নয়ন ও বিকাশ এবং ৬) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন ও এলডিসি হতে উত্তরণের প্রভাবসমূহ মোকাবেলা করা।

পরিকল্পনাটির কার্যকর বাস্তবায়ন মূলত সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অংশীজনের গৃহীত কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করবে। এমতাবস্থায়, আমি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যাতে আমরা আমাদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করতে পারি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি বিশাল প্রক্রিয়া যা জিইডি'র সাথে সরকারের নীতি নির্ধারকগণ, মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সিভিল সোসাইটি প্রমুখের আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই জিইডি'র কর্মকর্তাদের, যাদের কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে এই অভাবনীয় বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও এটি দ্রুত প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি পরিকল্পনাটি সম্পাদনে বিশেষজ্ঞ ভূমিকা পালনের জন্য অর্থনীতিবিদ প্যানেলের সদস্যবৃন্দের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, আমি বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়নে কৌশলগত নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এম.এ. মান্নান, এমপি

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

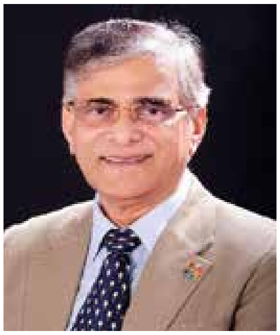

ড. শামসুল আলম
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

প্রাক-কথা

আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এবং বহুল প্রতীক্ষিত মুজিব জন্মশতবর্ষ উদযাপনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫) জাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে ন্যায় ও সাম্যের সমাজ অর্জনের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচক্ষণ নির্দেশনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়, যা আজকের উন্নয়নের একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীতে, একটি সমৃদ্ধ জাতি হবার লক্ষ্যে কৌশলগত দর্শনের নকশা নির্ধারণের জন্য আজ অবধি মোট সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

'কোভিড-১৯' নামক বৈশ্বিক বিপর্যয় যেটি বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি প্রক্রিয়া এই মহামারীর দরুণ প্রভাবিত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় অনন্য। কারণ এ পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ পুনরুদ্ধারের কৌশলসমূহকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি খাতভিত্তিক কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় একটি পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরিবর্তে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার পক্ষে ছিল; কারণ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় বিরতি সরকারের চলমান উন্নয়ন উদ্যোগসমূহকে মন্থর করতে পারে যা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ, এসডিজির লক্ষ্য অর্জন এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আকাঙ্ক্ষা পূরণের মত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর বাস্তবায়নে চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর কথা বিবেচনা করা হয়েছে, যার প্রথম পাঁচ বছরের সময়কাল অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। সুতরাং, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর বাস্তবায়ন শুরু করা, যাতে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে স্থিরকৃত লক্ষ্যে পৌঁছায় এবং এলডিসি হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জন করে, যা ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করবে।

কোভিড -১৯ এর আবির্ভাবের পূর্বে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং দারিদ্র্য হ্রাস সম্পর্কিত বৃহৎ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকারিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় জিডিপির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি (৭.১৩ শতাংশ) পরিকল্পনার বার্ষিক গড় লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি (৭.৪ শতাংশ) পৌঁছে ছিল। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে আরও আধুনিক নগর-ভিত্তিক উৎপাদন ও পরিষেবামূলক অর্থনীতিতে রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। পরিবহন, ব্যাংকিং, আবাসন, আইসিটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মত আধুনিক পরিষেবা খাতের ভূমিকা রপ্তানিমুখী উৎপাদন খাতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে, যা প্রতিবছর গড়ে ১২.৭ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বড় লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্রায়নের মাধ্যমে গ্রাম-শহর বিভেদ কমিয়ে আনা। গ্রামাঞ্চলে অকৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পরিষেবাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে সরকার এ ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। জেন্ডার, ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠী নির্বিশেষে বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ অর্জনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মূল উপাদান হিসেবে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ওপর জোর দিয়ে আসছে। এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০২০ সালের বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ জেন্ডার বৈষম্য কমাতে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫০তম স্থানে ছিল, এমনকি অনেক উন্নত দেশের চেয়েও বাংলাদেশের অবস্থান ভালো ছিল। বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস, বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার পরিবেশকে টেকসই উপায়ে পরিচালনার

জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পুরো একবিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রণীত একটি কারিগরি-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা- ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাস করার বিষয়সমূহ গতি পেয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিডিপি ২১০০ এর যথাযথ বাস্তবায়ন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রস্তুতি ২০১৯ সালে শুরু হয়। সূচনালগ্নে, পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সার্বিক প্রস্তুতি তদারকির জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সভাপতিত্বে অর্থনীতিবিদ প্যানেলও তৈরি করা হয়, যেখানে দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে অব্যাহত সমর্থন ও সহায়তা দিয়েছেন। এই মহতী উদ্যোগে অর্থাৎ পরিকল্পনাটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জিইডি সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, নীতি নির্ধারক, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, থিংক ট্যাঙ্ক এবং নতুন চিন্তকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় মোট ২৫টি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিও সম্পন্ন করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ হতে প্রাপ্ত হালনাগাদ তথ্যসমূহ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৬টি মূল বিষয়বস্তু ঘিরে আবর্তিত- ১. কোভিড -১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার; ২. জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস; ৩. অন্তর্ভুক্তির একটি বিস্তৃত কৌশল; ৪. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় একটি টেকসই উন্নয়ন কৌশল; ৫. ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন সাধন; এবং ৬. এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাব হ্রাস করা। এই পরিকল্পনা দলিল দুটি বিস্তৃত অংশে সংগঠিত করা হয়েছে। প্রথম অংশে নীতি কাঠামো প্রণয়নের পাশাপাশি পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) সময়কালে সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামো, দারিদ্র্য এবং অসমতা হ্রাসের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই অংশেই সরকারের বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সামগ্রিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যমাত্রাসহ ১৩টি সেক্টরের (প্রতিরক্ষা ব্যতীত) খাতভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ স্ব স্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাদের খাত-সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এবং কর্মসূচি প্রস্তুত করার সময় এই খাতভিত্তিক কৌশল এবং পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করবে বলে আশা করা যায়।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে ৮.৫১% জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রায় সামঞ্জস্য রাখতে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩৬.৫৯% এ উন্নীত করা দরকার, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকবে (জিডিপির ২৭.৩৫%)। পরিষেবা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি এক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রধান চালক হবে। অষ্টম পরিকল্পনার সময়কালে সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্যোগকে আরও জোরদার করবে, যা দারিদ্র্যকে ১৫.৬% এবং চরম দারিদ্র্যকে ৭.৪% এ নামিয়ে আনবে। যে কোন পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ষষ্ঠ এবং সপ্তম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও সমৃদ্ধ উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) প্রণয়ন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন পরিমাপ করতে ১০৪টি DRF সূচক (যার অর্ধেকেরও বেশি এসডিজি সম্পর্কিত) এর সাহায্যে মূল সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক পরিমাণগত ফলাফল পরিবীক্ষণ করা হবে। ২০২৩ অর্থ-বছরের শেষে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনার কথা চিন্তা করা হয়েছে এবং ২০২৫ অর্থ-বছরের শেষে অর্থাৎ পরিকল্পনাটি শেষ হওয়ার পরে এটির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হবে।

আমি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে এর কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ পরামর্শের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাছি। আমি আশা করি এই পরিকল্পনা বাংলাদেশের নাগরিকদের মঙ্গল সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য অংশীজন যারা এই পরিকল্পনা দলিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। জিইডির (বিশেষত দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ) কর্মকর্তারা, যারা কোভিড -১৯ প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য এর খসড়া থেকে আরম্ভ করে এটিকে চূড়ান্ত রূপ দানে অবিরাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সর্বশেষ, বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত অর্থনীতিবিদ প্যানেলসহ সিভিল সোসাইটির সদস্য, যারা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) চূড়ান্তকরণে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

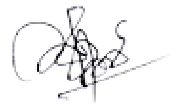

(ড. শামসুল আলম)

(মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত)

সূচিপত্র

সূচিপত্র i
সারণির তালিকা xiii
চিত্রের তালিকা xix
বক্সের তালিকা xxiii
সংযুক্ত সারণির তালিকা xxiii
সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী xxv
নির্বাহী সারসংক্ষেপ xxxvii

অংশ-১
সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত: কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতি কাঠামো
অধ্যায় ১

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উন্নয়ন অগ্রগতি ১
১.১ পর্যালোচনা ১
১.২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং কর্মসৃজনে অগ্রগতি ১
১.২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২
১.২.২ কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তর ৩
১.২.৩ বিনিয়োগে অগ্রগতি ৪
১.২.৪ কর্মসংস্থান ও শ্রম উৎপাদনশীলতা ৪
১.৩ দারিদ্র্য ও আয় অসমতা হ্রাসে অগ্রগতি ১০
১.৩.১ দারিদ্র্য হ্রাস ১০
১.৩.২ আয় বৈষম্য ১২
১.৪ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা ১৩
১.৪.১ জেন্ডার সমতা ১৩
১.৪.২ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ১৩
১.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা ১৪
১.৫ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি ১৪
১.৫.১ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ১৫
১.৫.২ বহিঃখাত ব্যবস্থাপনা ১৬
১.৫.৩ মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা ১৬
১.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রগতি ১৭
১.৬.১ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি ১৭
১.৬.২ পরিবহন খাত ১৭
১.৭ মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি ১৯
১.৭.১ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (এইচপিএন) ১৯
১.৭.২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২০
১.৮ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ২১
১.৮.১ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ২১
১.৮.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ২২
১.৯ গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি ২২
১.১০ অর্থবছর ২০২০ মেয়াদে কর্মাকৃতি: কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি সাড়া ২৩
১.১০.১ সরকারি নীতিতে সাড়া প্রদান ২৪
১.১০.২ কোভিড-১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ ২৬
১.১১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য করণীয় ২৬

অধ্যায় ২

দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের কৌশলসমূহ ২৯
২.১ উন্নয়ন প্রেক্ষাপট ২৯
২.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন পদক্ষেপ ৩০
২.৩ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং ন্যায্যতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ:- ৩০
২.৩.১ দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য ৩১
২.৩.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য..৩১
২.৩.৩ ন্যায্যতা..৩১
২.৪ দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রগতি: ৩৩
২.৫ প্রবৃদ্ধি অসমতা যোগসূত্র ৩৩
২.৬ প্রবৃদ্ধি ও বণ্টনঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা ৩৪
২.৭ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগসমূহ থেকে শিক্ষা.. ৩৫
২.৮ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও নীতিসমূহ..৩৬
২.৮.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ ৩৬
২.৮.২ কোভিড ১৯ পরবর্তী জিডিপি প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের কৌশল.. ৩৭
২.৮.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ সমূহ.. ৩৭
২.৮.৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসৃজনের প্রাক্কলন ৩৮
২.৮.৫ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলসমূহ..৩৯
২.৮.৬. দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির নীতিসমূহ..৪১
২.৯ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা ৪৩
২.১০ কোভিড-১৯ এর যুগে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ৪৪

অধ্যায় ৩

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো..৪৫
৩.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ ৪৫
৩.২ বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং রাজস্ব নীতি ৪৭
৩.২.১ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা..৪৭
৩.২.২ সরকারি বিনিয়োগ প্রচেষ্টা শক্তিশালীকরণ: রাজস্ব নীতি সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ৪৮
৩.২.৩ জাতীয় সঞ্চয় প্রচেষ্টা বজায় রাখা..৫০
৩.৩ লেনদেনের ভারসাম্য (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) এবং বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা..৫১
৩.৪ বিনিময় হার নীতি..৫৪
৩.৫ আর্থিক সেবাখাতের অবদান এবং মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ৫৫
৩.৫.১ ব্যাংকিং খাতের পরিকৃতি ৫৫
৩.৫.২ মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ৫৮
৩.৫.৩ সুদ হার নীতি ৫৯
৩.৫.৪ পুঁজিবাজার উন্নয়ন কৌশল ৬১
৩.৫.৫ বিমা খাতের কৌশল ৬৫
৩.৬ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা..৬৫

অধ্যায় ৪

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল ৭৫
৪.১ প্রস্তাবনা ৭৫
৪.২ দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি ৭৬
৪.২.১ দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি ৭৬
৪.২.২ দারিদ্র্যের ফলাফল অর্জনে সহায়ক খাতসমূহ ৭৭
৪.২.৩ দারিদ্র্য নিরসনে উদ্ভূত বিষয়সমূহ ৮৪
৪.২.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতি ৮৫
৪.২.৫ দারিদ্র্য নিরসনে অষ্টম পরিকল্পনা কৌশল ৮৭
৪.২.৬ চরম দারিদ্র্য মোকাবেলার কৌশল-অতিরিক্ত ব্যবস্থা। ৯১
৪.২.৭ বহুমূখী দারিদ্র্য সূচক (Multidimensional Poverty Index-MPI) ৯২
৪.৩ আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে অগ্রগতি ৯২
৪.৩.১ দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বণ্টন ৯২
৪.৩.২ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে দারিদ্র্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ৯৪
৪.৪ আয় বৈষম্য নিরসনে উন্নতি ৯৫
৪.৪.১ উত্তম আয় বণ্টন কৌশল ৯৫

অধ্যায় ৫

সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং এর অর্থায়ন ৯৯
৫.১ পর্যালোচনা ৯৯
৫.২ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য মোট সম্পদের পরিমাণ ১০০
৫.২.১ মোট বিনিয়োগ ও অর্থায়ন ১০০
৫.২.২ বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থায়ণ ১০০
৫.২.৩ সরকারি খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন ১০১
৫.৩ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব নীতি কাঠামো ১০১
৫.৩.১ উচ্চ সরকারি ব্যয়ের চাহিদা ১০২
৫.৪ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রাজস্ব গতিশীলতা: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা ১০৪
৫.৪.১ আর্থিক ঘাটতি ও অর্থায়ন ১০৯
৫.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল ১০৯
৫.৫.১ সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনা ১০৯
৫.৬ সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার ১১২
৫.৭ সমন্বিত উন্নয়ন অংশীদারিত্বের অভিমুখে ১১৪
৫.৮ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১১৫

অধ্যায় ৬

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ১২১
৬.১ পর্যালোচনা ১২১
৬.২ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ১২১
৬.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১২৩
৬.৩.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ভূমিকা ১২৩
৬.৩.২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ১২৪
৬.৩.৩ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ১২৪
৬.৩.৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১২৪

অংশ-২
খাত উন্নয়ন কৌশল
খাত ১: সাধারণ সরকারি সেবা এবং
খাত ২: জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা
অধ্যায় ১

জন প্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ....................১৪৩
১.১ সূচনা ১৪৩
১.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গভর্ন্যান্স ক্ষেত্রে অর্জন ১৪৪
১.২.১ ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতি ১৪৪
১.২.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সুনির্দিষ্ট অর্জন ১৪৬
১.৩ প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ ১৫১
১.৪ গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ ১৫৪
১.৪.১ প্রধান ক্ষেত্র ১: সরকারি খাতের সক্ষমতা: প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন....................১৫৪
১.৪.২ প্রধান ক্ষেত্র ২ক: বিচার ও আইনের শাসন....................১৫৫
১.৪.৩ প্রধান ক্ষেত্র ২খ: আইন প্রণয়ন এবং আইনের শাসন ১৫৭
১.৪.৪ প্রধান ক্ষেত্র ৩: অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন ১৫৮
১.৪.৫ প্রধান ক্ষেত্র ৪: স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্স উন্নতিকরণ....................১৬৩
১.৪.৬ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত কার্যক্রমের অন্যান্য ক্ষেত্র ১৬৩
১.৫ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা....................১৬৫
১.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বরাদ্দ....................১৬৯

খাত ৩: শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা
অধ্যায় ২

রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন কৌশল....................১৭৫
২.১ প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা ১৭৫
২.২ বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্পনীতির পর্যালোচনা....................১৭৬
২.৩ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা....................১৮০
২.৩.১ ১৯৭৮ পরবর্তী চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল....................১৮১
২.৩.২ ভিয়েতনাম: ম্যানুফ্যাকচারিং বিস্ময় ১৮২
২.৪ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাণিজ্য নীতি ১৮৪
২.৫ চলতি বাণিজ্য পদ্ধতি ও রপ্তানি অগ্রগতি....................১৮৬
২.৬ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের জন্য বাণিজ্য পদ্ধতির প্রয়োগ ১৮৯
২.৬.১ বাণিজ্য সুবিধাদির উন্নয়ন....................১৯৫
২.৬.২ বিদ্যুৎ ও পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন ১৯৬
২.৬.৩ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-এর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাজার অভিগম্যতার উন্নয়ন ১৯৭
২.৬.৪ বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন ১৯৮
২.৬.৫ বাণিজ্য ও শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ....................২০০
২.৭ দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পনীতি ২০১
২.৮ বাজার অভিগম্যতার দ্রুত বিস্তৃতির জন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) ২০৩
২.৯ প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ২০৬
২.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ২০৮

অধ্যায় ৩

কাঠামোগত রূপান্তরের সেতু বন্ধনে সেবা খাত ২০৯

৩.১ উন্নয়ন প্রেক্ষাপট ২০৯
৩.২ সেবা ও কাঠামোগত রূপান্তর ২০৯
৩.৩ বাংলাদেশের সেবা খাতের গতি-প্রকৃতি ২১৪
৩.৩.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান ২১৪
৩.৩.২ সেবা খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ২১৪
৩.৩.৩ বর্ধিত কৃষি বহির্ভূত সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ রূপান্তর ২১৫
৩.৩.৪ খাত (Factor) ও খাত বহির্ভূত (Non-Factor) সেবা থেকে বর্ধনশীল রপ্তানি আয় ২১৭
৩.৪ উন্নয়নের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিত করা ২১৯
৩.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান কৌশল ২২২
৩.৫.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ ২২২
৩.৬ সেবা খাতে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ ২২৭
৩.৬.১ সেবা খাতের কাঠামো ২২৮
৩.৬.২ সেবা খাত কার্যক্রমের আধুনিকায়নের সন্ধানে ২৩০
৩.৬.৩ সেবার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার চ্যালেঞ্জ ২৩২
৩.৬.৪ সেবার ক্ষেত্রে দক্ষতার চ্যালেঞ্জ ২৩৪
৩.৬.৫ খাত বহির্ভূত সেবার রপ্তানি চ্যালেঞ্জ ২৩৬
৩.৬.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সহায়ক বিধিবিধান ২৩৯
৩.৭ সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ২৪০
৩.৭.১ সেবা খাত কৌশল ২৪০
৩.৭.২ প্রণোদনা নীতিমালা ২৪১
৩.৭.৩ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ২৪৩
৩.৭.৪ সেবা খাতের দক্ষতার ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ২৪৫
৩.৭.৫ বিচক্ষণ বিধি বিধান (Prudential Regulations) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ২৪৬
৩.৭.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ২৪৬
৩.৭.৭ কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তার দক্ষতা ২৪৭
৩.৮ সেবা খাতের জন্য বিনিয়োগ চাহিদা ২৪৮

খাত ৪: কৃষি
অধ্যায় ৪

কৃষি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ ২৫১

৪.১ ভূমিকা ২৫১
৪.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতের অগ্রগতি ২৫২
৪.৩ শস্য উপখাত: ২৫৩
৪.৩.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের অগ্রগতি ২৫৪
৪.৩.২ শস্য উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ২৫৫
৪.৩.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফসল উপখাতের কৌশলসমূহ ২৫৯
৪.৪ প্রাণি-সম্পদ উপখাত ২৬৬
৪.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অগ্রগতি ২৬৬
৪.৪.২ প্রাণিসম্পদ উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ২৬৭
৪.৪.৩ প্রাণি সম্পদ উপখাতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কৌশল: ২৬৯
৪.৫ মৎস্য উপখাত ২৭১

৪.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মৎস্য উপখাতের অগ্রগতি ২৭১
৪.৫.২ মৎস্য উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ২৭৩
৪.৫.৩ মৎস্য উপখাতের লক্ষ্য ও কৌশল ২৭৪
৪.৬ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ২৭৯
৪.৬.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৭৯
৪.৬.২ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ ২৮০
৪.৬.৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ ২৮২
৪.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ২৮৮
৪.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ডেল্টা সম্পর্কিত নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার....২৯০
৪.৭.১ গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার ২৯০
৪.৭.২ গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ২৯১
৪.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি এবং পানিসম্পদ খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ....২৯৪

খাত ৫: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
অধ্যায় ৫

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল....২৯৭
৫.১ প্রেক্ষাপট ২৯৭
৫.২ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অর্জন....২৯৮
৫.২.১ বিদ্যুৎ খাত ২৯৯
৫.২.২ প্রাথমিক জ্বালানিতে অগ্রগতি.... ৩০৮
৫.২.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের অগ্রগতি....৩১৪
৫.২.৪ জ্বালানিতে প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্কারসমূহের অগ্রগতি....৩১৪
৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাতের কৌশল....৩১৫
৫.৩.১ বিদ্যুৎ খাতের কৌশল....৩১৬
৫.৩.২ প্রাথমিক জ্বালানি খাতের কৌশল ৩২৪
৫.৩.৩ বিদ্যুৎ এবং প্রাথমিক জ্বালানির জন্য অর্থায়ন কৌশল ৩২৬
৫.৩.৪ বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার....৩২৬
৫.৩.৫ জ্বালানি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৩২৮
৫.৩.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি খাতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ ৩২৮

খাত ৬: পরিবহন ও যোগাযোগ
অধ্যায় ৬

পরিবহন ও যোগাযোগ উন্নয়ন কৌশল....৩৩১
৬.১ পর্যালোচনা....৩৩১
৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতের অগ্রগতি ৩৩১
৬.২.১ সড়ক পরিবহন খাতে অগ্রগতি ৩৩২
৬.২.২ রেলসেবা খাতের অগ্রগতি ৩৩৫
৬.২.৩ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (IWT).... ৩৩৫
৬.২.৪ সামুদ্রিক পরিবহন উপখাতের অগ্রগতি....৩৩৬
৬.২.৫ বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে অগ্রগতি.... ৩৩৭
৬.২.৬ সমুদ্রবন্দর উপখাতে অগ্রগতি ৩৩৮
৬.২.৭ নগর পরিবহন....৩৪০
৬.২.৮ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতের কতিপয় ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ....৩৪২

৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৪৩
৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্য ৩৪৪
৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের জন্য নির্ধারিত কৌশল ৩৪৫
৬.৫.১ উপখাতভিত্তিক কৌশলসমূহ ৩৪৭
৬.৬ ডাক ও টেলিযোগযোগ সেবা ৩৫৭
৬.৬.১ ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩৫৮
৬.৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি ৩৫৯
৬.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিকম খাতের জন্য নির্ধারিত অভীষ্ট, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ ৩৬৪
৬.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিযোগাযোগ খাতের কৌশলসমূহ ৩৭২
৬.৭ ডাক পরিষেবা খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ ৩৭৬
৬.৮ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ পরিকল্পনা ৩৭৭

খাত ৭: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
অধ্যায় ৭

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল ৩৮১
৭.১ ভূমিকা ৩৮১
৭.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার খাতে অগ্রগতি ৩৮১
৭.২.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩৮১
৭.২.২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৩৮৫
৭.২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৮৭
৭.২.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি ৩৮৮
৭.৩ আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ৩৮৮
৭.৩.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের ধারা ৩৮৯
৭.৩.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের ধারা ৩৯০
৭.৩.৩ দুর্বল নিজস্ব রাজস্ব উৎস ৩৯১
৭.৩.৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ ব্যয়ের বৈষম্য ৩৯৩
৭.৩.৫ আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ: আন্তর্জাতিক তুলনা ৩৯৪
৭.৩.৬ এককেন্দ্রিক বাজেট কাঠামোর ফলাফলসমূহ ৩৯৫
৭.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ ৩৯৫
৭.৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩৯৬
৭.৪.২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ৪০৫
৭.৪.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ৪১১
৭.৫ অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ৪১৩
৭.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বরাদ্দ ৪১৪

খাত ৮: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন
অধ্যায় ৮

টেকসই উন্নয়ন: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ৪১৭
৮.১ পর্যালোচনা ৪১৭
৮.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি ৪২০
৮.২.১ পরিকল্পনা, নীতি, কৌশল ৪২০
৮.২.২ কার্যক্রম/উদ্যোগ/ব্যবস্থাসমূহ ৪২৩

৮.৩ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ....৪২৮
৮.৩.১ সুসংগত প্রতিষ্ঠান, নীতি এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা....৪২৮
৮.৩.২ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্ট পরিবেশগত উদ্বেগ....৪২৯
৮.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশ-বিষয়ক কৌশল ও কার্যক্রমসমূহ.... ৪৩৩
৮.৪.১ টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ-বিষয়ক রাজস্ব কাঠামো সংস্কার (EFR) কার্যক্রম ৪৩৩
৮.৪.২ পরিবেশগত রাজস্ব ও বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নে রাজস্ব কাঠামো সংস্কার....৪৩৫
৮.৪.৩ পরিবেশ-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ৪৩৬
৮.৪.৪ খাত-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও ওয়াশ প্রযুক্তি/পদক্ষেপসমূহ.... ৪৩৭
৮.৪.৫ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৪৩৭
৮.৪.৬ সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে নির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ....৪৩৯
৮.৫ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ ৪৪৩
৮.৬ বন উপখাত....৪৪৬
৮.৬.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতের কর্মসম্পাদন অগ্রগতি....৪৪৬
৮.৬.২ বন উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ.... ৪৪৮
৮.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতের লক্ষ্যসমূহ ৪৪৯
৮.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন উপখাতের জন্য নির্ধারিত কৌশলসমূহ ৪৫০
৮.৭ টেকসই উন্নয়ন–অর্জনের উপায়সমূহ....৪৫২
৮.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দকরণ....৪৫৩

খাত ৯: গৃহায়ন ও নাগরিক পরিষেবাসমূহ
অধ্যায় ৯

নগর উন্নয়ন কৌশল....৪৫৭
৯.১ ভূমিকা ৪৫৭
৯.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), নতুন নগর এজেন্ডা (এনইউএ) ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা....৪৫৭
৯.৩ বাংলাদেশে নগরায়ণের ধরণ ও ক্রমধারা ৪৫৯
৯.৩.১ নগর প্রবৃদ্ধির স্থানিক ও অস্থায়ী ধরণ....৪৫৯
৯.৩.২ নগরকেন্দ্রের আকার ও সংখ্যা: স্থানিক ও অস্থায়ী ধরণ....৪৬০
৯.৩.৩ ঢাকার প্রাধান্য....৪৬১
৯.৪ নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৪৬২
৯.৪.১ অর্থনীতিতে নগরসমূহের ভূমিকা....৪৬২
৯.৪.২ অর্থনীতির সামষ্টিকীকরণ ও নগরায়ণ ৪৬৩
৯.৪.৩ নগরীর প্রতিযোগী সক্ষমতা....৪৬৪
৯.৫ নগরায়ণের প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৪৬৫
৯.৫.১ নগরের পরিবেশ ৪৬৫
৯.৫.২ ভূমি ও গৃহায়ন....৪৬৬
৯.৫.৩ মৌলিক নগর পরিষেবাসমূহ....৪৬৭
৯.৫.৪ নগর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৪৭৪
৯.৬. নগর এলাকার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ....৪৭৬
৯.৬.১ নগর গভর্ন্যান্স ও ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান ব্যবস্থা ৪৭৬
৯.৬.২ নগর গভর্ন্যান্স ও ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণমূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামো ৪৭৬
৯.৭ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নগর খাতের অগ্রগতি/পর্যালোচনা ৪৭৯
৯.৭.১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়: সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ....৪৭৯
৯.৭.২ স্থানীয় সরকার বিভাগ (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়): সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ ৪৮১

৯.৭.৩ ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ.. ৪৮৫

৯.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন কৌশল ৪৮৬

৯.৮.১ স্থানিক উন্নয়ন কৌশল ৪৮৭

৯.৮.২ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কৌশলসমূহ..৪৮৯

৯.৮.৩ অবকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের কৌশলসমূহ..৪৯০

৯.৮.৪ নগরীর ভূমি ও গৃহায়ন উন্নয়ন কৌশলসমূহ ৪৯৩

৯.৮.৫ নগরীর পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ ৪৯৫

৯.৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর খাতের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রণালয়/বিভগিভিত্তিক অভীষ্ট, কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ ৪৯৭

৯.৯.১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়..৪৯৭

৯.৯.২ স্থানীয় সরকার বিভাগ..৪৯৮

৯.৯.৩ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ৪৯৯

৯.৯.৪ নগর খাতের জন্য উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) ৫০১

৯.৯.৫ নগর খাতের জন্য সম্পদ সংগ্রহ.. ৫০৩

৯.৯.৬ নগর উন্নয়নে স্থানীয় অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি..৫০৪

৯.৯.৭ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৫০৪

৯.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নগর খাতের উন্নয়নে তহবিলের জোগান..৫০৪

খাত ১০: স্বাস্থ্য

অধ্যায় ১০

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি ৫০৯

১০.১ পর্যালোচনা..৫০৯

১০.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি..৫১০

১০.২.১ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এসডিজি অভীষ্টের অগ্রগতি ৫১২

১০.২.২ চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-এর অগ্রগতি..৫১৪

১০.২.৩ স্বাস্থ্য সেবায় অসমতা মোকাবিলায় অগ্রগতি ৫১৫

১০.২.৪ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) পদ্ধতির অগ্রগতি..৫১৫

১০.৩ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN) খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ..৫১৭

১০.৩.১ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ৫১৮

১০.৩.২ কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ ও এটির প্রতি বাংলাদেশের সাড়া প্রদান ৫১৯

১০.৪ এইচপিএন খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত অভীষ্ট, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ..................৫২১

১০.৪.১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচি..৫২৩

১০.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম ৫৩৬

১০.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পুষ্টি কর্মসূচি ৫৩৮

১০.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন..৫৪১

১০.৬.১ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি..৫৪১

১০.৬.২ জনমিতিক লভ্যাংশ ও বয়োবৃদ্ধি ৫৪৪

১০.৬.৩ জনসংখ্যা খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ ৫৪৬

১০.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা কর্মসূচি..৫৪৭

১০.৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জনমিতিক লভ্যাংশের ব্যবহার..৫৪৯

১০.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দকরণ ৫৫০

খাত ১১: : শিক্ষা ও প্রযুক্তি
অধ্যায় ১১

শিক্ষা খাত উন্নয়ন কৌশল ৫৫৩

১১.১ সূচনা ৫৫৩

১১.২ মানব মূলধন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি........ ৫৫৩

১১.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে শিক্ষা খাতের অগ্রগতি এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ........৫৫৪

১১.৩.১ প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশব শুরুর শিক্ষায় অগ্রগতি ৫৫৫

১১.৩.২ প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি........৫৫৫

১১.৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি ৫৫৭

১১.৩.৪ মাদ্রাসা শিক্ষায় অগ্রগতি ৫৫৯

১১.৩.৫ উচ্চ শিক্ষায় অগ্রগতি........৫৬১

১১.৩.৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি ৫৬৩

১১.৪ দক্ষতা উন্নয়নের অগ্রগতি ৫৬৪

১১.৫ শিক্ষার সমতার দিকসমূহ........৫৬৭

১১.৬ শিক্ষা ও টিভেটের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৫৬৯

১১.৭ শিক্ষা খাতের উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশলসমূহ........৫৭০

১১.৭.১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ক্রস-কাটিং বিষয়গুলো সামলানো ৫৭১

১১.৭.২ প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশব শুরুর শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ........৫৭২

১১.৭.৩ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ........ ৫৭৩

১১.৭.৪ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ ৫৭৩

১১.৭.৫ মাদ্রাসা প্রবাহ উন্নয়নের কৌশলসমূহ........৫৭৫

১১.৭.৬ উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ ৫৭৬

১১.৭.৭ প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ ৫৭৭

১১.৮ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) অধীনে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষতার সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা........ ৫৭৮

১১.৯ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি ৫৮০

খাত ১২: ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ
অধ্যায় ১২

উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি কৌশল........ ৫৮৩

১২.১ পর্যালোচনা ৫৮৩

১২.২ উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল অর্থনীতিকে কাজে লাগানো........ ৫৮৪

১২.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি অগ্রগতির পর্যালোচনা ৫৮৫

১২.৩.১ কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো ৫৮৬

১২.৩.২ ই-গভর্নমেন্ট ৫৮৭

১২.৩.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন ৫৮৮

১২.৩.৪ আইসিটি শিল্পের প্রসার ৫৮৮

১২.৩.৫ আইসিটি বিভাগের আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা ও নীতিমালা........৫৮৯

১২.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ........৫৮৯

১২.৪.১ লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতির সুযোগ কাজে লাগানো........৫৯০

১২.৪.২ পাঁচ হেলিক্স ৫৯০

১২.৪.৩ শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা........৫৯১

১২.৪.৪ মেধাসম্পদ এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারকেন্দ্রিক স্টার্ট-আপের সফলতা সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় সুযোগ কাজে লাগানোর সময় যুবকদের ক্ষমতায়ন ৫৯২

১২.৪.৫ হাই-টেক যন্ত্র ও উদ্ভাবনে সফলতা সৃষ্টি করার জন্য পুনর্নকশা সক্ষমতা কাজে লাগানো......................৫৯২
১২.৪.৬ হাই-টেক পার্কগুলোকে ডিজিটাল, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবন অর্থনীতির কেন্দ্রে পরিণত করা ৫৯৩
১২.৪.৭ ব্যাপক স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সেবা সরবরাহের জন্য আইসিটি..৫৯৪
১২.৪.৮ গ্লোবাল ডিজিটাল ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের সমতা ও ন্যায্য শেয়ার নিশ্চিতকরণ ৫৯৫
১২.৪.৯ দারিদ্র্য কমানোর জন্য আইসিটি ব্যবহার করা...৫৯৬
১২.৪.১০ এসডিজি অর্জনের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতি অর্জন করা...৫৯৭
১২.৪.১১ ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেয়া...৫৯৮
১২.৪.১২ কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহ দেয়া..৫৯৯
১২.৪.১৩ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সুবিধা আদায়ের জন্য সংস্কৃতি ও জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা বিনির্মাণ.................৬০০
১২.৪.১৪ কোভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে উত্তরণে আইসিটির শক্তিকে কাজে লাগানো। এছাড়া স্বাস্থ্য সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও আইসিটির ক্ষমতা কাজে লাগানো। ৬০১
১২.৫ সার্বিক পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকির বিষয় ও সুপারিশমালা...৬০৮
১২.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বরাদ্দ...৬১০

খাত ১৩: বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম
অধ্যায় ১৩

সংস্কৃতি, তথ্য, ধর্ম, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন...৬১৩
১৩.১ প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা...৬১৩
১৩.২ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ ৬১৩
১৩.২.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ ৬১৪
১৩.২.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ...৬১৫
১৩.২.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কৌশলসমূহ..৬১৬
১৩.৩ তথ্য ৬১৭
১৩.৪ ধর্ম বিষয়ক: ৬২০
১৩.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চলাকালীন অগ্রগতি ৬২০
১৩.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ...৬২১
১৩.৪.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল এবং লক্ষ্যসমূহ ৬২১
১৩.৫ ক্রীড়ার উন্নয়ন ৬২৩
১৩.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ...৬২৩
১৩.৫.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খেলাধুলার উন্নয়নে উদ্দেশ্যসমূহ ৬২৩
১৩.৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খেলাধুলার উন্নয়নে লক্ষ্যসমূহ...৬২৩
১৩.৬ যুব উন্নয়ন ৬২৪
১৩.৬.১ যুব উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ...৬২৪
১৩.৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যুব উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ ৬২৫
১৩.৬.৩ যুব কর্মসংস্থানের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)...৬২৬
১৩.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব উন্নয়নের উদ্দেশ্য/লক্ষ্যসমূহ..৬২৭
১৩.৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় যুব উন্নয়নের জন্য কৌশল ও নীতিসমূহ.............................৬২৮
১৩.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, খেলাধুলা এবং যুবাদের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ.................৬৩৩

খাত ১৪: সামাজিক সুরক্ষা

অধ্যায় ১৪

সামাজিক সুরক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি..৬৩৭

১৪.১ ভূমিকা ৬৩৭

১৪.২ সামাজিক সুরক্ষা ৬৩৭

১৪.২.১ বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ..৬৩৮

১৪.২.২ সপ্তম পরিকল্পনার সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ৬৪০

১৪.২.৩ অষ্টম পরিকল্পনার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কৌশল..৬৪২

১৪.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ৬৫৩

১৪.৩.১ খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির চ্যালেঞ্জ..৬৫৩

১৪.৩.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির জন্য কৌশল ও উদ্দেশ্য ৬৫৫

১৪.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৬৫৮

১৪.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালীন অগ্রগতি..৬৬০

১৪.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ..৬৬১

১৪.৫ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন..৬৬৪

১৪.৫.১ সপ্তম পরিকল্পনায় অগ্রগতি..৬৬৪

১৪.৫.২ বাস্তবায়ন ৬৬৪

১৪.৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার কৌশল..৬৬৮

১৪.৫.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশল বাস্তবায়ন..৬৮২

১৪.৬ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ৬৮৪

১৪.৬.১ সপ্তম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি..৬৮৪

১৪.৬.২ বাস্তবায়ন ৬৮৮

১৪.৬.৩ অষ্টম পরিকল্পনার জন্য অন্তর্ভুক্তির কৌশল ৬৮৮

১৪.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা, সমাজ কল্যাণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্নয়ন সংস্থান ৬৯৫

সারণির তালিকা

অংশ-১

সারণি-১.১:	বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি	২
সারণি-১.২:	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন	৩
সারণি ১.৩:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগের অগ্রগতি	৪
সারণি ১.৪:	সপ্তম পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত কর্মসৃজন (লক্ষ শ্রমিক)	৫
সারণি ১.৫:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থানের অগ্রগতি	৬
সারণি ১.৬:	প্রবৃদ্ধির মোট ও খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি	৬
সারণি ১.৭:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তরুণদের কর্মসংস্থানে চ্যালেঞ্জ-এর অগ্রগতি	৯
সারণি ১.৮:	সপ্তম পরিকল্পপনা মেয়াদে (%) দারিদ্র্য হ্রাস	১০
সারণি ১.৯:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের প্রধান প্রধান নির্দেশক	১০
সারণি ১.১০:	জিডিপি প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা (%)	১১
সারণি ১.১১:	২০১০-২০১৬ এর মধ্যে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি	১১
সারণি ১.১২:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রেমিট্যান্স কর্মাকৃতি	১১
সারণি ১.১৩:	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল লক্ষ্যসমূহ	১৫
সারণি ১.১৪:	কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ (বিলিয়ন টাকা)	২৪
সারণি ১.১৫:	প্রণোদনার আর্থিক ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২৫
সারণি ১.১৬:	কোভিড-১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব	২৬
সারণি ২.১:	আইএমএফ প্রক্ষেপিত স্বল্পমেয়াদি কোভিডকালীন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির চিত্র (%)	২৯
সারণি ২.২:	নিচের ৪০% আয় বৃদ্ধি বনাম গড় জনসংখ্যার আয়	৩২
সারণি ২.৩:	দারিদ্র্যের ধারা: ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৬ (মাথা গুণতি অনুপাত; শতকরা)	৩৩
সারণি ২.৪:	আয় অসমতার বিকল্প পরিমাপ: পালমা অনুপাত	৩৪
সারণি ২.৫:	দশকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হার: ১৯৭০ দশক থেকে ২০১৯ পর্যন্ত (মাথাপিছু শতকরা হার)	৩৫
সারণি ২.৬:	আয় জিনি সহগের দশকভিত্তিক গড়: ১৯৮০ এর দশক থেকে ২০০০ এর দশক (শতকরা)	৩৫
সারণি ২.৭:	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ	৩৭
সারণি ২.৮:	জিডিপির কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	৩৮
সারণি ২.৯:	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৩৯
সারণি ৩.১:	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্র	৪৬
সারণি ৩.২:	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ	৪৬
সারণি ৩.৩:	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রকৃতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫২
সারণি ৩.৪:	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে লেনদেন ভারসাম্যর সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৫৩
সারণি ৩.৫:	বিভিন্ন দেশসমূহের ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের নির্দেশক (২০১৮)	৫৬
সারণি ৩.৬:	ব্যাংকিং খাতের অবস্থা নির্দেশক (শতকরা)	৫৭
সারণি ৩.৭:	বাংলাদেশের ব্যাংকি ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন	৫৭
সারণি ৩.৮:	বাংলাদেশ মুদ্রা জরিপ, অর্থবছর ১৯-২৫	৫৯
সারণি ৩.৯:	পুঁজিবাজার উন্নয়নের নির্দেশক সমূহ (ডিএসই)	৬১
সারণি ৪.১:	দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি ২০০০-২০১৬ (%)	৭৬
সারণি ৪.২:	প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর এবং কর্মসংস্থান ২০০০-২০১৬	৭৭
সারণি ৪.৩:	ক্ষুদ্র ঋণে অভিগম্যতা	৮২
সারণি ৪.৪:	প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	৮৪
সারণি ৪.৫:	সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন	৮৬

সারণি ৪.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার ৮৭
সারণি ৪.৭: অষ্টম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য লক্ষ্যমাত্রা ৮৮
সারণি ৪.৮: বিভাগভিত্তিক দারিদ্র্য বণ্টন (%) ৯৩
সারণি ৪.৯: আয় বৈষম্য কমাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব সংস্কারসমূহ (জিডিপির %) ৯৭
সারণি ৫.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ অর্থায়ন (অর্থবছর ২০২১) ১০০
সারণি ৫.২: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামো (জিডিপির শতকরা) ১০১
সারণি ৫.৩: সরকারি ব্যয় অগ্রাধিকার (জিডিপির %) ১০২
সারণি ৫.৪: রাজস্ব- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন ১০৪
সারণি ৫.৫: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামো ১০৫
সারণি ৫.৬: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান প্রধান রাজস্ব খাতসমূহ ১০৬
সারণি ৫.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন ১০৯
সারণি ৫.৮: সরকারি বিনিয়োগের খন্ড খন্ড অংশ ১১২
সারণি ৫.৯: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে খাতগত এডিপি বরাদ্দ ১১৩
সারণি ৫.১০: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতগত এডিপি বরাদ্দ অর্থবছর ২০২১ মূল্যে ১১৩
সারণি ৫.১১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, মোট উন্নয়ন ব্যয়ের % হিসেবে ১১৪
সারণি ৬.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জাতীয় অগ্রাধিকার ক্ষেত্র ১২২

অংশ-২

সারণি ১.১: বৈশ্বিক গভর্ন্যান্স সূচক (World Governance Indicator): বাংলাদেশ ১৪৪
সারণি ১.২: প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির দেশীয় নির্দেশক ১৪৪
সারণি ১.৩: Ease of Doing Business সূচকে অগ্রগতি ১৪৫
সারণি ১.৪: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় সম্পাদিত বছরভিত্তিক ই-জিপির পরিসংখ্যান ১৫০
সারণি ১.৫: ২০১৮ সালের আদালতের ধরণ অনুযায়ী বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা ১৫২
সারণি ১.৬: ২০১১-২০২০ অর্থবছরে মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের গতিপ্রকৃতি ১৫৩
সারণি ১.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তায় চলতি মূল্যে এডিপি বরাদ্দ (টাকা মিলিয়ন) ১৭০
সারণি ১.৮: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয় ভিত্তিতে সাধারণ সরকারি সেবা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তায় এডিপি বরাদ্দ (স্থায়ী মূল্যে) (টাকা মিলিয়ন) ১৭১
সারণি ২.১: ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাণিজ্য ও শুল্কনীতির ধারা ১৭৭
সারণি ২.২: ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্পখাতের অগ্রগতি ১৭৮
সারণি ২.৩: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্পখাতের অগ্রগতি ১৭৮
সারণি ২.৪: অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশের গড়শুল্ক ক্রম (নিম্ন শুল্কের জন্য উচ্চতর ক্রম) ১৮৮
সারণি ২.৫: বিশ্ব ব্যাংকের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী বিভিন্ন আয় গ্রুপের দেশের গড় শুল্ক হার ১৮৮
সারণি ২.৬: জাতিসংঘের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপের দেশের গড় শুল্ক হার ১৮৮
সারণি ২.৭: নির্বাচিত সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিযোগী দেশগুলোর গৃহীত ট্যারিফের সাধারণ গড় ১৮৮
সারণি ২.৮: বাংলাদেশ ও নির্বাচিত দেশ/অঞ্চলসমূহের শুল্ক বৃদ্ধির হার ১৯০
সারণি ২.৯: অর্থবছর ২০১১- অর্থবছর ২০২০ পর্যন্ত গড় ট্যারিফ ধারা ১৯২
সারণি ২.১০: জিডিপি এবং সেক্টরাল প্রবৃদ্ধির হার ও অংশ, অর্থবছর ২০২০- অর্থবছর ২০২৫ .... ২০১
সারণি ২.১১: শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের জন্য ৮ম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা; চলতি মূল্যে) ২০৮
সারণি ২.১২: শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের জন্য ৮ম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা; ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে) ২০৮

সারণি ৩.১: বিশ্বের সর্ব বৃহৎ পাঁচটি অর্থনীতির কাঠামো, ২০১৮ (জিডিপি'র %) ২১২
সারণি ৩.২: জিডিপি ও সেবার দশকীয় প্রবৃদ্ধি হার ২১৪
সারণি ৩.৩: গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের উৎস (শতাংশ) ২১৬
সারণি ৩.৪: বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২১৯
সারণি ৩.৫: চলতি মূল্যে সেবা খাতের কাঠামো (জিডিপি'র %) ২২৮
সারণি ৩.৬: পরিবহন খাতের গঠন (জিডিপি'র %) ২২৯
সারণি ৩.৭: খাত বহির্ভূত সেবা রপ্তানি থেকে আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে) ২৩৬
সারণি ৩.৮: বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটনের অবদানের তুলনা, ২০১৯ ২৩৭
সারণি ৩.৯: পর্যটন সম্প্রসারণে চলমান উদ্যোগ ২৩৮
সারণি ৩.১০: সেবা খাতের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ (২০২১ ভিত্তি মূল্যে, বিলিয়ন টাকা) ২৪৮
সারণি ৪.১: কৃষি উপখাতগুলোর প্রবৃদ্ধি চিত্র ২৫২
সারণি ৪.২: খাদ্য আইটেমগুলোর মাথাপিছু প্রাপ্যতা (গ্রাম/মাথাপিছু/দিন) ২৫৩
সারণি ৪.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্বাচিত ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন (মিলিয়ন মেট্রিকটন/পাটের জন্য মিলিয়ন বেল) ২৫৪
সারণি ৪.৪: বছরভিত্তিক সারের মূল্য ও বিক্রয় ২৫৭
সারণি ৪.৫: গত ৫-১০ বছরের গড় উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে ২০২৫ পর্যন্ত প্রধান ফসলসমূহের প্রাক্কলিত গড় উৎপাদন (মি:মে.টন, পাট-মিলিয়ন বেল) ২৬০
সারণি ৪.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ২৬১
সারণি ৪.৭: দুধ, মাংস এবং ডিমের চাহিদা, উৎপাদন, ঘাটতি ও প্রাপ্যতা ২৬৭
সারনী ৪.৮: দুধ, মাংস ও ডিমের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও যোগান ২৭০
সারনি ৪.৯: মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানিসংক্রান্ত তথ্য ২৭৩
সারণি ৪.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মাছের প্রক্ষেপনকৃত উৎপাদন ২৭৫
সারণি ৪.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পানিখাতে লক্ষ্যমাত্রা ২৮৩
সারণি ৪.১২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ডেল্টা সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (পিআইপি) (২০১৫ ভিত্তিবছর মূল্যে) ২৮৯
সারণি ৪.১৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে প্রস্তাবিত ডেল্টা(পিআইপি) (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) বরাদ্দ ২৯০
সারণি ৪.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে) ২৯৪
সারণি ৪.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের মূল্যে) ২৯৪
সারণি ৫.১: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিআরএফ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অগ্রগতি ২৯৮
সারণি ৫.২: স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ এবং অফগ্রীড নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাদে) এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন ২৯৯
সারণি ৫.৩: মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও অফগ্রীড নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যতিত, মেঃওয়াটে) অর্থবছর ২০১০-অর্থবছর ২০২০ ৩০১
সারণি ৫.৪: বছরওয়ারী সিস্টেম লস্ বা অপচয় ৩০২
সারণি ৫.৫: সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং সাবস্টেশন অবকাঠামো ৩০৩
সারণি ৫.৬: বিআরইবি এর ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ৩০৪
সারণি ৫.৭: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা জ্বালানি ব্যবহার ৩০৬
সারণি ৫.৮: বিদ্যুৎ খাতে বাজেট সহায়তা (বিলিয়ন টাকা) ৩০৭
সারণি ৫.৯: প্রি-পেইড মিটার স্থাপন ৩০৮
সারণি ৫.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের সাম্প্রতিক চিত্র, ২০২০ ৩০৯
সারণি ৫.১১: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং খাতভিত্তিক ব্যবহার (বিলিয়ন কিউবিক ফুট) ৩০৯
সারণি ৫.১২: সেক্টরভিত্তিক গড় গ্যাস চাহিদার প্রক্ষেপণ (এমএমসিএফডি) ৩১০
সারণি ৫.১৩: পরিশোধিত জ্বালানি পণ্য আমদানি ৩১১
সারণি ৫.১৪: নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (মেগাওয়াট) ৩১৩

সারণি ৫.১৫: প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ (টাকা/কিও-ঘন্টা)..৩১৭
সারণি ৫.১৬: বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (নির্মাণাধীন) ৩১৮
সারণি ৫.১৭: ৮ম পরিকল্পনাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (ক্যাপটিভ এবং আরই সহ)...........................৩১৮
সারণি ৫.১৮: গ্রিড ভিত্তিক প্রধান নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পসমূহ...৩১৯
সারণি ৫.১৯: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বর্তমান মূল্য, বিলিয়ন টাকা)..................৩২৮
সারণি ৫.২০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(২০২১ অর্থ-বছরের স্থিরমূল্যে, বিলিয়ন টাকা) ৩২৮
সারণি ৬.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন সড়কের ধরণ ও পরিমাণ (কি.মি.) ৩৩৩
সারণি ৬.২: এলজিইডির অধীনে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের চিত্র ৩৩৪
সারণি ৬.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫/১৬-২০১৯/২০) সড়ক ও মহাসড়ক খাতের লক্ষ্যমাত্রা
এবং অর্জিত অগ্রগতি ৩৩৫
সারণি ৬.৪: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রেলসেবার সার্বিক চিত্র ৩৩৫
সারণি ৬.৫: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নৌপরিবহন খাতের কর্মসম্পাদনের চিত্র...৩৩৬
সারণি ৬.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাফিক কর্মসম্পাদনের চিত্র ৩৩৮
সারণি ৬.৭: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জিত আর্থিক সাফল্য ৩৩৯
সারণি ৬.৮: ঢাকা মহানগরে মেট্রোরেল স্থাপন কার্যক্রমের অগ্রগতি...৩৪১
সারণি ৬.৯: বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ও অবকাঠামোর মান, ২০১৯
(মোট স্কোর ১০০; তালিকায় অন্তর্ভূক্ত দেশ ১৪১টি) ৩৪২
সারণি ৬.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহনখাতের লক্ষ্যসমূহ...৩৪৫
সারণি ৬.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভৌত লক্ষ্যসমূহ................................ ৩৪৭
সারণি ৬.১২: ডিজিটাল সংযোগ ও সহজলভ্যতার উন্নয়ন ৩৫৯
সারণি ৬.১৩: জিডিপিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের সরাসরি অবদান (স্থির মূল্যে, ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬) ৩৬৩
সারণি ৬.১৪: ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্য সংযোজনের সারসংক্ষেপ
(স্থির মূল্যে; ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬; মিলিয়ন টাকা) ৩৬৩
সারণি ৬.১৫: টেলিযোগযোগ, কম্পিউটার ও আইটি খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ ৩৬৩
সারণি ৬.১৬: ডাক ও টেলিকম খাত থেকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের চিত্র...৩৬৪
সারণি ৬.১৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে) ৩৭৭
সারণি ৬.১৮: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের স্থিরমূল্য অনুসারে) ৩৭৭
সারণি ৭.১: দৈর্ঘ্য অনুসারে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর চিত্র.. ৩৮৩
সারণি ৭.২: অর্থবছর ২০১৭-অর্থবছর ২০২১ সময়ে উন্নয়ন ব্যয়সমূহ (কোটি টাকায়) ৩৮৮
সারণি ৭.৩: বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন (মিলিয়ন টাকায়) ৩৯০
সারণি ৭.৪: আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক চিত্র, ২০০০ সাল...............................৩৯৪
সারণি ৭.৫: উন্নয়ন সহযোগী ও খাতভিত্তিক কার্যসম্পাদনকারী সংস্থা ৪১৪
সারণি ৭.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাক্কলন
(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)..৪১৪
সারণি ৭.৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাক্কলন
(বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে) ৪১৪
সারণি ৮.১: ২০২১-২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় পরিবেশ খাতের উদ্দেশ্যাবলি..৪১৯
সারণি ৮.২: পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ ৪১৯
সারণি ৮.৩: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ (কোটি টাকায়) ৪২৮
সারণি ৮.৪: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশলসমূহ ৪৩৩
সারণি ৮.৫: ২০২৫ সালের জন্য নির্দিষ্ট সূচক ও লক্ষ্য চিহ্নিতকরণ ৪৩৮
সারণি ৮.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতে এডিপি বরাদ্দ..........................৪৫৩

সারণি ৯.১: বিভিন্ন বছরে ঢাকা শহরের প্রাধান্য..৪৬১
সারণি ৯.২: বাছাইকৃত এশীয় দেশসমূহে প্রধান শহরের আকার ও নগর উন্নয়ন..৪৬২
সারণি ৯.৩: বাংলাদেশের নগর অঞ্চল ও বৃহত্তর ঢাকায় মরণশীলতার প্রাক্কলিত ব্যয়
(বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও জাতীয় জিডিপির অনুপাতে তার পরিমাণ ৪৬৫
সারণি ৯.৪: কাঠামোর ধরণ অনুযায়ী খানার অনুপাত ৪৬৭
সারণি ৯.৫: পানি সরবরাহ সেবার আওতা ৪৬৯
সারণি ৯.৬: স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সুবিধাপ্রাপ্ত নগর খানার অনুপাত...৪৭০
সারণি ৯.৭: ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে কঠিন বর্জ্য বৃদ্ধির হার ৪৭১
সারণি ৯.৮: নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের ক্রমবিন্যাস...৪৭৬
সারণি ৯.৯: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ...৪৯৭
সারণি ৯.১০: বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ...৪৯৮
সারণি ৯.১১: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ...৪৯৯
সারণি ৯.১২: বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ...৪৯৯
সারণি ৯.১৩: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ...৫০০
সারণি ৯.১৪: উপ-খাতভিত্তিক অভীষ্ট, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ..৫০১
সারণি ৯.১৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ..........৫০৫
সারণি ৯.১৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ..........৫০৫
সারণি ১০.১: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন ৫১২
সারণি ১০.২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.............................৫২২
সারণি ১০.৩: পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে বহুখাত, বহুসংস্থাভিত্তিক পদ্ধতি ৫৩৯
সারণি ১০.৪: বাংলাদেশে জনসংখ্যার অগ্রগতি ১৯৭৪-২০১৯..৫৪২
সারণি ১০.৫: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের ক্ষেত্রে আইসিপিডি অভীষ্টে বাংলাদেশের অগ্রগতি.............................৫৪২
সারণি ১০.৬: কিশোরী ও যুবাদের ক্ষেত্রে আইসিপিডি অভীষ্টে বাংলাদেশের অগ্রগতি..৫৪৩
সারণি ১০.৭: জনমিতির নানা সূচকে তুলনামূলক অগ্রগতি ৫৪৪
সারণি ১০.৮: অষ্টম পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে).....................৫৫০
সারণি ১০.৯: অষ্টম পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা, অর্থবছর ২০২১-এর স্থির মূল্যে) ৫৫০
সারণি ১১.১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী (%)..৫৫৫
সারণি ১১.২: এসইএসআইপির ফলাফল আওতা (এরিয়া) ৫৫৮
সারণি ১১.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগসমূহ ৫৬৬
সারণি ১১.৪: দারিদ্র্য পরিস্থিতির ভিত্তিতে শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি ২০১০-২০১৬..৫৬৮
সারণি ১১.৫: বাংলাদেশে ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার মান, ২০১৮..৫৬৮
সারণি ১১.৬: শিক্ষা ও টিভেট-এর জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্টসমূহ...৫৬৯
সারণি ১১.৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের অতিরিক্ত লক্ষ্য ও অভীষ্টসমূহ ৫৭০
সারণি ১১.৮: দক্ষিণ এশিয়ায় ২০৩০ সাল নাগাদ মাধ্যমিক স্কুল সমাপনী ও মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সঠিক
প্রক্রিয়ায় পথে থাকা শিশুরা ৫৭১
সারণি ১১.৯: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ ও পরিবীক্ষণ সূচকসমূহ.............................. ৫৭৮
সারণি ১১.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ (চলতি মূল্যে শতকোটি টাকা) ৫৮০
সারণি ১১.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ (স্থির মূল্যে শতকোটি টাকা) ৫৮০
সারণি ১২.১: লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতি কৌশল রূপরেখা..৫৯১
সারণি ১২.২: শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য কর্মকাণ্ড..৫৯১
সারণি ১২.৩: স্টার্ট-আপ সফলতার উদাহরণ বাড়াতে কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ ৫৯২
সারণি ১২.৪: পুনর্নকশা সক্ষমতা অর্জন ও কাজে লাগানোর জন্য কর্মসূচি..৫৯৩

সারণি ১২.৫: হাইটেক পার্কগুলোকে উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত করার প্রোগ্রাম কার্যক্রম ৫৯৩
সারণি ১২.৬: উৎপাদনশীল জ্ঞান সৃষ্টির জন্য প্রোগ্রাম কার্যক্রমসমূহ...৫৯৪
সারণি ১২.৭: বাংলাদেশে ই-সরকারের উন্নয়ন পর্যায়ের বিবর্তন..৫৯৪
সারণি ১২.৮: বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য প্রোগ্রাম কার্যক্রম ৫৯৬
সারণি ১২.৯: এসডিজি অর্জনের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবনের উদাহরণ...৫৯৭
সারণি ১২.১০: এসডিজির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা আদায়ে প্রোগ্রাম কর্মকাণ্ডসমূহ ৫৯৭
সারণি ১২.১১: ৪ওজ কাজে লাগানো এবং এর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলোকে ব্যবহার করা............৫৯৮
সারণি ১২.১২: ডিজিটাল দুনিয়া ও সূচকসমূহে বাংলাদেশের সক্ষমতার বিবর্তন..৬০৯
সারণি ১২.১৩: উদ্ভাবন সমর্থনে পরিবর্তনশীল উৎপাদন অগ্রাধিকার ৬০৯
সারণি ১২.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইসিটি খাতে এডিপি বরাদ্দ ৬১০
(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা) ৬১০
সারণি ১২.১৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইসিটি খাতে এডিপি বরাদ্দ ৬১০
(২০২১ অর্থবছর স্থির মূল্যে বিলিয়ন টাকা) ৬১০
সারণি ১৩.১: জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর মূল প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্য...৬২৫
সারণি ১৩.২: যুব কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্থবছর ২০২১–অর্থবছর ২০৩১...৬২৮
সারণি ১৩.৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর জন্য এডিপি বরাদ্দ...............৬৩৩
(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)...৬৩৩
সারণি ১৩.৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর জন্য এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা স্থির মূল্যে, অর্থবছর ২০২১) ৬৩৩
সারণি ১৪.১: সর্বজনীন সামাজিক পেনশনের জন্য অর্থায়ন পরিকল্পনা...৬৪৯
সারণি ১৪.২: ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অনুমান (কিমি ২) ৬৫৯
সারণি ১৪.৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় আইন ও নীতিমালা...৬৬০
সারণি ১৪.৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে আরও ফলপ্রসূভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম ৬৬৩
সারণি ১৪.৫: জেন্ডার ও অসমতার সূচকগুলোয় অগ্রগতি..৬৬৫
সারণি ১৪.৬: জিজিজিআর (GGGR) উপ-সূচকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তুলনামূলক সাফল্য (পারফরম্যান্স) ৬৬৬
সারণি ১৪.৭: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ভঙ্গুরতা ও দারিদ্র্য...৬৮৭
সারণি ১৪.৮: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার অগ্রগতি ৬৮৮
সারণি ১৪.৯: সামাজিক সুরক্ষার জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা) ৬৯৬
সারণি ১৪.১০: সামাজিক সুরক্ষার জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ
(২০২১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বিলিয়ন টাকা) ৬৯৬

চিত্রের তালিকা

অংশ-১

চিত্র ১.১: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধির কর্মাকৃতি (% গড়ে প্রতিবছর ২০১৬-২০১৯)..........৩
চিত্র ১.২: তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা..........৭
চিত্র ১.৩: তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান (মিলিয়ন কর্মী)..........৭
চিত্র ১.৪: কর্মসংস্থান ২০১৩ বণ্টন (শতকরা হার)..........৮
চিত্র ১.৫: ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (০০০ টাকা ২০০৫-০৬ মূল্য)..........৯
চিত্র ১.৬: সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে মূল্যস্ফীতির ধারা (%)..........১৭
চিত্র ৩.১: পরিকল্পিত বনাম প্রকৃত এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ (জিডিপির %)..........৪৭
চিত্র ৩.২: নির্বাচিত দেশগুলোতে এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ..........৪৮
চিত্র ৩.৩: মোট খরচের ক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ (জিডিপির %)..........৪৯
চিত্র ৩.৪: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার..........৪৯
চিত্র ৩.৫: জাতীয় সঞ্চয় প্রবাহ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দৃশ্যপট..........৫১
চিত্র ৩.৬: বাংলাদেশি টাকা-মার্কিন ডলার এর চলতিমূল্য এবং প্রকৃত বিনিময় হারের গতিপ্রবাহ..........৫৫
চিত্র ৩.৭: বাংলাদেশি টাকা-ইউরো এর চলতিমূল্য ও প্রকৃত বিনিময় হারের গতিপ্রবাহ..........৫৫
চিত্র ৩.৮: ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধিও নির্দেশকসমূহ..........৫৬
চিত্র ৩.৯: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যস্ফীতি পরিকৃতি..........৫৮
চিত্র ৩.১০: জিডিপি অনুপাতে আমানতের সাম্প্রতিক গতিপ্রবাহ (শতকরা)..........৬০
চিত্র ৩.১১: অর্থবছর ২০০৭ থেকে অর্থবছর ১৯ পর্যন্ত জিডিপি অনুপাতের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন..........৬২
চিত্র ৩.১২: অর্থবছর ২০১০ থেকে অর্থবছর ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পি/ই অনুপাত..........৬৩
চিত্র ৩.১৩: বাংলাদেশ ও কিছু এশীয় বাজারের পি/ই অনুপাত (জুলাই ২০১৯)..........৬৩
চিত্র ৩.১৪: মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের অনুপাত টার্নওভার, অর্থবছর ২০০৭- অর্থবছর ২০১৯..........৬৪
চিত্র ৪.১: দরিদ্র লোকের সংখ্যা (মিলিয়ন)..........৭৬
চিত্র ৪.২: দারিদ্র্যের বাৎসরিক শতকরা পয়েন্ট হ্রাসের হার..........৭৮
চিত্র ৪.৩: গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ২০০০-২০১৬ (প্রতি বছরে %)..........৭৮
চিত্র ৪.৪: শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধির হার (প্রতি বছরে %)..........৭৯
চিত্র ৪.৫: গ্রামীণ কর্মসংস্থান কাঠামো ২০০০-২০১৬ (%)..........৭৯
চিত্র ৪.৬: গ্রামীণ এলাকায় প্রকৃত মজুরি (টাকা/দিন ২০১৬ মূল্য)..........৮০
চিত্র ৪.৭: শহরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ২০০০-২০১৬..........৮০
চিত্র ৪.৮: শহরাঞ্চলে মজুরি হার (টাকা/দিন, ২০১৬ মূল্য)..........৮১
চিত্র ৪.৯: অভিবাসন কর্মীদের সংখ্যা (০০০) ২০০০-২০১৬..........৮১
চিত্র ৪.১০: প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ ২০০০-২০১৬ (বিলিয়ন টাকা)..........৮২
চিত্র ৪.১১: সামাজিক সুরক্ষা ভাতা গ্রহণকারী পরিবারগুলোর শতকরা হার..........৮৩
চিত্র ৪.১২: অপরিবর্তিত প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে পরিমাপকৃত ২০১৬ অর্থ-বছরের দারিদ্র্য পরিস্থিতি..........৮৫
চিত্র ৪.১৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভিবাসী শ্রমিকদের বহিঃপ্রবাহ (মিলিয়ন শ্রমিক)..........৮৬
চিত্র ৪.১৪: ১০টি সবচেয়ে কম দরিদ্র এবং ১০টি সবচেয়ে বেশি দরিদ্র জেলা ২০১৬..........৯৪
চিত্র ৫.১: বিনিয়োগের বহিঃপ্রবাহ (জিডিপির % হিসেবে)..........৯৯
চিত্র ৫.২: পিপি ২০৪১ এর কর কাঠামো..........১০৫
চিত্র ৫.৩: মোট ঋণ ও এর আন্তঃসম্পদের (জিডিপির % হিসেবে)..........১১০
চিত্র ৫.৪: ঋণ পরিশোধ সেবার নির্দেশকসমূহ, অর্থবছর ২০১৮- অর্থবছর ২০২৫..........১১০

অংশ-২

চিত্র ১.১: প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য পেশাদার বিচারকের সংখ্যা..........১৫২
চিত্র ১.২: PEFA রেটিং ২০১৫ এর বণ্টন..........১৬০
চিত্র ২.১: বাংলাদেশী টাকা-মার্কিন ডলারের নমিনাল এবং প্রকৃত বিনিময় হারের ধারা..........১৭৯
চিত্র ২.২: বাংলাদেশী টাকা-ইউরোর নমিনাল এবং প্রকৃত বিনিময় হারের ধারা..........১৭৯
চিত্র ২.৩: পূর্ব এশীয় টাইগারদের ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার (শতাংশ)..........১৮০
চিত্র ২.৪: চীন ও ভিয়েতনামের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (১৯৮০-২০১৫)..........১৮৩
চিত্র ২.৫: বিভাজিত (Disaggregated) রপ্তানি অগ্রগতি (গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার শতাংশে)..........১৮৯
চিত্র ২.৭: গড় নমিনাল সুরক্ষার হার (NPR), গড় ইনপুট ও আউটপুট ট্যারিফ..........১৯২
চিত্র ২.৮: বিশ্ব ব্যাংকের বাণিজ্য লজিস্টিক প্রতিপাদন সূচি ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান..........১৯৬
চিত্র ২.৯: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সূচি; অবকাঠামোগত ক্রম বিন্যাস ২০১৯..........১৯৭
চিত্র ২.১০: ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা সহজীকরণ (EDB) ক্রম..........১৯৮
চিত্র ২.১১: ২০২০ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা সহজীকরণ ক্রম..........১৯৯
চিত্র ৩.১: কাঠামোগত পরিরবর্তনে উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ, ১৯৭০- ২০১৮ (জিডিপি'র অংশ % হিসেবে)..........২১০
চিত্র ৩.২: সেবা খাতের অর্থনৈতিক অবদান, ২০১৭..........২১১
চিত্র ৩.৩: জিডিপি অনুসারে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ৫টি অর্থনীতির কাঠামো, ২০১৮..........২১২
চিত্র ৩.৪: বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোতে সেবাখাত (১৯৭৬ - ২০১৯) (জিডিপি'র খাতগত অংশ %)..........২১৩
চিত্র ৩.৫: কর্মসংস্থানে সেবার অংশ..........২১৫
চিত্র ৩.৬: অভিবাসী কর্মীদের বাৎসরিক বহিঃগমন প্রবাহ..........২১৫
চিত্র ৩.৭: খাত ও খাত বহির্ভূত সেবা রপ্তানির ধারা..........২১৭
চিত্র ৩.৮: সেবা রপ্তানির মূল্য..........২১৮
চিত্র ৩.৯: জিডিপি'র % হিসেবে সেবা রপ্তানি হতে অর্জিত আয়..........২১৮
চিত্র ৩.১০: আধুনিক সেবার বিবর্তন (জিডিপি'র %)..........২৩১
চিত্র ৩.১১: সেবার কাঠামোগত পরিবর্তন..........২৩২
চিত্র ৩.১২: বাংলাদেশ ও তুলনীয় দেশগুলোর গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা (২০১১ পিপিপি মার্কিন ডলারে)..........২৩৩
চিত্র ৩.১৩: গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার ধারা, ১৯৯৫/৯৬ ভিত্তি মূল্যে..........২৩৩
চিত্র ৩.১৪: শ্রম শক্তির শিক্ষা প্রোফাইল..........২৩৪
চিত্র ৩.১৫: শ্রম শক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন..........২৩৫
চিত্র ৩.১৬: নেটওয়ার্ক রেডিনেস সূচক (এনআরআই), ২০১৯ (১২১ টি দেশের মধ্যে)..........২৩৯
চিত্র ৪.১: কৃষি ও শস্যের প্রবৃদ্ধি: প্রকৃত ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (%)..........২৫২
চিত্র ৪.২: বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে চাল ও মোট খাদ্যগ্রহণে পরিবর্তন ১৯৯১-২০১৬..........২৫৩
চিত্র ৪.৩: প্রধান প্রধান খাদ্যের ফলন হারের ধারা (মেট্রিকটন/হেক্টর)..........২৫৫
চিত্র ৪.৪: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর..........২৫৭
চিত্র ৪.৫: বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন (সংখ্যা)..........২৬৬
চিত্র ৪.৬: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন..........২৬৭
চিত্র ৪.৭: অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র..........২৭২
চিত্র ৪.৮: নানাবিধ জলাশয়ে মাছের উৎপদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র..........২৭২
চিত্র ৫.১: গ্রীডভিত্তিক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা..........২৯৯
চিত্র ৫.২: খাতভিত্তিক স্থাপিত ক্ষমতা-জুন ২০২০..........৩০০
চিত্র ৫.৩: খাতভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (অর্থবছর ২০২০)..........৩০০
চিত্র ৫.৪: সঞ্চালন ও বিতরণজনিত (টিএন্ডডি) অপচয় (%)..........৩০২

চিত্র ৫.৫: ইউটিলিটি ভিত্তিক বাল্ক বিক্রয় (অর্থবছর ২০১৯-২০২০)........৩০৪
চিত্র ৫.৬: ক্যাপটিভ পাওয়ার ব্যতিরেকে স্থাপিত ক্ষমতা (জ্বালানি প্রকার ভেদে)........৩০৫
চিত্র ৫.৭: জ্বালানি প্রকারভেদে বিদ্যুৎ উৎপাদন (জানুয়ারি ২০১৯)........৩০৫
চিত্র ৫.৮: বছরওয়ারী বকেয়া পাওনা (মাস হিসেবে)........৩০৭
চিত্র ৫.৯: প্রকারভেদে গ্যাস ব্যবহার অর্থবছর ২০১৮-১৯........৩১০
চিত্র ৬.২: ডিজিটাল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের সার-সংক্ষেপ........৩৬৫
চিত্র ৬.৩: ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্কের জন্য চারটি উদ্দেশ্য ও ১২টি নকশা অভীষ্ট........৩৬৬
চিত্র ৬.৪: অন্যান্য প্রযুক্তির তুলনায় ৫জি প্রযুক্তির গতি........৩৬৭
চিত্র ৭.১: মোট সরকারি ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের অংশ........৩৯০
চিত্র ৭.২: জিডিপির অনুপাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের অংশ........৩৯১
চিত্র ৭.৩: মোট সরকারি রাজস্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব রাজস্বের অংশ........৩৯২
চিত্র ৭.৪: স্থানীয় সরকারের নিজস্ব রাজস্বে কর ও ব্যয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ........৩৯৩
চিত্র ৭.৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ন অনুপাত........৩৯৪
চিত্র ৯.১: বিভিন্ন বছরে নগরায়ণের অগ্রগতি........৪৫৯
চিত্র ৯.২: মোট জনসংখ্যা ও নগরীর জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি........৪৫৯
চিত্র ৯.৩: বিভাগভিত্তিক নগরের জনসংখ্যার অনুপাত ও নগরায়ণের মাত্রা........৪৬০
চিত্র ৯.৪: আকার অনুসারে নগরকেন্দ্রগুলোর বণ্টন........৪৬১
চিত্র ৯.৫: বিভিন্ন শহরে মোট দেশজ জনসংখ্যার অংশ ও জিডিপির পরিমাণ........৪৬২
চিত্র ৯.৬: খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানের অংশ........৪৬৪
চিত্র: ৯.৭: নির্বাচিত মেগাসিটিগুলোয় বায়ুমানের তুলনামূলক মূল্যায়ন........৪৬৬
চিত্র ৯.৮: নগর আবাসনের ঘাটতি........৪৬৭
চিত্র ৯.৯: খানাভিত্তিক পানির প্রাপ্যতায় অগ্রগতি........৪৬৮
চিত্র ৯.১০: উন্নততর স্যানিটেশন সুবিধার সার্বিক প্রাপ্যতা (ব্যবহার শৌচাগার ভাগাভাগিসহ)........৪৬৯
চিত্র ৯.১১: পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবা আওতার গড় অনুপাত (মোট জনসংখ্যার %)........৪৭০
চিত্র ৯.১২: সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রহের দক্ষতা........৪৭২
চিত্র ৯.১৩: ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে সড়ক ব্যবস্থার সেবার স্তর........৪৭৩
চিত্র ৯.১৪: বিভিন্ন বছরে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের স্তর (%)........৪৭৪
চিত্র ১০.১: বাংলাদেশে জনমিতির চিত্র........৫৪৪
চিত্র ১০.২: বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর বার্ধক্যের প্রবণতা........৫৪৫
চিত্র ১০.৩: বাংলাদেশে কর্মক্ষম বয়সী (১৫-৬৫ বছর) জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নির্ভরশীল বয়োবৃদ্ধ (৬৫ বছর+) জনগোষ্ঠীর অনুপাত........৫৪৬
চিত্র ১১.১: প্রাথমিক শিক্ষার মানের সূচকসমূহ (২০১৮)........৫৫৭
চিত্র ১১.২: প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার অগ্রগতি (%)........৫৬৩
চিত্র ১১.৩: টিভেট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা........৫৬৫
চিত্র ১১.৪: টিভেট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ('০০০)........৫৬৫
চিত্র ১১.৫: লিঙ্গ ভেদে টিভেটে তালিকাভুক্তি........৫৬৫
চিত্র ১৩.১: কর্মসংস্থানের অবস্থার ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার বিতরণ (%)........৬৩০
চিত্র ১৪.১: বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ধারা (%)........৬৩৮
চিত্র ১৪.২: স্বতন্ত্র সূচকগুলোর বাস্তবায়নের অবস্থা........৬৪১
চিত্র ১৪.৩: প্রয়োজনীয় বাড়তি বিনিয়োগ (বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা ও জিডিপির শতাংশ)........৬৪৩
চিত্র ১৪.৪: কিশোরী মেয়েদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের জন্য প্রাক্কলিত বিনিয়োগ........৬৪৫
চিত্র ১৪.৫: শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি সম্প্রসারিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা........৬৪৬
চিত্র ১৪.৬: শিশু অক্ষমতা বিষয়ক বিনিয়োগ (বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা এবং জিডিপির শতাংশ)........৬৪৭

চিত্র ১৪.৭: ২০১৬ সালে দারিদ্র্য রেখাগুলোর দ্বারা পরিবারগুলোর মধ্যে ভোগের বিন্যাস..৬৫২
চিত্র ১৪.৮: ১৯৫০-এর দশক থেকে ইতিহাসে বড় বড় বন্যায় ডুবে যাওয়া অঞ্চল (শতাংশে) ৬৫৯
চিত্র ১৪.৯: সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জিজিজিআর উপ-সূচকগুলোতে বাংলাদেশের সাফল্য (পারফরম্যান্স) ৬৬৭
চিত্র ১৪.১০:২০১৯-২০ অর্থ-বছরের শিশুকেন্দ্রিক বাজেটের বৈশিষ্ট্য...৬৮৫

বক্সের তালিকা

অংশ-১

বক্স ২.১: দরিদ্রবান্ধব সুনির্দিষ্ট কিছু নীতির উদাহরণ.....৩৬
বক্স ৪.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ..... ৮৩
বক্স ৪.২: বৈষম্য নিরসনে অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যয়ের অনুমিত প্রভাব.....৯৬
বক্স ৫.১: ৮ম পরিকল্পনার কর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এনবিআরের কর সংস্কার ১০৭

অংশ-২

বক্স ৬.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মেগা প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি ৩৩৩
বক্স ৬.২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের লক্ষ্য.....৩৫১
বক্স ৭.১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় গভর্ন্যান্সের জন্য ধাপভিত্তিক নির্দেশনা.....৩৯৮
বক্স ৯.১: সখিপুর Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) ও সহ-জৈবসার প্লান্ট.....৪৯২
বক্স ১১.১: এসইআইপির পারফরম্যান্স ৫৬৭
বক্স ১২.১: আইসিটির জন্য আরও উন্নতি অর্জনের ক্ষেত্রগুলো.....৫৯৫
বক্স ১২.২: জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থা তৈরির পাঠ ৬০১
বক্স ১৩.১: যুব কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ৬২৭
বক্স ১৪.১: জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬৪০
বক্স ১৪.২: কেনিয়ায় পেনশন স্কিম ৬৪৯

সংযুক্ত সারণির তালিকা

সারণি ক ৩.১: বাংলাদেশ: প্রকৃত খাতে অর্জন বছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫ .....৬৭
সারণি ক ৩.২: বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালন কর্মসূচি ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫.....৬৯
সারণি ক ৩.৩: বাংলাদেশ: কেন্দ্রীয় সরকার কার্যসমূহ, অর্থবছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫.....৭০
সারণি ক ৩.৪: বাংলাদেশ: রাজস্ব পরিকৃতি, অর্থবছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫..... ৭১
সারণি ক ৩.৫: অনুন্নয়ন/উন্নয়ন বহির্ভূত সরকারি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫..... ৭১
সারণি ক ৩.৬: উন্নয়ন বহির্ভূত সরকারি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫ .....৭২
সারণি ক ৩.৭: বাংলাদেশ: ঋণ টেকসহিতার নির্দেশকসমূহ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫ ..... ৭৩
সারণি ক ৫.১: মন্ত্রণালয় অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (টাকা বিলিয়ন).....১১৭
সারণি ক ৫.২: মন্ত্রণালয় অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ.....১১৯
সারণি ক ৬.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ).....১২৬

Acronyms

3R	Reduce, Reuse and Recycle
3R	Rail, Road and Riverine
4th HPNSP	The Fourth Health, Population and Nutrition Sector Programme
6FYP	Sixth Five Year Plan
7FYP	Seventh Five Year Plan
8FYP	Eighth Five Year Plan
a2i	Access to information
AAC	Autoclave Aerated Concrete
ACC	Anti-Corruption Commission
ADB	Asian Development Bank
ADM	Adaptive Delta Management
ADP	Annual Development Programme
ADR	Alternative Dispute Resolution
AEZ	Agro-Ecological Zone
AFOLU	Agriculture, Forestry and Other Land Use
AfT	Aid for Trade
AI	Artificial Intelligence
AIG	Alternative Income Generation
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
AIMS	Aid Information Management System
AIMS	Assistance Information Management System
AIR	Annual Information Return
AMC	Alternative Medical Care
ANR	Assisted Natural Regeneration
ANS	Air Navigation Services
APA	Annual Performance Agreement
APAMS	Annual Performance Agreement Management System
APIR	Annual Programmes Implementation Report
APR	Annual Programmes Review
APSC	Annual Primary School Census
APTA	Asia Pacific Trade Agreement
AQI	Air Quality Index
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ATC	Agricultural Technical Committees
ATP	Automatic Train Protection
ATS	Automatic Train Supervision
ATU	Anti-Terrorism Unit
AWD	Alternative Wetting and Drying
BADC	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BAEC	Bangladesh Atomic Energy Commission
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BAPARD	Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation & Rural Development
BARD	Bangladesh Academy for Rural Development
BARI	Bangladesh Agricultural Research Institute
BASM	Bangladesh Academy of Securities Market
BAU	Business as Usual
BB	Bangladesh Bank
BBA	Bangladesh Bridges Authority
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCC	Bangladesh Computer Council
BCC	Budget Call Circular
BCC	Behavioral Change Communication
BCCRF	Bangladesh Climate Change Resilient Fund
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BCCTF	Bangladesh Climate Change Trust Fund
BCG	Bangladesh Coast Guard
BCM	Billion Cubic Meters

BCSL	Bangladesh Cable Shilpa Limited
BDF	Bangladesh Development Forum
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
BERC	Bangladesh Energy Regulatory Commission
BEYP	Bangladesh Empower Youth for Work
BFD	Bangladesh Forest Department
BFDC	Bangladesh Flim Development Corporation
BFDS	Bangladesh Freelancers Development Society
BFI	Bangladesh Forest Inventory
BFIS	Bangladesh Forest Information System
BFRI	Bangladesh Forest Research Institute
BFRI	Bangladesh Fisheries Research Institute
BGB	Border Guard Bangladesh
BHE	Bureau of Health Education
BHTPA	Bangladesh Hi-Tech Park Authority
BICM	Bangladesh Institute of Capital Market
BIDA	Bangladesh Investment Development Authority
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
BKSP	Bangladesh Krira Shikkha Protishthan
BLPA	Bangladesh Land Port Authority
BLRI	Bangladesh Livestock Research Institute
BMDA	Barind Multipurpose Development Authority
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training
BMRE	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion
BNDA	Bangladesh National Digital Architecture
BNH	Bangladesh National Herbarium
BNMC	Bangladesh Nursing & Midwifery Council
BNRS	Bangladesh National REDD+ Strategy
BoP	Balance of Payments
BoI	Board of Investment
BOT	Build Operate Transfer
BP	Bangladesh Parliament
BP	Bangladesh Police
BPC	Bangladesh Petroleum Corporation
BPDB	Bangladesh Power Development Board
BQ	Black Quarter
BR	Bangladesh Railway
BREB	Bangladesh Rural Electrification Board
BRRI	Bangladesh Rice Research Institute
BRT	Bus Rapid Transit
BRTC	Bangladesh Road Transport Corporation
BS-1	Bangabandhu Satellite-1
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation
BSEC	Bangladesh Securities and Exchange Commission
BSMIA	Bangabandhu Sheikh Mujib International Airport
BSRI	Bangladesh Sugarcrop Research Institute
BSS	Bangladesh Shongbad Shongstha
BTCL	Bangladesh Telecommunications Company Limited
BTRC	Bangladesh Telecommunications Regulatory Commission

BWMRI	Bangladesh Wheat and Maize Research Institute
BWDB	Bangladesh Water Development Board
C4C	Capacity Development for City Corporation
CAF	Comparative Advantage Following
CAD	Comparative Advantage Defying
CAAB	Civil Aviation Authority of Bangladesh
CAMS	Continuous Air Monitoring Stations
CBD	Convention of Biological Diversity
CC	Climate Change
CCA	Climate Change Adaption
CCC	Case Coordination Committee
CCHPU	Climate Change and Health Promotion Unit
CCTF	Climate Change Trust Fund
CD	Custom Duty
CD	Channel Depth
CD	Cabinet Division
CDA	Chattogram Development Authority
CDSP	Char Development and Settlement Project
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CETP	Central Effluent Treatment Plant
CGE	Computable General Equilibrium
CGS	Credit Guarantee Scheme
CHCP	Community Health Care Providers
CHT	Chittagong Hill Tracts
CHTA	Chittagong Hill Tracts Area
CHTDB	CHT Development Board
CIC	Central Intelligence Cell
CMA	Chittagong Marine Academy
CMC	Central Monitoring Committee
C-MPI	Child Multidimensional Poverty Index
CMSE	Cottage, Micro and Small Enterprise
CMSME	Cottage, Micro, Small and Medium Enterprise
CPA	Chittagong Port Authority
CPE	Customer Premises Equipment
CPHS	Citizen Perception Household Survey
CPI	Consumer Price Index
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CSICRD	Climate Smart Integrated Coastal Resource Database
CSO	Civil Society Organizations
CSP	Communications Services Provider
CST	Community Support Team
CTC	Counter Trafficking Committee
CTT	Coal Transshipment Terminal
CRR	Cash Reserve Ratio
DAB	Digital Audio Broadcasting
DAE	Department of Agricultural Extension
DBI	Digital Bangladesh Initiative
DC	Deputy Commissioner
DDM	Department of Disaster Management
DDR	Disaster Risk Reduction
DEDO	Duty Exemption and Drawback
DESCO	Dhaka Electric Supply Company
DEMRS	Digital Evidence Management & Reporting System
DFQF	Duty Free Quota Free
DFS	Digital Financial Services
DGHS	Directorate General of Health Services
DIA	Disaster Impact Assessment
DIFE	Department of Inspection for Factories and Establishments
DIP	Department of Passport and Immigration
DIS	Distribution Management System

DLDD	Desertification, Land Degradation and Drought
DLIs	Disbursement-Linked Indicators
DLS	Department of Livestock Services
DM	District Magistrate
DMTCL	Dhaka Mass Transit Company Limited
DMFAS	Debt Management and Financial Analysis System
DNC	Department of Narcotics Control
DoE	Department of Environment
DoF	Department of Fisheries
DoS	Department of Shipping
DoT	Department of Telecommunications
DoICT	Department of ICT
DoDM	Department of Disaster Management
DP	Development Partner
DP	Delta Plan
DPDC	Dhaka Power Distribution Company
DPE	Directorate of Primary Education
DPHE	Department of public Health Engineering
DPP	Development Project Proposal
DRIP	Digital Risk Information Platform
DRF	Development Results Framework
DRF	Disaster Response Framework
DRR	Disaster Risk Reduction
DSP	Digital Services Provider
DSHE	Directorate of Secondary and Higher Education
DTCA	Dhaka Transport Coordination Authority
DTS	Digital Transformation Strategy
EC	Election Commission
EC	Electronic Commerce
EDB	Ease of Doing Business
EDF	Export Development Fund
EDI	Electronic Data Interchange
EE	Energy Efficiency
EEBL	Excelerate Energy Bangladesh Limited
EFR	Environmental Fiscal Reforms
EFA	Education for All
EFR	Environmental Fiscal Reforms
EGPP	Employment Generation Programme for the Poorest
EGDI	E-Government Development Index
EIF	Enhanced Integrated Framework
e-KYC	Electronic Know Your Customer
E-LMIS	Electronic Logistic Management Information System
EMRD	Energy and Mineral Resources Division
EMP	Environmental Management Plan
EPZ	Export Processing Zone
EPI	Economic and Policy Instruments
EPI	Environmental Performance Index
EPI	Expanded Programmes on Immunization
EPR	Extended Producer Responsibility
ERD	Economic Relations Division
ERL	Eastern Refinery Limited
ERP	Enterprise Resource Planning
ESP	Essential Service Package
ESF	Energy Security Fund
ETP	Effluent Treatment Plant
EU	European Union
EUAE	Eurasian Economic Union
EVM	Electronic Voting Machines
FAMS	Foreign Assistance Management System
FAO	Food and Agriculture Organization
FBE	Forward Baseline Estimate
FCDI	Flood Control, Drainage & Irrigation
FCD	First Concrete Pouring
FCTC	Framework Convention on Tobacco Control
FD	Finance Division

FDI	Foreign Direct Investment
FIAC	Farmer's Information and Advisory Center
FIAF	Federation of International Film Archives
FIES	Food Insecurity Experience Scale
FIP	Forest Investment Plan
FIR	First Information Report
FMD	Foot and Mouth Disease
FMP	Forestry Master Plan
FPC	Fair Price Card
FRC	Financial Reporting Council
FSM	Faecal Sludge Management
FSRU	Floating Storage and Re-Gasification Unit
FSTPs	Faecal Sludge Treatment Plants
FTA	Free Trade Agreement
FTZ	Free-Trade Zone
FY	Fiscal Year
FYP	Five Year Plans
GAPs	Good Agricultural Practices
GCM	Global Compact for Migration
GCI	Global Competitive Index
GCF	Green Climate Fund
GD	General Diary
GDF	Gas Development Fund
GDP	Gross Domestic Product
GE	Gender Equality
GED	General Economics Division
GEP	Growth Elasticity of Poverty
GGGR	Global Gender Gap Report
GHG	Green House Gas
GIS	Geographical Information System
GMP	Good Manufacturing Practice
GMP	Growth Monitoring and Promotion
GNI	Gross National Income
GoB	Government of the People's Republic of Bangladesh
GPMS	Governance Performance Management System
GRB	Gender Responsive Budgeting
GRS	Grievance Redressal System
GVC	Global Value Chain
GWP	Global Warming Potential
HCI	Heavy and Chemical Industries
HCE	Health Care Establishment
HCR	Head Count Rate
HDC	Hill District Council
HEQEP	Higher Education Quality Enhancement Project
HED	Health Engineering Department
HIC	High Income Country
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HPN	Health, Population and Nutrition
HS	Hemorrhagic Septicaemia
HSD	Health Services Division
HSIA	Hazrat Shahajalal International Airport
HSFSP	Higher Secondary Female Stipend Project
HWS	Health Workforce Strategy
HYV	High Yield Variety
IaaS	Infrastructure-as-a-Service
IAS	International Accounting Standards
IBD	Infectious Bronchities
IBAS++	Integrated Budget and Accounting System
ICAO	International Civil Aviation Organization
ICB	Investment Corporation of Bangladesh
ICOR	Incremental Capital Output Ratio
ICS	Improved Cooking Stove
ICT	Information and Communication Technology
ICTD	Information and Communication Technology Division

ICPD	International Conference on Population and Development
ICVGD	The Investment Component of Vulnerable Group Development
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited
IFMIS	Integrated Financial Management Information System
IFRS	International Financial Reporting Standards
ILS	International Labor Standard
IMD	Information Management Division
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IMF	International Monetary Fund
IMPACT	Innovative Management of Resources for Poverty Alleviation through Comprehensive Technology
IMT	Institute of Marine Technologies
IoT	Internet of Things
IPR	Intellectual Property Rights
IPM	Integrated Pest Management
IPA	International Phonetic Alphabet
IPF	Investment Project Financing
IRIS	International Recruitment Integrity System
IRD	Internal Resources Division
IRT	Independent Review Team
ISA	International Standards of Auditing
ITS	Intelligent Transportation System
ITU	International Telecommunication Union
ITS	Intelligent Transport System
IVA	Independent Verification Agency
IWRM	Integrated Water Resources Management
IWTMP	Inland Water Transport Master Plan
IWT	Inland Water Transport
IWRM	Integrated Water Resources Management
JCS	Joint Cooperation Strategy
JMP	Joint Monitoring Programmes
JRC	Joint Rivers Commission
KPI	Key Performance Indicators
LCG	Local Consultative Group
LCE	Low-Carbon Economy
LDC	Least Developed Country
LDN	Land Degradation Neutrality
LFS	Labor Force Survey
LFFE	Low-Fossil-Fuel Economy
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
LGI	Local Government Institute
LGRD SSP	Local Government and Rural Development Sector Strategy Paper
LGS	Local Government System
LIC	Low Income Country
LMIC	Lower Middle-Income Country
LMRU	Labor Market Research Unit
LNG	Liquefied Natural Gas
LPI	Index of Trade Logistics Performance
LPL	Lower Poverty Line
M2M	Machine to Machine
MAD	Minimum Acceptable Diet
MAF	Ministry Assessment Format
MARAS	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage
MCS	Monitoring, Control and Surveillance System
MDA	Ministries, Divisions, and Agency
MDD	Minimum Dietary Diversity
MEFWD	Medical Education and Family Welfare Division
MFS	Mobile Financial Services
MHA	Million Hectares
MHVS	Maternal Health Voucher Scheme
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey

MIS	Management Information System
MLE	Medium and Large Enterprise
MNPS	Mobile Number Portability Services
MNH	Maternal and Newborn Health
MoA	Ministry of Agriculture
MoC	Ministry of Commerce
MoCA	Ministry of Cultural Affairs
MoCAT	Ministry of Civil Aviation and Tourism
MoCHTA	Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs
MoDMR	Ministry of Disaster Management and Relief
MoE	Ministry of Education
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MoEWOE	Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment
MoF	Ministry of Finance
MoFA	Ministry of Foreign Affairs
MoFL	Ministry of Fisheries and Livestock
MoFood	Ministry of Food
MoHA	Ministry of Home Affairs
MoHFW	Ministry of Health and Family Welfare
MoHPW	Ministry of Housing and Public Works
MoI	Ministry of Industries
MoL	Ministry of Land
MoLE	Ministry of Labour and Employment
MoLGRDC	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives
MoLJPA	Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
MoPA	Ministry of Public Administration
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MoR	Ministry of Railways
MoRA	Ministry of Religious Affairs
MoRTB	Ministry of Road Transport and Bridges
MoS	Ministry of Shipping
MoSW	Ministry of Social Welfare
MoU	Memorandum of Understanding
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs
MoWR	Ministry of Water Resources
MPA	Mongla Port Authority
MPI	Multidimensional Poverty Index
MPS	Monetary Policy Statement
MPS	Model Police Station
MR	Menstrual Regulation
MRA	Microcredit Regulatory Authority
MRP	Machine Readable Passport
MRT	Metro Rail Transit
MRT	Mass Rapid Transit
MRV	Machine-Readable Visa
MSPA	Master Sales Purchase Agreement
MSP-VAW	Multi-Sectoral Program on Violence Against Women
MSY	Maximum Sustainable Yield
MTBF	Medium-Term Budgetary Framework
MVA	Manufacturing Value Addition
MYPIP	Multi-Year Public Investment Programme
M&E	Monitoring and Evaluation
NAID	NOC Automation and IMEI Database
NAP	National Adaptation Plan
NAPA	National Adaptation Programme of Action
NATP	National Agricultural Technology Project
NARS	National Agricultural Research System
NAW	National Accounting Wing
NBR	National Board of Revenue

NBSAP	National Biodiversity Strategy and Action Plan
NCD	Non-Communicable Disease
NCGP	National Committee on Government Performance
NCS	National Conservation Strategy
ND	New Castle Disease
NDC	Nationally Determined Contribution
NEET	Not in Employment, Education or Training
NEP	National Energy Policy
NEP	National Education Policy
NESCO	Northern Electricity Supply Company Ltd
NFE	National Funding Entities
NFEA	Non- Formal Education Act
NFL	National Forest Inventory
NFMS	National Forest Monitoring System
NFS	Non Factor Service
NHP	National Housing Policy
NHA	National Housing Authority
NID	National Identification
NIE	National Implementing Entities
NIPSOM	National Institute of Preventive and Social Medicine
NIPORT	National Institute for Population Research and Training
NIS	National Integrity Strategy
NLASO	National Legal Aid Services Organization
NMS	Network Monitoring System
NOSCOP	National Oil and Chemical Spill Contingency Plan
NPDM	National Plan for Disaster Management
NPL	Non-Performing Loans
NPA-PSHT	National Plan of Action to Prevent and Suppress of Human Trafficking
NPR	Nominal Protection Rate
NRI	Network Readiness Index
NRCP	National Residue Control Plan
NRCC	National River Conservation Commission
NRT	National Roadmap Team
NSA	National Student Assessment
NSC	National Sports Council
NSDA	National Skills Development Authority
NSDP	National Skills Development Policy
NSDS	National Strategy for the Development of the Statistics
NSDS	National Sustainable Development Strategy
NSIS	National Social Insurance System
NSSF	National Social Security Fund
NSSS	National Social Security Strategy
NTCC	National Tobacco Control Cell
NTDs	Neglected Tropical Diseases
NTMC	National Tele-Communication Monitoring Centre
NTVQF	National Technical and Vocational Qualifications Framework
NUA	New Urban Agenda
NVVN	NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd
NWDP	National Women's Development Policy
NYP2017	National Youth Policy 2017
OAA	Old Age Allowance
OAG	Office of the Auditor General
OCC	One-stop Crisis Centre
OCAG	Office off the Comptroller and Auditor General of Bangladesh
ODA	Official Development Assistance
ODSs	Ozone Depleting Substances
ODC	Other Duties and Charges
ODP	Ozone Depleting Potential
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
OFRS	Online Fertilizer Recommendation System

OIA	Osmani International Airport
OIC-CERT	Organization of the Islamic Cooperation-Computer Emergency Response Teams
OMS	Order Management System
OMS	Open Market Sale
O&M	Operation and Maintenance
OTI	Oman Trading International
PaaS	Platform-as-a-Service
PAC	Post-Abortion Care
PC	Planning Commission
PCB	Private Commercial Bank
PD	Power Division
PDBF	Palli Daridro Bimochon Foundation
PECE	Primary Education Completion Examination
PEFA	Public Expenditure Financial Assessment
PEDP	Primary Education Development Programme
PESP	Primary Education Stipend Project
PFM	Public Financial Management
PFS	Proforma for Study Proposal
PGCB	Power Grid Company of Bangladesh Ltd
PHC	Population and Housing Census
PIB	Press Institute Bangladesh
PID	Press Information Department
PIM	Public Investment Management
PIMRW	PIM Reform Wing
PIP	Public Investment Programme
PKSF	Palli Karma Sahayak Foundation
PKI	Public Key Infrastructure System
PLAU	Policy Leadership and Advocacy Unit
PMT	Proxy Means Test
PoP	Point of Presence
PP2021	Perspective Plan 2021
PP2041	Perspective Plan 2041
PPA	Payra Port Authority
PPR	Peste de Petits Ruminant
PPP	Purchasing Power Parity
PPP	Public-Private-Partnership
PRS	Population Registration System
PS	Parliament Secretariat
PSC	Public Service Commission
PSD	Public Security Division
PSDF	Power Sector Development Fund
PSMP	Power System Master Plan
PSPGP	Private Sector Power Generation Policy
PSB	Policy Support Branch
PTA	Preferential Trade Agreement
PTD	Posts and Telecommunications Division
PWD	Persons with Disabilities
PWD	Public Works Department
RAI	Rural Access Indicator
RADP	Revised Annual Development Programme
RBA	Retirement Benefits Authority
RBM&E	Result-Based Monitoring and Evaluation
RBO	River Basin Organization
RD	Regulatory Duty
RDA	Rajshahi Development Authority
RDA	Rural Development Authority
R&D	Research and Development
RE	Renewable Energy
REDD+	Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation
RFW	Results Framework
RHD	Roads and Highways Department
RMG	Readymade Garments
RSTP	Revised Strategic Transport Plan
RTI	Right to Information
RTHD	Road Transport and Highways Division

RYMG	Rice Yield Gap Minimization
SAAO	Sub-Assistant Agricultural Officer
SaaS	Software-as-a-Service
SAF	Sector Appraisal Format
SAFTA	South Asian Free Trade Agreement
SAIA	Shah Amanat International Airport
SASEC	South Asia Sub-Regional Cooperation
SBA	Small Business Administration
SBCC	Social Behaviour Change Communication
SBU	Strategic Business Unit
SBW	Special Bonded Warehouse
SCADA	supervisory control and data acquisition
SCB	State-Owned Commercial Bank
SCM	Subsidies and Countervailing Measures
SCT	Supply Chain Trade
SD	Supplementary Duty
SDG	Sustainable Development Goal
SDP	Skill Development Programme
SDP	Service Delivery Points
SEA	Strategic Environmental Assessment
SEIP	Skills for Employment Investment Project
SEQAEP	Secondary Education Quality and Access Enhancement Program
SEZ	Special Economic Zone
SFDF	Small Farmers Development Foundation
SGICC	Strategy for Governance Improvement of City Corporations
SHED	Secondary and Higher Education Division
SHS	Solar Home System
SID	Statistics and Informatics Division
SLA	Service Level Agreement
SLM	Sustainable Land Management
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound
SmPR	Six-Monthly Programme Implementation Report
SOC	Security Operations Center
SOD	Standing Orders on Disaster
SOE	State-Owned Enterprise
SOP	Standard Operating Procedure
SPA	Sales Purchase Agreement
SPS	Sanitary and Phyto-sanitary Standards
SPS	Service Process Simplification
SRF	Sector Results Framework
SSD	Security Services Division
SSK	Shasthyo Shuroksha Karmasuchi
SSP	Sector Strategy Paper
SSNPs	Social Safety Net Programmes
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics
STEP	Skills for Training for Employment Program
STOL	Short Take-Off and Landing
STPs	Software Technology Parks
SVRS	Sample Vital Registration System
SWAp	Sector Wide Approach
SWG	Sector Working Groups
TCF	Trillion Cubic Feet
T&D	Transmission and Distribution
TDS	Tax Deduction at Source
TEU	Twenty-Foot Equivalent Unit
TFR	Total Fertility Rate
TFP	Total Factor Productivity
THNPP	Tribal Health, Nutrition and Population Plan
TLCC	Town Level Coordination Committee
TMED	Technical and Madrassa Education Division
TOD	Transit Oriented Development

TR	Test Relief
TRIPS	Trade Related Intellectual Property Rights
TSC	Technical School and College
TSER	Transforming Secondary Education for Results
TSMP 2041	Transport Sector Master Plan 2041
TSS	Telephone Silpa Shangstha
TTC	Technical Training Centers
TTTC	Technical Teachers' Training College
TVAS	Telecommunication Value Added Service
TVET	Technical and Vocational Education and Training
UDC	Union Digital Center
UDCC	Union Development Coordination Committee
UDD	Urban Development Directorate
UDMCs	Union Disaster Management Committees
UDMC	Upazila Disaster Management Committees
UGC	University Grants Commission
UHC	Universal Health Coverage
UMIC	Upper Middle-Income Country
UN	United Nations
UNEP	United Nations Environment Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNO	Upazila Nirbahi Officer
UP	Union Parishad
UPHC	Urban Primary Health Care
UPL	Upper Poverty Line
USD	United States Dollar
USF	Unclassed State Forest
VDP	Village Defense Party
VGF	Vulnerable Group Feeding
VGD	Vulnerable Group Development
VPN	Virtual Private Network
VTMS	Vessel Traffic Management System
VTTI	Vocational Teachers' Training Institute
WASAs	Water Supply and Sewerage Authorities
WASH	Water, Sanitation and Hygiene
WASRA	Water and Sanitation Regulatory Agency
WARPO	Water Resource Planning Organization
WB	World Bank
WDI	World Development Indicators
WEF	World Economic Forum
WEWB	Wage Earners' Welfare Board
WFP	World Food Programme
WHO	World Health Organization
WPS	Woman Policing Strategy
WSP	Water Safety Plan
WTE	Waste-To-Energy
WTTC	World Travel & Tourism Council
WUA	Water User Association
WWF	World Wide Fund for Nature
WZPDC	West Zone Power Distribution Company
XBRL	Extensible Business Reporting Language
YES	Youth Employment through Skills

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

ক. রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার সর্বদাই দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরেই পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্নির্মাণে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণীত হয়, যার লক্ষ্য ছিল দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। এই সোনার বাংলা হবে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত যেখানে দ্রুত জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি ঘটবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার্যকরী পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত উন্নয়ন পথ ও দর্শন অনুসরণ করে সেই মোতাবেক দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর তিনি জনগণের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন এবং রূপকল্প ২০২১ এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ ঘোষণার মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, মানব উন্নয়ন এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে অর্থবছর ২০০৯ এবং অর্থবছর ২০১৯ এর মধ্যবর্তী টানা ১০ বছর বাংলাদেশ নির্বিঘ্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময়কালে মাথাপিছু আয় ৭৫৪ ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ২০৬৪ ইউএস ডলারে উন্নীত হয়; প্রত্যাশিত আয়ু ৬৭ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়। বয়স্ক স্বাক্ষরতা ৫৮% থেকে বেড়ে ৭৫%-এ উন্নীত হয়। দারিদ্র্য ৩৫% থেকে কমে ২০.৫%-এ নেমে আসে এবং চরম দারিদ্র্য হার ১৮% থেকে কমে ১০.৫%-এ নেমে আসে। এই সময়সীমায় প্রবৃদ্ধি প্রতিবছর গড়ে ৭% হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দ্রুত প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর কাতারে চলে আসে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশের (LIC) তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ২০২১ সালের লক্ষ্যমাত্রা সময়ের অনেক আগেই ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের (LMIC) তালিকায় স্থান পায়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সকল মানদণ্ড পূরণ করে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হয়। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এটি নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন। এসব সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ কে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিশাল ম্যান্ডেটের মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো পুনঃনির্বাচিত করে। তিনি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার এবং তাঁর পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে, সরকার রূপকল্প ২০৪১ এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ গ্রহণ করে, যেখানে অর্থবছর ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে (UMIC) উন্নীত হওয়া, চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের (HIC) মর্যাদা লাভ করার রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়। এই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমন সময় প্রণীত হতে যাচ্ছে, যখন সমগ্র জাতি জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন করছে এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে।

খ. অভূতপূর্ব বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর আক্রমণ

যখন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২১-অর্থবছর ২০২৫) প্রণয়নের প্রস্তুতি চলছে, তখন অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯, ২০২০ সালের মার্চের কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে আঘাত হানে। দ্রুত সংক্রমনশীল এই মহামারীর ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক রূপ সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দেয়। সারা পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয় এবং হাজার হাজার লোক মারা যায়। কোভিড-১৯ বিস্তার হার রোধে লকডাউন পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে এবং চাহিদার মন্দার ফলে বিশ্ব অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ত্রাণ ও অর্থনৈতিক প্রণোদনায় দশ হাজার ট্রিলিয়ন ডলার দেওয়া সত্ত্বেও ওইসিডি (OECD) দেশগুলো মহামারীর প্রথম ৪ মাসের মধ্যে মন্দায় পড়ে। অতএব মহামারীর ভয়াবহ আক্রমণ ঘটে। মহামারীর অবসানকল্পে স্বাস্থ্য সমাধান খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এখনো কোন কূল কিনারা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের মানব স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির ওপর কঠোর আঘাত হেনেছে এই কোভিড-১৯। সৌভাগ্যবশত প্রতিবেশী ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার মোটামুটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে। তবুও মহামারীর চূড়ান্ত রূপ কী হবে, তা এখনো অজানা। অর্থনীতির বিশাল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে; রপ্তানি উপার্জনে তীব্র মন্দা দেখা দিয়েছে। সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগের হার কমে গেছে এবং সরকারি রাজস্ব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানব স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে সরকার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এই ভাইরাসের বিস্তার রোধে

কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন- পূর্ণ কিংবা আংশিক লকডাউনের মাধ্যমে বিস্তার রোধ, স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য জরুরিকাজে নিয়োজিত কর্মীদের সুরক্ষার্থে নিরাপদ ব্যবস্থা জোরদার ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান, উপকরণ ও সরবরাহসহ স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সুবিধা জোরদার করা, কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক ব্যবহার করা, হাত ধোঁয়া এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বজায় রাখা ও অন্যান্য সেবা পদক্ষেপসমূহের মতো স্বাস্থ্য নিরাপত্তা গ্রহণের ওপর সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দান। অর্থনৈতিক দিক থেকে সরকার ধারাবাহিকভাবে ১১৯৬.৪ বিলিয়ন (জিডিপির ৪.৩%) টাকার অর্থনৈতিক প্রণোদনামূলক প্যাকেজ গ্রহণ করেছে, যাতে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের আয় রক্ষা পায় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় চালু হয়।

টেকসই দীর্ঘমেয়াদি জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে বাংলাদেশ অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকার মনে করে, মানব স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকতে পারে না। বরং এগুলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সম্পূরক। এখানে প্রধান কাজটি হলো উভয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি ভারসাম্যমূলক নীতি ও কর্মসূচির সংমিশ্রণ করা। সরকার মানব স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে চায়, যাতে শ্রমিকরা নির্ভয়ে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ার অবাঞ্ছিত ঝুঁকি এড়িয়ে পুনরায় কাজ আরম্ভ করতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় সচল না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে নিরাপদে রাখার উপায় বের করার লক্ষ্যে সরকার স্থানীয় মহামারী বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সাথে কাজ করছে। এই কৌশলটি নমনীয় হওয়ায় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গ. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কোভিড-১৯ শুরুর পূর্বে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং দারিদ্র্য হ্রাস সম্পর্কিত বড় বড় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সপ্তম পরিকল্পনার অগ্রগতি বেশ ইতিবাচক ছিল। জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (৭.৬%) প্রথম ৪ বছরে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার (৭.৪%) লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকৃত গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার পুরো ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে ৭.১৩%-এ এসে দাঁড়ায়। ২০১৬-২০১৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম প্রবৃদ্ধির দেশগুলোর কাতারে চলে আসে। গ্রামভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি থেকে অতি আধুনিক নগরভিত্তিক উৎপাদন শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে ১২.৭% হারে প্রবৃদ্ধি নিয়ে রপ্তানি নির্ভর ম্যানুফ্যাকচারিং খাত নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়। নির্মাণশিল্পে বেশ প্রবৃদ্ধি থাকায় শিল্পের জিডিপি ৩৪.৬%-এ এসে পৌঁছায়। সেবা খাত বৃদ্ধি পেয়ে ৬% এ এসে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে পরিবহন, ব্যাংকিং, রিয়েল এস্টেট, আইসিটি, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক সেবা কর্মকাণ্ডের ভূমিকা প্রসারিত হওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুমূখী করে তুলে গ্রাম-শহরের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন সংকুচিত করা। পরিকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার সময়কালে গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক উৎপাদন কাঠামো থেকে অ-কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন কর্মকাণ্ডের দিকে রূপান্তরিত হচ্ছিল। সপ্তম পরিকল্পনায় এই রূপান্তর আরো গতি পেয়েছে। কৃষি এখন আর গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান আয়ের উৎস নয়। কৃষির মধ্যে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটেছে; খাদ্যশস্য থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ উৎপাদন যেমন গবাদিপশু, পোল্ট্রি, ডেইরি প্রোডাক্টস, ফলমূল, সব্জি এবং ফুল ইত্যাদির উৎপাদনে রূপান্তর ঘটেছে। রপ্তানিমুখী মৎস্য বাংলাদেশে কৃষি আয়ের উৎস হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করেছে। এভাবে কৃষিতে মূল্য সংযোজনে মৎস্য উপ খাতের অবস্থান ২০১৫ অর্থ-বছরের ২৩% হতে ২০১৯ অর্থবছরে ২৬% এ পৌছেছে। এই রূপান্তরের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা আরো জোরদার হয়েছে। শস্য উৎপাদন এখন জনগণের ক্যালোরি গ্রহণের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট সহায়ক। অন্যদিকে সব্জি ও ফলমূলের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধিসহ প্রোটিনসমৃদ্ধ মাছ, পোল্ট্রি, ডিম ও দুধ এর ব্যাপক যোগান জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য পুষ্টি ভারসাম্যের উন্নতি বিধানে অবদান রেখেছে।

অ-কৃষি গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ ও সেবার প্রসারের ফলে গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থানের নতুন নতুন উৎস উন্মোচিত হয়েছে। অ-কৃষি উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি এবং বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের দ্রুত অন্তঃপ্রবাহের ফলে নির্মাণ, গৃহায়ন, ব্যবসা, পরিবহন, বিদ্যালয় স্থাপন, গৃহনির্মাণ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবাসমূহের মতো অনেক কর্মকাণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ ও গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নয়নসহ আইসিটি নেটওয়ার্ক ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের প্রসারের ফলে গ্রাম ও নগর অর্থনীতির মধ্যে পরিবহন খরচ কমে গেছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির পণ্যসমূহের উচ্চতর মূল্য ও উত্তম ব্যবসায়ের পথ প্রশস্থ হয়েছে। গ্রামীণ রূপান্তরের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক এবং ৮ম পরিকল্পনার অগ্রগতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে কৃষিতে রূপান্তর ঘটতে লাগলো- প্রধানত কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত উৎপাদন কাঠামোর দিকে রূপান্তর ঘটলো এবং এভাবে শ্রমের চাহিদা বাড়তে লাগলো। উৎপাদন, নির্মাণ ও সংগঠিত সেবাসমূহ নতুন কর্মসৃজন প্রতিবছর গড়ে ৩-৪% বৃদ্ধি পেয়েছে যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত হারের চেয়ে ছিল মন্থর। কিন্তু নতুন কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক বাজারের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধির চেয়ে উত্তম ছিল। কর্মসস্থানের ক্ষেত্রে ভালো সংবাদ হলো শ্রম উৎপাদনশীলতার উন্নতি। এভাবে গড় জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রতিবছর মোটামুটি ৫.৬% বৃদ্ধি পায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, শ্রম উৎপাদনশীলতা কৃষিসহ সব খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে প্রতিবছর রেকর্ড ৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এবং এটি প্রকৃত মজুরি আয়, অর্থনীতি ও কৃষিতে টেকসহিতা বৃদ্ধির ভিত রচনা করেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রতিবছর ৯% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীলতার অগ্রগতি গ্রামীণ ও নগর এলাকার কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে যা দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রেখেছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং, নির্মাণ ও আধুনিক সেবাসমূহে কর্মসৃজন হারের মন্থরতা কাটাতে প্রয়োজন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নীতি পদ্ধতি সম্বলিত শক্ত পরিবীক্ষণ। কোভিড-১৯ এর কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয়েছে তা মোকাবেলা করতে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে তরুণ জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের বর্ধিষ্ণু বেকারত্ব কমিয়ে আনা আরও একটি চ্যালেঞ্জ হবে। চূড়ান্তভাবে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন সেটি হলো দক্ষতার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন আনা, যার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার গুণগতমান ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বিষয়গুলোকে অধিক অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার ২০.৫%-এ এবং চরম দারিদ্র্য প্রায় ১০.৫%-এ নেমে এসেছে। এই অগ্রগতির পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত: ৭ম পরিকল্পনার সময় উৎপাদনে কাঠামোগত পরিবর্তনসহ অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ভিত্তি রচিত হয়। দারিদ্র্য হ্রাসে এটির অবদানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত: পল্লী এলাকায় বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থের বিপুল প্রবাহ ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং পল্লী এলাকার সেবাসমূহে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। তৃতীয়ত: ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রসার গ্রামীণ দরিদ্র লোকদের ভোগকে সুরক্ষা দেয় এবং তাদের সম্পদ বিনির্মাণে সহায়তা করে। চতুর্থত: আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীন সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে গৃহায়ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। মুজিব শতবর্ষের প্রাক্কালে সরকার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে ২ শতক জমিসহ ৬৫,৭২৬ ইউনিট আবাস প্রদানের লক্ষ্যে প্রথম পর্বে ১,১৬০ কোটি টাকা বণ্টন করেছে। আরো ১,২৮,০০০ টি গৃহ আগামী এক বছরে নির্মাণ করা হবে। সরকারি তহবিলের মাধ্যমে নতুন নতুন গৃহ তৈরি করে এ পর্যন্ত ৩,৫৭,৫৯০ জন সুবিধাভোগীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশের সকল জেলা থেকে তালিকাভুক্ত ৮,৮৫,৬২২ টি দরিদ্র পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হবে।

দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন জেন্ডার, ধর্ম, বর্ণ ও বৈষম্যহীন এক ন্যায্য সমাজের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন, জেন্ডার ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের আয়ু ২০১৫ সালের ৭১ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়েছে। বয়স্ক স্বাক্ষরতা ২০১৫ সালের ৬৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ৭৫%-এ উন্নীত হয়েছে। খর্বকায়তা ও কৃশকায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় শিশু পুষ্টির উন্নতি ঘটেছে। জেন্ডারের দৃষ্টিকোন থেকে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূর হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বড় পার্থক্য হ্রাস পেয়েছে। নারীর অধিকার ও বিশেষাধিকার রক্ষায় রেগুলেটরি কাঠামো প্রদানে বাংলাদেশ বেশ অগ্রসর হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে বর্ধিত সদস্যপদের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম প্রকাশিত ২০২০ বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ (World Gender Gap) প্রতিবেদনে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে বাংলাদেশের বিশেষ অগ্রগতির কথা ফলাওভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিক ০.৭২৬ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ ১৫৩ টি দেশের মধ্যে ৫০ তম স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ইউএসএ, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, কোরিয়া ও জাপানকে পেছনে ফেলেছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে সমতাভিত্তিক ও ন্যায় সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হলেও আরো দুটো ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আরো অধিকতর প্রচেষ্টা আবশ্যক। প্রথমত: অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। মাত্র ৩৬%-এ নারী শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ খুব কম এবং উচ্চ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, যদিও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সকল আইনগত ও রেগুলেটরি নীতিসমূহ বলবৎ রয়েছে তবুও বাল্য বিবাহ, স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া এবং কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের মজুরির বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে

প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী শ্রম অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধিতে এবং জেন্ডার বৈষম্য এবং নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে সকল আইনগত দিক বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকবে।

বাংলাদেশের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষত বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস, বর্ধিষ্ণু বন এবং জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (BCCTF) অর্থায়নে পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিসমূহ বেশ ভালোভাবে পালন করে আসা হয়েছে। আশু সতর্ক পদ্ধতি অনুসরণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও প্রাপ্যতা এবং সময়মতো ত্রাণ ও সহযোগিতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকায় জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। আর এগুলোই হলো ভালো অগ্রগতির নির্দেশক।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি হ্রাসকরণের প্রচেষ্টা বেশ গতি পেয়েছে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (বিডিপি ২১০০) নামে পরিচিত বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদি পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো পানি, ভূমি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্যতার মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় ঘটানো, যা বাস্তবায়ন হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত টেকসই দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এটি একটি গেম চেঞ্জার হতে পারে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিডিপি ২১০০ এর প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বিচক্ষণ সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিছু চাপ সত্ত্বেও এর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার ৫.৫% -এ নেমে এসেছে। সুদের হার কম এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ পর্যাপ্ত। জিডিপির প্রায় ৫%-এ বাজেট ঘাটতি রেখে আর্থিক বিচক্ষণতা বজায় করা হয়েছে। লেনদেন ভারসাম্যের অবস্থা স্বস্তিকর; বাহ্যিক ঋণ জিডিপি হার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং বাহ্যিক ঋণ সেবা প্রদানে কোন চাপ নেই। দুটো ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা গেছে। একটি হলো বাজেট রাজস্ব ঘাটতি এবং অন্যটি হলো মন্দ ঋণের (এনপিএল) বৃদ্ধির কারণে ব্যাংকিং খাতের ওপর চাপ। ৯% এর নীচে কর জিডিপি অনুপাত বিশ্বের অন্যতম কম এবং বর্ধিষ্ণু রাজস্ব ঘাটতি অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সম্পদ ও সামাজিক সুরক্ষার সরকারি ব্যয় অর্থায়ন করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে কঠিন করে তুলেছে। ব্যাংকিং খাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যাংকগুলোতে মন্দ ঋণের ব্যাপক বৃদ্ধি, আক্রান্ত ব্যাংকগুলোর, বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্যের ওপর চাপ দিচ্ছে এবং ঋণের ওপর সুদের হার কমিয়ে ব্যাংকে আমানত বাড়ানোর টেকসই উপায় ব্যাহত করছে। কর ব্যবস্থার সংস্কার ও ব্যাংক খাতে সংস্কার উভয়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে কারণ জাতিকে কোভিড-১৯ এর প্রতিকূল অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

ঘ. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ বিষয়ে করণীয়

কোভিড -১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব এখনও বিস্তৃত হচ্ছে, কারণ মহামারীর ফলে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে অর্থবছর ২০২০ এর প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলাফল পরিকল্পনা দলিলের অধ্যায়-১, অংশ ১ এর ১.১৩ নং সারণিতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক, জিডিপি (৮০০ বিলিয়ন টাকা), রপ্তানি (৮ বিলিয়ন ডলার), বিনিয়োগ (৫০০ বিলিয়ন টাকা) এবং কর রাজস্ব (২০০ বিলিয়ন টাকা)। তাছাড়া, স্বল্পমেয়াদে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে হয়। দারিদ্র্যের এই স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধি রোধে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা হোক অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মন্দা স্রোতের সম্পূর্ণ প্রভাব বুঝতে এখনও সময় লাগবে ততক্ষণে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যগত প্রভাবসমূহ নিয়ন্ত্রণে আসবে, শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবে, জনগণ তাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু করবে, যাতে পরিবহন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, অবকাশ কেন্দ্র, পর্যটন, সৌন্দর্য চর্চা, শিক্ষা, ব্যক্তিগত সেবা ইত্যাদি বিষয়ের চাহিদা সবই স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে উপার্জনসমূহ পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসাটা নির্ভর করবে কত দ্রুত বৈশ্বিক অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তার ওপর। অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ড ও বৈশ্বিক অর্থনীতি উভয়ের পুনরুদ্ধার কোভিড-১৯ এর প্রতিকার কিংবা টিকা প্রসারের ওপর নির্ভর করছে। আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা হলো বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার ২০২১ সালের প্রথম দিকে ঘটবে।

যেখানেই অগ্রগতির ঘাটতি ছিল কোভিড-১৯ সেখানেই অনেক সংস্কারের গুরুত্বকে জোরদার করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব কর্মাকৃতি, বেসামরিক বিনিয়োগ প্রতিবেশ, রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজন। বাংলাদেশে কর সংগ্রহ পিছিয়ে পড়ছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি দ্রুত ফিরিয়ে আনতে হবে। একইভাবে রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং বহুমূখী ম্যানুফ্যাকচারিং ভিত্তির প্রসার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ছাড়া এটি সম্ভব হবে না। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুজ্জল বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের লক্ষ্যানুযায়ী

প্রাপ্তির ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি বিধানের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হবে। চূড়ান্তভাবে, কোভিড-১৯ এর ফলে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যয় সংকোচনসহ স্বল্পমেয়াদী যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়েছে তা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরেই মোকাবেলা করা এক বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হবে। তদানুসারে কর্মসৃজন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পমেয়াদী পুনরুদ্ধার ছাড়াও স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর অভিগম্যতা সম্পর্কিত কয়েকটি ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হবে। কোভিড -১৯ এর সময়ে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থা চাপের মধ্যে ছিল এবং এসময়ে যেসব ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি দেখা গেছে সেগুলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তুলে ধরা হবে। বাহ্যিক সুবিধা, স্বাস্থ্য সেবার অভিগম্যতা ও দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ জোরদার করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় উত্তরণে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। কোভিড-১৯ এক সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করেছে। দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত আয় হস্তান্তরে বৃহত্তর তহবিল গঠনের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করতে হবে। কোভিড-১৯ এর ফলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের অভিগম্যতার গুরুত্বকেও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং কোভিড সংক্রমণ হ্রাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে জোরদার করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার সংস্কার ছাড়াও আরো চারটি ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ৮ম পরিকল্পনার গভীর নিরীক্ষা করা হবে এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ অধিক আলোচিত ও বিষয়গুলোতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রথমত: প্রতিষ্ঠান যেমন- স্থানীয় সরকার, নগর প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শক্তিশালীকরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জোর দেওয়া হবে। ন্যায়বিচার, নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালীকরণ অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়ত: সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়গুলোর বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নত করা হবে যাতে বড় বড় সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং পরিবহন ও সামাজিক খাতে সরকারি নীতিসমূহের সময়মতো বাস্তবায়ন ঘটে। তৃতীয়ত: আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নীতির ওপর আলোকপাত করতে হবে। বিশেষ করে কর সংগ্রহ ও সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাম্যতা বৃদ্ধি করতে অর্থায়ন সংস্কার বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর সরকারি ব্যয়ের সমতার দিকগুলোর ওপর জোর দেয়া হবে। চূড়ান্তভাবে, পানি সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য পরিবেশগত ঝুঁকির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে ৮ম পরিকল্পনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ও রাজস্ব নীতি ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোর একীভূতকরণ ৮ম পরিকল্পনায় অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

ঙ. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন পদ্ধতি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ (পিপি ২০৪১) এর বাস্তবায়ন ৪টি ৫ বছর মেয়াদি ধাপে করা হবে। প্রথম ধাপটি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দিয়ে শুরু হয়েছে। তাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ পিপি ২০৪১ বাস্তবায়ন এমনভাবে শুরু করা যাতে বাংলাদেশ ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মর্যাদা অর্জন লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, প্রধান প্রধান এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে এবং চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়। এসব খাতগুলোর প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ৮ম পরিকল্পনা ৬টি মূল বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত।

- মানব স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার;
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাস;
- প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য পূর্ণ অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে উপকৃত হতে এবং সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তিক আয় হস্তান্তর করার মাধ্যমে দরিদ্র ও অসুরক্ষিতদের সহায়তা করতে ব্যাপক ভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ;
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল এমন এক টেকসই উন্নয়নের পথ অবলম্বন, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণ রূপান্তরকে সফলভাবে মোকাবিলা করে;
- অর্থনীতিকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মর্যাদা দানে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ; এবং
- এসডিজি (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবেলা করা ।

চ. কোভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধারের কৌশল

কোভিড-১৯ থেকে জানমালের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আক্রান্তদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে, ভয় দূর করে আত্মবিশ্বাস বিনির্মাণ এবং অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ আছে সরকার সেগুলো দ্রুত ও ব্যাপকভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে মানব স্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধারের সাথে এটি সংগতিপূর্ণ। অর্থবছর ২০২০- এ ইতোমধ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়াও সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধাসমূহের উন্নতি বিধানে বেশ কিছু সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্থায়ন বৃদ্ধি পাবে, সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা শক্তিশালী হবে, জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার পরিচর্যা সুবিধাদির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি বেসরকারি যৌথ স্বাস্থ্যবিমা স্কিমের সম্মিলনের মাধ্যমে ‘সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা তহবিল’ চালু হবে। দরিদ্র ও অরক্ষিতদের আয় হস্তান্তরের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ শক্তিশালী করা হবে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে গ্রাম ও নগরবাসীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে পর্যায়ক্রমে সাজানো এবং বাস্তবায়ন করা হবে যাতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমে আসে। বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্য খাত মোকাবেলাকারী অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও অন্যান্য দেশগুলোর (যে সকল দেশ কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন কিংবা প্রতিকারের ঔষুধ আবিষ্কারে এগিয়ে রয়েছে) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী সাফল্য প্রাপ্য হলেই যাতে সেগুলো সংগ্রহ করা যায়, তার জন্য সকল প্রচেষ্টা চালানো হবে। কোভিড-১৯ প্রতিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা অনুদানের মাধ্যমে দেশীয় ফার্মা ও মেডিকেল গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে ২০২০ সালের এপ্রিল- মে ২০০০-এ ঘোষিত সকল প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল দ্রুত বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্যমুখী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বিতরণ শক্তিশালী করা হবে। কর্মসংস্থান সুরক্ষায় সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হবে এবং কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্প (CMSE) এ কর্মসংস্থান বাড়ানো হবে। এসব শিল্পে বর্তমানে ২১ মিলিয়ন লোক নিয়োগ পেয়েছে। ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে স্বল্প খরচে ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করবে এবং সহজবোধ্য ও স্বল্প খরচের মাধ্যমে করার উপায় বের করবে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে সক্রিয়ভাবে পৌঁছানোর জন্য সকল প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা রেগুলেটরি বাঁধাসমূহ দূর করা হবে ।

ছ. অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের মধ্যে সাতটি প্রধান বিষয় রয়েছে।

- শ্রমঘন, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং তাড়িত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ;
- কৃষির বহুমূখীকরণ উৎসাহিতকরণ;
- সিএমএসএমইতে (CMSME) গতিশীলতা দান;
- আধুনিক সেবাখাত শক্তিশালীকরণ;
- নন-ফ্যাক্টর সেবাসমূহের রপ্তানি ত্বরান্বিতকরণ;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংবলিত আইসিটি ভিত্তিক শিল্পোদ্যোগ উৎসাহিতকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালীকরণ।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হলো কোভিড-১৯ এর কারণে যারা নতুনভাবে বেকার হয়ে পড়েছে তাদের জন্য প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং জনমিতি লভ্যাংশের পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্ভব ছিল না। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কাঠামোগত রূপান্তর ইতোমধ্যে শিল্পচালিত প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করেছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এগিয়ে যাচ্ছে। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে, রপ্তানি বেড়েছে এবং তৈরি পোশাক খাতে ৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে তৈরি পোশাকের বাইরে অন্যখাতে রপ্তানি খুব একটা অগ্রসর হতে পারেনি। এতে রপ্তানি বহুমূখীকরণ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসৃজন ধীর হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে তৈরি পোশাক খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে যাবে; অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি কৌশলে উৎপাদন এবং তৈরি পোশাক ব্যাতীত ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানিসমূহের ওপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যাতে উৎপাদন ও রপ্তানিকে বহুমূখী করা যায় বিশেষত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়া ও হালকা প্রকৌশল এবং ঔষধ কোম্পানিতে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া এবং পাদুকা শিল্পের

মতো অনেক কাজই তৈরি পোশাক শিল্পের মতোই আপেক্ষিকভাবে শ্রম ঘন এবং প্রচুর বৈদেশিক বাজার রয়েছে। তাই মূল্য সংযোজন প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে তৈরি পোশাক শিল্পের মতো সেগুলো কর্মসৃজন করবে এবং রপ্তানিতে অবদান রাখবে। অনেক ভোগ্যপণ্যের মতো উচ্চ অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্বলিত কার্যকর আমদানি বিকল্প কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে জোর দেওয়া হবে। বাণিজ্য সুরক্ষার মাধ্যমে রপ্তানির বিরোধী পক্ষপাত বাণিজ্য নীতি বৈষম্য দূর করা হবে। বিনিময় হার আরো নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং বিনিয়োগ পরিবেশের সংস্কারের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এবং অভ্যন্তরীণ বিনিয়েগের এই কৌশল বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

কৃষিতে বহুমূখীকরণ বৃদ্ধি করতে কৌশল গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে কৃষি উৎপাদনশীলতার অগ্রগতি, ইনপুট সরবরাহ, মূল্য নীতি সহায়তা, পানি সরবরাহ, কৃষি ঋণ এবং বাজারজাতকরণের সহায়তার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করা হবে। কৃষি আয় ও অশস্য কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে মৎস্য, ফলমূল, শাক সবজি ও গবাদিপশু পণ্যের কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে কৃষি রপ্তানি ত্বরান্বিত করা হবে। বিডিপি ২১০০ সরকারি বিনেয়োগ কর্মসূচির প্রথম পর্বের বাস্তবায়নের ফলে পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হবে, বন্যা ঝুঁকি হ্রাস পাবে, জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং মাটির লবণাক্ততা হ্রাস পাবে।

সিএমএসএমই (CMSME) গ্রাম ও নগর এলাকায় সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃজন করতে পারে। জাপান, তাইওয়ান ও কোরিয়ার বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে রপ্তানি, প্রবৃদ্ধি, এবং কর্মসংস্থানের জন্য সিএমএসএমই (CMSME) এর শক্তিশালী ও গতিশীল ভূমিকা রয়েছে। অ-কৃষি কর্মসৃজনের সর্বোত্তম পন্থা হলো অর্থনীতিতে সিএমএসএমই পুনরুজ্জীবিত করা। বিশেষ করে কম শিক্ষিত তরুণ জনগোষ্ঠী সিএমএসএমই কাজের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। এসএমই (SME) ফাউন্ডেশনকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় এজেন্সিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সিএমএসএমইর প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে যেমনটি আমেরিকায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সিএমএসএমই বৃদ্ধি করতে ওয়াট-স্টপ-সেবা হিসেবে কাজ করবে। আর্থিক দিক এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

সেবা খাত সমূহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিম্ন উৎপাদনশীলতার অনানুষ্ঠানিক সেবাসমূহ থেকে উচ্চ উৎপাদনশীলতার আনুষ্ঠানিক সেবায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই আনুষ্ঠানিক খাতের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং, অর্থ, নগর পরিবহন, আইসিটি, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ও পর্যটন। নিয়ন্ত্রক সংস্কার এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে সহায়ক সরকারি বিনিয়োগ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের প্রণোদনা তৈরির মাধ্যমে এই রূপান্তর আরো বৃদ্ধি পাবে। সেবা রপ্তানির প্রসারণই প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের চালিকা শক্তি। আন্তর্জাতিক জাহাজ সেবায় একটা বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এবং এই বাজারের বড় অংশ লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। জাহাজ ও আইসিটি সেবাসমূহে বেশি বেশি রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব রপ্তানিসমূহ অতিমাত্রায় শ্রমঘন এবং বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, আইসিটি খাতটি বিভিন্ন সেবা কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসছে এবং শিক্ষিত তরুণদের কর্মসৃজনের জন্য এটি একটি সুযোগ। আইসিটি কর হ্রাস, আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রসারের এবং সকল আইনগত প্রতিবন্ধকতা অপসারণের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আইসিটি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা হবে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স কর্মসৃজন, আয় ও বিনিয়োগ যোগানে একটা বড় উন্নয়ন ভূমিকা পালন করেছে। তরুণ জনগোষ্ঠী বিদেশি চাকরি থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ আয় সরবরাহের মাধমে দারিদ্র্য হ্রাস করেছে তা নয়, বরং সেগুলো নির্মাণ কাজ, গৃহায়ন, পরিবহন, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ অসংখ্য গ্রামীণ সেবাসমূহে কর্মসংস্থান ও কর্মকাণ্ডের সহায়তার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি রূপান্তরে অবদান রেখেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই শক্ত ট্র্যাক রেকর্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কোভিড- ১৯ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলেছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রেমিট্যান্স আন্তঃপ্রবাহ সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ২% প্রণোদনার কারণে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতি পুনরুদ্ধার হলেই বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দূরবস্থা দূর হবে। সরকারের সাথে সরকারের (G2G) আলোচনার মাধ্যমে, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে স্বল্প খরচের ঋণ নিয়ে, কর্মস্থলে সম্ভাব্য অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবাসমূহ বৃদ্ধি করে এবং স্থানীয় বাংলাদেশী দূতাবাস ও হাইকমিশন কর্তৃক স্বাগতিক দেশগুলোর শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স উপার্জন বৃদ্ধি করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

জ. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক রূপরেখা

সমষ্টি ও খাত পর্যায়ে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির জন্য উচ্চতর বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এই বিনিয়োগে এমনভাবে অর্থায়ন করতে হবে যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় কোন সমস্যা না হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেওয়া হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে মূল্যস্ফীতি গড় ৫% কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। এভাবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কোভিড-১৯ এর ধাক্কা সামলে উঠতে পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরে রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অর্থবছর ২০২৩ এর মধ্যে বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৫% ফিরিয়ে আনতে কর রাজস্ব বৃদ্ধি করে আর্থিক বিচক্ষণতা পুনরুদ্ধার করা হবে। পণ্য এবং নন-ফ্যাক্টর সেবা (এনএসএফ) ভিত্তিক তেজী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ রপ্তানি ভিত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে লেনদেন ভারসাম্যের অগ্রগতি বজায় রাখা হবে। বৃহৎ বিশ্ববাজারের কথা বিবেচনা করলে এনএফএস এর রপ্তানি বৃদ্ধি সুযোগ ব্যাপক। এক্ষেত্রে জাহাজ, পর্যটন এবং আইসিটি সেবাসমূহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান এবং উন্নত দক্ষতার ভিত্তি তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ প্রবাহ ত্বরান্বিত করার ওপর জোর দেয়া হবে।

মূলধন আহরণ প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালক বলে বিবেচিত হবে। অন্যান্য উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) অভিজ্ঞতার মত উৎপাদনের মূলধন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটবে। কৃষি, তৈরি পোশাক ও আধুনিক সেবাসহ বাংলাদেশের সকল খাতে ইতোমধ্যে তা ঘটতে শুরু করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগমন এবং এ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং-এ এসব নতুন নতুন মূলধনঘন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। ফলে ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট রেশিও (ICOR) খাত পর্যায়ে এবং সমষ্টি পর্যায়ে বৃদ্ধি পাবে। অতএব, প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে বিনিয়োগ হার অর্থবছর ২০২০ এর জিডিপির ৩২% থেকে বৃদ্ধি করে অর্থবছর ২০২৫ এর জিডিপির ৩৭%-এ উন্নীত করা। অতিরিক্ত বিনিয়োগের অনেকটাই বেসরকারি খাত থেকে আসবে। বেসরকারি বিনিয়োগ হার অর্থবছর ২০২০ এর জিডিপির ২৩.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ এর জিডিপির ২৭.৪% এ উন্নীত হবে। বেসরকারি বিনিয়োগে কেবল সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা বাড়িয়ে এই বৃদ্ধি সম্ভব হবে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এর বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যাপক এবং বাংলাদেশ কদাচিৎ এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগায়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু হবে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (BIDA) নীতিভিত্তিক গবেষণা, প্রচার এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দ্রুত ও কার্যকর সেবাসমূহ সরবরাহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি করা। সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির অতিরিক্ত ১.২% হারে বৃদ্ধি করতে হবে যাতে অবকাঠামো ও মানব পুঁজিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

উপরে উল্লিখিত কৌশলের ভিত্তিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে অর্থবছর ২০২১ এর স্থিরমূল্য ৬৩.৬ হাজার কোটি টাকা (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১ম বছর) যার মধ্যে ৪৭.৫ হাজার কোটি টাকা বেসরকারি খাত (৭৫%) থেকে আসবে এবং ১৬.১ হাজার কোটি টাকা (২৫%) সরকারি খাত থেকে আসবে। অতীতের মতো অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের আকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ অষ্টম পরিকল্পনার (৯৫%) অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা রাখবে। বৈদেশিক সঞ্চয় থেকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবশিষ্ট ৫% অর্থায়ন করা হবে। বৈদেশিক সম্পদের প্রতি স্বল্প নির্ভরতা বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকারের সতর্কতামূলক পন্থার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঝ. সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ও অর্থায়ন

আগেই লক্ষ্য করা গেছে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুততর বেসরকারি খাত বিনিয়োগ ৮ম পরিকল্পনার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হবে। সরকারের ভূমিকা হবে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ফিরিয়ে আনা এবং অবকাঠামোগত বাঁধাসমূহ নিরসন করা। সরকারি বিনিয়োগ অর্থবছর ২০১৯ এর জিডিপির ৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ এর মধ্যে জিডিপির ৯.২% এ উন্নীত হবে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির মোট পরিমাণ হবে অর্থবছর ২০২১ মূল্য ১৬.১ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ১১.৯ হাজার কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মাধ্যমে অর্থ যোগান দেওয়া হবে। এডিপির মূল লক্ষ্য হবে দ্রুত স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নতি বিধান ও শক্তিশালীকরণ; সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বিনির্মাণ; জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ দ্রুত গ্রহণ করে বেসরকারি বিনিয়োগ ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির অবকাঠামোগত বাঁধাসমূহ দূরীকরণ এবং বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়ন।

বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ, শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবার সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে যাতে সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি ক্ষেত্রে ঘাটতি সমাধানে ব্যাপক অভিগম্যতার মাধ্যমে উত্তম মানব পুঁজি গঠন করা যায়। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এর বাস্তবায়ন দ্রুত করা হবে, যাতে আধুনিক জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে সকল দরিদ্র ও অসুরক্ষিত নাগরিকদের সর্বাত্মক সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা যায়। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে, চলমান রূপান্তরধর্মী অবকাঠামো প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও বড় বড় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে যাতে অন্যান্য বড় বড় মহাসড়ক ও সেতু, বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করা যায় এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে বিদেশি ও দেশীয় বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় জমি প্রদান করা হবে। এডিপি ও বর্ধিত পিপিপি (PPP) উভয়ের মাধ্যমে অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হবে। চূড়ান্তভাবে, বিডিপি ২১০০ এর প্রথম পর্ব বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

এসব বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বার্ষিক বাজেট এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে, যাতে ৮ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সাথে এর সংগতি থাকে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে হাতিয়ার হিসেবে বার্ষিক বাজেট ও এডিপিকে সামঞ্জস্য করা হবে। এই বৃহৎ সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচিতে (PIP) অর্থায়ন করতে প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টা, যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক কাঠামো পিপি ২০৪১ এর আর্থিক কাঠামো বাস্তবায়ন করবে। ৩.৪ শতাংশ পয়েন্টে কর জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে। কর নীতি ও কর প্রশাসনের আধুনিকায়নের মাধ্যমে তা অর্থবছর ২০১৯ সালের জিডিপির ৮.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপির ১২.৩% এ উন্নীত হবে। এতে আয় ও মূল্য সংযোজন করের ওপর জোর দেয়া হবে। বাণিজ্য নীতির রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাতিত্ব দূর করার জন্য আমদানি করের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। সরকারি খাতের সম্পদের কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য উত্তম সরকারি সেবা সরবরাহ ও প্রণোদনার ভর্তুকি ও হস্তান্তর কর্মসূচিসমূহ এবং সরকারি খাতের সংস্থার বর্ধিত কার্যকারিতার জন্য সরকারি খাতের সম্পদের বিচক্ষণ ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ হবে। স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে একটি আধুনিক সম্পত্তি কর ব্যবস্থা চালু করা হবে। সরকারি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠণ করা হবে, যাতে মুনাফা অর্জন করা যায় এবং বাজেট স্থানান্তরের ওপর নির্ভরতা দূর করা যায়। এসব উৎস থেকে অর্থবছর ২০২৫ এর মধ্যে অতিরিক্ত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপির ১%।

ঞ. মানব উন্নয়নের কৌশল

একই পর্যায়ের মাথাপিছু আয়ের দেশগুলোর তুলনায় মানব উন্নয়নে বিশেষ অর্জনের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তবুও উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মানব উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে অতীতের তুলনায় আরো অধিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা রূপান্তরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে যাতে এই অভূতপূর্ব মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্য সেবার সাড়া প্রদান বিষয়টি উপরের পরিচ্ছেদ গ-এ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদি দৃষ্টিকোন থেকে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যয়ে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে; ২০১৯ সালের জিডিপির ব্যয় ০.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপির ২.০% এ উন্নীত হবে; স্বাস্থ্য সেবার সযোগ সুবিধাসমূহ, কর্মী নিয়োগ, যন্ত্রপাতি এবং সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী হবে, জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; আইসিটি সমাধানের মাধ্যমে টেলি স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি ঘটবে। স্বাস্থ্য বিধি মানদন্ডের উন্নতি ও মানব স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা হবে। সরকার মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচি সমন্বিত করে একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নীতি প্রণয়ণ করবে। পুষ্টি বিষয়ে শিশু ও মায়ের যে অগ্রগতি হয়েছে, বর্ধিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের সমন্বয়, বিদ্যালয়ে দুপুর বেলার খাবার সরবরাহ, শিক্ষা প্রচার, স্থানীয় স্বাস্থ্য ক্লিনিকে পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং এ বিষয়ে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা ত্বরান্বিত করা হবে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্যগত পরামর্শ এবং স্বল্প খরচের জন্মনিয়ন্ত্রণ পছন্দের মাধ্যমে ঐচ্ছিক প্রতিপালনের মাধ্যমে মোট উর্বরতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনতে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচি বেশ সফল হয়েছে কারণ মোট উর্বরতা হার ২.১ এ নেমে এসেছে। প্রতিস্থাপন হার ১.২% পৌঁছেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বয়স্ক জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, দক্ষ কর্মী দ্বারা প্রসবের অভিগম্যতার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস করা হবে, অল্প বয়সে মেয়েদের গর্ভধারণ হ্রাস পাবে, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে, নারী শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তরুণ জনগোষ্ঠীর উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

বয়স্ক স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অতীত অগ্রগতির ফলে শ্রম শক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে অবদান রয়েছে। তবুও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পারিপার্শ্বিকতায় উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের জন্য যেসকল দক্ষতা প্রয়োজন তার জন্য আরো অগ্রগতি দরকার। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০০% বয়স্ক স্বাক্ষরতা হার অর্জনের কথা বলা হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষায় অগ্রগতি তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দৃঢ় করা হবে। শিক্ষার গুণগত মানের ওপর জোর দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে কর্মস্থলের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হবে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে বিজ্ঞান, গণিত ও আইসিটির এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। টিভেট (TVET) পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার উন্নতি বিধান করা হবে। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব, কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং এনজিও ও উন্নয়ন অংশীদারদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হবে; শিক্ষা প্রশিক্ষণের বেসরকারি সুযোগ বাড়ানো হবে এবং শিক্ষা বাজেট ২০১৯ এর জিডিপির ২.০% থেকে অর্থবছর ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপির ৩.% এ উন্নীত হবে।

ট. দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তি

দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। কোভিড-১৯- আঘাত আসার পূর্বে, দারিদ্র্য হার ২০১৯ সালে ২০.৫% নেমে এসেছিল এবং চরম দারিদ্র্য হার ১০.৫% এ নেমে এসেছে। গত দশকে এটিই উন্নয়ন কৌশল সফলতার দৃঢ় সাক্ষ্য বহন করে। অনেক দরিদ্র এবং অরক্ষিত পরিবারগুলোর আয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষতির কারণে কোভিড-১৯ সাময়িকভাবে দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ২০৪১ সালের পিপিতে উল্লিখিত দারিদ্র্য হ্রাসের পথে গতি ফিরিয়ে আনতে নতুন কর্মসৃজন এবং হস্তান্তর পরিশোধের মাধ্যমে এই আয় ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা হলো অর্থবছর ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কৌশল অতীত সাফল্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজনে প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। এভাবে উপরে উল্লিখিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নের মিশ্রণের ফলে কর্মসৃজন হবে এবং দরিদ্রদের উচ্চ প্রকৃত আয় যোগাবে, উপরে উল্লিখিত মানব উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতি ঘটবে, পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো থেকে বর্ধিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৈদেশিক আয় প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক ঋণ সরবরাহ এবং বর্ধিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ফলে দারিদ্র্য কৌশলের মূল উপাদানগুলো বিনির্মিত হবে।

এই কৌশলগুলো অনেকাংশে অতীত কৌশলের অনুরূপ, তথাপি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য কৌশল বিভিন্নভাবে বর্ধিত করা হবে। প্রথমত: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রবৃদ্ধি কৌশলে কর্মসৃজনের ওপর যতটা আলোকপাত করা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিকতর আলোকপাত করা হবে। দ্বিতীয়ত: অবকাঠামো সরবরাহ, ঋণ ও সামাজিক সুরক্ষা আয় হস্তান্তরের মাধ্যমে দরিদ্রতম ১০টি জেলাতে দারিদ্র্য কমাতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। তৃতীয়ত: সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার (UHC) পরিকল্পিত সূচনা বড় অর্থনৈতিক অভিঘাতের উৎস থেকে দরিদ্রদের ঝুঁকি কমিয়ে দিবে। চতুর্থত, দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলের একটি বড় কাঠামোগত অগ্রগতি হবে দেশব্যাপী শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। এটির ভিত্তি হবে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ফাস্ট ট্র্যাক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন এবং নগর, গ্রামীণ ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে উচ্চতর ব্যয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ের বাজেট বৃদ্ধি করা হবে। এ ব্যয় অর্থবছর ২০১৯ এর জিডিপির ১.২% থেকে অর্থবছর ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপির ২% এ উন্নীত হবে। এখানে সরকারি চাকরিজীবিদের পেনশন বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সে অর্থ দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ করা হয়নি। চূড়ান্তভাবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে ডিজিটাল/মোবাইল আর্থিক সেবা ব্যবস্থাকে অধিক কার্যকর করা হবে। সুনির্দিষ্ট নীতি কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে - জাতীয় পরিচয় চিহ্নিত ডাটাবেইজ শক্তিশালীকরণ, ডিজিটাল আর্থিক সেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে আন্তঃব্যবহার্যতা প্রতিষ্ঠা করাসহ প্রদেয় অবকাঠামোর উন্নতি বিধান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিকাশে ডিএফএস এর সেবাসমূহ অধিক সহায়ক করে তুলতে উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা। এসব সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ আয় বৈষম্য কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে এবং প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল শক্তিশালী করা হবে। জেন্ডারের দিক থেকে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করা হবে এবং ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (NWDP) পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে। উচ্চ শিক্ষায় নারী পুরুষ উভয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে যে প্রভেদ ছিল তা নিরসনের মাধ্যমে নারীর শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে টিভেট (TVET) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলোতে, শিশু সেবা প্রাপ্তির উন্নতিতে, নারীর চলাচলের নিরাপত্তার অগ্রগতিতে এবং কর্মস্থলে মৌলিক সুযোগ সুবিধা যেমন টয়লেট ও নিরাপদ ন্যাপকিনের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিশু উন্নয়ন কৌশল হবে সকল শিশু সুরক্ষা আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে লিপিবদ্ধ পুনঃগঠিত শিশু সুবিধা কর্মসূচির ভিত্তিতে দৃঢ় সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাসমূহের মাধ্যমে শিশু দারিদ্র্য হ্রাস করা হবে।

নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু, শারীরিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী- যারা পেশাগত কারণে সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়- তাদের অন্তর্ভুক্তি কৌশল আগের মতোই সংবিধানে যেভাবে আছে সেভাবে বাস্তবায়নে বলবৎ থাকবে। সংবিধানে বর্ণ, ধর্ম, জাতি, মত ও পেশা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের প্রতি সম অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিতে সকল আইনগত ও রেগুলেটরি বিধি নিষেধ দূর করা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সুরক্ষায় সামাজিক উন্নয়ন নীতিসমূহের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড বিনির্মাণে গৌরব বোধ করে। অন্তর্ভুক্তি নীতিসমূহকে সুসংজ্ঞায়িত করা হলেও স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক সক্ষমতার প্রতিবন্ধকতার কারণে বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধ থেকেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলে মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ও সরকারি উভয় পর্যায়ের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দেওয়া হবে এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা হবে।

ঠ. অবকাঠামো উন্নয়নের কৌশল

৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে গত ১০ বছর মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের অর্থায়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশ আজ বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ থেকে বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুৎ বাণিজ্য বাস্তবায়ন ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) ও কয়লার প্রাথমিক জ্বালানির বহুমূখীকরণে উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এলএনজি এবং আমদানিকৃত কয়লা জ্বালানি-এ দুটির সুযোগ ভিত্তিক বিনিয়োগ চলছে এবং অর্থবছর ২০২২-অর্থবছর ২০২৩ মেয়াদে উৎপাদন শুরু হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি কৌশল চলমান ভালো কাজ অব্যাহত রাখবে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কৌশল দৃঢ় করা হবে। প্রথমত, বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ২০১৬ (পিএসএমপি) এর হালনাগাদ করা হবে এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ কর্মসূচি হালনাগাদকৃত চাহিদা প্রক্ষেপণ ও নতুন প্রজন্মের জন্য ন্যূনতম ব্যয়ের উৎস নির্বাচন এবং বিদ্যমান সক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। দ্বিতীয়ত, সঠিক জ্বালানি মূল্য ও অন্যান্য প্রণোদনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও মূল্যনীতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অর্থায়ন বৃদ্ধি করা হবে। চতুর্থত, বিদ্যুৎ সুবিধাদির সঠিক পরিচলন ও ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণ, জ্বালানি ব্যবহারে মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের মাধ্যমে জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাত কৌশল ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে কৌশল গৃহীত হয় তা অনুসরণ করবে। এখানে কর্মাকৃতি ব্যবধান রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলোতে জোর দেওয়া হবে। এভাবে এ কৌশলে একটি দক্ষ, টেকসই, নিরাপদ ও আঞ্চলিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটানো হবে, যেখানে বিভিন্ন পদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক হবে, যথাযথভাবে আন্তঃমুখী হবে এবং যেখানেই সম্ভব একে অপরের সাথে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা করবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পদ্ধতির গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন, ঢাকার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগের পাশাপাশি দুটো সমুদ্র বন্দরের উন্নয়ন দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কার্যকরী রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠা, রাস্তার সমন্বয়, রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে স্থলপথ উন্নয়নে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিবহন সংযোগ উদ্যোগসমূহে অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। বিনিয়োগের দিক থেকে, আন্তঃশহর সংযোগ, মহাসড়ক, টানেল এবং সমুদ্র বন্দরসহ সকল রূপান্তরমূলক পরিবহন অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের যথাসময়ে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে এই কৌশলটি চলমান থাকবে। এগুলো বাংলাদেশের পরিবহন যোগাযোগকে আধুনিকায়ন করতে সহায়তা করবে। সারা দেশ জুড়ে পণ্য ও সেবার গতিশীলতা বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যয় কমিয়ে দেবে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করবে। এ সকল রূপান্তরযোগ্য প্রকল্পসমূহ অতিমাত্রায় পুঁজিঘন, সাধারণত বহু বছর কেন্দ্রীক এবং অতিরিক্ত বিলম্ব ব্যয় এড়াতে শক্ত তদারকি প্রয়োজন হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণ নগর ট্রানজিট সুযোগ-সবিধাসমূহে প্রদত্ত অগ্রাধিকার অব্যাহত থাকবে এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে (বাংলাদেশের প্রথম উন্নত মেট্রোরেল) এমআরটিলাইন-৬ এর কাজ শেষ করার জন্য প্রচেষ্টা থাকবে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থায়ন কৌশলে সরকারি-বেসরকারি শক্ত অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগের সাথে এডিপিকে সমন্বিত করা হবে। আন্তর্জাতিক পিপিপি চুক্তি আলাপ আলোচনা ও পরিচালনায় অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ কর্মী দ্বারা পিপিপি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আন্তঃমোডাল পরিবহন ভারসাম্যের উন্নতি বিধানে বিশেষ জোর দিতে হবে। বিশেষ জোর দেওয়া হবে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ওপর যা সাধারণত স্বল্পব্যয়ী এবং পরিবেশবান্ধব। পরিবহনের ওপর, বিশেষ করে পর্যটনের জন্য বিমান চলাচল ও আন্তঃজেলা এয়ারলাইন সংযোগকে শক্তিশালীকরণ

এবং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সড়ক ব্যবহারকারী চার্জ, আকাশ ও সমুদ্র বন্দর ফি, অভ্যন্তরীণ নৌ ও রেল ফি সহ গণ পরিবহন সেবায় বিভিন্ন পরিসরে ব্যবহারকারী চার্জ ও ফি চালুর মাধ্যমে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে।

ড. ডিজিটাল বাংলাদেশ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি

শ্রম শক্তির উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং পুঁজি গঠন ও প্রযুক্তির ওপর। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত আইসিটি বিপ্লবের ফলে মোবাইল প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে শ্রম উৎপাদনশীলতা ও নাগরিক কল্যাণকে উন্নত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে দৃঢ় অগ্রগতি লাভ করেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাক্কালে আইসিটির ভূমিকা সামনে এসেছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার ফলে কর্মক্ষেত্রে শারীরিক উপস্থিতি, ব্যবসা ও শিক্ষা উদ্যোগ থেমে গিয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আইসিটি যোগাযোগ ব্যবহার করে এসব কর্মকাণ্ড আবার পুনরায় চালু করা হচ্ছে। ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, লোক প্রশাসন, পরামর্শ প্রদান ও খুচরা ব্যবসাসহ আরো অসংখ্য কর্মক্ষেত্র রয়েছে যেখানে শারীরিক উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। এগুলো আইসিটি সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এটি ইতোমধ্যে কর্মক্ষেত্রে বেশি লোকসমাগমের কর্মক্ষেত্র ধারণাটি আমূল পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তিগত গৃহ-অফিসে পরিণত হয়েছে। যাত্রীর সময় ও আর্থিক খরচ বাচানোর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার উন্নতি ঘটেছে।

অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা ও এটির প্রাপ্যতার আন্তজার্তিক প্রেক্ষাপটে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল বাংলাদেশের পূর্ণ সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অসংখ্য নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কর নীতির অসামঞ্জস্যতা পুনঃমূল্যায়ন করা। অতিরিক্ত কর আরোপ করে এটি এই খাতে বোঝা বাড়ানো হয়েছে। তাই, আইসিটি অবকাঠামোর বেসরকারি বিনিয়োগ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। করারোপের কারণে অতিরিক্ত সেবা ব্যয় ভোক্তার চাহিদা কমিয়ে দেয়, ফলে আইসিটি খাত বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে আইসিটির বিশেষ অগ্রগতিকে তরান্বিত করতে এই কর সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হবে।

সরকারি বিনিয়োগে নির্দিষ্ট অবকাঠামো যোগানের ওপর জোর দিবে। অন্যদিকে সরকারি নীতি ইতোমধ্যে সেবা প্রদান করা হয়নি এমন এলাকাগুলোতে মোবাইল ফোন প্রযুক্তির বেসরকারি খাতের প্রসার সহজ করে দিবে, বিশেষ করে পল্লী এলাকায় মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রণোদনা যোগাবে এবং ইন্টারনেট ভিডিও ফোন ও তথ্য সেবার মতো উচ্চমূল্য সংযোজিত মোবাইল সেবা সমূহের অধিক দ্রুত বিকাশে সহায়তা করবে। আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে সফটওয়্যার তৈরির মতো আইসিটি সেবা রপ্তানি উৎসাহ দান করা হবে। কর্মচারী প্রশিক্ষণের মতো সরকারি সেবার ডিজিটাইজেশন কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি খাতে ই-সেবার অধিক দ্রুত গ্রহণ উৎসাহিত করা হবে। আইসিটি শিক্ষা ও দক্ষ আইসিটি কর্মীর প্রাপ্যতা বাড়াতে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। প্রযুক্তি পার্কে বিনিয়োগ এবং আইসিটি গবেষণা ও উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে রপ্তানির লক্ষ্যে আইসিটি সফটওয়্যারের উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে ।

ঢ. নগর রূপান্তর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ যখন নিম্ন মধ্য আয় থেকে উচ্চ আয়ের দেশে ধাবিত হবে, দেশের নগরায়ণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নগরের জমি, পানি, বিদ্যুৎ, পরিবহন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং গৃহায়নের ওপর বর্ধনশীল চাপ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সকল নগর কেন্দ্রে বিশেষভাবে রাজধানী শহর ঢাকাতে এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামে অনুভূত হচ্ছে। উচ্চ প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে জমির উচ্চ মূল্য, যানজট এবং নগর অবকাঠামোর ওপর চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সরকার বুঝতে পেরেছে প্রবৃদ্ধি প্রচেষ্টার টেকসহিতা নিশ্চিত করতে নগরায়নের সমস্যাসমূহ কার্যকরভাবে সমাধানের দরকার হবে। সুষমভাবে মোকাবিলার জন্য পিপি ২০৪১ দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঐ কৌশল অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ নগর কৌশলের ওপর নির্ভর করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নগর কৌশল বাস্তবতার নিরিখে করা হয়েছে যেখানে বাজার অর্থনীতি নগরায়ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত থাকবে। নগরায়নের ধরণকে প্রভাবিত করতে জন নীতির ভূমিকা নির্ভর করবে প্রণোদনা, বিধিবিধান, সরকারি বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে বিকেন্দ্রীকৃত এবং স্বায়ত্বশাসিত নগর সরকার উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) এর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান অংশ হিসেবে কাজ করে। নগর ব্যবস্থাপনা সংস্কারের একটা ভালো কৌশল হলো ত্রিমুখী পদ্ধতি- (১) উত্তম সেবাসমূহের জন্য এই অংশীদারিত্বকে শক্তিশালীকরণ করতে সরকারি-বেসরকারি ভূমিকা পুনসংজ্ঞায়িতকরণ; (২) সরকারি নগর সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং (৩) রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিমূলক নগর সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানি সরবরাহ, ড্রেন, নিরাপদ স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ নগর সেবাসমূহে বিনিয়োগ করা হবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং কোভিড-১৯ এর সংক্রমন মোকাবিলার জন্য নগর ও পল্লী এলাকায় বিশেষভাবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। ভূমি ও সম্পত্তি নিবন্ধন, নিবন্ধন ফি হ্রাস এবং গৃহায়ন বন্ধকী অর্থায়ন শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত বিধিবিধান সহজীকরণের মাধ্যমে নগর গৃহায়নকে ত্বরান্বিত করা হবে।

নগর খাতে ব্যাপক অর্থায়ন প্রয়োজন। এডিপি অর্থায়ন সীমিত হওয়ার কারণে রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া, সেবা সরবরাহ অপর্যাপ্ত হবে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার হস্তান্তরের জন্য মানদণ্ডভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে, রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই মানদন্ডের মধ্যে থাকতে পারে জনসংখ্যা, দারিদ্র্য এবং কর্মাকৃতি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নগর ও পল্লী উভয় ক্ষেত্রে তিনটি অন্যান্য আর্থিক কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষমতাবান হবে। প্রথমটি হলো উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পাওয়া যায় এমন আধুনিক সম্পত্তি কর ব্যবস্থার মাধ্যমে কর আহরণ। দ্বিতীয়টি হলো বেসরকারি অর্থায়ন এবং তৃতীয়টি নগর সেবার ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতি সম্পর্কিত। একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGI) কর সম্পদ এবং জাতীয় সরকার হস্তান্তর নগর সরকারের পরিচালন ব্যয়ে এবং স্থানীয় রাস্তাঘাট, নর্দমা ব্যবস্থাপনা, পার্ক এবং জলাধার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্মসূচি অর্থায়নে সহায়তা করবে অন্যদিকে ব্যয় পুনরুদ্ধার, পানি সরবরাহ, নর্দমা কঠিন বর্জ্য অপসারণের মত সেবাসমূহে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। এসব বাণিজ্যিক সেবাসমূহের বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করা হবে। নগর গৃহায়ন প্রধানত একটি বেসরকারি খাতভিত্তিক কর্মকাণ্ড হবে। সরকারের ভর্তুকি ও অনুদান দরিদ্রদের স্বল্প খরচের গৃহায়ণের জন্য দেওয়া হবে।

ণ. টেকসই উন্নয়ন

গত কয়েক বছরে পরিবেশ সুরক্ষার্থে অনেক আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস এবং অভিযোজন ঘটাতে অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে বায়ু ও পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অগ্রগতি বজায় ছিল। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (BCCTF) অর্থের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের উন্নতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিডিপি ২১০০ গ্রহণের মাধ্যমে এই কৌশল ও নীতিমালার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকোপের সাথে দেশের ব-দ্বীপ গঠনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য এই বিস্তৃত দীর্ঘমেয়াদি কৌশল জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে জনগণের ঝুঁকি বহুলাংশে কমিয়ে দেবে।

প্রাথমিকভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার টেকসই উন্নয়ন কৌশলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো পিপি ২০৪১-এ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রথম পর্ব বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। পিপি ২০৪১ এ প্রস্তাবিত প্রবৃদ্ধি কৌশলে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়সমূহ একীভূত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ এক সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্ট কৌশল, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মধ্যে রয়েছে ক) সামষ্টিক অর্থনীতি কাঠামোর মধ্যে পরিবেশগত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে; খ) সহিষ্ণুতা তৈরি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে ডেল্টা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, (গ) বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাস, (ঘ) জ্বালানি ভর্তুকি দূর করা, (ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর সবুজ কর আরোপ, (চ) শিল্প ইউনিটগুলো থেকে নির্গমনের ওপর কর আরোপ এবং (ছ) ভূ-উপরিস্থ পানি দূষণ রোধ।

বাস্তবায়নের প্রথম পর্বে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বায়ু ও পানি দূষণ হ্রাসে চলমান প্রচেষ্টাসমূহে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, বনজ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা হবে এবং বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়ন করা হবে। পরিবেশগত সংস্কার বাস্তবায়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশলের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, নীতিমালা ও বিধি বিধান তৈরির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্পদ আহরণে আরো অধিক কার্যকরী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির সাথে সঠিক সমন্বয় সাধন করা হবে।

ত. সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

অর্থবছর ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহের সাথে সংগতি রেখে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জনে একটা সময়সীমা নির্ধারণ করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব বিষয়ের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

- সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঠিক কার্যকলাপ নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালীকরণ।
- যথাযথ আর্থিক স্বায়ত্বশাসনসহ একটি সুসংজ্ঞায়িত আইন কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ।
- সরলীকৃত আবেদন ফরম, পূর্বঘোষিত সেবা প্রদানের সময়সীমা এবং সেবা চার্জ ও অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মতো সকল সরকারি সেবাসমূহের অনলাইন লেনদেন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবা প্রদান শক্তিশালীকরণ।
- দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলাগুলোর দ্রুততর নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আর্থিক ও আইনগত সহায়তা প্রদান।
- দক্ষ কর্মী নিয়োগ এবং পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সকল বিবেচনাপূর্ণ নিয়মকানুন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্তিশালীকরণ। খেলাপী ঋণ, ক্রুটিপূর্ণ ঋণ প্রদান সিদ্ধান্তসমূহ কমানো এবং ট্রেজারী তহবিলের অবলম্বন ছাড়া মুনাফা অর্জনের জন্য সরকারি ব্যাংকগুলোর জরুরি সংস্কার।
- কর পদ্ধতির আধুনিকায়নের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট আয়কর এবং ভ্যাটকে শক্তিশালীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ আর্থিক কাঠামোর কার্যকারী বাস্তবায়ন করা হবে। কর ফরমটিকে সহজ করা হবে এবং কর গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে কোন আন্তঃক্রিয়া ব্যতীত কর ফরম পূরণ এবং পরিশোধ অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। অডিট সীমিত কার্যকর মানদণ্ড নির্ভর হবে। কর সংগ্রহ থেকে কর নীতিকে আলাদা করার কথা বিবেচনা করা হবে।
- সম্পদের অপচয় হ্রাস এবং শিল্পোদ্যোগক্তাদের অর্থব্যয় পুনরুদ্ধার ও সকল রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বাজেট বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কূন্য সহনশীলতা নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং কার্যক্রমগুলো জনগণের কাছে তুলে ধরা হবে।
- উত্তম তদন্ত ও ন্যায্য সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হবে।

থ. উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF)

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতিতে যে বড় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ঘটেছে তা হলো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সহযোগী কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ করতে কার্যকরী ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের আত্তীকরণ। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনার উত্তম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি উত্তম তথ্যাভিজ্ঞ ও স্বকীয় উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়ন পরিমাপের জন্য সামষ্টিক ও খাতভিত্তিক পরিমাণগত ফলাফল পরিবীক্ষণ করা হবে। ২০২৩ অর্থ-বছরের শেষ দিকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা করা হবে। এই পরিকল্পনা সমাপ্তির পর ২০২৫ সালের শেষে একটি চূড়ান্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হবে।

বহুবিধ সূচক গুচ্ছ জরিপ (MICS), নগর শিশু কল্যাণ জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ পকেট নির্ভর জরিপ, অরক্ষিতদের জন্য পকেট নির্ভর জরিপ, মন্ত্রণালয় হতে এসডিজির প্রশাসনিক তথ্যের জন্য জাতীয় উপাত্ত নিশ্চয়করণ কাঠামো বাস্তবায়ন, এসডিজি তথ্য পরীবিক্ষণসহ উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোর তথ্য সংস্কারের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে তথ্য সংগ্রহের জন্য শক্তিশালী করা হবে। মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়ে জিইডি ও বিবিএস তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরির জন্য স্বাধীন সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করবে।

বিবিএস তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দানে সহায়তা করতে পারে। এতে জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের জীবনের উন্নতি বিধান সহজতর হবে। সরকারি বিনিয়োগের ফলে নিম্নোক্ত প্রচেষ্টাসমূহ উপাত্তকে আরও কার্যকর ও অভিগম্য করে তুলবে - (১) সেবা প্রদান স্থানে সংগ্রহ করা যায় এমন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নতি এবং পোর্টালের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনিক উপাত্তে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে এসডিজির কার্যসিদ্ধি; (২) যারা নীতি প্রণয়ণের সাথে জড়িত এবং যারা তাদেরকে দায়বদ্ধ করতে চায় তাদেরকে উপাত্তে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে উপাত্তের চাহিদা বৃদ্ধি করা; এবং (৩) সরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে বিনিয়োগ ভূমিকা ও দায়িত্ব সমন্বয় করা, যাতে দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম অংশ

সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত:

কৌশলগত নির্দেশনা ও নীতি কাঠামো

অধ্যায় ১

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উন্নয়ন অগ্রগতি

১.১ পর্যালোচনা

রূপকল্প ২০২১ এবং সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ (পিপি ২০২১) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫ সালের জুলাই মাসে গৃহীত হয়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এ যে উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বিবেচনা করা হয়েছিল সেগুলোর কিছু অসমাপ্ত ছিল এবং তা সমাপ্ত করা প্রয়োজন ছিল। সেজন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে, প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যথাযথ উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। পিপি ২০২১ উন্নয়ন এজেন্ডা ও জাতিসংঘ অনুমোদিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ ২০৩০ (এসডিজি) এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার আগামী পদক্ষেপ হিসেবে এটি করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে সংশোধনের সুযোগ রেখে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন রূপকল্পের সাথে যুক্ত মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার এই ধারাবাহিকতা স্বাভাবিকভাবে একটি গতিশীল ও নমনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার উপাদান হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। এটি চলমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই করোনা ভাইরাসের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দারিদ্র্য মুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। পিপি ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো ৪টি মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্বের মধ্যে প্রথম পরিকল্পনা। কোভিড-১৯ প্রভাবের সাথে সমন্বয়সহ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ৬ষ্ঠ ও ৭ম অভিজ্ঞতা ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। কারণ, অভূতপূর্ব বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

এই অধ্যায়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রধান প্রধান অর্জন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের ব্যবধান ছিল তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রাধিকার এবং এ সংশ্লিষ্ট সামষ্টিক অর্থনীতি ও খাতগত কৌশল, নীতিমালা ও কর্মসূচি নিরূপণে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে। ৮ম পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলোতে আরো বিস্তারিতভাবে ৭ম পরিকল্পনার খাতগত কর্মাকৃতি তুলে ধরা হয়েছে, যাতে ৮ম পরিকল্পনার খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহের উন্নয়ন প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করা যায়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রকৃত কর্মাকৃতির বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের লক্ষ্যে, ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি ধারাভিত্তিক কর্মাকৃতি থেকে কোভিড-১৯ এর স্বল্পমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবকে আলাদা করা এখানে বিশ্লেষণাত্মকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ এর প্রভাব পড়তে শুরু করে। অতএব পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ৪ বছরের (অর্থবছর ২০১৬-অর্থবছর ২০১৯) ফলাফল হবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মাকৃতি মূল্যায়নের ভিত্তি। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে আলাদাভাবে অর্থবছর ২০২০ এর কর্মাকৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থবছর ২০২০ এর ফলাফলে পরিবর্তন ঘটতে পারে। কারণ উত্তম ও হালনাগাদ তথ্যসমূহ জুলাই-আগষ্ট মেয়াদে পাওয়া যাবে।

১.২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং কর্মসৃজনে অগ্রগতি

প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ অগ্রগতি হয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি যা ধরা ছিল তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর কাতারে চলে এসেছে। কৃষি থেকে শিল্পে এবং আধুনিক সেবাসমূহে উৎপাদন কাঠামোর রূপান্তর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে অধিক রূপান্তরের সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হবে। যে ক্ষেত্রটিতে অগ্রগতি বেশি বাঁধা পেয়েছে সেটি হলো কর্মসৃজন। কৃষক প্রধানত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে অধিক বাণিজ্যিকমুখী উৎপাদন কাঠামোর দিকে ধাবিত হতে লাগলো এবং

শ্রমিক ছাটাই শুরু করলো। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেভাবে প্রত্যাশিত ছিলো ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবা খাতসমূহ সেভাবে কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা দেখতে পারেনি। ফলে এসব কর্মকাণ্ডে মোট কর্মসৃজন প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম ছিল। এর ফলে এসব কর্মকাণ্ডে শ্রম নিয়োগের হার কমে গেল।

১.২.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধি

৫ বছর মেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনার জিডিপি ফলাফল সারণি ১.১ এ দেখানো হয়েছে। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড় প্রবৃদ্ধি হার গতি পেয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ৪ বছরে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৬% এ উন্নীত হয়েছে। যাই হোক, কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকৃত গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার পুরো ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ৭.১৩% এসে দাড়িয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে দ্রুত হ্রাস মাথাপিছু জিডিপি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই হার ৬.২% পৌঁছেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার চলমান ক্রমবর্ধমান অন্তঃপ্রবাহের সাথে মাথাপিছু জিডিপির দ্রুত প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ধারাবাহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের (LMIC) সীমা অতিক্রম করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মাথাপিছু জিএনআইয়ের দ্রুত বৃদ্ধি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) পথে বাংলাদেশকে ধাবিত করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। অর্থবছর ২০২০ এ মাথাপিছু জিএনআই ইতোমধ্যে ২০৬৪ ইউএস ডলারে পৌঁছেছে।

সারণি-১.১: বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা	পরিকল্পনা মেয়াদ (অর্থবছর)	গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার		মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	মাথাপিছু জিএনআই (ইউএস ডলার)*
		পরিকল্পনা (%)	প্রকৃত (%)		
প্রথম পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮	৫.৫	৪.০	১.৩	১১১
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	৫.৪	৩.৮	১.৫	১৪৫
তৃতীয় পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	৫.৪	৩.৮	১.৬	২০৪
চতুর্থ পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫	৫.০	৪.২	২.৪	২৫৩
পঞ্চম পরিকল্পনা	১৯৯৭-২০০২	৭.১	৫.১	৩.৫	৪৩১
ষষ্ট পরিকল্পনা	২০১১-২০১৫	৭.৩	৬.৩	৪.৯	১৩১৪
সপ্তম পরিকল্পনা	২০১৬-২০২০	৭.৪	৭.১৩	৫.৭৩	২০৬৪

*উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) *পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরের মাথাপিছু জাতীয় আয়*

৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বৈশ্বিক মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে (চিত্র ১.১)। এখানে বিষয়টি হলো এই যে ২০১৬-২০২০ সালের মেয়াদে বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার চীন ও ভারতের অর্জিত প্রবৃদ্ধির হারকেও ছাড়িয়ে গেছে যা প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে সকল প্রবৃদ্ধি কৌশলের নির্দেশ করে। এই কর্মাকৃতি ২০৩১ অর্থ-বছরের শেষে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মর্যাদা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি রচনা করেছে।

চিত্র ১.১: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধির কর্মাকৃতি (% গড়ে প্রতিবছর ২০১৬-২০১৯)

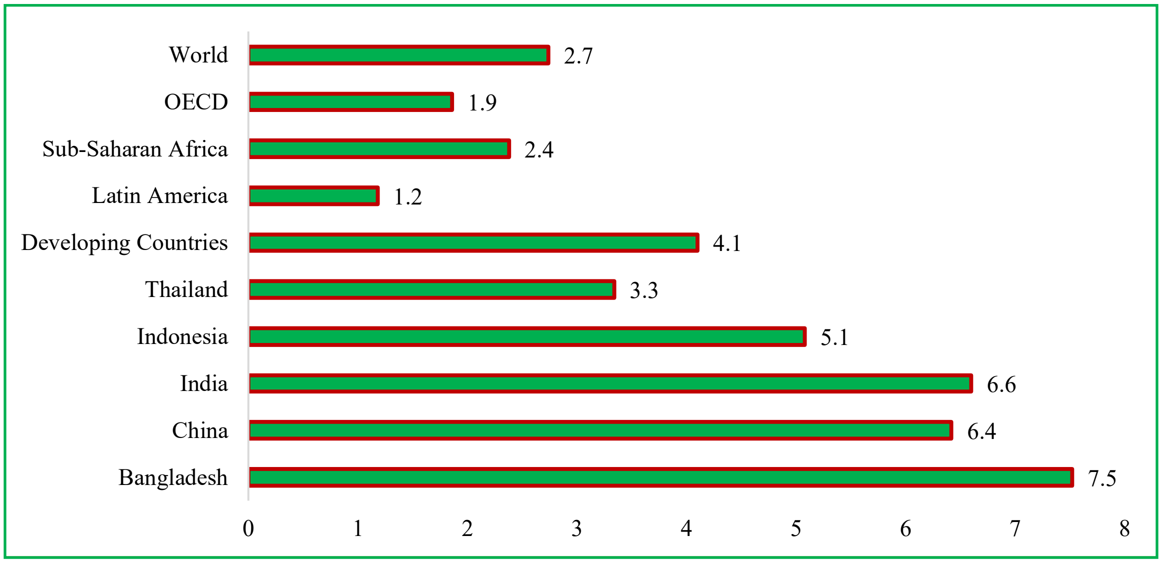

উৎস: গ্লোবাল ইকনোমিক প্রসপেক্ট, জুন ২০১৯ এবং জানুয়ারী ২০২০, বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

১.২.২ কাঠামোগত পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক রূপান্তর

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পিপি ২০২১ এর কৌশলের সাথে সংগতি রেখে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কৌশলে শিল্প ও আধুনিক সেবাসমূহের উৎপাদন ভাগ বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবাসমূহের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির অকৃষি খাত শক্তিশালীকরণ করার মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করার ওপর ক্রমাগত জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থবছর ২০১৬-২০২০ মেয়াদে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বৃদ্ধি ১১.৫% এ উন্নীত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধির বেশিরভাগই রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে আসবে বলে হিসাব করা হয়েছে। তদুপরি, আধুনিক সেবা ও সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সেবা খাত ৬.৫% গড় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়েছিল। যেখানে ৩.৩% হারে কৃষি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে, সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং এ গ্রামীণ অকৃষি কর্মকাণ্ড, বাণিজ্য, নির্মাণ, পরিবহন ও সেবাসমূহের প্রসারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সারণি ১.২ এ দেখা যায় যে, উৎপাদন কাঠামোর রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১২.৭% গড় হারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন কাঠামোর উন্নতি বিধানে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে। এই শক্তিশালী বৃদ্ধির কারণে এর জিডিপির ভাগ অর্থবছর ২০১৫ এ ১৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০১৯ এ ২৩%-এ উন্নীত হয়েছে। নির্মাণ খাতও বেশ ভালো করেছে। ফলে মোট জিডিপিতে শিল্পের ভাগ অর্থবছর ২০১৫ এর ২৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০১৯ এ ৩৫% এ উন্নীত হয়েছে। সেবা খাত গড়ে ৬.৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বড় অর্জন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো সেবা খাতের কর্মকাণ্ড যেমন- ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবাসমূহ, সংগঠিত পরিবহন (আকাশ, রেল, নদী, সড়ক পরিবহন) টেলিফোন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সম্প্রসারণের ফলে আধুনিক সেবাসমূহের অনুকূলে সেবা খাতের গঠনে পরিবর্তন হয়েছে।

সারণি-১.২: সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন

অর্থনীতির কাঠামো	অর্থবছর ২০১৫	অর্থবছর ২০১৯
কৃষি	১৫.৩৬	১৩.৬১
অ-ফসলী কৃষির ভাগ	(৪৪.৯০)	(৪৮.১৩)
শিল্প	২৯.১৯	৩৪.৫৭
যার মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	(১৯.৩৫)	(২৩.২৭)
সেবা	৫৫.৪৫	৫১.৮২

উৎস: জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমূখীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে, গ্রামীণ অর্থনীতি প্রধানত কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন কাঠামো থেকে অধিক অকৃষি ভিত্তিক উৎপাদন কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত হয়েছে। ৭ম পরিকল্পনায় এ রূপান্তরের ওপর আরো জোর দেওয়া হয়েছে। এটি প্রমাণিত যে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষির সেই একক প্রাধান্য আগের মতো আর নেই। কৃষির মধ্যে খাদ্যশস্য থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ উৎপাদন যেমন মাছ, গবাদিপশু, পোল্ট্রি, দুগ্ধজাত পণ্য, ফলমূল, শাকসবজি ও ফুলে এ ধীর ও স্থির রূপান্তর হচ্ছে। রপ্তানিমুখী মৎস্যখাত বাংলাদেশের খামার আয়ের উৎসে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। এভাবে কৃষি মূল্য সংযোজনে মৎস্য উপখাতের অবদান ২০১৫ অর্থ-বছরের ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ অর্থবছরে ২৬%-এ উন্নীত হয়েছে।

খামার-বহির্ভূত গ্রামীণ কর্মোদ্যোগের সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ দৃশ্য দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃষিতে বহুমূখীকরণ এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স-এর পর্যাপ্ত অন্তঃপ্রবাহের সংমিশ্রণে খামার-বহির্ভূত কর্মসৃজন গ্রামীণ ম্যানুফ্যাকচারিং সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, নির্মাণ, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, পরিবহন ও আইসিটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের গ্রামীণ কাজের চাহিদা তৈরি হয়েছে। আইসিটি ও পরিবহন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাম শহর ও বাজারের সাথে উত্তম সংযোগসহ উন্নত গ্রামীণ রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ-এর প্রাপ্যতা এই গ্রামীণ রূপান্তরকে সহজতর করে দিয়েছে। বিশেষ করে, আইসিটি সলিউশনের ব্যবহার এবং যাত্রী ও পণ্য দ্রব্য পরিবহনের সাথে সম্পর্কিত সময় হ্রাস তথ্য প্রবাহের উন্নতি ঘটিয়েছে এবং লেনদেন খরচ কমিয়েছে, এভাবে গ্রামীণ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ রূপান্তরের অগ্রগতি খুব আশাব্যঞ্জক এবং এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে।

১.২.৩ বিনিয়োগে অগ্রগতি

অতীতে মূলধন গঠন ছিল প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য মূলধন গঠনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগে কঠিন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সরকারি বিনিয়োগ হার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাও ছাড়িয়ে গেছে। সরকার রাজস্ব ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সেগুলো বিবেচনায় নিলে এটি কিছুটা আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। চলতি ব্যয়ের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করা হয়। এটি উন্নয়ন ব্যয় সীমাবদ্ধ করে। জমাকৃত অর্থ ও অবচয় তহবিল থেকে সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ প্রসারের মাধ্যমে এই রাজস্ব ব্যয় পুষিয়ে নেওয়া হয়। বেসরকারি বিনিয়োগও প্রসারিত হয়েছে কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতির জন্য বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের মন্থর গতি এবং সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) উদ্যোগের অধীন বিনিয়োগ প্রচেষ্টার দুর্বলতা কিছুটা দায়ী।

সারণি ১.৩: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগের অগ্রগতি

অর্থবছর	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ হার (জিডিপির %)			প্রকৃত বিনিয়োগ হার (জিডিপির %)		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
অর্থবছর ১৫	৬.৮	২২.১	২৮.৯	৬.৮	২২.১	২৮.৯
অর্থবছর ১৬	৬.৪	২৩.৭	৩০.১	৬.৭	২৩.০	২৯.৭
অর্থবছর ১৭	৭.১	২৩.৯	৩১.০	৭.৪	২৩.১	৩০.৫
অর্থবছর ১৮	৭.৪	২৪.৪	৩১.৮	৮.০	২৩.৩	৩১.৩
অর্থবছর ১৯	৭.৬	২৫.১	৩২.৭	৮.১	২৩.৫	৩১.৬

উৎস: সপ্তম পরিকল্পনা ও বিবিএস

১.২.৪ কর্মসংস্থান ও শ্রম উৎপাদনশীলতা

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জসমূহ তিনটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মাত্রায় প্রোথিত:

প্রথমটি হলো পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মসৃজন করা, যাতে নতুন যারা শ্রম শক্তিতে আসছে তাদের আত্মীকরণ করা যায়। এটি হলো পরিমাণগত চ্যালেঞ্জ। চলতি জনসংখ্যা রূপান্তরের ফলে, কর্মী জনসংখ্যার ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত শ্রম শক্তির বৃদ্ধি গড়ে প্রতিবছর ২.৯% ছিল, যা উল্লেখযোগ্যভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের চেয়ে দ্রুততর ছিল (প্রতিবছর ১.৩৭%)। এটি ২০১০ সালের সাম্প্রতিক শ্রম শক্তির জরিপের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন সময়ে এটি সহজলভ্য ছিল। এখানে মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মী জনগোষ্ঠীর বর্ধিষ্ণু ভাগ (জনসংখ্যার লভ্যাংশ) এবং নারী শ্রম শক্তির বর্ধিষ্ণু অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হয়। এই বর্ধনশীল শ্রম শক্তির কর্মে নিয়োগ এবং বেকারত্ব কমাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসৃজন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রতিবছর ২.৬ মিলিয়ন গড় হারে বৃদ্ধি করতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রার দ্বিতীয় মাত্রাটি গুণগত দিকগুলোর সাথে সম্পর্কিত। যদিও মোট কর্মসংস্থানে কৃষিখাতের কর্মসংস্থানের ভাগ হ্রাসের দিকে, তা সত্ত্বেও এটি এখনও সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের উৎস। গবেষণায় দেখা যায়, ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে বিশেষত সংগঠিত সেবায় শ্রম উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মঞ্জুরী অনেক বেশি। সম্মানী ও সুবিধার প্রেক্ষিতে চাকরির গুণগতমান অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের তুলনায় আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে গড়ে বেশ ভালো বলে মনে হয়। সপ্তম পরিকল্পনার একটি বড় উদ্দেশ্য হলো কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির তুলনায় ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবায় অধিক কর্মসৃজন করা।

তৃতীয় মাত্রাটি তরুণদের বেকারত্বের, বিশেষত শিক্ষিত বেকার তরুণদের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তির চ্যালেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত। সরকার বেকার তরুণদের, বিশেষত শিক্ষিত বেকার তরুণদের এই বিশাল ব্যাপ্তির সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তরুণ বেকারত্বের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করার উদ্দেশ্য ছিল।

কর্মসংস্থান কৌশল: সপ্তম পরিকল্পনার কর্মসংস্থান কৌশল চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত:

ম্যানুফ্যাকচারিং ও সংগঠিত সেবার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করাই ছিল প্রথম প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয়ত, ৭ম পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ একটি শ্রম আধিক্যপূর্ণ অর্থনৈতিক হওয়ায় শ্রমঘন পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে তুলনামূলক সুবিধা আছে। তৈরি পোশাক ম্যানুফ্যাকচারিং অভিজ্ঞতা সপ্তম পরিকল্পনার এই বিশ্লেষণে ভিত্তি দিয়েছে। এ কারণে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে তৈরি পোশাক ব্যতীত অন্যান্য পণ্য রপ্তানির উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি ভিত্তিকে বহুমূখীকরণ করার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত, জেলা পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদান, ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ সহজীকরণ, বিনিময় হার প্রণোদনা প্রদান, সম্ভাব্য অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান এবং বেসরকারি কর্মসংস্থানে বিনিময়ের শোষণমূলক আচরণ প্রতিহত করাসহ অন্যান্য নীতিমালার মাধ্যমে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে শ্রম সেবা রপ্তানিতে অর্জিত সাফল্যের ভিত্তিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ ও চূড়ান্তভাবে, সরকার তরুণদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় যুব নীতিমালা ২০১৭ গ্রহণ করেছে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন জোরদার করেছে, স্টেপ (STEP) ও সেইপের (SAFE) মতো অসংখ্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে এবং আইসিটি শক্তিশালী করেছে।

সপ্তম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান ফলাফল: শ্রম শক্তির ওপর সবচেয়ে সাম্প্রতিক উপাত্ত এলএফএস (LFS) ২০১৬-১৭। এ কারণে, অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান প্রাক্কলনে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ২০১০ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের তথ্য জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। প্রাক্কলিত ফলাফল সারণি ১.৪ এ দেখানো হলো।

সারণি ১.৪: সপ্তম পরিকল্পনায় প্রাক্কলিত কর্মসৃজন (লক্ষ শ্রমিক)

	অর্থবছর ২০২০ (পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাৎসরিক গড়	অর্থবছর ২০১৯ (প্রাক্কলিত)	প্রকৃত বাৎসরিক গড়
অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান	১০.৯	২.২	৪.৬	১.২
বৈদেশিক কর্মসংস্থান	২.০	০.৪	২.৮	০.৭
মোট কর্মসংস্থান	১২.৯	২.৬	৭.৪	১.৯
অতিরিক্ত শ্রম শক্তি	৯.৯	২.০	৪.২	১.১

সূত্রঃ এলএফএস ২০১৬-১৭; জিইডি প্রাক্কলন ।

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এসেছে। প্রথমত: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরের মেয়াদে ৭.৪ মিলিয়ন নতুন কর্মসৃজন হওয়ায় পুরো পরিকল্পনার সময়ে কোভিড-১৯ না আসলেও প্রকৃত কর্মসৃজনে ১২.৭ মিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রায় অনেক ঘাটতি থাকত। দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজনে ঘাটতিটা অনেক বেশি। পুরো পরিকল্পনার ১০.৯ মিলিয়নের এর প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মাত্র ৪.৬ মিলিয়ন প্রাক্কলিত নতুন কর্মসৃজন হয়েছে। অন্য কথায় ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতিবছর প্রায় ২.২ মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজন করা, কিন্তু প্রকৃত কর্মসৃজন হয় প্রতিবছর ১.২

মিলিয়ন। তৃতীয়ত: যখন অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজন লক্ষ্যমাত্রার নীচে চলে এসেছে, তখন বিদেশে কর্মসৃজন লক্ষ্যমাত্রার অনেক উপরে ছিল (লক্ষ্যমাত্রা ০.৪ মিলিয়নের তুলনায় প্রতিবছর বিদেশে কর্মসৃজন ০.৭ মিলিয়ন)। কর্মসৃজন সংখ্যা এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের দিক থেকে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রেরণা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এটি প্রকৃত মজুরিতে বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ধীরতর কর্মসৃজনের নেতিবাচক প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পুষিয়ে নিয়েছিল। চূড়ান্তভাবে, একটি বড় আশ্চর্যজনক ফলাফল হলো-অভ্যন্তরীণ শ্রম শক্তির বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য মন্থরগতি। ২০১৬-১৭ এর অতি সাম্প্রতিক শ্রম শক্তি জরিপ অনুসারে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিবছর ২.৯% প্রক্ষেপিত শ্রম শক্তি প্রবৃদ্ধির তুলনায় প্রকৃত শ্রম শক্তি ২০১০ ও ২০১৭ সালের মধ্যে প্রতিবছর গড়ে ১.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, শ্রম বাজারে প্রকৃত বার্ষিক নব্য প্রবেশকারীদের সংখ্যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত ২ মিলিয়নের তুলনায় মাত্র ১.১ মিলিয়ন। এই আশ্চর্যজনক ফলাফলের জন্য প্রায় ৩৬% এর মত নারীদের শ্রম শক্তিতে অংশগ্রহণের হারের স্থবিরতা দ্বারা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এখানে আরো প্রতিফলিত হয় যে, মোট জনগোষ্ঠীর তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ভাগে প্রত্যাশিত বৃদ্ধি ঘটেনি। এটি কয়েকটি কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তার মধ্যে ১৫-২৪ বছর বয়সী এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ তরুণী কর্মশক্তিতে প্রবেশের পরিবর্তে শিক্ষায় প্রবেশ করে; আবার এক বর্ধিষ্ণু ভাগের উঠতি তরুণ ছেলেমেয়ে কর্মে, শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণে নেই এবং এছাড়াও ক্রমবর্ধমান ভাগের বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী (৬৪+) রয়েছে। তাই যখন মোট নতুন অভ্যন্তরীণ কর্মসমূহকে শ্রম শক্তির সাথে প্রকৃত সংযোজন এর সাথে তুলনা করা হয়, তখন ফলাফলটি হয় হতাশাব্যঞ্জক। তথাপি, উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব এবং অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমের প্রেক্ষিতে ১০% কর্মসংস্থান, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজন কর্মাকৃতি লক্ষ্যমাত্রার নীচে ছিল।

কাঠামোগত রূপান্তরের কারণে, কৃষি খাত থেকে ব্যাপকভাবে শ্রমিক চলে যেতে লাগলো এবং প্রকৃতপক্ষে কর্ম সংস্থানের সংখ্যা কমে গেল। কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ কাজে প্রত্যাশা অনুসারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি (সারণি-১.৫)। ২০১০-২০১৭ সালের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রবৃদ্ধি প্রতিবছর ১০.৪ % বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থান বাৎসরিক ৪% হারে খুব সীমিতভাবে বৃদ্ধি পেল। ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা ২০১০-২০১৭ সালের মধ্যে মাত্র ০.৩৯ এ নেমে আসলো। একইভাবে নির্মাণ খাতে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা মাত্র ০.৪ (সারণি ১.৬)।

সারণি ১.৫: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থানের অগ্রগতি

খাতসমূহ	অর্থবছর ২০১৫ (মিলিয়ন কর্মী)	অর্থবছর ২০১৯ (মিলিয়ন কর্মী)	অর্থবছর ২০১৫ (শতাংশে ভাগ)	অর্থবছর ২০১৯ (শতাংশে ভাগ)
কৃষি	২৫.৮	২৪.২	৪৪.০	৩৮.২
শিল্প	১১.৫	১৩.৬	১৯.৫	২১.৬
(ম্যানুফ্যাকচারিং)	(৮.৬)	(৯.৮)	১৪.৭	১৫.৫
সেবা	২১.৪	২৫.৪	৩৬.৫	৪০.১
মোট	৫৮.৭	৬৩.৩	১০০.০	১০০.০

উৎস: এলএফএস তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জিইডি প্রাক্কলন এবং ২০১০ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে খাতগত কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা

সারণি ১.৬: প্রবৃদ্ধির মোট ও খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি

খাত	২০০০-২০১০ (%)	২০১০-২০১৭ (%)
কৃষি প্রবৃদ্ধি	৩.৫	৩.৪
কৃষি কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি	২.৬৫	(-০.৫৭)
কৃষি কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	০.৭৬	নাবোধক
ম্যানুফ্যাকচারিং বৃদ্ধি	৭.৫	১০.৩
ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	৬.২	৪.০
ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	০.৮৩	০.৩৯
নির্মাণ, খনিজ, বিদ্যুৎ ও পানির প্রবৃদ্ধি	৭.৫	১১.১
নির্মাণ, খনিজ, বিদ্যুৎ ও পানি কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি	৯.১	৪.৫
নির্মাণ, খনিজ, বিদ্যুৎ ও পানি কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	১.২১	০.৪১
সেবাসমূহের বৃদ্ধি	৬.৩	৬.০
সেবা কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি	২.৯	৩.৩

খাত	২০০০-২০১০ (%)	২০১০-২০১৭ (%)
সেবা কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	০.৪৬	০.৫৫
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৮	৬.৮
কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি	৩.৩	১.৭
জিডিপি কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	০.৫৭	০.২৫

উৎস: বিবিএস জাতীয় হিসাব এবং শ্রম শক্তি জরিপ

কর্মসৃজনে স্থবিরতার জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী হলো তৈরি পোশাক খাতে শিল্প একীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তা। এখানে ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে প্রধানত নারীদের জন্য ৪ মিলিয়ন কর্মসৃজন হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়তা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য ক্রেতা প্রণোদিত বিধিবিধান প্রতিপালনের এর কারণে তৈরি পোশাক খাতের একীকরণের ফলে ২০১২ সাল থেকে তৈরি পোশাক শিল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এগুলো সাধারণত ছোট পরিসরে এবং স্বল্প দক্ষ নারী ভিত্তিক কর্মসংস্থান যোগানদানকারী (চিত্র-১.২)। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও ২০১২ অর্থবছর থেকে তৈরি পোশাক খাতে মোট কর্মসংস্থান ৪.০ মিলিয়নে স্থির রয়েছে (চিত্র-১.৩)। এই উন্নয়নের ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসৃজনে, বিশেষ করে শহরের নারী তরুণীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ সকল নারী তরুণী শ্রমিকদের সম্পাদিত অনেক কাজই এখন সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হচ্ছে।

চিত্র ১.২: তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা

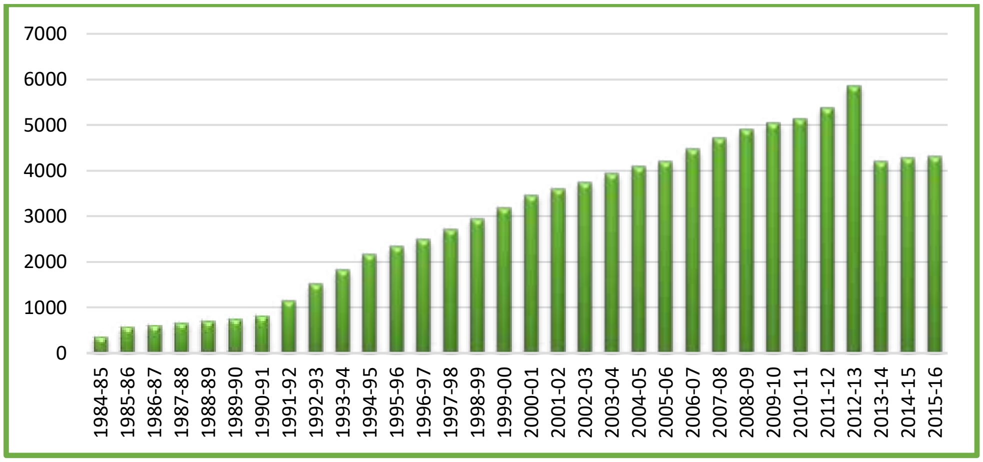

উৎস: বিজিএমইএ

চিত্র ১.৩: তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থান (মিলিয়ন কর্মী)

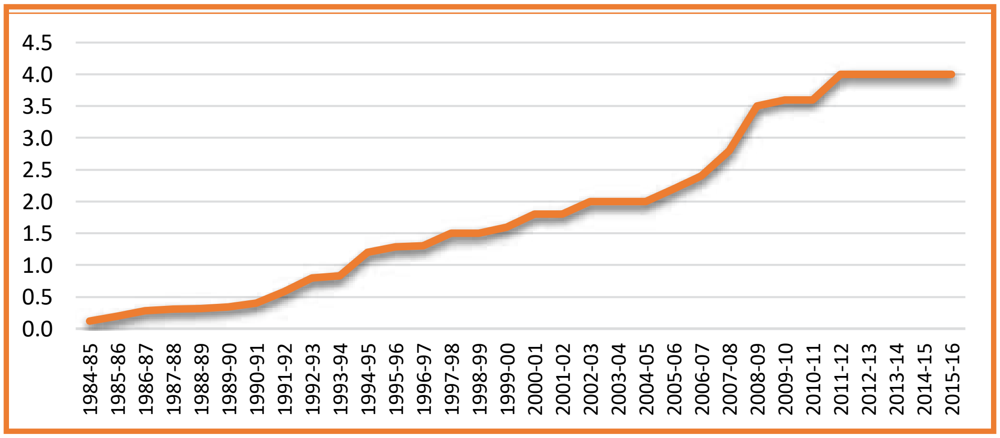

উৎস: বিজিএমইএ

দ্বিতীয়ত: তৈরি পোশাক খাতের সাফল্যের ফলে রপ্তানিমুখী শ্রমনিবিড় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত শিল্প বাণিজ্য নীতির রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাতিত্বসহ অসংখ্য কারণে রপ্তানি খাতের অন্যত্র কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। এভাবে অনেক বাণিজ্যে বাঁধা দূর হওয়া সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ বাজারের উৎপাদনের অনুকূলে পর্যাপ্ত বাণিজ্য সুরক্ষা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এই আমদানি বিকল্প ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কর্মসংস্থানের প্রভাব সীমিত।

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পসমূহ বাংলাদেশের অ-কৃষি কর্মসৃজনের মেরুদণ্ড। ২০১৩ সালের শুমারি অনুসারে, সকল অকৃষি শিল্পের ৯৯% শিল্প সিএমএসই (CMSE) শ্রেণিতে পড়ে এবং এতে ২০১৩ সালে ২০.৩ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হয়। এর ফলে কৃষির বাইরে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে পরিণত হয় (চিত্র ১.৪)। সাধারণভাবে এই খাতটি আনুষ্ঠানিক এবং অর্থায়নসহ অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে গতিশীলতার অভাব রয়েছে। এই খাতকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অকৃষি কর্মসৃজন অর্থনীতি পরিসর সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে।

চিত্র ১.৪: কর্মসংস্থান ২০১৩ বণ্টন (শতকরা হার)

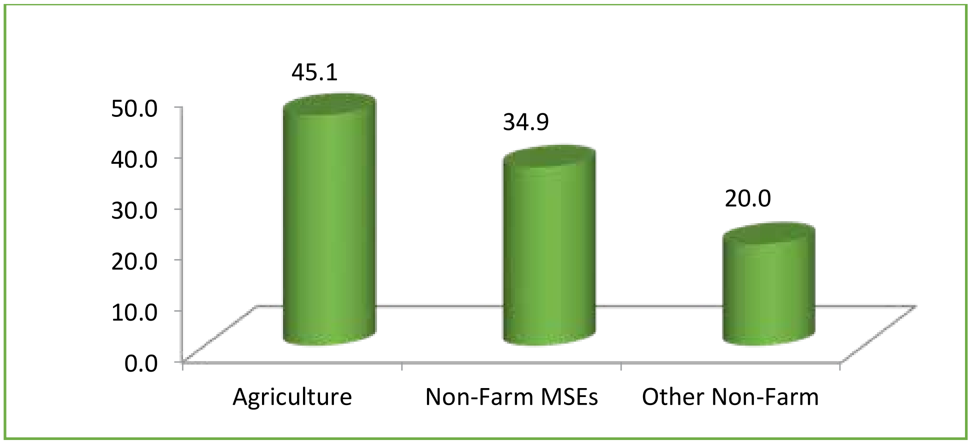

উৎস: বিবিএস, এলএফএস ২০১৩, এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩

কর্মসংস্থানের গুণগত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, সপ্তম পরিকল্পনায় যেভাবে আশা করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে কর্মসংস্থান কাঠামোর উন্নতি ঘটেছে। নিম্ন উৎপাদনশীলতা, মোট কর্মসংস্থানে নিম্ন-আয়ের কৃষি কর্মসংস্থান ২০১৫ সালের ৪৪% থেকে নেমে ৩৮% (সারণি ১.৪) এ চলে এসেছে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা, উচ্চতর আয়ের কর্মসংস্থানের ভাগ ম্যানুফ্যাকচারিং ও অন্যান্য শিল্প কর্মকাণ্ডে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবাখাতে কর্মসংস্থান ভাগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলো সবই ভালো খবর, কিন্তু উৎপাদন ও মূল্য সংযোজনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও কর্মসৃজনে উৎপাদন খাতের সক্ষমতায় ধীরগতির কারণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের রূপান্তরের হার কম ছিল।

শ্রম উৎপাদনশীলতা: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শ্রম আয় বৃদ্ধির একমাত্র টেকসই উপায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতি জুড়ে বিশেষভাবে কৃষিতে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। গড় উৎপাদনশীলতার পরিবর্তন ১.৫ নং চিত্রে নির্দেশ করা হয়েছে, যেখানে দেখা যায় গড় জাতীয় শ্রম উৎপাদনশীলতা প্রতিবছর ৫.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা কৃষিসহ সকল খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষিতে তা প্রতিবছর সর্বাধিক ৭.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং-এ উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতিবছর ৯% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রতিযোগিতার জন্য এটি বড় সংবাদ, তখন ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধির হারে স্থবিরতার কারণে নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মধ্যে কোন বৈপরীত্য রয়েছে কিনা এবং এই দুটো বিষয়ের মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোকাবিলা করা হবে। সেবা উৎপাদনশীলতায় তুলনামূলক স্থবিরতা হলো কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে আনুষ্ঠানিক নগর সেবাসমূহে, বিশেষ করে ব্যক্তিগত সেবা ও ব্যবসা বাণিজ্য শ্রেণিতে বড় ধরণের অভিবাসনের ফল। বিভাজিত শ্রম শক্তি বিষয়ক উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকিং, আইসিটি, আধুনিক পরিবহন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়, পেশাগত ও আনুষ্ঠানিক সেবায় উৎপাদনশীলতা ও উপার্জন সবচেয়ে বেশি।

চিত্র ১.৫: ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (০০০ টাকা ২০০৫-০৬ মূল্য)

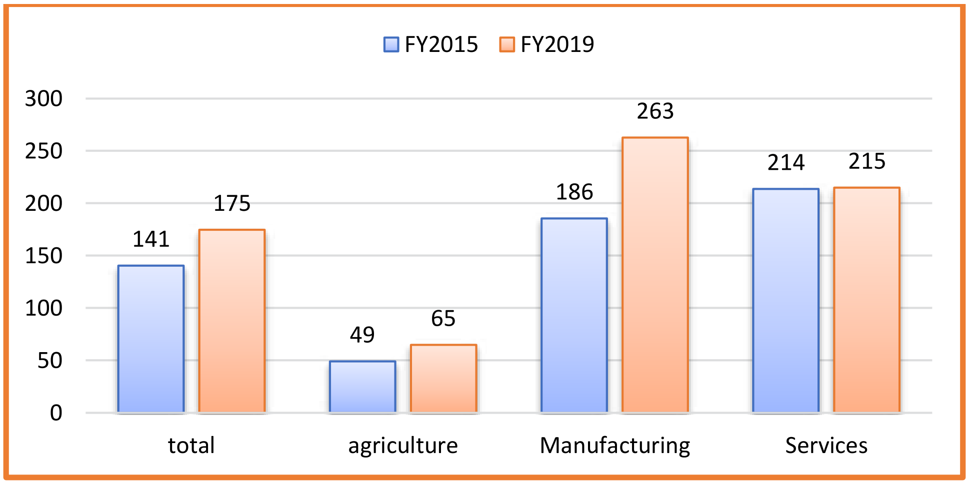

উৎস: বিবিএস জাতীয় হিসাব এবং বিভিন্ন বছরের এলএফএস উপাত্ত

বৈদেশিক শ্রম অভিবাসন: আগেই লক্ষ্য করা গেছে যে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থান কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিদেশ, বিশেষ করে, তেল সমৃদ্ধ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে শ্রম অভিবাসনের উন্নয়ন। দেশে কর্মসৃজন ছাড়া এইদিকে অগ্রগতি অধিক ভালো। অভিবাসী শ্রমিকের প্রকৃত অভিগমন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে অতিক্রম করেছে (সারণি-১.৩)। এভাবে, ০.৪ মিলিয়ন পরিকল্পিত বার্ষিক গড় অভিবাসী শ্রম বহিরাগমন এর তুলনায়, প্রকৃত বহিরাগমন ০.৭ মিলিয়ন ছিল। এই অতিরিক্ত বহিঃ কর্মসংস্থান বড় সুরক্ষা দিয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজনে মন্থরগতির নেতিবাচক প্রভাবসমূহ দুর্বল করে দিয়েছে। সরকার অনেক নীতি সহায়তা দিয়ে বাইরের অভিবাসনকে সহায়তা করেছে - এর মধ্যে রয়েছে ভালো তথ্য অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং উত্তম ব্যাংকিং সেবা ও বিশেষ বিনিময় হার প্রণোদনার মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহের অন্তঃপ্রবাহে সহায়তা করা, দালালদের শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়ার মাধ্যমে অভিবাসন ব্যয়হ্রাস করার পাশাপাশি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে নিম্ন খরচের ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং উত্তম প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

তরুণ কর্মসংস্থানের অগ্রগতি: জাতীয় যুবনীতি ২০০৭ গ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ সত্ত্বেও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তরুণ কর্মসংস্থানের অগ্রগতি প্রত্যাশার নীচে ছিলো (সারণি-১.৭)। তরুণ বেকারদের শতকরা হার ২০১৩ সালের ৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১০.৬% এ উন্নীত হয়। শিক্ষিত তরুণদের বেকার সমস্যাটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে; এর সাথে সাথে বেড়েছে তরুণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান না থাকার (NEET) বিষয়টি। এনইইটিএর বৃদ্ধি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রম শক্তি বৃদ্ধির মন্থর গতির কারণ। সর্বাত্মকভাবে তরুণ কর্মসংস্থান মোকাবেলা করা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

সারণি ১.৭: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তরুণদের কর্মসংস্থানে চ্যালেঞ্জ-এর অগ্রগতি

নির্দেশক	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৭
মোট জনসংখ্যার শতকরা হার হিসেবে তরুণ জনগোষ্ঠী	২৬.৬	২৭.০
মোট শ্রম শক্তির শতকরা হার হিসেবে তরুণ শ্রম শক্তি	৩৮.৫	৩২.০
তরুণ বেকারদের হার (%)	৮.১	১০.৬
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষিত তরুণ বেকারদের হার (%)	১৩.৬	২২.৩
উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ বেকারদের হার (%	১৬.৪	১৩.৪
কর্মসংস্থান, শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ (এনইইটি) নেই এমন তরুণ (%)	২৫.৪	২৯.৮

উৎস: এলএফএস ২০১৩ এবং এলএফএস ২০১৬-১৭

১.৩ দারিদ্র্য ও আয় অসমতা হ্রাসে অগ্রগতি

১.৩.১ দারিদ্র্য হ্রাস

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে দারিদ্র্য ২০১৫ সালে ২৪.৮% থেকে ১৬.৬% এবং চরম দারিদ্র্য ১২.৯% থেকে ৮.০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। প্রাক্কলিত দারিদ্র্য হ্রাসের ফলাফল ১.৮ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। শেষ নিয়মিত খানা আয় ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬-১৭ সালে সম্পন্ন করা হয়। অর্থবছর ২০১৮ পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাস পরিমাপ করতে বিবিএস খানা আয় ব্যয় জরিপের তথ্য ব্যবহার করেছে। সারণি ১.৮ ২০১৯ অর্থ-বছরের জন্য ২০১০-২০১৬ মেয়াদে মাথাপিছু জিডিপির প্রেক্ষিতে এর দারিদ্র্য স্থিতিশীলতা ব্যবহার করা হয়। ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রকৃত দারিদ্র্য হ্রাস ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি (সারণি ১.৯)। তাই কোভিড-১৯ মহামারীর অনুপস্থিতিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য হ্রাস লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে অর্জিত হতো। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এবং কোভিড পূর্ব বিশ্বে দারিদ্র্য কৌশলের বলিষ্ঠতার বহিঃপ্রকাশ করে। যাইহোক কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিবেশে এসডিজি ০১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্য অর্জন করতে দারিদ্র্য নিরসন কৌশল আরো পরিবর্তন করা লাগতে পারে। অংশ এক এর দুই ও চার নং অধ্যায়ে এবং অংশ দুই এর ১৩ নং অধ্যায়ে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ১.৮: সপ্তম পরিকল্পপনা মেয়াদে (%) দারিদ্র্য হ্রাস

বছর	দারিদ্র্য (উচ্চতর দারিদ্র্য রেখার মাথাপিছু দারিদ্র্য (%)	চরম দারিদ্র্য (নিম্নতর দারিদ্রে রেখার মাথাপিছু হার (%)
২০১৬	২৪.৩	১২.৯
২০১৭	২২.৯	১২.১
২০১৮	২১.৮	১১.৩
২০১৯	২০.৫	১০.৫

উৎস: ২০১০-২০১৬ জিডিপি-দারিদ্র্য সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিবিএস ও জিইডি মূল্যায়ন

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলের প্রচেষ্টাসমূহ হলো প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, কৃষি, ক্ষুদ্র ঋণ, গ্রামীণ অবকাঠামোর ওপর সরকারি ব্যয় বাড়ানো এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারি ব্যয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে দারিদ্র্য বান্ধব করা। দারিদ্র্য হ্রাসের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি নির্দেশক ১.৯ সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি ১.৯: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের প্রধান প্রধান নির্দেশক

কর্মাকৃতি নির্দেশক	ভিত্তিবছর (২০১৫)	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ২০২০	প্রাক্কলিত ২০১৯
মাথাপিছু প্রতি দারিদ্র্য (%)	২৪.৮	১৮.৬	২০.৫
চরম দারিদ্র্য(%)	১২.৯	৮.৯	১০.৫
জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি (%)	৬.৬	৭.৪	৭.৫
কৃষি জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার (%)	৩.৩	৩.৩	৩.৫
কৃষি বহুমুখীকরণ (অফসলী ভাগ %)	৪৪.৯১	৫২.৭০	৪৮.১৩
অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (মিলিয়ন)		২.২	১.১
বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি(মিলিয়ন)		০.৪	০.৭
সরকারি কর্মচারী ব্যতীত, সামাজিক সুরক্ষার ওপর গড় বাৎসরিক ব্যয় (জিডিপির %)	১.৫	১.৫	১.২

উৎস: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; বিবিএস

জিডিপির প্রবৃদ্ধি: জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে রয়েছে। তাই জিডিপি প্রবৃদ্ধির ত্বরান্বিতকরণ উল্লেখযোগ্যভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে অবদান রাখে। এছাড়া, উৎপাদনশীলতা ও বহুমুখীকরণের উন্নতি বিধানে নীতি প্রচেষ্টাসহ কৃষি খাতে ধারাবাহিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে যা কৃষি আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যাই হোক এখানে লক্ষ্যণীয় গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, যখন সপ্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন সবচেয়ে সাম্প্রতিক উপাত্ত ছিল খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০। ২০০৫ ও ২০১০ এর মধ্যে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৬ সালের অতি সাম্প্রতিক এইচআইইএস-এ দেখা যায় যে, ২০১০ এবং ২০১৬ এর মধ্যে প্রকৃত দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা কমেছে (সারণি ১.১০)। প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতার পতন থেকে বোঝা যায়, যখন দারিদ্র্য কমে তখন প্রবৃদ্ধি প্রচেষ্টার মাধ্যমে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নতি যথেষ্ট হবে না। প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্যমুখী ধরণ বৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ের মাধ্যমে আয় হস্তান্তরকে বৃদ্ধি করতে অন্যান্য নীতিসমূহ শক্তিশালী করা হবে।

সারণি ১.১০: জিডিপি প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা (%)

দারিদ্র্যের ধরণ	এইচআইএস বর্ষ	দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা
দারিদ্র্য	২০০৫-২০১০	০.৮
চরম দারিদ্র্য	২০০৫-২০১০	১.১
দারিদ্র্য	২০১০-২০১৬	০.৭
চরম দারিদ্র্য	২০১০-২০১৬	০.৮

উৎসঃ এইচআইইএস এবং জাতীয় হিসাব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জিইডি প্রাক্কলন

কর্মসংস্থান, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি: প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্যমুখী ধরণ অনেকাংশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এ তিনটি বিষয় হলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শ্রম উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি। সারণি ১.৪ এ দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে মন্থর গতির কারণে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজনের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে কর্মসংস্থানের স্থবিরতার কারণে স্বল্প দক্ষ নারী শ্রমিকদের নিয়োগ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে তা প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা কমাতে অবদান রাখছে। যাই হোক শ্রম উৎপাদনশীলতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি একটি ইতিবাচক দিক।

সারণি ১.১১ এ খানা আয় ব্যয় জরিপের তথ্য ব্যবহার করে ছয়টি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। ফলাফলে দেখা যায় যে, উঠতি শ্রম উৎপাদনশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ (চিত্র ১.৫) কৃষি শ্রমবাজারে নিবিড়করণের কারণে (সারণি ১.৬), সব বিভাগে কৃষিতে প্রকৃত মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত মজুরি অ-কৃষি কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামীণ ও নগর দারিদ্র্য হ্রাসে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সারণি ১.১১: ২০১০-২০১৬ এর মধ্যে প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি

বিভাগ	গ্রমীণ/কৃষি	নগর/কৃষি	গ্রামীণ/ অ-কৃষি	নগর/অকৃষি	গ্রামীণ	নগর
বরিশাল	৭.০	৭.৪	৭.০	৭.০	৬.৯	৭.০
চট্টগ্রাম	৪.০	৪.২	৬.১	৬.৭	৫.০	৬.৮
ঢাকা	৬.৮	৬.৮	৬.০	৮.৯	৬.০	৮.৯
খুলনা	৬.৮	৪.০	৮.৭	৭.৪	৭.৭	৭.৩
রাজশাহী	৫.৭	৬.২	৮.১	৫.৪	৬.৭	৫.৯
সিলেট	৫.৪	৮.০	১১.৪	৫.৪	৮.৬	৬.৪
বাংলাদেশ	৫.৯	৬.৮	৭.৫	৪.১	৬.৫	৭.৭

উৎস: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতকৃত চরম দারিদ্র্য বিষয়ক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি

রেমিট্যান্স: ১.৪ নং সারণিতে লক্ষ্য করা যায় অভিবাসী শ্রমিকদের বহিরাগমন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার প্রোফাইলে গুণগত উন্নতি ঘটেছে। অর্থবছর ২০১৯ এ সরকার বৈদেশিক রেমিট্যান্স বাড়ানোর জন্যে ২% উচ্চ বিনিময় হারের এক বিশেষ প্রণোদনার প্রস্তাব করেছিল। এসব উন্নয়নের নীট ফলাফল হলো অর্থবছর ২০১৮ থেকে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহে এক উল্লেখযোগ্য উর্ধ্বগতি।

সারণি ১.১২: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রেমিট্যান্স কর্মাকৃতি

অর্থবছর	শ্রমিক সংখ্যা (০০০)	রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ ($ বিলিয়ন)
অর্থবছর ২০১৬	৭৫৮	১৪.৯৩
অর্থবছর ২০১৭	৫৭৮	১২.৭৭
অর্থবছর ২০১৮	৮৮০	১৪.৯৮
অর্থবছর ২০১৯	৬৭৫	১৬.৪২
অর্থবছর ২০২০		১৮.২১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

কয়েকটি গবেষণা অনুসন্ধানে দারিদ্র্য হ্রাসে রেমিট্যান্সের উচ্চ ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করা হয়েছে। কয়েকটি চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স দারিদ্র্য কমিয়েছে। প্রথমত, গ্রামীণ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক কর্মস্থলে অভিবাসন গ্রামীণ শ্রমবাজারকে শক্তিশালীকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এভাবে প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রেমিট্যান্স থেকে আয় হস্তান্তর গ্রামীণ লোকদের আয় ও ভোগ বৃদ্ধি করে প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করেছে। তৃতীয়ত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের ব্যাপক অন্তঃপ্রবাহের ফলে গৃহায়ন, নির্মাণ, বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবাসমূহের প্রসার বেড়েছে। এগুলো পর্যায়ক্রমে গ্রামীণ শ্রমিকদের বহুমূখী কর্মসংস্থানের ভিত্তি যোগায়। রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের বহুমূখী প্রভাব হলো, গ্রামীণ রূপান্তর ও বহুমূখী কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের আয়ের ভিত্তি।

ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণ: বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণের বিকাশে অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভিগম্যতা ও সেবা সুবিধা বৃদ্ধি করতে গৃহীত কর্মসূচিগুলো অব্যাহত ছিল। ঋণ সুবিধাসহ অন্যন্য আর্থিক সেবা যাতে সহজেই সকলের নিকট অভিগম্য হয়, এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি শক্তিশালী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গ্রাম ও শহর উভয় অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে আইসিটি (মোবাইল ব্যাংকিং) ভিত্তিক এক নতুন আর্থিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আর্থিক সেবার সার্বিক পরিস্থিতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে, এমএফআই-সমূহের সুষ্ঠু তদারকিসহ ঋণগ্রহীতা ও ঋণদানকারী উভয়ের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ২০১০ এ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এমআরএ)-এর জন্য বেশ কিছু বিধিবিধান তৈরি করে। ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা অর্থবছর ২০১৫ এর ২০.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০১৯ এ ২৫.৭৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে মোট ঋণ একই সময়ে ৬৩৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৩৫ বিলিয়ন টাকা হয়েছে।

১.৩.২ আয় বৈষম্য

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। তবুও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি চ্যালেঞ্জ সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, সেটি হলো আয় বৈষম্য। আয় বৈষম্য কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সপ্তম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন লক্ষ্য হিসেবে আয় বৈষম্য হ্রাসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোয় (ডিআরএফ) সুনির্দষ্ট আয় অসমতা হ্রাসের লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ডিআরএফ এর লক্ষ্য হলো ভোগের জিনি সহগ অর্থবছর ২০১০ এর ০.৩২ থেকে কমিয়ে এনে অর্থবছর ২০২০ এ ০.৩০ এ নিয়ে আসা এবং আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে জিনি সহগ ০.৪৬ এ রেখে দেওয়া। আয় বৈষম্য মোকাবিলা করতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পল্লী উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সরকারি ব্যয় সংস্কার, কর্মসংস্থান, শ্রম উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র বান্ধব প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং দরিদ্রদের অভিগম্য মানব পুঁজির উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতার উন্নতিবিধান করতে ক্ষুদ্র ঋণ ও ঋণের প্রসার, বৃদ্ধিশীল ব্যক্তিগত আয় কর আরোপের ওপর জোর দিয়ে কর সংস্কার ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে দরিদ্রদের উন্নত অভিগম্যতা।

২০১৬ সালের সাম্প্রতিক প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ভোগের জিনি সহগ ২০১০ সালের মতো প্রায় ০.৩২ তে অপরিবর্তিত রয়েছে, অন্যদিকে আয়ের জিনি সহগ ০.৪৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৮ এ উন্নীত হয়েছে। কিন্তু ২০১৯ উপাত্ত নেই। তাই বর্তমান উপাত্তের অনুপস্থিতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে আয় বৈষম্য হ্রাসের সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলা কঠিন। যাই হোক কিছু গুণগত মূল্যায়ন করা যেতে পারে। ইতিবাচক দিক থেকে বলতে গেলে কৃষিতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চমূল্যে খাদ্য ফসলের কৃষি উৎপাদনের বহুমূখীকরণ আয় বণ্টনের উন্নতির জন্য সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক খাত। দ্বিতীয় ইতিবাচক খাতটি হলো ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষুদ্র ঋণ স্কিমের মাধ্যমে ঋণের প্রসার। তৃতীয় ইতিবাচক দিকটি হলো প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি। চতুর্থ ইতিবাচক খাত হলো অকৃষি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি। যাইহোক অন্যান্য নীতি কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন কম কার্যকর হয়েছে। আধুনিক ব্যবস্থায় আয়কর আরোপ ব্যবস্থার সংস্কার হয়নি। এ ব্যবস্থায় বৃদ্ধিশীল হারে করারোপ করা হয়। ব্যয় নীতিসমূহ সঠিক পথে আছে, কিন্তু কর রাজস্বের ঘাটতির কারণে জিডিপির শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি ব্যয়ের পরিকল্পিত প্রসার ঘটেনি। সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাসমূহের বণ্টনের ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল। যার ফলে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র লোক আওতার বাইরে ছিল এবং কিছু অদরিদ্র লোক এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তাই ভারসাম্যপূর্ণভাবে, আয় বৈষম্য বাংলাদেশের জন্য একটা বড় সমস্যা। অষ্টম পরিকল্পনায় নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে এবং বাংলাদেশের আয় বৈষম্য দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধির ধরণ পাল্টিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার থাকতে হবে।

১.৪ নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা

১.৪.১ জেন্ডার সমতা

নারীর ক্ষমতায়নে ভাল কর্মাকৃতির কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অগ্রগতি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বলবৎ ছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের পর উচ্চ শিক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য কমিয়ে আনায় বেশ অগ্রগতি ঘটেছে। নারীর অধিকার ও বিশেষাধিকার সুরক্ষায় রেগুলেটরি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবে এগিয়ে গেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (এনডব্লিউডিপি) ২০১১ এর বাস্তবায়ন ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চলছিল। এলএফএস ২০১৬-২০১৭ এর উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ও পেশাদার নেতৃত্বের ভূমিকায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতীয় সংসদে বর্ধিত নেতৃত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম প্রকাশিত ২০২০ বৈশ্বিক জেন্ডার অসমতা প্রতিবেদনে জেন্ডার পার্থক্য কমিয়ে আনায় বাংলাদেশের বিশেষ অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক জেন্ডার অসমতা প্রতিবেদন ৪টি বিষয়ের ভিত্তিতে জেন্ডার অসমতা দূর করার অগ্রগতির ভিত্তিতে দেশগুলোর মর্যাদা নির্ধারণ করে। মাত্রাগুলো হলো ১) অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, ২) শিক্ষাগত অর্জন, ৩) স্বাস্থ্য ও বেঁচে থাকা এবং ৪) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। সামগ্রিকভাবে ০.৭২৬ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০ তম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, কোরিয়া ও জাপানের মতো উন্নত দেশগুলো থেকে এগিয়ে এবং দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে। ভালো দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে জেন্ডার অসমতা দূর করা, জন্মগত লিঙ্গ অনুপাত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। এসব দৃঢ় অগ্রগতি সত্ত্বেও, এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অত্যাধিক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। জিজিআর (GGR) এ দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর কারণ হলো নারীর নিম্ন শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ হার, নারীর প্রতি মজুরি বৈষম্য, সরকারি চাকরিতে উচ্চ পর্যায়ে নারীর অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব এবং বেসরকারি খাতে নারীর অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপক জাতীয় কর্ম। সামাজিক ক্ষমতায়নে আইনসমূহ পর্যাপ্ত কিন্তু বাস্তবায়ন দুর্বল। বাল্য বিবাহ রোধ, সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য দূর করতে সিডো (CEDAW) এর শক্তিশালী বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য জেন্ডার সম্পর্কিত আইনের প্রয়োগ এখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

১.৪.২ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশ তার সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা নিয়ে গর্ববোধ করে, কারণ এখানে ধর্ম, জেন্ডার, জাতিবর্ণ ও পেশার ভিত্তিতে অগ্রগতিতে কোন আইনগত বাঁধা নেই। শিশু বয়স্ক ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমে চলমান অগ্রগতি নিশ্চিতকরণে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সপ্তম পরিকল্পনার সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল বাস্তবায়নটি সঠিক পথে রয়েছে। শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৩ সালের শিশু আইন বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে, এর জন্য কর্ম পরিকল্পনা এবং সম্পদ বরাদ্দ প্রণয়ন। শিশুবান্ধব বাজেট প্রত্যয়টি চালু হয়েছে এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিশুবান্ধব বাজেটটির কার্যকর প্রসারে ধীরে ধীরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিশু অপুষ্টির প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে শিশু পুষ্টির অগ্রগতিতে আরো অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিশু দারিদ্র্য অনেক বেশি এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্তৃক সুপারিশকৃত সংহতি শিশু সহায়ক ভাতা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ফাস্ট ট্র্যাকে রাখা প্রয়োজন। ২০১৩ সালের শিশু আইন কার্যকর করার বাস্তবায়ন সক্ষমতার শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং প্রতিবন্ধী শিশুসহ শিশুদের জন্য নিবেদিত সামাজিক সেবা কর্মশক্তির নিয়োগ প্রয়োজন। রাস্তা কিংবা এতিমখানা কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সেবা যত্ন কেন্দ্রে বসবাসরত শিশুদের ওপর দেশে তথ্যের অনেক ঘাটতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠান কিংবা এতিমখানায় বসবাসরত শিশুদের অপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং নগদ অনুদানে প্রতিপালন সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার কিংবা কমিউনিটি ভিত্তিক পুনঃসংহতকরণের সামাজিক সমন্বয় ও জ্ঞানমূলক উন্নয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অধিক শিশুদের সুরক্ষা দিতে কার্যকর হবে।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিষয়ে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) এলাকার উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আলোকপাত করা হয়েছে। কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ করতে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অভিগম্যতা বাড়াতে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়মিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা উপলব্ধি ও সমাধানের চেষ্টা করে। প্রাপ্য সম্পদের তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এর উন্নয়ন চাহিদা অনেক বেশি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে উচ্চ দারিদ্র্যের হার হ্রাস করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে।

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আইনগত বাঁধা দূরীকরণ এবং উপযুক্ত পরিবেশ চালু করতে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষা ও অধিকার আইন ২০১৩ অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে এই আইনের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন হতে বিরত থাকবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাজ ছিল এসব আইনকানুনের বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। ২০১২ সালের প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, প্রতিবন্ধীদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুপারিশ হলো, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি সর্বাত্মক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্মসূচি প্রণয়নে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এখনও প্রস্তুত হয়নি। ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন চলছে। ২০১৫-২০১৯ সালের মধ্যে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা চারগুণের অধিক হয়েছে; ০.৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭ মিলিয়ন হয়েছে। প্রতি মাসে তাদের প্রত্যেককে ৭০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিছু কর্মসূচি রয়েছে। সমাজ সেবা বিভাগের অধীন প্রতিবন্ধী তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে, দলিত ও যৌন কর্মীদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলের লক্ষ্য ছিল সকল বৈষম্য দূর করা, সামাজিক অবমাননাকর রীতি থেকে তাদেরকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মাধ্যমে বিশেষ কর্মসূচি চালু করা। আইনি বিধান থাকলেও স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে এসব প্রান্তিক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিতে এখনও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে সংবিধানে প্রোথিত সর্বাত্মক সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান।

১.৪.৩ সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক সুরক্ষায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। ২০১৫ সালের জুন মাসে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করে। এটির লক্ষ্য ছিল সামাজিক সুরক্ষার ওপর সরকারি ব্যয়ের দারিদ্র্য প্রভাব শক্তিশালী করা এবং মধ্যম আয়ের অর্থনীতির সামাজিক সুরক্ষা সমস্যাসমূহ মোকাবিলার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কাজ ছিল এনএসএসএস বাস্তবায়ন করা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ২০১৫ সালের জুন মাসে গৃহীত হবার পর প্রথম ৫ বছর (অর্থবছর ২০১৬-অর্থবছর ২০২০) এ এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন ধীর ছিল। এনএসএসএস বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ শুরু হতে বেশ বিলম্ব হয়। পরবর্তীতে উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায়, ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিক এনএসএসএস বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই কর্ম পরিকল্পনাটি সর্বাত্মক এবং এই কাজগুলো যদি ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তবে কালক্ষেপণ সত্ত্বেও এই কর্ম পরিকল্পনাটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অগ্রগতিতে বেশ সহায়তা করবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে, সামগ্রিক অগ্রগতি মাঝামাঝি ধরণের এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দৃঢ়ভাবে সংহত হওয়া প্রয়োজন। আলাদা আলাদা কর্মসূচির মূল্যায়নে উচ্চ বর্জন অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি বের হয়ে এসেছে এবং আংশিকভাবে দারিদ্র্য লক্ষ্যমাত্রা পদ্ধতির ত্রুটির কারণে সুবিধাগুলো অপচয় হয়েছে। তাছাড়া সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রাধিকার দেওয়া সত্ত্বেও রাজস্বের মন্থরগতির কারণে সম্পদে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। সরকারি চাকরিতে পেনশনের বিষয়টি বাদ দিলে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণদের মোট সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় জিডিপির মাত্র ১.২%। এই ব্যয় একটি দেশের ২ কোটি দরিদ্র এবং দারিদ্র্যের কাছাকাছি আরো ২ কোটি (দারিদ্র্য রেখার ১.২৫ গুণ বেশি) লোকের জন্য পর্যাপ্ত নয়। কোভিড-১৯ এর কারণে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও অর্থায়ন শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির ওপর কেভিড-১৯ প্রভাব মোকাবিলা করার উপায় হিসেবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১.৫ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি

বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই ঐতিহ্য রাখা হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধি এজেন্ডার দিকে অদম্যভাবে ধাবিত হয়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় হলো

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত কর্মাকৃতি ১.১৩ নং সারণিতে নির্দেশ করা হয়েছে। নিম্ন মূল্যস্ফীতির হার, নিম্ন আর্থিক ঘাটতি, নিম্ন ঋণ জিডিপি অনুপাত এবং স্থিতিশীল লেনদেন ভারসাম্যে প্রতিফলিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু সম্পদ আহরণে এবং রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি দুর্বল ছিল।

সারণি ১.১৩: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল লক্ষ্যসমূহ

নীতি ক্ষেত্র	কর্মাকৃতি নির্দেশক	ভিত্তিবছর (অর্থবছর ২০১৫)	পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২০)	প্রকৃত (অর্থবছর ২০২০)
আর্থিক নীতি	জিডিপি অনুপাতে কর (%)	৮.৫	১৪.১	৭.৯
	জিডিপি অনুপাতে সরকারি ব্যয় (%)	১৩.৫	২১.১	১৪.৯
	রাজস্ব ঘাটতি (জিডিপির %)	৩.৭	৪.৭	৫.৫
	মোট ঋণ (জিডিপির %)	৩৩.৬	৩৬.৩	৩৫.৯৮
লেনদেন ভারসাম্য	রপ্তানির গড় প্রবৃদ্ধি হার (নামিক মার্কিন ডলার) (%)	-	১২.০	১.৬
	রপ্তানি (জিডিপির %)	১৫.৭	১৬.২	১২.৩২
	চলতি হিসেবের উদ্বৃত্ত (জিডিপির %)	১.৫	(-) ২.৫	(-) ১.২৪
	রেমিট্যান্স (জিডিপির %)	৭.৮	৭.৬	৫.৬
	বৈদেশিক রিজার্ভ (আমদানির মাস)	৬.৩	৭.৩	৭.২
	বৈদেশিক ঋণ (জিডিপির %)	১২.৩	১১.২	১৩.৪
মুদ্রানীতি	সিপিআই মুল্যস্ফীতির হার (%)	৬.৫	৫.৫	৫.৬৫
	এমদ্ব প্রবৃদ্ধি (%) (বছরের শেষ)	১২.৪	১৫.৯	১২.৬৪
	বেসরকারি খাত ঋণের প্রবৃদ্ধি	১৩.২	১৫.০	১৩.১৪

উৎস: সপ্তম পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগ (এফডি) প্রাক্কলন। নোট: প্রবৃদ্ধি হার (মেয়াদ গড়)

১.৫.১ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রাজস্ব নীতির কর্মাকৃতি মিশ্র ছিল। আর্থিক দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে কর্মাকৃতি সঠিক পথে রয়েছে। বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫% এ ছিল এবং পরিকল্পনা লক্ষ্যের চেয়ে জিডিপির অনুপাতে মোট ঋণ বরাবর কম ছিল। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী রাজস্ব কর্মাকৃতি। রাজস্ব নীতির ক্রাউডিং আউট প্রভাব এড়িয়ে এটি বেসরকারি বিনিয়োগে সমর্থন যুগিয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতির বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। রাজস্ব নীতি ব্যবস্থাপনার অন্য মাত্রায় বেশ কিছু বিষয় রয়েছে।

প্রথমত, কর আদায় কর্মাকৃতিতে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। কর জিডিপির অনুপাত ৫.৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি হয়ে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপির ১৪.১ শতাংশে বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ৭ম পরিকল্পনায় গৃহীত হয় তাতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত কর জিডিপির অনুপাত অর্থবছর ২০২০ এ জিডিপির মাত্র ৭.৯ শতাংশে উন্নীত হয়। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিষ্প্রভ কর কর্মাকৃতির পর এটি বড় ধরণের ধাক্কা।

দ্বিতীয়ত, উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যয় ক্ষেত্রগুলো (যেমন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও পরিবেশ) রাজস্ব শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ব্যয় কর্তন দরকার হয় অথবা সপ্তম পরিকল্পনার অঙ্গীকার মেটাতে অসমর্থ হয়। সরকারি ব্যয়ে রাজস্ব প্রতিবন্ধকতা খুব ব্যাপক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থবছর ২০২০ এর জিডিপির ২১% ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায়, অর্থবছর ২০২০ এ প্রকৃত সরকারি ব্যয় ছিল মাত্র ১৪.৯%। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি ব্যয়ে এই ব্যাপক ৫-৬% জিডিপি ঘাটতির কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি সম্পদ, পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস কার্যত আর্থিক নীতির এই অক্ষমতার প্রতিফলন। রাজস্ব প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্পূর্ণরূপে মূল দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচিতে সহায়তা করা যায়নি।

তৃতীয়ত, বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতা বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হওয়ার অগ্রগতি থমকে দিয়েছে। বড় বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন হতে দেরি হওয়ায় খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুবিধা পেতে বিলম্ব হয়েছে। এভাবে এসব বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক মুনাফার হার (রেট অফ রিটার্ন) কমে যায়।

চতুর্থত, অবকাঠামোতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্যোগ গতি সঞ্চার করতে পারেনি। সরকার অবগত যে রাজস্ব ও ব্যয় উভয় দিক থেকে আর্থিক নীতি ব্যবস্থাপনায় প্রধান দুর্বলতা দীর্ঘমেয়াদে চলে এসেছে এবং এগুলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যৌক্তিকভাবে মোকাবিলা করা হবে।

শিশুদের জন্য অধিক বিনিয়োগকে সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি অগ্রাধিকার দেবে। নিম্নের কৌশলগত কর্ম গৃহীত হবে: ক) শিশুদের জন্য বৃহত্তর ও উত্তম সরকারি বিনিয়োগ সমর্থনে প্রমাণ যোগাড় করা হবে। বাজেট সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতসহ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বিশ্লেষণ; শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগসহ রাজস্ব সংস্থান বিশ্লেষণ; শিশুদের জন্য সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা; শিশুদের জন্য নির্বাচিত কর্মকাণ্ডের আয় ব্যয় বিশ্লেষণ; খ) শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব পালনকারীদের সক্ষমতা বাড়ানো; এবং গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বাজেট প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের (শিশুসহ) অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করতে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণ।

১.৫.২ বহিঃখাত ব্যবস্থাপনা

বহিঃস্থ স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ৭ম পরিকল্পনায় বহিঃখাতের কর্মাকৃতি ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। চলতি হিসাব সবসময় উদ্বৃত্ত থাকে কিংবা নিম্ন পর্যায়ের ঘাটতি থাকে, বৈদেশিক ঋণ সেবা এবং জিডিপির অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ দুটোই কম এবং সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে; ঋণ পরিশোধে কোন চাপ নেই। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলোতে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তারপর সামলে উঠেছে এবং এখন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রিজার্ভ স্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছে এবং বৈদেশিক বিনিময় হার স্থিতিশীল রয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একটা রেকর্ড সাফল্য দেখিয়েছে এবং ২০২০ সালের জুনে ৩৬.০৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় যেটি ৭-৮ মাসের আমদানি বিল পরিশোধ করতে যথেষ্ট।

বহিঃখাতের এই অতি ইতিবাচক দিকগুলোর বিপরীতে, দুটি উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথমত, ৭ম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার কম। পরিকল্পনায় নামিক মার্কিন ডলারের ভিত্তিতে গড়ে প্রতিবছর ১২% রপ্তানি প্রবৃদ্ধি আয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এতে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৬.৮%। এটি কিছুটা দুর্বল রপ্তানি কর্মাকৃতি। রপ্তানির ক্ষেত্রে আকস্মিক মন্থরগতি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের চাকরির বৃদ্ধি ধীর হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয় হলো তৈরি পোশাকশিল্পে (আরএমজি) অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে রপ্তানি ভিত্তিকে অধিকতর বিস্তৃত ও বহুমূখী করে তোলার ক্ষেত্রে অসামর্থ্য। পক্ষান্তরে, তৈরি-পোশাক রপ্তানির অংশ আরো বেড়েছে, ২০১৫ অর্থবছরে মোট রপ্তানির ৭৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তা ২০১৯ অর্থবছরে ৮৪% এ উন্নীত হয়। তৈরি-পোশাক ছাড়া অন্য কোন রপ্তানি এগিয়ে আসতে পারেনি। নন-ফ্যাক্টর সেবা রপ্তানি যেমন- আইসিটি, জাহাজশিল্প ও পর্যটনে এখনো প্রত্যাশিত গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়নি। ৮ম পরিকল্পনায় তাই রপ্তানি আয় উৎসের বহুমূখীকরণ বড় চ্যালেঞ্জ রূপে দেখা দিবে।

১.৫.৩ মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা

৭ম পরিকল্পনার প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি অগ্রাধিকার ছিল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং মূল্যস্ফীতি হার ৬% এর নীচে নিয়ে আসা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গড় মূল্যস্ফীতি হার ২০১৫ অর্থ-বছরের ৬.৫ শতাংশ থেকে পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে ৫.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে প্রকৃত মূল্যস্ফীতির প্রবণতা চিত্র ১.৬ এ প্রদর্শিত হলো। উল্লেখযোগ্যভাবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হয়েছে। মুদ্রা ও রাজস্ব বিচক্ষণতার ফলে অভ্যন্তরীণ তারল্য সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়েছে এবং তা অর্থবছর ২০১৯ এ ৫.৫% নেমে এসেছে। যাই হোক বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা হতে অনেক কম হয়েছে। কিন্তু এটা রাজস্ব নীতির ক্রাউডিং আউট প্রভাব বা মুদ্রানীতির কঠোরতার কারণে নয়। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মন্থরতা এবং সপ্তম পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগ কম হওয়ার কারণে চাহিদা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধি কমেছে।

চিত্র ১.৬: সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে মূল্যস্ফীতির ধারা (%)

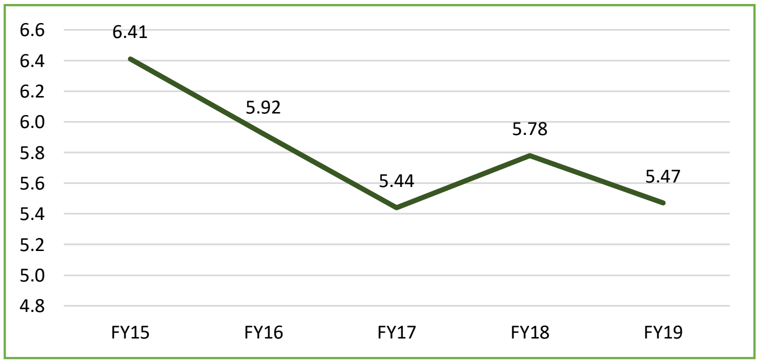

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

১.৬ অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রগতি

১.৬.১ বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরকার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুতের অভিগম্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরেক দফা শক্তিশালী ও সুগঠিত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ, খাত সংস্কার ও আঞ্চলিক বাণিজ্য। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা মহা পরিকল্পনা (পিএসএমপি) ২০১০ এর ওপর ভিত্তি করে সরকার যে বিদ্যুৎ সেবাখাত বাস্তবায়ন করছে, তা পুনরায় ২০১৬ সালে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তা পরিবর্তনশীল চিত্রপটের সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে। অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) এর যে সকল লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল তার অনেকগুলো অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন করার সক্ষমতা রয়েছে। সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের সাথে উৎপাদন সক্ষমতার এই বৃদ্ধি বিদ্যুৎ খাতের নিম্নের উভয় নির্দেশকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করেছে - বিদ্যুতের মাথাপিছু ভোগ বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতে জনগণের অভিগম্যতা।

অর্থবছর ২০১৯ এ সরকারি, আইপিপি, ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ মোট প্রতিস্থাপিত সক্ষমতা, লক্ষ্যমাত্রার অধিক ২২,৭৮৭ মেগাওয়াটে পৌঁছায় যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২.২৩% এ উন্নীত হয়েছে। অর্থবছর ২০১৫ এর ভিত্তিবছরে ৭২% ছিল। এতে মাথাপিছু উৎপাদন অর্থবছর ২০১৫ এর ৩৭১ কেডব্লিউএইচ (KWH) থেকে ৫১০ কেডব্লিউএইচ (KWH) -এ উন্নীত হয়েছে। এই মেয়াদে প্রায় ৩.২৭ কোটি গ্রাহক বণ্টন ব্যবস্থার ৫.০২ লাখ কিলোমিটার জাতীয় গ্রীডের সাথে যুক্ত হয়েছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস অর্থবছর ২০১০ এর ১৫.৭৩ শতাংশ হতে অর্থবছর ২০১৯ (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত) এ বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে ১০.৯০ শতাংশে নেমে এসেছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানি এবং বড় আকারের কয়লা চালিত বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণের মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানির উৎস বহুমূখীকরণে অগ্রগতি লাভ করেছে। জ্বালানি খাতের প্রায় সকল অংশে কয়েকবার মূল্য সমন্বয় ঘটেছে।

এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, দুটো উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথমত, বিদ্যুৎ সরবরাহে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধি পায়নি। এভাবে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভাগ (জলবিদ্যুৎসহ) অর্থবছর ২০১৫ এর ৩.৬% থেকে অর্থবছর ২০১৯ এ ৩.২৫% নেমে এসেছে। বৈশ্বিকভাবে বিশুদ্ধ জ্বালানি (Clean fuel) ব্যবহারে যে অগ্রগতি তার সাথে গতি বজায় রাখার জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর প্রবল নির্ভরতা কমাতে হবে। দ্বিতীয়ত, মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও জ্বালানি খাতের অর্থায়নের অগ্রগতি সীমাবদ্ধ থেকেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নের এসব দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করা হবে।

১.৬.২ পরিবহন খাত

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নত জীবনযাত্রার লক্ষ্যের জন্য প্রাণবন্ত ও কার্যকর পরিবহন নেটওয়ার্কের দরকার হবে। পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নতি বিধান ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের ভিশন ছিল কার্যকর, টেকসই, নিরাপদ ও আঞ্চলিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি বিধান। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যার মধ্য বিভিন্ন মোড (mode) একে অপরের পরিপূরক হবে, যথাযথভাবে আন্তঃক্রিয়া করবে এবং

যেখানে সম্ভব পরস্পর সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা করবে। সক্ষমতা বৃদ্ধির আধুনিক প্রযুক্তির সূচনা ও সিস্টেম-এর উৎপাদনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি, ঢাকার সাথে দুটো সমুদ্র বন্দরের নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন যোগাযোগে উন্নয়ন, দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কার্যকর রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠা; সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের মধ্যে সমন্বয় এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার মধ্যে স্থল সড়ক উন্নয়নে সহায়ক বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিবহন সংযোগ উদ্যোগসমূহে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হবে।

বিনিয়োগের দিক থেকে রূপান্তরধর্মী পরিবহন অবকাঠামো প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের পরিবহন নেটওয়ার্ককে আধুনিকায়ন করে যাতে সমগ্র দেশজুড়ে পণ্য ও সেবাসমূহের গতিশীলতার উন্নতি বিধান করতে পারে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহজ করতে পারে, ব্যয় কমাতে পারে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে। এসব রূপান্তরধর্মী প্রকল্পসমূহ অতি উচ্চমাত্রার পুঁজিঘন, সাধারণভাবে বহুবছর মেয়াদী এবং বিলম্ব ও অতিরিক্ত ব্যয় পরিহার করতে বিশেষ তদারকির প্রয়োজন হয়। বর্ধণশীল নগরায়ণ এবং নগর যানজটের কারণে সৃষ্ট বিশেষ চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজধানী শহর ঢাকা দিয়ে শুরু করে গণপরিবহন চালু করা হবে এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে (বাংলাদেশের প্রথম ইলেভেটেড মেট্রোরেল) এমআরটি লাইন-৬ এর কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও উচ্চ বিনিয়োগ খরচ বিবেচনায় নিয়ে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থায়ন কৌশলে শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) সাথে এডিপি বরাদ্দ সমন্বয় করা হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আন্তঃমোডাল পরিবহন ভারসাম্য উন্নয়নে রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের ওপর অধিক জোর দেওয়া হবে। এটি সাধারণত ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব। আন্তঃজেলা বিমান সংযোগের উন্নতির মাধ্যমে বিমান পরিবহনকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সড়ক ব্যবহারকারী চার্জ, বন্দর ফি, অভ্যন্তরীণ নৌ ও রেল ভাড়াসহ বিভিন্ন ধরণের গণপরিবহন সেবার ব্যবহারকারী চার্জ ও ফি চালুর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

পরিবহন খাতের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যুক্তিসংগত। এতে আন্তঃপরিবহন সমন্বয়, জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন, আন্তঃনগর সংযোগ, আঞ্চলিক সংযোগ, বাণিজ্য লজিস্টিকের ব্যয় এবং পরিবহন নেটওয়ার্ক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার উন্নতির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সড়ক ব্যবহারকারীদের চার্জ এবং পরিবেশগত টেকসহিতার প্রতি সংবেদনশীলতা প্রবর্তনের ধারণা যথাযথ। একইভাবে পরিবহনখাতে সেবা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনার কৌশল যথাযথভাবে করা হয়েছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশলের মত পরিবহন খাত বাজেট বরাদ্দে বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক কৌশল ও অগ্রাধিকার অনুসারে সকল বড় বড় প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তা ও সেতুর জন্য পরিকল্পনা মেয়াদে উল্লেখযোগ্য নতুন পরিবহন অবকাঠামো যোগ করা হয়েছে। সকল পরিবহন মাধ্যমের (mode) জন্য সেবার প্রসার বাড়ানো হয়েছে। বিমান পরিবহনে বেসরকারি অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলো বিমান সেবার সাথে সংযুক্ত। এগুলো বড় অর্জন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এগুলো শক্ত ভিত্তি দিয়েছে ।

অগ্রগতি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান রয়ে গেছে। রূপান্তরধর্মী প্রকল্প ও সেগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টার ওপর গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন পদ্মা বহুমুখি সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হতে বিলম্ব হচ্ছে। অনেক সড়ক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সম্পন্ন হওয়ার হার খুব ধীর। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন বিনিয়োগ পিছিয়ে রয়েছে। অনেক প্রকল্প সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অত্যাধিক ভিড় ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নগর পরিবহন বিষয়গুলো রাজধানী ঢাকা শহরে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অবকাঠামোর জন্য পিপিপি উদ্যোগ প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি।

৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নে শিক্ষা থেকে এটা প্রতীয়মান, পিপিপি চুক্তির বহুমূখী উন্নয়ন অংশীদারের অর্থ ব্যবহার করে নামকরা আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যথাকল্প চুক্তির মাধ্যমে বড় জটিল ও পুজিঘন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের কৌশল পুনঃবিবেচনা করার প্রয়োজন হতে পারে। এই যথাকল্প প্রকল্পসমূহের স্বচ্ছ আইসিবি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দর কষাকষি হওয়া উচিত এবং যথা সময় ও যথা ব্যয়ে সম্পন্ন করার ধারা যুক্ত করা উচিত।

১.৭ মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি

১.৭.১ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN)

পিপি ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নে উচ্চাভিলাসী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জনসংখ্যা স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, জনসংখ্যার গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং শিশু পুষ্টির উন্নতি বিধানে নজর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তরুণ ও বর্ধিষ্ণু শ্রম শক্তির যাদের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরতা এবং শিক্ষা দক্ষতা আছে তাদের স্বাক্ষরতা হার এবং মৌলিক শিক্ষা দ্রুত বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। মানব উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে পৌঁছে যেতে পারে।

এটা প্রমাণিত যে, এইচপিএন (HPN) এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট উর্বরতার হার কমেছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার প্রায় ১.২ % এ নেমে এসেছে এবং মনে হয় যে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১% জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের লক্ষ্য অর্জিত হবে। অর্থবছর ২০২১ এর জন্য নির্ধারিত ৭০ বছরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৮ সালে ৭২ বছর পর্যন্ত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফলে বোঝা যায়, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টির মানদণ্ড নীতি নির্ধারকদের প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। শিশু মৃত্যু হার আরো কমে ২০১৯ অর্থবছরে ১০০০ জনে ২১-এ নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যু হারের ক্ষেত্রে ২০১৫- এর ১০০০০০ এ ২১৬ জন থেকে ২০১৯- এ ১০০০০০ এ ১৬৫ হয়েছে। ২০২০ অর্থ-বছরের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ১০০০০০ এ ১০৫ জনের তুলনায় এইহ্রাস কম। মাতৃ মৃত্যু মোকাবিলায় অপ্রতুল অগ্রগতি এই এইচপিএন (HPN) পদ্ধতির একটা বড় দুর্বল দিক। এর জন্য প্রয়োজন জরুরি নীতি কর্ম। শিশু পুষ্টির অগ্রগতির প্রতিফলন দেখা যায়, কৃষতা (Wasting) ২০১১ সালের ১৬% থেকেহ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ৯.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এটি ভালো অগ্রগতি এবং পিপি ২০২১ মেয়াদে সরকারের মাধ্যমে গৃহীত উৎকর্ষ পুষ্টি নীতি উৎকর্ষ শাসন ব্যবস্থার নির্দেশক।

এসব অর্জন সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবায় বড় বড় অসমতা এখনও রয়ে গেছে এবং সেগুলো মোকাবিলা করা প্রয়োজন। অসংক্রামক রোগের (NCDs) কারণে মৃত্যু হার মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে - চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারীর নিজস্ব (আউট অব পকেট) হ্রাস, প্রয়োজনীয় পুষ্টি সেবার পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধি, ই-এলএমআইএস (E-LMIS) শক্তিশালীকরণ ও প্রতিষ্ঠাসহ সুবিধা প্রস্তুতি বৃদ্ধি স্বাস্থ্য খাতের চেলেঞ্জের অন্যতম। বেসরকারি খাত নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা এবং স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এইচপিএন (HPN) এর ওপর সরকারি ব্যয় গুণগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে বর্ধিত জিডিপির ০.৭% এ স্থির হয়ে রয়েছে। এটি বৃদ্ধি করতে দ্রুত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটি সরকারের কৃতিত্বের বিষয় যে, কম সরকারি বাজেটে এমন ইতিবাচক এইচপিএন ফলাফল অর্জন করেছে তবে এটি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে টেকসই নাও হতে পারে। কারণ, অধিকাংশ সংক্রামক রোগের (কলেরা, ম্যালেরিয়া, টিবি, পোলিও) প্রকোপ কমেছে এবং এই রোগের স্বল্প খরচের প্রতিরোধ ও আরোগ্যমূলক সমাধানের বদলে উচ্চ আয়ের দেশে দেখা যায়, এমন জটিল ও ব্যয়বহুল মহামারীবিদ্যার (epidemiology) ধরণ স্থান নিয়েছে।

দেশ যতই উচ্চ আয়ের দেশে যাবে, বেসরকারি ব্যয় হবে এইচপিএন ব্যয়ের প্রধান উৎস। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে দরিদ্র ও বয়স্কদের জন্য গবেষণা ও স্বাস্থ্য বিমা ভর্তুকির ওপর সরকারি ব্যয় অন্যতম ব্যয় অংশ (expenditure item) হবে। বাংলাদেশের এইচপিএন কৌশলের হারানো অংশ যেটির প্রতি জরুরি মনোযোগ দরকার সেটি হলো - পুষ্টি সেবার গুণগতমান ও পরিধি বাড়াতে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসুচি (EPI) প্লাটফর্মে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও প্রবর্ধন একীকরণ এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, কোভিড-১৯ এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে অনবগত ও অপ্রস্তুত হয়ে ধরা দিয়েছে। কোভিড-১৯ বৈশ্বিকভাবে যেমন বিশ্বের কিছু নামকরা স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় তেমন পিপিই, মাস্ক, অক্সিজেন সরবরাহ, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারী এবং স্বাস্থ্য সেবা বেড ও মৌলিক সরবরাহের মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধার প্রাপ্যতায় প্রস্তুতির ঘাটতি দেখা গেছে। এটি আংশিকভাবে নিম্ন সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয়ের ফলাফল। কিন্তু এর ফলে পরিকল্পনা, প্রবিধান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রতি জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা প্রতিফলিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা শুধু স্বল্প ব্যয়ে সাধারণ সরল ব্যাকটেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগগুলো মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত। কোভিড-১৯ এর মতো জটিল মহামারী নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন বিপুল অর্থ, শক্ত পরিকল্পনা এবং দ্রুত সাড়া দেয়ার সক্ষমতা। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করাই হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সবচেয়ে বড় উন্নয়ন।

১.৭.২ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো ২০২০ অর্থ-বছরের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা অর্জন। এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত দুটো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হলো (১) ১০০% বয়স্ক (১৫ বছরের ওপর) স্বাক্ষরতা অর্জন এবং (২) ১০০% নীট প্রাথমিক ভর্তির হার অর্জন। অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি-বৃদ্ধি, সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষার সমতা বৃদ্ধি; সম্মিলিত দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রম শক্তি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নতি বিধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা বিস্তার।

বাংলাদেশ বয়স্ক স্বাক্ষরতা হার বৃদ্ধিতে অগ্রগতি লাভ করে চলেছে। অর্থবছর ২০১০ এর ৫৬% থেকে বেড়ে অর্থবছর ২০১৮-তে এ হার ৭৩.৯%-এ উন্নীত হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়ের স্বাক্ষরতা হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারী পুরুষের স্বাক্ষরতার মধ্যে পার্থক্য কমে এসেছে। বর্তমান ধারায় যাই হোক, অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে ১০০% বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার অর্জিত হবে বলে ধারণা হয় না। বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ের ভর্তির ক্ষেত্রে ভালো অগ্রগতি লাভ করেছে এবং জেন্ডার পার্থক্য দূর করেছে। তাই, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে অর্জিত হয়েছে। সরকারের সবার জন্য শিক্ষা (EFA) এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতা বাড়ানো। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এটা মনে হয় না যে, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে ১০০% অর্জিত হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলো মোকাবিলা করার মাধ্যমে কার্যকরিতা বাড়ানো হবে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ (টারশিয়ারি) শিক্ষার প্রসার হয়েছে। নীট মাধ্যমিক ভর্তি অর্থবছর ২০১০ এর ৪৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০১৭ এ ৬৭% এ উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে উচ্চ শিক্ষা ১১% থেকে ১৮% এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার ব্যক্তিগত যোগান, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষায় সরকারের উদার নীতির ফলে অগ্রগতি সহজ হয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার নিম্ন কাভারেজ এবং সরকারি বাজেটের আর্থিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিলে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এটি বড় নীতি সাফল্য। উচ্চ শিক্ষার আরো প্রসার ঘটাতে, ২০১৭ সালে সরকার বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা কৌশল পরিকল্পনা (২০১৭-২০৩০) গ্রহণ করে।

শ্রম প্রশিক্ষণের জন্য প্রধান কৌশল হলো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। আনুষ্ঠানিক টিভেট (TVET), এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিপ্লোমা কোর্স, এইচএসসি (কারিগরি), এসএসসি (কারিগরি) এবং এইচএসসি (বিএম) কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আনুষ্ঠানিক সনদসহ সময়-নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গ্রেডকৃত প্রশিক্ষণ। প্রকৌশল, মহাবিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় (টিএসসি), টেকনিক্যাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ভোকেশনাল শিক্ষক প্রশিক্ষণ (VTTI), ব্যবসায় ব্যস্থাপনা মহাবিদ্যালয় ও অন্যান্য টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে কোর্সগুলো চালু আছে। টিভেট এ ভর্তির হার ২০০৯ সালের ১% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১৬.১% এ উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি খাতে বিশেষ করে আইসিটি খাতে এবং বিভিন্ন ব্যবসায় দক্ষ এবং আধা দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে কাজের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে টিভেট পদ্ধতির উন্নতি বিধানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এই নীতিগুলো টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা কর্মসূচিসমূহের প্রসার, বহুমূখীকরণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে জোর দেবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির অধীন জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা গুণগতমান সংগতি রক্ষার্থে জাতীয় টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) প্রণয়ন করা হয়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো এডিবি (ADB) ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)। বেসিস, বিটিএমএ, বিজিএমইএ, এইওএসআইবি (AEOSIB) এবং অন্যান্যরা কারিগরি প্রশিক্ষণের সাথে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতা সনদ প্রদানের জন্য এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ একটি সমন্বিত টিভেট উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য টিভেট কর্মকাণ্ড উৎসাহিত করা যায়।

এসব নীতিমালার ফলে টিভেট ব্যবস্থায় অনেক গ্রাজুয়েট তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। একটা বড় সমস্যা হলো দক্ষতা ও চাকরির বাজারের মধ্যে গরমিল। ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ও উচ্চ সেবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ঘাটতির মুখোমুখী হতে হচ্ছে এবং বিদেশ থেকে এসব দক্ষ লোকদের ভাড়া করে আনতে হচ্ছে।

শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ওপর ব্যাপক জোর দেওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশ গুণগত ও পরিমাণগত অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। পরিমাণগত দিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় অভিগম্যতা ও ঝরে পড়ার বিষয়টি বড় চ্যালেঞ্জ। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থবছর ২০১৮-এ ঝরে পড়ার হার ছিল ১৮.৮%। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, অপর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং অবকাঠামো ও সক্ষমতার ঘাটতি (বাহ্যিক এবং অবকাঠামোগত উভয়ই) খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বিপুল বেসরকারি বিনিয়োগ সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষার ভর্তি ১৮% সীমাবদ্ধ রয়েছে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে গুণগতমান হলো সবচেয়ে উদ্বেগের। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় এটি খুব তীব্র। যার ফলে শিক্ষার পরবর্তী ধাপগুলোতে প্রভাব পড়ছে।

জ্ঞানভিত্তিক দক্ষতা, উদ্ভাবনমূলক ও বিশ্লেষণাত্মক সক্ষমতার বিষয়ে গুণগতমানের বিষয়টি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ ছাত্র ছাত্রীদেরকে প্রায়ই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার পর মৌলিক কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি দেখা যায়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের স্নাতকদের প্রায়ই চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়াও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কম গুরুত্ব থাকার কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কম অংশগ্রহণ এবং স্বল্পমাত্রার সক্ষমতা চাকরির বাজারে দক্ষতার ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করেছে। কর্মস্থলে প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক সময় পূরণ হয়না। এই দক্ষতা ব্যবধান ঘুচিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন সতর্ক ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

গুণগত ও পরিমাণগত চ্যালেঞ্জের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো- শিক্ষা খাতে কম বাজেট বরাদ্দ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি জিডিপির ২% এর মধ্যে উঠানামা করে। বাৎসরিক বাজেটে সরকারের বরাদ্দ বৃদ্ধির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব প্রতিবন্ধকতার কারণে এটি বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। নিম্ন বাজেট বরাদ্দ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দুর্বল গুণগত মানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁধা হিসেবে প্রায়ই বিবেচনা করা হয়। এর ফলে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশল ও নীতির সফল বাস্তবায়ন বাঁধাগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা ব্যয়ে সমতা ও জেন্ডার ব্যবধান বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে। সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে, মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্রদের মোট ভর্তির হার মাত্র ২৪%। এটি অ-দরিদ্রদের (৭৬%) চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। জেন্ডারের দৃষ্টিকোণ থেকে, যদিও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার ব্যবধান বন্ধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবে উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশে চাকরির বাজারে নারীদের কম অংশগ্রহণ (অর্থবছর ২০১৭ শ্রম শক্তি জরিপ অনুসারে ৩৬.৩%) এবং স্বল্প মজুরি, নিম্ন উৎপাদনশীল কাজে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ হলো উচ্চ শিক্ষায় নারীদের নিম্ন অংশগ্রহণ। সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড়ে নারী শিক্ষার্থী মোট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ২৬%।

১.৮ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি

১.৮.১ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

সরকার পরিবেশগত বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে একীকরণ করেছে এবং পরিবেশগত সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কৌশল চিহ্নিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি বৈশ্বিক মনোযোগ এবং বাংলাদেশের উচ্চ ঝুঁকিসমূহ সর্বোচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং এই দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে অধিক ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর বৈশ্বিক আলোচনায় বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে এবং সকল বৈশ্বিক কর্মসূচিতে স্বাক্ষর করেছে।

পরিবেশ সুরক্ষায় অনেক বছর ধরে অনেক আইন বিধি বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং প্রশমনের জন্য অনেক কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অগ্রগতি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চলমান ছিল। এই পরিকল্পনায় পানি ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। আইনগত কাঠামো ছাড়াও বাস্তবায়ন কেন্দ্রীভূত ছিল ইট ভাটা থেকে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং চামড়া শিল্প থেকে পানি দূষণ হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। জীববৈচিত্র্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ কৌশল ও পরিকল্পনায় সাম্প্রতিক সময়ে এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাসহ দেশের ব-দ্বীপ গঠনের মাধ্যমে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় এটি একটি সর্বাত্মক কৌশল। জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার গতিশীল বাস্তবায়ন একটি বড় হাতিয়ার হবে এবং টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসের সম্ভাবনার প্রভূত উন্নতি ঘটবে।

প্রশমন উদ্যোগ পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ নিম্ন কার্বন উন্নয়ন পথ অনুসরণ করে গ্রীন হাউস গ্যাসে (GHG) নির্গমণ হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রশমন বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এনডিসিতে (জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অদানসমূহ) তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ, পরিবহন এবং শিল্প খাতে ১২ মিলিয়ন মেট্রিকটন সমপরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্রাস করতে কিংবা ঐসব খাতের ৫% Business as Usual (BAU) এর নীচে নামিয়ে আনতে বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহায়তা পাওয়া সাপেক্ষে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে ঐসব খাতের আরও অতিরিক্ত ২৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন সমপরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড কিংবা বিএইউ নির্গমণ কমিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে ।

বাংলাদেশ অভিযোজন প্রচেষ্টায় অগ্রগামী রয়েছে। বাংলাদেশ অভিযোজন ক্ষমতা এবং সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ঝুঁকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) প্রণয়নের দিকে রোডম্যাপ তৈরি করেছে। জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি (NAPA) এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) এর ভিত্তিতে NAP প্রাসঙ্গিক নতুন ও বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচি এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংহতিমূলকভাবে বিশেষ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং কৌশল সকল প্রাসঙ্গিক খাতে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে যথাযথ স্থানে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন একীভূত করেছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (BCCSAP) কে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

তথাপি, বিদ্যমান পরিবেশগত আইন ও বিধি বিধানের সামগ্রিক বাস্তবায়নে একটা জটিল চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মানব সম্পদ এবং আর্থিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা প্রতিবন্ধকতার ফলে বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হয়। পানির গুণগতমান কমে যাচ্ছে, বাতাসের গুণগতমানও কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনায় দেখা যায় যে, বাতাসের গুণগত মানের দিক থেকে বিশ্বের দূষিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ। একইভাবে, বন আচ্ছাদিত এলাকা ও প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষায় বাংলাদেশে কর্মাকৃতি তুলনীয় দেশগুলোর মধ্যে নীচের দিকে রয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশগত কর্মাকৃতির সূচকে বাংলাদেশ তুলনীয় ১৮০ টি দেশের মধ্যে ৫% এর নিচে রয়েছে। এতে বুঝা যায়, বাংলাদেশের সামনে বিশাল চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

১.৮.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের একটা ভালো ট্র্যাক রেকর্ড আছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই অগ্রগতি চলমান ছিল। দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রগতি ঘটেছে। এর প্রতিফলন ঘটেছে কার্যকরী আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের মাধ্যমে। সরকারের জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-১৫ বাস্তবায়নে ২০১২ তে জাতীয় দুর্যোগ বাস্তবায়ন আইন প্রণয়ন, ২০১৫ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন এবং ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অগ্রগতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসমূহ দুর্যোগ প্রস্তুতির ত্রাণ বিতরণের ওপর জোর দেওয়া থেকে সরে এসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বড় কৌশলগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই কৌশলগত পরিবর্তনের ফলে উত্তম প্রস্তুতি, পূর্ব সতর্ক ব্যবস্থা এবং দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদান সম্ভব হয়েছে ।

বিশেষত বন্যা ও নদী ভাঙন থেকে ফসল, গৃহায়ন, সম্পত্তি ও জীবিকার চলমান ব্যপক ক্ষতি, থেকে বোঝা যায়, দুর্যোগ প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করতে চলমান অগ্রগতির পাশাপাশি পানি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে সরকারের মনোযোগ স্থানান্তর করতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বন্যা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা এবং উত্তম ব্যবস্থাপনার দিকে সরকারের কৌশলগত পরিবর্তন বাস্তবায়নে একটা বড় ভূমিকা পালন করবে।

১.৯ গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রগতি

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য এবং যথাসময়ে ফল লাভের জন্য সুশাসন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে সমস্ত সরকারি ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে এবং সুশাসনের চর্চাকে উৎসাহিত করতে ৭ম পরিকল্পনায় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রচেষ্টাসমূহ অব্যাহত রাখা হয়। পরিকল্পনায় বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদি, অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান, বিকেন্দ্রীকরণ ও জনপ্রশাসন শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থবহ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে, ২০১৮ সালে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনগুলো সময়মতো সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। শক্তিশালী সংসদীয় তদারকির মাধ্যমে সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ভারসাম্য ও রক্ষার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শক্তিশালী করা হয়েছে। অধিক অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আইন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে মানব জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইন ও শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটেছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে, পরিকল্পনা প্রক্রিয়া জাতীয় অনেকগুলো কৌশলগত দলিলের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়েছে। এসব দলিলের মধ্যে রয়েছে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (NSSS), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (বিডিপি ২১০০), জাতীয় এসডিজি কর্ম পরিকল্পনা, এলডিসি (LDC) গ্রাজুয়েশন স্টাডি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১। জাতীয় উন্নয়নে টেকসই অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে এবং জনগণের জীবিকার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ যে ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে তা এসব কৌশলগত দলিলগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এখন বাজেট প্রণয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতি বাস্তবায়ন করতে, সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার (ইনটেগ্রিটি) কৌশল (এনআইএস) অনুমোদন করেছে। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে যে সকল পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়, তা চিহ্নিত করা হয়। তাদের কর্ম পরিচালনায় শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এছাড়াও, দুর্নীতির জন্য প্রধানত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মাকৃতির দুর্বলতাই যে দায়ী তার জন্য এনআইএস দলিলে সাংবিধানিক মূলনীতি, সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন এবং বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রবর্ধনে একটি সমন্বিত কৌশল সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। সরকারি সম্পদের অপব্যয় কমাতে, সরকারি ক্রয় ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়গুলোতে এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক অফিসে অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ এবং বাহ্যিক নিরীক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। মন্ত্রণালয়গুলোতে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং মন্ত্রিপরিষদের নিকট অধিক জবাবদিহি করার লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে সরকারি ব্যবসা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আইসিটি ভিত্তিক সমাধান গ্রহণ করা। ক্রয়, লাইসেন্সিং, অনুমতি ও অন্যান্য সরকারি কর্মকাণ্ড ও সেবার জন্য সরকার ই-লেনদেনের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করছে। সেবার অধিকতর স্বচ্ছতা ও দক্ষতার জন্য ই-শাসন ব্যবস্থার উপকরণগুলো স্থানীয় সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে। শক্তিশালী প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা (PFM) সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিএফএম কর্ম পরিকল্পনা ২০১৮-২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন চলছে। পিএফএম সংস্কারের অধীন ই-চালান ব্যবস্থা ও নতুন বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থা (Ibas++) চালু করা হয়েছে; নতুন হিসাব বিএসিএস (BACS) সম্পন্ন হয়েছে এবং জাতীয় সঞ্চয় সনদ বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয়তা চালু করা হয়েছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অগ্রগতি সত্ত্বেও, এটি মনে রাখা দরকার যে, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি বিকশিত হবে এবং পরিবর্তনের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করবে। অর্থবছর ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জন এবং অর্থবছর ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জন করতে পিপি ২০৪১ এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ এমন একটা সময় পথ নির্ধারণ করবে, যাতে সে বর্তমান উচ্চ মধ্যম আয়ের ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সেগুলো অর্জন করতে পারে। ফলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ পিপি ২০৪১ এ উল্লেখিত এসব দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের দিকে একটা পদক্ষেপ হিসেবে নির্ধারিত হবে।

১.১০ অর্থবছর ২০২০ মেয়াদে কর্মাকৃতি: কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি সাড়া

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী পৃথিবীতে আতংক ছড়িয়েছে। অনেক আক্রান্ত হয়েছে এবং অনেকের দুঃখজনক প্রাণহানি ঘটেছে। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। ভাইরাসের বিস্তার রোধে তাৎক্ষণিক প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ২০২০ সালের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে বিধি নিষেধ আরোপ করে। পরবর্তীতে তা ২০২০ সালের ৩০ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তখন থেকে অর্থনীতি উন্মুক্ত রয়েছে কিন্তু সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকির ভারসাম্য রাখতে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে মহামারীর নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রভাব এখনও বিস্তৃত হচ্ছে। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে শহর এলাকায় স্থবির হয়ে পড়ে। কর রাজস্ব, রপ্তানি ও বিনিয়োগ থেকে আয় ২০২০ সালের মার্চ-জুন মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। সরকার সংক্রমণের বিস্তার হ্রাসে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং দরিদ্রদের সহায়তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার সচল করতে ১১৯৬.৪ বিলিয়ন টাকার (জিডিপির ৪.৩%) বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

১.১০.১ সরকারি নীতিতে সাড়া প্রদান

কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারীর নেতিবাচক আর্থ-সামাজিক প্রভাব কমাতে বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন করতে চারটি প্রধান কৌশলগত কর্মসূচি নিয়ে একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকার যে চারটি প্রধান কৌশল গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপ:

- ***সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:*** আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে কর্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি বাজেট থেকে বিদেশ ভ্রমণ ও বিলাসী ব্যয়ের অর্থায়ন নিরুৎসাহিত করা হবে।
- ***আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ চালু:*** ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মীদের ধরে রাখতে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে শিল্পের প্রতিযোগিতা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসায় পরিবেশ পুনরুজ্জীবিত করতে আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা হয়। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান নীতি হস্তক্ষেপ হলো এমএসএমই (MSME) সহ ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করা।
- ***সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রসার:*** দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণ, শ্রমিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণে এ কর্মসূচি চালু করা হয়। প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডগুলো হলো; ক) বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ; খ) উচ্চ ভর্তুকি মূল্য দিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি (OMS) কর্মসূচির অধীনে চাল বিক্রি (প্রতি কেজি ১০ টাকা); গ) নির্ধারিত ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর নিকট নগদ টাকা প্রদান; ঘ) সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য কবলিত ১০০ টি উপজেলার মধ্যে ভাতা পাওয়ার যোগ্য সকলকে (১০০ ভাগ) ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা (বয়স্ক ভাতা এবং বিধবা ভাতা/স্বামী পরিত্যক্তা নারীর ভাতা); এবং ঙ) গৃহহীন লোকদের গৃহ নির্মাণ ত্বরান্বিত করা।
- ***অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি:*** অর্থনীতির তারল্য বজায় রাখা, যাতে মহামারীর আর্থিক ধাক্কাটা সহ্য করা যায় এবং দৈনন্দিন ব্যবসা সাবলীলভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সিআরআর (নগদ রিজার্ভ হার) এবং রেপো হার কমিয়েছে এবং প্রয়োজন হলে এটি চলতে থাকবে। যাই হোক, এক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে, যাতে বর্ধিত অর্থনৈতিক সরবরাহের ফলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি না পায়।

বিস্তারিত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১.১৪ তে তুলে ধরা হলো। অন্যদিকে এসব কর্মসূচির আর্থিক ব্যয় সারণি ১.১৫ তে লিপিবদ্ধ করা হলো।

সারণি ১.১৪: কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ (বিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	পরিমাণ
১.	রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প শ্রমিকদের বেতন সহায়তার বিশেষ তহবিল	৫০.০
২.	আক্রান্ত শিল্প ও সেবা খাতের কার্যকরী মূলধন ঋণ	৪০০.০
৩.	এসএমই ও কটেজশিল্প কার্যকরী মূলধন ঋণ	২০০.০
৪.	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের প্রসার (ইডিএফ)	১২৭.৫
৫.	পরিবহন পূর্ববর্তী ঋণ পুনরায় অর্থায়ন স্কিম	৫০.০
৬.	ডাক্তার, নার্স ও মেডিকেল কর্মীদের বিশেষ সম্মানি	১.০
৭	স্বাস্থ্য বিমা ও জীবন বিমা	৭.৫
৮.	বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ	২৫.০
৯.	১০ টাকা কেজিতে ওমমএস (OMS)	২.৫
১০	দরিদ্র লোকদের নগদ অর্থ সরবরাহ	১২.৬
১১.	ভাতা কর্মসূচির প্রসার	৮.২
১২.	গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ	২১.৩
১৩.	অতিরিক্ত ধান ক্রয় (২.০ লাখ টন)	৮.৬
১৪.	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা	৩২.২
১৫.	কৃষিতে ভর্তুকি	৯৫.০
১৬.	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫০.০
১৭.	পেশাজীবী, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৩০.০
১৮.	চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২০.০
১৯.	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এপ্রিল-মে ২০২০ এর স্থগিত সুদ এর ওপর ভর্তুকি	২০.০
২০.	এসএমই খাতের ঋণ ঝুঁকি ভাগাভাগি করা	২০.০
২১.	রপ্তানিমুখী শিল্পের হতদরিদ্র কর্মীদের নিরাপত্তা কর্মসূচি	১৫.০
	মোট (টাকা)	১১৯৬.৪
	বিলিয়ন ইউএস ডলার	১৪.২
	জিডিপির % পর্যন্ত	৪.৩

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

সারণি ১.১৫: প্রণোদনার আর্থিক ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্যাকেজের মোট সাইজ (ইউএসএস মিল)	আর্থিক খরচ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
				অর্থবছর ২০১৯-২০	অর্থবছর ২০২০-২১
১	রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প শ্রমিকদের বেতন সহায়তার বিশেষ তহবিল	বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি)	৫৮৮.২	৫৮৮.২	-
২	আক্রান্ত শিল্প ও সেবা খাতের কার্যকরী মূলধন ঋণ (আর্থিক সম্পদ হতে সুদ ভর্তুকি)	(বিবি)	৩,৮৮২.৪	৩৯.৭	১৫৮.৮
৩	কুটির শিল্পসহ এসএমইতে কার্যাকরী মূলধন ঋণ	(বিবি)	২,৩৫২.৯	২৯.৪	১১৭.৭
৪	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (ইডিএফ) (আর্থিক সম্পদ হতে সুদ ভর্তুকি)	(বিবি)	১,৫০০.০	১০.০	৫০.০
৫	পরিবহন পরবর্তী ঋণ পুনরায় অর্থায়ন স্কিম	(বিবি)	৫৮৮.২	৫.০	২০.০
৬	ডাক্তার, নার্স ও মেডিকেল কর্মীদের বিশেষ সম্মানি	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১.৮	-	১১.৮
৭	স্বাস্থ্য বিমা ও জীবন বিমা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৮৮.২	-	৮৮.২
৮	বিনামূল্যে খাদ্য বন্টন	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৯৪.৫	২৯৪.৫	-
৯	১০ টাকা কেজিতে ওএমএস	খাদ্য মন্ত্রণালয়	২৯.৫	২৯.৫	-
১০	দরিদ্র লোকদের নগদ অর্থ সরবরাহ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৪৭.৯	১০৩.৬	৪৪.৪
১১	ভাতা কর্মসূচির প্রসার	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৯৫.৯	-	১৩০.৯
১২	গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২৫০.৬	৭৪.১	১৭৬.৫
১৩	অতিরিক্ত ধান ক্রয় (২.০ লাখ টন)	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১০১.২	-	১০১.২
১৪	কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সহায়তা	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৭৮.৮	৫০.০	৩২৮.৮
১৫	কৃষিতে ভর্তুকি	কৃষি মন্ত্রণালয়	১,১১৭.৬	-	১,১১৭.৬
১৬	কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	(বিবি)	৫৮৮.২	-	২৯.৪
১৭	পেশাজীবী, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	(বিবি)	৩৫২.৯	-	১৭.৬
১৮	চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ব্যাংক	২৩৫.৩	-	২৩৫.৩
১৯	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর এপ্রিল-মে ২০২০ এর স্থগিত সুদ ভর্তুকি	(বিবি)	২৩৫.৩	-	২৩৫.৩
২০	এসএমই খাতের ঋণ ঝুঁকি শেয়ারিং	(বিবি)	২৩৫.৩	-	৪৭.১
২১	রপ্তানিমুখী শিল্পের হতদরিদ্র কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি	শ্রম অধিদপ্তর	১৭৬.৫	-	৪৩.৩
মোট (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			১৩,২৫১.৪	১,২২৪.০	২,৯৫৩.৯

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকার আইএমএফসহ (IMF) প্রধান প্রধান উন্নয়ন অংশীদারদের এর কাছ থেকে বাজেট ও লেনদেন ভারসাম্য সহায়তার অনুরোধ করেছে। অর্থবছর ২০১৯-২০ তে এডিবি (ADB), এআইআইবি (AIIB) ও বিশ্ব ব্যাংক (WB) এর নিকট থেকে ১.০ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ বাজেট সহায়তা গ্রহণ করেছে। আইএমএফ এর নিকট থেকে ৭২২ মিলিয়ন ডলারের লেনদেন ভারসাম্য সহায়তা পেয়েছে। অর্থবছর ২০২০-২১-এ জাপান, এডিবি, ইইউ, জার্মানি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ইডিসিএফ (EDCF) থেকে আরো ২.০ বিলিয়ন বাজেট সহায়তা আশা করা যাচ্ছে।

১.১০.২ কোভিড-১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ

কোভিড-১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব এখনও বিরাজমান কারণ মহামারী মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির ওপর আঘাত করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অর্থবছর ২০২০ প্রধান অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ এর ফলাফলের সারণি ১.১৬ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং কর রাজস্ব উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদে বেকারত্বের হার ও দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হচ্ছে। যাই হোক এই বৃদ্ধি কমে যাবে যখন আয় হস্তান্তর করা হবে এবং কর্মসংস্থান পুনরায় ফিরিয়ে আনা হবে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিকে অচলাবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে; যতক্ষণ না পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ন্ত্রণযোগ্য হচ্ছে, লোকজন কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে এবং জনগণ তাদের স্বভাবিক কর্মকাণ্ড শুরু করছে যাতে পরিবহন, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, ছুটি, ট্যুরিজম, সৌন্দর্য চর্চা, শিক্ষা, ব্যক্তিগত সেবাসমূহ এসবই স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, রপ্তানি আয়ের পুনরুদ্ধার নির্ভর করবে কত দ্রুত বৈশ্বিক অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তার ওপর। দেশীয় কর্মকাণ্ড এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কোভিড-১৯ এর প্রতিকার কিংবা টিকার আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করবে। এখন সর্বোচ্চ প্রত্যাশা হলো ২০২১ সালের প্রথম দিকে বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার ঘটাবে।

সারণি ১.১৬: কোভিড-১৯ এর সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রভাব

নির্দেশক	অর্থবছর ২০ প্রকৃত ফলাফল	কোভিড পূর্ববর্তী অর্থবছর ২০২০ প্রত্যাশিত ফলাফল
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৫.২৪	৮.১৯
নামমাত্র জিডিপি (টাকা বিলিয়ন)	২৭৯৬৪	২৮৮৫৯
বেসরকারি বিনিয়োগ হার (জিডিপির %)	২৩.৬	২৪.৬
রপ্তানি (বিলিয়ন ডলার)	৩৩.৬৭	৪৫.৫
কর রাজস্ব (টাকা বিলিয়ন)	২২০৭	৩৪০১
আর্থিক ঘাটতি (জিডিপির %)	৫.৫	৫.০
মূল্যস্ফীতির হার (%)	৫.৬৫	৫.৫

উৎস: বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবি, অর্থ মন্ত্রালয় এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১.১১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য করণীয়

৭ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান, মানব উন্নয়ন ও আয় প্রবৃদ্ধির দিক থেকে উন্নয়ন অগ্রগতির সামগ্রিক ইতিবাচক রেকর্ড হতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশল সঠিক পথেই এগোচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে, ২০২১ এর অনেক আগেই বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে, এছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে দারিদ্র্য নিরসনে এমডিজি (MDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এটা প্রতীয়মান যে, দৃঢ় কর্মাকৃতির ফলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারা ঠিক রেখে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গতিপথ নির্ধারণ করা উচিত এবং কর্মাকৃতির যে-ক্ষেত্রগুলোতে ঘাটতি রয়েছে, সেগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল এমনভাবে অনুসরণ করা হবে যা অর্জনকে আরো সংহত করে এবং বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব হয়।

কোভিড-১৯ এর ফলে যেখানে কর্মাকৃতি ব্যবধান দেখা দিয়েছে সেখানে সংস্কার এর গতি বৃদ্ধির ওপর জোরদার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজস্ব কর্মাকৃতি, বেসরকারি বিনিয়োগের পরিবেশ, রপ্তানি বহুমূখীকরণ, এবং অভ্যন্তরীণ কর্মসৃজন। বাংলাদেশের কর কর্মাকৃতি অনেক দিন থেকেই ছিটকে পড়ছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কারের মাধ্যমে এটিকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। একইভাবে, রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং বহুমূখী ম্যানুফ্যাকচারিং ভিত্তির প্রসার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ছাড়া এটি সম্ভব হবে না। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের নিষ্প্রভ কর্মাকৃতি পুষিয়ে নিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। চূড়ান্তভাবে, বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের ফলে কোভিড-১৯ থেকে যে স্বল্পমেয়াদী বেকারত্ব তৈরি হয়েছে তা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরেই একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। কর্মসৃজনই হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। কোভিড-১৯ এর ক্ষতির স্বল্পমেয়াদী পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও, স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন দরকার হবে। কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে উভয় পদ্ধতিই ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এবং কর্মাকৃতি খুব দুর্বল, এখানে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হবে। এখানে বাহ্যিক সুবিধাদি ও দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মাকৃতির ব্যবধান রয়েছে। কোভিড-১৯ সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য বিমা স্কিমের সংমিশ্রণে একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য এবং দারিদ্র্যের প্রবৃদ্ধি স্থিতিস্থাপকতা এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বৃদ্ধি করতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে মন্থর অগ্রগতি এবং দরিদ্র ও অরক্ষিতদের সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত আয় স্থানান্তরে অসামর্থ্য দ্রুত মোকাবিলা করার দরকার হবে।

আশু অগ্রাধিকার সংস্কারের পাশাপাশি, ৮ম পরিকল্পনায় চারটি ক্ষেত্রে আরো গভীর পরীক্ষার দরকার হবে এবং অধিকতর কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে, যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্ভব হয়নি। এর প্রথমেই আসে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। স্থানীয় সরকার, নগর প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রচেষ্টার মূলে প্রবেশ করা যায়নি। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা এবং সেবা আরো দুর্বল হয়েছে। বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ হলো দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ। এর জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়গুলোর বাস্তবায়ন সক্ষমতা সীমিত যার ফলে পরিবহন ও সামাজিক খাতে বড় সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ও সরকারি নীতির বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তৃতীয়ত, আয় বৈষম্যের ক্ষেত্রে শক্ত নীতির ওপর জোর দেওয়া দরকার। বিশেষ করে, কর আদায় ও সরকারি ব্যয়ের সমতা বৃদ্ধি করে এমন সরকারি অর্থায়নের সংস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর সরকারি ব্যয়ের সমতার দিকটি যথেষ্ট প্রচেষ্টার দাবি রাখে। চূড়ান্তভাবে, অগ্রগতি সত্ত্বেও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কর্মসূচির প্রভাব খুব কম; কারণ এগুলোকে মূলধারার অর্থনৈতিক নীতি ব্যবস্থাপনায় সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পানি সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য পরিবেশগত ঝুঁকির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৮ম পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার (বিডিপি ২১০০) কার্যকর বাস্তবায়নে জোর দেয়া হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আরেকটি উচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হবে প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক নীতি ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার বিষয় একীকরণ। পরিশেষে, শুধু পিপি ২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য নয় এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যে ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যাপ্ত অগ্রগতি প্রয়োজন।

অধ্যায়-২

দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের কৌশলসমূহ

২.১ উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলসমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো-(১) ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; (২) ২০৩১ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং (৩) ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন। এ লক্ষ্যসমূহকে সামনে রেখেই বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং চরম দারিদ্র্য হ্রাসের হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সুনির্দিষ্ট কৌশল ও নীতিমালা চিহ্নিত করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ উল্লিখিত দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্টসমূহ অর্জনের কৌশলগত দিক-নির্দেশনা ও নীতিমালার রূপরেখাসমূহকে বাস্তবায়নযোগ্য ও পরিবীক্ষণযোগ্য করে আরো বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট কৌশল, নীতি, বিনিয়োগ কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠানিক কর্মসূচি গ্রহণ করাই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাজ, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে।

উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং পরবর্তীতে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ পাশাপাশি এও বলা হয়েছে যে, ২০৩১ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য দূর করতে হলে এ প্রবৃদ্ধিকে হতে হবে দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের মূল উপাদানগুলোকে সঠিকপথে পরিচালিত করতে বেশ সহায়ক হবে। যে সকল দেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য হারে চরম দারিদ্র্য হ্রাসে সফল হয়েছে, সে সকল দেশের অভিজ্ঞতা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক হিসেবে এ অভিজ্ঞতাসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধারণ করা হবে।

অপ্রত্যাশিত কোভিড-১৯ মহামারীর দ্রুত বিস্তার এবং মানবস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও আত্মবিশ্বাসের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণকে বেশ জটিল করে তুলেছে। এই চরম বৈশ্বিক ও জাতীয় অনিশ্চয়তার মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন বিশাল চ্যালেঞ্জের বিষয়। সকল দেশ কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং কিছু কিছু দেশ কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে বেরিয়ে আসছে ও প্রবৃদ্ধির গতি পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ এ সকল দেশের ভালো অনুশীলন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। বেশ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এটি সর্বজনীনভাবে কাম্য যে, অন্যান্য ঐতিহাসিক মহামারীর মতো কোভিড-১৯ মহামারীও টিকা আবিষ্কার বা প্রতিকার বা উভয়ের মাধ্যমেই চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণে আসবে। অধ্যায়-১ এ যেমনটি বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব হলো ২০২০ পঞ্জিকাবর্ষের মার্চ-ডিসেম্বর সময়ের জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধীর গতি। তবে এখন আশা করা হচ্ছে যে, ২০২১ পঞ্জিকাবর্ষ থেকেই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার শুরু হবে (সারণি ২.১)। একটি বিষয় এখানে বেশ লক্ষ্যণীয়, আর তা হলো-২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও ভারতের ব্যাপক মন্দা। তবে ২০২১ পঞ্জিকাবর্ষে গিয়ে তা পুনরুদ্ধার শুরু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি ২.১: আইএমএফ প্রক্ষেপিত স্বল্পমেয়াদি কোভিডকালীন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির চিত্র (%)

এলাকা/দেশ	পঞ্জিকাবর্ষ ২০১৯	পঞ্জিকাবর্ষ ২০২০	পঞ্জিকাবর্ষ ২০২১	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১
বিশ্ব	২.৯	-৪.৯	৫.৪	-১.০	০.২৫
যুক্তরাষ্ট্র	২.৩	-৮.০	৪.৫	-২.৯	-১.৭৫
ইইউ	১.৩	-১০.২	৬.০	-১.৭	-১.৪
চীন	৬.১	১.০	৮.২	৩.৬	৪.৬
ভারত	৪.২	-৪.৫	৬.০	-০.১৫	০.৭৫

উৎস: *IMF World Economic Outlook, ২৪ জুন ২০২০*

অন্যান্য মুক্ত অর্থনীতির মতো, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মূলত তিনটি প্রবৃদ্ধি চালকের মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানি, রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং এফডিআই। বর্তমান অর্থনীতিতে এফডিআই-এর ভূমিকা খুব বেশি না হলেও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর সামষ্টিক কাঠামোতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে এফডিআই-কে চিহ্নিত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগের মন্দ পারফরম্যান্সও এফডিআই-কে অধিক গুরুত্ব প্রদানের অন্যতম কারণ। বৈশ্বিক মন্দা ২০২১ অর্থ-বছরের পুরোটা সময় চলতে পারে। আর এতে করে ২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি, রেমিট্যান্স ও এফডিআই-এর প্রত্যাশিত পুনরুদ্ধার ব্যাপকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

২.২ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন পদক্ষেপ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এর প্রথমটি হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। আর তাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাজ হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর বাস্তবায়ন এমনভাবে শুরু করা, যাতে উচ্চ মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে দেশ সঠিক পথে থাকে এবং এসডিজির প্রধান প্রধান লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা ও ২০৩১ সাল নাগাদ চরম দারিদ্র্য দূর করা যায়। এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ০৬টি মূল বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা:

- মানবস্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার।
- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সপ্তম পরিকল্পনার ৭.৪% থেকে ৮% এ উন্নীতকরণ এবং ২০২৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫.৬%। দারিদ্র্যের হার ২০১৯ এর ২০.৫% থেকে কমিয়ে ২০২৫ নাগাদ ১৫.৬% এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২০১৯ এর ১০.৫% থেকে ৭.৪% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে এবং দারিদ্র্য ও ঝুঁকিগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিস্তৃত কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- একটি টেকসই উন্নয়ন পথনকশা প্রণয়ন করা, যা দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং যা অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণকে সফলভাবে ব্যবস্থাপনা করবে।
- ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের পথে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন।
- এসডিজির অভীষ্ট অর্জন এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রভাব প্রশমন।

এই ৬টি আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক কৌশল, নীতি ও কর্মসূচিসমূহে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

২.৩ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং ন্যায্যতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ:-

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, টেকসই দ্রুত জিডিপি প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যে হ্রাসে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পূর্ব এশিয়ার দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। পূর্ব এশিয়ায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত ১৯৯০ সালের ৩৩% থেকে কমে গিয়ে ২০০৪ সালে ৯.৯% এ চলে এসেছে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একই মেয়াদে চরম দারিদ্র্য ৪১% থেকে ২৯.৫% এ নেমে এসেছে। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে তিন দশক ধরে চীন ১০% এর ওপর প্রবৃদ্ধি হার বজায় রেখেছে এবং ৬০০ মিলিয়ন লোককে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়েছে। ১.৪ বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে সেই চীনে আজ মাত্র ১০ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে। অপরদিকে সাব-সাহারা আফ্রিকায় যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি সামগ্রিকভাবে অনেক কম, সেখানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত জনগণের অনুপাত কমেছে সামান্যই। ১৯৯০ সালের ৪৭% থেকে ২০০৪ সালে নেমে আসে মাত্র ৪১%-এ। বাংলাদেশের এক্ষেত্রে একইরকম ইতিবাচক অভিজ্ঞতা রয়েছে।

উন্নয়ন কমিউনিটির মধ্যে একটা বিষয়ে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর তা হলো দারিদ্র্য হ্রাস করতে হলে দারিদ্র্যের সকল দিক চিহ্নিত করা। শুধুমাত্র আয় বা ভোগের অভাবই নয়, বরং স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অভিগম্যতার অভাব, আঘাতের ঝুঁকি এবং নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাব, এর সবই দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া উচিত। দারিদ্র্যের এই বহুমাত্রিকতা এখন একটি স্বীকৃত বিষয়, যা এসডিজিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এটি বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো দ্বারা অনুমোদিত।

দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে গুরুত্বারোপ, মানব উন্নয়নে অগ্রগতি সাধন, ঝুঁকিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান এবং সকল শ্রেণির মাঝে সুযোগের সমতা বিধানের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি সাধন করছে। যদিও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল (NSSS)-এর আওতায় দারিদ্র্য ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অধীনে আনার ক্ষেত্রে গুণগতমানের উন্নতি ঘটেছে, তবুও জনগণের একটি বড় অংশ সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতির বাইরে রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঝুঁকির শিকার হচ্ছে, যা কোভিড-১৯ কালীন সময়েও পরিলক্ষিত হয়েছে। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিকট কার্যকরভাবে পৌঁছতে আরো অনেক করণীয় বাকী আছে।

২.৩.১ দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য

জিডিপি প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সে জন্য এই প্রবৃদ্ধিকে অবশ্যই দরিদ্রবান্ধব হতে হবে। আর এই দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনই বাংলাদেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। প্রবৃদ্ধিকে দরিদ্রবান্ধব হতে হলে এতে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে- ক) দরিদ্রের আয় প্রবৃদ্ধি হার অবশ্যই অ-দরিদ্রের আয় প্রবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাবে; (খ) আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চতর আয় অসমতার ফলে প্রবৃদ্ধির দারিদ্র্য প্রভাব হ্রাস পায়। আয় অসমতা হ্রাস পেলে দারিদ্র্য হ্রাসে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। দরিদ্রদের অধিক সম্পদ প্রদান করা হলে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্য হার হ্রাস পেতে থাকবে। অতএব, দারিদ্র্য হ্রাসে প্রবৃদ্ধির নিম্ন স্থিতিস্থাপকতার সাথে অসমতার সম্পর্ক রয়েছে। এটির উদ্ভব ঘটে তখন, যখন সুযোগের অসমতা সমাজের মাঝে প্রোথিত থাকে যাতে দরিদ্রদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বাজার বৈষম্যের শিকার হয়। অসমতার কারণে শুধু যে দরিদ্র ব্যক্তিরা কষ্ট ভোগ করে তা নয়, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতেও সমস্যা দেখা দেয়। কেননা কর্মজীবী দরিদ্ররা তখন উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হয় না। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো জেন্ডার অসমতা আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক জায়গায় নারীরা পুরুষের চেয়ে কম শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। তাদের বেশির ভাগকেই শিশুর যত্ন নিতে হয় এবং প্রায়ই শ্রমবাজারে তারা বাধাঁ বিপত্তির সম্মুখীন হয়। একইভাবে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে বেশ বড় ব্যবধান রয়েছে, এতে করে গ্রামীণ জনগণ নানা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

২.৩.২ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির তাৎপর্য

গত দুই দশকে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ধারণাটি যে কোন প্রবৃদ্ধি কৌশলের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই ধারণাটি দেশের কাঠামোগত রূপান্তরের বিশ্লেষণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে, কারণ এটি ছাড়া কোন দেশই তাৎপর্যপূর্ণ আয় প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম হয়নি। আরো বলা যায় যে, উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্য হ্রাস করতে প্রবৃদ্ধির ধারা দ্রুত হওয়া উচিত এবং এ ধারাতে সকল খাত ও শ্রম শক্তির সকল অংশকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। মূল দৃষ্টি থাকবে প্রবৃদ্ধির ধরণ বা প্রকৃতির ওপর, যাতে এ প্রবৃদ্ধি কর্মসৃজন বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কষাখাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে।

২.৩.৩ ন্যায্যতা

ন্যায্যতা বিষয়টি অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিষয়ে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক বিতর্কে বেশ জোরালোভাবে উঠে এসেছে। এর কারণ হলো আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার উন্নত মান নিশ্চিত করতে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের বড় বড় পদক্ষেপ সত্ত্বেও অন্তঃ ও আন্তঃ দেশীয় অসমতা কমেনি। বরং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে অসমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে দ্রুত প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অসমতা কমাতে পারেনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সমতার এই বৈশ্বিক বিষয়টির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। গত দুই দশকে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও লক্ষ্য করা যায় যে, অসমতা বেশ উচ্চ রয়েছে এবং ধীরে ধীরে আরো উচ্চতর হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে যেখানে আয় জিনি সহগ (আয় অসমতা পরিমাপের

একটা মানসম্মত পদ্ধতি) ১৯৯১-৯২ সালে ০.৩৮৮ ছিল, তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে ০.৪৫১ এ, ২০১০ সালে ০.৪৫৮-এ এবং ২০১৬ সালে ০.৪৮৩ এ পৌঁছেছে। আয় অসমতার একটি বিকল্প পরিমাপ পদ্ধতি, পালমা অনুপাতেও একই ফলাফল দেখা যাচ্ছে। আয়স্তরের উপরের ১০% এবং নিচের ৪০% জনগণের আয় শেয়ারের অনুপাতকে সাধারণত পালমা অনুপাত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ পালমা অনুপাত ১৯৮৫ সালের ১.৭৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ২.৬২ তে এবং ২০১৬ সালে ২.৯৩ তে পৌঁছেছে। স্পষ্টত এটি নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় অসমতাও বেড়ে চলেছে।

দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষণ শুরু করার আগে বাদবাকী জনগোষ্ঠীর তুলনায় দরিদ্রদের আয়ের পরিবর্তন পর্যালোচনা করা উচিত হবে। আর এর জন্য একটি অতি সাধারণ পদ্ধতি হলো নিচের ৪০% জনগোষ্ঠীর গড় আয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১৮ সালের ‘Poverty and Shared Prosperity’ নামক প্রতিবেদনে নিচের ৪০% জনগোষ্ঠীর আয় কীভাবে গড় জনগণের আয়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়, তা দেখানো হয়েছে। সারণি ২.২ এ নির্বাচিত দেশগুলোর আয় বৃদ্ধির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ২.২: নিচের ৪০% আয় বৃদ্ধি বনাম গড় জনসংখ্যার আয়

	আয় প্রবৃদ্ধি (২০১০-১৫)	
	নিচের ৪০%	গড় জনসংখ্যা
নিচের ৪০%, গড়ের চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে		
চীন	৯.১%	৭.৪%
ভিয়েতনাম	৫.২%	৩.৮%
মালয়েশিয়া	৮.৩%	৬.০%
থাইল্যান্ড	৫%	৩%
ব্রাজিল	৩.৮%	২.২%
মিশর	২.৬%	০.৮%
নিচের ৪০%, গড়ের চেয়ে কম বৃদ্ধি পাচ্ছে		
বাংলাদেশ	১.৪%	১.৫%
শ্রীলংকা	৪.৮%	৫.৩%
পাকিস্তান	২.৭%	৪.৩%
ইন্দোনেশিয়া	৪.৮%	৪.৮%
যুক্তরাষ্ট্র	১.৩%	১.৭%
নিচের ৪০%, এর ক্রমহ্রাসমান আয় শেয়ার		
উগান্ডা	-২.১৫	-০.৯৬
জাম্বিয়া	-০.৫৯	২.৯৩
গ্রীস	-৮.৩৫	-৬.৯৮
স্পেন	-২.১৬	-১.৫৩
দক্ষিণ আফ্রিকা	-১.৩৪	-১.২৩

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক (Poverty and Shared Prosperity’ 2018)

চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ও থাইল্যান্ডের মতো পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের সফলতার গল্প উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে নিচের ৪০% লোকের আয়, গড় জনগোষ্ঠীর আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সকল দেশে নিচের ৪০% জনগোষ্ঠীর আয় গড় জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রায় সমান বৃদ্ধি পাচ্ছে (১.৪% বনাম ১.৫%), তাদের মধ্যে বাংলাদেশ পড়েছে। এটি এখনও উন্নয়নশীল কিছু কিছু দেশের চেয়ে ভালো (যেমন-দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া), যেখানে নিচের ৪০% এর আয় গড় জনগণের আয়ের চেয়ে দ্রুততর গতিতে কমে যাচ্ছে। অসমতা ও দারিদ্র্য উভয় দেশেই অবশ্যই আরো খারাপ হচ্ছে। তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলগুলোর চেয়ে প্রথম দলের দেশগুলোতে প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক, পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, বাংলাদেশকে দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে অসমতা হ্রাসেও নজর দিতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে, নিচের ৪০% জনগোষ্ঠীর গড় আয় গড় জনগোষ্ঠীর আয়ের চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি নিশ্চিত করার মাধ্যমে আয় অসমতার বৃদ্ধিতে লাগাম টানা।

২.৪ দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রগতি:

প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ গত তিন দশকে, বিশেষ করে বর্তমান শতকের শুরু থেকে দারিদ্র্য হার হ্রাসে বেশ সফল হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়েছে বেশ ধীরগতিতে। দারিদ্র্য হার ১৯৯১/৯২ এর ৫৬.৭ শতাংশ থেকে ২০০০ সালে নেমে আসে ৪৮.৯ শতাংশে। পরের দশকে প্রবৃদ্ধি হার ও দারিদ্র্য হ্রাসের হার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এ সময়ে জাতীয় দারিদ্র্য ১৯৯০ এর দশকের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে হ্রাস পেয়ে ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে। এরপর এটি আরো হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.২ শতাংশে পৌঁছায়। ২০২০ সালের মধ্যে ২০% এর নিচে নেমে আসবে বলে আশা করা হয়, যদিও দারিদ্র্য হ্রাসের হার গত দশকে কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে (সারণি ২.৩)। যেখানে ২০০০ দশকে দারিদ্র্য প্রতিবছর ১.৭ শতাংশ পয়েন্ট করে হ্রাস পেয়েছে, সেখানে পরবর্তী ৬ বছরে দারিদ্র্য হ্রাসের হার প্রতিবছর ১.২ শতাংশ পয়েন্টে নেমে এসেছে। অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে কোভিড ১৯ সংকটের পূর্বে প্রায় ৩৩ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে বলে ধারণা করা হয়।

সারণি ২.৩: দারিদ্র্যের ধারা: ১৯৯১-৯২ থেকে ২০০৬

(মাথা গুণতি অনুপাত; শতকরা)

	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
সামগ্রিক দারিদ্র্য						
জাতীয়	৫৬.৭	৫০.১	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.২
নগর	৪২.৮	২৭.৮	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৮.৬
গ্রামীণ	৫৮.৮	৫৪.৫	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৪
চরম দারিদ্র্য						
জাতীয়	৪১.১	৩৫.২	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৮
নগর	২৪.০	১৩.৭	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭	৭.৪
গ্রামীণ	৪৩.৮	৩৯.৫	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১	১৪.৮

উৎস: বিবিএস, খানা আয় ব্যয় জরিপ (HIES), ২০১০, ২০১৬

চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯০ এর দশকে আপেক্ষিকভাবে ধীর গতিতে হ্রাস হওয়ার পর ২০০০ এর দশকে বেশ দ্রুতগতিতে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পায়। এ সময়ে চরম দারিদ্র্য অর্ধেকে নেমে এসে ২০০০ সালের ৩৪.৩ থেকে ২০১০ সালে ১৭.৬ শতাংশে পৌঁছায়। এরপর থেকে চরম দারিদ্র্য হ্রাসের হার কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়ে এবং ২০১৬ সালে চরম দারিদ্র্য ১২.৯% এ এসে দাঁড়ায়। অর্থবছর ২০২০ এর মধ্যে এ হার ১০% এর নীচে চলে আসবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়।

গবেষণায় দেখা যায় যে, অসমতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। এমনকি যখন প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পায়, তখনো দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমে যেতে পারে। যদি বণ্টন আরও অসম হয়ে উঠে। নিচে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশের আয় অসমতা বৃদ্ধির ধারায় রয়েছে। তাই অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

২.৫ প্রবৃদ্ধি অসমতা যোগসূত্র

সাইমন কুজনেৎস এর মতে, প্রবৃদ্ধি ও অসমতার মাঝে সম্পর্ক অনেকটা "ইনভার্টেড ইউ" আকৃতির। এখানে প্রথমে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে অসমতা বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে দেশ ধনী হতে শুরু করলে অসমতা হ্রাস পেতে থাকে। উন্নয়নের এই নিয়ম ব্যাখ্যা করতে এবং এর প্রায়োগিক বৈধতা পরীক্ষা করতে সেই থেকে অনেক কাজ হয়েছে। এ থেকে মোটামুটি একটা উপসংহারে আসা যায় যে, প্রবৃদ্ধি ও আয় অসমতার মধ্যে পদ্ধতিগত কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রবৃদ্ধির সাথে অসমতা বৃদ্ধি পাওয়ার যেমন অসংখ্য নজির আছে, তেমনি প্রবৃদ্ধির সাথে অসমতা হ্রাস পাওয়ারও অসংখ্য নজির রয়েছে। পূর্ব এশীয় অলৌকিক (মিরাক্কেল) অর্থনীতি বিষয়ে অসংখ্য গবেষণায় দেখা যায় যে, কীভাবে নীতিসমূহ ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে সমতার সাথে প্রবৃদ্ধিকে যুক্তকরণে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বৃহত্তর শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক নীতিসমূহে। পাশাপাশি পুণর্বন্টন নীতিসমূহেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, যা বৃহত্তর মানব পুঁজি বিনির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপীয় অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কীভাবে উচ্চ মাথাপিছু আয় এবং নিম্ন আয় অসমতা পুনর্বণ্টনমূলক আর্থিক নীতিসমূহের সাথে সহাবস্থান করে। তথাপি এটিও লক্ষ্য করা যায় যে, এশিয়ার যে সকল দেশে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যে সকল দেশে অসমতা প্রকৃতপক্ষে আরো বেড়েছে। উদাহরণ হলো চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও বাংলাদেশ।

অসমতা বৃদ্ধির পেছনের কারণসমূহ অনুসন্ধান করতে হলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত জিনি সহগ পদ্ধতি থেকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসমতাকে দেখা উচিত। এটা দীর্ঘদিন থেকে সুবিদিত যে, জিনি সহগের অন্যতম সীমাবদ্ধতা হল, এটি নিচের চেয়ে বণ্টনের মাঝামাঝিতে অধিক গুরুত্ব দেয়। যদি বণ্টনের মধ্যম অংশটি লেজেরটির মতো একইরকমভাবে আচরণ করে, তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন বণ্টনের মধ্যে তুলনা করা সমস্যাদায়ক হয়না। অর্থাৎ উচ্চতর ও নিম্নতর লেজের মধ্যে ফারাক এবং বণ্টনের মধ্যমটির ফারাক একইরকম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, জিনি সহগের ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটিই অন্যতম কারণ ।

কিন্তু গ্যাব্রিয়েল পালমা'র সাম্প্রতিক লেখাতে এই অনুমানের ব্যবহারিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্বের অনেক দেশের আয় বণ্টনের ওপর একটা বড় ধরণের গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে, বণ্টনের মধ্যম অংশটি লেজের মতো সাধারণত একইরকমভাবে আচরণ করে না। প্রকৃতপক্ষে তার গবেষণা থেকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি তথা পঞ্চম থেকে নবম পর্যন্ত ৫ ডেসাইল এর অধিভুক্ত ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ সময় অধিকাংশ দেশের জাতীয় আয়ের আনুমানিক ৫০ শতাংশ শেয়ার দখল করে থাকে। নিচের ৪০ শতাংশ জনগণ এবং উপরের ১০ শতাংশ জনগণের মধ্যে জাতীয় আয়ের বাদবাকী ৫০% পরিবর্তিত হারে বণ্টন হয়। এই উপরের ১০% লোকই সামগ্রিক আয় বণ্টনের পরিবর্তনকে চালিত করে। এভাবে যখন আয়বণ্টন খারাপের দিকে যায়, তার অর্থ হলো উপরের ১০ শতাংশের শেয়ার বাড়তে থাকে এবং নিচের ৪০ শতাংশের শেয়ার কমতে থাকে। অন্যদিকে মধ্যবর্তী ৫০ শতাংশ কমবেশি তাদের শেয়ার ধরে রাখে। এভাবে আয় বণ্টনের পরিবর্তনশীল ধরণ, জাতীয় আয়ের অর্ধেক অংশ শেয়ার করার জন্য বণ্টনের দুটো লেজের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে।

এই তথ্যের একটি পরিষ্কার দিক রয়েছে, তা হলো নিখুঁতভাবে আয় অসমতার মাত্রা পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি। জিনি সহগের ন্যায় সামগ্রিক বণ্টনের পরিমাপ খুঁজে লাভ নেই। কারণ বণ্টনের মধ্য অংশের কোনভাবে বেশি পরিবর্তিত হয় না, বরং সরলভাবে বণ্টনের দুটো লেজের মধ্যে ফারাকের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। মূলত ঐখানেই পরিবর্তনগুলো ঘটে।

সারণি ২.৪: আয় অসমতার বিকল্প পরিমাপ: পালমা অনুপাত

	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০৫	২০১৬
নিচের ৪০% এর আয় শেয়ার	২৯.২৩	১৫.৫৪	১৪.৩৬	১৩.০১
মধ্যম ৫০ % এর আয় শেয়ার	৫৩.৩৬	৪৯.৭৮	৪৮.০০	৪৮.৮৩
উপরের ১০% এর আয় শেয়ার	১৭.৪১	৩৪.৬৮	৩৭.৬৪	৩৮.১৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পালমা অনুপাত	১.৬৮	২.২৩	২.৬২	২.৯৩

উৎস: বিভিন্ন বছরে খানা আয় ব্যয় জরিপ প্রতিবেদনে প্রদত্ত আয় বণ্টন বিষয়ক তথ্য থেকে গণনা করা

১৯৯১-৯২ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে পালমা অনুপাত ধারাটি ২.৪ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। মধ্যম ৫০ শতাংশ জনগণের শেয়ার জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে, যা পালমা হাইপোথিসিসের সাথেও সংঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু উপরের ও নিচের মধ্যেকার ফাঁরাক বেড়ে গেছে। পালমা অনুপাত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১-৯২ সালের ১.৬৮ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালে ২.২৩ এ, ২০০৫ সালে ২.৬২ এবং ২০১৬ সালে ২.৯৩ এ উন্নীত হয়। এ থেকে বর্ধিষ্ণুভাবে অসম সমাজের একটা দীর্ঘমেয়াদি ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজেদের শেয়ার ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে, তখন সেখানে নিচের ৪০ শতাংশ জনগণ ক্রমাগত উপরের ১০ শতাংশের কাছে নিজেদের শেয়ার হারাচ্ছে। তাতে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো, গত দশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি কি অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল? যদি না হয়, তাহলে কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয়বণ্টনে সমতা নিশ্চিত করা যাবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা স্পষ্ট করা হয়েছে।

২.৬ প্রবৃদ্ধি ও বণ্টনঃ বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা

জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়তে শুরু করে মূলত ১৯৯০ এর দশক থেকে, যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে এবং বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধির পথে নিয়ে গেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় ১৯৯০ এর দশকের প্রায় ৪.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ এর দশকে ৫.৮ শতাংশে এবং ২০১০ দশকে ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (সারণি ২.৫)। প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে চলমান ক্রমহ্রাসমান হারের কারণে মাথাপিছু আয় বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে মাথাপিছু আয় প্রতিবছর ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী দুই দশকের প্রবৃদ্ধি হারের প্রায় দ্বিগুণ। ২০০০ এর দশকে এটি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রতিবছর ৪.৪ শতাংশ হারে। এই অর্জন ঐ সময়ের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কিছু দেশের ন্যায় অতটা শক্তিশালী না হলেও সামগ্রিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বেশ আকর্ষণীয় ছিল।

সারণি ২.৫: দশকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হার: ১৯৯০ দশক থেকে ২০১৯ পর্যন্ত (মাথাপিছু শতকরা হার)

	১৯৮০-৮৯	১৯৯০-৯৯	২০০০-০৯	২০১০-১৯
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৩.৭২	৪.৮০	৫.৮২	৭.০০
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.০১	১.৭০	১.৩২	১.১০
মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	১.৬৮	৩.০৫	৪.৪৪	৫.৯০

উৎস: বিবিএস

দ্রুত প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য কমাতে সহায়তা করলেও আয় অসমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জিনি সহগ অনুযায়ী, আয় অসমতার মাত্রা ১৯৮০ এর দশকের গড় ০.৩৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ এর দশকে ০.৪৪-এ এবং ২০০০ এর দশকে ০.৪৬ এ পৌঁছেছে (সারণি ২.৬)। প্রবৃদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে আয় অসমতাও যে বাড়ছে, সারণি ২.৪ এ প্রদত্ত পালমা অনুপাতও তা নির্দেশ করছে। এভাবে যখন বাংলাদেশে গড় জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ধনী ও গরীবের মধ্যে পার্থক্যও বাড়ছে।

সারণি ২.৬: আয় জিনি সহগের দশকভিত্তিক গড়: ১৯৮০ এর দশক থেকে ২০০০ এর দশক (শতকরা)

	১৯৮০ এর দশক	১৯৯০ এর দশক	২০০০ এর দশক
জাতীয়	০.৩৭৭	০.৪৪২	০.৪৬৩
গ্রামীণ	০.৩৬১	০.৩৮৯	০.৪৩০
নগর	০.৩৮০	০.৪৭১	০.৪৭৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,খানা আয়-ব্যয় জরিপ (বিভিন্ন বছর)

বর্ধনশীল অসমতা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্য হ্রাসে যদিও প্রবৃদ্ধির হার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তথাপি আয়বণ্টন যথেষ্ট খারাপ হওয়ায় অন্ততপক্ষে দুটি কারণে এটি উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে: ক) এটি নির্দেশ করে যে, প্রবৃদ্ধির ফলাফলসমূহ সমানভাবে বণ্টন হচ্ছে না অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং খ) উচ্চতর অসমতা দারিদ্র্য হ্রাসের হার বৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা কমিয়ে দিয়েছে।

২.৭ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের উদ্যোগসমূহ থেকে শিক্ষা

৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রবৃদ্ধির নীতি ও কৌশল প্রণয়নে যে সকল দেশ নিম্নতর আয় অসমতা নিয়ে উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করেছে তাদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বৈশ্বিক গবেষণায় ৬টি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অসমতা হ্রাসে কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়েছে।

১. শৈশব উন্নয়ন ও পুষ্টি কর্মকাণ্ড
২. সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা
৩. গুণগত শিক্ষায় সর্বজনীন অভিগম্যতা
৪. দরিদ্র পরিবারগুলোতে নগদ অর্থ সরবরাহ
৫. পল্লী অবকাঠামো, বিশেষ করে রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতায়ন
৬. অগ্রগতিমূলক কর আরোপ।

নিম্ন আয় অসমতা ঠিক রেখে উচ্চ মাথাপিছু আয়ের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতায়, যেখানে একটা শক্তিশালী পূর্ণবণ্টনমূলক অর্থনৈতিক নীতি রয়েছে। এই নীতির ফলে ব্যক্তিগত আয় করের অগ্রগতিমূলক ব্যবস্থা থেকে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং একটি বর্ধনশীল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের নিকট আয় সরবরাহ করার জন্য ঐ রাজস্ব ব্যবহার করা হয়। এই দেশগুলো সবার জন্য সর্বজনীন সেবা এবং বিনামূল্যে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান করে। বৃহৎ পুর্ণবন্টনমূলক অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়ন ছাড়াও সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহ দরিদ্রদের সুবিধা প্রদানে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমন্বিত সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে নির্বাচিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর গৃহীত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কয়েকটি উদাহারণ ২.১ নং বক্সে তুলে ধরা হলো।

বক্স ২.১: দরিদ্রবান্ধব সুনির্দিষ্ট কিছু নীতির উদাহরণ

- ২০১৫ সাল থেকে ইথিওপিয়ার সব জনগণ মৌলিক সামাজিক সেবা থেকে লাভবান হচ্ছে। এটি ব্লক অনুদানের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা ও জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও পল্লীর রাস্তাঘাট, পানি ও স্যানিটেশানের মতো মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান করছে। এর সহায়তায় সেবাসমূহে অভিগম্যতা নিশ্চিত করে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে এবং মৌলিক সেবায় আকর্ষণীয় অর্জনে অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে।
- মিশরের সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে মিশরীয়দের জন্য সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়ন এবং সরকারি সেবার উন্নতির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। "ইজিপ্ট টেক অফ" নামক নতুন কর্মসূচিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি নাগরিকদের সেবা সরবরাহ এবং স্থানীয় উন্নয়নকে পরিচালনা করতে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে চিলি অসম অভিগম্যতার-চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। ফলে প্রায় ৪৯০০০ ছাত্রছাত্রী তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৃত্তি পেয়েছে। সরকারি অনুদান পাওয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সবচেয়ে নিম্ন গ্রেডও একটি কেন্দ্রীভূত নিয়মিত ভর্তি পদ্ধতি চালু করেছে যেখানে আবেদনকারীদের ৭৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছে।
- মালয়েশিয়াতে ২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত নিচের ৪০ শতাংশের দ্রুত আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছে মূলত তাদের প্রকৃত মজুরি এবং সামগ্রিক আয় বৃদ্ধির কারণে। এদের আয়বৃদ্ধি হয়েছে বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে। ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো পাশ হওয়া নূন্যতম মজুরি আইনের সময়কাল শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির সাথে মিলে গেছে। অংশত, নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্যকে দূর করার লক্ষ্যে। অন্যান্য দেশ, যেমন; ব্রাজিলেও নূন্যতম মজুরির বৃদ্ধি, অসমতা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে সহায়ক নীতিসমূহ।
- প্রায় সকল শীর্ষ এশীয় অর্থনীতি যথা হংকং, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান (চীন) এবং থাইল্যান্ড শেয়ারকৃত প্রবৃদ্ধি কৌশলভিত্তিক অনেক নীতি বাস্তবায়ন করেছে। অভিজাত শ্রেণি উচ্চ সঞ্চয় এবং উচ্চতর বিনিয়োগে নজর দেয় এবং অ-অভিজাত শ্রেণি নজর দেয় প্রাথমিক শিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্য এবং ভূমি সংস্কারের দিকে, যাতে করে আরো অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক জীবাশ্ম জ্বালানি ভর্তুকি বিলোপ, দরিদ্রতম জনগণকে সহায়তার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সামাজিক কল্যাণ নীতিমালা চালু এবং একটি সবুজ জ্বালানি নীতি প্রণয়নে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে।
- রুয়াণ্ডা ইকোট্যুরিজম রাজস্ব শেয়ারিং মডেলের উন্নতি বিধান করেছে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রণোদনা হিসেবে স্থানীয় জনগণের নিকট এ রাজস্ব পৌঁছে দিচ্ছে।
- দক্ষিণ আফ্রিকার ১২টি ওর্য়াকিং ফর ফরেস্টস ইকোসিস্টেম, কোস্টস কর্মসূচি পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিত নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছে।
- ফিলিপাইনের জাতীয় সবুজায়ন কর্মসূচি দেখিয়েছে যে, টেকসই বনায়নে ৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ, প্রান্তিক ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিরাপদ জীবিকা সরবরাহের পাশাপাশি কার্যকর বন সংরক্ষণও নিশ্চিত করতে পারে।

২.৮ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল ও নীতিসমূহ

২.৮.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য কোভিড ১৯ পূর্ব প্রবৃদ্ধি ২.৮ সারণিতে দেখানো হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১৯ অর্থ-বছরের ৮.১৩ শতাংশ থেকে ২০২০ অর্থবছরে ৮.১৯ শতাংশে এবং ২০২৫ অর্থবছরে ৮.৫১ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কোভিড ১৯ আসার ফলে এই প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির পথ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। যাইহোক অধিকাংশ ক্ষতি ২০২০ অর্থবছরে হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল মে মাসে দেশে চালিত বিধিনিষেধের কারণে এবং তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক ধ্বসের কারণে ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রাক্কলন ৫.২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ২০২১ অর্থ-বছরের ১ম ছয় মাসের তথ্যে দেখা যায় যে, পুনরুদ্ধার ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। রপ্তানি বেশ ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কৃষিখাত ভালো করেছে এবং বিদেশি রেমিট্যান্স আয় বেড়েছে। সরকারের উদ্দীপনা প্যাকেজ এই পুনরুদ্ধারে বেশ সহায়তা করছে এবং সরকার এখন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির গতি পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। সরকার কোভিড ১৯ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবে এবং প্রথম ছয় মাসের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারে সুরক্ষা দিতে অবিরাম সহায়তা দিতে থাকবে। অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে এবং প্রবৃদ্ধির ধারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে (যেমন সারণি ২.৭ এ দেখানো হয়েছে) প্রয়োজনে আরো নীতি গ্রহণ করা হবে।

সারণি ২.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ

	অর্থবছর ২০ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩	অথবছর ২৪	অর্থবছর ২৫
কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী জিডিপি প্রবৃদ্ধি(পিপি ২০৪১ অনুসারে	৮.১৯	৮.২৩	৮.২৯	৮.৩২	৮.৩৭	৮.৫১
কোভিড-১৯ পরবর্তী জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১.৩৯	১.৩৪	১.২৪	১.২২	১.১৯	১.১৮
মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৩.৮৫	৬.০৬	৬.৪৬	৬.৭৮	৭.১৩	৭.৩৩

উৎস: বিবিএস এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

২.৮.২ কোভিড ১৯ পরবর্তী জিডিপি প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের কৌশল

কোভিড ১৯ মহামারিসৃষ্ট সমস্যাসমূহ দ্রুত ও সর্বাত্মকভাবে মোকাবেলা করতে সরকার বদ্ধপরিকর। জান মালের ক্ষতি কমানো, আক্রান্তদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, ভয় দূর করে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০২০ অর্থবছরে গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়ন ছাড়াও সরকার অসংখ্য সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার উন্নতি ঘটে। স্বাস্থ্যসেবাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি করা হবে, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করা হবে, জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সুবিধার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্মোচন পর্যায়ক্রমে এবং এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে কোভিড ছড়ানোর ঝুঁকি কমে আসে। অন্যান্য দেশ কোভিড ১৯ মোকাবেলায় যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, বাংলাদেশ তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজে লাগবে। এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যে সব দেশ টিকা কিংবা প্রতিষেধক আবিস্কারে এগিয়ে রয়েছে, তাদের সাথে লিয়াজো করবে। টিকা বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য সরকার সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কোভিড ১৯ প্রতিকারের গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা অনুদানের মাধ্যমে সরকার দেশীয় ফার্মা ও মেডিকেল গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিষয়ে দৃঢ় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে, যাতে ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন মাসে ঘোষিত প্রণোদনা ও ত্রাণ প্যাকেজ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যায়। এনএসএস-এর অধিক দ্রুত বাস্তবায়ন এবং দারিদ্র্যকেন্দ্রিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সরবরাহ কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। কর্মসংস্থান সুরক্ষা এবং মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মনযোগ দেয়া হবে। বর্তমানে এ শিল্পে প্রায় ২৮ মিলিয়ন লোক জড়িত আছে। ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করেই অতিদ্রুত এটি সম্পন্ন করা হবে। কীভাবে এটি নমনীয় ও স্বল্প খরচে করা যায় সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যক ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কাজ করবে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে পৌঁছাতে সকল প্রতিষ্ঠানিক কিংবা রেগুলেটরি বাঁধাসমূহ দূর করা হবে।

২.৮.৩ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ সমূহ

দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খাতের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে-কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি, শ্রম উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি। দরিদ্রদের জন্য আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে প্রবৃদ্ধির অবদান যে প্রাথমিক চ্যানেলের মাধ্যমে হয়, তা হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম উপকরণ হিসেবে বিবেচিত।

প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হলে কয়েকটি বিষয় প্রয়োজন, যথা; কর্মের সুযোগ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সেবাসমূহে অভিগম্যতা, এবং পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির মাধ্যমে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের আয় সরবরাহ করা। দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হলো আয় বৃদ্ধির সক্ষমতার অভাব। প্রবৃদ্ধির ফলে বর্ধিত শ্রম চাহিদা তৈরি হয় এবং দরিদ্রদেরই কেবলমাত্র শ্রম বিক্রি করার মতো শ্রম আছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে আয়ের শ্রম শেয়ারও বৃদ্ধি পায়। ফলে পর্যায়ক্রমে প্রবৃদ্ধিও পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে একটি শুদ্ধ চক্র তৈরি হয়। কিন্তু কর্মসংস্থান শুধুমাত্র কর্মসৃজনের পরিমাণে সীমাবদ্ধ নয় বরং এক্ষেত্রে চাকরির গুণগত মানও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমন অনেক বাস্তব নজির আছে যে, যখন আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, তখন অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরির পরিমাণ বৃদ্ধিও ঘটে। যা মূলত স্বল্প বেতনের এবং অনিরাপত্তামূলক হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক খাতে। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অধিকাংশ ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক খাতে চাকরি পেতে চায়, কিন্তু শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবের কারণে তারা ব্যর্থ হয়।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ এবং কৃষি থেকে উৎপাদন কাঠামো শিল্প ও সেবায় সরিয়ে নিতে এ পর্যন্ত সরকারের প্রবৃদ্ধি কৌশলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই প্রবৃদ্ধি কৌশলের কারণে উৎপাদন, নির্মাণ কাজ, পেশাজীবী কাজ, পরিবহন, ব্যবসা ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতে অনেক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রথমত, কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি জিডিপি প্রবৃদ্ধির চেয়ে অনেক ধীর হওয়ার ফলে জিডিপির কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাচ্ছে (সারণি ২.৯)। দ্বিতীয়ত, ম্যানুফ্যাকচারিং ও নির্মাণ খাতে মূল্য সংযোজনে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও কর্মসংস্থান প্রকৃতপক্ষে ২০১৩ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত সময়কালে সংকুচিত হয়েছে। তৃতীয়ত, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান পুঞ্জিভূত হওয়ার ফলে শোভন কাজে ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। ৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো কীভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতিতে শোভন কাজের আরো সুযোগ সৃষ্টি করা যায় তা নিশ্চিত করা। বর্তমান সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে উৎপাদন, নির্মাণ, পরিবহন, বাণিজ্য ও পেশাগত কাজে কর্মসৃজন এখন সময়ের দাবি। এতে করে আনুষ্ঠানিক খাতে চাকরির শেয়ার বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। এসব বিবেচনা করে, প্রবৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে প্রবৃদ্ধির কর্মসংস্থান প্রভাব আবশ্যক।

সারণি ২.৮: জিডিপির কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা

কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা	২০০০-২০১০	২০১০-২০১৬/১৭	২০১৩-২০১৬/১৭	২০০০--২০১৬/১৭
মোট জিডিপি	০.৫৭	০.২৫	০.১৭	০.৪৪
কৃষি	০.৭৬	ঋণাত্মক	ঋণাত্মক	০.৩৮
ম্যানুফ্যাকচারিং	০.৮৩	০.৩৯	ঋণাত্মক	০.৬১
সেবাসমূহ	০.৪৬	০.৬৪	০.৩৬	০.৫১

উৎস : *BBS National Accounts and LFS data*

২.৮.৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসৃজনের প্রাক্কলন

কোভিড ১৯ সংকটের দোলাচলের মধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস ৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। ৭ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার ৭.৪% থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির বার্ষিক গড় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৮.০-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে যদি জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার কমে যায় কিংবা বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধায় কড়া-কড়ি থাকে, তবে দেশীয় কর্মসংস্থান পরিস্থিতিতে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২০২০ সালে কোভিড ১৯ এর কারণে সংঘটিত কর্মসংস্থানের ক্ষতি ২০২১ এবং ২০২২ অর্থবছরে পুষিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। আরো সাধারণভাবে বলতে গেলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ফিরিয়ে আনতে হলে সারণি ২.৭ এ প্রদত্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি পাশাপাশি একে দরিদ্রবান্ধব করার মাধ্যমে কর্মসৃজন বৃদ্ধি করতে জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৮ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন সব নীতি গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রবৃদ্ধির কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, যাতে শ্রম বাজারে যারা নতুন আসছে তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয় এবং যারা কোভিড ১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে চাকরি হারিয়েছে তারা যেন চাকরি ফিরে পায়। সরকারকে জনমিতিক লভ্যাংশের সম্পূর্ণ সুবিধা ভোগের দিকেও মনযোগী হতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে শ্রম নিবিড় এবং রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং চালিত প্রবৃদ্ধিকে প্রণোদিত করা, কৃষির বহুমূখীকরণ ত্বরান্বিত করা, সিএমএসএমই খাতে গতিশীলতা দান করা, আধুনিক সেবাখাতকে শক্তিশালী করা, খাত বহির্ভূত সেবাসমূহ ত্বরান্বিত করা, আইসিটি নির্ভর উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালী করা।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থানের প্রক্ষেপণ ২.৯ সারণিতে দেখানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপির কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা ০.৩০ এ উন্নীত করা, যা এমনকি ২০০০-২০১০ মেয়াদেও ০.৫৭ ছিল। এ ০.৩০ এর কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতার লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর সাথে সংগতিপূর্ণ। যদি কোভিড- ১৯ থেকে বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার ২০২২ অর্থবছরে শুরু হয়, সরকার সাথে সাথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরবরাহের দিক থেকে প্রক্ষেপণের ধারণা এই যে, শ্রম শক্তি ২.২% হারে প্রতিবছর বৃদ্ধি পাবে, যা ২০১০-১৭ সালের মধ্যে যা পরিলক্ষিত হয়েছে তার চেয়ে দ্রুততর হবে। সরকারের নারী ক্ষমতায়ন নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ বাড়তেই এ উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ২.৯: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
অতিরিক্ত দেশীয় কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	১.৪৩	১.৫২	১.৬১	১.৭২	১.৮০
অতিরিক্ত বৈদেশিক কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	০.৫৮	০.৬১	০.৬৫	০.৬৯	০.৭২
অতিরিক্ত মোট কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	২.০১	২.১৩	২.২৬	২.৪১	২.৫২
অতিরিক্ত শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	১.৪৯	১.৫৩	১.৫৬	১.৬০	১.৬৩
উদ্বৃত্ত কর্মসংস্থান (মিলিয়ন)	০.৫২	০.৬০	০.৭০	০.৮১	০.৮৯

উৎস: ৮ম পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

এসব অনুমানের মধ্যে রয়েছে দেশীয় সৃষ্ট চাকরির সংখ্যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের তুলনায় বেশি হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রক্ষেপিত বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিবেচনায় নিলে মোট উদ্বৃত্ত ৩.৫ মিলিয়ন কর্মসৃজন হবে। এতে তরুণদের বেকারত্ব হ্রাস পাবে এবং বাংলাদেশে বেকারত্বের সংখ্যা আংশিক কমে আসবে।

২.৮.৫ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলসমূহ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলের মধ্যে ৭টি প্রধান বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- শ্রম নিবিড়, রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং নির্ভর প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষি বহুমূখীকরণ
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গতিশীলতা আনয়ন
- আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালীকরণ
- খাত বহির্ভূত সেবাসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ
- আইসিটিনির্ভর উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালীকরণ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় অধিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে অনেক বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যাতে কোভিড ১৯ এর কারণে যারা বেকার হয়ে পড়েছে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করা যায়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটে তা শিল্পনির্ভর প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করে। তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নেতৃত্ব চলে গেছে। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গার্মেন্টস খাতে ৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। নন-গার্মেন্টস খাতে রপ্তানি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় রপ্তানি বহুমূখীকরণে বাঁধা তৈরি হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি শ্লথ হয়েছে। গার্মেন্টস খাতের বড় ভূমিকা পালন অব্যাহত থাকলেও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নন-গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং ও রপ্তানিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে, যাতে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়া ও পাদুকা, হালকা প্রকৌশলী ও ওষুধ শিল্পের মতো খাতে উৎপাদন ও রপ্তানী বহুমূখীকরণ হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া, পাদুকার মতো খাতগুলো গার্মেন্টেসের মতো শ্রম নিবিড় এবং বিদেশে এর ব্যাপক বাজার রয়েছে। তাই গার্মেন্টসের মতো এ খাতগুলোতে কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগ রয়েছে এবং খাতগুলো রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যসংযোজন প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণেও অবদান রাখবে। অনেক ভোগ্যপণ্য, যেগুলোর স্থানীয় বাজারে চাহিদা রয়েছে, সেগুলোর আমদানি বিকল্পের ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে। রপ্তানি বিরূপ যে বাণিজ্য নীতি রয়েছে তা সংস্কার করতে হবে। বিনিময় হার হতে হবে অধিক নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক এবং বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কারের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এফডিআই ও দেশজ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

কৃষিখাতে কৌশলটি হবে কৃষির বহুমূখীকরণ এবং উৎপাদনশীলতার, উন্নতি কাঁচামাল বা ইনপুট সরবরাহ, মূল্যনীতি সহায়তা, পানি সরবরাহ, খামার ঋণ ও বাজারজাতকরণ সহায়তার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। খামারের আয় বৃদ্ধি এবং মৎস্য, ফলমূল শাকসবজি ও গো-খামারজাত পণ্যের মত অফসলী কর্মকাণ্ডে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে কৃষি রপ্তানি উৎসাহিত করা হবে।

কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পসমূহে (সিএমএসই) পল্লী ও নগর এলাকায় কর্মসংস্থান তৈরির সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এসব উদ্যোগ সকল খামার বহির্ভূত উদ্যোগের ৯৯.৮% এবং সকল খামার বহির্ভুত কর্মসংস্থানের ৮৩% (২০১৯সালে প্রাক্কলিত ৩৪মিলিয়ন) হলো সিএমএসই খাতে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসব শিল্প উদ্যোগ প্রকৃতিগতভাবে অ-আনুষ্ঠানিক এবং এখানে গতিশীলতার অভাব রয়েছে। সিএমএসই খাত বিভিন্ন ধরণের বাঁধার সম্মুখীন হয়, যা মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প উদ্যোগ থেকে ভিন্ন। এরমধ্যে রয়েছে নিবন্ধন না থাকা ও কর সনদের অনুপস্থিতির কারণে রেগুলেটরি বাঁধাসমূহ, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে অপর্যাপ্ত অভিগম্যতা, উচ্চ সুদের হার, নিম্ন বিনিয়োগ, অপর্যাপ্ত প্রযুক্তি, দক্ষতার অভাব ও বাজার অভিগম্যতার দুর্বলতা। জাপান, তাইওয়ান ও কোরিয়ার বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় রপ্তানি, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সিএমএসই-এর শক্তিশালী ও গতিশীল ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ৮ম পরিকল্পনায় এ সকল বাঁধা দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে সিএমএসই খাতকে গতিশীল করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। বিশেষ করে- রেগুলেটরি বাঁধাসমূহ সহজ করা হবে এবং ইউএসএর মতো এসএমই ফাউন্ডেশনকে স্মল বিজনেস এজেন্সি (এসবিএ)-তে রূপান্তর করার মাধ্যমে সিএমএসই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। এটি সিএমএসইর উন্নতি বিধানে একটি 'ওয়ান স্টপ শপ' হিসেবে সেবা দিবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। আইসিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক সমাধান পেতে ঋণ আবেদন, অনুমোদন এবং পর্যবেক্ষণের স্বল্প-খরচ পদ্ধতির মাধ্যমে বানিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের অভিগম্যতা বাড়াতে হবে। ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম প্রণয়ন করতে হবে, যাতে ঋণের ঝুঁকি কমানো যায় এবং চলতি মূলধনের যোগান দেওয়া যায়।

সেবাখাতে নিম্ন উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠনিক খাত হতে উচ্চ উৎপাদনশীল আনুষ্ঠানিক সেবাখাত যেমনঃ ব্যাংকিং, অর্থ, নগর পরিবহন, আইসিটি, স্বাস্থ্য সেবা এবং ট্যুরিজম প্রভৃতিতে রূপান্তরির হওয়ায় সেবাখাতসমূহ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। এই রূপান্তর আরো বৃদ্ধি করা হবে। রেগুলেটরি সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে সহায়ক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করে এই রূপান্তর আরো জোরালো করা হবে।

প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য সেবা রপ্তানি প্রসারের ওপর জোর দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক পরিবহন সেবায় বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। তাই এই বাজারের একটা বড় শেয়ার দখলে নিতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। পর্যটন ও আইসিটি সেবায় রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক বেশি। এসব রপ্তানি বেশি মাত্রায় শ্রম নিবিড় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণদের জন্য। প্রকৃত পক্ষে আইসিটি খাত বিভিন্ন সেবা কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা দেখাতে শুরু করেছে এবং শিক্ষিত তরুণদের জন্য আরো কর্মসৃজনের অনেক সম্ভাবনা তুলে ধরছে।আইসিটি কর হ্রাস,আইসিটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রসার এবং সকল প্রকার রেগুলেটরি বাঁধা দূরীকরণের মাধ্যমে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইসিটি কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা হবে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বড় ধরণের উন্নয়ন ভূমিকা পালন করেছে কর্মসৃজন, আয় সরবরাহ ও বিনিয়োগ যোগানে। প্রবাসী আয়ের কারণে প্রত্যক্ষ আয় সরবরাহের মাধ্যমে শুধুমাত্র দারিদ্র্য কমে গেছে তাই নয়, বরং নির্মাণ, গৃহায়ন, পরিবহন, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ অনেক গ্রামীণ সেবায় সহযোগিতা করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে রূপান্তরকরণে অবদান রেখেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই শক্ত ট্র্যাক রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করতে আরো প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। কোভিড-১৯ এর ফলে বিদেশে কর্মসংস্থান নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে সরকারের প্রস্তাবকৃত ২% প্রণোদনা সহায়তার কারণে। একবার বৈশ্বিক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেই বৈদেশিক কর্মসংস্থান পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জি২জি আলোচনার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধিতে সবাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিম্ন সুদের ঋণের মাধ্যমে অভিবাসন খরচ কমানো হবে, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রদান বৃদ্ধি করা হবে এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশে কর্মস্থলে শোষণ ও হয়রানির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করা হবে।

কর্মসংস্থানে জেন্ডার ভারসাম্য: শ্রম বাজারের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো নারীদের জন্য সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে নারীদের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনশীল সম্পদে অসম অভিগম্যতা রয়েছে এবং নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন রকমের ভূমিকা রাখতে পারে না। যে সকল প্রতিষ্ঠান অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নারী উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করে তাদের সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র ঋণের মতো স্কিমগুলোতে অর্থায়ন করা, উত্তম শিক্ষা অর্জন এবং পুরুষ ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিকট থেকে অধিক সহায়তা পাওয়া, নারীদের জন্য শ্রম বাজারে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে খুবই জরুরি। অর্থনীতিতে বিদ্যমান নানা অদৃশ্য বাঁধার কারণে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এখনো অধরা রয়ে গেছে।

২.৮.৬ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির নীতিসমূহ

বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্য হ্রাস ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একটা ঐক্যমতে পৌঁছানো গেছে যে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করেনি বরং এর সুফল জনগণের সকল অংশেই সমবণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ সকল নীতির মধ্যে রয়েছে:

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা হলো প্রবৃদ্ধি অর্জনের ভিত্তি এবং পূর্ব শর্ত। অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ (রাজস্ব ও ঋণ) ও বাহ্যিক (বিওপি) ভারসাম্যে অস্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এর ফলে সমন্বিত ও খামার পর্যায়ে সম্পদ বণ্টন, বিনিয়োগ, আউটপুট ও কর্মসংস্থানে আঘাত আসে। দর উঠানামা, বড় ঋণের বোঝা এবং অনিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতি অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারে, যাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। যেহেতু দরিদ্রদের আয় পরিবর্তনশীল এবং হোঁচট খাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে, তাই অ-দরিদ্রদের চেয়ে দরিদ্রদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি। গবেষণা থেকে এটা নিশ্চিত যে, উচ্চ মুদ্রা স্ফীতি,বিশেষ করে ১০ শতাংশের উপরে মূল্যস্ফীতি অনানুপাতিকহারে দরিদ্রদেরকে আঘাত করে এবং ঐ বৃহৎ বাজেট ও চলতি হিসাব ঘাটতির ফলে অবশেষে সংকট তৈরি হয়, যেখানে দরিদ্ররা বেশি কষ্ট ভোগ করে। দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনে সঠিক মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিতে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধির জন্য রাজস্বনীতি: সাধারণ ঐক্যমত হলো এই যে, সরকারের উচিত বাজেট ঘাটতি নিম্ন ও টেকসই রাখা যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং দরিদ্রদের আয় রক্ষা পায়। সরকারি ব্যয় হঠাৎ করে কাটছাট করার মতো পদ্ধতি গ্রহণ করার চেয়ে নীতিনির্ধারকরা বরং কর ভিত্তি বৃদ্ধি ও রাজস্ব ঘাটতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ধীর পদ্ধতি গ্রহণ করতে পছন্দ করে না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন করার জন্য রাজস্ব ঘাটতি মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা নেই। মূলত রাজস্ব ঘাটতি বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে, যা উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং ঋণ পরিশোধে সহায়তা করে। প্রবৃদ্ধি সম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে সরকারি ঋণ পরিশোধ করা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারি ব্যয়সমূহ সমন্বিত চাহিদা বৃদ্ধি করে, সরবরাহ বাঁধাসমূহ দূর করে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।

দেশ একবার প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পর্ব থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে এবং উচ্চ আয় স্তর অর্জন করলে, রাজস্বনীতি দৃঢ় না করে বরং নমনীয় রাখা উচিত। সরকারের উচিত মানব পুঁজি বিনিয়োগে ও অন্যান্য অবকাঠামোগত বিনিয়োগে ব্যয় করা, যাতে প্রবৃদ্ধি টেকসই, দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়। সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে,অধিকাংশ গবেষণায় দেখা যায় যে, লোকসানি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজারের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে, দরিদ্র ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয় এবং এ সকল লোকসানি প্রতিষ্ঠানের কারণে দরিদ্রবান্ধব বিনিয়োগসমূহ পর্যাপ্ত বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, এমনও উদাহরণ রয়েছে যে, বেসরকারিকরণ প্রচেষ্টাসমূহ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় বন্দী থাকায় সরকারি উদ্যোগসমূহ রাজনৈতিক অভিজাতদের কিংবা সমাজের খ্যাতিমান ব্যবসায়ীদের নিকট চলে গেছে; সরকার সামান্য রাজস্ব সুবিধা পেয়েছে এবং দরিদ্রদের সেবার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঐক্যমত রয়েছে যে, ব্যবসা কিংবা শিল্প সরকারের কাজ নয়। যে সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি সেবা উৎপাদন ও সরবরাহ করে, সে সকল ক্ষেত্রে সরকার নিশ্চিত করবে যে, সেবাসমূহ পক্ষপাতহীন এবং দরিদ্র পরিবারগুলো এই সেবাসমূহ সঠিকভাবে পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উচ্চবিত্তদের পক্ষপাতমূলক এবং দরিদ্রদের স্বার্থ খর্ব করে এমন কর আইনসমূহ কিংবা কর মুক্ত আইনসমূহ সংশোধন করতে হবে।

সঞ্চয় ও পুজি সঞ্চয়ন তাড়িত প্রবৃদ্ধি মডেলটি ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের নিকট খুব আকর্ষণীয় ছিল। এ মডেলে বলা হয় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পদ্ধতিটি সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি অতি সরল ফাংশন। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি এখনও বিনিয়োগ দ্বারা চালিত (পুঁজি সংগ্রহ), যা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, আর্থিক ঘাটতি, বৈদেশিক সম্পদসমূহের মাধ্যমে অর্থায়ন করতে হয়। পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থায়নের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধি টেকসইকরণ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মাথাপিছু ৮% এর ওপর প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে হলে বাংলাদেশের প্রয়োজন জিডিপির শতকরা হিসেবে অন্ততপক্ষে ৩০% এর উপরে মোট দেশীয় বিনিয়োগ। উপরন্তু, মানব পুঁজিতে, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মোট জিডিপির ৫-৬% বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এই ধারণা দেয় যে, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা বা বোধ হলো সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা। দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল বিশ্বে টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হলো উন্নততর জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ। এই ডিজিটাল যুগে

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা রয়েছে, কারণ এরা গবেষণা ও উন্নয়নের যথেষ্ট বিনিয়োগ ছাড়াই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমদানি ও ব্যবহার করতে পারে। তথাপি, আইসিটি প্রবৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান অবকাঠামোর প্রসার অব্যাহত রাখতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া উচিত ।

বাণিজ্য-চালিত প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটাতে পারে। বিশ্বায়ন ও বহুপাক্ষিকতার বিবর্তন এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে যা পণ্য ও সেবাসমূহের ব্যাপক বৈশ্বিক বাজার তৈরি করেছে। এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর পণ্যের জন্য স্থিতিস্থাপক বাজার সৃষ্টি করেছে, যেখানে বৈশিক চাহিদা কাজে লাগিয়ে দেশগুলো প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত পূর্ব এশীয় দেশগুলো রপ্তানি নির্ভর প্রবৃদ্ধির যে নতুন রূপান্তর দেখেছে, তাকে বলা যায় বাণিজ্য নির্ভর প্রবৃদ্ধি, যেখানে আমদানি ও রপ্তানি সমান গুরুত্ব বহন করে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, এই যুদ্ধপরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও একতাবাদের কারণে এখন চাপের মধ্যে রয়েছে। এই বিশ্বায়নবিরোধী শক্তিগুলো এখনও উন্নত বিশ্বের কিছু কিছু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আশা করা যায়, এই নতুন ধারার যথেষ্ট সমালোচক রয়েছেন; যারা এ ধারাটিকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হবেন এবং ২১ শতকের প্রেক্ষিতে আরো যৌক্তিক পদ্ধতির অবতারণা করবেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও তৎপরবর্তী সময়ে বাণিজ্যমুখী প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। তৈরি পোশাক খাতের মতো বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে দেশের অবিরাম অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি অন্তঃআঞ্চলিকবাণিজ্যের প্রসারে আরো প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিনিময় হার নীতি: আরেকটি বিনিময় নীতি যা যুদ্ধপরবর্তী যুগে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে তা হলো স্থির বিনিময় হারের চেয়ে নমনীয় বিনিময় হার নীতি। প্রায় সকল দেশ স্থির বিনিময় হার নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং বিভিন্ন মাত্রার নমনীয় কিংবা ভাসমান বিনিময় হারের দিকে ধাবিত হয়েছে। সরকারকে অতিমূল্যায়িত বিনিময় হার অবশ্যই বাদ দিতে হবে কারণ এটি রপ্তানির প্রণোদনা ধ্বংস করে, কালক্রমে মূল্য পশোধের ভারসাম্যে সংকট তৈরি করে এবং দরিদ্রবিরোধী কারণ ধনীদের আমদানি প্রবণতা বেশি থাকে। মুদ্রার অতিমূল্যায়ন স্থানীয় উৎপাদন ও কর্মসংস্থানকে নিরুৎসাহিত করে এবং ভোগ ও সম্পদ বাবল বৃদ্ধি করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও সনাতন পদ্ধতি হলো প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার বজায় রাখা, তথাপি অধিক জনপ্রিয় নীতি হলো বিনিময় হার অবমূল্যায়িত রাখা, যাতে করে বিশ্ববাজারে রপ্তানি প্রতিযোগিতামূলক থাকে। এই নীতি অবস্থান পূর্ব এশীয় অর্থনীতিতে রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করেছিল এবং চীনে এই নীতি অবস্থান অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা স্থানীয় উৎপাদনকারীদের বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় ফেলে দেয়। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সক্ষম করে তোলে, যা লেনদেন ভারসাম্য তৈরি করে।

সুরক্ষা বেষ্টণী ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচী: আয় অসমতা হ্রাস করার কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী, সামাজিক তহবিল, ক্ষুদ্র ঋণ ও সুনির্দিষ্ট নগদ ও সহায়তা কর্মসূচিসমূহ, বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায়। কিন্তু এরূপ সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টণী কর্মসূচির মূল চ্যালেঞ্জ হলো সঠিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাছাইয়ে অনেক দরিদ্রেরই এসব কর্মসূচিতে অভিগম্যতা নেই, নতুবা এসব কর্মসূচি প্রণোদনার অভাবের কারণে এবং বাছাইয়ের ভুলের কারণে দক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। প্রবৃদ্ধিকে সকল জনগণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শক্তিশালী ও কার্যকারী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে দরিদ্রবান্ধব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণের ওপর এবং অর্থনীতির নিদিষ্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে প্রসারিত করার ওপর জোর দেয়া উচিত। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে শক্তিশালিকরণ করার মাধ্যমে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

সামাজিক সুরক্ষা বলতে এমন নীতি ও কর্মকাণ্ডকে বোঝায় যা দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দারিদ্র্য থেকে বাঁচতে সক্ষমতা যোগায় এবং তাদেরকে ঝুঁকি ও বিপর্যয় সামাল দিতে সক্ষম করে তোলে। সামাজিক সুরক্ষা পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে সামাজিক বিমা, সামাজিক সহায়তা এবং ন্যূনতম শ্রম মানদণ্ড। এইসকল শ্রম-সুযোগ কর্মসূচিসমূহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে। এটি মানবপুঁজি গঠণে সহায়তা করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, বিনিয়োগকে উদ্বুদ্ধ করে এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের উন্নতি বিধান করে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচীসমূহ সাধারণত জনগণের জন্য বেশ উপকারী হয় এবং যদি সঠিক উপকারভোগী বাছাই করা যায়, তবে এরূপ ব্যয় থেকে যে প্রাপ্তিটা আসে তা অমূল্য। কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিক আয় ব্যয় করার সুযোগ থাকে, তবে তারা এগুলো সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় করতে পারে। অন্যদিকে এসব কর্মসূচি শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়, যা পর্যায়ক্রমে একটি এলাকায় মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে। এ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক কৌশল ও কর্মকাণ্ডসমূহ অধ্যায়ে-১৪ এ আলোচনা করা হয়েছে।

গভর্ন্যান্স বা শাসন ব্যবস্থার ভূমিকা: বিভিন্ন গবেষণা থেকে এটা প্রমাণিত যে, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে গভর্ন্যান্সে ভূমিকা রয়েছে। প্রবৃদ্ধি সাধারণত দরিদ্রবান্ধব হলেও সর্বদা তা অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় না। দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির নির্ধারকসমূহ হলো- শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নয়ন। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে যে কোনটার পরিবর্তনের প্রভাব অন্যটাতে পড়ে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত যে সকল নীতি সুপারিশের গভীর তাৎপর্য রয়েছে তা নিম্নে সংক্ষিপ্ত কারে তুলে ধরা হলো।

১) সাধারণত প্রবৃদ্ধি দরিদ্রবান্ধব : মাথাপিছু আয় প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সবচেয়ে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আয়ও বাড়তে থাকে। ২) বৈশ্বিকভাবে প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠেনি; ৩) সুশাসনের শুধুমাত্র দুটি বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, যথা- সরকারের কার্যকারিতা এবং আইনের শাসন; ৪) শিক্ষা ব্যয়,অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নয়নের মতো কাঠামোগত খাতসমূহ দারিদ্র্য হ্রাস ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; এবং ৫) দরিদ্রদের আয়ের ওপর প্রবৃদ্ধির প্রভাব সরলরৈখিক নয় এবং দুর্নীতি বাড়ার সাথে সাথে তা কমতে থাকে। কিন্তু নিচের ২০ শতাংশের আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রভাব সরলরৈখিক।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের সাথে সাথে জনপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, গুণগত শিক্ষা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে আয়বণ্টন সুষম হয় এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যায়। সুশাসন উত্তম সম্পত্তি অধিকার, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবসায় এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করে। গবেষণায় আরো দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা ব্যয়, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব পুঁজি বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসে এবং অন্তর্ভুক্তি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি শিশু মৃত্যু ও এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত কিছু কিছু কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

২.৯ দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক মাত্রা

উপরের অনুচ্ছেদসমূহে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা ও উপায়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত কিছু প্রতিষ্ঠানের সংস্কারসহ শক্তিশালীকরণ জরুরি। এ সংস্কারসমূহের মধ্যে রয়েছে:

- প্রবৃদ্ধি কৌশল বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানসমূহ (অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, এনবিআর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক) যাতে সুসংগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমন্বিত হয় এবং তারা যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (স্বল্প মূল্যস্ফীতি, স্বল্প সুদহার, আন্তঃবাহ্যিক ভারসাম্য, বিনিময় হার স্থিতিশীলতা নিম্ন ঋণ-জিডিপি অনুপাত প্রভৃতি) প্রাতিষ্ঠানিক মান, কার্যকর সুশাসন, আইনের শাসন এবং উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ বজায় রাখতে পারে। তা নিশ্চিত করা, এতে করে অর্থনীতির সকল ক্রীড়নকদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সকল জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে এবং লাভবান হতে পারবে।
- আইন সহজীকরণ, ই-ক্রয়, কর সংগ্রহসহ সকল সরকারি লেনদেন অনলাইন করা, সেবার মানদণ্ড নির্ধারণ, সরকারি সেবার জন্য স্বচ্ছ ফি কাঠামো এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতি ও জোচ্চুরি দূর করা।
- শিক্ষা,স্বাস্থ্যসেবা,কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে নারী পুরষ উভয়ের সমান অভিগম্যতা প্রদানের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা। জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত এবং এটি সমতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।
- কৃষি খাতে বিশেষ জোর দিয়ে কর্মসংস্থানে বর্ধিত সুযোগ সুবিধা তৈরির ভিত্তি হিসেবে প্রশিক্ষণ ও সঠিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ। শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধি এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের সাথে তাল মিলিয়ে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া উচিত, উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধিতে এবং স্ব-নির্ভরদের আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে।
- কর্মসৃজন এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বর্ধিত প্রণোদনা, সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং সক্ষমতা তৈরি করা। আত্মকর্মসংস্থান চাকরির একটা বিকল্প যৌক্তিক খাত হতে পারে। কর্ম সংস্থান প্রবৃদ্ধির ফলে কর্মসৃজন হয় এবং আয় ও মজুরি বৃদ্ধি পায়।
- ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য বাজার, সম্পদ, অর্থায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা। শ্রম ও পুঁজি বাজারে বর্ধিত অভিগম্যতা নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহ দিতে সহায়তা করবে।

- দক্ষ ও নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসাহিত করা, যাতে শক্তি সৃজনকারী নতুন ব্যবসার সুযোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। জ্বালানিতে বর্ধিত অভিগম্যতার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রভাব ফেলবে। এর ফলে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য নতুন নতুন ব্যবসা ও কর্মের সুযোগ তৈরি হবে।
- করারোপ (কর জিডিপি অনুপাত বিশ্বের সর্বনিম্ন), আর্থিক সহায়তা (অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে কাঙ্খিত হলে) এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের (দরিদ্র জনগণ তাদের জীবিকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর খুবই নির্ভরশীল) মাধ্যমে আয় পুর্ণবন্টনসহ সম্পদ অসমতা হ্রাস করা। দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্র জনগণ সম্পদের অভাবে ভুগে। এছাড়া প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশের টেকসইতা একে অপরের পরিপূরক।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিক সমতাভিত্তিক প্রসার, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় (দারিদ্র্য ও শিক্ষার মধ্যে একটা সহসম্বন্ধ রয়েছে) মানব পুঁজির ভিত্তি বৃদ্ধি করবে এবং কারিগরি বেকারত্ব মোকাবেলায় একটি সমাধানমূলক খাত হিসেবে কাজ করবে। জ্ঞান আহরণ/দক্ষতা, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক গুণ হিসেবে মানবপুঁজি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার গুণগতমাণের ওপর বিশেষ করে শিক্ষাদানকারীদের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- উচ্চ ব্যয় ও অদক্ষ শিল্পায়ন থেকে সুবিধাভোগী কায়েমী স্বর্থান্বেষী গোষ্ঠীর বাণিজ্য সুরক্ষা চাপ প্রতিহত এবং জাতির তুলনামূলক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থান-নিবিড় বাণিজ্যমুখী (রপ্তানিমুখী) উৎপাদন প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। বাণিজ্য বাঁধাসমূহ হ্রাস করলে এবং উন্মুক্ততা বাড়ালে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে জিডিপির ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়া বাণিজ্য পণ্য ও মূল্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এর ফলে শ্রম নিবিড় রপ্তানিমুখী উৎপাদনে মজুরি বৃদ্ধি পাবে, যেখানে অদক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া যাবে।
- উন্নত অবকাঠামোর জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, মানবপুঁজি শক্তিশালীকরণ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক), গবেষণা ও উন্নয়নে প্রণোদনা প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- পর্যাপ্ত আয়, কর্ম পরিবেশ, চাকরির প্রশিক্ষণ এবং নিরাপত্তা সুরক্ষাসহ শ্রম বাজারে সতর্ক নমনীয় পরিবেশ তৈরি করা। এর ফলে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে অনানুষ্ঠনিক খাতে চাকরির অনিশ্চয়তা ও দুর্বল কর্ম পরিবেশের সমস্যা সমাধানে (সামাজিক সুরক্ষা ও আইনগত পদক্ষেপের মাধ্যমে) পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চাকরির প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে।
- কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত বাঁধা দূর করা, যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী প্রবৃদ্ধি সুবিধায় ব্যাপকভাবে অংশ নিতে পারে এবং লাভবান হতে পারে।

২.১০ কোভিড-১৯ এর যুগে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া

কোভিড-১৯ মহামারী সংকট থেকে যে সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে তার একটি অংশ হলো বাহ্যিক এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অনুমান করা যায় যে, কোভিড-১৯ সংকটের কারণে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি স্থল- ইউরোপ ও উত্তর আ্যামেরিকার অর্থনীতির স্থবিরতার ফলে রপ্তানি চাহিদা কমে যাবে। এর ফলে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাওয়ার বিদ্যমান আয় অসমতা আরো বাড়বে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হলো যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণবাদ এবং ক্রমহ্রাসমান বহুমূখীবাদ, যা বাণিজ্য খাতে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে।

বৈশ্বিক বহুমূখীবাদ পদ্ধতির তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধাভোগী হিসেবে বাংলাদেশকে সামনের বছরগুলোতে বহুমূখীবাদ ও বিশ্বায়নের সংস্কার ও টেকসইতার জন্য আন্দোলনে আরো অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ বিশ্ব অর্থনীতি ধীরে ধীরে কোভিড-১৯ মহামারী থেকে বেরিয়ে আসছে। গত ২৫ বছরে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে বৃহত্তর সমন্বয় সাধনের পর, পশ্চাদপদ নীতিসমূহের দিকে ধাবিত হলে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। সাথে সাথে প্রবৃদ্ধি কিংবা অন্তর্ভুক্তিতাও বাঁধাগ্রস্ত হবে।

প্রবৃদ্ধি কমিশনের ভাষ্যমতে, উন্মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতি উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের জন্য অধিকতর স্থিতিস্থাপক রপ্তানি বাজারের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাদের মতে, শুধুমাত্র স্থানীয় চাহিদানির্ভর প্রবৃদ্ধি বেশিদূর আগাতে পারে না। শ্রমনির্ভর উৎপাদনে আমাদের তুলনামূলক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানি বৃদ্ধির সাফল্য ভবিষ্যতেও সমৃদ্ধির বার্তা প্রদান করছে। ২০৩১ নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার দীর্ঘমেয়াদি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে সমৃদ্ধি ও সীমাহীন সুযোগের এ পথ থেকে কোনভাবেই বিচ্যুত হওয়া চলবে না। কোভিড-১৯ সংকট আমাদের অধিকতর উন্নয়ন অর্জনের সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করতে পারে।

অধ্যায় ৩

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উন্নয়ন দর্শন এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নীতি বাস্তবায়ন ও অর্জনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবসমূহ ধারণ করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে একটি দুঃসহ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে অধ্যায় ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি হ্রাস এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ অন্যান্য সামাজিক সূচকে অগ্রগতি লাভ করলেও দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী অর্থনীতিতেও বিদ্যমান ছিল। কোভিড-১৯ এর প্রতিকূল প্রভাব দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এছাড়া, জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং স্বল্পমেয়াদী দারিদ্র্য বৃদ্ধি করেছে। এ সকল বাহ্যিক অভিঘাতসমূহ মোকাবেলার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা পুনরুদ্ধার করা এখন বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ।

যেহেতু কোভিড-১৯ মহামারী এখনো চলছে এবং কবে নাগাদ শেষ হবে তা জানা নেই, তাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তি অর্থবছর ২০২০ এবং অর্থবছর ২০২১ এ কোভিড-১৯ মহামারীর সম্পূর্ণ প্রভাব কিরূপ হবে তা অনেক অনিশ্চয়তায় ঘেরা। এই ধরণের অনিশ্চিত পরিবেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ করা একটি বড় ধরণের নীতি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রভাব, শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা প্রণীত বৈশ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণ এবং দেশের অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নেতৃস্থানীয় জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তসমূহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত ও অনুসিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মাল্টিসেক্টর কম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (সিজিই) মডেল এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোই হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রক্ষেপণসমূহের মূল ভিত্তি। এ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কৌশল এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (BOP) সংশ্লিষ্ট প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা ঋণ টেকসহিতা এবং বহিঃস্থ খাতের বাস্তবোপযোগিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থবছর ২০২১ এর বাজেটের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সর্বোপরি চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সিজিই মডেল এর ওপর ভিত্তি করে প্রণীত যেখানে একটি বিস্তারিত উৎপাদন হিসাব রয়েছে এবং উক্ত হিসাবটি সম্পূর্ণরূপে আর্থিক হিসেবের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় প্রক্ষেপিত সংখ্যায় কিছুটা পরিবর্তন আসা খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ২০২০ অর্থ-বছরের প্রাপ্ত প্রকৃত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে যা ২০২১ অর্থ-বছরের বাজেট প্রণয়নের সময় পাওয়া যায়নি।

৩.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ

সারণি ৩.১ এ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি পথ দেখানো হয়েছে। এছাড়া, জিডিপি'র খাতভিত্তিক গঠন সারণি ৩.২ এ দেখানো হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের কৌশল এবং এর অন্তর্নিহিত নীতি, সংস্কার এবং অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর অধ্যায় ২ এ বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি মূল লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হলো সরকার জিডিপি প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করবে যাতে করে অধ্যায় ১ ও ২ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৪ অর্থ-বছরের মধ্যে কোভিড-১৯ দ্বারা প্রভাবিত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি পথকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উল্লিখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি পথে ফেরানো যেতে পারে। প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হবে রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাত এবং রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ। যদিও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত কৃষি ও সেবা খাত শক্তিশালী সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাবে, তথাপি মোট জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিল্প খাতের ক্রমবর্ধমান অংশ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ সকল খাতের আধিপত্য প্রকাশ করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রে অর্থনীতির খাতভিত্তিক বিন্যাস খুবই প্রয়োজনীয়।

সারণি ৩.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক চিত্র

সামষ্টিক নির্দেশক	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
প্রবৃদ্ধি: প্রকৃত জিডিপি (%)	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
প্রকৃত জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	১১০৫৮	১১৬৩৭	১২,৪৯৮	১৩,৪৬০	১৪,৫৩৭	১৫,৭৪৭	১৭,০৮৭
মোট জাতীয় আয় (বিলিয়ন টাকা)	৩১৬	৩৪৬	৩৭৬	৪১৫	৪৬০	৫১০	৫৬৬
জিএসআই মাথাপিছু (টাকা)	১৯০৯	২০৬৪	২১৭০	২৩৪৫	২৫৫৫	২৭৯০	৩০৬৯
সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি (%)	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
মোট বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে)	৩১.৫৭	৩১.৭৫	৩২.৫৬	৩২.৭৩	৩৪.০০	৩৪.৯৪	৩৬.৫৯
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে)	২৩.৫৪	২৩.৬৩	২৪.৪১	২৪.৫৩	২৫.৩২	২৬.০৮	২৭.৩৫
--যার মধ্যে এফডিআই (জিডিপির % হিসেবে)	০.৮৭	০.৫৪	০.৮৩	১.৩৫	১.৯০	২.৫০	৩.০০
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে)	৮.০৩	৮.১২	৮.১৫	৮.২০	৮.৬৮	৮.৮৬	৯.২৪
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির % হিসেবে)	২৯.৫০	৩০.১১	৩১.৪৩	৩১.১৭	৩২.২৯	৩৩.০৩	৩৪.৪২
ভোগ (জিডিপির % হিসেবে)	৭৪.৯৮	৭৪.৬৯	৭৪.৩১	৭৪.১২	৭২.৮৬	৭১.৯৭	৭০.৪১

উৎস: বিবিএস এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ৩.২: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ

খাত	অর্থবছর ২০১৯ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২০২০ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রবৃদ্ধি হার						
কৃষি	৩.৯২	৩.১১	৩.৪৭	৩.৮৩	৪.১০	৪.০০	৩.৯০
শিল্প:	১২.৬৭	৬.৪৮	১০.২৯	১০.৫৯	১০.৭৯	১১.২০	১১.৯০
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৪.২০	৫.৮৪	১০.৭৩	১০.৯৯	১১.২৪	১২.০০	১২.৬০
সেবাসমূহ	৬.৭৮	৫.৩২	৬.৭৪	৬.৯৫	৭.২৫	৭.৩০	৭.৩৫
জিডিপি	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
	জিডিপির % হিসেবে অংশ (অপরিবর্তনীয় মূল্য)						
কৃষি	১৩.৬৫	১৩.৩৫	১২.৮৪	১২.৩৬	১১.৮৯	১১.১৬	১০.৫৬
শিল্প:	৩৫.০০	৩৫.৩৬	৩৬.২৫	৩৭.১৭	৩৮.০৭	৪০.৩৭	৪১.৮৬
ম্যানুফ্যাকচারিং	২৪.০৮	২৪.১৮	২৪.৮৯	২৫.৬১	২৬.৩৩	২৮.৭৫	৩০.২৩
সেবাসমূহ	৫১.৩৫	৫১.৩০	৫০.৯১	৫০.৪৭	৫০.০৪	৪৮.৪৭	৪৭.৫৮

উৎস: বিবিএস এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

ক্রমবর্ধনশীল শ্রম শক্তি এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের অবদান প্রবৃদ্ধি গণনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টারপ্ল্যান অর্থবছর ২০২১-অর্থবছর ২০৩০' প্রণয়ন করেছে। এ মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরবর্তী দশ বছরের জন্য গড় উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি হার ৫.৬ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগের পরিমাণ ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৩১.৮ শতাংশ হতে ২০২৫ অর্থবছরে অর্থাৎ পরিকল্পনার মেয়াদান্তে ৩৭ শতাংশে উন্নীত করা। এটি একটি বড় ধরণের নীতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। ইতোমধ্যেই অধ্যায় ১ এ বর্ণিত হয়েছে যে, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের উৎপাদন অবকাঠামোতে পুঁজির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু শ্রম উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে এর উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই উৎপাদনে পুঁজির প্রাধান্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার তরান্বিতকরণে প্রয়োজন হবে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ। এটি চীন, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডসহ সকল উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সকল দেশসমূহ নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে তাদের ইনক্রিমেন্টাল ক্যাপিটাল আউটপুট অনুপাত (আইকর) এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন দেখিয়ে ছিল।

সরকারি এবং বেসরকারি, উভয় ধরণের বিনিয়োগ বৃদ্ধিরই প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, বিনিয়োগের কার্যকারিতাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাতের ক্ষেত্রে মুদ্রানীতি, রাজস্ব, বিনিময় হার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্কারসমূহ কার্যকরী ও মানসম্পন্ন বেসরকারি বিনিয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। বিশেষ করে, সরকারি নীতিসমূহকে বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত রপ্তানি-বিরোধী

পক্ষপাত দূরীভূত করা এবং রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রণোদনা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এছাড়া, বেসরকারি বিনিয়োগের কার্যকারিতা নির্ভর করবে সরকারি বিনিয়োগের দক্ষতার ওপর। পূর্বের মত অধিকাংশ সরকারি বিনিয়োগই জ্বালানি ও শক্তি এবং পরিবহন খাতের প্রধান প্রধান অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহার করতে হবে। উপরন্তু, বিডিপি ২১০০ এর নির্দেশনা মোতাবেক পানিসম্পদ খাতসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অভিঘাতসহনশীলতা শক্তিশালীকরণ, কোভিড-১৯ কে মোকাবেলা এবং মানব সম্পদ তৈরিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২ বিনিয়োগ, সঞ্চয় এবং রাজস্ব নীতি

বিনিয়োগের অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রধান উৎস হিসেবে জাতীয় সঞ্চয়ের ভূমিকা চলমান থাকবে যদিও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ভূমিকা আরো বৃদ্ধি পাবে। ৮ম পরিকল্পনায় বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপিত ৯.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ২৭ শতাংশই আসবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ থেকে, যেহেতু জাতীয় সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি এককভাবে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের চাহিদা মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত নয়। নতুন প্রযুক্তি আনয়ন, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাজার প্রসারের ক্ষেত্রে বর্ধিত এফডিআই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২.১ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

জিডিপি'র অংশ হিসেবে অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির অধিকাংশই বেসরকারি খাত হতে আসবে মর্মে ৮ম পরিকল্পনায় প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের যে প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল তা ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চলমান ছিল, তবে কাঙ্খিত গতি পায়নি। এ সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এফডিআই ও বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক পরিবেশের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করা এবং সকল ধরণের ক্লিয়ারেন্স শর্তাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও এফডিআই সহজতর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড-কে একটি ওয়ান-স্টপ শপে রূপান্তরের মাধ্যমে লেনদেন-ব্যয় হ্রাস করা। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (এফটিজেড) ও বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জমির তীব্র স্বল্পতা এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার জটিলতা থেকে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা নিরসন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সকল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ২০১৮ ও ২০১৯ অর্থবছরে এফডিআই এর অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এ অগ্রগতি সত্ত্বেও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম হয়েছে। এফডিআই এর ক্ষেত্রে এই ঘাটতি ছিল বেশ প্রকট (চিত্র ৩.১)।

চিত্র ৩.১: পরিকল্পিত বনাম প্রকৃত এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ (জিডিপির %)

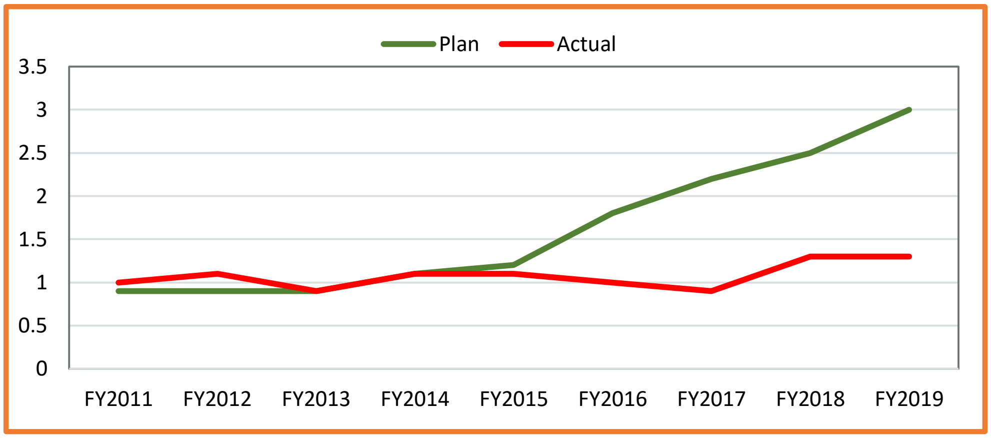

উৎস: ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উন্নয়নশীল দেশসমূহে মোট এফডিআই সরবরাহের তুলনায় বাংলাদেশে এফডিআই এর অন্তঃপ্রবাহ খুবই নগণ্য। ২০১৮ সালে মোট বৈশ্বিক এফডিআই অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ ছিল ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অংশ ছিল ৭০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (৫৪ শতাংশ)। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ এফডিআই সুবিধা গ্রহণকারী দেশসমূহের তালিকা চিত্র ৩.২ এ উল্লেখ করা হলো। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এফডিআই এর বিপরীতে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের এফডিআই এর অংশ ছিল যথাক্রমে ১৩৯ বিলিয়ন, ৪২ বিলিয়ন, ২২ বিলিয়ন এবং ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অংকের কাছে বাংলাদেশের ৩-৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের এফডিআই প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। উন্নয়নশীল

দেশসমূহের মোট প্রাপ্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের নগণ্য পরিমাণ এফডিআই প্রবাহ এটাই নির্দেশ করে যে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের এখনও অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বৈদেশিক বিনিয়োগের একটি বড় অংশের ভাগিদার হতে পারে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় লক্ষ্যমাত্রা হতে পারে।

চিত্র ৩.২: নির্বাচিত দেশগুলোতে এফডিআই অন্তঃপ্রবাহ

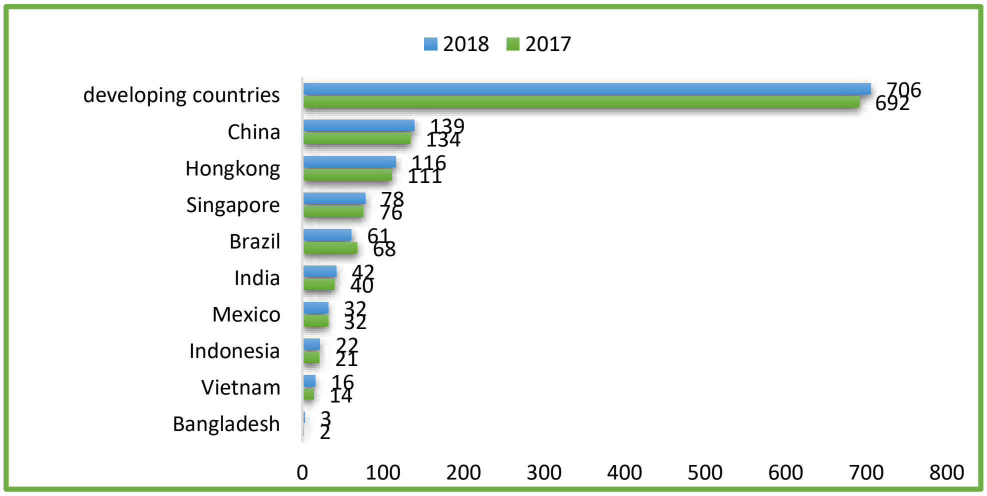

উৎস: আংকটাড (UNCTAD) ২০১৯

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ কৌশল কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহের ওপর আলোকপাত করবে যেমনঃ দূরদর্শি সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যাতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, প্রতিযোগিতামূলক এবং স্থিতিশীল বিনিময় হার, যুক্তিযুক্ত ঋণ খরচের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বেসরকারি ঋণের সরবরাহ, দক্ষ সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন জ্বালানি ও শক্তি এবং পরিবহন সেবা সহজলভ্য করা, ইপিজেড (EPZ) এবং এসইজেড (SEZ) এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকৃত ভূমির সরবরাহ জোরদার করা, বন্দরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তোলন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং আইসিটির মাধ্যমে বাণিজ্যিক (ট্রেড লজিস্টিক) ব্যয়হ্রাস, সর্বোপরি বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো। তবে প্রধান লক্ষ্য হলো ব্যবসায় পরিচালনা ব্যয় (কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস) উল্লেখযোগ্য পরিমাণেহ্রাস করার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের কস্ট অব ডুয়িং বিজনেস সূচকে অগ্রগতি লাভ করা। এক্ষেত্রে ২০১৯ অর্থবছরে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অগ্রগতি চলমান রাখা হবে যাতে করে সকল ধরণের বিনিয়োগ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিডা একটি ওয়ান-স্টপ কেন্দ্র হিসেবে সত্যিকার অর্থে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। সুষ্ঠু গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কার্যক্ষম বিনিয়োগের জন্য প্রচারমূলক কার্যাবলীর সম্পাদনের জন্য বিডাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে। বিনিয়োগ অনুমতি প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী প্রচলিত ব্যবস্থাকে সহজীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদানে আইসিটির সহায়তায় অনলাইনে সেবাদান করা হবে। অনুমতি সেবা প্রদান বিশেষত জমি রেজিস্ট্রেশন এবং বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে গুণগত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে যা উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশের একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। যেসকল ক্ষেত্রে বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে যেমন দেউলিয়া আইন ও চুক্তির বাস্তবায়ন, এসব ক্ষেত্রসমূহে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার উত্তম চর্চার ওপর ভিত্তি করে যথোপযুক্ত আইনী মাধ্যম দ্বারা শক্তিশালী এবং আরো কার্যকরী করে তোলা হবে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যবসার উপযোগী এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য সহায়ক করে গড়ে তোলা হবে। কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে কর প্রদান সহজীকরণ ও কম দুর্বহ করা হবে যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রাজস্ব নীতি কাঠামোর আওতায় সরকারের কর ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের একটি অংশ।

৩.২.২ সরকারি বিনিয়োগ প্রচেষ্টা শক্তিশালীকরণ: রাজস্ব নীতি সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ থেকেই সরকার সরকারি বিনিয়োগের নিম্নপ্রবাহ থামাতে সফল হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর সংস্কার পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে এটি সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে কর-জিডিপি অনুপাত ২০১১ অর্থ-বছরের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে ৯.৫ শতাংশে পৌঁছায়। যদিও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বাস্তব অগ্রগতি কম হয়েছে, তথাপি এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কর রাজস্ব আদায়ের এই অগ্রগতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কিছুটা থমকে যায়।

বৃদ্ধির পরিবর্তে কর-জিডিপি অনুপাত হ্রাস পেয়ে ২০২০ অর্থবছরে ৭.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। কর আদায়ের দুর্বল অগ্রগতি একটি বড় ধরণের উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং তৎসংশ্লিষ্ট রাজস্ব নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। কর ও রাজস্ব নীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অধ্যায় ৫-এ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির অর্থায়নের আলোকে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি জোরদারকল্পে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ক্রমবর্ধমান হারে বড় আকারের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (চিত্র ৩.৩)। যদিও রাজস্ব ঘাটতির ফলে কিছু কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়েছে, তথাপি জিডিপি'র হিসেবে এডিপি'র অংশ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। বাজেটের অংশের বিচারে এডিপি বরাদ্দ ২০১৫ অর্থ-বছরের ৩০ শতাংশ হতে ২০১৯ অর্থবছরে ৩৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের বর্ধনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এডিপি'র সিংহভাগই জ্বালানি ও শক্তি এবং পরিবহন অবকাঠামো খাতের বৃহদাকারের রূপান্তরমূলক প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে ব্যয় করা হয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামোর (গ্রামীণ উন্নয়ন ও পানি সম্পদ) ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। ফলে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এডিপি'র ৫০ শতাংশের অধিক বরাদ্দ মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নসহ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছে। অধিকাংশ বরাদ্দই পরিবহনখাতে পদ্মা ব্রীজের মত গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরমূলক প্রকল্পসমূহে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। অবকাঠামো খাতের ওপর যে শক্তিশালী নজর দেয়া হয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ এবং এটি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ৪ বছরে প্রবৃদ্ধি ঊর্ধ্বগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

চিত্র ৩.৩: মোট খরচের ক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দ (জিডিপির %)

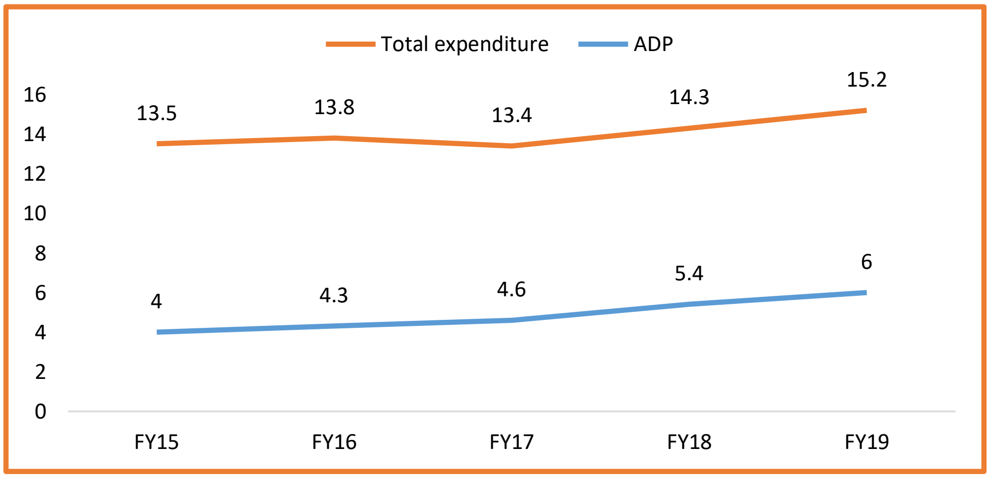

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

চিত্র ৩.৪: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার

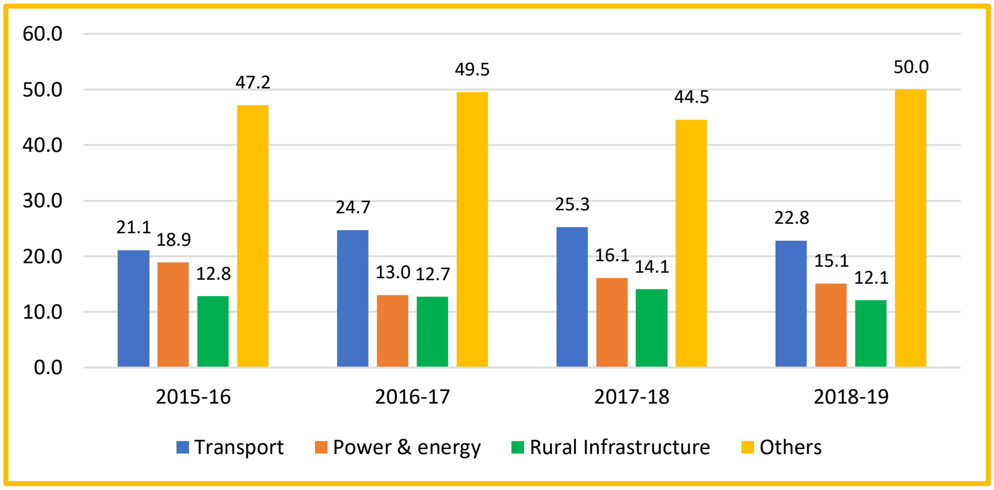

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

অবকাঠামো খাতে খুব ভালভাবে সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকারের পুনঃনির্ধারণ করা জরুরি। স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বড় আকারের বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বিডিপি ২১০০ এর বাস্তবায়ন জোরদার করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধিতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবহন খাতের মত বিডিপি ২১০০ এর বাস্তবায়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পরিবেশগত সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু বহু-বছর মেয়াদি রূপান্তরমূলক প্রকল্পের ওপর নজর বাড়াতে হবে।

পরিবহন ও বিদ্যুৎ খাতে যে জোর দেয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। তবে এডিপি'র সীমিত আকার এবং কোভিড-১৯ জনিত উদ্ভূত ঝুঁকি নিরসনে এডিপি'র অগ্রাধিকারখাত পরিবর্তন হওয়ায় বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতে পিপিপি'র আদলে অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অধিক জোর দিতে হবে। ইতোমধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে বিদ্যুৎ খাত বেশ ভাল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়নে পিপিপি প্রচেষ্টা আরো জোরদার করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন পিপিপি'র প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। এক্ষেত্রে পিপিপি জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়নে বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ সংগ্রহে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পিপিপি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে হবে। পরিবহন এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে প্রত্যক্ষ এডিপি বরাদ্দ মোট এডিপির অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও প্রকৃত সংখ্যায় এই বরাদ্দ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। পরিবহন অবকাঠামো খাতের সকল চলমান রূপান্তরমূলক প্রকল্পের সময়োচিত বাস্তবায়ন ও সমাপ্তির লক্ষ্যে বিশেষ জোর দিতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ অগ্রাধিকার এবং সম্পদ বরাদ্দ বিস্তারিতভাবে অধ্যায় ৫ বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.২.৩ জাতীয় সঞ্চয় প্রচেষ্টা বজায় রাখা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ জিডিপি'র তুলনায় একটি সম্মানজনক জাতীয় সঞ্চয় হার বজায় রেখে আসছে। ২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় সঞ্চয় হারের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ। এই উচ্চ জাতীয় সঞ্চয় হারের প্রাথমিক উৎস হলো উচ্চ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়। এছাড়া ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে জিডিপি'র ৫.৭ শতাংশ হারে বৈদেশিক শ্রমিকদের মাধ্যমে আগত রেমিট্যান্স প্রবাহের ফলে জাতীয় সঞ্চয় আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্ষেপিত বিনিয়োগের অর্থায়নের সিংহভাগই আসবে জাতীয় সঞ্চয় থেকে, যা ২০১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৯.৫ শতাংশ হতে ২০২৫ অর্থবছরে ৩৪.৪ শতাংশে পৌঁছাবে।

তারপরেও ২০১৯ অর্থবছর হতে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে জাতীয় সঞ্চয়ের হার ৪.৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। ২০১৩ অর্থবছর হতে জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি কোভিড-১৯ পরবর্তী পুনরুদ্ধারকৃত সময়েও জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পেতে পারে। তাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত জাতীয় সঞ্চয় হারের প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হলো অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হারের উর্ধ্বগতি। বেসরকারি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং দেশজ বিনিয়োগের ওপর উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করে এমনতর উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়াতে সহায়তা করে। সরকার সঞ্চয়কারীদেরকে ইতিবাচক প্রকৃত সুদের হার প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয়কে উৎসাহিত করবে। জাতীয় সঞ্চয়ের একটি অংশ আসবে সরকারি খাতের বর্ধিত রাজস্ব আদায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর রাজস্ব কাঠামো বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে সরকারি সঞ্চয়ের হার জিডিপি'র অনুপাতে ২০১৯ অর্থ-বছরের ০.৭ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে ২.০ শতাংশে উন্নীত করে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এটি বলা বাহুল্য যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ভূমিকা অপরিসীম।

চিত্র ৩.৫: জাতীয় সঞ্চয় প্রবাহ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দৃশ্যপট

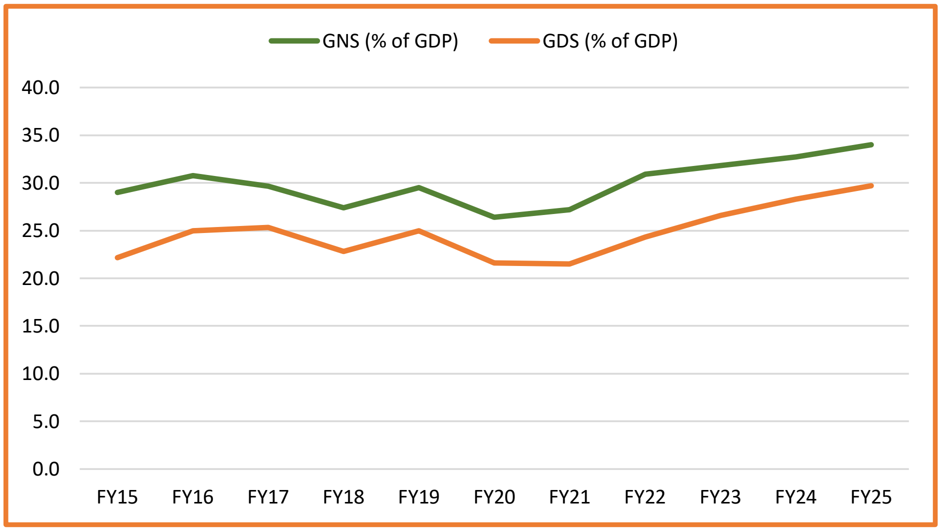

উৎস: বিবিএস ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রক্ষেপণ

৩.৩ লেনদেনের ভারসাম্য (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট) এবং বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থান এদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার নির্দেশক। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের অধিকাংশ সময়ে বৈদেশিক চলতি হিসেবে উদ্বৃত্ত অর্জন হয়েছে যার দরুণ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক রিজার্ভে দ্রুত উল্লম্ফন দেখা গেছে। কোভিড-১৯ আরম্ভের পূর্বে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের ২০১৭ অর্থবছরে বিওপি'র কৃতিত্ব কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে কারণ উক্ত সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে কিছুটা শ্লথ গতি পরিলক্ষিত হয়।

তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ঘটিত বিপ্লব বাংলাদেশের জন্য রপ্তানি উপার্জন, আয় এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব মূল্য সংযোজন করেছে। এটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অর্থায়নে আমদানির প্রসারের মাধ্যমে বৈদেশিক দায়গ্রস্থতা এবং বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা পরিহার করে বাংলাদেশের লেনেদেনের ভারসাম্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেছে। তবে তৈরি পোশাক খাতের সাফল্যের মত অন্যান্য রপ্তানিমুখি খাতের ক্ষেত্রে এই পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ফলে সময়ের সাথে সাথে মোট রপ্তানি উপার্জনে তৈরি পোশাক খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটি অর্থনীতিকে একটি একক পণ্যের রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। বৈশ্বিক তৈরি পোশাক পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায়, তৈরি পোশাক খাতের প্রবৃদ্ধি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে। এছাড়া, বাড়তি মার্কেট শেয়ার অর্জনও অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ৪ বছরে দেশজ রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ৬.৩ শতাংশ হারে অর্জিত হয়েছে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ শতাংশ (সারণি ৩.৩)। এরই মাঝে কোভিড-১৯ বাড়তি সমস্যার তৈরি করেছে; ২০১৯ অর্থ-বছরের ৩৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে হ্রাস পেয়ে ২০২০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

বৈশ্বিক পুনরুদ্ধার ঘটলে কোভিড-১৯ জনিত রপ্তানি ধ্বস পুনরুদ্ধার হবে বলে আশা করা যায়। তবে নিম্নের সারণি ৩.৪ এ রপ্তানি পরিকৃতিতে যে হতাশা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো অনেক সমস্যা নিয়েও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে তৈরি পোশাক খাত সম্মানজনক ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার বজায় রাখতে পেরেছিল কিন্তু যদি উক্ত ৪ বছরকে বিবেচনা করা হয় তবে তৈরি পোশাক বহির্ভূত রপ্তানি প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। এটি মাঝে মাঝেই ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে ওঠানামা করেছে এবং এই ওঠানামার কোন নির্দিষ্ট ধরণ অনুমান করা যায়নি। রপ্তানি বহুমূখীকরণের ওপর ভিত্তি করে একটি শক্তিশালী রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কৌশলের মাধ্যমে এই সমস্যা নিরসন করা প্রয়োজন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ধিত রপ্তানি কৌশল এলডিসি (LDC) থেকে উত্তরণের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে সম্পন্ন হওয়া গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে। এ প্রতিবেদনে রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ যেসকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার বিস্তারিত কারণসমূহ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক এলডিসি গ্রাজুয়েশন স্টাডি প্রতিবেদনে উল্লিখিত নীতি প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলে এটি কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট রপ্তানি বাজার ধ্বসের দ্রুত পুনরদ্ধারে সহায়তা প্রদান করবে।

সারণি ৩.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রকৃতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	পাট ও পাটজাত পণ্য	চামড়া	জুতা	হিমায়িত খাদ্য	অন্যান্য	তৈরি পোশাক বহির্ভূতমোট	তৈরি পোশাক	মোট রপ্তানি
অর্থবছর ২০১৫	৮৬৮.৫	৩৯৭.৫	৬৭৩.৩	৫৬৮	৩০৭৭.৬	৫৭১৭.৫	২৫৪৯১.৪	৩১২০৮.৯
অর্থবছর ২০১৬	৯১৯.৬	২৭৭.৯	৭১৪	৫৩৫.৮	১৫৮২.৯	৬১৬৩.০	২৮০৯৪.২	৩৪২৫৭.২
অর্থবছর ২০১৭	৯৬২.৪	২৩২.৬	৭৭৭.৮	৫২৬.৫	১৭৭০.৫	৬৬৮৫.৩	২৮১৪৯.৮	৩৪৮৩৫.১
অর্থবছর ২০১৮	১০৩৭.৮	১৭৩	৮০৯.৭	৪৮৩	১২৭৭.৩	৬০৫৩.৫	৩০৬১৪.৭	৩৬৬৬৮.২
অর্থবছর ২০১৯	৯০৬.৮৫	৪১১.৯	৮৭৯.৪১	৫০০.৪	৮৬২.৩	৫৬৭২.৯	৩৪১৩৩.৩	৩৯৮০৬.২
প্রবৃদ্ধি হার (%)								
অর্থবছর ২০১৫	৫.৩	-২১.৪	২২.৪	-১১	০.৯	০.৪	৪.১	৩.৪
অর্থবছর ২০১৬	৫.৯	-৩০.১	৬.০	-৫.৭	-৪৮.৬	৭.৮	১০.২	৯.৮
অর্থবছর ২০১৭	৪.৭	-১৬.৩	৮.৯	-১.৭	১১.৯	৮.৫	০.২	১.৭
অর্থবছর ২০১৮	৭.৮	-২৫.৬	৪.১	-৮.৩	-২৭.৯	-৯.৫	৮.৮	৫.৩
অর্থবছর ২০১৯	-১২.৬	১৩৮.১	৮.৬	৩.৬	-৩২.৫	-৬.৩	১১.৫	৮.৬

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

অতীতের মত, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কৌশলের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাত নেতৃত্ব প্রদান করে যাবে। তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতের শক্তিশালী অবস্থান উক্ত পরিকল্পনা মেয়াদে সম্ভাব্য ২৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থন যোগাবে। আর এজন্য তৈরি পোশাক খাতসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি, পরিবহন, বন্দর প্রভৃতি সহায়তামূলক অবকাঠামোতে বিশাল আকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। অন্যান্য সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় চামড়া, জুতা, হালকা শিল্প (বাইসাইকেল এবং ইলেক্ট্রনিকস্ পণ্য), তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), হোম টেক্সটাইল, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ এবং জাহাজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ সকল শিল্পসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার তৈরি পোশাক খাতের মত অন্যান্য খাতেও বাণিজ্য সুরক্ষা হ্রাস এবং শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মূলধনী যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্কবিহীন অনুপ্রবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাতমূলক বাণিজ্য নীতির বিষয়টি মোকাবেলা করবে। এ সকল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৃহত্তর ও সহজতর বাজার অভিগম্যতা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং ব্যবস্থাপনা অনুশীলন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এফডিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এফডিআই বাংলাদেশকে অন্তর্বর্তী পণ্যের রপ্তানি বাজারে অনুপ্রবেশ এবং এশিয়ান ভ্যালু চেইনের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করবে। প্রচলিত ও নতুন খাতসমূহে এফডিআই আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সরকার সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম তরান্বিতকরণে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া, সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপান, চীন, ভারত এবং অন্যান্য দেশসমূহের বিনিয়োগকারীদের নিকট বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (SEZ) হস্তান্তরের পরিকল্পনা করছে।

প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির প্রক্ষেপণও ৮ম পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে। জিডিপি'র তুলনায় সামগ্রিক আমদানি স্থিতিস্থাপকতা পূর্বের মত ০.৯ এর কাছাকাছি থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ব্যবস্থাপনার আওতায় উচ্চ আমদানি এবং প্রাণবন্ত তৈরি পোশাক ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী খাতের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। এফডিআই এবং সরকারি খাতের অবকাঠামো বিনিয়োগের কারণে এ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের যে বিশাল উল্লম্ফন বিবেচনা করা হয়েছে তা আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হতে পারে। ২০২০ অর্থবছরে পেট্রোলিয়ামের মূল্যের দ্রুতপতন এবং বিশ্ববাজারে জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্যমূল্যের নমনীয়তা আমদানি ব্যয় কমিয়ে রাখতে সহায়ক হবে। প্রক্ষেপিত আমদানি প্রবৃদ্ধি শিল্পখাতের সম্প্রসারণের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহসহ বিদ্যুৎ, পরিবহন ও পানিসম্পদ খাতের গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনে সহায়ক হবে।

সারণি ৩.৪ এ বিওপি হিসেবের একটি সংক্ষিপ্ত প্রক্ষেপণ দেখানো হয়েছে। গুরুত্ব যদিও রপ্তানি ও আমদানি গড়ে একই হারে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, তথাপি মার্কিন ডলারের হিসেবে রপ্তানির তুলনায় আমদানির উচ্চ ভিত্তির ফলে অত্র পরিকল্পনা মেয়াদে বহিঃ বাণিজ্য স্থিতি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হবে। তারপরও বাণিজ্য স্থিতি জিডিপি'র ৫-৬ শতাংশের মধ্যেই স্থিতিশীল থাকবে। জিডিপি'র অনুপাতে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৪ শতাংশের মধ্যে রাখতে পারলে বাণিজ্য স্থিতির টেকসহিতা নিশ্চিত করা যাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশি কর্তৃক শিপিং খরচ, বিমান খরচ, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক ঋণ (সরকারি ও বেসরকারি) পরিশোধ ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য

হস্তান্তরযোগ্য ব্যয় এবং এফডিআই ও পোর্টফোলিও বিনিয়োগ থেকে উদ্ভূত আয় স্থানান্তরের কারণে সেবা ও আয় হিসেবের ঘাটতি বৃদ্ধি পাবে। এ সকল কারণে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে বহিঃস্থ চলতি হিসেবের ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ২.৪ শতাংশে দাঁড়াবে। উচ্চ প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পৃক্ত ক্রমবর্ধমান মূলধন ও আমদানি নির্ভর বিনিয়োগ এবং সাধারণ আমদানি চাহিদার আলোকে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে চলতি হিসেবে এ ধরণের ঘাটতি যুক্তিযুক্ত।

চলতি হিসেবের স্থিতিতে সাধারণ আকারের ঘাটতি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিওপি অবস্থান তুলনামূলকভাবে সহনীয় থাকবে। অর্থায়নের দৃষ্টিকোন থেকে শুরুর বছরগুলোতে এমএলটি ঋণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। নতুন প্রতিশ্রুতি ও পাইপলাইনে থাকা বিদ্যমান সহায়তা ব্যবহারে সরকারের দক্ষতা এবং সার্বভৌম (সভরিন) বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার থেকে ঋণ গ্রহণের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে নীট দীর্ঘমেয়াদি ছাড়কৃত বৈদেশিক ঋণ (বৈদেশিক সহায়তা) এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মিশ্রণটি পরিবর্তিত হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বভৌম ঋণের রেটিং এবং দেশের স্থিতিশীল ভাবমূর্তির কারণে সরকার চাইলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে অনুপ্রবেশ করতে পারে। বিওপি অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এটি হলো বিনিয়োগ অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে এফডিআই প্রবাহের সম্ভাব্য ভূমিকা। এফডিআই প্রবাহ সময়ের সাথে সাথে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং ২০২৫ অর্থবছর নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপির অংশ হিসেবে ৩ শতাংশে পৌঁছাবে। এফডিআইয়ের এ বৃদ্ধি একটি কৌশলগত নীতি উদ্দেশ্য যা উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের গতি বাড়াবে। লেনেদেনের ভারসাম্যের স্থিতির নমনীয়তা ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গঠনে সহায়তা প্রদান করবে যা ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে ৯ মাসের আমদানি ব্যয় নির্বাহ করার সক্ষমতা তৈরি করবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহে কোন অপ্রত্যাশিত ঘাটতি দেখা দিলে এ রিজার্ভ সক্ষমতা টেকসই জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করবে।

সারণি ৩.৪: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে লেনদেন ভারসাম্যর সংক্ষিপ্ত বিবরণী

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		(প্রক্ষেপণ)				
বিওপি উপাদান	(ইউএসডি মিলিয়নে)						
বাণিজ্য স্থিতি	-১৫৮৩৫	-১৭০১৭	-১৮০০৫	-১৯৬৯৩	-২১৭৮২	-২৪৩৬১	-২৭৫৪৫
রপ্তানি এফ ও বি (ইপিজেড সহ)	৩৯৬০৪	৩৩৬৭৪	৩৭৭৫৫	৪১৬৪৩	৪৫৯৯৫	৫০৮৭০	৫৬৩৩৯
আমদানি এফ, ও, বি (ইপিজেড সহ)	-৫৫৪৩৯	-৫০৬৯১	-৫৫৭৬০	-৬১৩৩৬	-৬৭৭৭৬	-৭৫২৩২	-৮৩৮৮৩
সেবাসমূহ	-৩১৭৭	-২৯৮৭	-৩০৪৪	-৩৩৪৮	-৩৬৯৯	-৪১০৬	-৪৫৭৮
আদায়	৭১৫৩	৬৭৭০	৭৫৫১	৮১৫৫	৮৮০৮	৯৫১২	১০২৭৩
পরিশোধ	-১০৩৩০	-৯৭৫৭	-১০৫৯৪	-১১৫০৩	-১২৫০৭	-১৩৬১৮	-১৪৮৫২
আয়	-২৯৯৩	-২৭৭৬	-৩২০১	-৩৪৮৯	-৩৮০৩	-৪১৪৫	-৪৫১৮
আদায়	১৯২	১৭২	১৮৯	২০৮	২৩০	২৫৫	২৮৫
পরিশোধ	-৩১৮৫	-২৯৪৮	-৩৩৯০	-৩৭৩৯	-৪১৩০	-৪৫৬৮	-৫০৫৯
চলতি হস্তান্তর	১৬৯০৩	১৮৭৭৫	২০২৬১	২০৪৭৭	২১৯৪৪	২৩৫১৩	২৫১৯২
অফিসিয়াল হস্তান্তর	৪১	১৯	৫০	৬০	৭০	৮০	৯০
বেসরকারি	১৬৮৬২	১৮৭৫৬	২০২১১	২০৪১৭	২১৮৭৪	২৩৪৩৩	২৫১০২
এর মধ্যে, শ্রমিকদের রেমিট্যান্স	১৬১৯৬	১৮০১৪	১৯৪৫৫	২০৮১৭	২২২৭৪	২৩৮৩৩	২৫৫০২
চলতি হিসাব স্থিতি	-৫১০২	-৪০০৫	-৩৯৮৯	-৬০৫৩	-৭৩৪০	-৯১০০	-১১৪৫০
আর্থিক ও মূলধন হিসাব	৬১৪৬	৮২০৮	৯৬১১	১০৯৭০	১৪৫০৩	১৮৮৫৯	২৩৬৭৬
মূলধন হিসাব	২৩৯	২৫৬	২৫০	২৮০	৩১০	৩৪০	৩৭০
মূলধন স্থানান্তর	২৩৯	২৫৬	২৫০	২৮০	৩১০	৩৪০	৩৭০
আর্থিক হিসাব	৫৯০৭	৭৯৫২	৯৩৬১	১০৬৯০	১৪১৯৩	১৮৫১৯	২৩৩০৬
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ	২৬২৮	১৮০৪	২৯৪৮	৫২৩৯	৮১৪১	১১৮৫৯	১৫৮০৮
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (নীট)	১৭১	২৭৬	৩০০	৩৪০	৩৮০	৪২০	৪৬০
নীট সহায়তা ঋণ	৫০৬১	৫৭৩৯	৮৪৭৪	৭৫৮২	৮২২৩	৮৮৭১	৯৭৪৮
ঋণ বণ্টন	৬২৬৩	৬৯৯৬	৯৮৮৬	৯১০০	৯৯৭১	১১০০৫	১২১২০

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		(প্রক্ষেপণ)				
ঋণ এ্যামরটাইজেশন (Amortization)	-১২০২	-১২৫৭	-১৪১২	-১৫১৭	-১৭৪৮	-২১৩৫	-২৩৭১
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	৩০২	৪৩৮	৩৫০	৩২০	৩২০	৩২০	৩২০
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	২৭২	৯৩১	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-২৭১৬	-৯৬৬	-২২১১	-২৩১১	-২৪১১	-২৫১১	-২৬১১
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (নীট)	১৮৯	-২৭০	-৮০০	-৭৮০	-৭৬০	-৭৪০	-৭২০
ভুল ও বাদ পড়া	-৮৬৫	২৯৬	০	০	০	০	০
সামগ্রিক উদ্বৃত্ত	১৭৯	৪৪৯৯	৫৬২২	৪৯১৭	৭১৬৩	৯৭৫৮	১২২২৬
	(অন্যভাবে অথবা নির্দেশিত প্রবৃদ্ধি হার)						
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	৯.১৫	-১৪.৯৭	১২.১২	১০.৩০	১০.৪৫	১০.৬০	১০.৭৫
আমদানি প্রবৃদ্ধি	১.৭৯	-৮.৫৬	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১১.০০	১১.৫০
সেবা আদায় প্রবৃদ্ধি	৫৭.৫৬	-৫.৩৫	১৪.৯৯	১০.৩০	১০.৪৫	১০.৬০	১০.৭৫
সেবা পরিশোধ প্রবৃদ্ধি	১৮.১৮	-৫.৫৫	১০.০০	১০.০০	১০.৫০	১১.০০	১১.৫০
আয় গ্রহণ প্রবৃদ্ধি	১৩.৩৩	-৭.২৫	১২.৩০	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০
রেমিটেন্স প্রবৃদ্ধি	৮.১০	১১.২২	৮.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৭.০০
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
মুদ্রা স্ফীতি হার	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
নামীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১২.৯৮	৯.৯৯	১২.৮৮	১২.৯৮	১৩.১৮	১৩.৪১	১৩.৫০
রিজার্ভ (পণ্য ও সেবাসমূহ আমদানি মাস)	৬.৫	৭.৪	৭.৭	৭.৮	৮.২	৮.৭	৯.৩
নামীয় জিডিপি (ইউএস বিলয়নে)	৩০৩	৩৩০	৩৫৩	৩৮৮	৪২৮	৪৭৪	৫২৭
বিনিময় হার (বাংলাদেশ টাকায়)	৮৪.০০	৮৪.৭০	৮৯.৪০	৯১.৯০	৯৪.২০	৯৬.৫০	৯৮.৬০
মূল্যস্ফীতি (বাণিজ্য আংশীদার) %	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
রপ্তানি জিডিপির (%) হিসেবে	১৫.৪৫	১২.২৫	১২.৮৩	১২.৮৩	১২.৭৯	১২.৭৩	১২.৬৪
আমদানি জিডিপির (%) হিসেবে	২১.৭৩	১৮.৩১	১৮.৭৯	১৮.৭৭	১৮.৭৪	১৮.৭৩	১৮.৭৪
রেমিটেন্স জিডিপির (%) হিসেবে	৫.৩৫	৫.৪৬	৫.৫১	৫.৩৬	৫.২০	৫.০২	৪.৮৪
চলতি হিসাব স্থিতি জিডিপির (%) হিসেবে	-১.৬৯	-১.২১	-১.১৩	-১.৫৬	-১.৭১	-১.৯২	-২.১৭
এফডিআই জিডিপির (%) হিসেবে	০.৮৭	০.৫৪	০.৮৩	১.৩৫	১.৯০	২.৫০	৩.০০
মোট এমএলটি জিডিপির (%) হিসেবে	১.৭৬	২.২৭	২.৮০	২.৩৫	২.৩৩	২.৩২	২.৩০
বাণিজ্য ঋণ নীট জিডিপির % হিসেবে	-০.৯	-০.৩	-০.৬	-০.৬	-০.৬	-০.৫	-০.৫

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

৩.৪ বিনিময় হার নীতি

বিনিময় হারের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং এর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা বাণিজ্য লেনদেনের ভারসাম্যের টেকসহিতা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগতভাবে বাংলাদেশ নমনীয়ভাবে বিনিময় হার পরিচালনা করে আসছে যেখানে রপ্তানি প্রণোদনা চাহিদার সাথে মূল্য স্থিতিশীলতা এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। তথাপি, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের অধিকাংশ সময়েই বিনিময় হারের উপচয় (Appreciation) ঘটেছে যা রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে (চিত্র ৩.৬ এবং ৩.৭)। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৮-১৯ মেয়াদে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার প্রকৃত অর্থে ৩৬ শতাংশ উপচয় ঘটেছে। অন্যদিকে অর্থবছর ২০০৮ থেকে অর্থবছর ২০১৯ পর্যন্ত ইউরোর বিপরীতে টাকার ৪৮ শতাংশ উপচয় ঘটেছে। ইউরোর ক্ষেত্রে অধিক উপচয় বাংলাদেশি টাকার সাথে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার কিছুটা বেঁধে দেয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত করে অর্থাৎ ইউরোর তুলনায় বাংলাদেশি টাকা বেশি শক্তিশালী হয়েছে। তবে মার্কিন ডলারের উপচয়ও ইউরোর বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার শক্তিশালী হওয়ার একটি অন্যতম উৎস। বিশ্বের দুটি প্রভাবশালী মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার এ উপচয় (Appreciation) রপ্তানি সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং রপ্তানি বহুমূখীকরণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছে কারণ এ দুটি মুদ্রায় বাংলাদেশ অধিকাংশ রপ্তানি বাণিজ্য সম্পাদন করে থাকে।

চিত্র ৩.৬: বাংলাদেশি টাকা-মার্কিন ডলার এর চলতিমূল্য এবং প্রকৃত বিনিময় হারের গতিপ্রবাহ

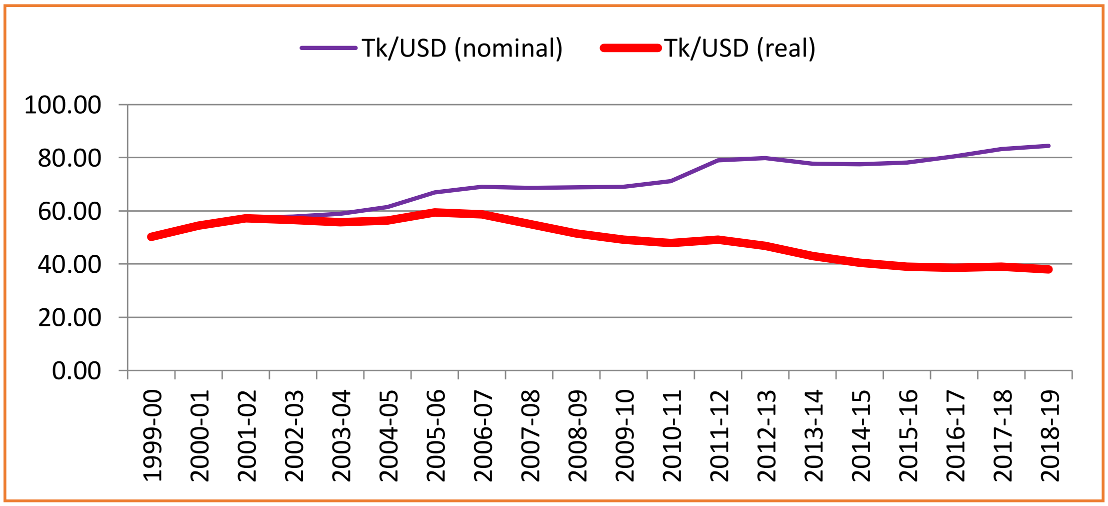

উৎস: জিইডি মূল্যায়ন

চিত্র ৩.৭: বাংলাদেশি টাকা-ইউরো এর চলতিমূল্য ও প্রকৃত বিনিময় হারের গতিপ্রবাহ

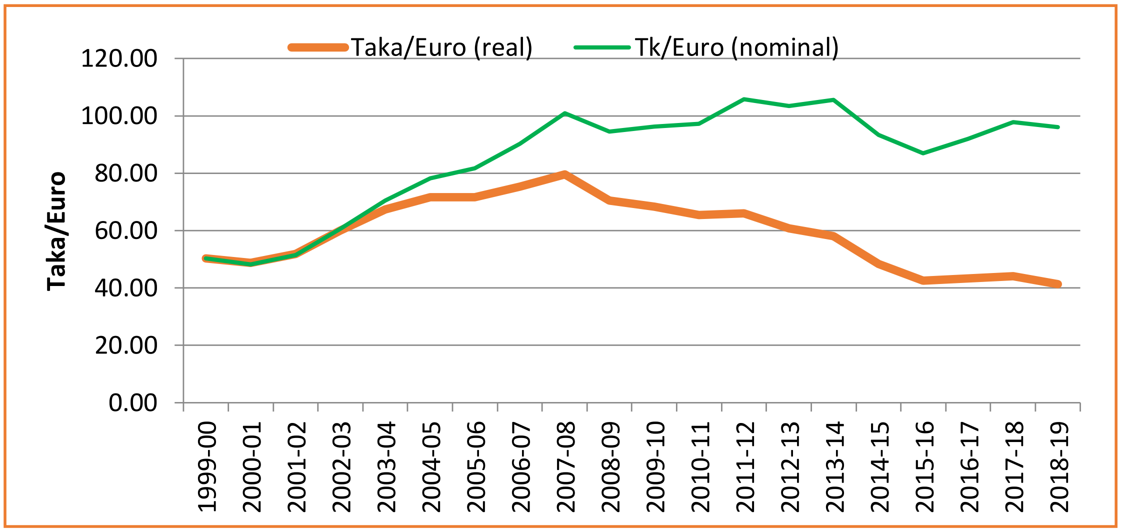

উৎস: জিইডি মূল্যায়ন

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং বিনিময় হারে নমনীয়তা আনয়নের মাধ্যমে পূর্বের প্রকৃত বিনিময় হারের উপচয় সংশোধন করে সামনের বছরগুলোতে যেন বিনিময় হারের উপচয় প্রতিহত করা যায় সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রপ্তানি বহুমূখীকরণে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের নমনীয় ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই ব্যবস্থাপনা যাতে মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩.৫ আর্থিক সেবাখাতের অবদান এবং মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক

৩.৫.১ ব্যাংকিং খাতের পরিকৃতি

ব্যাংকিং খাতের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশকে বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা ও পশ্চাদপদতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ব্যাংকিং খাতের সংস্কার ১৯৮০ এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৯০ এবং ২০০০ এর দিকে অধিকতর বেগবান হয়। ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ কর্মসম্পাদন সূচকের ক্ষেত্রে এ সংস্কার অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। ব্যাংকিং খাতের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলোই ১৯৯৯ সালে ঘটেছে যা এ খাতের গুণগত মান ও অবস্থানকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্যাংকিং খাত ৬ষ্ঠ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বেশ কয়েকটি বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিল তবে আর্থিক গভীরতার (ফিন্যান্সিয়াল ডেপ্টথ্) বিচারে সামগ্রিক অবস্থানের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকিং খাতের গভীরতা বিচারের বহুল প্রচলিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এমটু/জিডিপি অনুপাত এবং ব্যাংক ঋণ/জিডিপি অনুপাতে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। একটি সুগঠিত পুঁজিবাজারের অভাবের কারণে, বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণে বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধিই সবচেয়ে মুখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাংকিং খাতের পরিকৃতি কম সন্তোষজনক ছিল। বিশেষ করে, ব্যাংকিং খাতের গভীরতা মাপের উভয় সূচকই কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। ফলে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের গতি কিছুটা স্থবির হয়ে পড়েছিল (চিত্র ৩.৮)। পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশ থেকে বাংলাদেশ এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আর্থিক গভীরতার দিক থেকে বাংলাদেশ ভারত ছাড়াও চীন ও ভিয়েতনামের মত দেশসমূহ থেকেও পিছনে রয়েছে (সারণি ৩.৫)।

চিত্র ৩.৮: ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের প্রবৃদ্ধিও নির্দেশকসমূহ

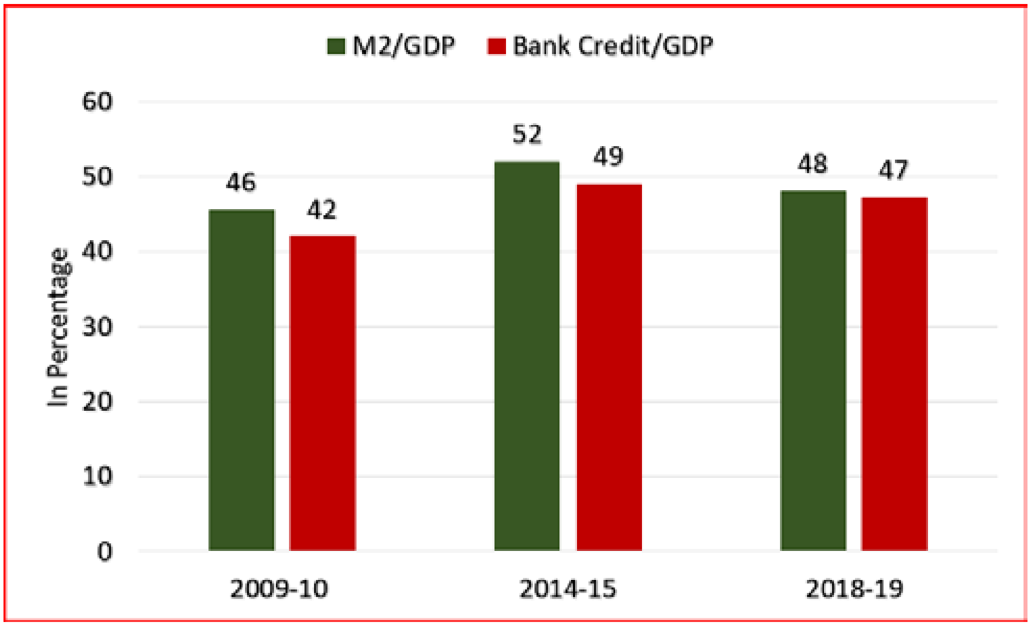

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৩.৫: বিভিন্ন দেশসমূহের ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের নির্দেশক (২০১৮)

দেশ	এমটু/জিডিপি	ব্যাংক ঋণ/ জিডিপি
বাংলাদেশ	৬৪.৩	৪৬.৮
চীন	১৯৯.১	১৬১.১
ভারত	৭৩.৭	৫০.০
পাকিস্তান	৫৮.০	১৮.৮
ভিয়েতনাম	১৫৮.১	১৩৩.১

উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক, বিশ্ব ব্যাংক এবং আর্থিক সুস্থতা নির্দেশক, আইএমএফ

ব্যাংকিং খাতের সুস্থতা পরিমাপের সকল গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের একটি হলো মোট ঋণের অনুপাতে 'নন-পারফর্মিং (এনপিএল)' বা শ্রেণিকৃত ঋণের স্থিতি। সারণি ৩.৬ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে শ্রেণিকৃত ঋণের অনুপাত ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৯ সালে শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৪১ শতাংশ যা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে সরকার (এসসিবি) ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের (পিসিবি) ক্ষেত্রে ২০১১ সালে সর্বনিম্ন ৬.১ শতাংশে নেমেছিল যা শ্রেণিকৃত ঋণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি অনন্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত। বিশেষ করে, বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে এনপিএল এর অনুপাত ১৯৯৯ সালের ২৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে ৩ শতাংশেরও নিচে অবস্থান করেছিল, তবে ২০১৪ সালে তা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয়

শর্তাদি মেনে মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে শিল্প খাতওয়ারী ‘ঝুঁকি ভারিত মূলধনের পর্যাপ্ততা’ অনুপাত জুন ২০১১ এ ১১ শতাংশের উপরে বিরাজমান ছিল। সরকার পরিচালিত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ‘ঝুঁকি ভারিত মূলধনের পর্যাপ্ততা’ অনুপাত ১৯৯৯ সালে মাত্র ৫.৩ শতাংশ ছিল যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১ সালে ১১.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকল্পে সরকার এসব ব্যাংকগুলোতে মূলধন পুণর্ভরণে সহায়তা প্রদান করেছে। সংস্কার-পরবর্তী দৃশ্যপটে ব্যাংকিং খাতের সূচকগুলোতে অনুকূল ফলাফল আনয়নের দিক থেকে ২০১১ সাল ছিল তাৎপর্যমন্ডিত।

সারণি ৩.৬: ব্যাংকিং খাতের অবস্থা নির্দেশক (শতকরা)

নির্দেশক	১৯৯৯ (সংস্কার পূর্ব বেইজলাইন)	২০১১ (সবচেয়ে ভালো বছর)	২০১৯ (সাম্প্রতিক প্রাপ্যতা)
শ্রেণিকৃত: সামগ্রিক	৪১.১	৬.১২	১১.৯৯
শ্রেণিকৃত: বেসরকারি ব্যাংক	২৭.১	২.৯৫	৭.৪৩
শ্রেণিকৃত: বৈদেশিক ব্যাংক	৩.৮	২.৯৬	৬.০১
শ্রেণিকৃত: রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৫.৬	১১.২৭	৩১.৫০
শ্রেণিকৃত: সরকারি ডিএফআইএস	৬৫.০	২৫.৫৫	১৭.৮১
ঝুঁকি ভারিত মূলধন অনুপাত: সামগ্রিক	৭.৪	১১.৩৫	১১.৭০
ঝুঁকি ভারিত মূলধন অনুপাত: বেসরকারি ব্যাংক	১১.০	১১.৪৯	১২.৭০
ঝুঁকি ভারিত মূলধন অনুপাত: বৈদেশিক ব্যাংক	১৫.৮	২০.৯৭	২৮.৭০
ঝুঁকি ভারিত মূলধন অনুপাত: রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৫.৩	১১.৬৮	৮.৫০
ঝুঁকি ভারিত মূলধন অনুপাত: সরকারি ডিএফআই	৫.৮	-৪.৪৯	-৩১.২০

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে যে তিনটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তা হলোঃ বাজার শেয়ার দখলের প্রতিযোগিতা, উন্নত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ এবং উত্তম তদারকি। ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের নিকট ব্যাংকিং খাত উন্মুক্ত করে দেয়াই ছিল সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারণী সিদ্ধান্ত। এ প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের অনুপাত ২০০১ সালের ৩৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ সালে ৭৮ শতাংশে পৌঁছেছে। একই সাথে উক্ত সময়ে মোট আমানতের অনুপাত ৩৩ শতাংশ থেকে সম্প্রসারিত হয়ে ৭১ শতাংশে উন্নীত হয় (চিত্র ৩.৮)।

সারণি ৩.৭: বাংলাদেশের ব্যাংকি ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন

বছর	আমানত (বিলিয়ন টাকা)		জমা (শতকরা অংশ)		ঋণ (বিলিয়ন টাকা)		ঋণ (শতকরা অংশ)	
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি
১৯৯৭	৩৪২	১৬৮	৬৭	৩৩	২৩১	১৩৭	৬৩	৩৭
২০০০	৪০০	২১৩	৬৫	৩৫	২৮২	১৬৬	৬৩	৩৭
২০০৪	৫৪৪	৫১৫	৫১	৪৯	৩৮৭	৪২০	৪৮	৫২
২০০৮	৪১৪	১৯০২	১৮	৮২	৫৭৩	১২৪৩	৩২	৬৮
২০১০	৫৯৯	২৭৬৮	১৬	৮৪	৭৩৭	১৮৩৭	২৯	৭১
২০১৫	১৭৫৭	৫৯৬৭	২৩	৭৭	১২৯১	৪০৭০	২৪	৭৬
২০১৮	৩১৩৯	৬৭৯৬	৩২	৬৮	১৮০২	৬৩৫৬	২২	৭৮
২০১৯	৩২৯০	৭৫৯৪	৩০	৭০	২০১৪	৭১৫২	২২	৭৮
২০২০	৩৫৪৬	৮৫০৯	২৯	৭১	২২৬৯	৭৮৫৮	২২	৭৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বাসেল-১ ও বাসেল-২ এর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানগুলো প্রগতিশীলভাবে কঠোর করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি করার ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অনেক প্রচেষ্টাও গৃহীত হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ বাসেল-৩ ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন শুরু করেছে কিন্তু এর অগ্রগতি থমকে আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সুস্থতা মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে। সারণি ৩.৬ অনুযায়ী এনপিএল এর অনুপাত ২০১১ সালের ৬ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ঋণ পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রেই অধিকাংশ অধঃপতন হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ে এনপিএল অনুপাত ১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ শতাংশে পৌঁছায়। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রেও কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর এনপিএল অনুপাত ৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশের উপরে পৌঁছেছিল। রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ঝুঁকি ভারিত মূলধনের পর্যাপ্ততাও হ্রাস পেয়েছে এবং সরকারি ডিএফআই'গুলো আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয়ে পড়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কয়েকটি নীতি সংস্কারের চিন্তা করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, বাসেল-৩ বিধিবিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন, কর্পোরেশনে রূপান্তরের মাধ্যমে সরকারি ব্যাংকের অবস্থার উন্নয়ন যাতে তারা মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়, উচ্চ-ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণগ্রহণকারীর সাথে লেনদেন কার্যক্রম হ্রাস করা এবং ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে অনাদায়ী ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সুচিন্তিত নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন বাড়ানো। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুদ্রা সংক্রান্ত প্রক্ষেপণ এবং ঋণ বরাদ্দের অনুসিদ্ধান্তসমূহ দূরদর্শী ব্যাংকিং সংস্কার বাস্তবায়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৩.৫.২ মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

একটি বিচক্ষণ মুদ্রানীতির অপরিহার্যতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত সচেতন। এ কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেকটি মুদ্রানীতি বিবরণীতে প্রধান প্রধান মুদ্রা সংক্রান্ত সামষ্টিক চলকের জন্য পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মূল্যস্ফীতিসহ বহিঃখাত সৃষ্ট চাপ কমানোর লক্ষ্যে ২০১২ অর্থবছরে একটি সতর্ক ও সংযত মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বি-বার্ষিক মুদ্রানীতি বিবরণীর মাধ্যমে এই দূরদর্শী মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা যাতে মূল্যস্ফীতি এবং বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিক খেয়াল রাখা হয়েছে। মুদ্রা সরবরাহ এবং বেসরকারি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে (এমটু) বাংলাদেশ ব্যাংক খুবই বাস্তবসম্মত লক্ষ্য স্থির করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক খুবই নিবিড়ভাবে এর বাস্তবায়ন তদারকি করেছে। ফলে কর্মসম্পাদনের প্রকৃত অবস্থা মোটামুটি সঠিক পথেই ছিল। রাজস্ব ঘাটতির ওপর কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণ এ সকল উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করেছে।

সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতির হার ৫-৬ শতাংশের মধ্যে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, যা আরো কিছুটা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা আছে (চিত্র ৩.৯)। এটি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান শক্তি হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা। এই সফলতার ওপর ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত রচিত হয়েছে এবং এ দলিলে মূল্যস্ফীতি আরো হ্রাস পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর সাথে সম্পর্কিত মুদ্রানীতি ও ঋণ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি এবং বিওপি'র লক্ষ্যমাত্রার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ (সারণি ৩.৮)।

চিত্র ৩.৯: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল্যস্ফীতি পরিকৃতি

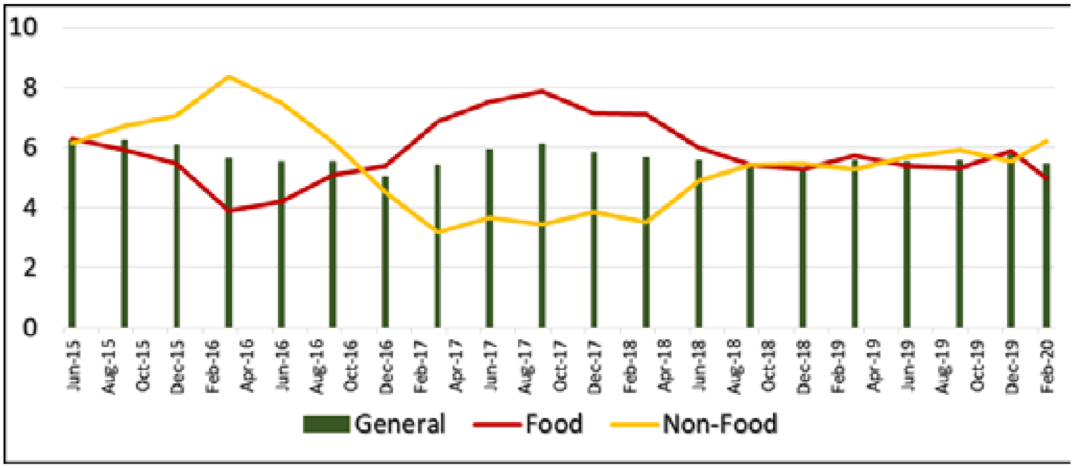

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো: (বিবিএস)

সারণি ৩.৮: বাংলাদেশ মুদ্রা জরিপ, অর্থবছর ১৯-২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
উপাদান	(বিলিয়ন, টাকা)						
ব্রড মানি	**১২১৯৬**	**১৩৭৩৭**	**১৫৬২২**	**১৭৮০৩**	**২০২৬৫**	**২২৯৮৩**	**২৬০৮৬**
নীট বৈদেশিক সম্পদ	**২৭২৪**	**৩০১৫**	**৩৫১৭**	**৩৯৬৯**	**৪৬৪৪**	**৫৫৮৬**	**৬৭৯১**
নীট দেশজ সম্পদ	**৯৪৭২**	**১০৭২৩**	**১২১০৫**	**১৩৮৩৪**	**১৫৬২১**	**১৭৩৯৭**	**১৯২৯৫**
দেশীয় ঋণ (ক+খ+গ) স্বত্ত্ব	১১৪৬৯	১৩০২৬	১৪৭৯৫	১৬৮৩৯	১৯১৫৪	২১৭২৫	২৪৬৬৪
ক. সরকারের (নীট) স্বত্ত্ব	১১৩৩	১৭৬২	১৯৪০	২১৪০	২৩৬৪	২৬১৪	২৮৯৫
খ. সরকারি স্বত্ত্ব	২৩৪	২৯২	৩২১	৩৫৪	৩৮৯	৪২৮	৪৭১
গ. বেসরকারি খাতের স্বত্ত্ব	১০১০৩	১০৯৭৩	১২৫৩৩	১৪৩৪৫	১৬৪০১	১৮৬৮৩	২১২৯৮
নীট অন্যান্য সম্পদ	-১৯৯৭	-২৩০৪	-২৬৯০	-৩০০৫	-৩৫৩২	-৪৩২৭	-৫৩৬৯
	(শতকরা পরিবর্তন)						
ব্রড মানি	**৯.৮৮**	**১২.৬৪**	**১৩.৭২**	**১৩.৯৬**	**১৩.৮৩**	**১৩.৪১**	**১৩.৫০**
নীট বৈদেশিক সম্পদ	**২.৯২**	**১০.৬৭**	**১৬.৬৭**	**১২.৮৫**	**১৭.০০**	**২০.২৮**	**২১.৫৮**
নীট দেশজ সম্পদ	**১২.০৬**	**১৩.২০**	**১২.৮৯**	**১৪.২৮**	**১২.৯২**	**১১.৩৭**	**১০.৯১**
দেশীয় ঋণ (ক+খ+গ)	১২.২৬	১৩.৫৮	১৩.৫৭	১৩.৮২	১৩.৭৫	১৩.৪২	১৩.৫৩
ক. সরকারের (নীট) স্বত্ত্ব	১৯.৩৭	১০.০০	১০.১৫	১০.৩০	১০.৪৫	১০.৬০	১০.৭৫
খ. সরকারি স্বত্ত্ব	২১.৬৪	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
গ. বেসরকারি খাতের স্বত্ত্ব	১১.৩২	১৩.১৪	১৪.২২	১৪.৪৬	১৪.৩৩	১৪.১৭	১৪.০০
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
মুদ্রা বিনিময়ের গতিবেগ	২.০৮	২.০৪	২.০২	২.০০	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
মূল্যস্ফীতি হার (%)	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
নামীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১২.৯৮	৯.৯৯	১২.৮৮	১২.৯৮	১৩.১৮	১৩.৪১	১৩.৫০
সামগ্রিক স্থিতি (মিলিয়ন ডলার)	১৭৯.০	৪৪৯৯.০	৫৬২১.৭	৪৯১৭.১	৭১৬২.৭	৯৭৫৮.২	১২২২৫.৭
সামগ্রিক স্থিতি (বিলিয়ন ডলার)	০.১৮	৪.৫০	৫.৬২	৪.৯২	৭.১৬	৯.৭৬	১২.২৩
নামীয় বিনিময় হার (টাকা/মার্কিন ডলার)	৮৪.০০	৮৪.৭০	৮৯.৪০	৯১.৯০	৯৪.২০	৯৬.৫০	৯৮.৬০
সামগ্রিক ভারসাম্য (বিলিয়ন, টাকা)	১৫.০৪	৩৮১.০৭	৫০২.৫৮	৪৫১.৮৮	৬৭৪.৭২	৯৪১.৬৭	১২০৫.৪৫
নামীয় জিডিপি (বিলিয়ন, টাকা)	২৫৪২৫	২৭৯৬৪	৩১৫৬৫	৩৫৬৬১	৪০৩৬৩	৪৫৭৭৬	৫১৯৫৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

৩.৫.৩ সুদ হার নীতি

২০১১ এর জানুয়ারি থেকে মুদ্রাব্যবস্থা সংক্রান্ত উন্নয়ন মুদ্রানীতি বিবরণীতে (এমপিএস) উল্লিখিত পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সঠিক পথেই এগিয়ে চলছে। মুদ্রানীতি সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হারের মত নীতি নির্দেশনার বদলে মূলত পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে যে উপরোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যেকোন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামর্থ্যের বাইরে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের মত, মুদ্রানীতির সঞ্চালন বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অকার্যকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ট্রেজারি বিল এবং বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন একটি উত্তম সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও দক্ষ মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি।

সরকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর মুখে, ঋণের ওপর সুদের হার হ্রাস করে ৯ শতাংশে নামিয়ে আনতে সহায়তা করেছে। মধ্যম মেয়াদে সরকার গবেষণা ও প্রামাণিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সুদের হার ব্যবস্থাপনার দিকে সতর্ক দৃষ্টি প্রদান করবে।

দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সুদের হার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রথমত দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সঞ্চয়কে গতিশীল করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যয় হ্রাস করার গুরুত্ব।

প্রামাণিক তথ্যে এটি দেখা যায় যে, গত কয়েক বছরে সুদের হার কমানোর প্রচেষ্টা প্রকৃত আমানতের হারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ফলে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যাংক আমানতের প্রবৃদ্ধির হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে (চিত্র ৩.১০)। বর্ধনশীল শ্রেণিকৃত ঋণ এর মুখে আমানতের স্থবির প্রবৃদ্ধি ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারল্য ও মুনাফা সংকট তৈরি করতে পারে। এতে করে আর্থিক লেনদেন হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত হবে। এটি ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতাও ব্যাহত করতে পারে। প্রকৃত আমানত হারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে এবং আর্থিক লেনদেনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে ঋণদানের ওপর সুদের হার কমাতে হলে ব্যাংকিং খাতের কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে মোকাবেলা করতে হবে।

চিত্র ৩.১০: জিডিপি অনুপাতে আমানতের সাম্প্রতিক গতিপ্রবাহ (শতকরা)

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

যেসকল কাঠামোগত বিষয়সমূহ সাধারণত সুদের হারের ওপর প্রভাব ফেলে সেগুলো হলোঃ ব্যাংকিং ব্যবস্থার দক্ষতা (প্রশাসনিক ব্যয়, ঝুঁকি ও মুনাফার ভারসাম্য রক্ষাপূর্বক ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, পুঁজির ওপর মুনাফা প্রভৃতি); আর্থিক বাজারের উন্মুক্ততা (মূলধন হিসেবের উন্মুক্ততা); আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নের অবস্থা বিশেষতঃ বন্ড মার্কেট প্রভৃতি।

একটি সুব্যবস্থিত ও তুলনামূলকভাবে অধিকতর দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণদান ও আমানতের ওপর সুদের বিস্তৃতি ২ থেকে ৩ শতাংশের মধ্যে হয়ে থাকে যেটি বাংলাদেশে ৫ শতাংশেরও বেশি। এই উচ্চ বিস্তৃতি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার অদক্ষতা ও কাঠামোগত দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনটি প্রধান উপাদানের উন্নয়নের দ্বারা বিস্তৃতির ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে:

(১) ব্যাংকের প্রশাসনিক ব্যয়, বিশেষ করে সুদের ব্যয় বাদ দিয়ে পরিচালন ব্যয় সাধারণত খুব বেশি নয়। তবে অধিকতর দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থা ও নিম্ন বিস্তৃতি সংবলিত দেশগুলোর সাথে তুলনা করা হলে এ ক্ষেত্রে আরো উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

(২) শ্রেণিভুক্ত ঋণের সাথে সম্পর্কযুক্ত সঞ্চিতির প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই সুদের হারের বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের মোট ও নীট এনপিএল অনুপাত সবসময়ই সমপর্যায়ের দেশগুলো থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকের শ্রেণিকৃত মুনাফার ওপর কর্পোরেট করের হারও সুদের হারকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৪২.৫ শতাংশ যা এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। এটি সুদের হারের বিস্তৃতির ওপর প্রভাব ফেলে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দেশজ সঞ্চয় ও আমানতের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো আমানতকারীদেরকে যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিকভাবে ইতিবাচক প্রকৃত সুদের হার প্রদান অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত ও ঋণদান হার কাঠামোতে নিম্নগামিতা নিশ্চিত করতে মূল্যস্ফীতি হার আরো হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। একই সাথে বাংলাদেশে এনপিএল এর উচ্চ হার, যা ১২ শতাংশেরও অধিক যেখানে চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মত দেশগুলোতে মাত্র ১-৩ শতাংশ, আমাদের আমানত ও ঋণদানের সুদের বিস্তৃতি কমানোর লক্ষ্যে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অদক্ষতা হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারের ভারসাম্য নষ্ট না করে ঋণদানের ওপর সুদের হার কমানোর লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও তদারকি শক্তিশালীকরনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

একটি রীতি হতে পারে যে প্রকৃত গড় আমানতের ওপর সুদের হার ২-৩ শতাংশে এবং প্রকৃত গড় ঋণের ওপর সুদের হার ৬-৭ শতাংশে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা, যেটি মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান বা তা থেকে কিছুটা কম হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার ঋণের ওপর আরোপিত সুদের হার ঐসকল ঋণের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাজার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

দীর্ঘমেয়াদে আগামী ২০ বছরে যেহেতু বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) হতে উচ্চ আয়ের (HIC) দেশে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা করে তাই এটি যথাযথ যে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রশাসনিক ভাবে নির্ধারিত সুদের হার নীতির পরিবর্তে একটি উপযুক্ত বাজার-চালিত সুদের হার নীতি গ্রহণ করবে। অন্যান্য উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মত, বাংলাদেশ উপযুক্ত মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুদের হারকে প্রভাবিত করতে পারে। বর্তমানে একটি সুবিকশিত বন্ড মার্কেটের অভাবে মুদ্রানীতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের (প্রয়োজনীয় রিজার্ভ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিসকাউন্ট হার এবং ট্রেজারি বিলের ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত খোলা বাজার কার্যক্রম) মধ্যকার সংযোগ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সরকার বেসরকারি লেনদেনের জন্য ট্রেজারি বিল (টি-বিল) বাজার উন্মুক্ত করার মাধ্যমে বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন সাধন করতে পারে। তাহলে এটি অন্যান্য সুদের হারের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এটি করা গেলে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির একটি প্রধান উপাদান হিসেবে টি-বিল সরবরাহের মাধ্যমে সুদের হারকে বেশি কার্যকর উপায়ে প্রভাবিত করতে পারবে। এটি সুদের হার ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করে তুলবে এবং সঞ্চয়কারীদেরকে নিরাপদ আর্থিক সম্পদের প্রস্তাব দিতে পারবে। ফলশ্রুতিতে আমানত সংগ্রহ বেগবান হবে কারণ ব্যাংকগুলো টি-বিলের পরিবর্তে আকর্ষণীয় আর্থিক পণ্যের মাধ্যমে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারবে।

৩.৫.৪ পুঁজিবাজার উন্নয়ন কৌশল

গত আড়াই দশকে পুঁজিবাজার অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক অগ্রগতির ভেতর দিয়ে গিয়েছে যার ফলে পুঁজিবাজারে বহুমূখী মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়েছে। বর্তমানে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা নিম্নোক্ত ধরণেরঃ স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক ডিলার/স্টক ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপক, সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি, ট্রাস্টি বা জিম্মাদার, এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ। পুঁজিবাজারের প্রাথমিক খাতটি ইক্যুইটি (শেয়ার) ও বন্ড উপকরণের সরকারি ও বেসরকারি প্রস্তাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়। আর মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি খাতটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। এ সকল এক্সচেঞ্জের উপকরণগুলি হলো ইক্যুইটি সিকিউরিটি (শেয়ার), ডিবেঞ্চার, কর্পোরেট বন্ড এবং ট্রেজারি বন্ড। বাংলাদেশের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা।

পুঁজিবাজার উন্নয়নের সূচক: ২০০৭-২০১০ মেয়াদে আর্থিক বাজারের অন্যান্য অংশের চেয়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। শেয়ারের মূল্যায়নের তুলনায় অর্থনীতির মৌলিক উপাদানসমূহের কারণেই পুঁজিবাজারের এই প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পরবর্তীতে, অনুমাননির্ভর শক্তিগুলো বাজারের প্রধান নির্দেশকসমূহ যেমন বাজার ক্যাপিটালাইজেশন, মূল্য উপার্জন অনুপাত এবং বাজার টার্ণওভারের মত বিষয়গুলোকে একটি অনন্য পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীতে এটি প্রসারণশীল মুদ্রানীতি ও স্টক এক্সচেঞ্জের কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আরো বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ২০১১ সালের প্রথম দিকে শেয়ার বাজারের এই বাবল ফেটে পড়ে। তখন থেকে শেয়ার বাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য ধারাবাহিক সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এখনো শেয়ার বাজার ভঙ্গুর রয়ে গিয়েছে এবং অনিশ্চয়তায় ঘেরা।

সারণি ৩.৯ তে পুঁজিবাজার উন্নয়নের কিছু প্রধান প্রধান সূচকের তিনটি ভিন্ন সময়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে। অর্থবছর ২০০৭ বাবল-পূর্ব, অর্থবছর ২০১০ শেয়ার বাজারের বাবলের সর্বোচ্চ অবস্থা এবং অবশেষে অর্থবছর ২০১৯ সাম্প্রতিক অবস্থা নির্দেশ করছে। এটি সহজেই অনুমেয় যে, ২০০৭-২০১০ মেয়াদে বাজার ক্যাপিটালাইজেশন এবং ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছায়।

সারণি ৩.৯: পুঁজিবাজার উন্নয়নের নির্দেশক সমূহ (ডিএসই)

	অর্থবছর ২০০৭ (বাবল পূর্ববর্তী অবস্থা)	অর্থবছর ২০১০ (বাবল চলাকালীন অবস্থা)	অর্থবছর ২০১৯ সাম্প্রতিক
তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির সংখ্যা	২৮১	২৭৯	৩৬৩
ইস্যুকৃত ও ঋণ (বিলিয়ন টাকা)	৮৪	২১৩	৭২০
বাজারপুজিকরণ (বিলিয়ন টাকা)	৪১২	২,২৭৭	৩,৪৩৭
টার্নওভার (বিলিয়ন টাকা)	০.২	২.৭	৪.০
সাধারণ মূল্য সূচক	২,১৪৯	৬,১৫৪	প্রযোজ্য নয়
ডিএসই ইনডেক্স	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৫,৪২২
ডিএসই -৩০ সূচক	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১,৯২৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

গুরুত্বপূর্ণ শেয়ার বাজার সংস্কার: এই প্রেক্ষাপটে সরকার এডিবি'র সহায়তায় সিএমডিপি২ শীর্ষক একটি উল্লেখযোগ্য পুঁজিবাজার উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সিএমডিপি২-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো:

(ক) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) দায়িত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে বাজারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা;

(খ) পুঁজিবাজারের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প প্রণয়ন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত মানদন্ডের উন্নয়ন, প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডের দ্রুত মীমাংসা, তালিকাভূক্ত কোম্পানিগুলোর সুশাসনের উন্নয়ন এবং শেয়ারবাজারের ডিমিউচুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে বাজার সহায়তা জোরদার করা; এবং

(গ) ইক্যুইটি এবং বন্ড ইস্যুকরণে প্রণোদনা দান, তরল পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করা।

ঝুঁকি নিরসন, শেয়ার বাজার লেনদেনের ও তথ্যের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, কর প্রণোদনার মধ্যে সংযোগ সাধন এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারসহ নানা ধরণের সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জিত অগ্রগতি খুবই ইতিবাচক ছিল তবে কিছু প্রতিবন্ধকতা এখনো রয়ে গেছে। প্রথমত, বিএসইসি'র সামগ্রিক কর্মকাণ্ড আশানুরূপ হয়নি। অনিয়ম, বিলম্বিত ও জটিল আইপিও প্রক্রিয়া, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আইপিও'র জন্য নিম্নমানসম্পন্ন কোম্পানির অনুমোদন, অপর্যাপ্ত ও সময়োচিত নজরদারির অভাবে শেয়ার মূল্যের সন্দেহজনক গতিবিধি প্রভৃতি কারণে শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি'র সুশাসন ব্যবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গ্রামীণ ফোনের তালিকাভুক্তির পর কোন খ্যাতনামা দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, সময়ের সাথে সাথে অর্থনীতির মৌলিক উপাদানগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা, টেক্সটাইল এবং অন্যান্য খাতসমূহে। এ সকল খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা অর্জনের সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে এদের শেয়ার মূল্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশি টাকার মূল্যহ্রাসের আশংকায় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ নগদ টাকা গুটিয়ে চলে যাচ্ছে অথবা বাজারে অনুপ্রবেশ করছে না। তারা মনে করছে বাজারে টাকা অতিমূল্যায়িত অবস্থায় রয়েছে। তৃতীয়ত, ব্যাংকিং খাতের তারল্য ঘাটতির কারণে পুঁজিবাজার তারল্য সংকটে ভুগছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেকটি ব্যাংকের জন্য পুনঃ ডিসকাউন্ট জানালা (রিডিসকাউন্ট উইন্ডো) খুলেছে যাতে তারা পুঁজিবাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য ভর্তুকিকৃত সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ২ বিলিয়ন টাকা পর্যন্ত ধার নিতে পারে।

বাজার ক্যাপিটালাইজেশনের পুনরুদ্ধার: জিডিপি'র তুলনায় বাজার ক্যাপিটালাইজেশন ২০০৫ সালের ৫.৫ শতাংশ হতে সর্বোচ্চ ২৯ শতাংশে পৌঁছানোর পর ২০১৯ এর জুন-এ ১৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও বাজার ক্যাপিটালাইজেশন এখনো পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হয়নি, তবে এটি ১৪-১৬ শতাংশের মধ্যে স্থিতিশীল থাকার কারণে এর নিম্নগামিতা রোধ করা গেছে। এটি একটি ইতিবাচক উন্নয়ন যা শেয়ার বাজারের অস্বাভাবিক উঠানামা ও অনিশ্চয়তা কমিয়েছে এবং শেয়ার বাজার সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছে।

চিত্র ৩.১১: অর্থবছর ২০০৭ থেকে অর্থবছর ১৯ পর্যন্ত জিডিপি অনুপাতের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন

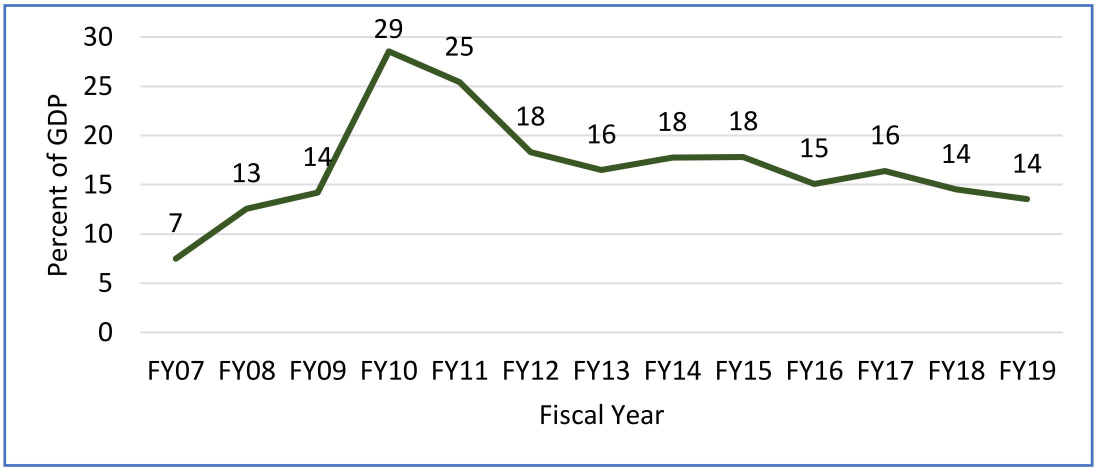

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক মাসিক অর্থনৈতিক ধারা

মূল্য-উপার্জন অনুপাত: মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্যমান মূল্য-উপার্জন অনুপাত (পি/ই অনুপাত), যা জুন ২০১৯ এ ১৪.২৫- তে উন্নীত হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশি আকর্ষণীয় কারণ ২০১০ সালের জুন এ গড় পি/ই অনুপাত ছিল ২৪.০৮ (চিত্র ৩.১২)। ফলে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ ফিরে এসেছে। পি/ই অনুপাত ১৪-১৬ এর মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে যা পুঁজিবাজারের জন্য উত্তম।

চিত্র ৩.১২: অর্থবছর ২০১০ থেকে অর্থবছর ২০১৯ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পি/ই অনুপাত

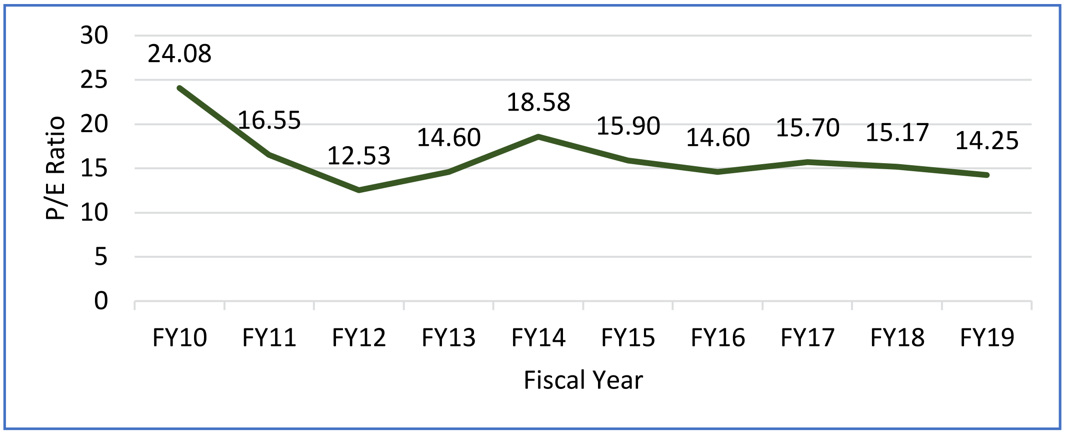

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ মাসিক পর্যালোচনা

ডিএসই'র অতীত পরিকৃতি এবং সমপর্যায়ের আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে যে বিষয়গুলো দৃশ্যমান হয় তা হলো:

- জুলাই ২০১৯ এ ডিএসই'র গড় মূল্য-উপার্জন (পি/ই অনুপাত) ছিল ১৩.৫ যা থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা এবং হংকংসহ অধিকাংশ দেশের কাছাকাছি অবস্থান করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভারত যেখানে শেয়ার অতিমূল্যায়িত ছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং অনেকের মতে ভারতীয় বাজারের মূল্যায়ন বাজারের মৌলিক উপাদান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
- উক্ত সময়ে বাংলাদেশে শেয়ার বাজারে লভ্যাংশের হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি ছিল যা সমপর্যায়ের আঞ্চলিক দেশগুলোর বিচারে ভাল বলে গণ্য করা যায়।

চিত্র ৩.১৩: বাংলাদেশ ও কিছু এশীয় বাজারের পি/ই অনুপাত (জুলাই ২০১৯)

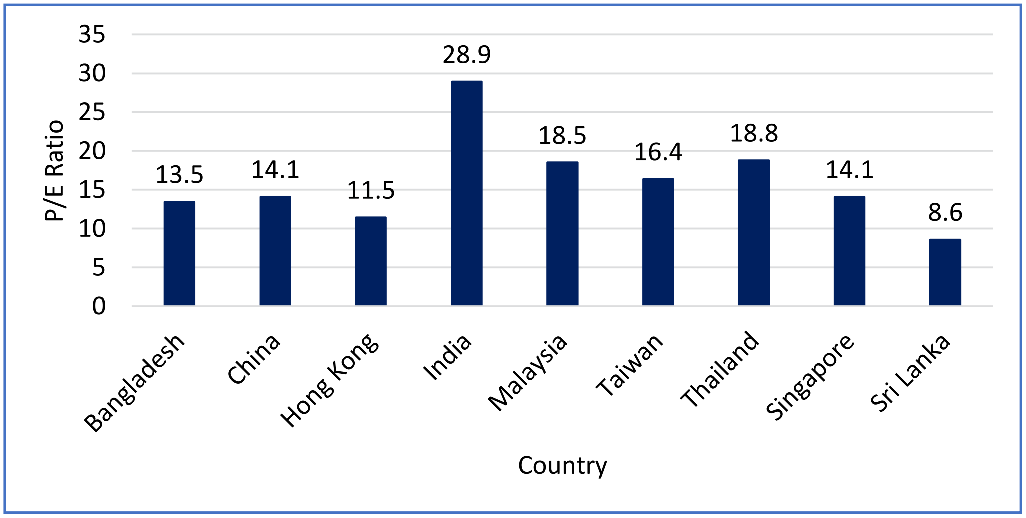

উৎস: সিইআইসি

বাজার ক্যাপিটালাইজেশনে টার্ণওভারের অংশ: বাজারের গতিশীলতা সাধারণত বাজারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় যেমন-দৈনিক টার্ণওভারের মূল্য অথবা বিক্রয়/ক্রয়ের পরিমাণ। দৈনন্দিন টার্ণওভারের অস্থিতিশীলতা ফিল্টার বা পরিশোধনের জন্য বাজার ক্যাপিটালাইজেশনে ডিএসই'র দৈনিক টার্ণওভারের ২০-দিন ব্যাপী চলমান গড় পরিমাপ করা হয়। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেলেও টার্ণওভার অনুপাতটি ২০০৪-০৫ এবং তার পূর্ববর্তী মেয়াদের সাথে তুলনাযোগ্য যখন বাজার একটি স্থিতিশীল পরিবেশে পরিচালিত হত। শেয়ার বাজারের কার্যক্রমে এই স্থিতিশীলতা শেয়ার বাজারের স্বাভাবিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। আর এ স্বাভাবিকতা অনুমাননির্ভর বা ফটকাবাজারের পরিবর্তে বাজারের মৌলিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে শেয়ার বাজারের কার্যক্রম পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

চিত্র ৩.১৪: মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের অনুপাত টার্নওভার, অর্থবছর ২০০৭- অর্থবছর ২০১৯

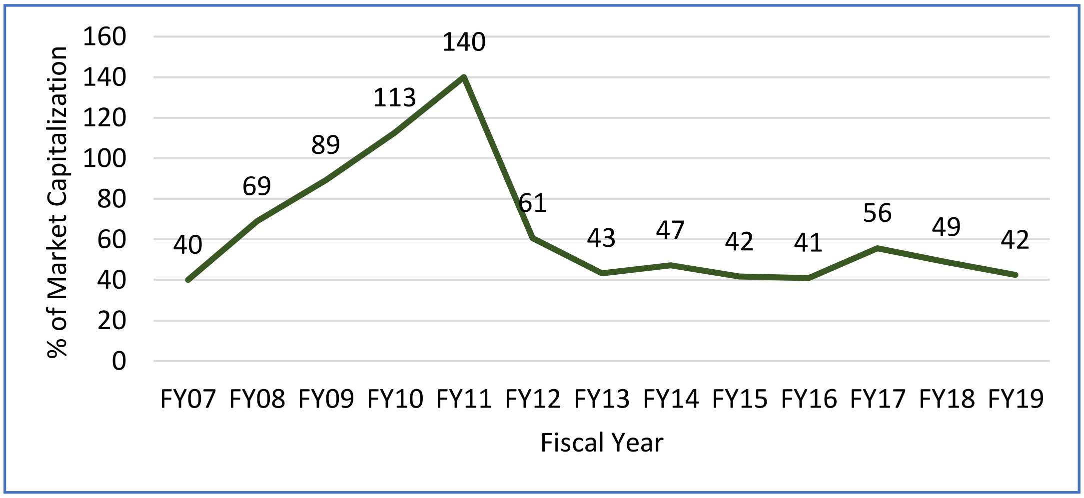

উৎস:বাংলাদেশ ব্যাংক

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পুঁজিবাজারের সংস্কার

প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে যে শেয়ার বাজারে স্থিতিশীলতা বিরাজ করবে তার অনেক ইতিবাচক চিহ্ন রয়েছে। যথাযথ মূল্যায়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে বৈদেশিক পোর্টফোলিও বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহদাকারের ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল কোম্পানির আইপিও'র (IPO) পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা গেলে বাজারের স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিতে তা সহায়ক হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট সংস্কার এজেন্ডাটি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কিছু বিলম্ব হলেও সংস্কার কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষ করে, শেয়ার বাজারের ডিমিউচুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে মালিকানাস্বত্ব, ব্যবস্থাপনা ও সদস্যদের লেনদেনের ক্ষমতা পৃথক করা গেলে এটি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জকে বাণিজ্যিক ও পেশাগতভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তর করতে সহায়তা করবে। উত্তম সুশাসন কাঠামোও বাজার উন্নয়ন ও নতুন বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করতে সহায়ক হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ইক্যুইটির চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা চালানো হবে:

- বাজারের আস্থা বৃদ্ধি করতে হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা সম্পর্কিত মানদন্ডের উন্নয়ন সাধন করতে হবে। নব্য প্রতিষ্ঠিত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (FRC) ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) এবং ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। পাশাপাশি হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষকদের লাইসেন্স প্রদান করবে।
- কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, হিসাবরক্ষণ নীতি এবং আইএএস-এর সাথে সম্মতি বিধানের বিষয়টি তদারকি করার লক্ষ্যে একটি নিরীক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এ সকল কার্যক্রম ছাড়াও একটি শক্তিশালী মিউচুয়াল ফান্ড শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুসংগঠিত বিনিয়োগকারীদের ভিত তৈরি করতে হবে। এর জন্য প্রথাগত ধারণা ও কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপের কারণে কীভাবে এ খাত সাড়া দিচ্ছে তাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শেয়ার বাজারের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত নিয়মকানুনের সাথে আইসিবি তহবিলের সামঞ্জস্য বিধান নিশিত করার মাধ্যমে সবার জন্য একটি সমবস্থান তৈরি করতে হবে।

৩.৫.৫ বিমা খাতের কৌশল

বিশ্বের প্রতিটি দেশের আর্থিক খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বিমা খাত। এ খাত মানুষের জীবন সংক্রান্ত ঝুঁকি ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করে এবং উন্নত ও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অনেক অবদান রাখে। বাংলাদেশে বিমা শিল্পখাতের উন্নয়নের অনেক সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিমাখাত সংশ্লিষ্ট কৌশলসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) সকল বিমাকারী তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি একচুয়ারি বিভাগ প্রবর্তন করবে এবং একচুয়ারি শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। আইডিআরএ এবং বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন একটি তহবিল গঠনের মাধ্যমে একচুয়ারিয়াল সায়েন্সের মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

(খ) আইডিআরএ (IDRA) একটি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়নপূর্বক বিমা পলিসি সম্পর্কিত সকল উপাত্ত একটি ডিজিটাল পলিসি রিপোজিটরীতে সংরক্ষণ করবে যার নাম হলো ইউনিফায়েড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম। এটি শুধু তথ্য ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করবে না, বরং আইডিআরএ-কে বিমা সংক্রান্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করবে। এটি আইডিআরএ এবং পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে এসএমএস ও ই-মেইলভিত্তিক একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ই-কেওয়াইসি (e-KYC), পেমেন্ট গেইটওয়ে, ই-রিসিপ্ট সেবা প্রদান করা হবে। ফলে এটি নকল বিমাকারী এজেন্ট কর্তৃক অর্থপাচার ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড হ্রাস করতে সহায়ক হবে। এছাড়া এটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধ কমিশন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করবে।

(গ) সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্থ্য বিমা প্রবর্তন করবে। স্বাস্থ্যবিমা থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের মাধ্যমে সরকার সরকারি-বেসরকারি খাতে হাসপাতাল নির্মাণ করে সাধারণ জনগণকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

(ঘ) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত আঘাত ও মৃত্যু ঝুঁকি নিরসনে শ্রমিকদের জন্য বিমা প্রবর্তনের জন্য সরকার ও চাকুরিদাতা উভয়ে মিলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি সুউচ্চ দালানসমূহ যেগুলো বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত ও ভাড়া প্রদান করা হয় সেগুলোকে বাধ্যতামূলক বিমার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

(চ) আইডিআরএ- (IDRA) সহ অন্যান্য বিমা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা

এ অধ্যায়ে যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপট উপস্থাপিত হয়েছে তাতে উন্নয়নমূলক এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উপাদানজনিত নিম্নগামী ঝুঁকি রয়েছে। কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব এ সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাসমূহ সময়োচিতভাবে এবং সুকৌশলে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়।

অভ্যন্তরীণ দিক থেকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ এবং সরকারি খাত হতে সম্পদ সংগ্রহ নিশ্চিত করা যাতে করে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন এবং অভিঘাতসহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা যায়। একইভাবে, এটি প্রবৃদ্ধি শক্তিশালীকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বৃহদাকারের অবকাঠামো ও ডেল্টা প্ল্যান সম্পর্কিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে এফডিআই আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধির গতির টেকসহিতা এবং ভালমানের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও এফডিআই ভিত্তিক বিনিয়োগের ভারসাম্যমূলক মিশ্রণে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি হবে অন্যতম চাবিকাঠি। নিম্ন মূল্যস্ফীতি, প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃত বিনিময় হার এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃত সুদের হার বজায় রাখতে পারে এমন দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নেও একটি বড় রকমের প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এ সকল সংস্কার ব্যতিরেকে

প্রক্ষেপিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং এফডিআই সংগ্রহের প্রচেষ্টা বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হবে না। অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের ক্ষেত্রে, ব্যাংকিং ও পুঁজিবাজার সংস্কার খুবই প্রয়োজনীয়। আমানত ও ঋণদানের ওপর সুদের বিস্তৃতি কমানো এবং পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার হারের সাথে প্রকৃত ঋণদানের সুদের হারের সামঞ্জস্য রেখে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রকৃত সুদের হার বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও সরকারি বিনিয়োগের আকার পরিকল্পনা অনুযায়ী আরো বৃদ্ধি পাবে, তথাপি বিদ্যমান সুশাসন সমস্যার মুখে মানসম্মত বিনিয়োগের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে গুণগত মান এবং প্রকল্প হস্তান্তরের পরেও ঠিকাদারদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করা মানসম্মত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সরকারি খাতে সম্পদ সমাবেশ একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে থাকবে এবং এজন্য করনীতি সংস্কারের (মূসক ও প্রত্যক্ষ কর উভয় ক্ষেত্রে) দ্রুত বাস্তবায়ন, কর প্রশাসন আধুনিকীকরণ, এবং এনবিআর কর প্রশাসনের সংস্কার দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারী, সাইক্লোন ও বন্যার মত কিছু বহিরাগত ঝুঁকির আবির্ভাব হতে পারে যা পরিকল্পিত সম্পদ এবং নীতি নির্ধারকদের নজর অন্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে সরিয়ে পরিকল্পনার অর্জনকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। এ সকল ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার জন্য দরকার সক্রিয় নীতিগত জবাব, যেমন-সরকারি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিডিপি ২১০০ এর বাস্তবায়ন।

অতীতের মতোই, বহিঃস্থ বিভিন্ন উপাদান দেশের সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে এই পরিকল্পনা মেয়াদে তাদের প্রভাব বিস্তার অব্যাহত রাখবে। কিছু প্রাসঙ্গিক বহিঃস্থ ঝুঁকি নিম্নরূপঃ

- কোভিড-১৯ মহামারীতে বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের গতি।
- বিশ্ববাজারে পেট্রোলিয়ামের মূল্যে অনিশ্চয়তা।
- তেল-বহির্ভুত পণ্যের মূল্যের অনিশ্চয়তা, যে সকল পণ্যের মূল্য বর্তমানে তুলনামূলকভাবে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে।
- ইউএস-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ এবং তাদের মধ্য বিদ্যমান দুর্বল সম্পর্ক যা বৈশ্বিক পরিমন্ডলে বাণিজ্য সংস্কার, পুঁজি প্রবাহ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভাঙ্গন বৃদ্ধি করতে পারে।
- বৈশ্বিক তৈরি পোশাক বাজারের স্থবিরতা।

সরকার উদীয়মান অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ঝুঁকির ক্ষেত্রে সচেতন থাকবে এবং একটি দূরদর্শী সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অন্বেষণ অব্যাহত রাখাসহ পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংস্কারের গতি বৃদ্ধি করবে। এছাড়া, সরকার সংশোধনমূলক কার্যপ্রক্রিয়া গ্রহণ এবং কোভিড-১৯ মহামারীর মত আকস্মিক সমস্যার প্রভাব প্রশমনে প্রয়োজনীয় নীতি সমন্বয়ের জন্য বদ্ধপরিকর।

উপরি উল্লিখিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি তা যথার্থভাবেই চ্যালেঞ্জিং কিন্তু একই সাথে অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনযোগ্য। তবে এর প্রকৃত ফলাফল নির্ভর করবে অর্থনৈতিক এবং অর্থনীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের ওপর। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সকল ভবিষ্যত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণ লাভ হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ক্রমবর্ধমান রাজস্ব সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এবং ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি যার আশু সমাধান প্রয়োজন। কোভিড-১৯ মহামারী উন্নয়ন অর্জনের প্রধান উৎস হিসেবে মানব স্বাস্থ্য ও কল্যাণের গুরুত্বকে জোরদার করেছে। এছাড়া, এটি বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নকে জোরদার করতে হবে। সরকারি বিনিয়োগের আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক দক্ষতার আলোকে ব্যয়ের গুণগত মানের বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সম্পদ সংগ্রহ, বিশেষ করে এনবিআর কর রাজস্বের টেকসই বৃদ্ধির বিষয়টিতে জোর দিতে হবে কারণ এ পরিকল্পনার অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে অধ্যায় ৫ এ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদান্তে নির্ধারিত ৮.৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জন করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিনির্মাণে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় সহায়তামূলক সংস্কার ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অধ্যায় ৩: পরিশিষ্ট সারণি

সারণি ক ৩.১: বাংলাদেশ: প্রকৃত খাতে অর্জন বছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
প্রকৃত খাত নির্দেশক	(জিডিপির % হিসেবে)						
মোট জাতীয় সঞ্চয়সমূহ	২৯.৫০	৩০.১১	৩১.৪৩	৩১.১৭	৩২.২৯	৩৩.০৩	৩৪.৪২
মোট দেশজ সঞ্চয়	২৫.০২	২৫.৩১	২৫.৬৯	২৫.৮৮	২৭.১৪	২৮.০৩	২৯.৫৯
মোট বিনিয়োগ	৩১.৫৭	৩১.৭৫	৩২.৫৬	৩২.৭৩	৩৪.০০	৩৪.৯৪	৩৬.৫৯
সরকারি বিনিয়োগ	৮.০৩	৮.১২	৮.১৫	৮.২০	৮.৬৮	৮.৮৬	৯.২৪
বেসরকারি বিনিয়োগ	২৩.৫৪	২৩.৬৩	২৪.৪১	২৪.৫৩	২৫.৩২	২৬.০৮	২৭.৩৫
বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই)	০.৮৭	০.৫৪	০.৮৩	১.৩৫	১.৯০	২.৫০	৩.০০
দেশীয় বিনিয়োগ	২২.৬৭	২৩.০৯	২৩.৫৮	২৩.১৮	২৩.৪২	২৩.৫৮	২৪.৩৫
পণ্য ও সেবাসমূহের নীট রপ্তানি	-৬.১২	-৬.০৬	-৫.৯৬	-৫.৯৪	-৫.৯৫	-৬.০০	-৬.১০
পণ্য ও সেবাসমূহের রপ্তানি	১৫.৩২	১২.২৫	১২.৮৩	১২.৮৩	১২.৭৯	১২.৭৩	১২.৬৪
পণ্য ও সেবাসমূহের আমদানি	২১.৪৪	১৮.৩১	১৮.৭৯	১৮.৭৭	১৮.৭৪	১৮.৭৩	১৮.৭৪
চলতি হিসাব স্থিতি	-১.৬৪	-১.২১	-১.১৩	-১.৫৬	-১.৭১	-১.৯২	-২.১৭
ভোগ	৭৪.৯৮	৭৪.৬৯	৭৪.৩১	৭৪.১২	৭২.৮৬	৭১.৯৭	৭০.৪১
সরকারি ভোগ	৬.২৭	৬.২৪	৬.০৮	৫.৯৮	৫.৮৮	৫.৭৮	৫.৬৮
বেসরকারি ভোগ	৬৮.৭১	৬৮.৪৫	৬৮.২৩	৬৮.১৪	৬৬.৯৮	৬৬.১৯	৬৪.৭৩
মোট সম্পদ	১০৬.১১	১০৬.০৬	১০৬.৮৭	১০৬.৮৫	১০৬.৮৬	১০৬.৯১	১০৭.০০
নীট ফ্যাক্টর আয়	৪.৪৭	৪.৮৫	৫.৭৪	৫.২৮	৫.১২	৪.৯৬	৪.৭৮
মোট জাতীয় আয়	১০৪.৪৭	১০৪.৮৫	১০৫.৭৪	১০৫.২৮	১০৫.১২	১০৪.৯৬	১০৪.৭৮
মোট জাতীয় মাথাপিছু আয় (ইউএস ডলার)	১৯০৯	২০৬৪	২১৭০	২৩৪৫	২৫৫৫	২৭৯০	৩০৫৯
মেমোরেন্ডাম আইটেম:	(পরিবর্তন কিংবা অন্যভাবে নির্দেশিত % হিসেবে প্রবৃদ্ধি হার)						
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
সিপিআই মুদ্রাস্ফিতি	৫.৪৮	৫.৬৫	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
জিডিপি ডিফ্লেটর	৪.৪৪	৪.৫১	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
নামীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধি	১২.৯৮	৯.৯৯	১২.৮৮	১২.৯৮	১৩.১৮	১৩.৪১	১৩.৫০
আইকর (ICOR)	৩.৮৭	৪.০০	৪.৪০	৪.২৫	৪.২৫	৪.২০	৪.৩০
নীট ফ্যাক্টর আয় (বিলিয়ন টাকা)	১১৩৬	১৩৫৫	১৮১১	১৮৮২	২০৬৭	২২৬৯	২৪৮৪
মোট জাতীয় আয় (বিলিয়ন টাকা)	২৬৫৬১	২৯৩১৯	৩৩৩৭৬	৩৭৫৪৩	৪২৪৩০	৪৮০৪৫	৫৪৪৪০
ভোগ (বিলিয়ন টাকা)	১৯০৬৩	২০৭৮০	২৩৪৫৫	২৬৪৩৩	২৯৪০৭	৩২৯৪৩	৩৬৫৮২
সরকারি	১৫৯৪	১৭২৮	১৯১৯	২১৩৩	২৩৭৩	২৬৪৬	২৯৫১
বেসরকারি	১৭৪৬৮	১৯০৫২	২১৫৩৬	২৪৩০০	২৭০৩৪	৩০২৯৭	৩৩৬৩১
বিনিয়োগ (বিলিয়ন টাকা)	৮০২৭	৮৮৭৯	১০২৭৮	১১৬৭০	১৩৭২৩	১৫৯৯৬	১৯০১২
সরকারি	২০৪১	২২৭১	২৫৭৩	২৯২৪	৩৫০৩	৪০৫৬	৪৮০১
বেসরকারি	৫৯৮৬	৬৬০৮	৭৭০৫	৮৭৪৬	১০২২০	১১৯৪০	১৪২১২
চলতি হিসাব স্থিতি (বিলিয়ন টাকা)	-৪১৬	-৩৩৯	-৩৫৭	-৫৫৬	-৬৯১	-৮৭৮	-১১২৯
পণ্য ও সেবামূহের নীট রপ্তানি (বিলিয়ন টাকা)	-১৫৫৪	-১৬৯৪	-২১৬৮	-২৪৪২	-২৭৬৮	-৩১৬৩	-৩৬৩৮
মোট সম্পদ (বিলিয়ন টাকা)	২৬৯৭৯	২৯৬৫৮	৩৩৭৩৩	৩৮১০৩	৪৩১৩০	৪৮৯৩৯	৫৫৫৯৪
মোট জাতীয় সঞ্চয় (বিলিয়ন টাকা)	৭৫০০	৮৫৩৯	৯৯২১	১১১১৪	১৩০৩২	১৫১১৮	১৭৮৮৩
মোট দেশজ সঞ্চয় (বিলিয়ন টাকা)	৬৩৬২	৭১৮৪	৮১১০	৯২২৮	১০৯৫৬	১২৮৩৩	১৫৩৭৪
প্রকৃত ভোগ (বিলিয়ন টাকা)	৮২৯১	৮৬৪৮	৯২৮৮	৯৯৭৮	১০৫৯২	১১৩৩৩	১২০৩১

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
প্রকৃত বেসরকারি ভোগ (বিলিয়ন টাকা)	৭৫৯৮	৭৯২৯	৮৫২৮	৯১৭৩	৯৭৩৭	১০৪২৩	১১০৬১
প্রকৃত বেসরকারি ভোগ প্রবৃদ্ধি হার	৪.৯৬	৪.৩৬	৭.৫৬	৭.৫৭	৬.১৫	৭.০৪	৬.১২
জিডিপি ডিফ্লেটর সূচক	২২৯.৯	২৪০.৩	২৫২.৫	২৬৪.৯	২৭৭.৬	২৯০.৭	৩০৪.১
বিনিময় হার	৮৪.০০	৮৪.৭০	৮৯.৪০	৯১.৯০	৯৪.২০	৯৬.৫০	৯৮.৬০
প্রকৃত মাথাপিছু ভোগ	১২৭.৯০	১৩১.৫৭	১৩৯.৪৪	১৪৭.৯৬	১৫৫.১৮	১৬৪.০৮	১৭২.১৬
মাথাপিছু প্রকৃত ভোগ (টাকা)	৪৯৫১১	৫০৯৩৩	৫৩৯৭৮	৫৭২৭৯	৬০০৭২	৬৩৫১৯	৬৬৬৪৭
জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	১৬৭.৪৬	১৬৯.৭৯	১৭২.০৬	১৭৪.১৯	১৭৬.৩২	১৭৮.৪২	১৮০.৫২
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি হার	১.৪১	১.৩৯	১.৩৪	১.২৪	১.২২	১.১৯	১.১৮
প্রকৃত জিডিপি (বিলিয়ন টাকা, ২০০৫-০৬)	১১০৫৮	১১৬৩৭	১২৪৯৮	১৩৪৬০	১৪৫৩৭	১৫৭৪৭	১৭০৮৭
নামীয় জিডিপি (বিলিয়ন টাকা)	**২৫৪২৫**	**২৭৯৬৪**	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**

উৎস: বিবিএস এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ক ৩.২: বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালন কর্মসূচি ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
চলক/আইটেম	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
	(বিলিয়ন, টাকা)						
রাজস্ব ও অনুদান	**২৫৩৫**	**২৬৫০**	**৩২৩৮**	**৩৯৮০**	**৪৮৬৪**	**৫৯০৭**	**৭৩২৫**
মোট রাজস্ব	**২৫১৮**	**২৬৩০**	**৩২১৩**	**৩৯৫৮**	**৪৮৪৪**	**৫৮৮৭**	**৭৩০৫**
কর রাজস্ব	২২৫৯	২২০৭	২৮৪৭	৩৪৯৫	৪২৭৮	৫১৫৪	৬৩৭০
এনবিআর কর রাজস্ব	২১৮৬	২১৪৮	২৬৯৯	৩৩৫২	৪০৭৭	৪৮৮০	৬০০৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৭৩	৫৯	১৪৮	১৪৩	২০২	২৭৫	৩৬৪
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৫৯	৪২৩	৩৬৬	৪৬৪	৫৬৫	৭৩২	৯৩৫
অনুদান	**১৭**	**২০**	**২৫**	**২২**	**২০**	**২০**	**২০**
	(বিলিয়ন, টাকা)						
মোট ব্যয়	**৩৯১৯**	**৪১৫৬**	**৫৩৮৫**	**৬০৩১**	**৭০৯২**	**৮১৯৬**	**৯৯২৩**
নীট ঋণ সহ পরিচালন ব্যয়	**২৪০৮**	**২৫৪৯**	**৩৫১২**	**৩৮৪৪**	**৪৪৩২**	**৫১১৫**	**৬২৪৬**
পরিচালন ব্যয়	**২৩৮৩**	**২৫১৪**	**৩৪৭০**	**৩৮৩৭**	**৪৪২০**	**৫০৯০**	**৬২০৬**
পৌন: পুনিক	২১৮০	২৩৩০	৩১১২	৩৫৪২	৪০৮০	৪৬৯৮	৫৭৫৬
মূলধন ব্যয়	২০৩	১৮৪	৩৫৮	২৯৫	৩৪০	৩৯২	৪৫০
নীট ঋণ	২৫	৩৫	৪২	৭	১২	২৫	৪০
উন্নয়ন ব্যয়	**১৫১১**	**১৬০৭**	**১৮৭৩**	**২২২৭**	**২৭২৬**	**৩১৬৬**	**৩৭৮৪**
এডিপি ব্যয়	১৪৭৩	১৫৪৩	১৮০০	২১৩৩	২৬২২	৩০৬০	৩৬৭৫
এডিপি বহিভূত উন্নয়ন ব্যয়	৩৮	৬৪	৭৩	৯৪	১০৪	১০৬	১০৯
সামগ্রিক স্থিতি (অনুদান ব্যতীত)	**-১৪০১**	**-১৫২৬**	**-২১৭১**	**-২০৭৩**	**-২২৪৮**	**-২৩০৯**	**-২৬১৮**
সাগ্রিক স্থিতি (অনুদানসহ)	**-১৩৮৪**	**-১৫০৬**	**-২১৪৬**	**-২০৫১**	**-২২২৮**	**-২২৮৯**	**-২৫৯৮**
প্রাথমিক স্থিতি	**-৮৮৯**	**-৯৩২**	**-১৫০৮**	**-১৩০২**	**-১৩৫৮**	**-১২৬৬**	**-১৪৩৬**
	(বিলিয়ন, টাকা)						
অর্থায়ন	**১৩৮৪**	**১৫০৬**	**২১৪৬**	**২০৫১**	**২২২৮**	**২২৮৯**	**২৫৯৮**
বহিস্থ (নীট)	**৩১৩**	**৫২৭**	**৭৫৮**	**৬৯৭**	**৭৭৫**	**৮৫৬**	**৯৬১**
ঋণ	৪৪৮	৬৩৬	৮৮৪	৮৩৬	৯৩৯	১০৬২	১১৯৫
এ্যামরটাইজেশন (Amortization)	-১৩৫	-১১০	-১২৬	-১৩৯	-১৬৫	-২০৬	-২৩৪
দেশীয়	**১০৭১**	**৯৭৯**	**১৩৮৯**	**১৩৫৪**	**১৪৫৩**	**১৪৩৩**	**১৬৩৭**
ব্যাংক (সিএরপিবিএস, মুদ্রা)	৩০৫	৯২৮	১০৪২	৬৯২	৪৮০	২৯৮	৩২৭
ব্যাংক বহির্ভূত	৭৬৬	৫১	৩৪৭	৪৯৬	৭৬৩	৮৬৫	৯৮২

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ক ৩.৩: বাংলাদেশ: কেন্দ্রীয় সরকার কার্যসমূহ, অর্থবছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
রাজস্ব নির্দেশক:	(জিডিপির % হিসেবে)						
রাজস্ব ও অনুদানসমূহ	**৯.৯৭**	**৯.৪৮**	**১০.২৬**	**১১.১৬**	**১২.০৫**	**১২.৯০**	**১৪.১০**
মোট রাজস্ব	**৯.৯০**	**৯.৪০**	**১০.১৮**	**১১.১০**	**১২.০০**	**১২.৮৬**	**১৪.০৬**
কর রাজস্ব	৮.৮৯	৭.৮৯	৯.০২	৯.৮০	১০.৬০	১১.২৬	১২.২৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬০	৭.৬৮	৮.৫৫	৯.৪০	১০.১০	১০.৬৬	১১.৫৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.২৯	০.২১	০.৪৭	০.৪০	০.৫০	০.৬০	০.৭০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.০২	১.৫১	১.১৬	১.৩০	১.৪০	১.৬০	১.৮০
অনুদান	**০.০৭**	**০.০৭**	**০.০৮**	**০.০৬**	**০.০৫**	**০.০৪**	**০.০৪**
	(জিডিপির % হিসেবে)						
মোট ব্যয়	**১৫.৪১**	**১৪.৮৬**	**১৭.০৬**	**১৬.৯১**	**১৭.৫৭**	**১৭.৯০**	**১৯.১০**
নীট ঋণ সহ পরিচালন অনুন্নয়ন ব্যয়	**৯.৪৭**	**৯.১১**	**১১.১৩**	**১০.৯০**	**১১.০৮**	**১১.২৫**	**১২.০৭**
অনুন্নয়ন পরিচালন ব্যয়	**৯.৩৭**	**৮.৯৯**	**১০.৯৯**	**১০.৭৫**	**১০.৯৩**	**১১.১০**	**১১.৯২**
রাজস্ব ব্যয়	৮.৫৭	৮.৩৩	৯.৮৬	৯.৯৩	১০.১১	১০.২৬	১১.০৮
মূলধন ব্যয়	০.৮০	০.৬৬	১.১৩	০.৮২	০.৮৩	০.৮৪	০.৮৫
নীট ঋণ	**০.১০**	**০.১৩**	**০.১৩**	**০.১৫**	**০.১৫**	**০.১৫**	**০.১৫**
উন্নয়ন ব্যয়	**৫.৯৪**	**৫.৭৫**	**৫.৯৩**	**৬.০২**	**৬.৪৯**	**৬.৬৬**	**৭.০৩**
এডিপি ব্যয়	৫.৭৯	৫.৫২	৫.৭০	৫.৮৯	৬.৩৬	৬.৫৩	৬.৯০
এডিপি বহিভূত উন্নয়ন ব্যয়	০.১৫	০.২৩	০.২৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩
সামগ্রিক স্থিতি (অনুদান ব্যতীত)	**-৫.৫১**	**-৫.৪৬**	**-৬.৮৮**	**-৫.৮১**	**-৫.৫৭**	**-৫.০৪**	**-৫.০৪**
সামগ্রিক স্থিতি (অনুদানসহ)	**-৫.৪৪**	**-৫.৩৯**	**-৬.৮০**	**-৫.৭৫**	**-৫.৫২**	**-৫.০০**	**-৫.০০**
প্রাথমিক স্থিতি	**-৩.৫০**	**-৩.৩৩**	**-৪.৭৮**	**-৩.৬৫**	**-৩.৩৬**	**-২.৭৭**	**-২.৭৬**
	(জিডিপির % হিসেবে)						
অর্থায়ন	**৫.৪৪**	**৫.৩৯**	**৬.৮০**	**৫.৭৫**	**৫.৫২**	**৫.০০**	**৫.০০**
বহিস্থ (নীট) [বাজার ঋণ সহ]	**১.২৩**	**১.৮৮**	**২.৪০**	**২.৪২**	**২.৪৪**	**২.৪৬**	**২.৪৮**
ঋণ	১.৭৬	২.৩	২.৮	২.৩৫	২.৩৩	২.৩২	২.৩০
এ্যামরটাইজেশন (Amortization)	-০.৫৩	-০.৩৯	-০.৪০	-০.৩৯	-০.৪১	-০.৪৫	-০.৪৫
দেশীয়	**৪.২১**	**৩.৫০**	**৪.৪০**	**৩.৩৩**	**৩.০৮**	**২.৫৪**	**২.৫২**
ব্যাংক (সিঅপিবিএস, মুদ্রা)	১.২০	৩.৩২	৩.৩০	১.৯৪	১.১৯	০.৬৫	০.৬৩
ব্যাংক বহির্ভূত	৩.০১	০.১৮	১.১০	১.৩৯	১.৮৯	১.৮৯	১.৮৯
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
নামীয় জিডিপি (বিলিয়ন টাকায়)	**২৫৪২৫**	**২৭৯৬৪**	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**

সারণি ৩.৪: বাংলাদেশ: রাজস্ব পরিকৃতি, অর্থবছর ২০১৯-অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
চলক/আইটেম	(বিলিয়ন, টাকা)						
এনবিআর কর রাজস্ব	**২১৮৬**	**২১৪৮**	**২৬৯৯**	**৩৩৫২**	**৪০৭৭**	**৪৮৮০**	**৬০০৬**
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৬৭৩	৭৫৩	৭৮০	১১৩৯	১৪০৩	১৭৫০	২৩৪৪
মূল্য সংযোজন কর	৮৫১	৭৯৯	১১৩৬	১৩৫৫	১৭৩১	২০৯৩	২৫২২
কাস্টম শুল্ক	২৪৩	২৩৭	২৮৪	৩১৪	৩৪৭	৩৮৫	৪২৬
সম্পূরক শুল্ক	৩৮৩	৩২৫	৪৪৭	৪৮৪	৫২৫	৫৬৯	৬১৭
রপ্তানি শুল্ক	১	১	১	২	২	২	২
আবগারি শুল্ক	২৩	২৩	২৯	৩৪	৩৮	৪৪	৫০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১২	৯	২১	২৫	৩০	৩৭	৪৪
	(জিডিপির % হিসেবে)						
এনবিআর কর রাজস্ব	**৮.৬**	**৭.৭**	**৮.৬**	**৯.৪**	**১০.১**	**১০.৭**	**১১.৬**
আয় ও লাভের ওপর কর	২.৬	২.৭	২.৫	৩.২	৩.৫	৩.৮	৪.৫
মূল্য সংযোজন কর	৩.৩	২.৯	৩.৬	৩.৮	৪.৩	৪.৬	৪.৯
কাস্টম শুল্ক	১.০	০.৮	০.৯	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮
সম্পূরক শুল্ক	১.৫	১.২	১.৪	১.৪	১.৩	১.২	১.২
রপ্তানি শুল্ক	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
আবগারি শুল্ক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
অন্যান্য কর ও শুল্ক	০.০	০.০	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
নামীয় জিডিপি (বিলিয়ন টাকায়)	**২৫৪২৫**	**২৭৯৬৪**	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ক ৩.৫: অনুন্নয়ন/উন্নয়ন বহির্ভূত সরকারি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		(প্রক্ষেপণ)				
চলক/আইটেম	(বিলিয়ন, টাকা)						
মোট পরিচালনা ব্যয়	**২৩৮৩**	**২৫১৪**	**৩৪৭০**	**৩৭৯৮**	**৪৩৩৭**	**৫০৮১**	**৬১৯৫**
পরিচালনা পৌন: পুনিক	**২১৮০**	**২৩৩০**	**৩১১২**	**৩৩০৩**	**৩৭৭০**	**৪৬৯৮**	**৫৭৫৬**
প্রদেয় ও ভাতা	৫৩৪	৫৫৫	৬৫৯	৭৪৫	৮৭০	১০৪০	১২৯৯
পণ্য ও সেবাসমূহ	২৮৬	২৮৪	৩৪৭	৪০১	৪৬৫	৫৭৩	৭০২
সুদ পরিশোধ	৪৯৫	৫৭৪	৬৩৮	৭৪৯	৮৭০	১০২৩	১১৬২
দেশীয়	৪৬১	৫৩১	৫৮৩	৬৮১	৭৮৯	৯১৬	১০৩২
বৈদেশিক	৩৪	৪৩	৫৫	৬৮	৮১	১০৭	১৩০
ভর্তুকি ও নীট হস্তান্তর	৮৬৫	৯১৬	১৪২৩	১৩৯০	১৫৩৭	২০৪০	২৫৬৭
ব্লক ভাতা	০.০	০.০	৪৫.০	১৮.০	২৮.০	২২.৯	২৬.০
পরিচালন মূলধন ব্যয়	**২০৩.০**	**১৮৪.০**	**৩৫৮.০**	**৪৯৪.৮**	**৫৬৭.৪**	**৩৮২.২**	**৪৩৯.০**
সম্পদ ও কাজ গ্রহণ	২০২.০	১৮০.০	৩২০.০	৪৪৮.০	৫১০.০	৩১৮.১	৩৬৬.৩
শেয়ার ও ইক্যুইটি বিনিয়োগ	১.০	৪.০	৩৮.০	৪৬.৮	৫৭.৪	৬৪.১	৭২.৭

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ক ৩.৬: উন্নয়ন বহির্ভূত সরকারি ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		(প্রক্ষেপণ)				
চলক/আইটেম	(জিডিপির % হিসেবে)						
মোট পরিচালন ব্যয়	**৯.৩৭**	**৮.৯৯**	**১০.৯৯**	**১০.৭৫**	**১০.৯৩**	**১১.১০**	**১১.৯২**
পরিচালন পৌণ: পুনিক ব্যয়	**৮.৫৭**	**৮.৩৩**	**৯.৮৬**	**৯.৯৩**	**১০.১১**	**১০.২৬**	**১১.০৮**
প্রদেয় ও ভাতা	২.১০	১.৯৯	২.০৯	২.০৯	২.১৬	২.২৭	২.৫০
পণ্য ও সেবাসমূহ	১.১২	১.০২	১.১০	১.১২	১.১৫	১.২৫	১.৩৫
সুদ প্রদান	১.৯৫	২.০৫	২.০২	২.১০	২.১৬	২.২৩	২.২৪
দেশীয়	১.৮১	১.৯০	১.৮৫	১.৯১	১.৯৫	২.০০	১.৯৯
বৈদেশিক	০.১৩	০.১৫	০.১৭	০.১৯	০.২০	০.২৩	০.২৫
ভর্তুকি ও নীট হস্তান্তর	৩.৪০	৩.২৮	৪.৫১	৩.৯০	৩.৮১	৪.৪৬	৪.৯৪
ব্লক বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.১৪	০.০৫	০.০৭	০.০৫	০.০৫
পরিচালন মূলধন ব্যয়	**০.৮০**	**০.৬৬**	**১.১৩**	**০.৮২**	**০.৮৩**	**০.৮৪**	**০.৮৫**
সম্পদ ও কাজ গ্রহণ	০.৭৯	০.৬৪	১.০১	১.২৬	১.২৬	০.৭০	০.৭১
শেয়ার ও ইক্যুইটি বিনিয়োগ	০.০০	০.০১	০.১২	০.১৩	০.১৪	০.১৪	০.১৪
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
নামীয় জিডিপি	**২৫৪২৫**	**২৭৯৬৪**	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ক ৩.৭: বাংলাদেশ: ঋণ টেকসহিতার নির্দেশকসমূহ, অর্থবছর ২০১৯- অর্থবছর ২০২৫

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		(প্রক্ষেপণ)				
ঋণ নির্দেশক	(জিডিপির % হিসেবে)						
মোট ঋণ আউটস্টান্ডিং	**৩৩.৬**	**৩৫.৯৮**	**৩৭.১**	**৩৮.৬**	**৩৯.৬**	**৩৯.৯**	**৪০.২**
বৈদেশিক ঋণ	১২.৬	১৩.৪	১৩.৮	১৪.২	১৪.৪	১৪.৬	১৪.৭
দেশীয় ঋণ	২১.০	২২.৬	২৩.৩	২৪.৪	২৫.২	২৫.৩	২৫.৫
	(বিলিয়নে, টাকা)						
বৈদেশিক ঋণ	**৩১৯৮**	**৩৭৪৮**	**৪৩৫৬**	**৫০৫৩**	**৫৮২৭**	**৬৬৮৩**	**৭৬৪৫**
মোট ঋণ	৪৪৮	৫৭১	৮৮৪	৮৩৬	৯৩৯	১০৬২	১১৯৫
এ্যামরটাইজেশন/পুনঃপরিশোধ	১৩৫	১২০	১২৬	১৩৯	১৬৫	২০৬	২৩৪
নীট ঋণ	৩১৩	৪৫১	৭৫৮	৬৯৭	৭৭৫	৮৫৬	৯৬১
বৈদেশিক ঋণের ওপর সুদ পরিশোধ	৩৪	৪৩	৫৫	৬৮	৮১	১০৭	১৩০
দেশীয় ঋণ	**৫৩৩৮**	**৬৩১৪**	**৭৩৫৫**	**৮৭০৮**	**১০১৬২**	**১১৫৯৫**	**১৩২৩১**
মোট অর্থায়ন	**১০৭১**	**৯৭৯**	**১৩৮৯**	**১৩৫৪**	**১৪৫৩**	**১৪৩৩**	**১৬৩৭**
দেশীয় ঋণের ওপর সুদ পরিশোধ	৪৬১	৫২৮	৫৮৩	৬৮১	৭৮৯	৯১৬	১০৩২
দেশীয় ঋণের ওপর কার্যকরী সুদে হার	৯.৪	৯.১	৮.২	৮.১	৮.০	৭.৯	৭.৮
মোট অপরিশোধিত	**৮৫৩৬**	**১০০৬২**	**১১৭১১**	**১৩৭৬১**	**১৫৯৮৯**	**১৮২৭৮**	**২০৮৭৬**
মোট ঋণ পরিশোধ	**৫৮৬**	**৬৬৫**	**৭৬৪**	**৮৮৮**	**১০৩৫**	**১২২৯**	**১৩৯৬**
বহিস্থ	১৩৪	১৪৫	১৮১	২০৭	২৪৬	৩১৩	৩৬৪
দেশীয়	৪৫২	৫২০	৫৮৩	৬৮১	৭৮৯	৯১৬	১০৩২
	(বিলিয়ন ইউএসডি)						
বৈদেশিক ঋণ	**৩৬.২**	**৪৪.২**	**৪৮.৭**	**৫৫.০**	**৬১.৯**	**৬৯.৩**	**৭৭.৫**
মোট ঋণ	৫.৩	৬.৭	৯.৯	৯.১	১০.০	১১.০	১২.১
এ্যামরটাইজেশন/পুন: পরিশোধ	-১.৬	-১.৪	-১.৪	-১.৫	-১.৭	-২.১	-২.৪
নীট ঋণ	**৩.৭**	**৫.৩**	**৮.৫**	**৭.৬**	**৮.২**	**৮.৯**	**৯.৭**
বৈদেশিক ঋণের ওপর সুদ পরিশোধ	০.৫	০.৫	০.৭	০.৮	০.৯	১.১	১.৩
ঋণের ওপর কার্যকরী সুদের হার	১.৩						
মোট ঋণ পরিশোধ	**২.৫**	**২.৪**	**২.৪**	**২.৫**	**২.৬**	**২.৭**	**২.৭**
বৈদেশিক	০.৭	০.৫	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৭
দেশীয়	১.৮	১.৯	১.৮	১.৯	২.০	২.০	২.০
ঋণ টেকসহিতা সূচক	(জিডিপির % হিসেবে, অন্যভাবে নির্দেশিত)						
রপ্তানি ও রেমিটেন্সের % হিসেবে বৈদেশিক ঋণ	**৬৭.৪**	**৮৫.৩**	**৮৫.২**	**৮৮.০**	**৯০.৬**	**৯২.৭**	**৯৪.৭**
রপ্তানি ও রেমিটেন্সের % হিসেবে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	**২.৮**	**৩.৩**	**৩.৫**	**৩.৬**	**৩.৮**	**৪.৩**	**৪.৫**
রাজস্বের অনুপাতে মোট ঋণ (%)	**৩৩৮.৯**	**৩৮২.৫**	**৩৬৪.৪**	**৩৪৭.৬**	**৩৩০.১**	**৩১০.৫**	**২৮৫.৮**
মোট রাজস্বের অনুপাতে ঋণ পরিশোধ (%) হিসেবে	**২৩.৩**	**২৫.৩**	**২৩.৮**	**২২.৪**	**২১.৪**	**২০.৯**	**১৯.১**
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
সরকারি বাজেট ঘাটতি, জিডিপির % হিসেবে	-৫.৪	-৫.৪	-৬.৮	-৫.৮	-৫.৫	-৫.০	-৫.০
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৮.২	৫.২	৭.৪	৭.৭	৮.০	৮.৩	৮.৫
নামীয় জিডিপি পবৃদ্ধি (%)	১৩.০	১০.০	১২.৯	১৩.০	১৩.২	১৩.৪	১৩.৫
সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি (গড়, %)	৫.৫	৫.৭	৫.১	৪.৯	৪.৮	৪.৭	৪.৬
মুদ্রাস্ফীতি হার (বাণিজ্য অংশীদারসমূহ), %	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫	২.৫
বিনিময় হার (টাকা, প্রতি মার্কিন ডলারে)	৮৪.০	৮৪.৭	৮৯.৪	৯১.৯	৯৪.২	৯৬.৫	৯৮.৬
অনুদানসহ সরকারের বাজেট ঘাটতি (বিলিয়ন টাকা)	১৩৮৪	১৫০৬	২১৪৬	২০৫১	২২২৮	২২৮৯	২৫৯৮
রপ্তানি ও রেমিট্যান্স (বিলিয়ন টাকা)	৪৭৪৪	৪৩৯৫	৫১১৫	৫৭৪০	৬৪৩১	৭২০৯	৮০৬৯

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

অধ্যায় ৪

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন কৌশল

৪.১ প্রস্তাবনা

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০০০ সাল থেকে এই অগ্রগতি দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ এর দশকে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০%। ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% এ নেমে আসে। যদিও ২০১৬ থেকে নতুন খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এর তথ্য নেই, তবুও জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতি এবং উন্নয়ন অগ্রগতির অন্যান্য সূচক দেখে বোঝা যায় যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ০৪ বছরে দারিদ্র্যের হার অনেক হ্রাস পেয়েছে। ২০১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্যের হার ২০.৫% এ নেমে এসেছে বলে হিসাব করা হয়। চরম দারিদ্র্য নিরসনেও একই চিত্র দেখা যায়। ২০১৬ অর্থ-বছরের চরম দারিদ্র্যের হার ১২.৯% থেকে কমে ২০১৯ অর্থবছরে ১০.৫% এ এসে দাড়িয়েছে। এই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ (পিপি-২০৪১) এ ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। দারিদ্র্য নিরসনের এই অগ্রগতি ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ফলে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হয়, কারণ এ সময়ে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষের আয় রোজগার হুমকির মুখে পড়ে। এসময়ে যদিও সরকার নানা ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টণী কর্মসূচি (বিনামূল্যে ও ভর্তুকিকৃত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ) গ্রহণ করেছে, তারপরও কোভিড-১৯ এর স্বল্পমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে শহর অঞ্চলের অনেক দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় রোজগার ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের অনেকেই এসময়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। কোভিড-১৯ এর কারণে স্বল্পমেয়াদী দারিদ্র্য বৃদ্ধির হার সাময়িক এবং সপ্তম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কোভিড-১৯ এর পূর্বে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা সমুন্নত রাখা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে বর্ণিত কৌশলসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও পরবর্তী সময়েও দারিদ্র্য নিরসনে প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত, যদিও স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি নিরসন এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত দারিদ্র্য নিরসনের এসব উপাদানকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি সরকার আয় বৈষম্যের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে কারণ এসডিজি অভীষ্ট-১০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এ অন্তর্ভুক্ত আয় বৈষম্য নিরসনের অঙ্গীকারের সাথে তা সংগতিপূর্ণ। দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল ব্যক্তিদের আয় রোজগার অক্ষুন্ন রাখার জন্য সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। ব্যক্তিগত আয় বৈষম্য ছাড়াও, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলাগুলোর দারিদ্র্য ও আয় বণ্টনের বৈষম্য বিষয়েও সরকার উদ্বিগ্ন রয়েছে। ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এলাকা ও জেলাগুলোতে দারিদ্র্য বণ্টনে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, উচ্চ আয় ও কর্মসংস্থানে অভিগম্যতার অসম সুযোগ সুবিধার কারণে এসব বৈষম্য বিদ্যমান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলাগুলোতে ব্যক্তিগত আয় বৈষম্য নিরসন করতে সরকারি নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ অধ্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর স্বল্পমেয়াদী দারিদ্র্য সমস্যাগুলো থেকে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলগুলো আলাদা করার জন্য কোভিড-১৯ আঘাত হানার পূর্বে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (অর্থবছর ২০১৬- অর্থবছর ২০১৯) প্রথম চার বছরের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে আয় বৈষম্যের বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। জেলাগুলোর আয় বৈষম্য বিষয়ে অর্থপূর্ণভাবে কথা বলার জন্য জেলা পর্যায়ে আয় সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত নেই। যাই হোক, দারিদ্র্য নিরসনে আয় বৈষম্য এবং চরম দারিদ্র্যপীড়িত স্থান অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়, তা হলো কোন জেলাগুলো সবচেয়ে বেশী দরিদ্র এবং কোথায় সরকারি নীতি সহায়তা প্রয়োজন। এসডিজি-১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এ উল্লেখ করা আছে যে অর্থবছর ২০৩১ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূল করতে হবে।

এই অধ্যায় বিশ্লেষণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য নিরসনে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়। এখানে কোভিড-১৯ এর প্রভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এসডিজি-১, এসডিজি-১০ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদী বিশেষ সমস্যাসমূহ মাথায় রেখে অষ্টম পরিকল্পনায় আলাদা আলাদা লক্ষ্যমাত্রা ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এই দুটি বিষয় দারিদ্র্য নিরসন ও আয় বৈষম্য কমানোর মূল কৌশল। এগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অংশ-২, অধ্যায়-১৪ তে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়, ভোগ, দারিদ্র্য ও বৈষম্যের মাত্রা নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, দারিদ্র্য বহুমাত্রিক; তাই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, পানি সরবরাহ, নিরাপদ স্যানিটেশন, গৃহায়ন ইত্যাদি কল্যাণমূলক নির্দেশকের অগ্রগতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি-১ এ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বহুমাত্রিক প্রকৃতি এবং এ সকল বঞ্চনার অবসান ঘটানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। জনকল্যাণকর এসব দিকগুলোর অগ্রগতি দারিদ্র্য নিরসন ও জাতীয় উন্নয়নে সরকারের বৃহত্তর কর্মপরিধির একটা অংশ। এসব বিষয় এই অধ্যায়ের ২য় অংশে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (যেমন অধ্যায়: ৯, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে; অধ্যায়: ১০ এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে, অধ্যায়: ১১ তে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও গৃহায়ন বিষয়ে এবং ১৪ নং অধ্যায়ে সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

৪.২ দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি

৪.২.১ দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি

২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে একই হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৪৮.৯% থেকে নেমে ২০১৬ সালে ২৪.৩% এ প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে) এর মানে প্রতিবছর গড়ে ১.৫৪% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। একই মেয়াদে চরম দারিদ্র্য ৩৪.৩% থেকে ১২.৯% এ নেমে এসেছে। অতএব একই মেয়াদে বাৎসরিক গড় দারিদ্র্য হ্রাস ১.৩৪ শতাংশ পয়েন্ট (সারণি-৪.১)। এসব অর্জনের ফলে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ২০০০ সালের ৬২.৮ মিলিয়ন থেকে ২০১৬ সালে ৩৯.১ মিলিয়ন হয়েছে। অন্যদিকে চরম দরিদ্র লোকের সংখ্যা একই মেয়াদে ৪৪ মিলিয়ন থেকে ২০.৭ মিলিয়নে নেমে এসেছে।

সারণি ৪.১: দারিদ্র্য নিরসনে অতীত অগ্রগতি ২০০০-২০১৬ (%)

	দারিদ্র্য (উচ্চ দারিদ্র্য রেখা)				চরম দারিদ্র্য (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা)			
	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
জাতীয়	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.৩	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯
নগর	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৮.৯	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭	৭.৬
গ্রামীণ	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৪	৩৭.৯	২৮.৮	২১.১	১৪.৯

উৎস: বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) (২০০০, ২০০৫, ২০১০, ২০১৬)

চিত্র ৪.১: দরিদ্র লোকের সংখ্যা (মিলিয়ন)

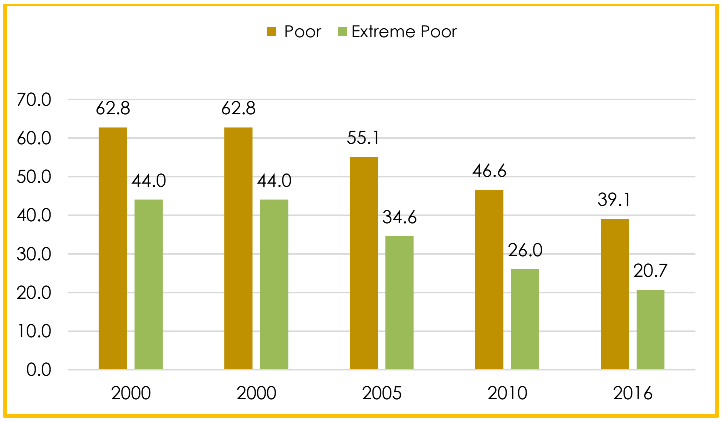

উৎস: সারণি ৪.১ এবং বিবিএস এর জনসংখ্যা উপাত্ত

যখন গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় দারিদ্র্য কমে গেল, তখন এই কমে যাওয়ার হার গ্রামীণ দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে দ্রুততর ছিল। ফলে গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্য হারের মধ্যে পার্থক্য কালক্রমে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ২০০০ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য হার ছিল ৫২.৩%, অন্যদিকে নগর দারিদ্র্য হার ছিল ৩৫.১%। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য ব্যবধান ছিল ১৭.২ শতাংশ পয়েন্ট। এই ব্যবধান ২০১৬ সালের মধ্যে ৭.৫ শতাংশ পয়েন্টে নেমে আসে। গ্রামীণ দারিদ্র্য ২৬.৪% এ নেমে আসে এবং নগর দারিদ্র্য ১৮.৯% এ নেমে আসে। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও হ্রাসের মাত্রা একই রকম ছিল।

৪.২.২ দারিদ্র্যের ফলাফল অর্জনে সহায়ক খাতসমূহ

২০০০-২০১৬ মেয়াদে দারিদ্র্য ফলাফলের বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণে বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের কারণ সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। বোঝার সুবিধার্থে বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতাকে এখানে দুটি আলাদা পর্বে ভাগ করা হয়েছে। ২০০০-২০১০ মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন এবং ২০১০-১৬ মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন।

প্রবৃদ্ধি, খাতভিত্তিক রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃজন: প্রথমত, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও এর গঠন উভয় মেয়াদের দারিদ্র্য নিরসনে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এ বিষয়ে একটা ঐক্যমত রয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি এবং অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর দুই মেয়াদেই দ্রুত বৃদ্ধি পায় (সারণি ৪.২)। কিন্তু এই দুই মেয়াদে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ২০১০-১৬ এর তুলনায় ২০০০-১০ মেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে অনেক বেশী কর্মসৃজন করেছে। কৃষিসহ সব খাতের জন্য এটি প্রযোজ্য ছিল। জিডিপিতে কৃষির প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃজনে এর অংশ হ্রাস পেলেও, ২০০০-২০১০ মেয়াদে কৃষিতে নতুন কর্মসৃজন অব্যাহত ছিল। অন্যদিকে ২০১০-১৬ মেয়াদে কৃষিতে কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, ২০০০-১০ মেয়াদে শিল্প ও সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-১৬ মেয়াদে প্রতিবছর মাত্র ০.৯ মিলিয়ন কর্মসৃজন হয়, যা ২০০০-১০ মেয়াদে ছিল ২.৫ মিলিয়ন।

সারণি ৪.২: প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর এবং কর্মসংস্থান ২০০০-২০১৬

সময়কাল	মাথাপিছু জিডিপি (%)	জিডিপিতে কৃষির অংশ (%)	জিডিপিতে শিল্পের অংশ (%)	জিডিপিতে সেবার অংশ (%)	কৃষিতে কর্মসৃজন (মিলিয়ন)	শিল্পে কর্মসৃজন (মিলিয়ন)	সেবাতে কর্মসৃজন (মিলিয়ন)	প্রতিবছর কর্মসৃজন (মিলিয়ন)
২০০০		২৫	২৫	৫০				
২০০০-২০১০	৪.৪	১৮	২৭	৫৫	৫.৯	৪.৪	৪.৮	২.৫
২০১০-২০১৬	৫.১	১৫	৩০	৫৫	-০.৩	২.৭	৩.১	০.৯

উৎস: বিবিএস এর জাতীয় আয় হিসাব এবং বিভিন্ন বছরের শ্রম শক্তি জরিপ (LFS) এর উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রাক্কলন

প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রভাবে, ২০১০-১৬ মেয়াদের চেয়ে ২০০০-২০১০ মেয়াদে দারিদ্র্য হার অধিক দ্রুত হারে হ্রাস পায়। ২০০০-১০ মেয়াদে প্রতিবছর মধ্যম দারিদ্র্যের গড় বাৎসরিক নিরসন ছিল ১.৭৪ শতাংশ পয়েন্ট। অন্যদিকে ২০১০-১৬ মেয়াদে তা ১.২ শতাংশ পয়েন্টে নেমে আসে। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে গড় বাৎসরিক হ্রাসের হারও বেশ অভূতপূর্ব ছিল। চরম দারিদ্র্যের গড় বাৎসরিক হ্রাসের হার ২০০০-১০ মেয়াদে ১.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট ছিল যা ২০১০-১৬ মেয়াদে ছিল মাত্র ০.৭৮ শতাংশ পয়েন্ট (সারণি ৪.২)। গ্রাম ও শহরের দারিদ্র্য নিরসনের বিষয়টি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উভয় মেয়াদকালে শহরে দারিদ্র্যের চেয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুত হারে হ্রাস পেয়েছে। এখানে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শহরে দারিদ্র্য হ্রাস ২০১০-২০১৬ মেয়াদে একই জায়গায় স্থবির ছিল।

চিত্র ৪.২: দারিদ্র্যের বাৎসরিক শতকরা পয়েন্টহ্রাসের হার

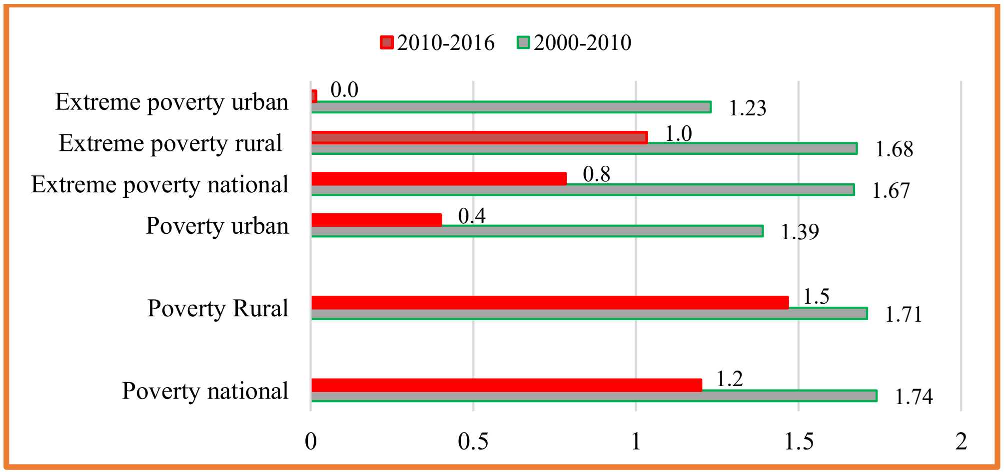

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এর উপাত্ত ব্যবহার করে জিইডি'র প্রাক্কলন

আলাদা আলাদা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষিকাজে আয়ের দৃঢ় প্রবৃদ্ধি এবং অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি থেকে কৃষিখাত লাভবান হয়েছে। অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ২০০০-২০১০ মেয়াদে দ্রুত ছিল (চিত্র ৪.৩)। বর্ধনশীল কৃষিখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং চালের দামের বৃদ্ধির ফলে কৃষিকাজে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অকৃষি খাতে অনেক কর্মসৃজন হওয়ায় কৃষিশ্রম বাজার শক্তিশালী হয়েছে এবং কৃষিতে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। অকৃষি খাতে কর্মসংস্থানের প্রসার এবং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছে এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য দ্রুততার সাথেহ্রাস পেয়েছে। গ্রামীণ অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার ২০১০-২০১৬ মেয়াদে কম ছিল। গ্রামীণ শ্রম সরবরাহের দ্রুত পতন ছিল এর মূল কারণ (চিত্র ৪.৩)।

চিত্র ৪.৩: গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ২০০০-২০১৬ (প্রতি বছরে %)

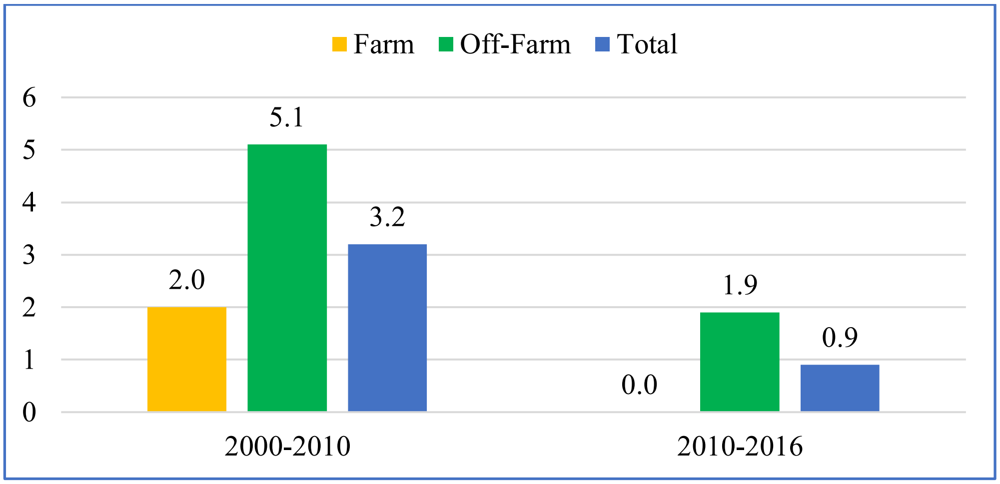

উৎস: বিভিন্ন বছরের শ্রম শক্তি জরিপ (LFS)

চিত্র ৪.৪: শ্রম শক্তির প্রবৃদ্ধির হার (প্রতি বছরে %)

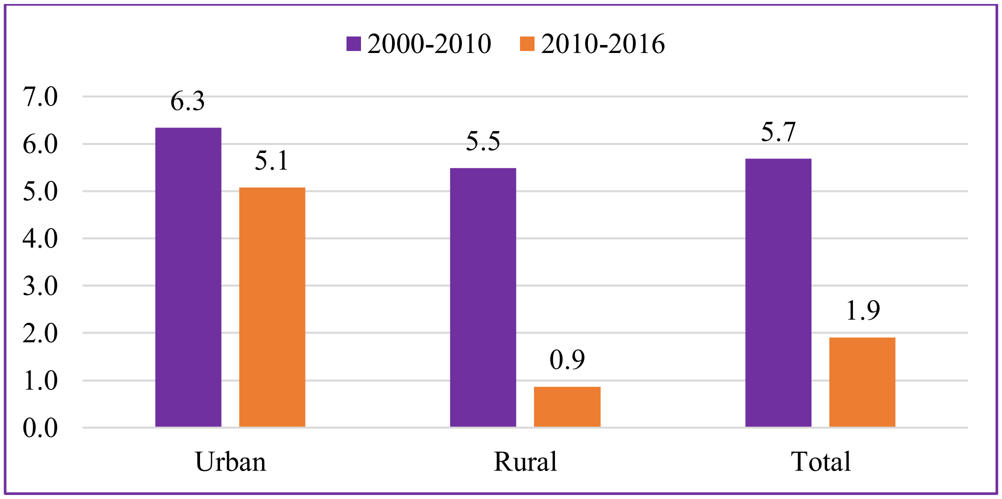

উৎস: বিভিন্ন বছরের শ্রম শক্তি জরিপ (LFS)

গ্রামীণ অর্থনীতির কর্মসংস্থান কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদানে যে বড় ধস নামে তা ৪.৪ নং চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এটি চলমান গ্রামীণ কাঠামোগত রূপান্তরের একটি বড় নিদর্শন যেখানে কৃষির মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থান সংকুচিত হয়ে আসছে এবং অকৃষি অর্থনীতির পথ সুগম হচ্ছে। এই গ্রামীণ রূপান্তর দারিদ্র্য নিরসনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি থেকে শ্রমিকদের (এই শ্রমিকরা প্রায়ই উদ্বৃত্ত শ্রম হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ছদ্মবেশী বেকারত্বের শিকার হয়) সরিয়ে নেওয়ার ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ রূপান্তরের একটি বড় ইতিবাচক উন্নয়ন ঘটেছে। এর ফলে কৃষিতে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিকাজে মজুরিও বেড়েছে। অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের এই খাতে উচ্চ বেতনের চাকরির সুযোগ তৈরি হয়েছে। অকৃষি খাতে সাধারণত মজুরি ও আয় অধিক হয় (চিত্র ৪.৫)।

চিত্র ৪.৫: গ্রামীণ কর্মসংস্থান কাঠামো ২০০০-২০১৬ (%)

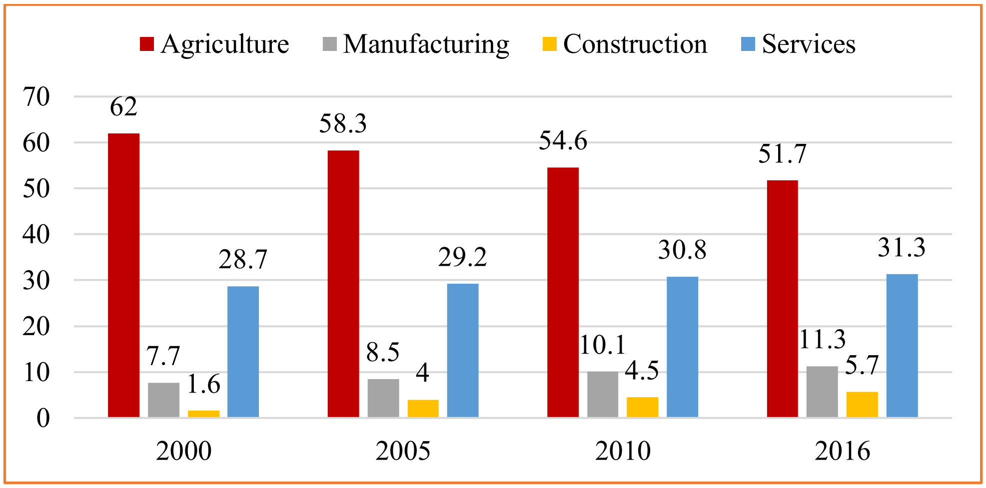

উৎস: বিভিন্ন বছরের শ্রম শক্তি জরিপ (LFS)

চিত্র ৪.৬: গ্রামীণ এলাকায় প্রকৃত মজুরি (টাকা/দিন ২০১৬ মূল্য)

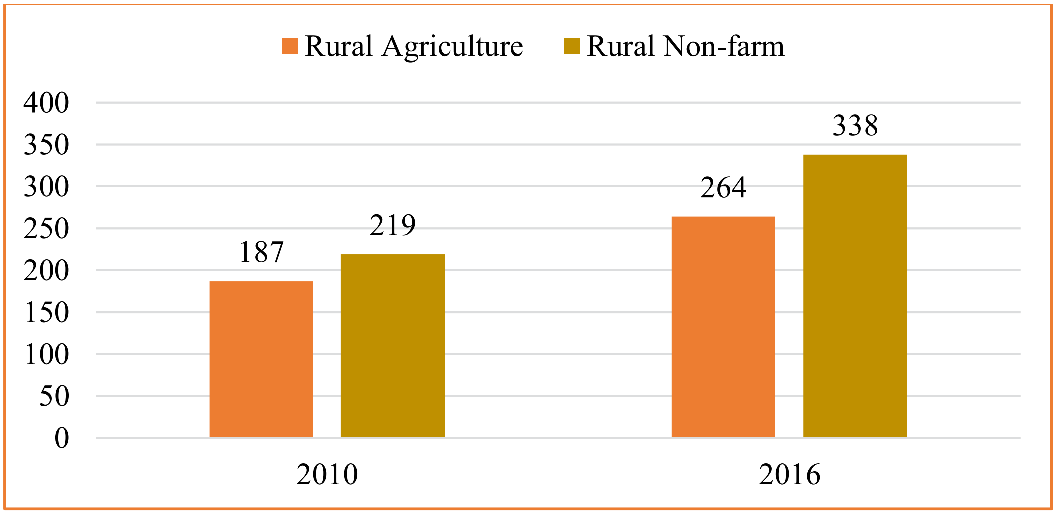

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০ এবং ২০১৬

শহরাঞ্চলে কর্ম প্রসার গ্রামাঞ্চলের চেয়ে দ্রুততর ছিল। অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণে শহরে শ্রম শক্তির যে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে তা সমাধানের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের কর্ম প্রসার একটি ভালো উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি ২০০০- ২০১০ এবং ২০১০-১৬ এই দুই মেয়াদের জন্যই সত্য ছিল। শহরের দরিদ্র মানুষেরা উৎপাদনমুখী কর্মের প্রসারে, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) এবং নির্মাণ কাজের প্রসারে বেশি লাভবান হয়েছে। এটিই ছিল শহরে দারিদ্র্য হ্রাসের সবচেয়ে বড় উপকরণ। ২০০০ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে প্রায় ২.৪ মিলিয়ন কর্মসৃজন হয়, প্রধানত স্বল্প দক্ষতাসম্পন্ন নারী শ্রমিকদের জন্য। নির্মাণ খাতেও শহর এলাকায় আরও ১.১ মিলিয়ন কর্মসৃজন হয়। শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের এই দ্রুত বৃদ্ধি ২০০০-১৬ মেয়াদে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল। সেবাখাতে অতিরিক্ত ৪.২ মিলিয়ন কর্মসৃজন শহরে কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস। যাইহোক, এগুলো প্রকৃতিগতভাবে অনানুষ্ঠানিক এবং কাজের ধরণের ওপর নির্ভর করে এখানে উপার্জনে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ৪.৭: শহরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ২০০০-২০১৬

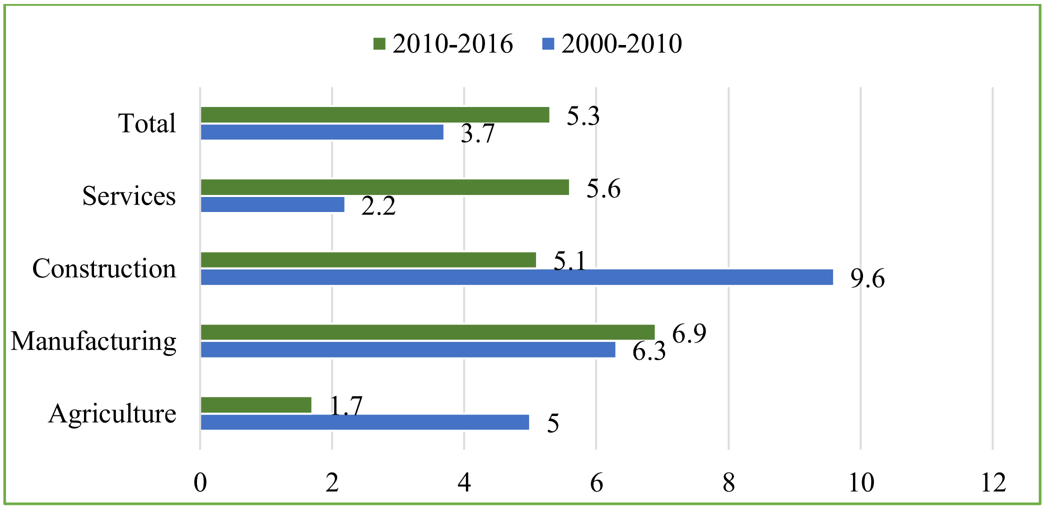

উৎস: শ্রম শক্তি জরিপ (LFS) ২০০০, ২০১০, ২০১৬-১৭

শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শ্রম বাজারে বেশির ভাগ দরিদ্র শ্রমিকের মজুরিতে তেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। ২০১০-১৬ মেয়াদে শহরাঞ্চলে মজুরি বৃদ্ধির দ্বারা এটি নির্দেশিত হয় (চিত্র ৪.৮)। শহরাঞ্চলে অকৃষি খাতে মজুরি গ্রামাঞ্চলের অকৃষি খাতের মজুরির চাইতে গড়ে প্রায় ১৮% বেশি ছিল যা গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিকদের অভিবাসনকে উৎসাহিত করে।

চিত্র ৪.৮: শহরাঞ্চলে মজুরি হার (টাকা/দিন, ২০১৬ মূল্য)

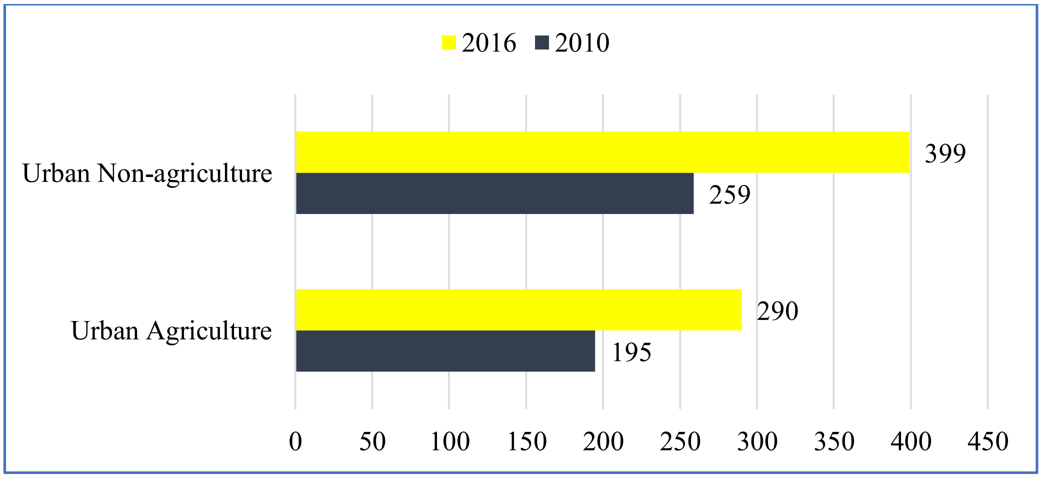

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০ এবং খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬-১৭

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়: দেশীয় ও বৈদেশিক অভিবাসন আয় দারিদ্র্য নিরসনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। বৈদেশিক অভিবাসন শহর ও গ্রামীণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের একটা বড় উৎস, বিশেষ করে গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য। দেশের বাইরে অভিবাসনরত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ ও বহি:প্রবাহ ৪.৯ এবং ৪.১০ চিত্রে দেখানো হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যায়।

চিত্র ৪.৯: অভিবাসন কর্মীদের সংখ্যা (০০০) ২০০০-২০১৬

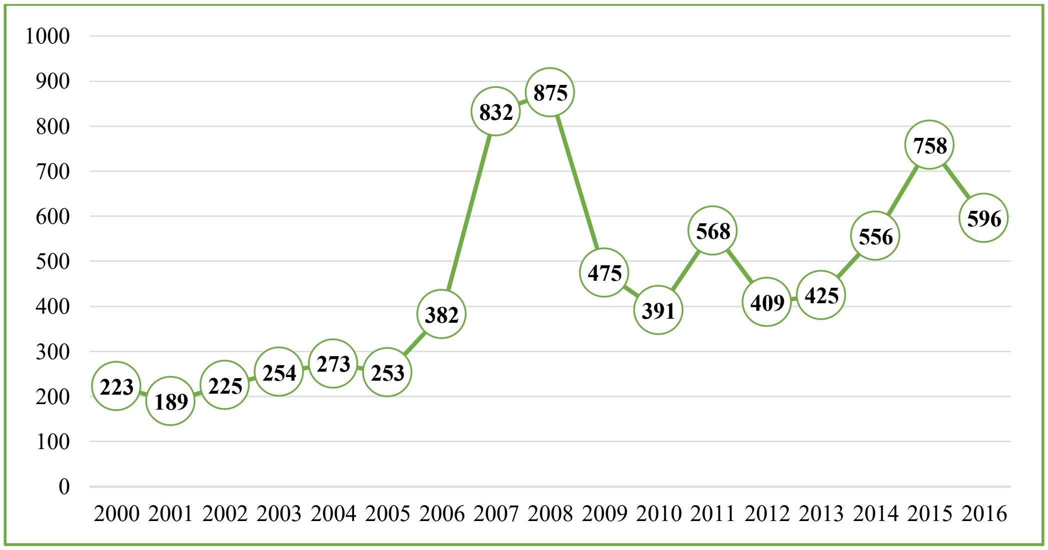

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক

চিত্র ৪.১০: প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ ২০০০-২০১৬ (বিলিয়ন টাকা)

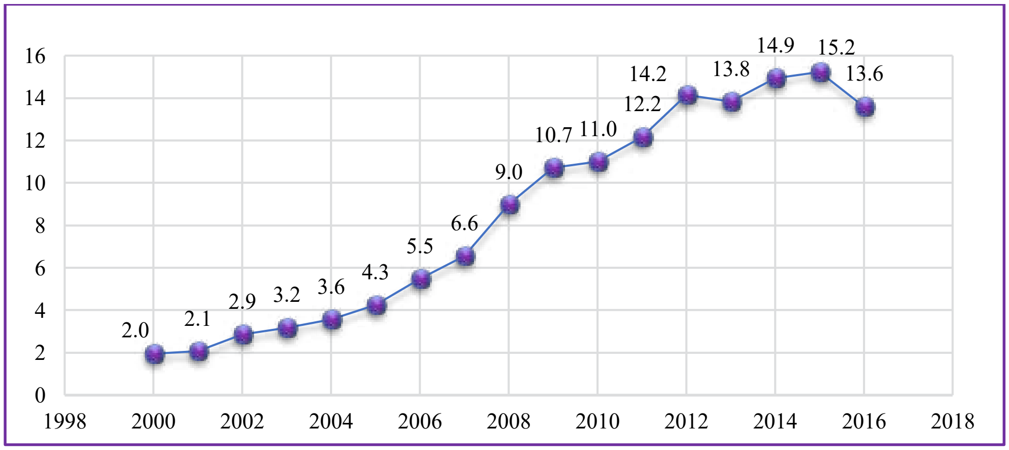

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশে প্রবাসী আয়ের অনেকাংশই গ্রামাঞ্চলে যায়। এর ফলে গ্রামীণ জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এটা যে শুধুমাত্র গ্রামীণ পরিবহন খাতের উন্নয়নেই সহায়তা করেছে তা নয় বরং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবাসমূহেও সহায়তা করেছে। কৃষি শ্রমের উদ্বৃত্ত একটা অংশ অভিবাসী শ্রম বাজার দখল করে নিয়েছে, যদিও এর বড় একটা অংশ গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের শিল্প খাতের কর্মসংস্থানে প্রবেশ করেছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, প্রবাসী আয় থেকে তুলনামূলক অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো বেশি উপকৃত হয়। তার ওপর দেশের অতিদরিদ্র ৪০% পরিবারে প্রবাসী আয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ২০১০ সালের ৪.১% থেকে ২০১৬ সালে ২.৩% এ নেমে এসেছে। তবুও প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই অতিদরিদ্র ৪০% পরিবারের ভেতর যাদের প্রবাসী আয়ের উৎস রয়েছে তারা গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন যা সেইসব এলাকায় দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় (চিত্র ৪.১০) এবং এর সাথে ২০১৬ সালে অতিদরিদ্র ৪০% পরিবারের প্রবাসী আয় কমে যাওয়ায় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দারিদ্র্য নিরসনের হার কম ছিল।

ক্ষুদ্র ঋণে অভিগম্যতা: ক্ষুদ্র ঋণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধির সরকারি কর্মসূচি হলো আরেকটি খাত যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করেছে। দেশে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যপ্তি ও পরিসর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে অকৃষি খাতে কর্মসৃজনে সহায়তা, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদ বিনির্মাণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাসে এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে (সারণি ৪.৩)। কিন্তু ক্ষুদ্র ঋণের উচ্চ খরচ একটি উদ্বেগের বিষয়। তাই খরচ কমিয়ে আনতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে পরিমাণ সুদে ঋণ দেয় তা ২০-২৪% এর মধ্যে ওঠানামা করে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ধার্যকৃত সুদের হার থেকে অনেক বেশী। ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে, সরকারি উৎস থেকে সরবরাহকারীদের অধিক অর্থায়ন করে এবং গ্রামাঞ্চলে যারা ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করে সুদের হার কমানো যেতে পারে। প্রযুক্তির উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের খরচ কমানো যেতে পারে। চাহিদার দিক থেকে, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে ঋণ গ্রহীতাদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও প্রযুক্তি সরবরাহের মাধ্যমে। ইতোমধ্যে স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বাজার তথ্যের উন্নতি ঘটছে এবং লেনদেনের খরচ কমে যাচ্ছে। এই কৌশলগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো জোরদার করা হবে।

সারণি ৪.৩: ক্ষুদ্র ঋণে অভিগম্যতা

ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন	২০০৫	২০১০	২০১৬
ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন (টাকা বিলিয়ন)	১৩২	৩৭২	৭৮৭
ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন (টাকা বিলিয়ন) (২০০৫ মূল্য)	১৩২	২৬৩	৩৫৮
ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৩.৯	২৭.২	২৩.২
দরিদ্র পরিবারগুলোর সংখ্যা (মিলিয়ন)	১১.৫	১০.৪	৯.৭
প্রকৃত ক্ষুদ্র ঋণ/দরিদ্র পরিবার (০০০)	১২	২৫	৩৭

উৎস: ক্ষুদ্র ঋণ রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্র ঋণ উপাত্তের ভিত্তিতে জিইডি'র প্রাক্কলন

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অভিগম্যতা: গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র লোকদের জন্য বাংলাদেশ সরকার এক বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে। এই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ তে দেখা যায় যে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর শতকরা হার ২০১০ সালের ২৪.৬% এর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ২৮.৬% এ উন্নীত হয়েছে (চিত্র-৪.১১)। এটি একটি ইতিবাচক উন্নয়ন। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলাফল বৃদ্ধি করতে দরিদ্র মানুষের নিকট সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাঠানোর উত্তম ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হবে। নির্ধারিত বিষয়গুলো অংশ ২ এর ১৪ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র ৪.১১: সামাজিক সুরক্ষা ভাতা গ্রহণকারী পরিবারগুলোর শতকরা হার

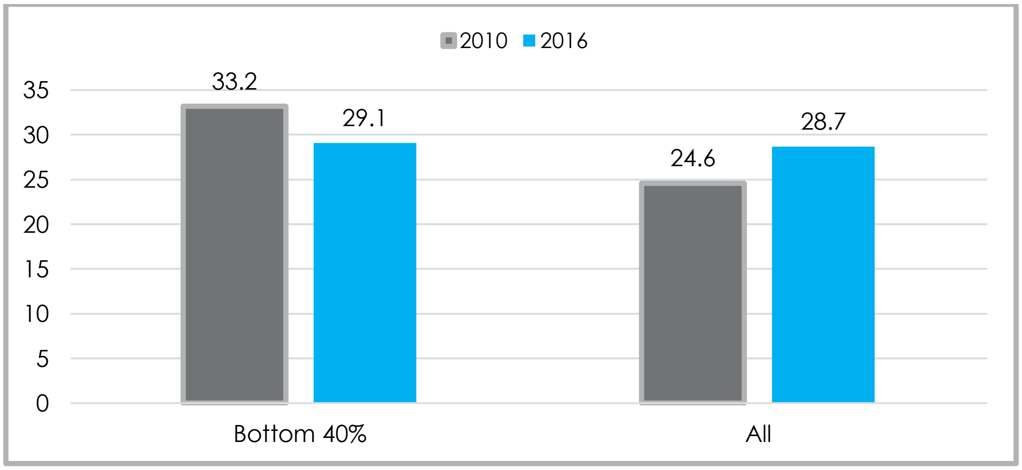

উৎসঃ খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০ এবং ২০১৬

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে নির্মাণে ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগগুলো এখনও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে।

বক্স ৪.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

আমার বাড়ি আমার খামার: গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং কৃষি উৎপাদন ও জীবিকা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন বৃদ্ধি করতে 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৬ এর ১লা জুলাই পর্যন্ত এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান চলতি অংশ সম্পন্ন হওয়ার পর, প্রকল্পের বাদবাকী অংশের সম্পত্তি ও সদস্যদের এই ব্যাংকের অধীনে নিয়ে আসা হবে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা হবেন ব্যাংকের ৪৯% এর মালিক। এই উদ্যোগের ফলে, প্রকল্প এলাকার নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর সংখ্যা ১৫% থেকে ৩% এ নেমে এসেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ১০ মিলিয়ন পরিবারকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা।

আশ্রয়ন প্রকল্প: প্রথম পর্বে সরকারি বরাদ্দের ১১৬০ কোটি টাকা দিয়ে মুজিব শতবর্ষের প্রাক্কালে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোকে ৬৫,৭২৬ টি বাড়ী এবং ২ ডেসিমেল জমি দান করা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যে আরো ১,২৮,০০০ টি ঘর নির্মাণ করা হবে। এ পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে ৩,৫৭,৫৯০ জন সুবিধাভোগীকে নতুন বাড়িঘর নির্মাণ করে তাঁদের পুনবার্সন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা থেকে ৮,৮৫,৬২২ টি পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মান করে দেওয়া হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ: ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য হলো জনগনের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়া এবং প্রত্যেক খাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬ টি ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে সেবাগ্রহিতাদের ২৭২ ধরণের প্রায় ৫৪০ মিলিয়ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট: শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়গামী শিশুদের ১০০% ভর্তি নিশ্চিত করা, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে বই সরবরাহ, মেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষাসহ বৃত্তি দেয়া। শিক্ষা বৃত্তি ও লেখাপড়ার খরচ বাবদ এ পর্যন্ত ১৪,২৯,৭৭৬ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ৬৬১.০৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচি: নারী ক্ষমতায়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হলো নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা। সামাজিক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিহত করা। এটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আইন কানুন বাস্তবায়ন; ১২,৯৫৬ টি পল্লী মাতৃস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন; ৪ মাস থেকে ৬ মাস পর্যন্ত মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সবার জন্য বিদ্যুৎ: জাতীয় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে, দারিদ্র্য নির্মূলকরণে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ১০ বছরে পাওয়ার প্ল্যান্টের সংখ্যা ১২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ১৩৮টি করা হয়েছে; বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াট হয়েছে এবং বিদ্যুতে জনগণের অভিগম্যতা ৪৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭% এ উন্নীত হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি: গ্রামীণ দরিদ্রের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রতি ৬০০০ লোকের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যে এই উদ্যোগের অধীনে ১৩,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য হলো আলাদা আলাদা সুবিধাভোগীদের ও সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ করা এবং সুরক্ষাবলয় তৈরি করা। বাংলাদেশ সরকার সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির ২.২ শতাংশ ব্যয় করছে। মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা হিসেবে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা অর্থবছর ২০১৫ এবং অর্থবছর ২০১৮ মেয়াদে ৩২ এবং ৩৪ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করেছে।

বিনিয়োগ উন্নয়ন: বিদ্যুৎ, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) এবং স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, ইলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, ১০০টি বিশেষ বেসরকারি অর্থনৈতিক এলাকা নির্মাণ ইত্যাদির মতো অনেক মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগবান্ধব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা: পরিবেশ সুরক্ষার উদ্যোগের লক্ষ্য হলো পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের রক্ষা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি চিহ্নিত করা। এই উদ্যোগের ফলে, সরকার নিয়ন্ত্রিত বনের পরিধি ২০০৫-০৬ এর ৭.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৫.৫৮% এ উন্নীত হয়েছে। পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৫ সালে ইউএনইপি এর 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

৪.২.৩ দারিদ্র্য নিরসনে উদ্ভূত বিষয়সমূহ

একদিকে যখন দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতি খুব উৎসাহব্যঞ্জক, তখন দারিদ্র্যের গতিশীলতা থেকে উঠে আসা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত: জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২০১০-১৬ মেয়াদে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে হারে দারিদ্র্য হ্রাস পায়নি। সে সময়ে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য নিরসনের হার কাঙ্খিত হারে কমেনি। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা কমে গেছে। ফলাফল সারণি ৪.৪ এ দেখানো হয়েছে। ২০০০ এবং ২০১০ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃতভাবে স্থিতিশীল ছিল কিন্তু ২০১০-১৬ মেয়াদে তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যায়। চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও ২০১০-১৬ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা ব্যাপক হারে হ্রাস পায়।

সারণি ৪.৪: প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা

মাথাপিছু শতকরা	২০০০-২০০৫	২০০৫-২০১০	২০১০-১৬
গড় মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৪.০	৪.৮	৫.১
দারিদ্র্যের গড় নিরসন	(-) ৩.৯৪	(-) ৪.৬৭	(-) ৪.১১
চরম দারিদ্র্যের গড় নিরসন	(-) ৬.০৫	(-) ৬.৮৫	(-) ৫.০৬
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	(-) ০.৯৮৫	(-) ০.৯৭৩	(-) ০.৮০৬
চরম দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা	(-)১.৫১	(-)১.৪৩	(-) ০.৯৯২

উৎস: বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এবং জাতীয় আয় হিসাব ব্যবহার করে জিইডি'র প্রাক্কলন

২০০৫-১০ অর্থ-বছরের প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতাকে নিয়ে সম্ভাব্য দারিদ্র্য হ্রাসের হার পরিমাপ করা হলে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের এই নিম্ন অগ্রগতির নীতিগত কারণ অনুমান করা যায় (চিত্র ৪.১২)। এই হিসাব অনুযায়ী মধ্যম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দারিদ্র্য হ্রাসের হার ০.৯ শতাংশ নিম্নতর ছিল এবং চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে তা ছিল ১.৪ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় যে, দারিদ্র্য নিরসনে শুধুমাত্র উচ্চতর মাথাপিছু আয়ই যথেষ্ট নয়। দারিদ্র্য নিরসন নীতিকে অবশ্যই এমনভাবে চালিত করতে হবে যাতে দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি বহুমূখীকরণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর কৃষি আয়ের প্রতি আরো মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাত এবং শহরাঞ্চলে কর্মসৃজনে

শিল্পখাতের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সুবিধার ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলোর অভিগম্যতা বৃদ্ধি করেছে। এসব সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারগুলোর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার জন্য সরকারি ব্যয় আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

চিত্র ৪.১২: অপরিবর্তিত প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা দিয়ে পরিমাপকৃত ২০১৬ অর্থ-বছরের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

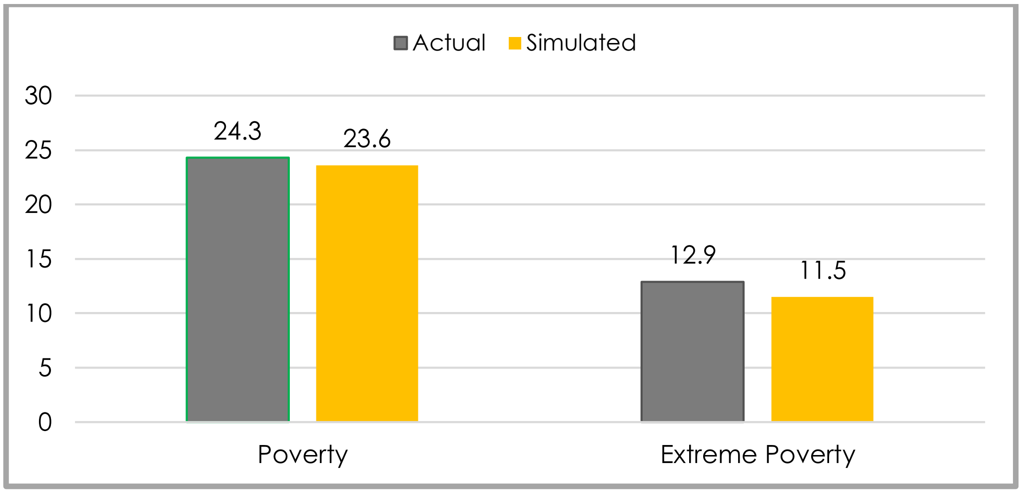

উৎস: জিইডি'র প্রাক্কলন

দ্বিতীয়ত, ২০০০-২০১০ মেয়াদে নাটকীয় পতনের পরেও, শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি ২০১৬ তে স্থির হয়ে যায়। এর সম্ভাব্য আংশিক কারণ ব্যাখ্যা করা যায় ২০১৬ এর খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) অনুযায়ী এ বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সরাসরি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। এখানে শহরাঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির তুলনামূলক অনুপস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের তীব্রতা বেশী হওয়ায় সেখানে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচির গুরুত্ব বেশী থাকাই স্বাভাবিক। তবুও, গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে চলমান অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণে শহরে দারিদ্র্যের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। উৎপাদনশীল ও নির্মাণখাতে কর্মসৃজনের গুরুত্ব শহরে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধার আওতায় এনে দারিদ্র্য ভাতার ব্যবস্থা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, মধ্যম দারিদ্র্য সীমার ঠিক উপরেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি থেকে বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক ধাক্কা সামলে ওঠার ক্ষমতা কমে গিয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণেই এটি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। এমনকি কোভিড-১৯ এর আগেই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর (এমন জনগোষ্ঠী যাদের ভোগ্য পণ্যের খরচ দারিদ্র্যসীমার ১.২৫ গুণের ভেতরে) সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ২০১০ সালের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি অধিক অসম হয়ে উঠার কারণে এটি ঘটেছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ভোগ বৃদ্ধি দরিদ্রতর পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছিল। এভাবে, ২০০৫ এবং ২০১০ সালের মধ্যে অতিদরিদ্র ৪০% এর গড় ভোগ বৃদ্ধি ছিল ১.৮% যেখানে সকল পরিবারের এর গড় ভোগ বৃদ্ধি ছিল ১.৪%। ২০১৬ সালে এই দৃশ্যপট পাল্টে যায় যখন দরিদ্রতর পরিবারগুলোর (নীচের অতিদরিদ্র ৪০%) গড় ভোগ বৃদ্ধি ছিল ১.২% যেখানে সকল পরিবারের গড় ভোগ বৃদ্ধি ছিল ১.৬%।

৪.২.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মধ্যম দারিদ্র্য ২০১৫ সালের ২৪.৮% থেকে হ্রাস করে ২০২০ সালের মধ্যে ১৮.৬% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং একই মেয়াদে চরম দারিদ্র্য ১২.৯% থেকে ৮.৯% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে শেষবার খানা আয়-ব্যয় জরিপ করা হয় ২০১৬ সালে। তারপর থেকে আর কোন জরিপ করা হয়নি। এর মধ্যে বিবিএস ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দারিদ্র্য পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে। ২০১৯ সালে ২০১০-২০১৬ এর প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়। এতে ভোগ-জিডিপি সম্পর্ক এবং আয় বণ্টনে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ৪ বছরে দারিদ্র্যের প্রক্ষেপিত হ্রাস সারণি ৪.৫ এ দেখানো হয়েছে। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য এই সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ফলাফলে দেখা যায়, দারিদ্র্য নিরসনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ভালোভাবে অর্জিত হয়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, প্রথম ৪ বছর মেয়াদে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

সারণি ৪.৫: সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন

বছর	মধ্যম দরিদ্র (%)		চরম দরিদ্র (%)	
	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	প্রকৃত/প্রাক্কলিত	সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	প্রকৃত /প্রাক্কলিত
২০১৬	২৩.৫	২৪.৩	১২.১	১২.৯
২০১৭	২২.৩	২৩.১	১১.২	১২.১
২০১৮	২১.০	২১.৮	১০.৪	১১.৩
২০১৯	১৯.৮	২০.৫	৯.৭	১০.৫

উৎস: বিবিএস এর ২০১৬-২০১৮ অর্থ-বছরের তথ্য উপাত্ত। ২০১০-২০১৬ এর প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করে ২০১৯ এর প্রাক্কলন।

অতীতের মতো, জিডিপি প্রবৃদ্ধি এই মেয়াদেও দারিদ্র্য নিরসনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু ক্রমাগত কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জিডিপিতে উৎপাদনখাত ও অন্যান্য শিল্প খাত বিশেষ করে নির্মাণ খাতের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ হ্রাস পেয়েছে। যতটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের স্থবিরতার কারণে দারিদ্র্য নিরসনে ততটা অগ্রগতি হয়নি। উপরে বর্ণিত (পরিচ্ছেদ ৪.২.২) দারিদ্র্য নিরসনের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাতে কর্মসৃজন এবং উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে কর্মসৃজন দারিদ্র্য নিরসনের প্রধান উৎস ছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে এই স্থবিরতার ফলে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের প্রক্রিয়া বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ২০০০-২০১৩ মেয়াদে তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থান শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম চালিকা শক্তি ছিল। ২০১৩ সাল থেকে এই খাতে কোন প্রবৃদ্ধি নেই। নিম্ন দক্ষতাসম্পন্ন নারী শ্রমিকরা ২০০০ এবং ২০১৩ মধ্যেকার এই সময়টিতে শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের প্রধান উপকারভোগী ছিলেন। এসময় নির্মাণ কাজেও কর্মসংস্থান স্থবির ছিল। এই খাত শহর ও গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তৈরি পোশাক শিল্প ও নির্মাণ খাত উভয় ক্ষেত্রেই দ্রুত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও এই দুই খাতে কর্মসংস্থানের স্থবিরতার কারণ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পুঁজি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্ররা প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) কারণে শহরাঞ্চলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি থেকে সুবিধা নিতে পারছে না।

দেশীয় কর্মসংস্থান সৃজনে স্থবিরতার প্রেক্ষিতে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনের ইতিবাচক দিক হলো বৈদেশিক অভিবাসনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি (চিত্র ৪.১৩)। প্রক্ষেপণের চাইতে বেশী শ্রমিকদের অভিবাসন ২০১৭-২০২০ মেয়াদে প্রবাসী আয়ের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি করেছে যা ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে নিম্নমুখী ছিল। এই উর্ধ্বমুখী অন্তঃপ্রবাহ প্রবাসী আয়ের সুবিধাভোগীদেরও ব্যাপক উদ্দীপনা যোগায়। গ্রহীতা দেশগুলোর সরকারের সাথে কূটনৈতিক ও নীতিগত সংলাপের মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানো বৃদ্ধি করতে সরকারি নীতিমালাকে সহজ করা হয়েছে। অভিবাসনের সুযোগসুবিধার বিষয়ে জেলা পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রচার করা হয়েছে। সম্ভাব্য অভিবাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৪.১৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভিবাসী শ্রমিকদের বহিঃপ্রবাহ (মিলিয়ন শ্রমিক)

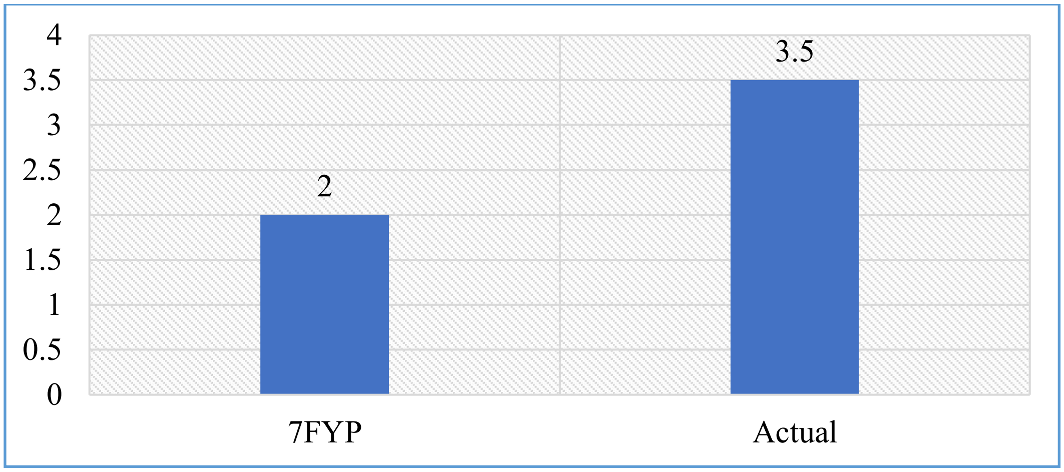

উৎস: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ ব্যাংক

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলে ক্ষুদ্র ঋণে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঋণ ও ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যাও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টনের প্রকৃত পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ১৪% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২০০৫-২০১৬ (৯.৫%) মেয়াদের চাইতে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুততর ছিল। গ্রহীতাদের সংখ্যাও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (৫% থেকে বেড়ে ৮%)। ক্ষুদ্র ঋণ রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় নতুন নতুন লাইসেন্সের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের সুবিধা প্রদান এবং নিয়ম কানুনের আওতায় নিয়ে আসা, ঋণ প্রদানকারীদের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারিকে শক্তিশালী করার জন্য আইন প্রণয়ন এবং অদক্ষ কিংবা অভদ্র ঋণ প্রদানকারীদের মূলোৎপাটন করার মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ৭২৪টি লাইসেন্সকৃত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্মরত ছিল। বৃহত্তর প্রতিযোগিতায় অভিগম্যতা, সেবা সরবরাহ এবং কিছুটা খরচ কমানোর ফলে সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনে ব্যাপক ইতিবাচক উন্নয়ন হয়েছে।

সারণি ৪.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার

ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন	অর্থবছর ২০১৫	অর্থবছর ২০১৯
ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন (টাকা বিলিয়ন)	৬৩৪	১৪০৩
ক্ষুদ্র ঋণ বণ্টন (টাকা বিলিয়ন) (২০০৫ মূল্য)	৩০৬	৫৪২
ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা(মিলিয়ন)	২০.৪	২৮.৪
দরিদ্র পরিবারগুলোর সংখ্যা (মিলিয়ন)	৯.৫	৮.২
প্রকৃত ক্ষুদ্র ঋণ/দরিদ্র পরিবার (০০০)	৩২	৬৩

উৎস: ক্ষুদ্র ঋণ রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের ক্ষুদ্র ঋণ উপাত্তের ভিত্তিতে জিইডি'র প্রাক্কলন

সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০১৫ সালে সরকার বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতির দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নয়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) গ্রহণ করে। এনএসএসএস বাস্তবায়নে বেশ কয়েকটি বিষয় সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভাতা হস্তান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত সরকার থেকে জনগন (G2P) পদ্ধতির প্রবর্তন। এটি এখন সম্পন্ন হয়েছে এবং পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছে। এই সংস্কারের ফলে সরকার সুবিধাভোগীদের নিকট সরাসরি অনলাইনে ভাতা প্রদান করতে পারছে। অন্যান্য বহুমূখী কর্মসূচিগুলো সংস্কারের মাধ্যমে এনএসএসএস কর্তৃক সুপারিশকৃত জীবন চক্র পদ্ধতিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে রূপান্তরিত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপচয় কমাতে বিনিময় কর্মসূচিকে নগদ সরবরাহে রূপান্তর করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যদিও জিডিপিতে শতকরা হিসেবে এনএসএসএস কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত সম্পদের পরিমাণ আর্থিক কারণে কমে যাচ্ছে। সরকার এনএসএসএস এর বাস্তবায়নে অগ্রগতি অর্জন করছে এবং অষ্টম পঞ্চবর্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়নকে আরও শক্তিশালী করতে চায়।

৪.২.৫ দারিদ্র্য নিরসনে অষ্টম পরিকল্পনা কৌশল

কোভিড-১৯ এর আগে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত দারিদ্র্য নিরসনে দৃশ্যমান অগ্রগতি এটাই নির্দেশ করে যে, প্রধান দারিদ্র্য নিরসন কৌশল সঠিক পথেই ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং এর সাথে ৪.২.৩ পরিচ্ছেদে উল্লেখিত কোভিড-১৯ পূর্ব ফলাফল এর কিছু কিছু বিষয় এই শিক্ষা দেয় যে, দারিদ্র্য নিরসন কৌশলকে শক্তিশালী করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

প্রথমত: প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস এবং ২০১৬ সালে শহরাঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা দারিদ্র্য হ্রাসের স্থবিরতা এই নির্দেশ করে যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো বেশী দারিদ্র্যবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সুদৃঢ় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই বিষয়টি ২য় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি অবস্থানকারী নিম্ন মধ্যবিত্তদের সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থ হলো এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী কোভিড-১৯ এর অভিঘাতে জর্জরিত। মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিক এবং স্ব-নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং ব্যাপকভাবে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণদের আয় সরবরাহের শক্তিশালী পদ্ধতির মাধ্যমে আয়ের স্থিতিশীলতা তৈরি করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত: খুব স্বল্প মেয়াদে অনানুষ্ঠানিক খাতে অনেক দেশীয় বেকারদের কাজে নিয়োগ করতে এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশে চাকরি হারানো দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়াও সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে যাতে স্বল্পমেয়াদী দারিদ্র্য বৃদ্ধির হার কিছুটা কমানো যায়।

পরিশেষে: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এবং এসডিজি-০১ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করা প্রয়োজন। এর জন্য চরম দরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং সরকারি বেসরকারি বিমা কর্মসূচির সমন্বয়ে অর্থায়নকৃত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতির সূচনা এইক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজন।

দারিদ্র্য নিরসনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যসমূহ সারণি ৪.৭ এ দেখানো হয়েছে। দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যসমূহ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার এবং ভোগ/আয় বন্টনের ধরণের ওপর নির্ভর করে। এটি আরো নির্ভর করে কীভাবে কোভিড-১৯ এর ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধি কত তাড়াতাড়ি কোভিড পূর্ব ধারায় ফিরিয়ে আনা যায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত গড় প্রবৃদ্ধি হার প্রতিবছর ৮.০%। প্রক্ষেপণে এই ধারণা করা হয় যে, সরকার অর্থবছর ২০২২ এর মধ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য নিরসনে কোভিড-১৯ আক্রান্ত দারিদ্র্য পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারে কর্মসৃজন ও আয় সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল নীতিসমূহ গ্রহণ করবে। এটিই একমাত্র পথ যার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থবছর ২০৩১ এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হবে। সারণি ৪.৭ এ প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শিত হয়েছে যা থেকে ধারণা করা যায় যে ২০১০-২০২০ মেয়াদে যে হারে দারিদ্র্য হ্রাস করা হয়েছিল তার চেয়ে দ্রুতগতিতে দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ভোগ বন্টনের উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করা সম্ভব হবে। এই প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রধান প্রধান সহযোগী কৌশল এবং নীতিসমূহ নীচে আলোচনা করা হয়েছে। এসব নীতিসমূহ গত দুই দশকে এবং বিশেষ করে ২০১০-২০২০ মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে।

সারণি ৪.৭: অষ্টম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য লক্ষ্যমাত্রা

সূচক সমূহ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
দারিদ্র্য সংঘটন	২৩.০	২০.০	১৮.৫	১৭.০	১৫.৬
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা			১.২	১.২	১.২
মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৬.১	৬.৫	৬.৮	৭.১	৭.৩
চরম দারিদ্র্যের সংঘটন	১২.০	১০.০	৯.১	৮.৩	৭.৪
প্রবৃদ্ধি-দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা			১.৪	১.৪	১.৪

উৎস: জিইডি'র প্রক্ষেপণ

দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের প্রধান উপাদানসমূহ

অষ্টম পরিকল্পনার দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট দারিদ্র্য: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দুই বছরের মধ্যে ২০২০ এর ০৬ মাসের মধ্যে কোভিড-১৯ এর অভিঘাতে সৃষ্ট দারিদ্র্য থেকে ঘুরে দাঁড়ানোকে সর্বোচ্চ ও তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার দিতে হবে। অর্থবছর ২০২১ এর প্রথমার্ধে কোভিড-১৯ এর স্থায়ী প্রভাব এবং অভিঘাতের ব্যাপকতাকে বিবেচনা করলে ১৮ মাসের পুনরুদ্ধার মেয়াদ যৌক্তিক বলে মনে হয়। দারিদ্র্য নিরসন সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে থাকবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে উন্নতি এবং কোভিড-১৯ সর্ম্পকিত স্বাস্থ্যসেবাজনিত ব্যয় যাতে সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে যারা এবং যারা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়ের কারণে আয় হারিয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের আয় সরবরাহ বৃদ্ধি করা। কোভিড-১৯ এর কারণে যারা বেকার হয়ে পড়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; তাদেরকে স্বল্প খরচের ঋণ সুবিধার মাধ্যমে কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর গতিশীল বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতকে রক্ষা করা। যান্ত্রিক সহায়তা, কৃষি ঋণ, বাজারজাতকরণে সহায়তা, সরকারি ক্রয়ের মাধ্যমে মূল্য সহায়তার অভিগম্যতাসহ অসংখ্য নীতিমালার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বহুমূখীকরণে সহায়তা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কর্মসৃজন: ২০০০-২০১৬ মেয়াদে দারিদ্র্য পরিস্থিতির অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের মূল নির্ধারক হলো জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি যা উৎপাদন, নির্মাণ ও সেবা খাতে কর্মসৃজন প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণে দেখা যায় যে, স্বল্পমেয়াদে সরকারের গৃহীত

নীতি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি কৌশল এর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে জিডিপি প্রবৃদ্ধির পুনরুদ্ধার কত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হবে। এভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দীর্ঘমেয়াদে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এ স্থিরকৃত ০৮ শতাংশের লক্ষ্যে ফিরে আসতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে এ প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫% এ পৌছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অংশ কমতে থাকবে, অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ, বিশেষ করে উৎপাদন এবং সেবাখাত বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধি দুই সংখ্যায় উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এভাবে অর্থবছর ২০২০ এর ২৫% থেকে জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ২০২৫ অর্থবছরে ৩১% এ উন্নীত হবে। উৎপাদনখাতের এই পরিবর্তনশীল গঠন এই খাতে কর্মসৃজনের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে। এছাড়াও শহর ও গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানে লক্ষ্যণীয় স্থবিরতা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দূর করতে সিএমএসএমই এর ভূমিকা বৃদ্ধিতে ২য় অধ্যায়ে পরামর্শকৃত কৌশল অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন ও অকৃষি খাতে কর্মসৃজনে অতি গুরুত্বপূর্ণ হবে।

জিডিপি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি খাতের অংশ কমে গেলেও খাদ্য নিরাপত্তা এবং আত্মনির্ভরশীল কৃষকদের আয় রোজগারের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হয়ে থাকবে। এই কৃষকদের অনেকেই দরিদ্র। তারপরও গ্রামাঞ্চলে অকৃষি খাতে কর্মসৃজন শ্রমিকদের দারিদ্র্য নিরসনে প্রধান ভূমিকা রাখবে। কৃষিখাতে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি নিরসন, শস্য বহির্ভূত কৃষির বহুমূখীকরণ, মাছ চাষ, গবাদিপশু এবং দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি কৃষিখাতে জড়িত কৃষক ও শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং ফসল উৎপাদনশীলতার প্রসার বাড়াতে বিনিয়োগ করা হবে, বিশেষ করে চালে। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বীজ ও প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হবে। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোর বরেন্দ্র এলাকাতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে খরা প্রবণ এলাকায় কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করতে পানি সম্পদে বিনিয়োগ করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলাবদ্ধতা প্রতিকারে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে। নদীভাঙন ও লবণাক্ততা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এসব কর্মকাণ্ডের সবই ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০) এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষি ও পানি সম্পদ বিষয়ে অংশ ০২ এর ৫ম অধ্যায়ে আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলাগুলোতে ঝুঁকি নিরসনে বিডিপি ২১০০ এর বাস্তবায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রাম ও শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বের করা হয়েছে। এটি হচ্ছে উৎপাদন খাতে প্রবৃদ্ধির অনিশ্চিত গতিপ্রকৃতি যা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করবে। উৎপাদনখাতে কর্মসৃজনের স্থবিরতা এবং ২০১৩-২০১৬-১৭ মেয়াদে উৎপাদন খাতে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতার দ্রুত পতনের বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাত্মকভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা যায়। উৎপাদন খাতে মূল্যসংযোজন এবং কর্মসংস্থান বাড়াতে এ বিষয়ক নীতিমালার প্রধান উপাদানগুলোর লক্ষ্য হলো তৈরি পোশাক শিল্পের বাইরে শ্রমনিবিড় রপ্তানিমুখী উৎপাদনখাতের বহুমূখীকরণ ও উন্নতি বিধান করা। তৈরি পোশাক শিল্পের সাফল্যের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য শ্রমনিবিড় উৎপাদন খাতের রপ্তানির নীতি তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, রপ্তানিবিরোধী সুরক্ষামূলক বাণিজ্য নীতির অবসান, অবকাঠামোগত সেবার উন্নয়ন, বন্দর ও কারখানা গেইটের মধ্যে অনিয়ম, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং পরিবহন সংযোগের মাধ্যমে বাণিজ্য ব্যয় নিরসন করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যেসব উৎপাদন ও বাণিজ্য নীতি সংস্কার করা হবে তা বিস্তারিতভাবে অংশ ০২ এর ২য় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষির বাইরে উৎপাদন ও সেবাখাতসমূহে শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য সিএমএসএমইগুলো কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস। সিএমএসএমই-এর কর্মসংস্থান হলো স্বল্পমেয়াদে নিয়োগকৃত এবং পারিবারিক শ্রমের এক মিশ্র সমন্বয়। এসব শিল্পখাত প্রকৃতিগতভাবে প্রধানত অনানুষ্ঠানিক; এখানে সামান্য মূলধনের বিনিয়োগ, দুর্বল প্রযুক্তি এবং ক্ষুদ্র পরিসরের উৎপাদন বিদ্যমান। উৎপাদনকারী সিএমএসএমই এর সাথে আনুষ্ঠানিক মধ্যম ও বড় মাত্রার শিল্প খাতের উৎপাদনের সাথে কোন সংযোগ নেই। আনুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক শিল্পের সাথে সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতের সংযোগ তৈরিতে অগ্রগতি ছিল কিন্তু বিগত কয়েক বছরে আনুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এই সংযোগকে দুর্বল করে দিয়েছে। সিএমএসএমই এর গতিশীলতার অভাব কর্মসৃজনে একটি বড় বাঁধা । কোভিড-১৯ এর ফলে এটির ওপর আবারও আঘাত এসেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কৌশলের বড় কৌশলগত পরিবর্তন হবে ব্যাংক অর্থায়নে উত্তম অভিগম্যতা এবং প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সিএমএসএমই খাতকে শক্তিশালী করে এসএমই ফাউন্ডেশনকে আমেরিকার ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংঘ (এসবিএ) এর মতো প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়াও ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চতর ঝুঁকির কারণে, বিশেষ করে প্রারম্ভিক পর্যায়ে সিএমএসএমইতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। ঋণ গ্যারান্টি কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়।

উৎপাদন খাতের পরিবর্তনের পাশাপাশি সেবাখাত ঐতিহাসিকভাবেই একটি শক্তিশালী মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাথমিকভাবে, কৃষিখাত থেকে শ্রমিকদের স্থানান্তর প্রধানত গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক সেবাখাতসমূহে হয়েছে। কালক্রমে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্প ও নির্মাণকাজের উদ্ভব কম উৎপাদনশীল ও নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক সেবাখাতসমূহের বিকাশকে স্থবির করে দিয়েছে। সেবাসমূহের মধ্যে পরিবহন, বাণিজ্য, অর্থ, গৃহায়ন, পর্যটন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবাসমূহের দৃশ্যমান রূপান্তর ঘটেছে। এই রূপান্তরের অনেকটাই শহরাঞ্চলে ঘটেছে কিন্তু উন্নত পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের বিস্তারের সাথে সাথে সেবাসমূহের আধুনিকায়ন হচ্ছে। ঋণ প্রদানে সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি খাতের শক্তিশালীকরণ ও রপ্তানির উন্নতিবিধান এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেবাখাতের এই রূপান্তর সম্ভব হবে।

দারিদ্র্যকেন্দ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ: মানবসম্পদের উন্নয়ন সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের অন্যতম হাতিয়ার। প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই খাতে অগ্রগতি সত্ত্বেও দক্ষতাজনিত বাঁধা অনেক। মাধ্যমিক ও এর উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধি, শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতিবিধান এবং কর্মমুখী দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে আরো সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অংশ ০২ এর ১০ম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেবায় সমতা বৃদ্ধিতে আরো বেশী প্রচেষ্টা প্রয়োজন যাতে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় উত্তমভাবে অংশগ্রহণে দরিদ্রদের সক্ষম করে তোলা যায়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দীর্ঘ মেয়াদে আয় বৈষম্য নিরসনের সবচেয়ে ভালো উপায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়নের ওপর বেশ জোরালো আলোকপাত করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির ওপর জোর দেওয়া হবে, গুণগত মানের ওপর জোর দেওয়া হবে এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দরিদ্রদের অভিগম্যতার উন্নতিবিধানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। অংশ ০২ এর ১০ নং অধ্যায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কৌশল বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (বিডিপি ২১০০) এর বাস্তবায়ন: এটা সুবিদিত যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে দারিদ্র্য ও ঝুঁকি আন্তঃসম্পর্কিত। তাই দারিদ্র্য নিরসনের টেকসই প্রক্রিয়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সম্পর্কিত। অন্যান্য বিষয়সহ এটিকেও মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে বিডিপি ২১০০ প্রস্তুত করা হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিডিপি ২১০০ গ্রহণ বাংলাদেশের কৌশল প্রণয়নে একটা বড় মাইলফলক, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভাবনার পথে বাঁধা প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হলো বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ।

বৈদেশিক অভিবাসন থেকে কর্মসৃজন ও আয় উপার্জন ত্বরান্বিতকরণ: ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার শিক্ষা নিয়ে দারিদ্র্য নিরসনে বৈদেশিক অভিবাসনের সম্ভাব্য শক্তিশালী ইতিবাচক ভূমিকা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অর্থবছর ২০২১ সালের শেষে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দারিদ্র্য নিরসনের বৈদেশিক অভিবাসন কৌশল অনেক আন্তঃসম্পর্কিত নীতিমালা নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে রয়েছে ১) বাংলাদেশ থেকে শ্রম শক্তি রপ্তানি করতে বর্তমান ও নতুন সম্ভাব্য শ্রম-ঘাটতি সম্পন্ন দেশগুলোর সাথে আলাপ আলোচনা করতে সরকারি প্রচেষ্টাসমূহকে শক্তিশালী করা; ২) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা; ৩) নির্ভুল তথ্য প্রবাহ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক অভিবাসনের অভিগম্যতা না পাওয়া বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দরিদ্রতম জেলাগুলোতে বৈদেশিক অভিবাসনে সহায়তা করা; ৪) স্বল্প খরচে যে সকল প্রতিষ্ঠান অভিবাসন সেবা সরবরাহ করে তাদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাইরের অভিবাসনের খরচ কমানোর উপায় বের করা; ৫) বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত সরকারি কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ উপার্জনের ক্ষেত্রে অভিবাসনের খরচ বহন করতে এককালীন ঋণের সুবিধা প্রদান করা; ৬) হাইকমিশনের মাধ্যমে তথ্য ও দুর্নীতিবিরোধী সেবাসমূহ প্রদান; ৭) এটি নিশ্চিত করা যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে রেমিটেন্সের বিনিময় হার হ্রাসকৃত বাজার হারের সাথে প্রতিযোগিতামূলক হবে; ৮) প্রবাসী আয় পাঠানোর জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং চ্যানেলের ব্যবহারকে সক্ষম করে তুলতে অভিবাসী কর্মীদের ভালো ব্যাংকিং সেবা প্রদান।

ক্ষুদ্র ঋণ সেবাসমূহের চলমান প্রবৃদ্ধি: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দারিদ্র্য নিরসনে এবং গ্রামাঞ্চলে জীবনমানের রূপান্তরে ক্ষুদ্র ঋণ সেবাসমূহের একটি বড় নীতিগত সাফল্য রয়েছে। এই অগ্রগতি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও শক্তিশালী করা হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যয় কমিয়ে আনার এমন উপায় উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করা হবে যা ঋণ প্রদান থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃপরিশোধের মাধ্যমে লেনদেন ব্যয় কমাতে সহায়তা করবে। কিছু কিছু ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের মূলধারার ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

বাংলাদেশের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার প্রবর্তন: কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের ফলে দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ করে চরম দারিদ্র্য নিরসনে বড় নীতিগত কর্মসূচি হিসেবে একটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ গুরুত্ব পেয়েছে। চরম দরিদ্ররা বিশেষভাবে আঘাত প্রাপ্তরা, স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে। বাংলাদেশের এখন সময় এসেছে এক ধরণের স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচি পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে শুরু করা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবায় অর্থায়নের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে স্বাস্থ্য বিমাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উক্ত স্বাস্থ্য সেবায় অর্থায়নের কৌশল বাস্তবায়ন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রাধিকার পাবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর বাস্তবায়নকে শক্তিশালীকরণ: উপরোক্ত কৌশল ও নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য নিরসনে সহায়তা করার জন্য একটি সুচিন্তিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নানান ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টণী কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও এ বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতাও রয়েছে তারপরেও কিছু সমাজিক নিরাপত্তা বেষ্টণী কর্মসূচির কার্যকারিতা ও দারিদ্র্যবিমুখতার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন রয়েছে। কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতাতেও বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতির কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য দুটো বড় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রথমত, এনএসএসএস এর বাস্তবায়ন দ্রুততর করতে হবে। এনএসএসএস এ সুপারিশকৃত মূল জীবন চক্র ঝুঁকিভিত্তিক কর্মসূচিসমূহকে একত্র করে একটি বহুমূখী কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিনিময় পদ্ধতির লেনদেন থেকে সরে এসে নগদ অর্থ অনলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে। এনএসএসএস এর দ্বারা চিহ্নিত উপযুক্ত নির্দেশকসমূহের ওপর ভিত্তি করে সুবিধাভোগীদের জন্য একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং অনলাইনে যেকোনো অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, সংস্কারকৃত সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতির অর্থায়নকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এটি ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার 'সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি ও অর্থায়ন' এ বর্ণিত হয়েছে যেখানে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় (সিভিল সার্ভিস পেনশন ব্যতিরেকে) অর্থবছর ২০১৯ এর ১.২% থেকে জিডিপির শেয়ার হিসেবে অর্থবছর ২০২৫ এ ২.০% এ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

৪.২.৬ চরম দারিদ্র্য মোকাবেলার কৌশল-অতিরিক্ত ব্যবস্থা।

চরম দারিদ্র্য নির্মূলে ছোট ছোট সাফল্যের পুনঃপ্রয়োগ: এক্ষেত্রে অনেকগুলো সাফল্য রয়েছে এবং এগুলোর পদ্ধতিগত নানা ধরণের বৈচিত্র্যও রয়েছে। বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট জীবিকা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি এতে অন্তর্ভুক্ত (যেমন: EEP, CLP, TUP ইত্যাদি) যেগুলো জটিল প্রকৃতির চরম দারিদ্র্য মোকাবেলায় ভালো কার্যকারিতা দেখিয়েছে। এ ধরণের বেশিরভাগ কর্মসূচির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সংশ্লিষ্ট চরম দরিদ্রদের কাছে সরাসরি সম্পদ (বস্তুগত বা আর্থিক) হস্তান্তর। এই কর্মসূচিগুলো তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সঞ্চয় অভ্যাস, সাংগঠনিক, আর্থিক ও বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধিতে বা সমর্থন যোগাতে সহায়তা করে, যা বাজার ব্যবস্থায় পাওয়া সম্ভব নয় এবং শুধুমাত্র টাকা দিয়ে রাতারাতি অর্জন করা যায় না। এখন এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-খাটো সংস্কার করে ব্যাপকভাবে পুনঃপ্রয়োগ করা দরকার, যাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চরম দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে অধিকাংশ চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই কর্মসূচিগুলোর আওতায় নিয়ে আসা যায়।

অভিঘাত প্রতিরোধ ও প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মনে করিয়ে দেয় কীভাবে যেকোনো দুর্যোগ/অভিঘাত চরম দারিদ্র্য নিরসনের হারকে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ দরিদ্র ও দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সীমিত সম্পদ রয়েছে এবং অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো সঞ্চয় নেই। কোভিড-১৯ এর মতো ভয়ংকর এবং দীর্ঘমেয়াদি অভিঘাত দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতিকে বানচাল করে দিতে পারে। তাই দরিদ্রদের জন্য সম্পদ নির্মাণে এবং সম্পদের রক্ষায় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ এর ফলে দরিদ্র লোকরা আরোও দরিদ্র হয়েছে এবং চরম দরিদ্ররা হতাশায় ভুগছে। যদিও কোভিড-১৯ মানবজীবনে একবার ঘটার মত অপ্রত্যাশিত বৈশ্বিক অভিঘাত, তবুও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়মিত অভিঘাত বাংলাদেশের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ধরণের প্রতিরোধযোগ্য অভিঘাতের কারণে দারিদ্র্যে পরিস্থিতির অবনতি না ঘটলে, বাংলাদেশ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য থেকে আরও দ্রুততার সাথে বেরিয়ে আসতে পারত। তাই দরিদ্র ও বিশেষ ভাবে দরিদ্রতমদের জন্য অভিঘাত প্রতিরোধ ও ঝুঁকি নিরসন অষ্টম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি প্রশমন কৌশল প্রত্যাশিত ঝুঁকির প্রভাব কমাতে ব্যবহার করা হবে তার একটি হলো বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সর্ম্পকিত অভিঘাত নিরসন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা চালু। এই দুটি কৌশলকেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উন্নয়নের আঞ্চলিক ভারসাম্যে অগ্রগতি: পরপর কয়েকটি খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে দেখা যায় যে দারিদ্র্যের তীব্রতা জেলা ও উপজেলা ভিত্তিতে ভীষণভাবে আলাদা। কিছু কিছু দরিদ্র জেলা ও উপজেলা রয়েছে যা দীর্ঘমেয়াদে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে বছরব্যাপী কষ্ট ভোগ করছে। এই পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর দারিদ্র্য সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করলে চলমান অধিকাংশ কর্মসূচির চেয়ে আরো সফলভাবে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় কাজ যা বিস্তারিতভাবে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২.৭ বহুমূখী দারিদ্র্য সূচক (Multidimensional Poverty Index-MPI)

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অনুযায়ী নারী, পুরুষ ও শিশুদের সকলের সব মাত্রায় দারিদ্র্য দূরীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। দারিদ্র্য ও বঞ্চনার বহুমূখী প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার বহুমূখী দারিদ্র্য সূচক (MPI) নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং শিশু সম্পর্কিত বহুমূখী দারিদ্র্য সূচক (Child MPI)-কে বাংলাদেশের জাতীয় MPI প্রণয়নের সূচনাপর্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। MPI বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকার অ-অর্থনৈতিক দারিদ্র্য সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাবে যা দারিদ্র্য নিরসনের জন্য দরিদ্রতম এলাকাগুলোর মধ্যে দরিদ্রতম উপদলগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে। দারিদ্র্যের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণগুলো কি কি সে বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে এই সূচকসমূহ সুনির্দিষ্ট এলাকা কিংবা উপদলগুলোর জন্য কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যবহার করা যাবে যাতে তারা তাদের দারিদ্র্য নিরসন করতে পর্যাপ্ত এবং যথাযথ নির্দেশনা পায়। এটি আশা করা যায় যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জাতীয় MPI এবং Child MPI সরকারের অ-অর্থনৈতিক দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিকে আরও বেগবান করে তুলবে। এর ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং প্রান্তিক দরিদ্রগোষ্ঠী মূলধারার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসবে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, বৈশ্বিক বহুমূখী দারিদ্র্য সূচক (Global MPI) প্রতিবেদন ২০২০ অনুসারে, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সংঘটন এবং দারিদ্র্যের তীব্রতা উভয়ই ২০১৪ সালের ০.১৭৫ থেকে ২০১৯ সালে ০.১০১ পয়েন্টে নেমে এসেছে। অন্যদিকে ২০১৪ সালে বৈশ্বিক MPI অনুযায়ী দরিদ্র ছিল মোট জনসংখ্যার (৫৮.০ মিলিয়ন) ৩৭.৬%, এই অনুপাত ২০১৯ সালে (৩৯.২ মিলিয়ন) ২৪.১% এ নেমে আসে। এর অর্থ হলো এই যে, ১৮.৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী এই সময়কালে দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসেছে।

৪.৩ আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে অগ্রগতি

বাংলাদেশ ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছে যেখানে বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি, লিঙ্গ কিংবা স্থানকাল নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ কারণ বিভিন্ন খাতে দুর্বল প্রাথমিক অবস্থা, খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, খাতের গতিশীলতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন মাত্রার বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। তাই সরকার এসব বৈষম্য চিহ্নিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিভিন্ন নীতিগত ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে উন্নয়ন সমতা নিশ্চিত করবে।

স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো অনুযায়ী, বাংলাদেশ ০৮ টি বিভাগ ও ৬৪ টি জেলা নিয়ে গঠিত। জেলাগুলোকে আবার উপজেলা ও থানাতে ভাগ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বিভাগ কিংবা জেলাগুলোতে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাগুলোতে কাঙ্খিত মাথাপিছু আয় অর্জন হয়েছে কি না তা দেখা সম্ভব হয় না। তারপরও খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এর তথ্য জেলা ও এলাকাভিত্তিক দরিদ্রদের অবস্থান খুঁজে পেতে একটি সর্বজনীন সুযোগ তৈরি করে দেয়। অতএব, এটি আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর চিত্র প্রদান করে। এটি নীতি নির্ধারণে, বিশেষ করে আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে বৈষম্য নিরসন করতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে খুব কাজে আসে।

৪.৩.১ দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বণ্টন

সরকারের একটা গুরুত্বপুর্ণ উদ্দেশ্য হলো এটি নিশ্চিত করা যে, সারাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতি হয়েছে এবং কোন এলাকা বা জেলা এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আয় বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। সবচেয়ে মৌলিক ফলাফল হলো যে উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সব এলাকায় দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (সারণি-৪.৮)। খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশালের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে ২০০০ ও ২০১৬ এর মধ্যে দারিদ্র্যের দ্রুত হ্রাসের সংবাদটি সংবাদপত্রে খুব ফলাওভাবে প্রচারিত হয়েছে। কৃষিতে মন্দা মাসগুলোতে ক্ষুধা ও বিভিন্ন বঞ্চনায় রংপুরের জনগণ বিশেষভাবে কষ্ট ভোগ করতো। এখন এটি অতীতের বিষয় হয়ে গেছে এবং রংপুর চরম দারিদ্র্য নিরসনে ৬০% এর বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। চরম দারিদ্র্য একইরকমভাবে হ্রাস পেয়েছে ময়মনসিংহ, বরিশাল ও খুলনাতে। এসব পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো সচরাচরভাবে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে অনেক বেশি মাত্রায় কষ্ট ভোগ করে।

সারণি ৪.৮: বিভাগভিত্তিক দারিদ্র্য বন্টন (%)

বিভাগ	দারিদ্র্য হার (%)				চরম দারিদ্র্য হার (%)			
	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
বরিশাল	৫৩.১	৫২.০	৩৯.৪	২৬.৪	৩৪.৭	৩৫.৬	২৬.৭	১৪.৪
চট্টগ্রাম	৪৫.৭	৩৪.০	২৬.২	১৮.৩	২৭.৫	১৬.১	১৩.১	৯.০
ঢাকা	৪২.৩	২৭.৭	২৫.৮	১৬.৭	৩০.৬	১৬.১	১১.৩	৭.৪
খুলনা	৪৫.১	৪৫.৭	৩২.১	২৭.৭	৩২.২	৩১.৬	১৫.৪	১২.১
ময়মনসিংহ	৬০.৬	৪৮.৫	৪৮.৩	৩২.৯	৪৭.০	৩৫.০	৩১.৯	১৮.০
রাজশাহী	৪৫.১	৪৫.৭	৩২.১	২৭.৭	৩২.২	৩১.৬	১৫.৪	১২.১
রংপুর	৬০.৬	৪৮.৫	৪৮.৩	৩২.৯	৪৭.০	৩৫.০	৩১.৯	১৮.০
সিলেট	৪২.৪	৩৩.৮	২৮.১	১৬.২	২৬.৭	২০.৮	২০.৭	১১.৫

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬ এর ওপর ভিত্তি করে প্রাক্কলন, বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্য মূল্যায়ন ২০১৯, ভলিউম ২

যদিও আঞ্চলিক দারিদ্র্য নিরসনে টেকসই অগ্রগতি একটা ভালো সংবাদ, তবুও এটা মাথায় রাখতে হবে যে দারিদ্র্য নিরসনের অগ্রগতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়ে গেছে (সারণি ৪.৮)। বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চলগুলোতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) দারিদ্র্য পশ্চিম অঞ্চলের (খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগ) চেয়ে কম। যেহেতু অঞ্চলের অভ্যন্তরে দারিদ্র্য সংঘটন ও তীব্রতার পার্থক্য রয়েছে, সেহেতু জেলা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিভাজনে এই বিষয়টি ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সবচেয়ে কম দারিদ্র্য হার প্রদর্শনকারী ১০টি জেলার অগ্রগতির সাথে সবচেয়ে দরিদ্র ১০টি জেলার তুলনা করে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দারিদ্র্য ফলাফলের বৈষম্যের জন্যে কি কি বিষয় দায়ী তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় জেলাভিত্তিক তুলনামূলক আলোচনায় ।

৪.১৪ নং চিত্রে ১০টি সবচেয়ে বেশী দরিদ্র এবং ১০টি কম দরিদ্র জেলাগুলোর চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে কিছু আকর্ষণীয় বিষয় আলোকপাত করা যেতে পারে:

- জেলা পর্যায়ের দারিদ্র্যের বৈষম্য বেশী। সবচেয়ে কম দরিদ্র জেলা (নারায়নগঞ্জ) এবং সবচেয়ে দরিদ্র জেলা (কুড়িগ্রাম) এর ব্যবধান ৬৮ শতাংশ পয়েন্ট।
- সবচেয়ে কম দরিদ্র জেলাগুলো বাংলাদেশের পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। ঢাকা বিভাগে ০৬টি (নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মাদারিপুর, ফরিদপুর এবং ঢাকা), চট্টগ্রাম বিভাগে ০২টি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ফেনী) এবং সিলেট বিভাগে ০২ টি (মৌলভীবাজার এবং সিলেট)
- সবচেয়ে দরিদ্র জেলাগুলো সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও রংপুর বিভাগের পশ্চিমের জেলাগুলোতে অনেকগুলো অতিদরিদ্র জেলা রয়েছে (কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, রংপুর এবং লালমনিরহাট)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতেও দরিদ্র মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার তিনটি জেলার দুটোতেই দারিদ্র্য হার ৫৩-৬৩ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুনের চেয়ে বেশী।

চিত্র ৪.১৪: ১০টি সবচেয়ে কম দরিদ্র এবং ১০টি সবচেয়ে বেশি দরিদ্র জেলা ২০১৬

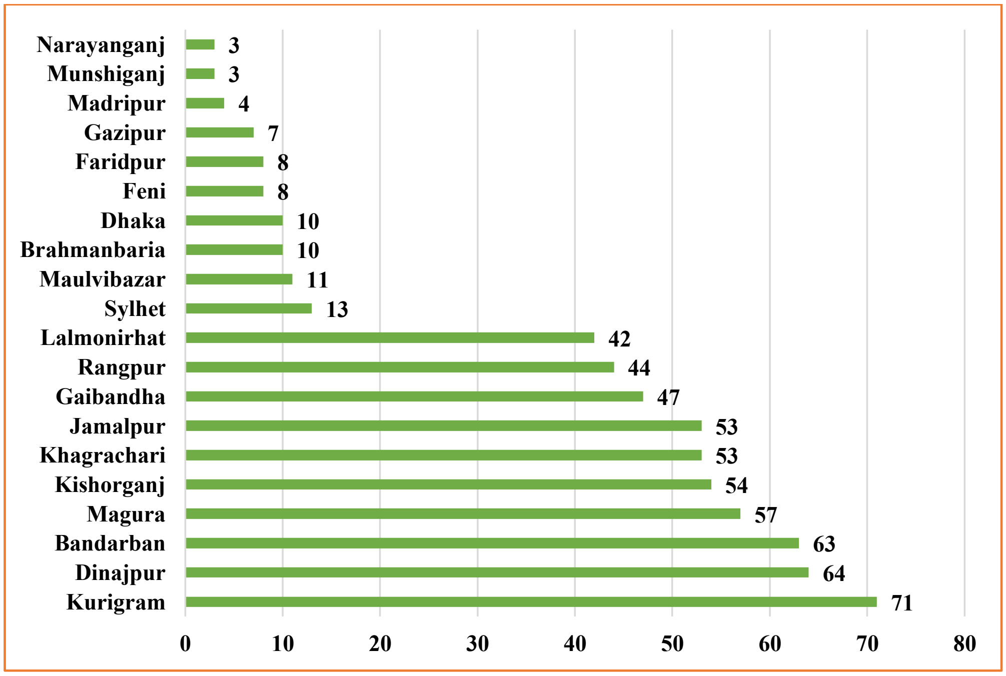

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১৬, বিবিএস

একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন হলো কেন এই ১০টি জেলা এতো দরিদ্র এবং এইসব জেলা যে দারিদ্র্য হার প্রদর্শন করে তা কেন জাতীয় দারিদ্র্য হারের এতো উপরে। এই বিশ্লেষণ জেলা পর্যায়ে দারিদ্র্যের উপস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার দাবি রাখে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য একত্রিত করে সীমিত মাত্রায় করা কিছু বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে আলাদা আলাদাভাবে এই জেলাগুলোতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

- এসব জেলা মূলতঃ কৃষি খাত দ্বারা পরিচালিত, ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেশী, উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় উৎপাদন ও নির্মাণ খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত। বিশেষ করে অকৃষি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা এসব জেলাগুলোতে কম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় কম।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ করে বন্যা ও নদী ভাঙনে অধিক কষ্ট পায়।
- উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসমূহ কম রয়েছে বা দুর্বল।
- উন্নত জেলাগুলোর তুলনায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও আয় সরবরাহে দুর্বল অভিগম্যতা রয়েছে।
- ন্যূনতম দরিদ্র জেলাগুলোর তুলনায় দুর্বলতর শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থা রয়েছে।

৪.৩.২ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে দারিদ্র্য সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল

দরিদ্রতম জেলাগুলোতে দারিদ্র্য নির্মূল করতে উপরোক্ত তথ্যগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্ম পরিকল্পনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি প্রদান করে। প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত চাহিদার উন্নতি বিধানে এডিপি ব্যয়ের ওপর আলোকপাত করা।
- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা এবং পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে লবণাক্ততা চিহ্নিত করার জন্য বিডিপি ২১০০ এর প্রকল্প সম্পাদন পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- চর এলাকার ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে চর উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা করা।
- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আয় সহায়তা প্রদানে সহায়তা করতে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণমূলক সেবাসমূহের ওপর আলোকপাত করা।

- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে ঋণগত, প্রযুক্তিগত ও বাজারজাতকরণ সেবাসহ আলোচিত সহযোগিতা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ অকৃষি খাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের সুবিধা তৈরি করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের খরচ মেটাতে নির্ভুল তথ্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর অবস্থান উন্নত করা।
- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি সেবাসমূহে অভিগম্যতা বাড়ানো।
- পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুদান বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তোলা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় সেবা প্রদানকারী এনজিও ও সিবিওর অংশীদারিত্ব মজবুত করা।
- উপরের দিকের ১০টি দরিদ্রতম জেলাগুলো যে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সেগুলোর সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান করতে জেলাপর্যায়ে গভীরভাবে দারিদ্র্য মূল্যায়ন করা এবং এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারি কর্মসূচি গ্রহণ করা
- জেলা পর্যায়ের গড় আয় বিন্যাসের ধারণা পেতে জেলাপর্যায়ে বিবিএস এর সহায়তায় জিডিপি প্রাক্কলন পুনরায় চালু করা প্রয়োজন এবং গড় আয় বিন্যাসের সমকেন্দ্রিকতা ঘটছে কিনা তাও মূল্যায়ন করা দরকার।

৪.৪ আয় বৈষম্য নিরসনে উন্নতি

উপরোক্ত দারিদ্র্য নিরসন বাস্তবায়ন কৌশলটি আয় বৈষম্য রোধ ও চূড়ান্তভাবে নিরসনকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, ভোগ বৈষম্যে বাংলাদেশের জিনি সহগ ০.৩২ এর কাছাকাছি মাত্রায় স্থিতিশীল রয়েছে, কিন্তু জিনি সহগ ও পালমা অনুপাতের হিসেবে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় বৈষম্য নিরসন একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার ফল। চীন ও ভারতের মতো বর্ধনশীল অর্থনীতি উঠতি আয় বৈষম্যের অভিজ্ঞতা লাভ করছে। যেহেতু সম্পদ ও মানব সক্ষমতা ঐতিহাসিকভাবে অসমভাবে বন্টিত, বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে প্রবৃদ্ধির মুনাফাসমূহ তাদেরকেই সুবিধাদি দিচ্ছে যারা আগে থেকেই সম্পদ ও মানব সক্ষমতার আশীর্বাদপুষ্ট। দীর্ঘমেয়াদি আয় বৈষম্য নিরসন কৌশল এই প্রাথমিক ব্যবধানের ওপর আলোকপাত করবে। দরিদ্রদের অভিগম্যতার পার্থক্যও দূর করার ওপর জোর দিতে মানব উন্নয়ন কৌশল একটা শক্তিশালী উপকরণ। দরিদ্রদের ঋণ পাওয়ার অধিকারের মাধ্যমে সম্পদ তৈরির সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আয় বৈষম্য নিরসন করা যেতে পারে। শারীরিক ও সামাজিক বাঁধাসমূহ দূর করার মাধ্যমে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উক্ত কৌশল হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পশ্চিম ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আয় বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে রাজস্ব নীতি একটা শক্তিশালী উপকরণ হতে পারে। এটি সামাজিক খাতে (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপদ স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ এবং সামাজিক সুরক্ষা) বর্ধিত সরকারি ব্যয় বরাদ্দ দাবি করে। এটি খুব সুসংগঠিত ব্যক্তিগত আয়কর ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রগতিশীল হারে সকল আয়ের উৎসে করারোপ করা সম্ভব।

৪.৪.১ উত্তম আয় বন্টন কৌশল

ক) *ভূমি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ*

দরিদ্রদের সাধারণত খুব সামান্যই স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পদ থাকে। যারা সৌভাগ্যবান তাদের গ্রাম এলাকায় খুব সামান্য বসতভিটা রয়েছে। ক্ষমতাসীন উচ্চবর্গের দ্বারা জমি বিষয়ক ঝামেলা ও সামান্য ক্ষতি পূরণ প্রদানের মাধ্যমে জমি দখল বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জমি নিয়ে বিরোধ শহরাঞ্চলেও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। উচ্চবর্গের ধণিক শ্রেণীর নিকট সরকারি জমি নিয়মবহির্ভূত উপায়ে বণ্টনের মাধ্যমে জমিতে দরিদ্র শ্রেণির অসম অভিগম্যতা সম্পদ ও আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য তৈরি করেছে। সঠিক ভূমি ব্যবস্থাপনা এধরণের বৈষম্যের উৎস ঠিক করতে সহায়ক হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক, নিয়ন্ত্রণমূলক ও রাজস্ব নীতির সংস্কারের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি বাজার শক্তিশালী করা হবে। এসব সংস্কারের মধ্যে রয়েছে ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজ করা, ভূমি লেনদেন ও নিবন্ধন সহজ করা। জমির/রিয়েল এস্টেটের বাজার মূল্য অনুযায়ী নিবন্ধন ফি এবং সম্পত্তি কর নির্ধারণ করা উচিত। এতে উল্লেখযোগ্যভাবে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। এসব সংস্কার প্রভাবশালী ভূমি দখলকারীদের থাবা থেকে দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করবে। ভূমি লেনদেনের ক্ষেত্রে সঠিক মূলধনী মুনাফা কর আদায় মূলধনী মুনাফা হ্রাস করতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হবে। জমি দখলকে নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে এটি জমির মূল্য স্থিতিশীল করবে এবং সামাজিক সেবার ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব আয় যোগাবে।

খ) *পুনঃবণ্টনমূলক আর্থিক নীতিসমূহ*

বাংলাদেশে গবেষণায় দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পদের ওপর আয়কর বাধ্যতামূলক করে তা দরিদ্রদের স্বার্থে সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে পুনঃবণ্টন সমাজে আয় বণ্টনের উন্নতি ঘটাবে। গবেষণার ফলাফলগুলো ৪.২ বক্সে বর্ণনা করা হয়েছে।

বক্স ৪.২: বৈষম্য নিরসনে অতিরিক্ত রাজস্ব ব্যয়ের অনুমিত প্রভাব

উত্তম কর প্রশাসন, উচ্চতর প্রত্যক্ষ কর রাজস্ব আদায় এবং নগদ সরবরাহের মাধ্যমে রাজস্ব পুনঃবণ্টন পদ্ধতির গুরুত্ব বাংলাদেশের উদাহরণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়কর ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং নিম্ন আয়ের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে আদায়কৃত অতিরিক্ত রাজস্ব সরবরাহের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের (জিনি সহগের মাধ্যমে পাওয়া) চিত্র নিচে উপস্থাপিত হলো। বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১ থেকে ২০৪১) সামষ্টিক প্রক্ষেপণের সাথে যুক্ত সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যষ্টিক পরীক্ষামূলক মডেল (Micro-simulation Model) থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো গৃহীত হয়েছে। এখানে তিনটি পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছেঃ ১) প্রাথমিক পরীক্ষায় (দুর্বল সমন্বয়) দেখা যায় যে, ০৮ থেকে ০৯ শতাংশ হারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও দূর্বল রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থার কারণে এই প্রবৃদ্ধি জিনি সহগের ওপর সামান্যই প্রভাব ফেলে। ২) রাষ্ট্রের সকল আয়কর যোগ্য ব্যক্তি তাদের প্রদেয় আয়কর প্রদান করলে বাংলাদেশের বৈষম্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে ৩) একটি কার্যকর আয়কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সবচেয়ে দরিদ্র ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কার্যকরভাবে হস্তান্তর করা হলে জিনি সহগের নাটকীয় পরিবর্তন সম্ভব হবে।

প্যানেল ক: জিনির ওপর প্রভাবসমূহ

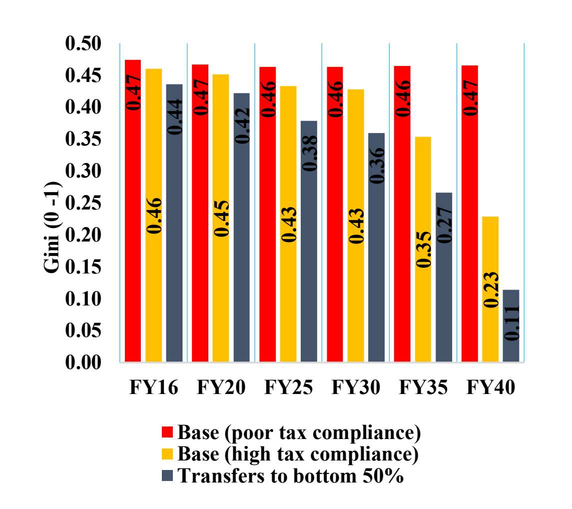

উৎস: খোন্দকার ও অন্যান্য (২০২০)

প্যানেল খ: জিনির শতকরা পয়েন্টের হার (ভিত্তির ওপর)

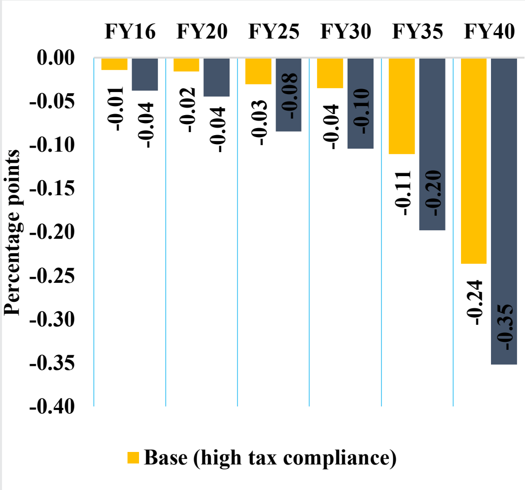

পুনঃবণ্টনমূলক রাজস্ব নীতির প্রবর্তন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ এর মূল রাজস্ব নীতি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই রাজস্ব নীতির প্রথম পর্বের বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কর ও সামাজিক ব্যয়ের সমন্বয়ে যে পুনঃবণ্টনমূলক রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন করা হবে তা ৪.৯ সারণিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারণি ৪.৯: আয় বৈষম্য কমাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব সংস্কারসমূহ (জিডিপির %)

সংস্কার পদক্ষেপসমূহ	অর্থবছর ২০১৯ (ভিত্তি বছর)	৫-বছর বৃদ্ধি	অর্থবছর ২০২৫
সামাজিক খাতে ব্যয়			
: শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি	২.০	১.০	৩.০
: স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি	০.৭	১.৩	২.০
: সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি (সিভিল সার্ভিস পেনশন বাদ দিয়ে)	১.২	০.৮	২.০
: গ্রামীণ অবকাঠামো ও পানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি	১.৯	১.১	৩.০
সামাজিক খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি		৪.২	
অর্থায়ন			
: ভর্তুকি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে (SOE) ব্যয়হ্রাসকরণ	১.৪	(-১.০)	০.৪
: আয়কর বৃদ্ধি	২.৬	১.৯	৪.৫
: মূল্য সংযোজন কর বৃদ্ধি	৩.৩	১.৬	৪.৯
: স্থানীয় সরকার রাজস্ব বৃদ্ধি	০.২	০.৫	০.৭
মোট অর্থায়ন		৫.০	

উৎস: অষ্টম পরিকল্পনা কৌশল

এই নীতিতে সর্বপ্রথম অগ্রাধিকার হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় অন্ততপক্ষে জিডিপির ৩ ও ২ শতাংশে বাড়ানো। আর এর জন্য শিক্ষা নীতি, গভর্ন্যান্স ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সরবরাহে উন্নতির প্রয়োজন হবে।

আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে সরকারি ব্যয় বাড়ানো দরকার সেটি হলো গ্রামীণ অবকাঠামো- গ্রামীণ সড়ক, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। এই ক্ষেত্রটিতে অতীতে সরকারি ব্যয় কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। এই নীতি যে কতখানি সফল তার প্রমাণ রয়েছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরেও বাংলাদেশ খাদ্য চাহিদায় প্রায়-স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তবু শ্রম শক্তির একটি বড় অংশ এখনো কম উৎপাদনশীল ও স্বল্প আয়ের কৃষিকাজেই নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি খাতকে বহুমূখী করে উচ্চ মূল্য-সংযোজন কার্যাবলীর সাথে যুক্ত করা এবং একই সাথে কৃষিতে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অকৃষি খাতের কার্যাবলীতে স্থানান্তরে সহায়তার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এই রূপান্তরের ফলে অর্থনীতিতে শ্রমের গড় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা প্রবৃদ্ধিসহ আয় বন্টনেও সহায়ক হবে। এছাড়াও বিডিপি ২১০০ তে পানি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যা ও নদীভাঙনের ফলে গ্রামীণ জীবিকা ও সম্পদের ক্ষতি হ্রাস পাবে। অবকাঠামোতে জিডিপির ১% অতিরিক্ত ব্যয় ব্যাপক সুফল বয়ে আনবে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে (অধ্যায় ৫)।

গ্রামাঞ্চলে ঋণসুবিধার প্রাপ্যতা এই রূপান্তরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। ক্ষুদ্র ঋণের বিপ্লব দরিদ্রদের সম্পদ তৈরিতে সহায়তা করেছে এবং তাদের ভোগের বৃদ্ধির সুরক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখছে। তারপরেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি করা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর উন্নতিবিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় যে ক্ষেত্রটিতে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন, সেটি হলো সামাজিক সুরক্ষা। সিভিল সার্ভিস পেনশন বাদে সরকার বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির ১.২% ব্যয় করে থাকে। পরবর্তী পাঁচ বছরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির ২% শতাংশে উন্নীত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

সরকারি সম্পদ সীমাবদ্ধতার বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ৪.২ শতাংশ বর্ধিত সরকারি ব্যয় খুব বেশি বলে মনে হয়। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে, এই অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহের কৌশল অবশ্যই সরকারি নীতির নাগালের মধ্যে রয়েছে এবং ৫ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব নীতিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, সরকার ভর্তুকি ও সরবরাহের ওপর প্রায় ৩.৪ শতাংশ ব্যয় করে, যার মধ্যে জিডিপির ১.৪ শতাংশ বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি ও সরবরাহের ওপর এবং সরকারি ব্যাংকসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান (SOE) এর জন্য ব্যয় হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল রাজস্ব সংস্কারের লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ খাত ও সরকারি ব্যাংকগুলোসহ (SOE)-কে লাভজনক শিল্পে রূপান্তরিত করা। এই ভর্তুকিগুলো অনেকাংশেই কমে যাবে এবং অগ্রাধিকারমূলক সামাজিক ব্যয়ের খাতগুলোতে বন্টন করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, সম্পদের সীমাবদ্ধতার আরো একটি বড় কারণ হলো কর আদায়ে অপ্রতুলতা, বিশেষ করে ব্যক্তিগত আয়কর থেকে। বর্তমানে কার্যকরী আয়করের হার প্রায় ৪ শতাংশ, যা খুবই কম। বিশেষ করে জাতীয় আয়ের ৩৫ শতাংশের মালিকানা রয়েছে এমন শীর্ষ ১০ শতাংশের ওপর এই কার্যকর আয়করের হার ১০ শতাংশ বাড়ানো হলে জিডিপিতে জাতীয় আয় বর্তমানে ১.৪ শতাংশের স্থলে ৩.৫ শতাংশ বেড়ে যাবে। এজন্য প্রয়োজন হবে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা, যাতে করে 'মূলধনী আয়' কর জালের বাইরে না যেতে পারে এবং আয়কর বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত আয়ের সকল উৎস সমানভাবে গ্রহণপূর্বক কর প্রশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। কর্পোরেট আয়কর আরোপের সাথে আয় এবং মুনাফার ওপর মোট করের পরিমাণ অর্থবছর ২০১৯ এর ২.৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ এ ৪.৫% এ উন্নীত হবে। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও এর কার্যকারিতা বাড়ানো হলে তা থেকে জিডিপিতে অতিরিক্ত ১.৮ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, আধুনিক 'সম্পত্তি কর' ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তা আদায়ের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব দেয়া হলে তা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনেও সাহায্য করবে।

ব্যয় পুনঃবরাদ্দের (জিডিপি'র ১.০%) সঙ্গে ব্যক্তিগত আয়ের ওপর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত কর, ভ্যাট ও স্থানীয় সরকার রাজস্ব (জিডিপি'র ৪.০%) যুক্ত করা হলে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে জিডিপি'র অতিরিক্ত ৪.০% শতাংশ অর্থায়ন করা যেতে পারে এবং এর পরে জিডিপি'র যে ১.০% উদ্বৃত্ত থেকে যাবে, তা অবকাঠামোতে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হিসেবে অর্থায়ন করা যাবে। আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে এই প্রগতিশীল কর আরোপ ও ব্যয় পুনঃবরাদ্দের রাজস্ব নীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অধিকতর কার্যকর রাজস্ব নীতি ছাড়াও সরকার উন্নত গভর্ন্যান্সের মাধ্যমেও আয় বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

অধ্যায় ৫

সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি এবং এর অর্থায়ন

৫.১ পর্যালোচনা

ঐতিহাসিকভাবে বেসরকারি খাত বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে (চিত্র ৫.১)। অর্থবছর ২০১১ থেকে সরকারি বিনিয়োগ শক্তিশালীভাবে পুনরুদ্ধার হয়েছে। তথাপি বেসরকারি বিনিয়োগের কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে। তদানুসারে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত অর্থায়ন পরিকল্পনার প্রাক্কলন হয়েছে এই ধারণা/অনুমানের ওপর ভিত্তি করে যে বেসরকারি খাতের এই কর্তৃত্ব চলমান থাকবে। তবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রচেষ্টার মধ্যে একটা ভালো ভারসাম্য এবং পরিপূরক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। এভাবে, যেহেতু অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরণের বর্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ ৮ম পরিকল্পনার সাফল্যের চাবিকাঠি হবে, তাই বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্বের মানব স্বাস্থ্য ও কল্যাণ পুনরুদ্ধার ও শক্তিশালী করা এবং অবকাঠামোগত বাঁধা শিথিল করাই হবে সরকারের ভূমিকা। অতীতের মতো এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামাজিক উদ্দেশ্য সমূহের সাথে সংগতি রেখে সরকারি খাত কর ব্যবস্থাকে অধিক সমতাভিত্তিক করে এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অংশের জীবনযাত্রার গুণগত মানের উন্নতিবিধানে সামাজিক নিরাপত্তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যয় কর্মসূচি গ্রহণসহ রাজস্ব ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধিকে অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবে। সরকার ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিং ফ্রেমওয়ার্ক ফর এক্সিলারেটিং এচিভমেন্ট অব এসডিজি ইন বাংলাদেশ (Integrated National Financing Framework For Accelerating Achievement of SDGs in Bangladesh) শীর্ষক একটি যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন আরম্ভ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচি সরকারকে একটি সমন্বিত অর্থায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে। এই কর্মসূচি বিদ্যমান ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স এ্যাসেসমেন্ট (DFA) এবং এসডিজি অর্থায়ন কৌশল পর্যালোচনাপূর্বক এগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও কোভিড-১৯ মহামারী পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের ওপর দৃষ্টিপাত করতে সহায়তা করবে।

চিত্র ৫.১: বিনিয়োগের বহিঃপ্রবাহ (জিডিপির % হিসেবে)

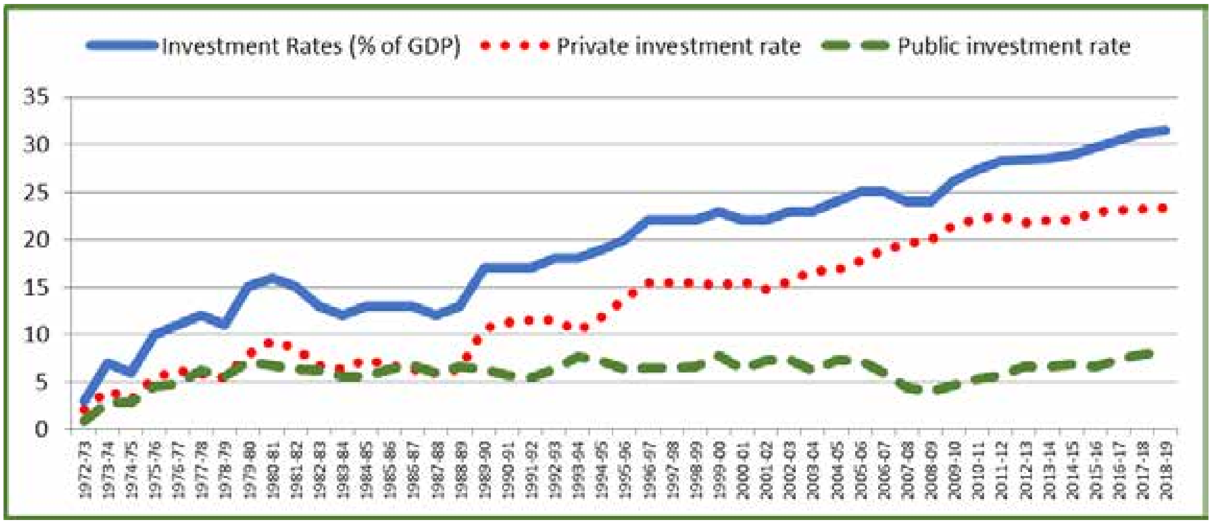

উৎস: বিবিএস এবং অর্থ মন্ত্রণালয়

বাৎসরিক উন্নয়ন ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নতি সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণ, অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা নিরসন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবার সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার পুনর্গঠনে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সর্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ এবং আইসিটি সেবার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) বাস্তবায়ন

ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে করে আধুনিক জীবনচক্র ভিত্তিক পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের সর্বাত্মক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করা যায়। অবকাঠামোর ক্ষেত্রে চলমান রূপান্তরমূলক অবকাঠামো প্রকল্প ছাড়াও প্রধান প্রধান মহাসড়ক ও সেতু এবং চলমান বিদ্যুৎখাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বড় রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ) প্রবর্তনের মাধ্যমে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগকারীদের সেবাদানের জন্য তৈরিকৃত ভূমিতে অভিগম্যতা প্রদান করা হবে। পরিশেষে, বিডিপি ২১০০ এর প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে ।

এই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে। বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)-এদুটোকে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে যাতে এগুলোকে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জাতীয় এই পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য প্রয়োজন হবে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সঞ্চয় বৃদ্ধি, বেসরকারিখাতের আয় প্রবৃদ্ধি এবং করনীতি ও কর প্রশাসনের সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি। সরকারি সম্পদের কার্যকারিতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য সরকারি উদ্যোগসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন এবং ভর্তুকি ও হস্তান্তর কর্মসূচিসহ উন্নত সরকারি সেবা বিতরণ ও প্রণোদনার জন্য সরকারি খাতের সম্পদ বিচক্ষণতার সাথে ব্যয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

৫.২ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য মোট সম্পদের পরিমাণ

৫.২.১ মোট বিনিয়োগ ও অর্থায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ২০২১ অর্থবছর মূল্যে (পরিকল্পনার প্রথম বছর) ৬৩.৬ ট্রিলিয়ন টাকা। অতীতের মতো, জাতীয় সঞ্চয়ের আকারে স্থানীয় সম্পদ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (৯৪.৯%) অর্থায়নে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট আর্থিক প্রয়োজনীয়তার বাকী ৫.১% যোগান দেওয়া হবে বৈদেশিক সঞ্চয় থেকে। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সরকারি কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বৈদেশিক সম্পদের ওপর নির্ভরতা সাধারণ পর্যায়ে রাখা হয়েছে। বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণের এই সচেতনমূলক কৌশল বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল ইতিবাচক দিক হয়ে রয়েছে যা বহিঃস্থ হিসেবের স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

সারণি ৫.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিনিয়োগ অর্থায়ন (অর্থবছর ২০২১)

আইটেম: বিলিয়ন টাকায়	মোট	অংশ (%)
মোট বিনিয়োগ	৬৩৫৭৪	১০০.০
--সরকারি	১৬০৫৮	২৫.৩
--বেসরকারি	৪৭৫১৬	৭৪.৭
অর্থয়ানের উৎস		
দেশজ সম্পদ	৬০৩৫৮	৯৪.৯
বৈদেশিক সম্পদ	৩২১৬	৫.১

উৎস:জিইডি প্রক্ষেপণ

৫.২.২ বেসরকারি বিনিয়োগ ও অর্থায়ণ

এফডিআই (FDI) এর প্রসারণমূলক ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি করা হবে। বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়াবে মোট বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে অধ্যায় ৩ এর আলোচনা অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশে এফডিআইয়ের বিদ্যমান অন্তঃপ্রবাহ জিডিপি'র প্রায় ১ শতাংশ থেকে জিডিপির ৩ শতাংশে বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগে এফডিআই এর অংশ এবং বেসরকারি খাতের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রায় সীমিত বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের ৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭% এ এসে দাঁড়াবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটি একটি বড় কৌশলগত রূপান্তর যা বেসরকারি বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে মূল ভূমিকা পালন করবে এবং এভাবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারি বিনিয়োগের নিষ্প্রভ অবস্থার উন্নয়ন সাধন করবে। এফডিআই এর দ্রুত প্রবৃদ্ধি প্রযুক্তির উন্নয়ন, জ্ঞান হস্তান্তর ও দক্ষতার উন্নয়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে বড় ভূমিকা পালন করবে।

৫.২.৩ সরকারি খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন

অর্থবছর ২০১৫ হতে অর্থবছর ২০১৯ মেয়াদে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি), যা বাংলাদেশের সরকারি খাতের বিনিয়োগের প্রধান অংশ, আকার জিডিপি'র অনুপাতে ২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধি গত দশকে পরিলক্ষিত এডিপি'র নিম্নমুখী গতিধারাকে সচল করেছে। আর এটি সম্ভবপর হয়েছে এডিপি বাস্তবায়ন তরান্বিত করে অবকাঠামোগত ঘাটতির ব্যাপকতা নিরসনে সরকারি প্রচেষ্টার ফলে। ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে সরকারি খাত ও পিপিপি-ভিত্তিক বেশ কয়েকটি বড় ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন না হওয়া সত্ত্বেও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অর্জিত সুযোগের ওপর ভিত্তি করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিনির্মিত হবে, যেখানে ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে ১৬.১ ট্রিলিয়ন টাকা সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হবে, যা অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের ২৫.৩ শতাংশের সমান। সরকারি খাতের মোট বিনিয়োগের ১২.৮ ট্রিলিয়ন টাকার অর্থায়ন আসবে দেশজ সম্পদ (৮০%) থেকে। তন্মধ্যে রাজস্ব সঞ্চয় থেকে ৩৬ শতাংশ এবং দেশজ ব্যাংকিং ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ হিসেবে ৪৪ শতাংশ অর্থায়ন করা হবে। সরকারি খাতের উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে প্রাথমিকভাবে বিশেষ সুবিধাযুক্ত ঋণ আকারে প্রাপ্ত বৈদেশিক অর্থায়নের পরিপূরক ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। নীট ভিত্তিতে উক্ত বিনিয়োগ সরকারি বিনিয়োগ অর্থায়নের ২০ শতাংশ প্রদান করবে। বড় বড় অবকাঠামো প্রকল্পের অর্থায়নে সভরিন বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের অভিগম্যতা লাভ করা দেশজ সরকারি বিনিয়োগের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের উৎস হিসেবে বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। এটি লক্ষ্যণীয় যে, প্রক্ষেপিত রাজস্ব ঘাটতির ওপর ভিত্তি করে সরকারি খাতের বিনিয়োগ অর্থায়ন পরিকল্পনাটি ঋণ টেকসহিতার সাথে সম্পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। রাজস্ব ঘাটতিতে অর্থায়ন করার লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের বিষয়টিও ৩য় অধ্যায়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক প্রক্ষেপণে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর তাই এটি মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং বেসরকারি খাতে ঋণ বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ।

৫.৩ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব নীতি কাঠামো

৮ম পরিকল্পনার রাজস্ব নীতি কাঠামো ৫.২ নং সারণিতে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি মূলত পিপি ২০৪১ এর রাজস্ব নীতিকাঠামো থেকে গৃহীত হয়েছে কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাব প্রতিফলিত করতে এটিকে সমন্বয় করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব নীতি কাঠামোর তিনটি প্রধান আলোচ্য বিষয় রয়েছে: প্রথমত, রাজস্বের নিম্নমুখী গতিরোধ করে কর-জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত রাজস্ব নীতি সংস্কার প্রচেষ্টা গৃহীত হবে। দ্বিতীয়ত, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উন্নয়ন অগ্রাধিকারগুলো মোকাবেলা করতে উচ্চ রাজস্ব সরকারি ব্যয় কর্মসূচি পুনরুদ্ধারের ভিত হিসেবে কাজ করবে। তৃতীয়ত, কোভিড-১৯ এর কারণে রাজস্ব ঘাটতি শুরুর দিকে বৃদ্ধি পেয়ে এর মধ্য-থেকে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা (৫ শতাংশ) থেকে দূরে সরে আসলেও কর রাজস্ব আদায়ের গতিশীলতা এবং বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব ঘাটতিজনিত সমস্যা দ্রুত দূরীভূত হয়ে জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে ফিরে আসবে।

সারণি ৫.২: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামো (জিডিপির শতকরা)

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
রাজস্ব নির্দেশক:	(জিডিপির % হিসেবে)						
রাজস্ব ও অনুদান	**৯.৯৭**	**৯.৪৮**	**১০.২৬**	**১১.১৬**	**১২.০৫**	**১২.৯০**	**১৪.১০**
মোট রাজস্ব	**৯.৯০**	**৯.৪০**	**১০.১৮**	**১১.১০**	**১২.০০**	**১২.৮৬**	**১৪.০৬**
কর রাজস্ব	৮.৮৯	৭.৮৯	৯.০২	৯.৮০	১০.৬০	১১.২৬	১২.২৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬০	৭.৬৮	৮.৫৫	৯.৪০	১০.১০	১০.৬৬	১১.৫৬
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.২৯	০.২১	০.৪৭	০.৪০	০.৫০	০.৬০	০.৭০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.০২	১.৫১	১.১৬	১.৩০	১.৪০	১.৬০	১.৮০
অনুদান	**০.০৭**	**০.০৭**	**০.০৮**	**০.০৬**	**০.০৫**	**০.০৪**	**০.০৪**
	(জিডিপির % হিসেবে)						
মোট ব্যয়	**১৫.৪১**	**১৪.৮৬**	**১৭.০৬**	**১৬.৯১**	**১৭.৫৭**	**১৭.৯০**	**১৯.১০**
নীট দেনাসহ অনুন্নয়ন ব্যয়	**৯.৪৭**	**৯.১১**	**১১.১৩**	**১০.৯০**	**১১.০৮**	**১১.২৫**	**১২.০৭**
অনুন্নয়ন ব্যয়	**৯.৩৭**	**৮.৯৯**	**১০.৯৯**	**১০.৭৫**	**১০.৯৩**	**১১.১০**	**১১.৯২**

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ				
রাজস্ব ব্যয়	৮.৫৭	৮.৩৩	৯.৮৬	৯.৯৩	১০.১১	১০.২৬	১১.০৮
মূলধন ব্যয়	০.৮০	০.৬৬	১.১৩	০.৮২	০.৮৩	০.৮৪	০.৮৫
নীট দেনা	**০.১০**	**০.১৩**	**০.১৩**	**০.১৫**	**০.১৫**	**০.১৫**	**০.১৫**
উন্নয়ন ব্যয়	**৫.৯৪**	**৫.৭৫**	**৫.৯৩**	**৬.০২**	**৬.৪৯**	**৬.৬৬**	**৭.০৩**
এডিপি ব্যয়	৫.৭৯	৫.৫২	৫.৭০	৫.৮৯	৬.৩৬	৬.৫৩	৬.৯০
এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়	০.১৫	০.২৩	০.২৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩	০.১৩
সামগ্রিক উদ্বৃত্ত (অনুদান)	**-৫.৫১**	**-৫.৪৬**	**-৬.৮৮**	**-৫.৮১**	**-৫.৫৭**	**-৫.০৪**	**-৫.০৪**
সামগ্রিক উদ্বৃত্ত (অনুদানসহ)	**-৫.৪৪**	**-৫.৩৯**	**-৬.৮০**	**-৫.৭৫**	**-৫.৫২**	**-৫.০০**	**-৫.০০**
প্রাথমিক উদ্বৃত্ত	**-৩.৫০**	**-৩.৩৩**	**-৪.৭৮**	**-৩.৬৫**	**-৩.৩৬**	**-২.৭৭**	**-২.৭৬**
	(জিডিপির % হিসেবে)						
অর্থায়ন	**৫.৪৪**	**৫.৩৯**	**৬.৮০**	**৫.৭৫**	**৫.৫২**	**৫.০০**	**৫.০০**
বৈদেশিক (নীট), (বাজার ঋণসহ)	**১.২৩**	**১.৮৮**	**২.৪০**	**২.৪২**	**২.৪৪**	**২.৪৬**	**২.৪৮**
ঋণ	১.৭৬	২.৩০	২.৮	২.৩৫	২.৩৩	২.৩২	২.৩০
এ্যামোরটাইজেশন (Amortization)	-০.৫৩	-০.৩৯	-০.৪০	-০.৩৯	-০.৪১	-০.৪৫	-০.৪৫
স্থানীয়	**৪.২১**	**৩.৫০**	**৪.৪০**	**৩.৩৩**	**৩.০৮**	**২.৫৪**	**২.৫২**
ব্যাংক (সিআরপিবিএস'র অর্থ)	১.২০	৩.৩২	৩.৩০	১.৯৪	১.১৯	০.৬৫	০.৬৩
ব্যাংক বহির্ভূত	৩.০১	০.১৮	১.১০	১.৩৯	১.৮৯	১.৮৯	১.৮৯
মেমোরেন্ডাম আইটেম:							
নামীয় জিডিপি,বিলিয়ন টাকায়	**২৫৪২৫**	**২৭৯৬৪**	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**

উৎস: বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

৫.৩.১ উচ্চ সরকারি ব্যয়ের চাহিদা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের সরকারি প্রশাসনের আকার ক্ষুদ্র এবং বাংলাদেশের মত একটি দেশের ক্ষেত্রে, যেখানে অপরিসীম উন্নয়ন চাহিদা রয়েছে, এই আকারের সরকারি ব্যয় স্বাভাবিক। জিডিপির অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয়ের আকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সরকার সরকারি বিনিয়োগ এবং অবকাঠামো বিনিয়োগে অর্থায়ন বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে। তবুও রাজস্ব ঘাটতি ও বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতা মানব উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তায় (সারণি ৫.৩) পর্যাপ্ত সম্পদ ব্যয়ের সক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সামাজিক ঝুঁকি অনেক বেড়েছে এবং মানব উন্নয়নে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিম্নমুখিতা এবং রাজস্বখাতে দূরদর্শিতা বজায়ের প্রয়োজনীয়তার নিরীখে, সম্পদ সংগ্রহ বৃদ্ধি করার একমাত্র উপায় হলো মূল উন্নয়ন অগ্রাধিকারের ওপর ব্যয় বৃদ্ধি করা।

সারণি ৫.৩: সরকারি ব্যয় অগ্রাধিকার (জিডিপির %)

ব্যয় আইটেম	অর্থবছর ২০১০	অর্থবছর ২০১৫	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২৫
মোট ব্যয়	১৩.৯	১৩.৫	১৫.৪	১৯.১
উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়	১০.৩	৯.১	৯.৫	১২.১
উন্নয়ন ব্যয়	৩.৬	৪.০	৬.০	৭.০
শিক্ষা	১.৬	১.৭	২.০	৩.০
স্বাস্থ্য	০.৬	০.৬	০.৭	২.০
সামাজিক নিরাপত্তা (সিভিল সার্ভিস পেনশন ব্যতীত)	১.৪	১.৪	১.২	২.০
বিদ্যুৎ,জ্বালানি ও পরিবহন	১.৫	১.৮	২.৪	২.০
কৃষি ও পল্লী অবকাঠামো	০.৬	০.৮	০.৯	১.০
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	০.৫	০.৭	১.০	২.০

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় ও জিইডি প্রক্ষেপণ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব নীতিকাঠামো কর-জিডিপি'র অনুপাত অর্থবছর ২০১৯ এর ৮.৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে অর্থবছর ২০২৫ এ ১২.৩ শতাংশে প্রক্ষেপণ করেছে। কর বহির্ভুত রাজস্বেও কিছুটা বৃদ্ধি প্রক্ষেপিত হয়েছে যা মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি অর্থবছর ২০১৯ এর ৯.৯ শতাংশ থেকে অর্থবছর ২০২৫ এ ১৪.১ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করবে। জিডিপির অংশ হিসেবে মোট রাজস্বে এই ৪.২ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি সরকারি খাতের ব্যয় একটি নূন্যতম পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য সংক্রান্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে। একই সাথে এটি কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সহায়ক হবে।

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি ব্যয়ের অগ্রাধিকারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করে ঢেলে সাজানো। তদানুসারে স্বাস্থ্য সেবাখাতে সরকারি ব্যয় অর্থবছর ২০১৯ এর জিডিপির ০.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ এর মধ্যে জিডিপির ২ শতাংশ উন্নীত হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা: সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে দরিদ্র-প্রায় জনগণকে, যারা কোভিড-১৯ এ আয়ক্ষতির কারণে দরিদ্র গোষ্ঠীতে পর্যবসিত হয়েছে, আয় সহায়তা প্রদান করা যায়। আরো সহজভাবে বলতে গেলে সামাজিক নিরাপত্তা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (২০১৫-২০২৫) কর্তৃক সুপারিশকৃত ঝুঁকি নিরসনের জীবন চক্র পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়িত হবে। কর্মসংস্থানভিত্তিক সামাজিক বিমা ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার অগ্রগতিতেও এটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। সিভিল সার্ভিস পেনশনকে, যা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণদের জন্য নয়, বাদ দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় ২০১৯ অর্থবছরে জিডিপির ১.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপির ২.০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

ঝুঁকি নিরসন: আমাদের অর্থনীতিতে বিমার প্রসার বৃদ্ধির জন্য বিমা খাত বহুমূখীকরণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। জীবন ও জীবন বহির্ভুত উপ-খাতগুলোতে বিমা পণ্য যেমন ভবন বিমা, বঙ্গবন্ধু স্কুল বিমা, যাত্রী বিমা, মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ বিমা, কৃষি শিল্প বিমা চালু করা হবে। এসব বিমা পণ্যগুলো ব্যাংক নিশ্চয়তা, কর্পোরেট এজেন্ট, ব্রোকারদের মতো বহুমূখী বণ্টন চ্যানেলের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ: মানব পুঁজি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন আইসিটি শিক্ষার প্রসারসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ২০১৯ অর্থ-বছরের জিডিপির ২.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপির ৩.০ শতাংশে উন্নীত হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন: অবকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ অব্যাহত থাকবে। সকল চলমান রূপান্তর প্রকল্পগুলো সম্পন্ন করার ওপর সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন খাতের অন্যান্য প্রকল্পসমূহও গ্রহণ করা হবে, যা প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য প্রয়োজন। পিপিপি-ভিত্তিক অর্থায়নের ওপর অধিকতর জোর প্রদানপূর্বক সার্বিক অর্থায়নে একটি কৌশলগত পরিবর্তন আসবে। তদানুসারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অবকাঠামোগত খাতে এডিপি বরাদ্দ জিডিপি'র অংশ হিসেবে প্রান্তিকভাবে কমে ২ শতাংশে নেমে আসবে কিন্তু প্রকৃত অর্থে বরাদ্দ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে অবকাঠামো খাতে অর্থায়নের মধ্যে জিডিপি'র অংশ হিসেবে অতিরিক্ত ১-১.৫ শতাংশ পিপিপি অর্থায়নের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। তাই এডিপি ও পিপিপি ব্যয়কে একত্রিত করলে জিডিপি'র অংশ হিসেবে অবকাঠামোখাতে সরকারি বিনিয়োগের অংশ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাবে।

কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামো: কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামোয় প্রদত্ত অগ্রাধিকার রক্ষিত থাকবে এবং ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে তা জিডিপির অনুপাতে ১.০ শতাংশে উন্নীত করে আরো শক্তিশালী করা হবে।

বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়ন: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি প্রধান অগ্রাধিকার হলো বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার (বিডিপি ২১০০) বাস্তবায়ন শুরু করা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিডিপি ২১০০ বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, লবণাক্ততা হ্রাস, জলাবদ্ধতা হ্রাস, নদী ভাঙ্গনের প্রকোপ হ্রাস, সেচ, শিল্প কারখানা ও মানুষের ভোগের জন্য সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, ভূমি ও বন ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং বাস্তুসংস্থান শক্তিশালী করা হবে। বিডিপি ২১০০ বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য প্রাক্কলিত বরাদ্দ অর্থবছর ২০১৯ এ জিডিপির ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫-এর মধ্যে জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত হবে।

৫.৪ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রাজস্ব গতিশীলতা: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য শিক্ষা

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী কর পরিকৃতির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় কিন্তু ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরে উচ্চতর গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজস্ব আয়ের প্রকৃত অবস্থা বেশ নিম্ন ছিল। কর-জিডিপি অনুপাত কোভিড-১৯ এর প্রভাবের কারণে আরো হ্রাস পেলেও কোভিড-১৯ এর পূর্বে অর্থবছর ২০২০ এর প্রথম ৮ মাসে করের পরিকৃতি প্রত্যাশিত গতিপথের বাইরে ছিল। বাৎসরিক কর লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত পরিকৃতি ৫.৪ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২০১৫ এর ৯.৪ শতাংশ থেকে অর্থবছর ২০২০ এ ১২.৩ শতাংশে উন্নীত করা এবং করবহির্ভুত রাজস্ব ১.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২.০ শতাংশে এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এই অনুমানের ভিত্তি ছিল বড় ধরণের কর সংস্কারসহ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকার সংস্থার সংস্কার বাস্তবায়ন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কোন সংস্কারই বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে কর ও কর বহির্ভূত উভয় রাজস্ব পরিকৃতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ছিল। কর বহির্ভূত রাজস্ব প্রান্তিকভাবে জিডিপি'র ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে করের প্রকৃত পরিকৃতি অর্থবছর ২০২০ এ জিডিপি'র ৭.৯ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে।

সারণি ৫.৪: রাজস্ব- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অর্জন

অর্থবছর	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০	গড় (অর্থবছর ২০১৬-২০)
	(৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, বিলিয়ন টাকায়)					
মোট রাজস্ব	২০৮৪	২৬৩৪	৩১৭২	৩৮০৮	৪৬২৭	৩২৬৫
কর রাজস্ব	১৮২২	২২৪৪	২৭২৮	৩৩০৪	৪০৫২	২৮৩০
এনবিআর কর রাজস্ব	১৭৬৪	২১৬৬	২৬৩৯	৩২০৩	৩৯৩৭	২৭৪২
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৬২	৩৯০	৪৪৪	৫০৪	৫৭৫	৪৩৫
	(প্রকৃত , বিলিয়ন টাকায়)					
মোট রাজস্ব	১৭৩০	২০১২	২১৬৬	২৫১৮	২৬৩০	২২১১
কর রাজস্ব	১৫১৯	১৭৮১	১৯৪৩	২২৫৯	২২০৭	১৯৪২
এনবিআর কর রাজস্ব	১৪৬২	১৭১৬	১৮৭১	২১৮৬	২১৪৮	১৮৭৭
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২১১	২৩১	২২২	২৫৯	৪২৩	২৬৯
নির্দেশক:	(৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য,জিডিপির % হিসেবে)					
মোট রাজস্ব	১২.১	১৩.৫	১৪.৩	১৫.১	১৬.১	১৪.২
কর রাজস্ব	১০.৬	১১.৫	১২.৩	১৩.১	১৪.১	১২.৩
এনবিআর কর রাজস্ব	১০.৩	১১.১	১১.৯	১২.৭	১৩.৭	১১.৯
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৫	২.০	২.০	২.০	২.০	১.৯
	(প্রকৃত রাজস্ব,জিডিপির % হিসেবে)					
মোট রাজস্ব	১০.০	১০.২	৯.৬	৯.৯	৯.৪	৯.৮
কর রাজস্ব	৮.৮	৯.০	৮.৬	৮.৯	৭.৯	৮.৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৪	৮.৭	৮.৩	৮.৬	৭.৭	৮.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.২	১.২	১.০	১.০	১.৫	১.২
মেমো আইটেম:						
নামীয় জিডিপি,৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	১৭১৭৬	১৯৫১৭	২২১৭৭	২৫২২৩	২৮৭৩৯	২২৫৬৬
নামীয় জিডিপি	১৭৩২৯	১৯৭৫৮	২২৫০৫	২৫৪২৫	২৭৯৬৪	২২৫৯৬

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণ

কর রাজস্ব পতনের মূল কারণ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত প্রধান প্রধান কর সংস্কারের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে অক্ষমতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পিত কর সংস্কার হলো ২০১২ ভ্যাট আইনের বাস্তবায়ন। এটি একটি মৌলিক সংস্কার যা ভ্যাট ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করে এবং ভ্যাট উৎপাদনশীলতার উন্নতির মাধ্যমে কর সংগ্রহ বৃদ্ধি করে। কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে এনবিআর এর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সহজতর করাসহ কর সংস্কার প্রচেষ্টার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ২০১২ সালের মূল ভ্যাট আইনের প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটেনি। আয়কর আইন, নীতিমালা ও প্রক্রিয়াসমূহের সংস্কারও ঘটেনি। ২০১১ সালের কর আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার নির্দেশনা মোতাবেক এনবিআরের পরিকল্পিত প্রশাসনিক সংস্কার এখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের অপেক্ষায়।

সরকার এসব চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর সংস্কারের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। সরকার পিপি ২০৪১ এর রাজস্ব কাঠামোর অনুমোদনের মাধ্যমে এ সংকেত প্রদান করেছে। পিপি ২০৪১ এর রাজস্ব কাঠামো মোতাবেক অর্থবছর ২০৩১ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৭ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ২২ শতাংশ অর্জনের আশা করছে যা উচ্চ মধ্যম আয় (UMIC) ও উচ্চ আয়ের (HIC) দেশগুলোর গড় কর-জিডিপি অনুপাতের গড় করের সাথে তুলনাযোগ্য (চিত্র ৫.২)। এটি অর্জিত হবে কর আইন ও কর প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর ওপর ভিত্তি করে। এখানে আয় এবং ভ্যাট ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হবে যাতে করে উচ্চ মধ্যম আয় (UMIC) এবং উচ্চ আয়ের (HIC) অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের কর সংগ্রহ ও কর কাঠামো অর্জন করা যায়। এই আধুনিকীকরণের মূল বৈশিষ্ট্য হলো আয় করের সর্বজনীন এবং প্রগতিশীল ব্যবস্থার সূচনা করা যা উচ্চ মধ্যম আয় (UMIC) এবং উচ্চ আয়ভুক্ত (HIC) দেশসমূহের মত প্রাপ্ত কর সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস হয়ে উঠে।

চিত্র ৫.২: পিপি ২০৪১ এর কর কাঠামো

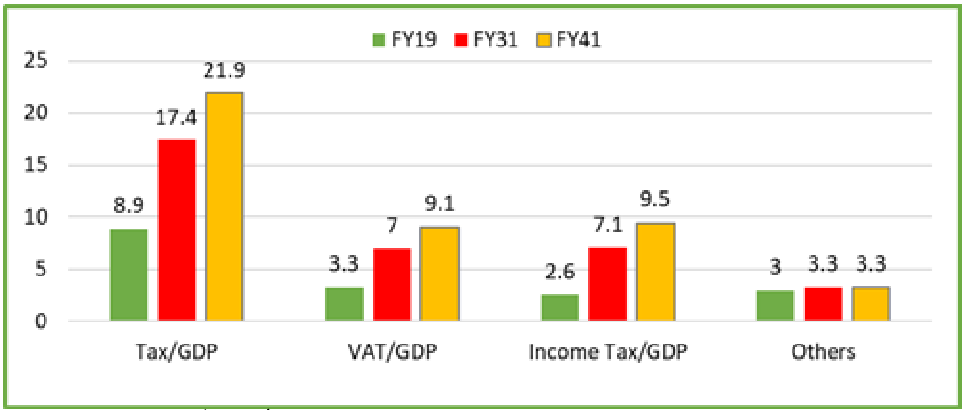

উৎস: পিপি ২০৪১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

উপরের সারণি ৫.৫ এ বর্ণিত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামো চিত্র ৫.২ এ সংক্ষিপ্ত আকারে পিপি ২০৪১ এর রাজস্ব কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট রাজস্ব এবং অন্যান্য কর কাঠামোর উৎসের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৫.৫ এবং ৫.৬ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সারণি ৫.৫: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামো

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ				
নির্দেশক(জিডিপির % হিসেবে):						
মোট রাজস্ব	৯.৪	১০.২	১১.১	১২.০	১২.৯	১৪.১
কর রাজস্ব	৭.৯	৯.০	৯.৮	১০.৬	১১.৩	১২.৩
এনবিআর কর রাজস্ব	৭.৭	৮.৬	৯.৪	১০.১	১০.৭	১১.৬
এনবিআর কর বহির্ভূত রাজস্ব	০.২	০.৫	০.৪	০.৫	০.৬	০.৭
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৫	১.২	১.৩	১.৪	১.৬	১.৮

উৎস: অর্থমন্ত্রণালয়, জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.৬: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান প্রধান রাজস্ব খাতসমূহ

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত	প্রক্ষেপণ				
উপাদানসমূহ:	(জিডিপির % হিসেবে)					
এনবিআর কর রাজস্ব	৭.৭	৮.৬	৯.৪	১০.১	১০.৭	১১.৬
আয় ও লভ্যাংশের ওপর কর	২.৭	২.৫	৩.২	৩.৫	৩.৮	৪.৫
মূল্য সংযোজন কর	২.৯	৩.৬	৩.৮	৪.৩	৪.৬	৪.৯
কাস্টম শুল্ক	০.৮	০.৯	০.৯	০.৯	০.৮	০.৮
সম্পূরক শুল্ক	১.২	১.৪	১.৪	১.৩	১.২	১.২
রপ্তানি শুল্ক	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
আবগারী শুল্ক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
অন্যান্য কর ও শুল্কসমূহ	০.০	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, জিইডি প্রক্ষেপণ

পিপি ২০৪১ এ উল্লিখিত কর ব্যবস্থা বাংলাদেশের বিদ্যমান পুরনো কর ব্যবস্থা থেকে সরে গিয়ে একটি মৌলিক রূপান্তরের ইংগিত বহন করে, যেখানে পূর্বের কর ব্যবস্থা ছিল পরোক্ষ উপকরণগুলোর ওপর নির্ভরশীল এবং আয়ের চেয়ে ভোগের ওপর কর আরোপ করার ক্ষেত্রে বেশী জোর প্রদান করা হতো। কর আইন, কর আদায়, কর নিরীক্ষা এবং কর নজরদারি সব দিক থেকেই এটি সেকেলে ছিল। পিপি ২০৪১ এ এই বিদ্যমান পুরাতন কর ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করে এমন একটি কর ব্যবস্থার প্রবর্তনের কথা করা হয়েছে যেটি কর রাজস্বের প্রাথমিক উৎস হিসেবে আয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করবে। এছাড়া এটি সেলফ্ এ্যাসেসমেন্ট, অন-লাইন ফাইলিং ও কর প্রদান, জটিল কেস ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে সহজতর ফাইলিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচিত ও দক্ষ নিরীক্ষার ওপর নির্ভর করবে। কর নীতি ও কর সংগ্রহ পৃথকভাবে কাজ করবে। কর সংগ্রহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংঘটিত হয়, যেখানে কর গ্রহীতা ও কর দাতার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষা সংযোগ নেই। তাই এইক্ষেত্রে ঘুষ প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে কর নিষ্পত্তির ঝুঁকি দূর হয়। এটি বর্তমান পদ্ধতির চেয়ে ব্যাপকভাবে আলাদা। তাই এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন একটু সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এক্ষেত্রে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা সংঘটিত হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যেসকল সুনির্দিষ্ট কর সংস্কার কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো বক্স-৫.১ এ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২০ বছর মেয়াদি পিপি ২০৪১ এর রাজস্ব নীতি কাঠামো বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এটির বাস্তবায়নের প্রথম মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি। এই প্রথম পর্বে, ভ্যাট, আয়কর এবং কাস্টম দায়িত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত সংস্কার চালু করা হয়েছে। বাণিজ্য সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়াদি অংশ ২ এর অধ্যায় ২ এ আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কর রাজস্বের ওপর এর প্রভাব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রাজস্বের ক্ষেত্রে বাণিজ্য করের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং তৎপরিবর্তে প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি উন্নয়ন এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাণিজ্য নীতিকে কাজে লাগানো। রাজস্ব ফলাফলসমূহ প্রান্তিক এবং এগুলো আয় ও মূল্য সংযোজন করের মাধ্যমে পুষিয়ে দেওয়া হয়। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোর (HIC) কাঠামোতেও এ বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়। বক্স-৫.১ এ প্রস্তাবিত কর সংস্কারসমূহ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং কর রাজস্ব আদায় পুনরুদ্ধার এবং সারণি ৫.৩ এ লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ সংস্কারসমূহ বিলম্বিত করা সমীচীন হবে না।

বক্স ৫.১: ৮ম পরিকল্পনার কর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে এনবিআরের কর সংস্কার

করনীতি সংস্কার

- অর্থবছর ২০২২ এ বর্ণিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও দক্ষ বাস্তবায়ন।
- আয়কর, মূসক ও কাস্টমস আইনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
- অর্থবছর ২০২৩ এ আয়কর ব্যবস্থা সহজীকরণ ও ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।
- অর্থবছর ২০২২ এ নতুন কাস্টম আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- অর্থবছর ২০২২ এর শেষে একটি যথাযোগ্য সম্পত্তি কর ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং এরই একটা অংশ স্থানীয় সরকার গুলোর জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে।
- অর্থবছর ২০২৪ এর শুরুতে, কর সংগ্রহ থেকে কর পরিকল্পনার পৃথকীকরণ।
- অর্থবছর ২০২৪ এর থেকে, এনবিআর চেয়ার এবং কর নীতি ইউনিটের নতুন চেয়ার পেশাগত ভিত্তিতে ৫ বছরের নির্ধারিত মেয়াদে নির্বাচন করা উচিত।
- আধুনিক প্রযুক্তি, পেশাগত কর্মী নিয়োগ এবং নীতি ও গবেষণা সক্ষমতা নিয়ে অফিস আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে এনবিআর চেয়ার এবং নতুন কর নীতি ইউনিটের চেয়ারকে প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদান।

কর প্রশাসন সংস্কার: আয়কর

- **করদাতাদের ভিত্তি বিস্তৃতকরণ:** এজন্য করদাতাদের সকল আকারের ভৌত ও আর্থিক পরিসম্পদের মালিকানার পরিবীক্ষণসহ ঐ সকল পরিসম্পদ হতে সৃষ্ট আয় নিরূপণ প্রয়োজন হবে।
- **কর রাজস্ব ভিত্তি বিস্তৃতকরণ:** প্রথাগতভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কিছু সংখ্যক অ-আর্থিক বড় বড় কর্পোরেশন থেকে কর আদায়ের ওপর আমাদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা রয়েছে। করের আওতা বাড়ানোর জন্য আনুষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য ছোট সংস্থাসহ বিভিন্ন কর্পোরেশন থেকে কর আদায়ের c চেষ্টা করতে হবে।
- সেবা প্রদানকারী ও স্বনিয়োজিতদের আয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান (যাদের কাছ থেকে কর আদায় কঠিন হয়ে পড়ে)।
- **খানাগুলোর মধ্যে কোন বৈষম্য ছাড়াই কর আদায়ের উদ্দেশ্যে আয়ের সকল উৎসকে সমভাবে বিচার করা:** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে জমি, রিয়েল এস্টেট/গৃহায়ন ও পুঁজিবাজার (স্টক মার্কেট) থেকে মূলধনী লাভের ওপর আরোপিত কর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্পদ সমাবেশ প্রাথমিকভাবে সংঘটিত হচ্ছে শহরের জমি ও রিয়েল এস্টেট, দ্রুত বর্ধনশীল তৈরি পোশাক খাতের করমুক্ত বা স্বল্প করযুক্ত আয় এবং বিভিন্ন আর্থিক উপায়ের মাধ্যমে আয়ের ওপর তুলনামূলকভাবে স্বল্প করারোপের ফলে সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে। এটি অবশ্যই বদলাতে হবে।
- **টিআইএন নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়করণ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে টিআইএন সংযুক্তকরণ।**
- **সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি: ব্যবসায় প্রক্রিয়া-** এটি একটি সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি যা লেনদেন পর্যায়ে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর অর্থাৎ টিআইএন (TIN) এবং বিআইএন (BIN)-কে ডেটাবেজে যুক্ত করার মাধ্যমে তিনটি বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। এ ধরণের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদ্ধতি হলো, প্রথমে একই লোকেশনে তিনটি বিভাগের লেনদেন প্রক্রিয়াসহ ডেটাবেজ কেন্দ্রীকরণ করা এবং এরপর একটি তথ্যব্যবস্থা বিনির্মাণ যা তিনটি ডেটাবেজের ডেটা সংগ্রহ করতে পারে এবং পরবর্তীতে তা 'ব্যতিক্রমী রিপোর্ট' এর জন্য প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি তথ্য প্রবাহে কাম্য গতি এনে দেবে, ফলে এনবিআর-এর তিনটি কর অনুবিভাগের মধ্যে কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যাবে।
- **সমন্বিত রাজস্ব .ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি:** ডিজিটাল কর্মসূচি: এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপি একটি সমন্বিত আইসিটি মঞ্চ গড়ে তোলা হবে, যেখানে কর রিটার্ন, ব্যাংক, টিডিএস সনাক্তকারী, আদায় সংস্থা সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষ প্রভৃতি থেকে কর পরিশোধের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ হবে। এছাড়া সমন্বিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে তৃতীয় পক্ষের রিটার্নও, যেমন টিডিএস রিটার্ন, বার্ষিক তথ্য রিটার্ন (AIR) প্রভৃতি গৃহীত হবে, এবং এতে এমআইএস রিপোর্ট, ব্যতিক্রমী রিপোর্ট প্রভৃতি তৈরি হবে। এই কর্মসূচির অধীনে একটি কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র থাকবে, যেখানে সকল আয়কর ও মূসক রিটার্ন, সেটি ই-ফাইল বা পেপার-ফাইলেই হোক না কেন, প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি সমন্বিত প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে আনা হবে।
- **আয়কর রিটার্নের ই-ফাইলিং এবং অনলাইন পরিশোধ-** এটাকে সক্ষম করে তুলতে করের ফরমটি সহজ করতে হবে এবং সম্পত্তির বিবতি কিছু আয় সীমার ক্ষেত্রে মুছে ফেলতে হবে। অনলাইনে টাকা পাঠাতে নির্বাচিত কিছু ব্যাংকে এনবিআর কর হিসাব খুলতে হবে।
- **করের আওতা বৃদ্ধি ও কর আরোপে কঠোর নীতি-** বিশেষ করে ব্যক্তি পর্যায়ের করের ক্ষেত্রে, যা করের প্রতিপালনে সম্ভাব্য উন্নয়ন সাধন করে। এছাড়া আয়করের ভিত্তি বিস্তৃত করাসহ বর্ধিত স্বচ্ছতা ও দক্ষতার মাধ্যমে কর আদায় প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সমস্যা সমাধান করা হবে।

- **কৌশলগত যোগযোগ এবং করদাতাদের সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সহায়তা দান-** বাংলাদেশের কর ভিত্তি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশকেই করের বোঝা বহন করতে হয়। প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের অধিকাংশই আসে উৎসে কর কর্তন (টিডিএস) থেকে; অথচ কর্পোরেট কর এবং অগ্রিম করের মাধ্যমে ব্যবসায় ও পেশা (PAYE) থেকে এর বড় অংশ আসা উচিত। বিভিন্ন উপযুক্ত ক্যাটেগরি থেকে একেবারেই প্রতিবেদন না দেয়া, বা প্রতিবেদনে কম করে দেখানো এর অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে করদাতাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট প্রভৃতির মতো দূরশিক্ষণ ছাড়াও এনবিআর গ্রাহক সেবা উইং-এর সাথে গ্রুপভিত্তিক বা ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হবে।

কর প্রশাসন সংস্কার: মূসক ও কাস্টম

- নতুন মূসক আইন বাস্তবায়ন।
- মূসক এর ভিত্তি বিস্তৃত করা, বিশেষ করে ব্যবসা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।
- মূসকের আওতায় আনার জন্য ছোট ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানপূর্বক মূসক পরিশোধে প্রণোদনা দান এবং ঐ একই পদ্ধতিতে বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক খাতে পরিচালিত ব্যবসার আনুষ্ঠানিকায়ন বৃদ্ধি করা।
- ব্যবহারিক দিক থেকে মূসক প্রশাসনের সংস্কার।
- কেন্দ্রীয় মূসক নিবন্ধন, ই-জমা ও রিটার্ন প্রসেসিংসহ কেন্দ্রীয় ডেটাবেজের মাধ্যমে সমগ্র কর ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ।
- নতুন মূসক আইন ও বিধি বিষয়ে করদাতাদের সমন্বিত শিক্ষা ও তথ্য অভিযান পরিচালনা।
- আয় করের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ও উৎপাদনমুখী নিরীক্ষা সম্পন্ন করা।

বক্স ৫.১ এ অবিলম্বে গ্রহণযোগ্য তাৎক্ষণিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে, যার কিছু ২০১১ সালের কর আধুনিকীকরণ পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ থাকলেও ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়নি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের জন্যই কর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ, এর কম্পিউটারাইজেশন এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর প্রধান কারণ হলো, প্রবৃদ্ধির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ আসবে দেশজ উৎস থেকে, প্রধানত আয়কর ও মূসক থেকে। রাজস্ব প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সমমান অর্জন করতে আয়কর ভিত্তির প্রসারণ এবং একটি স্থায়ী ধারণ ব্যবস্থাসহ কর-বেষ্টণীর অধীনে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ও কোম্পানিকে নিয়ে আসা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বড় অংশ যেহেতু এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতায় চালিত, তাই এটি আয়কর দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির মন্থর গতিসহ সম্ভাব্য মূসক আদায় সীমিত হয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই তৎপরতাগুলোকে আনুষ্ঠানিক করতে সরকারের উদ্যোগ ও প্রণোদনা দেশজ উৎসের কর সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে এবং সেই সাথে তা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অর্জনকেও সম্ভব করে তুলবে।

এছাড়াও রয়েছে ব্যাপকভাবে কর এড়িয়ে যাবার প্রবণতা, যা হস্তান্তর-মূল্য নিরূপণ, অর্থপাচারসহ নিবন্ধনকৃত প্রত্যক্ষ করদাতাদের সংখ্যা-স্বল্পতার দ্বারা প্রকাশ পায়। সিআইসি (Central Intelligence Cell) সহ এনবিআর-এর অন্যান্য গোয়েন্দা ইউনিটের মতো কর ফাঁকি শনাক্তকরণ ইউনিট শক্তিশালী করে- এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। কর ফাঁকি প্রতিরোধকল্পে এনবিআর-এর উচিত বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে একত্রে কাজ করা। এছাড়া বিভিন্ন আদালতে বিপুল সংখ্যক রাজস্ব মামলা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বিভিন্ন আদালতে ২০,০০০-এরও বেশি এ ধরণের মামলা বিচারাধীন, যার মূল্য প্রায় ২০ বিলিয়ন টাকা। দক্ষিণ আফ্রিকার মডেল অনুসরণ করে, এনবিআর এ ধরণের বিরোধ আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির জন্য 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)' ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এভাবে বকেয়া রাজস্ব আদায়ে এডিআর ব্যবস্থাকে আরো জনপ্রিয় এবং আরো শক্তিশালী করা হবে।

ইপিজেড (EPZ) গুলোতে অধিক ম্যানুফ্যাচারিং সুবিধা বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিশেষ করে বর্ধিত সংখ্যায় এসইজেড (SEZ) গুলোতে উৎপাদন তৎপরতা শুরু হবার সাথে, কর কর্মকর্তাসহ সার্বিক প্রশাসনের আচরণের বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য এনবিআর-এর অধীনে বন্ড প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রয়োজন হবে। বন্ড প্রশাসনকে কাস্টমস প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় কিনা সে ব্যাপারেও সরকার বিবেচনা করতে পারে এবং এর দক্ষতাকে বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের সাথে বিন্যাস করার প্রচেষ্টা নিতে পারে।

রাজস্ব আদায় বাড়াতে পরিসংখ্যানতাত্ত্বিক ও গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ও নীতি প্রণয়ন এবং কর প্রশাসনের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। পরিসংখ্যান ও গবেষণা বিভাগকে শক্তিশালী করতে করণীয় তালিকা তৈরির কাজ এনবিআর ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করেছে এবং এই কর্মতালিকা সম্বলিত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও সামাজিক স্বীকৃতিদান কর্মসূচির

মাধ্যমে কর প্রদানে আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। গবেষকদের পরামর্শ এই যে, সকল প্রতিষ্ঠানের কর পরিশোধের ধরণ সংক্রান্ত তথ্য সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রকাশ করা হলে তা কর প্রদানে আগ্রহ সঞ্চারসহ কর পরিশোধ বাড়াতে পারে। এছাড়াও তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা কর পরিশোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অধিক হারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

৫.৪.১ আর্থিক ঘাটতি ও অর্থায়ন

সরকারের আর্থিক ঘাটতি প্রথম দিকে কর রাজস্বের ওপর কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বৃদ্ধি পেলেও এটি পিপি ২০৪১ রাজস্ব কাঠামোয় লিপিবদ্ধ রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা অনুযায়ী জিডিপির ৫ শতাংশের কাছাকাছি স্থিতু হবে। প্রক্ষেপিত ৮ শতাংশ এর উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার এবং শুরুর দিকের নিম্ন ঋণ জিডিপি অনুপাতের কারণে ঋণের টেকসহিতা বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তবে, সরকারের দিক থেকে দেশজ ও বৈদেশিক অর্থায়নের যথাযথ মিশ্রণ ঘটিয়ে তার অর্থায়নের উৎসগুলোকে বহুমূখী এবং উভয় ক্ষেত্রেই অর্থায়নের বাজারভিত্তিক অতিরিক্ত উৎস শনাক্ত করা প্রয়োজন হবে। দেশজ ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে, জাতীয় সঞ্চয় স্কিম ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারি বিলের স্থলে উপযুক্ত মাধ্যমিক বাজার ও একটি সুগঠিত প্রাপ্তি রেখা সম্বলিত দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি বিল ও বন্ড, অবকাঠামো বন্ড প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ানো দরকার।

বৈদেশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎস থেকে গতানুগতিক সুবিধাজনক ছাড়সহ ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বাড়ানো দরকার এবং একই সঙ্গে অর্থায়নের অপরাপর উৎসের পাশাপাশি বিভিন্ন মেয়াদের সভরিন বন্ড আকারে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত। এমন কি ছাড় সুবিধাযুক্ত অর্থায়নের সুযোগ প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেলেও, সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) হয়ে ওঠার সাথে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যাবে। বিশ্বব্যাংক ও এডিবির মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে গতানুগতিক সুবিধাপ্রাপ্তির পাশাপাশি, বাংলাদেশের অবকাঠামোগত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ছাড় সুবিধাযুক্ত বৈদেশিক অর্থায়নে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশীয় অবকাঠামো ব্যাংক থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সরকারের উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব প্রথম সভরিন বন্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ, কেননা বৈদেশিক ও দেশজ অবস্থা এখন এ ধরণের বন্ড ছাড়ার জন্য অনুকূল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ঋণ ব্যবস্থাপনা উইং কর্তৃক প্রণয়নযোগ্য একটি সমন্বিত সরকারি অর্থায়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলের ভিত্তিতে এই কৌশলগত রূপান্তর সম্পন্ন করতে হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এই বাজেট অর্থায়ন চিত্রটি ৫.৭ সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাজেট ঘাটতি এবং এর অর্থায়ন

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২০	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	প্রকৃত	প্রক্ষেপিত				
উপাদানসমূহ:	(জিডিপির % হিসেবে)					
আর্থিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	৫.৩৯	৬.৮০	৫.৭৫	৫.৫২	৫.০০	৫.০০
ঘাটতি অর্থায়ন	৫.৩৯	৬.৮০	৫.৭৫	৫.৫২	৫.০০	৫.০০
নীট বহিঃস্থ/বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৮৮	২.৪০	২.৪২	২.৪৪	২.৪৬	২.৪৮
নীট দেশজ অর্থায়ন	৩.৫০	৪.৪০	৩.৩৩	৩.০৮	২.৫৪	২.৫২
ব্যাংক ঋণ	৩.৩২	৩.৩০	১.৯৪	১.১৯	০.৬৫	০.৬৩
বহির্ভূত ব্যাংক ঋণ	০.১৮	১.১০	১.৩৯	১.৮৯	১.৮৯	১.৮৯

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় ও জিইডির প্রক্ষেপণ

৫.৫ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল

৫.৫.১ সার্বিক ঋণ ব্যবস্থাপনা

সরকারি ঋণ ও ঋণ সেবা পরিশোধ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের রেকর্ড অত্যন্ত সবল। জিডিপির প্রায় ৩৬ শতাংশ সরকারি ঋণ গ্রহণের মাত্রা আন্তর্জাতিক মানদন্ডের দিক থেকে তেমন বেশি নয়। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঋণ/জিডিপি অনুপাত মূলত স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু জিডিপি অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ পড়ে যাওয়া এবং দেশীয় ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এর মিশ্রণে পরিবর্তন ঘটেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঋণ কৌশলটি আর্থিক দূরদর্শিতা বজায় রেখে প্রণীত হয়েছে, যেখানে কর রাজস্ব পতনের মুখে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ যোগান দেওয়ার কারণে রাজস্ব ঘাটতি প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে তা

জিডিপির ৫ শতাংশে এসে স্থিতিশীল হয়েছে। সরকারি ঋণ গ্রহণ সক্রিয়ভাবে নিম্ন ব্যয়সম্পন্ন বিকল্প ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করবে এবং উচ্চ অগ্রাধিকারের বিনিয়োগে ঋণকৃত সম্পদসমূহ ব্যবহার করবে। কর রাজস্ব ও রপ্তানি বৃদ্ধি করতে একই সময়ে ঋণ সেবা পরিশোধ সক্ষমতা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির ওপর আলোকপাত করা হবে। তাই ঋণ কৌশলে সরকারি ঋণের সুদের হার খুব নিম্ন রাখা; উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জন এবং কর রাজস্ব ও রপ্তানি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ধারণ করা হবে যাতে এটি নিশ্চিত করবে যে সামগ্রিক ঋণ পরিস্থিতি খুবই সহনীয় এবং ঋণ টেকসহিতা সংক্রান্ত কোন সমস্যা নেই।

সারণি ৫.৩ এর রাজস্ব কাঠামোর আওতায় ঋণ-জিডিপি অনুপাত অর্থবছর ২০২০ এর পর্যায় থেকে ৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ২০২৫ এর মধ্যে জিডিপির ৪০ শতাংশে এ উন্নীত হবে। এই বৃদ্ধির অনেকটাই ঘটবে বৈদেশিক ঋণ অনুপাতে। কারণ বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন উচ্চ ব্যয়ের দেশজ সঞ্চয়পত্র এবং ব্যাংক ঋণ থেকে নিম্ন খরচের এমএলটি ঋণের দিকে ধাবিত হবে। এই বৃদ্ধির কিছুটা পরিবহন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোখাতে এবং বিডিপি ২১০০ এর বিনিয়োগের পাশাপাশি অর্থবছর ২০২১ এবং অর্থবছর ২০২২ এ স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় কোভিড-১৯ জনিত ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থায়নের গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। এগুলো সবই উচ্চ উৎপাদনশীলতার বিনিয়োগ যা প্রবৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নে সহায়তা করে। দেশজ ঋণ/জিডিপি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে এবং ঋণ টেকসহিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চিত্র ৫.৩: মোট ঋণ ও এর আন্তঃসম্পদের (জিডিপির % হিসেবে)

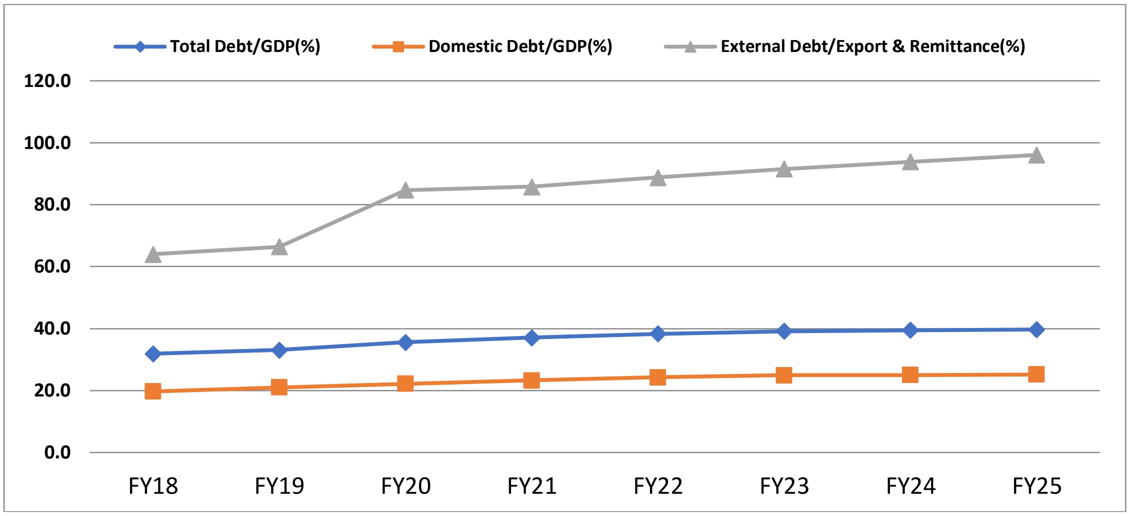

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণসমূহ

চিত্র ৫.৪: ঋণ পরিশোধ সেবার নির্দেশকসমূহ, অর্থবছর ২০১৮- অর্থবছর ২০২৫

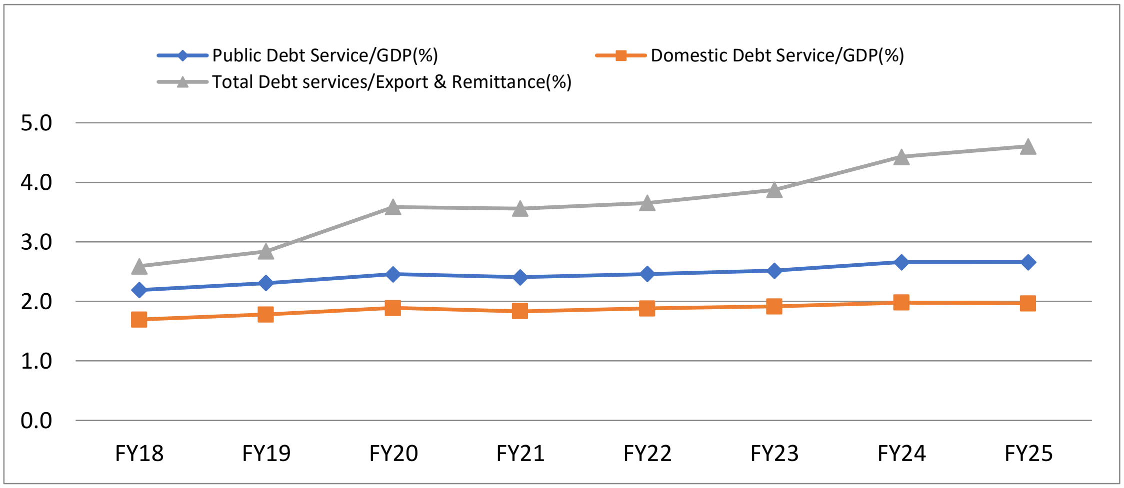

উৎস:অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জিইডি প্রক্ষেপণসমূহ

বৈদেশিক ও দেশজ ঋণের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপিত বৃদ্ধি খুব অল্প এবং সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের অবস্থাও নিয়ন্ত্রণযোগ্য পর্যায়ে রয়েছে যা ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্ধিত সক্ষমতাকে নির্দেশ করে (চিত্র ৫.৪)। জিডিপির শতকরা হিসেবে মোট ঋণ পরিশোধের হার সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তা জিডিপির ২.৭ শতাংশে স্থিতিশীল রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জিডিপি'র অনুপাতে ঋণ পরিশোধের হার অর্থবছর ২০২০ এর ২৬ শতাংশ থেকে অর্থবছর ২০২৫ এ ১৯ শতাংশে নেমে আসবে। এই অভাবনীয় অগ্রগতির উৎস হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রাজস্ব কাঠামোর বাস্তবায়ন। এ রাজস্ব কাঠামোতে কর-জিডিপি'র অনুপাত ২০১৯ অর্থবছর থেকে ৩.৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধিসহ উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন দেশজ সঞ্চয়পত্রের পরিবর্তে নিম্নব্যয় সম্পন্ন দেশজ ঋণ এবং বৈদেশিক এমএলটি ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ জনিত রপ্তানি আয় হ্রাস, রেমিটেন্স স্থবিরতা এবং বৈদেশিক এমএলটি ঋণের বৃদ্ধির কারণে রপ্তানি ও রেমিটেন্সের শতকরা হিসেবে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ সেবার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বৃদ্ধির হার অর্থবছর ২০২০ এর ৩.৫ শতাংশ থেকে অর্থবছর ২০২৫ এ ৪.২৫ শতাংশে এ দাঁড়াবে, যা খুবই সাধারণ পর্যায়ের হবে। সামগ্রিকভাবে, সকল ঋণ নির্দেশক সহনীয় এবং ঋণ টেকসহিতার বিবেচনার সাথে সংগতিপূর্ণ।

বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা

এ পরিকল্পনার অধীনে বৈদেশিক অর্থায়ন কৌশলে অবশ্যই সর্বোচ্চ সুবিধাজনক শর্তে ছাড়যুক্ত সরকারি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ঋণের সর্বাধিক উপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক ঋণের বর্তমান দূরদর্শী কৌশল বজায় রাখা হবে। ছাড়যুক্ত ঋণ থেকে পরিবহন ও জ্বালানি খাতের অধিকাংশ অবকাঠামোগত প্রকল্পের (যেমন মাতারবাড়ি পাওয়ার হাব; ঢাকা মেট্রো রেল; কর্ণফুলী নদীর সুড়ঙ্গপথ প্রভৃতি) অর্থায়ন করা যেতে পারে। এছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত করার সুযোগসহ খুব বড় আকারের 'এইড পাইপলাইন' যার পরিমাণ বর্তমানে ২৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি (প্রায় ৬ বছরের 'এইড' ব্যবহার), তা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

পরিকল্পনার অধীনে বৈদেশিক অর্থায়ন কৌশলে আরো যে সকল ব্যবস্থা থাকবে তার মধ্যে রয়েছে বহিঃস্থ অর্থায়নের উৎস বিস্তৃত করা, সভরিন ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে সুবিধাজনক শর্তে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের জন্য বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহে অধিকতর সুযোগ তৈরি করা এবং পরিকল্পনার অধীনে সামাজিক খাতের লক্ষ্য অর্জনে বা সরকারি খাতের বড় বড় প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সরকারি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎসের ওপর নির্ভরতা অব্যাহত রাখা। উপরের ৫.৩ ও ৫.৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, এই কৌশলের ওপর অব্যাহত নির্ভরতা পরিকল্পনা মেয়াদে বৈদেশিক ঋণসহ ঋণ পরিশোধের বোঝা কমিয়ে আনবে। এই কৌশলের টেকসহিতা নিশ্চিত করা হলে তা বাংলাদেশকে বহিঃস্থ অভিঘাতজনিত ঝুঁকি হ্রাসসহ দেশজ ঋণ গ্রহীতাদের জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং অর্থায়ন ব্যয়ও হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

দেশীয় ঋণ ব্যবস্থাপনা

অতীতের মতো আর্থিক অনুশাসন ও কর রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশীয় ঋণ কৌশলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে যাতে সরকারের ঋণের প্রয়োজনীয়তার সাথে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ও বেসরকারি খাতে ঋণ বরাদ্দের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অর্থবছর ২০২০ এবং অর্থবছর ২০২১ এর বাজেটের সাথে প্রাথমিকভাবে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে, যার কিছুটা কোভিড-১৯ জনিত, হতাশাবাদ থাকলেও অর্থবছর ২০২২ ও তৎপরবর্তী সময়ে কর সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশোধন করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশে দেশজ সরকারি ঋণ সংগ্রহের উচ্চ ব্যয় হ্রাস করারও ব্যবস্থা নেয়া হবে। অতি উচ্চ ব্যয়ে লেনদেনযোগ্য নয় এমন পুরাতন ধারার জাতীয় সঞ্চয়পত্র ইস্যু করে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরতার স্থলে বাজারভিত্তিক বিভিন্ন উপায় ও সুদ হার সঞ্চয়ের ওপর সমধিক জোর দেয়া দরকার। দেশজ ঋণের সুদ পরিশোধ এরই মধ্যে বাজেট ব্যয়ের বৃহত্তম একক খাত হয়ে পড়েছে এবং বাজেটীয় অংশ হিসেবে এটি অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২০২০ অর্থবছরে দেশজ ঋণ যখন মোট সরকারি ব্যয়ের ৬২ শতাংশ তখন দেশজ ঋণের সুদ পরিশোধের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২০২০ অর্থবছরে প্রাক্কলিত মোট সুদ পরিশোধের ৯২ শতাংশেরও বেশি। এই গতি সাবলীল নয়, এবং এটি বিপরীতমুখী করা প্রয়োজন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে উচ্চ ব্যয়যুক্ত ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশজ সুদ পরিশোধের প্রবৃদ্ধিকে কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

মধ্যমেয়াদে দেশজ ঋণ সেবার উচ্চ ব্যয় যদিও ঋণের টেকসহিতায় তেমন বড় কোনো বাঁধা সৃষ্টি করে না, তবু তা বাজেটীয় বিবেচনাধীন ব্যয় বা প্রাথমিক (সুদ-বহির্ভূত) ব্যয়কে সীমিত করে এবং এভাবে সরকারি খাতে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজস্বের আকার সংকোচন করে। একারণে, সরকারি ঋণ সংগ্রহ ব্যয় আরো স্বল্প ব্যয়সম্পন্ন করতে এবং একই সাথে দেশজ বন্ড মার্কেট তৈরিতে সহায়তা দিতে ঋণ ব্যবস্থাপনা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া সরকারের উদ্যোগে পুঁজিবাজার ও বন্ড বাজারের সুদ হারের সাথে মিল রেখে জাতীয় সঞ্চয় ব্যবস্থার সুদ হার কাঠামো যুক্তিযুক্ত উপায়ে সমন্বয় সাধনের কাজও অব্যাহত থাকবে।

৫.৬ সরকারি বিনিয়োগে অগ্রাধিকার

সরকারি খাতে সম্পদ সমাবেশের সীমাবদ্ধতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অগ্রাধিকরণের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্যের রেকর্ড রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার করাটাই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করাই হবে বিনিয়োগের উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুফল আদায়ের চাবিকাঠি এবং সেই সাথে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উজ্জীবিত করারও কার্যকর পন্থা। একারণে এ পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়নের দক্ষতা, সুশাসন এবং ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের (এমঅ্যান্ডই) ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদান করা হবে।

কোভিড-১৯ জনিত সমস্যা থেকে পুনরুদ্ধার এবং প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র ও ঝুকিপূর্ণদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার জোরদার, এবং অব্যাহত সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির টেকসহিতা নিশ্চিতকরণের আলোকে ৮ম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগের অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করা হবে।

উপরন্তু, ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ সম্পর্কিত বিনিয়োগ কর্মসূচিতে সম্পদের একটি বড় অংশ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। সারণি ৫.৮ এ মোট সরকারি বিনিয়োগের বিবরণসহ চলতি মূল্যে ও স্থির মূল্যে এডিপির পরিমাণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। সারণি ৫.৯ ও ৫.১০ এ যথাক্রমে স্থির মূল্যে ও চলতি মূল্যে পরিকল্পিত সরকারি বিনিয়োগের(অর্থবছর ২১) প্রস্তাবিত খাতওয়ারি সারাংশ পরিবেশিত হয়েছে। চলতি ও স্থিরমূল্যে এই বরাদ্দগুলোর মন্ত্রণালয়-ওয়ারি মানচিত্রায়ন প্রদর্শিত হয়েছে পরিশিষ্ট সারণি ৫.১ ও ৫.২ এ। এই বরাদ্দগুলো নির্দেশনামূলক এবং বার্ষিক বাজেট চক্রের আলোকে সম্পদের প্রকৃত প্রাপ্যতা, সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তিত জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনার প্রেক্ষিতে এগুলো পর্যালোচনা করা হবে। এ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে বিস্তারিত খাতভিত্তিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও নীতিসমূহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের অংশ ২ এর খাতভিত্তিক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সারণি ৫.৮: সরকারি বিনিয়োগের খন্ড খন্ড অংশ

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
জিডিপিতে মোট সরকারি বিনিয়োগ অংশ (%)	৮.২	৮.২	৮.৭	৮.৯	৯.২
নামীয় মূল্য	**(বিলিয়ন টাকা,চলতি বাজার মূল্য)**				
মোট সরকারি বিনিয়োগ	২৫৭৩	২৯২৪	৩৫০৩	৪০৫৬	৪৮০১
যার মধ্যে:					
এডিপি বিনিয়োগ	১৮০০	২১৩৩	২৬২২	৩০৬০	৩৬৭৫
প্রকৃত মূল্য	**(বিলিয়ন টাকা,অর্থবছর ২০২১ বাজার মূল্য)**				
মোট সরকারি বিনিয়োগ	২৫৭৩	২৭৮৮	৩১৮৭	৩৫২৪	৩৯৮৭
যার মধ্যে:					
এডিপি বিনিয়োগ	১৮০০	২০৩৩	২৩৮৬	২৬৫৯	৩০৫২
মেমো আইটেম:					
নামীয় জিডিপি, বিলিয়ন টাকায়	**৩১৫৬৫**	**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**
জিডিপি ডিফ্লেটর সূচক (অর্থবছর ২০২১ ভিত্তিবছর হিসেবে)	১০০.০	১০৪.৯	১০৯.৯	১১৫.১	১২০.৪

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.৯: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলতি মূল্যে খাতগত এডিপি বরাদ্দ

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
খাত	(বিলিয়ন টাকায়,চলতি বাজার মূল্য)	১২০.৬	১৩৯.২	১৬১.৩	১৯২.৯
সাধারণ সরকারি সেবা	৯৬.১	২৮৩.৮	৩৩২.০	৩৬৮.৮	৪২৩.৯
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৫৯.৯	৬.৯	৮.০	৯.৩	১১.২
প্রতিরক্ষা	৫.৬	৫১.৮	৫৯.৭	৬৯.৮	৮৩.৮
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪২.১	৩৩৬.৮	৪০৭.০	৫০৬.০	৬২৫.৭
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬৭.৪	২১৮.৪	২৭৮.৮	৩৪০.৮	৪০৮.৯
স্বাস্থ্য	১৭০.১	৮৪.৬	৯২.২	১০৭.৫	১২১.৭
সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৭২.৪	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪২.৮	২৪.১	২৭.৮	৩২.৩	৩৮.৮
বিনোদন,সংস্কৃতি ও ধর্ম	১৯.৬	২৮৯.২	৩৯০.৮	৪৫২.২	৫৪২.৬
বিদ্যুৎ ও শক্তি	২৬৫.১	২২২.৯	২৯৯.৫	৩৫২.৭	৪৩৮.২
কৃষি	১৬৫.৯	১১.৫	১৩.৩	১৫.৫	১৮.৬
পরিবেশ	৯.৪	২৯.১	৩৩.৫	৩৯.১	৪৬.৯
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	২৩.৬	৪০০.৩	৪৭৯.৮	৫৩৩.৯	৬৩৭.০
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬০.০	**২১৩২.৭**	**২৬২২.৪**	**৩০৬০.১**	**৩৬৭৫.৩**
মোট এডিপি ব্যয়	১৮০০.০				
মেমোরেন্ডাম:		**৩৫৬৬১**	**৪০৩৬৩**	**৪৫৭৭৬**	**৫১৯৫৬**
নামীয় জিডিপি	৩১৫৬৫				

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.১০: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতগত এডিপি বরাদ্দ অর্থবছর ২০২১ মূল্যে

খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	(বিলিয়ন টাকায়, অর্থবছর ২০২১ বাজার মূল্যে)				
সাধারণ সরকারি সেবা	৯৬.১	১১৪.৭	১২৫.৫	১৩৯.৯	১৬০.১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৫৯.৯	২৬৯.৪	২৯৯.৯	৩১৭.৪	৩৪৮.৪
প্রতিরক্ষা	৫.৬	৬.৬	৭.২	৮	৯.২
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	৪২.১	৪৯.৩	৫৩.৯	৫৯.৯	৬৮.৭
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬৭.৪	৩১৯.৭	৩৬৭.৫	৪৩৫.৬	৫১৪.২
স্বাস্থ্য	১৭০.১	২০৭.৫	২৫১.৮	২৯৩.৪	৩৩৬.১
সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৭২.৪	৮০.৩	৮৩.৩	৯২.৭	১০০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	৪২.৮	৫০	৫৪.৯	৬১	৬৯.৯
বিনোদন,সংস্কৃতি ও ধর্ম	১৯.৬	২২.৯	২৫	২৭.৯	৩১.৯
বিদ্যুৎ ও শক্তি	২৬৫.১	২৭৪.৪	৩৫৩.১	৩৮৯.৩	৪৪৫.৯
কৃষি	১৬৫.৯	২১১.৭	২৭০.৫	৩০৩.৭	৩৬০.০
পরিবেশ	৯.৪	১১.০	১২.০	১৩.৪	১৫.৩
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	২৩.৬	২৭.৬	৩০.৩	৩৩.৭	৩৮.৪
পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬০.০	৩৮৭.৮	৪৫১.৫	৪৮২.৬	৫৫৩.৬
মোট এডিপি ব্যয়	**১৮০০.০**	**২০৩১.৯**	**২৩৮৬.৪**	**২৬৫৮.৫**	**৩০৫১.৭**

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ৫.১১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ,মোট উন্নয়ন ব্যয়ের % হিসেবে

খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
	(মোট এডিপি ব্যয়ের চলতি মূল্যেও % হিসেবে				
সাধারণ সরকারি সেবাসমূহ	৫.৩	৫.৭	৫.৩	৫.৩	৫.২
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৪.৪	১৩.৩	১২.৭	১২.১	১১.৫
প্রতিরক্ষা	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২.৩	২.৪	২.৩	২.৩	২.৩
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	১৪.৯	১৫.৮	১৫.৫	১৬.৫	১৭.০
স্বাস্থ্য	৯.৫	১০.২	১০.৬	১১.১	১১.১
সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৪.০	৪.০	৩.৫	৩.৫	৩.৩
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২.৪	২.৫	২.৩	২.৩	২.৩
বিনোদন,সংস্কৃতি ও ধর্ম	১.১	১.১	১.১	১.১	১.১
বিদ্যুৎ ও শক্তি	১৪.৭	১৩.৬	১৪.৯	১৪.৮	১৪.৮
কৃষি	৯.২	১০.৫	১১.৪	১১.৫	১১.৯
পরিবেশ	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	১.৩	১.৪	১.৩	১.৩	১.৩
পরিবহন ও যোগাযোগ	২০.০	১৮.৮	১৮.৩	১৭.৪	১৭.৩

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণ

৫.৭ সমন্বিত উন্নয়ন অংশীদারিত্বের অভিমুখে

বাংলাদেশের জন্য একটি মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে ব্যাপক পরিমাণ বিনিয়োগ। কোভিড-১৯ থেকে পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ এই কাজকে জটিল করে তুলেছে এবং এক্ষেত্রে মানব স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পূর্বাবস্থায় আনা এবং সেই সাথে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরায় দ্রুত চালু হওয়া প্রয়োজন। দেশের সম্পদ ভিত্তির প্রধান উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারদের নিকট হতে ঋণ ও অনুদান বা মঞ্জুরি আকারে প্রাপ্ত সহায়তা। জিডিপির অনুপাতে বিদেশি সহায়তা কমে এলেও টাকার অংকে এর পরিমাণ অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। সুতরাং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান কৌশলগুলোর অন্যতম হবে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে কার্যকর অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, বিশেষ করে বহুজাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে, যাতে কোভিড-১৯ মোকাবেলাকরণে দ্রুত সহায়তা পাওয়া যায় এবং পাইপ লাইনে থাকা বিদ্যমান ও নতুন নতুন ঋণের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ও ফলাফল নিশ্চিত করা যায়।

বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বৈশ্বিক অঙ্গীকার ও স্থানীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও, বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যকারিতায় সমস্যা অব্যাহত রয়েছে। প্রধান সমস্যাবলির মাঝে রয়েছে: (১) 'স্ট্যান্ড-অ্যালোন'/একক প্রকল্পগুলোর অব্যাহত বিস্তার এবং বৈদেশিক সহায়তার বিভক্তি, (২) সমন্বয়হীনতার কারণে খাতভিত্তিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাসগত সমস্যা, (৩) দেশীয় ব্যবস্থার স্বল্পব্যবহার এবং নিম্নমানের সমন্বয়, (৪) উন্নতি সত্ত্বেও, সম্ভাব্য সাহায্য প্রাপ্তির নিম্নধারা, (৫) সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে দুর্বল সমন্বয়, ফলে উন্নয়ন সহযোগিতার প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে বোধগম্যতার ঘাটতি এবং নীতি সংলাপের ক্ষেত্রে দুর্বল নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হয়।

বিদেশি সাহায্য হতে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ২০১০ সালে একটি যৌথ সহযোগিতা কৌশলে (JCS) স্বাক্ষর দানের মাধ্যমে বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে অংশীদারিত্বের একটি আনুষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি স্থাপন করেছে। সহায়তার কার্যকারিতা বিষয়ে প্যারিস নীতির ভিত্তিতে, যৌথ সহযোগিতা কৌশলের (JCS) প্রাথমিক লক্ষ্য হলো দেশ পর্যায়ে সহায়তার কার্যকারিতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের বাস্তব রূপদান। যৌথ সহযোগিতা কৌশল অনুসারে স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (LCG) বাংলাদেশে সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের (DP) মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রধান মঞ্চ হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) ও স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (LCG) এর কর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সংলাপ বিনিময় করে। বিডিএফ- একটি উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরাম যা কয়েক বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এতে

শুধু সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীই নয়, বরং সংসদ, সুশীল সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিগণও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিষয়গত ক্ষেত্রে এলসিজিগুলোতে যৌথ-সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করেন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের সচিব/সদস্য এবং একটি উন্নয়ন সহযোগী। সমন্বয় পদ্ধতি শক্তিশালী করতে সরকার ও ডিপি-র উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব বিগত বছরগুলোতে সমন্বয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এলসিজিতে বর্তমানে ১৮টি ওয়ার্কিং গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত, এর প্রতিটিতেই বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধি চেয়ার হিসেবে এবং একজন ডিপি কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং নির্দিষ্ট জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিয়ে এতে কাজ করা হয়ে থাকে। নিয়মিত এলসিজি সভা অনুষ্ঠানের ফলে অধিকতর গঠনমূলক উন্নয়ন সংলাপ আয়োজিত হয়, যা ডিপি ও জিওবি-র মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবর্তিত অংশীদারিত্ব চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার যৌথ সহযোগিতা কৌশল ও স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ-কে শক্তিশালী করতে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো একটি অধিকতর প্রাণবন্ত ও যৌথ শক্তিতে বলীয়ান অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগিতার কার্যকারিতাকে খর্ব করে এমন বিদ্যমান সমস্যাবলির মোকাবেলা করা। তবে এ ধরণের একটি সবল অংশীদারিত্বের জন্য সরকারকে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। বিদ্যমান পাইপ লাইনের ব্যবহারে গতি বাড়াতে হবে, ধীরগতিসম্পন্ন প্রকল্পগুলোর ওপর আলোকপাত করতে হবে এবং পুনর্গঠন করে বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে।। ৮ম পরিকল্পনায় এই মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সরকারের লক্ষ্য ও খাতসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সাথে সকল উন্নয়ন অংশীদার তাঁদের দেশের সহায়তা কৌশল বিন্যাস করবে। উন্নয়ন অংশীদারদের নীতির বিন্যাস ও ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ (LCG) খাতসংশ্লিষ্ট ওয়ার্কিং গ্রুপে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার হিসেবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) উচিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়গুলো বৈদেশিক সহায়তা প্রক্রিয়ায় প্রবেশে সমপর্যায়ের সুবিধা প্রাপ্ত হয়।

সরকার তথ্য অধিকার আইন জারি ও একটি স্বাধীন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার সাথে সরকারি দলিলাদি সর্বজনসমক্ষে প্রকাশের জন্য একটি পরিবেশ তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে; এটি অত্যন্ত জরুরি যে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তসহ প্রকল্প দলিলাদিতে যাতে সকল মানুষের সহজগম্যতা থাকে। এই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই বৈদেশিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য-উপাত্ত সবার জন্য উন্মুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশে উন্নয়ন অংশীদারদের জন্য তথ্য আদান-প্রদানে 'এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এআইএমএস) হবে প্রধান বাহন।

৫.৮ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তায় ক্রমবর্ধিত সামাজিক ব্যয় চাহিদাসহ বর্ধনশীল অবকাঠামো চাহিদা মেটাতে বিনিয়োগ কর্মসূচি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারি খাতে সম্পদ আহরণ সব সময়েই বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী, তবে উপযুক্ত নীতি, প্রশাসনিক সংস্কার এবং কর প্রশাসনের অটোমেশন প্রভৃতি সহায়তা পেলে এই লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অধিগম্য। সবচাইতে বড় সমস্যা হবে এনবিআর রাজস্ব প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট পুরাতন রীতি ও সংস্কৃতির পরিবর্তন করে মূসক ও প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি আধুনিক আইটি ও হিসাবভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দেশজ রাজস্ব সমাবেশ সংশ্লিষ্ট কৌশলে সাফল্যলাভের পূর্বশর্তই হবে মূসক ও প্রত্যক্ষ কর প্রশাসনের অটোমেশনসহ এনবিআর আধুনিকায়ন পরিকল্পনার দক্ষ বাস্তবায়ন।

বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রক্ষেপণগুলো যুক্তিযুক্ত এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোর ঋণ গ্রহণ রীতির সাথে মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ডলারের দিক থেকে বৈদেশিক ঋণের আয়তন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলেও আপেক্ষিকভাবে পরিকল্পনা মেয়াদে বাজেটের বৈদেশিক অর্থায়ন নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আরো হ্রাস পাবে, যেমনটি মোটামুটিভাবে ৭ম পরিকল্পনার অধীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতেও দেখা গিয়েছে। জিডিপি এবং পণ্য রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ এর অনুপাতে বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ সেবা পরিশোধের টেকসই হ্রাস অবশ্যই বহিঃস্থ অভিঘাতে বাংলাদেশের অরক্ষণীয়তা হ্রাস করবে। বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ সেবা পরিশোধের ক্ষেত্রে এ ধরণের উন্নতি বৈদেশিক দায়বদ্ধতা মেটানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে, যা সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে প্রবেশ সুবিধা সুগম করবে।

দেশজ ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে পরিকল্পনার অর্থায়নে কোন বড় সমস্যা হবে না। পরিকল্পনার অধীনে প্রক্ষেপণকৃত দেশজ ঋণ গ্রহণ বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা ও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতৎসত্ত্বেও, এই দুটি উৎস থেকে পরিকল্পিত ঋণ গ্রহণ যেহেতু বড় আকারের হবে, তাই প্রয়োজন হবে মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির মধ্যে উন্নত সমন্বয় সাধন যাতে বেসরকারি খাতের ঋণ চাহিদা উপেক্ষিত হবার যে কোন সম্ভাবনা পরিহার করা যায়। বাজারভিত্তিক সুদ হার কাঠামোতে পরিবর্তনের সাথে ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণের ওপর প্রদেয় সুদ হারসহ দেশজ অর্থায়নের উৎসগুলোকে যুক্তিযুক্তভাবে বিন্যাস করা প্রয়োজন এবং দ্রুত বর্ধনশীল দেশজ ঋণ সেবার বোঝা কমানোর লক্ষ্যে দেশজ ঋণের উৎসও আরো বিস্তৃত করা দরকার। দেশজ বন্ড বাজারের চাহিদা ও সরবরাহ এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসহ দেশে বন্ড বাজারের উন্নয়ন করা গেলে তা দেশজ অর্থায়নের উৎসকে বহুমুখী করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায় ৫: পরিশিষ্ট সারণিসমূহ

সারণি ক ৫.১: মন্ত্রণালয় অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ (টাকা বিলিয়ন)

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	চলতি মূল্যে এডিপি				
আংশিক মোট= সাধারণ সরকারি সেবাসমূহ	**৯৬.১**	**১২০.৬**	**১৩৯.২**	**১৬১.৩**	**১৯২.৯**
জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০.২	০.২	০.৩	০.৩	০.৪
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৯.৩	৫০.৯	৫৮.৭	৬৭.৫	৮০.১
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.২	০.২	০.৩	০.৩	০.৪
নির্বাচন কমিশন	৭.৫	৯.২	১০.৬	১২.৪	১৪.৯
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৯	৩.৪	৩.৯	৪.৭
সরকারি কর্ম কমিশন	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
অর্থ বিভাগ	১৫.৪	১৮.৯	২১.৮	২৫.৪	৩০.৫
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	০.৮	১.০	১.২	১.৪	১.৬
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১৮.৯	২৩.৩	২৬.৮	৩১.৩	৩৭.৬
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৪	০.৫	০.৬	০.৭	০.৯
পরিকল্পনা বিভাগ	৩.৭	৪.৬	৫.৩	৬.২	৭.৪
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ	০.৮	১.০	১.১	১.৩	১.৬
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫.৬	৬.৯	৭.৯	৯.২	১১.১
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০.৬	০.৭	০.৮	১.০	১.২
আংশিক মোট = স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	**২৫৯.৯**	**২৮৩.৮**	**৩৩২.০**	**৩৬৮.৮**	**৪২৩.৯**
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৪.৭	২৪০.৪	২৮১.৯	৩১০.৪	৩৫৩.৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৩.৪	২৮.৯	৩৩.৩	৩৮.৮	৪৬.৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১.৮	১৪.৫	১৬.৮	১৯.৬	২৩.৫
আংশিক মোট = প্রতিরক্ষা	**৫.৬**	**৬.৯**	**৮.০**	**৯.৩**	**১১.২**
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা সেবাসমূহ	৫.৬	৬.৯	৮.০	৯.৩	১১.২
আংশিক মোট = সরকারি আদেশ ও নিরাপত্তা	**৪২.১**	**৫১.৮**	**৫৯.৭**	**৬৯.৮**	**৮৩.৮**
আইন ও বিচার বিভাগ	৫.৩	৬.৫	৭.৫	৮.৭	১০.৫
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৭.৩	২১.৩	২৪.৬	২৮.৭	৩৪.৫
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.৯	১.২	১.৩	১.৬	১.৯
দুর্নীতি দমন কমিশন	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৮.৪	২২.৬	২৬.১	৩০.৫	৩৬.৬
আংশিক মোট- = শিক্ষা ও প্রযুক্তি	**২৬৭.৪**	**৩৩৬.৮**	**৪০৭.০**	**৫০৬.০**	**৬২৫.৭**
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৯.৫	১১৩.০	১৩৩.০	১৫৮.৩	১৯৩.৭
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৬১.৪	৯২.৩	১০৬.৪	১৩৬.৬	১৭১.৩
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়	৯১.০	৯২.৩	১০৬.৪	১২৪.২	১৪৯.০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭.০	২৫.৪	৩৯.৯	৫৫.৯	৭৪.৫
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮.৫	১৩.৮	২১.৩	৩১.০	৩৭.২
আংশিক মোট = স্বাস্থ্য	**১৭০.১**	**২১৮.৪**	**২৭৮.৮**	**৩৪০.৮**	**৪০৮.৯**
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫১.৭	১৯৫.৮	২৫২.৭	৩১০.৪	৩৭২.৪
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৮.৪	২২.৬	২৬.১	৩০.৪	৩৬.৫
আংশিক মোট = সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	**৭২.৪**	**৮৪.৬**	**৯২.২**	**১০৭.৫**	**১২১.৭**
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৪	৩.৯	৪.৫	৫.৪
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.১	৫.১	৫.৯	৬.৮	৮.২
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.১	৭.৫	৮.৭	১০.১	১২.২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫৬.২	৬৪.৬	৬৯.১	৮০.৭	৮৯.৪

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**চলতি মূল্যে এডিপি**				
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.০	৪.৬	৫.৪	৬.৫
আংশিক মোট = গ্রহায়ণ ও কমিউনিটি উপকরণ	৪২.৮	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪২.৮	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১
আংশিক মোট =বিনোদন, সংস্কৃতি,ধর্ম	১৯.৬	২৪.১	২৭.৮	৩২.৩	৩৮.৮
তথ্য মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৯	৩.৪	৩.৯	৪.৭
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৩	৩.৮	৪.৪	৫.৩
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০.৯	১৩.৫	১৫.৫	১৮.১	২১.৭
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৬	৪.৪	৫.১	৫.৯	৭.১
আংশিক মোট = বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৬৫.১	২৮৯.২	৩৯০.৮	৪৫২.২	৫৪২.৬
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০.০	২৪.৭	২৮.৪	৩৩.২	৩৯.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪৫.১	২৬৪.৫	৩৬২.৪	৪১৯.০	৫০২.৮
আংশিক মোট = কৃষি	১৬৫.৯	২২২.৯	২৯৯.৫	৩৫২.৭	৪৩৮.২
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪১.২	৪৬.১	৪৭.৯	৪৯.৭	৫৯.৬
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯.০	১১.১	১২.৮	১৫.০	১৮.০
ভূমি মন্ত্রণালয়	৭.১	৮.৮	১০.১	১১.৮	১৪.২
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৮.৬	১৫৬.৯	২২৮.৭	২৭৬.২	৩৪৬.৪
আংশিক মোট = পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	৯.৪	১১.৫	১৩.৩	১৫.৫	১৮.৬
পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯.৪	১১.৫	১৩.৩	১৫.৫	১৮.৬
আংশিক মোট = শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	২৩.৬	২৯.১	৩৩.৫	৩৯.১	৪৬.৯
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১.৬	২.০	২.৩	২.৭	৩.২
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১.২	১.৫	১.৭	২.০	২.৩
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৮	১৫.৭	১৮.১	২১.১	২৫.৪
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৩	৩.৮	৪.৫	৫.৪
পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৫.৩	৬.৬	৭.৬	৮.৮	১০.৬
আংশিক মোট = পরিবহন ও যোগাযোগ	৩৬০.০	৪০০.৩	৪৭৯.৮	৫৩৩.৯	৬৩৭.০
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৭৭.৯	১৯০.০	২১৫.০	২৩৩.৮	২৭৯.১
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬৫.৬	৭৫.০	১০০.০	১১৫.৪	১৪০.৩
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪০.৬	৫০.১	৫৭.৭	৬২.১	৭৪.৫
বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮.৩	১০.৩	১১.৮	১৩.৮	১৬.৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১২.১	১৪.৯	১৭.২	২০.০	২৪.০
সেতু বিভাগ	৫৫.৫	৬০.০	৭৮.১	৮৮.৮	১০২.৫
মোট উন্নয়ন ব্যয়	১৮০০.০	২১৩২.৭	২৬২২.৪	৩০৬০.১	৩৬৭৫.৩

সারণি ক ৫.২: মন্ত্রণালয় অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	এডিপি (অর্থবছর ২০২১ মূল্যে বিলিয়ন টাকা)				
আংশিক মোট= সাধারণ সরকারি সেবাসমূহ	৯৬.১	১১৪.৭	১২৫.৫	১৩৯.৯	১৬০.১
জাতীয় সংসদ সচিবালয়	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৯.৩	৪৮.৩	৫৩.০	৫৮.৯	৬৭.৫
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
নির্বাচন কমিশন	৭.৫	৮.৮	৯.৬	১০.৭	১২.২
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৮	৩.০	৩.৪	৩.৯
সরকারি কর্ম কমিশন	০.৩	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪
অর্থ বিভাগ	১৫.৪	১৮.০	১৯.৭	২১.৯	২৫.১
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	০.৮	১.০	১.১	১.২	১.৩
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১৮.৯	২২.১	২৪.২	২৭.০	৩০.৯
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৪	০.৫	০.৬	০.৬	০.৭
পরিকল্পনা বিভাগ	৩.৭	৪.৪	৪.৮	৫.৩	৬.১
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ	০.৮	০.৯	১.০	১.২	১.৩
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫.৬	৬.৫	৭.১	৭.৯	৯.১
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০.৬	০.৭	০.৭	০.৮	১.০
আংশিক মোট = স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২৫৯.৯	২৬৯.৪	২৯৯.৯	৩১৭.৪	৩৪৮.৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৪.৭	২২৮.২	২৫৪.৭	২৬৭.২	২৯০.৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৩.৪	২৭.৪	৩০.১	৩৩.৪	৩৮.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১.৮	১৩.৮	১৫.১	১৬.৮	১৯.৩
আংশিক মোট = প্রতিরক্ষা	৫.৬	৬.৬	৭.২	৮.০	৯.২
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় - প্রতিরক্ষা সেবাসমূহ	৫.৬	৬.৬	৭.২	৮.০	৯.২
আংশিক মোট = সরকারি আদেশ ও নিরাপত্তা	৪২.১	৪৯.৩	৫৩.৯	৫৯.৯	৬৮.৭
আইন ও বিচার বিভাগ	৫.৩	৬.২	৬.৭	৭.৫	৮.৬
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৭.৩	২০.৩	২২.২	২৪.৭	২৮.৩
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.৯	১.১	১.২	১.৩	১.৫
দুর্নীতি দমন কমিশন	০.২	০.২	০.২	০.২	০.৩
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৮.৪	২১.৫	২৩.৬	২৬.২	৩০.০
আংশিক মোট- = শিক্ষা ও প্রযুক্তি	২৬৭.৪	৩১৯.৭	৩৬৭.৫	৪৩৫.৬	৫১৪.২
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৯.৫	১০৭.৩	১২০.১	১৩৬.৩	১৫৯.২
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৬১.৪	৮৭.৬	৯৬.১	১১৭.৬	১৪০.৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়	৯১.০	৮৭.৬	৯৬.১	১০৬.৯	১২২.৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭.০	২৪.১	৩৬.০	৪৮.১	৬১.২
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮.৫	১৩.১	১৯.২	২৬.৭	৩০.৬
আংশিক মোট = স্বাস্থ্য	১৭০.১	২০৭.৫	২৫১.৮	২৯৩.৪	৩৩৬.১
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫১.৭	১৮৬ ০	২২৮.৩	২৬৭.২	৩০৬.১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৮.৪	২১.৫	২৩.৫	২৬.২	৩০.০
আংশিক মোট = সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ	৭২.৪	৮০.৩	৮৩.৩	৯২.৭	১০০.০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.২	৩.৫	৩.৯	৪.৫
নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.১	৪.৮	৫.৩	৫.৯	৬.৭
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.১	৭.২	৭.৮	৮.৭	১০.০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫৬.২	৬১.৩	৬২.৫	৬৯.৫	৭৩.৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩.৩	৩.৮	৪.২	৪.৭	৫.৩

অর্থবছর	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**এডিপি (অর্থবছর ২০২১ মূল্যে বিলিয়ন টাকা)**				
আংশিক মোট =গৃহায়ন ও কমিউনিটি উপকরণ	**৪২.৮**	**৫০.০**	**৫৪.৯**	**৬১.০**	**৬৯.৯**
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪২.৮	৫০.০	৫৪.৯	৬১.০	৬৯.৯
আংশিক মোট =বিনোদন, সংস্কৃতি, ধর্ম	**১৯.৬**	**২২.৯**	**২৫.০**	**২৭.৯**	**৩১.৯**
তথ্য মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৮	৩.০	৩.৪	৩.৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.১	৩.৪	৩.৮	৪.৩
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০.৯	১২.৮	১৪.০	১৫.৬	১৭.৯
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৬	৪.২	৪.৬	৫.১	৫.৮
আংশিক মোট = বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	**২৬৫.১**	**২৭৪.৪**	**৩৫৩.১**	**৩৮৯.৩**	**৪৪৫.৯**
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০.০	২৩.৪	২৫.৭	২৮.৬	৩২.৭
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪৫.১	২৫১.০	৩২৭.৪	৩৬০.৭	৪১৩.২
আংশিক মোট = কৃষি	**১৬৫.৯**	**২১১.৭**	**২৭০.৫**	**৩০৩.৭**	**৩৬০.০**
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪১.২	৪৩.৮	৪৩.২	৪২.৮	৪৯.০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯.০	১০.৬	১১.৬	১২.৯	১৪.৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	৭.১	৮.৩	৯.১	১০.২	১১.৬
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৮.৬	১৪৯.০	২০৬.৬	২৩৭.৮	২৮৪.৬
আংশিক মোট = পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	**৯.৪**	**১১.০**	**১২.০**	**১৩.৪**	**১৫.৩**
পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯.৪	১১.০	১২.০	১৩.৪	১৫.৩
আংশিক মোট = শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ	**২৩.৬**	**২৭.৬**	**৩০.৩**	**৩৩.৭**	**৩৮.৪**
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১.৬	১.৯	২.১	২.৩	২.৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১.২	১.৪	১.৫	১.৭	১.৯
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২.৮	১৪.৯	১৬.৪	১৮.২	২০.৮
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.২	৩.৫	৩.৯	৪.৪
পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৫.৩	৬.২	৬.৮	৭.৬	৮.৭
আংশিক মোট = পরিবহন ও যোগাযোগ	**৩৬০.০**	**৩৮৭.৮**	**৪৫১.৫**	**৪৮৩.৬**	**৫৫৩.৬**
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৭৭.৯	১৮৫.০	২০৩.৭	২১৭.৬	২৫২.৮
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬৫.৬	৭৩.৪	৯৪.১	৯৯.৫	১১৫.০
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪০.৬	৪৭.৫	৫৩.১	৫৬.৪	৬১.২
বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮.৩	৯.৭	১১.৭	১২.৯	১৩.৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১২.১	১৪.১	১৬.৫	১৭.২	১৯.৭
সেতু বিভাগ	৫৫.৫	৫৮.১	৭২.৪	৮০.০	৯১.৩
মোট উন্নয়ন ব্যয়	**১৮০০.০**	**২০৩২.৯**	**২৩৮৬.৪**	**২৬৫৮.৫**	**৩০৫১.৭**

অধ্যায় ৬

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬.১ পর্যালোচনা

অগ্রগতির সূচক হিসেবে আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নের পরিবর্তে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্ব প্রথম ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ধারণাটি প্রবর্তন করা হয়। এই ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা সংশোধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রত্যেক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় অর্জিত ফলাফল ও ঘাটতির কারণসমূহে নজর দানের মাধ্যমে ধারাবাহিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সংযোগ তৈরি করতেও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো ব্যবহৃত হয়। চিহ্নিত ব্যর্থতাসমূহ নিরসনে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এজেন্ডা, নীতি বা কৌশল গ্রহণ করা হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা হয়েছে। যদিও অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর প্রাদুর্ভাবে উন্নয়ন অগ্রগতির বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে এবং বর্ধনশীল ধারাও থেমে গেছে, তবুও এ পরিকল্পনা উন্নয়ন গতি পুনরুদ্ধার ও ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোয় (ডিআরএফ) নির্দেশিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করতে সচেষ্ট হবে।

৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোর (ডিআরএফ) অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য আরো যথাযথ ডিআরএফ প্রণয়ন করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সরকারি নীতি ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য গৃহীত ডিআরএফ কৌশল, পরিকল্পনায় এর কৌশলগত ভূমিকা, ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা,তথ্য গতিশীলতার ব্যবস্থাপনা,পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি ও চূড়ান্ত মূল্যায়নে ডিআরএফ-এর ভূমিকা তুলে ধরা।

৬.২ ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল

৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণের অগ্রগতির ফলে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নের কৌশলগত বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রূপকল্প ২০৪১ ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতিকে পরিবীক্ষণ করতে, ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করতে এবং তার বিপরীতে সংশোধিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরি।

সঠিক ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ডাটাবেইজ তৈরির গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত, এর ওপর ভিত্তি করেই একটি বিস্তারিত ডিআরএফ প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে

- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও এসডিজির মূল সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পরিবীক্ষণমূলক সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- তথ্য উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে;
- তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে;
- ভিত্তিবছর, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তিবছর এবং মধ্যবর্তী বছরসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ডিআরএফ-এ মোট ১৫ টি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে,যার মধ্যে ৪ টি সামষ্টিক এবং অন্য ১১ টি খাতভিত্তিক, এ সকল অগ্রাধিকার খাতের সবকয়টিই এসডিজির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। সারণি ৬.১ জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ এবং তাদের অন্তর্গত সূচকসমূহ দেখানো হয়েছ। ১০৪টি পরিমাপযোগ্য সূচক ব্যবহার করে এসব উন্নয়ন অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি মুল্যায়ন করা হবে। নির্দেশক, ভিত্তিবছর তথ্য ও বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পরিশিষ্ট-১ হিসেবে এই অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ৬.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জাতীয় অগ্রাধিকার ক্ষেত্র

জাতীয় অগ্রাধিকার	ফলাফল বিবরন	সূচক	সূচকের সংখ্যা
অ. সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ			
সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি-৮)	বাণিজ্য ও বেসরকারি খাত উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ।	প্রকৃত খাত সূচক	৪
		রাজস্ব সূচক	৩
		বাহ্যিক খাত সূচক	৩
		মুদ্রা ও আর্থিক খাত	২
		মূল্য স্তর /মুদ্রা স্ফীতি	১
দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস (এসডিজি -১ ও ১০)	সকল জনগোষ্ঠী ও এলাকায় দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস	দারিদ্র্য	২
		সামাজিক সুরক্ষা	১
		আয়/ভোগ অসমতা	১
কর্মসংস্থান (এসডিজি-৮)	টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীল ও শোভন কাজের সুযোগ বৃদ্ধি	কর্মসংস্থানের পরিমাণ,গুণগতমান এবং নিরাপত্তা	৫
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব (এসডিজি-১৭)	টেকসই উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশিদারীত্ব শক্তিশালীকরণ।	বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ও গুণগতমান	২
আ. খাতভিত্তিক উন্নয়ন অভীষ্ট ও নির্দেশক			
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি-৩)	প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা,বিশেষ করে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ স্বাস্থ্যখাতে টেকসই উন্নয়ন	মৃত্যু/আয়ু	৪
		নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য	৩
		জন্মহার ব্যবস্থাপনা	২
		বহুল সংক্রামক রোগ প্রতিকার	৩
		শিশু পুষ্টি	৩
গুণগত শিক্ষা (এসডিজি-৪)	দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সবার জন্য গুণগত শিক্ষা	শিক্ষার পরিমাণ	৩
		শিক্ষার গুণগতমাণ	২
		শিক্ষার অর্থায়ন	২
কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (এসডিজি-২)	খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার জন্য টেকসই কৃষির উন্নতিবিধান	কৃষি মূল্য সংযোজন এবং গঠন	১
		কৃষি অর্থায়ন	১
		খাদ্য নিরাপত্তা	১
নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (এসডিজি-৬)	সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা	সুপেয় পানি	১
		স্যানিটেশন	১
		আন্তঃসীমান্ত পানি	১
পরিবহন ও যোগাযোগ (এসডিজি-৯)	উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন অবকাঠামোর উন্নতি	পরিবহন নেটওয়ার্ক পরিমাণ	৭
		আন্তঃ মডেল পরিবহন ভারসাম্য	১
বিদ্যুৎ, জ্বালানি,ও খনিজ সম্পদ (এসডিজি-৭)	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহারের টেকসইতা নিশ্চিতকরণ	বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অভিগম্যতা	৩
		নবায়নযোগ্য শক্তি	২
জেন্ডার ও সামাজিক অসমতা (এসডিজি-৫ এসডিজি-১০)	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন	জেন্ডার সমতা	৯
		সামাজিক সমতা	১
পরিবেশ,জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা (এসডিজি-১৩, ১৪ ও ১৫)	অবক্ষয়ের হাত থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা এবং একটি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল বিদ্যমান রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রতিকার করা	জলবায়ু পরিবর্তন	২
		পরিবেশগত সুরক্ষা	৪
		বাতাসের গুণগতমান	১
		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)	টেলিফোন ও ব্রডব্যান্ড সেবাসমূহের মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা	সেবার পরিমাণ	৪
নগর উন্নয়ন (এসডিজি-১১)	নগর দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং উত্তম নগর ব্যবস্থাপনার এবং সেবার উন্নতির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করা	নগর সেবা ও অভিগম্যতা	৪

জাতীয় অগ্রাধিকার	ফলাফল বিবরন	সূচক	সূচকের সংখ্যা
গভর্ন্যান্স (এসডিজি-১৬)	অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নতিবিধান এবং সবার জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ	বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা	৩
		ই-ক্রয়	১
		তথ্য অধিকার	১
		বিকল্প সমস্যা নিরসন	১
		শিশু সুরক্ষা	১
		মানব পাচার	২
		সরকারি সেবার গুণগতমান	১

উপরের সংক্ষিপ্ত সারণিতে ডিআরএফ-এর প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল বিষয়কে ধারণ করা হয়েছে। এই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা বিধানে সহায়তা করবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মধ্যে ভারসাম্য এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক লক্ষ্যের মধ্যে কৌশলগত সংযোগসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই ডিআরএফ-এ প্রদত্ত অগ্রগতি সূচকসমূহ অর্জিত হলে পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে।

৬.৩ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোকে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাকে বাংলাদেশের উপযোগী করে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়।

৬.৩.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ভূমিকা

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফোকাল পয়েন্ট হলো জিইডি। জিইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর অত্যধিক জোর প্রদানের ফলেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি জীবন্ত দলিলে পরিণত হয়েছে, এ দলিলকে মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে হালনাগাদ করা হয় এবং এর সমাপ্তি মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও জিইডি এ ধারা অনুসরণ করবে। এছাড়াও জিইডি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/ বিভাগভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করবে। জাতীয় এসডিজি কর্ম পরিকল্পনার পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত নিয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে অর্থবছর ২০২১-২০২৫ মেয়াদে গৃহীতব্য প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ চিহ্নিত করে সংশোধিত এসডিজি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিআরএফ এর পাশাপাশি সংশোধিত এসডিজি কর্ম পরিকল্পনাকেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে ।

জিইডি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে, যা একটি মাইলফলক।এ প্রশিক্ষণ শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতাই বৃদ্ধি করেনি বরং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে আরো কার্যকরভাবে বুঝতে ও কাজে লাগাতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে জিইডি আরো বড় পরিসরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন অব্যাহত রাখবে। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়নে জিইডি কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে, যাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের করনীয় সম্পর্কে জানতে পারে এবং কি কি অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়সমূহকে দায়িত্ব আরোপের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট ও জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে একদিকে যেমন সংযোগ শক্তিশালী করেছে, অন্যদিকে তেমন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে জড়িত করার মাধ্যমে সামষ্টিক ও অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যেও সংযোগ শক্তিশালী করেছে। পরিকল্পনা কমিশন সঠিকভাবেই অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর আলোকপাত করেছে। জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রধান প্রধান নীতিসমূহ বাস্তবায়নের ফলাফল নিরূপনই, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য। এই সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর মূলত দুইটি পৃথক কাঠামো সমষ্টি। একটি হলো খাতভিত্তিক যা বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়, অন্যটি হলো বিনিয়োগ প্রকল্পভিত্তিক, যা আইএমইডি দ্বারা পরিচালিত হয়।

৬.৩.২ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রকল্প নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাসমূহ খুঁজে বের করতে সম্পূর্ণ প্রকল্পের পদ্ধতিগত পর্যালোচনা পরিচালনায় এবং সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির উন্নয়ন প্রভাব শক্তিশালীকরণে আইএমইডি বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে যদিও আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়ে গেছে। এডিপির সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও পর্যালোচনাপূর্বক কীভাবে সরকারি বিনিয়োগের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা যায়, তার উপায় খুঁজে বের করাটা জরুরি, বিশেষ করে কোভিড-১৯ কালিণ ভয়াবহ সম্পদ ঘাটতির কারণে আরো বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।

আইএমইডিকে পরীক্ষামূলক এবং অ-পরীক্ষামূলক উভয় ধরণের উপাত্তের সাহায্য নিয়ে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণ করতে হবে যাতে তা শুধু প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিরূপণে সীমাবদ্ধ না থেকে, এর সামগ্রিক প্রভাব নিরূপণ করা যায়। আইএমইডি তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দিবে, গবেষণালব্ধ জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশেজ্ঞদের সাথে আন্তঃ সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

৬.৩.৩ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিকে গতিশীলতা দান করতে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো বড় ভূমিকা পালন করে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর পরিকল্পনা অনুবিভাগ এ কাজটি সম্পাদনের দায়িত্বে থাকে। এই ক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কিছু অগ্রগতি সাধিত হলেও অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা আরো উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার অভাব এখনো রয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও সময়মতো পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী পরিকল্পনার অগ্রগতি কী, ব্যর্থতা কোথায়, এ ব্যর্থতা কীভাবে দূর করা যায়, এমন কোন বিশ্লেষণ সময়মতো পাওয়া না যাওয়ার কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে যথাযথ ইনপুট প্রদান করা যায় না। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালগুলো এমটিবিএফ প্রণয়নে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করলেও এই বাজেটের সাথে মধ্যমেয়াদি বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সংযোগ সাধনের কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদনের ওপর জোর দিতে হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুশীলনের জন্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে আরো সক্ষম করে গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত একটা সক্ষমতা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উল্লেখ থাকবে। দ্বিতীয়, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর উন্নতি সাধন করতে হবে। তৃতীয়, বাস্তবায়নকারী মন্তণালয়গুলোর পরিকল্পনা শাখাকে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি সরবরাহের মাধমে শক্তিশালী করা হবে। যাতে তা প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন ও তথ্য উপাত্ত সরবরাহে সক্ষম হয়ে উঠে এবং সর্বশেষে, খাতভিত্তিক তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন এবং ওয়েবসাইটে তা প্রকাশের জন্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.৩.৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

২০১৩ সালের পরিসংখ্যান আইন অনুসারে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায়ে উপাত্ত প্রদানকারী মূল প্রতিষ্ঠান। বিবিএস এর ভূমিকা ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে জাতীয়, জেলাভিত্তিক ও খাতভিত্তিক বিভিন্ন উপাত্ত সরবরাহে বিবিএস এর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি বিবিএস এর সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। প্রকতপক্ষে, যথাযথ নীতি প্রণয়ন, গবেষণা পরিচালনা ও একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো যথাসময়ে উপাত্ত প্রাপ্তি। আর তা নিশ্চিতকরনে প্রয়োজন বিবিএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিবিএস এর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সময়োপযোগী ও মানসম্মত উপাত্ত প্রাপ্তিতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। আর এ জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করবে: প্রথমত, বিবিএস-কে শক্তিশালীকরণের কৌশলগত নির্দেশনা, নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অন্তর্ভুক্ত করে "ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর দ্যা ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা স্ট্যাটিস্টিক্স (এনএসডিএস)" নামক একটা দলিল বিবিএস কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। এ দলিল বাস্তবায়নে ৭ম পরিকল্পনায় কিছু অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ক্রয়ে শ্লথগতির কারণে কিছুটা বাঁধাগ্রস্ত হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বাঁধাসমূহ দূরীকরণে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, নিয়মিত ও ঘন ঘন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুশীলন সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিবিএস স্বল্প পরিসরে কিছু কিছু জরিপ পরিচালনা করবে। সামর্থ্য তথা আর্থিক সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় বড় আকারে বার্ষিক জরিপ পরিচালনা কঠিন হবে। তাই বিকল্প হিসেবে অনেক ছোট পরিসরে অপেক্ষাকৃত স্বল্প নমুনা এবং ছোট জরিপ এলাকা নিয়ে অন্তবর্তী জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে। এই জরিপগুলো থেকে

প্রাপ্ত উপাত্ত বিদ্যমান বড় আকারের জরিপগুলোর অন্তবর্তীকালীণ সময়ের উপাত্ত চাহিদা এবং কিছু কিছু নির্ধারিত সূচকের নিয়মিত পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে। বার্ষিক জরিপের ব্যয় চাহিদা বিবেচনায়, ব্যয় সীমাবদ্ধতার আলোকে বার্ষিক জরিপের পরিবর্তে দ্বিবার্ষিক জরিপ পরিচালনা করা হবে। এতে করে সীমিত সামর্থ্য দিয়েও অধিকতর পরিবীক্ষণ সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, ন্যাশনাল একাউন্টস্ পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করবে। এছাড়া বিবিএস ত্রৈমাসিক জিডিপি ডাটা উপস্থাপনার ওপর আলোকপাত করবে। এতে করে নীতিনির্ধারকরা প্রকৃত সময় ভিত্তিতে আর্থিক ও রাজস্ব নীতির পরিবর্তনসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবে। এলোকেশন অব বিজনেস, ১৯৯৬ (এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত), পরিসংখ্যান আইন,২০১৩ এবং এসএসডিএস অনুসারে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ" পপুলেশান রেজিস্টার (এনপিআর) প্রণয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। কার্যকর সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একটা স্বতন্ত্র আইডি নম্বরসহ দেশের প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য সরবরাহ করতে জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় হিসেবে বিবিএস এনপিআর প্রণয়ন ও হালনাগাদ করবে।

চতুর্থত, যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি প্রশাসন ও সেবাসরবরাহে আরো বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির দিকে ধাবিত হয়েছে, সেহেতু জেলাপর্যায়ে প্রচার ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার উত্তম উলব্ধিতে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেক আগে, বিবিএস জেলা পর্যায়ে জিডিপি তৈরি করতো। এটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী তৈরি করতো। বিবিএস জেলা পর্যায়ের উৎপাদন এবং আর্থিক বিবরণী সংকলন শুরু করবে।

পরিশেষে, বিবিএস উপাত্তের গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দেওয়া হবে। পারিবারিক আয় ও মজুরিসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

- দুটো পর্যালোচনা পরিচালনা করা হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যাতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়। ১ম পর্যালোচনাটি হবে ৮ম পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা এবং ২য় টি হবে সমাপ্তি পর্যালোচনা।
- মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা করা হবে অর্থবছর ২০২৩ এ। এটি সরকারকে মধ্যমেয়াদে অগ্রগতি এবং ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহের মাত্রা বুঝতে সহায়তা করবে অবশিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলে কোন পরিবর্তন আনতে হবে কিনা তা বুঝতে সহায়তা করবে।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সাথে শেয়ার করা হবে।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার টেকসহিতা

ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার টেকসই অনেকগুলো উপাদানের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত একটি কার্যকর ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই ব্যবস্থার জন্য সরকারি নীতিতে এর উপযোগিতা ও অকৃত্রিম চাহিদার প্রতিফলন থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এমঅ্যান্ডই-র জন্য ব্যবহৃত তথ্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য- হতে হবে, তথ্য সংগ্রহে আনুষ্ঠানিক রীতি বজায় রাখতে হবে এবং এর বিতরণ অবশ্যই ব্যবহার-বান্ধব হতে হবে। তৃতীয়ত, এমএন্ডই প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিতে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সরকার ফলাফলভিত্তিক এমঅ্যান্ডই-র জন্য চাহিদা ও প্রণোদনা উভয়ই নিশ্চিত করতে পারে। সর্বশেষে, অব্যাহত নিরবচ্ছিন্ন সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

অধ্যায় ৬: পরিশিষ্ট সারণি

সারণি ক ৬.১: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ)

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	জাতীয় অগ্রাধিকার: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি-৮)									
	ফলাফল বিবরণ: বাণিজ্য ও বেসরকারি খাত উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উন্নয়নে সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ									
	প্রকৃত খাত									
১	মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	BBS, SID	FD	৩.৮৫ (২০২০)	৬.০৬	৬.৪৬	৬.৭৮	৭.১৩	৭.৩৩	এসডিজি ৮.১.১
২	মোট জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির % হিসেবে)	BBS, SID	IRD, BB	৩০.১১ (২০২০)	৩১.৪৩	৩১.১৭	৩২.২৯	৩৩.০৩	৩৪.৪২	
৩	মোট বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে) (ক) বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে) (খ) সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির % হিসেবে) (গ) বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) (জিডিপির % হিসেবে)	BBS, SID	MoI, BIDA, FD, BB	৩১.৭৫ (ক) ২৩.৬৩ (খ) ৮.১২ (গ) ০.৫৪ বিবিএস (২০১৯)	৩২.৫৬ (ক) ২৪.৪১ (খ) ৮.১৫ (গ) ০.৮৩	৩২.৭৩ (ক) ২৪.৫৩ (খ) ৮.২০ (গ) ১.৩৫	৩৪.০০ (ক) ২৫.৩২ (খ) ৮.৬৮ (গ) ১.৯০	৩৪.৯৪ (ক) ২৬.০৮ (খ) ৮.৮৬ (গ) ২.৫০	৩৬.৫৯ (ক) ২৭.৩৫ (খ) ৯.২৪ (গ) ৩.০০	
৪	মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউএস ডলারে)	BBS, SID		২০৬৪ (বিবিএস ২০২০)	২১৭০	২৩৪৫	২৫৫৫	২৭৯০	৩০৫৯	
	রাজস্ব খাত									
৫	মোট রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে) (ক) কর রাজস্ব (জিডিপির % হিসেবে)	NBR, BB	NBR, IRD	৯.৪ (ক) ৭.৮৯ (এফডি ২০২০)	১০.১৮ (ক) ৯.০২	১১.১০ (ক) ৯.৮০	১২.০০ (ক) ১০.৬০	১২.৮৬ (ক) ১১.২৬	১৪.০৬ (ক) ১২.২৬	
৬	সরকারি ব্যয় (জিডিপির % হিসেবে)	BB, FD	BB, FD	১৪.৮৬ (২০২০)	১৭.০৬	১৬.৯১	১৭.৫৭	১৭.৯০	১৯.১০	
৭	সরকারি বাজেট ঘাটতি(অনুদানসহ) (জিডিপির % হিসেবে)	BB, FD	FD	৫.৩৯ (২০২০)	৬.৮০	৫.৭৫	৫.৫২	৫.০০	৫.০০	
	বাহ্যিক খাত									
৮	রপ্তানি (জিডিপির % হিসেবে)		BBS, SID	১২.২৫ (২০২০)	১২.৮৩	১২.৮৩	১২.৭৯	১২.৭৩	১২.৬৪	
৯	আমদানি (জিডিপির % হিসেবে)		MoC	১৮.৩১ (২০২০)	১৮.৭৯	১৮.৭৭	১৮.৭৪	১৮.৭৩	১৮.৭৪	
১০	প্রবাসী আয় (জিডিপির % হিসেবে)	BB	BB, MoEWOE	৫.৪৬ (২০২০)	৫.৫১	৫.৩৬	৫.২০	৫.০২	৪.৮৪	

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	মুদ্রা/আর্থিক খাত									
১১	ব্রডমানি (এম২) প্রবৃদ্ধি (%)	BB, FD BBS, SID	BB, FD	১২.৬৪ (২০২০)	১৩.৭২	১৩.৯৬	১৩.৮৩	১৩.৪১	১৩.৫০	
১২	বেসরকারি খাত ঋণ প্রবৃদ্ধি (%)	BB, FD BBS, SID	BB, FD	১৩.১৪ (২০২০)	১৪.২২	১৪.৪৬	১৪.৩৩	১৪.১৭	১৪.১৮	
	মূল্য									
১৩	সিপিআই মূল্যস্ফীতি হার (বার্ষিক গড়)	BB, FD BBS, SID	BB, SID	৫.৬৫ (২০২০)	৫.১০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০	
	জাতীয় অগ্রাধিকার: দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস (এসডিজি -১ এবং ১০)									
	ফলাফল বিবরণ: সকল জনগোষ্ঠী ও এলাকার দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাস									
১৪	জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত	BBS, SID	CD, GED	ইউপিএল: ২০.৫% এলপিএল: ১০.৫% (২০১৯, বিবিএস)	ইউপিএল: ২৩.০০% এলপিএল : ১২.০%	ইউপিএল ২০.০০% এলপিএল : ১০.০%	ইউপিএল : ১৮.৫০% এলপিএল : ৯.১%	ইউপিএল : ১৭.০০% এলপিএল : ৮.৩%	ইউপিএল : ১৫.৬০% এলপিএল : ৭.৪%	এসডিজি: ১.২.১
১৫	জাতীয় সংজ্ঞা অনুসারে সকল মাত্রায় দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সকল বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুদের অনুপাত	BBS, SID GED	GED	এমপিআই: ০.১৬৮ মাথাগুণতি অনুপাত: ৩৬.১০ তীব্রতা: ৪৬.৫						এসডিজি: ১.২.২
১৬	সামাজিক সুরক্ষার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর অনুপাত	BBS, SID	CD, GED	২৭.৮% (এইচআইইএস, ২০১৬)	৩২.১২%	৩২.৮৪%	৩৩.৫৬%	৩৪.২৮%	৩৫.০০%	এসডিজি ১.৩.১
১৭	অসমতার মাত্রা(জিনি সহগ) (ক) আয় অসমতা (খ) ভোগ অসমতা BBS GED; SID	BBS	GED; SID	(ক) ০.৪৮ (খ) ০.৩২ (এইচআইইএস,, ২০১৬)	(ক) ০.৪৬২ (খ) ০.৩০২	(ক) ০.৪৫৯ (খ) ০.২৯৯	(ক) ০.৪৫৬ (খ) ০.২৯৬	(ক) ০.৪৫৩ (খ) ০.২৯৩	(ক) ০.৪৫০ (খ) ০.২৯০	
	জাতীয় অগ্রাধিকার: স্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি-৩)									
	ফলাফল বিবরণ: প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, বিশেষ করে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ স্বাস্থ্যখাতের টেকসই উন্নয়ন									
১৮	মাতৃ মৃত্যু অনুপাত (প্রতি এক লাখে)	BBS	HSD	১৬৫ (এসভিআরএস, ২০১৯)	১৩৯	১২৯	১২০	১১০	১০০	এসডিজি ৩.১.১
১৯	দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা উপস্থিতিতে শিশু জন্মের অনুপাত (%)	BBS	HSD	৫৯ (এমআইসিএস, ২০১৯)	৬২.৫০	৬৪.৮৭	৬৭.২৫	৬৯.৬২	৭২.০০	এসডিজি ৩.১.২

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
২০	৫ বছরের নীচে শিশু মৃত্যুর হার	BBS	HSD	২৮.০০ (এমভিআরএস, ২০১৯)	২৭.৮০	২৭.৬০	২৭.৪০	২৭.২০	২৭.০০	এসডিজি ৩.১.৩
২১	নবজাতক মৃত্যু হার	BBS	HSD	১৫.০০ (এসভিআরএস, ২০১৯)	১৪.৮০	১৪.৬০	১৪.৪০	১৪.২০	১৪.০০	এসডিজি: ৩.১.৪
২২	৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বাকৃতির শিশুর অনুপাত (%)	BBS	HSD	২৮.০ (এমআইসিএস ২০১৯)	২৪.৫৭	২৩.৪৩	২২.২৮	২১.১৪	২০.০	এসডিজি: ২.২.১
২৩	অপুষ্টির অনুপাত (%)	BBS	HSD	১৩.০ (এফএও ২০১৯)	১২.৫	১২	১১.৫	১১	১০.৫	এসডিজি: ২.১.১
২৪	৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে অপুষ্টির অনুপাত (কৃশকায় ও অতিরিক্ত ওজনের শিশু)	BBS	HSD	কৃশকায়: ৯.৮% অতিরিক্ত ওজনঃ: ২.৪% (এমআইসিএস ২০১৯)	৮.৬ ১.৮	৮.২ ১.৬	৭.৮ ১.৪	৭.৪ ১.২	৭.০% ১.০%	এসডিজি: ২.২.২
২৫	গড় আয়ুষ্কাল	BBS	HSD	৭২.৬ (এসভিআরএস, ২০১৯)	৭৩.০৩	৭৩.২৭	৭৩.৫১	৭৩.৭৫	৭৪.০০	
২৬	মোট উর্বরতা হার (টিএফআর)	BBS	HSD	২.০৪ (এসভিআরএস, ২০১৯)	২.০৩	২.০২	২.০১	২.০১	২.০০	
২৭	প্রজনন বয়সের নারীদের (১৫-৪৯ বছর) অনুপাত, যারা আধুনিক পদ্ধতিতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট	BBS	HSD	৭৭.৪% (এমআইসিএস ২০১৯)	৭৮%	৭৮.৫%	৭৯%	৭৯.৫%	৮০%	এসডিজি ৩.৭.১
২৮	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিস্তার হার (%)	BBS	HSD	৬৩.৪ (এসভিআরএস, ২০১৯)	৬৮.২	৬৯.৯	৭১.৬	৭৩.৩	৭৫.০	
২৯	জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সকল ভ্যাকসিন গ্রহণকারীর অনুপাত (≤১২ মাস বয়সের শিশুরা)	NIPORT	HSD	৮৫.৬০% (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)	৯১.৮০%	৯৩.৩৫%	৯৪.৯০%	৯৬.৪৫%	৯৮.০০%	এসডিজি: ৩. খ.১
৩০	সম্পদ কুইন্টাল অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু অনুপাত (সবচেয়ে উচ্চ এবং সবচেয়ে নিম্ন কুইন্টালের অনুপাত)	NIPORT	HSD	১:৩.০০ (বিডিএইচএস ২০১৭-১৮)	১:২.৩৬	১:২.১৪	১:১.৯৯	১:১.৭১	১:১.৫০	
৩১	যক্ষ্মার হার (প্রতি ১০০,০০০ হলে)	WHO	HSD	২২১ (ডব্লিউএইচও ২০১৯)	১৫৫	১৫০	১৪৩	১২৮	১১২	এসডিজি: ৩.৩.২

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
৩২	হৃদ রোগ,ক্যান্সার ,ডায়াবেটিস কিংবা শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মৃত্যু হার	WHO	HSD	২১.৬% (ডব্লিউএইচও , ২০১৯)	১৯.২%	১৮.৬%	১৮.০%	১৭.৪%	১৬.৮%	এসডিজি ৩.৪.১
	জাতীয় অগ্রাধিকার: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশান (এসডিজি-৬)									
	ফলাফল বিবরণ: সবার জন্য নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটেশান নিশ্চিত করা									
৩৩	নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় সুপেয় পানি সেবা ব্যবহারকারী জনগণের অনুপাত	BBS, SID	LGD	জাতীয়: ৪২.৬% নগর: ৩৭.৯% গ্রামীণ: ৪৪.০% (এমআইসিএস ২০১৯)	৪৮%	৫৫%	৬২%	৬৮%	৭৫%	এসডিজি: ৬.১.১
৩৪	নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশান সেবা ব্যবহারকারী জনগণের অনুপাত	BBS, SID	LGD	জাতীয়: ৬৪.৪ নগর: ৬৪.৭ গ্রামীণ: ৬৪.৩ (এমআইসিএস ২০১৯)	৬৭%	৭০%	৭৪%	৭৭%	৮০%	এসডিজি ৬.২.১
৩৫	পানি বিষয়ক সহযোগিতার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনাসহ আন্তঃ সীমান্ত অববাহিকা এলাকার অনুপাত	a) MoWR b) MoFA	MoWR, MoFA	৩৮% (জেআরসি, ২০১৮)	৪০%	৪০%	৪১%	৪১%	৪১%	এসডিজি ৬.৫.২
	জাতীয় অগ্রাধিকার: গুণগত শিক্ষা (এসডিজি-৪)									
	ফলাফল বিবরণ: দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সবার জন্য গুণগত শিক্ষা									
৩৬	শিক্ষা সম্পন্নের হার (প্রাথমিক শিক্ষা,নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা,উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা)	BANBEIS	MoPME SHED	ক) ৮২.১ (এপিএসসি ২০১৯) খ) ৬৪.৯৮ গ) ৮১.৪৫ (বিইএস ২০১৯)	ক) ৮৪.০০ খ) ৬৫.৩৫ গ) ৮২.১৩	ক) ৯০.০০ খ) ৬৫.৭৫ গ) ৮২.৬১	ধ) ৯০.০০ ন) ৬৬.৫৩ প) ৮৩.০৮	ক) ৯১.০০ খ) ৬৭.৩১ গ) ৮৩.৫৫	ক) ৯২.০০ খ) ৭০ গ) ৮৫	এসডিজি ৪.১.২
৩৭	স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক পরিপুষ্টতায় উন্নতির ধারায় রয়েছে এমন অর্নূধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত	BBS, SID	MoPME	জাতীয়: ৭৪.৫০% (এমআইসিএস, ২০১৯)	৭৬.৩০%	৭৭.২৫%	৭৮.১৭%	৭৯.০৮%	৮০.০০%	এসডিজি ৪.২.১
৩৮	প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির সংখ্যা (লিঙ্গভেদে)	DPE	MoPME	বালক: ৫৪৪৪২ বালিকা: ৪৩৮৬৯ মোট: ৯৮৩১১ (এপিএসসি-২০১৯)	৫৫০০০ ৪৫০০০ ১০০০০০	৫৬০০০ ৪৯০০০ ১০৫০০০	৫৬০০০ ৫০০০০ ১০৬০০০	৫৬০০০ ৫০০০০ ১০৬০০০	৫৬৫০০ ৫০০০০ ১০৬৫০০	

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
৩৯	ক) বিদ্যুৎ, (খ) শিক্ষাদানের জন্য ইন্টারনেট, (গ) শিক্ষাদানের কাজে কম্পিউটার, (ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো ও উপকরণাদি (ঙ) নিরাপদ সুপেয় পানি, (চ) পৃথক স্যানিটেশান সুবিধা, (ছ) হাত ধোয়ার (ওয়াশা সূচকের সংজ্ঞানুযায়ী) সুবিধা সম্বলিত বিদ্যালয়ের অনুপাত	a) BANBEIS, MoE b) DPE, MoPME c) DPE, MoPME	MoPME, SHED	প্রাথমিক (ক) ৮৭.৭৩% (খ) ৭৬.৮৩% (গ) ৭৯.৮৩% (ঘ) ৬১.৪৪% আইএমডি,ডিপিই -২০১৯) (ঙ) ৯৭% বিদ্যালয় (চ) ৭৬.২৪% বিদ্যালয় (ছ) ২৬% (এপিএসসি, ২০১৯) মাধ্যমিক ক) ৯৩.২৫ খ) ৩৭.৬৪ গ) ৭৬.৭২ ঘ) ১৮.৪৮ ঙ) ৯৭.০৭ চ) ৯৫.৯৩ ছ) ২৮.৬৬ ২০১৯)	প্রাথমিক ক) ৯০% (খ) ৮০% (গ) ৮২% (ঘ) ৬৫% (ঙ) ৯৮% (চ) ৮০% (ছ) ৪২% মাধ্যমিক (ক) ৯৫.৯২ (খ) ৩৯.৫৯ (গ) ৭৯.৬৩ (ঘ) ২১.১৪ (ঙ) ৯৭.৬০ (চ) ৯৬.৩৬ (ছ) ৩৬.৩৩	প্রাথমিক (ক) ৯২% (খ) ৮৩% (গ) ৮৪% (ঘ) ৭০% (ঙ) ৯৮% (চ) ৮৪% (ছ) ৫৮% এাধ্যমিক (ক) ৯৬.০০ (খ) ৪০.৭৬ (গ) ৭৮.৮০ (ঘ) ২২.২৩ (ঙ) ৯৭.৮৩ (চ) ৯৬.৫৫ (ছ) ৪০.৮২	প্রাথমিক (ক) ৯৪% (খ) ৯০% (গ) ৯০% (ঘ) ৭৫% (ঙ) ৯৯% (চ) ৮৬% (ছ) ৭৭% মাধ্যমিক (ক) ৯৭.০৮ (খ) ৪২.০৮ (গ) ৭৭.৯৭ (ঘ) ২৩.৩১ (ঙ) ৯৮.০৬ (চ) ৬৯.৭৪ (ছ) ৪৫.৩১	প্রাথমিক (ক) ৯৫% (খ) ৯৫% (গ) ৯৫% (ঘ) ৮০% (ঙ) ১০০% (চ) ৯০% (ছ) ৯১% এাধ্যমিক (ক) ৯৭.৯০ (খ) ৪৩.৩৭ (গ) ৭৭.১৪ (ঘ) ২৪.৩৯ (ঙ) ৯৮.২৯ (চ) ৯৬.৯৩ (ছ) ৪৯.৮০	প্রাথমিক (ক) ১০০% (খ) ১০০% (গ) ১০০% (ঘ) ৮০% (ঙ) ৯৫% বিদ্যালয় (ভ) ৮৫% বিদ্যালয় (ম) ১০০% মাধ্যমিক (ক) ১০০% (খ) ৫০% (গ) ১০০% (ঘ) ৮০% (ঙ) ১০০% (চ) ১০০% (ছ) ৭০%	এসডিজি: ৪. ক.১
৪০	শিক্ষার স্তর অনুযায়ী ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের অনুপাত	a) BANBEIS, MoE b) DPE, (MoPME	MoPME, SHED	(ক) প্রাক প্রাথমিক: (খ) প্রাথমিক ৮০.০৬% (এপিএসসি, ২০১৫) (গ) নিম্ন মাধ্যমিক ৬২.০১% (ঘ) উচ্চ মাধ্যমিক: ৫৯.০১% (২০১৯)	(ক) নিম্ন মাধ্যমিক (৭১.১৫%) (খ) উচ্চ মাধ্যমিক: ৬৯.৯২%	(ক) নিম্ন মাধ্যমিক ৭৪.২৬% (খ) উচ্চ মাধ্যমিক: ৭৩.২৬%	(ক) নিম্ন মাধ্যমিক ৭৯.৩৪% (খ) উচ্চ মাধ্যমিক: ৭৬.৩৪%	(ক) নিম্ন মাধ্যমিক ৮২.২% (খ) উচ্চ মাধ্যমিক :৭৮.৫৬%	(ক) নিম্ন মাধ্যমিক ৮৫% (খ) উচ্চ মাধ্যমিক: ৮০.০০%	এসডিজি ৪.গ.১
৪১	জিডিপির % হিসেবে সরকারি শিক্ষা ব্যয়	MoE, FD	MoE, FD	২.২	২.৩	২.৫	২.৬	২.৮	৩.০	
৪২	খাত ও অধ্যয়নের ধরণ অনুযায়ী বৃত্তির জন্য সরকারিভাবে উন্নয়ন সহায়তা প্রবাহের পরিমাপ	ERD	ERD	৮.৭৬ মিলিয়ন ডলার (২০১৫, ইআরডি)	১৫.৫০ মিলিয়ন ডলার	১৬.৬০ মিলিয়ন ডলার	১৭.৮০ মিলিয়ন ডলার	১৮.৯০ মিলিয়ন ডলার	২০.০০ মিলিয়ন ডলার	এসডিজি. ৪.খ.১

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	জাতীয় অগ্রাধিকার: কর্মসংস্থান (এসডিজি-৮)									
	উলাফল বিবরণ: টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীল ও শোভন কাজের সুযোগ বৃদ্ধি।									
৪৩	প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	BBS, SID		৫.৮৫% বিবিএস ২০১৮-১৯)	-	-	-	-	৫.৫%	এসডিজি: ৮.২.১
৪৪	খাত ও লিঙ্গ ভেদে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত	BBS , SID		মোট ৭৮.০% (পুঃ ৭৬.০%, মঃ ৮৫.৫%) (এলএফএস ২০১৬-১৭)	৭৭.৫	৭৭.০	৭৬.৫	৭৬	মোট: ৭৫%	এসডিজি: ৮.৩.১
৪৫	লিঙ্গ, বয়স এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিভেদে বেকারত্বের হার	BBS , SID		লিঙ্গভেদে পুরুষ ৩.১% নারী ৬.৭%	-	-	-	-	লিঙ্গভেদে পুরুষ ০.৮% নারী ২.১%	এসডিজি ৮.৫.২
				বয়সভেদে ১৫-২৪ বছর: ১২.৩ % ২৫-৩৪ বছর: ৫.৭% ৩৫-৪৪ বছর: ১.২% ৪৫-৫৪ বছর: ০.৮% ৫৫+বছর: ০.৬% এলএফএস ২০১৬-১৭	-	-	-	-	বয়সভদে ১৫-১৭ বছর ৫.৪ % ১৮-২৪ বছর ৪.৪% ২৫-২৯ বছর ৩.০% ৩০-৬৪ বছর ১.০% ৬৫+ বছর ০.২৪%	
৪৬	শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষনের সাথে যুক্ত নেই এমন (১৫-২৪ বছর) তরুণদের অনুপাত	BBS, SID		মোট ২৬.৮% পুরুষ: ৯.২% নারী: ৪৩.৯% এলএফএস ২০১৬-১৭	-	-	-	-	১২%	এসডিজি: ৮.৮.১
৪৭	লিঙ্গ ও অভিবাসনগত অবস্থাভেদে প্রানঘাতি ও অ-প্রানঘাতি পেশাগত দুর্ঘটনা সংঘটনের হার	a) DIFE, MoLE b) BBS , SID c) BMET, MoEWOE		ক) প্রানঘাতি: ২২৮ পুরুষ: ২২০ নারী: ৮ খ) অপ্রানঘাতি: ১১১ পুরুষ: ৯৪; নারী: ১৭ ডিআইএফই, ২০১৯	ক) প্রানঘাতি: ১৬৩ পুরুষ: ১৯৯; নারী: ৮ খ) অপ্রানঘাতি: ১০০ পুরুষ: ৮৫; নারী: ১৫	ক)প্রানঘাতি: ১৪৭ পুরুষ: ১৪০ নারী: ৭ খ) অপ্রানঘাতি: ৯০ পুরুষ: ৭৬; নারী: ১৪	ক)প্রানঘাতি: ১৩০ পুরুষ: ১২৪ নারী: ৬ খ) অপ্রানঘাতি: ৮০ পুরুষ: ৬৮; নারী: ১২	ক)প্রানঘাতি: ১১৪ পুরুষ: ১০৮ নারী: ৬ খ) অপ্রানঘাতি: ৭০ পুরুষ: ৬০; নারী: ১০	ক)প্রানঘাতি: ৯৮ পুরুষ: ৯৩ নারী: ৫ খ) অপ্রানঘাতি: ৬০ পুরুষ: ৫১; নারী: ৯	

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	জাতীয় অগ্রাধিকার: কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (এসডিজি-২)									
	ফলাফল বিবরণ: খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সমৃদ্ধ দেশ হওয়ার জন্য টেকসই কৃষির উন্নতিবিধান									
৪৮	কৃষিখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	BBS, DAE, DLS, DoF, BFD	MoA	৩.১.১ বিবিএস ২০২০	৩.৪৭	৩.৮৩	৪.১০	৪.০০	৩.৯০	
৪৯	কৃষি গবেষণায় বরাদ্দকৃত কৃষি বাজেটের হার (%)	MoA	MoA	৮.৩৫ (২০২০)	৯.১৯	১০.১০	১১.১১	১২.২৩	১৩.৪৫	
৫০	খাদ্য নিরপত্তাহীনতা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মাপকাঠির (এফআইইএম) ভিত্তিতে জনগণের মাঝারি বা তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপকতা	BBS	MoFood	মাঝারি : ৩০.৫% তীব্র: ১০.২% (FAO 2019)	মাঝারি : ২৮% তীব্র :১০%	মাঝারি : ২৭% তীব্র: ৯%	মাঝারি : ২৬% তীব্র: ৮%	মাঝারি : ২৫% তীব্র: ৭%	মাঝারি : ২৪.২% তীব্র: ৬%	এসডিজি ২.১.২
	জাতীয় অগ্রাধিকার: পরিবহন ও যোগাযোগ (এসডিজি ৯)									
	ফলাফল বিবরণ: উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন									
৫১	নির্ধারিত চার-লেন সড়কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	RHD	MoRTB	৩০ (২০১৯)	৫০	৫০	১৫০	১০০	২০০	
৫২	ভালো ও উন্নত অবস্থার সওজ-এর সড়ক, নেটওয়ার্কের অংশ (নেটওয়ার্কের %)	RHD	MoRTB	৮১.৪% (২০২০)	৮৪%	৮৭%	৯০%	৯২.৫%	৯৫%	
৫৩	মেট্রোরেল ট্র্যানজিট (এমআরটি) নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	DTCA	MoRTB	০ (২০১৫)	০	২০	২২	৩০	৪৫	
৫৪	ভালো ও উন্নত অবস্থার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক	LGED	LGD, MoLGRDC	৩৮ % (২০১৯)	৪৩%	৪৮%	৫২%	৫৫%	৫৭%	
৫৫	নির্ধারিত নতুন রেলপথ নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি))	BR	MoR	২৯৫৫ (২০১৮)	৩৪০০	৩৫০০	৩৬০০	৩৭০০	৩৮০০	
৫৬	নির্ধারিত নতুন ডাবল রেলপথ নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	BR	MoR	১১০.৫	১৫০	১৮২	৫৪০	৯০১	১১১০.৫	
৫৭	সকল মৌসুমে চলাচলের উপযোগী সড়কের ২ কি:মি এর মধ্যে বসবাসকারী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনুপাত	a) LGED, LGD b) BBS, SID	LGD	৮৩.৪৫% (এলইজিইডি, ২০১৬)	৮৬%	৮৭%	৮৮%	৮৯%	৯০%	এসডিজি ৯.১.১

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
৫৮	পরিবহনের ধরণ অনুযায়ী যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের পরিমাণ	a) BRTC, RTHD b) BIWTC, MoS c) BIWTA, MoS d) BR, MoR e) CAAB, MoCAT		যাত্রী: ১৩০.৯৯ লাখ মালামাল: ৪.১২ মেট্রিক টন (CAAB, 2019) যাত্রী (বাস): ৪৮০ লাখ মালামাল (ট্রাক): ৪.৮৫ মেট্রিক টন (RTHD) যাত্রী: ৩১.৪৭ লাখ মালামাল: ৫৫.৯৪ মেট্রিক টন (BIWTA) যাত্রী: ১.৯৭ লাখ মালামাল: ৬৬৭৮ মেট্রিক টন মালামাল: ৬৬৭৮ টিউস ফেরি: ৩০.৭২ লাখ যান (BIWTC)	যাত্রী: ১০৯.২৮ লাখ মালামাল: ৩.৭১ মেট্রিক টন যাত্রী (বাস): ১৩০.৯৯ লাখ মালামাল (ট্রাক): ৫০০ মেট্রিক টন: ৫.০০ যাত্রী: ৩১.৮৮ কোটি মালামাল: ৬৩.১৩ মেট্রিক টন যাত্রী: ১৩০.৯৯ লাখ মালামাল: ২.০৭ লাখ মালামাল: ৭৬৭৮ টিউস ফেরি: ৩২.২৬ লাখ যান	যাত্রী: ১২১.৪৮ লাখ মালামাল: ৪.১২ মেট্রিক টন যাত্রী (বাস): ৫.৫০ লাখ মালামাল (ট্রাক): ৫.৫০ মেট্রিক টন যাত্রী: ৩৪.০৩ কোটি মালামাল: ৬৮.১৮ মেট্রিক টন যাত্রী: ২.১৭ লাখ মালামাল: ৮৬৭৮ টিউস ফেরি: ৩২.৪১ লাখ যান	যাত্রী: ১৩০.১৩ লাখ মালামাল: ৪৩৯০৮৪ মেট্রিক টন যাত্রী (বাস): ৬০০ লাখ মালামাল (ট্রাক): ৬.০০ মেট্রিক টন যাত্রী: ৩৬.৫৮ লাখ মালামাল: ৭৪.৩২ মেট্রিক টন যাত্রী: ২.২৮ লাখ মালামাল: ৯৬৭৮ টিউস ফেরি: ২৫.৯৩ লাখ যান	যাত্রী: ১৩৭.৭৮ লাখ মালামাল: ৪.৬৮ মেট্রিক টন যাত্রী (বাস): ৬৫০ কোটি মালামাল (ট্রাক): ৬.৫০ মেট্রিক টন যাত্রী: ৩৯.৫১ কোটি মালামাল: ৮১.৩৮ মেট্রিক টন যাত্রী: ২.৪০ লাখ মালামাল: ১০৬৭৮ টিউস ফেরি: ১৮.১৫ লাখ যান	যাত্রী: ১৪৬.৩৪ লাখ মালামাল: ৪.৯৮ মেট্রিক টন যাত্রী (বাস): ৭০০ লাখ মালামাল (ট্রাক): ৭.০০ মেট্রিক টন যাত্রী: ৪৩.০৬ কোটি মালামাল: ৮৯.৫২ মেট্রিক টন যাত্রী: ২.৫২ লাখ মালামাল: ১১৬৭৮ টিউস ফেরি: ৯.০৭ লাখ যান	এসডিজি ৯.১.২
	জাতীয় অগ্রাধিকার: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ (এসডিজি-৭)									
	ফলাফল বিবরণ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন, ভোগ ও ব্যবহারে টেকসইতা নিশ্চিতকরণ									
৫৯	স্থাপনকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা (মেগাওয়াট)	PD	PD	২৩৫৪৮ (২০২০)	২৪০০০	২৬০০০	২৮০০০	২৯০০০	৩০০০০	
৬০	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত (খানার %)	PD, BBS	PD	৯৭% (২০১৯)	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	এসডিজি ৭.১.১
৬১	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (kWh)	PD	PD	৫১২ (২০১৯)	৫৫২	৫৯২	৬৩২	৬৭৪	৭২০	
৬২	মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ (%) (জলবিদ্যুৎসহ)	PD	PD	৩.২৫ (২০১৯)	৪.৫০	৫.৭৫	৭.০০	৮.৫	১০.০০	এসডিজি ৭.২.১
৬৩	পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত	BBS	EMRD	২৬.৩% (২০১৯)	২১%	২৩%	২৫%	২৭%	৩০%	এসডিজি ৭.১.২

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	জাতীয় অগ্রাধিকার: জেন্ডার ও সামাজিক অসমতা (এসডিজি ৫ও ৯)									
	ফলাফল বিবরণ: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন									
৬৪	জাতীয় সংসদে নারী আসনের অনুপাত (%)	PS	BP	২০.৮৬ (২০২০)	২৩	২৬	২৯	৩২	৩৫	এসডিজি ৫.৫.১
৬৫	১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয় এমন ২০-২৪ বছর বয়স্ক নারীর অনুপাত	BBS	MoWCA	৫১.৪ (২০১৯)	৫০	৪২	৩৪	৩২	৩০	এসডিজি ৫.৩.১
৬৬	উচ্চ শিক্ষা স্তরে পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত	BANBEIS	MoE	০.৭	০.৭৬	০.৮২	০.৮৮	০.৯৪	১.০	এসডিজি ৪.৩ ও ৪.৫.১
৬৭	মোট বাজেটের অংশ হিসেবে জেন্ডার বাজেট	FD, MoWCA	FD, MoWCA	৩০.৮২ (২০১৯)	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৫.গ.১
৬৮	(ক) প্রাথমিক (খ) মাধ্যমিক (গ) উচ্চ শিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষার্থীর অনুপাত (%)	BANBEIS	MoE	(ক)- (খ) ২৫.৬০ (গ) ২৭.২৩ (২০১৯)	৬৬ ৩০ ২৮	৬৭ ৩১ ২৮.৫	৬৮ ৩২ ২৯	৬৯ ৩৩ ২৯.৫	৭০ ৩৫ ৩০	এসডিজি ৪.৫.১
৬৯	ব্যবস্থাপক পদে কর্মরত (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে) নারীদের অনুপাত	BBS	MoWCA, MoPA	১১.৪ (২০১৬)	১৯	২০	২১	২২	২৩	এসডিজি ৫.৫.২
৭০	সহিংসতার ধরণ ও বয়সভেদে বর্তমান বা পূর্বতন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কর্তৃক গত ১২ মাসে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী বিবাহিত নারী ও বালিকার অনুপাত	BBS	MoWCA	৫৪.৭ (অর্থবছর ২০১৫)	৪৮	৪১	৩৪	২৭	২০	এসডিজি ৫.২.১
৭১	বয়স ও সংঘটনস্থলভেদে স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্যকোন ব্যক্তি কর্তৃক গত ১২ মাসে কোন সহিংসতার শিকার ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও বালিকাদের অনুপাত	BBS	MoWCA	৬.২ (অর্থবছর ২০১৫)	৫.৪	৪.৮	৪.২	৩.৬	৩.০	এসডিজি ৫.২.২
৭২	লিঙ্গভেদে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজে ব্যয়িত সময়	BBS	MoWCA	নারী: ২৩.৬ পুরুষ: ৬.৯ (অর্থবছর ২০১৭) এলএফএস,বিবিএস	নারী: ২৩% পুরুষ:৭.৫%	নারী: ২২.৫% পুরুষ: ৮%	নারী:২২% পুরুষ: ৮.৫%	নারী: ২১% পুরুষ: ৯%	নারী: ২০% পুরুষ: ১০%	এসডিজি ৫.৪.১
৭৩	(ক) নীচের ৪০% জনগণ এবং (খ)মোট জনগণের মধ্যে পারিবারিক ব্যয় কিংবা মাথা পিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি হার	BBS	GED	ক)৭.৭ খ) ৯.১ (২০১৬)	-	-	-	-	ক) ৯.৫ খ) ৯.৩	এসডিজি ১০.১.১

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
	জাতীয় অগ্রাধিকার: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (এসডিজি১৩, ১৪ ও ১৫)									
	ফলাফল বিবরণ: অবক্ষয়ের হাত থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল বিদ্যমান রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রতিকার করা									
৭৪	ওজোনস্তরক্ষয়কারী এইচ- সিএফসি (ওডিপি)- এর ব্যবহার (ওডিপি)	DoE	MoEFCC	৬৫.৩৫ (২০১৬)	৪৭.২২	৪৭.২২	৩০.৫	২৬.৫	২৩.৬১	এসডিজি ১৩.২.২
৭৫	মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত	BFD	MoEFCC	১৪.১ (২০১৫)	১৪.৪	১৪.৬	১৪.৮	১৫.০	১৫.২	এসডিজি. ১৫.১.১
৭৬	কার্বন ডাই অক্সাইড - এর নির্গমণ (মাথা পিছু টন)	DoE	MoEFCC	০.৯১ (২০১১)	-	-	-	-	১.৩৮	এসডিজি. ১৩.২.২
৭৭	মোট সমুদ্র এলাকার তুলনায় সংরক্ষিত এলাকার আওতায়	DoF	MoEFCC	২.০৫ (২০১৬-১৭)	৪.৭৩	-	-	-	৭.৯৪	এসডিজি ১৪.৫.১
৭৮	সংরক্ষিত জলাভূমি ও প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থলের অনুপাত	MoFL	MoFL	১.৫১ (২০১৪-১৫)	১.৭০	১.৮৫	২.০	২.১০	২.২০	এসডিজি ১৫.১.২
৭৯	সংরক্ষিত বনের শতকরা হার	BFD	MoEFCC	৩.০৬ (২০২০)	৩.২০	৩.২৫	৩.৩০	৩.৩৫	৩.৪০	
৮০	নগর বায়ু দূষণে বস্তুকণার উপস্থিতি (ক) Mg/m এ PM 10 (খ) Mg/m এ PM 2.5	DoE	MoEFCC	(ক) ১৪৫ (২০১৭) (খ) ৮৫ (২০১৭)	১৪০ ৮৩	১৩৫ ৮১	১৩০ ৭৮	১২৫ ৭৫	১২০ ৭৩	
৮১	ব্যবহারযোগ্য সাইক্লোন সেন্টারের সংখ্যা	DDM	MoDMR	৪০১৪ (২০১৯)	৪,০৪৭	৪,২৪৭	৪,৪৪৭	৪,৬৪৭	৪,৮৪৭	
৮২	সংশোধিত এসওডি-তে উল্লেখিত ঝুঁকি হ্রাসের গাইডলাইন তৈরি	DDM/ MoDMR	MoDMR	০৪ (২০২০)	০৭	১০	১৩	১৬	১৯	এসডিজি ১.৫
৮৩	দুর্যোগ অভিঘাত সহনশীল আবাসস্থল ও সম্পদসহ আবাসনের সংখ্যা	DDM	MoDMR	৭০,০০০ (২০২০)	১,৫০,০০০	২,৩০,০০০	২,৯০,০০০	৩,৪০,০০০	৩,৮০,০০০	এসডিজি ১১.খ
৮৪	প্রতি ১০০,০০০ জনে দুর্যোগের কারণে মৃত,নিখোঁজ ও প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা	BBS	MoDMR	আক্রান্ত ব্যক্তি: ১২,৮৮১ প্রতি ১০০,০০০ লোক (বিডিআরএস, বিবিএস, ২০১৫) মৃত ব্যক্তি: ০.২০৪৫ (এমওডিএমআর, ২০১৬)	আক্রান্ত ব্যক্তি ৬০০০	আক্রান্ত ব্যক্তি ৫০০০	আক্রান্ত ব্যক্তি ৪০০০	আক্রান্ত ব্যক্তি ৩০০০	আক্রান্ত ব্যক্তি ২০০০	এসডিজি. ১৩.১.১
	জাতীয় অগ্রাধিকার: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি(আইসিটি)									
	ফলাফল বিবরণ: টেলিফোন ও ব্রডব্যান্ড সেবাসমূহের মাধ্যমে ডিজিটাল যোগাযোগে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা									
৮৫	লিঙ্গভেদে একটি মোবাইল টেলিফোন আছে এরূপ ব্যক্তিদের অনুপাত	BTRC	BTRC, PTD	৯৬.২৮ (২০২০)	১০০	১০৫	১১০	১১৫	১২০	এসডিজি. ৫.খ.১

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
৮৬	মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত	BTCL	BTCL	২জি: ৯৯.৬% ৩জি: ৯৫.৪০% ৪জি: ৮২% (বিটিএরসি,জুন, ২০১৯)	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	এসডিজি. ৯.গ.১
৮৭	গতিভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা	BTRC	BTRC	৪.৮০ (ডিসেম্বর, ২০১৯)	৬	৮	১০	১২	১৫	এসডিজি ১৭.৬.১
৮৮	প্রতি ১০০ জন লোকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	BTRC	PTD	৬০.৩৪ (মার্চ ২০২০)	৭০	৭৫	৮০	৮৫	৯০	এসডিজি ১৭.৮.১
	জাতীয় অগ্রাধিকার: নগর উন্নয়ন (এসডিজি-১১)									
	ফলাফল বিবৃতি: নগর দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং উত্তম নগর ব্যবস্থাপনা এবং সেবার উন্নতির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা									
৮৯	শহরের বস্তি, বেআইনি স্থাপনা বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত	PHC, BBS	MoLGRD&C	৩৩%	৩১.৪	২৯.৮	২৮.২	২৬.৬	২৫%	এসডিজি ১১.১.১
৯০	(ক) সরকারি স্বাস্থ্য সেবা (খ) নিরাপদ সুপেয় পানি এবং (গ) স্যানিটেশান সুবিধার অভিগম্যতা আছে এমন নগর জনগণের শতকরা হার	a) DGHS b) MICS, BBS c) MICS BBS	MoHFW	ক) ৮৭ খ) ৪৭.৯ গ) ৫৫.৯	৮৯.৬ ৮২.৪ ৮৪	৯২.২ ৮৬.৮ ৮৮	৯৪.৮ ৯১.২ ৯২	৯৭.৪ ৯৫.৬ ৯৬	ক) ১০০ খ) ১০০ গ) ১০০	এসডিজি ১.৪.১
৯১	নিয়মতিভাবে সংগৃহীত নগরের কঠিন বর্জ্যের শতকরা হার	LGD, MoLGRD&C	MoLGRD&C	৬৩.২%	৬৫.৫	৬৮	৭০.২	৭২.৬	৭৫	এসডিজি ১১.৬.১
৯২	অনুমোদিত উপজেলা মহাপরিকল্পনা আছে এরূপ (ক) উপজেলা (খ) পৌরসভার সংখ্যা	LGED, UDD	LGD, MoHPW	(ক) ১৪ (খ) ৩২৪ (২০১৯)	(ক) ১৪ (খ) ৩৩০	ক) ২৯ খ) ৩৫০	ক) ৭০ খ) ৩৮৪	ক) ১২০ খ) -	ক) ২৫০ খ) -	
	জাতীয় অগ্রাধিকার: গভর্ন্যান্স (এসডিজি-১৬)									
	ফলাফল বিবরণ: অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং কার্যকর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নতিবিধান এবং সবার জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ									
৯৩	গড় জাতীয় মামলা নিস্পত্তির হার	MoLJPA, Supreme Court Registry	MoLJPA, Supreme Court Registry	৩২.২৪ (২০১২)	৩৫.৮	৩৯.৩	৪২.৮	৪৬.৫	৫০	
৯৪	মোট মামলাকারীদের তুলনায় দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠী দ্বারা আইনি সহায়তা সেবা ব্যবহার ও সেবা সুবিধাপ্রাপ্তির সংখ্যা	LJD	LJD	২২০০০	১১০০০০	১২০০০০	১৫০০০০	১৭৫০০০	২০০০০০	
৯৫	ই-ক্রয় পদ্ধতি ব্যবহারকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	CPTU	IMED	০ % (২০১৪)	১৬	৪১	৬৫	৮৯	১০০	এসডিজি ১২.৭.১

ক্রমিক নং	অগ্রগতি সূচক	উপাত্ত উৎস (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবেদন)	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিবছর	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)	মন্তব্য
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
৯৬	তথ্যাধিকার আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জবাবের সংখ্যা	Information commission	Information Commission	১২৮৫২ (২০১৯)	৮০০০	৯০০০	১০০০০	১১০০০	১২৫০০	এসডিজি ১৬.১০.২
৯৭	মোট মামলার তুলনায় এডিআর-এর অধীনে প্রতিবছর নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	LJD	LJD	১৪,০০০ (২০১৪)	১৭,০০০	১৯,০০০	২১,০০০	২৩,০০০	২৫,০০০	
৯৮	বিগত একমাসে পরিচার্যকারী কর্তৃক যেকোন ধরণের শারীরিক নিগ্রহ এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার এমন ১-১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা	BBS	MoWCA	88.8 (2019)	৮৭.০	৮৫.০	৮৩.০	৮২.০	৮০.০	এসডিজি ১৬.২.১
৯৯	লিঙ্গ, বয়স এবং শোষনের ধরণভেদে প্রতি ১০০০০০ এ মানব পাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	BP	MoHA	মোট-০.৯২ পুরুষ-১.১৪ নারী-০.৬৪ (বিপি ২০১৫)	০.৭	০.৬	০.৫	০.৪	০.৩	এসডিজি. ১৬.২.২
১০০	১৮ বছর বয়সের মধ্যে যৌথ সহিংসতার শিকার হয়েছে এমন ১৮-১৯ বয়সের তরুণ তরুণী নারীর অনুপাত	BBS	MoWCA/ PSD	তরুণী: ৩.৪৫% (ভাউ জরিপ, ২০১৫)	তরুণী: ৩.০০%	তরুণী: ২.৫০%	তরুণী: ২.২৫%	তরুণী: ২.০০%	তরুণী: ১.৫০%	এসডিজি ১৬.২.৩
১০১	জেলে বন্দি মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিনাদন্ডে আটক জনসংখ্যার অনুপাত	MoHA	MoHA	৭৭ (ডিওপি,এসএসডি, ২০২০, এমওএইচএ)	৭৫	৭২	৭০	৬৫	৬০	এসডিজি ১৬.৩.২
১০২	সরকারি সেবা গ্রহণের সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত	BBS	Cabinet Division, MoPA	৩৯.৬৯ (সিপিএইচএস, ২০১৮, বিবিএস)	৪৫	৪৯	৫৩	৫৭	৬০	এসডিজি. ১৬.৬.২
	জাতীয় অগ্রাধিকার: আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব (এসডিজি-১৭)									
	ফলাফল বিবরণ: টেকসই উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ									
১০৩	এডিপি ও বাজেট সহায়তার শতাংশ হিসেবে বৈদেশিক সহায়তা	ERD, MoF	ERD, MoF	৩৫.৪২ % (২০১৯-২০)	৩৫.৮৭	৩১.১০	২৮.১৫	২৫.১৭	২৭.২৪	
১০৪	মোট বৈদেশিক সহায়তায় (ক) রেয়াতি ঋণ (খ) অনুদান এর শতকরা হার	ERD, MoF	ERD, MoF	(ক) ৫৫ % (খ) ৪৫ % (২০১৯-২০)	(ক) ৫৪.৫ (খ) ৪৫.৫	(ক) ৫৪ (খ) ৪৬	(ক) ৫৩ (খ) ৪৭	(ক) ৫২.৫ (খ) ৪৭.৫	(ক) ৫২ (খ) ৪৮	

অংশ-২
খাত উন্নয়ন কৌশল

খাত-১:
সাধারণ সরকারি সেবা
এবং
খাত-২:
জনশৃঙ্খলা ও সুরক্ষা

অধ্যায় ১

জন প্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ

১.১ সূচনা

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক বাস্তবতার যে চিত্র লক্ষ্য করা যায় তাতে মনে হয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ অর্ন্তভূক্ত রূপান্তরযোগ্য প্রত্যাশাসমূহ অর্জন অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবুও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং আগামী দুই দশক এর গতি ধরে রাখতে নীতিনির্ধারকদের প্রয়োজন সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, উচ্চগুণ সম্পন্ন মানব পুঁজি ও বিশদ অবকাঠামোর জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবাখাতের উন্নয়ন করা, যাতে এগুলো বিশ্ববাজারের উপযোগী হয়ে উঠে। এর পাশাপাশি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্ন্যান্স এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের উপলব্ধি হলো যে, নিম্ন আয় ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে গর্ভন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানের যে কাঠামো দেখা যায় তা থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশের গভর্ন্যাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, নিম্ন আয় ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নধর্মী রূপান্তর ঠিক তখনই সম্ভব হয়েছে, যখন নীতিনির্ধারকরা যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিনিয়োগ করেছে। এ ধরণের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে দেয় এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের বিস্তৃত পরিবেশের মধ্যে প্রয়োজনের সময় সরকারি পণ্য সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রকে সম্পদ সংগ্রহে সক্ষম করে তুলে। বিশেষ করে, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি বিষয়ক অধ্যয়নগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু কিছু বিষয় দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি বজায় রাথার জন্য গুরুত্বপূর্ন, কারণ এগুলো সামগ্রিক অর্থনীতিতে বৃহত্তর দক্ষতা, প্রতিযোগিতা, স্থিতিশীলতা ও উদ্ভাবনীকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চালকদের প্রণোদনা প্রণয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

তাই সরকার দীর্ঘস্থায়ী দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তর অর্জনে কার্যকরী প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষণীয় প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্ন্যান্স উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যাতে নীতিনির্ধারকরা বস্তুগত ও মানব পুঁজিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারে, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সাধন করতে পারে এবং উৎপাদন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বিশেষ করে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমসাময়িক সমস্যাসমূহকে মোকাবেলা করতে উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য প্রধান প্রধান ক্ষেত্র চিহ্নিত করে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এসব সংস্কারের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে: ক) জন প্রশাসনের সক্ষমতা, খ) বিচার ব্যবস্থা, গ) আর্থিক খাত এবং ঘ) স্থানীয় সরকার। আরো সুনির্দষ্টভাবে বলা যায় যে,৭ম পরিকল্পনার দলিলের সারশিরোনামে "প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ,নাগরিক ক্ষমতায়ন" প্রতিফলিত উন্নয়ন কৌশলের কেন্দ্রে নাগরিকদের ক্ষমতায়নকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গভর্ন্যান্স দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রতিফলিত পরিবর্তন তত্ত্বটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে: প্রতিষ্ঠান উন্নত ও শক্তিশালী হলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত করে, যা পর্যায়ক্রমে সম্পদ ও সক্ষমতা তৈরি করবে। এভাবে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন হবে এবং তাতে উন্নত জীবনযাত্রা ও সুশাসনের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির উন্নতিবিধানে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই আলোচিত পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হবে। এটি সরকারের রাজনৈতিক ইশতেহারেও অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিশেষ করে, সরকার সচেতন যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গভর্ন্যান্সের অগ্রাধিকার নিরূপনের সময় এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যেখানে গভীর কাঠামোগত ও আচরণগত পরিবর্তন অর্ন্তভূক্ত সেখানে সংস্কার ও পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এখানে সকল পর্যায়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় রাজনৈতিক সহায়তা ছাড়া দীর্ঘমেয়াদে এটি অর্জন করা কঠিন। পরিশেষে গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যেসব ঘাটতি রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করতে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব কৌশল ও নীতিমালা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ বর্ণিত উন্নয়ন রূপান্তর অর্জনের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গভর্ন্যান্স ক্ষেত্রে অর্জন

১.২.১ ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতি

বিভিন্ন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতি ও গভর্ন্যান্সের অগ্রগতির তুলনা পরিমাপ করা হয় সাধারণত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে। এগুলোর মধ্যে খ্যাতি রয়েছে এমন পরিমাপ নির্দেশক হলো "ওয়ার্ল্ড গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটর"। এই নির্দেশকটি ছয়টি মূল মাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির তুলনা করে থাকে। এগুলো হলো: কথা বলার স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সংঘাত/সন্ত্রাসবাদের অনুপস্থিতি, সরকারের কার্যকারিতা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ। অধিকন্তু,গভর্ন্যান্স বিষয়ক মানসম্মত প্রতিবেদনে এসব নির্দেশকগুলোকে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির পরিস্থিতি স্থানকাল পাত্রভেদে পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব নির্দেশকের মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত বাংলাদেশের পরিকৃতির অবস্থান গত দশকে ছিল মিশ্র। কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোটামুটি অগ্রগতি হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে চলমান দুর্বলতা বজায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সারণি ১.১ এ বর্ণিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতি হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আপেক্ষিক অবস্থান মোটামুটিভাবে তিনটি নির্দেশকে উন্নতি লাভ করেছে। এগুলো হল: দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সংঘাত/সন্ত্রাসবাদের অনুপস্থিতি। অন্যদিকে অন্যান্য নির্দেশক যেমন কথা বলার স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা, সরকারের কার্যকারিতা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান-এর ক্ষেত্রে আগের অবস্থানের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে।

উপরন্তু, যখন আমরা নিবিড়ভাবে নির্দেশকগুলো মূল্যায়ন করি- যা আর্থিক সক্ষমতার সাথে যুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতি, বিচারের জন্য অপেক্ষাধীন মামলার সংখ্যা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বিচার বিভাগের সক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের শ্রেণীকৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা পরিমাপ করে, তখন এটি ২০১০ হতে ২০১৯ সময়কালে কম উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। উদাহরণস্বরূপ ২০১০ হতে ২০১৯ সময়কালে বিচারের জন্য অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং এটি আনুমানিকভাবে প্রায় ৩.৬ মিলিয়ন (সারণি ১.২)। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিচারের জন্য অপেক্ষাধীন মোট মামলার সংখ্যা ২.০ মিলিয়নে সীমিত রাখার যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল এটি তার চেয়ে অনেক বেশি। এটি মামলা নিস্পত্তি হারের সীমিত পরিবর্তনের নির্দেশক। অথচ ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের প্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে, আমরা যদি কর-জিডিপি অনুপাত লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাই যে ৬ষ্ঠ ও ৭ম উভয় পরিকল্পনার আলাদা আলাদা মেয়াদে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫% এর বেশি অর্জনের লক্ষ্যমাত্র্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তথাপি এটি অর্থবছর ২০১০ এর ৯.২১% থেকে কমে অর্থবছর ২০১৯ এ ৮.৯% এ নেমে এসেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, সম্পদ সংগ্রহ এবং উন্নয়নের চাহিদা পূরণে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে প্রধান প্রধান আর্থিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি প্রয়োজন।

সারণি ১.১: বৈশ্বিক গভর্ন্যান্স সূচক (World Governance Indicator): বাংলাদেশ

নির্দেশকের নাম শতকরা র‌্যাংক	২০১০ র‌্যাংক	২০১৮ র‌্যাংক
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	১৪.৭৬	১৬.৮৩
সরকারের কার্যকারিতা	২৬.৩২	২১.৬৩
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংঘাত/সন্ত্রাসবাদের অনুপস্থিতি	৯.৯৫	১৩.৮১
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান	২২.০১	১৯.২৩
আইনের শাসন	২৫.৫৯	২৮.৩৭
কথা বলার স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা	৩৬.৯৭	২৭.৫৯

সূত্র: ডব্লিউজিআই, বিশ্বব্যাংক, ২০১৯

সারণি ১.২: প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির দেশীয় নির্দেশক

	২০১০	২০১৯
১. মোট মামলা জট (মিলিয়ন)	১.৮	৩.৬
২. কর-জিডিপি অনুপাত (%)	৯.২১	৮.৯
৩. শ্রেণিকৃত ঋণ: সকল ব্যাংক	৭.৩	১১.৭
: সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	১৪.১	৩১.৬

সূত্র: বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক, সুপ্রীম কোর্ট, ২০২০

আর্থিক খাতে গভর্ন্যান্স-এর সমস্যাসমূহ নীতিনির্ধারকদের জন্য একটা উদ্বেগের বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে। অর্থবছর ২০১২ এবং অর্থবছর ২০১৮ এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পুনঃমূলধন যোগান দিতে সরকারকে আনুমানিক ১২৯ ট্রিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছিল। কারণ এ সময়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বড় বড় ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ পুনঃ তফসিল করতে অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে ৩০০ ট্রিলিয়নের অধিক টাকার ঋণ পুনর্গঠনের ফলে প্রকৃতপক্ষে পুরো ব্যাংকিং খাতের শ্রেণীকৃত ঋণ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছর ২০২০ এ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এটি ব্যাংকিং প্রশাসনের অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান নয়। ফলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ব্যাংকিং খাতে শ্রেনীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসে সরকার একটি শক্ত রাজনৈতিক অবস্থানে থাকবে এবং আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সংস্কারের উদ্যোগ নিবে। পুঁজি বাজারের সংস্কার প্রচেষ্টাসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পুঁজি বাজারে কিছু অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতাও রয়েছে এবং পুঁজি বাজারে আত্মবিশ্বাসের কিছু অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে। নীতি নির্ধারকরা স্বীকার করেন যে, বেসরকারি খাতের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সমাবেশকরণের জন্য একটি দক্ষ পুঁজিবাজার গড়ে তোলা প্রয়োজন। ফলে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের অবস্থার উন্নতিবিধানে আর্থিক খাতের দৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রতি নীতি নির্ধারকগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

"ডুয়িং বিজনেস ইন্ডিকেটর" দ্বারা পরিমাপকৃত একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশের সাধারণ রেকর্ড সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ সাধারণত "ডুয়িং বিজনেস ইন্ডিকেটর" সূচকের ক্ষেত্রে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে। তবে, এই বিষয়টি ২০১৬ সালে তাৎপর্যপূণভাবে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর অধীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনে প্রণোদনা যুগিয়েছে। এ সরকারি প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কারের উন্নতিবিধান যাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসা করা সহজ হয়। "ডুয়িং বিজনেস ইন্ডিকেটর" নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে গঠিত, কারণ এটিকে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এটি ব্যবসায়ের সূচনা, নির্মাণ কাজের অনুমতি, বিদ্যুৎ প্রাপ্তি, সম্পত্তি নিবন্ধন, সংখ্যালগু বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, কর প্রদান, সীমান্ত বাণিজ্য, চুক্তি কার্যকরণ, ঋণ প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় মূল্যায়নের পরিমাণগত উপায় নির্দেশ করে। এভাবে "ডুয়িং বিজনেস" কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর গুণগত মান মূল্যায়ন করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিবেশের বহুমূখী মূল্যায়নে সহায়তা করে।

উপরন্তু, ২০১৯ সালে ব্যবসার প্রতিবন্ধকতা নিরসণে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চিহ্নিত পদক্ষেপসমূহের কারণে ২০১৯ সালের বৈশ্বিক র‌্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ ৮ ধাপ এগিয়েছে (সারণি ১.৩)। এটি ইতিবাচক এবং মোটামুটি অর্জন, বিশেষ করে যদি চীন ও ভারতের ব্যাংকিং-এর সাথে বাংলাদেশের তুলনা করা হয়। বাংলাদেশ বিশেষভাবে সম্পত্তি নিবন্ধন এবং চুক্তি কার্যকর করার বিষয়ে যথাযথ আইনত ব্যবস্থা গ্রহণে দুর্বল পরিকৃতি দেখিয়েছে, যা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামোর দুর্বল পরিকৃতিকে প্রতিফলিত করে এবং এক্ষেত্রে আরো মনোনিবেশ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। সামগ্রিকভাবে উক্ত র‌্যাংকিং থেকে প্রতিফলিত হয় যে, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

সারণি ১.৩: Ease of Doing Business সূচকে অগ্রগতি

	২০১৭	২০১৮	২০১৯
১. বাংলাদেশ	১৭৭	১৭৬	১৬৮
২. ভারত	১০০	৭৭	৬৩
৩. চীন	৭৮	৪৬	৩১
৪. ভিয়েতনাম	৬৮	৬৯	৭০

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক, ২০২০

সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকৃতির দেশীয় নির্দেশকগুলোর তুলনা ও তাদের প্রবণতা গভর্ন্যান্সের অনেক বিষয়ের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। উপরন্তু,দীর্ঘ দিন ধরে চালিত প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির নির্ধারকের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রমানিত যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের মৌলিক শর্ত, যা সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি ঘটায়, সরকারি সম্পদ ও মানব পুঁজিতে সম্পদ ও বিনিয়োগের সমাবেশ ঘটায়। তাই, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন বিষয়ে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ২০১৮ সালে শান্তিপূর্ণভাবে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। নির্বাচন কমিশন নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে স্থানীয় ও পৌর নির্বাচন সম্পন্ন করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোট গ্রহণ মেশিন (ইভিএম) এর ব্যবহার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে, কারণ এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনার উন্নতিতে সহায়তা করেছে। উপরন্তু, সংসদে নারীর সরাসরি প্রতিনিধিত্বের বিষয়েও বাংলাদেশে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কেননা ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২২ জন নারী সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচিত নারী সংসদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২% এবং জাতীয় সংসদ ৯ম ও ১০ম উভয় নির্বাচনে ছিল মাত্র ৬%। কিন্তু ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিত্ব ৭% এর অধিক হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নীতিনির্ধারনে নারীদের বক্তব্যের জায়গা জোরালো হয়েছে। ১০ম ও ১১তম জাতীয় সংসদে সংসদ বয়কট করার প্রবণতা অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি নিয়মিতভাবে নীতি সর্ম্পকিত বিষয়সমূহ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছে। এর ফলে জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার সামগ্রিকভাবে উন্নতি ঘটেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের উন্নতি ইতোমধ্যে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈশ্বিক জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদনে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৩টি দেশের মধ্যে সপ্তম।

১.২.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সুনির্দিষ্ট অর্জন

বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা: বাংলাদেশ সরকার দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিচারের অভিগম্যতার উন্নতিবিধানে সংকল্পবদ্ধ। অধিকন্তু, বিচারের অভিগম্যতা নিশ্চিতের অন্যতম মূল উপকরণ হলো আইনগত সহায়তা প্রদান এবং সে সকল ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান যারা আর্থিক অসচ্ছলতা, দুস্থতা, অসহায়ত্ব ইত্যাদি কারণে বিচার পেতে অক্ষম। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এর আওতায় প্রদত্ত সরকারি আইনী সহায়তা সেবায় অভিগ্যমতা নিশ্চিতকল্পে জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট আইনগত সহায়তা কার্যালয়, দুটি শ্রম আদালত আইন সহায়তা সেল এবং জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থবছর ২০১৯ এ মোট ১০০,৮০৬ জন সুবিধাভোগী জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে সরকারি আইনগত সহায়তা গ্রহণ করেছে। এটি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে বছরভিত্তিক অন্ততপক্ষে ৩৭,০০০ ভুক্তভোগীকে আইনগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ২০০৯ থেকে ২০১৯ সময়কালে প্রায় ৫,০০,০০০ ভুক্তভোগী আইনগত সহায়তা সেবা পেয়েছে এবং এতে বাংলাদেশের বিচারের অভিগম্যতার অবস্থার উন্নতিবিধানে সরকারের অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, মোট সরকারি আইনসহায়তা গ্রহণকারীর সংখ্যা অর্থবছর ২০১৭-২০১৮ এবং অর্থবছর ২০১৮-১৯ ছিল যথাক্রমে ৮২,০০০ ও ১০০,৮০০ জন (জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯)। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট এ সেবা পৌছানোর জন্য জাতীয় হটলাইন স্থাপন এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গ্রাম আদালতগুলো বর্তমানে ২৭টি জেলায় কার্যকর রয়েছে এবং সেগুলোতে মামলা নিস্পত্তির হার বেশী। জাতীয় হটলাইনসহ জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ৬৪টি জেলায় সেবা প্রদান করছে। সরকার এসব পদ্ধতির বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ব্যবস্থা অবলম্বনে বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০০০ সালের মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি-এর আওতায় বছরভিত্তিক অন্ততপক্ষে ২৫,০০০ মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০২০ সালের পূর্বেই এই মাইল ফলকটি অর্জিত হয়েছে।

আইনী ব্যবস্থায় অভিগম্যতা: আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সাধারণভাবে জনগণের সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে সকল হালনাগাদকৃত আইন লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ৩০০ টি গুরুত্বপূর্ণ আইন বাংলা থেকে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং এগুলো এখন ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: বিচার বিভাগের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সু-প্রশিক্ষিত বিচারক ও বিচারিক কর্মকর্তাদের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিচারিক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে সরকার তৎপর রয়েছে। এই লক্ষ্যে ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে ৭০০ এর অধিক বিচারককে বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২৫৩ জন বিচারককে অস্ট্রেলিয়াতে,৬০ জনকে জাপানে এবং ২৫০ জনকে ভারতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু, কার্যকরী পরিকল্পনার মাধ্যমে জুডিশিয়ারির সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে ২০১৮[১] সালের জাতীয় বিচার ব্যবস্থার বিশদ নিরীক্ষণের মাধ্যমে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি তৈরি করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এধরণের প্রথম নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমগ্র দেশের বিচার ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্যাদি অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এ প্রতিবেদন অপরাধ ও পুলিশিং থেকে শুরু করে

১ দেখুন: https://bangladesh.justiceaudit.org/

আদালতের রায়, সাজা, বন্দী প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যাদি রয়েছে। সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় জুড়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ও পরিচালন এবং সম্পদ ও গভর্ন্যান্সের বিষয়াবলী নিয়ে এর পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য, যা সরকারের খাতভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি করবে। সবশেষে, সরকার ৪২টি নতুন আদালত যুক্ত করার পরিকল্পনা করে বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামোর উন্নতি বিধান করেছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের মধ্যে ৩০টি সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, ২৭টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রারণ হয়েছে; ২৩টি নতুন সাবরেজিস্ট্রি কার্যালয় ভবন নির্মানের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এনেক্স ভবন-২ এর নির্মাণ কাজ ২০১৯ সালে শুরু হয়েছে, যার ফলে বিদ্যমান সুযোগসুবিধার সাথে ৩২টি নতুন আদালত কক্ষ যোগ হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement): ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে 'সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' এর নিয়মিত ব্যবহারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। এটি সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের পদ্ধতিগত পর্যালোচনা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। সরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে সরকার ২০১৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচনা করে। কর্মী ও সরকারি সংস্থাগুলোর পরিকৃতি মূল্যায়নের বিষয়ে সিভিল সার্ভিস আইন, ২০১৮ তে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ব্যবহার উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং ১৭০০০ এর অধিক সরকারি দপ্তর এর অর্ন্তভুক্ত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়্যার এর মানোন্নয়ন করা হয়। ২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর গড় স্কোর ৮৬.৫% ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে, কর্মসম্পাদন বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। এ সময়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এটি সরকারি সংস্থাগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিতেও সহায়তা করেছে। অধিকন্তু এসডিজিসহ সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যকর সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানে এ ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। অধিকন্তু মন্ত্রিপরিষদ সচিব সরকারি কর্মসম্পাদন বিষয়ক জাতীয় কমিটি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছেন। সামগ্রিকভাবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি তার কাংখিত উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস: নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে ভূক্তভোগী নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও রেফারেন্স সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক মাল্টি সেক্টোরাল কর্মসূচির আওতায় বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল পরিচালনা করে। সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুর সকল প্রয়োজনীয় সেবা একটি কেন্দ্র হতে প্রদানের জন্য এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ১৬,৮০৪ জন ভুক্তভোগী এ সকল কেন্দ্র হতে চিকিৎসা সেবা নিয়েছে; যার মধ্যে ৩৭৪৭ জন সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগী দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ৭৮% ভুক্তভোগী নারী দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার/সেলগুলো মূলত চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে কারণ এখানে আইনী ও পরামর্শ সেবাসমূহ প্রায় নেই বললেই চলে।

গ্রাম আদালতের পরিকৃতির উন্নতি: গ্রাম্য আদালতসমূহ প্রকল্প এলাকাতে মোট ১৭৬,১২২টি মামলা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৪৪,১২৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এই অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ কার্যকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদিও এক্ষেত্রে আরো অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালে ব্র্যাকের ইস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট পরিচালিত জরীপে দেখা যায় যে, যারা আইনগত সেবা চেয়েছে তারা গ্রাম আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত নয়। জরীপে আরো দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকায় বিপুল সংখ্যক বিবাদ ভূমির সাথে সম্পর্কিত। বিরোধকৃত অধিকাংশ ভূমির মূল্য সাধারণত ৭৫,০০০ টাকার উপরে হওয়ায় তা গ্রাম আদালতের কর্তৃত্ব বহির্ভূত। ফলে এগুলো গ্রাম্য আদালতে নিষ্পত্তি হয়না। তাই এ ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সাধারণত দুর্বল।

মামলা সমন্বয় কমিটি পরিকৃতির উন্নতি: কারাগারে কয়েদীদের প্রচন্ড জটলা এবং মামলা জট সংক্রান্ত স্থানীয় সমস্যা সমাধানে বিচার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে একত্রীকরণের বিষয়ে জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মামলা সমন্বয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ সফল হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান যাতে একলা নীতিতে চলার পরিবর্তে সকলের সাথে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করে তা নিশ্চিতকরণে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে নিয়ে মামলা সমন্বয় কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সংসদে সরকারি হিসাব কমিটির পরিকৃতির উন্নতি: সংসদে সরকারি হিসাব কমিটির কার্যক্রমের উন্নতি ঘটেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সরকারি হিসাব কমিটি উদ্বেগজনক বিষয়গুলো আলোচনা করতে সবচেয়ে বেশিবার সভায় মিলিত হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium Term Budgetary Framework, MTBF) এর ব্যবহার বৃদ্ধি: বাজেট প্রণয়নের কৌশলগত ও নীতিভিত্তিক পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে শক্তিশালী করতে সরকার মধ্যমেয়াদি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে বাজেট প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ব্যয়ের ভবিষ্যত ভিত্তি প্রাক্কলন (Forward Baseline Eastimates)-এর আরো উন্নয়নে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো অবদান রেখেছে। এটি বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখতে সরকারকে সক্ষম করে তুলেছে।

আর্থিক তথ্যের স্বচ্ছতার উন্নতি: ৭ম পরিকল্পনাকালে আর্থিক তথ্যের সঠিকতা বৃদ্ধি করতে চালু করা হয় সমন্বিত বাজেট ও হিসাব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (iBAS++)। সরকারের আর্থিক অবস্থানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারি ঋণের তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে আর্থিক বিবরণীর প্রকৃত হিসাব নিকাশ প্রকাশ করতে সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনার তথ্য ব্যবস্থা (Integrated Financial Management Information System, IFMIS) চালু করেছে। বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক-এর দপ্তর এবং বিশ্বব্যাংক IFMIS-এর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের সাথে তাল মিলিয়ে সরকার বৃহত্তর স্বচ্ছতা ও পারস্পরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সাহায্য ও ঋণ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজ করেছে। এই ডিজিটাল ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ঋণ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিশ্লেষণ ব্যবস্থা (DMFAS), অর্থনৈতিক সহযোগিতার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (AIMS) এবং বৈদেশিক সহযোগিতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FAMS) প্লাটফরমের সংগে যুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এজেন্ডার বাস্তবায়ন: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন নতুন সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা টুলস তৈরি এবং চালু করে। এ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থা টুলসের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন ফরম্যাট (MAF), (২) সেক্টরের মূল্যায়ন ফরম্যাট (SAF), (৩) সেক্টরের কৌশলপত্র এবং (৪) কয়েক বছরভিত্তিক (Multi Year) সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুমোদনের পূর্বে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মূল্যায়নে নির্দিষ্টকৃত এ দু'টো ফরম্যাট ব্যবহৃত হওয়ায় তা সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থা সংস্কার কর্মসূচিতে অবদান রাখছে। খাতভিত্তিক কৌশল পত্রে নির্দিষ্ট খাতের লক্ষ্য, পরিকৃতি, সুযোগ সুবিধা এবং সমস্যাসমূহের সর্বাত্মক পর্যালোচনা করা হয়। দুটো খাতের জন্য উক্ত কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো হল: ১) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাত ও ২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। পরিকল্পনা কমিশন পাইলটভিত্তিতে দুটি খাতের জন্য কয়েকবছরভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করেছে। কয়েক বছরভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো বিভিন্ন খাত ও প্রকল্পের মধ্যে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের উন্নতি বিধান করা। উপরন্তু, ২০১৮ সালে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থা সংস্কারকে সমন্বয় করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থা উইং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া,কার্যক্রম বিভাগ ২০১৯ সালে এডিপির জন্য নতুন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি করেছে। ২০২০ বছর থেকে এই পদ্ধতির পূর্ণ বাস্তবায়ন শুরু হবে।

ই-গভর্ন্যান্সের অগ্রগতি: ই-গভর্ন্যান্স নাগরিকদেরকে সরকারের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি সেবা পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এটি সরকারি নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ সহজ করেছে। উপরন্তু সরকার ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সর্বাত্মক ই-প্রশাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। এ সকল পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে সরকার মন্ত্রণালয়ের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের জন্য সম্পূর্ণরূপে সহজলভ্য করে তুলেছে। উপরন্তু এসব ওয়েব সাইটগুলো রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার জন্য ৫০,০০০ এরও অধিক সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সরকার একটি জাতীয় পোর্টাল চালু করেছে, যেখানে সকল মন্ত্রণালয়ের তথ্য রয়েছে। অন্যদিকে অনলাইনের তথ্য শেয়ার করতে জেলাগুলোকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ই-সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অধিকন্তু, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকা প্রদর্শনের সুবিধার্থে জাতীয় তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং চালু করা হয়েছে। সরকার দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয় আইসিটি ইনফ্র্যা-নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে ৮,০০০টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্যের কারণে প্রকল্পটি তৃতীয় পর্যায়ের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এটি আরো নাগরিক বান্ধব হবে এবং উচ্চতর ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করবে। এই প্রকল্পের সাফল বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা পর্যায়ে ১০ জিপিএস সক্ষম নেটওয়ার্ক এবং জেলা পর্যায়ে ১০০ জিপিএস সক্ষম নেটওয়ার্ক নিশ্চিত হবে। সরকার বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃক্ষের মতো প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশী, নাগরিক এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন ও ওয়ার্ক পারমিট ব্যবস্থা চালু করেছে। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনলাইন কর ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে অনলাইনে কর রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি চালু করেছে। সরকার 'সেবাকুঞ্জ' নামে একটা একক উৎসভিত্তিক অ্যাক্সেস পয়েন্ট চালু করেছে, যা ৩৬টি ডিরেকটরী হতে প্রায় ৪০০ সেবা সরবরাহ করবে।

সরকারি সেবাসমূহের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের প্রসার এবং উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সরকারের ই-গভর্ন্যান্সের উদ্যোগ ৫টি উপাদান নিয়ে গঠিত। এগুলো হল: সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ, কম কাগজের ব্যবহার, সরকারি সেবা পোর্টাল, ভূমি সংক্রান্ত তথ্য সেবাসমূহ এবং সরকারি ফরম পোর্টাল। সরকারি সেবা সরবরাহে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াসমূহ সহজীকরণ এবং সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় সময় কমানো হচ্ছে সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ-এর মূল লক্ষ্য। ডিজিটাইজেশন দ্রুত বাস্তবায়ন করতে সরকারি দপ্তরগুলোতে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ২০২০ সালের গোড়ার দিকে এ কর্মসূচিতে মোট ৪২৪টি সরকারি সেবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বড় বড় সেবার অভিগম্যতা দিতে 'সেবাকুঞ্জ' নামে ২০১৪ সালে গৃহীত একটি সরকারি সেবা পোর্টাল ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরো অধিক সেবা অন্তর্ভুক্ত করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রসার লাভ করেছে। সেবা প্রক্রিয়া সহজীকরণ পদ্ধতিতে অধিক সেবা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সকে আরো জোরদার করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভূমি প্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্স: পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলা ব্যতীত সারাদেশে ২০১৯ সালের জুলাই মাসে শুরু হওয়া ই-মিউটেশন ভূমিখাতে সংস্কারের একটা বড় পদক্ষেপ। ভূমি প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি অধিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। ২০১৯ সাল থেকে ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিস এবং ৩৬১৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এই সেবা সরবরাহ করে আসছে। অধিকন্তু অনলাইনে প্রাপ্ত মোট ৯,৯৫,৮১৫টি মিউটেশনের আবেদনে বিপরীতে মোট ৬,৫৫,২২০টি নিষ্পত্তি হয়েছে। সরকার বর্তমানে ৩টি জেলা ও ৫টি সাবরেজিষ্ট্রি কার্যালয়ে দলিল নিবন্ধনে ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করেছে, যা ভূমি মালিকানার ওপর বিরোধ কমাবে ও এ খাতে তথ্য অব্যবস্থাপনা হ্রাস করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন: দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৬ সালে কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা শীর্ষক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উপরন্তু, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, আমলা, এনজিও, ব্যবসায়ী ও মিডিয়া প্রতিনিধি প্রভৃতি সাথে আলাপ আলোচনা করে কমিশন ২০১৭-২০২০ মেয়াদে একটি সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক ও সময় নির্ধারিত (SMART) কৌশল গ্রহণ করেছে, যা কমিশনকে আরো পদ্ধতিগতভাবে দুর্নীতি হ্রাস করতে সহায়তা করবে। অধিকন্তু তদন্ত, অনুসন্ধান, প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্যক্রমের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে কমিশন কর্তৃক সক্ষমতা বিনির্মাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে তদন্ত, সাইবার অপরাধ, অর্থ পাচার, মামলা ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কমিশন ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ৫১৮৩টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং ১২১১টি প্রাথমিক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন (First Information Report, FIR) দাখিল করেছে। উপরন্তু, ২০১৯ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন হট লাইন ১০৬ এর মাধ্যমে ১,৪৭,৫২৪টি ফোন কল গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৪৭৬০টি ছিল দুর্নীতিদমন কমিশনের তফসিলভূক্ত অভিযোগ। এ সকল অভিযোগের ভিত্তিতে দুদক সারা দেশে ১০০১টি প্রতিরোধমূলক অভিযান পরিচালনা করেছে। ২০১৪ এবং ২০২০ সালের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন সারাদেশে ১৪৪টি গণশুনানীর আয়োজন করেছে। ঐ গণশুনানী থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন ৪৪৬৪ টি অভিযোগ গ্রহণ করে যেখানে ৩০৮০টির নিষ্পত্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে গণশুনানী অভিযোগ পরিচালনায় সাফল্যের হার ছিল প্রায় ৬৯%। অন্যান্য অভিযোগগুলো মিথ্যা, দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিল বহির্ভূত এবং আদালতে বিচারাধীন থাকায় নিষ্পত্তি হয়নি। দুর্নীতি দমন কমিশন কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে সরকারি সেবা প্রদানে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং হয়রানির কারণ অনুসন্ধান করে এবং প্রাপ্ত ইন্টেলিজেন্স তথ্য, দলিল-দস্তাবেজ, মিডিয়া প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করে।

বাংলাদেশ তথ্য কমিশন: বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অধিকার নীতির প্রতি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ থেকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সরকারি তথ্যের জন্য তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত আবেদন ও অভিযোগের সংখ্যা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে তথ্য কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা বেড়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে কমিশন অফিসে তথ্যের জন্য দায়েরকৃত ৮০৭টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে অভিযোগের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২,১৩৭টি। কমিশন বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইলেকট্রোনিক পদ্ধতিতে তাদের ওয়েবসাইটে সরবরাহ করতেও উৎসাহিত করেছে। উপরন্তু, তথ্য কমিশন ৭ম পরিকল্পনা মেয়াদে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের অনলাইন ট্রাকিং শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি হলো যে, বেসরকারি ব্যাংক তথ্য কমিশনের কর্ম তফসিলভুক্ত হয়েছে, যার ফলে জনগণ বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারে।

ই-প্রকিউরমেন্ট: দুর্নীতি হ্রাস এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সরকার অনলাইন ক্রয় ব্যবস্থা চালু করেছে। এতে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা দুটিই বৃদ্ধি পাবে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ই-জিপি সম্প্রসারণ করা এবং ২০২০ সালের মধ্যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ই-প্রকিউরমেন্টের আওতায় নিয়ে আসা। তদানুসারে, ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারীর

মাধ্যমে ই-জিপি গ্রহণের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সিপিটিইউ প্রদত্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, গত কয়েক বছরে ই-জিপি গ্রহণের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪৫৮টি সংস্থা ই-জিপি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সকল ক্রয়ের প্রায় ৫৫ শতাংশ ই-জিপির আওতায় করা হয়। এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৭১০০টির ক্রয় কার্যক্রমের নিরপেক্ষ সমীক্ষা হতে দেখা যায় যে, ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয় প্রচলিত কাগজ নির্ভর ক্রয় পদ্ধতির তুলনায় ১২ শতাংশ কম ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি ১.৪: মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থায় সম্পাদিত বছরভিত্তিক ই-জিপির পরিসংখ্যান

অর্থবছর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	প্রবৃদ্ধি হার	বিভাগের সংখ্যা	প্রবৃদ্ধি হার	সংস্থার সংখ্যা	প্রবৃদ্ধি হার
২০১২	৫		৪		৪	
২০১৩	৫	০.০০	৪	০.০০	৫	২৫.০০
২০১৪	৫	০.০০	৫	২৫.০০	৮	৬০.০০
২০১৫	১১	১২০.০০	৯	৮০.০০	৩২	৩০০.০০
২০১৬	১৮	৬৩.৬৪	১২	৩৩.৩৩	৭২	১২৫.০০
২০১৭	৩৩	৮৩.৩৩	১৮	৫০.০০	৩০০	৩১৬.৬৭
২০১৮	৩৭	১২.১২	১৮	০.০০	৪৫৮	৫২.৬৭

সূত্র: সিপিটিইউ ২০১৯

ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র সম্প্রসারণ: ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের (Union Digital Center, UDC) প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ই-গভর্ন্যান্সের প্রসারে একটা বড় পদক্ষেপ ছিল। ইউডিসি চালুর ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা গ্রহণের জন্য গড়ে যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয় তা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে এবং সেবা কেন্দ্রে যাতায়াতের সংখ্যাও কমেছে। বিশেষ করে a2i প্রদত্ত একটি হিসাব (২০১৭) হতে দেখা যায় যে স্থানীয় সেবা গ্রহণকারীদের সেবা গ্রহণের জন্য যে সময় প্রয়োজন পূর্বের তুলনায় তা ৮৫% কমেছে, ব্যয় কমেছে ৬৩% এবং সেবা কেন্দ্রে যাতায়াতের সংখ্যা কমেছে ৪০%। একই প্রতিবেদনে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাইজেশনের ফলে এ খাতে ২.০ বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে বলে ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: জন প্রশাসনের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সেবার মান উন্নয়ন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সরকার অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করেছে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার প্রয়োগকে বেশির ভাগ সরকারি দপ্তরের কাজের মূল ধারায় নিয়ে আসতে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যাতে নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীগণ তাদের উদ্বেগের কথা জানাতে পারে এবং সরকারি দপ্তরগুলোতে স্বচ্ছতার অবস্থার উন্নতি ঘটে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে অভিযোগের প্রতিকার ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান।

নগর স্থানীয় সরকারের উন্নতিবিধান: নগর স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্সের অবস্থার উন্নতিবিধানে সরকার বর্তমানে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিটি গভর্ন্যান্স প্রকল্প, যা ছয়টি বড় সিটি কর্পোরেশনে সরকারি সেবার উন্নতি বিধান করতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ছয়টি সিটি কর্পোরেশন হলো ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা এবং নারায়নগঞ্জ। সরকার সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্যও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে: ১) গভর্ন্যান্সের উন্নতির জন্য মধ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন; ২) এই কৌশলের সাথে মিল রেখে প্রশাসনিক উন্নতির জন্য একটি কর্মকাণ্ডের প্লান-ডু-চেক-এ্যাকশান চক্র (Plan-Do-Check-Action Cycle) প্রতিষ্ঠা করা; ৩) কর নিবন্ধন এবং আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া চালু এবং সুষ্ঠুভাবে কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা; ৪) 'আয় অনুসারে ব্যয়' এ নীতি অনুসরণে আবর্তক ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। উপরন্তু, নগর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য এবং পৌরসভার গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকার পৌরসভা গভর্ন্যান্স-এর উন্নতি বিধানে জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ আরো দুটি প্রয়োজনীয় কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে। এগুলো হল: উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্সের উন্নতিকল্পে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র এবং সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স উন্নতির জন্য কৌশলপত্র ২০২০-৩০। এ সকল প্রকল্পের সহায়তায় এমন কৌশল ও নীতি বিকল্প প্রণয়ন করা হবে, যা নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিভাগে গভর্ন্যান্স পরিকৃতির উন্নতি বিধান করতে পারে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের কার্যকারিতার উন্নতি সাধন: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে সরকার স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে। এটি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন টুল, যা ৭ম পরিকল্পনার জাতীয় পর্যায়ের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারকে খাতভিত্তিক কৌশল ও উদ্দেশ্যসমূহে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতের কৌশল পত্রটি ছয়টি প্রধান ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়। এগুলো হচ্ছে: ১) প্রকল্প চিহ্নিতকরণ - এটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রকল্প চিহ্নিতকরণ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। এর ফলে চিহ্নিতকরণ পর্যায়েই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট খাতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ফলাফলের সাথে সংগতিপূর্ণ কি না; ২) প্রকল্প প্রণয়নঃ প্রকল্প প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার জন্য এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা, যা নিশ্চিত করে যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনে চিহ্নিত প্রকল্পগুলো সংশ্লিষ্ট খাতের লক্ষ্য ও ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবে; ৩) প্রকল্প মূল্যায়নঃ এটি একটি উপায় উদ্ভাবন করে যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলো মূল্যায়ন করে; ৪) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণঃ এটি খাতভিত্তিক অগ্রগতির বিশদ বিবরণ, যার মাধ্যমে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ উচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পেয়ে থাকে; ৫) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থায়নঃ এটি খাতভিত্তিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তার ওপর তথ্য সরবরাহ করে, যা জিইডি, কার্যক্রম বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; ৬) উন্নয়ন সহায়তা সমন্বয়ঃ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সহায়তায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতের চলমান অগ্রাধিকারের সুস্পষ্ট চিত্র সম্বন্ধে জানতে পাবে।

বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সকল নতুন আবেদনকারীকে সফলভাবে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদান করেছে। সংস্থাটি মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদান ও এর নবায়ন করতে আন্তর্জাতিক বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাবলী অনুসরণ করছে। বহির্গমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ভিআইপি নাগরিকদের জন্য ই-পাসপোর্ট দেয়া শুরু করেছে এবং বাংলাদেশই প্রথম দক্ষিণ এশীয় দেশ এবং বিশ্বের ১১৯তম দেশ যে এমন উন্নত ভ্রমণ দলিল (Advanced Travel Documents) প্রবর্তন করছে। সংস্থাটি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ও ভিসার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছে এবং বাংলাদেশের ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজতর করেছে। উপরন্তু, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য পাসপোর্ট ইস্যুর সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যা বিদেশের বাজারে শ্রম শক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এর ফলে রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: বাংলাদেশ সরকার ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল মোতাবেক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা জোরদারকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছে। সামষ্টিক এবং খাতভিত্তিক গৃহীত নীতিগুলোর কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য সকল পরিকল্পনা নিয়মিতভাবে মধ্যমেয়াদে মূল্যায়ন করা হয়। জিইডি সামষ্টিক অর্থনৈতির পর্যায়ক্রম ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়নে সক্রিয় রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জিইডি ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার সমাপ্তি মূল্যায়ন এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। সরকার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের অনুশীলনকে আরো প্রশস্ত করেছে, যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বৃহত্তম পরিসরে সূচক তৈরি এবং তার দ্বারা বিভিন্ন খাতে গৃহীত নীতির বাস্তবায়ন মূল্যায়ন সুগম করেছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নে তৎপর রয়েছে।

১.৩ প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

আইন প্রণয়ন ও আইনের শাসন: টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি সুসংহত আইনী কাঠামো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই লক্ষ্য অর্জনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবুও এ ক্ষেত্রে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী আইন প্রণয়নের জন্য খসড়া প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার অভাব রয়েছে। যথাযথ এবং নির্ভুল আইনী খসড়া প্রণয়নে পর্যাপ্ত এবং দক্ষ লেজিসলেটিভ কর্মকর্তা প্রয়োজন। কাজেই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ আইন ও সাংবিধানিক বিধান সম্পর্কে অবগত নয়। জনগণের আইন ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। ১৯৮৭ সালের পূর্বে সকল আইন প্রণীত হয়েছে ইংরেজিতে, যার ফলে সাধারণ জনগণের কাছে আইনের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জনগণকে আইন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অতএব, সকল ইংরেজি আইন বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। বাংলাদেশে অনুবাদকারী কর্মকর্তার স্বল্পতা রয়েছে বিধায় এর সংখ্যাও বাড়াতে হবে।

বিচার ও আইনের শাসন: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এমন একটি সমাজ প্রত্যাশা করে যেখানে দেশের সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায় বিচার সুরক্ষিত থাকবে। তদুপরি, সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বারা এটি স্বীকৃত যে আইনের শাসন ও একটি কার্যপোযোগী বিচার ব্যবস্থা মানব কল্যাণ সাধনের মূল ভিত্তি, যা একইসাথে যথাযোগ্য ও কার্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে সজাগ রয়েছে এবং আইনের সার্বিক প্রকৃতি ও সকল নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতহীন আচরণ- উভয় অবস্থার উন্নতি করে প্রত্যেক নাগরিকের বিচারের অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও বিচারাধীন মামলাসমুহের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর অভীষ্ট ১৬ কে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। ফলে নীতি নির্ধারকদের জন্য সকল নাগরিকের বিচারের অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং সর্বস্তরে কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জবাবদিহিতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গঠনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। তথাপি, বিচার বিভাগের জন্য বিচারাধীন মামলাসমুহের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিতকরণ একটি উদ্বেগের বিষয়। ২০১০ সালে উচ্চ ও নিম্ন উভয় আদালতে বিচারাধীন মোট মামলার সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। কিন্তু ২০১৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লক্ষে এবং ২০২০ সালের মধ্যে তা ৩৩ থেকে ৩৮ লক্ষে গিয়ে পৌঁছে। এটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ধরণের মামলা সময়মত নিষ্পত্তিতে বাঁধা হিসেবে কাজ করে। উপরন্তু, একটি কার্যকর, জবাবদিহি সম্পন্ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যথাযথ অগ্রগতি না হওয়ার পিছনে নানাবিধ বিষয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় বিচারিক কর্মকর্তার অভাব, (সারণি ১.৫ এবং চিত্র ১.১), নিয়োগ বিধিমালা ও আরো ভাল কার্যসম্পাদনের জন্য প্রণোদনা প্রদানের সীমাবদ্ধতা, বিচার ব্যবস্থায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সীমিত অভিগম্যতা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করলে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বাংলাদেশে ১১ জন, ভারতে ১৯ জন, অস্ট্রেলিয়াতে ৪১ জন, ইংল্যান্ডে ৫১ জন, কানাডায় ৭৫ জন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০৭ জন বিচারক রয়েছেন। এ থেকে বাংলাদেশের বিচার খাতে মানব সম্পদের বিশাল ঘাটতির চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ ছিল, কিন্তু এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য যথাযথ মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তার অনুমোদনের লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি।

সারণি ১.৫: ২০১৮ সালের আদালতের ধরণ অনুযায়ী বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা

আদালতের ধরণ	বিচারক প্রতি মামলার সংখ্যা
১. আপিল বিভাগ	৩১৪৩
২. হাইকোর্ট বিভাগ	৫৫০০
৩. নিম্ন আদালত	১৭০০

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ২০১৯

চিত্র ১.১: প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য পেশাদার বিচারকের সংখ্যা

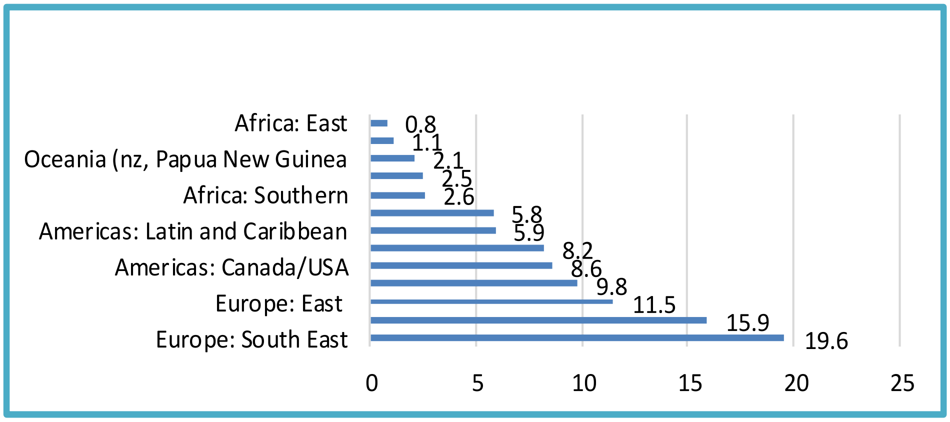

সূত্রঃ Harrendorf, (২০১০); বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ২০১৯

অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের ওপর অধিককতর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই দূরদর্শী ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং মূল্যস্ফীতি ও আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক ঋণের দায়বদ্ধতা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকার কার্যকর দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। তদুপরি, সামষ্টিক অর্থনীতিতে সুষ্ঠু স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বেশ

গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এটি বহুল আলোচিত ‘মধ্যম আয়ের ফাঁদ’- এড়াতে সহায়তা করে। আর্জেন্টিনা এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলো ইতোপূর্বে এ মধ্যম আয়ের ফাঁদ-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সরকারকে ব্যাংকিং খাতের গভর্ন্যান্সের সাথে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বসহকারে মোকাবেলা করতে হবে। এক্ষেত্রে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং ব্যাংকিং খাতের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দৃঢ় ও সুষ্ঠু কর্পোরেট গভর্ন্যান্স মেনে চলতে নির্দেশনা প্রদান করেছে, যাতে করে যে কোন জালিয়াতি কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এছাড়াও, সাম্প্রতিক বছরগুলোত বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংক তদারকি কৌশল এবং পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিতে ব্যাংকগুলোর কাঠামো শক্তিশালীকরণ, রিজার্ভ কাঠামো পুনঃনির্ধারণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি ব্যাংকের তথ্য-উপাত্তে অনলাইন প্রবেশ ত্বরান্বিত করতে ব্যাংকগুলোর তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

অপরদিকে, ব্যাংকিং খাতে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। ২০১৮ সাল ব্যতীত ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে (৯ শতাংশ) স্থিতিশীল ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশে পৌঁছানোর পর ২০১৮ সাল থেকে তা নিম্নগামী হচ্ছে। তবে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঋণখেলাপীদের ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান শিথিল করে সম্প্রতিককালে জারি করা বিধিমালার ফলে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

অধিকন্তু, বিশ্বে সর্বনিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। তাই কর এড়ানো ও কর ফাঁকি দূর করতে অর্থনৈতিক কুশীলবদের মাধ্যমে কর কাঠামোর সংশোধনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আয়ের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণোদনা স্বরূপ সরকারও আয়কর হার ও কোম্পানি করের হার অপরিবর্তিত রাখে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালে রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেলেও, কর-জিডিপি অনুপাতের ওপর এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। যার ফলে, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর-জিডিপি অনুপাত অর্জিত হয়নি, আর বর্তমান কোভিড-১৯ অতিমারীর পেক্ষাপটে ২০২০ অর্থবছরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম।

সারণি ১.৬: ২০১১-২০২০ অর্থবছরে মোট ঋণের শতাংশ হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের গতিপ্রকৃতি

ব্যাংকের ধরণ	মোট ঋণের % হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণ									
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১	২৪	২০	২২	২২	২৫	২৭	৩০	২৪	২৩
উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান	২৫	২৭	২৭	৩৩	২৩	২৬	২৩	১৯	১৫	১৬
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬	৬	৬
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৩	৪	৬	৭	৮	১০	৭	৬	৬	৫
মোট	৬	১০	৯	১০	৯	৯	৯	১০	৯	৯

সূত্রঃ ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিকেন্দ্রীকরণ পরিস্থিতি: প্রায় ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি ব্যয়ের ৯০% এরও বেশি নির্বাহ করে এবং সমস্ত সম্পদের ৯৮% যোগান নিশ্চিত করে, যা চরম আর্থিক কেন্দ্রীকতার ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়াও, স্থানীয় সরকারগুলোর দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অতিমাত্রায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ না করার পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহে সামর্থ না থাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করতে পারে না। বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়সমূহ এ দলিলে দ্বিতীয় খন্ডের ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১.৪ গভর্ন্যান্স ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

১.৪.১ প্রধান ক্ষেত্র ১: সরকারি খাতের সক্ষমতা: প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন

উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যে এই বিষয়ে দ্বিমত নেই যে, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন তখনই সম্ভব যখন কোন জাতি কার্যকর রাষ্ট্র সৃষ্টি ও তা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়, যা কিনা ভৌত ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য পুঁজির যোগান দিতে, চুক্তি বাস্তবায়ন করতে এবং আইনশৃঙ্খলা সুরক্ষিত রাখতে পারে। সরকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, যা জন প্রশাসনকে এর কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আরও স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক এবং জবাবাদিহিমূলক হতে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলশ্রুতিতে, সরকারের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নয়ন অপরিহার্য। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা:** কাংখিত ফলাফল পেতে সরকারি নীতিগুলো যেন সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় তার জন্য সরকার সমগ্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়াজুড়ে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এর ফলে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়বে।
- **জন প্রশাসনের জন্য যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা:** রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ যেন রূপকল্প ২০৪১ এবং তদসংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ধারণ করে এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ যেন এ রূপকল্প যথাযথ নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়নে তাঁদের ভূমিকা পালনে এবং স্বীকৃতি প্রদানে বদ্ধপরিকর থাকে এ বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর অধীনে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত হতে হবে। উপরন্তু, সরকারি কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজেদের মধ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির মাধ্যমে এই অংশগ্রহণমূলক রূপকল্প বাস্তবায়নে অংশীদারিত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবেন।
- **পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান:** একটি কার্যকর জন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিনির্ধারকগণ নিশ্চিত করবেন যেন কম যোগ্যতা বা অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা প্রশাসনের মধ্যে পদোন্নতি না পায়। এছাড়াও, এই সমস্যা দূরীকরণে সরকারি কর্মচারিদের সাধারণ শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ্য যে, সরকার নিশ্চিত করবে যে (ক) সরকারি খাতে বিদ্যমান কর্মদক্ষতার অভাব পূরণে কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; এবং (খ) প্রশিক্ষণের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকার আরও নিশ্চিত করবে যে, প্রত্যেক কর্মকর্তাকে একটি নূন্যতম সংখ্যক ঘন্টা/দিন ব্যাপী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, যা সরকারি দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।
- **সরকারি কর্মকমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি:** সরকার মেধাভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালন উপযোগী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখবে। আমলাতন্ত্রের এ সকল কর্মচারী শুধু যে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে তাই নয় বরং উদ্ভাবনী চিন্তা ও সংস্কারের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারক হয়ে উঠার মাধ্যমে গভর্ন্যান্স পদ্ধতির উন্নতিবিধান করতে পারবে। সরকারি কর্মকমিশনের জন্য অধিক আর্থিক স্বায়ত্বশাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে এটি তার কার্যক্রম জোরদার এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে এপিএ-কে একটি কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়সমুহের জবাবদিহিতা পরিস্থিতির উন্নয়নের পাশাপাশি মন্ত্রিসভায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কার্যক্রম ও কর্মপরিবেশ নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। কাজেই, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও সরকার বিদ্যমান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আরও মজবুত এবং উন্নত করতে কাজ করবে। এপিএ-এর মূল পরিকল্পনায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা পুরস্কৃত করার কোন বিধান ছিল না এবং এটি শুধুই সুনাম ও দুর্নাম নির্ধারণ/দোষ-গুণ পরিমাপের প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করত। তবে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মূল্যায়নকালে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা যায় কি না তা সরকারের বিবেচনার মধ্যে থাকবে, যাতে করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও উৎসাহিত হয়। ৮ম পরিকল্পনা সময়কালে অনলাইন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আরও সুনির্দিষ্ট এবং উন্নত করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কাংখিত প্রতিশ্রুতিপূরণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বাস্তবায়ন জোরদার করার মাধ্যমে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। এগুলো হলোঃ ক) প্রণোদনা ব্যবস্থাসহ সরকারের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা নীতি/কৌশল নির্ধারণ; খ) সরকারি খাতের সকল সংস্থায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-এর প্রয়োগ; গ) কর্মচারীদের কর্মসম্পাদন ক্ষমতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংযুক্ত করে তাদের কর্ম পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাঝে সমন্বয় সাধন; ঘ) সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমুহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রস্তুত, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মূল্যায়নের সুবিধার্থে অনলাইন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির হালনাগাদকরণ; এবং ঙ) বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যক্রমের উন্নতি সাধন করবে। বিদ্যমান পদ্ধতিতে নাগরিকগণ তাদের উদ্বেগ বা অভিযোগ সরকারি সংস্থাগুলোতে নিয়মানুযায়ী প্রকাশের প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ পেয়ে আসছে, যার ফলে তাদের আনীত প্রকৃত অভিযোগগুলো কোনরকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন ব্যতিরেকে সহায়ক কার্যসাধন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিকার করা হয়ে থাকে। সুতরাং জনসাধারণের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার এরূপ প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগকে আরো মূল ধারায় আনা হলে সরকারি সংস্থাগুলো জনসাধারণের জন্য আরও উন্নত সেবা দানে সক্ষম হবে।

১.৪.২ প্রধান ক্ষেত্র ২ক: বিচার ও আইনের শাসন

বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান, আধা-আনুষ্ঠানিক বিচারিক প্রতিষ্ঠান এবং বিচারের অধিকারের কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সরকার কর্তৃক বহুল স্বীকৃত একটি বিষয়। এমনকি, জাতিসংঘের প্রণীত এসডিজির আওতায়, 'সকলের জন্য বিচারের অধিকার' শীর্ষক এজেন্ডা বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের বিশেষ তাগিদও পরিলক্ষিত হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে এটি সর্বজনবিদিত যে, কোন জাতির দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন সম্ভাবনা আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রনীতির দ্বারা সম্পদের অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার সক্ষমতার ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল। তবুও, বিচারিক সেবা জনগণের জন্য অভিগম্যতাযোগ্য, সাশ্রয়ী ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য বিচার বিভাগের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। তাই, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে:

আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় সংস্থাসমূহ

১. বর্তমানে বিশ্বের বিচারক-জনসংখ্যার সর্বনিম্ন অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যার ফলে দেশে বিশাল মামলাজট এবং তাদের নিষ্পত্তির নিম্নহার পরিস্থিতি বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে, সর্বশেষ তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারক রয়েছেন প্রায় ১.১ জন, অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিচারকরে সংখ্যা গড়ে ২ থেকে ২.২৫ জন-এ তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক নীচে। ফলশ্রুতিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচারক-জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিচার বিভাগে নিয়োগ ত্বরান্বিত করবে।

২. গবেষণামূলক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কিছু প্রশাসনিক জেলা মামলাজটের সংখ্যা সময়ের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধিতে 'পাইপলাইন' হিসেবে কাজ করে। এসব 'পাইপলাইন' জেলাগুলোর জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে করে উক্ত প্রশাসনিক জেলাগুলোতে অবস্থিত জেলা আদালতসমূহ কার্যকরভাবে নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান পায়।

৩. ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। উক্ত কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগের কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রম বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় উক্ত লক্ষ্য, কৌশল ও কার্যক্রমের- যেগুলো অসম্পূর্ণ বা অবাস্তবায়িত রয়েছে- সেগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

৪. জেলা পর্যায়ের আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সাধারণ, ছোটোখাটো বা হয়রানিমূলক মামলার সংখ্যা কমিয়ে এনে তাঁদের ওপর মামলার চাপ কমানো এবং সত্যিকার অর্থে আইনি প্রতিনিধিত্ব ও রায়ের জন্য অপেক্ষমান গুরুতর এবং জটিল মামলাগুলোকে পরিচালনার জন্য বিচারিক প্রক্রিয়ায় কর্মরতদের যথাযথ সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫. জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনতে স্বল্প খরচে সুষ্ঠু ও দ্রত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৬. আদালতগুলোতে অতিমাত্রায় মামলাজটের প্রেক্ষাপটে সরকার বিচার বিভাগের নীরিক্ষা সংক্রান্ত (Justice Audit) প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত ফলাফলের নিরীখে একটি দ্বিমুখী দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করবে, যা সমস্ত বিচারাধীন, নিস্পত্তি হয়নি এমন মামলা যাচাই-বাছাই

করবে এবং নতুন মামলাসমূহের কঠোর ও দৃঢ় বাছাই প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন মামলার জট পর্যবেক্ষণ কমিটিসমূহ তাদের চলমান কাজ অব্যাহত রেখে, ৫ থেকে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন মামলার যাঁচাই-বাছাই করবে যাতে করে সেগুলো নিস্পত্তি বা খারিজ করে দেয়া যায় এবং এতে করে 'চলমান' মামলা থেকে রায়ের জন্য অপেক্ষমান মামলা ছাঁটাই সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনিস্পত্তিকৃত মামলাসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থেই এগুলো বিচারাধীন নাকি অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা করে নিস্পত্তি করে সম্ভব তা মূল্যায়নের জন্য পরিপূরক যাচাই কার্যক্রমও সম্পাদন করা হবে।

৭. মামলা সমন্বয় কমিটিসমূহ যথাযথ স্থানে/আদালতে মামলা প্রেরণের লক্ষ্যে মামলা বাছাইয়ের পাশাপাশি মামলাজট নিরসণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জেলা থেকে (জেলা সমন্বয় কমিটি) জাতীয় পর্যায়ে নীতি-Feedback প্রমাণ লুপ (Policy-Evidance Feedback Loop) সম্পন্ন করার জন্য আন্ত-মন্ত্রণালয় সমন্বয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৮. সরকার নারী ও শিশুদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যামান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করবে। নারী ও শিশু আদালতে ক্রমবর্ধিষ্ণু বিচারাধীন মামলার সংখ্যা দ্রুততার সাথে কমিয়ে আনা হবে। নারী ও শিশু আদালতের কার্যক্রমের ওপর একটি সামগ্রিক/সমীক্ষা সম্পাদন করা হবে, যাতে করে সেই অনুযায়ী সেবা প্রদানে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

আধা-আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ জনগণ দেওয়ানী বিরোধ এবং আংশিক-ফৌজদারি মামলার সমাধান বা প্রতিকারের জন্য আধা-আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্ভরশীল।[২] তাই, একটি দেশের আইনের শাসন পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর আধা-আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা অপরিহার্য। অতএব, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় অনানুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১. সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা উক্ত এলাকার লোকজনের মধ্যে সালিশ পরিচালনার জন্য প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।

২. ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করবে। তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পর্যাপ্ত সম্পদের সংস্থানও নিশ্চিত করতে হবে।

৩. গ্রাম আদালত ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত আইনি পরিষেবার মধ্যে দ্বৈততা সীমিত পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার গ্রাম আদালতগুলোকে আরো পুন:বিন্যাস করবে।

৪. সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ সমাধানে আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগীয় সংস্থার দ্বারস্থ না হয়ে গ্রাম আদালত ব্যবস্থার ব্যবহার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্থানীয় সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করবে যেন আনুষ্ঠানিক বিচার বিভাগের মামলাজট সমস্যা সময়ের সাথে সাথে হ্রাস পায়।

বিচারে অভিগম্যতা

১. বিচার কার্যে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করতে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিবছর আনুমানিক ২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদান করবে।

২. সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করবে, যেন এই সংস্থাটির সেবা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে কার্যকরভাবে পৌঁছতে পারে এবং আইনি সমস্যা সমাধানে বিচার ব্যবস্থায় তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০০ সালে। ২০০৯ সাল থেকে এ সংস্থাটি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের আইনি সহায়তা প্রদানে পুরোদমে কাজ করছে। বর্তমানে ৬৪টি জেলা আইন সহায়তা কার্যালয়, সুপ্রীম কোর্ট আইন সহায়তা অফিস, ২টি শ্রম আদালত আইন সহায়তা কেন্দ্র এবং জাতীয় হেল্পলাইন কল সেন্টার প্রভৃতি জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতায় সরকারি আইনি সহায়তা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তবুও, সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এ সংস্থার প্রধান সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান। পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬৪ জেলাতেই আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ২০১৭ সালের একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪১টি জেলাতেই কোন আইন সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা নেই।

---

২ দেখুন: UNDP, (2006). Doing Justice: How informal justice systems can contribute Oslo Governance Centre

৩. বিচার ব্যবস্থায় অভিগ্যমতা সুগম করতে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এনজিও ও অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলবে। তাতে বিভিন্ন প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে এবং তা মানসম্মত আইনি সহায়তা প্রদানে সহায়ক হবে।

৪. আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত কৌশল এবং কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সমস্যা অনুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এটি আইনি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য অসহায় জনগোষ্ঠীর অনুপাত এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য মূল্যায়ন ও লিপিবদ্ধ করবে যাতে করে এসব তথ্য পর্যালোচনা করে কারা, কখন এবং কি কি কারণে বিচার ব্যবস্থায় অভিগম্যতা পেয়েছে তা জানা যায়।

৫. সরকার জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের পরিপূরক উপায় হিসেবে প্যারা-লিগ্যালিজমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে। প্যারালিগ্যালদের ব্যবহার মামলাজট ও বিচারাধীন কয়েদী সম্পর্কিত সমস্যা প্রশমিত করেছে এবং অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। সত্যিকার অর্থে, প্যারালিগ্যালগণ শুধু দরিদ্র্য ও নারীদের প্রয়োজনীয় আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ ক্ষুণ্ন করে এমন অসম্পূর্ণ তথ্যের সমস্যার সমাধান করেনা, অধিকন্তু জেলখানার প্রকৃত অবস্থা যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ করতে জেলা জজ এবং জেলা প্রশাসক/ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের কারাগার পরিদর্শনে সহায়তা করে থাকে। প্যারালিগ্যালগণ পুলিশকে বিশেষত ছোট অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুততর সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে উৎসাহিত করে থাকে। এর ফলে পুলিশের প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমান কারাবন্দীদের কারাভোগের সময় হ্রাস পায়। ফলে এসব মামলা পরিচালনা করতে আদালতসমূহ আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১.৪.৩ প্রধান ক্ষেত্র ২খ: আইন প্রণয়ন এবং আইনের শাসন

বাংলাদেশ সরকার কেবল সঠিক আইন প্রণয়ন করে না, বরং এই প্রক্রিয়াটিকে ফলপ্রসু ও কার্যপোযোগী করতেও আগ্রহী। এ লক্ষ্যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় চলমান আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ ১. আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে আইনী খসড়া প্রণয়নকারী দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য লেজিসলেটিভ কর্মকর্তাদের জন্য দেশ ও দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ডিপ্লোমা ও উচ্চ শিক্ষার কোর্সের আয়োজন; ২. লেজিসলেটিভ গবেষণা এবং লেজিসলেটিভ সম্পাদনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা; ৩. অগ্রাধিকার ও গুরুত্বের ভিত্তিতে সকল আইন ইংরেজি থেকে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ; ৪. ইলেক্ট্রনিক ক্যাটালগিং সিস্টেম সম্বলিত আইন বিষয়ক গ্রন্থাগার এবং আইন বিষয়ক ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের জন্য একটি সংরক্ষণাগার ও রেকর্ড রুম প্রতিষ্ঠা; ৫. আইন বিষয়ক গনসচেতনতা কেন্দ্র এবং রিসোর্স ডকুমেন্টশন কেন্দ্র স্থাপন; ৬. অধ:স্তন আইনসমুহকে কোডিং এর আওতায় আনা এবং হালনাগাদ করা।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিচার বিভাগকে এগিয়ে নিতে উন্নত পদক্ষেপসমূহ

ই-জুডিশিয়ারি: বাংলাদেশ সরকার বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে সজাগ রয়েছে। বিচারক এবং আদালতের কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম, হার্ডওয়্যার ও সংযোগ সহায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার সহায়তা প্রদান প্রভৃতি এই ডিজিটাইজেশনের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব, ডোমেইন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ত্রিমুখী সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাহায্য নিয়ে আইন ও বিচার বিভাগ ২৬৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, হার্ডওয়্যার সরবরাহ এবং সংযোগ সহায়তা প্রদান ত্বরান্বিত করার একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক জেলায় মাঠ পর্যায়ে বিচার বিভাগের ডিজিটাল কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন প্রোগ্রামার এবং কয়েকজন সহকারী প্রোগ্রামার, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হবে।

স্বতন্ত্র প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা: প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত, তাৎক্ষণিক এবং বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন একটি দৃশ্যমান এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অ্যাডিশনাল এজি, ডিএজি, এবং এএজি নিয়োগের সুপারিশ করবে। সরকার ক্রমান্বয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে। প্রাথমিকভাবে, উল্লেখিত অ্যাটর্নি সার্ভিসের ৭০ শতাংশ নিয়োগ দেয়া হবে সরকার কর্তৃক নির্বাচিত নিবন্ধিত আইনজীবীদের মধ্য থেকে। অবশিষ্ট্য ৩০ শতাংশ নিয়োগ হবে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি অনুসরণের পূর্বে অ্যাটর্নি সার্ভিসের নিয়োগ বিধি, শৃঙ্খলা বিধি, সেবা বিধি, পদায়ন ও পদোন্নতি বিষয়ক নির্দেশিকা, চাকরিতে থাকা অবস্থায় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি দলিলাদি প্রণয়ন করা হবে।

জুডিশিয়াল একাডেমী প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সকল যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি উচ্চাকাংখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই লক্ষ্য পূরণে বিচার বিভাগও প্রয়োজনীয় অবদান রাখবে। উন্নত দেশগুলোর মত বিচার বিভাগের উচ্চতর অবস্থান নিশ্চিত করতে একটি জুডিশিয়াল একাডেমি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। জুডিশিয়ালি একাডেমি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা, মানসম্মত পাঠ্যক্রম রচনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, আন্তর্জাতিক বিষয় সমন্বয় সাধন এবং নিম্ন ও উচ্চ উভয় আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে। এ একাডেমীটি রাজধানী ঢাকার আশেপাশে অবস্থিত হতে পারে এবং এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি নিশ্চিত করতে প্রায় ৩৫ একরের মত জমির প্রয়োজন হতে পারে।

অধঃস্তন আদালতে কর্মরত বিচারকগণের পেশাগত উন্নয়ন: বাংলাদেশ সরকার কর্মরত অবস্থায় বিচারকগণের ক্রমাগত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত রয়েছে। বিশেষত, সাইবার ক্রাইম, অনলাইন সুরক্ষা, বহুজাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিচার প্রক্রিয়ায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার, ডিজিটাল আদালত ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত অপরাধ বিচার, কিশোর অপরাধ বিচার, পারিবারিক নির্যাতন, অফশোর কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অফশোর অপরাধ ও বিরোধ, সমুদ্র আইন, জলবায়ু পরিবর্তন আইন ও নীতি, এনার্জি বিষয়ক আইন ও নীতি, টেকসই উন্নয়নের জন্য বিচার বিভাগীয় পরিকল্পনা, বিচার বিভাগীয় প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ, উপকূলবর্তী এলাকা ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক সুরক্ষা, পরিবেশগত পরিকল্পনা, গভর্ন্যান্স এবং ন্যায়বিচার, পরিবেশগত আদালত পদ্ধতি, বহুজাতিক সামুদ্রিক সীমানা স্থান-সংক্রান্ত পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিচারিক কর্মকর্তাদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে আধুনিকতম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার উল্লিখিত সকল বিষয়ের ওপর বিচারকদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে বিশেষায়িত প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করতে বিশেষায়িত দল গঠন করবে।

১.৪.৪ প্রধান ক্ষেত্র ৩: অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্সের উন্নতি সাধন

অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতে সুরক্ষা প্রদান, চুক্তি কার্যকর এবং যথাযথ ভৌত ও সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত মানব সম্পদের সমন্বয়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কাজ করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহে চুক্তি কার্যকর করা, সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতে সুরক্ষা প্রদান এবং অর্থনৈতিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে সফল মিথস্ক্রিয়া নিশ্চিত করতে এর সাথে সম্পর্কিত নিয়ম ও শর্তাবলীর প্রয়োজনীয় চর্চার নিশ্চয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তদুপরি, এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত যে, যেসকল দেশ উন্নত অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স সম্বলিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে সে সকল দেশে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন টেকসই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গভর্ন্যান্স-এর উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

ব্যাংকিং খাতের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ

ব্যাংকিং খাত তদারকির উন্নতি সাধন: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের যথাযথ ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করবে, যাতে করে ব্যাংকটি এর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। তদনিমিত্ত, সরকার যোগ্য কর্মীদের বর্ধিত হারে নিয়োগে সহায়তা করবে, এর কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সংগ্রহ করতে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দিবে এবং বিচক্ষণ নীতিমালার প্রয়োগে সহায়তা করবে। সরকার এই বিষয়ে অবগত রয়েছে যে, একটি সুষ্ঠু মুদ্রা নীতি ব্যবস্থাপনা এবং নতুন ব্যাংকগুলোকে লাইসেন্স প্রদান, ব্যাংক একীকরণ, ব্যাংকের তদারকি ও ঋণ আদায়ের মত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিচক্ষণতা অনুশীলনের জন্য একটি কার্যকর স্বায়ত্বশাসিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিকল্প নেই।

ব্যাসেল (Basel) ১ ও ২ গ্রহণের ফলে ব্যাংকগুলোতে উন্নত তদারকির যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হয়েছে, উচ্চমানের তদারকির ক্রমাগত উন্নয়নের গুরুত্ব তারই প্রতিফলন। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পোর্টফোলিও মানের অবনতি ব্যাংকিং খাতের পরিপূর্ণতাকে ব্যাহত করছে। ফলে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার ব্যাংকিং খাতের কর্মক্ষমতার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সমগ্র ব্যাংকিং খাতকে একটি একক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে আনা হবে। ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাস এবং ব্যাসেল ৩ এর শর্তাবলীর সাথে যুৎসই মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত নিশ্চিত করতে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংককে দ্রুত কর্ম সম্পাদনে সক্ষম করে তুলবে।

ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যথাযথ পরিবীক্ষণ ও তদারকির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান ভালভাবে কর্মসম্পাদন

করছে বা যাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর তদারকি ও তারল্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উত্তরণ সম্ভব প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রেখে ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রেণীভূক্ত করতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

ঋণ আদায় ও ব্যাংক আদালতের কার্যকারিতার উন্নতি সাধন: বকেয়া ঋণের বিষয়ে আদালত থেকে রায় প্রাপ্তি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদালতের দ্বারস্থ হতে নিরুৎসাহিত করে। এই সমস্যা দূরীকরণে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ এবং অগ্রিম আদায় প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে 'অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩' মার্চ, ২০০৩ থেকে কার্যকর হয়। এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যাংক তাদের বকেয়া আদায়ে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে বন্ধক রাখা সম্পত্তি আদালতের কোনও পূর্ব অনুমতি ছাড়াই বিক্রয় করতে পারবে। এটি একটি উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ, তবে তা বাস্তবায়নের বিশাল চ্যালেঞ্জের কারণে এই বিধানের কার্যকারিতা প্রশ্নের সম্মুখীন। এ প্রেক্ষিতে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার ঋণ আদায়ের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'অর্থ ঋণ আদালত'-এর কার্যকারিতার উন্নতি সাধন করবে। এছাড়াও, 'অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩'-এর পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে- যাতে করে ঋণখেলাপীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে যেতে না পারে এবং ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করতে না পারে।

সুদের হার নীতির যথাযথ ব্যবস্থাপনা: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকার বাংলাদেশ ব্যাংককে সুদের হার নীতি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে, যাতে করে আর্থিক মধ্যস্থতা জোরদার করার পাশাপাশি সুদের নিম্ন হার বজায় রেখে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে যায়। সুদের হার ব্যবস্থাপনায় অস্থিতিশীলতা বা দুর্বলতা প্রবৃদ্ধির গতিকে ব্যাহত করে এবং ব্যাংক আমানত বৃদ্ধির হার কমিয়ে ব্যাংকিং খাতকে দুর্বল করে তুলতে পারে। শ্রেণীকৃত ঋণের উর্দ্ধগামীতার বিপরীতে ধীর গতির আমানত ভিত্তি ব্যাংকগুলোর জন্য অতি তারল্য এবং মুনাফা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, যা অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে। শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে এবং ব্যাংকের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ প্রদানের নিম্ন বাস্তব সুদ হারের সাথে আমানত গ্রহণের জন্য ইতিবাচক বাস্তব সুদ হারের সমন্বয় করা যেতে পারে।

সরকারি ব্যাংকের পুনঃমূলধনের জন্য কঠোর মানদণ্ড: নিম্ন পরিকৃতি সম্পন্ন সরকারি ব্যাংকগুলোতে বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ স্থানান্তরের পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহীতা ব্যাংককে তাদের কর্ম পরিচালনা পদ্ধতি সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই স্বচ্ছলতা নিশ্চিতের কঠোর মানদণ্ড অনুসরণের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, অন্যথায় শাস্তি স্বরূপ প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। নির্ধারিত সময় পরেও যদি পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তবে ব্যাংকগুলোতে বড় ধরণের সংস্কার হিসেবে তাদের কর্ম পরিচালনার পরিধি হ্রাস, বৈদেশিক ব্যবস্থাপনা, একীভূতকরণ, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। প্রতিটি ব্যাংকে মূলধন প্রবাহের তথ্য এবং একই সাথে সরকার এবং ব্যাংকের উভয়ের সম্মতিতে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহ সবার জন্য উন্মুক্ত করে পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করা হবে, যাতে করে সরকারি তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নতিকরণ

কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি: সরকারের কার্যকর কর্ম পরিচালনা বাজার সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। এটি, উপরন্তু, কর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় দূর্বলতার ফলাফল হচ্ছে কর আদায়ে দূর্বলতা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের সরকারি সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশে করের ভিত্তি সম্প্রসারণে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নতুন করদাতাদের তালিকাভুক্ত করতে এবং বিদ্যমান করদাতাদের তাদের প্রদেয় কর পরিশোধ করতে উৎসাহিত করার জন্য নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী সর্বনিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত সম্বলিত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি হওয়ায়, সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় দেশের কর-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এতদউদ্দেশ্যে সরকার আর্থিক বিষয়ে সংস্কার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিবে। কর সংস্কারের বিস্তারিত এই দলিলের প্রথম খন্ডের ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে উন্নতিকরণ: ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট প্রণয়ন উন্নতি বিধানে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে মধ্য-মেয়াদী বাজেট কাঠামো সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে চালু করা হয়েছে। সকল ধরণের বাজেট হিসাব বর্তমানে আইবাস ++ (iBAS++) নামক সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমন্বিত, যা একটি মানসম্মত হিসাবরক্ষণ কাঠামোর দ্বারা সময়মতো অর্থ ছাড় এবং ব্যয়ের হিসাবরক্ষণ কার্যাদি সম্পন্ন করে। তবে, বাজেট প্রক্রিয়া এখনও বার্ষিক চক্রে আবদ্ধ

এবং সম্পাদিত ব্যয় পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেটে আবর্তিত হয় না। ফলে বছরের শেষে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখনও উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট সমন্বয়ে দূর্বলতা বিদ্যামান। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এই সমস্যা দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। জাতীয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেটের মধ্যে আরও সংগতি ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উন্নত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা: উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি সহায়তার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় পর্যায়ে আনীত সরকারি ব্যয়ের বিষয়ে একাধিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্কার সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করেছে। তবুও, এক্ষেত্রে এখনও ঘাটতি রয়েছে। ২০১৬ সালের সরকারি ব্যয়ের আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Public Expenditure Financial Assessment Report, PEFA) হতে বাংলাদেশের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার কর্ম পরিকৃতির ওপর একটি মিশ্র রেটিং পাওয়া গেছে। উক্ত প্রতিবেদনে প্রায় ৩১ টি PEFA সূচককে A-D এর গ্রেডিং স্কেলে রেটিং করা হয়েছিল, যেখানে A অত্যন্ত সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচ্য। এর মধ্যের গ্রেডগুলোকেও এককেটি ইতিবাচক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা কর্ম পরিকৃতিকে পরবর্তী উচ্চ গ্রেডের (যেমন, সি+ হচ্ছে বি এর কাছাকাছি) নিকটে এনে দেয়। রেটিংগুলোর বণ্টন পদ্ধতি চিত্র ১.২ এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১.২: PEFA রেটিং ২০১৫ এর বণ্টন

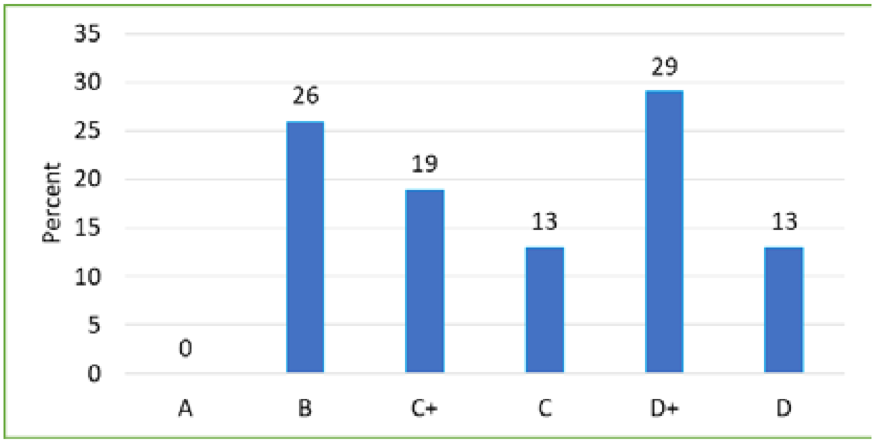

সূত্র: PEFA Report, ২০১৬

PEFA-এর যে সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন (সি বা তার নীচে গ্রেড) সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: ব্যয় সংমিশ্রণ আউটপুট (ডি+); রাজস্ব আডটপুট (সি); বাজেট শ্রেণিবদ্ধকরণ (সি); সরকারি বাজেট বর্হিভূত কার্যক্রম (ডি); স্থানীয় সরকারগুলোতে হস্তান্তর (ডি+); পরিষেবা সরবরাহের জন্য কর্মসম্পাদনের ক্ষমতার তথ্য (ডি+); রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা (ডি), আর্থিক ঝুঁকি রিপোর্টিং (ডি+); সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা (সি); সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ডি+); সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক পূর্বাভাস (ডি+); রাজস্ব প্রশাসন (ডি+); ব্যয়ের বকেয়া (ডি); অর্থনৈতিক ব্যয়ের ওপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (সি); অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ (ডি); বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন (ডি+); এবং বহিঃনিরীক্ষা (ডি+)।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। তবে, পরবর্তী ধাপের সংস্কারের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তিতে বিলম্বসহ আরও নানাবিধ কারণে এই পরিকল্পনার প্রায়োগিক বাস্তবায়ন ব্যহত হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে একটি সম্মত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নে জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

বাজেট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ধিত অংগীকার: বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সরকার প্রাক-বাজেট বিবৃতিটি পাবলিক ডোমেইনে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিবে। প্রধান প্রধান অংশীজনের স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের পর্যায় বৃদ্ধি করতে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উন্মুক্ত বাজেট জরিপ দ্বারা সৃষ্ট উন্মুক্ত বাজেট সূচকে বর্ণিত বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির মাধ্যমে এই নির্দিষ্ট মাত্রার অগ্রগতি চিহ্নিত করা যাবে। উক্ত উন্মুক্ত বাজেট জরিপে বাজেট সংক্রান্ত ৮টি গুরুত্বপূর্ণ দলিল সরকার জনগণের জন্য কার্যকর এবং পরিপূর্ণভাবে পাবলিক ডোমেইনে সরবরাহ করে কিনা তা নির্ধারণে ১০০টির বেশি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। সরকার আয় ও ব্যয় উভয়ের প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করে রাজস্ব সংক্রান্ত সকল উপাত্ত এতে তুলে ধরবে।

কয়েক বছর ভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (Multi-year Public Investment Programme, MYPIP) প্রবর্তন: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি ও অর্জনের ওপর ভিত্তি করে সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার সংস্কার ত্বরান্বিত করতে বদ্ধপরিকর। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার সংস্কারে পরিকল্পনা কমিশন বরাবরের মতই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল, ২০১৬-২০২১ এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা, ২০১৮-২০২৩- এর বৃহত্তর পরিসরে সরকারি বিনিয়োগ এর সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারি বিনিয়োগ সংস্কার প্রক্রিয়ায় সকল অংশীজনের সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থায় সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো হলো:

- **প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াসমূহের উন্নতিসাধন:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন ফর্ম্যাট এবং সেক্টরের মূল্যায়ন ফর্ম্যাট প্রবর্তন করা হবে এবং তা পরীক্ষামূলকভাবে (১) বিদ্যুৎ ও শক্তি, এবং (২) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনার যাচাই ও মূল্যায়নে ব্যবহৃত হবে। এই দু'টি পরীক্ষামূলক খাতে সফল হলে পরে তা অন্যান্য সকল খাতে প্রয়োগ করা হবে।
- **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর মধ্যে কৌশলগত সংযোগ জোরদার করা:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে খাতভিত্তিক কৌশলপত্র এবং কয়েক বছরভিত্তিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি চালু করা হবে এবং তা উল্লেখিত দু'টি পাইলট খাতে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হবে। পরবর্তিতে তা অন্যান্য খাতেও প্রয়োগ করা হবে।
- **এডিপি/আরএডিপির খাতভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ করা:** এডিপি/আরএডিপি এর বর্তমান খাতভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ১৭টি খাতের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ এর ১৪টি খাতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কার্যক্রম বিভাগ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এমটিবিএফ এর সাথে এডিপি/আরএডিপি সংযোগ দৃঢ় করার লক্ষ্যে এ দুটি দলিল অনুসরণে ১৪টি খাতের ভিত্তিতে এডিপি/আরএডিপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- **এডিপি-এর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা:** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সকল সরকারি দপ্তরের জন্য একাধিকবছরভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি মডিউলসহ এডিপি-এর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করে গড়ে তোলা হবে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় বাজেট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় এডিপি-এর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে অর্থ বিভাগের জাতীয় ডিজিটাল ইন্টারফেসও প্রতিষ্ঠিত হবে।

পুঁজি বাজারের কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতার উন্নতিকরণ

অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান বিপুল অর্থায়নের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের পুঁজি বাজার অর্থনীতিতে আর্থিক মধ্যস্থতা এবং সম্পদ সংস্থানের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে নি। তিনটি মূল সীমাবদ্ধতার কারণে পুঁজি বাজারের কর্মসম্পাদন ক্ষমতা বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছেঃ তথ্যের অসামঞ্জস্যতা ও বাজারের ওপর অনাস্থা, পুঁজি বাজারের পরিবর্তে ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগের প্রতি নাগরিকদের অধিকতর আগ্রহ এবং নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে দুর্বলতা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পুঁজি বাজারের বৃহত্তর সক্ষমতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

- সরকার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি, আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিচক্ষণ প্রবিধান বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহে দীর্ঘ-মেয়াদি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বর্তমানে বিএসইসি-এর নতুন সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। পুঁজিবাজারে ইস্যুকারী এবং বাজার মধ্যস্থতাকারীদের জন্য বিচক্ষণ প্রবিধান এবং তদারকি নিশ্চিত করতে কমিশন সিকিউরিটিজ আইন ও বিধিমালায় পরিবর্তন আনছে।
- বাংলাদেশে একটি সক্রিয়, গতিশীল এবং সুশাসিত প্রাথমিক বাজার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঋণ এবং ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ ইস্যু সম্পর্কিত আইন ও প্রবিধানসমূহ ঢেলে সাজানো হবে, যাতে করে সিকিউরিটিজগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এই প্রক্রিয়াতে নিরীক্ষক এবং রেটিং এজেন্সিগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় দ্রুত সংস্কার আনতে হবে।

- প্রসারণযোগ্য ব্যবসায়িক প্রতিবেদনের ভাষা (Extensible Business Reporting Language, XBRL) সহযোগে প্রস্তুতকৃত একটি প্রযুক্তিগত প্লাটফর্ম স্টক এক্সচেঞ্জ, ইস্যুকারী এবং অন্যান্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত। ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অফ অডিটিং এবং আধুনিক কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কোডগুলোর সাথে ইস্যুকারী এবং বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পর্যবেক্ষণ কার্যকর করতে বিএসইসি বিপুল পরিমানে বিনিয়োগ করবে।

- সরকার বন্ড এবং ডিরাইভেটিভ উভয় বাজারের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্রপূর্ণ পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে করে ব্যবসায়ের অর্থায়ন ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাজারে দিকে ধাবিত হয়। বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর একটি ডিরাইভেটিভ মার্কেট অপরিহার্য। এই গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা বিনির্মাণে কমিশন স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

- সুশাসিত পুঁজি বাজার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর মত প্রধান নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় অপরিহার্য। একটি আধুনিক পুঁজি বাজার গঠনে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিএসইসির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার বিষয় যাচাই করবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে, বিশেষত তাদের মধ্যে যারা শেয়ার বাজারের সাথে সম্পৃক্ত।

- শেয়ার বাজারে সিকিউরিটিজ লেনদেনের কারসাজি রোধ এবং বৃহত্তর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকার নজরদারি সফটওয়্যার/পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করবে। এ লক্ষ্যে, বিএসইসি তাদের ট্রেডিং প্লাটফর্ম, অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং একটি গতিশীল বাস্তব সময়ের বাণিজ্য নিষ্পত্তি অবকাঠামোর উন্নতিবিধানে স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে।

- সিকিউরিটি আইনে তদন্ত, তদারকি এবং এর প্রয়োগ বিএসইসি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করবে। বিএসইসির নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে এই মূল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন করে মানব সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ সংস্থানের বিধান রয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সিকিউরিটিজ আইনগুলো ক্রমাগত বিবর্ধিত হচ্ছে। বিএসইসির আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি এবং তা প্রকাশের বিধি যাতে কোম্পানিগুলো মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সংস্থাগুলো আর্থিক প্রকাশের বিধি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে কঠোর জবাবদিহিতা কার্যকর করা হবে। এজন্য শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য শেয়ার বাজার সম্পর্কিত আইনী মামলাসমূহ আরও বেশি পরিমাণে পুঁজিবাজারের বিশেষ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা দরকার।

- কর সম্পর্কিত আইন পুঁজিবাজারের জন্য অবিসংবাদিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাতের কোম্পানিগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত করার জন্য এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুত থাকতে সরকার কর ব্যবস্থায় প্রদত্ত প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করবে। মূলধন জারিকারীদের জন্য তালিকাভূক্তি আকর্ষণীয় করে তোলা হবে এবং এই লক্ষ্যে কর নীতিমালা প্রস্তুত করা হবে। বর্তমান ব্যাংক ভিত্তিক ঋণ গ্রহণের প্রবণতাকে পুঁজি বাজার-ভিত্তিক অর্থায়নে রূপান্তর নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- ৭ম পরিকল্পনার সময়কালে সরকার পুঁজিবাজারের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে আর্থিক প্রতিবেদন কাউন্সিল (Financial Reporting Council) গঠন করে। এ কাউন্সিল পুঁজি বাজারের প্রবিধান উন্নতিকরণে বিএসইসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের মান কার্যকর করার জন্য সরকার আর্থিক প্রতিবেদন কাউন্সিলকে আরও কার্যকর এবং প্রায়োগিক করে তুলবে। অপর দিকে, পুঁজি বাজার বিষয়ক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল শেয়ারবাজার সংক্রান্ত কোনও মামলা না পাওয়ার কারণে গত ১৮ মাস ধরে অকার্যকর ছিল। অষ্টম পরিকল্পনার আওতায় সরকার পুঁজি বাজারের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের মান উন্নীত করতে অংগীকারাবদ্ধ।

- বাংলাদেশে আর্থিক বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশের আর্থিক বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য সরকারের দুটি প্রতিষ্ঠান হল বাংলাদেশ একাডেমি অফ সিকিউরিটিজ মার্কেট এবং বাংলাদেশ ক্যাপিটাল মার্কেট ইনস্টিটিউট। সরকার উভয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে এবং তাদেরকে আর্থিক বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১.৪.৫ প্রধান ক্ষেত্র ৪: স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্স উন্নতিকরণ

স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সুশাসন বজায় থাকলে তা রাষ্ট্রকে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল ভোগ করতে সহায়তা প্রদান করে। স্থানীয় এবং জাতীয়-রাষ্ট্রের উভয় সংগঠনসমূহ প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ এবং তার সর্বোত্তম প্রয়োগ নিশ্চিতে যদি সমন্বিতভাবে কাজ করে তাহলে কার্যকর নীতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়। বাংলাদেশ সরকার বিকেন্দ্রীকরণ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে উন্নত গভর্ন্যান্সের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সজাগ রয়েছে এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। এ দলিলের দ্বিতীয় খন্ডের ৭ম অধ্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হলো অধিকতর এবং আরও উল্লেখযোগ্য সংস্থানসহ বৃহত্তর প্রসাশনিক ও আর্থিক স্বায়ত্বশাসনের মাধ্যমে তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় উন্নততর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে যে ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনুরূপ প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

১.৪.৬ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পরিকল্পিত কার্যক্রমের অন্যান্য ক্ষেত্র

- **নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণ:** সরকার এই বিষয়ে অবগত আছে যে একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন ছাড়া নাগরিকদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ফলে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পপনার আওতায় নির্বাচন কমিশনের কর্মসম্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হবে: (১) নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহার সম্প্রসারণে সরকার নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবে; (২) নির্বাচন কমিশন স্বতন্ত্র ও কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা করবে; এবং (৩) স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রচার প্রচারণার ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আরও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- **সংসদীয় প্রক্রিয়া কার্যকর করা:** বাংলাদেশ সরকার কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক গভর্ন্যান্সের আদর্শের প্রতিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, বরং প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক এবং অংশগ্রহণমূলক করতেও আগ্রহী। সেই লক্ষ্যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পপনার সময়কালে জনগণের আস্থা ও আকাংখার আঁধার হিসেবে সংসদের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হবে: (১) সরকার জনসাধারণের জন্য আরও বেশি সংখ্যক শুনানি উন্মুক্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর থাকবে, বিশেষত, পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির মতো বাজেট কমিটির শুনানি; (২) কোরামের অভাবে যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয় তা হ্রাস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; (৩) পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির কার্যকারিতার উন্নতি সাধনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে; (৪) সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের শতকরা হার নূন্যতম ৩৩% নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে।
- **ন্যায়পাল নিয়োগ:** সপ্তম পরিকল্পনার আওতায় প্রতিশ্রুত ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিশ্চিতকরণে সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।
- **দুর্নীতি দমন:** প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি নির্মুলের লক্ষ্যে সরকার দুর্নীতি দমনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং দুদককে ব্যাপকভাবে ঢেলে সাজানো। যেহেতু, দুদকের একার পক্ষে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা কঠিন হয়ে পড়বে, কাজেই এই লক্ষ্যে সুশীল সমাজ ও অন্যান্য অংশীজন সহযোগে সমগ্র সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। সুতরাং সরকার গভর্ন্যান্স বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত রেটিং অনুযায়ী দেশের কর্মসম্পাদন সক্ষমতার উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ অগ্রাধিকার পাবে-(১) দুদককে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য সক্ষম করে তোলা হবে, যেটি সরাসরি সরকার প্রধানের নিকট রিপোর্ট করবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে এজন্য আইনি প্রবিধান সংশোধন করা হবে; (২) অপরাধের তদন্ত এবং অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে দুদক কোনও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে না; (৩) দুদক জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ ট্র্যাক করবে; (৪) সরকার দুদককে এর দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতে এর প্রয়োজনীয় সংস্থানের যোগান বৃদ্ধি করবে। এ সম্পদ সংস্থানের মধ্যে রয়েছে: আরও কর্মী নিয়োগ, আর্থিক বরাদ্দ, প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধা সরবরাহ এবং অটোমেশন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ; (৫) উল্লেখিত বর্ধিত সংস্থানের যোগান পেয়ে দুদক দ্রুত মামলা নিস্পত্তি এবং ব্যর্থতার জন্য দায়ভার গ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে; (৬) দুদক এর কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে দুর্নীতি দমনে প্রতিরোধ ও তদন্তের আধুনিক পদ্ধতিগুলোর আলোকে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর

দিবে; (৭) পাবলিক ডোমেইনে সর্বোচ্চ সংখ্যক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে এবং তথ্য অধিকার নথিভুক্তিকরণ (RTI Filling) ও পাবলিক ডোমেইনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত মতামতের প্রতি সংবেদনশীল থেকে দুদক নিজেদের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে; (৮) সংসদীয় কমিটি দ্বারা গণ শুনানির আয়োজন করে দুদক আরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে; (৯) একটি সর্বসম্মত সময়ে মধ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট বিভাগসমুহে দুর্নীতি দমন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে; এবং (১০) সরকার তথ্য প্রকাশকারী সুরক্ষা আইন (Whistle blower Act) কার্যকর করবে।

- **মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর শক্তিশালীকরণ:** প্রজাতন্ত্রের হিসাব এবং সকল আদালত ও সরকারের সকল কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তাদের হিসেবের নিরীক্ষণ ও রিপোর্টিং এর দায়িত্ব পালন করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর। তদুপরি, নীতিনির্ধারকদের মতে একটি স্বচ্ছ ও সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান উল্লেখিত সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের নিয়মিত নিরীক্ষণ নিশ্চিত করবে এবং জনগণের মতামতের জন্য প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, যা সাধারণ জবাবদিহিতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশের সুযোগ করে দেবে। কাজেই সরকার একটি নিয়মিত এবং কার্যকর কাঠামো প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে করে প্রতিষ্ঠানটি আরও স্বতন্ত্র ও ফলাফল-ভিত্তিক নিরীক্ষণ পরিচালনা করে। এছাড়াও, সুস্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করে নিরীক্ষণ রিপোর্টের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

- **ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন:** ভূমি সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ-এর ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন করা হবে, যাতে করে ইহা নিম্নবর্ণিত তিনটি দপ্তরে সহজলভ্য হয়: (১) ভূমি নিবন্ধন, (২) সহকারী কমিশনার, ভূমি (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। এই ডিজিটাইজেশন প্রয়োজনীয় তথ্যের সহজলভ্যতা এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের দ্রুততর নিস্পত্তিও নিশ্চিত করবে। সুনির্দিষ্টভাবে, ডিজিটাল উপায়ে রক্ষিত মিউটেশন রেকর্ডের তথ্যাদির পাশাপাশি জমির দাগ অনুযায়ী মৌজা জরিপ এবং জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত নিবন্ধিত দলিলসমূহ থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট এবং সঠিক রেকর্ড পূর্ববর্তী সমস্ত লেনদেনের ইতিহাসসহ জমির মালিকানা বা উত্তরাধিকারের প্রমাণীকরণের জন্য একটি কার্যকর এবং স্বচ্ছ ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। তবুও, উন্নততর জনসেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি ‘ওয়ান স্টপ’ সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়াজন।

- **ই-রেজিস্ট্রেশন:** ভূমি মালিকানা স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার ই-রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। ইহা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের ভূমিকা এবং ভূমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া - এ দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে, যা রূপকল্প ২০৪১-কে সমর্থন করে। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা এবং ৬৪টি জেলায় ভূমি নিবন্ধন দপ্তর প্রতিষ্ঠা নিবন্ধকরণ প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তি সহজতর করবে, যা ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে এবং একই সাথে দ্রুত এবং স্বচ্ছ সেবা পেতে সহায়ক হবে।

- **সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমুহের মাঝে উন্নততর সমন্বয় সাধন:** দক্ষ ও কার্যকর ভূমি প্রশাসন বিষয়ক ই-সার্ভিস নিশ্চিতে, জাতীয় ও তৃণমূল উভয় পর্যায়ে- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাঝে বিদ্যমান সমন্বয় আরো সুদৃঢ় করা হবে। সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর দপ্তরে কর্মরত সকল কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সক্ষমতা-বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ভূমি অফিসের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণের পাশাপাশি এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদনের নিয়মিত প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে। ভূমি প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী, আর্থিক সংস্থান এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিক সুবিধাদি প্রদান জোরদার করা হবে।

- **তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ:** বাংলাদেশের তথ্যের যেমন অপ্রতুলতা রয়েছে, তেমনি সময়মতো তথ্য পাওয়াও যায়না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হয় না। স্বচ্ছতার উন্নতিবিধানের জন্য সরকারি কৌশল, নীতি, কার্যক্রম, কার্যাবলী ইত্যাদির স্বাধীন মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য ও উপাত্তের প্রাপ্যতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনেক ক্ষেত্রে, সরকারি ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার বান্ধব নয়। এই গুরুতর উদ্বেগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সমস্ত সরকারি তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা দরকার।

- **তথ্য কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি:** সরকার নিশ্চিত করবে যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় করা আবেদনের প্রতি তথ্য কমিশন কর্তৃপক্ষ আরও সংবেদনশীল হবে। এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদনসমুহের অগ্রগতি ও তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থাগুলো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হবে। তথ্য কমিশন যথাসময়ে পাবলিক ডোমেইনে তথ্য বিষয়ক আবেদনসমূহ, তাদের নথিভুক্তকরণ এবং সরবরাহকৃত তথ্যের বিষয়াবলী প্রকাশ করবে। পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- **গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান:** সরকার বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধি, সরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: দুদক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রমের ডিজিটাইজেশন এবং অটোমেশন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ, ব্যাংকিং খাত এবং পুঁজিবাজারের সংস্কারের নিমিত্তে বর্ধিত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করবে। তদুপরি, সরকার এডিপি প্রকল্পসমুহের জন্য বরাদ্দকৃত আর্থিক সংস্থান যথাসময়ে ব্যয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহ শক্তিশালীকরণ:** ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহ থেকে প্রদত্ত পরিষেবাদি মূলতঃ ইন্টারনেট ভিত্তিক। এ সকল সেন্টারে পরিষেবাদি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করতে, যেসব অঞ্চলে এ সেন্টারসমূহ অবস্থিত সেসব অঞ্চলের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নত করতে হবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রমের ওপর স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- **ডিজিটাল শিক্ষার উন্নতিকরণ:** সরকারি ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশনের দ্রুত বিস্তার এবং ই-পরিষেবা চালুর মাধ্যমে জনসাধারণকে এর সুবিধা ভোগ করার জন্য খাপ খাইয়ে চলার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডিজিটাইজেশন শিক্ষায় শিক্ষিত করা হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে মানিয়ে চলার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর:** বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও ভিসার বর্ধিত গ্রহণযোগ্যতা জনশক্তি রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বাংলাদেশি ভিসা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজীকরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশের জনগণের ক্ষেত্রেও পাসপোর্ট ইস্যু পদ্ধতির সরলীকরণ এবং আধুনিকীকরণ বৈদেশিক বাজারে শ্রম শক্তি রপ্তানি ত্বরান্বিত করবে। এই পদক্ষেপ রেমিট্যান্স অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। কাজেই, এক্ষেত্রে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পপনার লক্ষ্যগুলো হলোঃ (১) ২০২৫ সালের মধ্যে আবেদনকারী সকলকে ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের আওতায় আনা; (২) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট ইস্যু ও হস্তান্তর সম্পাদন; (৩) ব্যবহার বান্ধব পদ্ধতি উদ্ভাবন; এবং (৪) ডিজিটাল স্পেইসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সহজলভ্যকরণ।
- **বাস্তবান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) শক্তিশালীকরণ:** আইএমইডি হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভূক্ত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আইএমইডি প্রকল্প বাস্তবায়নের ভৌত এবং আর্থিক বিষয়গুলোতে মূলতঃ গুরুত্বারোপ করছে। এছাড়াও, আইএমইডি মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন, প্রান্তিক মূল্যায়ন এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাপ্ত প্রকল্পসমুহের প্রভাব মূল্যায়ন করছে। সরকার এই বিষয়ে অবগত আছে যে, আইএমইডি-কে শক্তিশালীকরণ, পরিবীক্ষণ অনুষঙ্গ হালনাগাদকরণ, ফলাফল-ভিত্তিক এবং যথাযথ সময়ে পরিচালিত পরিবীক্ষণ ব্যতীত, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু হবে না। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে আইএমইডি-কে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.৫ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জন শৃংখলা বজায় রাখতে ও নাগরিকদের সম্পদ এবং জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সরকার তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আইন প্রয়োগের নিশ্চয়তা, অভ্যন্তরীণ ও বহি: হুমকি থেকে নাগরিকদেরকে সুরক্ষা দেয়া, সীমান্তে নিরাপত্তা বিধান করা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাসবাদ দমন ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করা এবং কারাবন্দীদের পুনর্বাসন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য। ফলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আওতাভুক্ত আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থার সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশ পুলিশের কার্যকারিতার উন্নতি সাধন: সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ আইন প্রয়োগ করা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধ কমিয়ে আনা, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কমিউনিটির সক্রিয় সহায়তা নিয়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রভৃতিতে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে আইনের শাসন কায়েম করা এবং অপরাধমূলক বিচারের উন্নতি বিধান করার জন্য প্রয়োজন একটি কার্যকরী এবং জবাবদিহিতা সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী। এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের কার্মকান্ড সম্পাদনের প্রয়োজন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে:

কৌশলগত নির্দেশনা এবং সাংগঠনিক সংস্কার: বাংলাদেশ পুলিশের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করা, জবাবদিহিতা ও তদারকি বৃদ্ধি এবং আইনী কাঠামোর আধুনিকায়নে সরকার প্রয়োজনীয় কৌশলগত নির্দেশনা প্রদান ও সংস্কার সাধন করবে। এ সংস্কারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক রূপকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে পুলিশ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি: দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ,কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের অতি সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় সাম্প্রতিক বিষয়ে পুলিশের জ্ঞান আহরণ, উত্তম অনুশীলন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উন্নয়নের সাথে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিদেশে পাঠানো হবে। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং পুলিশ সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দেয়া হবে। বাংলাদেশ পুলিশের মোট ৩০টি ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অবকাঠামো, যন্ত্রাংশ, পরিবহন ও আইসিটি সুবিধাসমূহের উন্নতিবিধানে পর্যাপ্ত উদ্যোগও গ্রহণ করা হবে। সেবারত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর ফ্যাসিলিটেটর ও প্রশিক্ষকদেরকে সক্ষমতা নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রশিক্ষিত করা হবে। মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন, জ্ঞান বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজে লাগানো হবে। বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো ও নারী বান্ধব করা হবে।

সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিটের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় উগ্রতা নিরসনে ঢাকাসহ সমগ্র দেশের সন্ত্রাস বিরোধী ইউনিটের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে এবং ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। উপরন্তু, সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিটের উদ্যোগে অন্যান্য অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে কাউন্টার টেররিজম নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

ছয়টি বিভাগীয় শহরে ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন: ফরেনসিক বিজ্ঞান আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থাপনার এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। আধুনিক তদন্ত প্রক্রিয়া ফরেনসিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে। অপরাধীদের বিচার এবং নিরপরাধী সন্দেহভাজনদের ছাড় দেয়া সহজতর হয়ে উঠে যদি ফরেনসিক সাক্ষ্য সঠিকভাবে এবং সময়মতো বিশ্লেষণ করা হয়। একই সময়ে, যদি রাসায়নিক ও ফরেনসিক আলামত দ্রুত নিস্পত্তি করা যায় তবে থানার অপেক্ষমান মামলাগুলোর দ্রুত নিস্পত্তি করা যাবে। এ কারণে বাংলাদেশ পুলিশ একটি কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আলামত ও ফরেনসিক সাক্ষ্যের দ্রুত নিস্পত্তি বিষয়ে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরো ছয়টি ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে বাংলাদেশ পুলিশকে একটি কার্যকরী তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে তৈরি করা যায়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অনুসন্ধান, অভিযান এবং তদন্তের উন্নতি সাধন: নিরপেক্ষ ও সমতাভিত্তিক বিচার প্রর্বধনে পুলিশি অভিযান, মামলার অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে উন্নতিবিধানে সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে, পুলিশ কর্মকর্তা ও নাগরিকদের নিরপেক্ষ আচরণ নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রসাশনে আরো কার্যকরভাবে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা (Grievance Redress System) চালু করা হবে। বিশেষ করে আইজিপির অভিযোগ কেন্দ্রকে অভিযোগ প্রতিকার কেন্দ্র হিসেবে আরো অধিক কার্যকর করে গড়ে তোলা হবে, যাতে পুলিশ কর্মকর্তা এবং নাগরিকদের নিরপেক্ষ আচরণ নিশ্চিত করা যায়।

অপরাধ প্রতিরোধ ও কমিউনিটি পুলিশ: কমিউনিটি ও পুলিশের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধি ও আন্তসম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে বিচার ও মানবাধিকারে জনগণের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পায় এবং অপরাধ সংঘটনে ভীতি বাড়ে। বাংলাদেশ পুলিশ কমিউনিটি পুলিশি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উপকরণ হিসেবে দেশব্যাপী বিআইটি পুলিশিং কৌশল প্রয়োগ করেছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নাগরিকদের উন্নত পুলিশি সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে, কমিউনিটি পুলিশিং এর মাধ্যমে অপরাধ হ্রাস করতে টেকসই সমাধান অনুসন্ধানের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। কতিপয় বাস্তব উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশিংকে কার্যকর করা হবে। এগুলো হল: (ক) কমিউনিটি পুলিশের ফোরাম, (খ) খাতভিত্তিক কমিউনিটি অন্তর্ভূক্তি, গ) ওপেন হাউজ ডে, ঘ) বিট সভা, ঙ) যুব ও ছাত্রদের সম্পৃক্তকরণ/অন্তভূক্তি, চ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি, (ছ) গণসমাবেশ ও র‍্যালী, (জ) অপরাধবিরোধী সভা, (ঝ) ভিকটিম রি-কন্ট্রাক্ট, (ঞ) বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন।

জেন্ডার সংবেদনশীল পুলিশিংয়ের প্রর্বতন: হয়রানির শিকার হয়েছে এমন ভুক্তভোগীর ন্যায়সঙ্গত ও সংবেদনশীল পুলিশিং এবং সহায়তা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সকল স্তরে নারী ও শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে, পুলিশি সেবায় জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ পুলিশের মাধ্যমে সরকার নারী পুলিশিং কৌশল প্রণয়ন করবে।

সকল থানার ডিজিটাইজেশন: রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল শ্রেণির নাগরিকদের অভিগম্যতা তৈরির জন্য বাংলাদেশ পুলিশের সকল থানাকে ডিজিটাইজ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দৈনন্দিন লেনদেনের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে সময়, সম্পদ ও শ্রম শক্তি বাঁচাতে থানাগুলোকে ইলেকট্রনিক্যালি পরস্পর সংযুক্ত রাখতে হবে। অধিকন্তু আইনী দলিল সংরক্ষণ এবং পুলিশিং সেবা কর্মকাণ্ড সম্পাদন যেমন অনলাইনে সাধারণ ডায়েরী, অনুসন্ধান, তদন্ত প্রভৃতি কাজে ওয়েব-ভিত্তিক আবেদনের প্রচলন করা হবে।

৯৯৯ জাতীয় জরুরি সেবা শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বিনির্মাণ: জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ বর্তমান সরকার গৃহীত একটি জনপ্রিয় সরকারি উদ্যোগ। জনগণ ৯৯৯ সেবাকে তাদের সাইবার রক্ষাকবচ বলে মনে করে। এটি ইতোমধ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় একটি জায়গা সুরক্ষিত করার আশা জাগিয়েছে। অধিকন্তু দুর্দশাগ্রস্ত এবং আগুনের মত দূর্যোগের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে ৯৯৯ সেবা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ৯৯৯ সেবার জন্য ক্রমবর্ধমান আবেদন দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হবে। তাই, ৯৯৯ সেন্টারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিনির্মাণ এবং প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ গঠনের বিষয়টি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাবে।

সাইবার অপরাধ এবং ভূয়া সংবাদ হ্রাস: সরকার সাইবার অপরাধ হ্রাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সমাজে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে,যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন ভূয়া সংবাদ ছড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অপব্যবহার হ্রাস করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মডেল পুলিশ স্টেশন: পুলিশ সংস্কার প্রকল্প - ১ম ও ২য় পর্যায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মডেল পুলিশ স্টেশনে কতিপয় সুযোগ সুবিধা যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো হল: নারীদের জন্য ব্যারাক ও টয়লেটে সুবিধা, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা হোল্ডিং সেল, আগ্নেয়াস্ত্রের নিরাপদ প্রকোষ্ঠ, আলাদা সাক্ষাতকার কক্ষ এবং প্রবেশ র‍্যাম্প। অধিকন্তু ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও বাংলাদেশ পুলিশ "মডেল পুলিশ স্টেশন" থেকে উল্লিখিত সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

সিসিটিভি এবং অন্যান্য নজরদারি পদ্ধতিসমূহ: ৮ম পরিকল্পনার অধীন সরকার জাতীয় সড়ক এবং প্রধান প্রধান শহরগুলোর নিরাপত্তা বাড়াতে মহানগরগুলোর পুলিশ এখতিয়ারভুক্ত নির্বাচিত এলাকা এবং মহাসড়কের নির্বাচিত অংশসমূহকে সিসিটিভি নজরদারির আওতায় নিয়ে আনা হবে।

মানব পাচার রোধ: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগ মানব পাচার রোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। জননিরাপত্তা বিভাগ মানব পাচার প্রতিরোধ এবং দমন আইন, ২০১২-এর অধীনে এই অপরাধ মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে। জননিরাপত্তা বিভাগ ২০১৮ সালে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Action Plan for Prevention and Supperssion of Human Trafficking, NPA-PSHT) ২০১৮-২০২২ গ্রহণ করেছে। সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশলের সাথে এ কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্যতা বিধান করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় জননিরাপত্তা বিভাগ জাতীয় কর্মপরিকল্পনার অধিকতর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে এ কর্তৃপক্ষ মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা সমন্বয়ের মূল সংস্থা হিসেবে আর্বিভূত হতে পারে। অগ্রাধিকার হিসেবে জনগণের চলাফেরা, অভিবাসন এবং অভিবাসীদের অধিক নিরাপত্তাদানের লক্ষ্যে আইনী বিধানগুলো (অভিবাসন আইন ২০১৩ এবং মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২) কার্যকরকরণে জননিরাপত্তা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মানব পাচার রোধ ও প্রতিরোধ করতে আইনের প্রয়োগ এবং এর ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার উন্নয়নে বিনিয়োগ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে মানব পাচারের ঝুঁকি কমানো এবং মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মানব পাচার বিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এসব মানব পাচার বিরোধী কমিটিকে শক্তিশালী এবং সক্রিয় করতে সম্পদ বরাদ্দ ও সক্ষমতা নির্মাণে সহায়তা করা হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মানব পাচার রোধ ও দমনে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাতে নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণে জন নিরাপত্তা বিভাগের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ওপর সরকার অগ্রাধিকার দিবে।

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা: নাগরিকত্ব বঞ্চিত,এক মিলিয়নেরও অধিক রোহিঙ্গা সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই হতভাগ্য লোকদের সহায়তার জন্য সরকারের পক্ষ হতে অনেক কিছু করা হয়েছে, যার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনেক কৃতিত্বের দাবিদার। অবিশ্বাস্য কঠিন পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই মানব বিপর্যয়ের সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিণতি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। উদ্ভূত এ সংকট নিরসনে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তিকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার রোহিংগা শরনার্থীদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারকে রাজি করতে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের সফল প্রত্যাবাসনে এবং মানবিক সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত হয়েছে এমনটি প্রত্যাশা করছে। রোহিংঙ্গাদের দ্বারা সৃষ্ট কক্সবাজারে জনগণের আধিক্য ও গাদাগাদি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের পূনর্বাসনের জন্য ভাসানচর দ্বীপে একটি আবাসন তৈরি করছে। মায়ানমারে প্রত্যাবাসনের আগ পর্যন্ত এসব জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্তের নিরাপত্তা, চোরাচালান রোধ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বিশেষ করে বিজিবি এ সকল ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বৈদেশিক পণ্যের চোরাচালান ও শুল্ক ফাঁকি হ্রাস করতে পারে। অন্যথায় বিদেশী পণ্য এবং দেশের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হতে পারে। বিজিবি ২০১৭ সালে, "বিজিবি অভীষ্ট, ২০৪১" শীর্ষক একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে বিজিবিকে একটা সুপ্রশিক্ষিত,সুসজ্জিত এবং প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসরমান শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। এভাবে, বিজিবির কার্যকারিতার উন্নতিবিধানে 'বিজিবি অভীষ্ট, ২০৪১' এর মধ্যে যেসকল লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো অর্জনে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রধিকার দেয়া হবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে:

- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণে বিজিবিতে কর্মরত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- বিজিবির কার্যকারিতা বৃদ্ধিকল্পে লজিস্টিক সুবিধাধি বৃদ্ধি করা।
- বিজিবির মধ্যে "কুইক রেসপন্স ফোর্স" গঠন এবং এটিকে শক্তিশালীকরণে সহায়তা করা। এই দলটি জরুরি প্রয়োজনে সীমান্ত এলাকায় দ্রুত আধুনিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের কাজ করবে।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার্থে সেন্টমার্টিন দ্বীপে একটা স্থায়ী স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা।
- বেনাপোল ও অন্যান্য স্থল সীমান্তে যান্ত্রিক তদন্ত ব্যবস্থা চালু করা।
- সীমান্ত আউটপোস্ট(বিওপি)-এর সংখ্যা বৃদ্ধি, সীমান্ত রিং রোড এবং কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।
- চোরাচালান হ্রাসকল্পে সকল অংশীজনদের সাথে নিয়ে একটি সর্বাত্মক কৌশল প্রণয়ন।
- প্রতিবেশী দেশগুলোতে মানব পাচার বিশেষ করে নারী ও শিশুদের পাচার রোধে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে শান্তি বজায় রাখতে মায়ানমার সীমান্তে তদারকি বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (বিসিজি): বাংলাদেশের সামুদ্রিক আইন কার্যকর করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি একটি আধাসামরিক বাহিনী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তাগণ এ বাহিনীতে প্রেষণে কাজ করে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার "কোস্ট গার্ড অভীষ্ট ২০৩০" গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশের কোস্টগার্ডকে আধুনিকায়নের একটি কৌশলগত দলিল। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো জনশক্তি বৃদ্ধি, জাহাজ, হোভারক্রাফট এবং হেলিকপ্টার, জন-মানবহীন আকাশ যান, সমুদ্রে চলাচলকারী যান এবং নতুন প্রজন্মের সার্ভিল্যান্স প্রযুক্তি ক্রয় করে বিজিবির সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ পরিকল্পনার রূপকল্প হল বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দ্বিমাত্রিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে এ বাহিনী বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার সুরক্ষা দিতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সকল জাতীয় জরুরি অবস্থায় সহায়তা করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার "কোস্ট গার্ড অভীষ্ট ২০৩০" এ নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে অগ্রাধিকার দিবে। বিসিজি আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষার মাধ্যমে নীল অর্থনীতির কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলো যাতে সুরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (ভিডিপি): বাংলাদেশ আনসার হলো আধাসামরিক সহায়ক বাহিনী, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে। এ বাহিনীর কাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা শক্তিশালী করতে নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ঃ

- সরকারের নির্দেশনা অনুসারে কার্যকরভাবে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে আনসার ও ভিডিপি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- যেকোন জাতীয় জরুরি অবস্থায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে যাতে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে সে জন্য আনসার ভিডিপিকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সুবিধাা প্রদান করা হবে।

কারা অধিদপ্তর: বন্দীদের নিরাপদ কারাবাস নিশ্চিতকরণ ও কারাগারে এবং বন্দীদের মধ্যে কঠোর শৃংখলা বজায় রাখা, সকল বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা, সমাজে একজন সুনাগরিক হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য বন্দীদের ভালো আবাসন, খাদ্য এবং ঔষধ

প্রদানের পাশাপাশি তাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আইনজীবিদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া, বন্দীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ করাই হল কারা অধিদপ্তরের মূল কাজ। তাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বন্দীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং কাউন্সেলিং-এর সুযোগ দিয়ে, কারাগারে বন্দীদের ঘনত্ব কমানোর জন্য উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মহিলা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বন্দীদের বিশেষ যত্ন দানের মাধ্যমে উন্নত সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স: ৭ম পরিকল্পনার মেয়াদকালে দেশে বেশ কিছু অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে শত শত লোকের প্রাণহানি হয়। প্রকৃত পক্ষে, গত ২৩ বছরে প্রতিবছর গড়ে অগ্নিকান্ডের ঘটনা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে প্রতিদিন গড়ে ৫৩ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে, ২০০4 থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সারাদেশে প্রায় ২০০০০০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে এবং তাতে অন্ততপক্ষে ১৯70 জন লোক মৃত্যুবরণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার অগ্নিকান্ড নিবারণের সাথে সংশ্লিষ্ট কমীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি এবং অগ্নিনিরোধ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানব সৃষ্ট দুর্যোগে সুষ্ঠু অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে যাতে জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় তার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। বিপজ্জনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে সরকার ফায়ার সার্ভিস বিভাগের অধীনে একটি নজরদারী দল গঠন করবে, যাতে দেশের মূল অগ্নি হটস্পটগুলোতে অগ্নি সুরক্ষা বিধিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সরকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এবং বর্তমানে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ প্রাধান্য পেয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বেগবান করতে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

১) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং এর ব্যবহার কমানোর জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা হবে। বিশেষত: সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার বন্ধের জন্য একটি নজরদারি দল গঠন করা হবে, যাতে এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ হতে মাদক প্রবেশের সহায়ক প্রধান প্রধান সরবরাহকারী চেইনগুলো ব্যাহত হয়।

২) মাদক সেবনের পরিণতি সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করা হবে।

৩) দেশে মাদকাসক্তদের সুলভ চিকিৎসা এবং কার্যকর পুর্নবাসন নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে পুর্নবাসন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় এনজিওদের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে।

জাতীয় টেলি-যোগাযোগ পরিবীক্ষণ কেন্দ্র: জাতীয় টেলিযোগাযোগ পরিবীক্ষণ কেন্দ্র ২০১4 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্দেশ্য হল সাম্প্রতিক টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের সকল শাখা ও মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অবস্থার উন্নতি বিধান করা। এই সংস্থাটি সন্দেহভাজন হুমকির কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করতে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য প্লাটফরম হিসেবে কাজ করে। সাইবার স্পেস (Cyber Space)-এর হুমকি অন্যান্য হুমকি থেকে পুরাপুরিই আলাদা। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় টেলিযোগাযোগ পরিবীক্ষণ কেন্দ্র নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করেছে : ১) সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো থেকে জনগণকে সুরক্ষা দিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত ডিভাইস ক্রয়ে সহায়তা করা; ২) ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংসদীয় অডিটের সুযোগ বৃদ্ধি করা, যাতে ব্যয় কার্যক্রমের ব্যাপক যাচাই-বাছাই নিশ্চিত করা যায়; ৩) এনটিএমসির সকল প্রধান উপকরণ যেমন- তথ্য কেন্দ্র, মনিটরিং স্টেশন এবং ভৌত নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আরো বেশি বিনিয়োগ করা; 4) টেলিযোগাযোগ খাতে উদ্ভুত হুমকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ প্রদান; ৫) নাগরিকের মৌলিক গোপনীয়তা যাতে লজ্ঘিত না হয় তা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদের সাথে উক্ত কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের বাৎসরিক শুনানী নিশ্চিত করা।

১.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন সম্পদ বরাদ্দ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ তে নির্ধারিত প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জনপ্রশাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গভর্ন্যান্স এর ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হচ্ছে মৌলিক পূর্বশর্ত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের প্রয়োজন হবে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় যে, আরো ফলপ্রসু সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা, সরকারি কর্মচারীর মধ্যে ভবিষ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং একটি কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক আইনি কাঠামো গড়ে তোলা,

যা জনপ্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। পাশাপাশি এটিকেও স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য যে, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির গতিশীলতা ধরে রাখতে একটি সক্ষম এবং কার্যকর জনপ্রশাসন ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রয়োজন একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। এ পরিবেশে শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা এবং আইনের শাসন বিদ্যমান থাকবে। এরূপ একটি পরিবেশ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং বিনিময় নিশ্চিত করে কার্যকর এবং ন্যায় সঙ্গত আইনি কাঠামোর সুবিধা প্রদান করে। সরকার এ সকল প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে, যাতে এগুলো প্রয়োজনীয় আইন, অবকাঠামো এবং মানব সম্পদ দ্বারা পরিচালিত হয়।

জনগণের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা সুস্পষ্টভাবে কার্যকর করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ প্রদান করা হবে। সাধারণ জনসেবা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে সিংহভাগ ব্যয় আবর্তক প্রকৃতির এবং তা চলতি বাজেট হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। তবে এ খাতকে শক্তিশালীকরণ এবং সামর্থ বিনির্মাণে এখানে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাই আবর্তক বাজেট হতে বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এডিপির আওতায় এখাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। সারণি ১.৭-তে এ খাতের বছরের এডিপি বরাদ্দের ইঙ্গিতবহ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, জনপ্রশাসনের মূল ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োজন মোতাবেক বরাদ্দ পরিবর্তিত হতে পারে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি জীবন্ত দলিল (Living Document) হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ পরিকল্পনায় প্রয়োজনে নমনীয়তা এবং অভিযোজী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হবে।

সারণি ১.৭: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সাধারণ সরকারি সেবা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তায় চলতি মূল্যে এডিপি বরাদ্দ (টাকা মিলিয়ন)

নং	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
১.	সাধারণ সরকারি সেবা	জাতীয় সংসদ	০.২	০.২	০.৩	০.৩	০.৪
		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৯.৩	৫০.৯	৫৮.৭	৬৮.৫	৮০.১
		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.২	০.২	০.৩	০.৩	০.৪
		নির্বাচন কমিশন	৭.৫	৯.২	১০.৬	১২.৪	১৪.৯
		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৯	৩.৪	৩.৯	৪.৭
		সরকারি কর্ম কমিশন	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪	০.৫
		অর্থ বিভাগ	১৫.৪	১৮.৯	২১.৮	২৫.৪	৩০.৫
		অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	০.৮	১.০	১.২	১.৪	১.৬
		আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১৮.৯	২৩.৩	২৬.৮	৩১.৩	৩৭.৬
		অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	০.৪	০.৫	০.৬	০.৭	০.৯
		পরিকল্পনা বিভাগ	৩.৭	৪.৬	৫.৩	৬.২	৭.৪
		বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ	০.৮	১.০	১.১	১.৩	১.৬
		পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫.৬	৬.৯	৭.৯	৯.২	১১.১
		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০.৬	০.৭	০.৮	১.০	১.২
	আংশিক মোট		**৯৬.০**	**১২০.৭**	**১৩৯.২**	**১৬২.৪**	**১৯২.৯**
২.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	আইন ও বিচার বিভাগ	৫.৩	৬.৫	৭.৫	৮.৭	১০.৫
		জননিরাপত্তা বিভাগ	১৭.৩	২১.৩	২৪.৬	২৮.৭	৩৪.৫
		লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.৯	১.২	১.৩	১.৬	১.৯
		দুর্নীতি দমন কমিশন	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
		সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৮.৪	২২.৬	২৬.১	৩০.৫	৩৬.৬
মোট (জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা)			**৪২.১**	**৫১.৮**	**৫৯.৭**	**৬৯.৮**	**৮৩.৮**
সর্বমোট			**১৩৮.২**	**১৭২.৪**	**১৯৮.৯**	**২৩১.১**	**২৭৬.৭**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ- ২, পরিশিষ্ট সারণি এ ৫.২

সারণি ১.৮: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয় ভিত্তিতে সাধারণ সরকারি সেবা এবং জনশৃংখলা ও নিরাপত্তায় এডিপি বরাদ্দ (স্থায়ী মূল্যে) (টাকা মিলিয়ন)

নং.	খাত	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
১.	সাধারণ সরকারি সেবা	জাতীয় সংসদ	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
		প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩৯.৩	৪৮.৩	৫৩.০	৫৮.৯	৬৭.৫
		মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০.২	০.২	০.২	০.৩	০.৩
		নির্বাচন কমিশন	৭.৫	৮.৮	৯.৬	১০.৭	১২.২
		জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৮	৩.০	৩.৪	৩.৯
		সরকারি কর্ম কমিশন	০.৩	০.৩	০.৩	০.৪	০.৪
		অর্থ বিভাগ	১৫.৪	১৮.০	১৯.৭	২১.৯	২৫.১
		অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)	০.৮	১.০	১.১	১.২	১.৩
		আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১৮.৯	২২.১	২৪.২	২৭.০	৩০.৯
		অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	০.৪	০.৫	০.৬	০.৬	০.৭
		পরিকল্পনা বিভাগ	৩.৭	৪.৪	৪.৮	৫.৩	৬.১
		বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)	০.৮	০.৯	১.০	১.২	১.৩
		পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫.৬	৬.৫	৭.১	৭.৯	৯.১
		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০.৬	০.৭	০.৭	০.৮	১.০
	আংশিক মোট		**৯৬.১**	**১১৪.৭**	**১২৫.৫**	**১৩৯.৯**	**১৬০.১**
২.	জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	আইন ও ন্যায়বিচার ভিভাগ	৫.৩	৬.২	৬.৭	৭.৫	৮.৬
		জননিরাপত্তা বিভাগ	১৭.৩	২০.৩	২২.২	২৪.৭	২৮.৩
		লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	০.৯	১.১	১.২	১.৩	১.৫
		দুর্নীতিদমন কমিশন	০.২	০.২	০.২	০.২	০.৩
		সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৮.৪	২১.৫	২৩.৬	২৬.২	৩০.০
	মোট (জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা)		৪২.১	৪৯.৩	৫৩.৯	৫৯.৯	৬৮.৭
	সর্বমোট		**১৩৯.১**	**১৬২.৮**	**১৭৯.৪**	**১৯৯.৮**	**২২৮.৮**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ- ২, পরিশিষ্ট সারণি এ ৫.২

খাত-৩:
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

অধ্যায় ২

রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিসহ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন কৌশল

২.১ প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা

বিগত দুই দশকের ধারাবাহিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর সরকার যখন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, বিশ্ব তখন কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ১৯৩০ সালের মহামন্দার পর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক দুর্যোগের সমুক্ষীন। অতএব, টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ মোকাবেলা করার সাথে সাথে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কৌশল গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে মহামারির প্রভাব মোকাবেলা করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কোভিড-১৯ এর কারণে অতীতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG) ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বিশ্ব চাহিদার মন্দার কারণে ইতোমধ্যে ২০২১ অর্থ-বছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় কমেছে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতির দুটো বড় মাইল ফলক হচ্ছে (ক) ২০২১ সালটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষ এবং (খ) ২০২৪ সাল নাগাদ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ (গ্রাজুয়েশন)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উন্নতর স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার এ গ্রাজুয়েশনকে আলিঙ্গন করতে বদ্ধ পরিকর এবং সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিশেষ করে বাণিজ্য অগ্রাধিকার সুবিধা বিলোপের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বাণিজ্য ও শিল্পনীতি পুনর্গঠন করা আবশ্যক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ও রপ্তানি ভিত্তি বহুমূখীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি একক পণ্য গ্রুপের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা। এছাড়াও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন যাতে এ খাতের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক কর্ম সৃজনের সুযোগ তৈরি হয়।

কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ওপর তীব্র প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে অনেক বেশি সংযুক্ত। ২০০৮-২০০৯ এর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের চেয়েও এবারের বৈশ্বিক মন্দা আমাদের রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রা, জিডিপি ও কর্মসংস্থানের ওপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরটিকে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নীতিমালা যার মাধ্যমে বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধি চাঙ্গা করা সম্ভব। দারিদ্র্য সীমার কাছাকাছি বসবাসকারী অ-দরিদ্র লোক সহ লক্ষ লক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ লোকের জীবিকার সুরক্ষা প্রদান জরুরি। সরকার প্রথম পর্বে স্বাস্থ্য কাম অর্থনৈতিক অভিঘাত থেকে অর্থনীতিকে বাচাতে ১.২ বিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়নের বেশি) উদ্দীপক (ত্রাণ) প্যাকেজ চালু করেছে। অর্থবছর ২০২১ এর বাজেটে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্যাকেজটিই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মূল চালিকা হিসেবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুভ সূচনা ঘটাবে এবং গত ১০ বছরে প্রবৃদ্ধির যে ভিত্তি প্রস্তর তৈরি হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। অধিকাংশ আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক কোভিড-১৯ সংকটের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের (ভি-চিহ্নযুক্ত পুনরুদ্ধার) চেয়ে ধীর পুনরুদ্ধারের সুপারিশ করছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাণিজ্য (যথা রপ্তানি এবং আমদানি) মূলত বাংলাদেশী পণ্যের বৈশ্বিক চাহিদা এবং অত্যাবশকীয় কৃষি ও শিল্পখাত পণ্যের যোগান যা বাংলাদেশের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থায় প্রবেশ করছে তার ওপর নির্ভর করে। তাই এ খাতের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বড় চালিকা শক্তি হবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ।

বাণিজ্য নীতি ও শিল্পায়ন

বাংলাদেশের শিল্পনীতির মূল লক্ষ্যসমূহকে দুটো ধারায় বিভক্ত করা যায়: আমদানি বিকল্প শিল্প উন্নয়ন এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন যা বাণিজ্য নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী বাণিজ্য নীতিতে যে সকল প্রণোদনা প্রদান করা হয় তার সঙ্গে দুই ধারার শিল্পনীতির সম্পুরক ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের দ্বিমুখী পদ্ধতি দুটো বড় প্রতিযোগী কৌশলকে সামনে নিয়ে আসে। এ দুটি কৌশল হলো 'তুলনামূলক সুবিধা অনুসরণকারী (CAF)' এবং 'তুলনামূলক সুবিধা বর্জনকারী (CAD)'। তুলনামূলক সুবিধা অনুসরণকারী শিল্প ও বাণিজ্য নীতিসমূহ মূলত দেশের তুলনামূলক সুবিধার (উদাহরণস্বরূপ শ্রমনিবিড় উৎপাদন) ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে। অন্যদিকে তুলনামূলক সুবিধা বর্জনকারী নীতিসমূহ দেশের তুলনামূলক

সুবিধার বিষয়টি বিবেচনা না করে শিল্প ও বাণিজ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে যেমন শ্রম পর্যাপ্ত অর্থনীতিতে ভারী সুরক্ষা দিয়ে পুঁজি নিবিড় আমদানি প্রতিস্থাপনমূলক শিল্পের প্রসার সাধন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বাণিজ্য ও শিল্পনীতিগুলো প্রণয়নে, এদুটি পদ্ধতির প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখতে হবে।

একটি ভালো শিল্পনীতি অবশ্যই বাজার শক্তির পরিপূরক হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসৃজনে অবদান রাখতে শিল্পখাতের সম্ভাবনা কাজে লাগানো প্রয়োজন। কার্যত, বাংলাদেশের শিল্পনীতির বহুমূখী উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্প ভিত্তিক কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিল্প কর্মকাণ্ডের আঞ্চলিক বণ্টন, পিঁছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ এবং আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ। এ সকল লক্ষ্যের মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদান খুব গুরুত্বপূর্ন, কারণ শিল্পনীতি কার্যকর করতে হলে অবশ্যই এর সীমিত ও পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। বহুমূখী উদ্দেশ্য সম্বলিত নীতি বাস্তবায়ন অত্যন্ত জটিল। অধিকন্তু বিভিন্ন উদ্দেশ্য একে অপরের সাথে অসংগতিপূর্ণ হতে পারে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর, যেখানে জিডিপিতে শিল্প খাতের অংশ ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০-৪৫ শতাংশে পৌঁছাবে। এর ফলে কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক সেবা খাতের বিদ্যমান অর্ধ-বেকার শ্রম শক্তির অনেকাংশে কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে। উপরন্তু বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষম ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উনয়নে সময়নির্ভর ও পারফরম্যান্স ভিত্তিক ইনফ্যান্ট শিল্পকে সহায়তা প্রদান করা আবশ্যক। বাংলাদেশ প্রথাগতভাবে শিল্প নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্র ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় সাধন করে থাকে।

পরিশেষে, ২১ শতকের গ্রাজুয়েশন উত্তর বাংলাদেশের শিল্পনীতি সর্বাত্মক বা সমন্বিত হতে হবে যা ডব্লিউটিও এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। বিনিয়োগ এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করতে শিল্প উন্নয়নের নীতিসমূহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে। 'ডি মিনিমইজ' অপশনের ব্যাবস্থা রেখে বিশেষ ও পার্থক্যগত আচরণের অধীনে রূপান্তর কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। শিল্প উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সাধারণ নীতিগুলোর মধ্যে এমন কিছু নীতি রাখতে হবে যেগুলো অবকাঠামো উন্নয়ন , মানব পুঁজি গঠন, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়। এসব উপাদানগুলি রপ্তানি প্রতিয়োগিতার সক্ষমতা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক।

সমসাময়িক বাণিজ্য নীতি অবশ্যই শিল্পায়ন কৌশলের সহায়ক হবে যা টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী সক্ষম ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন ঘটাবে। টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য অধিকতর বাণিজ্য উন্মুক্ততার মাধ্যমে বিশাল বৈশ্বিক বাজারকে কাজে লাগাতে হবে। এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রধান প্রধান বাণিজ্য সংস্থাসমূহের সাথে সংযুক্ত হতে হবে। ভবিষ্যতে উচ্চ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাণিজ্য ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নাই।

এলডিসি পরবর্তী গ্রাজুয়েশন পরিস্থিতিতে, বাণিজ্য ব্যবস্থাকে ডব্লিউটিও আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। গ্রাজুয়েশনের পর রপ্তানি উন্নয়নের জন্য ভর্তুকি প্রদানের সুযোগ নাও থাকতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশের উন্নয়নে ভর্তুকি প্রদান করার সুযোগ থাকবে যা রপ্তাানি প্রতিযোগী সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.২ বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্পনীতির পর্যালোচনা

বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রক্ষণশীল বাণিজ্য ও শিল্পনীতির বোঝা নিয়ে উন্নয়ন যাত্রা শুরু করে। এই নীতির ফলে অনেক আমদানিযোগ্য পণ্যের ওপর উচ্চ সুরক্ষামূলক ট্যারিফ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নকে ব্যপকভাবে উৎসাহিত করা হয়। স্বাধীনতার সময়ে যেহেতু অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কূন্য ছিল সেহেতু মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার রক্ষা এবং টেকসই লেনদেনের ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য এই কৌশলটি যথাযথ বলে মনে করা হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পাট,বস্ত্র ও অন্যান্য অনেক শিল্পের মালিকানার অধিকারী হয়, যার মালিক ছিল মূলত পাকিস্তান উদ্যোক্তারা এবং তারাই এগুলো পরিচালনা করত এবং এগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে পাকিস্তানে চলে যায়। উপরন্তু, ১৯৭২ সালে বড় বড় সকল শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করার বিষয়ে জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করা হয়। এভাবে বাংলাদেশী শিল্পপতিদের মালিকানাধীন অনেক বড় বড় পাট ও বস্ত্র কারখানা রাষ্ট্রীয় ব্যব্যস্থাপনার অধীনে চলে আসে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বেসরকারি শিল্প সীমিত আকারে অনুমোদিত থাকলেও সরকারি মালিকানাধীন শিল্পগুলো শিল্পখাতে কর্তৃত্ব বজায় রাখে; এভাবে সরকারের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। সরকারি মনোপলির কারণে বাজার প্রতিযোগিতা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পখাত চরম অদক্ষতা ও ব্যাপক লোকসানের সমুক্ষীন হয়।

এসব বছরগুলোতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল খুব ধীর। এটি ছিল এমন একটা সময়ে যখন অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো দ্রুততর জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। বাংলাদেশে যে জিডিপির ম্যানুফ্যাকচারিং অংশ ১৯৭৫- ১৯৭৬ সালে ১০.২ শতাংশ ছিল তা ১৯৯০-৯১ সালে কমে ৯.৮ শতাংশে নেমে আসে। শিল্প প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির ব্যর্থতার সাথে সাথে উচ্চ ট্যারিফ ও আমদানি নিষেধাজ্ঞাসহ

আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসৃজন করতে পারেনি এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়ন সহায়ক প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধিও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৮০ এর দশকের শেষের বছরগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মক সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়। এসব সংকটগুলোর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতি এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আর্থিক ভারসাম্যহীনতা উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতির চাকা কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে ১৯৯০ এর দশকে উল্টাতে লাগলো। এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি, কৃষি উপকরণ বাজারের অধিকতর উদারীকরণ, আর্থিক খাতের সংস্কার অন্তর্ভুক্তিকরণ, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসসহ মুদ্রানীতিকে মূলধারায় নিয়ে আসা। ডি-রেগুলেটরি পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্প খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বাড়ানো হয়। বাণিজ উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে রয়েছে শুল্ক ও আমদানি উদারীকরণ, বিনিময় হারের নমনীয়তা, চলতি হিসাবে রূপান্তর ইত্যাদি। এছাড়াও বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যা রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ এর দশকে এসব সংস্কার যুগপথভাবে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখে।

১৯৯০ এর দশকের শেষে, বিশ্বব্যাংক আখ্যায়িত "গ্লোবালাইজারস" নামক বৈশ্বিক অর্থনীতির কাতারে বাংলাদেশের অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর ২০০৪ সালে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৯০ এর দশকে গ্লোবালাইজার বহির্ভূত দেশগুলো থেকে গ্লোবালাইজার দেশগুলো প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যহ্রাসে অধিকতর সফলতা অর্জন করে। বাংলাদেশও ১৯৯০ এর দশক থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশকে ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যর্থ হওয়ার পর প্রথম বারের মতো ১৯৯০[৩] এর দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৫ শতাংশ অর্জিত হয়। অন্যদিকে, প্রথমবারের মতো রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্ক অতিক্রম করে, গড়ে ১২ শতাংশে পৌঁছে। বাণিজ্য উদারীকরণের কারণে বিশেষভাবে ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির দ্রুততর হয়। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ডব্লিউটিওর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হওয়ায় উন্নত দেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাজার অভিগম্যতা সহ বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের স্থিতিশীল অবস্থান তৈরি হয়।

২১ শতকের প্রথম দশকে, মুক্তবাজার অর্থনীতির মৌলিক নীতিকে ঘিরে শিল্প ও বাণিজ্য নীতিসমূহ প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থনীতির রেগুলেটরি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছিল। অন্যদিকে, উৎপাদন ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতকে অর্থনীতির মূল চালক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় হয়। কিছু রাজনৈতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। প্রধান রপ্তানি শিল্প হিসেবে তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্ভব ঘটে। পরবর্তীতে দেশের প্রাথমিক রপ্তানি পণ্য হিসেবে এটি পাট ও পাটজাত পণ্যের স্থান দখল করে নেয়। তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রধান রপ্তানি আইটেম হিসেবে পাট ও পাটজাত পণ্যকে অতিক্রম করে যায় এবং ১৯৯০ এর দশকে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এ শিল্পে রপ্তানির অংশ ৭০ শতাংশে পৌঁছায়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তৈরি পোশাকের ক্রমবর্ধনশীল রপ্তানি অব্যাহত থাকে যা রপ্তানিতে ঝুঁকির সৃষ্টি করে। যদিও বাংলাদেশ চীনের পরে ২ নম্বর পোশাক রপ্তানিকারক এবং ভিয়েতনামের সাথে ৩ নম্বর রপ্তানিকারক হিসেবে অবস্থান করছে। তথাপি আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। ভিয়েতনামের ইউট-এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্বাক্ষর এবং সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত পুর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহুমূখী মুক্তবাণিজ্য ক্লাব ও 'ট্রান্স-প্যাসিফিক অংশিদারিত্বের সর্বাত্মক ও প্রগতিশীল চুক্তি' (CPTPP)-তে যোগ দেয়ার পর এই প্রতিযোগিতা আরো তীব্রতর হয়।

সারণি ২.১: ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাণিজ্য ও শুল্কনীতির ধারা

	অর্থবছর ২০১১	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১৩	অর্থবছর ২০১৪	অর্থবছর ২০১৫	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
গড় এনপিআর	২৩.৭৪	২৬.৯৬	২৮.৯৩	২৮.০৯	২৬.৬৯	২৫.৬০	২৫.৬৪	২৬.৫৫	২৬.৭০	২৬.৭৫
গড় আউটপুট শুল্ক (*)	৪১.২৯	৪৩.৪৯	৪৬.৮২	৪৫.৯৮	৪৩.১৬	৪১.৩২	৪০.৫৫	৩৮.৭৯	৩৯.৬৪	৪৬.৪৩
গড় ইনপুট শুল্ক (**)	১২.৫	১২.৭২	১৩.০২	১২.১৭	১২.০২	১১.৬৩	১২.১৩	১২.৫৭	১২.০৩	১৩.৫২
রপ্তানি(বিলিয়ন ডলার)	২২.৯	২৪.৩	২৬.৬	৩০.২	৩১.২	৩৪.২	৩৪.৮	৩৬.৬	৩৯.৬	৩২.৮
রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	৪১.৫	৬	৯.৩	১৩.৬	৩.৪	৯.৭	১.৭	৫.২	৮.২	(-) ১৭.২
আমদানি (বিলিয়ন ডলার)	৩২.৫	৩৩.৩	৩৩.৬	৩৬.৬	৩৭.৭	৩৯.৯	৪৩.৫	৫৪.৫	৫৫.৪	৫০.৭
আমদানি প্রবৃদ্ধি	৫২.১	২.৪	০.৮	৮.৯	৩.০	৫.৯	৯.০	২৫.৩	১.৭	(-) ৮.৫

সূত্র:বিবিএস;এনবিআর তথ্যেও ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রাক্কলন

নোট:এনপির= নমিনাল সুরক্ষা হার ; (*) আউটপুট শুল্ক প্রধানত ভোগ্য পণ্যের ওপর এনপিআর-কে নির্দেশ করে; (**) ইনপুট শুল্ক মৌলিক কাঁচামাল, মাঝারি ও মূলধন পণ্যের ওপর এনপিআর-কে নির্দেশ করে।

৩ Trade, Growth and Poverty, David Dollar and Art Kray, 2014

সারণি ২.২: ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্পখাতের অগ্রগতি

	অর্থবছর ২০১১		অর্থবছর ২০১২		অর্থবছর ২০১৩		অর্থবছর ২০১৪		অর্থবছর ২০১৫	
	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৭.৭	১০.০	১৮.৩	১০.০	১৯.০	১০.৩	১৯.৫	৮.৮	২০.২	১০.৩
শিল্প	২৭.৪	৯.০	২৮.১	৯.৪	২৯.০	৯.৬	২৯.৬	৮.২	৩০.৪	৯.৭
জিডিপি প্রবৃদ্ধি		৬.৫		৬.৫		৬.০		৬.১		৬.১

সূত্র:বিবিএস

সারণি ২.৩: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে শিল্পখাতের অগ্রগতি

	অর্থবছর ২০১৬		অর্থবছর ২০১৭		অর্থবছর ২০১৮		অর্থবছর ২০১৯		অর্থবছর ২০২০	
	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি	অংশ	প্রবৃদ্ধি
ম্যানুফ্যাকচারিং	২১.০১	১০.৩০	২১.৭৪	১০.৯৭	২২.৮৫	১৩.৪০	২৪.০৮	১৪.৭৩	২৪.১৮	৫.৮৪
শিল্প	৩১.৫৪	১০.১০	৩২.৪৮	১০.৫	৩৩.৬৬	১২.০৬	৩৫.০০	১৩.০২	৩৫.৩৬	৬.৪৮
জিডিপি প্রবৃদ্ধি		৭.১		৭.৩		৭.৯		৮.২		৫.২

সূত্র:বিবিএস

৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি: ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে সমৃদ্ধ দশক শুরু হয়। ৬ষ্ঠ ও ৭ম উভয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাণিজ্য ও শিল্প কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এগুলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষনাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রথম বারের মতো বাংলাদেশ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৭-৮ শতাংশের অধিক বাৎসরিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতি দশকে আনুমানিক ১ শতাংশ পয়েন্টে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিপরীতে, ৬ষ্ঠ (৬.৩%) এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (৭.৬%) কালে প্রতি ৫ বছরে ১ শতাংশ পয়েন্টে জিডিপি বৃদ্ধি পায়। জিডিপিতে শিল্পের অংশ ২০১১ অর্থবছরে ২৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ অর্থবছরে ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অংশ একই মেয়াদে ১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ শতাংশে উন্নীত হয় (সারণি ২.১- ২.৩)। ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় ১০ শতাংশ এবং ৭ম পরিকল্পনায় ১২.৩ শতাংশ অর্জিত হয়, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান চালকের ভূমিকা পালন করে।

যাইহোক, ২১ শতকের প্রথম দশকে শুল্ক ও কাস্টমস অনুশীলনে কিছুটা মডেস্ট সংস্কার ব্যতীত বাণিজ্য নীতি কার্যত অপরিবর্তিত থাকে। অর্থনীতি বাণিজ্য উদারীকরণ এবং শিল্প বিনিয়োগে বি-নিয়ন্ত্রীকরণের সুবিধা ভোগ করে। ১৯90 দশকের বাণিজ্য ও শুল্ক উদারীকরণ নীতিতে রেগুলেটরি শুল্ক (RD) ও সম্পূরক শুল্ক (SD) আকারে প্যারা ট্যারিফের প্রচলন করা হয়। যার ফলে ঐদশকে গড় নমিনাল এবং কার্যকরী সুরক্ষা লেভেল অপরিবর্তিত থাকে (সারণি-২,১)। যদিও দুটো পরিকল্পনায় প্রস্তাবকৃত তুলসামূলক সুবিধা ভিত্তিক (CAF) রপ্তানিমুখী বাণিজ্য নীতিসমূহ পরিপালনের মাধ্যমে রপ্তানি অগ্রগতি আরো অধিক গতিশীল হতে পারতো কিন্তু তা মূলত অবাস্তবায়িত থেকে গেছে। তথাপি গড়ে দুই অঙ্কের অধিক ১১.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং ২০১১ অর্থবছরে ৪১ শতাংশ রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ধীর, ২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত গড়ে মাত্র ৬.৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

যদিও বাণিজ্য উদারীকরণ ও রপ্তানিমুখী উৎপাদন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান কৌশল হয়ে উঠে, তবুও ১৯৯০ এর দশকের শেষ থেকে বাণিজ্য ও শিল্প নীতির মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। শিল্পনীতিতে প্রণোদনা প্রদানের জন্য থ্রাস্ট খাত নির্ধারণে রপ্তানিমুখী শিল্প ও আমদানি প্রতিস্থাপনমূলক শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। প্রণোদনা মূলত চলতি সাফল্য এবং সম্ভাবনাময় সাফল্যজনক শিল্পের অনুমানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ সময় গড় ট্যারিফের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পায় যা মূলত ইনপুট ট্যারিফ হ্রাসের কারণে হয়েছিল। অন্যদিকে আউটপুট শুল্ক বাড়তে থাকে এবং সুরক্ষার কার্যকরী হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তুলনা করলে দেখা যায় রপ্তানির প্রণোদনাগুলো (ভর্তুকি কিংবা ছাড়কৃত ঋণ) আমদানি বিকল্পের জন্য প্রদত্ত উচ্চ সুরক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল না। সৌভাগ্যজনক ভাবে, মুক্তবাণিজ্য সুবিধা পদ্ধতি উপভোগ করে তৈরি পোশাক খাত ব্যাপকভাবে ট্যারিফ ব্যবস্থার বাইরে থেকে যায় এবং বন্ডেড ওয়ের হাউস সুবিধার কারণে আন্তর্জাতিক মূল্যে ইনপুট প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। তৈরি পোশাক বহির্ভূত রপ্তানির তুলনায় তৈরি পোশাক খাত বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়নি এবং ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে।

প্রকৃত বিনিময় হারের উপচয় (Appreciation) : ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি অগ্রগতির দুর্বলতার প্রধান কারণ হলো ২০০৬ সাল থেকে প্রকৃত বিনিময় হারের উপচয়ের ক্রমযোজিত প্রভাব। ২০০৫-০৬ এবং ২০১৮-২০১৯ মেয়াদে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রকৃত অর্থে ৩৬ শতাংশ হারে উপচয় করা হয় (চিত্র ২.১)। ইউরোর সাথে ২০০৭-০৮ সালের পরে উপচয় সংঘটিত হয়। তখন থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে ৪৮ শতাংশ হারে টাকার উপচয় করা হয় (চিত্র ২.২)। ইউরোর বিপরীতে এই অতিরিক্ত উপচয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে টাকা মার্কিন ডলারের তুলনায় ইউরোর বিপরীতে শক্তিশীলভাবে প্যাগড। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার উপচয়ের ফলাফলস্বরূপ ইউরোর বিপরীতে টাকার অতিরিক্ত উপচয় সংঘটিত হয়। এ দুটি প্রধান বৈশ্বিক মুদ্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্থে টাকার এ উপচয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে এবং রপ্তানির বহুমূখীকরণে বড় ধরণের প্রতিবন্ধতা তৈরি করে।

চিত্র ২.১: বাংলাদেশী টাকা-মার্কিন ডলারের নমিনাল এবং প্রকৃত বিনিময় হারের ধারা

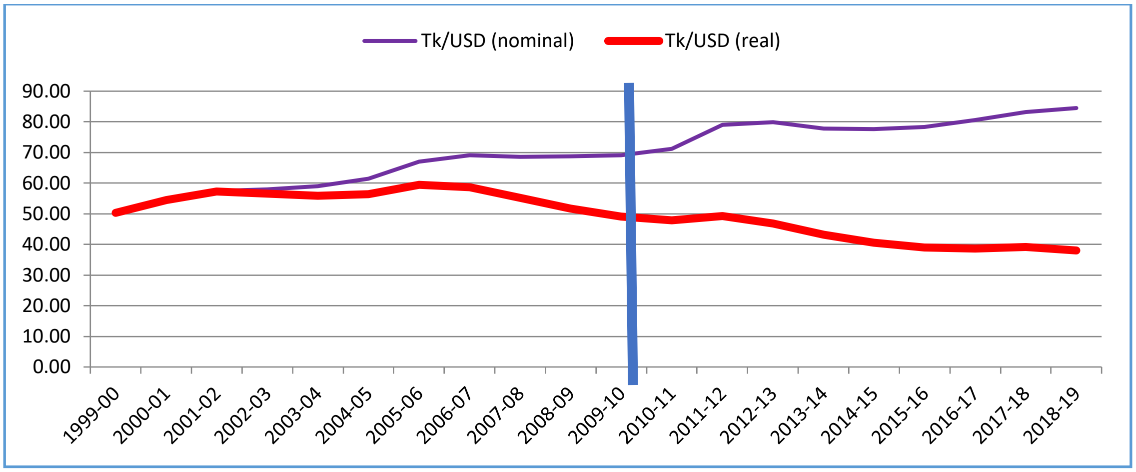

সূত্র:বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রক্কলন

চিত্র ২.২:বাংলাদেশী টাকা-ইউরোর নমিনাল এবং প্রকৃত বিনিময় হারের ধারা

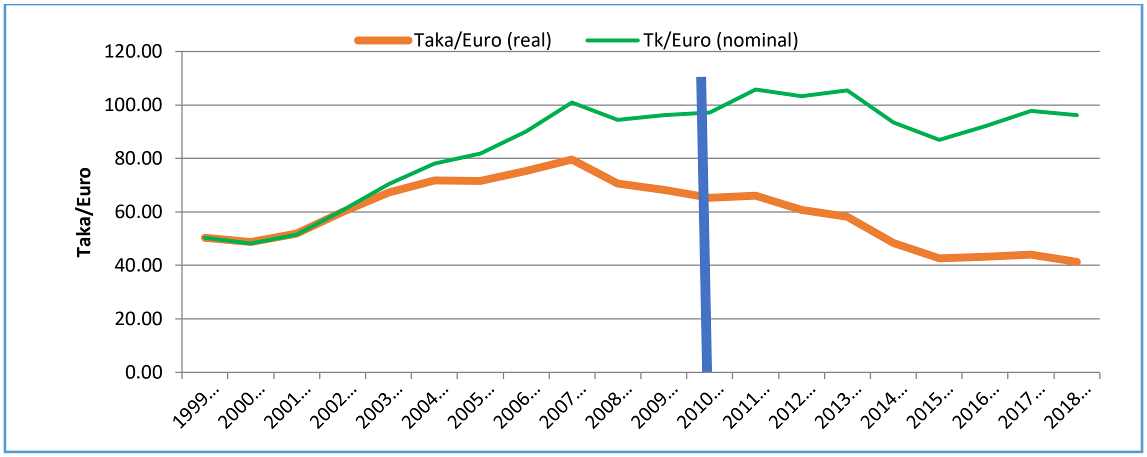

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রক্কলন

প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বাণিজ্য সুরক্ষার রপ্তানি বিমুখ ধারা এবং প্রকৃত বিনিময় হারের উপচয়ের কারণে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধিত হয় কারণ তা রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণে প্রদানকৃত নগদ ভর্তূকি ও অন্যান্য আর্থিক প্রণোদনার কার্যকরিতাকে বিনষ্ট করে দেয়। ২০১৭ অর্থবছর থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে এবং অদ্যাবধি অতীতের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ধারার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিনিময় হারের সঠিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

২.৩ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা

আগামী পাঁচ বছরের বাণিজ্য ও শিল্প কৌশল সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়, বাংলাদেশ উনয়নশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে যে সকল দেশ দ্রুতবর্ধনশীল প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মত বিষয়ে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তাদের বাণিজ্য ও শিল্প কৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক সময়ের পূর্ব এশীয় টাইগার (অর্থাৎ কোরিয়া, তাইওয়ান (চীন), হংকং (চীন), সিঙ্গাপুর), মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, চীন এবং সাম্প্রতিক সময়ের উদীয়মাণ অর্থনীতি ভিয়েতনাম। চিত্র ২.৩, ১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে পূর্ব এশীয় চার টাইগারের অসাধারণ রপ্তানি পারফরম্যান্সের (ম্যানুফ্যাকচারিং সামগ্রীতে) চিত্র তুলে ধরে। ১৯৮০, ১৯৯০ এবং তৎপরবর্তী কালে চীন তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানিতে দক্ষতা প্রদর্শনকারী নতুন সদস্য হিসেবে ভিয়েতনামের আবির্ভাব ঘটেছে। ১৯৬০ এর দশকে দুর্বল উন্নয়নশীল অর্থনীতি থেকে পূর্ব এশীয় চার টাইগার প্রায় ৫০ বছরেই উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে।

উচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন পূর্ব এশীয় দেশসমূহ রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপণ করে। এ দেশগুলো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমুহের পূর্ববর্তী তুলনামূলক সুবিধা বর্জনকারী (CAD) আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন (ISI) থেকে বের হয়ে, বাণিজ্য উন্মুক্ততার মাধ্যমে তুলনামূলক সুবিধা অনুসরণকারী তত্ত্ব ভিত্তিক রপ্তানি উন্নয়নের পথ অনুসরণ করে সহসাই একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়। স্বল্পোন্নত (LDCs) এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমুহের বাণিজ্য এবং শিল্প নীতিতে একই ধরণের পরিবর্তন আনয়নের বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর মত বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহ নির্দেশনা এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে।

চিত্র ২.৩: পূর্ব এশীয় টাইগারদের ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার (শতাংশ)

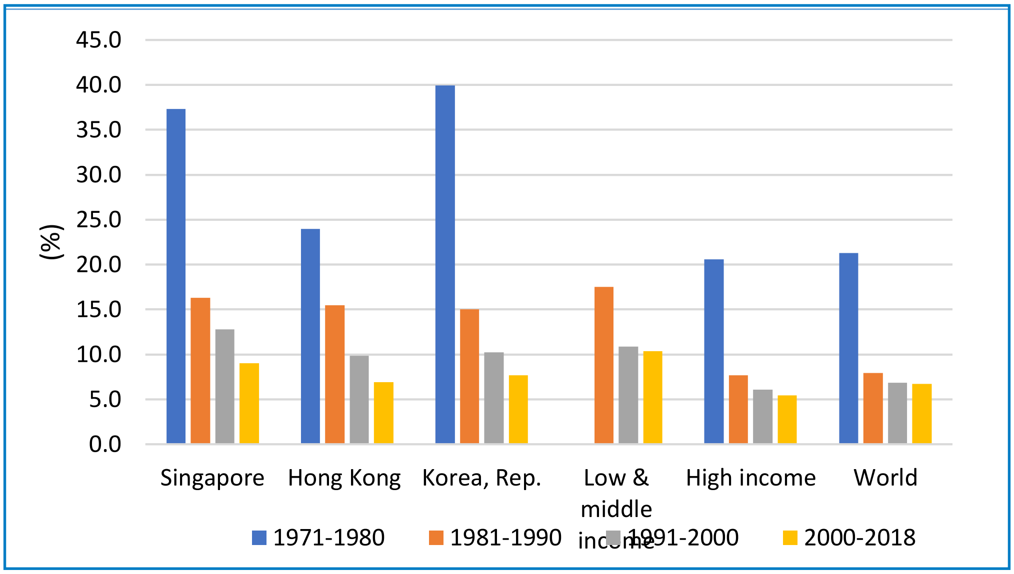

সূত্র:বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক (WDI), বিশ্বব্যাংক

স্বনামধন্য বাণিজ্য ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের গবেষণায় এক্ষেত্রে অনুসরিত নীতির দু'টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়ঃ (ক) আমদানি এবং রপ্তানি বিকল্প উৎপাদনের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন প্রণোদনার ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্মুক্ততরণ এবং (খ) বিশাল আর্ন্তজাতিক বাজারের গতিশীল অর্থনৈতিক সুবিধার সুফল ভোগ করার লক্ষ্যে নির্বাচিত কিছু শিল্পে হস্তক্ষেপ, যেগুলোকে বাণিজ্য নীতির হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করে আরও নতুন ও আধুনিকায়ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজেদের ভারী ও রাসায়নিক শিল্প প্রকল্প (এইচসিআই) সম্প্রসারণে জাপান এবং কোরিয়ায় বেসরকারি শিল্প খাত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার জন্য সিঙ্গাপুর এবং তাইওয়ানও সক্রিয়ভাবে প্রণোদনা প্রদান করে। জাপান এবং কোরিয়ার সাথে সাদৃশ্য রেখে মালয়েশিয়াও একটি এইচসিআই প্রকল্প গ্রহণ করে, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া শ্রম-নির্ভর উৎপাদন থেকে যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রোনিক্সের মতো উচ্চ-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের প্রসারে মনোনিবেশ করে।

বাণিজ্য নীতি এবং প্রবৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য উৎপাদনের মধ্যে নিরপেক্ষ/ পক্ষপাতহীন প্রণোদনার সুপারিশ করা হয়। নিরপেক্ষ প্রণোদনার ফলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী খাতে অর্থনীতির বেশিরভাগ সম্পদ প্রবাহ হবে। পরবর্তীতে, তাত্ত্বিক কার্যক্রমে/গবেষণায় দেখা যায় যে, বাজার শক্তি, অর্থনীতির মাত্রা, জ্ঞান, অথবা বাহ্যিকতা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্যে নিরপেক্ষ প্রণোদনা পরিহার, রপ্তানি বাণিজ্যের মান উন্নয়নে অবদান রাখে। সরকারের হস্তক্ষেপের বিষয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, নির্দিষ্ট কিছু শিল্পের বিকাশে প্রণোদনা সাধারণ অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। অপরদিকে, রপ্তানি খাতে সরকারের সামগ্রিক সহায়তা আন্তর্জাতিক বাজারে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে একটি কার্যকরী পন্থা হিসেবে প্রমানিত হয় এবং উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি উন্নতিকরণে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

পূর্ব এশীয় দেশসমুহের বাণিজ্য ও শিল্প নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ পূর্ব এশীয় দেশ সুরক্ষাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিল্পায়ন শুরু করে এবং ধীরে ধীরে মুক্ত বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। সে অনুযায়ী, এসব দেশ প্রায়শই মিশ্র বাণিজ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা সৃষ্টিকারী সুবিধাদি আয়ত্ত করে; তারা ভোগ্যপণ্যকে সংরক্ষিত বাজারের অন্তর্ভুক্ত রেখে, রপ্তানিকারকদের কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কমুক্ত আমদানি মঞ্জুর করে। যেহেতু তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে নির্ধারিত রপ্তানি মূল্যের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সেই মূল্য চলতি গড় বা মুদ্রিত মূল্যের থেকে প্রায়শই যথেষ্ট কম থাকে, তাই রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্যের ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে মুনাফা নিশ্চিকতরণের কৌশল অবলম্বন করা হয়ে থাকে। উপরন্তু, প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে ব্যয় সংশ্লিষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সেলক্ষ্যে রপ্তানি নীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয়। প্রকারান্তরে, উচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন সকল পূর্ব এশীয় দেশসমূহ আমদানি বিকল্প শিল্পে তাদের রক্ষণশীলতার মাত্রা কমিয়ে এনেছে, এতে করে বিরাজমান পক্ষপাতিত্বমূলক রপ্তানি-বিরোধী নীতির কার্যত দূরীকরণ নিশ্চিত হয়েছে। এখানে উল্ল্যখযোগ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান সুরক্ষা হারের তুলনায় এসব দেশের রক্ষণশীলতার তুঙ্গে থাকাকালীন কার্যকর সুরক্ষা হারের পরিমাণ কম ছিল।

পূর্ব এশীয় বেশির ভাগ দেশ রপ্তানি অগ্রগতির এমন মানদণ্ড তৈরি করে যে অর্থনৈতিক সকল কার্যক্রম সেই আলোকেই বিশ্লেষিত হত। এমনকি অভ্যন্তরীণ বাজারে বিদ্যমান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা গড় হারের চেয়ে বেশি সুরক্ষা হার ভোগ করে লাভজনক অবস্থানে ছিল- তারা এই বিষয়ে অবগত ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হতে পারে। আমদানি সুরক্ষা হারের এমন উল্লেখযোগ্য হ্রাস দক্ষিন-পূর্ব এশীয় নব্য শিল্পায়ন অর্থনীতির উৎপাদকদেরও একই নির্দেশনা প্রদান করে। সরকার দৃঢ়ভাবে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। আন্তর্জাতিক জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে রপ্তানি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট গুবুত্ব রয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং রপ্তানিকারকদের শুল্কমুক্ত আমদানি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আমদানি বিকল্প শিল্পের সংযোগ স্থাপন করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক আপেক্ষিক মূল্য এবং আভ্যন্তরীণ আপেক্ষিক মূল্যের মাঝে খুব সামান্য পার্থক্য বজায় থাকে। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাজার শক্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক চাপে সম্পদের প্রবাহ ও কার্যক্রম পরিচালিত করতে সহায়তা করে যা শ্রম-নির্ভর রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত পন্থা এবং পরবর্তীকালে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপন করে। নিম্নে চিত্র ২.৪-এ চীন এবং ভিয়েতনামের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

২.৩.১ ১৯৭৮ পরবর্তী চীনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল

১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত দারিদ্র্য কবলিত দেশের অবস্থান থেকে বাজার এবং বৈশ্বিকমুখী সংস্কারের তিন দশকের মধ্যে প্রধান বৈশ্বিক প্রতিযোগী হিসেবে চীনের অর্থনীতির উদ্ভব। ২১ শতকের সফল অর্থনৈতিক কৌশলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে চীনকে বর্ণনা করা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্র তৈরির ”বিশ্ব কারখানা” হিসেবে। বিশ্বের প্রধান রপ্তানিকারক হিসেবে চীনের এই আকর্ষণীয় উদ্ভব পূর্ব এশীয় টাইগারদের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং সবচেয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন অর্থনীতির সমতুল্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে।

২০১৩ সালের বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন ”চীন ২০৩০-আধুনিক মানবিক ও সৃজনশীল সমাজ বিনির্মাণ” অনুসারে ১৯৭৮ পরবর্তী চীনের রপ্তানি বৃদ্ধি, দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

ব্যবহারিক ও কার্যকর বাজারমুখী সংস্কার: এসব সংস্কারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের দ্বৈত-ধারা (Dual track) যা পুরানো অগ্রাধিকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীণ খামার গুলোকে সহায়তা প্রদান করে ও অন্যদিকে বেসরকারি শিল্প বিকাশের উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয়।

সামাজিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির মাঝে ভারসাম্য রক্ষা: ১৯৭৮ সালের সংস্কার পর্যায়ের পূর্বে যে অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল তা থেকে উত্তরণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আর্থিক, প্রশাসনিক এবং কর্মসংস্থান নীতির মিশ্রণের ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন সামাজিক স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের (ঝঙউং) পুনকাঠামোকরণ করা হয় ফলে ব্যাপক শ্রমের বিচ্যুতি ঘটে যা বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়।

অভ্যন্তরীণ বাজারের সমন্বয় (Integration): পণ্য, শ্রম, পুঁজির চলাচল এবং জাতীয় বাজার প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক বাঁধাসমূহ দূর করতে নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। বাজার সম্প্রসারণে সড়ক ও সমুদ্র সংযোগের উন্নতি বিধানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন: বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অভিগম্যতা চীনকে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছে।

মূল্য চেইন সংযোজন: বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকর্ষন করতে এবং বাণিজ্য সুবিধার উদারীকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক মূল্য চেইনের উন্নয়ন করে দেশটি একটি বন্ধ এবং রক্ষণশীল অর্থনীতি থেকে উচ্চ বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত সম্পন্ন দেশে পরিণত হয়। গত কয়েক বছরে পরিবহন, ইন্টারনেট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত অবকাঠামোতে চীন ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। বৈশ্বিক মূল্য চেইনে উন্নয়নের ফলে ফার্মে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইউএস ও জার্মানির পাশাপাশি আজ চীন তিনটি প্রধান বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্রের অন্যতম।

আঞ্চলিক সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে এশীয় অর্থনীতি চীনের সাথে শক্তভাবে যুক্ত রয়েছে। ম্যাকেন্সি বৈশ্বিক ইনস্টিটিউট পরিলক্ষণ করে যে, সম্প্রতি মূল্য চেইন অধিক আঞ্চলিক এবং কম বৈশ্বিক প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। এই উন্নয়ন বিশেষ করে এশিয়াতে লক্ষ্যণীয়। মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ অংশীদার হলো চীন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীনের ভূমিকা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। চীন এখন বৈশ্বিক মূল্য চেইনের উচ্চতর মূল্য সংযোজন অংশে প্রবেশ করছে।

২.৩.২ ভিয়েতনাম: ম্যানুফ্যাকচারিং বিস্ময়

বিশ্বব্যাপী ১০টি স্মার্টফোনের একটি বর্তমানে ভিয়েতনামে উৎপাদিত হয়। মোবাইল ফোন ভিয়েতনামের এক নম্বর রপ্তানি। দেশটি ২০১৯ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি রাজস্ব আয় করে। ২০১৮ সালে বাণিজ্য-জিডিপির অনুপাত ১৯০ শতাংশে উন্নীতকরণের মাধ্যমে ভিয়েতনাম বিশ্বের সবচেয়ে উন্মুক্ত অর্থনীতির স্থান দখল করে। শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত বাঁধা দূরীকরনের মাধ্যমে এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দেশটি বাণিজ্য উদারীকরণে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য ব্লকগুলোর সাথে সমন্বয় সাধনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

ভিয়েতনামের উন্নয়ন কৌশলে ইউনিক কিছু রয়েছে। এক সময়ে যখন বৈশ্বিক বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়ে, তখন ভিয়েতনামের বাণিজ্য ২০০৭ সালের ৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে জিডিপির ২০০ শতাংশে উন্নীত হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা ব্যবহার করে ভিয়েতনামের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। ২০১৪ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে ১.৫ মিলিয়ন নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং কর্ম সৃষ্টি হয়। ভিয়েতনামে ম্যানুফ্যাকচারিং- এ রেনেসা ঘটে গেছে, অন্যদিকে বিশ্বের অনেক অংশ পূর্বাবস্থায় থেকে গেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসৃজনের ক্ষেত্রে ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল এবং উন্নত অর্থনীতির জন্য একইভাবে শিক্ষণীয়।

ভালো নীতির শক্ত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ভিয়েতনাম সফল হয়েছে। প্রথমত, বাণিজ্য উদারীকরণকে মুক্ত হস্তে আলিঙ্গন করেছে। দ্বিতীয়ত, বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যবসা কার্য পরিচালনার খরচ কমানোর দেশীয় সংস্কারের মাধ্যমে এটি বৈদেশিক বাণিজ্য উদারীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তৃতীয়ত, কোন শর্ত কিংবা বিধিনিষেধ ছাড়াই উন্মুক্ত হাতে এফডিআইকে স্বাগত জানিয়েছে। চূড়ান্তভাবে, মানব ও ভৌত উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। বৈদেশিক বাণিজ্য উদারীকরণ, দেশীয় সংস্কার, এফডিআই আহরণ এবং মানব ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করার এই শিক্ষণগুলো উন্নয়নশীল দেশ গুলোর জন্য উদাহরণস্বরূপ।

চিত্র ২.৪: চীন ও ভিয়েতনামের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (১৯৮০-২০১৫)

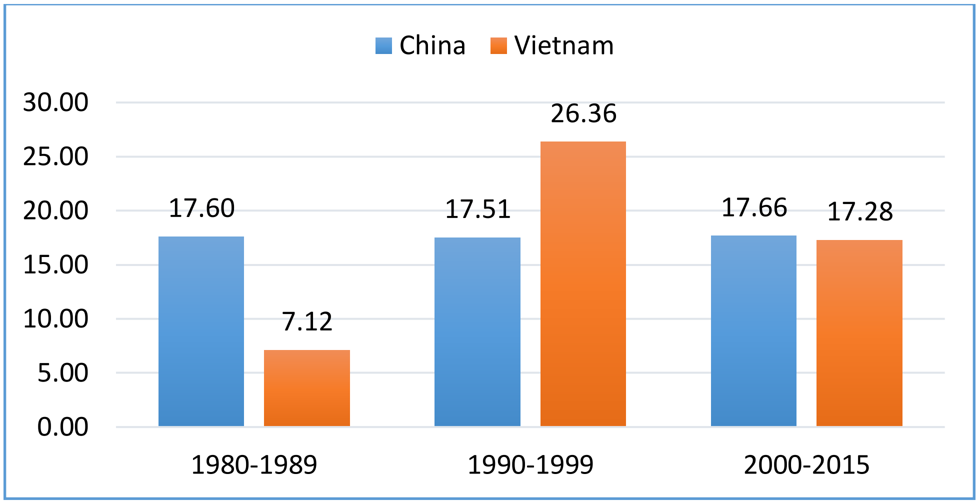

সূত্র:বিশ্ব উন্নয়ন নির্দেশক (WDI), বিশ্বব্যাংক

প্রথমত, বাণিজ্য নীতি ছিল ভিয়েতনামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনীতি। সিংগাপুরের পর এটি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সদস্য হিসেবে পূর্ব এশিয়াতে শীর্ষে অবস্থান করছে। দেশটি ১৬টি দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে। ভিয়েতনাম বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও এশিয়ান এর সদস্যসহ ইউএসএ, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউ এবং ইউরেশিয়ান কাস্টম ইউনিয়নের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই বছরের প্রথম দিকে, এটি পূনর্জীবিত CPTPP- এর সাথে যুক্ত হওয়া ১১ টি দেশের একটি।

এসব বাণিজ্য চুক্তিগুলোর অধীনে দেশটি ব্যাপকভাবে শুল্ক হ্রাস করেছে, বহুমুখী দেশীয় সংস্কার সাধন সহ বৈদেশিক বিনিয়োগে অর্থনীতি অনেকটাই উন্মুক্ত করেছে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী ১০,০০০ এর অধিক বিদেশি কোম্পানি দেশটিকে বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্যামসাং, ইন্টেল এবং এলজির মতো বড় বড় বৈশ্বিক কোম্পানিও রয়েছে। ভিয়েতনামের বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রধানত রপ্তানিমুখী, শ্রম-নিবিড় উৎপাদন শিল্পে।

দ্বিতীয়ত, ভিয়েতনাম মানব উন্নয়নে কার্যকরী বিনিয়োগের মাধ্যমে জনমিতির লভ্যাংশ অর্জনে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভিয়েতনাম বেশ সফল হয়।

তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতার সক্ষমতার উন্নয়নে এবং ব্যবসা কার্য পরিচালনা সহজীকরণের ওপর জোর দেয়া হয়। ২০১৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রতিযোগিতা সূচকে এবং ২০১৮ সালের বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবসা কার্য পরিচালনার সহজীকরণ র‍্যাংকিং এ উচ্চতর স্কোর অর্জন করে (৫ পয়েন্ট উপরে উঠে ৫৫ তম অবস্থান) এবং ২০১৪ সালের তুলনায় ৩১ পয়েন্ট উপরে উঠে ৬৮তম অবস্থান অর্জন করে। বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে ভিয়েতনাম ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছে। কর্পোরেট আয় কর ২০০৩ সালের ৩২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে হ্রাস করা হয়।

চূড়ান্তভাবে, ভিয়েতনাম অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে এবং যোগাযোগে। উচ্চ সরকারি বিনিয়োগের কারণে দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বণ্টন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামগ্রিকভাবে ভিয়েতনামের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত আপেক্ষিকভাবে ছোট। অধিকাংশ খাত বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ৯০ শতাংশের কাছাকাছি ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানিমুখী। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে সৃষ্ট কর্মের প্রকৃতি মূলত মৌলিক এসেম্বিলিং যার জন্য ম্যানুয়াল শ্রম প্রয়োজন। কিন্তু তা যথেষ্ট মূল্য যোগ করে না (প্রতি শ্রমিকে)। অধিকন্তু, যেহেতু মজুরি অপরিহার্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তাই নিম্ন দক্ষতায়, শ্রম নিবিড় শিল্পে ভিয়েতনামের চলতি তুলনামূলক সুবিধা বেশিদিন বজায় থাকবে না। নতুন শ্রম সাশ্রয় প্রযুক্তি ও স্বংক্রিয়তার ধারা ত্বরান্বিত হতে পারে। বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযাজন র‍্যাংকে ভিয়েতনামের সাম্প্রতিক আরোহন রপ্তানিমূখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনার গুরুত্ব তুলে ধরে।

আগামীর পথে: যখন বাণিজ্য ও শিল্পনীতির প্রসঙ্গ আসে, চীনসহ পূর্ব এশিয়ার উচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন অর্থনীতি বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসকল উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। আন্তর্জাতিক বাজারে দেরিতে প্রবেশকারী ভিয়েতনাম রপ্তানি প্রসারে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে। রপ্তানি জিডিপি অনুপাত ১০০ শতাংশ অতিক্রম করেছে এবং এর বাণিজ্য অনুপাত ২০০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এসব অর্থনীতির উন্নয়ন কৌশলগুলোর মধ্যে যে জিনিসটি বেশি দেখা যায় তা হলো দেশে শিল্পায়ন ও ব্যাপক কর্ম সংস্থানের শক্তি যোগাতে বৃহত্তর বাণিজ্য সংযোগের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারের সুবিধা কাজে লাগানো। সকল পুর্ব এশীয় টাইগারদের মধ্যে একটি সাধারণ কৌশল হলো রপ্তানি উৎপাদনে প্রণোদনা ও দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদনের যে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে তার ভারসাম্য নিশ্চিত করা। দুটো বাজারের মধ্যে নিরপেক্ষ প্রণোদনা বজায় রাখতে গতানুগতিক প্রেসকিপশনে পরিবর্তন আনা হয়। শিল্প সুরক্ষা বিদ্যমান ছিল কিন্তু তা রপ্তানি প্রণোদনাকে অকেজো করেনি কিংবা রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাত তৈরি করেনি। শিল্পনীতির ক্ষেত্রে, কোরিয়া, (ভারী ও কেমিক্যাল শিল্প) তাইওয়ান, এবং মালয়েশিয়ায় সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত শিল্পখাতে কাংখিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি এবং স্বাভাবিকভাবেই তা ব্যর্থ নীতিতে পরিণত হয়। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ঐতিহ্যবাহী কৌশল থেকে প্রস্থান করে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন স্পষ্টত প্রভাবশালী কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভিয়েতনামে এফডিআই নির্ভর রপ্তানিমূখী বিনিয়োগকে এতোটাই উৎসাহিত করা হয়েছে যে, ২০১৮ সালে ভিয়েতনামের ম্যানুফ্যাকচারিং রপ্তানির ৯০ শতাংশই ছিল এফডিআই চালিত। তিনটি শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- আমদানি বিকল্পের তুলনায় রপ্তানিমূখী উৎপাদনের পক্ষে প্রণোদনা প্রদান, রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির প্যারাডাইম এবং রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এফডিআই আহরণ। বাংলাদেশের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল গ্রহণে এই শিক্ষা কাজে লাগানো যায়।

চূড়ান্তভাবে, এসব অর্থনীতিতে রাষ্ট্র যে সীমিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে তার ওপর আলোকপাত করা গুরুত্বপূর্ণ। বাজার হলো শক্তিশালী চালক কিন্তু তা পারফেক্ট নয়। বাজারকে দক্ষভাবে কাজ করাতে প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বাজারের প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তিতে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বদাই সহায়তামূলক। যথাযথ নিয়ম নীতি দিয়ে স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতি বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক পণ্য ও খাত প্রবাহে অর্থনীতিকে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করা; বেসরকারি শিল্পকে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে দেওয়া এবং মৌলিক মানব পুঁজি এবং অবকাঠামোর মতো জরুরি সেবা নিশ্চিত করা।

২.৪ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়নে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাণিজ্য নীতি

আজকের বিশ্বায়িত বিশ্বে, বাণিজ্যনীতিসমূহকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, শিল্প ও বাণিজ্যনীতিসমূহ প্রায় একই মুদ্রার দুই পিঠ। বৃহৎভাবে সংজ্ঞায়িত করলে দেখা যায় যে শিল্প কৌশলসমূহ দুই ধরণের- রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন এবং আমদানি বিকল্প শিল্পায়ন। যা মূলত উৎপাদিত পন্যের শেষ গন্তব্য বিদেশী বাজার না অভ্যন্তরীণ বাজার তার ওপর নির্ভর করে। বাণিজ্য নীতি দ্বারা বিদেশি না অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে শিল্পায়নকে ধাবিত করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তী কোয়ার্টার শতকে বাংলাদেশে কর্মসৃজনের প্রধান ক্ষেত্র হবে বহুমূখী ম্যানফ্যোকচারিং খাত যা বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং রপ্তানিমুখী এবং সেই সাথে উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য শেয়ার বৃদ্ধি পাবে। সরকারের ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ ইতোমধ্যে বহির্মূখী বাণিজ্য নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের বাণিজ্য ও শিল্পনীতির নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তনিমুখী বা বাণিজ্য নির্ভর প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাণিজ্য নীতির বহির্মুখী কৌশলসমূহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সম্পূর্ণরুপে কার্যকর করতে হবে। যাইহোক, এইক্ষেত্রে সংস্কার এজেন্ডা অনেকাংশে অসমাপ্ত রয়ে গেছে এবং কিছু নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে বিশেষভাবে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের এলডিসি পর্যায় থেকে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে। নীতিমালাসমূহ যথাযথ হতে হবে যাতে একদিকে তুলনামূলক সুবিধা ভিত্তিক রপ্তানি প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয় এবং অন্যদিকে রপ্তানি উৎপাদন এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য আমদানি বিকল্প উৎপাদনের মধ্যে প্রণোদনার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা যায়। নি:সন্দেহে গ্রাজুয়েশন পরবর্তী পর্যায়ে ”প্রিফারেন্স ধ্বস”-এর কারণে বৈশ্বিক বাজারে টিকে থাকতে প্রচন্ড প্রতিযোগিতার সম্মুক্ষীণ হতে হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিশেষত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে, তবে কৃষি প্রক্রিয়াজাত (যেমন পাট পণ্য) এবং কৃষি পণ্যও কম প্রতিযোগিতার সম্মুক্ষীণ হবে না।

শিল্পায়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য নীতি কৌশল: বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপ মোকাবিলা করতে পারলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা নির্ভর করছে মূলত তিনটি আন্তঃসম্পর্কীয় বিষয়ের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের ধারার ওপর যেগুলো হচ্ছে- (ক) অধিক প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য পরিস্থিতি (খ) বিশ্বায়নের ভবিষ্যৎ (গ) ভবিষ্যৎ ম্যানুফ্যাকচারিং

ও সেবাখাত সমূহের রূপান্তরের সাথে বাণিজ্য নীতির বিবর্তন। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ বাংলাদেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতি পর্বও। এই তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত ও কৌশলগত শক্তির আন্তঃক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি ও কর্মসৃজনে সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করবে বাংলাদেশকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করতে সহায়তা করবে।

শিল্পনীতির বিষয়বস্তু ও নীতিসমূহ: বাংলাদেশের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রবৃদ্ধির গতানুগতিক ধরণের সাথে সংগতিপূর্ণ যেখানে জিডিপিতে শিল্পের অংশ কৃষির তুলনায় বৃদ্ধি পায়। কর্মসৃজন ও প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পায়নকে কার্যকর করতে ভালো শিল্পনীতি প্রয়োজন। সিংগাপুর, আয়ারল্যান্ড, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর উন্নয়নে শিল্পনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে ক্লাস্টার ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। কালক্রমে, শিল্পনীতির কার্যকারিতা বিষয়ে অধিক ব্যবহারিক মতের উদ্ভব ঘটছে। কার্যকরী শিল্পনীতি প্রণয়নে শিল্পনীতির তাত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশ কালানুক্রমিকভাবে শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। তাই ভালো শিল্পনীতি প্রণয়ন করা অত্যাবশক যাতে প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা ত্বরান্বিত করা যায়।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পখাতে টেকসই গতিশীলতা আনয়নে দ্বিমুখী পদ্ধতি প্রয়োজন যা বর্তমানে অনুশীলন করা হচ্ছে তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

(ক) ***দেশীয় বাজারের চাহিদা বৃদ্ধিকরণের সাথে সাথে রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন দ্বারা প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ:*** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এবং দেশের গতিশীল তুলনামূলক সুবিধার ওপর নির্ভর করে এমনভাবে শিল্পায়ন করতে হবে যাতে তা কর্মসংস্থান নিবিড় হয়। যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সাথে সংগতিপূর্ণ হবে। এভাবে প্রতিযোগিতার ওপর ভিত্তি করে রপ্তানি বহুমূখীকরণ ও দেশীয় বাজার সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হবে। রপ্তানি ও সুরক্ষা নীতিসমূহ সংঘাতপূর্ণ নয়, উদ্দেশ্য হবে দুটো নীতির মধ্যে পরিপূরকমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা। রপ্তানি প্রণোদনা ও সুরক্ষামূলক শুল্ককে আধুনিকায়ন ও যৌক্তিকীকরণ করা প্রয়োজন। অসমাপ্ত বাণিজ্য সংস্কার সম্পন্ন করা ছাড়াও কাস্টম প্রশাসন আধুনিকায়ণে বাণিজ্য সুবিধা উপাদানগুলোর ওপর জোর দিবে।

খ) ***বেসরকারি খাত:*** বেসরকারি খাত প্রবৃদ্ধির চালিকা হবে। এই লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে রাষ্ট সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করবে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গর্ভন্যান্স শক্তিশালীকরণসহ বেসরকারি খাতের সাথে রাষ্ট্রের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, আইন ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি, অবকাঠমোগত বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা (বিদ্যুৎ, ওভার ল্যান্ড, বন্দর পরিবহন এবং যোগাযোগ) দূরীকরণ। দক্ষ ও কার্যকরী আর্থিক খাত প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করতে হবে। প্রবৃদ্ধির সাথে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসে বেসরকারি খাত সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে। বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা জরুরি:

বৈশ্বিক বাজার অনুসন্ধান: বিশ্ব অকল্পনীয়ভাবে দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে ৭,৮,৯, কিংবা ১০ শতাংশ বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে দ্রুত সমন্বয় (integration) সাধনের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব। বৈশ্বিক অর্থনীতি দুটো সুবিধা প্রদান করে। একটি হলো বৃহৎ বাজার যা কালক্রমে অধিক সমন্বিত হচ্ছে। যদি অর্থনীতির কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা থাকে এবং যা বাংলাদেশের রয়েছে, এক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনশীলতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে বৈশ্বিক বৃহৎ বাজারের সুবিধা কাজে লাগানো সম্ভব। দ্বিতীয় বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ- বৈশ্বিক অর্থনীতি নতুনজ্ঞান, প্রযুক্তি, পদ্ধতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। ডিজিটালকৃত তথ্য প্রবাহ ব্যবহার করে বিশ্বায়ন জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষণের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। সঠিকভাবে এই বৈশ্বিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

প্রতিবছর ২ মিলিয়ন কর্ম সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ পূরণে বৈশ্বিক বাজারকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। দেশীয় অর্থনীতির ক্ষুদ্র আকার বিবেচনা করে বাংলাদেশের প্রয়োজন পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধি করা যাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয়। দেশীয় বাজারের আকার বড় হলেও তা ৮০ ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যাপক বৈশ্বিক বাজারের সাথে তুলনীয় নয়। EEU ও উত্তর আমেরিকার বাহিরেও চীন, ভারতের এবং এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে এ সকল এলাকা বিশ্বের অধিকাংশ বাণিজ্য শেয়ার (১০০ বিলিয়ন ডলার) দখল করবে যার সুবিধা বাংলাদেশকে কাজে লাগাতে হবে।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: আগামী ৫ বছর কিংবা কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক বাজারে লাগামহীন প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ সময় ”প্রিফারেন্স এরোশন” অনেকাংশে কার্যকর হয়ে যাবে। নতুন প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে

বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে ভালো সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিনির্মাণ এবং শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। বিশ্ব ব্যাংকের ব্যবসা সহজিকরণ (ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস, (EDB) ২০১৯) র‍্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় আনুমানিক ৫ বছর পিঁছিয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক গর্ভন্যান্স ও রেগুলেটরি পরিবেশ ব্যবসা ও বিনিয়োগের অনুকূল হতে হবে। উন্নত অবকাঠামো সেবা নিশ্চিতকরণ, সহজ বাজার প্রবেশ/প্রস্থান, তথ্যের অবাধ অভিগম্যতা এবং শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক চাপ ফার্মকে অধিক উৎপাদনশীল, প্রতিযোগিমূলক, গতিশীল এবং উদ্ভাবনী করে তুলবে। এটি তুলনামূলক সুবিধার বাইরেও (সস্তা শ্রমের ওপর ভিত্তি করে) প্রতিযোগী সুবিধার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাজরে ফার্মকে প্রতিযোগী সক্ষম করে তুলে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীন জাতীয় উৎপাদনশীল সংস্থার প্রণয়নকৃত "বাংলাদেশ জাতীয় উৎপাদনশীলতা মাস্টার পরিকল্পনা ২০২১ অর্থবছর - ২০৩০ অর্থবছর" পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার প্রতিবছর ২ অক্টোবরকে জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস হিসেবে ঘোষনা করেছে।

বহুমূখীকরণ ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা উন্নয়নের প্রয়াস: রপ্তানি বহুমূখীকরণ ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে অসম্পন্ন সংস্কারের একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাকলগ রয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতার উন্নতি বিধানে অগ্রাধিকারমূলক নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমত, বৈশ্বিক বাজারগুলো দ্রুত প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও প্রতিযোগিতামূলক চাপসহ বাণিজ্য সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রপ্তাণি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বহুমূখীকরণের কোন বিকল্প নাই। দ্বিতীয়ত, যদিও বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের (RMG) আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে তবে এটিকে টিকে থাকতে হলে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে কারণ এটি প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে উদাহরস্বরূপ ইউতে-প্রিফারেন্সিয়াল অভিগম্যতা হারিয়ে ফেলবে। আরএমজি শিল্প প্রকৃত পক্ষে বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে- শীর্ষ তিনটি পরিবেশ বান্ধব এবং বিশ্বের শীর্ষ ১০টি শিল্প কারখানার মধ্যে ৭টি বাংলাদেশের। তথাপি, শিল্পটিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। চূড়ান্তভাবে, রপ্তানি বহুমূখীকরণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের রপ্তানি একক পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। রপ্তানির ৮৩ শতাংশ তৈরি পোশাক শিল্প। যদিও গত ১০ বছরে বাংলাদেশ RMG বহির্ভূত পণ্যও রপ্তানি করছে। এগুলোর সংখ্যা ১০০০ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত (HS- ৬- কোড লেভেলে), যার মূল্য ১ মিলিয়ন ডলারে নীচে (২০১৮ অর্থবছরে আরএমজি বহির্ভূত রপ্তানি ছিল ৭৫ শতাংশ)।

এলডিসি গ্রাজুয়েশণের পর আগামী ৫ থেকে ১০ বছরে প্রতিযোগিতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে যার প্রস্তুতি জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। বাণিজ্যের চলতি অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশের দুটো ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ক) রপ্তানি বান্ধব দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি তৈরি করা খ) তুলনামূলক সুবিধার ওপর ভিত্তি করে রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী সক্ষমতার উন্নয়ন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাত দূর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে দেশীয় সীমানা বহির্ভূত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য এজেন্ডা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

২.৫ চলতি বাণিজ্য পদ্ধতি ও রপ্তানি অগ্রগতি

১৯৯০ দশকের বাণিজ্য নীতির সংস্কার উচ্চ সুরক্ষাবাদী আন্তমূখী আমদানি বিকল্প শিল্পনীতির প্রস্থানের সূচনা করে। সুস্পষ্টভাবে কিছু কিছু শিল্প তুলনামূলক সুবিধা বর্জনকারী নীতি অনুসরণে প্রসার লাভ করেছিল উদাহরণস্বরূপ ম্যাশিন যন্ত্রাংশ, এবং কিছু কেমিক্যাল শিল্প। বাণিজ্য নীতি সংস্কারের ফলে বাণিজ্য সংযোগ বৃদ্ধিসহ দেশীয় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় আপেক্ষিক মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যের ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়। এসব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে কর্মকাণ্ড সম্পাদন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং বিস্তারকে উৎসাহিত করা এবং এভাবে গতিশীলতা অর্জন। বাণিজ্য নীতি পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে শুল্ক হ্রাস এবং যৌক্তিকীকরণ, পরিমাণগত বাঁধা বিলোপ, যৌথ বিনিময় ব্যবস্থা গ্রহণ, স্থির থেকে অধিক নমনীয় বিনিময় হার পদ্ধতির প্রচলন এং চলতি বাণিজ্য হিসেবের সাথে রূপান্তর। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে এই অঞ্চলের একটি তুলনামূলক সুবিধা ভিত্তিক রপ্তানি শক্তি হিসেবে তৈরি করা এবং উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক বাজারের সাথে নিবিঢ় সংযোগ স্থাপন করা।

বাংলাদেশের রপ্তানি অগ্রগতি টেকসইকরণে যে ধরণের বাণিজ্য উদারীকরণ প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। কিন্তু এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাণিজ্য নীতি সংস্কার করা না হলে ২০২৪ সালের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পরবর্তী পর্বে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে। বৈশ্বিক বাজারে সৃষ্ট সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বিগত দশকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, চলতি বাণিজ্য পদ্ধতি এখনও আমদানি বিকল্প উৎপাদনের পক্ষে। ধীর শুল্ক হ্রাস এবং অন্যান্য সুরক্ষার পর্যায়ক্রমিক বিলোপ দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দিয়েছে এবং রপ্তানি ও রপ্তানি কর্মকাণ্ডকে নিরুৎসাহিত করেছে। কর ও প্রণোদনামূলক নীতিসমূহ এমনভাবে প্রদান করা হয়েছে যা রপ্তানিমূখী উৎপাদনের চেয়ে দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদনকে অধিক প্রণোদনা দিয়েছে।

- প্রায় সকল দেশীয় উৎপাদিত ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন শুল্ক ও প্যারা শুল্কের মাধ্যমে সুরক্ষিত। চূড়ান্ত পণ্য আমদানির ওপর শুল্ক দেশীয় মূল্যের তুলনায় তার আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধি করে। এভাবে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বিকল্প পণ্যের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এতে রপ্তানির উৎপাদন থেকে দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদনের দিকে সম্পদকে চালিত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সিরামিকস, প্লাসটিকস, এবং বিস্কুট, টেবিল সামগ্রী, রান্নাঘরের সরঞ্জামাদি, পদশোভা, ল্যাম্প ইত্যাদি পণ্যের ওপর উচ্চ সুরক্ষা হার (১১৩ শতাংশ থেকে ৮৫.৬ শতাংশ) এসব পণ্যের রপ্তানি দাম দেশীয় বাজারের দামের তুলনায় কম করে দেয়। নীট ফলাফল হলো দেশীয় বিক্রি রপ্তানির চেয়ে বেশি লাভজনক হয়ে পরে। তাই রপ্তানিকে নিরুৎসাহিত করা হয়। অথচ এসব পণ্যের উচ্চ রপ্তানি সম্ভাবনা ছিল যা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি।
- উচ্চ সুরক্ষা দিয়ে আমদানি কমানোর পর, আমদানি সর্ম্পকিত বৈদেশিক মূদ্রার চাহিদা কমানো হচ্ছে। এভাবে হয়তো বিনিময় হার নিম্ন রাখা সক্ষম হয় (উদাহরণস্বরূপ ইউ এস ডলারের নিম্ন দেশীয় মুদ্রার দাম) কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় রপ্তানি আয় কমে যায়। এভাবে বিনিময় হারের উপচয় হয়। সুরক্ষার ফলে রপ্তানি কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পরে।
- শুধু শুল্ক লেভেলেই নয়, ট্যারিফ এস্কেলেশনও অনেক বেশি। ক্রমবর্ধমান শুল্ক কাঠামো, কাঁচামালের আমদানির ওপর নিম্ন শুল্ক এবং অধিক প্রক্রিয়াজাত জিনিসের ওপর মাঝারি ও উচ্চ শুল্ক মূলত: নমিনাল সুরক্ষার চেয়ে আমদানি বিকল্প শিল্পের কার্যকরী সুরক্ষা বৃদ্ধি করে। আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন আমদানি শুল্ক ও অন্যান্য সুরক্ষা একই সাথে ভোগ করে। এর অর্থ দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজনকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যা সুরক্ষার অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান থাকতো না এবং উৎপাদনকে রপ্তানি বিমুখ করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের ট্যারিফ কাঠামোয় শুল্ক এস্কেলেশনের হার বিশ্বের সবচেয়ে বেশি।
- রপ্তানিকারকরা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে বিক্রি করে এবং তাদের ক্রেতাদের নিকট থেকে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধির টাকা আদায় করতে পারে না। এভাবে আমদানিকৃত ইনপুটের ওপর পরিশোধিত আমদানি শুল্ক তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে এবং মুনাফার মার্জিন হ্রাস করে। একইভাবে, তারা দেশীয় উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে তাদের ইনপুট ক্রয় করলে, সুরক্ষার উপস্থিতি ও স্থানীয় প্রতিযোগিতার স্বল্পতার কারণে খরচ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ইনপুটের ওপর ট্যারিফের প্রভাব প্রতিহত করতে এবং আন্তর্জাতিক মূল্যে ইনপুটের সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার দুটো পদ্ধতির প্রচলন করে- ক) বিশেষ বন্ধনকৃত পণ্য সামগ্রী (স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস) স্কিম যা তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যাপকভাবে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় খ) শুল্ক মুক্ত এবং পশ্চাদপদ স্কিম উভয়ই কাস্টম বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা শুল্ক মুক্ত ইনপুট আমদানির অনুমোদন প্রদান করে যা উচ্চ শুল্ক অর্থনীতিতে অধিক কার্যকরী হয়ে থাকে। অন্যান্য রপ্তারিকারকদের জন্যও এ সকল সুবিধা সম্প্রসারণে এনবিআর কাজ করছে। ইনপুটের ওপর পরিশোধিত শুল্কের পুনর্বন্টন কৌশল ইতোমধ্যে অকার্যকর প্রমানিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে রপ্তানি প্রতিযোগীতার সক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব নয়।
- রপ্তানিবিমুখ ধারা অদ্যাবধি প্রকট। গবেষণায় দেখা যায় যে উচ্চ শুল্ক হার রপ্তানি বিমুখ ধারার প্রধান কারণ। এ পর্যন্ত তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানি সাফল্যের জন্য যে সকল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা অন্যান্য শ্রম নিবিড় রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়নি। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি নীতি ও সুরক্ষা নীতির মধ্যে সংঘাত রয়েছে যা পারস্পরিকভাবে আলাদা। এটিকে চিহ্নিত করে দূরীভুতকরণে পদক্ষেপ নিতে হবে। সারণি ২.৪ এ উচ্চ বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসে বাংলাদেশের নিম্ন র‍্যাংকিংকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ শুল্ক রপ্তানির তুলনায় দেশীয় বিক্রির আপেক্ষিক মুনাফার বৃদ্ধি করে এবং রপ্তানির জন্য পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করে। এভাবে, রপ্তানির চেয়ে আমদানি বিকল্প উৎপাদনের পক্ষে প্রণোদনার সহজাত পক্ষপাতিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এটি পরিবর্তন করতে হবে।

সারণি ২.৪: অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশের গড়শুল্ক ক্রম (নিম্ন শুল্কের জন্য উচ্চতর ক্রম)

দেশ	সকল পণ্য (এশিয়াতে)	ম্যানুফ্যাকচারিং (বিশ্বে)
বাংলাদেশ	৪	১৯
ভারত	১০	৭৪
পাকিস্তান	৫	২৫
শ্রীলংকা	১২	৮২
ভিয়েতনাম	১৬	৯০
মালয়েশিয়া	২২	১০২
থাইল্যান্ড	১৪	৮৪

নোট: সকল পণ্যের ট্রারিফ র‍্যাংকিং এশিয় দেশগুলোর (৪৬টি দেশ) ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যারিফ র‍্যাংকিং বিশ্বের ট্যারিফ র‍্যাংকি (১৮২ টি দেশ) এর ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে: নিম্ন ট্যারিফের জন্য উচ্চু র‍্যাংক

সূত্র:ITC ডাটাবেইজ, IndexMundi বাণিজ্য পরিসংখ্যান, ২০১৭-২০১৮

সারণি ২.৫:বিশ্ব ব্যাংকের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী বিভিন্ন আয় গ্রুপের দেশের গড় শুল্ক হার

দেশের ক্যাটাগরি	গড় শুল্ক হার (শতাংশ)
নিম্ন আয়ের দেশ	১১.০
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ	৭.২
উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ	৩.৭
উচ্চ আয়ের দেশ	২.০

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক শুল্ক তালিকা ২০১৮

সারণি ২.৬: জাতিসংঘের শ্রেণিকরণ অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপের দেশের গড় শুল্ক হার

ইউএন দেশের শ্রেণিকরণ	গড় শুল্ক	ন্যুনতম	সর্বোচ্চ
উন্নত/ওইসিডি দেশ	২.০৬	০.২ (আইসল্যান্ড)	৫.৮ (চিলি)
উন্নয়নশীল দেশ	৬.৫৩	১.১ (তুর্কেমিনিস্থান)	২৫.৭ (বাহামাস)
স্বল্পন্নোত দেশ	৮.৪১	৩.৪ (ভুটান)	১৯.৬ (জিবুতি)

উৎস: জাতিসংঘ কর্তৃক দেশের শ্রেণিকরণ (২০১৪) এবং বিশ্ব ব্যাংকের ট্যারিফ উপাত্ত (২০১৮) এর ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত

সারণি ২.৭: নির্বাচিত সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিযোগী দেশগুলোর গৃহীত ট্যারিফের সাধারণ গড়

দেশ	গড় শুল্ক
বাংলাদেশ	১৩.৫*
ভিয়েতনাম	৯.৫
থাইল্যান্ড	৯.৬
এালয়েশিয়া	৫.৬
ফিলিপাইন্স	৬.২
ইন্দোনেশিয়া	৮.১
ভারত	১৭.১
শ্রীলংকা	৯.৩

উৎস: বিশ্ব ট্যারিফ প্রোফাইল ২০১৯, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, ITC ২০১৯ এবং UNCTAD ২০১৯

**কেবলমাত্র গড় কাস্টমস শুল্ক, প্যারা ট্যারিফের আরো ১৩ শতাংশ বাদ।*

সারণি ২.৫, ২.৬ এবং ২.৭ এর তথ্য অনুযায়ী অন্যান্য দেশ এবং দেশীয় গোষ্ঠীর তুলনায় বাংলাদেশের শুল্ক হার রপ্তানি বিরূপ।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও বাংলাদেশের রপ্তানি অগ্রগতি ১৯৯০ দশকের বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচির দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে ২৫ বছরে দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছে কিন্তু পুন:নবায়নকৃত বাণিজ্য সুরক্ষা এবং বিনিময় হারের অতিরিক্ত উপচয়ের কারণে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এ প্রবৃদ্ধি কমে যায় (চিত্র ২.৫)। এই পরিস্থিতি থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তরণ করতে হবে। বাণিজ্য ও শিল্পনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হারের সংমিশ্রণে অতীতের রপ্তানির গতি ধারা ফিরিয়ে আনতে হবে। তৈরি পোশাক রপ্তানির গতি ধারা অব্যাহত রেখে এ খাতের বাইরে রপ্তানির সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জোর প্রচেষ্টা নিতে হবে।

চিত্র ২.৫: বিভাজিত (Disaggregated) রপ্তানি অগ্রগতি (গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার শতাংশে)

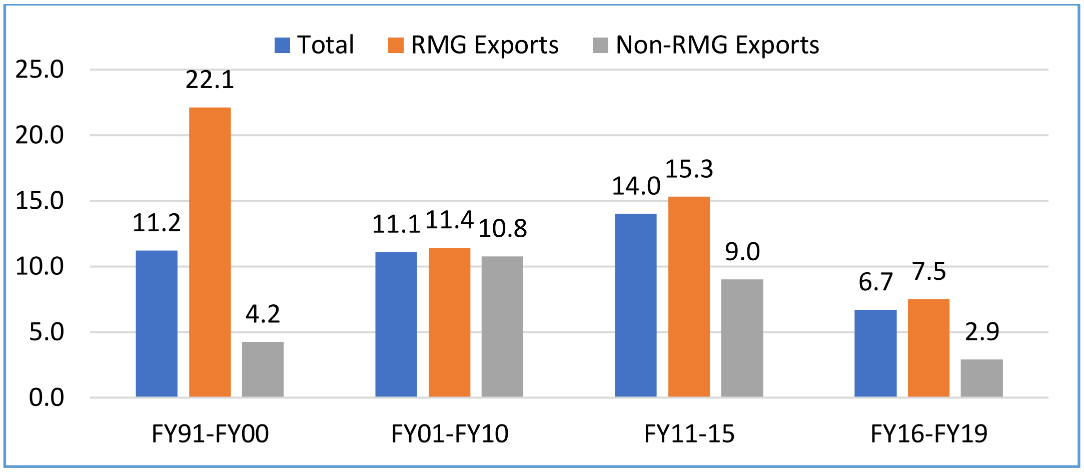

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিবিধ বছর

২.৬ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণের জন্য বাণিজ্য পদ্ধতির প্রয়োগ

দুটো আন্তঃসম্পর্কিত নীতি যথা: সুরক্ষা কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টি অনুধাবন করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু উচ্চ সুরক্ষা স্তর বলবৎ তাই রপ্তানির যেকোন সহায়তা (উদাহরণ স্বরূপ ভর্তুকি) উচ্চ হতে হবে। কিন্তু এরূপ কৌশল সমূহ আর্থিকভাবে টেকসই হয় না এবং ডব্লিউটি আইনের পরিপন্থি। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর এক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের নিকট থেকে আরও বেশি অভিযোগ আসতে থাকবে। আমাদের বাণিজ্য নীতি ডব্লিউটির সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া দরকার। ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশনের পর বিষয়টি আরো তীব্রতর হবে। তাই, রপ্তানি বিমূখী পক্ষপাতিত্বের লেভেলকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প শিল্পগুলোর সুরক্ষা কাঠামো ও তার লেভেলকে যৌক্তিকিকীকরণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

ট্যারিফ আধুনিকায়নের আবশ্যকতা: বাণিজ্য ও ট্যারিফ নীতিকে প্রধান ধারায় আনার জন্য ৫ বছর মেয়াদি একটি সমন্বিত কর্মসূচি প্রয়োজন। এ ধরণের বাণিজ্য ও শুল্ক পদ্ধতি প্রবর্তণ করা দরকার যা দেশকে বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ অনুযায়ী ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের অর্থনীতির কাতারে পৌঁছে দিবে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে চলতি শুল্ক পদ্ধতিতে সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আরোপিত প্যারা ট্যারিফে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের ট্যারিফ সীমানা না থাকার যে বিষয়টি রয়েছে তা এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। বৈদেশিক (দ্বিপাক্ষিক,আঞ্চলিক এবং বহুমূখী চুক্তির সুযোগ সুবিধা করায়ত্ত করে বাজার উন্মুক্ত করণ) এবং বাণিজ্য নীতির দেশীয় উপকরণ (রপ্তানি এবং দেশীয় বিক্রির জন্য প্রণোদনাকে ভারসাম্যপূর্ণ করে রপ্তানিবিরোধী পক্ষপাতিত্ব দূর করা) কে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে যাতে গতিশীল বৈশ্বিক বাজার এবং রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক পদ্ধতি চাহিদার সাথে মানানসই করা যায়। আসন্ন কাঠামোগত সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন যা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের মধ্যে ঘটতে পারে।

চলতি ট্যারিফ কাঠামোয় দ্রুত সংস্কার প্রয়োজন। অতি আবশ্যক অগ্রাধিকার কাজ হলো ট্যারিফ ব্যবস্থার আরো যৌক্তিকিকরণ এবং আধুনিকায়ন। ট্যারিফ কাঠামো পরীক্ষায় দেখা যায় যে গড় নমিনাল সুরক্ষা হারে (NPR) হ্রাস মূলত মৌলিক কাঁচামাল, মূলধন দ্রব্য এবং মধ্যমেয়াদি ইনপুট এ শুল্ক হ্রাসের কারণে হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ কাস্টমস শুল্ক হার অর্থবছর ২০০৫ থেকে ২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে। সাপ্লিমেন্টারি শুল্ক এবং রেগুলেটরি শুল্কের প্রভাবে প্যারা শুল্ক উঁচু হয়ে যায়। আমদানি ক্যাটাগরির নমিনাল সুরক্ষা হারের ধারা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, সাম্প্রতিক অতীতে ইনপুট ক্যাটাগরির জন্য গড় নমিনাল সুরক্ষা হারের দ্রুত পতন ঘটেছে। অন্যদিকে চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত রয়েছে। আউটপুট এবং ইনপুট শুল্কের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্যতিক্রম (চিত্র ২.৬ এবং সারণি ২.৮)। ইনপুট ও আউটপুট ট্যারিফের এই ধারা বাংলাদেশের জন্য ব্যতিক্রম এবং পূর্ব এশীয় এবং অন্যান্য প্রতিযোগী হাই পারফরমিং অর্থনীতির দেশগুলো থেকে আলাদা। এখানে দুটো বিষয় লক্ষ্যণীয়, যখন ইনপুট এবং আউটপুট শুল্কের মধ্যে ব্যবধান (শুল্ক বৃদ্ধি অনুপাত) প্রতিযোগী দেশগুলোতে নিম্ন এবং ইনপুট আউটপুট শুল্ক ধারা নিম্নমুখী তখণ বাংলাদেশের শুল্ক ধারা তা অনুসরণ করেনি বরং আউটপুট শুল্ক বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে ইনপুট শুল্ক ধীরে ধীরে কমে গেছে। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরোক্ষ কর থেকে প্রত্যক্ষ করের শেয়ার বৃদ্ধি করে কর ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা জরুরি।

সারণি ২.৮: বাংলাদেশ ও নির্বাচিত দেশ/অঞ্চলসমূহের শুল্ক বৃদ্ধির হার

দেশ/অঞ্চল	বছর	গড় ইনপুট শুল্ক	গড় আউটপুট শুল্ক	শুল্ক বৃদ্ধি অনুপাত
বাংলাদেশ	২০১৮	১৩.১৩	৪৫.৯৮	৩.৫০
চীন	২০১৬	৮.৩৩	১৩.৪১	১.৬১
ভারত	২০১৬	১১.৬৯	১৪.৯৯	১.২৮
ইন্দোনেশিয়া	২০১৩	৫.২৮	৯.২০	১.৭৪
দক্ষিণ কোরিয়া	২০১৫	১৩.২৪	১২.০৬	০.৯১
মালয়েশিয়া	২০১৪	৩.৬৯	৭.৫৩	২.০৪
ফিলিপাইন	২০১৫	৫.০১	৯.৮২	১.৯৬
থাইল্যান্ড	২০১৫	৭.৯২	১৮.৫৯	২.৩৫
ভিয়েতনাম	২০১৬	৬.৪১	১৭.৫৯	২.৭৪
তুরস্ক	২০১৬	৭.৬৯	১০.৫৮	১.৩৮
দক্ষিণ এশিয়া	২০১৬	১০.৬৬	১৬.০০	১.৫০
এশীয়ান	২০১৬	৩.৬৫	৭.২৭	১.৯৯

উৎসঃ এনবিআর, WITS ডাটাবেস, বিশ্ব ব্যাংক

চিত্র ২.৬: আউটপুট ও ইনপুট ট্যারিফের ধারা: বাংলাদেশ, ভারত, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড

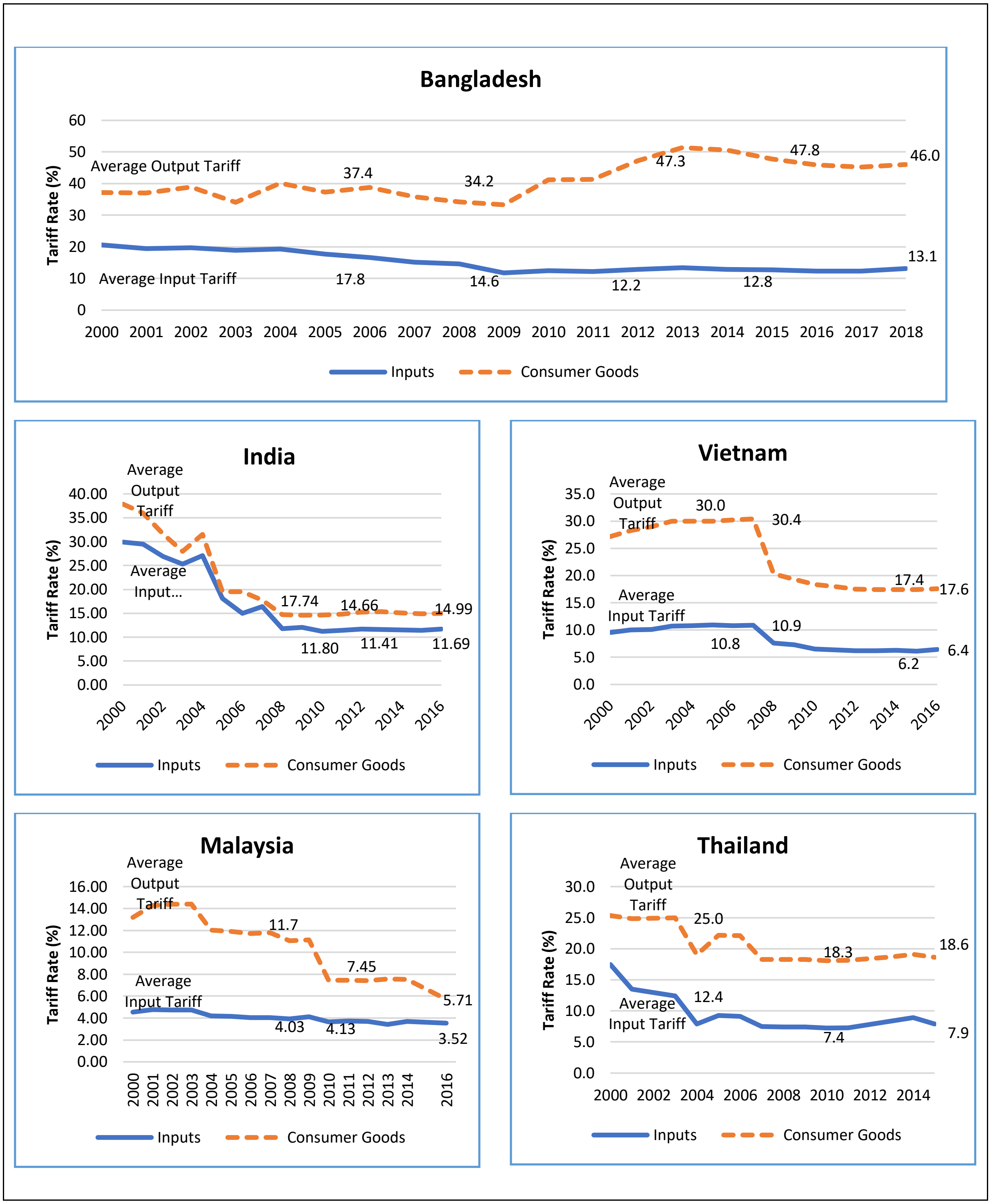

সূত্র: এনবিআর, TRAINS ডাটা বেইজ, WITS বিবিধ বছর

গড় ইনপুট ও আউটপুট শুল্কের মধ্যে ব্যবধান ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমস্ত সময় ধরে বিরাজমান ছিল (সারণি ২.৯)। এটি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য পরিবর্তন করা দরকার। শুল্ক এস্কেলেশন (যাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইনপুটের ওপর গড় শুল্কের অনুপাত হিসেবে) এতো উচ্চে রাখার যৌক্তিকতা নেই।

সারণি ২.৯: অর্থবছর ২০১১- অর্থবছর ২০২০ পর্যন্ত গড় ট্যারিফ ধারা

	অর্থবছর ২০১১	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১৩	অর্থবছর ২০১৪	অর্থবছর ২০১৫	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
গড় এনপিআর	২৩.৭৪	২৬.৯৬	২৮.৯৩	২৮.০৯	২৬.৬৯	২৫.৬০	২৫.৬৪	২৬.৫৫	২৬.৭০	২৬.৭৫
গড় আউটপুট ট্যারিফ	৪১.২৯	৪৩.৪৯	৪৬.৮২	৪৫.৯৮	৪৩.১৬	৪১.৩২	৪০.৫৫	৩৮.৭৯	৩৯.৬৪	৪৬.৪৩
গড় ইনপুট ট্যারিফ	১২.৫	১২.৭২	১৩.০২	১২.১৭	১২.০২	১১.৬৩	১২.১৩	১২.৫৭	১২.০৩	১৩.৫২

সূত্র: এনবিআর তথ্যেও ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রাক্কলন

চিত্র ২.৭: গড় নমিনাল সুরক্ষার হার (NPR), গড় ইনপুট ও আউটপুট ট্যারিফ

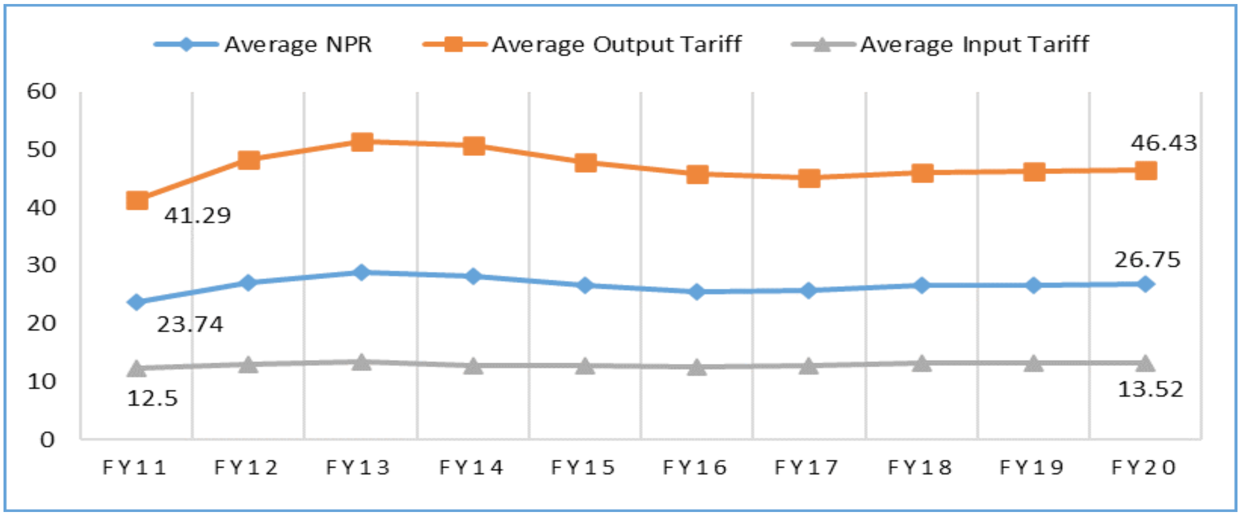

সূত্র: এনবিআর তথ্যেও ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র প্রাক্কলন

সাধারণ ধারণা হলো, আউটপুট শুল্ককে উচ্চে রেখে ইনপুট শুল্কের হ্রাস করা হলে তা আমদানি বিকল্প দেশীয় উৎপাদনকে অধিক প্রতিযোগী সক্ষম করে তুলে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার নীট ফলাফল হচ্ছে দেশীয় উৎপাদনকারীদের অধিক সুরক্ষা প্রদান এবং কালক্রমে উৎপাদনশীলতায় কিংবা প্রতিযোগিতায় কোন উন্নয়ন ব্যতিরেকে কেবল শুল্কের কারণে মুনাফা বৃদ্ধি করা। সুরক্ষিত শিল্পগুলো আরো অদক্ষ হয়ে পরে। যে অর্থনীতি ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য একটি উৎপাদনশীল এবং প্রতিযোগিতামূলক ম্যানুফ্যাকচারিং খাত তৈরি করতে চায় তার জন্য এটি একটি টেকসই সুরক্ষা কৌশল হতে পারে না।

বহুমুখী পণ্য ঝুড়ি নিয়ে টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থার কাঠামো পূনর্গঠনের মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ধীরে ধীরে কার্যকরী সুরক্ষা লেভেল এবং রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাতিত্বের বিলোপ করা। এই প্রক্রিয়ায় শুল্ক বৃদ্ধি হার আস্তে আস্তে কমে শুল্ক কাঠামো ধারা ইউনিফর্ম এবং নিম্নমূখী হবে।

দশ বছর কিংবা তারও অধিক সময় ধরে যে সকল শিল্প সুরক্ষা পেয়েছে তা ৫ বছরের মধ্যে তুলে নিতে হবে। দশ বছরের কম সময় ধরে যেসব শিল্প সুরক্ষা ভোগ করেছে তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সুরক্ষা সুবিধা নির্দিষ্ট সময় ও পারফরম্যান্স ভিত্তিক অর্থাৎ উৎপাদন ও শ্রমের অনুপাত বা রপ্তানির ওপর ভিত্তি করে প্রদান করতে হবে।

রপ্তানি বহুমূখীকরণের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ: ভবিষ্যৎ বাণিজ্য নীতি নির্ধারণে রপ্তানি বহুমূখীকরণ হবে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। রপ্তানি বহুমূখীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা রপ্তানি আয়ের অস্থিতিশীলতা ও ঝুঁকি কমায়। সরকার বিশ্বাস করে রপ্তানি বহুমূখীকরণ কৌশল শুধুমাত্র পণ্য বহুমূখীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং রপ্তানি বহুমূখীকরণ কৌশলের বিভিন্ন দিক রয়েছে; যা নিম্নরূপ:

- **দ্রব্য বহুমূখীকরণ:** রপ্তানির তালিকায় নতুন নতুন পণ্য যুক্ত করা।
- **ভৌগলিক বহুমূখীকরণ:** রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা।
- **গুণগতমান বহুমূখীকরণ:** বিদ্যমান পণ্যসমূহের মূল্যমাণ বাড়ানো। স্বল্পমূল্য পণ্য থেকে অধিক মুল্য পণ্যের বাজার তৈরি করা।
- **পণ্য থেকে সেবায় বহুমূখীকরণ:** সেবাখাতে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সুযোগ তৈরি করা।

- **মধ্যবর্তী পণ্য বহুমূখীকরণ:** পণ্য বহুমূখীকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত ধাপের পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না রেখে মধ্যবর্তী পণ্য রপ্তানির প্রচেষ্টা গ্রহণ।

পণ্য বহুমূখীকরণ একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আমাদের রপ্তানি আয় মূলত কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তৈরি পোশাকে যেখান থেকে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশ অর্জিত হয়। কিন্তু এটি আমাদের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আয়ের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বৈশ্বিক সংকটের কারণে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদার অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে। যদিও গত দেড় দশক ধরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি পোশাকের চাহিদার আকস্মিক হ্রাস হলে আমাদের অর্থনীতি বড় ধরণের ধাক্কা খাবে। বহুমূখী পণ্য রপ্তানি তালিকায় যুক্ত করার মাধ্যমে এই জাতীয় ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপ্রচলিত পণ্য যেমন: পাদুকা ও চামড়াজাত সামগ্রী, হালকা প্রকৌশল পণ্য (সাইকেল ও ইলেক্ট্রনিকস পণ্য) ঔষধ, সিরামিকস, পাটজাত পণ্য, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং অন্যান্য বহুবিধ শ্রমঘন পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম কৌশল হল পণ্য বহুমূখীকরণ।

রপ্তানি পণ্য বহুমূখীকরণে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রচলিত বাণিজ্য নীতির তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করবে:

- রপ্তানি প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনের বাঁধাগুলি (শুল্ক, বাণিজ্য অবকাঠামো, শক্তি ও টেলিযোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক অবস্থা, ইত্যাদি) চিহ্নিত করা।
- প্রচলিত বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিরাজমাণ রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাত হ্রাসের কৌশল গ্রহণ।
- রপ্তানি বহুমূখীকরণ বিরোধী পক্ষপাত হ্রাসের কৌশল গ্রহণ।

রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির জন্য একটি প্রণোদনা কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন যার ফলে বিভিন্ন নীতির কারণে সৃষ্ট রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাত দূরীভূত করা সম্ভব হয়। রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে দামের তুলনামূলক ব্যবধানের ফলেই এইসব পক্ষপাত বা বৈষম্যের জন্ম হয়। রপ্তানিকারকদের পক্ষে বৈশ্বিক মূল্য প্রভাবিত করা সম্ভব না কিন্তু আমদানি শুল্ক ও পরিমাণগত বাঁধার কারণে উৎপাদকেরা তাদের পণ্যের দাম দেশীয় বাজারে বৈশ্বিক দামের চেয়েও বেশী পেয়ে থাকে। সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট মুনাফার কারণে (এবং এভাবে রপ্তানি পণ্যের চেয়ে আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্যের তুলনামূলক বেশি দামের কারণে) রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের চেয়ে আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্য উৎপাদনে পুঁজির স্থানান্তর উৎসাহিত হয়। এছাড়া নীতিজনিত কারণে অবাণিজ্যযোগ্য পণ্যের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে যার ফলে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের বদলে এই খাতে আরও পুঁজি স্থানান্তর হতে পারে।

উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও তৈরি পোশাক খাত এই রপ্তানি বিরোধী সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পেরেছে। সরকার শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের জন্য উন্মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা প্রদান করে। বিশ্ব বাজারে বিশেষ প্রবেশাধিকার এমএফএ'র সুবিধা ও বিশেষ শুল্কাধীন পণ্যাগার ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধাসহ শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র নীতি তৈরির ফলে উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও রপ্তানি বিরোধী সমস্যা কার্যকরভাবে প্রশমন করা গেছে। যতদিন উচ্চ শুল্ক সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ আছে ততদিন তৈরি পোশাক খাতের বাইরের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রেও এই নীতিসমূহ অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রায় শেষে (অর্থবছর ২০১৯) বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাতের বাইরে প্রায় ১৪০০ ধরণের পণ্য (ঐঝ- ৬ সংখ্যা) রপ্তানি করেছে কিন্তু তার মধ্যে মুষ্টিমেয় পণ্য (যেমনঃ পাট ও পাটজাত পণ্য, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, ইত্যাদি) এক বিলিয়ন ডলারের মাত্রা ছুঁতে পেরেছে। তবে এই চিত্র অন্য রকম হবে যদি মধ্যবর্তী পন্যের রপ্তানি (তৈরি পোশাক খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প) এখানে যুক্ত হয়, কারণ ২০১৯ অর্থবছরে যে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে তার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি দখল করে আছে বস্ত্র, সুতা ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের সরবরাহ। রপ্তানি বহুমূখীকরণের এই অংশটিও বিবেচনায় নিতে হবে। তৈরি পোশাক খাতের বাইরের অন্যান্য পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের (আনুমানিক ৩৫০০) কাছে দুটি বিকল্প থাকে; তারা হয় রপ্তানির জন্য উৎপাদন করে অথবা দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদন করে এবং সেক্ষেত্রে দেশীয় বাজারের জন্য উৎপাদন বেশি লাভজনক (রপ্তানি বিমূখী পক্ষপাত থাকায়)। রপ্তানি প্রণোদনার পরিমাণ বেশ কম হওয়ার দরুন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের রপ্তানির পরিমাণ সীমিত (তৈরি পোশাক খাতের বাইরের মাত্র ৩০০ পণ্য এক মিলিয়ন ডলার রপ্তানি মাত্রা অতিক্রম করতে পেরেছে)। রপ্তানি বহুমূখীকরণের বাঁধা দূর করার জন্য এবং প্রচলিত নীতির অধীনে রপ্তানির প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির জন্য শুল্ক ও সংরক্ষণ কাঠামো যৌক্তিক করার মত পদক্ষেপ নেয়া দরকার যাতে বর্তমান নীতি আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে না পড়ে। রপ্তানি বহুমূখীকরণের অগ্রগতির জন্য এটা অতীব প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে শুল্ক প্রশাসনে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে যদিও ২০২৫ সাল নাগাদ রাজস্ব সংগ্রহে এ শুল্কের বড় কোন ভূমিকা থাকবে না কারণ তখন দেশজ কর-ই (আয়কর ও ভ্যাট) হবে রাজস্ব আদায়ের মূল ক্ষেত্র। ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করাই হবে শুল্ক ব্যবস্থার মূলনীতি। তথাপি মাঝে মাঝে উচ্চ শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সম শুল্কহার বিধির ব্যতিক্রম অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই জাতীয় শুল্ক কাঠামোর ফলে দেশীয় উৎপাদন ও ব্যবসাবাণিজ্য স্বল্প মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের বাণিজ্য ব্যবস্থা সুসংগঠিত হওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে আধুনিক উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পখাত বিকাশ লাভ করতে পারে যার ফলশ্রুতিতে নূন্যতম লেনদেন খরচের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে বা অনলাইনে পণ্য ও সেবার অবাধ চলাচল সম্ভব হয়।

বাণিজ্য নীতির নতুন গতিপথ: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর শিল্পায়নের জন্য সফল রপ্তানিমুখী নীতি তৈরি করণে বাণিজ্য নীতির পুরাতন কৌশলে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনে তাতে নতুন চিন্তা-ভাবনা ও নির্দেশনা যুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) *সংরক্ষণ নীতির নতুন কৌশল:* দীর্ঘ সময় ব্যাপী উচ্চ সংরক্ষণের ফলে অদক্ষতার সৃষ্টি হয় এবংর প্রতিযোগিতা ক্ষমতার ভিত্তি নষ্ট করে দেয়। সংরক্ষণ নীতি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, সংরক্ষণের মাত্রা কমানো দরকার এবং আমদানি প্রতিস্থাপনকারী পণ্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রদানের কৌশল তৈরি করা উচিত।

(খ) *শুল্ক যৌক্তিকীকরণ:* বাংলাদেশের নমিনাল ও কার্যকর সংরক্ষণ শুল্ক মাত্রা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এছাড়া শুল্ক বৃদ্ধি এবং আউটপুট ও ইনপুটের নমিনাল শুল্ক হারের ব্যবধান অনেক বেশি। যেহেতু প্রচলিত উচ্চ শুল্কহার ব্যবস্থা রপ্তানি প্রতিযোগিতা ক্ষমতার ভিত্তি নষ্ট করে দেয় সেহেতু দেশে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্যের ওপর এনপিআর যৌক্তিক করার কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করা দরকার। এনবিআর-এর উচিত ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড় এনপিআর ৩-৫ শতাংশ হারে কমানোর কৌশল গ্রহণ করা এবং তা শুরু করা উচিত আমদানি প্রতিস্থাপনকারী ভোগপন্যের ওপর ব্যাপক হারে এনপিআর কমানোর মাধ্যমে।

(গ) *সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দামে (করমুক্ত) সরঞ্জামাদি ক্রয় করার সুবিধা নিশ্চিতকরণ:* বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিস্ময়কর সাফল্যের পুনরাবৃত্তি অন্য পন্যের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এর পিছনে অন্যতম প্রধান অন্তরায় তৈরি পোশাক খাত বহির্ভূত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি-বিরোধী পক্ষপাতের উপস্থিতি। শ্রমঘন অন্যান্য পণ্য উৎপাদনে পোশাক খাতের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে হলে যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের মোট উৎপাদনের আংশিক রপ্তানি করে তাদেরকেও আমদানিকৃত সরঞ্জামের ওপর করমুক্ত সুবিধা প্রদান করতে হবে। রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের ওপর করমুক্ত সরঞ্জামাদি ক্রয়ের সুযোগ প্রদানের এই নীতি কোন বিশেষ সহায়তা নয় বরং রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য উৎপাদনের জন্যই এটি আবশ্যক, যাতে আন্তর্জাতিক দামে সরঞ্জামাদি ক্রয়কারী বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের সাথে সমতা সৃষ্টি হয়। রপ্তানি সাফল্যের জন্য রপ্তানি বিরোধী পক্ষপাতহীন নীতি সহায়তা প্রয়োজন।

(ঘ) *মধ্যবর্তী পণ্য খাতের উন্নতি সাধন:* বাংলাদেশের রপ্তানির ৯৮ শতাংশ চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য যেখানে মধ্যবর্তী পণ্যের পরিমাণ খুবই কম বা নেই বললেই চলে। যেহেতু বেশিরভাগ ভোগ্যপণ্যে উচ্চ সংরক্ষণ প্রদান করা হয় সেহেতু বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশীয় নীতিতে মধ্যবর্তী পণ্য বিরোধী পক্ষপাত আছে। যেহেতু মধ্যবর্তী পণ্যের বাণিজ্য বৈশ্বিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই এর পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশ্বের যেকোন জায়গায় সন্নিবেশিত করা যায় এমন মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের উৎপাদকদের তৈরি নেটওয়ার্ক সৃষ্ট সুযোগ বাংলাদেশের কাজে লাগানো উচিত।

(ঙ) *দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ:* দেশের ছোট-বড় সকল রপ্তানিকারকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে কারণ অনেক ছোট রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য তাদের রপ্তানি কার্যক্রম বর্ধিত করতে পারে না।

(চ) *সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই):* এফডিআই প্রযুক্তি হস্তান্তর, বিদেশী বাজার তৈরি এবং দেশে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব আমাদের রপ্তানি বহুমূখীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আগামী দশকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এফডিআই প্রযুক্তি ব্যবধান ঘোচাতে সাহায্য করতে পারে এবং বাংলাদেশের উৎপাদন খাতকে বৈশ্বিক উৎপাদন খাতের সর্বাধুনিক অগ্রগতির সাথে তাল মেলাতে সহায়তা করতে পারে।

(ছ) *বহির্বিশ্বে বাজার সম্প্রসারণের জন্য সরকারি সহায়তা:* উন্নত বিশ্বের বাজারে আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে বাণিজ্য অগ্রাধিকার সুবিধা শেষ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, উত্তর আমেরিকা, জাপান ও বিকাশমান অর্থনীতির বৃহত্তম বৈশ্বিক বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করার জন্য দূতাবাসের মাধ্যমে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা আরো বেশি জোরদার করতে হবে।

(জ) *নীতির নমনীয়তাকরণ:* সকল ভালো নীতিই কাংখিত ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে না। সফল রপ্তানি অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নীতি বাস্তবায়নে নমনীয়তা প্রদর্শন করলে সংকট প্রতিশম করা যায়। কোন নীতি থেকে কাংখিত ফল না আসলে তা পরিবর্তনের সুযোগ থাকা উচিত।

(ঝ) *আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের সাথে বাণিজ্য চুক্তি:* যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বেশিরভাগ সদস্যই একটি সংস্কারকৃত ও অধিক কার্যকর বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা দেখতে চায়। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা থেকে উপকৃত বাংলাদেশ বাকি বছরগুলোর জন্যও (২০২৪ সাল পর্যন্ত) স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করবে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর যখন প্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা শেষ হয়ে যাবে তখন বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান যে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে সে বিষয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। উপরন্তু, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির আওতায় আমাদের নতুন বাজারে প্রবেশাধিকার খুঁজতে হবে। বিশ্বের অন্য যেকোন অঞ্চলের চেয়ে এশিয়া মহাদেশে বাজার দ্রুত বাড়ছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) মতে ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জিডিপি'র ৫০ ভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে এশিয়ায়। RCEP (আসিয়ান+) ও CPTPP- নামক দুটি আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং এরা একত্রে আগামী দিনের এশিয়ান বাজারের বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্রণ করবে। এসব গ্রুপের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি করা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত উচ্চ শুল্ক ব্যবস্থায় এটি একটি কঠিন কাজ এবং সংরক্ষণ শুল্কের পরিমাণ কমালে দেশীয় আমদানি-প্রতিস্থাপনকারী শিল্পের পক্ষ থেকে প্রথাবিরোধিতা সম্পর্কিত অভিযোগের সম্মুখীন হতে হবে। রাজনৈতিক অর্থনীতির এ চ্যালেঞ্জ বিবেচনাযোগ্য কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাফল্য খুবই দরকার।

রপ্তানি প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি: কার্যকর রপ্তানি প্রবৃদ্ধির জন্য রপ্তানি নীতিমালার পাশাপাশি আরো কিছু পরিপূরক নীতিমালা ও কর্মসূচি দরকার। সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, রপ্তানি প্রবর্ধনকারী ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা ও আর্থিক বাজারের অবাধ কার্যক্রম নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উপরন্তু, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতি সাধন এবং দুর্নীতির পরিমাণ কমিয়ে আনার মাধ্যমে শাসনকার্যের মানের উন্নয়ন করা দরকার। প্রযুক্তির প্রসারনে এবং উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো সুবিধা তৈরিতে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।

পরবর্তী ৫ বছর বা আরও কিছু সময়ের জন্য একটি সমন্বিত বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও শক্তিশালী বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি বিপ্লব ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতার বিষয়টি ক্রমেই আরো চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ছে। বাণিজ্য অগ্রাধিকার ও বিশেষ বাণিজ্য সুবিধাসমূহ মূলত স্বল্পোন্নত দেশগুলির কিছু সহজাত দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়। এইসব দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ও দেশীয় নীতিমালার অনমনীয়তার জন্য উচ্চ উৎপাদন খরচ। প্রকৃতপক্ষে, বৈশ্বিক অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় উন্নয়নশীল দেশগুলির বাণিজ্য পরিচালনা সম্পর্কিত খরচ অনেক বেশী। এ সংক্রান্ত ব্যয় বাণিজ্য করের চেয়েও বেশি। বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এমন অনেক অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান যার ফলে উৎপাদিত পণ্যের খরচ বেড়ে যায় এবং রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস পায়।

২.৬.১ বাণিজ্য সুবিধাদির উন্নয়ন

কাঁচামাল ও মূলধন পণ্য আমদানি এবং পণ্য রপ্তানির উচ্চ খরচ রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে অনেকাংশে দুর্বল করে দেয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমদানিকৃত উপকরণের ওপর দেশীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগ অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২০১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮.৫ শতাংশ। রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে তা জিডিপি'র ১৪ শতাংশ। বাণিজ্যের আর্থিক খরচ (পরিবহন , ইনস্যুরেন্স ও পরিচালনা) এবং বন্দর থেকে ছাড়পত্র প্রদানের দক্ষতা এই দুইটি বিষয়ই প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ধারনে দারুনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে।

বাণিজ্য লজিস্টিকের গুরুত্ব স্বীকার করে বিশ্ব ব্যাংক বাণিজ্য লজিস্টিক প্রতিপাদন সূচির (LPI) নিয়মিত সংকলন ও হালনাগাদ করে এবং এই লজিস্টিক প্রতিপাদন সূচির পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে দেশগুলির শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। ২.৮নং চিত্রে ২০১৮ সালের বাংলাদেশ ও তার প্রতিদ্বন্দী দেশগুলির এলপিআই সূচি দেখানো হয়েছে যেখানে ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম। চীন, থাইল্যান্ড, ভারত ও ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের এলপিআই র‍্যাংকিং খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল প্রতিদ্বন্দী হচ্ছে চীন, ভারত ও ভিয়েতনাম। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরে

বাজারে টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাণিজ্য লজিস্টিকের উচ্চ মূল্য মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বাণিজ্য লজিস্টিক প্রতিপাদন উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ প্রদান করলে উত্তরণ পরবর্তী পরিবেশে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশকে অবশ্যই এলপিআই ক্রমের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

চিত্র ২.৮: বিশ্ব ব্যাংকের বাণিজ্য লজিস্টিক প্রতিপাদন সূচি ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান

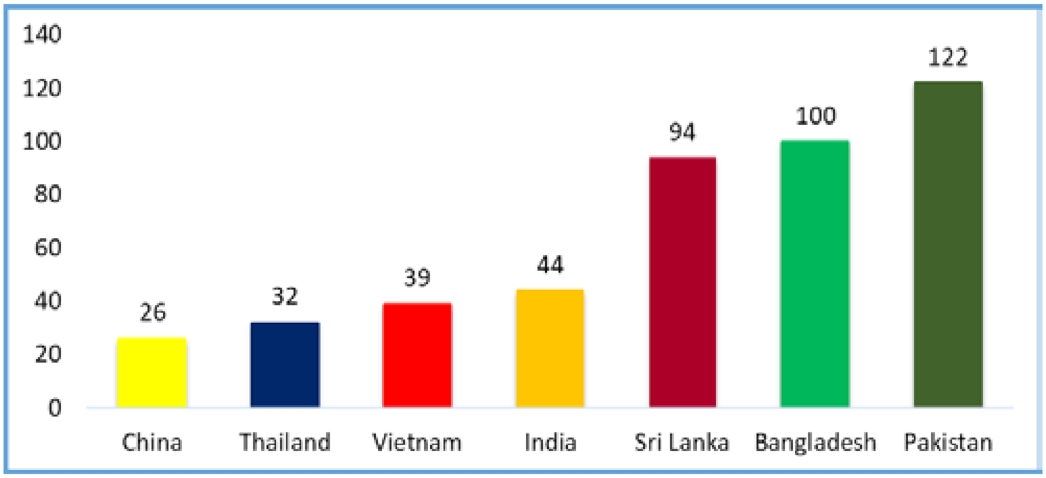

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংক, ২০১৮

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: রপ্তানি আমদানিকে উদ্দীপ্ত করে। আমদানিতে বিলম্ব হলে আমদানিকারী প্রতিষ্ঠানের খরচই শুধু বাড়ে না, যদি অধিকাংশ পণ্য রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল হয় তবে ঐ প্রতিষ্ঠান দারুন অসুবিধাজনক অবস্থানে পড়ে। ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ তীব্রতর হবে। অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বাজারের অংশীদারীত্ব ধরে রাখতে সময়মত ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সময়মত ও অল্প দামে কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদনের সময়সূচী বজায় রাখা অপরিহার্য হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের ১০০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ পরিচালনা করে চট্টগ্রাম বন্দর। এই অঞ্চলের অধিকাংশ বন্দরের চেয়ে এখানে জাহাজ ঘোরাতে এবং কনটেইনার ইয়ার্ড থেকে কার্গো ছাড়পত্র পেতে সময় বেশি লাগে। এই বন্দরের পরিচালন দক্ষতার মৌলিক উন্নয়ন আবশ্যক এবং বন্দরের সন্তোষজনক উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করতে হলে জাহাজ ঘোরাতে যাতে কম সময় লাগে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আমদানি ছাড়পত্র প্রদানে বন্দরের দক্ষতার উন্নয়ন রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২.৬.২ বিদ্যুৎ ও পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন

আজকের বিশ্বায়িত পরিবেশে, অবকাঠামো বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি মৌলিক নির্ধারক। যদিও উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে কিন্তু প্রবৃদ্ধির গতি অধিকতর বেগবান করার জন্য এবং মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্ধিত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহসহ উন্নত অবকাঠামো খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশে পর্যাপ্ত ও নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো সুবিধা তৈরি না হওয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ও অধিক পরিমাণ দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগ সংহত করা সম্ভব হয়নি। ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উন্নত বিদ্যুৎ, শক্তি, পরিবহন ও অন্যান্য অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সেবার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। এইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) আওতায় বর্ধিত সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় যেখানে নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিদ্যুৎ ও পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অবকাঠামোগত পর্যাপ্ততার তুলনায় বাংলাদেশের অবকাঠামোগত পর্যাপ্ততার ব্যবধান সহজেই পরিমাপ করা যায়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) ১২টি বৃহৎ সূচকের ওপর ভিত্তি করে নিয়মিত প্রতিযোগিতা সক্ষমতার বৈশ্বিক তুলনা প্রকাশ করে; অবকাঠামোগত মান তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের ঈর্ষনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতির রেকর্ড সত্ত্বেও অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট সূচকে বাংলাদেশ এশিয়ার অনেক উদীয়মান অর্থনীতির পেছনে পড়ে আছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (GCI) সূচক ১৪১টি দেশের মধ্যে ১১৪ (চিত্র ২.৯)।

চিত্র ২.৯: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার সূচি; অবকাঠামোগত ক্রম বিন্যাস ২০১৯

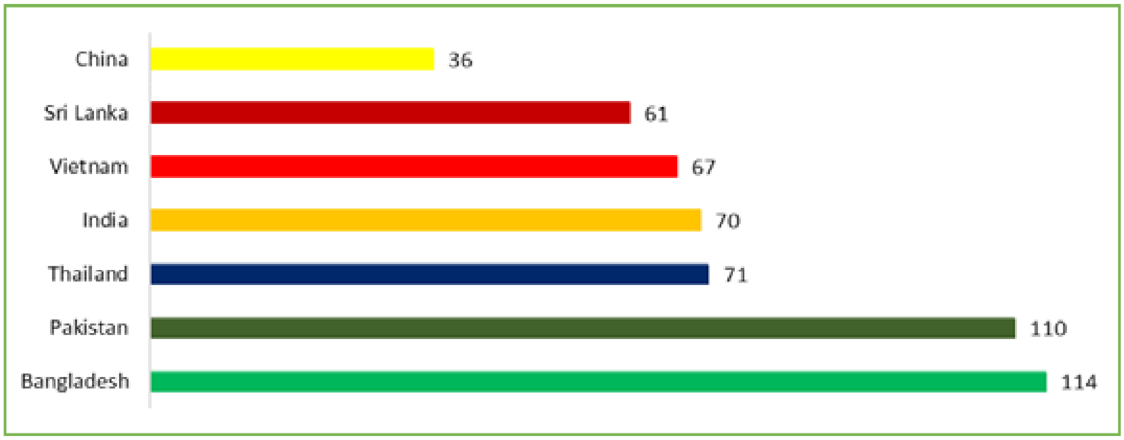

সূত্রঃ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা প্রতিবেদন ২০১৯, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের চাহিদা ৩৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। সেটা মাথায় রেখেই সরকার আগামী ১৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার যাতে বিদ্যুতের দাম নিম্ন রাখা যায় এবং কার্বন দূষণ কমিয়ে টেকসই প্রাথমিক শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

বাংলাদেশ ১৬০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ এবং দেশটি ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হতে চায়। কিন্তু এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের বর্তমান পরিবহন ও সংযোগ সুবিধার বিবেচনায় অবকাঠামোগত সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। এটা জিসিআই-এর পরিবহন ও সংযোগ সুচকে প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে ১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশের পয়েন্ট ৫৭.৫ এবং ১৪১টি দেশের ভেতর অবস্থান ১১৭তম। পরিবহনের ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের সড়ক পথের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা রয়েছে যা খুবই ব্যয়বহুল এবং ভূমির ক্রমবর্ধমান সংকোচন ও বিপুল সংখ্যায় স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনে সড়ক সংযোগের ব্যপ্তি বৃদ্ধি করা আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অপর দিকে, ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০-এর বিশদ বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ জলপথ কম ব্যয়বহুল এবং পরিবেশ বান্ধব কিন্তু অতীতে সেটির ওপর নজর দেয়া হয়নি। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় বর্ণিত অভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন কৌশলের বাস্তবায়নকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। উপরন্তু, খরচ ও দক্ষতার ভিত্তিতে ইন্টারমডাল পরিবহন ভারসাম্যের ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

২.৬.৩ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-এর মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাজার অভিগম্যতার উন্নয়ন

রপ্তানি প্রসারণ ও বহুমূখীকরণ সীমিত দেশীয় পুঁজি, প্রযুক্তি ও বাজার জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য প্রায়ই বাঁধাগ্রস্ত হয়। সাম্প্রতিককালে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের বিকাশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগেরর ভূমিকা যথেষ্ট নজর কেড়েছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের অভিগগম্যতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং একই সাথে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে কিছু ইতিবাচক বাহ্যিকতা তৈরি হয় যা 'স্পিল ওভার' নামে পরিচিত। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে স্পিল ওভার সুবিধার মাধ্যমে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং এভাবে তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশী ফার্ম এবং পন্যের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বাড়ে। একই শিল্প গ্রুপের দেশীয় ফার্মের মধ্যে 'স্পিল ওভার' সংঘটিত হতে পারে যা আনুভূমিক 'স্পিল ওভার' নামে পরিচিত। আবার বিক্রেতা ও সরবরাহকারীর সংযোগের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের প্রাথমিক সাপ্লাই চেইনে 'স্পিল ওভার' সংঘটিত হতে পারে যা পশ্চাৎমুখী 'স্পিল ওভার' নামে পরিচিত। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করার সম্ভাবনা আছে এমন শিল্পে পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটানোর মাধ্যমে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ সহায়তা করতে পারে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক সংযোগ তাদের বিদেশী বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে সহযোগিতা করতে পারে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজারজাতকরণ কৌশল, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশীয় ফার্মের পরিচিতি করিয়ে দিয়েও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

এফডিআই প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বৈশ্বিক ভ্যালু চেইন (GVC) রপ্তানিকে উৎসাহিত করে। পরিশেষে, সাপ্লাই চেইন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এফডিআই গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের জন্য বাংলাদেশকে বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের সাথে সংযুক্ত হতে হবে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এফডিআই প্রবাহ বৈশ্বিক ভ্যালু চেইন সৃষ্টির লাইফলাইন হিসেবে পরিগণিত যা দেশের বাইরে বিকাশমান উৎপাদন নেটওয়ার্ক টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। সুতরাং, সাপ্লাই চেইন সুবিধা করায়ত্ব ও প্রসারিত করার জন্য ভবিষ্যতে এফডিআই আকৃষ্ট করা হবে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের জন্য একটি অপরিহার্য কৌশল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খন্ডায়িত উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক উপস্থিতি ঘটেছে যা একই সাথে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরি করে। বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের মধ্যে একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কীভাবে নিজের অবস্থান তৈরি করছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়াতে গত ২৫ বছর বা তারও অধিক কাল ধরে মধ্যবর্তী পণ্যের বাণিজ্য সম্পসারণে এফডিআই মূলত অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: বর্তমানে বাংলাদেশ দুটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি- অধিক পরিমাণ এফডিআই সংহত করা ও বৈশ্বিক ভ্যালু চেইন সুবিধা কাজে লাগানো। অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানি যারা উপাদান ও উপকরণ উৎপাদনের জন্য বা বিভিন্ন উৎপাদন একত্রীকরণ কাঠামোর আওতায় চূড়ান্ত সন্নিবেশের জন্য কম খরচের জায়গা খুঁজছে তাদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে এফডিআই আকৃষ্ট করার মধ্যেই জিভিসির সাথে সংযুক্ত হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ নিহিত রয়েছে। শুধুমাত্র মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য নয় বরং বিভিন্ন দেশের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে উলম্বভাবে একীভূত হয়ে রপ্তানিকে বহুমূখীকরণ করে মধ্যবর্তী পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের জন্য এফডিআই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উচিৎ তৈরি পোশাক খাতে অর্জিত বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের অভিজ্ঞতা অন্যান্য যেমন পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, ইলেক্ট্রনিক্স, হালকা প্রকৌশল, খেলনা, প্লাস্টিক ইত্যাদি খাতে কাজে লাগাতে এমন কার্যকরী কৌশল গ্রহণ করা যাতে আগামী দশকে এফডিআইচালিত জিভিসি অর্জিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের নতুন ধারা তৈরি হবে যা বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

২.৬.৪ বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতিসাধন

বেসরকারি খাতের অবদান বৃদ্ধির জন্য অনেক নীতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং যার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যাপ্তি দ্রুত বেড়েছে, ১৯৮৯ অর্থবছরে যেখানে জিডিপি ছিল ৬ শতাংশ তা ২০১৯ অর্থবছরে বেড়ে ২৪ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিবেশ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল। বিশ্ব ব্যাংকের তৈরি করা বিনিয়োগ পরিবেশের বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে এটি প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ব ব্যাংকের ২০২০ সালের ব্যবসা সহজীকরণ (ইজ অব ডুইং বিজনেস (EDB) ক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম (চিত্র ২.১০)। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও উদার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য এই র‍্যাংকিং-এ আসিয়ান ভুক্ত অধিক অগ্রসর অর্থনীতির দেশসমূহের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির চেয়ে ভালো (চিত্র ২.১১)

চিত্র ২.১০: ২০২০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা সহজীকরণ (EDB) ক্রম

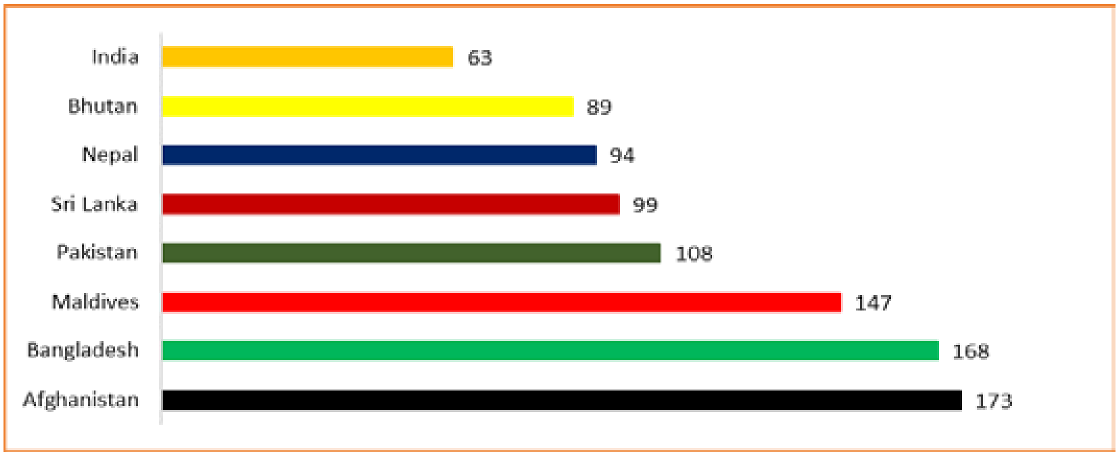

সূত্রঃ ব্যবসা পরিচালনা (Doing Business) ২০২০, বিশ্ব ব্যাংক

চিত্র ২.১১: ২০২০ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা সহজীকরণ ক্রম

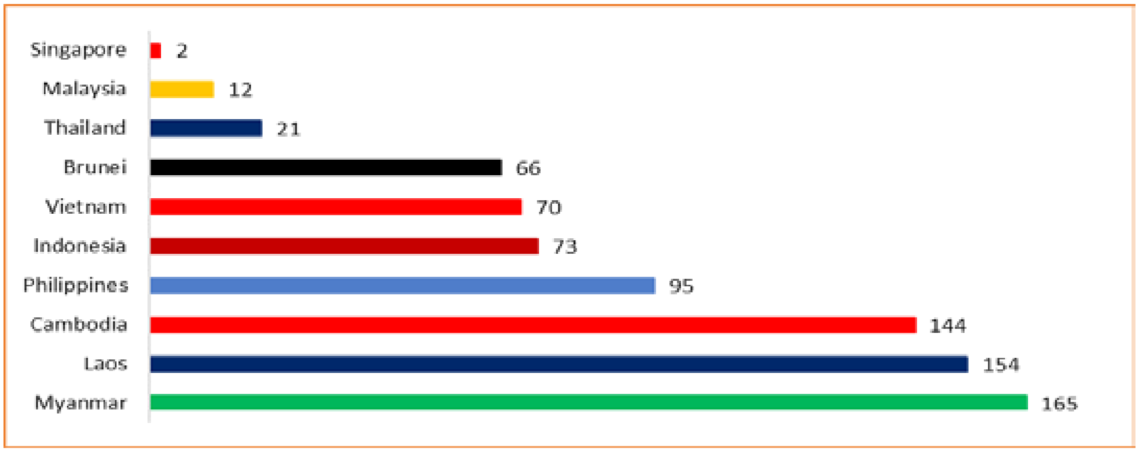

সূত্রঃ ব্যবসা পরিচালনা (Doing Business) ২০২০, বিশ্ব ব্যাংক

ব্যবসা সহজীকরণ (EDB)-র‍্যাংকিং করার সময় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে দেশগুলোর যে ঘাটতি বা দুর্বলতা রয়েছে তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এই তথ্য-প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় গত কয়েক বছরে ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি খুব কম। একইভাবে, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের ২০১৮ সালে করা বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলকতা সূচক (GCI) জরিপে ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩তম। বিশ্ব ব্যাংকের EDB- র‍্যাংকিং অনুসারে, বাংলাদেশের এই নিচু অবস্থানের কারণ- দুর্বল অবকাঠামোগত সেবা এবং কর প্রদান, সম্পত্তি নিবন্ধন, চুক্তি বাস্তবায়ন এবং অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চ খরচ। এছাড়া বিদ্যুৎ, পানি, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সংযোগসহ শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত জমির প্রাপ্যতা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা যার ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ কম। বিনিয়োগের পরিবেশ শক্তিশালী করে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এই প্রতিবন্ধকতাগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামী ৫ বছরে মধ্যে সমাধান করতে হবে যাতে বিনিয়োগ পরিবেশের দৃশ্যমান উন্নতি হয়।

ব্যবসা সহজীকরণ ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ক্রমে অবস্থানের উন্নয়নে, বাংলাদেশ ভিয়েতনামের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারে কারণ আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ন্যায় দেশটিও দীর্ঘমেয়াদি ও বিধ্বংসী সংঘাতের পরে পুনর্গঠিত হয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ক্রম প্রতিবেদনে দেশটির অবস্থান ২০০৬ সালে ছিল ৭৭তম যা ২০১৭ সালে উন্নত হয়ে ৫৫তম হয়েছে। একই সাথে ব্যবসা সহজীকরণ প্রতিবেদনে দেশটির উন্নতি আরও বেশি উৎসাহব্যঞ্জক, ২০০৭ সালের ১০৪ তম অবস্থান থেকে ২০১৯ সালে ৬৯তম অবস্থানে উঠে এসেছে। এই উত্তরণের পেছনে হ্যানয় যে সকল সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে তার মধ্যে রয়েছেঃ কর প্রদান, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়ন, ঋণ প্রাপ্তি ও বিদ্যুতের লভ্যতা নিশ্চিত ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: শিল্পপার্ক ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পায়নের জন্য উপযুক্ত জমির প্রাপ্যতার সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপ প্রশংসার দাবী রাখে। এ সকল চলমান স্থাপনার দ্রুত সমাপ্তি এবং সময়মত ও ব্যবসাবান্ধব ভাবে সেগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই হবে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগের গতি ত্বরান্বিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। (১) বিদ্যুৎ প্রাপ্তিতে, (২) সম্পত্তি নিবন্ধন করণে, (৩) ঋণ প্রাপ্তি, (৪) বিদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পাদন, (৫) চুক্তি কার্যকর করণে (৬) দেউলিয়াত্ব মীমাংসা করণে যাতে সময় কম লাগে সরকার সে বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোনিবেশ করছে। যদি এই সমস্ত বিষয়ে সংস্কার আনার ফলে ব্যবসা সহজীকরণ ক্রম প্রতিবেদনে দেশের র‍্যাংকের উন্নতি ঘটে তবে বিশ্বের সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিকট এই মর্মে ইতিবাচক বার্তা পৌছাবে যে, বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (BIDA) সমন্বয় সাধনের ফলে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে উন্নতি হচ্ছে। এছাড়াও বিডা ও সারা বিশ্বে (বিশেষত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা) অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের বাণিজ্যিক বিভাগ শক্তিশালী বাজারজাতকরণ প্রচেষ্টা শুরু করেছে যাতে এফডিআই আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশের বিনিয়োগ পরিবেশে দৃশ্যত উন্নতি হয়েছে।

২.৬.৫ বাণিজ্য ও শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস সতর্কভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে যেসব উন্নয়নশীল অর্থনীতি সময়ের প্রবাহে উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে সেখানে দুইটি বিষয়ের সমন্বয় ছিলঃ নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক নীতি ও তা বাস্তবায়নের জন্য ভালো প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় বাণিজ্য ও শিল্প কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দেশের রপ্তানি ও শিল্প উৎপাদনের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য হয়। বাংলাদেশে বাণিজ্য ও শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে রপ্তানি ও এর বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদান করে এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক সংস্কার দরকার।

বিরামহীন ও সৃজনশীল উদ্ভাবনের ফলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির বাজারের সুযোগ সুবিধা যাতে উদ্যোক্তারা কাজে লাগাতে পারে সেজন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করতে হবে এবং সেজন্য আগামী দশক হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও তা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা এবং সেগুলিকে কার্যকর করা যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পত্তির অধিকার কার্যকর করা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উদ্যোক্তা এবং এসএমই ও বৃহৎ ব্যবসার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গ্রহণে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতের জন্য দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ভবিষ্যৎ রূপরেখা: আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উচ্চ আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরিতে সহায়ক হয়। দক্ষভাবে সম্পদ বণ্টনের জন্য বাজারের ক্রিয়াকলাপ বাড়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাজারে হস্তক্ষেপের মাত্রা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে হবে। উচ্চ অগ্রগতি সম্পন্ন অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় কোন একটি বিশেষ শিল্পের প্রসার ভালো ফলাফল নিয়ে আসে না কারণ শিল্পখাতের উন্নয়ন বাজারমুখী এবং তুলনামূলক সুবিধার ভিত্তিতে ফ্যাক্টর- ইনটেনসিটি দ্বারা চালিত হলেই শুধুমাত্র রপ্তানির প্রসার হয়। সকল বিনিয়োগকারীদের জন্য সহায়ক নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের 'থ্রাস্ট সেক্টরের' ক্ষেত্রে কৌশল বদলাতে হবে যাতে সেগুলি থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সফলতা আসে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসার জন্য বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কিছু নিয়ম- বিশেষ করে শুল্ক সংরক্ষণ ও প্যারা-শুল্ক সংক্রান্ত বিধি- মেনে চলতে হবে যেগুলি এতদিন শিথীল ছিল। অন্যান্য বহুপাক্ষিক নিয়মনীতির অনেক বিষয় আছে যেগুলি উন্নয়নশীল ও উন্নত অর্থনীতির জন্য ভিন্ন যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি পরিচালনার নিয়ম, ভর্তুকি, মান ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ। উপরন্তু, বাংলাদেশ যদি আঞ্চলিক বাণিজ্য সংস্থা যেমন RCEP'র সদস্য হতে চায় তবে তাদের কঠোর নিয়মকানুন অনুসরন করতে হবে। ভবিষ্যতে আরো প্রতিযোগিতামূলক ও কঠোর বিধি সম্পন্ন বৈশ্বিক বাণিজ্যিক পরিবেশের সম্মুখীন হওয়ার জন্য ও তা মেনে চলার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখনই প্রস্তুতি নেয়া শুরু করতে হবে। বহুপাক্ষিক নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি উন্নত শুল্ক অবকাঠামো ও প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের অন্যতম কৌশল।

যখন উপরোক্ত এই নীতিগুলি কার্যকর করা সম্ভব হবে তখন সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন খাতের উন্নয়নের চিত্র ২.১০ নং সারণির ন্যায় হতে পারে। ২০২০-২১ অর্থ-বছরের সামগ্রিক ও শিল্প/উৎপাদন খাতের প্রবৃদ্ধির হারে কোভিড-১৯ জনিত অভিঘাত ও পুনরুদ্ধার বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ২০২২ ও তার পরবর্তী অর্থবছরগুলোতে অর্থনীতি আবার কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী প্রবৃদ্ধি রেখায় ফিরে যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সেকশনে বর্ণিত রপ্তানিমুখী বাণিজ্য ও শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা গেলে আশা করা যায় যে, শিল্প প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০২০ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবৃদ্ধি ৫.৮৪ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ১২.৬০ শতাংশে উন্নীত হবে এবং জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অংশ ২০২০ অর্থবছরে ২৪.১৮ শতাংশ (প্রাক্কলিত) থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ৩০.২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় দ্রুত জিডিপি প্রবৃদ্ধির মূল নিয়ামক শক্তি হবে ম্যানুফ্যাকচারিং খাত।

সারণি ২.১০: জিডিপি এবং সেক্টরাল প্রবৃদ্ধির হার ও অংশ, অর্থবছর ২০২০- অর্থবছর ২০২৫

খাত	২০১৯(প্রকৃত)	২০২০ (প্রকৃত)	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২৪	অর্থবছর ২৫
	প্রবৃদ্ধি হার (শতকরা)						
কৃষি	৩.৯২	৩.১১	৩.৪৭	৩.৮৩	৪.১০	৪.০০	৩.৯০
শিল্প	১২.৬৭	৬.৪৮	১০.২৯	১০.৫৯	১০.৭৯	১১.২০	১১.৯০
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	১৪.২০	৫.৮৪	১০.৭৩	১০.৯৯	১১.২৪	১২.০০	১২.৬০
সেবাসমূহ	৬.৭৮	৫.৩২	৬.৭৪	৬.৯৫	৭.২৫	৭.৩০	৭.৩৫
জিডিপি	৮.১৫	৫.২৪	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
	জিডিপির অংশ শতকরা হিসেবে (স্থির মূল্যে)						
কৃষি	১৩.৬৫	১৩.৩৫	১২.৮৪	১২.৩৬	১১.৮৯	১১.১৬	১০.৫৬
শিল্প	৩৫.০০	৩৫.৩৬	৩৬.২৫	৩৭.১৭	৩৮.০৭	৪০.৩৭	৪১.৮৬
তন্মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং	২৪.০৮	২৪.১৮	২৪.৮৯	২৫.৬১	২৬.৩৩	২৮.৭৫	৩০.২৩
সেবাসমূহ	৫১.৩৫	৫১.৩০	৫০.৯১	৫০.৪৭	৫০.০৪	৪৮.৪৭	৪৭.৫৮

সূত্রঃ জিইডি প্রক্ষেপণ

২.৭ দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্পনীতি

অন্য দেশের মত বাংলাদেশেও বাণিজ্য নীতি শিল্প নীতির সহায়ক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর শিল্পের উন্নতি হচ্ছে যে কোন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনে শিল্প খাতের অংশ সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে, ২০১৯ অর্থবছরে এটি ছিল জিডিপির ৩৪ শতাংশ যেখানে ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কার্যকর শিল্প নীতি তৈরি করা দরকার। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ও দেশীয় পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রেখে এ ধরণের শিল্প নীতি গ্রহণ করতে হবে যা রপ্তানিমুখী শিল্পের সম্প্রসারন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সক্ষম হয়। শিল্প নীতিতে কর্ম সংস্থান তৈরি, উৎপাদন বৃদ্ধি, আয় অথবা বিনিয়োগে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর মত লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রধান উদ্দেশ্য হবে রপ্তানিমুখী ও কর্ম সংস্থান তৈরি করতে সক্ষম শিল্প উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

শিল্পনীতির হাতিয়ার (Instrument): শিল্প নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এগুলিকে বাহ্যিক, পণ্য ও ফ্যাক্টর মার্কেট ভিত্তিক কর্মসূচি হিসেবে বিভক্ত করা যেতে পারে।

বাহ্যিক বাজার কর্মসূচির মধ্যে আছে আমদানি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা, শুল্ক ও প্যারা শুল্ক, আমদানি কোটা (২০০৪ সাল থেকে বিলুপ্ত), ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ প্রোগ্রাম এবং একই সাথে রপ্তানি উদ্বুদ্ধকরণ পদক্ষেপ (যেমনঃ সরঞ্জামাদির করমুক্ত আমদানি, ইপিজেড বা এসইজেড, নগদ ভূর্তুকি, বিশেষ ছাড়ে ঋণ) যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান নতুন বাজার ধরতে পারে বা নতুন বাজারে প্রবেশ করতে পারে। রপ্তানির জন্য অন্যান্য নীতিমালার মধ্যে রয়েছে এফডিআই উৎসাহিতকরণ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে সংযুক্তি, উপযুক্ত সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা, দক্ষ অবকাঠামো ও সহায়তা সেবা এবং মানব সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন যেমন: গবেষণা ও উন্নয়ন, শিক্ষা ও শিল্পগুচ্ছ তৈরি।

পণ্যবাজার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দেশীয় বাজারে প্রবেশের নীতিমালা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ন্যায্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও কর নীতিমালা, দেশীয় পন্যের চাহিদা উৎসাহিত করা।

ফ্যাক্টর মার্কেট কর্মসূচির মধ্যে আছে বিভিন্ন নীতিমালা যেমন কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যিক শর্ত ও এফডিআইয়ের ওপর শর্তারোপ যাতে এফডিআই থেকে বাংলাদেশ নিট সুবিধা অর্জন করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর মার্কেট ইন্টারভেনশন এর মধ্যে রয়েছে পুঁজি বাজার এবং আর্থিক খাত যার লক্ষ্য হচ্ছে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা এবং রুগ্ন শিল্পকে রক্ষা করা। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে যারা শিল্প উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সরবরাহ করে, রুগ্ন বা বিকশিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ভুর্তকিতে পুঁজি বা পুঁজি সহায়তা প্রদান করে এবং 'থ্রাস্ট সেক্টর' (সেই সকল চিহ্নিত খাত যাদের সাম্প্রতিক অবস্থার ভিত্তিতে বোঝা যায় ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির ভালো সম্ভাবনা আছে)-কে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভুর্তকিতে ঋণদান করে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প নীতির হাতিয়ার: প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মকানুন ভিত্তিক বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার একজন উপকারভোগী সদস্য হিসেবে শিল্পনীতির উপকরণ ব্যবহারে ডব্লিউটিও'র নিয়মকানুন মেনে চলা বাংলাদেশের জন্য অবশ্য কর্তব্য। বাংলাদেশের ব্যাপক ব্যবহৃত কিছু উপকরণ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

শুল্ক ও প্যারা শুল্ক: দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শুল্ক। ডব্লিউটিও শুধুমাত্র কাস্টমস শুল্ককে (CD) স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বাংলাদেশ সম্পূরক ও নিয়ন্ত্রক শুল্ক (SD ও RD) অতিরিক্ত সংরক্ষন প্রদানের জন্য ব্যবহার করে। এ শুল্কসমূহ রাজস্ব আদায়ের জন্যও ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কর ও মাশুলের (ODC) আওতায় ডব্লিউটিও এই জাতীয় প্যারা-শুল্ককে নিষিদ্ধ করে। ডব্লিউটিও-র আদি সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সীমিত পরিসরে 'ট্যারিফ বাইন্ডিং' বা 'ট্যারিফ ক্যাপ'-এর আওতায় ছিল। বাংলাদেশ সকল প্রকার কৃষি শুল্ক ২০০%-এ সীমিত রাখার জন্য সম্মত ছিল এবং অকৃষি পন্যের শুল্কের মাত্র ৫% এর মধ্যে থাকার কথা। স্পার্কিং প্লাগের (HS-৩৮০৮.৯২) ওপর ৩% থেকে শুরু করে মিষ্টি বিস্কুট ও ওয়েফারের (HS-১৯০৫.৩১) ওপর ৫০% শুল্ক রয়েছে। সাধারণত 'এপ্লাইড ট্যারিফ'-এর চেয়ে 'বাউন্ড ট্যারিফে'র পরিমাণ বেশি হয়। যখন অন্যান্য কর ও মাশুল অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন 'এপ্লাইড ট্যারিফে'র পরিমাণ 'বাউন্ড ট্যারিফ'কে অতিক্রম করে (যেমনঃ বিস্কুট, স্পারকিং প্লাগ)। ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর ডব্লিউটিও-এর নিয়ম নীতির এমন বিচ্যুতির ফলে বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ থেকে অভিযোগ আসতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্ট হারের মধ্যে 'এপ্লাইড ট্যারিফে'র মাত্রা বেঁধে দেয়াই হবে যৌক্তিক।

রপ্তানি ভুর্তকি ও অন্যান্য সহায়তামূলক পদক্ষেপ: 'সাবসিডিজ অ্যান্ড কাউন্টারভেইলিং মেজারস' (SCM) চুক্তি অনুসারে মাথাপিছু জিএনআই ১০০০ মার্কিন ডলারের (১৯৯০ এর মার্কিন ডলারের স্থির মূল্যে) বেশি হলে সে সব দেশ রপ্তানি ভর্তুকি দিতে পারবে না; ব্যতিক্রম শুধু এলডিসি ও কিছু উন্নয়নশীল দেশ (SCM চুক্তির সংযুক্তি ৭-এ তালিকাভুক্ত) যাদের মাথাপিছু জিএনআই ১০০০ মার্কিন ডলারের নিচে। বর্তমানে বাংলাদেশ ৩৫টি রপ্তানি পণ্যে ৪% (অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি) থেকে ২০% (ফল ও শাক সবজি) ভর্তুকি প্রদান করে। ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশর এই সুযোগ বহাল থাকবে না কিন্তু মাথাপিছু জিএনআই তখনও ১০০০ মার্কিন ডলারের (১৯৯০ সালের মার্কিন ডলারের স্থির মূল্যে) কম থাকলে অব্যাহতি পেতে পারে এক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র নিকট সংযুক্তি ৭-এ থাকা তালিকাভুক্ত দেশের মত অব্যাহতি বজায় রাখার আবেদন করতে হবে। স্থানীয় উপাদানের ব্যবহার সংরক্ষণ করার জন্য ভর্তুকিও নিষিদ্ধ হবে যা এলডিসি'র থাকা অবস্থায় প্রদান করা যায়। বাংলাদেশের আনুমানিক অর্ধেক রপ্তানি ভর্তুকি প্রদান করা হয় বস্ত্র শিল্প ও তৈরি পোশাক খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজকে সহায়তা করার জন্য। ২০২৪ সালে বা তার পর থেকে এই সুবিধাও ঝুঁকিতে পড়বে। শেষ কথা, ২০০১ সালের নভেম্বরে গৃহীত ডব্লিউটিও'র প্রক্রিয়া অনুযায়ী , রপ্তানি পণ্য বৈশ্বিক বাজারের ৩.২৫ শতাংশ অতিক্রম করলে রপ্তানি ভর্তুকি নিষিদ্ধ কারণ সেই পণ্যটিকে প্রতিযোগী সক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সেক্ষেত্রে নতুন স্থাপিত শিল্পের জন্য প্রযোজ্য রপ্তানি সহায়তা কার্যকর হয় না। বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির অংশ ৬.৫ শতাংশ হওয়ায় এ শিল্পটি এ শ্রেণীতে পড়ে। সুতরাং তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রদেয় যেকোন বা সকল ভর্তুকি ডব্লিউটিও'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বাণিজ্য সংক্রান্ত বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি অধিকার (TRIPS): বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য প্রদত্ত TRIPS- একটি বড় সুবিধা যেটির ফলে বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন ভঙ্গ না করেই 'জেনেরিক ড্রাগ' উৎপাদনে সক্ষম একটি বলিষ্ঠ ঔষধ শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ধন্যবাদযোগ্য এই সুবিধাটির জন্যই বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প সকল প্রকার ওষুধের দেশীয় চাহিদার ৯৭ শতাংশ মেটানোর পাশাপাশি ৬০ টির মত দেশে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলারের ওষুধ রপ্তানি করে। স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য এই সুবিধার মেয়াদ ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে কিন্তু ২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটলে এই সুযোগ ঐ বছরই শেষ হয়ে যাবে। প্রস্তুতিমূলক পর্ব হিসেবে সময় চাওয়া বা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত সময় বাড়ানোর জন্য ডব্লিউটিও'র নিকট আবেদন করতে হবে। কিন্তু এই অনুরোধের বিপক্ষে উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

TRIPS-চুক্তির মূল লক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার (IPR) সংরক্ষণকে শক্তিশালী করা হলেও শিল্প নীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলির সাধারণত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা কম। সুতরাং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রসারণের মাধ্যম হিসেবে এফডিআই আকৃষ্ট করা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প নীতির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে TRIPS-ধারা ৬৬.২, যেটিতে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এলডিসিভুক্ত দেশগুলিকে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। উন্নত দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অধিক সুবিধা পাবে। সুতরাং বাংলাদেশকে অধিক এফডিআই আকৃষ্ট করতে চাইলে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাসমূহকে কাজে লাগাতে ঝুঁকি হ্রাস এবং মুনাফা করা সম্ভব এরূপ শিল্পনীতি পরিচালনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডব্লিউটিও'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলাদেশের শিল্পনীতি নির্দিষ্ট না হয়ে সমন্বিত হওয়া উচিত অর্থাৎ শিল্পখাতের উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য এমন নীতিমালা প্রণয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। অবকাঠামো, মানব সম্পদ তৈরি, অধিকতর গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির প্রসারণ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা উন্নয়নে আবশ্যক। ডব্লিউটিও'র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলাদেশের শিল্পনীতির ইন্সট্রুমেন্টের মধ্যে রয়েছে শুল্ক (নির্দিষ্ট হারের মধ্যে); আঞ্চলিক সংযোগের জন্য ভর্তুকি, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ এবং রপ্তানি উদ্বুদ্ধকরণ পদক্ষেপ যেমন ভর্তুকি মূল্যে ঋণ ও ইনস্যুরেন্স, বিশেষ ছাড়ে কর ও শুল্কের সুবিধা এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (EPZ) ও বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (SEZ)।

ডব্লিউটিও'র প্রতিশ্রুতি মেনে চলা: বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং এই বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপকারভোগী হিসেবে বাংলাদেশের উচিত ডব্লিউটিও'র নিয়ম নীতি মেনে চলা, ডব্লিউটিও'র আওতাধীন সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়ে বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়ানো এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশের বাণিজ্য ব্যবস্থার মৌলিক উন্নয়নের জন্য 'এনহান্সড ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক (EIF)'-এর সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেল 'ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি' সম্পন্ন করেছে। এই স্টাডি দেশের বাণিজ্যের বর্তমান প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলি নিজস্ব অর্থে ও বিভিন্ন 'এইড ফর ট্রেড' (AFT) কর্মসূচির আওতায় সমাধান করার জন্য একটি 'একশন ম্যাট্রিক্স' প্রস্তুত করেছে। উপরন্তু, 'বাংলাদেশের সেবাখাতে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনাঃ সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ' এবং 'প্রধান রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের সম্মুখীন হওয়া অশুল্ক বাঁধা চিহ্নিতকরণ' শিরোনামে গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল রপ্তানি কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করবে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে কর্মকর্তাদের নেগোসিয়েশন দক্ষতা, সেবাখাতে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও অশুল্ক বাঁধা হ্রাস পাওয়ার মত বিষয়ে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে। "প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১" ও "রূপকল্প ২০২১"-এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন অন্যান্য প্রকল্প যেমন ১) বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প, ২) রপ্তানি বহুমূখীকরণ ও প্রতিযোগিতা ক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (স্তর-২), ৩) ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো প্রকল্প বিশেষ অবদান রাখবে। এছাড়াও 'ডিজিটাল বাণিজ্য নীতি ২০১৮' মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়েছে ও কার্যকরী করা হচ্ছে। এই নীতির আওতায় একটি 'ই-কমার্স সেল' গঠিত হবে যেটি বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক বাণিজ্য সমন্বয় উন্নয়নে কাজ করবে।

ডব্লিউটিও'র দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুসমর্থনের মাধ্যমে 'ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট' ২০১৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কার্যকর হয়। ৯৪ তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৬ সালের ১৩ই জুন চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই প্রথম বহুপাক্ষিক চুক্তি। এই চুক্তির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী একটি আধুনিক বাণিজ্য সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে বাণিজ্যিক লেনদেনের সময় ও খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়। এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে বিভিন্ন প্রকার ছাড় দেয়া হয়েছে।

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার আওতায় রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নিয়েছে। অনেক উন্নত দেশ থেকে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত (DFQF) সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগতি লাভ করেছে; ফলে ডব্লিউটিও'র অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব প্রধান বাজারগুলিতে প্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পাচ্ছে। কতিপয় উন্নয়নশীল দেশ যেমন চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি ও থাইল্যান্ড ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ড ছাড়া সকল উন্নত দেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলির অধিকাংশ পণ্যকে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদান করে। উপরন্তু, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা ও চীন স্বল্পোন্নত দেশগুলির জন্য তাদের 'রুলস অব অরিজিন' সহজ করেছে।

২.৮ বাজার অভিগম্যতার দ্রুত বিস্তৃতির জন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)

'প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি' (PTA)-এর আওতায় শুল্ক ছাড় বা অন্য উপায়ে সদস্য দেশগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যকে বাজারে প্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার প্রদান করে (উদাহরণস্বরূপ এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA), বাংলাদেশ যার সদস্য)। 'মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' (FTA)- হচ্ছে PTA'র একটি চূড়ান্ত ধরণ যেটি সদস্য দেশগুলির ব্যাপক পরিমাণ পণ্যকে শুল্ক মুক্ত বা কম শুল্কে বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান করে; খুবই অল্প পরিমাণ পণ্যই সাধারণত নেতিবাচক তালিকায় (সংবেদনশীল তালিকা) থাকে। অর্থাৎ PTA হচ্ছে 'ইতিবাচক পণ্যের তালিকা' আর FTA হচ্ছে 'নেতিবাচক পণ্যের তালিকা'। এফটিএ দ্বিপাক্ষিক (যেমন: ভিয়েতনাম ও জাপান) বা আঞ্চলিক (যেমন আসিয়ান) বা বহুপাক্ষিক (বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে বিস্তৃত কিছু দেশের মধ্যে; যেমন: 'ট্রান্স-প্যাসিফিক অংশিদারিত্বের

সর্বাত্মক ও প্রগতিশীল চুক্তি’ (CPTPP) হতে পারে। ডব্লিউটিও-র অধীনে অদ্যাবধি প্রায় ৩০০ PTA/FTA সম্পন্ন হয়েছে। এ থেকে ২০০০ সালের পর PTA/FTA-র প্রসারণের মাত্রা বোঝা যায়। সাধারণত সকল PTA/FTA-র দুইটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়: (১) পারস্পরিকতা (জিএসপি স্কিমের অকার্যকরতার বিপরীতে) এবং (২) উৎসের নিয়ম (ROO), প্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য এটা নিশ্চিত করা যে একটি পণ্যের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর অংশীদার দেশেই সংঘটিত হয়েছে। প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা কে পাবে এবং তার পরিমাণ কতটুকু হবে সেটা নিশ্চিত করার জন্য উৎসের নিয়ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বর্তমান বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে PTA/FTA-র আধিক্য যেখানে জটিল শুল্ক নির্ধারণী ও উৎসের নিয়ম বিদ্যমান। প্রতিটি PTA/FTA -র বহুপাক্ষিক নিয়মের বাইরেও নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এফটিএ-র মূল আকর্ষণ হচ্ছে এটি সদস্যদের অগ্রাধিকারমূল বাজার প্রবেশাধিকার ও আকর্ষণীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করে। দ্বিপাক্ষিক এফটিএ-র জন্য উভয় সরকারেরই সম্মতি প্রয়োজন হয়, দেশ দুটির মাঝে সম্ভাব্য বাণিজ্যের ভারসাম্য থাকলে এটি সম্পাদন করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। এফটিএ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য চীন, ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও নেপালের নিকট থেকে বাংলাদেশকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০২৪ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার সুবিধা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে বাজার হারানোর সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য এফটিএ একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ শুধুমাত্র ‘সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট’ (SAFTA) সাক্ষর করেছে কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষক মনে করে দক্ষিণ এশিয়াতে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এটি খুব বেশি অগ্রগতি আনতে পারেনি যেটি এই চুক্তির প্রধান অঙ্গীকার ছিল।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ও ব্রেক্সিট পরবর্তী যুক্তরাজ্যের সাথে বাণিজ্য সমঝোতার জন্য আলাপ-আলোচনা করতে হবে যাতে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অনুকূল প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়। এর বাইরেও বাংলাদেশ আরো দ্বিপাক্ষিক বা আঞ্চলিক এফটিএ-র সাথে যুক্ত হতে পারে যদি তার বাণিজ্যের পরিমাণ (বা বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি) ও কর্ম সংস্থান তৈরিতে ইতিবাচক সম্ভাবনা থাকে।

প্রথমত, এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে এই বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় (WTO) স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রদেয় বিশেষ ও স্বতন্ত্র বণ্টন ব্যবস্থার বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারভোগী। এমনকি উত্তরণের পরেও বাংলাদেশের এই বৈশ্বিক ব্যবস্থার শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে থেকে যাবে।

গ্যাট (GATT)-এর ধারা ১, গ্যাটস (GATTS)-এর ধারা ২ এ বর্ণিত বৈষম্যহীনতার নীতি থেকে সরে এসে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার আওতায় প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সমঝোতার চুক্তি সম্ভব, যেমন ‘মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA)। গ্যাট (GATT)-এর ধারা ২৪-এর আওতায় এফটিএ স্বাক্ষর করার প্রবিধান রয়েছে এবং বাণিজ্য ব্লকও তৈরি করার সুযোগ রয়েছে, সদস্য নয় এমন দেশগুলিকে বাইরে রেখে ডব্লিউটিও’র সদস্য দেশগুলিকে নিয়ে বাণিজ্য ব্লক তৈরির অনুমোদনও দেয়া হয় যতক্ষণ চুক্তিটির ফলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে সংঘটিত বাণিজ্য উদারীকরণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ডব্লিউটিও’র আওতায় প্রাপ্য সুযোগের চেয়ে বেশি হয়। সাম্প্রতিককালে স্বাক্ষরিত এফটিএগুলি শুধুমাত্র পণ্যের বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ না, সেবা ও বিনিয়োগও এর আওতাভূক্ত।

সম্প্রতি অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও সংরক্ষনবাদের উত্থানের ফলে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন কঠিন চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে এফটিএ স্বাক্ষর করছে। বাংলাদেশ অদ্যাবধি শুধুমাত্র একটি আঞ্চলিক এফটিএ (SAFTA) স্বাক্ষর করে ও কোন দ্বিপাক্ষিক এফটিএ স্বাক্ষর করেনি, যার ফলে বাংলাদেশ ডব্লিউটিও’র বাইরেও যে উন্মুক্ত বাণিজ্য করার সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পিঁছিয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের রপ্তানির জন্য বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার তৈরি করার সম্ভাবনা এফটিএ’র মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। যদিও এর সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে।

ইতিবাচক দিক হচ্ছে এফটিএ স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সরকারি ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করে। ফলে নতুন বাজার তৈরি, জিডিপি বৃদ্ধি এবং নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়। নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার ও আরো কার্যকরভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি উৎসাহিত হয়। যেহেতু দেশগুলি একে অন্যের কাছে তাদের বাজার উন্মুক্ত করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সেহেতু এফটিএ ‘তুলনামূলক উদারীকরণ’ নামক উপকারী প্রক্রিয়াটিকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। নেতিবাচক দিক হচ্ছে, এফটিএ’র ফলে সংহতিনাশক প্রতিযোগিতা তৈরি হতে পারে, প্রচলিত জীবিকা নষ্ট হতে পারে এবং কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বাংলাদেশে প্রচলিত উচ্চ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মালেশিয়ার (যাদের গড় শুল্ক ৬.২%) সাথে এফটিএ

সম্পাদিত হলে মালেশিয়ান রপ্তানিকারকেরা ‘বর্ধিত সংরক্ষণ’ সুবিধা পাবে কিন্তু বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা ‘হ্রাসকৃত সংরক্ষন’-এর সম্মুখীন হবে। মালয়েশিয়ার সাথে এফটিএ হলে সংরক্ষণমূলক শুল্কের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে যেটা অবশ্য একটা বড় ধরণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ।

যেখানে ডব্লিউটিও পদ্ধতিতে প্রধান প্রধান বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার একপাক্ষিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে সেখানে এফটিএ'র একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে পারস্পারিকতা। যদিও উদারীকরণ ব্যবস্থায় ছাড় দিতে হয় তবে শুল্ক বা অন্যান্য বাণিজ্য বাঁধা সমন্বয় করার জন্য আলাপ-আলোচনার সুযোগ থাকে। বাংলাদেশ উত্তর-দক্ষিণ (উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ) সমঝোতায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় শুল্ক হ্রাস করতে অধিকতর সময় লাগতে পারে। এফটিএ থেকে অধিকতর লাভ তখনই সম্ভব যখন এফটিএ বড় বাজারের দ্বার উন্মুক্ত করে (যেমন: উত্তর-দক্ষিন এফটিএ, বাংলাদেশ ও ওইসিডি সদস্যদের মধ্যে)। বিমসটেক, আসিয়ান বা এর প্রতিনিধি এবং আরো ৬টি এফটিএ অংশীদার যুক্ত দ্য রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ (RCEP) এর মত আঞ্চলিক সংস্থার (দক্ষিন-দক্ষিন) সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ বাজার সৃষ্টির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

যাই হোক এফটিএ'র কথা বিবেচনা করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে:

- গভীর, ব্যাপক ও দ্রুত উদারীকরণে এফটিএ যথেষ্ট প্রভাব তৈরি করে। এফটিএ যদি কম শুল্ক সুবিধা প্রদান করে তবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত প্রশাসনিক খরচ বহন করতে চাইবে না।
- এফটিএ'র প্রভাব ব্যাপকতর হবে যদি এফটিএ কর্তৃক দূরীকৃত বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার পরিমাণ বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতার তুলনায় বেশি হয় ।
- সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হচ্ছে এফটিএ'র ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পণ্যের যোগান বৃদ্ধিকরণে অর্থনীতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এফটিএ যে অবদান রাখবে তা অনেকাংশে সরকারের নীতি, অর্থনীতির নমনীয়তা এবং নতুন করে সৃষ্ট চাহিদার যোগান দেয়ার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে।
- সেইসব দেশের সাথে এফটিএ করা যেতে পারে যারা ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে যেমন মালয়েশিয়া, চীন, ভারত (এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে যেহেতু সাফটা ইতিমধ্যে বাজারে প্রবেশাধিকার দিয়েছে) ও থাইল্যান্ড। OECD- সদস্য রাষ্ট্রের বাইরে উদীয়মান বাজার অর্থনীতির দেশগুলিও ভালো প্রার্থী। মূল বিষয় হচ্ছে যদি অংশীদার দেশের বাজার ছোট হয় সেক্ষেত্রে এফটিএ থেকে প্রাপ্তি কম।
- এফটিএ'র প্রথম শর্ত হচ্ছে শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে বাণিজ্যের উন্মুক্ততা। প্রতিযোগীদের তুলনায় আকাশচুম্বি শুল্ক ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশ প্রত্যাশিত এফটিএ প্রার্থী পেতে বেশ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে। যেকোন এফটিএ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় পারস্পরিক সম্মতিতে শুল্ক হ্রাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন শুল্কহার খুব বেশি, যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব থেকে প্রাপ্ত সুবিধা খুবই কম। সুতরাং বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থার যৌক্তিকীকরণ জাতীয়ভাবে অপরিহার্য যদি দেশটি ভবিষ্যতে যেকোন দেশ বা অঞ্চলের সাথে এফটিএ সম্পাদন করতে চায়। এফটিএ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা খুবই জটিল এবং অনেক সময় সাপেক্ষ।

বাংলাদেশ সরকার দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য সহায়তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করছে। ইতোমধ্যে বেশ কিছু দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ডব্লিউটিও'র সদস্যপদের বাইরেও দেশটি সাপটা, স্যাটস, সাফটা, আপটা, বিমসটেক, টিপ-ওআইসি ও ডি-৮ প্রিফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্টস-এর সদস্য। আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি (RTA) সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটবে। এই উত্তরণের ফলে দেশটির বাণিজ্যের ওপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়বে যেহেতু দেশটি তার প্রধান বাজারসমূহে প্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার হারাবে। সুতরাং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করবে যাতে উত্তরণের পর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়।

এমতাবস্থায়, সরকার সম্ভাব্য অংশীদারদের সাথে এফটিএ স্বাক্ষর করার নীতি গ্রহণ করেছে যাতে উত্তরণজনিত চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে ‘ডিউটি-ফ্রি কোটা ফ্রি’ (DFQF) এবং ‘এভ্রিথিং বাট আর্মস’ (EBA) নামক বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধা বিলুপ্ত হওয়ার পর সৃষ্ট বাণিজ্য চ্যালেঞ্জসমূহ কাটিয়ে উঠতে পারে। দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বা প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) স্বাক্ষর করার

জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন বেশ কয়েকটি বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক পিটিএ ও এফটিএ স্বাক্ষর করা এবং 'কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' (CEPA)-তে যোগ দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। ২০১০ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য একটি 'পলিসি গাইডলাইন' তৈরি করেছে। সময়ের চাহিদা পূরণ করার জন্য এই নীতিটি হালনাগাদ করা দরকার। ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির নির্দেশাবলীটি সংশোধন করে আরো কার্যোপযোগী করা হবে।

শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে FTA/PTA সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা শুরু করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে মূল্যায়ন শেষ করেছে। লেবাননের সাথে FTA/PTA স্বাক্ষর করার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মন্ত্রণালয় আরেকটি সমীক্ষা গ্রহণ করেছে। 'কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনোমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' (CEPA)-এর ওপর যৌথ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় ভারতের সাথে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ৪টি সীমান্ত হাট স্থাপন করা হয়েছে যাতে আশেপাশের দূরবর্তী এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরো ১৬টি সীমান্ত হাট স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বার্থে বিভিন্ন বাণিজ্য ব্লকের এফটিএ স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), অ্যাসোসিয়েশান অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশন্স (আসিয়ান), ইউরেশিয়ান ইকোনোমিক ইউনিয়ন (EAU) ও মারকোসুর (MERCOSEUR) দেশগুলির সাথে এফটিএ সাক্ষরের জন্য উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির কর্মকর্তাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাণিজ্য নীতিকে মূল ধারায় নিয়ে আসার এখনই উপযুক্ত সময়। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের এই সময়ে বাণিজ্য নীতির সংস্কার দরকার যাতে এর সম্ভাবনা কাজে লাগানো যায়। এটিকে বাংলাদেশের ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করা উচিত যেখানে বাণিজ্য নীতি কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অবকাঠামোর সুবিধা তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ব্যবহারিক অর্থে, উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রতিটি স্তরে বাণিজ্য বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ভোক্তা ও সকল শ্রেণীর অংশীজনের অংশগ্রহণে শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরামর্শের মাধ্যমে বিষয়টি প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন।

২.৯ প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লব

এ অধ্যায়ে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে শ্রমের স্থানচ্যুতি ও কর্মসংস্থানের ওপর যে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে তার ওপর সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হবে। যেহেতু ডিজিটাল অর্থনীতি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে এবং বাংলাদেশের সব খাতে ও কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিস্তার লাভ করেছে সেহেতু ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও সময়ের সাথে সাথে বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে উৎপাদন খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সুবিধা গ্রহণ না করার কোন বিকল্প নাই। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের মূলে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবস্থা, রোবোটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং এটি আমাদের কাজ করা, বেঁচে থাকা এবং পণ্য ও সেবা উৎপাদনের ধরণে পরিবর্তন আনছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লব একইসাথে ধবংসাত্মক ও সৃষ্টিশীল শক্তি যেটি বাজার ব্যবস্থায় সুম্পিটারের বিখ্যাত "সৃষ্টিশীল ধ্বংস" তত্ত্বের প্রচলন করেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের শিল্প অগ্রগতির ধারা যা মূলতঃ রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির ফলে তৈরি হয়েছে তা ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সম্মুক্ষীন।

ইন্টারনেট ও ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ডিজিটাল উৎকর্ষতার যুগে উৎপাদনের এই ধীর কিন্তু নিশ্চিত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন উৎপাদনের উপকরণের প্রাচুর্যতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের শ্রমঘন শিল্পায়নে- যে দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে তা ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। মুলত বাংলাদেশে এখনও বিপুল পরিমাণ কম দক্ষ শ্রমিকের পর্যাপ্ততা রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প হচ্ছে তার সর্বোৎকৃষ্ঠ উদাহরণ। গত ৫০ বছর ধরে পোশাক উৎপাদন, বিশেষ করে পোশাক প্রক্রিয়াজাত করার শেষ ধাপ, একটি শ্রমঘন কাজ হিসেবে চলে আসছে। বিশ্বায়ন, উন্মুক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিশাল বৈশ্বিক বাজার উন্মুক্ত করার জন্য তৈরি বহুপাক্ষিক নিয়ম নীতিকে ধন্যবাদ। এসবের জন্যই বাংলাদেশ- স্বল্পোন্নত দেশের একটি সফল উদাহরণ হিসেবে শ্রমঘন উৎপাদন ও তুলনামূলক সুবিধা ভিত্তিক তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারক হয়েছে। ডিজিটাল সময়ে এসে দ্রুত ও ব্যাপক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে তুলনামূলক সুবিধার এই ক্ষেত্রটি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্পখাতের চাকুরীর প্রাণ হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। খরচ, মান ও উৎপাদন সময়ের সাথে তাল মেলাতে এই খাতে আগ্রাসীভাবে স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। গবেষণা থেকে দেখা যায় গত ৩৫ বছর ধরে প্রতি ইউনিট উৎপাদনের ক্ষেত্রে (ইউনিট পরিমাপ করা হয় মিলিয়ন ডলার রপ্তানি রাজস্বের ভিত্তিতে) শ্রমের ব্যবহার ৩৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ৩৫ বছর আগের তুলনায় এখন প্রতি মিলিয়ন ডলার তৈরি পোশাক রপ্তানিতে গড়ে ৩.৫ গুণ কম শ্রম ব্যয় হয়। ফলে অতীতের তুলনায় তৈরি পোশাক শিল্প আরো বেশি প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। একইভাবে বলা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প আগের তুলনায় আরো বেশি প্রযুক্তি ও পুঁজি নির্ভর এবং কম শ্রম নির্ভর হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে চাকুরি হারানোর বিষয়টি রপ্তানির পরিমাণে দ্রুত প্রবৃদ্ধি দ্বারা পূরণ করা সম্ভব।

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে হারানো চাকুরির পরিমাণের সাথে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তাল মেলাতে পারছে না, ফলে নিট চাকুরি হারানোর সংখ্যা বাড়ছে। রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ, ২০১০ অর্থ-বছরের ১২.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০১৯ অর্থবছরে ৩৪ বিলিয়ন ডলার হলেও নিয়োজিত শ্রমিকের পরিমাণ ৪.৪ মিলিয়ন থেকে কমে ৪ মিলিয়ন হয়েছে। এই সময়ে বেতন ও কমপ্লায়ান্সজনিত খরচ দ্রুত বেড়েছে যা ৪র্থ শিল্প বিপ্লব প্রযুক্তি গ্রহনে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আইসিটি বিভাগ ও ইউজিসি পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে যে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ২০২৫ সালে, বর্তমানে যে পরিমাণ তৈরি পোশাক উৎপাদন হচ্ছে সেই একই পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশের বেশি শ্রম নিয়োগ হ্রাস পেতে পারে।

পুনঃস্থাপন (Reshoring) সম্ভাবনা: পোশাক শিল্পে স্বয়ংক্রিয় সেলাই মেশিন (SewBot) আবির্ভাবের কারণে পুনঃস্থাপন সম্ভাবনা (উন্নত দেশ পোশাক উৎপাদন নিজেদের দেশে সরিয়ে নিতে পারে) আগের থেকে তীব্রতর হচ্ছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে বিনিয়োগকারীদের কম খরচে উৎপাদনসক্ষম শ্রমঘন দেশের কারখানায় পোশাক উৎপাদন স্থানান্তরকরণ। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ফলে পোশাক উৎপাদনে শ্রমের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, একই সাথে অফশোরিং সুবিধাও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। একটা সময়ে পুনঃস্থাপন শুরু হবে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার এই যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্লেষকেরা তাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়ন করছে। প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়লে পূর্ববর্তী স্থানান্তরিত উৎপাদন আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তিত হয় কিন্তু তাতে কম দক্ষ শ্রমিকের যেমন বেতন বাড়ে না এবং তার জন্য নতুন চাকুরিও তৈরি হয় না। শুধুমাত্র উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকেরই বেতন বাড়ে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে পুনঃস্থাপন ঘটলে শুধুমাত্র দক্ষ শ্রমিকেরই পারিতোষিক বাড়ে, ফলে অসমতাও বাড়ে। বিশ্ব ইনপুট-আউটপুট সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে তাত্ত্বিকেরা দাবী করেছেন পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন উপায় গ্রহণ করা গেলে পুনঃস্থাপন ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাত্রার মাঝে ইতিবাচক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। গড়ে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে একটি রোবট সংযোজিত হলে সেটি ৬জন শ্রমিককে প্রতিস্থাপন করে; স্থানান্তর (Offsore) উৎপাদনে জড়িত প্রতি ১০০০ জন কর্মীর ক্ষেত্রে পুনঃস্থাপন কাজ ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বাড়লে শ্রম সংক্রান্ত খরচের সুবিধা কমে যায়; ফলে স্থানান্তরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তথ্যপ্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়, গত দশক ধরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে স্বয়ংক্রিয়তার মাত্রা বাড়ছে।

অধিক পরিমাণে পুনঃস্থাপন ঘটলে বৈশ্বিক চাহিদা কমে যাবে বা কমপক্ষে বাংলাদেশের মত রপ্তানিকারক দেশ থেকে পোশাকের আমদানি চাহিদা হ্রাস পাবে। ইতিবাচক দিক হচ্ছে, পোশাক মৌলিক প্রয়োজন হওয়ায় এবং বৈশ্বিক চাহিদার বৃদ্ধি আয়ের বৃদ্ধির সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় নন-ওইসিডি দেশগুলির (চীন, ভারত ও অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার ও মধ্য এশিয়ার উদীয়মান বাজার) উদীয়মান অর্থনীতি সহজেই সেই ঘাটতি পূরণ করতে পারবে।

বৈশ্বিক বাজারে পোশাকের চাহিদার নিম্নগামিতা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন না হয়ে বাংলাদেশের উচিত মৌলিক পোশাকের বাজারের বড় অংশ (যেটা চীন গুটিয়ে নিচ্ছে) দখলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা এবং দুই অঙ্কের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় রেখে শিল্পটিকে প্রস্তুত করা। যাই হোক, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অগ্রগতি ও রপ্তানির সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি (প্রতিবছর ১০%) বিবেচনায় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে নীট ১ মিলিয়ন চাকুরী হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সরকারের উচিত হবে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার করার মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করে অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতে (যেমনঃ পাটজাত দ্রব্য, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল) কর্মসংস্থান তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক তথ্য হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার ফলে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি চাকরি হারাবে। সুতরাং প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা রেখে নারীদের জন্য আরো শক্তিশালী দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

২.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতে বেসরকারি খাতের অবদান অনেক বেশী যদিও পাট, বস্ত্র ও সার খাতে সরকারি খাতের উপস্থিতি রয়েছে। শিল্পখাতের গতিশীলতা, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসৃজন নির্ভর করছে যথাযথ শিল্প ও বাণিজ্য নীতি প্রনয়ণের ওপর যা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং বৈশ্বিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষম করে তুলবে। সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠার চেয়ে বাণিজ্য ও শিল্প নীতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা প্রদানই সরকারি ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারি বিনিয়োগের বরাদ্দ মূলত শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্টানসমূহ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সকল শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা প্রতিষ্ঠান ম্যানুফ্যাকচারিং উৎপাদন, বাণিজ্য পরিচালনা (যেমন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট) এবং বাজার আবিষ্কারের সাথে জড়িত তার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সরকারি বিনিয়োগের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সারণি ২.১১ এবং ২.১২ তে যথাক্রমে চলতি ও স্থির মূল্যে (২০২১ অর্থবছর মূল্যে) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ২.১১: শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের জন্য ৮ম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা; চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১.৬	২.০	২.৩	২.৭	৩.২
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১.২	১.৫	১.৭	২.০	২.৩
শিল্পমন্ত্রণালয়	১২.৮	১৫.৭	১৮.১	২১.১	২৫.৪
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৩	৩.৮	৪.৫	৫.৪
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫.৩	৬.৬	৭.৬	৮.৮	১০.৬
খাতগত মোট	**২৩.৬**	**২৯.০**	**৩৩.৫**	**৩৯.০**	**৪৬.৯**

সূত্রঃ অধ্যায় ৫,অংশ ১,পরিশিষ্ট সারণি এ ৫.১

সারণি ২.১২: শিল্প ও অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের জন্য ৮ম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা; ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১.৬	১.৯	২.১	২.৩	২.৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১.২	১.৪	১.৫	১.৭	১.৯
শিল্পমন্ত্রণালয়	১২.৮	১৪.৯	১৬.৪	১৮.২	২০.৮
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.২	৩.৫	৩.৯	৪.৪
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫.৩	৬.২	৬.৮	৭.৬	৮.৭
খাতগত মোট	**২৩.৬**	**২৭.৬**	**৩০.২**	**৩৩.৬**	**৩৮.৫**

সূত্রঃ অধ্যায় ৫,অংশ ১,পরিশিষ্ট সারণি এ ৫.২

অধ্যায় ৩

কাঠামোগত রূপান্তরের সেতু বন্ধনে সেবা খাত

৩.১ উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

উন্নয়ন অগ্রগতির সাথে কাঠামোগত পরিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কয়েক দশক অতিক্রম করে নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অপরিহার্য। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে, এরূপ রূপান্তরে যে ধরণ লক্ষ্য করা যায় তা হল, উৎপাদনে কালক্রমে কৃষির অংশ কমতে থাকবে, কারণ শিল্পায়ন প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। একই সাথে গ্রামীণ কৃষির অপ্রয়োজনীয় শ্রমের জন্য নগর কেন্দ্রগুলোতে শিল্প, বাণিজ্য ও আধুনিক সেবা খাতে অভিবাসিত শ্রম শক্তির জন্য মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

এখানে উৎপাদনে কৃষির অংশ কমে যাচ্ছে কিংবা অর্থনীতিতে এটির গুরুত্ব কমতে থাকবে তা নির্দেশ করছে না। উন্নত অর্থনীতির অগ্রগতির ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, উচ্চ উৎপাদনশীল কার্যক্রমে কৃষির বিবর্তন-যেমন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র খামারে পুরো দেশের জন্য শস্য, মাংস, পোল্ট্রি, মৎস্য এবং শাকসব্জির চাহিদা মেটাতে সক্ষম এবং কিছু রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্ত থেকে যায়। প্রযুক্তিগত উৎপাদনশীলতার অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কালক্রমে কৃষি অনেক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। ঐতিহাসিকভাবে উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কৃষির উৎপাদন বাৎসরিকভাবে ৩-৫% এর মধ্যে উঠানামা করে। এভাবে কৃষিতে উৎপাদনশীলতার সকল শর্ত অর্জন সত্ত্বেও বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়শীল দেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে এই খাতের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। কৃষিতে জিডিপি'র অংশ ১৯৭৩ অর্থবছর ৬০ শতাংশ থেকে ২০২০ অর্থবছর ১৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ৭-৮% কিংবা তার বেশি দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে খাতগত কৌশল হিসেবে দ্রুত শিল্পায়নকে বেছে নেয়া যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, উন্নয়ন অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিবর্তনমূলক পর্যায়ে কাঠামোগত পরিবর্তনকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে, উন্নয়নের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনে কৃষির অংশ হ্রাসের ঘাটতি পূরণে শিল্পের অংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্প আনুষাঙ্গিকভাবে আধুনিক খাতে মজুরি কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্র, কারণ গ্রামীণ কৃষির শ্রম শক্তিকে বর্ধনশীল উৎপাদনশীলতা হিসেবে বিবেচনা করেছে, যা কৃষি বহির্ভূত ও শিল্প খাতের কার্যক্রমে লাভজনক কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত অনাবশ্যক শ্রম তৈরি করেছে। এই কাঠামোগত চেহারার (Phenomenon) সাথে ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকের উৎপাদনে রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির নতুন প্যারাডাইম (Paradigm) যুক্ত হয়েছে। এটি শুধু শিল্পায়নে উদ্দীপনা তৈরি করেনি, সেই সাথে বিশ্ব বাজারে সশ্রয়ী অর্থনীতির (Scale Economics) উপজীব্য প্রচলনের মাধ্যমে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল প্রদান করেছে। শিল্পায়ন ও রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের মাইলফলক। এর ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে ১৯৭৩ অর্থবছরে শিল্পের অংশ ১০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ অর্থবছরে ৩৫% এ উন্নিত হয়েছে।

৩.২ সেবা ও কাঠামোগত রূপান্তর

অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি স্থিতিশীল হলেও তা গতিশীল সেবা খাতের ওপর নির্ভর করে। যেহেতু এটি জিডিপি প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উপাদান, তাই অর্থনীতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার ওপর সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে। যে সকল আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক গত ২৫ বছরের বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করেছেন, তারা দেখেছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি শুধু দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেনি, বরং ঐ প্রবৃদ্ধি অন্যান্য উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশগুলোর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল ছিল এবং সেবা খাত প্রবৃদ্ধি হারের স্থিতিশীলতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি অবদান রেখেছে। এই স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল অর্থনীতি অসাধারণ গতিশীল উপাদান সঞ্চার করেছে। যে ডিজিটাল অর্থনীতি সেবা খাতের ইনপুট ও আউটপুট ছিল, তা এখন এই খাতের গতি-প্রকৃতি উদ্ভাবন এবং সামগ্রিক গতিশীলতার উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কারণ, ডিজিটাল অর্থনীতি কোভিড-১৯ এর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হওয়ার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পূন:চালন ও পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, সেবা খাত প্রাথমিকভাবে নগরের শিল্প অর্থনীতিতে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির রূপান্তরের জন্য একটি সুবিধাজনক বন্ধন তৈরি করে। গতানুগতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে কৃষি খাত আধুনিকীকরণের ফলে শ্রম প্রাথমিকভাবে কৃষি থেকে প্রধানত গ্রামীণ ও নগরের নিম্ন দক্ষ সেবা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সেবা প্রধানত প্রকৃতিগতভাবে অনানুষ্ঠানিক এবং কৃষিতে কর্মসংস্থান কমে গেলে তা এখানে কাজে লাগানো যাবে। এভাবে কৃষি থেকে সরে আসা শ্রম, উৎপাদন ও আধুনিক সেবা খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরে আসবে কিংবা অনানুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। সেবা কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি প্রধানত চাহিদার একটি দিক। আজকের পৃথিবীতে যেখানে শ্রম ও পুঁজি দ্রুত স্থানান্তরিত হয়, সেখানে দেশীয় ও বৈদেশিক চাহিদা প্রসারে সেবা খাত যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

চিত্র ৩.১ এ- ৩.১ সি-তে, ১৯৭০ সাল থেকে গত চার দশকের উচ্চ-আয় দেশ (HIC), মধ্যম আয়ের দেশ (MIC) এবং নিম্ন আয়ের দেশগুলোর (LIC) সেবা খাতের বিবর্তন ও কাঠামোগত পরিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলো শিল্পায়িত হয়ে গিয়েছে (৫% এর বেশ নীচে কৃষির গড় জিডিপি'র ৪০%) এবং ব্যবহারিকভাবে কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যণীয় ধারা সেবার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি কর্তৃত্বময় হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল সেবা খাতের একক কাঠামোগত রূপান্তর, যা ১৯৭০ সালে জিডিপি'র ৬০% এর নীচে থেকে ২০১৭ সালে ৭০% উন্নিত হয়। ১৯৮৫ এবং ২০০০ সালের মধ্যে আধুনিক সেবা খাত অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে উন্নত বিশ্বে প্রযুক্তিগত বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে এবং উচ্চ-আয়ের নেতৃত্বস্থানীয় দেশগুলোর জিডিপি'তে অবদান রাখছে। এটি ঘটেছে ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া বি-শিল্পায়নকরণের কারণে। কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও এই একই প্রবণতা মধ্যম-আয়ের দেশগুলোতে লক্ষ্যণীয়। এসব দেশগুলোতে সেবা খাতের অবদান ৫০% এর উপরে রয়েছে, যদিও তা জিডিপি'র ৬০% এর চেয়ে কম। কিন্তু বি-শিল্পায়নকরণের ধারা (জিডিপি'তে শিল্পের অংশ হ্রাস) মধ্যম-আয়ের দেশগুলোর (MIC) চেয়ে উচ্চ-আয়ের দেশগুলোতে (HIC) বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই সময়ে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও বেশিরভাগ সময় ধরেই নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে সেবা খাত জিডিপি'র প্রায় ৪০% এর কাছাকাছি।

সেবা খাতের বর্তমান অবস্থা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে এর অবদানের দিকে তাকালে (চিত্র- ৩.২) দেখা যায় যে, উচ্চ-আয়ের অর্থনীতির জিডিপি'তে সেবার অংশ বড় (HIC সর্বোচ্চ, এরপর MIC, তারপর LIC)। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, উচ্চ উৎপাদনশীলতার জন্য যেসব উন্নত আধুনিক সেবা প্রয়োজন হয় সেগুলো উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে দেখা যায়।

চিত্র ৩.১: কাঠামোগত পরিরবর্তনে উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ, ১৯৭০- ২০১৮

(জিডিপি'র অংশ % হিসেবে)

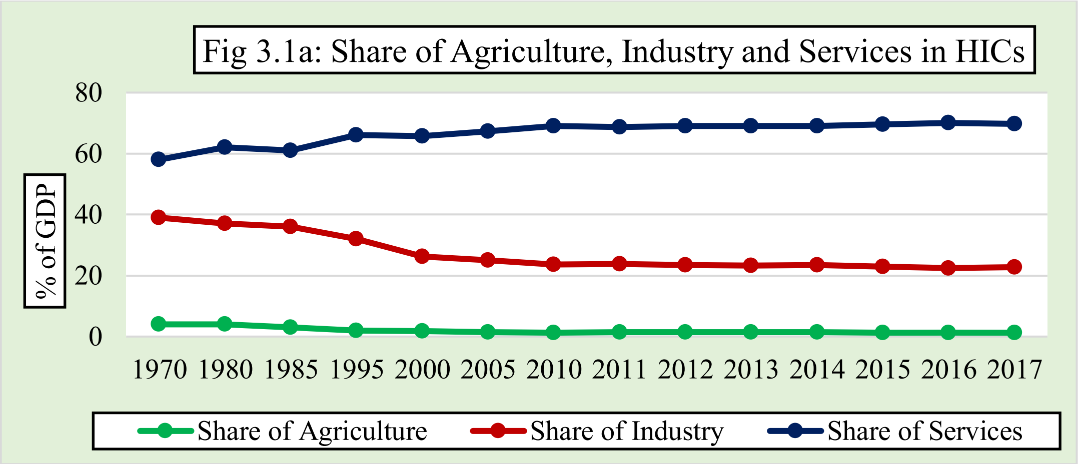

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

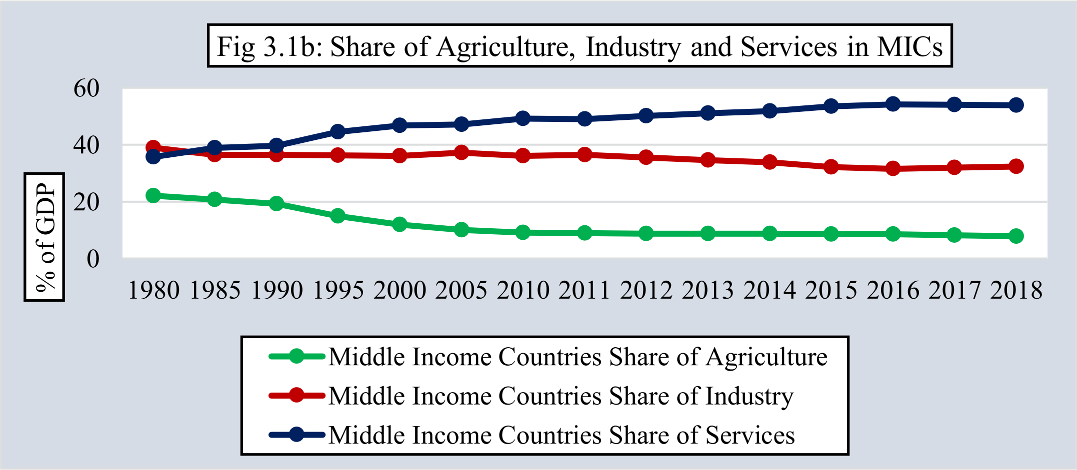

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

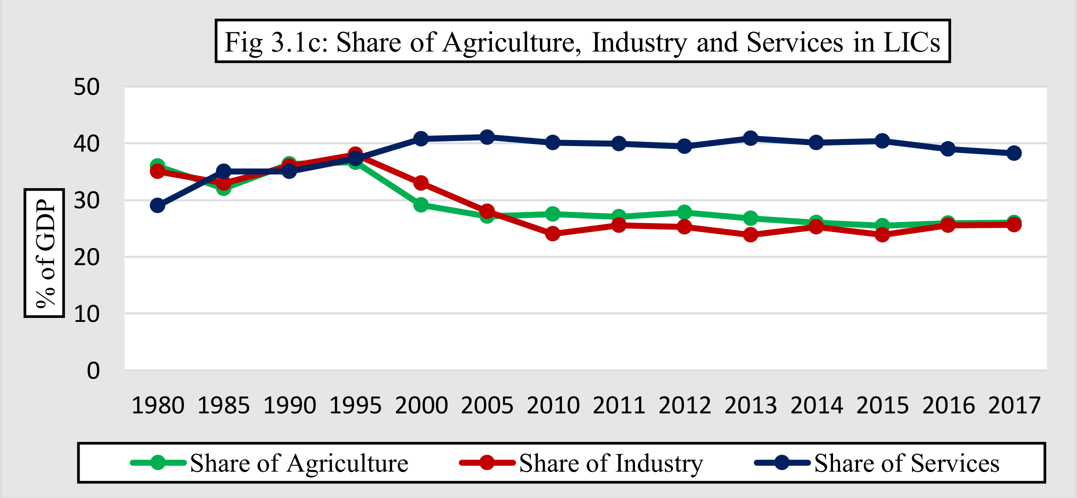

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

চিত্র ৩.২: সেবা খাতের অর্থনৈতিক অবদান, ২০১৭

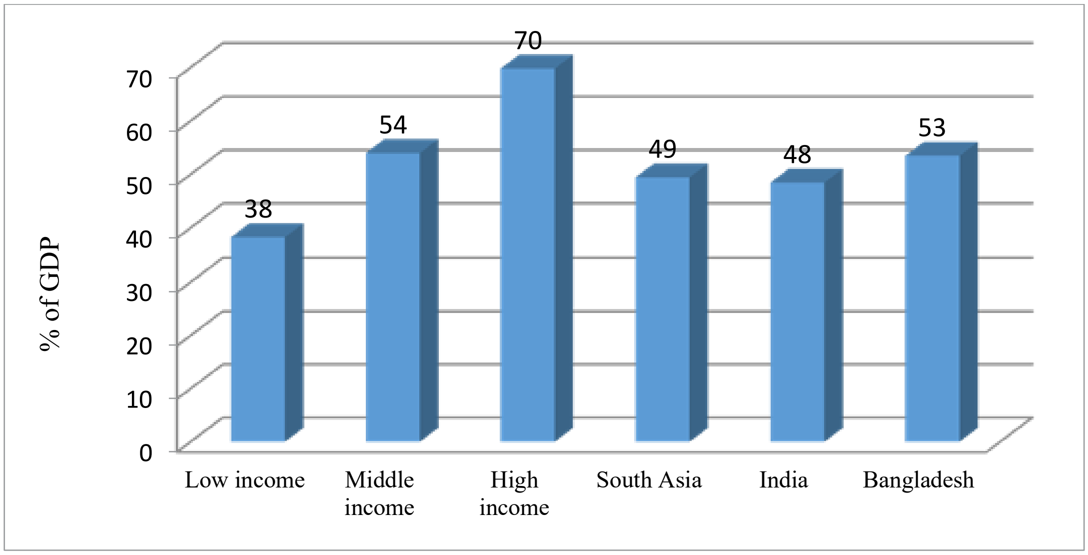

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

সবশেষে, ২০১৮ সালে বিশ্বে প্রথম সারির ৫টি নেতৃস্থানীয় অর্থনীতি (চিত্র ৩.৩ এবং ৩.১) উপরে বর্ণিত কাঠামোগত চরম রূপান্তরের চিত্র প্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানী বর্তমানের সেবা খাতের বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ করে (জিডিপি'র ৬৯-৭৭%)। চীন (৫২%) ও ভারত (৫৯%) উদীয়মান গতিশীল সেবা খাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ৩.৩: জিডিপি অনুসারে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ৫টি অর্থনীতির কাঠামো, ২০১৮

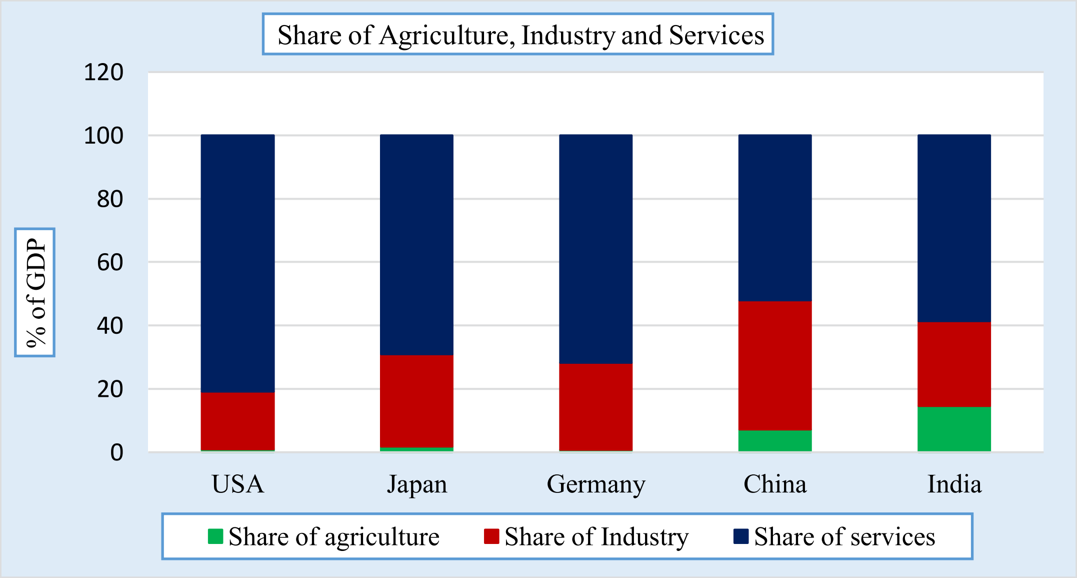

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

সারণি ৩.১: বিশ্বের সর্ব বৃহৎ পাঁচটি অর্থনীতির কাঠামো, ২০১৮
(জিডিপি'র %)

	কৃষির অংশ	শিল্পের অংশ	সেবার অংশ
ইউএসএ	০.৯	২১.৭	৭৭.৪
জার্মানি	০.৮	২৭.৫	৭১.৭
জাপান	১.৮	২৯.১	৬৯.১
চীন	৭.২	৪০.৭	৫২.১
ভারত	১৪.৬	২৬.৭	৫৮.৭

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটর (WDI), বিশ্বব্যাংক

২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC), যা বিশ্ব ব্যাংকের শ্রেণিকরণে ন্যূনতম আয়ের দেশ (LIC) হিসেবে শ্রেণিভূক্ত ছিল, তা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ (LMIC)-এ শ্রেণিভূক্ত হওয়ার জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনের শর্তসমূহ অনুসরণ করেছে। এখানে শিল্প কৃষির প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে, জিডিপি'তে শিল্পের অংশ কৃষির কমে যাওয়া অংশের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেবার ক্ষেত্রে চিত্র ৩.৪ প্রকাশ করে যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে জিডিপি'র সবচেয়ে বড় খাত হওয়ার জন্য সেবা খাত কৃষিকে অতিক্রম করে যায় (প্রায় ৫০%-এ)। তখন থেকেই এইচআইসি (HIC) কিংবা এমআইসি (MIC) এর ক্ষেত্রে আমরা যা দেখি এটি তা থেকে ভিন্ন, অর্থাৎ অর্থনীতিতে সেবার অংশ ৫০% এর কাছাকাছি স্থির হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ সেবা-ই অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমে, যেমন- খুচরা ও পাইকারি বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ, সামাজিক ও কমিউনিটি সেবা ইত্যাদি ঘিরে আবর্তিত। কেবল গত দুই দশকে, প্রযুক্তিগত বিপ্লব অধিক আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্বলিত আধুনিক সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে শক্তি যোগাচ্ছে।

চিত্র ৩.৪: বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোতে সেবাখাত (১৯৭৬ - ২০১৯)
(জিডিপি'র খাতগত অংশ %)

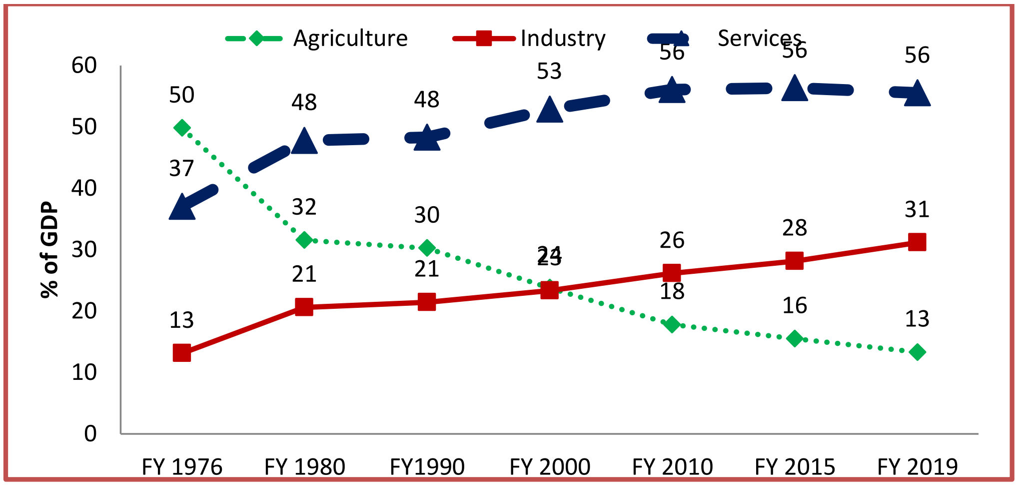

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

বাংলাদেশে সেবা খাত উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এটি শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত বর্ধনশীল চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়নি, সেই সাথে তা স্বল্প দক্ষ কর্মীদের জন্য বিশ্ববাজারে একটি দৃঢ় অবস্থানও তৈরি করেছে, বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে। এর ফলশ্রুতিতে, শ্রমিকদের রেমিট্যান্স প্রবাহ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা শহর ও গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন সেবা ও নির্মাণ কার্যাবলীতে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করছে। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ গ্রামীণ রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করা ছাড়াও দারিদ্র্য নিরসনেও অবদান রাখছে।

সেবা খাত নিজ থেকেই রূপান্তরিত হচ্ছে। যেহেতু বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার সময়ে নিম্ন-আয়ের উন্নয়নশীল দেশ থেকে ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হয়েছে, সেহেতু প্রাথমিকভাবে সেবা খাত অবিচ্ছিন্নভাবে নিম্ন-উৎপাদনশীলতা, বাণিজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিম্ন-আয়ের অসংগঠিত সেবা খাত, পরিবহন এবং অধিক সংগঠিত এবং উচ্চতর আয়ের বাণিজ্যিক সেবার দিকে নিম্নমুখী ব্যক্তিগত সেবা থেকে শক্তিশালীভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। জনপ্রশাসন, প্রতিরক্ষা, আইন-কানুন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাসমূহের মাধ্যমে সরকারি খাতে সৃষ্ট মানসম্মত সংগঠিত সেবা কার্যক্রম ছাড়াও, বেসরকারি সেবা খাত, ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা, নৌ-জাহাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিমান পরিবহন ও গুদাম সংরক্ষণ, পর্যটন এবং পরিবহন সহায়ক সেবাসহ অনেক আধুনিক বাণিজ্যিক কার্যাবলীর প্রবৃদ্ধিতে সেবা খাত ধীর গতিতে হলেও একটানা কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও, এই রূপান্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের তুলনায় বেশ মন্থর ও অনেক পিঁছিয়ে। এই সুযোগ ঠিক মতো কাজে লাগানো যায়নি। বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চ-আয়ের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর পরিপূর্ণ অন্বেষণ ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। এর চ্যালেঞ্জসমূহ পরিকল্পনা দলিলের অংশ-২,অধ্যায়-১২ তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর গবেষণা তথ্য থেকে দেখা যায় যে, সেবা কর্মসৃজন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের চালক হতে পারে। অধিকন্তু, রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে সেবার ভূমিকা অনেক ব্যাপক। সেবা খাতের বাণিজ্যিকীকরণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দ্বারা চালিত হয়েছে (মোবাইল, টেলিফোন, ইন্টারনেট), যাকে সেবার বিচ্যুতি ও সংকুচিত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অনেক সেবাই এখন ম্যানুফেকচারিং খাতের মত বাণিজ্যযোগ্য। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ, ব্যাংকিং ও অর্থ, বিমা এবং ব্যাক-আফিস প্রসেসিং। এসব সেবা প্রযুক্তি, পরিবহনযোগ্যতা ও বাণিজ্যযোগ্যতার কারণে বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে, যা সেবা বিপ্লবের (3T) হিসেবে পরিচিত। পরিমাপ যোগ্য নয় এবং বাণিজ্য উপযোগী নয় এমন সেবা সমূহের পুরাতন ধ্যান ধারণা আধুনিক সেবায় কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। তৎপরিবর্তে, সঠিক প্রণোদনা ও নীতি কাঠামো বিবেচনা করে আধুনিক সেবা মোট খাতগত উৎপাদনশীলতার (TFP) প্রবৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। মোট উপাদান উৎপাদনশীলতা (Total Factor Productvity) ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির একটি মূল উপকরণ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সেবা উন্নয়নের ধরণ পরিবর্তনে একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং এটি কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিকে গতিশীল করতে পারে। বাংলাদেশের জন্য একটি গতিশীল সেবা খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অতিরিক্ত পথের দিশা হবে।

এই অধ্যায়ে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও গ্রামীণ রূপান্তরের বড় বড় অর্জনের বিষয়ে সেবা খাতের উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধন এবং আগামী ৫ বছরে সেবা খাতের ভূমিকা-কে আরো গতিশীল করার জন্য একটা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে, কারণ বাংলাদেশ এলডিসি (LDC) তালিকা হতে বেরিয়ে এসেছে এবং ২০৩১ অর্থবছরর মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়ার প্রত্যাশা করছে। এই কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটা রূপরেখা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, এই অধ্যায়ে সেবা খাতের একটা রূপরেখাও প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায়।

৩.৩ বাংলাদেশের সেবা খাতের গতি-প্রকৃতি

প্রবৃদ্ধি হারের স্থিতিশীলতায় অবদান রাখা ছাড়াও বাংলাদেশের জিডিপি রূপায়নে সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে। পরবর্তী অংশে, চারটি পর্যালোচনামূলক এবং আন্তঃসম্পর্কিত অর্থনৈতিক নির্দেশকের আলোকে সেবা খাতের অবদান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, রপ্তানি এবং গ্রামীণ রূপান্তর।

৩.৩.১ জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান

বাংলাদেশে সেবা খাতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উন্নয়ন অর্থনীতির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেবা খাত প্রবৃদ্ধিতে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং প্রচলিত এই ধারণাকে অসত্য প্রতিপন্ন করে যে, সেবা কার্যাবলীর সংযোজন ও বৃদ্ধি সব সময় ম্যানুফ্যাকচারিং ও কৃষি প্রবৃদ্ধির অনুগামী হয়ে থাকে। এটি চিত্র ৩.৪ এ তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে কৃষির ভূমিকা যখন তুলনামূলক কমে আসতে থাকে, তখনই সেবা খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে, যা মোট জিডিপি'র চেয়েও অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং এর তুলনামূলক অংশ ১৯৭৪-৭৬ অর্থ-বছরের ৩৫% থেকে ১৯৮০ অর্থবছর ৫০%-এ উন্নিত হয়। এরপর এটি ৫০% এর উপরে স্থিতিশীল হয় এবং সাম্প্রতিক কালে দীর্ঘ সময় ধরে ৫০-৫৫% এ স্থিতিশীল রয়েছে। এভাবে ২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র চেয়ে দ্রুততার সাথে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে (সারণি-৩.২)। এ সময়ে এর তুলনামূলক জিডিপি'র অংশ ৫৫% এ উপনীত হয়। এই প্রবৃদ্ধি এখন জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের সামান্য নীচে স্থির অবস্থায় রয়েছে। ফলে সেবা খাতে জিডিপি অংশ কমে যাচ্ছে, যা ২০১৯ অর্থবছরে ৫১% এসে দাঁড়িয়েছে। প্রায় ২০০০ সাল পর্যন্ত, সেবা খাত ব্যাপকভাবে অনানুষ্ঠনিক কর্মসংস্থানের নিম্ন দক্ষ শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। কেবল সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক সেবা খাত সেবা অর্থনীতির একটি অধিক গতিশীল অংশ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে। তথাপি, প্রায় চার দশকের মধ্যে সেবা খাতে তুলনামূলক জিডিপি'র অংশে এই ৪৫% বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং যা আয়, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যাপক অবদান রাখছে।

সারণি ৩.২: জিডিপি ও সেবার দশকীয় প্রবৃদ্ধি হার

গড় প্রবৃদ্ধি হার	১৯৭৪-৮০ অর্থবছর	১৯৮১-৯০ অর্থবছর	১৯৯১-২০০০ অর্থবছর	২০০১-১০ অর্থবছর	২০১১-১৯ অর্থবছর
সেবা	৩.২	৩.৮	৪.৫	৬.১	৬.২
জিডিপি	২.৯	৩.৫	৪.৭	৫.৯	৬.৯

সূত্র: বিবিএস তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জিইডি'র মূল্যায়ন

বাংলাদেশের সেবা খাতে দশকীয় প্রবৃদ্ধির রেকর্ড আকর্ষণীয়। প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির পথ সম্পর্কে W.W.Rostow-এর সুপরিচিত "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর" অনুমান (Hipothesis)-এর প্রেক্ষাপটে এটিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাঁর বর্নিত পর্যায়সমূহ এটি অনুমান করে যে, একটি দরিদ্র কৃষি অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে শিল্প খাতের শক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়। যখন এটি টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, তখন সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ এই অর্থে সামান্য ভিন্ন পথ অনুসরণ করছে। সেবা খাত উন্নয়নের প্রাথমিক পর্বে শিল্প খাতের চেয়ে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ফলে, মোট জিডিপি'তে মূল্য সংযোজিত সেবার অংশ নিম্ন-আয় অর্থনীতির গড়ের চেয়ে উচ্চতর ছিল (চিত্র ৩.২)।

৩.৩.২ সেবা খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গ্রামীণ এবং নগর সেবায় যেখানেই অনানুষ্ঠনিক কর্মসংস্থানের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে যেমন- গ্রামীণ কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক পরবর্তী বছরগুলোতে আরো আধুনিক সেবা খাতে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে সেবা খাতে কালক্রমে কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়। চিত্র ৩.৫-এ কৃষি ও শিল্পের তুলনায় সেবা খাতে কর্মসংস্থানের অবদানের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। এই রূপান্তরের কারণগুলো পরিচ্ছেদ ৩.৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমিক প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ও নগরের বাণিজ্য, পরিবহন এবং ব্যক্তিগত সেবাসমূহে নিয়োজিত হয়। এভাবে সেবায় কর্মসংস্থানের অংশ ১৯৭৪ অর্থবছরে ১৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ অর্থবছরে ৩৪%-এ উপনীত হয়েছে। তখন থেকে এটি মোট কর্মসংস্থানের চেয়ে কিছুটা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা ১৯৭৪-১৯৯০ অর্থবছর সময়কালে উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল। স্থবির সেবা খাতের কর্মসংস্থান ১৯৯০ অর্থবছর পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা ১৯৯০ এর দশকে গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো বৈদেশিক অভিবাসন, বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে (চিত্র- ৩.৬)। নগর খাতের কর্মগুলোতে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের সাথে অভিবাসনের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসৃজন গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্রম বাজারের বুনিয়াদ দৃঢ়করণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এর ফলে কৃষি মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৩.৫: কর্মসংস্থানে সেবার অংশ

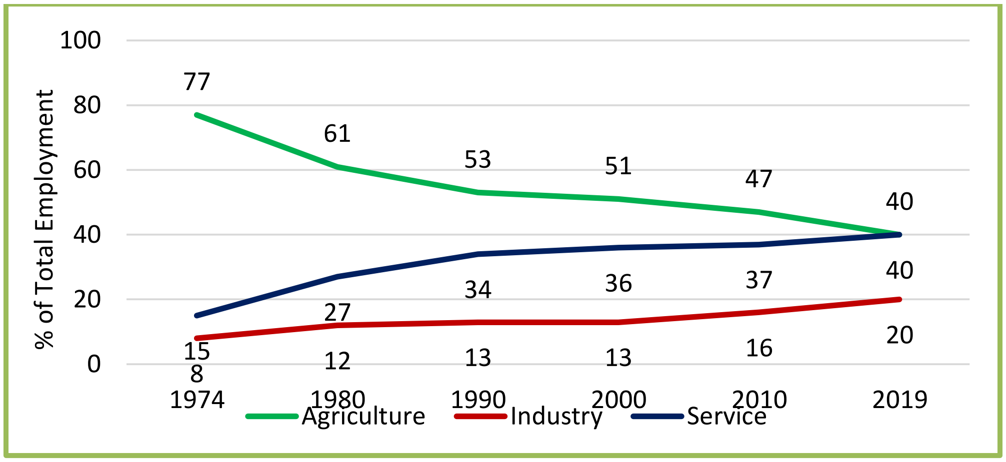

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

চিত্র ৩.৬: অভিবাসী কর্মীদের বাৎসরিক বহিঃগমন প্রবাহ

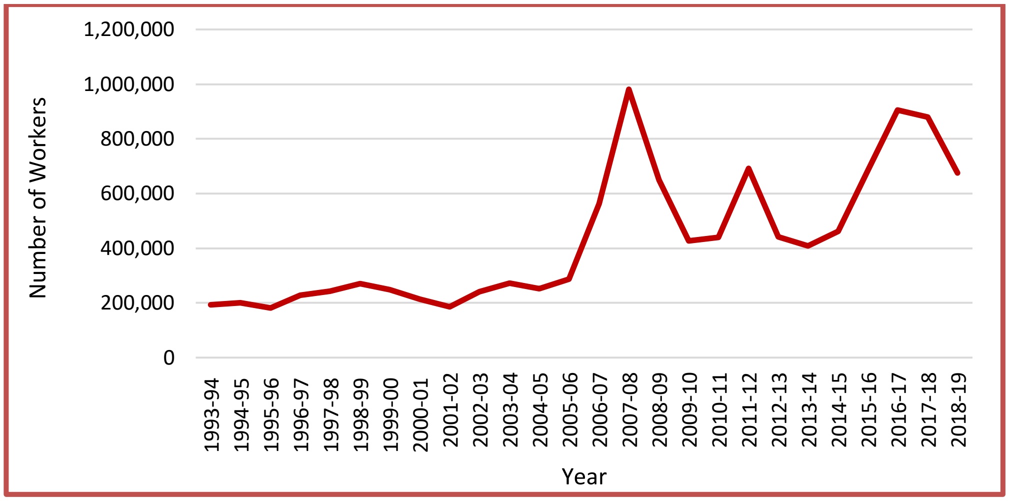

সূত্র: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)

৩.৩.৩ বর্ধিত কৃষি বহির্ভূত সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ রূপান্তর

১৯৭০ এর দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল সে তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি গভীর রূপান্তরযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক সেবা কার্যক্রমের বৃদ্ধি একদিকে গ্রামীণ রূপান্তরের উৎস এবং অন্যদিকে তার ফলাফল। এ সময়কালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে বয়স্ক সাক্ষরতার হার। গ্রামীণ জনগণের কল্যাণের মৌলিক নির্দেশকগুলোর উল্লেখযোগ্য

উন্নতির সাথে যুক্ত হয়েছে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেবার ব্যাপক বৃদ্ধি। ফলে তাদের বসত বাড়ির উন্নতি হয়েছে, সুপেয় পানিসহ স্যানিটারি সুবিধা, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ সড়ক, টেলিফোন ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাস্থ্য সুবিধা উন্নততর হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে।

সামাজিক অগ্রগতির সাথে আয়ের উৎস নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষি আর আগের মতো আয়ের প্রধান উৎস নয়। গ্রামীণ পরিবারগুলো এখন তাদের আয়ের সিংহভাগ প্রধানত পেয়ে থাকে কৃষি বহির্ভূত কার্যক্রম থেকে এবং নগদ অর্থের যোগান আসে মূলত বিদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের নিকট হতে। রেমিট্যান্স ও খামার-বহির্ভূত আয়ের অর্থায়নপুষ্ট গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেবার জন্য যে বর্ধিত চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে, তা গ্রামাঞ্চলে সেবার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যুক্ত করছে। গৃহায়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিক থেকে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, তা সেবার জন্য বর্ধনশীল চাহিদারই একটি স্পষ্ট উদাহরণ। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সেবাসহ পল্লী বিদ্যুতায়নের সম্প্রসারণও গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

১৯৭২ থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে উর্বরতা হ্রাস ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চমৎকারভাবে গ্রাম বাংলার উন্নয়নের ব্যাখ্যা তুলে ধরে। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে অন্যান্য বেশ কিছু গতিশীল উপাদান গ্রামীণ দৃশ্যপট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। এদের এই ভূমিকা সঠিকভাবে বোঝার জন্য গ্রামীণ খানাসমূহের আয়ের উৎসগুলো বিবেচনায় নেয়া যুক্তিযুক্ত হবে (সারণি ৩.৩)। পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালের শেষের দিকে গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের প্রায় ৫৩ শতাংশই আসতো কৃষি থেকে। ২০১০ সাল নাগাদ এই অংশ নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়ে মাত্র ৩০ শতাংশে নেমে আসে। অপরদিকে, কৃষি বহির্ভূত খাত থেকে আয়ের অংশ ৩৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ শতাংশে উন্নিত হয় (বিবিএস, ২০১০)। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ধনশীল উপাদানের মধ্যে রয়েছে দেশজ ও বৈদেশিক উৎস থেকে মোট হস্তান্তর (Transfer), যা ১৯৯১ এর ১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ১৭ শতাংশে উন্নিত হয়। এই হস্তান্তরের সিংহভাগ আসে বৈদেশিক রেমিট্যান্স থেকে।

সারণি ৩.৩: গ্রামীণ পারিবারিক আয়ের উৎস (শতাংশ)

বছর	মোট পারিবারিক আয়	কৃষি	কৃষি বহির্ভূত	সরবরাহ (রেমিটেন্স)
১৯৯১/৯২	১০০	৪০	৪৯	১১
১৯৯৫/৯৬	১০০	৩৫	৫৫	১০
২০০০	১০০	২৬	৬৩	১১
২০০৫	১০০	২৯	৫৯	১২
২০১০	১০০	৩০	৫৩	১৭
২০১৬	১০০	১৯	৬৯	১২

সূত্র: বিবিএস, এইচআইইএস (বিভিন্ন বছর)

এই পরিবর্তনশীল আয়ের ধারা থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যাপক রূপান্তরের যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে আসে, সেখানে জাতীয় আয়ের হিসেবে (National Account) কৃষি বহির্ভূত কার্যাবলীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে কৃষির সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯২ অর্থবছর হতে ২০১০ অর্থবছর মেয়াদে গড়ে ৩.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন বেড়েছে ৭.৩ শতাংশ। অ-কৃষি ও হস্তান্তর থেকে আয়ের চেয়ে কৃষি থেকে প্রাপ্ত আয়কে অধিকতর সমতামুখী মনে হলেও রেমিট্যান্স ও অ-কৃষি আয় দ্বারা অর্থায়িত গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেবার জন্য বর্ধনশীল চাহিদার সাধারণ ভারসাম্যের প্রভাব বিবেচনায় নেয়া হলে দেখা যায় যে, এর প্রধান উপকারভোগী গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক, যারা নিম্ন-আয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সেবার জন্য ক্রমবর্ধনশীল চাহিদার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৃহায়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিক থেকে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানে দৃশ্যমান উন্নতি।

পল্লী বিদ্যুতায়নের প্রসার, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট সেবার বিস্তার গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন তৈরি করছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্রামীণ পরিবহনে উন্নয়নের ফলে গ্রাম ও শহর কেন্দ্রগুলোর মধ্যে পরিবহন ব্যয় কমে এসেছে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে আইসিটি সেবা বিস্তৃতির ফলে নগর বাজার কেন্দ্র এবং গ্রামীণ উৎপাদন স্থলের মধ্যে তথ্যগত ব্যবধান ধীর গতিতে হলেও নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং এটি উৎপাদন প্রযুক্তি উন্নয়নেও সহায়তা প্রদান করছে। তদুপরি, মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক সেবার বিস্তৃতি অর্থ পরিশোধের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই দু'টি

বিষয় গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ব্যয় কমিয়ে এনে অধিকতর মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে লক্ষ্যণীয় হল গ্রামীণ এলাকায় আইসিটি সেবার প্রসারে অগ্রগতি সত্ত্বেও নগর ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে ডিজিটাল বিভাজন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বিভাজন দূর করার চেষ্টা করা হবে।

৩.৩.৪ খাত (Factor) ও খাত বহির্ভূত (Non-Factor) সেবা থেকে বর্ধনশীল রপ্তানি আয়

ঐতিহ্যগতভাবে বলতে গেলে আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহন ও বিমান পরিবহন ছাড়াও অধিকাংশ সেবা কার্যক্রমকে বাণিজ্য বহির্ভূত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রম বিবর্তন ও পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবার বিকাশের ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক নতুন ধরণের সেবার উদ্ভব ঘটেছে। যেহেতু ডিজিটাল তথ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া প্রবাহ দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছে, সেহেতু যে সকল সেবা কার্যক্রম এত দিন বাণিজ্য বহির্ভূত বলে বিবেচিত হতো সেগুলো এখন বাণিজ্যযোগ্য হয়ে উঠেছে, যেমন প্রিন্টিং, বিজ্ঞাপন, পশ্চাৎবর্তী অফিস প্রক্রিয়াকরণ (Back Office Procession)। যদিও অনেক সেবা এখনো বাণিজ্য বহির্ভূত কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়, তবুও বহু ধরণের সেবার আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে এখন চিন্তা করা সম্ভব।

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত সবাসমূহকে খাত ও খাত বহির্ভূত সেবা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। পণ্য রপ্তানি বিষয়ক তথ্যের সম্পূরক হিসেবে ইপিবি (EPB) এখন খাত বহির্ভূত রপ্তানি সেবার নিয়মিত মাসিক বিবৃতি প্রকাশ করে। অভিবাসী কর্মীদের রেমিট্যান্স হলো খাতভিত্তিক রপ্তানি সেবা। এসব সেবার যোগান দেওয়া হয় ডব্লিউটিওর ট্রেড সেবার সাধারণ চুক্তির (GATS) মোড-৪ (Mode-4) এর অধীনে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, খাত ও খাত-বহির্ভূত রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা দ্বারা লেনদেন ভারসাম্যের চলতি বিবরণী টেকসই রাখা যায়। ২০২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৭.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায় (কোভিড-১৯ এর অভিঘাতের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক কর্মহীনতা সত্ত্বেও), যা রেকর্ড পর্যায়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়িয়ে দিয়ে একটা রক্ষা প্রাচীর হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। রেমিট্যান্স জিডিপি'র ৬%, তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে ১৩% এর পর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস। জাহাজ, বিমান পরিবহন, বিমা, পর্যটন, আইটি এবং শান্তিরক্ষা মিশনের সেবার মতো অসংখ্য খাত-বহির্ভূত সেবা থেকে বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আইটি খাতে রপ্তানি কালক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইটি সেবার রপ্তানি ২০২০ অর্থবছরে ২৬৫.১৭ মিলিয়ন ইউএস ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৭ অর্থবছরে ১৯১.৮৪ ইউএস ডলার ছিল। রপ্তানি উপার্জনের এসব উৎসের ধারা চিত্র ৩.৭ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রমিক রপ্তানি ও সংশ্লিষ্ট রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৯৯০ অর্থবছর এর পরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য সেবা রপ্তানিতেও কিছুটা উর্ধ্বগতি দেখা গেলেও রেমিট্যান্স প্রবাহ থেকে আয় অন্যান্য সেবার অবদানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২০ অর্থবছরে ১৮ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হয়েছে, যা ১৯৯০ অর্থবছর এবং ২০২০ অর্থবছর এর মধ্যে নামীয় ডলার হিসেবে (Nominal doller terms) বাৎসরিক গড় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১১% । অন্যান্য সেবা রপ্তানি আয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেলেও এটি প্রতিবছর ৮% অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ৩.৭: খাত ও খাত বহির্ভূত সেবা রপ্তানির ধারা

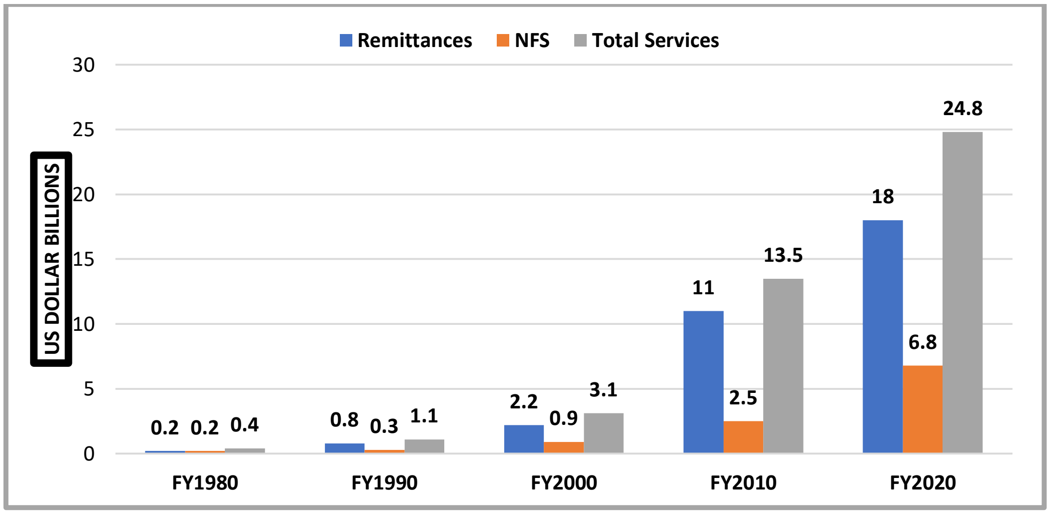

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

রেমিট্যান্স থেকে আয় এবং অন্যান্য সেবা থেকে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা উপার্জনের একটি বড় উৎস এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালক। তৈরি পোশাক খাতের বিকাশের আগে খাত ও খাত-বহির্ভূত সেবা থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা অর্জিত হত (চিত্র ৩.৮)। ২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতের আবির্ভাবের পরও এটির প্রভাব অব্যাহত ছিল। তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে রেমিট্যান্স ও অন্যান্য সেবা উপার্জনসমূহের আপেক্ষিক ভূমিকা তখন থেকে কমে গিয়েছে, ফলে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে এবং খাত-বহির্ভূত সেবা দ্রুত বৃদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জিডিপি'র অংশ হিসেবে সেবা খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় ২০১০ অর্থবছরে ১২.২% এর থেকে ২০১৯ অর্থবছরে মাত্র ৭.৪% এ নেমে আসে (চিত্র ৩.৯)। তথাপি, সেগুলো তৈরি পোশাকের পর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সবচেয়ে বড় উৎস। এই খাত হতে ২০১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিময় উপার্জন ছিল মোট বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার ৩৫%।

চিত্র ৩.৮: সেবা রপ্তানির মূল্য

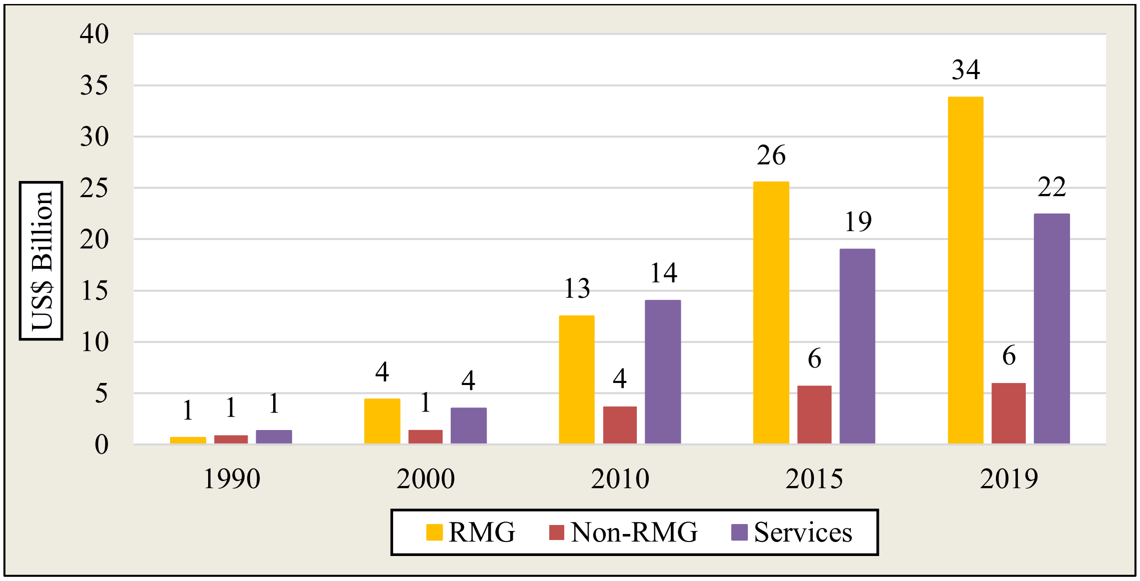

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংক

চিত্র ৩.৯: জিডিপি'র % হিসেবে সেবা রপ্তানি হতে অর্জিত আয়

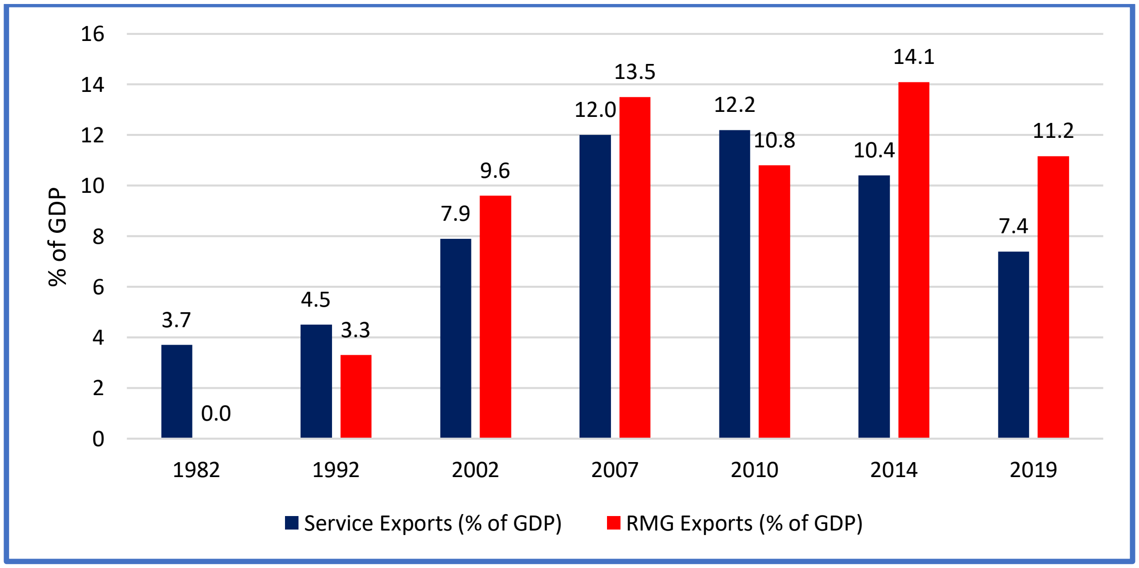

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংক

রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে সেবা খাতের অবদান বেশ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ হলো সেবা রপ্তানি আয়ের সাম্প্রতিক ধ্বস থেকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, সেই সাথে এর ঐতিহাসিক গতিশীল ভূমিকা রক্ষা এবং আরো প্রসারিত করা যায়। বিশেষ করে এনএফএস (NFS) এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বাংলাদেশের খাত সেবা (Factor Service) হতে আয় বাইরের কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কেননা শ্রম শক্তি আমদানিকারক দেশগুলোর অভিবাসন নীতির ওপর নির্ভর করে এ খাতে বাংলাদেশের আয়। উদাহরণস্বরূপ জিএটিএস-(GATS) এর মোড-৪ (Mode-4) এবং এনএফএস (NFS) থেকে উপার্জন সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য। তাই এনএফএস (NFS) এর বৈশ্বিক বাজার বৃহৎ এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা আপেক্ষিকভাবে কম রয়েছে। সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করে বৈশ্বিক এনএফএস (NFS) বাজারের একটা বড় অংশ দখল করা সম্ভব।

৩.৪ উন্নয়নের জন্য রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিত করা

অভিবাসী কর্মীদের আয় ও সঞ্চয় হলো রেমিট্যান্স। এটি নিঃসন্দেহে প্রবৃদ্ধির একটি শক্তিশালী চালক। উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে পণ্য ও সেবা আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বর্ধনশীল চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের লেনদেন ভারসাম্য (Balance Of Payment) বিবরণীতে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ে এর বড় রকমের অবদান রয়েছে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ রপ্তানি খাতের ফ্যাক্টর সেবা থেকে আসে। পণ্য রপ্তানির পর রেমিট্যান্স প্রবাহ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ বৈদেশিক আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। অভিবাসী শ্রমিক [জিএটিএস (GATS) এর মোড-৪ (Mode-4) এর অধীন] এবং তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৃহৎ শ্রম শক্তির মধ্যে অনেক শ্রমিক বিদেশে, প্রধানত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং অন্যত্রও সাময়িক কাজ খুঁজে নেয়। গত তিন বছরে (২০১৭-১৯ অর্থবছর), অভিবাসীদের বিদেশ গমনের সংখ্যা ৭,০০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ মিলিয়নে উপনীত হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের হিসাব মতে আমাদের ৬৫ মিলিয়ন শ্রম শক্তির ১২% (প্রায় ৮ মিলিয়ন) বিদেশে কর্মরত। আরএমএমআরইউ (Refugee and Migritory Movement Research Unit) এর এক হিসাব মতে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা ১১.৫ মিলিয়ন।

তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানির পর রেমিট্যান্স থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে। ২০১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১৬.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার, যা জিডিপি'র ৫.৪% (সারণি ৩.৪)। কোভিড-১৯ মহামারী সত্ত্বেও, রেমিট্যান্স প্রবাহের মাত্রা ২০২০ অর্থবছরে বেশ ভালো ছিল। কিন্তু প্রবাহ প্রবৃদ্ধি মার্চ-এপ্রিল মাসে স্লথ হয়ে পড়ে, তারপর ২০২০ এর জুনে তা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে, ২০১৯ অর্থবছর থেকে ২০২০ অর্থবছরে রেমিট্যান্স থেকে আয় ১০.৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোভিড-১৯ এর কারণে বিদেশে কাজ হারানোর এবং নতুন বিদেশি কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের চিত্র লক্ষ্যণীয়। এটি আশা করা যাচ্ছে যে, বিদেশে কর্মসংস্থানের বাজার ২০২১ এর মধ্যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সরকারও বিদেশে কর্মসংস্থানের গতিশীলতা পুনরুদ্ধারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সারণি ৩.৪: বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ

বছর	রেমিট্যান্স প্রবাহ (ইউএস ডলার মিলিয়ন)	রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৯	৯৬৮৯	
২০১০	১০৯৮৭	১৩%
২০১১	১১৬৫০	৬%
২০১২	১২৮৪৩	১০%
২০১৩	১৪৪৬১	১৩%
২০১৪	১৪২২৮	০%
২০১৫	১৫৩১৭	৮%
২০১৬	১৪৯৩১	-৩%
২০১৭	১২৭৬৯	-১৪%
২০১৮	১৪৯৮২	১৭%
২০১৯	১৬৪২০	১০%
২০২০	১৮২০৫	১১%

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

অন্তঃদেশীয় গবেষণায় দেখা যায় যে, অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ঐসব দেশগুলোর দারিদ্র হ্রাস ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। প্রধানত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এটির অবদান উল্লেখযোগ্য। এই ইতিবাচক প্রভাব অনেকটা বৃদ্ধি পায় যখন রেমিট্যান্স অবকাঠামো ও উৎপাদনশীল সক্ষমতায় বিনিয়োগ করা হয়। সরকারি নীতি পদক্ষেপগুলো এরূপ ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে পারে। বাংলাদেশে অভিবাসন ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ক্ষেত্রে বড় বাঁধাগুলো দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে যাতে আর্থিক সরবরাহ,যথাযথ প্রণোদনা নির্ধারণ, অভিবাসন নীতি সংহতির উন্নতি এবং জনগণের সাময়িক চলাচলের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন সুবিধা ত্বরান্বিত এবং দারিদ্র্য হ্রাস করা যায়।

রেমিট্যান্স দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দরিদ্র পরিবারগুলো প্রত্যক্ষভাবে এই রেমিট্যান্সের সুবিধা ভোগ করে, তাদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য নির্মূল হয়। ইতোমধ্যে রেমিট্যান্স বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসের একটি অধিক স্থিতিশীল উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহ এক প্রজন্ম কিংবা তারও অধিক স্থায়ী হতে পারে এবং সাধারণত একই পরিবারের সদস্যদের কাছে, একই এলাকার প্রতিবেশিদের মধ্যে বা জেলাসমূহের মধ্যে কম বেশি ছড়িয়ে যেতে পারে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধ্বংসাত্মক অবস্থা থেকে উওরণের ক্ষেত্রেও রেমিট্যান্স ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক সহায়তা ও মানব হিতৈষী সাহায্য প্রথমে এই বিপর্যয়ের পর পুনঃগঠনে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই সহায়তা দীর্ঘ-মেয়াদে কার্যকর হয় না। বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও অন্যান্য সহায়তা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরবর্তী পুনঃগঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

যদিও রেমিট্যান্স যথেষ্ট উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার হয়নি, কিন্তু এর ফলে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় অনেকাংশে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেবার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, ঘরের জিনিসপত্র, মেডিকেল ও শিক্ষা সেবা ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে, যা উচ্চ পর্যায়ের আমদানিকৃত উপাদানসহ গৃহসামগ্রী ব্যতিরেকে অধিকাংশ ভোগ্য পণ্য ও সেবা (প্রধানত উপযোগ ও আর্থিক সেবা) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। বিশেষ করে দরিদ্র ও গ্রামীণ এলাকায় এরূপ ভোগ স্থানীয় চাহিদা বৃদ্ধি করে, যার ফলে স্থানীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

যখন রেমিট্যান্স বিনিয়োগযোগ্য সম্পদে রূপান্তরিত হয় তখন সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর সেগুলোর বহুমূখী প্রভাব পড়ে। রেমিট্যান্সের একটি অংশ যখন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয়, তখন তার বহুমুখী প্রভাব বৃহত্তর ও অধিক টেকসই হয়ে উঠে, কারণ সেগুলো আয়ের স্রোতধারা তৈরি করে। বাংলাদেশে গড়ে ১০% রেমিট্যান্স সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা হয়। এটি বাস্তবতা যে, রেমিট্যান্স দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্তর বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, কারণ সেগুলো খামার ও খামার বহির্ভূত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগের জন্য অর্থের মূল উৎস। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় রেমিট্যান্স ক্ষুদ্র ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অদক্ষ কিংবা অনুপস্থিত স্থানীয় ঋণের বাজারকে পাশ কাটিয়ে যেতে সহায়তা করে এবং এটি নতুন উৎপাদনশীল কার্যক্রম শুরু করতে সহায়তা করে। রেমিট্যান্স থেকে সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ফলাফল পেতে, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা লক্ষ্য হবে স্থানীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সিএমএসএমই (CMSME) এর প্রসার এবং উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করতে উন্নয়নের অর্থায়নের উৎস হিসেবে রেমিট্যান্সের একটা চ্যানেল তৈরি করা।

অভিবাসীদের নিকট থেকে রেমিট্যান্সের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ স্থিতিশীল লেন-দেন ভারসাম্য (Balance Of Payment)-র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। দীর্ঘ দিনের পুরোনো বাণিজ্যিক ঘাটতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের চলতি হিসাব বিবরণী রেমিট্যান্স বৃদ্ধির ফলে ইতিবাচক হয়েছে। রেমিট্যান্স ২০১৯ অর্থ-বছরের শেষে ৩৩ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর একীভূতকরণে আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের টেকসইময়তায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবদান রেখেছে।

এরূপ তহবিল বৈদেশিক ঋণের জন্য দেশের ঋণযোগ্যতার উন্নতি ঘটিয়েছে। রেমিট্যান্স "প্রবাসী বন্ড" চালুর ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। এর মাধ্যমে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর সম্পদ উন্নয়ন অর্থনীতিতে এক উদ্ভাবনী কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এটি নতুন বাজারের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়। ভারত-ই হলো প্রথম উন্নয়নশীল দেশ, যে ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংকটকালে প্রবাসী বন্ড চালু করেছিল, কারণ তখন দেশটির ব্যাপক বাণিজ্য ও আর্থিক ঘাটতি ছিল এবং ভারতীয় রুপির উচ্চ মুল্যস্ফিতি ও অবমূল্যায়ন ঘটে। ভারতীয় অভিবাসীদের জন্য এই প্রবাসী বন্ড অল্প সময়ের মধ্যে ১.৬ বিলিয়ন ইউএস ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে করতে সহায়তা করেছিল। সংকট থেকে ভারতের এই পুনরুদ্ধার একটি জটিল প্রক্রিয়া ছিল।

রেমিট্যান্সের সিংহভাগ ভোগের উদ্দেশ্যে কিংবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় কিনা তার ওপর ভিত্তি করে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উন্নয়ন প্রভাবের কার্যকর পার্থক্য ঘটে। রেমিট্যান্সের প্রভাব বিষয়ে গবেষণায় দেখা যায় যে, ভোগের উদ্দেশ্যে রেমিট্যান্সের স্বল্পমেয়াদী প্রভাব রয়েছে এবং এটি অসমতাকে উৎসাহিত করে। কিন্তু, বিনিয়োগে যে রেমিট্যান্স ব্যবহার করা হয় আয়ের ওপর তার দীর্ঘমেয়াদি এবং অধিক সমতাভিত্তিক প্রভাব রয়েছে। এটি বলা হয়ে থাকে যে, যে কোন ধরণের ব্যয়, তা সে ভোগই হোক কিংবা বিনিয়োগই হোক অনেক অর্থনৈতিক লেনদেন সৃষ্টি করে এবং এর ফলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অধিক প্রবৃদ্ধির চাহিদা মানব পুঁজি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও উন্নত পুষ্টির ওপর ব্যয় দারিদ্র্য হ্রাসে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে।

রেমিট্যান্স বিনিয়োগ এবং বহুমূখী প্রভাব: বাংলাদেশে জমাকৃত রেমিট্যান্সের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ভোগ ও কল্যাণে ব্যয় করা হয়। অন্যদিকে, ভূমি, গৃহায়ন কিংবা নতুন উৎপাদনশীল খাতে অল্প পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়। স্পষ্টত, ভূমি ও গৃহায়ন ব্যয় কর্মসংস্থান তৈরি করে, যেমন-ভোগ, শিক্ষা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। এটা দেখা গেছে যে, একটি গোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সবচেয়ে জটিল খাত। যখন রেমিট্যান্সের একটি অংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয়, তখন এর বহুমূখী প্রভাব বৃহত্তর ও টেকসই হয়ে উঠে। কারণ, এটি আয়ের স্রোতধারা তৈরি করে। রেমিট্যান্স গ্রহীতা পরিবারগুলো কৃষিতে অর্থের প্রধান উৎস হিসেবে এটি ব্যবহার করে থাকে। রেমিট্যান্স গ্রহীতাদের আর্থিক পরামর্শ প্রদান আর্থিক খাতে তাদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে, যা দেশের উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। সহজ অভিগম্যতার কারণে রেমিট্যান্স স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তহবিল গঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস, কারণ অদক্ষ অনুশীলন ও জটিলতার কারণে স্থানীয় ঋণ বাজারে বাঁধা তৈরি হতে পারে। রেমিট্যান্স শুধু বাংলাদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে সাহায্য করেছে তাই নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধির ওপরও প্রভাব ফেলেছে। এই কারণে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি ট্রাজেক্টরিতে (Tragectory) রেমিট্যান্সের প্রবাহ ধরে রাখতে যথাযথ নীতি পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। রেমিট্যান্সের পরিমাণ ও কার্যকারিতা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন বিদেশগামী কর্মীদের ধরণ (দক্ষ কিংবা অদক্ষ), বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠানো (সরকারি চ্যানেল যার মাধ্যমে টাকা পাঠানো হয়) এবং সমাজের কল্যাণে কতটা ব্যয় করা হয়। রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে চলে যায়, যা কখনোই প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ পায় না। ব্যবহারের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন কিংবা মানব পুঁজির উন্নয়নে এসব তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করলে দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি লভ্যাংশ আসবে।

রেমিট্যান্স ও রপ্তানি-উন্নয়ন অর্থের দ্বৈত উৎস: ১৯৯০ এর দশক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের দু'টো মাধ্যমের প্রভাব বিবেচনা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একত্রে এগুলো জিডিপি'র ২০ শতাংশ, যা ভোগ, বিনিয়োগ এবং কর্মসৃজনের চালক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যন্ত্রপাতি, পুঁজি দ্রব্য এবং শিল্প কাঁচামালের উচ্চ আমদানি নির্ভর উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ থেকে যে দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য ঘাটতি হয়, তা গত ২০ বছরের মধ্যে ১৩ বছর যাবত চলতি হিসেবের উদ্বৃত্ত প্রদানে বর্ধনশীল রেমিট্যান্স প্রবাহের মাধ্যমে নিয়মিত হচ্ছে। বিনিয়োগের উচ্চ চাহিদাসহ দ্রুত উন্নয়ন অর্থনীতির জন্য চলতি হিসাব উদ্বৃত্ত জাতীয় সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগের ঘাটতি নির্দেশ করে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কয়েকটি বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন হচ্ছে (পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প, রূপপুর পারমানবিক শক্তি প্রকল্প, রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, চট্টগ্রাম-দোহাজারি থেকে রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গান্ডাম রেলওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা মাস ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প), সেগুলোর জন্য ভারী যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতির ব্যাপক আমদানি প্রয়োজন, তা এখন ঋণাত্মক চলতি হিসেবের দিকে বৈদেশিক ভারসাম্য তৈরি করেছে। এটি রেমিট্যান্স, পণ্য রপ্তানি, বাট্টাকৃত সাহায্য, সরবরাহের ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ অর্থায়নের মাধ্যমে পুরন করা হচ্ছে। কিন্তু চলতি হিসেবের ভালো দিক হল তা জাতীয় সঞ্চয়ের ওপর বিনিয়োগের অতিরঞ্জিততা প্রকাশ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আমরা অবকাঠামোগত ঘাটতি পুরনের চাহিদা প্রকাশ করছি। একবার সেতু বন্ধন হয়ে গেলে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রচুর মুনাফা আসবে।

চূড়ান্তভাবে বলা যায় যে, বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা (ODA) এর পাশাপাশি উন্নয়ন অর্থনীতির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি।

রেমিট্যান্সের ওপর আন্তঃদেশীয় গবেষণায় রেমিট্যান্স কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার কিছু উপায় চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে তা দেশের কল্যাণে অবদান রাখবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঐ কৌশলগুলোর কিছু বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে:

- গ্রহীতাদের (এবং প্রদানকারী) সঞ্চয় বৃদ্ধিতে নগদ হস্তান্তরের মাধ্যমে ওয়ালেট টু ওয়ালেট রেমিট্যান্স প্রবাহকে উৎসাহিত করা।
- লালফিতা ও অন্যান্য জটিলতা অবসানের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি করে গ্রহীতাদের রেমিট্যান্সের অর্থ বিনিয়োগে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে, যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি এবং তা ভোগের চেয়ে কম অস্থির।

- আর্থিক খাত ও সরকারি প্রশাসনের দুর্বলতা অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে লেনদেন খরচ চাপিয়ে দেয়। অতএব, লেনদেনের খরচ কমানোর জন্য এসব বিষয়গুলো চিহ্নিত করা উচিত। বাস্তব পরিস্থিতি হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকিং পদ্ধতির অদক্ষতা, চেক ক্লিয়ারেন্সে দীর্ঘসূত্রিতা, বিনিময় ক্ষতি কিংবা লেনদেন খরচের অযথাযথ প্রকাশ, রেমিট্যান্স প্রবাহ কমিয়ে দেয়।
- ব্যাংকিং খাতে প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সাবলিল, দ্রুত এবং অধিক স্বচ্ছভাবে আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করা হবে।
- যে সকল গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকিং সেবার সুযোগ নেই, সে সকল এলাকায় সরকারি পোষ্ট অফিস নেটওয়ার্ক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি করা হবে।
- রেমিট্যান্স সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করলে রেমিট্যান্স প্রবাহের নীতি প্রণয়ন সহজ হবে। এটি করার জন্য মূল নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আর্থিক সেবা প্রদানকারী এবং অভিবাসীদের মধ্যে অভিবাসনের ধরণ, প্রযুক্তি এবং অন্যান্য প্রণোদনার ওপর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- প্রবিধান (Regulations) অবশ্যই সহজ হতে হবে, যাতে নিম্ন আয়ের অভিবাসী পরিবার গুলোর মধ্যে প্রাপ্য আর্থিক পণ্যের প্রাপ্যতায় ব্যাপক সুযোগ ঘটে।

৩.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান কৌশল

গত দশকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ ও রেমিট্যান্স প্রবাহের কার্যকর ব্যবহারের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে একটি কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করার জন্য "বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন, ২০১৩" কার্যকর করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রয়েছে (প্রবাসী কল্যাণ ও প্রবাসী কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬; শ্রমিক অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৭; মজুরি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮; অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বিমার গাইডলাইন, ২০১৯; রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির সিআইপি গাইডলাইন, ২০১৯)। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটি (BMET) এখন প্রত্যেক শ্রমিককে ট্র্যাক করছে যারা বিদেশে গিয়েছে। তবে, ফিরে আসা অভিবাসীদের অনুসরণ করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা এখনও তৈরি হয়নি। এভাবে ফিরে আসা কর্মীদের সেবা ব্যাপকভাবে অব্যবহৃত রয়ে যাচ্ছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড একটি শিল্প উদ্যোগ কর্মসূচি চালু করেছে, যা অভিবাসী কর্মীদের সেবার প্রক্রিয়াকরণ করতে সহায়তা করে।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া গিয়েছে, তা হল-

- বাংলাদেশ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন খাত থেকে যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে। অংশীজনদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস জন্মেছে যে, যদি একটা বড় ধাক্কা দেওয়া যায় তাহলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসনের ক্ষেত্রে দৃশ্যপট আরো উন্নত হতে পারে। অভিবাসন রেমিট্যান্সের বাইরে উন্নয়নে আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।
- অভিবাসন গভর্ন্যান্সের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অভিবাসীদের খরচ ও হয়রানি হ্রাস পাবে। বিকেন্দ্রীকরণ চলমান হতে হবে এবং সকল জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।
- অভিবাসন গভর্ন্যান্সের বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধার বিকেন্দ্রীকরণও বিএমইটি (BMET) এর প্রশিক্ষণ সক্ষমতার উন্নতি বিধান করবে। প্রত্যেক উপজেলায় বিটিটিবির (BTTB) সাথে সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা থাকা উচিত।
- অভিবাসী কর্মীদের জন্য সঠিকভাবে কাজ করতে পিকেবি (PKB)-এর সক্ষমতার জন্য উদ্ভাবনী, অভিবাসনের বিভিন্ন পর্বের সেবা বহুমূখীকরণ, অভিবাসীদের পরিবারকে সেবা প্রদান এবং কার্যক্রমে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের প্রয়োজন।

৩.৫.১ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন বিষয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও বিষয়সমূহ ''রূপকল্প-২০৪১'' থেকে গৃহীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (SDG), আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড (ILS) ও কনভেনশনসমূহ, অভিবাসনের বৈশ্বিক কমপ্যাক্ট (GCM), অন্যান্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ এই কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

রূপকল্প:

প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে শোভন কর্মসংস্থানের (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) সুযোগ সুবিধা থাকা, যা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

উদ্দেশ্য:

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন ফ্রেমওয়ার্কের প্যারাডাইম পরিবর্তন (Paradigm Shift) করা, যাতে এটি দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করে।
- সকল বাংলাদেশী প্রবাসীদের বিশেষ করে নারী অভিবাসীদের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মানবাধিকার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোন অভিবাসন না করা।
- বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়ন চাহিদা বিচক্ষণতার সাথে চিহ্নিত করে বাংলাদেশকে মানব সম্পদের জন্য পছন্দনীয় উৎস একটি দেশ হিসেবে তৈরি করা।
- আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান।
- মন্ত্রণালয় ও এজেন্সিগুলোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অংশীজনদের সাথে নিয়ে কাজ করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা, বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং স্বাগতিক (Host) দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার পর অভিবাসীদের নিরাপদ, আশ্বস্ত ও সুরক্ষা প্রদান।
- অভিবাসীদের টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃসমন্বয়ের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের প্যারাডাইম পরিবর্তন (Paradigm Shift)

২০১৯ সালে পণ্য রপ্তানিতে ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলার অতিক্রম করে, যা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় বাংলাদেশ অবদান রাখছে। ১৬.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারের রেমিট্যান্স প্রবাহ বৈদেশিক মুদ্রার দ্বিতীয় বৃহৎ খাত। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারলে তা অর্থনীতি ও সমাজের জন্য সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনবে। এছাড়া, জনমিতিক লভ্যাংশ ভোগে, ''কর্মহীণ প্রবৃদ্ধির'' চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় উচ্চ অবদান রাখবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান কুটনীতির দশক ঘোষণা এই প্যারাডাইম পরিবর্তনের (Paradigm Shift) মাইল ফলক হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে প্রতিবছর প্রায় ১.৫ মিলিয়ন শ্রম শক্তি যুক্ত হবে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এই অতিরিক্ত শ্রম শক্তির ৫০% এর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

নৈতিক নিয়োগ ও সহমর্মিতা এই মনস্তাত্বিক পরিবর্তনের প্রধান দুটো মানদণ্ড হবে। সকল কারিকুলাম ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রশিক্ষণ সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে দুটো মানদন্ডের ওপর নির্ভর করবে।

প্যারাডাইম পরিবর্তনে (Paradigm Shift) জন্য আমাদেরকে ”শ্রম” শব্দটির দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিতে হবে, যা নিম্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের প্রত্যক্ষকরণ (Perception) করে। যেহেতু প্যারাডাইম পরিবর্তনের (Paradigm Shift) বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন, উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থ-সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান, তাই এটি স্পষ্ট যে, বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা দক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের অভিবাসন সুবিধা প্রদানে সক্ষম নয়। প্যারাডাইম পরিবর্তনের (Paradigm Shift) মধ্যে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয়, যা সমাজের সকল স্তরের সম্ভাবনাময় কর্মীদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ: ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ১০ দফা এজেন্ডা

১. প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি: প্যারাডাইম পরিবর্তনের (Paradigm Shift) জন্য প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা হলো পর্যাপ্ত সক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। বহিঃগমন পূর্ববর্তী সময়, উদ্দিষ্ট দেশে কর্মসংস্থান এবং প্রত্যাবর্তন অভিবাসনের এই তিনটি প্রধান বিভাগের মধ্যে কোন নীতি কাঠামো নেই, যা ফিরে আসা অভিবাসীদের যথেষ্ট সেবা প্রদানে সক্ষম। মন্ত্রণালয় “অভিবাসী কর্মীদের টেকসই পুনঃসমন্বয় নীতি” (Sustainable Reintegration of Migration Policy) গ্রহণের উদ্যোগ নিবে। মন্ত্রণালয় ''ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮'' কার্যকর করার উদ্যোগ নেবে যাতে অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- বিএমইটিকে (BMET) পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নিত করা।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মন্ত্রনালয়ের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দুটি প্রতিষ্ঠানের কাজের ম্যাপিং করা। অনুশাসন ও কার্যক্রমের দ্বৈততা হ্রাস এবং অভিবাসনের ক্ষেত্রে কার্যক্রমের যথাযথ সমন্বয় সাধন করা। মন্ত্রনালয়ের কাছে যে সমন্বিত ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার মাধ্যমে এটি সমন্বয় করা হবে।
- বর্তমান ও নতুন স্বাগতিক (Host) দেশগুলোতে শ্রম বাজারের গতিময়তা অনুধাবন করতে গবেষণা ও বিশ্লেষণ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ করতে শ্রম অভিবাসন বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার সংযোগ থাকবে মন্ত্রনালয়ের গবেষণা উইংয়ের সাথে। এটির মর্যাদা হবে বিআইডিএস (BIDS) কিংবা বিআইআইএসএস (BIISS) এর অনুরূপ। মন্ত্রণালয় বিএমইটি (BMET) এর মধ্যে একটি ”শ্রম বাজার গবেষণা ইউনিট” প্রতিষ্ঠা করবে।
- বর্তমানে অভিবাসন কুটনীতির যুগ শুরু হয়েছে। ১৯৯০ এবং ২০০০ এর দশকে বাণিজ্য কুটনীতির মধ্যে অর্থনৈতিক কুটনীতির উদ্ভব ঘটেছে এবং বাংলাদেশ এই বিদেশী নীতি পুনঃ পরিচিতকরণের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্য কূটনীতিতে আলোচনা চলমান রেখে বাংলাদেশকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান কুটনীতির মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজারের সুবিধা ভোগ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধন। এছাড়াও, বাংলাদেশকে তার পণ্য রপ্তানির জন্য মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোর বাজার অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই বিষয়টিকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে অর্থনৈতিক কুটনীতি ত্বরান্বিতকরণ ক্লাস্টারে নিয়ে আসতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে। বাংলাদেশেকে এফডিআই (FDI) আকর্ষণ করতে বিআইডিএ (BIDA), বিইপিজেডএ (BEPZA) এবং বিএইটিপিএ (BITPA) এই ক্লাস্টারের সাথে কাজ করতে হবে এবং এভাবে কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন এবং রপ্তানি বহুমূখীকরণ ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত হবে।
- অভিবাসন খরচ কমানো এবং শ্রম অভিবাসীদের হয়রানি হ্রাসের বিষয়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অসংখ্য প্রাক-বহিঃগমন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলা থেকে অন্ততঃপক্ষে ১০০০ নাগরিককে বিদেশ পাঠানোর কৌশলপত্রে যে সকল জেলা ইতিমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেসব জেলাগুলোতে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস প্রতিষ্ঠা করবে এবং অধিক অভিবাসন রয়েছে এমন জেলাগুলোতে কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। নিবন্ধন ও স্মার্ট কার্ড বণ্টনের সুযোগ-সুবিধা ৬৪টি জেলায় নিশ্চিত করা হবে। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কাজের ক্ষেত্র/পরিসর রেখাংকিত করতে হবে, যাতে কার্যকরী অভিবাসন, কর্মসংস্থান ও সমন্বয় সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা যায়।
- বর্তমানে ৬৪ টি টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC) এবং ৬টি মেরিন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে এবং ৭০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সকল উপজেলায় টিটিসি (TTC) স্থাপিত হবে। সম্ভাব্য অভিবাসীদের স্থান ত্যাগের পূর্বে যথাযথ এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

২. বাজার সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক অবদান: বর্তমান বৈদেশিক কর্মসংস্থান মোটামুটি ২০ টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য অল্প কয়েকটি দেশে মাঝে মাঝে সুযোগ তৈরি হয়। এই বাজার ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ২.৬ মিলিয়ন থেকে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে প্রায় ৮ মিলিয়ন এ উন্নিত হয়।

- মন্ত্রণালয় ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদেশে অভিবাসনের জন্য উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রেণিতে ন্যুনতম ৫০% রেখে অন্ততঃপক্ষে ৫ মিলিয়ন নতুন শ্রম শক্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। মন্ত্রণালয় ৪টি ভৌগলিক এলাকায় ২০টি নতুন দেশকে টার্গেট করবে। এছাড়া, প্রতিবছর ৩০ বিলিয়ন ইউএস ডলারের গড় রেমিট্যান্স আয়সহ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।
- লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য মন্ত্রণালয় একটি নতুন ”বাজার সম্প্রসারণ টাস্কফোর্সের” (Market Expantion Task-Force) মাধ্যমে ”বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার সম্প্রসারণ রোডম্যাপ” (Overseas Employment Market Expantion Road-map) চালু করবে।

৩. দক্ষতার উন্নয়ন: প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং যোগ্যতার স্বীকৃতির ইতিবাচক ফলাফলের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্ম-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এর সাথে সমন্বয় করে দক্ষতা উন্নয়ন নির্দেশক প্রস্তুত করা, যা অন্যান্য অংশীজনদের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ব্যবস্থা করবে।

- এই মেয়াদে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA), বাংলাদেশ টেকনিক্যাল শিক্ষা বোর্ড এবং ভবিষ্যৎ কাজের ল্যাব (Future Of Work Lab) এর সঙ্গে কাজ করতে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিবে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে মন্ত্রণালয় প্রত্যেক উপজেলায় টিটিসি (TTC) প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে সম্ভাব্য অভিবাসীরা ঘরের বাইরে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রশিক্ষণে যেতে পারে।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষে অন্ততঃপক্ষে ২০টি দেশের জন্য পারস্পরিক দক্ষতার স্বীকৃতি ও দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- মন্ত্রণালয় নতুন দক্ষতাভিত্তিক গ্রেডিং ব্যবস্থায় (NTVQ) ঐতিহ্যবাহী ৪টি স্তরের শ্রেণিতে (কম দক্ষ, আধা দক্ষ, দক্ষ এবং পেশাজীবী) পরিবর্তন করে "অভিবাসীর জন্য দক্ষতা শ্রেণি বিভাগের নীতি" প্রণয়ন করবে। নতুন শ্রেণিকরণ পদ্ধতি বিষয়ে অভিবাসীদের পুনরায় শ্রেণিকরণ করে বিএমইটি (BMET) কর্তৃক পেশাজীবী ডেটা-বেইজ তৈরি করবে। সিওডি (COD) এর বাৎসরিক পর্যালোচনা করা হবে, যাতে ন্যায্য মজুরি হার প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং দক্ষ কর্মীদের আলাদা করা যায়।
- মন্ত্রণালয় বহির্গমন অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্মার্ট কার্ড ইস্যু করার মাধ্যমে দক্ষতা মূল্যায়ন ও সনদ চালু করবে। অভিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ডের মূল্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সাথে মন্ত্রণালয় ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে, যাতে সিওডি (COD) এর মধ্যে বাংলাদেশের টিভেট (TVET) এর গুণগত মানের স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে।

৪. সেবার অভিগম্যতা

- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ডিজিটাল অবকাঠামোর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্ভাব্য অভিবাসীদের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা চালু করবে।
- জাতীয় অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয় করে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে ।
- তথ্য অভিগম্যতা হলো অভিবাসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে অবগত হওয়ার চাবিকাঠী। মন্ত্রণালয় দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং এনটিভিকিউ (NTVQ) যোগ্যতার জন্য যোগাযোগ কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে এবং সম্ভাবনাময় অভিবাসীদের নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক উন্নততর তথ্য প্রদান করবে।
- গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীদের কাজে অন্তর্ভুক্ত রাখার সুযোগ রেখে দেশের এবং বিদেশের অভিবাসী কর্মীদের সেবা অভিগম্যতার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের (PPP) উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- উন্নয়ন অংশীদারদের সহায়তায় অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে কল সেন্টার, অভিযোগ প্রশমন ব্যবস্থা ইত্যাদি। মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) মাধ্যমে এই সেবাসমূহকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) সাথে যুক্ত করে মূল ধারায় নিয়ে আসবে।

৫. আর্থিক অভিগম্যতা

- সকল প্রকার বাঁধা দূর করতে মন্ত্রণালয় পিকেবির (PKB) সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক উপজেলায় এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটসহ শাখার নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা। পিকেবি (PKB) অভিবাসী শ্রমিকদের পরিবারগুলোর নিকট ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছাতে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মত ব্যাংকিং সেবা ও ডিজিটাল ব্যাংকিং চালু করবে।
- নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য অভিবাসী কর্মীদেরকে ২% নগদ প্রণোদনার একটি অগ্রগতিমূলক ব্যবস্থা সরকার চালু করেছে। এর ফলে বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য সরকার বিমা সেবা চালু করেছে। বিমা সেবার পরিসর ও সময় সীমা ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বৃদ্ধি করা হবে।

- দেশ ত্যাগের পূর্বে অভিবাসীদের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা ও রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে মন্ত্রণালয় সর্বাত্মক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। অভিবাসীদের পরিবারে রেমিটেন্সের লাভজনক ব্যবহার বিষয়ে অবগত থাকার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৬. সুরক্ষা, অধিকার ও কল্যাণ

- বাংলাদেশের সংবিধান দেশে কিংবা বিদেশে অবস্থানরত সকল নাগরিকের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করছে [বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৩৫(৫)]। সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা বিষয়ক ১৯৯০ সালের আন্তর্জাতিক কনভেনশনের (International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Worker and Member of their Families 1990) স্বাক্ষরকারী হিসেবে ''বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধমে অভিবাসন আইন, ২০১৩'' এবং ''প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬''-এর মাধ্যমে ঐ কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অভিবাসীদের বিশেষ করে নারী অভিবাসীদের সুরক্ষা, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালী করার জন্য মন্ত্রণালয় অর্থ বরাদ্দ করবে।
- এই মেয়াদে অন্যতম সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হচ্ছে অনিবাসি বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে স্বাগতিক দেশগুলোতে নতুন অভিবাসীসহ অভিবাসীরা যে সকল সমস্যা মোকাবেলা করছে তার আইনগত সুরক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সহায়তা করা যায়। মন্ত্রণালয় বিদেশে অবস্থানরত এবং ফেরত আসা কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং এনজিওদের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করবে।
- মন্ত্রণালয় দেশীয় শ্রম বাজার পুনঃসমন্বয় করতে (উদ্যোক্তা সৃষ্টির দক্ষতা প্রশিক্ষণ, চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করা, এবং দক্ষতার মূল্যায়ন) ফেরত আসা অভিবাসী কর্মীদের একটি প্যাকেজ সহায়তা চালুর পরীক্ষা করবে।
- মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক রিক্রুটমেন্ট সমন্বয় পদ্ধতি (IRIS) চালুর মাধ্যমে দেশে ও স্বাগতিক দেশে রিক্রুটিং এজেন্সির বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এছাড়া, অভিবাসনের খরচ হ্রাস করতে এবং অভিবাসীদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- বাংলাদেশের কৌশল হবে নতুন বাজার অন্বেষণ করা এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন অভিবাসনের সুযোগ সুবিধা প্রদান, কিন্তু আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রেক্ষিতে মজুরি, অধিকার ও সুরক্ষার শর্ত পূরণ না হলে কোন অভিবাসন করবে না।

৭. ডিজিটালাইজেশন

মন্ত্রণালয় সকল বিদ্যমান সেবার ম্যাপিং তৈরির উদ্যোগ নিবে এবং এর কার্যকারিতা ও পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করবে। ২০২৫ সালের মধ্যে সমস্ত অভিবাসন প্রক্রিয়া অভিবাসন কর্মীদের জন্য সহজে ব্যবহারোপযোগী ইন্টারফেসের মাধ্যমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা চালু করা হবে।

- মন্ত্রণালয় শ্রম অভিবাসন তথ্য উপাত্ত কৌশল প্রণয়ন করবে, যাতে করে দেশে বিদেশে সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিকে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য তথ্যে অংশগ্রহণ করে উত্তম কৌশল নির্ধারণ এবং উত্তম সুরক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সেবা সরবরাহ করা যায়। তথ্য উপাত্ত কৌশলের মধ্যে কী কী থাকবে তার একটি উদাহরণ হলো ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (CMIS), এর মাধ্যমে বিএমইটি (BMET), টিটিসি (TTC), অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর কর্তৃক দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্সের পর্যায়, কোর্সের ধরণ, কোর্সের নাম, প্রতিষ্ঠান, জেলা, জেন্ডার এবং ফলাফলের ভিত্তিতে সকল তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে। দক্ষতা মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতির প্রচেষ্টা ও কর্মাকৃতির স্বীকৃতির জন্য এমআইএস (MIS) সাহায্য করবে।
- যথাযথ নকশা প্রণয়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ই-শিক্ষণ কর্মসূচি উদ্বোধন করবে, যার মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীরা দূরবর্তী শিক্ষণের সহায়তা নিয়ে নবাগতদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৮. বেসরকারি খাত এবং অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তকরণ

- মধ্যস্বত্তভোগীদের জবাবদিহিতার নিশ্চিতকল্পে মধ্যস্বত্তভোগীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরো সঠিক ধারায় নিয়ে আসার জন্য মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এই কর্মসূচির ফলাফল হবে অভিবাসনের খরচ কমানো।

- বেসরকারি খাত বৈদেশিক অভিবাসনের প্রধান চালিকাশক্তি, এই বিষয়টিকে স্বীকার করে মন্ত্রণালয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করবে যাতে কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের সক্ষমতা ও বিশেষায়নের দিক থেকে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা না করে এবং পরিপূরক হয়।
- দক্ষ কর্মীদের অভিবাসনের উন্নতি বিধান, সুরক্ষার অধিকার এবং লাভজনক অভিবাসন নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যকরী উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিচালনা করা।
- মন্ত্রণালয় একটি "নৈতিক রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতি (Ethical recruitment)" প্রণয়ন করবে এবং বিএআইআরএ (BAIRA) তা বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ করবে।
- অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকারের জন্য "কূণ্য রিক্রুটমেন্ট খরচ (Zero Recruitment Cost Migration)" (নিয়োগকারী কর্তৃক অর্থ প্রদানের মডেল) এবং প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার (Every Citizen's Right Matter) বিষয়ে স্বাগতিক দেশ ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের জন্য কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার ও অংশীজনদের একত্রিকরণে মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব প্রদান করবে।

৯. অভিবাসন খরচ

- মন্ত্রণালয় চাকরি দাতা, রিক্রুটিং এজেন্সি এবং সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে "সাশ্রয়ী রিক্রুটমেন্ট খরচ অভিবাসন (Low recruitment cost migration)" কে লক্ষ্য করে ৫ বছর মেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করবে ।
- মন্ত্রণালয় বিওইএসএল (BOESL) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যাতে নতুন বাজার এবং বিদ্যমান বাজারের সম্প্রসারণ করা যায়, যা বাজারভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে অভিবাসন ব্যয়হ্রাস করবে এবং ব্যয় কমানোর জন্য প্রতিযোগিতা বাড়াবে।

১০. পুনঃসমন্বয়

- মন্ত্রণালয় "অভিবাসী কর্মীদের টেকসই পুনঃসমন্বয় নীতি" গ্রহণের উদ্যোগ নেবে। মন্ত্রণালয় "ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নীতি, ২০১৮" কার্যকর করবে, যাতে অভিবাসী কর্মীদের লাভের অংশ তাদের কাছে পৌঁছে। মন্ত্রণালয় ফেরত আসা অভিবাসীদর পুণঃসমন্বয়ের জন্য একটি মানসম্মত অপারেটিং প্রক্রিয়া (SOP) গ্রহণ করবে, বিশেষ করে নারী অভিবাসীদের জন্য।
- মন্ত্রণালয় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং আন্তঃএজেন্সি/বিভাগ রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে ফেরত আসা কর্মীদের টেকসই পুণঃসমন্বয়ের জন্য এবং ফিরে আসা অভিবাসীদের জন্য একটি সহায়তা প্যাকেজ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়। এর মধ্যে থাকবে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পুনঃসমন্বয়, উদ্যোক্তামূলক দক্ষতার প্রশিক্ষণ, চাকরি প্রদান এবং দক্ষতা মূল্যায়ন, যাতে দেশীয় শ্রমবাজারে তাদের পুনঃসমন্বয়ে সহায়তা করা যায়।
- ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নতুন পদ্ধতি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ডিপোজিট স্কিম চালু করা। এর ফলে রেমিট্যান্স গ্রহণে ব্যাংকের খরচ কমাবে এবং অভিবাসী শ্রমিকদের হিসেবে টাকা জমা হবে। ডিপোজিট স্কিমটি ফেরত আসা অভিবাসীদের নিজেদের সহায়তা করবে এবং তার নিজের প্রচেষ্টা গ্রহণে সহায়তা এবং পুনঃসমন্বয়ের সুযোগ তৈরি হবে।
- স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান, মানসিক সহায়তা, দক্ষতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণসহ ফেরত আসা অভিবাসীদের পুনঃসমন্বয় সেবা প্রদানে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কর্যালয় ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোড এর সক্ষমতা তৈরি করা হবে।

৩.৬ সেবা খাতে উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ

কর্মসৃজন, রপ্তানি বৃদ্ধি, আয় সহায়তা ও দারিদ্র্য হ্রাসে সেবা খাতের অতীতের উল্লেখযোগ্য কর্মাকৃতি উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অসাধারণ অর্জন সত্ত্বেও এখনো বাংলাদেশের উন্নয়নে এই খাতের অবদান আরো বৃদ্ধির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে প্রবৃদ্ধি ও সমতার দিক থেকে। ২০৩১ সালের মধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয় থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন সেবা খাতের গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশের কাঙ্খিত যাত্রার সফল সমাপ্তি করার জন্য প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা হবে।

এই অভিযাত্রায় সুযোগ সুবিধা প্রদানে বেশ কিছু বিষয় ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা প্রয়োজন। প্রথমত, সেবা খাত আধুনিকায়নে কিছুটা অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এতে এখনো অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলীর প্রাধান্য রয়ে গেছে, যার উৎপাদনশীলতা ও আয় উভয়ই কম। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় এ ধরণের নিম্ন-উৎপাদনশীল ও নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক সেবায় কৃষি বহির্ভূত শ্রম শক্তির অনেকটাই জড়িত। এসব শ্রম শক্তির বেশির ভাগ দরিদ্র। দ্বিতীয়ত, সেবা খাতের দক্ষতা ভিত্তি নিম্ন, আর এ কারণেই সেখানে নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও নিম্ন আয়ের অনানুষ্ঠানিক প্রাধান্য বজায় রয়েছে। তৃতীয়ত, শ্রম সেবা রপ্তানি থেকে আয় বেশ ভালো হলেও অন্যান্য সেবা থেকে রপ্তানি আয় সেগুলোর সম্ভাবনা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম। চর্তুথত, একটি আধুনিক ও গতিশীল সেবা খাতের সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করতে আধুনিক সেবা সম্প্রসারণের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন।

৩.৬.১ সেবা খাতের কাঠামো

সারণি ৩.৫ এ সেবা খাতের কাঠামো দেখানো হয়েছে। বাণিজ্য হলো প্রভাবশালী সেবা কার্যক্রম, যা ১৯৭৪ অর্থবছর ও ২০১০ অর্থ-বছরের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জিডিপি'তে এর অংশ ১৪ শতাংশে পৌঁছায়। তখন থেকে জিডিপি'তে এর অংশ প্রায় ১৪ শতাংশে স্থিতিশীল হয়ে মোট জিডিপি'র মতো একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যিক কার্যাবলীর বর্ধনশীল গুরুত্ব এভাবে নিরূপন করা যেতে পারে যে, ২০১৯ অর্থ-বছরের জিডিপি'র অংশ ইতোমধ্যেই কৃষি ও বনের মিলিত জিডিপি'র অংশকে ছাড়িয়ে গেছে। এ খাতটি অত্যন্ত নমনীয় ও বেশ উদার প্রকৃতির। এখানে প্রবেশ/প্রস্থান কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকায় ব্যবসা সম্পর্কিত কার্যাবলীর প্রসারণে তা প্রভূত সহায়ক হয়। বিনিয়োগ চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম এবং সেই সাথে নমনীয় হওয়ায় প্রাপ্তব্য অর্থায়নের সাথে তা সহজেই সমন্বয় করা যায়। গ্রামীণ কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থান ও আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো বাণিজ্য।

সেবা খাতের অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি পর্যায়ে বিস্তৃত সেবা। ১৯৭৪ অর্থ-বছরের ৬.২ শতাংশ থেকে জিডিপি'র অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ অর্থবছরে ১১.১%-এ পৌঁছে। ২০১৯ সালে জিডিপি'র অংশ ৮.২ শতাংশে নেমে আসে। ব্যক্তিগত সেবার বিস্তার ঘটেছে রেমিট্যান্সের উদার প্রবাহ থেকে। বাংলাদেশের সকল শহরে, বিশেষ করে উচ্চ আয়ের মেট্রোপলিটান ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগর দু'টিতে ব্যাঙের ছাতার মতো অনেক ব্যক্তিগত সেবার জন্য চাহিদা সৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মোটর গাড়ির চালক, পানির মিস্ত্রি (প্লাম্বার), জুতা-মেরামতকারী, অনানুষ্ঠানিক বিদ্যুৎ মিস্ত্রী, দর্জী, গৃহকর্মী, ফুল ব্যবসায়ী, কেশ বিন্যাসকারী, বিউটি পার্লার ও এ জাতীয় অন্যান্য সেবা। এই সেবাগুলোর জন্য চাহিদার উচ্চ আয় স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) আর সেই সাথে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় এটি হয়ে উঠেছে আয় ও কর্মসংস্থানের একটি প্রাণবন্ত উৎস। ২০১৫-১৬ এর শ্রম শক্তি জরিপের (LFS) মজুরি সংক্রান্ত উপাত্তে দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং-এ গড় মজুরির তুলনায় পরিবার বহির্ভূত অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের গড় মজুরি বেশি (বিবিএস, ২০১৭)। বাণিজ্যের ক্ষেত্রের মতো কোন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা না থাকায় কর্মসংস্থান বাজারের বদৌলতে এর কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে।

সারণি ৩.৫: চলতি মূল্যে সেবা খাতের কাঠামো (জিডিপি'র %)

কার্যক্রম	১৯৮০ অর্থ-বছর	১৯৯০ অর্থ-বছর	২০০০ অর্থ-বছর	২০১০ অর্থ-বছর	২০১৯ অর্থ-বছর
বাণিজ্য	১২.৯২	১২.২৮	১৩.৩০	১৪.০	১৩.৩৪
পরিবহন	১০.৪২	৯.৫৩	৭.৪৯	৯.০১	৮.২৪
টেলিযোগাযোগ	০.২৩	০.৪	০.৬৮	১.৫৬	১.১০
আর্থিক সেবা	১.৩১	১.৩৮	১.৭৫	৩.০৮	৩.৮৯
রিয়েল এস্টেট	৮.৭০	৮.৫৪	৯.৪৮	৭.১৫	৭.৮৭
জন প্রশাসন	১.৪০	২.০৫	২.৮৫	৩.৩৪	৪.০৯
শিক্ষা	১.৯৮	১.৮৮	২.৪৩	২.৪০	৩.০২
স্বাস্থ্য	২.৩৩	২.২৯	২.১২	২.০১	২.১৫
হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	০.৫৭	০.৫৯	০.৬	০.৯২	১.০৪
ব্যক্তিগত ও কমিউনিটি সেবা	৭.৯৫	৯.৩৫	১২.২২	১২.৫৭	১০.৭৮
মোট সেবা	**৪৭.৮১**	**৪৮.২৮**	**৫২.৯১**	**৫৬.০৫**	**৫৫**

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

সারণি ৩.৬: পরিবহন খাতের গঠন (জিডিপি'র %)

যাতায়াত পদ্ধতি	১৯৮০ অর্থ-বছর	১৯৯০ অর্থ-বছর	২০০০ অর্থ-বছর	২০১০ অর্থ-বছর	২০১৯ অর্থ-বছর
স্থল পথ	৫.৩	৬.২	৬.৪	৭.৩	৭.০
নৌপথ	২.৫	২	১.১	০.৯	০.৭
আকাশ পথ	০.১	০.২	০.২	০.১	০.১
স্টোরেজ ইত্যাদি	০.২	০.৩	০.৪	০.৬	০.৬
মোট পরিবহন	**৮.১**	**৮.৭**	**৮.১**	**৮.৯**	**৮.৪**

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তৃতীয় প্রধান সেবা খাত হলো পরিবহন। ১৯74 অর্থবছর এবং ১৯৮০ অর্থ-বছরের মধ্যে দ্রুত সম্প্রসারণের পর পরিবহন খাতের গড় অবদান ভালো ছিল না। সারণি ৩.৬ এ পরিবহন খাতের প্রধান উপাদানগুলো প্রদর্শিত হলো। স্থল পরিবহনের অবদান বেশ ভালো, যা সামগ্রিক জিডিপি'র চেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে নৌ ও বিমান পরিবহনের অর্জন খুব ভালো নয়। এমনকি স্থল পরিবহনের সড়ক অবকাঠামো ও রেল সেবার অগ্রগতিতে বেশ বড় ধরণের কিছু সমস্যা রয়েছে।

নৌ-পরিবহনের দ্রুত অবনমন পুঞ্জীভূত অবহেলারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশে বিশাল নৌ-পথ সুবিধা বিদ্যমান, যেখানে গ্রামীণ জনগণের চলাচলে ও পণ্য প্রবাহে নদীপথে পরিবহন সেবা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটি গ্রামীণ দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য হ্রাসের একটি গতিশীল উৎসও হতে পারে। সড়ক নেটওয়ার্কের বর্ধনশীল চাপসহ রেল কার্গো সেবার সীমিত সামর্থ্যের প্রেক্ষাপটে নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে যে পরিবেশ বান্ধব বিশাল বিকল্প সুবিধা রয়েছে তা সঠিকভাবে অদ্যাবধি ব্যবহার করা হয়নি।

বেশ কিছু কারণে নৌপরিবহন সফল না হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, ব্যাপকভাবে পলি জমে অনেকগুলো নৌ-পথের নাব্যতা হারানো। এগুলোকে অধিকতর নাব্য করে আধুনিক নৌ-জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে নদীগুলোকে ড্রেজিং এর জন্য বিশাল বিনিয়োগ প্রয়োজন। দ্বিতীয় বড় কারণ হলো দুর্ঘটনা থেকে কার্গোসহ যাত্রীদের সুরক্ষা দানের ক্ষেত্রে উন্নতমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা। অনেকগুলো নৌ-জাহাজের নৌ-পথে চলাচলের মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। এছাড়াও, 'ওভার-লোডিং'-এর পৌনঃপুনিকতাও অত্যন্ত ব্যাপক। পর্যাপ্ত মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের অভাবে নিরাপত্তার মানগত দিকগুলো ঘন ঘন লংঘন করা হয় ফলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সেই সাথে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ হেতু নৌ-ট্র্যাফিকের একটি বড় অংশই স্থল পরিবহনে ফিরে আসার কারণে জানজট সমস্যা আরো জটিল হয়। তৃতীয় সমস্যা হলো, কার্গো ধারণ সামর্থ্যসহ নদীবন্দরের অপর্যাপ্ততা। দক্ষ মনিটরিং ও মানসম্মত নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সহযোগে নদীগুলোর ড্রেজিং ও নদীবন্দরে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা গেলে তা শুধু নৌ-পরিবহনের মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে না, বরং সেই সাথে বেসরকারি বিনিয়োগ ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধিতেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই ঘাটতি দূর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হলো, জাতীয় বাহন বাংলাদেশ বিমানের দুর্বল অবদান। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় পর্যায়ে বিমান পরিবহনের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি, সামর্থ্যগত সীমাবদ্ধতা ও ব্যবস্থাপনার দূর্বলতার কারণে জাতীয় যানবাহনটির মান নিম্নমূখী, সেই কারণে বহন ক্ষমতা, আস্থা ও সেবার গুণগত মান দুর্বল রয়ে গেছে। এর ফলে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ভ্রমণের জন্য চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেলেও এ প্রতিষ্ঠানটি এটি তেমন কোন সুফল আদায় করতে পারছে না। বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বাজারের বড় অংশই দখল করে রেখেছে উচ্চ-কর্মক্ষমতা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক বাহনগুলো। অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের পথে সরকার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বেসরকারি বিমান চলাচলের অনুমতি দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এখানে বড় সমস্যা হলো বিনিয়োগের অভাব। বিমান সেবা উচ্চ মাত্রায় পুঁজিঘন সেবা এবং এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা। এগুলোর অভাবে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এই খাতে প্রবেশ করতে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি বিনিয়োগকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। অভ্যন্তরীণ বিমান সংযোগের অপর্যাপ্ততার সাথে অত্যধিক ঘিঞ্জি স্থল পরিবহন যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

জিডিপি'র অংশ হিসেবে রিয়েল এস্টেট খাত সেবা খাতের চতুর্থ অবদানকারী। ১৯74 অর্থবছর থেকে এর গতি সাধারণভাবে উর্ধ্বগামী এবং স্বাধীনতার পরে প্রথম ১০ বছর এই খাতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ফলে জিডিপি'তে এর অংশ ১৯74 অর্থ-বছরের 4.9 শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯80 অর্থবছরে ১0.২ শতাংশে উন্নিত হয়। রেমিট্যান্স প্রবাহ থেকেও রিয়েল এস্টেট খাতের কর্মকাণ্ড

গতিশীল হয়। এছাড়াও, ক্রমবর্ধনশীল নগরায়ণের সাথে নগর গৃহায়ন ও নগর অফিস ভবনাদির চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও রিয়েল এস্টেট সেবার সরবরাহ পর্যাপ্ত ছিল এবং এ খাতের বাজার প্রতিযোগিতামূলকভাবে কাজ করছিল, তবে ২০০৭-১০ মেয়াদে উচ্চ ব্যয়ের নগর গৃহায়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হয়, যার ফলে বাজার অস্বাভাবিক তেজী ছিল। রিয়েল স্টেট মূল্য এবং নগর গৃহায়ন ভাড়া এই অস্বাভাবিক তেজী ভাবকে কমিয়ে এনেছে, ফলে রিয়েল এস্টেট কার্যক্রমের প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা এসেছে এবং জিডিপি'তে এর অংশ ২০১৯ অর্থবছরে ৬.১% এ নেমে আসে।

উপরন্তু, দুটি বড় নীতিগত সমস্যার কারণে আধুনিক ও দক্ষ রিয়েল এস্টেট বাজারের উদ্ভব ঘটেনি। এর প্রথমটি হলো গৃহ ঋণ মর্টগেজ সেবার অপ্রতুলতা এবং দ্বিতীয়টি হলো অঞ্চল চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত প্রবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা। দীর্ঘমেয়াদি গৃহ মর্টগেজ অপ্রতুলতার কারণে গৃহায়ন সেবার জন্য কার্যকর চাহিদা হ্রাস পায়, অপরদিকে জোনিং আইনের অকার্যকারিতার ফলে রিয়েল এস্টেট সেবার মান ক্ষুন্ন হয় এবং অধিক পরিমাণে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট সেবার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে তা নগর উন্নয়নের দুর্বলতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও জিডিপি'তে নিম্ন অবদান এসব সেবার নিম্ন গুণগত মানের প্রসারকে প্রতিফলিত করে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয় খাতে বেসরকারি উদ্যোগের যথেষ্ট অংশগ্রহণের ফলে সার্বিক কার্যাবলীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি এবং সেবার গড় মান ও উপকরণে তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার অপর্যাপ্ততা মানসম্মত ও উচ্চ মূল্য সংযোজনমূলক সেবা রপ্তানি বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিমার মতো আধুনিক স্বাস্থ্য অর্থায়নের বিকল্পের অভাব স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যের স্বাস্থ্য সেবা দ্রুত বিস্তারের পথে আরেকটি বড় অন্তরায়।

উল্লেখযোগ্য আরেকটি সেবা খাত যা সরাসরি সেবা খাতের মূল্য সংযোজনে প্রতিফলিত হয় না, তা হলো পর্যটনের ভূমিকা। এর প্রধান কারণ পর্যটনের সরাসরি প্রভাব পরিশোধন-বিবরণীতে (Service Account) ভ্রমণ ব্যয়ের রশিদ (Travel Receipt) আকারে গৃহীত হয়ে থাকে। অথচ এর বিপুল পরোক্ষ প্রভাব পড়ে ভ্রমনকালে পর্যটককে যে ব্যয় করতে হয় তার ওপর। যেমন- ভ্রমণ ব্যয়, হোটেল, খাদ্য, স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ও সেবা ইত্যাদি। উপরন্তু, পর্যটনের কিছু পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে, যেমন- ভ্রমণ, হোটেল, খাদ্য এবং অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয়। অর্থনীতিতে পর্যটনের বহুমুখী প্রভাব অনেক ব্যাপক ও বিশাল হতে পারে, যেমনটি ঘটেছে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে।

৩.৬.২ সেবা খাত কার্যক্রমের আধুনিকায়নের সন্ধানে

বাংলাদেশের সেবা খাতের কাঠামো ও বিবর্তন পর্যালোচনা করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যম আয়ের দেশের অর্থনীতিতে জিডিপি'র অংশ হিসেবে সেবা খাতের আপেক্ষিক আকৃতি যেরূপ হওয়ার প্রয়োজন বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছেছে। কারণ জিডিপি'তে এ খাতের অংশ ৫০% এর সামান্য বেশি (চিত্র ৩.১ খ)। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি তা নয়। যদিও সেবা খাতে জিডিপি'তে অবদান ৫১%, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবুও সেবা কার্যক্রমের অনেকটাই মজুরি কর্মসংস্থানের ধরণ ছাড়াই অনানুষ্ঠানিক সিএমএসই (CMSE) কার্যক্রমের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই ধরণের মজুরি কর্মসংস্থান শিল্প কিংবা আনুষ্ঠানিক সেবা, যেমন- ব্যাংকিং ও অর্থ, শিক্ষা এবং জনপ্রশাসনের মতো খাতে পাওয়া যায়। এলএফএস (LFS) ২০১৬-১৭ অনুসারে, সেবা খাতে নিয়োজিত প্রায় ৭১.৮% কর্মশক্তি অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সেবার কাঠামোগত পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো সেবা কার্যক্রমের প্রসার ও আধুনিকায়ন, যাতে সেবা খাত দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতির একটি উৎপাদনশীল ও গতিশীল অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটি আধুনিক ও দক্ষ সেবা খাত শিল্প ও কৃষিতে ফলাফল (Output) ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে কার্যকরী মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারে।

আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান ও শিল্পসহ এই খাতকে প্রভাবশালী আধুনিক ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। আধুনিকায়ন ধীরে ধীরে বিস্তৃত পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এমন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা আছে যেগুলো সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে উল্লেখিত হারে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে (উদাহরণস্বরূপ, আইসিটির এবং অনলাইন সেবার ব্যাপক ব্যবহার, মোবাইল টেলিফোন, কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক সেবা ইত্যাদি)। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের চলমানতা এতো দ্রুত যে, বাংলাদেশে যেভাবে আমাদের জীবনযাপন এবং ব্যবসা পরিবর্তিত হচ্ছে, সে সব ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে না।

সেবা খাতের আধুনিকায়নের পথে এখনো অনেক দূর যেতে হবে। আনুষ্ঠানিক সেবা খাতের প্রথাগত সংজ্ঞা ছাড়াও জনপ্রশাসন, জনস্বাস্থ্য এবং গণশিক্ষাসহ সেবার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুবিধার মিশ্রণ রয়েছে। অন্যদিকে, উপাত্তের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি, যা সেবা খাতের আধুনিকায়নের ব্যাপ্তি সম্পর্কে পূর্ণ অনুধাবনের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করে। এই সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে আধুনিকায়নের সংজ্ঞাকে আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে আনুষ্ঠানিক সরকারি খাত এবং অসংখ্য বেসরকারি খাতের বৃদ্ধিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়; যেগুলো সুসংগঠিত এবং সরকারি নিবন্ধনকৃত; যা অধিক দক্ষতা নির্ভর; এবং যেখানে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় ও অধিক পুঁজি ঘন। এই কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে টেলিকম ও আইসিটি, ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা, বিমান চলাচল শিল্প, আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহন, আতিথেয়তা শিল্প (হোটেল ও রেঁস্তোরা) এবং আধুনিক সংরক্ষণাগার ও পরিবহন সহায়ক সেবা। এই সকল কর্মকাণ্ডের প্রতিটিরই রয়েছে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা, যা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রকম চাহিদা মেটাতে পারে।

চিত্র ৩.১০ এ উচ্চ সম্ভাবনাময় আধুনিক সেবা কার্যক্রম বিস্তারের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯০ অর্থ-বছরে এ নিম্ন ভিত্তিমূল্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সেবা ও বিমান পরিবহন ছাড়া সকল সেবাই জিডিপি'র চেয়েও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে আর্থিক খাত অত্যন্ত ভালো করেছে এবং এর জিডিপি অংশেও অর্জিত হয়েছে দ্রুত প্রবৃদ্ধি। এছাড়াও, সংরক্ষণাগার ও পরিবহন সহায়তা সেবা এবং টেলিকম/ আইসিটি সেবার অবদানও বেশ সন্তোষজনক। তবে, সম্ভাবনার তুলনায় আইসিটি ও টেলিকম সেবার অবদান বেশ কম। অনুরূপভাবে, আন্তর্জাতিক শিপিং-এর অবদানও আশানুরূপ নয়। আতিথেয়তা সেবার প্রবৃদ্ধি এর ক্ষুদ্র ভিত্তি মূল্য থেকে শুরু করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গতি বৃদ্ধি হলেও সম্ভাবনার তুলনায় এটিরও অবদান সন্তোষজনক নয়। অভ্যন্তরীণ বিমান ভ্রমণের সাথে এটিও পর্যটন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় বাঁধা। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে স্বাস্থ্য সেবা একটি অন্যতম গতিশীল ও উচ্চ মূল্য সংযোজিত কার্যক্রম।

সেবা খাত আধুনিকায়নের ইতিবাচকভাবে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত সেবার প্রভাব রাখতে শুরু করেছে। এভাবে, আধুনিক সেবার অংশ জিডিপি'তে ১৯৯০ অর্থবছরর ১৮ শতাংশ থেকে ২০১৯ অর্থবছরে ৫৯ শতাংশে উন্নিত হয়েছে (চিত্র ৩.১১)। এই প্রবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেসরকারি খাত পরিচালিত আধুনিক সেবা থেকে এসেছে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে অর্থ ও প্রযুক্তি। এতদসত্ত্বেও, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশজ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার দিক থেকে এই সকল সেবার অনেকগুলোর অবদান আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে ব্যাপক বৈশ্বিক চাহিদার সুযোগ গ্রহণ করে আইসিটি, আতিথেয়তা সেবা, শিপিং ও বিমান চলাচল সেবা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিস্তৃত করা যেতে পারে। উপরন্তু গৃহায়ন, স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা খাতের উৎপাদন উন্নয়নে দক্ষতার ভিত্তি এবং প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করা প্রয়োজন।

চিত্র ৩.১০: আধুনিক সেবার বিবর্তন (জিডিপি'র %)

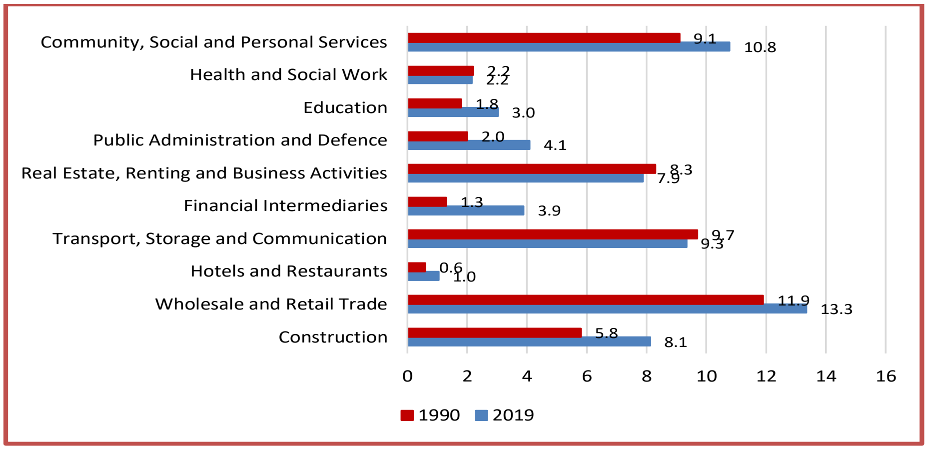

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

চিত্র ৩.১১: সেবার কাঠামোগত পরিবর্তন

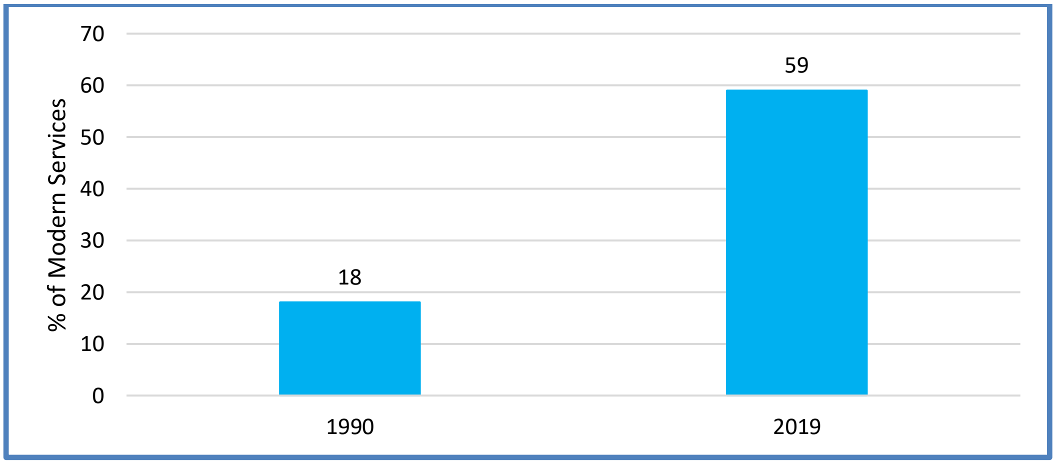

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

অর্থনীতির বর্ধনশীল গুরুত্বের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক সেবাসমূহে কর্মসংস্থানের অংশ বিগত কয়েক বছরে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে, বিশেষভাবে ২০১০ সাল থেকে প্রবৃদ্ধি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সেবা খাতে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ভিত্তির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ইঙ্গিত করে। যদি বাংলাদেশেকে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম-আয়ের দেশের সেবা আধুনিকায়নের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয় তবে এই খাতের অংশগ্রহণকে আরো গতিশীল করতে হবে। দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশে পৌঁছতে হলে উন্নত দেশের মতো উদীয়মান আনুষ্ঠানিক শিল্প উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে।

৩.৬.৩ সেবার ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতিতে উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত সেবা খাতের অবদান বিস্তৃত করার নির্দিষ্ট চাহিদা ছাড়াও রয়েছে সেবা কার্যাবলীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মতো একটি বড় ধরণের সাধারণ চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকিং, আর্থিক সেবা, আইসিটি ও বিমান চলাচলের মতো পেশা ও দক্ষতা-ঘন সেবা উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও উচ্চ-আয়ের কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই কার্যাবলীর ভূমিকা এখনো সীমিত। তবে অন্যান্য সেবা, যেমন- ব্যবসা, পরিবহন, ব্যক্তিগত সেবায় সাধারণভাবে নিম্ন উৎপাদনশীল অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলীর প্রাধান্য রয়েছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিকভাবে প্রধান প্রধান বাণিজ্য প্রতিযোগীদের মধ্যে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার একটি তুলনামূলক চিত্র বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। এটি চিত্র ৩.১২ এ দেখানো হয়েছে। তুলনাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে ক্রয় ক্ষমতার পার্থক্যের (PPP) দ্বারা জিডিপি পরিমাপ করা হয়। অসাধারণ ব্যাপার হলো বাংলাদেশ ১৯৯১ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি লাভ করেছে। মন্দ ব্যাপার হলো এই যে, প্রতিযোগীদের উৎপাদন স্তরে পৌঁছতে আরো অনেক কিছু করার বাকী রয়েছে। বাংলাদেশে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা ভারতের চেয়ে ৫৩ শতাংশ, চীনের চেয়ে ৬৯ শতাংশ, শ্রীলংকার চেয়ে ৭৫ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ার চেয়ে ৮৬ শতাংশ কম। বর্ধনশীল গড় শ্রম উৎপাদনশীলতায় হয়তো আগামী ২০ বছরের মধ্যে উচ্চতর আয়ে পৌঁছতে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

বাংলাদেশের খাত পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ, এর পরেই সেবা খাতের অবস্থান (চিত্র ৩.১৩)। অবাক হবার কিছু নেই যে, গড় উৎপাদনশীলতা কৃষিতেই সর্ব নিম্ন, জাতীয়ভাবে সামগ্রিক গড় উৎপাদনশীলতাকেও এটি নিম্নে টেনে রেখেছে। যা আন্তর্জাতিক তুলনীয় পর্যায়ে দৃশ্যমান খুব নিম্ন গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার আংশিক ব্যাখ্যাও প্রদান করে। বিভিন্ন খাতের মধ্যে গড় উৎপাদনশীলতার পার্থক্য থাকা যুক্তিযুক্ত। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শ্রম স্থানান্তর শুরু হয় সর্বনিম্ন উৎপাদনশীল কাজ (কৃষি) থেকে মধ্যম ধরণের গড় উৎপাদনশীল কাজে (সেবা) এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল কাজে (শিল্পে)।

চিত্র ৩.১২: বাংলাদেশ ও তুলনীয় দেশগুলোর গড় শ্রম উৎপাদনশীলতা (২০১১ পিপিপি মার্কিন ডলারে)

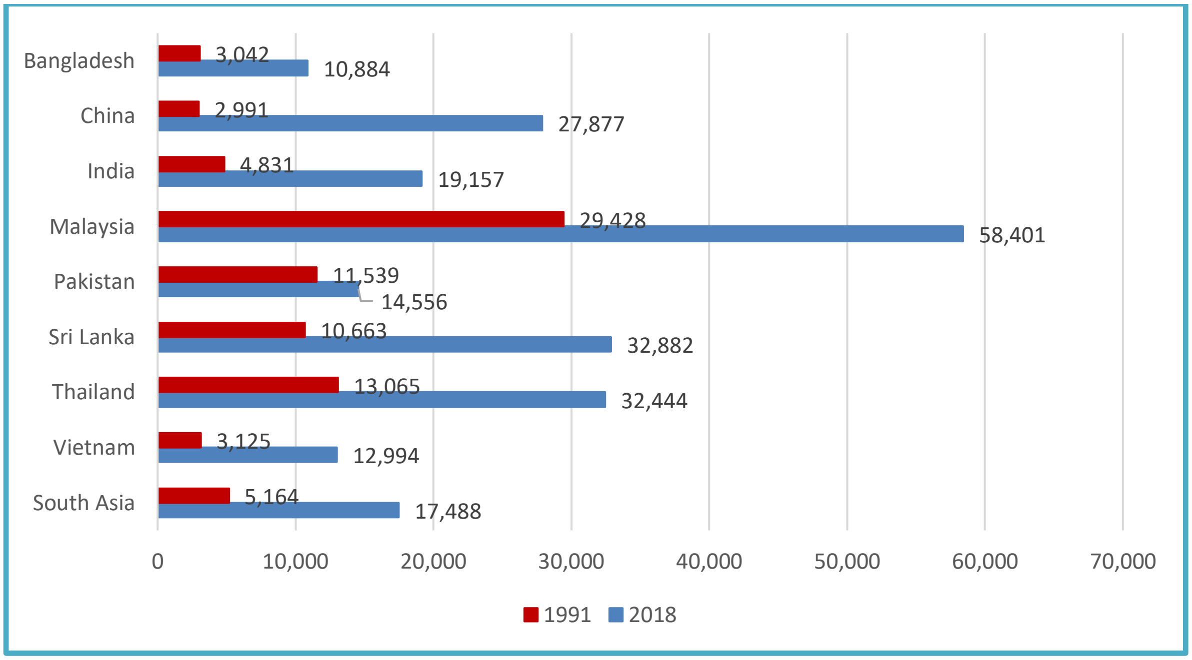

সূত্র: বিশ্ব ব্যাংক

চিত্র ৩.১৩: গড় শ্রম উৎপাদনশীলতার ধারা, ১৯৯৫/৯৬ ভিত্তি মূল্যে

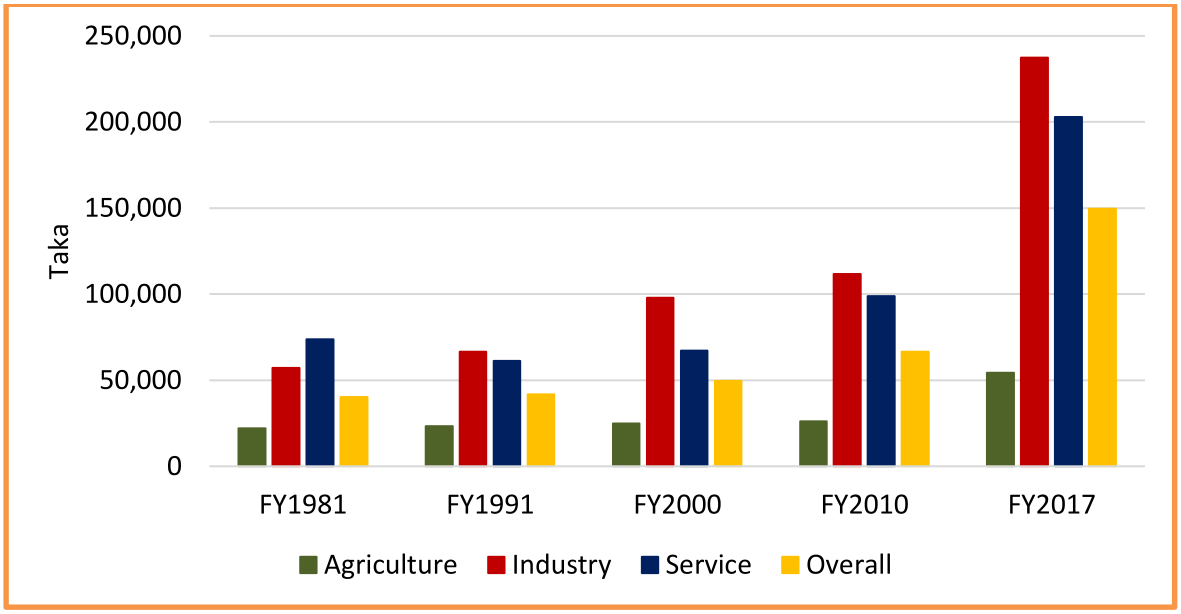

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

সেবা খাতে উৎপাদনশীলতার চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট। শ্রম শক্তি জরিপ (LFS) ২০১৫-১৬ অনুসারে, বাণিজ্য ও পরিবহনে মোট সেবা খাতের কর্মসংস্থানের ৫৭% এবং অতিরিক্ত ৫% পারিবারিক কর্মী হিসেবে নিয়োজিত। এসব নিম্ন উৎপাদনশীল কর্মীদের সাথে শিক্ষা সেবার (শ্রম শক্তির ১০%) নিম্ন উৎপাদনশীলতা যুক্ত করলে, সেবা খাতে কর্মসংস্থানের প্রায় ৭২% নিয়োজিত নিম্ন গড় উৎপাদনশীলতার সমস্যায় জর্জরিত। সেবা খাতে কর্মসংস্থানের এই ৭২%-এর গুণগত মান বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, যেটি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৬.৪ সেবার ক্ষেত্রে দক্ষতার চ্যালেঞ্জ

অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে সেবা খাতের সবচেয়ে বড় অংশ হল পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য এবং পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবা। এই অংশে পেশাগত সেবার (আইসিটি, টেলিকম, অর্থায়ন ইত্যাদি) উচ্চ উৎপাদশীলতার তুলনায় নিম্ন মজুরি ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা বেশি। এসব কার্যক্রমের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য দ্বারা এটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গড় হিসেবে পেশাগত সেবায় যে শ্রম শক্তি নিয়োজিত তাদের সবাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ডিগ্রিসহ অন্যান্য পেশাগত ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে পরিবহন, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত সেবায় গড় শিক্ষার স্তর অত্যন্ত নিম্ন। চিত্র ৩.১৪-এ বাংলাদেশে কর্মরত শ্রমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো হয়েছে। চিত্র ৩.১৫ তে দেখা যায় যে, শ্রম শক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে সামান্য অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু এই বৈসাদৃশ্য আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশের শ্রম শক্তির প্রায় ৩২ শতাংশের ২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত কোন শিক্ষা ছিল না, যার পরিমাণ কৃষিতে ৪৫ শতাংশ। প্রায় ২৬ শতাংশের শুধু প্রাথমিক শিক্ষা, ৩১ শতাংশের মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কেবল ১১ শতাংশের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা আছে (উচ্চ মাধ্যমিক ও তার উপরে)। সেবা খাত গড়ে শিক্ষা অর্জনের দিক থেকে শিল্প ও কৃষির চেয়ে ভালো। উদাহরণস্বরূপ গড় হিসেবে শিল্পের ৯ শতাংশ এবং কৃষির ৩ শতাংশের তুলনায় সেবা কর্মীদের প্রায় ২২ শতাংশের উচ্চ শিক্ষা রয়েছে।

চিত্র ৩.১৪: শ্রম শক্তির শিক্ষা প্রোফাইল

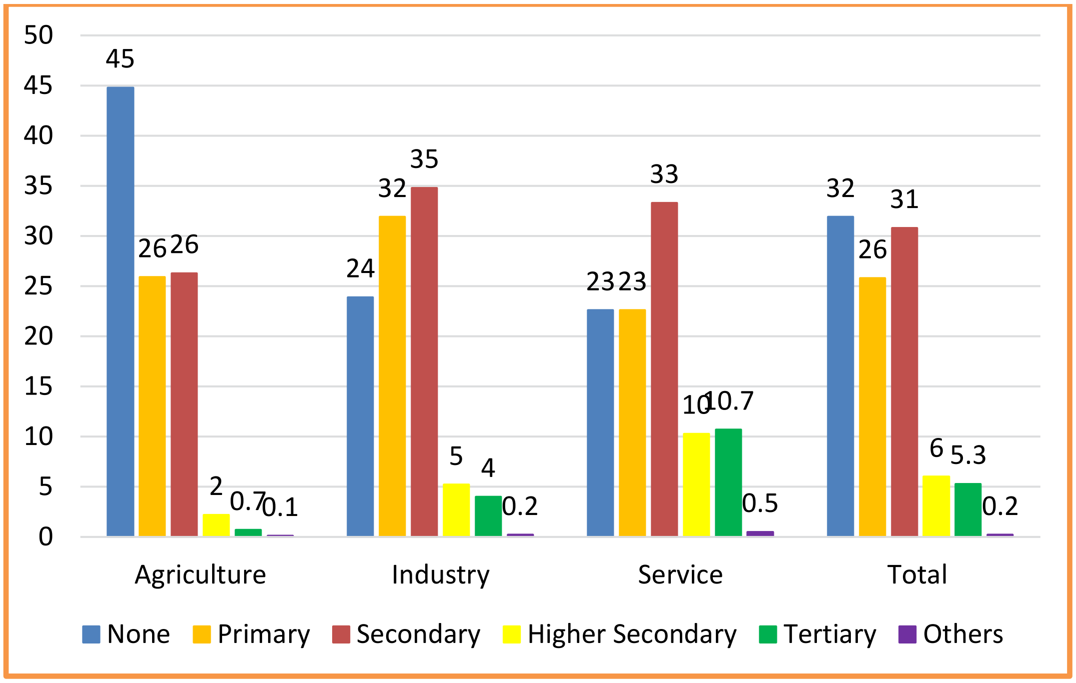

সূত্র: শ্রম শক্তি জরিপ (LFS) ২০১৬-১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

চিত্র ৩.১৫: শ্রম শক্তির শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন

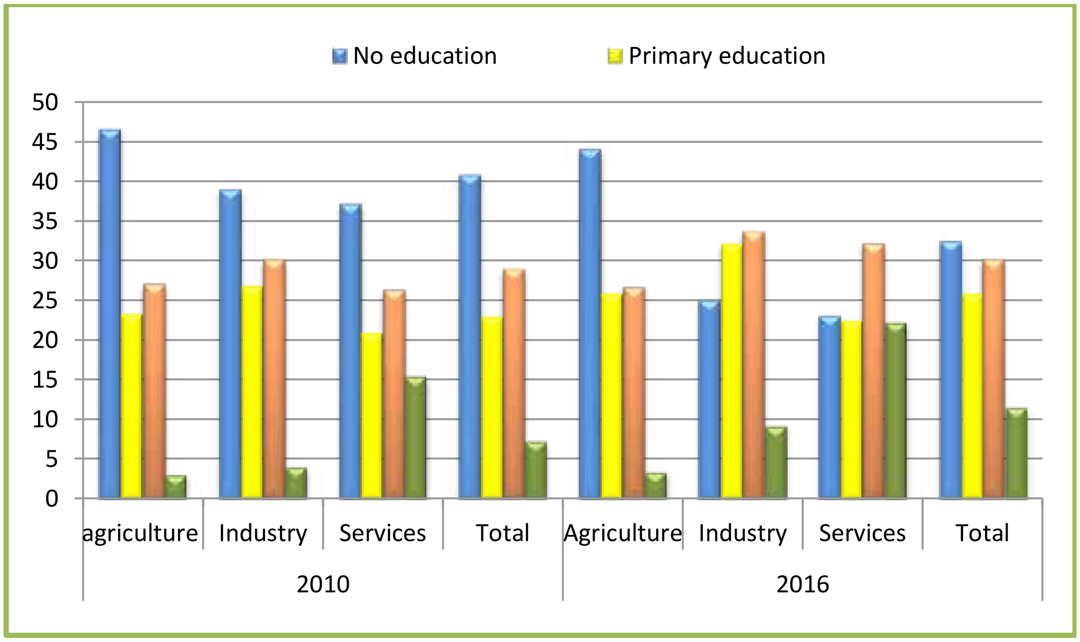

সূত্র: শ্রম শক্তি জরিপ (LFS) ২০১৬-১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)

২০১০ এর ''শ্রম শক্তি জরিপ'' ও ২০১০ এর ''খানা আয় ও ব্যয় জরিপ'' হতে প্রাপ্ত উপাত্তের সম্মিলিত বিশ্লেষণ থেকে সেবা খাতে দক্ষতাগত সমস্যার খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব। এলএফএস (LFS) ২০১০ থেকে জানা যায় যে, সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রম শক্তির ৭৯ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির। বৃত্তি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতার মাত্রায় ব্যাপক ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হয়, অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক কার্যাবলী কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যবসা, পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবায় (কার্যাবলীর ৯০ শতাংশেরও বেশি অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতির)। অন্যদিকে আর্থিক খাত, রিয়েল এস্টেট ও জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক (৬০-৮০ শতাংশ)। পারিবারিক আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুসারে, আনুষ্ঠানিক কর্মীদের জন্য স্কুল শিক্ষার গড় হলো সরকারি খাতের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০.১ বছর এবং বেসরকারি খাতের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৫.৯ বছর। এর বিপরীতে, দিনমজুরসহ অনানুষ্ঠানিক কর্মী ও স্ব-কর্ম নিয়োজিত কর্মীদের শিক্ষার গড় যথাক্রমে ২.১ ও ৪.২ বছর। ২০১০ এ বিভিন্ন ধরণের কাজে যুক্ত ছিল প্রায় ১৫ মিলিয়ন দিনমজুর এবং স্বকর্মে নিয়োজিত ছিল ২০ মিলিয়ন। প্রায় ৯.৭ মিলিয়ন দিন মজুর এবং ৮.৯ মিলিয়ন স্বকর্ম নিয়োজিত কর্মীর কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ২০০৯ সালে কৃষি বহির্ভূত শ্রমিকদের পঠণ মূল্যায়নের ওপর বিশ্বব্যাংক একটি জরিপ চালায়। সেখানে দেখা যায় যে, প্রায় ৭৭ শতাংশ কৃষি বহির্ভূত দিনমজুর এবং ৫৭ শতাংশ কৃষি বহির্ভূত স্ব-কর্মে নিয়োজিতরা পড়তে পারে না। এসব অনানুষ্ঠানিক কর্মী ও স্ব-কর্ম নিয়োজিত ব্যক্তি সেবা খাতে যুক্ত রয়েছেন। এসব তথ্য সেবা খাতের দক্ষতার চ্যালেঞ্জ এবং সাধারণভাবে বৃহৎ শ্রম শক্তির দক্ষতার চ্যালেঞ্জ নির্দেশ করে।

স্বাভাবিকভাবে আনুষ্ঠানিক সেবার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত। আইসিটি, টেলিকম, আর্থিক খাত, বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক জাহাজ পরিবহন ও পেশাগত সেবার মতো আধুনিক সেবা খাতগুলো হলো উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সর্বোচ্চ যোগান দাতা। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উৎসের মধ্যে গুণগত মানে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত দক্ষতা সরবরাহের দ্বারা এই সেবার বিস্তার ব্যাহত হয়ে থাকে। বিশেষ করে, আইসিটি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। জনপ্রশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার স্নাতকদের প্রাধান্য রয়েছে, যদিও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন সরবরাহকারীর মধ্যে মানগত পার্থক্য বেশ ব্যাপক, যা এই সেবার মান হ্রাস করে। যদিও সেবার আধুনিক অংশ উদ্ভূত হয়ে জ্ঞান অর্থনীতির প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিশেষায়িত কর্ম শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহে বাঁধাগ্রস্ত হয়, তবুও দক্ষতার অবস্থা আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে আমরা যা দেখেছি, তার চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভালো।

২০১৫-১৬ সালে এ কর্মশক্তির প্রায় ১১.৫ শতাংশ (৬.৯ মিলিয়ন কর্মী) উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দক্ষতা অর্জন করে এবং এদের অধিকাংশেরই কর্মসংস্থান হয় আনুষ্ঠানিক সেবা খাতে। নারী স্নাতকদের চেয়ে পুরুষ স্নাতকদের সংখ্যাই বেশি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যানবেইস (২০১৫) (কলেজ ও তার উর্ধ্ব) তথ্যে দেখা যায় যে, মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি

২০০৫ ও ২০১৫ সালের মধ্যে ১১.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীদের ভর্তি পুরুষদের তুলনায় একটু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (যথাক্রমে ১৩ শতাংশ ও ১০.৫ শতাংশ)। মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ স্নাতকদের উচ্চ হার ও সেই সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্রুত বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতেই এই কাঙ্খিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য উন্নয়ন এবং এর অব্যাহত অগ্রগতি আইসিটিসহ আধুনিক সেবার বিস্তারে অত্যন্ত সহায়ক হবে। তথাপি উল্লেখযোগ্যভাবে গুণগত মানের বিষয়টি রয়ে যায়। উপরন্তু, ১০ শতাংশেরও কম শিক্ষার্থী প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে ভর্তি হয়ে থাকে। কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষায় এই নিম্নকেন্দ্রীকরণ আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বড় দুর্বলতা, যা বাজার চাহিদার সাথে উচ্চ শিক্ষার সম্পৃক্তিকে ক্ষুন্ন করে।

৩.৬.৫ খাত বহির্ভূত সেবার রপ্তানি চ্যালেঞ্জ

দেশের বাইরে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, [জিএটিএস (GATS) এর মোড-৪ (Mode-4) এর অধীন ফ্যাক্টরসেবা রপ্তানি] অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বাংলাদেশ যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্সের শক্তিশালী অবদানে। এটি একটি উল্ল্যেখযোগ্য উন্নয়ন, যা সম্ভবপর হয়েছে বেশ কিছু সরকারি সহায়ক সেবার জন্য, যার মধ্যে রয়েছে- রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় স্বাগতিক দেশগুলোর সাথে সরকারি পর্যায়ে সংলাপ, কর অব্যাহতি, নগদ প্রণোদনা ও তথ্যের আদান প্রদান। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। মন্ত্রণালয়টি প্রবাসী শ্রমিকদের বৈধভাবে বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, অভিবাসীদের কল্যাণ করা এবং অভিবাসী কর্মীদের দেশে বিদেশে স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যানে কাজ করে থাকে। এই সকল সেবার উন্নয়নে অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এর তুলনায় অন্যান্য এনএফএস (NFS) এর রপ্তানি অধিক সীমিত।

সারণি ৩.৭-এ এনএফএস (NFS) রপ্তানি সেবা থেকে আয়ের হিসাব প্রদর্শিত হলো। এনএফএস (NFS) সেবা রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হলো সরকারি সেবা (৪৭ শতাংশ), যা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (বাংলাদেশ হাইকমিশনসহ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবার সহায়তায় অভিবাসন সর্ম্পকিত কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। ২০১৯ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে চারটি বৃহত্তম সেবা রপ্তানি হলো পরিবহন (১৫ শতাংশ), টেলিকম ও আইসিটি (১৪ শতাংশ), ব্যবসা সেবা (১৩ শতাংশ), পর্যটন (৫ শতাংশ) এবং অবশিষ্ট (৬ শতাংশ) অংশ রয়েছে আর্থিক সেবাসহ অন্যান্য সেবা। সেবা থেকে বেসরকারি রপ্তানি আয়ের সংকুলান অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হলেও উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত তিনটি ক্ষেত্রে আয় বেশ কম। এগুলো হল আন্তর্জাতিক পরিবহন, পর্যটন ও আইসিটি।

আন্তর্জাতিক পরিবহন সেবা: পরিবহন ক্ষেত্রে দুর্বল আয়ের সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) সেবা পরিশোধে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। পরিবহন সেবা থেকে ২০১৯ অর্থবছর মাত্র ৬,৬৩,৪২৭ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের বিপরীতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিবহন সুবিধাদাতাদের সার্ভিস চার্জ হিসেবে ৪৪৭৫৬.৯ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের বিমান ও শিপিং সেবার নিম্ন মান এবং দুর্বল সামর্থ্যের কারণে আন্তর্জাতিক যাত্রী ও পণ্য বহন সেবার জন্য বিদেশি শিপিং ও এয়ারলাইনগুলোর ওপর একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে এই খাতে ব্যাপক ঘাটতি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্য ২০০০ অর্থবছর ১৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ অর্থবছর প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নিত হয়েছে। ফলে এতদিন জাতীয় শিপিং ও বিমান পরিবহন সেবায় উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভের ব্যাপক সুযোগ তৈরি হয়েছে। বাণিজ্যসহ যাত্রী চলাচলের দিক থেকে এই সেবায় জন্য যে বিশাল চাহিদা, তা স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের সামনে এক অনন্য বিনিয়োগ সুবিধা এনে দিয়েছে। এজন্য সঠিক সরকারি বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও অবকাঠামোর (সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর, সরকারি বেসরকারি শিপিং ও এয়ারলাইন্সের অপারেশন ও কন্টেইনার নির্মাণ) বিনির্মাণ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা শ্রম শক্তির জন্য উত্তম সুযোগ তৈরি করবে এবং এ সকল সেবা খাতে কর্মসংস্থান তৈরির প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

সারণি ৩.৭: খাত বহির্ভূত সেবা রপ্তানি থেকে আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)

সেবার ধরণ (এএফএস)	২০১০ অর্থ-বছর	২০১১ অর্থ-বছর	২০১২ অর্থ-বছর	২০১৩ অর্থ-বছর	২০১৪ অর্থ-বছর	২০১৭ অর্থ-বছর	২০১৮ অর্থ-বছর	২০১৯ অর্থ-বছর
মোট এনএফএস (NFS) আয়	**২২৩৩.৬**	**২৫৭০.২**	**২৪৯১.৪**	**২৮২৭.৬**	**৩১১৫.৩**	**৩৬৪২.২**	**৪২৬০.১১**	**৬২২১.৯০**
১. পরিবহন	১৫০.৬	১৯১	৩৩৬.১	৪৫৮.৭	৪৬০.৯	৪২৬.৮	৫৮৯.২০	৬৬২.৭৬
২. ভ্রমণ	৭৯.১	৮৫.৬	৯৭.০	১০৭.৩	১৪২.৪	২৯০.৬	৩৪৪.৮১	৩৬৭.৮৬
৩. টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার এবং তথ্য সেবা	২৪৬.৫	৩৪৯.৬	৫২০.৭	৩৪৯.৫	৪৪৪.৮	৫৯৪.৭	৫৩৮.২৩	৫৪৯.০৫

সেবার ধরণ (এএফএস)	২০১০ অর্থ-বছর	২০১১ অর্থ-বছর	২০১২ অর্থ-বছর	২০১৩ অর্থ-বছর	২০১৪ অর্থ-বছর	২০১৭ অর্থ-বছর	২০১৮ অর্থ-বছর	২০১৯ অর্থ-বছর
৪. অন্যান্য ব্যবসায় সেবা	৪৯৫.১	৬৭০	৩১৩.১	৩১৬.৪	৪০৩.৩	৫২২.৬	৬৮১.২৫	৯৮০.০২
৫. সরকারি সেবা	১২০৩.২	১১৯২.৭	১০৮৯.৫	১৪২৫.৬	১৪৬৮.৩	১৫৩৯.৮	১৬৮৩.৭৮	২৮৮৩.৭৬
৬. অন্যান্য	৫৯.১	৮১.৩	১৩৫.০	১৭০.১	১৯৫.৬	২৬৭.৭		

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

পর্যটন: রেমিট্যান্স প্রবাহের মতোই পর্যটন থেকে প্রাপ্ত আয়ও রপ্তানি আয়ের একটি প্রধান উৎস হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি দেশজ পণ্য সম্ভার ও সেবা উন্নয়নের চাহিদা তৈরি করে এবং এভাবে জিডিপি ও সামগ্রিক কর্মসংস্থানে মূল্যবান অবদান রাখে। লেনদেন ভারসাম্য (Balance Of Payment)-এ সেবা হিসেবে ভ্রমণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে যদিও পর্যটনের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তবে পর্যটকের ভ্রমণ, হোটেল, খাদ্য ও বিভিন্ন স্থানীয় পণ্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের ও জিডিপি'তে যে প্রভাব সৃষ্ট হয় তা একদিকে যেমন বর্ধিত মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে আদায়কৃত হয়, অন্যদিকে তা পরিবহন, হোটেল, রেঁস্তোরা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে সহায়ক হয়। সকল কাজের অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগ রয়েছে, বিশেষ করে পর্যটন হলো অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় উৎস, যা অসংখ্য চাহিদা তৈরি করে। ফলে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে পর্যটন প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনন্য সাধারণ, যা পর্বত থেকে নদী, সমুদ্রতট, জীববৈচিত্র্য পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে অবস্থিত এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ নিরবছিন্ন ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাংলাদেশের গর্বের ধন। এতদ্‌সত্ত্বেও, এখানে পর্যটন শিল্প এখনো লাভজনক হতে পারেনি। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের মতে, ২০১৯ অর্থবছর বাংলাদেশের পর্যটনে মোট প্রাক্কলিত অর্থনীতির ৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৯.১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করেছে। ভ্রমণ ও পর্যটনে ১.৮৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, যা মোট কর্মসংস্থানের ২.৯%। অন্যদিকে, আর্ন্তজাতিক পর্যটকদের ক্ষেত্রে আয় হয়েছে ৩৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যা মোট রপ্তানির ০.৭%।

ডব্লিউটিটিসি (WTTC) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের পর্যটন খাতের অবদান আন্তর্জাতিক তুলনা সারণি ৩.৮-এ দেখানো হয়েছে। চীন, ভারত, ও মালয়েশিয়ার মতো তুলনীয় দেশগুলো পর্যটন শিল্পের সুবিধা গ্রহণে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে।

সারণি ৩.৮: বিভিন্ন দেশের মধ্যে পর্যটনের অবদানের তুলনা, ২০১৯

নির্দেশক	বাংলাদেশ	চীন	ভারত	মালয়েশিয়া	থাইল্যান্ড
জিডিপি'তে ভ্রমণ ও পর্যটনের অবদান	৯.১১ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট অর্থনীতির ৩%)*	১.৫৮ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট অর্থনীতির ১১.৩%)*	১৯৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট অর্থনীতির ৬.৮%)*	৪১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট অর্থনীতির ১১.৫%)*	১০৭ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট অর্থনীতির ১৯.৭%)*
কর্মসংস্থানে ভ্রমণ ও পর্যটনের অবদান	১.৮ মিলিয়ন কর্ম *(মোট কর্মসংস্থানের ২.৯%)*	৭৯.৮৭ মিলিয়ন কর্ম *(মোট কর্মসংস্থানের ১০.৩%)*	৩৯.৮ মিলিয়ন কর্ম *(মোট কর্মসংস্থানের ৮%)*	২.২২ মিলিয়ন কর্ম *(মোট কর্মসংস্থানের ১৪.৭%)*	৮.০৫ মিলিয়ন কর্ম *মোট কর্মসংস্থানের ২১.৪%)*
আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের প্রভাব	৩৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট রপ্তানির ০.৭%)*	১৩১ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট রপ্তানির ৪.৯%)*	৩০.৩ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট রপ্তানির ৫.৬%)*	২২.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট রপ্তানির ৯.৪%)*	৬৮.৯ বিলিয়ন ইউএস ডলার *(মোট রপ্তানির ২১.১%)*

সূত্র: World Travel & Tourism Council (WTTC)

সরকার ''বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০'' ও ''পর্যটন নীতি, ২০১০'' সহ পর্যটন খাতের জন্য বেশ কিছু নীতিমালা ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করছে। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে একটি পর্যটন বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা, যা মানসম্মত সেবা এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা ও আরামদায়ক অবস্থান নিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে নীতি প্রণয়নসহ সামগ্রিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত রয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ওপর এবং বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এই নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পর্যটন সেবায় উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো সংক্ষেপে সারণি ৩.৯-এ সন্নিবেশিত হলো। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই কর্মসূচিগুলো চলমান থাকবে এবং আরো প্রসারিত হবে।

সারণি ৩.৯: পর্যটন সম্প্রসারণে চলমান উদ্যোগ

<table>
<tr><th>মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি</th><th>কার্যক্রম</th><th>বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থা</th></tr>
<tr><td rowspan="4">নিরাপদ ও নিশ্চিত বিমান চলাচল ব্যবস্থা</td><td>হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মানোন্নয়ন</td><td rowspan="4">বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ</td></tr>
<tr><td>বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ</td></tr>
<tr><td>কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন</td></tr>
<tr><td>বিদ্যমান বিমানবন্দরগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ</td></tr>
<tr><td rowspan="7">পর্যটন সম্প্রসারণ</td><td>দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল শনাক্তকরণ এবং বিদ্যমান পর্যটন স্থানগুলোর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ</td><td rowspan="5">বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন</td></tr>
<tr><td>পর্যটন কার্যাবলীতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্তকরণ</td></tr>
<tr><td>সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও অবকাঠামো বিনির্মাণ</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ পর্যটনের ওপর ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি ও পর্যটন কর্মসূচির সম্প্রচার</td></tr>
<tr><td>পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রাখা এবং আরো চারটি পর্যটন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন</td></tr>
<tr><td>দেশে ও বিদেশে আয়োজিত পর্যটন মেলায় অংশগ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আয়োজন</td><td rowspan="2">বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড</td></tr>
<tr><td>পর্যটন খাতে সক্ষমতা বিনির্মাণ</td></tr>
</table>

সূত্র : বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (MOCAT)

আইসিটি সেবা রপ্তানি: আইসিটি খাতে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে নতুন। ‘‘রূপকল্প-২০২১’’ এর প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় এই খাতে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। সমন্বিত প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিগত বিপ্লব ত্বরান্বিত করার বিষয়ে অধ্যায় ১২-তে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ভিশন বর্ননা করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ৬ষ্ঠ ও ৭ম পরিকল্পনায় ব্যাপক গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অগ্রগতিও অর্জিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান ও সংযোগশীলতার উন্নয়নে আইসিটির ব্যবহারে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বৈশ্বিক বাজার সম্ভাবনার সাথে তুলনা করা হলে আইসিটি সেবার রপ্তানি প্রভাব একেবারেই নগণ্য। আইসিটি রপ্তানি থেকে আয় ২০১০ অর্থবছরে ২৪৭ মিলিয়ন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ অর্থবছরে ৫৪৯ মিলিয়ন ডলারে উন্নিত হয়। এই বৃদ্ধি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য, তবে তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে যখন ২০১৯ অর্থবছর ভারতের ১৩৭ বিলিয়ন ডলার আইসিটি আয়ের সাথে তুলনা করা হয় (Statista ২০২০)। এমনকি আয়তনের কথা বিবেচনায় রাখার পরেও ভারতের আইসিটি সেবা রপ্তানির আয় যেখানে তার জিডিপি'র ৪.৬৬ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা জিডিপি'র ০.২ শতাংশেরও কম। আইসিটি সেবার বৈশ্বিক বাজার বিশাল এবং ভারত এই বাজার সুবিধাকে অত্যন্ত সফলতার সাথে ব্যবহার করেছে, এমনকি যখন অভ্যন্তরীণভাবে আইসিটি সেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ বাজার ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় রেখে একটি সুচিন্তিত আইসিটি কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বৈশ্বিক আইসিটি বাজারে বাংলাদেশের প্রবেশকে নিরঙ্কুশ করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেবা রপ্তানির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই অগ্রগতি তখন আইসিটি ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি রপ্তানির ভিত্তি হবে।

অতীত অভিজ্ঞতায় বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা আইসিটি রপ্তানির প্রবৃদ্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, বিগত বেশ কয়েক দশক যাবত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত ও যোগ্য উদ্যোক্তা আইসিটি উদ্যোগ শুরু করলেও এগুলোর অধিকাংশই তহবিল সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতার কারণে ‘ক্ষুদ্রায়তনিক-স্বল্প-প্রবৃদ্ধির’ (Small Size-Low-Growth) অবস্থায় আটকা পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত, সফটওয়্যার শিল্পের জন্য মানব সম্পদের ক্ষেত্রে গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ভাবেই এক মারাত্মক কূন্যতা রয়েছে। এর কারণ হল উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আইসিটি সম্পৃক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি (শিক্ষকদের শিল্প-অভিযোজনের অভাব, কারিকুলাম আধুনিকায়নে স্থবির গতি প্রভৃতি) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে টার্শিয়ারি পর্যায়ে অপর্যাপ্ত মানের ‘ইনপুট’ সরবরাহ। তৃতীয়ত, ব্যান্ডউইথ্-এর উচ্চ মূল্য আইসিটির অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে। চতুর্থত, আইটি পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের অভাব, ইন্টারনেটের উচ্চ ব্যয়, বিদ্যুৎ সংকট-এগুলো হলো অধিকাংশ আইটি শিল্পের জন্য সাধারণ অবকাঠামোগত সমস্যা। বিশ্ব অর্থনৈতিক

ফোরামের নেটওয়ার্ক রেডিনেস সূচকের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামোগত সক্ষমতার দুর্বলতা বেশ ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সূচক উন্নয়নের জন্য আইসিটির উন্নতি বিধানে দেশের সক্ষমতা পরিমাপ করে (চিত্র ৩.১৬) (WEF ২০১৯)। চূড়ান্তভাবে উদ্যোগ গ্রহণের গতিশীলতা অপার্যপ্ততা, বৈদেশিক বিপণনের জন্য বাজেট স্বল্পতা এবং 'কান্ট্রি ব্র্যান্ড' প্রবর্ধনে সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগের অভাব হেতু আইসিটি শিল্পের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশিত মাত্রার চেয়ে অনেক কম। মোবাইল ফোন শিল্পের মূল্য সংযোজন নীতিমালা ও সুবিধাদি সেবা দাতাদের জন্য আদৌ অনুকূল নয়।

চিত্র ৩.১৬: নেটওয়ার্ক রেডিনেস সূচক (এনআরআই), ২০১৯ (১২১ টি দেশের মধ্যে)

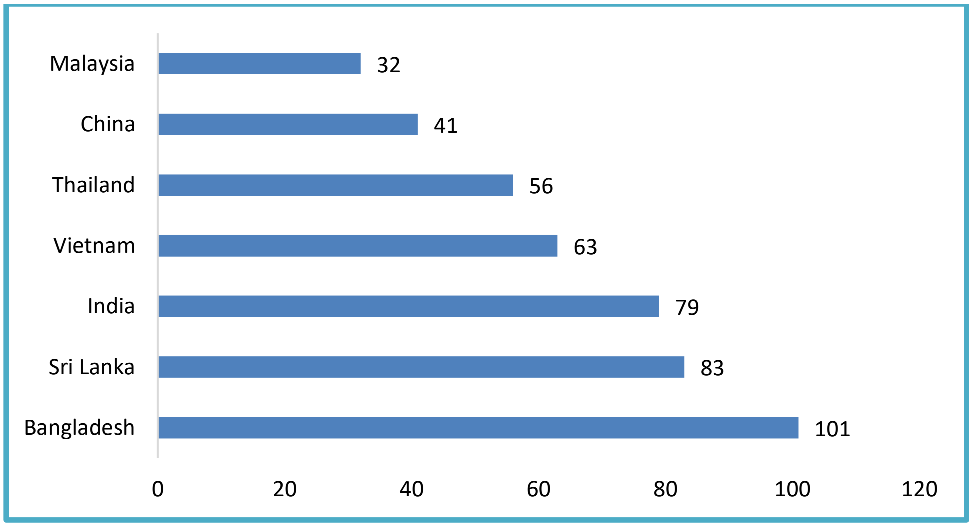

সূত্র: নেটওয়ার্ক রেডিনেস সূচক, পরটোলন ইনস্টিটিউট

তথাপি, বিষয়গুলো খুব দ্রুতই ঘটছিল। এসব বাঁধা এবং এই শিল্পের ব্যাপক রপ্তানি সম্ভাবনা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরামর্শে সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে আরো নিবিড়ভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশীয় ও বৈশ্বিকভাবে আইসিটি শিল্পের উন্নতি বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আইসিটি প্রকল্পের উন্নতি বিধানের ফলে দেশীয় আইটি এবং আইটিইএস (ITES) সক্ষমতা বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পেরেছে। এর ফলে বৈশ্বিক সচেতনতা এবং আইটি ও আইটিইএস (ITES) ব্যবসা সম্পর্কে বাংলাদেশের অনুধাবন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ গুগল/অ্যাপেল/মাইক্রোসফট/অ্যামাজান/আলিবাবা এর মতো বড় বড় আইটি কোম্পানিগুলো প্রতিষ্ঠা করতে আইটি স্টার্ট-আপ/আইটি উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করছে। এই ক্ষেত্রে সিএমএমআইএল-৫, সিএমএমআইএল-৩,আইএসও-৯০০১ এবং আইএসও-২৭০০১ ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক মান পেতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশীয় বিপিও/কেপিও/আইটি কোম্পানিগুলোর উন্নতি বিধানের চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে দুটো কোম্পানি- সিএমএমআইএল-৫,২১ কোম্পানি-সিএমএমআইএল-৩, ৪৭টি কোম্পানি আইএসও ৯০০১, ৬টি কোম্পনী-আইএস-২৭০০১ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্তর্জাতিক মানের সনদ পেয়েছে।

৩.৬.৬ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ও সহায়ক বিধিবিধান

সেবা খাতে বেসরকারি ব্যবসায় ও ব্যক্তির প্রাধান্য রয়েছে। সেবার সরকারি মালিকানা মূলত জনপ্রশাসন, সরকারি স্কুল, সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা ও সীমিত সংখ্যক সরকারি আর্থিক উদ্যোগ ও সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্মিত অবকাঠামোর (উদাহরণস্বরূপ হাইটেক পার্ক) মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং, সেবার উৎপাদন (আউটপুট), রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি বেসরকারি উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগ। তবে, এগুলোর অনুকূলে অবকাঠামোগত সহায়ক সেবা সুবিধা প্রদানসহ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ও উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানে সরকারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কিছু বিনিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার উদ্যোগ ও আনুষঙ্গিক নীতিমালার মাধ্যমে সেবা খাতে বিনিয়ন্ত্রণের ফলে বেসরকারি খাত এতে এগিয়ে আসতে উৎসাহী হয়। বিনিয়ন্ত্রণের এই নীতি এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় ঐতিহ্যগতভাবে সরকারি খাতের কাজ হিসেবে গণ্য করা হত এমন বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: শিক্ষা, আইসিটি সেবা, বিমান চলাচল, বিদ্যুৎ। এই বিনিয়ন্ত্রণ উদ্যোগের ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো নিয়ন্ত্রণ মূলক বেশ কিছু উদ্বেগজনক বিষয় রয়েছে, যেগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। প্রথমটি আইসিটি খাতের রেগুলেটরি নীতির সাথে সম্পর্কিত। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ স্থানীয় কন্টেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা বাড়ানো এবং একটি সুসংযুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবার জন্য ব্যান্ডউইথ-এর মূল্য কমানো প্রয়োজন। স্থায়ী ব্রডব্যান্ডের সর্বনিম্ন রেকর্ডকৃত মূল্য (মাথাপিছু জিএনআই-এর শতাংশ হিসেবে) চীনের ক্ষেত্রে যেখানে ০.৭ শতাংশ, বাংলাদেশে তা ৭.৩ শতাংশ। বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও প্রধান প্রধান সামাজিক সেবার জন্য (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, ই-গভর্ন্যান্স প্রভৃতি) বিদ্যমান নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে "গ্রামীণ টেলিযোগোযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১০" বাস্তবায়ন করা হবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর নীতি। আইসিটি সেবা ও ব্যাংকিং সেবার কর হার খুবই বেশি, বিশেষ করে আইসিটির প্রসারণকে গতিশীল করার স্বাথে এটি সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে আইসিটি খাতের ওপর মোট কর ৫৮ শতাংশ, যা এই ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি কর হারের দেশসমূহের একটি। এই নীতিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতির সাথে অসংগতিপূর্ণও বটে এবং যা সংশোধন করা প্রয়োজন।

তৃতীয় নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয় যেটি মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা হলো মান-উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। এই বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত। সারা দেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য উদ্যোগ ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এগুলো থেকে প্রদত্ত সেবার মান, তাদের কাছে পরিবেশিত খাদ্যের নিরাপত্তা মান এবং ত্রুটিপূর্ণ রোগ-শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, শিক্ষা সেবার নিম্ন মূল্য সংযোজন আংশিকভাবে নিম্ন গুণগতমান ও অপর্যাপ্ত রেগুলেটরি মানের প্রতিফলন।

চতুর্থ নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়টি হলো স্থল ও নৌ উভয় পরিবহণে চলাচলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত মান। উভয় ধরণের পরিবহনের ক্ষেত্রে যে ঘন ঘন মারাত্মক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তা অনেক বেশি এবং এটি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ব্যাপক পলি জমার কারণে বহু সংখ্যক নৌ-পথের নাব্যতা সংকট ছাড়াও নৌ-পরিবহনের নিরাপত্তা মানের অপর্যাপ্ততা পরিবহনের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের চাহিদা কমিয়ে দিয়েছে।

পঞ্চম নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়টি হল জোনিং বা অঞ্চল আইনের সাথে সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স। জোনিং আইনের সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে বিভিন্ন সেবা উদ্যোগের অবস্থান নগরের ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনাকে জটিল করা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকার জীবনযাত্রা ও নিরাপত্তার মান খর্ব করেছে। এ ব্যাপারে আশু মনোযোগ দেয়া আবশ্যক এবং সময়-নির্দিষ্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর সমাধান নিশ্চিত করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ তখনই সহায়ক হয় যখন সেগুলোর যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা ও সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর ন্যস্ত থাকে। বেশ কিছু বিশেষায়িত সংস্থার সহায়তা নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সেবা কার্যাবলীর পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয়। যে দ্রুতগতিতে বেসরকারি সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এই মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর সামর্থ্য সম্প্রসারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও, সরকারি সংস্থার কর্মীদের মধ্যে যারা সার্বিকভাবে জনপ্রশাসন ও সুশাসনের সাথে সংযুক্ত তাদের জন্য প্রশিক্ষণসহ প্রণোদনা নীতি সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা রয়েছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা এবং এর জন্য প্রয়োজন হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দীর্ঘ সময় নিয়ে টেকসই অগ্রগতির মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এই পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

৩.৭ সেবা খাতের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল

৩.৭.১ সেবা খাত কৌশল

প্রবৃদ্ধি ও কর্মসৃজনে সেবা খাতের বর্ধনশীল গুরুত্ব নির্দেশ করে যে, সেবা অর্থনীতির অবিরাম দৃঢ় অগ্রগতি 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১' এর লক্ষ্য অর্জনে ২০৩১ অর্থবছরর মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ অর্থ-বছরের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে জটিল হবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সেবা খাতের কৌশল হলো অতীত অর্জন দৃঢ় করা; বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষার ওপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছদে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করার ওপর জোর দেয়া। সেবা খাতের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১. সেবা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে প্রণোদনা নীতিমালার উন্নতি বিধান;
২. প্রধান সেবা খাতের অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
৩. সেবা খাত ও শিল্প খাতের দক্ষতার ভিত-কে শক্তিশালী করতে সক্ষমতার উন্নয়ন;
৪. রেমিট্যান্স প্রবাহের উৎপাদশীল ব্যবহারের জন্য কার্যকরী কর্মসূচির উন্নয়ন এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের সুবিধা গ্রহণ এবং বাড়িতে রেমিট্যান্স প্রেরণ করার জন্য অভিবাসী কর্মীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
৫. সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, সরকারি নিরাপত্তা বৃদ্ধি, কমপ্লায়েন্স বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদানকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিবেচনাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা;
৬. সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা এবং সেবার গুণগত মান, নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা;
৭. উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ একটি আধুনিক জনপ্রশাসনের উন্নতি বিধান;
৮. কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা।

৩.৭.২ প্রণোদনা নীতিমালা

বাংলাদেশের অতীত অভিজ্ঞতার ইতিবাচক ফলাফল থেকে লব্ধ শিক্ষা নিয়ে সেবা খাতের কার্যাবলীতে অধিকতর বেসরকারি অংশগ্রহণের অনুকূলে বিনিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ শক্তিশালী করা হবে। অন্যান্য উত্থানশীল অর্থনীতিতে, বিশেষ করে ভারতে সেবা শিল্পের বিনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা একইভাবে ইতিবাচক। বিশেষ সেবা নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা দাতাদের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করা হবে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসুবিধাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য লক্ষ্য-নির্দিষ্ট জরিপ পরিচালনা করা হবে। এই ধরণের পরামর্শমূলক সভা ও জরিপ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নীতিমালা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রপ্তানিমুখী সেবাগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবর্ধন করা হবে, বিশেষ করে নতুন প্রযুক্তি আমদানি এবং এভাবে সেবার মান উন্নয়নসহ রপ্তানির প্রতিযোগ-সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং, আইসিটি ও পর্যটনের ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতার আমদানি সুবিধা বাড়ানো হবে। বিদেশি অংশীদারদের সাথে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে। পর্যটনকে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের জন্য পর্যটকদের জন্য আগমন সুবিধা সংশ্লিষ্ট ভিসার মাধ্যমে ভিসার আবশ্যিক শর্ত আরো সহজ করে আনা হবে। সকল পর্যটকদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও আতিথেয়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করা হবে।

আইসিটি সুবিধা: সরকার আইসিটিকে একটি উচ্চ সম্ভাবনাযুক্ত খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই অগ্রাধিকার প্রতিফলিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও আইসিটি শিল্প এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এর সেবা সম্প্রসারণ ও শিল্পায়ন প্রবৃদ্ধির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সরকার এজন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট সকল নীতি পর্যালোচনা করবে, যাতে সেগুলো অতিরিক্ত বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি প্রণোদনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি খাত ও অলাভজনক খাতকে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ডের সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। সরকার অবহিত যে, কর নীতি সেবা দাতাদের জন্য একটি বড় ইস্যু। এটি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, যাতে বেসরকারি সরবরাহকারীদের থেকে অতিরিক্ত বিনিয়োগ সুবিধা পাওয়া যায় এবং চাহিদা বাড়ানো যায়। এই উচ্চ মুনাফা সংবলিত উদ্যোগের দ্রুততর প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে আইসিটির জন্য কর নীতি পুনঃপরীক্ষণ করা হবে। এই প্রণোদনার বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতারও পর্যালোচনা করা হবে। অতিরিক্ত বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণসহ রপ্তানি বিস্তারের জন্য আইসিটি শিল্পের প্রতিযোগ-সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। সরকার আইসিটিকে বাংলাদেশের কোভিড-১৯ সাড়া প্রদানের একটা প্রধান টুল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া, সরকার আইসিটি বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে, যাতে কোভিড-১৯ সাড়া প্রদানে, প্রভাব মেটাতে এবং প্রবৃদ্ধির জন্য আইসিটিকে সমন্বিত করতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়গুলোকে সহায়তা করা যায়।

আন্তর্জাতিক শিপিং: শিপিং সেবার জন্য অর্থ প্রদান এবং আয় গ্রহণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফারাক দ্রুত চিহ্নিত করা উচিত। চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির স্নাতকদের ওপর নির্ভর করে নৌ ব্যবসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সক্ষমতা অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির প্রশিক্ষনার্থীদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আছে এবং অনেক স্নাতক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। ফলে অনেক প্রশিক্ষিত মেরিন স্টাফ রয়েছে যাদের অনেকেই আন্তর্জাতিক শিপিং ফার্মে কাজ করে। পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ শিপিং কোম্পানিগুলো

দেশের বর্ধনশীল পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের শিপিং চাহিদা পুরণে এই দক্ষতার ভিত্তি কাজে লাগাতে পারে। ২০১৭ অর্থবছর মোট পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭৩ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ যদি এই বাজারের ৫০% করায়ত্ত করতে পারে, তবে শিপিং থেকে উপার্জন এখনকার ০.৪ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নিত হবে। শিপিং খাতের উচ্চ সম্ভাবনা স্পষ্ট প্রতীয়মান। বেসরকারি শিপিং এর সুযোগ সুবিধা বাড়াতে সরকারের উচিত এখনই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি শিপিং কোম্পানীগুলোর সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা, যাতে নিয়ন্ত্রক বাঁধা ও কর ইস্যুসহ শিপিং শিল্পের উন্নতি বিধানে প্রধান প্রধান বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো খুঁজে বের করা যায়। এটির ওপর ভিত্তি করে জাতীয় শিপিং খাতকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল: বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে সরকার বাংলাদেশ বিমান ও একটি নামকরা আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনের মধ্যে যৌথ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা যাচাই করবে। এমিরাটস্ ও এয়ার লংকা এর মধ্যে একই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এয়ার লংকার উন্নতি বিধানের জন্য খুব সহায়ক হয়েছিল। আজকের বিশ্বায়িত ও উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক 'এভিয়েশন' বিশ্বে কীভাবে একটি লাভজনক বিমান শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে হয়, এ ধরণের কৌশল বাংলাদেশ বিমান ব্যবস্থাপনার জন্য আবশ্যকীয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করবে। বিমান সেবার চাহিদা, বিশেষ করে লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলোর জন্য ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিমানের দক্ষতা ও সেবার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করা হলে এই বাজারের একটি বড় অংশ দখল করা সম্ভব। ভালো মানের ও নির্ভরযোগ্য সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশে আসা-যাওয়ায় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমানও ব্যয়-সচেতন আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করতে পারে। বিমান পরিচালিত হবে পূর্ণ ব্যবস্থাপনা নমনীয়তা সহযোগে একটি বাণিজ্যিক সত্তা হিসেবে। ব্যবস্থাপনা ও কর্মচারীদের পারিতোষিক হবে বাজার ভিত্তিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য ব্যবস্থাপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে। অভ্যন্তরীণ বিমান সেবার বিস্তারের প্রধান অন্তরায় হলো দেশজ বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি, যা পর্যটনের সম্ভাবনাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই অন্তরায় থেকে উত্তরণে যৌথ উদ্যোগ হয়তো সহায়ক হতে পারে। আন্তর্জাতিক শিপিং-এর ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা যাচাই করা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই, প্রতিবন্ধকতাগুলোর ওপর আলোকপাত করে সুনির্দিষ্ট সংস্কারমূলক সমাধান চিহ্নিত করতে একটি বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। পরবর্তী বছরে কিংবা কাছাকাছি সময়ে এই সমীক্ষা পরিচালিত হবে এবং মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।

নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিমান চলাচল ব্যবস্থা: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে বিমান চলাচল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও এই অগ্রগতির ওপর নির্ভর করবে এবং তার বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করবে। এই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উচ্চ-আয়ের দেশে বিমান ভ্রমণের চাহিদা মেটাতে আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞদের কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি বিমান পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে। সিংগাপুর এয়ারলাইন্স, থাই এয়ারওয়েজ, এমিরেটাস্, ইত্তিহাদ ও কাতার এয়ারওয়েজ এর মতো বেশ সফল লাজজনক এশীয় ও মধ্য প্রাচ্যের বিপুলাকার এয়ারওয়েজের অভিজ্ঞতার শিক্ষণ বিশ্লেষণ করতে হবে, যাতে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি বিমান পরিকল্পনার উন্নয়ন বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে।

পর্যটন: পর্যটনে দুইটি বড় উপাদান জড়িত, একটা হলো বাংলাদেশের প্রসারিত ও নিরাপদ বিমান ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা প্রদানে নির্ধারিত অবকাঠামোর প্রসার। দ্বিতীয়টি হলো ভিসা ও মুদ্রা বিনিময় সুযোগ সুবিধা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট এবং আভ্যন্তরীণ পরিবহন নিয়ে গঠিত পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নতি বিধান।

পর্যটন সুবিধা ও সহায়ক সেবা: ভারত, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ যে দেশগুলো পর্যটনে অত্যন্ত ভালো করেছে, এ রকম কয়েকটি দেশের গঠনমূলক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ শিক্ষার ভিত্তিতে যে পাঁচটি প্রবেশ দ্বারে সমধিক জোর দেয়া হবে, সেগুলো হলো ঃ (১) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে আন্তর্জাতিক মানের উপযোগী তিনটি আকর্ষণীয় বিপণন কেন্দ্র স্থাপন; (২) সুন্দরবনের নিকটবর্তী স্থানে একটি ইকো-প্রকৃতি সমন্বিত রিসোর্ট গড়ে তোলা; (৩) টেকনাফ থেকে সুন্দরবনকে যুক্ত করে একটি সরাসরি 'রিভিয়েরা (Riviera)' সংযোগ স্থাপন; (৪) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর উন্নতি বিধান; এবং (৫) চট্টগ্রাম ও সিলেটে ইকো-পার্ক স্থাপন। এছাড়াও, আরো বেশ কিছু সাধারণ সহায়ক ব্যবস্থা নেয়া হবে, যা পূর্ব বর্ণিত কার্যাবলীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এগুলো হলো:

- *বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নতকরণ:* অগ্রাধিকারযুক্ত বাজারগুলোতে বিপণন সহায়তার সঠিক মাত্রা উদ্ভাবন ও নিশ্চিতকরণ।
- *যোগ্যতাসম্পন্ন মানব পুঁজির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ:* পর্যটন শিল্পে মানসম্মত কর্মী বাহিনীর সরবরাহ সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলি সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- *পর্যটন পরিবেশ উন্নয়ন:* মূল পর্যটন সহায়ক সেবার জন্য (যেমন ট্যাক্সি সেবা, রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং রিসোর্ট) অভিগম্যতা ও সেবা দানের উন্নতি বিধান; অর্থায়ন, নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সুবিধা প্রদান ও সেই সাথে সম্মুখ সারির কর্মীদের সেবার মান বৃদ্ধি।
- *ভিসা সুবিধা সেবা বিস্তৃতকরণ:* পর্যটকদের যাতে লক্ষ্য-নির্দিষ্ট বাজার থেকে ভিসা পদ্ধতি, যেমন- অনলাইনে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টায় এবং আগমনের সাথে সাথেই ভিসা অনুমোদন নিয়ে যেন কোন জটিল অবস্থার মুখোমুখি না হতে হয় তা নিশ্চিতকরণ।

পর্যটন কৌশলের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। সরকারের ভূমিকা হলো স্থায়ী অবকাঠামোতে (বিমান চলাচলে) বিনিয়োগ করা, আগমন ও বহিঃগমন প্রক্রিয়া সহজ করাসহ অনুকূল সহায়ক পরিবেশ নির্মাণ ও সঠিক প্রণোদনা প্রদান এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। পর্যটন সুবিধাবলি ও সেবায় বিনিয়োগের বেশিরভাগই আসতে হবে বেসরকারি খাত থেকে। কীভাবে এই বিনিয়োগ সুবিধা বাড়ানো যায় তা নির্ধারণের জন্য পর্যটন কর্পোরেশন, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে। চাহিদার ওপর নির্ভর করে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য প্রণোদনা, যেমন-ঋণ সুবিধা ও কর সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে। এছাড়াও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে।

গৃহায়ন: উচ্চ আয়ের দেশে অভ্যন্তীরন গৃহায়ন, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এই সকল বিষয় ও সমস্যাগুলো সুপরিচিত। গৃহায়ন খাতের উন্নতি বিধানের জন্য সরকারের একটি সুচিন্তিত কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ কৌশলের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো হলো-গৃহায়ন চাহিদা ও সরবরাহের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে একটি শক্তিশালী পরিবেশের উন্নতি সাধন।

গৃহায়নের চাহিদা: দীর্ঘ পরিসরে সংগঠিত গৃহায়ন বাজারের (সাধারণ সকল উচ্চ আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো উচ্চ প্রতিযোগি সুসংগঠিত জামানত অর্থায়নকারী শিল্পের অনুপস্থিতি। উচ্চ-আয় অর্থনীতিতে সুদের হার খুব কম, কারণ গৃহের মালিকানা স্বত্বকে সবচেয়ে নিরাপদ সম্পদ বলে মনে করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোসহ গৃহ অর্থায়ন কোম্পানিগুলো থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি নিম্ন খরচের অর্থায়ন পাওয়া যায়। সাধারণত তরুণ পরিবারগুলোকে চলতি আয় কিংবা ঋণ পরিশোধের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে জামানত পণ্য প্রাপ্যতার প্রতিযোগিতামূলক পরিসর সামান্য কিংবা জিরো ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে নিম্ন স্তরের আয়ে বাড়ির মালিকানা স্বত্ব নিতে সক্ষম করে তোলে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে বেসরকারি বাড়ি জামানত এন্টাপ্রাইজের উদ্ভবে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুদের হার অনেক উচ্চ এবং ঋণ নেওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত জটিল। রাজস্ব (Fiscal Policy) জামানতের ওপর মুনাফা খরচ কর হতে বাদ দেয়ার এবং আবাসিক সম্পদে পুঁজি অর্জনের ওপর নিম্ন কর হারের মাধ্যমে গৃহ মালিকানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নীতিটি বাড়ির মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি করতে সরকার বিবেচনা করতে পারে।

গৃহায়নের সরবরাহ: সরবরাহের দিক থেকে, সবচেয়ে বড় বাঁধা হলো নগরে জমির মূল্য। এটির সাথে অনেক বিষয় জড়িত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দুর্বল ভূমি প্রশাসন ও ভূমি বিনিময়ের উচ্চ মূল্য। উন্নত ভূমি ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে জিজিটাইজডকৃত সম্পত্তির রেকর্ড এবং নিম্ন খরচে ভূমি বিক্রি এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া, যা প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে গৃহায়নের সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকেও সহজিকরণ করতে হবে এবং সঠিকভাবে জোনিং বিধি নিষেধ, নির্মাণ অনুমোদন এবং নিরাপদ মানদণ্ড কার্যকর করা হবে। গৃহ সামগ্রীর ওপর বাণিজ্য কর হ্রাস করলে গৃহের খরচ কমাতে সাহায্য করবে।

৩.৭.৩ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

অবকাঠামো কর্মসূচির অগ্রাধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা খাতের বিস্তারিত বিষয় সংশ্লিষ্ট খাতগত অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে আলোচনা করা হলো -

পরিবহন

- সকল আন্তঃজেলা সড়কগুলোকে ৪-লেনে রূপান্তর করা;
- এশীয় মহাসড়ক কার্যকর করতে সড়ক/সেতু সংযোগ সম্পন্ন করা;
- পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করা;
- প্রধান প্রধান নগর কেন্দ্রে, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে চলমান ফ্লাইওভার সম্পন্ন করা;
- ঢাকায় চক্রাকার সড়ক সম্পন্ন করা;

- কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল নগরে গণ ট্রানজিট বাস্তবায়ন করা;
- কর্ণফুলি টানেলের কাজ সম্পন্ন করা;
- রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করা;
- মংলা বন্দরের কার্যকারিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের উন্নয়ন;
- কক্সবাজার বিমান বন্দরের উন্নয়ন;
- নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ;
- ড্রেজিংয়ের রক্ষনাবেক্ষণের ব্যবস্থা রেখে বড় বড় নদী পথের ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নেয়া;
- নদী ডকের উন্নতি বিধান এবং বড় বড় শহরে সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষা

- ভৌত সুযোগ সুবিধা ও শিক্ষাদান সরঞ্জামাদির উন্নতির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- উচ্চ/বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় জেন্ডার ব্যবধান দূর করতে নারীদের শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ দিয়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষা পদ্ধতির সক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণ;
- সকল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষার প্রসার;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করা;
- মাদ্রাসার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগতমান বৃদ্ধি করা;
- গবেষণা ও উন্নয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করা;
- কোভিড-১৯ মহামারী চালিত দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির দৃশ্যপটের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা;
- শিক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দৃষ্টান্তের ব্যবহার বৃদ্ধি করা;
- সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকল প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিয়ে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে সুসজ্জিত করার মাধ্যমে "ডিজিটাল লারনিং ইকো সিস্টেম" চালু করা;
- ভবিষ্যৎ জরুরি অবস্থার প্রস্তুতিতে সকল উদ্ভাবনীমূলক সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত শিক্ষামূলক সম্পদ রিপোজিটরি তৈরি করা।

স্বাস্থ্য

- মা, কিশোরী, শিশু ও নবজাতকের যত্নের ওপর আলোকপাত করে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ শক্তিশালী করা;
- জেলা পর্যায়ে টারশিয়ারি সরকারি স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি মেডিকেল স্টাফদের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
- উচ্চতর মেডিকেল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে বিশেষায়িত মানব-সম্পদ সৃষ্টি করা;
- গুণগতভাবে উন্নত ডাক্তার, নার্স এবং মেডিকেল টেকনিক্যাল প্রশিক্ষক তৈরি করতে মেডিকেল, নার্সিং এবং অন্যান্য মেডিকেল টেশনিক্যাল শিক্ষার উন্নতি বিধান ও প্রসার;
- আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির শক্তিশালীকরণ এবং সম্প্রসারণ।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)

- পিপিপি উদ্যোগের মাধ্যমে আইসিটি পার্ক নির্মাণ;
- উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগ স্থাপন;
- দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সংযোগের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের সংযোগ বাস্তবায়নের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করা;
- গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
- ই-গর্ভণ্যান্স, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ফিনটেক খাত ইত্যাদিতে আইসিটি সক্ষম সেবার জন্য পিপিপি সুবিধা প্রদান।

জন প্রশাসন

- সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শক্তিশালী করা;
- সরকারি খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা।

৩.৭.৪ সেবা খাতের দক্ষতার ভিত্তি শক্তিশালীকরণ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মান উন্নয়নে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও বিনিয়োগে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বের চলমান নীতি কার্যকর এবং তা চলমান থাকা উচিত। তবে সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মানদন্ডের ওপর সরকারের পর্যবেক্ষণের উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। উচ্চ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সুবিধা বাড়াতে, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সরকারের অনুদান কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। সরকারের আরো উচিত ই-শিক্ষণের সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অংশীদারিত্ব ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করা। একটি বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রথম সারির আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সরকারিভাবে সাহায্যকৃত শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে জাপান, কোরিয়া এবং চীনকে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে অপ্রতুল এমন কয়েকটি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ক্ষেত্রে একই ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়।

আরেকটি প্রধান নীতি হলো গবেষণা ও উন্নয়নের ওপর সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা। এখানে বেসরকারি খাত শিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রধান উৎস, যদিও উদ্ভাবনে প্রধানত সরকারি সম্পদ এবং এর জন্য সরকারি তহবিল প্রয়োজন। উন্নয়ন আগ্রহের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা অনুদান উদ্ভাবনের একটা বড় সঞ্চালক হতে পারে। কৃষি ও শিল্প খাতের সাথে এই গবেষণাকে যুক্ত করে বেসরকারি তহবিলের মাধ্যমে সরকারি সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বর্তমানে সরকার গবেষণার ওপর জিডিপি'র মাত্র ০.১৫ শতাংশ ব্যয় করে। ২০২৫ অর্থবছরর মধ্যে জিডিপি'র ১ শতাংশে পৌঁছতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি'র ৩ শতাংশে পৌঁছাতে এটিকে উচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি করতে হবে এবং ঐ স্তরে ধরে রাখতে হবে।

বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (NSDP) গ্রহণ করে। NSDP-ত যে প্রশিক্ষণ কৌশল প্রসারিত করা হয়েছে তাতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিপি, ২০১৩) সহায়তায় ২০১৩ সালে একটি বড় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি খাত দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের এবং কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও এক্ষেত্রে অগ্রগতি কম এবং গৃহিত প্রচেষ্টাসমূহ সরলভাবে দক্ষতা উন্নয়ন চাহিদার মাত্রা দিয়ে নির্ধারিত। বিশেষ করে বিমান, আন্তর্জাতিক শিপিং, পর্যটন এবং আইসিটির মতো রপ্তানিমুখী সেবার সক্ষমতার উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

বিমান চলাচল, আন্তর্জাতিক শিপিং ও পর্যটনে বিশেষায়িত দক্ষতা কর্মকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালোভাবে অর্জন করা যায়। এজন্য এই ধরণের দক্ষতা লাভের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া ও যৌথ উদ্যোগ। উদাহরণ হিসেবে হিসেবে বলা যায় যে, তৈরি-পোশাক শিল্পের সাফল্য এ ধরণের আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী। একই ধরণের ব্যবস্থা থেকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সেবা দানকারী হোটেল শিল্পও উপকৃত হচ্ছে, তবে এই শিল্পকে মজবুত ভিত্তি দানের জন্য এখনো অনেক কিছু করার রয়েছে। এ ধরণের অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্ধন করতে সরকার নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা পর্যালোচনা করবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আন্তর্জাতিক কারিগরি বিশেষজ্ঞদের ওয়ার্ক পারমিট, ভিসার আবশ্যিক শর্ত, নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রভৃতি আরো সহজ করা।

আইসিটি-র প্রসঙ্গে বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। সবার আগে যেটি প্রয়োজন তা হলো বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বাংলাদেশের সকল প্রান্তে বিস্তৃত করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো সাধারণ শিক্ষার প্রাধান্য রয়েছে। বিভিন্ন অনুদান ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ কেন্দ্র বিনির্মাণে সরকার সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও, সরকার উচ্চতর অর্থনীতির জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় আরো বাড়াবে, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণায় সহায়ক হবে। উন্নত অর্থনীতিগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণায় প্রবৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও উন্নয়নে সরকারি ব্যয় হলো সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। তদুপরি, বছরে ৫০০০ আইটি স্নাতকদের বর্তমান সরবরাহ যাতে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করা যায় এজন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হবে। মেট্রোপলিটন নগরগুলোর বাইরে থেকে সেই সব শিক্ষার্থীদের ভর্তি হতে উৎসাহিত করা হবে,

যাদের মধ্যে বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। এই ধরণের সুবিধা বাড়াতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলোতে আইটি শিক্ষা চালু করা হবে। এছাড়াও, আইটি শিক্ষায় ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে বিশেষ শিক্ষা ঋণ নীতি ও বৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা কর্মসূচিগুলোতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে।

৩.৭.৫ বিচক্ষণ বিধি বিধান (Prudential Regulations) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষাসহ (সকল সেবায়), আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা (ব্যাংকিং সেবায়), রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় সুরক্ষা দান (ইন্টারনেট নিরাপত্তা) এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য (পরিবহন, খাদ্যশিল্প, স্বাস্থ্য সেবা) বিচক্ষণ বিধি বিধান গ্রহণ করা হবে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিচক্ষণ বিধি বিধান কার্যকর রয়েছে। এতদসত্ত্বেও, অনেকগুলো সেবার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোতে ফারাক রয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবায়। এক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুর্বল বাস্তবায়ন সক্ষমতা।

তদানুসারে, সেবা খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবহন, ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন ও আইসিটি কার্যাবলী তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার বিচক্ষণ ও সহায়ক উভয় ধরণের পর্যাপ্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হবে। সংস্কারের জন্য সঠিক বৈশিষ্ট্যসূচক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে অংশীজনদের সাথে যথাযথভাবে পরামর্শ করা হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষাও পর্যালোচনা করা হবে।

বিচক্ষণ বিধি বিধান উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত মূল উপাদানগুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করা হবে:

- শিক্ষায় ন্যূনতম গুণগত মান নিশ্চিত করতে স্বীকৃতির নীতি।
- গ্রহণযোগ্য মান এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ল্যাবসহ চিকিৎসকদের জন্য লাইসেন্স প্রদান।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন ”অভিযোগ কেন্দ্র” প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এতে দুর্বল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের অভিযোগের প্রতি প্রতিকার করা সম্ভব হবে।
- স্যানিটেশনসহ স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন হোটেল, রেঁস্তোরা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক খাদ্য সামগ্রী বিক্রেতাদের জন্য লাইসেন্স প্রদান।
- ট্রাক ও বাস ড্রাইভারদের লাইসেন্স ও ড্রাইভিং রেকর্ডসমূহের পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।
- যানবাহনের ওজন ও অতিরিক্ত বোঝা বহনের ফলে সড়কের ক্ষতি পরিবীক্ষণ।
- বাণিজ্যিক যানবাহনের নিরাপত্তার আনুসঙ্গ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন।
- সকল নৌ-যানে কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং নৌ-যানে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন পরিবীক্ষণ করা।
- পরিবহন শিল্পে জড়িত সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ও এন্টারপ্রাইজের জন্য দুর্ঘটনা বিমা প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সকল বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য সঠিক জোনিং আইন প্রয়োগ এবং সকল ধরণের যানবাহনের জন্য কঠোরভাবে পার্কিং আইন বাস্তবায়ন।

এই নিয়ন্ত্রণ মূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বেসরকারি উদ্যোগের সহযোগিতা এবং গণ-মাধ্যমের সহায়তা নিয়ে সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষার সম্প্রচার। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক বোঝা কমাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণোদনা দিতে আর্থিক জরিমানা ব্যবস্থা চালু এবং যদি প্রয়োজন হয় লাইসেন্স বাতিল করা। এটি সরেজমিনে সঠিকতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এই নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী যে কোন প্রতিষ্ঠানকে হয়রানি বা ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। কোন সরকারি সংস্থার কর্মীদের জড়িত না করে অনলাইনে সকল লাইসেন্সিং কাজ পরিচালিত হবে এবং যাবতীয় কার্যাবলী যথা সময়ে সম্পন্ন করা হবে। অভিযোগ নিরসনকল্পে অনলাইনে একটি অভিযোগ নিবন্ধন ব্যবস্থা থাকবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ মূলক সংস্থার কর্মী সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কোন সরকারি সেবা কর্মীকে নৈতিক বা সেবার মান লঙ্ঘন করতে দেখা গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৭.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণের সমস্যা বাংলাদেশে বেশ বিস্তৃত। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ সরকারি সেবা খাতে সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে যেসব সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, এবং কৃষি। কিছু সরকারি সেবা এজেন্সি বেসরকারি খাতে শুধু নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি সহায়তা প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়,

বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়। কিন্তু আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা উভয় ধরণের সেবা দিয়ে থাকে। এই এজেন্সিগুলো সম্মিলিতভাবে জনপ্রশাসনের অংশ। এক্ষেত্রে, জনপ্রশাসনের বড় রকমের সংস্কার বাংলাদেশের উচ্চ-আয় মর্যাদা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেবা নিয়ে যারা কার্যক্রম পরিচালনা করে এরূপ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রয়োজন বিশেষ দক্ষতা ও সক্ষমতা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বেসরকারি বিমান চলাচল সংস্থা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) এবং পর্যটন করর্পোরেশন। এসব নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রত্যেকটির সক্ষমতা ও কার্যকারিতা সংশ্লিষ্ট সেবার মান আন্তর্জাতিক উপযোগীতে উন্নিত করার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে।

জনপ্রশাসনের সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এটি জটিল, রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এবং সময়সাপেক্ষ। তাই একটি বাস্তবিক সংস্কার কৌশল প্রয়োজন। একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি হলো এমন কিছু জায়গায় আলোকপাত করা, যা খুব বেশি বিতর্কিত নয় এবং অধিক জটিল প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য একটি পর্যায়গত পদ্ধতি অবলম্বন করা। এই সকল বৃহৎ উদ্যোগ যা উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা প্রদান করে, সেগুলো হলো জনপ্রশাসনের ডিজিটাইজেশন, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং জনপ্রশাসনের কর্মীদের জন্য একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কৌশল প্রণয়ন। দুর্নীতি সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ডিজিটাইজেশন বিশেষ ভাবে সহায়ক হতে পারে। ই-ক্রয়, ই-হস্তান্তর, এবং ই-সেবা প্রদান জনপ্রশাসনের জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং দুর্নীতি হ্রাস করতে একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। ইতোমধ্যে সরকার এক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তবে অগ্রগতি আশানূরূপ নয়। এই তিনটি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটির জন্য অগ্রগতির নির্দেশকগুলো নিয়ে একটি সময়বদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবদের দায়িত্ব দিয়ে মন্ত্রী পরিষদ পর্যায়ে অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা উচিত।

মৌলিক সেবা প্রদানের বিষয়ে একটি প্রধান সংস্কার হলো স্থানীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার বিকেন্দ্রীকরণ। এটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এবং চলমান সংস্কার। যদি বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করতে চায় তবে এটির বাস্তবায়ন জরুরি । এটির বাস্তবায়ন এখনই শুরু করা দরকার, কারণ এর বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ। বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে থাকবে আইনগত কাঠামোর সংস্কার, যা পরিষ্কারভাবে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব কর্তব্য তুলে ধরবে; দায়িত্ব কর্তব্যের জবাবদিহিতার বিতর্কিত বিষয়সমূহ পুনরাবৃত্তি রোধ করবে; আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ, যা অর্পিত দায়িত্বের সরকারি রাজস্বের যথাযথ অংশগ্রহণ সক্ষম করে তুলবে; সক্ষমতা ও প্রশিক্ষণ, এবং জবাবদিহিতার কাঠামো প্রণয়ন। এ বিষয়ে অনেক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশ তার বিকেন্দ্রীকরন কৌশল প্রণয়ণে শিক্ষা নিতে পারে।

৩.৭.৭ কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তার দক্ষতা

- **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করা:** কর্মসংস্থান নীতির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় করে শ্রম শক্তি ও সরকারি সহায়তার বৈচিত্রময়তা এবং অর্ন্তভূক্তি প্রতিষ্ঠা, কর্ম পুনঃনকশা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য দক্ষতার পুণঃপ্রশিক্ষণ অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
- **উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সহায়ক পদ্ধতি:** "সমগ্র সমাজ" এপ্রোচ নিশ্চিত করা, যাতে সবচেয়ে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিরা সুবিধা প্রাপ্ত হয় এবং কর্মসংস্থান ও আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে টেকসই অর্থপূর্ণ বাস্তবতা নির্ভর পদ্ধতি নিশ্চিত হয়।
- **পরিক্ষণ ও অভিযোজনের উন্নত খাতভিত্তিক পদ্ধতির প্রচলন:** প্রধান শিল্প গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সহায়তার সংমিশ্রণ, নতুন ব্যবসায় পদ্ধতি ও মডেল এবং নতুন দক্ষতার জন্য খাতভিত্তিক কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। সঠিক কৌশল প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন অংশীজনদের জন্য, বিশেষ করে প্রণোদনা মডেল নিয়ে পরিক্ষণকে উৎসাহিত করা।
- **জাতীয় অভিযোজনের সামষ্টিক জ্ঞানগত পদ্ধতি:** বাংলাদেশকে শ্রম বাজারের সাথে সহনশীল করার জন্য জ্ঞান ভান্ডার তৈরি করা।
- **অর্থায়নের ওপর সরকারি বেসরকারি সহ-সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরি করা, উদ্ভাবনী ইকো-পদ্ধতির সহায়তা করা, চাহিদা তৈরি (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য) এবং ইএসজি (ESG) (পরিবেশগত সামাজিক পরিচালনা) বিনিয়োগ:** এটি বেসরকারি খাতকে কার্যকরভাবে যুক্ত করতে সাহায্য করবে এবং এর ভূমিকার বিষয়ে অধিক স্বচ্ছতা অর্জন করবে। এর মধ্যে রয়েছে অর্থ, ব্যবসা উন্মেষ পর্ব সেই সাথে এবং বৃদ্ধিমূলক সেবার অভিগম্যতা এবং ভবিষ্যৎ টেকসই বাংলাদেশ নির্মাণে একটি সম্মিলিত দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৩.৮ সেবা খাতের জন্য বিনিয়োগ চাহিদা

সেবা খাতে বিনিয়োগের অধিকাংশ আসবে বেসরকারি খাত থেকে। নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রণোদনামূলক নীতিমালার উন্নয়ন দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করবে। তবুও, সেবায় বেসরকারি বিনিয়োগ, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি সেবার সম্প্রসারণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামোর উন্নয়নে সম্পূরক সরকারি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হবে।

সেবা খাতের আধুনিকায়নের জন্য জিডিপি'র অংশ হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নির্দেশনামূলক প্রক্ষেপণে দেখা যায় (সারণি ৩.১০), সেবা খাতে মোট বিনিয়োগ চাহিদা ২০২১ অর্থ-বছরের জিডিপি'র ১৫.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবছরে ১৮.৬ শতাংশে উন্নিত হবে। সেবা খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ অর্থ-বছরের জিডিপি'র ৪.২ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ৪.৬ শতাংশ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ২০২১ অর্থবছরে জিডিপি'র ১১.০ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ১৪.০ শতাংশে উন্নিত হবে। সরকারি খাতের অধিকাংশ বিনিয়োগ হবে পরিবহন, আইসিটি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা, গৃহায়ন, নগর সেবাসমূহ, খেলাধুলা ও বিনোদন, জনপ্রশাসন সম্পর্কিত ভৌত অবকাঠামো ও সুবিধাবলির উন্নয়নে। বেসরকারি বিনিয়োগ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পর্যটন, আইসিটি, জাহাজ পরিবহন, বিমান, সড়ক পরিবহন, গৃহায়ন এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানের ওপর আলোকপাত করবে। বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য বিধি বিধান প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট সংস্কারের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণকে গতিশীল করতে সরকারি বিনিয়োগ সম্পূরক ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৩.১০: সেবা খাতের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ

(২০২১ ভিত্তি মূল্যে, বিলিয়ন টাকা)

	২০২১ অর্থবছর	২০২৫ অর্থবছর
সরকারি	১৩৩৫	২১৩২
বেসরকারি	৩৪৭৫	৬৪৭৮
মোট	৩৬১০	৬৯৪৪
সরকারি (জিডিপি'র %)	৪.২	৪.৬
বেসরকারি (জিডিপি'র %)	১১.০	১৪.০
মোট (জিডিপি'র %)	**১৫.২**	**১৮.৬**

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণ

খাত-৪:
কৃষি

অধ্যায় ৪

কৃষি ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

৪.১ ভূমিকা

প্রবৃদ্ধি ও গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলো কৃষিখাত। মোট দেশজ জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ১৪ শতাংশ এবং দেশের শ্রম শক্তির ৪০% এর অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই কৃষিখাত। এই খাতের অবিরাম সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে কৃষিখাতের অবদান আপেক্ষিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূপান্তর অনুসরণ করে বাদবাকী অর্থনীতি (ম্যানুফ্যাকচারিং খাত) জিডিপিতে অধিক ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। স্বাধীনতার পরে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি হিসেবে যখন অর্থনীতির অর্ধেক অংশই ছিল কৃষি, তখন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ও সেবাসমূহের দিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বহুমূখীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। এতদসত্ত্বেও আপেক্ষিক তাৎপর্যকে পাশ কাটিয়ে ১৯৭০-১৯৯০ এর দশকে কৃষিতে গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ২শতাংশের চেয়ে কম থাকলেও ২০০০ দশকে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.০ শতাংশে এবং পরবর্তী দশকে ৩.৫% এ উন্নীত হয়েছে। কৃষি খাতে প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ নিয়ে গঠিত। এভাবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় এবং এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা নির্বাহে কৃষির কৌশলগত গুরুত্ব বিশেষ মনোযোগ আকর্ষনের দাবী রাখে।

কৃষিতে ঈর্ষনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও, বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশকে কঠিন সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই সমস্যার জন্য কয়েকটি বিষয় দায়ী যেমন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি হ্রাস, আয় আসমতা বৃদ্ধি, নগরায়নের হার বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি। বর্ধনশীল আয় ও নগরায়নের ফলে খাদ্য গ্রহণে কিছু বৈচিত্র্যতা এলেও শস্য জাতীয় খাবার এখনও ৭০ শতাংশ খাদ্য চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় কৃষি উৎপাদনে দ্রুত বহুমূখীকরণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়া বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধির ফলে ভাতসহ অন্যান্য খাবারের পুষ্টিগুণ পরিবর্তিত হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়া ছাড়াও জিংক ও অন্যান্য অনু পুষ্টি ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি প্রাদুর্ভাবের কারণে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ টেকসই প্রবৃদ্ধিতে কৃষির ভূমিকা কতটা জরুরি তা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। বৈশ্বিকভাবে, বিভিন্ন কৌশল যেমন বৃহৎ পরিসরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া, সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া এবং চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধের পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যে সয়ম্ভরতা অর্জনের পর, বাংলাদেশকে খাদ্য স্বল্পতার সংকটে পড়তে হয়নি। তথাপি, অর্থনৈতিক পরিসরে লকডাউনের পদক্ষেপসমূহ কৃষি সরবরাহ চেইনে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তগোষ্ঠীর খাদ্য গ্রহণ বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে ব্যাপকভাবে সাময়িক বেকারত্ব তৈরি হয়েছে। এই সংকটের ফলে কাঁচামাল সংগ্রহ ও শ্রমিক ঘাটতির করণে কৃষকদের বাজার অভিগম্যতা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। কম উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহ নষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে পোল্ট্রি ও ডেইরি উপখাতে এবং তাদের পণ্য বিক্রয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বিপুল পরিমানের খাদ্য নষ্ট হয়েছে এবং পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা যেমন ওইসিডি, আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতে, আন্তর্জাতিক সংকটের মেয়াদকাল এবং পরবর্তী পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। কৃষিতে সরবরাহ চেইন জটিল হওয়ায় এবং উৎপাদনে একটি নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন বিধায়, খাদ্য নিরাপত্তায় দীর্ঘমেয়াদে সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতএব কোভিড-১৯ সংকট থেকে উদ্ভূত ঝুঁকির ফলে কৃষিতে যে অচলাবস্থা তা তাৎক্ষণিক ভাবে মোকাবেলা করা এবং মধ্যমেয়াদ থেকে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি নীতিমালা ও কৌশলসমূহের মাধ্যমে সমস্যাগুলো মেটানো প্রয়োজন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টি নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, এই অধ্যায়ে কৃষির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে কেননা এটি সরবরাহের দিক থেকে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির মূল নিয়ামক। এখানে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে কারণ এটি কৃষির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথেও এটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ দরিদ্রের ঝুঁকি হ্রাসে এবং তাদের জীবিকা রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সুরক্ষা ও সমাজ কল্যাণ কৌশলগুলোর প্রেক্ষাপটে ১৪ অধ্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি খাতের অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন স্বপ্ন ছিল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বর্ধিত বাণিজ্যিকীকরণসহ জলবায়ু সহনশীল কৃষি উৎপাদনে টেকসই নিবিড়তা ও বহুমুখীকরণ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে জীবিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করা; গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা শক্তিশালীকরণ; কৃষি পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল প্রসারের উন্নয়ন এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারের সাথে কৃষকদের সংযোগ স্থাপন করা। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো খাদ্য শস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে শস্যে তা অর্জিত হয়েছে, এছাড়াও নীতিমালা, কৌশল ও কর্মকাণ্ডের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে যা কৃষক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দেশীয় ও রপ্তানি বাজারে সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিম্ন শ্রম উৎপাদনশীলতার কারণে ব্যাপক ভর্তুকি নির্ভর কৃষিখাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন ও তা টেকসই করা একটি কঠিন কাজ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম দুই বছরেও, এই খাতে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রবৃদ্ধি হার কম অর্জিত হয়েছে (চিত্র ৪.১)। তা সত্ত্বেও ঐ সময় থেকে এই খাত প্রত্যাশার চেয়ে ভাল করছে। সপ্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম ৪ বছর মেয়াদে এই খাতে ৩.৩ শতাংশ লক্ষ্যের বিপরীতে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি ৩.৫% অর্জিত হয়েছে। কৃষি জিডিপির অর্ধেকেরও বেশী নিয়ে গঠিত শস্য উপখাত ১.৪ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাৎসরিক গড় প্রবৃদ্ধি ১.৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

চিত্র ৪.১: কৃষি ও শস্যের প্রবৃদ্ধি: প্রকৃত ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (%)

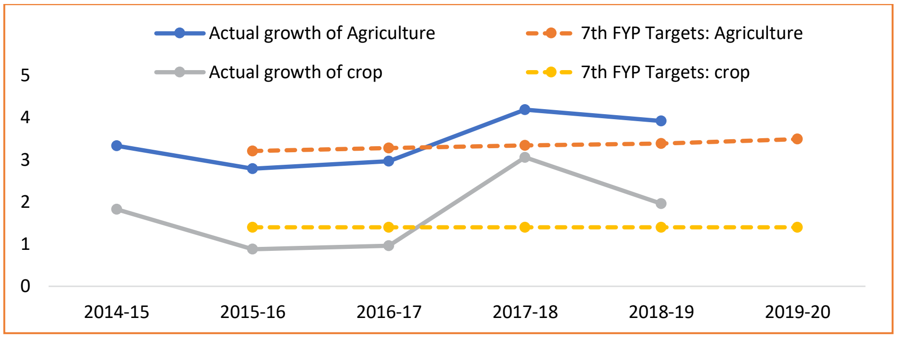

উৎস: বিবিএস এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ষষ্ঠ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত গড় প্রবৃদ্ধি ৪.৫৮% এর তুলনায় সপ্তম পরিকল্পনার প্রথম ৪ বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.১% অর্জিত হয়েছে বন উপখাতে। মৎস্য উপখাতে সাফল্যও ঈর্ষনীয়। এখাতের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি হার ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের উপরে অর্জিত হয়েছে।

সারণি ৪.১: কৃষি উপখাতগুলোর প্রবৃদ্ধি চিত্র

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
প্রবৃদ্ধি (%)					
কৃষি	৩.৩৩	২.৭৯	২.৯৭	৪.১৯	৩.৯২
ক.কৃষি ও বন	২.৪৫	১.৭৯	১.৯৬	৩.৪৭	৩.১৫
১)শস্য ও উদ্যান ফসল	১.৮৩	০.৮৮	০.৯৬	৩.০৬	১.৯৬
২)পশু খামার সংশ্লিষ্ট	৩.০৮	৩.১৯	৩.৩১	৩.৪	৩.৫৪
৩)বন ও সেবাসমূহ	৫.০৮	৫.১২	৫.৬	৫.৫১	৮.৩৪
খ.মৎস্য	৬.৩৮	৬.১১	৬.২৩	৬.৩৭	৬.২১
জিডিপির শতকরা (%)					
কৃষি (এ + বি)	১৬	১৫.৩৫	১৪.৭৪	১৪.২৩	১৩.৬৫
ক.কৃষি ও বন	১২.৩২	১১.৭	১১.১২	১০.৬৭	১০.১৫
১)শস্য ও উদ্যান ফসল	৮.৮৭	৮.৩৫	৭.৮৬	৭.৫১	৭.০৬
২)পশু খামার সংশ্লিষ্ট	১.৭৩	১.৬৬	১.৬	১.৫৩	১.৪৭
৩)বন ও সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ	১.৭২	১.৬৯	১.৬৬	১.৬২	১.৬২
খ.মৎস্য	৩.৬৯	৩.৬৫	৩.৬১	৩.৫৬	৩.৪৯

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান গত কয়েক দশকে কমেছে। কারণ অর্থনীতিতে কাঠামোগত রূপান্তর ঘটছে। সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২.৩৫% কমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩.৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খাতে নিয়োজিত ছিলো দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৩৫.২ শতাংশ। কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত অধিকাংশ লোক হয় প্রান্তিক নয়তো ভূমিহীণ কৃষক। কর্মজীবি নারীদের প্রায় ৬০ শতাংশই কৃষি কাজের সাথে জড়িত ছিল।

৪.৩ শস্য উপখাত

অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত দুই দশকে এটি দ্বিগুণ হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য আইটেমগুলোর মাথাপিছু প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৪.২)। খাদ্য শস্যের প্রাপ্যতার পরিমাণ ২০১০-১১ এর তুলনায় মাথাপিছু সামান্য হ্রাস পয়েছে। কিন্তু এর সাথে মাছ, মাংস ও দুধের মাথাপিছু প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। যা খাদ্য গ্রহণের বৈচিত্রতা প্রদর্শন করছে। আলু, তেল, ফলমূল এবং সব্জির মাথাপিছু প্রাপ্যতাও উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ দুটো খাদ্য আইটেম-ধান ও আলুর উদ্বৃত্ত উৎপাদক। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার সহায়ক সরকারি নীতিসমূহের কারণে খাদ্য আইটেমগুলোর মাথাপিছু প্রাপ্যতা বৃদ্ধির এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ডালের দেশীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ২০১০-১১ এবং ২০১৭-১৮ এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেছে। এর সম্ভাব্য কারণ হলো অন্যান্য শস্যের তুলনায় এই ফসলের নিম্ন ফলন হার। বাংলাদেশ ডাল ও তেল বীজ (ভোজ্য তেল) আমদানির ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্ভরশীল এ কারণে দেশীয় উৎপাদন এসব খাদ্য আইটেমের প্রাপ্যতায় অবদান কম। আরেকটি কারণ হতে পারে, অন্যান্য ফসলের আপেক্ষিক মূল্য বেশী বিধায় ডাল চাষের আওতায় কৃষি জমির পরিমাণ কম।

সারণি ৪.২: খাদ্য আইটেমগুলোর মাথাপিছু প্রাপ্যতা (গ্রাম/মাথাপিছু/দিন)

আইটেম	২০০৪-০৫	২০১০-১১	২০১৭-১৮
খাদ্য শস্য (চাল ও গম)	৪৯৫	৬৩৮	৬৩৪
আলু	১০৮	১৫৩	১৬৮
ডাল	১০	১৩	৭
তেল	১০	১৫	১৬
শাকসবজি	৩৫	৫৭	৭০
ফলমূল	৬৮	৬৫	৭৮
মাছ	৪১	৫৩	৭৪
মাংস	২১	৩৫	১২৫
দুধ	৪২	৫৫	১৬২

উৎস: বিবিএস,ডিএলএস,ডিওএফ।

খাদ্যের প্রকৃত ভোগ জনগণের খাদ্য অভিগম্যতা এবং প্রাপ্যতার প্রকৃত নির্দেশক। জাতীয় পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরীপে দেখা যায় যে, মাথাপিছু খাদ্য ভোগ ২০১০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারপরে প্রান্তিকভাবে কমেছে (চিত্র (৪.২) চাউলের মাথা পিছু ভোগ কমেছে। উপরে উল্লিখিত চাল বহির্ভূত আইটেমগুলোর বর্ধিত প্রাপ্যতার সাথে খাদ্য বৈচিত্রতা অসঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে চিত্রায়িত হয়েছে।

চিত্র ৪.২: বাংলাদেশে খাদ্য হিসেবে চাল ও মোট খাদ্যগ্রহণে পরিবর্তন ১৯৯১-২০১৬

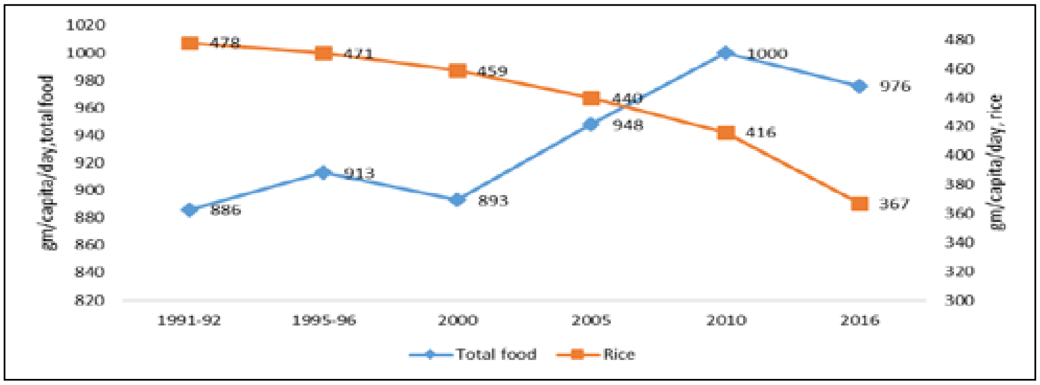

উৎস: পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ, বিবিএস.

এখানে উল্লেখ্য যে, মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণ ১৯৯১-৯২ সালের ২২৬৬ কেসিএএলএস থেকে ২০১৬ সালে কেসিএএলএস ২২১০ এ নেমে এসেছে, এই সময়ে উঠানামা খুব সামান্য। সবচেয়ে বেশী ক্যালোরি ভোগ ছিল ২০১০ সালে ২৩১৮ কেসিএএলএস কিন্তু ঐ লেভেলের ভোগ প্রতিদিন/ মাথা পিছু ২৪৩০ কেসিএএলএস কাঙ্খিত ভোগের লেভেলের চেয়ে কম ছিল। নিম্নতর ক্যালোরি ভোগের কারণ হলো জনগণ অধিক ক্যালোরি সম্পন্ন ভাতের পরিবর্তে অন্যান্য খাবার গ্রহণ করেছে। ২০১৬ সালে মাথাপিছু প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার ছিল দিনে ৬৩ গ্রাম যা মোটামুটিভাবে কাংখিত ৫৮ গ্রামের চেয়ে অধিক। এটি সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, খাদ্যে ক্যালোরি ঘাটতির অনুপস্থিতিতে লভ্য প্রোটিনকে ক্যালোরিতে রূপান্তরিত করতে পারে, যে কারণে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রোটিন গ্রহণ করা একজন ব্যক্তির ক্যালোরি ঘাটতি প্রোটিন দিয়ে পূরণ হতে পারে।

৪.৩.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের অগ্রগতি

গত তিনদশকে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এর সাথে সংগতি রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান খাদ্য আইটেমগুলোর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ২০১৯-২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ গম ছাড়া অন্যান্য সকল শস্যের জন্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে (সারণি ৪.৩)। সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ ও অনুকূল আবহাওয়া সহ উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহারের ফলে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গম উৎপাদন ২০১৬-১৭ সালে হুইট বাষ্ট (Wheat blast) এর কারণে কমে গেছে।

সারণি ৪.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্বাচিত ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

(মিলিয়ন মেট্রিকটন/পাটের জন্য মিলিয়ন বেল)

	অর্জন					লক্ষ্যমাত্রা ২০২১
	২০১৫-১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	
চাল	৩৪.৭১	৩৩.৮০	৩৬.২৮	৩৭.৩৬	৩৮.৭০	৩৬.৮১
গম	১.৩৫	১.৩১	১.১	১.১৫	১.২৫	১.৪০
আলু	১০.৩০	১০.২১	৯.৭৪	১০.৬৫	১০.৯২	১০.৩৪
তেল	১.০০	১.০৬	০.৯৭	১.০৬	১.১৫	০.৫২
ডাল	১.০১	১.০৩	১.০৪	০.৯৪	১.০৫	০.৩১
ভূট্টা	২.৭৬	৩.৫২	৩.৮৯	৪.৭	৫.৪০	১.৮৫
শাক সব্জি	১৫.২৬	১৬.০৪	১৫.৯৫	১৭.২৫	১৮.৪৫	-
পাট	৭.৫৬	৮.২৫	৮.৮৯	৭.৪৪	৬.৮২	-

উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (২০২০), কৃষি মন্ত্রণালয় এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১

সপ্তম পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনশীলতার ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে উৎপাদন টেকসইভাবে বৃদ্ধি পায়। সময়ের ব্যবধানে প্রধান প্রধান কৃষি পণ্যের ফলন হার বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও এগুলো এখনও অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৯১ সালের ১.৭১১ মেট্রিকটন/হেক্টর থেকে ধান ফলনের হার ২০১৮ সালে ৩.২৩ মেট্রিকটন/হেক্টেরে পৌঁছতে বাৎসরিক ২.৬৩৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধান চাষের তিনটি মৌসুমের মধ্যে উৎপাদনশীলতায় বেশী প্রবৃদ্ধি হয়েছে আউশের (৩.২০৫% বাৎসরিক) ক্ষেত্রে, এর পরেই রয়েছে বোরো (২.০৭১% বাৎসরিক) এবং আমন (১.৮৯৩% বাৎসরিক) (চিত্র -৪.৩)। ধান চাষে সাম্প্রতিক নীতি পরিবর্তন, উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার এবং কৃষি পদ্ধতিসহ রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ফলন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন রাবার ও পেঁপে) প্রধান প্রধান ফসলগুলোর ফলন হার তাৎপর্যপূর্ণ পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য ফলন বৃদ্ধি প্রদর্শনকারী কিছু শস্য হলো খাদ্য শস্যের মধ্যে ভূট্টা, ডালের মধ্যে মটর ডাল, মসলার মধ্যে রসুন ও পেয়াজ এবং ফলমূলের মধ্যে আম, পেয়ারা এবং তরমুজ। এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় ফলনের বিবেচনায় পিছিয়ে আছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় ও ধান উৎপাদনে তৃতীয় সর্ববৃহৎ উৎপাদক দেশ। ফলন বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পাটে সপ্তম ও ধানে ৪৪ তম। এমনকি ভূট্টার সর্বোচ্চ ফলনশীল প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ভূট্টার ক্ষেত্রে ফলন বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ২৬ তম। এই প্রেক্ষাপটে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই হবে অষ্টম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

চিত্র ৪.৩: প্রধান প্রধান খাদ্যের ফলন হারের ধারা (মেট্রিকটন/হেক্টর)

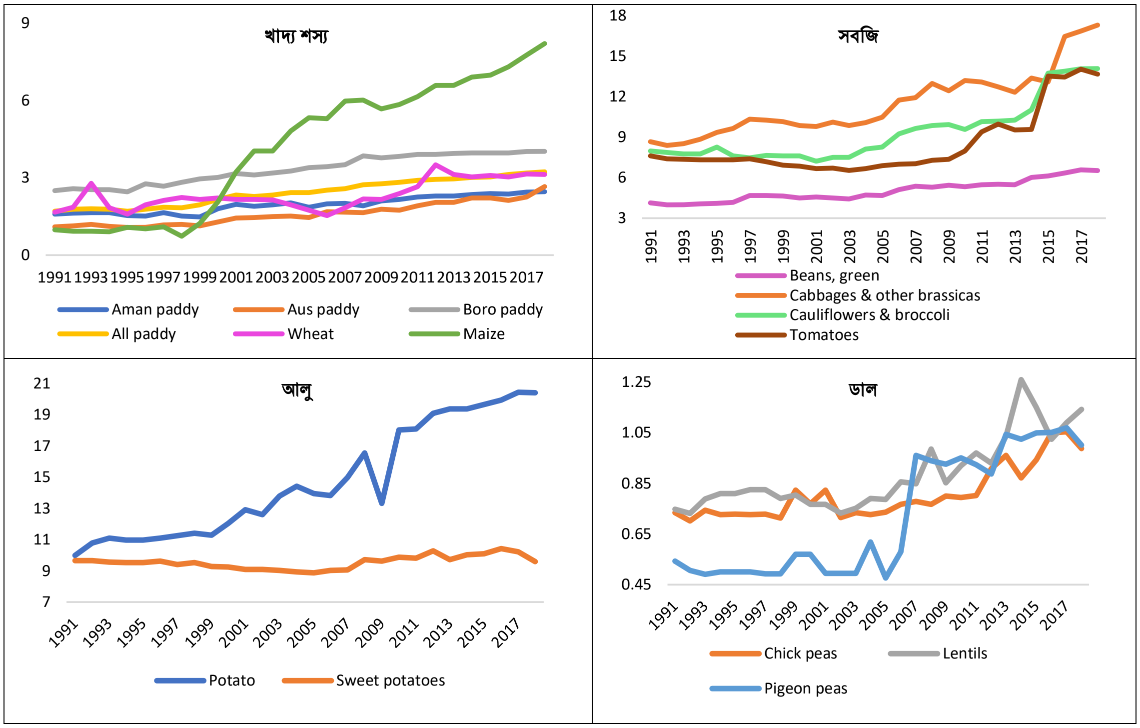

উৎস: অষ্টম পরিকল্পনার ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার

৪.৩.২ শস্য উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

দ্রুত শিল্পায়নের কারণে কৃষি জমি হ্রাসের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এর কিছু কিছু চ্যালেঞ্জের সম্পর্ক রয়েছে। মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা, ঋণের অভিগম্যতা, কৃষিতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু পণ্য মূল্যের অবিরাম পরিবর্তন অন্যতম বিষয় যা কৃষকদের প্রতিনিয়ত মুখোমুখী হতে হয়। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সংগ্রহোত্তর ক্ষতিও বৃদ্ধি পায়, যার পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশের ওপর। উচ্চমূল্য ও শ্রম নিবিড় ফসল উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি টেকসই করা কঠিন হবে যদি ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করা না হয় (সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস জাতির জন্য ১০% অতিরিক্ত খাদ্য সরবরাহ করবে)। বছরব্যাপি ফসলের বাজারজাতকরণকে সহায়তা করার জন্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হবে, যা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে পুরো মৌসুমে বাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করবে। উপরন্ত উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে মোড়কজাত নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান করা হবে।

শস্য উৎপাদনের প্রধান চলিকা শক্তি হলো উন্নত জাত ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার, দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা, শস্য ব্যবস্থাপনা ও সেচ অবকাঠামোর প্রসার বিশেষত: অগভীর নলকূপ ভিত্তিক ভূ-গর্ভস্থ সেচ ব্যবস্থা। এছাড়াও জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের মাধ্যমে ফসলের আধুনিক জাত ও প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন করা হচ্ছে। ভর্তুকি দেওয়ার কারণে নন ইউরিয়া সারের ব্যবহার বেড়েছে। এতদসত্ত্বেও কৃষক পর্যায়ে সম্ভাব্য ও প্রকৃত উৎপাদন বিবেচনায় ফলন পার্থক্য এখনও অনেক বেশী। ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন যেমন ঘাত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা চর্চা প্রধান ফসলসমূহের জাতের মান উন্নয়ণ, রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনা, সম্পদ সংরক্ষণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মূল্য সংযোজন, এবং ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু স্মার্ট প্রযুক্তি শস্য উপখাতের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। কৃষি ফসল খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ সমূহ হচ্ছে :

নিম্ন উৎপাদনশীলতা: নিম্ন উৎপাদনশীলতা কৃষির অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও বাজার অস্থিতিশীলতা সংশোধনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি, বিনা, বিজেআরআই), বাংলাদেশ সুগার ক্রপ রিসার্চ (BSRI) এবং বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) উদ্ভাবনের মাধ্যমে ঘাত সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিখাতে প্রযুক্তির ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছে। তা সত্ত্বেও দরিদ্র কৃষকদের অধিকাংশের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা নাই বা কম আছে। এরফলে উৎপাদনশীলতায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে। কৃষিখাতে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবশ্যই যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদনশীলতা কম। কৃষকের মাঠ ও গবেষণা ট্রায়ালের মধ্যে ফসলের বড় ব্যবধান রয়েছে। যা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের জন্যও প্রযোজ্য। উচ্চ মাত্রার ফলন পার্থক্য কৃষি উৎপাদন ও মুনাফায় তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে, যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং সর্বশেষে কৃষি জিডিপির ওপর প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সরকার "ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২(এনএটিপি-২) প্রকল্প" গ্রহণ করেছে যাতে বিভিন্ন ধানের ফলন পার্থক্য কমাতে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনীসমূহে আমন, বোরো ও আউশ মৌসুমের ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি ফলন ব্যবধান কমেছে যথাক্রমে ১.০৫ টন (কৃষকের গতানুগতিক চাষ পদ্ধতিতে ২৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে), ১.০২ টন (২২% ফলন বৃদ্ধি) এবং ০.৬১% টন (১৭% ফলন বৃদ্ধি)। এতদসত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ এখনও চিন্তার বিষয় যেখানে দেশের সম্প্রসারণ সেবার কার্যকারিতাকে মাঝারি মানের বিবেচনা করা হয়।

বাংলাদেশে শস্য নিবিড়তা হচ্ছে ১৯৪- যার অর্থ হলো এই যে প্রতিবছর এক টুকরো জমিতে গড়ে দুটি ফসলের চেয়েও কম উৎপাদন করা হয় যা চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামসহ অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। শস্য নিবিড়তার চলতি মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে তা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

গবেষণা সম্প্রসারণ-কৃষক সংযোগে প্রাতিষ্ঠানিক বাঁধাসমূহ: এটি প্রমানিত সত্য যে, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষক, বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা ও এনজিওসমূহের নিকট নতুন প্রযুক্তিসমূহ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ সংযোগ স্থাপনে কার্যকরী ও শক্তিশালী সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তথাপি কৃষি গবেষণা একটা অবহেলিত ক্ষেত্র, এখানে বাজেট বরাদ্দ কম এবং তুলনামূলকভাবে বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণা ও আর্থিক সুযোগ সুবিধাও পর্যাপ্ত নয়। একজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (এসএএও) গড়ে ১১৬২টি খামার নিয়ে কাজ করে যা একটা অসম্ভব লক্ষ্য (বিবিএস,২০১৯ডিএই,২০১৭)। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্নেন্স ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে গবেষণা ও এর সম্প্রসারণ সেবা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তন ও সম্পর্কিত অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম। যদিও গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণে আমাদের ভূমিকা সামান্য। বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণতার নেতিবাচক প্রভাবের সাথে খাপখাওয়াতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা ও এর প্রভাবে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ কৃষি ও মানুষের জীবন যাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, বিশেষ করে যারা কৃষি থেকে জীবিকা নির্বাহ করে (বিশ্ব ব্যাংক ২০০৮)।

জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ধারণা করা হচ্ছে যে গড় বাৎসরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি শতাব্দীতে ৩.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে ৩.৩(+০.৪) মি.মি. বরফ ও হিমবাহ গলে সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। এই বিষয়টি বাংলাদেশকে সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে নিম্ন ভূমি ও বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযোগ থাকার কারণে। অনেক কৃষি জমি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আগামী দিনগুলোতে পানির নীচে তলিয়ে যাবে। অন্যদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ত পানির সমস্যা উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষের জীবিকার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুভাবে লবণাক্ততার ঝুঁকি বাড়বে বলে আশঙ্কা রয়েছে। প্রথমত, ব-দ্বীপ অঞ্চল ও জলাভূমিসমূহ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকিতে পড়বে এবং সেচ ব্যবস্থা ও ভূ-ওপরস্থ পানি সম্পদে লবণাক্ততা সমস্যার কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়ত, উচ্চ তাপমাত্রার ফলে ভূপৃষ্ঠে অত্যধিক লবণ জমা হবে, যারফলে ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততার হারও বৃদ্ধি পাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ পরিবর্তিত হচ্ছে যা জনগণের জীবিকার ওপর, বিশেষ করে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে পানির ব্যাপক সংকট এবং বর্ষাকালে অত্যধিক পানির কারণে কৃষিতে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলবে। খরিপ মৌসুমে ধানসহ গ্রীষ্মকালীন অন্যান্য ফসলে বন্যার ঝুঁকি বৃদ্ধির সাথে বোরো (বৃষ্টি পরবর্তী মৌসুম) ধান উৎপাদনের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যান্য প্রভাবের কারণে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে (Yu et al. 2010)। রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারসহ জীবিকা রক্ষার্থে অবকাঠামো নির্মাণের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য জলবায়ু সহনশীল তহবিল পরিচালনা করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনেও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তির অবনমন ও ভূগর্ভস্থ পানিস্তর হ্রাস: দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ আরোও কমে যাচ্ছে। মাটির জৈব উপাদান কম থাকায় মাটির উর্বরতার অবস্থা নিম্ন থেকে মাঝামাঝি পর্যায়ের। অনেক বছর ধরেই মাটিতে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। বর্তমাণে বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট সারের ৭৫ শতাংশই হচ্ছে নাইট্রোজেন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের ব্যবহার জৈব উপাদান খনিজকরণ বৃদ্ধি করে যা মাটিতে কার্বণ কমাতে পারে এবং সিও২ নির্গমণ বৃদ্ধি করে। ২০০৮-০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের ভর্তুকির ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা করছে। টিএসপি,এমওপি ও ডিএপির মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে ইউরিয়া বিক্রি হ্রাস পেয়েছে এবং অন্যান্য তিনটি সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৪.৪)।

সারণি ৪.৪: বছরভিত্তিক সারের মূল্য ও বিক্রয়

সময়কাল	মূল্য (টাকা/কেজি)				বিক্রয় (লাখ মেট্রিকটন)			
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	ডিএপি	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	ডিএপি
২০০৮/০৯	১২	৪০	৩৫	৪৫	২৫.৩৩	১.৭৫	০.৮৫	০.১৮
২০০৯/১০	১২	২২	২৫	৩০	২৪.০৯	৪.৩২	২.৭৫	১.৩৭
২০১০/১১	১২	২২	১৫	২৭	২৬.৫৫	৫.৯১	৫.০৭	৩.৩১
২০১১/১২	২০	২২	১৫	২৭	২২.৯৬	৬.৪১	৬.০৩	৪.০৩
২০১২/১৩	২০	২২	১৫	২৭	২২.৪৭	৬.৫৪	৫.৭১	৪.৩৪
২০১৩/১৪	১৬	২২	১৫	২৭	২৪.৬২	৬.৮৫	৫.৭৬	৫.৪৩
২০১৪/১৫	১৬	২২	১৫	২৫	২৬.৩৮	৭.২২	৬.৪	৫.৯৭
২০১৫/১৬	১৬	২২	১৫	২৫	২২.৯১	৭.৩০	৭.২৬	৬.৫৮

উৎস: কৃষি মন্ত্রণালয় (২০২০)।

সঠিক সেচ হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি। কৃষি সেচেই ব্যবহৃত হচ্ছে স্বাদু পানির ৭০-৮০ শতাংশ। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুতর প্রভাব রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত কমে যাচ্ছে (চিত্র ৪.৪)। এতে ভবিষ্যতে সেচের পানির প্রাপ্যতা ও খাবার পানির প্রাপ্যতার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। দেশের সেচ দক্ষতা খুব কম যা ৩০-৪০ শতাংশের মধ্যে, এই নির্দেশকেও এটি প্রতিয়মান সেচে অনেক পানির অপচয় হচ্ছে। অন্যান্য কয়েকটি কারণের সাথে গতানুগতিক সেচ মূল্য ব্যবস্থা যেখানে কৃষকরা জমির পরিমানের ভিত্তিতে সেচের মূল্য পরিশোধ করে থাকে যা সেচের অদক্ষতাকে বাড়াতে ভূমিকা রাখে। পানির পরিমানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারনের পদ্ধিতি যা বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক কিছু এলাকায় অনুসরণ করা হচ্ছে, এইরূপ মূল্য ব্যবস্থাপনায় একজন কৃষক তার কৃষি উৎপাদন ঠিক রেখে সেচের পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে সেচ খরচ কমাতে পারে। ফসলের বহুমূখীকরণের জন্য একজন কৃষক উদ্বুদ্ধ হতে পারে যেহেতু ধানের তুলনায় কিছু কিছু ফসলে কম পানি প্রয়োজন হয়। অতএব শুষ্ক বোরো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ কমাতে এবং উচ্চ মূল্যের ফসল যেমন ডাল, সরিষা, তৈল বীজ ,মসলা ও শাকসজির উৎপাদন বাড়াতে ধান ব্যতিত অন্যান্য ফসলের চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব ফসলের উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাত করার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চিত্র ৪.৪: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর

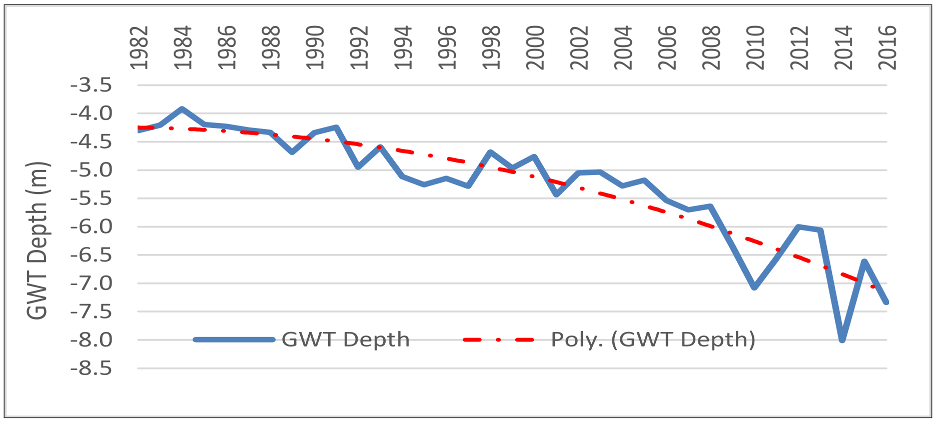

উৎস: এফপিএমইউ

কৃষি জমির প্রাপ্যতা হ্রাস: জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষি জমি কৃষি বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়িঘর এবং রাস্তা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মানের জন্য কৃষি জমির ওপর চাপ বাড়ছে। প্রতিবছর ০.৭৩ শতাংশ হারে চাষকৃত জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ২০২০ সালে মোট আবাদযোগ্য জমি ৮.৫ মিলিয়ন হেক্টের এসে পৌঁছেছে। যদিহ্রাসের এই হার চলতে থাকে তবে ২০২৫ সাল নাগাদ আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮.০০ মিলিয়ন হেক্টরে এসে দাঁড়াবে। জলাবদ্ধতা ,ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং মাটির উর্বরতা কমে যাওয়া, ভূমিধ্বস এবং লবণাক্ততার মতো জলবায়ুর পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবগুলো এই প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করছে। উদাহরণস্বরূপ গত তিন দশকে দক্ষিনাঞ্চলে, কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে প্রায় ১৭০,০০ হেক্টর কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে (কৃষি মন্ত্রণালয় ও এফএও ২০১১)। নদীর বাঁধের প্রায় ১২০০০ কিলোমিটার এলাকায় ৪০% জমি হারানোর কারণ হচ্ছে নদীভাঙ্গন। এর ফলে উপরের উর্বর মাটি ধুয়ে যাচ্ছে এবং জমির উপরে বালুতে ভরে যাচ্ছে। আবাদযোগ্য জমির প্রাপ্যতা এভাবে আগামী বছরগুলোতে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

ঋণ অভিগম্যতার সমস্যা: কৃষি ঋণ এই খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জীবিকার বহুমূখীকরণের চাবিকাঠি যা সামগ্রিক কৃষি বহুমূখীকরণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে একটা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে কৃষি ঋণের বরাদ্দ বৃদ্ধি বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশের কৃষক কৃষি উৎপাদন ফসল বহুমূখীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের প্রবেশগম্যতায় সমস্যার সম্মুখীন হয়, প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব এবং উচ্চ জামানত এক্ষেত্রে একটা বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

ঋণ অভিগম্যতার সমস্যা: কৃষি ঋণ এই খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্র কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জীবিকার বহুমূখীকরণের চাবিকাঠি যা সামগ্রিক কৃষি বহুমূখীকরণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে একটা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে কৃষি ঋণের বরাদ্দ বৃদ্ধি বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশের কৃষক কৃষি উৎপাদন ফসল বহুমূখীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, মূল্য সংযোজন এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের প্রবেশগম্যতায় সমস্যার সম্মুখীন হয় প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাব এবং উচ্চ জামানত এক্ষেত্রে একটা বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি: খাদ্যবাহিত রোগগুলো এখন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষিতে নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে, বিশেষ করে শাকসবজির ক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহার খাদ্য জনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। ক্ষতিকর কৃষি রাসায়নিক কিংবা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রিজারভেটিভস খাদ্য আইটেমগুলোতে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য স্বাস্থ্যবিধির নীতি অনুসরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে খাদ্য বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। উৎপাদনস্তর থেকে খাদ্য গ্রহণ পর্যন্ত খাদ্যকে নিরাপদ রাখা প্রয়োজন। দরিদ্র লোক ছাড়াও বিশেষ করে নবজাতক ও শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগে যা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ এবং অপর্য়াপ্ত ভিটামিন এবং অপর্যাপ্ত মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের ফলাফল। অপুষ্টিজনিত কারণে ১ বছর বয়সী শিশুরা কম ওজন, খর্বাকৃতি, মারাত্মক কৃশকায় হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে অপুষ্টি জনিত কারণে ৫ বছরের কম বয়সীদের শিশু মৃত্যু হার ৪৫ শতাংশ।

সংরক্ষণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ: উন্নত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, উন্নত মূল্য শৃঙ্খল সুযোগসুবিধা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কৃষকদের অভিগম্যতা কৃষি উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফসল কাটার মৌসুমে নিম্ন পণ্য মূল্য সবসময়ই কৃষকদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। সীমিত সংরক্ষণ সুবিধা যে কেবলমাত্র গুণগত মানই অনিশ্চিত করে তা নয় বরং কৃষকদের লাভও কমিয়ে দেয়। যথাযথ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকায় সংগ্রহোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন পর্বে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যের অপচয় হয়। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের অবারিত এক সম্ভাবনা রয়েছে যদি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। উৎপাদন ও রপ্তানি সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার জন্য উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। উত্তম কৃষি চর্চা উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর পর্যায়েও প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

অন্যান্য সমস্যাসমূহ: শস্য উপখাতে অন্যান্য আরো কিছু সমস্যা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ধীরগতি; সেচ ব্যবস্থার অদক্ষতা; নিম্ন মানের ও ভেজাল কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীটনাশক); নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ব্যবসায়ী কতৃক বাজারজাতকরণ; ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ; উৎপাদনকারীদের জন্য খামার গেইট মূল্য সহায়তা অনুপস্থিতি; ফসলের বিদ্যমান ফলন পার্থক্য হ্রাস; ভূমি, শ্রম ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ; উৎপাদিত পন্যের গুণগতমান ও খাদ্যকে নিরাপদ রাখা; ফসল কাটার পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস করা; কৃষিতে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; সৌর শক্তির ব্যবহার, জৈব সার, কৃষি বজ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৪.৩.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফসল উপখাতের কৌশলসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ফসল উপখাতের উন্নয়ন ভিশন হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; ফলন পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা; কৃষিপণ্যের স্থিতিশীল বাজারমূল্য; কৃষকদের লাভ ও নিরাপত্তা; জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতাকে সামনে রেখে শস্য বহুমুখীকরণ; কৃষির সরবরাহ শৃঙ্খলকে জোরদারকরণ; তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিকরণ বৃদ্ধি; ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কৃষিঋণ সহজ করা; অগ্রণী গবেষণা ও সেবা প্রদানকারীদের উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন; এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। নীতিগ্রহণের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা অর্জনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, শস্য বহুমূখীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণ এবং কৃষক ও অন্যান্য অংশিজনদের জন্য স্থানীয় ও রপ্তানি বাজারের সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উপখাতের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- ফসলের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যের সহজলভ্যতা, খাদ্যের অধিকার ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষ প্রযুক্তি পরিষেবাগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি করা;
- পুষ্টিকর, নিরাপদ ও চাহিদা রয়েছে এমন খাদ্যের চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- কোভিড-১৯ মহামারীর পর কৃষিপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন সাধন করা, কোভিড ১৯ এর বিরূপ প্রভাব সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে এনে সংকট পরবর্তী কৃষির প্রবৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য কৃষি গবেষণা আধুনিকায়ন, শিক্ষা, সম্প্রসারণ, উপকরণ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিপণ্যের বিপণন সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা;
- প্রিসিশন এগ্রিকালচার প্রবর্তন এবং সমালয় চাষ পদ্বতি তথা সুসমন্বিত ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, শারীরিক শ্রমের ব্যবহার হ্রাস এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ী চাষ পদ্ধতি চালু করা;
- ভূমি, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের আরও দক্ষ ও সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান সেচ ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে এনে সেচ কাজে ভূপরিস্থিত পানির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;
- ক্ষুদ্র সেচের জন্য সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনে গ্রামীণ এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান;
- অধিক সেচ চহিদা সম্পন্ন ফসলের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে কম সেচ প্রয়োজন এমন উচ্চ মূল্য ফসল উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- কৃষিক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজির প্রবর্তন, বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তিকে উৎসাহ প্রদান, খরা, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ত প্রবন এলাকা উপযোগী কৃষি উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ যেখানে পানি ও সময় এর অর্থনৈতিক দিকটি যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রবর্তন ও চর্চা করা যেখানে খরাপ্রবণ, জলাভূমি, পাহাড় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব সবুজ প্রযুক্তি (যেমন আইপিএম, আইএনএম, এডব্লিউডি ইত্যাদি এবং জলবায়ু স্মার্ট) প্রযুক্তির ব্যবহারসহ আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উৎসাহিত করা এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত, জলমগ্নতা এবং অন্যান্য ঘাত সহিষ্ণু ফসলের জাত সমূহের প্রচলন করা;
- মূল্য সংযোজন, সরবরাহ শৃঙ্খল এর উন্নয়ন, চাহিদা উপযোগী ও রপ্তানিমুখী কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা;
- আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃসংস্থার সমন্বয় এবং সকলের অংশগ্রহণে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বসতবাড়ির আঙ্গিনায় খালি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ জোর দিয়ে হলিস্টিক ফামিং সিস্টেম এ্যাপ্রোচ (HFSA) এর মাধ্যমে কৃষকদের জীবিকা ও আয় বৃদ্ধি করা;
- উদ্ভিদের জিনগত সম্পদ, ঔষধি উদ্ভিদ ও খাদ্য ফসলের বীজের জিনগত বৈচিত্র বজায় রাখা এবং বিলুপ্তি থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয় এবং ভূমি রেস সংরক্ষণ করা;

লক্ষ্যমাত্রা: কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানসম্পন্ন এবং উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ সুনিশ্চিত করে কৃষকদের জন্য সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রধান খাদ্যে (চাল) ইতোমধ্যে অর্জিত স্বয়ম্ভরতা অক্ষুন্ন রেখে বিদ্যমান ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং বিভিন্ন ধরণের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। উচ্চমূল্যের ফসলের সাথে কৃষি বহুমূখীকরণ, দেশের সরবরাহ চ্যানেলগুলোকে সংহতকরণ এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের নিকট কৃষিঋণ পৌছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যকে দেশের আগামী পাঁচ বছরের আদর্শ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। প্রধান ফসল সমূহের আগামী পাঁচ বছরের উৎপাদনের প্রাক্কলন সারণি ৪.৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৫: গত ৫-১০ বছরের গড় উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে ২০২৫ পর্যন্ত প্রধান ফসলসমূহের প্রাক্কলিত গড় উৎপাদন

(মি:মে.টন, পাট-মিলিয়ন বেল)

প্রক্ষেপণ/প্রক্ষেপিত						
প্রধান ফসল	**২০১৮-২০১৯ (ভিত্তি বছর)**	**২০২০-২০২১**	**২০২১-২০২২**	**২০২২-২০২৩**	**২০২৩-২০২৪**	**২০২৪-২০২৫**
ধান	৩৮.৭০	৩৯.২৯	৩৯.৮৯	৪০.৪৯	৪১.১১	৪১.৭৩
গম	১.২৫	১.২৯	১.৩২৩	১.৩৭	১.৪১	১.৪৬
আলু	১০.৯২	১১.২৩	১১.৫৪	১১.৮৬	১২.২০	১২.৫৪
তৈল বীজ	১.১৫	১.১৮	১.২১	১.২৩	১.২৬	১.২৯
সবজি	১৮.৪৫	১৯.৪৪	২০.৪৮	২১.৫৮	২২.৭৪	২৩.৯৬
ভুট্টা	৫.৪	৫.৬৭	৫.৯৫	৬.২৫	৬.৫৬	৬.৮৯
মশলা	৩.৯৫*	৪.০৩	৪.১১	৪.১৯	৪.২৮	৪.৩৬
ডাল	১.০৫	১.০৯	১.১৩	১.১৭	১.২১	১.২৫
পাঁট	৬.৮২	৮.০১	৮.০২	৮.০২	৮.০২	৮.০৩

*উৎস: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, *লক্ষ্যমাত্রা (২০১৯-২০)*

২০১৯ ভিত্তিবছরে ধানের উৎপাদন ৩৮.৭০ মি: মে.টন এর বিপরীতে ২০২৫ অর্থবছরে তা ৪১.৭৩ মি: মে.টন এ উন্নীত করা হবে। একইভাবে গম, আলু, ভুট্টা, ডাল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফসলের বৈচিত্রতার মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনার নিমিত্ত আরো যেসব লক্ষ্যসমূহ এ পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- কৃষি উপকরণের দাম ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা এবং প্রধান ফসল সমূহের বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে অস্থিরতা কমিয়ে আনা নিশ্চিত করা হবে।
- ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি সহ প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- ধানের ২৫টি এবং ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের জাত উন্নয়ন (২০০০টি জেনেটিক রিসোর্স, ১০০টি জলবায়ু ঘাত সহিষ্ণু);
- জৈব সার ব্যবহার এবং জৈব বালাই ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- বীজ উৎপাদন, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, ফসল ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা এবং এলাকাভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়ন;
- জনসাধারণের পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য নির্ভর পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত অপুষ্টিজনিত সমস্যা কমিয়ে এনে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন। পুষ্টি ও খাদ্য চেইনে উপস্থিত কৃষি রাসায়নিক বা ভারি ধাতুর ক্ষতিকর প্রভাব (উদাহরণস্বরুপ আর্সেনিক, সীসা, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি) সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা এবং ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
- আধুনিক ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তরের সাথে সাথে কৃষকদেরকে তুলার আধুনিক উচ্চ ফলনশীল (HYV) জাত সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
- ব্যাংক ও অন্যন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদের কম সুদে (২ শতাংশ) ঋণ প্রদান এবং কৃষকদের ঋণ সুবিধার পরিধি বৃদ্ধি করা হবে;
- বাজারে প্রবেশগম্যতা এবং বাজার সংযোগ কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশনের পরিধি বৃদ্ধি, ই-কৃষি বিপণন প্রতিষ্ঠা করা;
- আকাশ চিত্রের বিশ্লেষণ এবং মাঠজরিপ ও গবেষণাগারে মৃত্তিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে সমগ্রদেশের মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পাদন

এবং বিভিন্ন সংস্থার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত এলাকা ও গবেষণা খামারে বিস্তারিত/আধাবিস্তারিত (Semi- detailed) মৃত্তিকা জরিপ কাজ সম্পাদন, সমস্যাযুক্ত মৃত্তিকা অঞ্চলগুলো শনাক্তকরণের জন্য মৃত্তিকা জরিপ সম্পাদন (উদাহরণস্বরূপ: বিষাক্ত, লবণাক্ত, ক্ষারীয় বা পিটযুক্ত মাটি), ক্ষয়িষ্ণু প্রবণ মৃত্তিকা এলাকা চিহ্নিতকরণ, ভূমির ক্ষয় এবং ভাঙ্গনের কারণ অনুসন্ধান বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় মৃত্তিকা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জলাশয় ব্যবস্থাপনা;

- অনলাইনে সার সুপারিশ সিস্টেম (OFRS) এবং অফলাইন সার সুপারিশ সিস্টেম (মোবাইল অ্যাপস) এর মাধ্যমে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের সেবা প্রদান;
- কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহী করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

সারণি ৪.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা

কর্মসূচি	অর্থবছর ২১-২৫ (প্রতিবছর)
উপজেলা মাটি ও ভূমি ব্যবহারের নির্দেশিকা হালনাগাদ করা	৫০
ইউনিয়ন পর্যায়ে জমি, ভূমি এবং সারের ব্যবহার নির্দেশিকা	১৬০
মাটির বিশ্লেষণ এবং সার কার্ড বিতরণ	২৬,০০০
অনলাইন সার সুপারিশ সিস্টেমের জন্য উপজেলা ভিত্তিক মাটি ও ভূমি সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদকরণ	৫০
উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য মাটি এবং পানি লবণাক্ততার তথ্য হালনাগাদকরণ	৬০০
সারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নমুনা বিশ্লেষণ	৪০০০
উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে টেকসই মাটি ব্যবস্থাপানার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং হস্তান্তর	৩ (২০২৫ এর মধ্যে)
পার্বত্য অঞ্চলে টেকসই মাটি ব্যবস্থাপানার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং স্থানান্তর	৩ (২০২৫ এর মধ্যে)
মাটির উর্বরতা ব্যবস্থাপানার জন্য প্রর্দশনী কার্যক্রম	৯০
সুষম সার ব্যবহার এবং ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৬০০০
উপজেলা নির্দেশিকা এর ওপর ডিএই / এসআরডিআই অফিসারদের প্রশিক্ষণ	২০০

নোট: অন্যভাবে বিবৃত না হলে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা। উৎস: এসআরডিআই (SRDI)

উপরিল্লিখিত ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

টেকসই কৃষি এবং সবুজ প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহ প্রদান: টেকসইতা কেবলমাত্র বায়োফিজিক্যাল মাত্রিক বিষয়ই নয় বরং তা সম্পদ ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনশীলতা ব্যবহার সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধির সাথে জড়িত এবং যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদিও বিবেচ্য (Herdt and Lynam,1998)। বর্তমানে অর্জিত সাফল্য ধরে রেখে একটি কার্যকর টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিকে দুর্বল না করে ফলনের উচ্চমাত্রা অর্জন ও লাভজনক খামার টেকসই হবে। পূর্ববর্তী পরিকল্পনা ও নীতিসমূহে জৈব কৃষি, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম), এডব্লিউডি সহ অন্যান্য পদ্ধতি ও কৌশল চিহ্নিত করে তা প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল। এগুলো সফলভাবে গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা দলিলে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও যৌথ প্রয়াসের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাসত্ত্বেও এক্ষেত্রে প্রকৃত অর্জন কাঙ্খিত মাত্রায় হয়নি। পরিবেশবান্ধব এসব প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য কৃষকদেরকে সুবিধা প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক ও নীতিসহায়তা সম্বলিত একটি ইকোসিস্টেম পেমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রচলিত ইউরিয়ার তুলনায় গুটি ইউরিয়া কম দূষন ও বেশী উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করে। এটিকে আরো জনপ্রিয় করতে গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের জন্য আরও বেশী প্রণোদনা (অধিক ভর্তুকি) প্রদান করা যেতে পারে।

বিভিন্ন নীতি সহায়তার মাধ্যমে টেকসই কৃষি ও সবুজ প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এর জন্য এমন ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে যাতে এটি সম্পদ সংরক্ষণ, সামাজিকভাবে সহায়ক বাণিজ্যিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবেশ সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে যে কার্যক্রমগুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হবে সেগুলো হলো: (১) টেকসই কৃষিকে কার্যকর করার জন্য সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের মধ্যে অংশীদারিত্ব বাড়ানো; (২) আইসিএম, আইএনএম, আইডিএম (সেক্স ফেরোমন, উদ্ভিদজাত কীটনাশক, জৈবিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) প্রসার করে পরিবেশ রক্ষা করা হবে, কৃষিকাজে ভূ-উপরিস্থিত এবং বৃষ্টির পানি, সৌর শক্তির ব্যবহার করা হবে; (৩) জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, ডিলার, পরিবেশক, উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ী, প্রশিক্ষক এবং গবেষক (পুরুষ, নারী, যুবকদের লক্ষ্য করে) সহ কৃষির সকল ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে; (৪) বৃষ্টিনির্ভর কৃষির উন্নয়ন সাধন; (৫) কৃষক দলের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর; (৬) জীব বৈচিত্র রক্ষা (উদ্ভিদ, প্রাণী, মৎস্য, পরাগবাহ

ইত্যাদি) (৭) খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং খাদ্য বৈচিত্রতা প্রসার; (৮) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (ভূমি, পানি, জীব বৈচিত্র); (৯) কৃষি পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান; (১০) কৃষিকাজে অর্থনৈতিক বাস্তবোপযোগিতা বজায় রাখা; (১১) প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা; (১২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহ প্রদান; (১৩) নতুন জেগে উঠা চর ও উপকূলীয় ভূমি ব্যবহার এবং সামুদ্রিক শৈবাল চাষ।

প্রধান খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন এবং খাদ্যশস্য বহির্ভূত ফসলের বৈচিত্রতা নিশ্চিতকরণ: পূর্ববর্তী দুটি পরিকল্পনা দলিলের সাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলেও প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা বজায় রাখার বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়েছে, যেখানে সকল সেক্টরের ভিতরে এবং বাইরে একই সাথে কাঙ্খিতমাত্রার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণ দুটোই নিশ্চিত করা হবে, যার ফলে দেশের বিভিন্ন এগ্রোইকোলজিক্যাল এলাকায় বসবাসকারি তথা ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি জনিত চাহিদা পূরণে বৈচিত্রময় খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

এ কৌশলটির জন্য এলাকানির্ভর আধুনিক জাত উন্নয়ন ও ফলনশীলতা বৃদ্ধির গবেষণা প্রয়োজন হবে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর (NARS) বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে এ সম্পর্কিত নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নতুন প্রযুক্তিগুলো কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের কাজ করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে কৃষি মন্ত্রণালয়। ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মের শেষের দিকে অনিশ্চিত আবহাওয়া এড়ানোর জন্য আউসের স্বল্পকালীনজাত চাষাবাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং কৃষকপর্যায়ে আধুনিক ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফলন ব্যবধান (Yield Gap) হ্রাস করার কৌশল গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে। উপকূলীয় অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল, চর অঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের মতো দরিদ্রপীড়িত জেলাগুলোর মত পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি মনোযোগ প্রয়োজন। অন্যকৌশলটি হলো বোরো মৌসুমে বিরাজমান অনুকূল আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়ে ধান ব্যাতিত অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনে এবং বছরের বাকি মৌসুমে ধানের ২টি আবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

কোভিড-১৯ মহামারীর বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা: কৃষিখাতে মহামারীর বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার নিমিত্ত (শুধুমাত্র ফসল উপখাতে সীমাবদ্ধ নয়) সরকার কৃষকদের সুবিধা প্রদানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যাতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পোল্ট্রি, দুগ্ধখাত ও মৎস্য খাতসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা এই প্যাকেজের আওতায় মাত্র ৪ শতাংশ সুদে এই ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এই উদ্যোগ থেকে কৃষকরা আগামী ৩ বছর উপকৃত হবে। ক্ষুদ্র কৃষকরা কোন জামানত ছাড়াই এই ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এর বাইরে বাজেটে সারের ভর্তুকি বাবদ ৯,৫০০কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (২০২১ অর্থ-বছরের বাজেট অনুযায়ী) কোভিড এর প্রভাব কমিয়ে আনার সরকারের কৌশলের অংশ হিসেবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে ১৫০ কোটি টাকার বীজ বিতরণ করা হয়েছে কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য। উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা সুরক্ষার জন্য বিশেষত: সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ভিজিডি, ভিজিএফ এবং ইজিপিপি সহ বিদ্যমান নগদ অর্থ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করা হবে এবং নতুন অন্যান্য কর্মসৃজন কর্মসূচি শুরু করা হবে। দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থা ও কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার ওপরই এই প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর সাফল্য নির্ভর করছে। প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ বিতরণ এবং এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ জন্য একটি তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি কৃষি খাতের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গড়ে তোলা প্রয়োজন যেনো উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল যেকোনো সংকটের সময় বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়। এই ফান্ডটি ফসল, ফসল বহির্ভূত অন্যান্য কৃষি (ঘড়হ ঈৎড়ঢ়), মৎস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি উৎপাদিত কৃষিপণ্যের স্থিতিশীল বাজারমূল্যের জন্য নীতিগ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: অন্যান্য ফসলের তুলনায় ধান চাষাবাদে যেহেতু অধিক পানির প্রয়োজন সেকারণে শস্য বহুমুখীকরণ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের কার্যকর পন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেচ দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য যেসব প্রযুক্তি সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে (বারিড পাইপ, পিভিসি/প্লাস্টিক পাইপ/পলিথিন পাইপ ইত্যাদি) এবং কৃষিখামারে পানি ব্যবহারের দক্ষতা (ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ, শস্য বহির্ভূত ফসলের জন্য ফার্টিগেশন- ড্রিপ পদ্ধতিতে) বৃদ্ধির সহায়ক পদ্ধতিসমূহকে উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন। বিএমডিএ কর্তৃক চালুকৃত ভলিউমেট্রিক পদ্ধতিতে সেচের পানির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি কৃষকদেরকে সেচ কাজে পানির যৌক্তিক ব্যবহারে উৎসাহিত করছে, এ পদ্ধতিটি গভীর নলকূপের সেচাধীন এলাকা সমূহেও প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হবে। পরিমানের ভিত্তিতে পর্যায় ভিত্তিক দাম নির্ধারণ পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন মূল্যে যে পরিমাণ পানি নির্ধারিত হবে তা বরেন্দ্র এলাকায় কৃষকদেরকে যৌক্তিক পর্যায়ে সেচে পানি ব্যবহারে উৎসাহিত করবে।

গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণের যথাযথ ব্যবহার: বাংলাদেশে কৃষি উপকরণের মোট চাহিদার বড় একটা অংশ আন্তর্জাতিক উৎস হতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং সরাকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সরবরাহ চেইন এর উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন যাতে করে কৃষকরা কম পরিবহন ব্যয়ে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। সুষম এবং পরিমিত রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। নন-ইউরিয়া সার ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে সারের ভর্তুকি নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে। যার ফলশ্রুতিতে নন-ইউরিয়া সারের ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস পাওয়া শুরু হয়েছে। উপরন্তু অর্গানিক/জৈব সারের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহার এবং মৃত্তিকা নির্দেশিকা ও মৃত্তিকা পরীক্ষার সুনির্ধারিত উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করা হবে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে সহায়তা কার্যক্রম: বিশেষকরে ফসল কর্তন মৌসুমে কৃষি মজুরি বৃদ্ধি সাম্প্রতিক সময়ে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, ব্যয় হ্রাস করে এবং কৃষি কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিয়োজিত স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের কৌশলগুলোর উন্নয়ন করা হবে। প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং বিস্তারে সরকারি ও বেসরকারিখাতের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়তা প্রয়োজন, বিশেষকরে পাওয়ার টিলার, শক্তিচালিত মাড়াইযন্ত্রের পাশাপাশি রাইসট্রান্সপ্লান্টার, রিপার,ট্রাক্টর এবং কম্বাইন হারভেস্টর ইত্যাদি জাতীয় কৃষিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদক, নির্মাতা, কৃষকপর্যায়ে নির্ধারিত যন্ত্রপাতিতে নগদ প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখে যান্ত্রিকীকরণে উৎসাহ প্রদানের নীতি চালু রাখা হবে।

ভূমি সংস্কার: ভূমি সংস্কারের প্রভাব কৃষির বাইরেও রয়েছে কারণ এটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় শক্তির কাঠামোর ভারসাম্যেও পরিবর্তন আনে। এটি প্রকৃত কৃষকদের ক্ষমতায়িত করে এবং তাদের সংগঠিত করে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ করে তোলে। উপরন্তু এর বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রেরণার প্রয়োজন। কৃষি জমির ক্রমবর্ধনশীল বাজার ইতিমধ্যে কিছু ইক্যুইটি সুবিধা তৈরি করেছে। প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার জন্য বর্গাদারদের উচ্ছেদ ও ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার কৌশলগুলো অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। সরকারি খাস জমি ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা দরকার। ভূমি রেকর্ড ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অটোমেশন প্রক্রিয়া হস্তান্তর জনিত ব্যয় হ্রাস এবং অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা হ্রাস করবে, উল্লেখ্য যে ভূমি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে "Automation of Land Management Project" এবং "Capacity Development of Land Records and Survey to Perform Digital Survey Project" শীর্ষক দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বৃষ্টি নির্ভর ছাদ বাগান এবং উলম্ব কৃষির মাধ্যমে নগর কৃষির প্রসার: শহরের পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য নগর কৃষিকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এটি শহরের সেই মানুষগুলোর নিরাপদ খাদ্যের উৎস হতে পারে যাদের পক্ষে প্রচলিত কৃষি কাজ সম্ভব নয়। নগর কৃষি কাজ কম উপকরণ নিবিড়, এটি টেকসই পরিবেশ অর্জনে সহায়তা করবে। যদি এক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে বৃষ্টির পানি ও ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। উপরন্তু নগর কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য, উৎপাদন টেকসই নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন প্রয়োজন। দক্ষ সার প্রয়োগ প্রযুক্তি এবং রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনার জন্যও গবেষণা প্রয়োজন। সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সর্বোপরি, নগর কৃষিপণ্যকে মূল্য শৃঙ্খল এর সাথে সংযুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। উলম্ব কৃষিকাজ সম্প্রসারণ ছোট শহরগুলোকে আরো দক্ষতার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনেও সহায়তা করতে পারে। বেসরকারি এবং/অথবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে শহরাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে উলম্ব কৃষিকাজ করা যেতে পারে। উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে, উলম্ব কৃষিকাজ এর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে শহরাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদিত হতে পারে।

শস্য জোনিং এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা: খাদ্য উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদনের জন্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও এর সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা প্রয়োজনীয় একটি কাজ। সপ্তম পরিকল্পনায়ও শস্য জোনিং এবং ভূমির ব্যবহার পরিকল্পনার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল, তার কিছুটা অর্জিতও হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমন্বিত করে একটি বিস্তৃত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অষ্টম পরিকল্পনায় ভূমি ও পানি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচিকে আরো বেগবান করা হবে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রচার করা হবে এবং জোনিংয়ের ভিত্তিতে ফসলের আবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

প্রিসিসন এগ্রিকালচার প্রসার: সম্পদ সংরক্ষণ এবং কৃষিজ উপকরণের বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রিসিসন এগ্রিকালচারে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা সম্পদের সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে উপকরণ সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং রিটার্ন সর্বোচ্চকরণ নিশ্চিত করবে। যেখানে সম্ভব হবে সেখানেই প্রিসিসন এগ্রিকালচার গ্রহণ করা হবে। লেজার ইকুইপমেন্ট, বারিড পাইপ পদ্ধতিতে সেচ, ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচ, সবজির হাইড্রোপনিক চাষ পদ্ধতি, বেড প্লান্টিং, ইউএসজি ও আইপিএম ব্যবহার এর মাধ্যমে ভূমি অক্ষত রাখা (Land Levelling) প্রিসিসন এগ্রিকালচারের উদাহরণ। এটি উপকরণ ব্যবহার সাশ্রয় করবে, ফলন ও লাভজনকতা বাড়াবে এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাবে।

উত্তম কৃষি চর্চা প্রবর্তন ও জনপ্রিয়করণ: একটি মানদণ্ড প্রণয়ন, স্থানীয় বাজার এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনের জন্য প্রধানত: প্রত্যয়ন ও প্রত্যয়নের স্বীকৃতির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উত্তম কৃষি চর্চার প্রটোকল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কৃষির পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক অবস্থাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। উত্তম কৃষি চর্চার বিষয়টি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অসম্পন্ন রয়ে গেছে। উত্তম কৃষি চর্চার চারটি স্তম্ভ রয়েছে: অর্থনৈতিক বাস্তবতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং খাদ্য সুরক্ষা ও গুণগতমান। এই বিষয়টি প্রচারের জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। উত্তম কৃষি চর্চা প্রচলন করা হলে যে বিষয়গুলো নিশ্চিত হবে তা হচ্ছে: (i) নিরাপদ ও গুণগতমানসম্পন্ন খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের নিরাপদ ও গুণগতমান নিশ্চিত করবে; (ii) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন বাজারের সুযোগ সৃষ্টি হবে; এবং (iii) প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কাজের শর্তের উন্নয়ন হবে। এটি পুনরৎপাদনশীল কৃষিকে উৎসাহিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হবে যার উদ্দেশ্য হবে মাটি এবং মাটির উপরের বায়োম্যাস কার্বনধারণ করা, বৈশ্বিক বায়ুমন্ডলে কার্বন জমার প্রবণতার বিপরীত ধারা হিসেবে কাজ করবে। একই সময়ে এটি ফলন বৃদ্ধি জলবায়ু ঘাত সহিষ্ণু বীজ এবং কৃষিকাজ ও পশুপালনে নিয়োজিতদের ভাল স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বাড়াবে। সামগ্রিকভাবে এটি পরিবেশগত টেকসইতা এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পুনরৎপাদনশীল কৃষিকে প্রচার ও জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: পঁচনশীল কৃষিপণ্যের ভরা মৌসুমে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয়ে থাকে বাংলাদেশে। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার উন্নয়ন সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক হতে পারে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্পগুলো বর্তমানে বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। খামার পণ্য ও উপজাত পণ্য সমূহের গুদামজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্যাকেজিং করার জন্য অধিকাংশ প্রযুক্তি ও সুবিধাগুলো নিম্নমানের ও পুরোনোই রয়ে গেছে কারণ তারা মূলত স্থানীয় বাজার চাহিদাকে বিবেচনা করে থাকে। একইসাথে সামর্থের পুরোটা ব্যবহার করতে না পারার ব্যর্থতাও রয়েছে। বিএআরআই এবং অনুরূপ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো ফসল কর্তন পরবর্তী ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়নের গবেষণা পরিচালনা করবে, উদাহরণস্বরূপ প্যাকেজিং এবং কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ। ইতোমধ্যে দেশের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুলো কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এতদসত্ত্বেও কিছু বিশেষায়িত সম্প্রসারণ কার্যক্রম যেমন ফল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্র বেসরকারি খাতের জন্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি বাণিজ্যকে প্রদত্ত সহায়তা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে এবং এটিকে আরো জোরদার করা হবে।

রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ও হিমাগার: বাংলাদেশে বছরব্যাপী বিপুল পরিমাণে ফলমূল ও শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। বিশেষত সংরক্ষণ সুবিধা এবং পরিবহনের সময় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে অকার্যকর পদ্ধতির কারণে কৃষকদের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যাইহোক, সংরক্ষণ পর্যায়ে শীতল চেম্বার এবং পরিবহন পর্যায়ে রেফ্রিজারেটেড ভ্যান ব্যবহার করে শীতল চেইন বজায় রেখে কৃষিপণ্যের শেল্ফ লাইফ বৃদ্ধি করে সংগ্রহোত্তর লোকসান হ্রাস করা সম্ভব। চাহিদার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে ভোক্তা পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে সুপার শপ ও চেইন শপের সংখ্যা বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে, শীতল চেম্বার ও ফ্রিজ ভ্যান ব্যবহারের চাহিদা বাড়ছে। এছাড়াও রপ্তানীযোগ্য পচনশীল শাকসবজি এবং ফল সংরক্ষণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে এর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে যে কারণে একটি শীতল চেইন বজায় রাখার চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। উপযুক্ত স্টোরেজ এবং পরিবহন ব্যবস্থার সক্ষমতার উন্নয়ন উৎপাদনকারীদের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে পারে এবং বাজারে মৌসুমজুড়ে চাহিদা সরবরাহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে।

কৃষি গবেষণা: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষির বৈচিত্রতা বাড়ানোই গবেষণা ও উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৃষি গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে, ফলন ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং বৈচিত্রতা এবং নিবিড়তা, কমিউনিটিভিত্তিক চাষাবাদ, টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (উদাহরণস্বরূপ কৃষিক্ষেত্রের জন্য বৃষ্টির পানি এবং নদীর পানি সংরক্ষণ), রোগ ও বালাই ব্যবস্থাপনা, উচ্চমূল্যের কৃষিজাত পণ্যের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন জাত/প্রজাতির উন্নয়ন, জিনোমিক্স এবং ফিনোমিক্সের মতো

অগ্রগামী গবেষণা, শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা সালোকসংশ্লেষণ দক্ষতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, পলিসেড এবং পুষ্টি নির্ভর চাষাবাদ, উলম্ব চাষ পদ্ধতি, যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি। এটি লবণাক্ত ও খরা সহনশীল, স্বল্পমেয়াদী জাত, উচ্চমূল্যের পণ্য এবং স্বল্পব্যয়, সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তিতে গভীর প্রভাবকারী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োজনীয় জাত উদ্ভাবন করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব গুলোকে মোকাবেলা করা হবে। উপরন্তু প্যাকেজিং, ফসল সংগ্রহ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাজার উপযোগী, আইপিএম, অন-ফার্ম পানি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি এবং বায়োসিকিউরিটি গবেষণাসহ সমকালীন অন্যান্য বিষয়ের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। এ জন্য গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য বাজেটের বর্তমান বরাদ্দ ১.৫ শতাংশের স্থলে কৃষি জিডিপি'র কমপক্ষে ৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।

চাহিদা নির্ভর কৃষি সম্প্রসারণ: যথাযথ সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর, বহুমূখীকরণ এবং ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি পরিবেশগত অবস্থা, বিদ্যমান উৎপাদনশীলতা ব্যবধান এবং আঞ্চলিক নির্দিষ্টতার ভিত্তি কৃষির প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ম্যাপিং প্রণয়ন করা হবে। সম্প্রসারণ সেবাসমূহ কৃষকদের জন্য সঠিক সময়ে এবং সঠিক স্থানে কার্যকর পরামর্শমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বহুমাত্রিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। সম্প্রসারণ সেবায় দক্ষতা ব্যবধান, উৎপাদন ব্যবধান এবং কৃষি বৈচিত্রতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্য তালিকার বৈচিত্রতা আনয়ন এবং কৃষি পণ্যের জন্য মূল্যসংযোজনের পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধির বিষয়সমূহে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উচ্চমাত্রার উৎপাদনশীলতা অর্জন ও তা টেকসই করার লক্ষ্যে গবেষণা সম্প্রসারণ-কৃষক সংযোগকে জোরদার করা হবে। গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সংযোগে এমন একটি পরামর্শগ্রহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যেখানে কৃষকরা তাদের সমস্যার সম্ভাব্য প্রতিকার পাবে এবং গবেষকরা কৃষকদের মাঠের প্রায়োগিক ফলাফল তাদের গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষকদের মধ্যে এই ত্রি-মুখী সংযোগ ও যোগাযোগকে আরও জোরদার করা হবে। একই রকমের এগ্রোইকোলজিক্যাল জোনভুক্ত ২-৬ টি জেলার জন্য গঠিত কারিগরি কমিটি এবং কৃষি কারিগরি কমিটিগুলোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা হবে। পুষ্টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির সাথে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম আরও বেগবান করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্প্রসারণের নিম্নোক্ত অগ্রধিকার কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করা হবে:

- গবেষণা-সম্প্রসারণ-কৃষক সংযোগ জোরদারকরণ;
- ফসলের জোনিং ও মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে শস্য বহুমূখীকরণের কর্মসূচি প্রণয়ন ও প্রসার;
- ক্ষুদ্র সেচ প্রযুক্তি এবং সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার সম্প্রসারণ;
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বোরো ধান ফলনে কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত ঘাত সহিষ্ণু জাতসমূহ জনপ্রিয়করণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- বরেন্দ্র এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকায় উচ্চমূল্য ফসলের মাধ্যমে বৈচিত্রকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;
- বীজ, কীটনাশক এবং সারের গুণগতমান পর্যবেক্ষনের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন;
- প্রযুক্তি প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, কৃষক মেলার আয়োজন;
- তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পরিকল্পনার ওপর ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রসারণ পদ্ধতি অনুসরণ;
- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী, নারী কৃষকদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকল কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা হবে;
- পরিবেশ বান্ধব কৃষি চর্চার উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) নিশ্চিত করা হবে;
- ক্ষুদ্র কৃষক ও মাঝারি কৃষকদের জন্য কৃষিঋণ সহজলভ্য করা;
- ধানের ফলন ব্যবধান কমিয়ে আনার কৌশলসমূহ প্রচার করা;
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলন ব্যবধান, প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাব এবং ফলনশীলতার ব্যবধান হ্রাস;
- সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদারকরণ;
- এমআইএস ও আইসিটি ভিত্তিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ই-কৃষি জোরদারকরণ;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র (FIAC) স্থাপন ও কৃষি কে বাণিজ্যিকিকরণ করার কার্যক্রমে সহায়তা।

কৃষিতে নারী ও যুবদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ: বিশ্বব্যাপী নারীদের কৃষিতে অংশগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। যেখানে শ্রম শক্তি অর্ধেকেরও বেশি নারী এবং তাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে, ঋণ সহজীকরণ নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তা গড়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো প্রেরণামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা করে যুবদের কৃষি এবং সংগঠন ভিত্তিক

কার্যক্রমে আকৃষ্ট করতে হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীরা বীজ বপন ও শস্য কাটার পরের কার্যক্রমে যুক্ত থাকে। অষ্টমপঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৃষি কর্মসংস্থানে নারীদের উৎপাদনশীল অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব/প্রাধান্য দিবে এবং অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাধান করার চেষ্টা করা হবেঃ (১) কৃষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মজুরির পার্থক্য; (২) আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা যেসব সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়; (৩) ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মতো অন্যান্য পরিসেবাদির সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সেবাগুলোতে নারীর প্রবেশগম্যতা; এবং (৪) বাজারে ও উচ্চমূল্য সংযোজিত কৃষিতে নারীদের প্রবেশগম্যতা।

৪.৪ প্রাণি-সম্পদ উপখাত

গত তিন দশকে গৃহপালিত পশু ও পোল্ট্রি উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৪.৫)। ১৯৯০-এর দশকে গবাদি পশুর সংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল গরু ও মহিষ। বর্তমানে মোট গবাদি পশুর প্রায় ৭০ শতাংশ ছাগল। কৃষিকাজে পশু শক্তি (Animal Force) হিসেবে গরু-মহিষের ব্যবহারহ্রাস পাওয়ায় এমনটি হতে পারে। পোল্ট্রির সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই মুরগি এবং যা মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বিশ্বে সর্বোচ্চ গবাদি পশুর ঘনত্ব সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বড় গবাদি পশুর সংখ্যা ২৮২টি, তবে তাদের বেশিরভাগই স্থানীয় নিম্নমানের জাত, স্থানীয় গবাদি পশুর গড় ওজন, গরুর ক্ষেত্রে ১২৫-১৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ক্ষেত্রে ২০০-২৫০ কেজি, ভারতের সব কাজ উপযোগী গবাদি পশুর গড় ওজনের তুলনায় যা ২৫-৩৫ শতাংশ কম। বাংলাদেশে দুধের উৎপাদন কম, যা ১০ মাসব্যাপী দুগ্ধদান সময়কালে মাত্র ২০০-২৫০ লিটার, যেখানে পাকিস্থানে ৮০০ লিটার, ভারতে ৫০০ লিটার এবং এশিয়া মহাদেশে ৭০০ লিটার।

চিত্র ৪.৫: বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন (সংখ্যা)

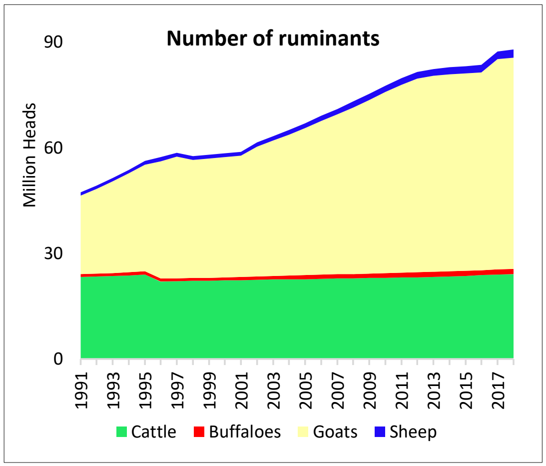

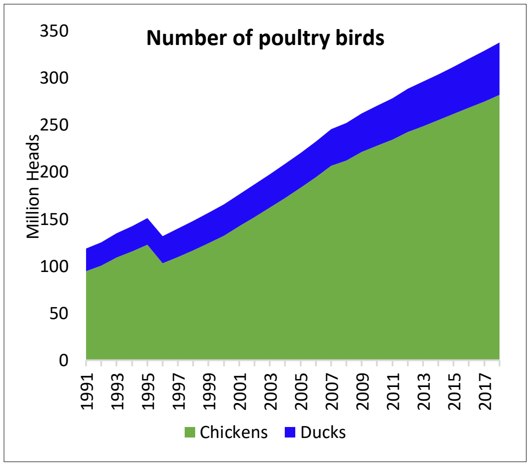

উৎস: *FAOSTAT*

৪.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অগ্রগতি

প্রানিসম্পদ বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির মূল উপাদানের একটি। এটি ২০১৮-২০১৯ সালে জিডিপির ১.৪৭ শতাংশ ও কৃষি জিডিপিতে ১৩.৬ শতাংশ অবদান রেখেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম চার বছর এই খাতটি গড়ে বার্ষিক ৩.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ২.৮ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। প্রোটিন, কর্মসংস্থান, রপ্তানি আয় ও খাদ্য নিরাপত্তার উৎস হিসেবে প্রাণিসম্পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রানিসম্পদ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য জীবিকা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রানিসম্পদ উপখাতের উদ্দেশ্য ছিল দুগ্ধজাত খাতে পশুর উৎপাদনশীলতায় টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা, দুগ্ধপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজনসহ এবং পশু লালনে নিযুক্ত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও নারীদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা। বাংলাদেশ লাইভস্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির উৎপাদনের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে, বহুবিধ বিষয় ও আন্তবিষয় এবং আন্ত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টি নিরাপত্তায়, দারিদ্র্য বিমোচনে, কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধন এবং পরিবেশ দূষণহ্রাস করে সমস্যাগুলো সমাধানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ কালে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এবং ডিম উৎপাদনে সয়ম্ভরতার কাছাকাছি পৌছেছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন ৭.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হয়, যা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ছিল ৫.৮৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন, (চিত্র: ৪.৬, সারণি ৪.৭)। এই সময়কালে দুগ্ধ উৎপাদন ৬.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পায় ৯.৯২ মিলিয়ন মেট্রিক টনে অর্থাৎ ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি, আর ডিমের উৎপাদন বেড়েছে ৫৫ শতাংশ। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুধ, মাংস ও ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা ২০১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৬১.৬৯ মিলি/জনপ্রতি প্রতিদিন, ১২২.৪৭ গ্রাম/জনপ্রতি প্রতিদিন, এবং ১০১.৭৮ টি/জনপ্রতি প্রতিবছর এ উন্নীত হয়েছে।

চিত্র ৪.৬: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

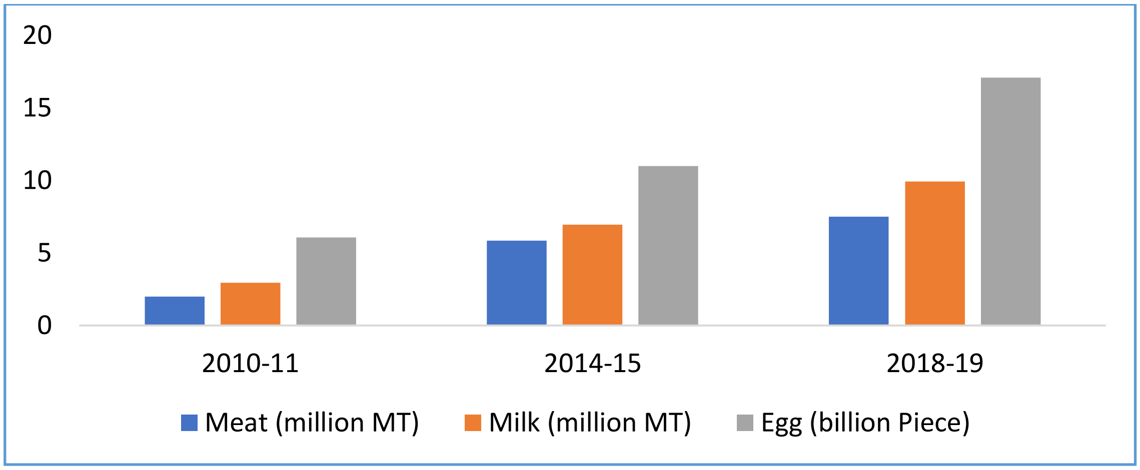

সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস), মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়।

সারণি ৪.৭: দুধ, মাংস এবং ডিমের চাহিদা, উৎপাদন, ঘাটতি ও প্রাপ্যতা

খাদ্য পণ্য	২০১৪-২০১৫				২০১৮-২০১৯			
	চাহিদা	উৎপাদন	স্বল্পতা	প্রাপ্যতা	চাহিদা	উৎপাদন	স্বল্পতা(-) উদ্বৃত্ত (+)	প্রাপ্যতা
দুধ (মে: টঃ)	১৪.৪৮ (২৫০ মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৬.৯৭	৭.৫১	১২২.০০ (মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	১৫.৩৪	৯.৯২	-৫.৪২	১৬১.৬৯ (মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)
মাংস (মে:টঃ)	৬.৯৫ (১২০ মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৫.৮৬	১.০৯	১০২.৬২ (মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৭.৩৬	৭.৫১	+০.১৫	১২২.৪৭ (মিঃগ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)
ডিম (মিঃ সংখ্যা)	১৬৫০৪.৮ (১০৪ সংখ্যা/প্রতিবছর/ মাথাপিছু)	১০৯৯৫.২	৫৫০৯.৬	৭০.২৬ (সংখ্যা/ প্রতিবছর/ মাথাপিছু)	১৭৪৮২.০৭	১৭১০৯.৭০	-৩৭২.৩৭	১০১.৭৮ (সংখ্যা/ প্রতিবছর/ মাথাপিছু)

উৎস: ডিএলএস (DLS)

৪.৪.২ প্রাণিসম্পদ উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও গত পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাণিসম্পদ উপখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে উৎপাদন ও বাজার ব্যহত: কোভিড-১৯ মহামারী নিয়ন্ত্রণের জন্য যে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ ও কার্যকর হয়েছিল তাতে প্রাণিসম্পদ উপখাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে মহামারির কারণে হাঁস-মুরগির মাংস এবং দুধের চাহিদা তীব্রভাবে হ্রাস পায়, যা মূল্য এবং খাতটির উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গ্রাম অঞ্চলে দুধ, ডিম ও হাঁস-মুরগির দাম প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, ফলে ক্ষুদ্র চাষিদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। অনেক কৃষক পোল্ট্রি ও ডিম উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ বন্ধ করে দিয়েছে যা আগামী দিনগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলতে

পারে। দুগ্ধজাত উৎপাদনকারী বাণিজ্যিক খামারগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘ অর্থনৈতিক শাটডাউন চলাকালীন, মিষ্টির দোকান ও অন্যন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যবসায়ীগণ দুগ্ধ ক্রয় না করার কারণে অতিরিক্ত সরবরাহের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও কাঁচামাল সরবরাহের সংকটের কারণে প্রাণিসম্পদ ও মৎসজীবীদের পশু খাদ্যের উৎপাদন কমেছে, এই খাতটির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটিতে সহায়তা করার জন্য যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তবে সংকটটি প্রাণিসম্পদ উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

কম উৎপাদনশীলতা: যদিও প্রাণীর সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশ মহিষ, গরু, ছাগল, মুরগী এবং হাঁসের ক্ষেত্রে শীর্ষ দশ শতাংশের মধ্যে রয়েছে। তথাপি বিগত তিন দশকে বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের হার ছিল স্থবির। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধিই উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দেশক। বাংলাদেশের প্রধান তিন ধরণের প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ভুটান, ভারত, নেপাল এবং পাকিস্থানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির তুলানায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম (বিশ্ব খাদ্য সংস্থা পরিসংখ্যান, ২০২০)।

মানসম্মত ফিড ও তৃণজাতীয় খাদ্যের অপর্যাপ্ততা: ফিড ও তৃণজাতীয় প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাণিসম্পদ পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। প্রাকৃতিক ভাবে জন্মানো ঘাস, ফসলের অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশের গবাদিপশুর খাদ্যের প্রধান উৎস। প্রাকৃতিক পশু খাদ্যের ঘাটতি এবং প্রক্রিয়াজাত পশুখাদ্যের উচ্চমূল্য হলো ছোট খামারিদের প্রাণিসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রাকৃতিক তৃণজাতীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমির ঘাটতি, ফিড প্রাকৃতিক তৃণজাতীয় খাদ্য সরবরাহে মৌসুমী উঠানামা, নিম্নমানের পশুখাদ্য এবং পশুপালনে দক্ষতা অভাব-এ সবই সমস্যাটিকে আরও প্রকট করেছে। দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূমি বিদ্যমান থাকায় তা প্রাকৃতিক পশু খাদ্যের এক বৃহৎ উৎস, তবে সাম্প্রতিক সময়ে লবণাক্ততার কারণে এই অঞ্চলে ঘাসের প্রাপ্যতা কমে গেছে, যার ফলে মহিষের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পশুচারণভূমিতে ঘাসের প্রাকৃতিক বিকাশের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের (HYV) চাষের কারণে সারাদেশে চারণভূমি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বন্যার প্রবণতা সহ আবহাওয়ার অস্বাভাবিক আচরণের জন্য চারণভূমির ঘাসের উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া খাদ্যে ভেজাল ও বানিজ্যিক পর্যায়ে অপর্যাপ্ত বা মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর তদারকির অভাব প্রক্রিয়াজাত পশুখাদ্যের বড় প্রতিবন্ধকতা, যার কারণে জনস্বাস্থ্য ও প্রানিস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ও পুরানো রোগের পুনঃসংক্রমন: রোগের পুনঃসংক্রমন পশুসম্পদ লালন পালনের ক্ষেত্রে বড় উদ্বেগের কারণ। প্রতিবছর প্রায় ১৫ শতাংশ প্রাণি ও ২০ শতাংশ হাঁস মুরগি বিভিন্ন রোগে মারা যায়, যা কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ্যানথ্রাক্স, হেমারজিক সেপ্টিসিমিয়া (H.S), ব্ল্যাক কোয়াটার (B.Q), ক্ষুরা রোগ ও মুখের রোগ (F.M.D)-এর মত রোগ গবাদিপশুর ক্ষেত্রে, ছাগলের ক্ষেত্রে Peste des petits Ruminants (PPR) এবং গোট পক্স, মুরগির ক্ষেত্রে নিউ ক্যাসেল ডিজিজ (N.D), ব্রঙ্কাইটিস, গুম্বর এবং হাঁসের ক্ষেত্রে ডাক প্লেগ (Duck Plague), ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস-এ গুলো হলো বাংলাদেশের প্রাণীদের প্রধান রোগ। গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি বিভিন্ন প্রটোজোয়ান রোগ যেমন টক্সোপ্লাজমোসিস, অ্যামিবিয়াসিস, গিয়ার্ডিয়াসিস, লিশম্যানিয়াসিস এবং পরাজীবি পোকামাকড়ের আক্রমনের শিকার হচ্ছে। ভালো ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত কৃমিনাশক ও উপযুক্ত ঔষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে সহজেই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়, যা খুব বেশি ব্যয়বহুলও নয়। প্রায় সব প্রাণি এক বা একাধিক পরাজিবী রোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে ফিড ও প্রাকৃতিক তৃণজাতীয় খাদ্যের অভাব এবং কৃষকদের জ্ঞানের অভাব প্রাণিসম্পদের ভারসাম্যহীন পুষ্টির জন্য দায়ী।

অপর্যাপ্ত ভেটেরিনারি সেবা ও প্রাণিস্বাস্থ্য: দেশে ভেটেরিনারি এবং প্রাণি স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা রয়েছে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি ভেটেরিনারি সেবাসমূহ রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে, যেখানে মূলত গবাদিপশু লালনপালন করা হয়ে থাকে সেখানে কার্যকর ভেটেরিনারি সেবার অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) পশুর যত্নের জন্য টিকা তৈরির কাজে নিয়োজিত। টিকার অপর্যাপ্ততা ও মান উদ্বেগের কারণ, বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য টিকা উৎপাদনে ভর্তুকির ব্যবহারকে যৌক্তিক করা প্রয়োজন। মানসম্মত টিকাকর্মসূচি কার্যকর করার জন্য স্থানীয় ও আমদানি করা উভয় প্রকারের টিকার ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। রোগ নির্ণয়ের সুবিধা সীমিত ও এর জন্য দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

সীমিত ঋণ সুবিধা: ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারগুলির বিকাশের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমানের বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু গবাদি পশু লালনে নিয়োজিত ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য ঋণ সুবিধা সীমিত এবং উচ্চতর জামানত প্রয়োজন। ঋণসুবিধা প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য যে সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতে হয়, তা হচ্ছেঃ (১) অপর্যাপ্ত ঋণতহবিল; (২) পশুপালন উৎপাদন চক্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ঋনের প্যাকেজ; (৩) জামানতের অভাবের কারণে ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকরা ঋণসুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়; (৪) ঋণের ক্ষেত্রে তদারকির অভাব; (৫) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনার জন্য প্রশিক্ষনের অপর্যাপ্ততা (ঋণ প্রদানকারী ও ঋণ গ্রহণকারী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য); (৬) অপর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা; এবং (৭) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে ক্ষুদ্র চাষীদের দুর্দশা ও ঝুঁকি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাবঃ জলবায়ুর পরিবর্তন টেকসই প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ। প্রাণিসম্পদের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে (i) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চর বিলীন হবে এবং চারণভূমি হ্রাস পাবে; (ii) উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশ প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলোকে তীব্র করবে যা প্রাণিসম্পদ লালনের জন্য উপযুক্ত নয়; (iii) গাছপালা ধ্বংসের কারণে পশু খাদ্য সংকট দেখা দেবে যার ফলস্বরূপ পশুর সংখ্যা হ্রাস পাবে; এবং (রা) ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাণিসম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ ধরণের দুর্যোগের পর পশু খাদ্য সরবরাহের অভাব এবং রোগের প্রার্দুভাবের কারণে উৎপাদশীলতা বাঁধাগ্রস্ত হয়।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জঃ প্রাণিসম্পদজাত পণ্যের অনুন্নত বিপণন ব্যবস্থা এই খাতের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। দুগ্ধজাত পণ্যের মার্কেটিং নেটওয়ার্ক এবং তথ্য ব্যবস্থা গ্রামীন অঞ্চলে গড়ে ওঠেনি। উৎপাদন ও পণ্যের দাম প্রধানত স্থানীয় চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থার ওপর নির্ভর করে এবং এটি দেশব্যাপি বিপণন নেটওয়ার্কের সাথে একীভূত নয়। অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে, ক্ষুদ্র চাষিদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা, দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সীমিত সুবিধা এবং সংগ্রহস্থান সীমিত হওয়ায় কম মূল্য। বিমার অভাব, বাজারে তথ্যের অনুপস্থিতি, কৃষকদের জ্ঞানের ঘাটতি এবং উপযুক্ত জাতের অভাব, ওষুধ, টিকা এবং বায়োলজিক্যাল পণ্য, পশুখাদ্য ও তার উপাদান, বাচ্চা, ডিম এবং পোল্ট্রির মাননিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারীসংস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি। এছাড়াও, গ্রামীণ ও শহরে মাংস উৎপাদন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে (কসাইখানা সহ) সম্পন্ন করা হয়।

৪.৪.৩ প্রাণি সম্পদ উপখাতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কৌশল

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও মূল্য সংযোজনের টেকসই প্রবৃদ্ধির মাধমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- প্রক্রিয়াজাত পণ্যসহ দুধ, ডিম, মাংসের টেকসই উৎপাদনে সহয়তা প্রদান;
- শিশু ও মহিলাসহ দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টি মোকাবেলায় পুষ্টি বিধান অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভোগ নিশ্চিত করা;
- ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের টেকসই আয় উপার্জন ও কর্মসংস্থানের প্রসার করা;
- অভিযোজিত গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজন মাফিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণকর্মী, পরিকল্পনাবিদ, পশু খামারি ও অন্যান্য অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- জলবায়ু সহনশীল ও সুলভ মূল্যে পশু খাদ্য ও তার উপকরণের উন্নয়ন; এবং
- বাণিজ্যিকভিত্তিতে পশু থেকে উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানিতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

লক্ষ্যমাত্রাঃ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দুধের উৎপাদন ২০১৮-১৯ সালের ৯.৯২ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ২০২৪-২৫ সালের ১৬.৩৭ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, মাংস উৎপাদন ৭.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৮.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ডিমের উৎপাদন ১৭১০৯.৭ মিলিয়ন থেকে বাড়িয়ে ২২৪০০ মিলিয়ন পিসে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণি ৪.৮)। আধুনিক জৈব কৌশল ব্যবহার করে, রোগ নির্ধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করে এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত উপযোগী ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব হবে।

সারনী ৪.৮: দুধ, মাংস ও ডিমের প্রক্ষেপিত চাহিদা ও যোগান

পণ্য	২০২০-২০২১		২০২৫-২৬	
	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	চাহিদা	উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
দুধ (মি:মে:টঃ)	১৫.৮৪ (২৫০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	১৫.৮৪ (২৫০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	১৬.৩৬ (২৫০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	১৬.৩৬ (২৫০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)
মাংস (মি:মে:টঃ)	৭.৬১ (১২০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৭.৯৩ (১২৫ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৭.৮৫ (১২০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)	৮.৫১ (১৩০ মি:গ্রঃ/ দিন/ মাথাপিছু)
ডিম (মি: সংখ্যা)	১৮০৫৫ (১০৪/প্রতিবছর /জনপ্রতি)	১৮৫৭৬ (১০৭/প্রতিবছর /জনপ্রতি)	১৯৪০৭ (১০৪/প্রতিবছর /জনপ্রতি)	২২৩৯৩ (১২০/প্রতিবছর /জনপ্রতি)

সূত্র: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস) প্রাক্কলন

কৌশল

প্রাণিসম্পদ খাতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা হবে:

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হবে। বিএলআরআই এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটের গবেষণামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অব্যবহৃত সম্ভবনাময় আঞ্চলিক প্রাণিসম্পদ সমূহকে কাজে লাগানো, নিরাপদ প্রাণীজাত পণ্য এবং উপজাত পণ্য উৎপাদন, প্রাণীজ আমিষ পরিপূরক, প্রাণী খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পোল্ট্রি এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের ইনপুট হিসেবে অ্যাডিটিভস, প্রিমিক্স্স, প্রোবায়োটিকস এবং খনিজ ও ভিটামিন পরিপূরকসহ পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি গবেষণা অগ্রাধিকার পাবে। প্রাণিসম্পদ গবেষণা পরিচালনার জন্য বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিওলোকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জাত উন্নয়ন: পশুঘনত্বের বিবেচনায় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ, যার অধিকাংশ বাণিজ্যিক পোল্ট্রির খামার এবং গৃহে পালনকারীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু স্থানীয় জাতগুলোর উৎপাদনশীলতা খুবই কম। স্থানীয় জাতের সাথে উপযুক্ত বিদেশি জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে। বসতবাড়ির আঙ্গিনায় মুরগি পালন, যেখানে বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুবই কম সেখানে উচ্চ উৎপাদনশীল স্থানীয় জাত ও প্রাকৃতিকভাবে রোগ প্রতিরোধ সম্পন্ন জাতগুলো লালনে উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া প্রাণিসম্পদের জাত উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজনন (এআই) কর্মসূচিগুলো জোরদার করা প্রয়োজন। একইসাথে আদিজাত যেগুলোর উৎপাদনশীলতা উচ্চমানের সেগুলো সংরক্ষণ করা হবে। যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গঁল ছাগল যার খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কম, প্রজনন হার উচ্চ এবং উচ্চ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে, এগুলো দরিদ্র এবং ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষের সম্পদ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ভেটেরিনারি সেবা ও প্রাণিসম্পদ: (১) বেসরকারি পশু চিকিৎসা, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ক্লিনিক এবং হাসপাতালসহ বেসরকারি ও কমিউনিটিভিত্তিক ভেটেরিনারি সেবাকে গতিশীল করার জন্য নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে; (২) ভেটেরিনারি ঔষধ, টিকা, ফিডস, ফিড উৎপাদন এবং প্রজনন সরঞ্জাম ও উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য একটি স্বায়ত্বশাসিত মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে; (৩) রোগ প্রতিরোধ ও গবাদিপশু ও হাঁস মুরগির রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পরজীবী রোগের বিরুদ্ধে ও কৃমিনাশক কর্মসূচির বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে; এবং (৪) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টিসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ খামারে উৎসাহ প্রদান: শস্য উৎপাদনে কৃষকদের একাধিক প্রণোদনা প্রদানের জন্য সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ থাকলেও হাঁস মুরগি ও প্রাণিসম্পদ খামারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নীতি সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে জোরদার করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। একদিকে প্রোটিন এবং খাদ্যের বৈচিত্রতার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এবং অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই সেক্টরে প্রদেয় প্রণোদনাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে। ২০২৫ সালের মধ্যে দুধ, মাংস এবং ডিম উৎপাদনের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ছোট খামারিদের জন্য ঋণের প্রবেশগম্যতা বাড়ানো প্রয়োজন। পোল্ট্রি ও পানিসম্পদ খামারিদের জন্য অন্যান্যদের মত জামানত বিহীন ভর্তুকিযুক্ত সুদে স্বল্প-মধ্যমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রচলন করা হবে। পাশাপাশি পোল্ট্রি পাখিদের টিকার আওতায় আনা এবং মানসম্পন্ন ফিড সরবরাহ নিশ্চিত করার বিকল্প নীতিগত বিষয়গুলোও খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদেরকে সহায়তা প্রদান: গবাদি পশু লালনপালনকারী ক্ষুদ্র খামারিদের সমস্যা দূর করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বড় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র মাঝারি আকারের খামারিদেরকেও সহায়তা প্রদান করা হবে। ফিড, ওষুধ, টিকা ও জৈবিক পণ্য জেনেটিক স্টক ও উপকরণসমূহ উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলোকে উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রাণীজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির জন্য সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র খামারি ও উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ সুবিধায় প্রবেশগম্যতা সহজ করা হবে।

ব্যবস্থাপনা চর্চার উন্নয়ন: প্রাণী, রোগ ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণসহ পশুখাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পন্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বর্জ্যসমূহ পরিবেশসম্মত ও নিরাপদ উপায়ে অপসারণ করার মত উন্নত পরিচালনা পদ্ধতি চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। নিরাপদ খাদ্যের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ফিড তৈরি, টিকা প্রদান, জৈব সুরক্ষার গাইডলাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ছোট আকারের বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারগুলোতে মানসম্মত একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উৎপাদনের প্রধান বিষয়গুলো অর্থাৎ রোগমুক্ত প্রাণী, ব্যয় সাশ্রয়ী সুষম প্রানিখাদ্যের বিষয়গুলোকে এখাতের কৌশল নির্ধারণে বিবেচনা করা হবে। বড় বাণিজ্যিক খামারগুলোতে বিমা স্কিম চালু একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। পশু পালনের জন্য পশু চিকিৎসা এবং সম্প্রসারণ সেবাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও উপজেলা পর্যায়ের পর ডিএলএস এর কোন অফিস নেই, কৃষকদের আরো প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান করে এখাতে "লিড ফার্মার এ্যাপ্রোচ" অব্যাহত রাখা হবে।

৪.৫ মৎস্য উপখাত

বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনকারী নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বর্তমান পরিমাণ ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন, যার মধ্যে চাষকৃত মৎস্যের অবদান ৫৬ শতাংশের বেশি। জিডিপিতে এখাতের অবদান ৩.৫ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে অবদান ২৫.৭১ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ ২০১৯)। বিগত দশকে এখাতে গড়ে বার্ষিক ৫.২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য এখাতে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে সয়ংস্বম্পুর্নতা অর্জন করেছে এবং দেশের মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৬২.৫৮ গ্রাম মাছ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

৪.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মৎস্য উপখাতের অগ্রগতি

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদনের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য়, চাষকৃত মৎস্য উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১১তম। ১৯৯০ সালের পর থেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ গুণেরও বেশি। মৎস্যের সম্ভাবনাময় উৎস এবং জলজ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করে মৎস্য খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মৎস্যজীবীদের জীবিকার নিরাপত্তা এবং এখাতের প্রদত্ত সরকারি সুবিধাগুলোর ন্যায়সঙ্গঁত বিতরণ নিশ্চিত করা ছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক মেয়াদকালে মৎস্য উপখাতে বার্ষিক ৬.২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল যা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ৬.১৮ শতাংশের তুলনায় অল্প পরিমাণে বেশি ছিল। কৃষিখাতের অন্যতম বৃহৎ উপখাত হচ্ছে মৎস্য উপখাত, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৪.২৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.৯৪ শতাংশ (চিত্র ৪.৭)। মৎস্যখাতের অর্জিত সাফল্যের পিছনে যে দুটি বিষয় প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে সেগুলো হলো: (i) হ্যাচারিতে উৎপাদিত মাছের পোনা ব্যবহার করে পুকুরে মাছ চাষ; (ii) নিচু জমির চারপাশে বাঁধ দিয়ে মাছের পুকুরে রূপান্তর। ঐতিহাসিকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাংলাদেশের মৎস্যজাত পণ্যের সরবরাহের প্রধান উৎস। অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৭ শতাংশ যেখানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের গড় প্রবৃদ্ধি ৩.২৫ শতাংশ।

চিত্র ৪.৭: অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

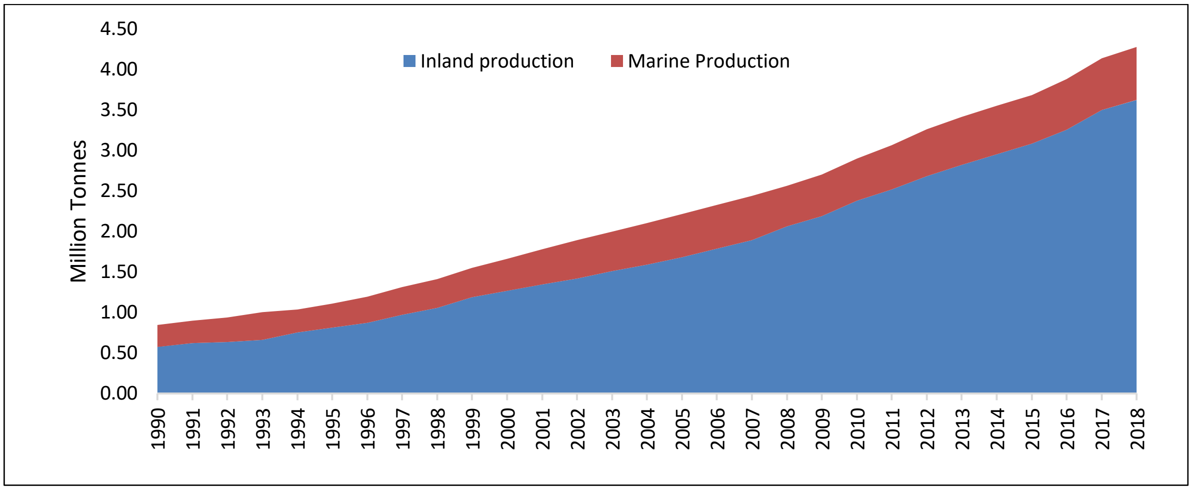

উৎস: এফএসওয়াইবি (FSYB), বিভিন্ন সংখ্যা

পূর্ববর্তী বছরসমূহে পুকুর, বাওড়, চিংড়ি খামার এবং প্লাবন ভুমিতে উৎপাদিত মাছের উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য জলাশয়ের উৎপাদনশীলতার স্থবিরতা বিরাজ করছে। পুকুরে মাছের উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক (৪৮৫১ কেজি/হেক্টর), তারপরে বাওড় (১৪৭১ কেজি/হেক্টর) এবং চিংড়ি খামার (৯৮৩ কেজি/হেক্টর) (চিত্র ৪.৮) ।

চিত্র ৪.৮: নানাবিধ জলাশয়ে মাছের উৎপদনশীলতার তুলনামূলক চিত্র

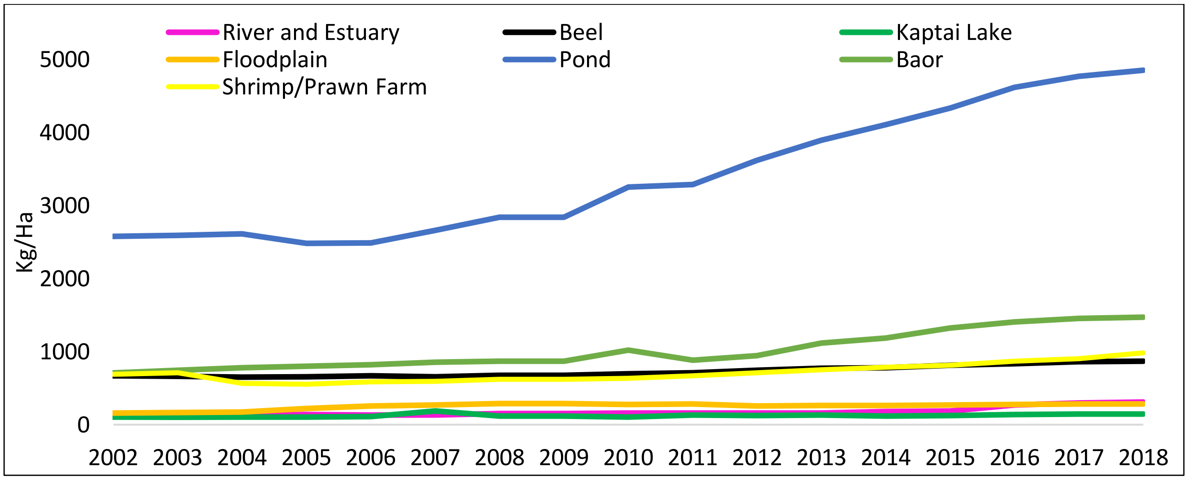

উৎসঃ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষিখাতের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি

দেশের মোট মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইলিশের অবদান প্রায় ১২ শতাংশ যা একক প্রজাতির হিসেবে সর্বোচ্চ। জিডিপিতে এর অবদান ১ শতাংশেরও বেশি। ২০১৭-১৮ সালে মোট ৫.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশ ধরা পড়েছিল যার পরিমাণ ২০০৮-০৯ সালে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রজননকালীন সময়কালে মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ এই বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। তালিকাভুক্ত জেলেরা নিষিদ্ধ সময়কালে বিকল্প উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড (এআইজি) প্রকল্পের আওতায় ভাতা এবং অন্যান্য বাণিজ্য উপকরণ গ্রহণ করে। এ ছাড়া জাটকা মাছ ধরা বন্ধে ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতা এই উচ্চপ্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখ্য যে ২০১৭ সালে ইলিশ বাংলাদেশের ভৌগলিক ইন্ডিকেশন (জিআই) পণ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে।

চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য। ২০০১-০২ সালে যেখানে চিংড়ি উৎপাদন ছিল এক লক্ষ মেট্রিক টনের কম সেখান থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে তা ২.৫৪ মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে। চিংড়ি অঞ্চলগুলিকে জোনিং করা, প্রকৃতি থেকে চিংড়ির পোনা সংগ্রহে সরকারি নিষেধাজ্ঞা, চিংড়ি চাষের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গুণগত মানের প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থা এবং চিংড়ি চাষিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সহ বেশ কয়েকটি সরকারি উদ্যোগ এই বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল। বর্তমানে, একটি জাতীয় কমিটি দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চল জরিপের মাধ্যমে চিংড়ি জোনিং কার্যক্রম চলছে। গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বাড়ানোর জন্য সরকারি ও বেসরকারি মালিকানার অধীনে ৪৬ টি গলদা চিংড়ি হ্যাচারি এবং ৪৯ টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপন করা হয়েছে। রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অবদান রেখেছে। ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশ ৭৩,১৭১.৩২ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪২৫০.৩১ কোটি টাকা আয় করেছে। এর মধ্যে ৩০৮৮.৮৫ কোটি টাকা (৩৬৫.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির মাধ্যমে আয় হয়। 'গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস' (জিএপি) বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, জাতীয় রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (এনআরসিপি) বাস্তবায়ন, মাছের মান নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষাগারগুলির আধুনিকীকরণ সহ বেশ কয়েকটি উদ্যোগ এই রপ্তানি সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে।

সারনি ৪.৯: মৎস্য ও মৎস্যজাতপণ্য রপ্তানিসংক্রান্ত তথ্য

অর্থবছর	পরিমাণ (মেঃ টন)	রপ্তানি আয় (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	৭৭৬৪৩.২৯	৩৪০৮.৫১
২০১০-১১	৯৬৪৬৯.২৩	৪৬০৩.৬৭
২০১১-১২	৯২৪৭৯.১৮	৪৭০৩.৯৫
২০১২-১৩	৮৪৯০৪.৫	৩৪১২.৬১
২০১৩-১৪	৭৭৩২৮.৮৬	৪৮৯৮.২২
২০১৪-১৫	৮৩৫২৪.৩৭	৪৬৬২.৬
২০১৫-১৬	৭৫৩৩৭.৯৩	৭২৮২.৮২
২০১৬-১৭	৬৮৩০৫.৬৮	৪২৮৭.৬৪
২০১৭-১৮	৬৮৯৩৫.৪৫	৪৩০৯.৯৪
২০১৮-১৯	৭৩১৭১.৩২	৪২৫০.৩১

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বাংলাদেশ।

৪.৫.২ মৎস্য উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

যদিও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে মৎস্য উপখাত বেশ ভাল করেছে তা সত্ত্বেও খাতটি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে এর প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। এর কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

কোভিড-১৯ এর কারণে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত: কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদে মৎস্য উপখাতে কিছুটা প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে নদনদী ও সমুদ্রে মাছ ধরার জাহাজগুলির চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় (সীমিত চাহিদার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব মেনে জাহাজে চলা কঠিন) মৎস্য ও মৎস্যজাত পন্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে পুরো বাজার ব্যবস্থাতেই একটি বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তবে মৎস্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এই পর্যায়ে স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়: অভ্যন্তরীণ মৎস্য খাত যেমন মৌসুমী বন্যার জমি সহ প্লাবনভুমি, বিল এবং নদীগুলি বাংলাদেশের মাছ উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র। কিন্তু অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অবকাঠামোগত বিনিয়োগের কারণে ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে যা অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের জেলেজীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের সম্পদগুলির কার্যকর সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি করা না যায়, তবে মাছের উৎপাদন আরও হুমকির সম্মুখীন হবে।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা: মূলত অতিরিক্ত মাছ ধরা, মাছ ধরায় ক্ষতিকর সরঞ্জাম ব্যবহার, জলাশয়গুলিতে পলি জমা, মাছের প্রাকৃতিক গতিপথ বন্ধ, অমৎস্যজীবী কর্তৃক ইজারা নিয়ে বা জোরপূর্বক দখল করে জলমহালের নিয়ন্ত্রণ; কৃষি রাসায়নিক, শিল্প বর্জ্য এবং নগরের পয়:প্রনালী ইত্যাদি দ্বারা জলাশয় দূষণের ফলস্বরূপ অভ্যন্তরীণ মৎস্যভান্ডার হ্রাস পাচ্ছে , যা দরিদ্র জেলেদের জীবিকার এক প্রধান উৎস এবং বহু গ্রামীণ পরিবারের বিনামূল্যে প্রোটিন সরবরাহের উৎস ছিল। এই অভ্যন্তরীণ জলজ সম্পদ যদি যথাযথ নীতি, বিধিবিধান এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা না যায় তাহলে এই উৎসের মৎস্য উৎপাদন ক্রমেই হ্রাস পাবে।

অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ: অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, নতুন প্রজাতির প্রবর্তন, মৎস্য চাষের আওতা বৃদ্ধি এবং বিশেষত পুকুরের মাছচাষের উন্নতির মাধ্যমে এই খাত সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। তারপরও এই খাতটি একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন যার মধ্যে রয়েছে পোনা সংরক্ষণে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, ন্যায্যমুল্যে ও কাঙ্খিত মানের মাছ ও চিংড়ির রেনু ও পোনার অপর্যাপ্ত সরবরাহ, সাশ্রয়ী

মুল্যে বিশ্বাসযোগ্য ও গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্যের অপ্রতুলতা, মাছ ও চিংড়ির সংক্রামক রোগের বিস্তার, প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ সেবাপ্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা না থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান জলাবদ্ধতা, দেশী প্রজাতির মাছের প্রাকৃতিক গতিপথে বাঁধ দেয়া, জীব বৈচিত্র ধ্বংস ও সামাজিক সংঘাতের কারণে প্লাবন ভুমিতে মাছের উৎপাদন ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎসসম্পদ: সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এদেশে আমিষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা ২০১৮-১৯ সালে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ। এই খাতে মোট উৎপাদন বাড়লেও সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ধীর গতিতে বাড়ছে। ফলস্বরূপ, ২০০৯-১০ সালে প্রায় ১৮ শতাংশ থেকে বর্তমানে মোট মৎস্য উৎপাদনে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্ব অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। এর পেছনে মূল চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুনের লঙ্ঘন, অবৈধ মাছ ধরার নৌকার ব্যবহার, বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক জলসীমায় (ইইজেড) পোচিং বা অবৈধ মাছ শিকার, মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ধারণের ওপর অনুসন্ধানী জরিপের ঘাটতি, ধ্বংসাত্মক ও অবৈধ মাছ ধরার সরঞ্জাম ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব; অবৈধ, অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ, ধ্বংসাত্মকভাবে মাছ ধরা, দূষণ, অপ্রাপ্তবয়স্ক মাছ ধরা, অতিউৎপাদনশীল উপকূলীয় এবং নিকটবর্তী উপকূলীয় মাছের আবাসস্থল যেমন প্রবাল প্রাচীর, ম্যানগ্রোভ বন, নদী মোহনা, মাছের অভয়ারণ্য ইত্যাদি ধ্বংসের কারণে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

চিংড়ি ও নোনা পানির মৎস্য চাষ: রপ্তানি খাতের একটি বড় অংশ হিসেবে মৎস্য চাষ, বিশেষ করে বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষের সাথে মৎস্য চাষের বিভিন্ন উপকরনের উৎপাদন শিল্প জড়িত, যেমনঃ খাদ্য, সার, বালাইনাশক ও মৎস্য চিকিৎসার ঔষধ, পানি পরিচর্যা ও পুকুর প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার্য কারিগরি যন্ত্রপাতি। চাষ পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন পণ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরন ও বিপননের জন্য সংযোগকারী বিভিন্ন বিষয়াদিও (মোড়কজাতকরন, পরিবহন, রপ্তানি-আমদানিকারক, ভোক্তা, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ) মৎস্য চাষে সংযোগকারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। গত তিন দশক ধরে চিংড়ি এবং নোনা পানিতে মৎস্য চাষ বাড়লেও এর উৎপাদনশীলতা কম। প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হ্যাচারিগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্যক্ষমতা অর্জন করলেও চিংড়ি উৎপাদনে কাঙ্খিত ও সম্ভাবনাময় পর্যায়ে পৌছাতে পারেনি। একটি কারণহল আমাদের চিংড়ি খামারগুলি, বিশেষত নোনা পানির বাগদা খামারগুলি এখনো গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যার উৎপাদনশীলতা খুব কম। গলদা চাষের ক্ষেত্রে রয়েছে উন্নতমানের খাদ্যের অভাব। আর বাগদা চাষে রয়েছে ভালমানের ও ভাইরাস মুক্ত চিংড়ি পোনা যাকে বলা হয় পোস্ট লার্ভা (পিএল)। বিগত বছরগুলিতে চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে সমস্যা ছিল, যেমন, গুণগতমান নিশ্চয়তা, ট্রেসিবিলিটি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব, যা রপ্তানি খাতকে প্রভাবিত করে।

চিংড়ি এবং নোনা পানিতে মৎস্য চাষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ার পরেও এক্ষেত্রে বেশ কিছু হুমকি রয়েছে। বিগত বছরগুলিতে চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা, যেমন মান নিয়ন্ত্রণ, ট্রেসিবিলিটি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব রপ্তানি কে প্রভাবিত করে। ৬ষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য সম্পর্কিত মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। মাইক্রোবায়োলজিকাল, অবশিষ্টাংশ ও রাসায়নিকের উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারগুলি ইউরোপীয় মান উপযোগী করা হয়েছে। ট্রেসিবিলিটির পাশাপাশি অন্যান্য জৈব নিরাপত্তাজনিত ইস্যুগুলো আরও গুরুত্ব নিয়ে দেখা উচিত এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পরীক্ষাগার সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করা হবে।

অন্যান্য বড় চ্যালেঞ্জ: মৎস্য শিল্পের অন্যান্য বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে, মৎস্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র রপ্তানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইচএসিসিপির অনুমোদিত মান নিয়ন্ত্রণ ঠিকমতো মেনে চলা কঠিন এবং এইখানে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ মান নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব কাঠামো কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। অন্যান্য চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে উন্নতমানের মাছের পোনা এবং পোনা মাছের সংকট; প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন ও মৎস্য পণ্য বিপণনের জন্য অবকাঠামোর সঙ্কট; মাছ ধরার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা; জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব; অপ্রতুল মানব সম্পদ এবং উপকরনের অভাব এবং মাছ চাষিদের জ্ঞানের অভাব এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণার সীমিত সুবিধা।

৪.৫.৩ মৎস্য উপখাতের লক্ষ্য ও কৌশল

উদ্দেশ্য: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৎস্য উপখাতের প্রধান লক্ষ্য হল মাছ ও চিংড়ির পাশাপাশি অন্যান্য জলজ সম্পদ উৎপাদনে টেকসই প্রবৃদ্ধি ঘটানো যা দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানিতেও ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা, জনগনের অংশগ্রহণে ‘সুনীল অর্থনীতি’র দ্বার উন্মুক্ত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এর সুফলের সুষ্ঠু বন্টনব্যবস্থা তৈরিসহ, মাছ ধরার পরবর্তী অপচয় কমানো ইত্যাদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপখাতের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলি হল:

- মৎস্য সম্পদ বাড়ানোর পাশাপাশি এর উৎপাদন বৃদ্ধি।
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নিশ্চিতকরণ।
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ, উৎপাদনপ্রক্রিয়ার স্থায়িত্ব এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক ভাবে সংবেদনশীল নির্দিষ্ট অঞ্চলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে জলাভূমি অভয়ারণ্য স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- সুনীল অর্থনীতির সম্ভাব্যতা নিরূপণ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের মজুদ যাচাইকরন এবং সামুদ্রিক মাছের নিয়ন্ত্রিত আহরণ উৎসাহিত করণ, টুনা ও টুনা জাতীয় সামুদ্রিক মাছের আহরণ বৃদ্ধি।
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্যের কঠোর মাননিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করন।
- দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ এবং মানসম্পন্ন মাছের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যসমূহ: মৎস্য খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৪.১০-এ বর্ণিত হয়েছে। মৎস্য চাষ, সিবিও /কো-ম্যানেজমেন্ট এবং মাছ/চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস' (GAP) এবং 'গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস' (GMP) এর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে মাছ /চিংড়ি সরবরাহ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে প্রচার ও বাস্তবায়ন করা হবে।

সারণি ৪.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মাছের প্রক্ষেপনকৃত উৎপাদন

নং	উৎস	২০২০-২১			২০২৪-২৫		
		জল এলাকা ('০০০ হেক্টর)	মোট উৎপাদন ('০০০ মে: টন)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)	জল এলাকা ('০০০ হেক্টর)	মোট উৎপাদন ('০০০ মে: টন)	উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)
১	নদী, মোহনা	৮৫৪.০০	৩৩১.০০	০.৩৮৮	৮৫৪.০০	৩৯৫.৭০	০.৪৬
২	সুন্দরবন	১৭৭.০০	১৯.২০	০.১০৮	১৭৭.৭০	২০.০০	০.১১
৩	বিল	১১৪.১৬	১০৫.৪০	০.৯২৩	১১৪.১৬	১১০.৪	০.৯৭
৪	কাপ্তাই লেক	৬৯.০০	১০.৬০	০.১৫৪	৬৯.০০	১১.০০	০.১৬
৫	প্লাবনভুমি/ হাওর	২৬১৭.০০	৮১৮.৪০	০.৩১৩	২৬১৭.০০	৮২৫.০৬	০.৩২
	মোট মুক্ত জলাশয়	**৩৮৩১.৮৬**	**১২৮৪.৬০**		**৩৮৩১.৮৬**	**১৩৬২.১৬**	
৬	পুকুর/ দিঘী	৩৭১.০০	২০৩২.২০	৫.৪৭৮	৩৭১.০০	২৩৩৩.৩০	৬.২৯
৭	বাওড়	৫.০০	৮.৫০	১.৭০০	৫.০০	৮.৮৪	১.৭৭
৮	মৌসুমি চাষের জন্য প্রস্তুত কৃত জলা	১৩১.০০	২৩০.৯০	১.৭৬৩	১৩১.০০	২৫২.২৬	১.৯৩
৯	চিংড়ি/বাগদা খামার	২৭৫.০০	২৭১.৪০	০.৯৮৭	২৭৫.০০	২৯৫.৬০	১.০৭
১০	কাঁকড়া	৯৮.৫৪	১২.৮০	০.১৩০	৯৮.৫৪	১৪.০০	০.১৪
১১	পেন কালচার	৫.২৯	১০.৬০	২.০০৪	৫.২৯	১১.০৮	২.০৯
১২	খাঁচায় মাছ চাষ	০.০১৩	৪.৩০	৩৩০.৭৬৯	০.০১৩	৪.৬০	৩৫৩.৮৫
	মোট মাছ চাষ	**৮৮৫.৮৪**	**২৫৭০.৭০**	-	**৮৮৫.৮৪**	**২৯১৯.৬৮**	
১৩	সামুদ্রিক অবানিজ্যিক	০০০	৫৬৯.৪			৫৮৩.০০	
১৪	সামুদ্রিক বানিজ্যিক (মাছ ধরার ট্রলার)	০.০০	১২৭.৭	-	-	১৩০.১৬	
	মোট সামুদ্রিক		**৬৯৭.১০**			**৭১৩.১৬**	
	সর্বমোট	-	**৪৫৫২.৪০**	-	-	**৪৯৯৫.০০**	-

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর

অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ: দেশে মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হল অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য পুকুরের মাছ চাষের সম্প্রসারন এবং নোনাজলের চিংড়ি চাষের ওপর আরো বেশী জোর দিতে হবে। এপ্রেক্ষিতে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাছ উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় টেকসইতা (পরিবেশগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ) এবং মান নিয়ন্ত্রণ (দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পন্যের উৎস সন্ধান) ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক মাছ চাষিদের জন্য যে কোনও ধরণের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

বেসরকারি খাতের মাধ্যমে মানসম্পন্ন মাছের পোনা এবং মৎস্য খাদ্য সরবরাহ মৎস্য চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষের পাশাপাশি ক্ষুদ্র দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষের প্রসারেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) নতুন জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কাজ করবে এবং মৎস্য বিভাগকে (ডিওএফ) প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে, যারা এটাকে মাঠ পর্যায়ে প্রচার করবে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য বিভাগ মাছ চাষিদের সক্ষমতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে কাজ করবে।

মৎস্য চাষের উন্নয়ন: মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে:

- পানিদূষণ না করে মৎস্য চাষের সম্প্রসারন এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষে উৎসাহ প্রদান করা;
- মৎস্য চাষের স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈচিত্রকরণের জন্য মাছের খামার যান্ত্রিকীকরণ এবং মৎস্য চাষের উলম্ব সম্প্রসারণ অগ্রাধিকার দেয়া;
- মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখার জন্য মৎস্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং মৎস্য চাষের নীতিমালা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা;
- প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামারের এর মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মৎস্য চাষি / মৎস্যজীবীদের জন্য প্রায়োগিক জলজ প্রযুক্তি এবং মৎস্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার প্রবর্তন;
- হ্যাচারি, নার্সারি পরিচালনা এবং স্প্যান ও ফ্রাই সরবরাহ, যার মধ্যে বেসরকারি খাত মূল ভূমিকা রাখবে, জিও-এনজিওর সহযোগিতা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে;
- মাছ এবং চিংড়ি ফিড উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন, ফিড উপাদান, খনিজ এবং ভিটামিন প্রিমিক্স এবং অন্যান্য কাঁচামাল নিয়মিত নজরদারি করা হবে;
- প্লাবনভুমিতে খাঁচা পদ্ধতিতে মাছ চাষে ব্যক্তিগত মালিকানা কে উৎসাহ দেওয়া হবে যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে;
- মাছ চাষ ও সংরক্ষণের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে দুটিকেই জোরদার করে তুলতে হবে। জনসাধারণকে সাথে নিয়ে প্লাবনভুমিতে মাছ চাষ ও অভয়ারণ্য রক্ষনাবেক্ষনের মাধ্যমে দেশি জাতের মাছের বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে;
- প্রাকৃতিক প্রজনন, স্পনিং, নার্সারি এবং মাছের বয়োবৃদ্ধির অঞ্চল সংরক্ষণ করে পুরো জীবনচক্র সম্পন্ন করা এবং মাতৃ মাছ ও পোনার কৌলন্যতা অক্ষুন্ন রেখে প্রাকৃতিক প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে;
- হ্যাচারিতে পরিবহন ও লালন-পালনের সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। ভাইরাস-মুক্ত চিংড়ি (পিএল) সরবরাহ নিশ্চিত করতে, সকল হ্যাচারি মা চিংড়ি এবং চিংড়ি পিএল উভয়ের পিসিআর পরীক্ষা নিশ্চিত করবে;
- মৎস্য অধিদপ্তর ও সহযোগী এনজিওরা চিংড়ি চাষি এবং এর সাথে জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তিগত, কাঁচামাল, অর্থায়ন এবং বাজার সংযোগের পাশাপাশি প্রসেসিং প্ল্যান্ট এর সাথে চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করবে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে;
- মাছ চাষ এবং মাছ প্রক্রিয়াকরণের সময় ব্যবহৃত দূষক / নিষিদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক এবং অন্যান্য রাসায়নিকের উৎস সনাক্ত করার জন্য উৎস সন্ধান ও নজরদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে যাতে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মৎস্য অধিদপ্তর এই বিষয়ে তাদের ভূমিকা জোরদার করবে;
- জনসাধারনের সহায়তায় মাছের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভিন্ন ধারার মৎস্য চাষ যেমন ধান খেতে মাছ চাষ ইত্যাদিতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে;
- মাছ চাষের সম্প্রসারণে সহায়তা এবং গবেষণা কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে চাষিদের সাথে সংযোগ আরও জোরদার করা হবে;

- ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষি এবং শহরাঞ্চলে মাছ উৎপাদনের জন্য বায়োফ্লোক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;
- বাজার ও কমিউনিটি ভিত্তিক 'দাউদকান্দি মডেল' এর অনুরূপ প্লাবনভূমিতে পলিকালচার সিস্টেমটি সারা দেশের প্লাবনভুমি অঞ্চলে সম্প্রসারিত হতে পারে।

উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন: গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ শিকার জীবিকা এবং প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উন্মুক্ত জলাশয়ে উৎপাদনশীলতা বিভিন্ন কারণে স্থবির হয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে মাছের মজুদ হ্রাস, জলাশয়ের আয়তন কমে যাওয়া এবং পানির গুণগতমানের অবনতি ইত্যাদি। দূষণ রোধ সহ মাছের মজুদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্মুক্ত জলাশয়ের স্থায়ী সংরক্ষণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি প্রয়োগ করা হবে:

- অভ্যন্তরীণ অব্যবহৃত জলজ সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য উৎপাদনের জন্য বিকশিত হবে। সরকারি সংস্থাগুলির জন্য প্রধান দায়িত্ব হবে নদী ও হ্রদের দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
- বেড়িবাঁধ, রাস্তাঘাট, আবাসন প্রকল্প এবং শিল্পায়নের মতো অপরিকল্পিত অবকাঠামোগত কারণে জলাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশনের পথ অবরুদ্ধকরণ এবং জলাশয় সংকোচন রোধ করতে হবে। যে কোন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্পকে অবশ্যই পরিবেশগত নিয়মকানুনগুলি মেনে চলতে হবে (এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে পর্যাপ্ত প্রশমনমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)। মাছের চলাচলের পথ এবং মৎস্য বান্ধব নিয়মাবলী প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরণের প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- সুন্দরবন, কাপ্তাই লেকের কিছু অংশ, হালদা নদীর নির্ধারিত অংশ, নির্ধারিত বিল ও হাওর অঞ্চল, এবং বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশের মত বাস্তুসংবেদশীল এলাকা জুড়ে মৎস্য ও জলজ অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হবে যেখানে মৎস্য শিকারের ওপরে পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা থাকবে।
- মৎস্য সংরক্ষণের কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। এই কৌশলের মধ্যে মৌসুমীয় নিষেধাজ্ঞা, ব্যবহার্য সরঞ্জামাদির ব্যাপারে বিধিনিষেধ, পরিচয়পত্র প্রদান করে প্রকৃত জেলেদের সনাক্তকরণ, চাষযোগ্য প্রজাতির ওপরে বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- টেকসই ইলিশ মাছ উৎপাদনের জন্য, সর্বাধিক টেকসই ফলন (MSY) নির্ধারণ করা হবে। অতিরিক্ত মাছ ধরা এড়াতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইলিশ অভয়ারণ্য ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। ইলিশ বিপণন ব্যবস্থা ও এর বাজারজতকরণের উন্নতির জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে, এবং প্রয়োজনে এই আইনটি সংশোধন করা হবে।
- জেলেদের ভিজিডি এবং ভিজিএফের মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলিতে অ্যাক্সেস থাকবে এবং মাছ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে।
- মাছ চাষীদের জন্য যথাযথ বিমা স্কিম এর ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এগিয়ে আসতে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।
- জেলেরা টেকসই গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থার মাধ্যমে সংগঠিত হবে এবং এ জাতীয় সংস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে খাস 'জলমহল' পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে যাতে তারা কেবল সম্পদের যাচ্ছেতাই ব্যবহারের পরিবর্তে সংরক্ষণ করতে পারে।

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ: সামুদ্রিক ফিশারি সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মৎস্য খাত ভিত্তিক নীল অর্থনীতি সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলি দেখার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশের জেলেরা ৫০ মিটারের অধিক গভীরতায় মাছ ধরার ক্ষমতা রাখে না। গভীর জলে মৎস্য শিকারের দীর্ঘলাইন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। গভীর সমুদ্রের জেলেদের সক্ষমতা প্রস্তুত করা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মনযোগের অন্যতম বিষয় হবে।

সামুদ্রিক মাছের সর্বাধিক টেকসই ফলন (MSY) নিশ্চিত করাকে খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার একটি প্রধান নিয়ামক হিসেবে দেখা হয়। এটা ঠিক যে সামুদ্রিক মাছ বাংলাদেশে জনপ্রিয় নয়। সাধারণ ডায়েটের অংশ হিসেবে সামুদ্রিক মাছকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। ভিশন ২০৪১ এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামুদ্রিক ফিশারির কৌশল সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি গৃহীত হবে:

- সম্পদ পাচারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং বিদেশী ট্রলারের অবৈধ প্রবেশ আটকানো হবে।
- নৌযান নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- সংরক্ষণের প্রয়োজন চিহ্নিত করা এবং এই প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি নিশ্চিত করা হবে।
- কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর সাথে সমন্বয় সাধন করে নিয়ম লংঘন কারীদের আটকানোর ব্যবস্থা করা হবে। এটা স্থানীয় নৌযানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- বঙ্গোপসাগরে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে স্টক এবং সর্বাধিক টেকসই ফলন / মাছ ধরার অনুমতিযোগ্য পরিমাণ (কোটা) নির্ধারণ করা হবে।
- সামুদ্রিক সম্পদের কার্যকর ও টেকসই আহরনের জন্য সামুদ্রিক ফিশারি রিসোর্সের ডিজিটাল মানচিত্র ব্যবহার করে সামুদ্রিক জলে ডিজিটাল মেরিন ফিশারি রিসোর্স ম্যাপিং অত্যাবশকীয়। তবে সার্কের অন্তর্ভুক্ত যেকোন দেশের ক্ষেত্রে, এই ব্যবস্থা হয় অনুপস্থিত অথবা উপস্থিত থাকলেও তা খুবই অপরিপক্ক। সার্কভুক্ত দেশগুলির জন্য যদি একটি সাধারণ ডিএমএফআরএম তৈরি করা যায় যা সমস্তদেশের জন্য একই সময়ে দরকারী এবং যা একই সাথে এই ক্ষেত্রে আলাদা বিনিয়োগের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।
- সমুদ্রের দূরবর্তী এলাকায় মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে (ইইজেড এবং এবিএনজে এর ২০০ মাইল দূরে) টুনা ও বড় আকারের রাক্ষুসে মাছ শিকার করার জন্য পারস্পরিক সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- সামদ্রিক সুরক্ষিত অঞ্চল গুলিকে প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

অন্যান্য কৌশল সমূহ: মৎস্য উপখাত সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলি নিম্নরূপ:

- মৎস্য এবং মৎস্য জাতীয় দ্রব্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
- উন্নত চাষ প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য চাষী/উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্দীপনামূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হবে।
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য চাষের সুবিধার্থে মৎস্য সম্পর্কিত তথ্য ও আধুনিক প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত নতুন বিধি, আইন, নিয়ম, নীতিমালা প্রবর্তন ও প্রচার করা হবে।
- বিশেষ বিশেষ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য নতুন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- আধুনিক গবেষণাগার পরিচালনা করার জন্য এবং প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের জন্য দক্ষ/প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা হবে।
- যেহেতু জেলেদের জীবন জলজ পরিবেশের ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তাদের ওপরে মারাত্মকভাবে পড়বে। তাদের জীবন-জীবিকার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে।
- জীববৈচিত্রের পরিবর্তন, অভয়ারণ্যের প্রভাব, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার, হাওর অববাহিকার আকৃতি, রাসায়নিক ও জৈবিক পরিবর্তন, মাছের উৎপাদন, মাছের অভিবাসন এবং জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদি অধ্যয়ন / গবেষণা বাস্তবায়ন করা হবে।
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এজেন্সিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় জোরদার করা হবে।

এছাড়াও দেশে ও বিদেশে স্বাস্থ্যকর শুকনো মাছের বিশাল চাহিদার কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যকর শুকনো মাছ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে আধুনিক শুটকি (শুকনো মাছ) মহল স্থাপনের উদ্যোগ নেবে। বাংলাদেশের শিপ বিল্ডিং শিল্প মৎস্য খাতের বিভিন্ন অগ্রগতি থেকে উৎসাহ পাচ্ছে। ডকিং / আনডকিং / বিল্ডিং এবং মেরামতের সুবিধায় প্রচুর ফিশিং ট্রলার, বার্জ, টাগ এবং নৌযানের ভীষণ প্রয়োজন। বিএফডিসি ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম ফিশ হারবার এবং পাথরঘাটা ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারে ডকইয়ার্ড স্থাপন করেছে। বিদ্যমান সুবিধা বাড়ানোর জন্য সম্প্রতি চট্টগ্রাম ফিশ হারবারে আরও একটি দ্বীমুখি চ্যানেল স্পিওয়ে নির্মিত হয়েছে। ফিশিং বোটের ডকিংয়ের সুযোগ বাড়ানোর জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে আরও ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।

৪.৬ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৪.৬.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের কৃষিকাজ হাইড্রোলজিকাল চক্র দ্বারা মূলত নির্ধারিত হয়। কৃষকদের বর্ষা মৌসুমে বন্যার বিরুদ্ধে সুরক্ষা, শুকনো মৌসুমে সেচ, আর্দ্র মৌসুমে পরিপূরক সেচ এমনকি উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সুরক্ষা, ভেজা ও শুকনো মৌসুমে যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা নদী ভাঙ্গঁনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সম্পর্কিত ঝুঁকি (ঝড়ের তীব্রতা / ঘূর্ণিঝড়)-র বিরুদ্ধে সুরক্ষা ব্যবস্থা।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার সর্বনিম্ন তীরবর্তী দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ৫৭ টি ট্রান্স সীমানা নদী সহ প্রায় ৭০০ নদীর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকার কারণে এর ভূখন্ড, চীন, ভারত এবং নেপালের মতো উপরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির সাথে এর আন্তঃসীমান্ত পানি সম্পদ রয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার আয়তনের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ অববাহিকা বাংলাদেশ ভূখন্ডের অন্তর্গত। বাংলাদেশের ৫৭ টি ট্রান্স সীমানা নদীর মধ্যে ১৩ টি নদী গঙ্গা অববাহিকার অধীনে চারটি হাইড্রোলজিকাল অঞ্চলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পড়ে; ১১ টি নদী ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার অধীনে সাতটি হাইড্রোলজিকাল অঞ্চল এবং ২৫ টি নদী ছয়টি হাইড্রোলজিকাল অঞ্চলকে মেঘনা অববাহিকায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলাদেশের নদী সমূহে আন্তঃসীমান্ত নদীতে বার্ষিক পানির প্রবাহ অনুমান করা হয় ১২০০ বিলিয়ন ঘনমিটার (বিসিএম), যার মধ্যে তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ প্রায় ৯৮১ বিসিএম (অর্থাৎ মোট সীমান্ত প্রবাহের প্রায় ৭৮ শতাংশ), যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে দেশে প্রবেশ করে। ৯৮১ বিসিএম এর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের ৫৪ শতাংশ, গঙ্গার ৩১ শতাংশ, (উজান) মেঘনার উপনদীগুলির প্রায় ১৪ শতাংশ এবং পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য ছোটখাটো নদীগুলির এক শতাংশ অবদান রয়েছে। মোট ট্রান্স সীমানা প্রবাহের মাত্র ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৪৮ বিসিএম শুকনো মৌসুমে পাওয়া যায়, যেখানে ফেব্রুয়ারি মাসে মোট প্রবাহের মাত্র ১ শতাংশ (১১ বিসিএম) পাওয়া যায় (আহমেদ ও রয়, ২০০৪), এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শুকনো মৌসুমে পানির চাহিদা মেটাতে আন্তঃ সীমানা প্রবাহের দুর্বলতা রয়েছে।

নদী তীর ভাঙ্গন রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামগ্রীক পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, নদীর নাব্যতা উন্নত করতে নদীর ড্রেজিংও অব্যাহত রয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে নিয়মিত বন্যা, নদীর তীর ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা এবং খরা-র মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে আয় ও জীবন-জীবিকার ক্ষতির বিষয়টি বিরাজমান রয়েছে। সরকার পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি অনুসরণ করবে না। সুতরাং, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য পানির গুরুত্ব এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক ঝুঁকির সাথে এর শক্তিশালী সংযোগগুলি দেখা, কৃষির আয় ও জীবিকা নির্বাহের সময় প্রাকৃতিক ঝুঁকিগুলির ঝুঁকি হ্রাস করে এমন সর্বোত্তম অনুশীলন, ভূমি ব্যবহার, কৃষি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের সাথে সামগ্রীক পানি ব্যবস্থাপনার ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি স্টাডি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (বিডিপি ২১০০) নামে পরিচিত এই স্টাডিটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নভেম্বর ২০১৮ সালে এনইসি কতৃক অনুমোদিত হয়েছে। পিপি ২০৪১-এ পানি ব্যববস্থাপনার কৌশলগ্রহণের মূল উপাদান ছিল বিডিপি ২১০০ এবং বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

এটি লক্ষণীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে বিডিপি ২১০০ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, নদীর তীর ভাঙ্গন, সেচ, নগর ও পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ, পানি দূষণ, জমি পুনরুদ্ধার, নদী ড্রেজিং সহ পানি ব্যববস্থাপনার সাথে জড়িত অভ্যন্তরীণ জলের ট্র্যাফিক, পরিবেশ সংরক্ষণ, বন সম্পদ, মৎস্যজীবন এবং জৈব- বৈচিত্র সংরক্ষণে সকল পরিসরে পানি ব্যবস্থাপনার এই বিস্তৃত পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নে একাধিক খাত এবং একাধিক মন্ত্রণালয় জড়িত। এটি প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যখাত সহ কৃষির সাথে সম্পর্কিত পানির সমস্যাগুলির সাথে নীবিড়ভাবে কাজ করে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এই পরিকল্পনা দলিলের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অধ্যায় ৮ এ আলোচনা করা হয়েছে; নগর খাতের পানির সমস্যাগুলি অধ্যায় ১১ এ আলোচনা করা হয়েছে; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলি অধ্যায় ১৪ এ আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) দেশের পানিসম্পদের উন্নয়ন ও পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। ষাট বছর আগে প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে, এটি বন্যা ও পানি নিষ্কাশন উপযোগী মোট সাড়ে ছয় মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমি তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১,৬২৪ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করেছে এবং ১৬,২৬২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেছে যার মধ্যে ৫,৭৫৭ কি.মি. উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে। আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি মেঘনা মোহনায় প্রায় ১০,৩৭০ বর্গকিলোমিটার

জমি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এর পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং মোট বন্যার সমভূমির ৫০ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। তদুপরি, বিডব্লিউডিবি পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (BCCTF) মাধ্যমে ৯৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

কৃষির সাথে সম্পর্কিত পানি ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তিনটি প্রধান মন্ত্রণালয় হল পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় , কৃষি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। বৃহৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এবং নদী পরিচালনার সমস্যাগুলি নিয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পগুলি নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিএডিসি, বিএমডিএ, এলজিইডি, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশনগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জল প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ। পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) একটি নির্বাহী সংস্থা যা বাংলাদেশের পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ। সরকার পানি কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করেছে, যা পানি ব্যবস্থাপনার জন্য আইনী কাঠামো নিশ্চিত করেছে। এই আইনটি বাংলাদেশের পানির সমন্বিত উন্নয়ন, পরিচালনা, নিষ্কাশন, বিতরণ, ব্যবহার, সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি বিস্তৃত আইন এবং একীভূত সংস্থান হিসেবে পানি ব্যবস্থাপনার সব বিষয়কে বিবেচনা করেছে। ওয়াটার অ্যাক্ট ২০১৩ বর্তমানে ১৯৯৯ এর জাতীয় পানি নীতি এবং ২০০১ সালের জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা দলিল দ্বারা সংজ্ঞায়িত বেশ কয়েকটি অপারেটিং নীতি ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছে । সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতি ২০১৭ এবং কৃষিতে ভূ-গর্ভস্থ পনি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮ ছাড়াও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ অনুমোদিত যা ইন্টিগ্রেটেড পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) উন্নতি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ভূগর্ভঃস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮ কৃষি খাতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পানির এবং তার ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর অধীনে ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদীর জমি অবৈধ দখল প্রতিরোধ, এবং নদীর জল এবং পরিবেশকে সকল প্রকার বর্জ্য দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য দায়বদ্ধ। সমন্বিত উন্নয়নের জন্য নদী ব্যবস্থার ব্যবহার, এবং নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্তমৌসুমে নাব্যতারক্ষা সহ নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার করা এ কমিশনের কর্মপরিকল্পনার অন্তভূক্ত। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ নদী সংরক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলি বিকাশ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় নিযুক্ত আরেকটি সংস্থা।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ এবং পানির জন্য বিশ্বব্যাংক উচ্চ স্তরের প্যানেলের সদস্য ছিলেন, যা টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পানির মূল্যমানকে সামনে নিয়ে এসেছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি সেল পানির মূল্যমান এবং এসডিজি অর্জনের মধ্যকার সম্পৃক্ততার কারণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, মূল্যমান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি চিহ্নিতকরণ এবং সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়, উচ্চ-স্তরের পানির মূল্যমান কমিটি এবং পানির মূল্যমান কারিগরি কমিটি অবহিত নীতিমালা ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য পানির ধারণাকৃত মূল্য নির্ধারণ জন্য একটি গবেষণা পস্তাবনা প্রস্তুত করেছে। এটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং এখন ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে, উচ্চ-স্তরের পানি মূল্যমান কমিটি এবং পানি মূল্যমান কারিগরি কমিটি এ বিষয়ে একটি পজিশন পেপার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪.৬.২ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

জলাশয়গুলির উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং তাদের যথাযথ ব্যবহারকে প্রভাবিত করছে এমন বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ জল খাত পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং প্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে, যার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

বন্যার ঝুঁকি: বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বন্যাপ্রবণ দেশ। দেশের বিভিন্ন হটস্পট এবং হাইড্রোলজিকাল অঞ্চল বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের বন্যার মুখোমুখি হয়। উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলগুলি নদীর বন্যার জন্য বেশি সংবেদনশীল এবং উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-হিলি অঞ্চল পাশাপাশি উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চলগুলি বন্যার ঝুঁকিতে রয়েছে (এপ্রিল-মে এবং সেপ্টেম্বরের সময়)। বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের অনেক জায়গায় বন্যা এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তবে প্রধানত দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এটি বেশী ঘটে থাকে। উপকূলীয় বন্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়। প্রতিবছর বন্যার ফলে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, এতে অনেক প্রাণিসম্পদ বিপনন হয় এবং বিশেষত গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের জন্য বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়। বন্যার পরে, খাদ্য সংকট অনেক দরিদ্র পরিবারের ক্ষুধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শুষ্ক মৌসুমে পানির সহজলভ্যতা: বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে পানির সহজলভ্যতা এবং পানির গুণাগুণ কৃষি খাতের মূল বিষয়। খাদ্য চাহিদার বৃদ্ধি, এবং কৃষি জমি ও পানি সম্পদ হ্রাসের কারণে কৃষিক্ষেত্র চাপের মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া খাদ্য উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌছেছে। বাংলাদেশে বছরজুড়ে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। খরা মূলত প্রাক-বর্ষা এবং বর্ষা-পরবর্তী মৌসুমে দেখা দেয়, তবে কিছু চরম ক্ষেত্রে বর্ষা মৌসুমে প্রাক-বর্ষাকাল খরা বৃদ্ধি পেয়েছিল বর্ষার বৃষ্টিপাতের বিলম্বের কারণে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজি অঞ্চলগুলি খরার জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

শুরুর দিককার খরা মূলত দেরিতে শুরু হওয়া বর্ষা বা বর্ষার বৃষ্টিপাতের বিরতির কারণে ঘটে থাকে। এটি বরেন্দ্র এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রাক-বর্ষা মৌসুমের সূচনা, যার ওপর ভিত্তি করে কৃষকরা "আউস" ধানের চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বছরের পর বছর, প্রাক-বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির বিরতি তাই ফসলের ক্ষতি বা সম্পূর্ণ ফসল হানীর কারণ হতে পারে। মধ্য-মৌসুমের খরা স্বল্পকালীন বা দীর্ঘায়িত শুকনো পরিবেশের জন্য সংগঠিত হয়। মৌসুম শেষের খরার প্রকোপ হয় যদি দ্রুত বৃষ্টিপাত শেষ হয়ে যায়, এটি "আমন" ধানের ফসলের ওপর প্রভাব ফেলে। উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি এইসকল খরার কারণে বিশেষ ক্ষতির শিকার হয়। খরার কারণে প্রতিবছর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শুকনো মৌসুম ও খরার সময় সেচ নিশ্চিত করার জন্য সারা দেশে অনেকগুলো সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবুও শুষ্ক মৌসুমে পানির সরবরাহ এবং সেচের উচ্চ ব্যয় কৃষিক্ষেত্রের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত।

নদীর পানি ব্যবস্থাপনা: পানির সাথে সম্পর্কিত বেশিরভাগ চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির সাথে সম্পর্কিত। ক্রমবর্ধমান পানি উত্তোলনের কারণে শুকনো মৌসুমের প্রবাহ হ্রাসে সারা দেশে পানির তীব্র সংকট দেখা দিচ্ছে। মোট আন্তঃসীমান্ত প্রবাহের কেবল ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৪৮ বিলিয়ন ঘনমিটার (বিসিএম) শুকনো মৌসুমে পাওয়া যায় যেখানে ফেব্রুয়ারির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোট প্রবাহের মাত্র ১ শতাংশ (১১ বিসিএম) পাওয়া যায়। প্রবাহ হ্রাস লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ এবং পরিবেশগত অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে। প্রধান নদ-নদী পুনরুদ্ধার এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। শুষ্ক মৌসুমের বর্ধিত পনিপ্রবাহ পুরো দেশকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। তবে এই কৌশলগুলি শুষ্ক মৌসুমের সেচ উদ্যোগকে প্রভাবিত করে যেমন খরা এবং পানির ঘাটতি অথ্যাৎ নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করতে সাহায্য করবে, উত্তর-মধ্য হাইড্রোলজি অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক উত্তোলন এবং এর ক্ষয়; দক্ষিণ-মধ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং উত্তর-পশ্চিম হাইড্রোলজি অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহের উৎসগুলিকে বাড়িয়ে তোলা।

উপকূলীয় অঞ্চল সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা: উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত, যা প্রায়শই উচ্চ জোয়ার, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, ঘূর্ণিঝড় এবং এর সাথে জলোচ্ছ্বাসের পানিতে নিমজ্জিত থাকে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কৃষিকাজে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য ১৯৬০ এর দশকে পলডারাইজেশন শুরু হয়েছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে, ক্ষয় এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে পোল্ডারগুলি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং এর প্রভাব ডেল্টা অঞ্চলে উপকূলীয় নদীসমূহের নিষ্কাশন ক্ষমতা এবং পলিমাটির ওপর পড়তে শুরু করে। তদুপরি, উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষত সমতল ও অরক্ষিত অঞ্চলগুলি ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ের ঘটনায় এবং তীব্র জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র স্তর বৃদ্ধি, ভারী বৃষ্টি বর্ষণ, স্বাদু পানির অপ্রাপ্যতা এবং লবণাক্ত পানির সংক্রমণের কারণে মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়বে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে কয়েক বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে দেশের লবণাক্ততার সীমানা উপরের দিকে প্রবাহিত হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের বেশ কয়েকটি অঞ্চল বিশেষত পশ্চিমাঞ্চল এবং নোয়াখালী মূল ভূখন্ড ব্যাপক এবং স্থায়ী জলাবদ্ধতায় ভুগছে। উপকূলীয় পোল্ডারগুলিতে, বিশেষত সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, বাগেরহাট এবং নোয়াখালী জেলায় জলাবদ্ধতার সমস্যা মারাত্মক। জলাবদ্ধতার পিছনে কারণগুলি জটিল এবং অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন। নিষ্কাশন ক্ষমতা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। কিছু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অপ্রতুল ড্রেনেজ সুবিধা এবং রাস্তা নির্মানের কারণে বন্যা সুরক্ষা বাঁধের অভ্যন্তরে প্রতিবছর বন্যার প্রাদুর্ভাব হয়।

জলাভূমি সংরক্ষণ: জলাভূমি পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা এবং আর্দ্র মৌসুম ধরে রাখার অববাহিকা হিসেবে কাজ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলাভূমিগুলিতে স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধ উপাদান রয়েছে এবং এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকার অবলম্বন। জলাভূমি, যা স্থানীয়ভাবে হাওর, বাওড় এবং বিল নামে পরিচিত, জনসংখ্যার চাপ, অপরিকল্পিত অবকাঠামোগুলির কারণে সেগুলি হারিয়ে যাচ্ছে যা জলাভূমিগুলির বাস্তুসংস্থান এবং হাইড্রোলজি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে বাঁধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশের জলাভূমিগুলির মোট আয়তন ৭ থেকে ৮ মিলিয়ন হেক্টর, বা মোট ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৫০ শতাংশ মনে করা হয়। তবে জলাভূমিগুলি উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে এবং এই জলাভূমি সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তন: জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চ্যালেঞ্জগুলি এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করা হয়েছে। দেশের পানিসম্পদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উপকূলীয় অঞ্চলে সর্বাধিক বলে ধরে নেওয়া হয়। স্বাদু পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পাবে এবং ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং উপকূলীয় বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভূগর্ভস্থ জলের সাথে ভূপরিস্থ পানির লবণাক্ততার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং তাদের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যার বৃদ্ধি (বিডিপি ২১০০) বিবেচনা করে অভ্যন্তরীণ পানির চাহিদা ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালে ১০০ শতাংশ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমানভাবে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সুতরাং, এটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সম্ভাব্য এবং সম্ভবত আগামী দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হতে পারে। সম্প্রসারণযোগ্য নগরকেন্দ্রগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পানিসম্পদ অবকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এই নগর কেন্দ্রগুলির আশেপাশে নগর ও শিল্প দূষণ স্বাদু পানির গুণমানকে প্রভাবিত করবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে, শহুরে ও গ্রামীণ অঞ্চলে স্যানিটেশন একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিবে।

উজানের দিকে উন্নয়ন: নদীর উজানে উন্নয়নের কারণে দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্রমশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। বিশেষত ভারতের মত উজানের দেশগুলিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ট্রান্স সীমানা নদীর শুষ্ক মৌসুম প্রবাহকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। গঙ্গার প্রবাহ হ্রাস বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবং বিশেষত সুন্দরবনের ইকোলজি, কৃষি, নেভিগেশন, হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল ডায়নামিকস ইত্যাদির জন্য প্রয়জোনীয় স্বাদু পানি সরবরাহকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা: পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য এ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহের টেকসইতা গুরুত্বপূর্ণ। অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণমূলক কার্যক্রমের জন্য সম্পদ ব্যবহারের নানান অংশকে যুক্ত করা এবং এর প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পানি সম্পর্কিত সংস্থাগুলির বহুপাক্ষিক অংশগ্রহণ, সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। দেশে ৩৫ টিরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা রয়েছে, যা প্রায় ১৩ টি মন্ত্রণালয় / বিভাগের সাথে সম্পর্কিত । তারা পানি খাত পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য কাজ করছে। মানব সম্পদ, ব্যবহারিক জ্ঞান, বাজেট ইত্যাদি এই সংস্থাসমূহের আবিশ্যিক কাজগুলি দক্ষতার সাথে সম্পাদন করার জন্য অপর্যাপ্ত। সম্পদের অভাবের কারণে বিদ্যমান বেশিরভাগ অবকাঠামোর অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) কাজ যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাড়া দিতে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও অপ্রতুল। বাংলাদেশে আইডব্লিউআরএম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক বহুমাত্রিকতা আন্তঃনির্ভরশীল প্রকৃতি এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিভিন্ন সেক্টর এবং স্থানিক সীমানায় একীভূতকরণের জন্য একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত।

৪.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য পানিসম্পদ খাতের লক্ষ্যসমূহ পিপি ২০৪১ এবং বিডিপি ২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় পানিসম্পদ খাতের উদ্দেশ্য হল পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান পানি অনুশীলনগুলি বৃদ্ধি করা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের পরিকল্পনা, বন্যার আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, সেচের উন্নয়ন এবং চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনাসহ আরও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনাকে বিস্তৃত করা, বিডিপি ২১০০ তে যেরূপ পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- নাব্যতা বৃদ্ধি এবং নৌ-পরিবহনের সুবিধার্থে নদীর ড্রেজিং অব্যাহত ও জোরদার করা;
- শস্য উৎপাদনে সেচের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভূপরিস্থিত পানি সেচের ব্যবহার বৃদ্ধি;
- দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীর তীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা;
- স্থায়ী সেচের জন্য ভূ-পরিস্থিত এবং ভূগর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, ভূগর্ভস্থ পানিরসংরক্ষণ সুরক্ষিত করা;
- অববাহিকা প্রশস্ত (Basin-wide) পানিসম্পদ উন্নয়ন এবং আন্তঃসীমান্ত নদী পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা;
- সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্বাদুপানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে লবণাক্ত পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করা;
- বন্যা ও অন্যান্য বিপর্যয় থেকে অর্থনৈতিক ক্ষতি কমাতে আধুনিক প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নয়ন;

- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কৌশল গ্রহণ;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ;
- সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল পরিচালনা কৌশল বাস্তবায়ন;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা;
- পরিকল্পনা কমিশনের সহযোগিতায় পানির মূল্যমানকে সরকারি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মূলধারায় আনা প্রয়োজন যেন তা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সহায়তা করতে পারে যা কিনা টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।
- অধিকতর টেকসই বিনিয়োগ এবং অপারেশনাল পছন্দগুলিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য বেসরকারি খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পানির মূল্যমান সম্পর্কিত অপশন সমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রদর্শন করা।

সারণি ৪.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পানিখাতে লক্ষ্যমাত্রা

সূচক	লক্ষ্যমাত্রা (বার্ষিক)
তীর সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ (কিমি)	২,৩৫৬
বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিমি)	৩,৯৪৯
উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ (কিমি)	১,০৪৩
নদী ড্রেজিং (কিমি)	২,৮১৭
খাল খনন/পুনঃখনন (কিমি)	১৭,০৪২
সেচ খাল খনন/পুনঃখনন (কিমি)	১,১১৯
পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো/হাইড্রোলিক অবকাঠামো (সংখ্যা)	২,০৫০
উপকূলীয় ক্রস-বাঁধ (সংখ্যা)	৭
ডব্লিউএমজি/ডব্লিউএমএ/ডব্লিউএমএফ প্রতিষ্ঠা (সংখ্যা)	৩৬৩
ডব্লিউএমজি/ডব্লিউএমএ/ডব্লিউএমএফ নিবন্ধন (সংখ্যা)	৫৮১
ভূমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৭১৫৯

উৎসঃ পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

কৌশল

বিডিপি ২০২১ এবং পিপি ২০৪১-এ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য বিশদ কৌশল উল্লেখ রয়েছে। বিডিপি ২১০০ পানি সম্পদ খাতের কৌশলগুলি কয়েকটি বিস্তৃত স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে: বন্যার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল, স্বাদু পানির কৌশল এবং ছয়টি হট স্পটের জন্য কৌশল - যথা, বরেন্দ্র ও খরা প্রবণ অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল, নদী ব্যবস্থা এবং মোহনা, নগর অঞ্চল, হাওর এবং ফ্ল্যাশ বন্যা অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম। পিপি ২০৪১ এবং বিডিপি ২১০০-তে নির্ধারিত মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদি প্রোগ্রামগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

পানিসম্পদের ব্যবহার এবং পানির অর্থনীতি: ফসল উৎপাদন এবং টেকসই কৃষিকাজ বৃদ্ধির জন্য পানি একটি অতি প্রয়োজনীয় ইনপুট। জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিত উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে, দেশের উল্লেখযোগ্য অংশ শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। অতএব, ফসলের নিবিড়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি তথা ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনাও অপরিহার্য। সেচের দক্ষতা নির্ধারণ করা হবে এবং সহজলভ্য পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের কার্যকারিতা এবং পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রচার করা হবে। কৌশলটির অংশ হিসেবে, জলাশয়, উপকূলীয় এবং পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে জলাধার এবং বৃষ্টির পানি সংগ্রহকে উৎসাহিত করতে হবে এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র পানিসম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি ছোট-বড় পানিসম্পদ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

বেড়িবাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নত করা: ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার জন্য প্রচুর অর্থনৈতিক কার্যক্রম চলছে এবং আরও বেশ কয়েকটি পাইপলাইনে রয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অতি বন্যা দেখা দিতে পারে যার জন্য প্রধান শহরগুলি সহ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে উচ্চ স্তরের সুরক্ষা দেয়া

প্রয়োজন। সুতরাং, নতুন বাঁধ এবং পানি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ জোরদার এবং/বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার অঞ্চল এবং প্রধান নগর শহরগুলিতে। তাছাড়া মাছের স্বাভাবিক চলাচলের জন্য মাছ বান্ধব কাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে, এক্ষেত্রে মাছের বংশবৃদ্ধি ও চারণের জন্য মাছের অভিবাসনের সুবিধার্থে মাছের মৌসুমী চলাচলকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বেড়িবাঁধ ও কাঠামো পুনঃস্থাপন, পুনরায় নকশা নিরূপণ ও পরিমার্জন: বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশী ও সেচ (এফসিডিআই) সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে। তবে, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে, এই প্রকল্পগুলির বেশিরভাগ সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী নয়, যা কিনা বন্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। অনেকগুলি বেড়িবাঁধ এবং কাঠামো পুনরুদ্ধার, পুনরায় নকশাকরণ এবং সংশোধন করা দরকার। শুকনো মৌসুমে ডুবে যাওয়া চরগুলিকে বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং প্রবাহ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। বাঁধ এবং অন্যান্য এফসিডিআই কাঠামোর পুনর্নির্মাণ, পুনরায় নকশাকরণ ও সংশোধন করার জন্য উজান থেকে অতিরিক্ত পানির তাৎক্ষনিক ও সময়োচিত নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য করার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, বিশেষত উচ্চ মাত্রায় পানির প্রবাহ যখন একত্রে প্রবাহিত হয়।

স্থানিক পরিকল্পনা এবং বন্যার ঝুঁকি জোনিং গ্রহণ: স্থানিক পরিকল্পনা এবং বন্যার ঝুঁকি জোনিং সংকটপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বন্যার নিরাপত্তা স্তর স্থাপন করা হবে এবং এই বিভাগগুলি দ্বারা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি, বন্যার ঝুঁকি ম্যাপিং ও মডেলিং সহ স্থানিক পরিকল্পনা, জোনিং ও বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর আর্থিক ও আইনী কাঠামোর উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা হবে।

বন্যার সতর্কতার সময় বাড়ানো: বন্যার প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থাটি আপডেট করা দরকার এবং সতর্কতা প্রদানের সময়কালের ব্যাপারে আরও জোর দেয়া প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের কাছে আরও অধিক সময় দিয়ে সতর্কবার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। সম্প্রদায় ভিত্তিক প্রারম্ভিক সতর্কতা পরিষেবাদি সম্প্রচার করা হবে, বন্যা এজেন্ট এবং নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগের জন্য এবং নেটওয়ার্কের জন্য হাইড্রোলজি (BWDB), আবহাওয়া বিজ্ঞান, মডেলিং (ইনস্টিটিউট এবং কেন্দ্র), প্রচার এবং প্রারম্ভিক পদক্ষেপের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক দাঁড় করানো হবে।

অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন: সময়মতো অর্থের অভাবে প্রকল্পগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ একটি বড় সমস্যা, যার জন্য অনেকগুলি কাঠামো অ-কার্যকরী হয়ে উঠছে। সুতরাং, প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি আবশ্যক। পানি সম্পদ খাতের সমাপ্ত প্রকল্পগুলি বিশেষত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে যথাযথভাবে পরিচালিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে যাতে প্রকল্পগুলির সৃষ্ট সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। এসব কার্যক্রমের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সক্ষমতা জোরদার করা হবে।

জলাশয় এবং যোগাযোগ পুনরুদ্ধার: পললতা এবং মানুষের কিছু কার্যক্রমের কারণে নদী ও খালসমূহ সংকীর্ন হয়ে পড়ায় নদী ও খালে প্রবাহিত পানির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি নেই। জলাশয় পুনরুদ্ধার এবং প্লাবনভূমি, জলাভূমি এবং নদীর মধ্যে যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা হবে।

নদী ব্যবস্থাপনা, খনন ও স্মার্ট ড্রেজিং: নদীগুলি ভরাট হয়ে যাচ্ছে যা পানির দক্ষ প্রবাহকে হ্রাস করে। নদী ব্যবস্থাপনার জন্য খনন ও স্মার্ট ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন। এছাড়াও, বছরের পর বছর ধরে বর্ষণ এবং প্রবাহের ক্ষমতা হ্রাস করার পাশাপাশি বড় বড় নদীগুলির নেভিগেশন রুটে বাঁধা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে জেগে উঠা নিমজ্জিত চরগুলি অপসারণ করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংয়ের প্রয়োজন হবে। নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নেভিগেশন রুটগুলি বহুবছর ব্যাপি কার্যকর রাখতে হবে। ড্রেজিং ডাম্পের অবস্থান বা "বালুমহলচ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন যেন তারা সেগুলো কোনও এক স্থানে সীমতি হয়ে না পড়ে এবং এই পলিমাটির ব্যবস্থাপনাও ভালভাবে করতে হবে।

অববাহিকা জুড়ে পানি সম্পদ উন্নয়ন উদ্যোগ:

আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি সম্পদ বন্টন করে নেওয়ার জন্য এবং একীভূত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী অববাহিকা সংস্থাগুলি (RBO) নদী অববাহিকা এলাকায় সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং নদী অববাহিকার সংশ্লিষ্ট দেশগুলির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই সমস্ত নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সমাধান করতে

সহায়তা করতে পারে। অববাহিকা ভিত্তিক এ্যাপ্রোচের সাহায্যে অববাহিকাসমূহকে একক ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করা যায়। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য অববাহিকা ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত কোন সংস্থা নেই। বিডিপি ২১০০-এ নিম্নলিখিত কাঠামোটি প্রস্তাব করা হয়েছে:

- গঙ্গা নদী অববাহিকা সংস্থা-বাংলাদেশ, ভারত এবং নেপাল এর সমন্বয়ে গঠিত;
- ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকা সংস্থা-বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান এবং চীন নিয়ে গঠিত; এবং
- মেঘনা/বরাক নদী অববাহিকা সংস্থা-বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।

নিরাপদ পানি থেকে টেকসই পানীয় জল এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ: পানীয় এবং স্যানিটেশনের উদ্দেশ্যে পানির টেকসই ব্যবহার এবং নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। যেখানে সম্ভব সেখানেই বৃষ্টির পানি সংগ্রহকে উৎসাহিত করা হবে। এ ছাড়া বিদ্যমান জলাধার গুলোতে পানি ধরে রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, জীবিকা এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য পানির গুণগতমান বজায় রাখা: বিষয়টি পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল অঞ্চলগুলির সুরক্ষা এবং উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে দূষণ রোধ দু'টোর সাথেই জড়িত। নগরীর পানীয় জল এবং স্যানিটেশন কর্তৃপক্ষ স্বাদু পানির মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালনকারী।

উপকূলীয় অঞ্চলে পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বন্যার ঝুঁকি হ্রাস: উপকূলীয় অঞ্চলে পানি নিষ্কাশন একটি বড় সমস্যা। নদীর পানি ধারনের কম ক্ষমতা এবং জোয়ারের প্রভাবের সাথে পলিপাতের কারণে এটি হয়ে থাকে। সুতরাং, পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করবে। উপকূলীয় জেলাগুলিতে গ্রামীণ নদী/খাল পুনরুদ্ধার ও জীবিকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যার ঝুঁকি খুব বেশি এবং বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস একই সময় ঘটলে তা বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে। সুতরাং, যথাযথ সময়ে বন্যা ঝুঁকি প্রতিরোধ কৌশল এবং যথাযথ প্রস্তুতির কার্যকর বাস্তবায়ন করা হবে।

ভূ-উপরিস্থ সেচের সম্প্রসারণ: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আঞ্চলিক ভূগর্ভস্থ সেচ প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছে যা কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব রয়েছে। বিডিপি ২১০০-এ ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ প্রকল্পগুলির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপ:

- সেচের জন্য জলাধারগুলির উন্নয়ন ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃস্থাপিত করে এবং ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে। মূল অগ্রাধিকারমূলক বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

  (ক) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ছোট-বড় ভূ-উপরিস্থ সেচের উন্নয়ন; নতুন অবকাঠামো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

  (খ) দেশের উত্তরাঞ্চলে গভীর নলকূপ ভিত্তিক সেচের ওপর নির্ভরতা আংশিক হ্রাস করা, ব্যয় হ্রাস, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের ঝুঁকি কমিয়ে আনা;

  (গ) দেশের সর্ব দক্ষিণে সমুদ্রের বিস্তৃতির বিরুদ্ধে ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার এবং উৎপাদনের হাতিয়ার সমূহকে সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ করে পূর্ববর্তী ঘূর্ণিঝড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ডাইক এবং বাঁধগুলির পুনর্বাসন;

  (ঘ) উন্নত নিষ্কাশন, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং বন্যার ব্যবস্থাপনা;

  (ঙ) দক্ষিণের নদীসমূহের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা, বিশেষত প্রধান নদীসমূহে ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ;

  (চ) শুষ্ক মৌসুমী পানির চাহিদা মেটাতে পানি ধরে রাখতে জলাধার তৈরির উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

  (ছ) ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজ, ২য় তিস্তা ব্যারাজ ও পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

- পানির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পানি সাশ্রয় প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বিতরণ ব্যবস্থায় ক্ষতি হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি স্থাপন করা হবে। এ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে: উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার (পানি পরিচালন সমবায়গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি) মাধ্যমে বিদ্যমান প্রকল্পগুলিতে পানি সাশ্রয়ী কৌশল যেমন; ড্রিপ সেচ, বারিড পাইপ সেচ, 'ফার্টিগেশন' এর মতো পানি সাশ্রয়ী কৌশলগুলির বিকাশ; বা বিদ্যমান স্কিমগুলির পুনর্বাসন।

দক্ষিণে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের প্রভাব হ্রাস এবং নদীর পানির প্রবাহকে বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। বিডিপি ২১০০- এর নির্দেশনা অনুযায়ী যে কার্যক্রমসমূহের ওপর জোর দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: পোল্ডারগুলির পুনর্বাসন এবং তাদের পরিচালনা; নদী খনন; ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণ এবং লবণাক্ত পানির উন্নত ব্যবস্থাপনা চর্চা।

উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন ভূমি পুনরুদ্ধার: ভূমি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং পুনরায় উন্নয়নের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াতে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কৃত্রিম পদক্ষেপ হিসেবে মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন বিষয়ে আরো বেশী জ্ঞান আহরণের জন্য গবেষণা পরিধি বৃদ্ধি করা হবে। কৌশলগত স্থানসমূহে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ ভূমি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ হবে যার জন্য সম্ভাব্য আড়াআড়ি বাঁধ প্রকল্পগুলি যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ভূমি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত ভূমি ল্যান্ড জোনিং এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষা ও উন্নয়ন করা হবে।

সদ্য জাগা চর এলাকাগুলিতে নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনার জোরদারকরণ: সদ্য জেগে ওঠা চর এলাকাগুলির উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মেঘনার উপকূলে এবং অন্যান্য সব নদীর তীরে নতুন স্বীকৃত চরের ভূমিকে উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করা, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে নদী ব্যবস্থাপনার একীকরণ; পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, আড়িয়াল খাঁ, কুশিয়ারা, গড়াই, মনু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীতে জলাবদ্ধতা এবং ড্রেজিংয়ের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ; নতুন স্বীকৃত অঞ্চলগুলিতে নগর উন্নয়নের জন্য সংহত নগর ও স্থানিক পরিকল্পনা; শিল্পাঞ্চল এবং কৃষি কার্যক্রম উন্নয়ন; এবং শুকনো মৌসুমে দক্ষিণের নদীতে লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা-এ বিষয়ে উন্নয়নের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

হাওর ও আকস্মিক বন্যার অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে রক্ষাকরণ: পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রাক-বর্ষার আকস্মিক বন্যা হাওর অঞ্চলে একটি সাধারণ ঘটনা। ফলস্বরূপ, বিশাল এলাকার নিম্নভূমি প্লাবিত হয়, ফসল কাটার আগেই বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বেশ কয়েকটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্প বিশেষত সুরমা-বাউলাই এবং কুশিয়ারা নদীকেন্দ্রিক প্লাবিত বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করেছে। বিদ্যমান এফসিডিআই প্রকল্পগুলি বাংলাদেশ ডেল্টা ২১০০ পরিকল্পানায় বিধৃত ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিস্থিতি (বৃষ্টিপাতের তীব্রতা এবং প্রধান নদীগুলির সর্বোচ্চ ঢল) মোকাবেলার জন্য সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোগুলি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও, রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজিং, এবং পুনঃখননের মাধ্যমে প্রবাহমান নদীগুলির পানি প্রবাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। হাওর ও আকস্মিক বন্যাঞ্চলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষা, বেসরকারি ও সরকারি উদ্যোগ এবং কৃষি নিবিড় বিনিয়োগের ক্ষেত্র বিশেষত বসত বাড়ির আঙ্গিনায় বাগান এবং নিবিড় প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্র যেগুলোতে অধিক লাভের সুযোগ আছে সেগুলোতে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। দ্রুত জমি প্রস্তুতি, রোপণ, আগাছা দমন, ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, শুকানো ইত্যাদির জন্য হাওর ও ফ্ল্যাশ বন্যার অঞ্চলে যান্ত্রিকীকরণের প্রচলন করা প্রয়োজন। ড্রেজিংয়ের মাটি দিয়ে জমির উচ্চতা বাড়িয়ে বসত বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, ডাল, মশলা এবং ফল চাষাবাদ করার পস্তাব করা হয়েছে। এটি পুষ্টির উন্নয়ন করবে এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধি করবে।

নদী, পানি এবং জীববৈচিত্রতার বিষয়ে এনআরসিসি'র সুপারিশ বাস্তবায়ন: এনআরসি কমিশন নদীর পানি, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য ১২৪ টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে। স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সকল সংস্থা, বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতায় সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলি কার্যকর করা হবে। এনআরসিসি'র একটি উল্লেখযোগ্য পরামর্শ হল নদী ও জলাশয় রক্ষার জন্য শহরগুলোর পাশাপাশি গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ এবং শিল্প বর্জ্যসমূহ অপসারনের জন্য থ্রি আর (হ্রাস, পুনরায় ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য) প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। এনআরসি কমিশনের ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে নদী, খাল, জলাশয়, হাওর-বাওর এবং উপকূলীয় অঞ্চলকে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য দেশের দশটি অঞ্চলের মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করতে দশটি কমিটি গঠন করা হয়েছে; নদীর জলের দূষণ রোধ; নদীগুলির পরিবেশ, পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ; নাব্যতা উন্নয়ন; নদীর ভাঙ্গঁন রোধ; বহুমূখী উপযোগী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী উন্নয়ন কার্যক্রম। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং কর্ণফুলিতে বিদ্যমান মাস্টার প্ল্যানগুলির পাশাপাশি এই মাস্টার প্ল্যানগুলি সময় মতো অনুমোদন এবং কার্যকর করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পানির উৎস সমূহের জন্য কৌশল: হটস্পট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' এ, পার্বত্য এবং উপকূলীয় সমভূমিকে বিবেচনা করা হয়েছে যেখানে পার্বত্য এলাকায় ভূমি ধ্বংসের সাথে উপকূলীয় সমভূমি এলাকায় পলিকরণ ও পুন:পুন: ড্রেজিং সমস্যার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পানি সম্পদের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য যে কৌশলগুলি বিবেচনা করা হবে সেগুলির মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শহরগুলিকে বন্যা এবং ঝড়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা করা; ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি এবং জলোচ্ছ্বাসের বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; পানি সংরক্ষণ এবং টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ; সবুজ বেল্ট, পরিবেশ বান্ধব কাঠামো, মাটি এবং পানি

সংরক্ষণ, এবং বনাঞ্চল সৃষ্টি করে পাহাড়গুলির ক্ষয় ব্যবস্থাপনাকে সংহতকরণ; ক্যাচমেন্ট এবং সাব-ক্যাচমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানগুলি প্রস্তুত করা; বন ও পার্বত্য এলাকায় পানি সম্পর্কিত বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার; এবং ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলগুলোকে পুনরুদ্ধার।

সীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল: যেহেতু গঙ্গার নিম্ন-ব-দ্বীপ-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় বাংলাদেশ অবস্থিত, সে কারণে দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা জটিল এবং উজানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভারত, চীন, ভুটান এবং নেপাল হয়ে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার নিম্নাঞ্চলে প্রবাহিত নদীর গতি পথে বা মরফোলজির ওপর একক বা দ্বিপক্ষীয়ভাবে কোনও হস্তক্ষেপমূলক উন্নয়ন বাংলাদেশের বর্তমান পানির সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে মুখোমুখী হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।

ট্রান্স সীমানা পানির বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। স্বতন্ত্র উন্নয়নের কথা চিন্তা না করে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যৌথ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে। নদীগুলির পরিবেশগত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে। বিডিপি ২১০০-এ ট্রান্স সীমানা পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি হাইলাইট করা হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনার সময়কালে এগুলোর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- বহু-স্তরের সংলাপের ব্যবস্থা যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত পয়েন্টগুলি থেকে আলোচনার সূচনা করতে সহায়তা করবে এবং নদীর অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ইস্যুগুলির সাথে পানি সম্পর্কিত আলোচনাকে যুক্ত করবে। অংশগ্রহণকারীদের অন্য পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সক্ষম করার জন্য তাদের একটি উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হবে, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা রাজনৈতিক বা অন্যান্য শক্তি-ভিত্তিক অবস্থানধারীদের দ্বারা বাঁধার সম্মুখীন হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব এর মতো বিষয়গুলি অন্যান্য নদীর অববাহিকা ব্যবস্থাপনার সাথে একত্রে সমান্তরালভাবে আলোচনা করা যেতে পারে কারণ এটি পানির সহজলভ্যতা এবং ব্যবস্থাপনার অনেকগুলি ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলে।
- পাশাপাশি, পানির সহজলভ্যতা, সীমানা সম্পর্কিত বিষয়গুলি আরও ভাল বোঝার জন্য এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং সাধারণ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনার কার্যকর গঠন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য মাল্টি-ট্র্যাক ওয়াটার কূটনীতি প্রয়োগ করতে হবে যেখানে পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের মাধ্যমে যৌথ নদী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যকর স্কীমসমূহ চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করে বেনিফিট শেয়ারিং-কে কেন্দ্রবিন্দুতে আনা হবে।
- নদীগুলিতে পরিবেশ গত অনুকূল প্রবাহ বজায় রাখা জরুরি এবং এরূপভাবে দ্বি-বহু-পাক্ষিক ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকর করতে হবে। নদীর তীরে বিভিন্ন স্থানে পানি ছাড়ার পরিমাণ এবং গুণগতমানের পরিমাপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
- একবারে একটি চুক্তিতে একমত হওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে একাধিক চুক্তির সমঝোতায় পৌঁছানো বাংলাদেশের জন্য সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য আরও একটি পদ্ধতি হতে পারে। একাধিক চুক্তির আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশের পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য ও সুবিধার ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্পের সুযোগ থাকে।
- পানি বণ্টনের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নদী বিবেচনা করতে হবে। ১৯৯৭ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ এবং ভারত ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন করে নিচ্ছে। শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ বৃদ্ধির জন্যও আলোচনা হচ্ছে। তিস্তার পানি বণ্টনের জন্য চুক্তির কাঠামোটিকে একটি কার্যকর চুক্তি হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। একইভাবে, ছয়টি অগ্রাধিকারযুক্ত ট্রান্স সীমান্ত নদী, যেমন ধরলা, দুধকুমার, মনু, খোয়াই, গোমতি এবং মুহুরীর জন্য পানি বণ্টনের নীতি ব্যবহারিক পর্যায়ে কার্যকর করা প্রয়োজন।
- সম্পৃক্ত দেশগুলি পারস্পরিক উপকারী নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে তাদের মতামত বিবেচনা করবে এবং দ্বি স্তরের উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম হাইড্রলিক এবং পরিবেশগত অবস্থানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সাধারণ সমস্যার সমাধান করবে, যেখানে চাহিদা ভিত্তিক সাধারণ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প শুরু করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখান তৃতীয় কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা বা কোনও দেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। এটির কার্যকারিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য, উভয় দেশকে প্রথমে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সম্মত হওয়া প্রয়োজন।

- বেনিফিট ভাগ করে নেওয়ার জন্য 'পারস্পরিক সুবিধাচ মডেলটি কার্যকর করতে হবে যা একতরফা কর্মকা' কে নিরুৎসাহিত করে এবং ত্রিপক্ষীয় দেশগুলির মধ্যে সমন্বয়কে আরও উৎসাহিত করবে। পারস্পরিক সুবিধার পিছনে ধারণাটি হল পানি সম্পর্কিত বিষয়ের বাইরের বিষয়গুলি আলোচনা প্রক্রিয়ায় সুবিধার বাড়ানোর জন্য। কাঠামো চুক্তি সাধারণ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনায় যৌথ সংস্থা নদী অববাহিকা সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে আলোচনার সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। বিদ্যুৎ খাত বা নাব্যতা এবং শারীরিক যোগাযোগের মতো বিভিন্ন উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ইস্যুগুলিকে জড়িত করা পারস্পরিক লাভের আওতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিতে পারে।
- আইনী ও রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণ সম্পাদন করতে হবে, নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জোনগুলি সনাক্ত করে কার্যকর সহযোগিতা কীভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- নদীর অববাহিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- তদুপরি, হাইড্রো-কূটনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান চর্চা আন্তঃসীমান্ত পানি সংক্রান্ত নেগোশিয়েশনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

৪.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান বিনিয়োগ কর্মসূচি (বিডিপি২১০০আইপি)-এর আওতায় মোট ৮০টি প্রকল্প রয়েছে যার মধ্যে ৬৫টি ভৌত এবং ১৫টি প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প। ২০১৫ সালের মূল্যে এই কর্মসূচির মোট মূলধনী বিনিয়োগ ব্যয় হলো ২,৯৭৮বিলিয়ন (৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশি টাকা। আগামী ৮ বছরের মধ্যে এই কর্মসূচির অন্তর্গত সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু করা হবে। তবে বিনিয়োগের আকার এবং কর্মসূচিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ কার্যাদি কয়েক দশক ধরে চলমান থাকতে পারে।

এই ৮০টি প্রকল্পকে ডেল্টা প্ল্যানে সংজ্ঞায়িত হটস্পট অনুযায়ী ৭টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। ডেল্টার স্বতন্ত্র হাইড্রোলোজিক্যাল এলাকা এবং এই অঞ্চল সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক ঝুঁকির প্রকার ও মাত্রা বিবেচনাপূর্বক করে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার হটস্পটগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ডেল্টা প্ল্যানে মোট ৬টি ভৌগলিক হটস্পট রয়েছেঃ ১) উপকূলীয় অঞ্চল, ২) বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, ৩) হাওর ও আকস্মিক বন্যা কবলিত অঞ্চল, ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, ৫) নদী ব্যবস্থা ও নদীমুখ, এবং ৬) নগর অঞ্চল। সপ্তম হটস্পটটি একটি ক্রস-কাটিং হটস্পট যা বাকি ছয়টি ভৌগলিক হটস্পটের সাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে থাকে। হটস্পটের অভ্যন্তরীণ প্রকল্পসমূহ একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলে সেগুলোর যথার্থতা বিবেচনাপূর্বক উপ-কর্মসূচিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যেমন- নগরাঞ্চলে উন্নত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বরেন্দ্র এলাকায় সেচ এবং হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ সকল কর্মসূচিসমূহ আকার ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান ও জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি বিকাশের পথ সুগম করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (পিআইপি)-টি অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী পুনরায় বিভক্ত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচির বিস্তারিত বর্ণনা পরিশিষ্ট সারণি এ৪.১ এবং এ৪.২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নের সারণি ৪.১২-এ হটস্পট, কর্মসূচির উদ্দেশ্য এবং ২০১৫ সালের মূল্যে নির্দেশিত মোট ব্যয় অনুযায়ী অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ডেল্টা বিনিয়োগ কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নতুন ডেল্টা বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ১৪০০ বিলিয়ন টাকা যা ২০১৫ সালের মূল্যে ১৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর আওতায় নতুন ৪৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। ২০২১ সালের মূল্যে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৪০ বিলিয়ন টাকা (২১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

সারণি ৪.১২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ডেল্টা সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (পিআইপি)
(২০১৫ ভিত্তিবছর মূল্যে)

হটস্পট	কর্মসূচির নাম/আওতা	ব্যয় (বিলিয়ন)
কর্মসূচি ১ নগর অঞ্চল	***বন্যা মুক্ত নগরী*** জলাবদ্ধতার উন্নয়ন, খাল ড্রেজিং এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা নগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: ইউএ ১.২; ইউএ ১.৩; ইউএ ৩.১; ইউএ ৯.৩; ইউএ ১০.১; ইউএ ১১.১	টাকা ১৩৮.৮ মার্কিন ডলার ১.৭৫
কর্মসূচি ২ বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল	***বরেন্দ্র এলাকায় নতুন খাদ্য বেল্ট*** হুরাসাগর/আত্রাই নদী এবং কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প যুক্তিযুক্ত ও পুনরুজ্জীবিত করা। বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: ডিপি ১.২; ডিপি ১.২১; ডিপি ১.৩; ডিপি ১.৪/১.৫	টাকা ১২৯.২ মার্কিন ডলার ১.৬৩
কর্মসূচি ৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	***পার্বত্য এলাকায় জীবনযাপন সহজতর করা*** পোল্ডার যুক্তিযুক্তকরণ, ক্যাচমেন্ট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং পাইলট প্রকল্পের সহায়তায় কাপ্তাই লেক পুনর্বাসন স্টাডি বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: সিএইচ ১.১০; সিএইচ ১.১১; সিএইচ ২৬.২; সিএইচ ২৬.১	টাকা ১৬.৭ মার্কিন ডলার ০.২১
কর্মসূচি ৪ উপকূলীয় অঞ্চল	***নিরাপদ ও অভিঘাতসহিষ্ণু উপকূল*** সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা (পশ্চিম-গোপালগঞ্জ; ভবদহ এলাকা; ভোলা) এবং পোল্ডার যুক্তিযুক্তকরণ (বলেশ্বর-তেঁতুলিয়া অববাহিকা; গরাই পশুর অববাহিকা; গোমতী-মুহুরী অববাহিকা) বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: সিজেড ১.৮/১.২১; সিজেড ১.১১/১.৩৮; সিজেড ১.২৬; সিজেড ১.৩; সিজেড ১.৪৮; সিজেড ১.৪১; সিজেড ১.৪৪; সিজেড ১.৪০; সিজেড ১.৪৫; সিজেড ১.৪৭; সিজেড ১.৩০; সিজেড ১২.৮	টাকা ৩৫৮.৬ মার্কিন ডলার ৪.৫২
কর্মসূচি ৫ প্রধান নদ-নদী	***স্থিতিশীল ও প্রবাহমান নদ-নদী*** নদ-নদীর স্থিতিশীলতা বা ভারসাম্য বজায় রাখা এবং চর এলাকার সমৃদ্ধি বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: এমআর ১.১; এমআর ১.৫; এমআর ১.৪৬; এমআর ৩.১; এমআর ১২.১	টাকা ২০৫.১ মার্কিন ডলার ২.৬
কর্মসূচি ৬ হাওর অঞ্চল	***হাওর ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার*** হাওর যুক্তিযুক্তকরণ, গ্রাম প্রতিরক্ষা এবং টেকসই জলাভূমি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: এইচআর ২.১/২.২; এইচআর ১.১; এইচআর ১৪.১; এইচআর ১৪.৩; এইচআর ১৫.৪/৫	টাকা ২৩.৬ মার্কিন ডলার ০.৩০
কর্মসূচি ৭ ক্রস-কাটিং	***নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি সরবরাহ*** জলবায়ু অভিঘাতসহিষ্ণু এবং সামগ্রিক আইডব্লিউআরএম, পাইপে পানি সরবরাহ এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পসমূহের কোড: সিসি ১.৪; সিসি ১.৩; সিসি ১২.৩৭; সিসি ১৬.১৯; সিসি ৯.১০; সিসি ১.৪৩; সিসি ১.৪৫; সিসি ১.৪৬; সিসি ১৮.৫; সিসি ৯.১৭	টাকা ৫২৭.৭ মার্কিন ডলার ৬.৬৫
সর্বমোট		**টাকা ১৩৯৯.৭** **মার্কিন ডলার ১৭.৬৩**

সূত্র: বিডিপি ২১০০

লাইন মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক প্রকল্প ব্যয়ের তালিকা সারণি ৪.১৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য বড় অংকের অর্থ বরাদ্দের মূল ব্যাখ্যা হল এই যে, বিডিপি ২১০০ মূলত জল-কেন্দ্রিক কর্মসূচি। বিডিপি ২১০০-এর আওতায় উদ্ভূত অগ্রাধিকারভুক্ত কর্মসূচি হতে দেখা যায় যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বড় ফাঁক রয়েছে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে বাড়তি বরাদ্দের কারণ হলো শহর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেইনেজ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের মুখ্য ভূমিকা। ডেল্টা ব্যবস্থাপনায় এ বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব এবং সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা বিরাজ করছে। অনেক ডেল্টা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ প্রধানত জ্ঞান অর্জন, দক্ষতার উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত (উদাহরণস্বরূপ ভূমি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন)। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে (যেমন বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম) এখনো বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়নি।

সারণি ৪.১৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে প্রস্তাবিত ডেল্টা(পিআইপি) (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) বরাদ্দ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০১৫ মূল্যে)	মিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা (২০১৫ মূল্যে)	শতাংশ
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫১৯৯	৪১২৭৭৯	২৯.৫
২	পানিসম্পদ	৮৯৮২	৭১৩০৭২	৫১.১
৩	কৃষি	৮৮৯	৭০৬২১	৫.১
৪	অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন	২৮৯	২২৯৪৮	১.৭
৫	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	১৩৭	১০৮৯০	১.০
৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	১৯৩৭	১৫৩৮১২	১১.০
৭	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন	১৯৬	১৫৫৯২	১.১
	মোট	**১৭,৬২৯**	**১,৩৯৯,৭৩৪**	**১০০**

সূত্র: বিডিপি ২১০০

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিডিপি ২১০০-এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অষ্টম পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কে বর্ণিত ডিফ্লেটরের সহায়তায় বর্তমান ও ২০২১ অর্থবছর মূল্যে রূপান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে তা মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে যা ৫ম অধ্যায়ের সংযুক্ত সারণি এ৫.১ ও এ৫.২-তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। সারণি ৪.১৩-এ উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাইরে যেসকল ডেল্টা মন্ত্রণালয়/বিভাগ রয়েছে তাদের অনুকূলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে (সংযুক্ত সারণি এ৫.১ ও এ৫.২, অধ্যায়-৫, খন্ড-১)।

৪.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ডেল্টা সম্পর্কিত নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডেল্টা সংক্রান্ত নতুন পিআইপি'র প্রবর্তন বিডিপি-২১০০ এর প্রথম পর্যায় বাস্তবায়নের একটি অংশ। অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডেল্টা নীতি কাঠামো এবং ডেল্টা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার। এ সংক্রান্ত আলোচনা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪.৭.১ গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার

ডেল্টা সংক্রান্ত নীতিতে দুই ধরণের নীতি রয়েছে যার একটি সামষ্টিক অর্থনীতি, ডেল্টা পিআইপি'র অর্থায়ন এবং ডেল্টা সম্পর্কিত প্রকল্পে বেসরকারি বিনিয়োগের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত। অপরটি খাতওয়ারী নীতির সাথে জড়িত। খাতভিত্তিক নীতিসমূহের মধ্যে সে সকল নীতি রয়েছে যা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (আন্তঃসীমান্ত নদী ব্যবস্থাপনাও এর অন্তর্ভুক্ত), কৃষি, বন ও মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নগরে পানি সুবিধা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেইনেজ এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের সাথে সম্পর্কিত। এই খাতভিত্তিক নীতি কৌশলসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে আলোচনা করা হয়েছে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার ইতোমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক ফ্রেমওয়ার্কে ধারণ করা হয়েছে:

- সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আর্থিক কাঠামোটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করবে যার মূল ভিত্তি স্তম্ভ হলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর অনুমোদিত আর্থিক কাঠামো। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুমান হলো এই যে, সরকার কর সংস্কারের মাধ্যমে কর রাজস্বের হার ২০২০ অর্থবছরে জিডিপি'র ৮.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২০২৫ অর্থবছরে ১৪ শতাংশে উন্নীত করবে। এ ধরণের সংস্কার ব্যতীত অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিডিপি ২১০০ এর পিআইপি'র বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।
- সরকার শহরে পানি সরবরাহ, সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতিগ্রহণের মাধ্যমে ডেল্টা কর্মসূচি হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ জিডিপি'র ০.১ শতাংশ হতে ২০২৫ অর্থবছরে ০.৩ শতাংশে উন্নীত করবে। এ লক্ষ্যমাত্রা খুবই পরিমিত পর্যায়ে স্থির করা হয়েছে কারণ উন্নত সেবা হতে ব্যয় পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুবই বেশি। তবে এক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সংস্কারগ্রহণের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাগুলোতে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যয় পুনরুদ্ধার এবং গ্রামীণ অঞ্চলে একটি দক্ষ ওয়াটার ইউজার এসোসিয়েশন (ডব্লিউইউএস) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বিডিপি ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- সরকার ডেল্টা কর্মসূচিতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করবে। বেসরকারি খাত বর্তমানে এক্ষেত্রে খুবই সীমিত ভূমিকা পালন করছে। বিডিপি ২১০০ তে বেসরকারি খাতের উপযোগী অর্থায়নের বিভিন্ন খাত নির্ধারণ করা হয়েছে যা শক্তিশালী ও তরান্বিত করা যেতে পারে।

৪.৭.২ গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সরকার ইতোমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেল্টা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে (জিইডি) ডেল্টা অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ এবং জিইডি'র তত্ত্বাবধানে ডেল্টা ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম অর্থবছরে এ প্রক্রিয়া দু'টি চলমান রাখা এবং শক্তিশালী করা প্রয়োজন। একই সাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে ওএন্ডএম এর মানোন্নয়ন এবং ডেল্টা লাইন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; বিকেন্দ্রীভূত পানি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপন করা যা বিডিপি ২১০০ কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি টেকিসইতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ; ডেল্টা সম্পর্কিত জ্ঞান ভান্ডার সৃষ্টি এবং অবহিতকরণের ব্যবস্থা তৈরি; এবং একটি বিস্তারিত ফলাফল নির্ভর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থার ভিত তৈরি করা।

যুক্তিযুক্ত ওএন্ডএম অনুশীলন প্রতিষ্ঠা

ওএন্ডএম সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে বিনিয়োগের পাশাপাশি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম বছরে তিনটি কার্য সম্পাদন করা অত্যাবশ্যকীয়ঃ

- বর্তমান ওএন্ডএম অনুশীলন এবং তাদের পর্যাপ্ততা নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ডেল্টা মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোতে বিদ্যমান ওএন্ডএম চর্চার একটি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
- উক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে, অর্থায়নের উৎস, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত উত্তম ওএন্ডএম অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করা।
- কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নির্ধারণ করা; বিশেষতঃ স্থানীয় পানিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর ওএন্ডএম এর ক্ষেত্রে কমিউনিটির ভূমিকা নির্ধারণ।

ডেল্টা মন্ত্রণালয়সমূহের বাস্তবায়ন সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

বিডিপি ২১০০ এর কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডেল্টা মন্ত্রণালয়সমূহকে শক্তিশালী করা অতীব প্রয়োজন। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ এবং এর সাথে দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা জড়িত। তথাপি কিছু অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওপর অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে জরুরি নজর দেয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছেঃ বিডব্লিউডিবি, ওয়ারপো, ডিওই, মিউনিসিপালিটিসমূহ (ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা) এবং সকল বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিষ্ঠান। তবে অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তন্মধ্যে দু'টি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হলো বিডব্লিউডিবি এবং ওয়ারপো। এ দুটো প্রতিষ্ঠানকেই নতুন প্রযুক্তি আনয়ন, উদ্ভাবন, সমন্বিত পরিকল্পনা, গবেষণা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। স্থানীয় পানিসম্পদ সংক্রান্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের পরিবর্তে সমবেতভাবে কাজ করার লক্ষ্যেও উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানদুটির সহায়তা প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীভূত পানি ব্যবস্থাপনা বিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং নানাবিধ কঠিন সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে। ওয়ারপো এবং বিডব্লিউডিবি এ কঠিন প্রক্রিয়াকে যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সহজতর ও সাশ্রয়ী করতে পারে।

পানি সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিডব্লিউডিবি'র সংশ্লিষ্টতার ইতিহাস অনেক পুরোনো। বিডব্লিউডিবি'তে অনেক দক্ষ পানি প্রকৌশলী থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অর্থায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। ঘাটতির এ জায়গাগুলোতে উপযুক্ত জনবল সংস্থানের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, বিডব্লিউডিবি'কে ডাচ ডেল্টা কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য উদ্ভাবনী প্রকৌশল সমাধান খুঁজে বের করতে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। নেদারল্যান্ডসহ অন্যান্য যেসকল দেশসমূহ উপকূলীয় বেল্ট ব্যবস্থাপনা, নদী ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী

প্রকৌশল সমাধান প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে, সেসকল দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পানি প্রকৌশলী এবং আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে 'অনুশোচনাবিহীন' প্রকৌশল সমাধান ডিজাইন এবং প্রয়োগের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত।

পানি সংক্রান্ত মিউনিসিপালিটিসমূহের (ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা) বিদ্যমান কার্যাবলী থেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে, এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরের ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন যাতে করে এ সকল সংস্থা তাদের প্রদেয় সেবার বিপরীতে সেবাগ্রহীতার নিকট হতে যাবতীয় ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে পানি এবং স্যানিটেশন সেবার যে পরিমাণ চাহিদা রয়েছে, তদানুযায়ী বিদ্যমান পৌরসভাগুলোর (বিশেষ করে ছোট শহরগুলোতে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে) পক্ষে সেবাদান সম্ভব নয়। যদিও সম্প্রতি বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যমান ঘাটতি কিছুটা মেটানো সম্ভব হয়েছে। তারপরও সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী এবং পলিউটারস্ পে মূলনীতির ভিত্তিতে ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যথোপযুক্ত ব্যয় পুনরুদ্ধার নীতিকৌশলের মাধ্যমে এ সকল পৌরসভাতে অতিরিক্ত সম্পদ স্থানান্তর করা গেলে তা পৌরসভাগুলোকে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত সেবাদানের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। এছাড়া এটি বাজেট বরাদ্দের সাথে কর্মসম্পাদনের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে পৌরসভাগুলোকে উত্তম কর্মসম্পাদনে অনুপ্রেরণা যোগাতে সহায়তা করবে।

বিকেন্দ্রীভূত পানি ব্যবস্থাপনা

ডেল্টা ব্যবস্থাপনায় ডাচ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো পানি সম্পদের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব। ডাচ ডেল্টা ব্যবস্থাপনা একদম গোড়া থেকেই বিকেন্দ্রীভূত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা হিসেবে পরিচিত। ঐতিহাসিকভাবে, সেখানে পানি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল প্রচেষ্টাসমূহ মূলত ভূমি-মালিকদের কাছ থেকে পাওয়া যারা সাগর ও নদীর দ্বারা সৃষ্ট পুনঃপুনঃ বন্যা থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিনিয়ত লড়াইয়ে লিপ্ত থাকত। এ ভূমি-মালিকগণ পরিবর্তীতে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন গড়ে তোলে এবং নিজস্ব সম্পদ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে। সময়ের আবর্তে, দেশটি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে সরকার কর্তৃক বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রসারিত হয়। তথাপি, সরকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা বিকেন্দ্রীকরণ প্রথা রক্ষণ করে এবং এর ফলাফল হলো বর্তমানের আধুনিক অংশগ্রহণমূলক বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহ। এখনও তারা জলপথ, বাঁধ, স্যুয়েজ প্ল্যান্টসমূহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশালী ভূমিকা পালন করে এবং পানিসম্পদ খাতের বার্ষিক বিনিয়োগের শতকরা ৫০ শতাংশ অংশীদার। সেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আইনগত ফ্রেমওয়ার্কটি 'ওয়াটার বোর্ড (আঞ্চলিক পানি কর্তৃপক্ষ) এ্যাক্ট' দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এ সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলে চার ধরণের অংশীদারদের প্রতিনিধিত্ব থাকে: (১) সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসী; (২) ভূমি মালিকগণ (কৃষক) যারা সেসকল খালি জমির মালিক যেগুলো সরকারি জমির অন্তর্ভুক্ত নয়; (৩) প্রাকৃতিক মজুদের মালিকগণ; (৪) ব্যবসায়/শিল্প প্রতিষ্ঠান। যেহেতু অধিবাসীগণ সিংহভাগ ব্যয় নির্বাহ করেন, তাই উক্ত কাউন্সিলে স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা ডাচ অভিজ্ঞতার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; এখানে পানি ব্যবস্থাপনাটি মূলত কেন্দ্রীভূত। পানি ব্যবস্থাপনায় অংশীজনদের অংশগ্রহণের অভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বড় দূর্বলতা। এক্ষেত্রে জরুরি দৃষ্টির প্রয়োজন। সরকার ইতোপূর্বে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা সফল হয়নি। এ মুহূর্তে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন কিছু সাহসী ও আমূল পদক্ষেপ যাতে করে সত্যিকার অর্থে ডাচ পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থার আদলে একটি অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা তৈরি করা যায়। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশে ডেল্টা ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করবে এ সকল স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর।

স্থানীয়/আঞ্চলিক পানি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান

একটি সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠানটির অভাব রয়েছে তা হলো উপকারভোগী অংশীদারদের সংগঠন যারা উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা, নদী ব্যবস্থাপনা, মিঠাপানির জলাভূমি (হাওর ও বাওড়) ব্যবস্থাপনা, বিশাল আকারের সেচ প্রকল্প, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সরবরাহ পয়ঃনিষ্কাশন, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, শিল্পায়নের জন্য পানির ব্যবহার প্রভৃতির সাথে জড়িত। পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্ন সংযোগটি প্রতিষ্ঠা করা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পদক্ষেপ যা সফলতার সাথে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

পানি ব্যবহারকারীদের এই প্রতিষ্ঠানটির মৌলিক দায়িত্ব হবে অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তারা সরকারের কোন স্বার্থের সাথে জড়িত থাকবে না। এ ধরণের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেঃ (১) ডাচ অভিজ্ঞতাসহ উত্তম চর্চা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমূহের পর্যালোচনা; (২) অতীতে বাংলাদেশে পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ এবং এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এবং ঐ সকল সংস্থার সফলতা ও বিফলতার বিশ্লেষণ; (৩) অধিক সংখ্যক অংশীজনদের সাথে পরামর্শ। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ডিজাইন, সদস্যপদ, নির্বাচন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও জবাবদিহিতাসহ একটি পরিপূর্ণ পরিচালন নীতিমালা দেয়া প্রয়োজন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেই পানি ব্যবস্থাপনায় বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এর মধ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্টাডি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ডেল্টা নলেজ ব্যাংকের ভিত্তি স্থাপন

ডাচ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনাগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে একটি ডেল্টা নলেজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। বিডিপি ২১০০ এর অধ্যায় ১৫ তে ডেল্টা নলেজ সম্পর্কিত বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। ডেল্টা অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দায় দায়িত্বসমূহ উক্ত অনুবিভাগের ওপর বর্তাবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা হলো তিনটি প্রধান দায়িত্বের সমন্বয়ে একটি নলেজ ইউনিট স্থাপন করা:

(ক) বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে ডেল্টা সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ক্রমানুসারে সাজিয়ে একটি ডিজিটাইজড নলেজ লাইব্রেরিতে রূপান্তর করা;

(খ) একটি ডেল্টা ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা;

(গ) একটি পূর্ণাঙ্গ ডেল্টা নলেজ উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উপাত্ত হালনাগাদকরণ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ডেল্টা নলেজ ব্যাংক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করার লক্ষ্যে প্রথম ধাপ হিসেবে ডেল্টা সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণা ও উপাত্তের ওপর একটি দ্রুত পর্যালোচনা সম্পন্ন করা উচিত। এ পর্যালোচনা প্রতিবেদনটি অন্যান্য ডেল্টা সম্পর্কিত সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন যাতে করে একটি নলেজ ও ডাটা হালনাগাদকরণ এজেন্ডা প্রণয়ন করা যায়। পরবর্তীতে ডেল্টা অনুবিভাগ কর্তৃক ডেল্টা ব্যবস্থাপনার চাহিদার নিরিখে উক্ত এজেন্ডার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে, ডেল্টা প্ল্যানের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং ৩-৫ বছরের উপাত্ত প্রণয়নসহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ প্রতিবেদনটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম বছরেই সম্পন্ন করতে হবে এবং ডেল্টা কাউন্সিল এর নিকট পর্যালোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে দাখিল করতে হবে।

অনুমোদন এবং 'নলেজ ওয়ার্ক' কার্যক্রম ও বাজেট নির্ধারণের পর এর বাস্তবায়ন আরম্ভ হতে পারে। উপাত্ত সংক্রান্ত কার্যক্রমটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অন্যান্য ডেল্টা মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ সাধনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। গবেষণা কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আউটসোর্সিং করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ডেল্টা অনুবিভাগ সমন্বয় ও তদারকির যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবে।

সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রণয়ন

সরকারি নীতিমালা ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করার বিদ্যমান পদ্ধতি বাংলাদেশের নীতি পরিকল্পনার একটি দুর্বল দিক। পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নও এর ব্যতিক্রম নয়। অভিযোজিত ডেল্টা ব্যবস্থাপনার পটভূমিতে ডেল্টা প্ল্যানের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যকীয়। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে:

- বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের;
- খাতওয়ারী নীতিমালা ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি'র;
- ডেল্টা প্ল্যানের সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রধান দায়িত্ব ডেল্টা অনুবিভাগের।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ডেল্টা প্ল্যান এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিত। আর নলেজ এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডেল্টা অনুবিভাগ নলেজ সংশ্লিষ্ট সহযোগী যেমন ওয়ারপো, সিইজিআইএস, আইডব্লিউএম, বুয়েট এবং বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি সহায়তা গ্রহণপূর্বক ডেল্টা প্ল্যান পর্যায়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারে। এটি বলা বাহুল্য যে, ডেল্টা প্ল্যানের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এতে প্রকল্প এবং খাত পর্যায়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হবে যেখানে সকল আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থা, বিশেষত যারা ডেল্টা ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে, এবং আইএমইডিও রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে একটি খসড়া পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পস্তাবনা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে অষ্টম পরিকল্পনা মেয়াদের ১৯-৪৮ মাসের মধ্যে উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের ৫ম বছরের শুরুতে প্রথম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি সরকার কর্তৃক অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রণয়ন সম্ভব হবে।

৪.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি এবং পানিসম্পদ খাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ

বাংলাদেশের কৃষিখাত প্রধানত বেসরকারি খাত দ্বারা পরিচালিত। তথাপি এ খাত গ্রামীণ অবকাঠামো (গ্রামীণ রাস্তা, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি ব্যবস্থাপনা), বন এবং কৃষি সেবা যেমন গবেষণা ও সম্প্রসারণ, গুদামজাতকরণ সুবিধাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের ওপর অনেক খানি নির্ভরশীল। বিডিপি ২১০০ গ্রহণ এবং তদসংশ্লিষ্ট অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পিআইপি বাস্তবায়ন এডিপি ব্যয় অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে, বিশেষত পানি ব্যবস্থাপনা (যেখানে অনেক ঘাটতি রয়েছে), তীর ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সুপেয় পানির সরবরাহের লক্ষ্যে নদীর প্রবাহ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে। এ প্রকল্পগুলো সবই মূলধন নির্ভর তথাপি বাংলাদেশের পানি সম্পদ রক্ষার্থে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরসনে এ প্রকল্পগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিডিপি ২১০০ এর পিআইপি'র প্রথম পর্যায়ের তথা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ চলতি ও স্থির মূল্যে নিম্নের সারণি ৪.১৪ ও ৪.১৫ তে দেখানো হলো। বিডিপি ২১০০ এর পিআইপি'তে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের জন্য অন্তর্ভুক্ত বিশাল আকৃতির রূপান্তরমূলক পানিসম্পদ প্রকল্পসমূহের অর্থায়নে বিশ্বব্যাংক, জাইকা ও এডিবি'র মত বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং নেদারল্যান্ডসহ পানি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক কারিগরি সহায়তার অভিজ্ঞতালব্ধ দেশসমূহের মত দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে সহায়তার প্রয়োজন হবে।

সারণি ৪.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪১.২	৪৬.১	৪৭.৯	৪৯.৭	৫৯.৬
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯.০	১১.১	১২.৮	১৫.০	১৮.০
ভূমি মন্ত্রণালয়	৭.১	৮.৮	১০.১	১১.৮	১৪.২
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৮.৬	১৫৬.৯	২২৮.৭	২৭৬.২	৩৪৬.৪
মোট	**১৬৫.৯**	**২২২.৯**	**২৯৯.৫**	**৩৫২.৭**	**৪৩৮.২**

উৎস: ৫ম অধ্যায়, ১ম খন্ড, এনেক্স টেবিল এ৫.১

সারণি ৪.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪১.২	৪৩.৮	৪৩.২	৪২.৮	৪৯.০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯.০	১০.৬	১১.৬	১২.৯	১৪.৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	৭.১	৮.৩	৯.১	১০.২	১১.৬
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৮.৬	১৪৯.০	২০৬.৬	২৩৭.৮	২৮৪.৬
মোট	**১৬৫.৯**	**২১১.৭**	**২৭০.৫**	**৩০৩.৭**	**৩৬০.০**

উৎস: ৫ম অধ্যায়, ১ম খন্ড, এনেক্স টেবিল এ৪.২

খাত-৫:
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

অধ্যায় ৫

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উন্নয়ন কৌশল

৫.১ প্রেক্ষাপট

গত দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্য হার দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় অধিকসংখ্যক জনগণ বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। একই সাথে দেশের অর্থনীতিতেও একটি রূপান্তর ঘটেছে; এক সময় কৃষি দেশের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু থাকলেও বর্তমানে সেবা ও শিল্প খাত জিডিপি'র সিংহভাগ দখল করেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে জ্বালানি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অনুঘটকের কাজ করেছে। শিল্পায়নে অগ্রসরতার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জ্বালানি খাত মূলত বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা, তরল জ্বালানি, বায়ু শক্তি, সৌর শক্তি এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম বহির্ভূত জ্বালানির সমন্বয়ে গঠিত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং এটি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির স্থিতিশীল সরবরাহের কারণে উক্ত পরিকল্পনা মেয়াদে উদীয়মান নগর কেন্দ্রসহ দেশের সকল প্রান্তে অধিকসংখ্যক হারে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিসহ জীবনযাত্রা অনেক সহজতর ও উপভোগ্য হয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই যাত্রা শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সফলতা কাজে লাগিয়ে রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনয়নের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হতে হবে। একটি দক্ষ ও স্বল্পমূল্যের বৈদ্যুতিক অবকাঠামো এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে স্বচ্ছ ও কার্যকর প্রাথমিক জ্বালানি খাত বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং এবং রপ্তানিমুখী পণ্যের অবস্থান শক্তিশালী করতে পারে। উদীয়মান অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির বিকাশে জ্বালানি সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে দ্রুত শিল্পায়ন পর্যায়ে যখন একটি দেশ গুণগত কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ-মধ্যম আয় ও উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে থাকে, তখন জ্বালানি খাতের ভূমিকা অনেক বেশি হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অর্জন করেছে। এ সময়ে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ যোগানের লক্ষ্যে সরকারের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা জোরদার করা হয়েছিল। অর্থায়ন কৌশলে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর দক্ষতা ও সেবাদানের মানোন্নয়নের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও এ যাত্রা অব্যাহত রাখবে। তবে জ্বালানি খাতে দক্ষতা আনয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং আর্থিক টেকসহিতার ওপর অধিক জোর দেয়া হবে। এটি বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। এ প্রক্রিয়ায় বৃহৎ আকারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে সরকারের সীমিত আর্থিক সম্পদের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের সময়োচিত বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়া হবে, যাতে করে সরকারের জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট কৌশলের লক্ষ্যসমূহের অর্জন ত্বরান্বিত করা যায়। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুতহারে বৃদ্ধিকরণ
- উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ লাইনের ট্রান্সমিশন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি ও যৌথ অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ বৃদ্ধি;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাথমিক জ্বালানিতে বৈচিত্র্য আনয়ন, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি;
- সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের অংশ হিসেবে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কম দূষণমুক্ত কয়লা উৎপাদন কেন্দ্র চলমান রাখা;
- বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ট্রান্সমিশন ও বিতরণজনিত অপচয় হ্রাস করা;
- বিকল্প জ্বালানি উৎস ব্যবহার;

- বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমানবিক জ্বালানি ব্যবহার;
- পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের (ভারত, নেপাল, ভূটান এবং মিয়ানমার) সাথে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধান;
- বিকল্প অর্থায়নের উৎস খোঁজা (এক্সপোর্ট ক্রেডিট এজেন্সি ইত্যাদি)।

৫.২ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অর্জন

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে যা উক্ত মেয়াদে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিপথে চলছে তার অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বিদ্যুত ও জ্বালানি খাত। শুধু তাই নয়, এ খাত ম্যানুফ্যাকচারিং ও রপ্তানি খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রক্রিয়াকেও সহজতর করেছে।

উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো বা ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস্ ফ্রেমওয়ার্কের (DRF) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ জ্বালানি খাতের কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উক্ত সময়ে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার একটি দৃশ্য সারণি ৫.১ এ তুলে ধরা হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নির্ধারিত এমএন্ডই লক্ষ্যমাত্রাসমূহের অধিকাংশই অর্জিত হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত অসাধারণ অগ্রগতি দেখিয়ে চলেছে এবং বর্তমানে এ খাতের উৎপাদন ক্ষমতা মোট চাহিদার থেকে অনেক বেশি। সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১০ এর ভিত্তিতে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে বিদ্যমান পিএসএমপি ২০১০ কে সংশোধন করে পিএসএমপি ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। উৎপাদন ক্ষমতা এবং ট্রান্সমিশন ও বিতরণ লাইনের সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু বিদ্যুৎ ভোগের হার এবং জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগের মাত্রা বৃদ্ধি করা এ দুটি সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

২০২০ অর্থবছরে সরকারি, আইপিপি, ক্যাপটিভ, আমদানিকৃত এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে পৌঁছেছিল, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি ছিল (সারণি ৫.১)। বিদ্যুৎ সংযোগের হার ২০১৫ ভিত্তি বছরের ৭২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে। এর ফলে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা একই সময়ে ৩৭১ কিলোওয়াট ঘন্টা থেকে ৫১২ কিলোওয়াট ঘন্টা (ক্যাপটিভসহ) পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে প্রায় ৩.৭০ কোটি ব্যবহারকারী ৫.৬৭ লক্ষ কিমি দীর্ঘ বিতরণ ব্যবস্থাসম্বলিত জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হয়েছেন।

বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থ-বছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১১.২৩ শতাংশে উপনীত হয়েছে। তবে, মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ (জল বিদ্যুৎসহ) ২০১৫ অর্থ-বছরের ৩.৬ শতাংশ হতে কমে ২০২০ অর্থবছরে ৩.০৫ শতাংশে এসেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সারণি ৫.১: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ডিআরএফ অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অগ্রগতি

কার্যসম্পাদন সূচক	উপাত্ত উৎস	লীড মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তি বছর (২০১৫)	(২০১৮)		(২০১৯)		(২০২০)	
				লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত মোট ক্ষমতা (মেঃওঃ)	বিদ্যুৎ বিভাগ	বি বি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩৫৪০	১৯২৪৯	১৮৭৫৩	২০৬৪৯	২২০৫১	২৩০০০	২৩৫৪৮
বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়া জনগোষ্ঠীর অনুপাত (খানার শতাংশ হিসেবে)	বিদ্যুৎ বিভাগ	বি বি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭২%	৯০%	৯০%	৯৪%	৯৪%	৯৬%	৯৭%
মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কি.ও.ঘন্টা)	বিদ্যুৎ বিভাগ	বি বি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৭১	৪৫৪	৪৬৪	৪৮৩	৫১০	৫১৪	৫১২
মোট উৎপাদিত বিদ্যুতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ (জল বিদ্যুৎ সহ)	বিদ্যুৎ বিভাগ	বি বি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩.৬	৭	৩.১৫	৮	৩.২৫	১০	৩.০৫

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এল এন জি আমদানি এবং বৃহৎ আকারের কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে উন্নতির ফলে প্রাথমিক জ্বালানির উৎসে বৈচিত্র্য/বহুমুখিতা আনয়নের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জ্বালানি খাতের সকল ধাপেই বেশ কয়েক দফায় মূল্যের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। তথাপি, প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের সম্প্রসারণ ও বহুমুখিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি খাতের অর্থায়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানির ক্ষেত্রে অর্জন ও সম্ভাব্য উদ্বেগের বিষয়ে নিম্নে বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫.২.১ বিদ্যুৎ খাত

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদন: সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি আইপিপি-এর সূচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে সক্ষম হয়েছে। চিত্র ৫.১ এ প্রদর্শিত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উর্ধ্বগামীতা থেকে এটি সহজেই অনুমেয়।

চিত্র ৫.১: গ্রীডভিত্তিক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

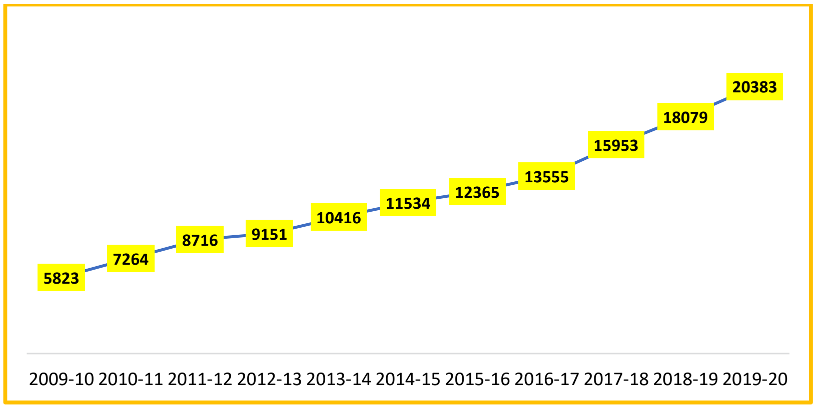

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

স্থাপিত ক্ষমতা: সারণি ৫.২ থেকে দেখা যায় যে, মোট ব্যবহারযোগ্য স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য ব্যতীত) অর্থবছর ২০১৫ এর ১১৫৩৪ মেঃওঃ থেকে ২০২০ অর্থবছরে ২০৩৮৩ মেঃওঃ এ উন্নীত হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত (আইপিপি), যৌথ অংশীদারিত্বমূলক এবং আমদানিকৃত অংশ যথাক্রমে ৪৭ শতাংশ (৯৫৬৮ মেঃওঃ), ৪৩ শতাংশ (৮৮৮৪ মেঃওঃ), ৪ শতাংশ (৭৭১ মেঃওঃ) এবং ৬ শতাংশ (১১৬০ মেঃও) (চিত্র ৫.২)।

এ সময়ে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৫.২) এবং ২০১৯ এর জুন মাসে তা ১২৮৯৩ মেঃওঃ এ গিয়ে পৌঁছায় যা সর্বোচ্চ। তবে ২০২০ এর জুন মাসে এ উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ১২৭৩৮ মেঃওঃ এ দাঁড়ায়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্যাপটিভ উৎস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে মোট স্থাপিত ক্ষমতা হলো ২৩৫৪৮ মেঃওঃ।

সারণি ৫.২: স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ এবং অফগ্রীড নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাদে) এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেঃওঃ)
২০০৯-১০	৫৮২৩	৪৬০৬
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১৫৯৫৩	১০৯৫৮
২০১৮-১৯	১৮৯৬১	১২৮৯৩
২০১৯-২০	২০৩৮৩	১২৭৩৮

উৎস: বিইআর ২০১৯ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ

চিত্র ৫.২: খাতভিত্তিক স্থাপিত ক্ষমতা-জুন ২০২০

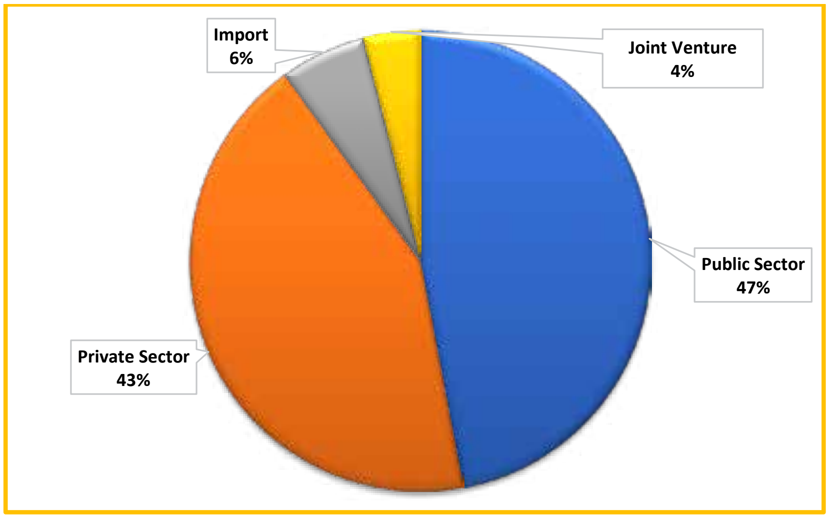

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপিত ক্ষমতা থেকে পিছিয়ে: স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও প্রতিবছরই উৎপাদিত ক্ষমতা স্থাপিত ক্ষমতার চেয়ে কম হয়ে থাকে (সারণি ৫.২)। উপরন্তু এই ব্যবধান সময়ের সাথে বেড়েই চলেছে। সকল ভবিষ্যৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বিদ্যমান স্থাপিত ক্ষমতার উদ্বৃত্তের বিষয়টি মাথায় রেখে করতে হবে কারণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি টেকসহিতার ওপর এর প্রভাব রয়েছে। বিশেষতঃ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে উচ্চ ব্যয়সম্পন্ন ও কম কার্যকর রেন্টাল এবং অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর ওপর একটি পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, কম কার্যকর কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ অথবা বেশি কার্যকর কেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার উপায় বের করতে হবে। এক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, এ বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত।

জুন ২০২০ পর্যন্ত দেশের মোট নীট উৎপাদিত বিদ্যুতের (চিত্র ৫.৩) ৪৯ শতাংশ সরকারি খাতে পরিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ দ্বারা উৎপাদিত হয়েছে। বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা উৎপাদিত ও আমদানিকৃত বিদ্যুতের অংশ যথাক্রমে ৪১ ও ১০ শতাংশ। ২০২০ অর্থবছরে, মোট ৭১,৪১৯ মিলিয়ন কিঃওঃ ঘন্টা সমপরিমাণ নীট উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি কেন্দ্র এবং আমদানির মাধ্যমে উৎপাদিত নীট বিদ্যুতের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫,৩১৬ মিলিয়ন কিঃওঃ ঘন্টা, ২৯,৪২৯ মিলিয়ন কিঃওঃ ঘন্টা এবং ৬৬৭৪ মিলিয়ন কিঃওঃ ঘন্টা।

চিত্র ৫.৩: খাতভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (অর্থবছর ২০২০)

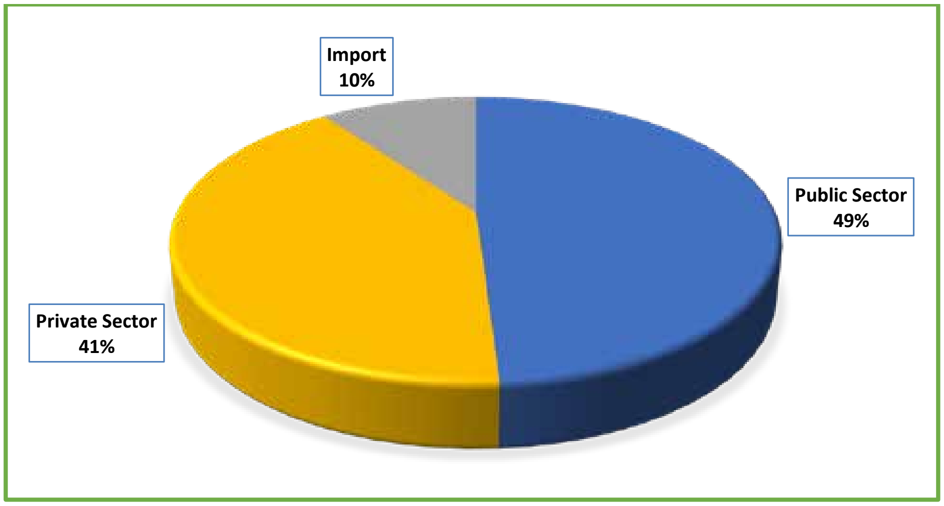

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি: সরকার বাংলাদেশ প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি (পিএসপিজিপি) ১৯৯৬ এর অংশ হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের আর্থিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি চিন্তা করে বেসরকারি খাতের অংশ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়েছে এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বেসরকারি উৎস হতে নতুন উৎপাদন শুরু হয়েছে, যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও চলমান ছিল। বেসরকারি খাতে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি স্থানান্তরিত হয়েছে (সারণি ৫.৩), যা এ খাতে সরকারি বিনিয়োগ তহবিলের ওপর চাপ কমিয়েছে। ১১৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানিসহ বেসরকারি খাত কর্তৃক মোট স্থাপিত ক্ষমতা ২০১৫ অর্থ-বছরের ৪৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি অন্তর্ভুক্ত করা হলে মোট স্থাপিত ক্ষমতায় বেসরকারি খাতের অবদান আরো বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট স্থাপিত ক্ষমতা দাঁড়াবে ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াটে। বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় অবকাঠামোগত রূপান্তর ও উন্নয়ন ঘটেছে। এটি মূলত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কৌশলেরই প্রতিফলন।

সারণি ৫.৩: মালিকানার ভিত্তিতে স্থাপিত ক্ষমতা (ক্যাপটিভ ও অফগ্রীড নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যতিত, মেঃওয়াটে)
অর্থবছর ২০১০-অর্থবছর ২০২০

অর্থবছর	সরকারি	বেসরকারি	আমদানি	যৌথ অংশীদারিত্ব	মোট
২০১০	৩৭১৯	২১০৪	-	-	**৫৮২৩**
২০১৫	৬০২২	৫০১২	৫০০	-	**১১৫৩৪**
২০১৯	৯৫০৭	৮২৯৪	১১৬০	-	**১৮৯৬১**
২০২০	৯৫৬৮	৮৮৮৪	১১৬০	৭৭১	**২০৩৮৩**

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ বাণিজ্য: আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যে বাংলাদেশ সফলতার সাথে তার অংশগ্রহণ জোরদার করে যাচ্ছে এবং ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৩ সালে প্রথম ভারতের বলরামপুর থেকে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানি করে। বর্তমানে উক্ত গ্রীডের সাবস্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের বোরহানপুর থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরিমাণ ১০০০ মেঃওঃ এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৬ এর মার্চে ভারতের ত্রিপুরার পালাটানা থেকে ১৬০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির ফলে ভারত থেকে মোট আমদানিকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১৬০ মেঃ ওয়াটে।

ভারত ছাড়াও বাংলাদেশ নেপাল, ভূটান ও মিয়ানমারসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য শুরুর বিষয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে। নেপাল থেকে জল বিদ্যুৎ আমদানির প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। এছাড়া নেপাল থেকে ৫০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের জিএমআর গ্রুপ এবং এনটিপিসি বিদ্যুৎ ভ্যাপার নিগম লিঃ এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত করে লেটার অব ইনটেন্ট (LOI) জারী করা হয়েছে। বিপিডিবি এবং জিএমআর এর মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। ভূটান থেকে জল বিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্যও একটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ, ভারত ও ভূটানের মধ্যকার একটি ত্রিপক্ষীয় এমওইউ সম্পাদনের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে যা যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রক্রিয়াটি আরো সহজতর করবে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যেও একটি সমঝোতা স্মারক রয়েছে। জ্বালানি বাণিজ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইউএন-এসকাপ, সার্ক, বিমসটেক, সাসেক এবং ডি-৮ এর মত বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মও ব্যবহার করছে।

বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতা: বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতায় একটি দৃশ্যমান উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রকোপ অনেক কমে গিয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হলো সঞ্চালন ও বিতরণজনিত (টিএন্ডডি) অপচয় হ্রাস পাওয়া (চিত্র ৫.৪)।

চিত্র ৫.৪: সঞ্চালন ও বিতরণজনিত (টিএন্ডডি) অপচয় (%)

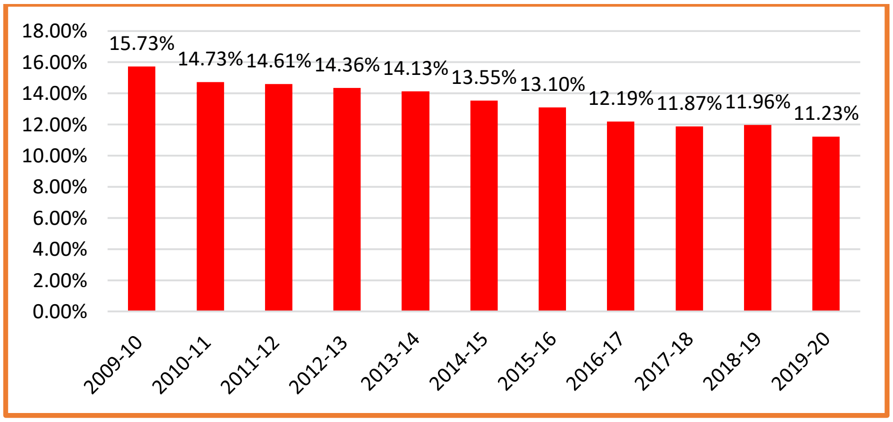

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

টিএন্ডডি অপচয়ের একটি অংশ হলো বৈদ্যুতিক লিকেজ যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। টিএন্ডডি অপচয় ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ২০১০ অর্থ-বছরের ১৫.৭৩ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৫ অর্থবছরে ১৩.৫৪ শতাংশে পৌঁছেছিল। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদেও এ অগ্রগতি অব্যাহত ছিল এবং ২০২০ অর্থবছরে তা ১১.২৩ শতাংশে পৌঁছেছে।

বিতরণজনিত অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে খাতওয়ারী সুশাসনের উন্নয়ন: গত কয়েক বছরে বিতরণজনিত অপচয় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে যা সময়ের সাথে সাথে টিএন্ডডি অপচয় ক্রমাগত কমানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। বিতরণজনিত অপচয় বা ক্ষতি ২০১০ সালের ১৩.৪৯ শতাংশ হতে ২০১৫ সালে ১১.৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২০ সালে ৮.৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে (নিম্নের সারণি ৫.৪)। যদিও এ অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে অনেক উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জিত হয়েছে; তথাপি আরো উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে এবং আমাদের সমপর্যায়ের যেসকল দেশ খুব ভাল করেছে তাদের পর্যায়ে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সারণি ৫.৪: বছরওয়ারী সিস্টেম লস্ বা অপচয়

অর্থবছর	বিতরণজনিত ক্ষতি (%)	মোট ক্ষতি (টিএন্ডডি) %
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮	৯.৬০	১১.৮৭
২০১৮-১৯	৮.৩৫	১১.৯৬
২০১৯-২০	৮.৭৩	১১.২৩

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ।

সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন: নিম্নে বর্ণিত সফল বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ কর্মসূচির প্রকৃত সুবিধা অর্জন করতে হলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে লোড কেন্দ্রগুলোতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া এবং চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর নিকট বিতরণ করা নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের তথ্যানুযায়ী, জাতীয় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কে মোট ১২,২৮৩ কিমি (সার্কিট কিমি) সঞ্চালন লাইন এবং ৫,৭৭,৪৭৯ কিমি বিতরণ লাইন সংযুক্ত হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে টিএন্ডডি দক্ষতার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে সঞ্চালন এবং বিতরণজনিত ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি লিঃ (পিজিসিবি) নানা প্রকার সঞ্চালন লাইন এবং সাবস্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। সঞ্চালন অবকাঠামো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৫.৫ এ উপস্থাপিত হলো:

সারণি ৫.৫: সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং সাবস্টেশন অবকাঠামো

অর্থবছর	ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা (সার্কিট কিমি)			৪০০ কেভি ভিডিসি সাবস্টেশন		৪০০/২৩০/১৩২ কেভি স্টেশন		২৩০/১৩২ কেভি সাবস্টেশন		১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	মেঃওঃ	সংখ্যা	এমভিএ	সংখ্যা	এমভিএ	সংখ্যা	এমভিএ
২০০৯-১০	-	২৬৪৭.৩০	৫৬৭০.৩০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০.০০	৭৫	৭৮৪৪.০০
২০১০-১১	-	২৬৪৭.৩০	৬০১৮.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫.০০	৮১	৮৪৩৭.০০
২০১১-১২	-	২৬৪৭.৩০	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫.০০	৮৩	৮৭৩৭.০০
২০১২-১৩	-	৩০২০.৭৭	৬০৮০.০০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫.০০	৮৪	৯৭০৫.০০
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩০৪৪.৭০	৬১২০.০০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫.০০	৮৬	১০৭১৪.০০
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৫৮.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫.০০	৮৯	১১৯৬৪.০০
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩১৭১.৪৫	৬৩৯৬.৮৩	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫.০০	৯০	১২৪২০.০০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩৩১২.৯৯	৬৫০৩.৯৫	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫.০০	৯১	১৩৩৬৪.৫০
২০১৭-১৮	৫৫৯.৭৫	৩৩২৪.৯৯	৬৭৯৫.৮৯	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯৬৭৫.০০	৯১	১৫০৪৫.৫০
২০১৮-১৯	৬৯৮.০০	৩৪০৭	৭৫৪৫.০০	০২	১০০০	০৫	৪২২০	২৬	১৩১৩৫.০০	১৩৫	২৩৬৪০.০০
২০১৯-২০	৮৬১.০০	৩৬৫৮	৭৭৬৪.০০	০২	১০০০	০৬	৫০৭০	২৮	১৩৯৮৫.০০	১৪৫	২৬২২২.০০

উৎস: পিজিসিবি

সঞ্চালন লাইন স্থাপন ছাড়াও ৪০০ কেভি এইচভিডিসি সাবস্টেশন, ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি স্টেশন, ২৩০/১৩২ কেভি সাবস্টেশন এবং ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে পিজিসিবি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা উপরের সারণি ৫.৫ এ দেখানো হয়েছে। বর্তমানে (জুন ২০২০) দেশে ১০০০ মেঃওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি এইচভিডিসি ব্যাক-টু-ব্যাক সাবস্টেশন, ৫০৭০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ছয়টি আর ৪০০/২৩০ কেজি গ্রীড সাবস্টেশন, ৬৫০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন, ১৩,৯৮৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ২৮টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন, ২৬,২২২ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৪৫টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন, ৮টি সাবস্টেশনে ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন বাসে ৪৫০ এমভিএআর ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৪৬টি সাবস্টেশনে ৩৩ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন বাসে ১,৩৪০টি এমভিএআর ক্যাপাসিটর ব্যাংক রয়েছে। দেশের সকল অংশে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সঠিক পথেই রয়েছে। সকল ব্যবহারকারীর নিকট বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে ছয়টি ভিন্ন সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে। এগুলো হলোঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি); বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি); ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি); ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো); পশ্চিম অঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (WZPDC) এবং উত্তর অঞ্চল বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। সরকার এ সকল সংস্থার সহায়তায় একটি সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের শতভাগ জনগণকে ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনার লক্ষ্যে এ কর্মসূচির মাধ্যমে বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং একই সাথে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন করা হবে। জুন ২০২০ পর্যন্ত, ০.৫৬৭ মিলিয়ন কিমি বিতরণ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ৩৭ মিলিয়ন ব্যবহারকারী জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত হওয়ার মত অবস্থানে ছিল।

মোট ৬৩,৩৬৪ মিলিয়ন কিঃওঃ ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের মধ্যে সিংহভাগ অংশ (৫২ শতাংশ) ছিল বিআরইবি'র (চিত্র ৫.৫)। এটা দৃশ্যমান যে, বিআরইবি গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকাগুলোকে বিদ্যুৎ সংযোগের আওতায় আনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, এর ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ২.৮৮ কোটি ব্যবহারকারীকে সংযুক্ত করেছে। তন্মধ্যে ২.৬২ কোটি হলো স্থানীয় সংযোগ, ২.৭৩ লক্ষ সেচ, ১৭.৭ লক্ষ বাণিজ্যিক লাইন, ১.৭৮ লক্ষ শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট, ৩.৬৩ লক্ষ দাতব্য, ১৯৭৪ নির্মাণ সংক্রান্ত, ১০৩১টি অস্থায়ী, ১০৪৯২টি স্ট্রীট লাইট এবং অবশিষ্টগুলো সাধারণ সংযোগ। ৮২৩০৫টি গ্রামকে ৫.২৭ লক্ষ কিমি বিতরণ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে।

চিত্র ৫.৫: ইউটিলিটি ভিত্তিক বাল্ক বিক্রয় (অর্থবছর ২০১৯-২০২০)

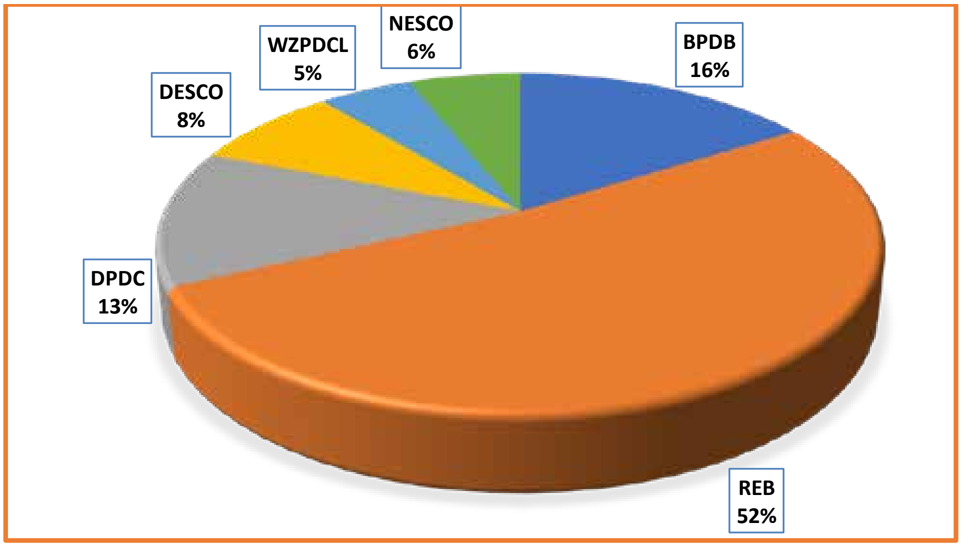

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

সারণি ৫.৬ এ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত লাইন স্থাপন এবং ব্যবহারকারী সংযোগের ক্ষেত্রে বিআরইবি'র লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন দেখানো হলো। এ সারণি থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিতরণ লাইন স্থাপন এবং ব্যবহারকারী সংযোগের ক্ষেত্রে অনেক গতিশীলতা এসেছে।

সারণি ৫.৬: বিআরইবি এর ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিমি)		গ্রাহক সংযোগ	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩		৪৬১৪১৭
২০১০-১১	২০৯৫	৩৫৩৩		২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯		৭২৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	৯৮৪২		৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৯৬৫		৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৯১০		১৮৩৯০৬৪
২০১৫-১৬	২০০০০	৩১৬১৩	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭	২৫০০০	৩৬৫৫৪	২০০০০০০	৩৫১১৫৭৩
২০১৭-১৮	৩০০০০	৫৪৮৮৬	৩২০০০০০	৩৮৫১১৪৩
২০১৮-১৯	২৫০০০	৭১৩২৬	২০০০০০০	৩০৪৫৫৯৩
২০১৯-২০	৫০০০০	৫০১৬৬	২০০০০০০	২৪০৫৩১২

উৎস: পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)

সৌর বিদ্যুৎ চালিত ব্যবস্থার পথিকৃৎ হিসেবে বিআরইবি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রদানের ক্ষেত্রে এর প্রচেষ্টা চলমান রেখেছে। বিআরইবি এ পর্যন্ত প্রায় ৫১,৩৬৪ টি সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস), ৩৭টি রুফটপ/হাইব্রিড টাইপ রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট, ৪০টি সৌর চালিত সেচ পাম্প, ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন এবং ৪০টি নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন করেছে। এ সকল স্থাপিত কেন্দ্রের মোট ক্ষমতা প্রায় ১৩.৩১ মেগাওয়াট পিক।

স্থাপিত ক্ষমতার জ্বালানি মিশ্রণ এবং প্রকৃত উৎপাদন: বর্তমানে বিভিন্ন রকমের জ্বালানির মাধ্যমে স্থাপিত কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দুটি প্রধান উৎস হলো প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি। স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস, তরল জ্বালানি (ফার্ণেস অয়েল) এবং ডিজেল এর অংশ যথাক্রমে ৫৩.৮ শতাংশ, ২৭.২ শতাংশ এবং ৬.৩ শতাংশ। নিম্নের চিত্র ৫.৬ এ জুন ২০২০ পর্যন্ত জ্বালানির প্রকারভেদে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থাপিত ক্ষমতা প্রদর্শিত হলো:

চিত্র ৫.৬: ক্যাপটিভ পাওয়ার ব্যতিরেকে স্থাপিত ক্ষমতা (জ্বালানি প্রকার ভেদে)

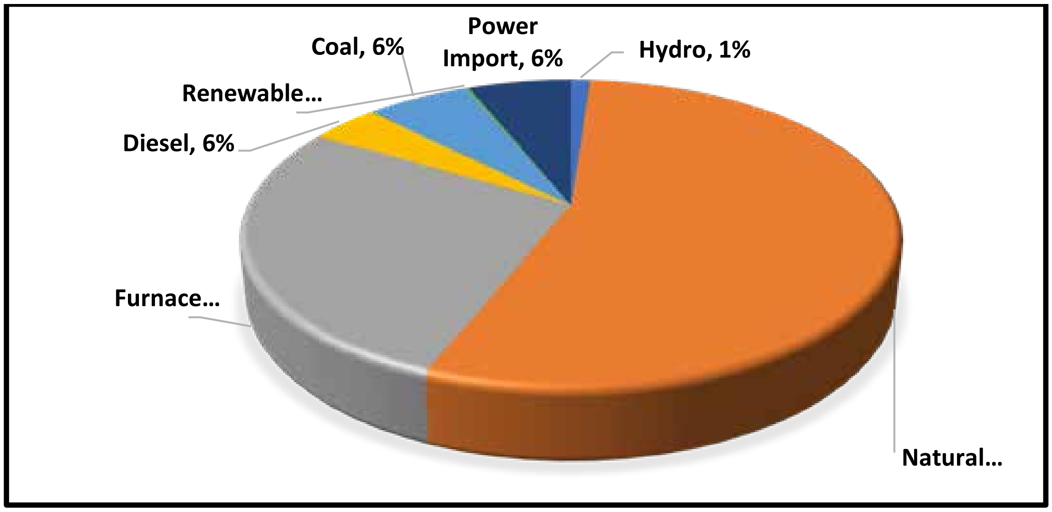

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

স্থাপিত ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বাড়ছে: স্থাপিত বিদ্যুৎ ক্ষমতা এবং প্রকৃত উৎপাদনের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অতিমূল্যের তরল জ্বালানি সমৃদ্ধ স্থাপিত ক্ষমতা কম ব্যবহারের প্রচেষ্টা সবসময়ই চলমান রয়েছে। এর ফলে, প্রকৃত উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার ৭১.৮২ শতাংশ (চিত্র ৫.৭) যেখানে স্থাপিত ক্ষমতা অনুযায়ী গ্যাসের অংশ ৫৪ শতাংশ (চিত্র ৫.৬)।

চিত্র ৫.৭: জ্বালানি প্রকারভেদে বিদ্যুৎ উৎপাদন (জানুয়ারি ২০১৯)

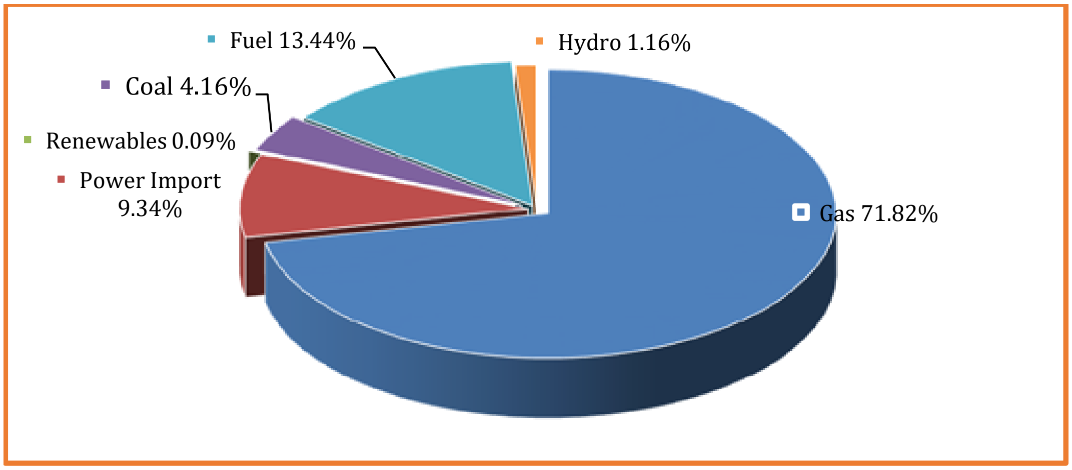

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুতের প্রকৃত মোট উৎপাদনে আমদানিকৃত অংশের পরিমাণ ৯.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে তরল জ্বালানির পরিমাণ স্থাপিত ক্ষমতা অনুযায়ী ৩৩ শতাংশ হলেও প্রকৃত উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা হ্রাস পেয়ে ১৩.৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যদিও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তদপরবর্তী মেয়াদে গুণগত মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দিকটি বিবেচনাপূর্বক রিজার্ভ মার্জিন হিসেবে কিছু অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রয়োজন রয়েছে; তবে তা সর্বোত্তমভাবে রিজার্ভ মার্জিনের দক্ষতা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হবে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মুখ্য জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি তরল জ্বালানি ব্যবহার চলমান রয়েছে: প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারি খাত পরিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল) ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৫.৭), যা একক/ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়ের ওপর চাপ ফেলেছে। গড় খরচ হ্রাস করতে একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তন করতে হবে।

সারণি ৫.৭: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা জ্বালানি ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিলিয়ন সিএফটি)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০০৯-১০	১৬৬	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১৫০	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১	৪৪৯	১৭২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭	৪৮৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭	২১৫	৫৮৭	৫১৩	৩৪৮
২০১৭-১৮	২১১	৮২৫	৬১৫	৭৯৫
২০১৮-১৯	২৭৪	৫৬৫	৪৮৪	৩৮৫
২০১৯-২০	২৬৭.৭৬	১২৪০	৩০১.০৯	১১.৯৩

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নয়ন পিছিয়ে পড়েছে: ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কৌশলগত সিদ্ধান্ত থাকলেও এটি ধীরে ধীরেহ্রাস পেয়ে ২০১৫ অর্থ-বছরের অবস্থা থেকেও নিম্নে অবস্থান করছে। যদিও বর্তমানে কিছু বড় আকারের কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে, তথাপি পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর বাস্তবায়ন খুবই ধীর গতিতে এগুচ্ছে। এছাড়া, কয়লা নীতির অভাবে কয়লা উত্তোলন আগানো যায়নি। বন্দর এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহন ও পরিচালনাগত অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে পরিকল্পিতভাবে বৃহদাকারে কয়লা আমদানি প্রক্রিয়ার দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ: বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ সীমিত আকারে অগ্রগতি অর্জন করেছে। একটি টেকসই জ্বালানি মিশ্রণের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে এটি একটি প্রধান অন্তরায়। জল বিদ্যুতের অংশ ২০১৫ অর্থবছরে খুবই সামান্য ছিল (২ শতাংশ) যা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরোহ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, আরেকটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে পরিচিত সোলার পিভি'র অংশও অত্যন্ত ক্ষুদ্র (২.০৩ শতাংশ)। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদিন কৌশল পুরোদমে অনুসরণ করতে হবে যাতে করে সকল পরিকল্পনা সময়মত বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারকে নীতি সহায়তা প্রদান করা যায়।

বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতি: ২০১০ অর্থ-বছরের ৮ শতাংশ থেকে ২০১৫ অর্থবছরে ২৯ শতাংশ এবং ২০১৮ অর্থবছরে ৩০ শতাংশেরও বেশি হারে তরল জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতারই একটি প্রতিফলন। এটি ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের গড় সরবরাহ ব্যয় বৃদ্ধি করেছে এবং বিদ্যুৎ খাতের অর্থায়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুতের গড় ব্যয় ২০১৫ অর্থ-বছরের ৬.১০ টাকা/কিঃওঃঘন্টা থেকে ২০২০ অর্থবছরে কিলোওয়াট ঘন্টা প্রতি ৮.৬০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। উক্ত সময়ে এ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ। গত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহকারীদের আর্থিক সক্ষমতা বজায়, ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষা এবং এই খাতে আর্থিক শৃংখলার বিধান নিশ্চিতকল্পে বিইআরসি বাল্ক এবং খুচরা ট্যারিফ হারের সমন্বয় সাধন করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি না করলে এবং অন্যান্য ব্যয় সংকোচন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে আমদানিকৃত জ্বালানির (উচ্চমূল্যের এলএনজি এবং আমদানিকৃত কয়লা) ওপর অতিনির্ভরতা চলমান থাকবে এবং বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বেড়েই চলবে।

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য লাইফ লাইন ট্যারিফ এর প্রবর্তন: দরিদ্র এবং নিম্ন মধ্যম আয়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিইআরসি আবাসিক ব্যবহারকারীর জন্য ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইফ লাইন ট্যারিফ স্থির করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক ট্যারিফ অধ্যাদেশেও এটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বিইআরসি'র এ ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের আবাসিক গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিদ্যুৎ ভর্তুকি: এখনও বিদ্যুতের বাল্ক সরবরাহের গড় ট্যারিফ গড় উৎপাদন ব্যয় থেকে কম। এর ফলে উদ্ভূত আর্থিক ক্ষতি জাতীয় বাজেটের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। বাল্ক সরবরাহের উৎপাদন ব্যয় এবং ট্যারিফের পার্থক্যজনিত ক্ষতির কারণে বিপিজিবি সরকার থেকে বাজেট সহায়তা পেয়ে থাকে (সারণি ৫.৮)। বিদ্যুতখাতে প্রদত্ত বাজেট সহায়তা ২০১৬ অর্থ-বছরের ৪৪ বিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০ অর্থবছরে ৭৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস বাজেটের ওপর চাপ কমিয়ে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। তথাপি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যের অনিশ্চয়তা, বিদ্যুতের মূল্য এবং ভর্তুকি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নীতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রাখতে পারে। সকল প্রকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পণ্যের সম্পূর্ণ ব্যয় পুনরুদ্ধার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। এটি শুধু জাতীয় রাজস্বের ওপর আর্থিক বোঝা কমাতে সাহায্য করবে না; বরং জ্বালানি সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করবে।

সারণি ৫.৮: বিদ্যুৎ খাতে বাজেট সহায়তা (বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)
২০১৫-১৬	৪৪
২০১৬-১৭	৪০
২০১৭-১৮	৪৫
২০১৮-১৯	৭৮
২০১৯-২০	৭৪

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

গভর্ন্যান্স খাত: বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক টেকসহিতার উন্নতি সাধন

বিইআরসি কর্তৃক বৈদ্যুতিক ট্যারিফের সমন্বয় সাধন এবং টিএন্ডডি ক্ষতি হ্রাস করা ছাড়াও সরকার বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক টেকসহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে একটি আর্থিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে ২ মাসের অধিক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকবে না এবং স্বায়ত্তশাসিত, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ব্যবহারকারী কর্তৃক বকেয়ার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসবে। নিম্নের চিত্র ৫.৮ অনুযায়ী ২০১৬ অর্থ-বছরের পর থেকে প্রাপ্য বকেয়ার পরিমাণ (মাস হিসেবে) ২ মাসের নিচে রয়েছে এবং ২০২০ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১.৮৭ মাস।

চিত্র ৫.৮: বছরওয়ারী বকেয়া পাওনা (মাস হিসেবে)

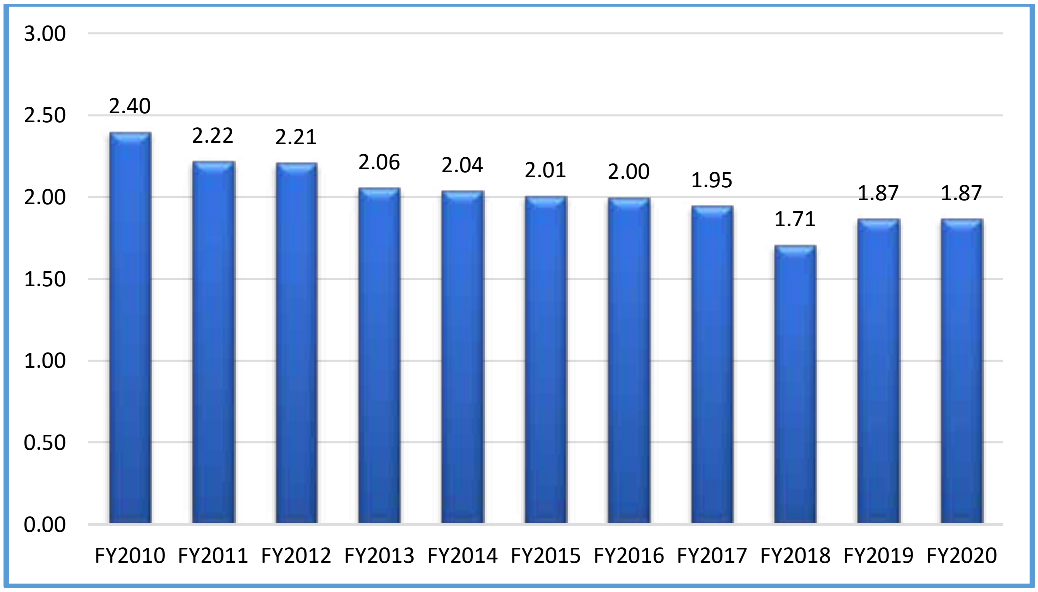

উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ

যদিও কিছু ক্ষেত্রে ভাল অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা আরো বাড়াতে হবে। সময়ের সাথে সাথে বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধি পাবে। সরকারি ইন্টারফেস এবং গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে আরো প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা এবং সেবার মান, বিলিং ও বিল প্রদান সংক্রান্ত পরিষেবাসমূহের ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতকে সাধারণ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিসেবে পরিচালিত না করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎ খাতকে কর্পোরেশনে রূপান্তরের মাধ্যমে এবং এর বিলিং, পাওনা ও বকেয়া আদায় ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনের ফলে বিদ্যুৎ খাতের অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উচ্চ ব্যয় সম্পন্ন কম কার্যকর রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা কমার সাথে সাথে বিদ্যুৎ খাতের অর্থায়নের ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হবে। তারপরও, বিদ্যুৎ খাতে অতিরিক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে এ খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার আমূল পরিবর্তন দরকার। অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আইপিপি এবং পিপিএ এর মত ক্ষেত্রগুলোকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বেসরকারি উৎপাদক গোষ্ঠীর নিকট বাণিজ্যিক ঝুঁকি হস্তান্তরসহ আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন সম্ভব কি না তা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

বিতরণজনিত সিস্টেম লস/অপচয় বন্ধে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার বৃদ্ধি: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস এবং বকেয়া পাওনার পরিমাণ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে, যা পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। সিস্টেম লস রোধে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের মাধ্যমে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত, বিপিডিবি, বিআরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, (WZPDCL) এবং নেসকো, এ ছয়টি বিতরণ সংস্থাই প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং মোট ৩.৩২ মিলিয়ন প্রি-পেইড মিটার স্থাপন সম্পন্ন করেছে। সারণি ৫.৯ এ জুন ২০২০ পর্যন্ত উপরোক্ত ছয়টি সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে:

সারণি ৫.৯: প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

ইউটিলিটি	মোট
বিপিডিবি	১১৭৮৫০৫
আরইবি	১১১০০০০
ডিপিডিসি	৪৯৮১০৩
ডেসকো	৩০৩০৬০
ডব্লিউজেডপিডিসিএল (WZPDCL)	২১৭২১৯
নেসকো	১৮৮৯৮
মোট	**৩৩২১৭৮১**

*উৎস: বিদ্যুৎ বিভাগ *জুন ২০২০ পর্যন্ত*

টিএন্ডডি এর উন্নয়ন, মূল্যের সামঞ্জস্য বিধান, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিলিং ও বিল আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বকেয়া আদায়ের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাসসহ অন্যান্য গৃহীত ব্যবস্থা বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক অর্জনে কল্যাণমূলক প্রভাব ফেলেছে। এই অর্জনসমূহ বিদ্যুৎ খাতের সুশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিরও নির্দেশক।

৫.২.২ প্রাথমিক জ্বালানিতে অগ্রগতি

তেল, গ্যাস ও কয়লা খনি অনুসন্ধান, উৎপাদন, উন্নয়ন, মূল্যায়ন এবং জ্বালানির রিজার্ভ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক জ্বালানিসমূহের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে দেশের বিদ্যমান জ্বালানি চাহিদা সহজেই মেটানো সম্ভব। এছাড়া জ্বালানি ঘাটতি নিরসনে প্রয়োজনে জ্বালানি আমদানি করা অত্যাবশ্যকীয়। সাধারণভাবে সমাজের সকল স্তরের জন্য স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন জ্বালানির সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং একটি দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য স্বল্প ব্যয় জ্বালানি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

গ্যাস খাত

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী ব্যবহার: প্রাকৃতিক গ্যাস আবাসিক ব্যবহার ও বাণিজ্যিক জ্বালানির ৭১ শতাংশ দখল করে আছে এবং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ, সার, শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত সারাদেশে ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। আবাসিক ব্যবহারের জন্য গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম সরকারি (পেট্রোবাংলা) এবং বেসরকারি উৎপাদকের (আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি) মধ্যে বিভক্ত। পেট্রোবাংলার সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী মোট জিআইআইপি'র (ইনিশিয়াল গ্যাস ইন প্লেস) পরিমাণ ৩৯.৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) যার মধ্যে ২৮.২৩ টিসিএফ গ্যাস প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য ক্যাটাগরিতে পুনরুদ্ধারযোগ্য। ১৯৬০ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭.৭৯ টিসিএফ গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে এবং ১০.৪৩ টিসিএফ উত্তোলনযোগ্য গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে। সারণি ৫.১০ এ গ্যাস উত্তোলন ও রিজার্ভের চিত্র দেখানো হয়েছে। এটি স্পষ্ট যে, গ্যাস রিজার্ভ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে অনুসন্ধান কার্যক্রমের গতি আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সারণি ৫.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের সাম্প্রতিক চিত্র, ২০২০

ক্রমিক নং	আইটেম	সংখ্যা
১.	মোট গ্যাস ক্ষেত্রর সংখ্যা (জুন ২০২০)	২৭
২.	উৎপাদনের আওতায় গ্যাস ক্ষেত্রর সংখ্যা (জুন ২০২০)	২০
৩.	মোট উৎপাদনকারী কূপের সংখ্যা (জুন ২০২০)	১১৩
৪.	মোট ইনিশিয়াল গ্যাস ইন প্লেস (জিআইআইপি)	৩৯.৮ টিসিএফ
৫.	আহরণযোগ্য গ্যাসের মোট রিজার্ভ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য)	২৮.২৩ টিসিএফ
৬.	গ্যাসের মোট ব্যবহার (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১৭.৭৯ টিসিএফ
৭.	অবশিষ্ট মোট রিজার্ভ (প্রমাণিত+সম্ভাব্য) (জুন ২০২০)	১০.৪৩ টিসিএফ
৮.	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন (জুন ২০২০ পর্যন্ত) আরএলএনজি সহ	৩০৩৮.৯ এমএমসিএফডি
৯.	পেট্রোবাংলা অধিভুক্ত কোম্পানিসমূহের উৎপাদন	৮৮০.৬০ এমএমসিএফডি
১০.	আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি দ্বারা উৎপাদন (আইওসি)	১৬৪৪.৫ এমএমসিএফডি
১১.	আর-এলএনজি	৫১৩.৯ এমএমসিএফডি
১২.	বর্তমান দৈনিক গ্যাস চাহিদা	প্রায় ৩৭০০ এমএমসিএফডি
১৩.	২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি (আর-এলএনজি সহ)	প্রায় ১২৯৪.৯০ এমএমসিএফডি

উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সারণি ৫.১১ এবং চিত্র ৫.৯ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিদ্যুৎ খাত প্রাকৃতিক গ্যাসের মুখ্য ব্যবহারকারী। এর পরে আছে শিল্পখাত (শিল্প কারখানা এবং ক্যাপটিভ উভয়ই)। অন্যান্য প্রধান চাহিদার উৎস হলো আবাসিক ব্যবহারকারী, সারকারখানা এবং সিএনজি স্টেশন। চা বাগান এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীরাও প্রাকৃতিক গ্যাসকে জ্বালানির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

সারণি ৫.১১: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং খাতভিত্তিক ব্যবহার (বিলিয়ন কিউবিক ফুট)

অর্থবছর	উৎপাদন	ব্যবহার									
		আর-এলএনজি	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ পাওয়ার	সার	শিল্প কারখানা	চা বাগান	বাণিজ্যিক	আবাসিক	সিএনজি	মোট
২০০৯-১০	৭০৩.৬		২৮৩.৩	১১২.৬	৬৪.৭	১১৮.৮	০.৮	৮.১	৮২.২	৩৭.২	৭০৭.৬
২০১০-১১	৭০৮.৯		২৭৫.৮	১২১.৬	৫৮.৯	১২২.১	০.৮	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৩.৬
২০১১-১২	৭৪৩.৭		৩০২.৩	১২৪.২	৫৮.৫	১২৮.৩	০.৮	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৩	৭৫০.৪
২০১২-১৩	৮০০.৬		৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.১
২০১৩-১৪	৮২০.৪		৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২		৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২		৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	৯.০	১৪১.৫	৪৫.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৬৯.২		৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১.০	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭.০	৯৮৭.৩
২০১৭-১৮	৯৬৮.৭		৩৯৮.৬	১৬০.৫	৪৩.০	১৬৬.৬	০.৯	৮.২	১৫৮.০	৪৬.২	৯৮২.০
২০১৮-১৯	৯৬১.৭	১১৬.০	৪৫০.৯	১৫৭.৫	৫৭.৭	১৬৪.৫	১.০	৭.৯	১৫৮.৯	৪৩.৪	১১৫৭.৮

উৎস: বিইআর ২০১৯ এবং পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

চিত্র ৫.৯: প্রকারভেদে গ্যাস ব্যবহার অর্থবছর ২০১৮-১৯

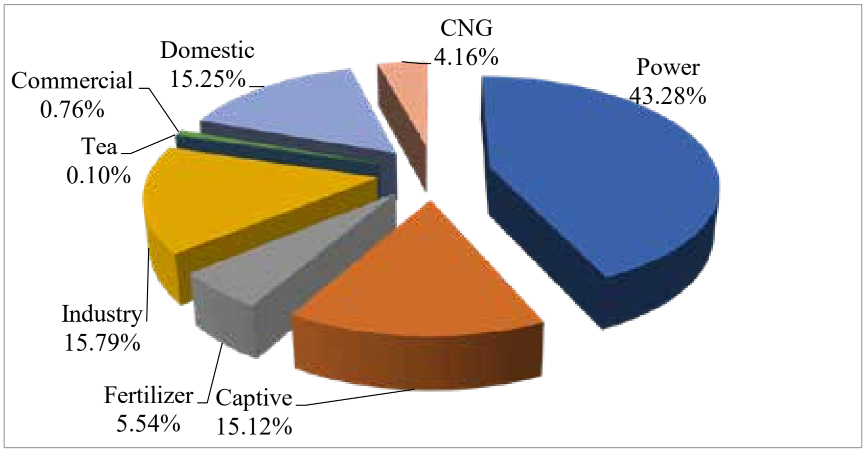

উৎস: পেট্রোবাংলা

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা প্রক্ষেপণ:

২০১৭ সালে 'গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান অব বাংলাদেশ (জিএসএমপি)' প্রণয়ন করা হয়। এটি ২০০৬ সালের মহাপরিকল্পনার একটি হালনাগাদ এবং এতে ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাস খাতের পরিকল্পনা সন্নিবেশিত রয়েছে। বর্তমান জিএসএমপি-এর মূল লক্ষ্য হলো ২০০৬ সালের মহাপরিকল্পনাকে হালনাগাদ করে বাংলাদেশের বিদ্যমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সাথে একীভূত করা এবং এই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা। যেহেতু বিদ্যুৎ খাত প্রাকৃতিক গ্যাসের অন্যতম প্রধান ব্যবহারকারী, তাই জিএসএমপি প্রণয়নকালে 'পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান অব বাংলাদেশ' এবং উক্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নকারী দলের সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। ২০১৭ সালের জিএসএমপি অনুযায়ী পরিবর্তিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে গ্যাসের চাহিদার তিনটি ভিন্ন দৃশ্যপট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত দৃশ্যপট সমূহের মধ্য থেকে 'দৃশ্যপট সি' কে পরবর্তী বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দৃশ্যপট-সি অনুযায়ী ২০২০-২১ সালে গ্যাসের মোট চাহিদা দাঁড়াবে ৪,৫২০ এমএমসিএফডি। ২০২৫-২৬, ২০৩০-৩১, ২০৩৫-৩৬ এবং ২০৪০-৪১ এ উক্ত চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫২৫৭, ৬২২৮, ৭৫৩২ এবং ৮৩৪৬ এমএমসিএফডি-এ। তথাপি, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীর জন্য গ্যাস সংযোগ সুবিধা বর্তমানে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্ধ রয়েছে।

সারণি ৫.১২: সেক্টরভিত্তিক গড় গ্যাস চাহিদার প্রক্ষেপণ (এমএমসিএফডি)

সেক্টর	২০২০-২১	২০২৫-২৬	২০৩০-৩১	২০৩৫-৩৬	২০৪০-৪১
বিদ্যুৎ	২১৯৭	২৩১৫	২৪৬৮	২৯৫০	২৯৯১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪৮০	২৮৩	১৬৭	৯৯	৫৮
স্যার	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
শিল্প কারখানা	৯২৫	১৫৭৫	২৩০২	২৯৯৪	৩৬১৩
আবাসিক	৪২৫	৫৫৭	৭২১	৮৬৭	৯৯৪
ব্যাণিজ্যিক ও চা বাগান	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
সিএনজি	১৩৯	১৭৩	২১৬	২৬৯	৩৩৫
মোট	**৪৫২০**	**৫২৫৭**	**৬২২৮**	**৭৫৩২**	**৮৩৪৬**

উৎস: গ্যাস সেক্টর মাস্টার প্ল্যান বাংলাদেশ ২০১৭ (দৃশ্যপট-সি)।

তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি): চাহিদা ও যোগানের ঘাটতি নিরসন এবং জ্বালানির ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার এলএনজি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১,৩৮,০০০ ঘনমিটার এলএনজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি এফএসআরইউ (ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট) স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি এফএসআরইউ-এর রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা হলো ৫০০ এমএমএসসিএফডি। বছর প্রতি ৩.৭৫ মিলিয়ন টন প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রথম এফএসআরইউ-টি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক এক্সেলারেট এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড (ইইবিএল) কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে এবং আগস্ট ২০১৮ থেকে এটি কার্যক্রম শুরু করেছে। একই ক্ষমতা সম্পন্ন দ্বিতীয় এফএসআরইউ-টি সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোঃ লিঃ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে এবং এপ্রিল ২০১৯ থেকে

কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। এফএসআরইউ দুটিই কক্সবাজারের মহেশখালীর নিকটে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে সরকারের বছরপ্রতি ৭.৫ মিলিয়ন টন প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি অন-শোর এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে যার সক্ষমতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বছরপ্রতি ১৫ মিলিয়ন টন পর্যন্ত করার সুযোগ রয়েছে। ভূস্থলে বিওওটি বা বুট এর ভিত্তিতে অন-শোর এলএনজি টার্মিনালটি নির্মাণে সরকার বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কাতারের রাসলাফান ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর সাথে ১.৮ থেকে ২.৫ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের লক্ষ্যে ১৫ বছর মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি এলএনজি সেলস্ পারচেজ এগ্রিমেন্ট (এসপিএ) স্বাক্ষর করেছে। অন্যদিকে, ১ এমটিপিএ এলএনজি সরবরাহের লক্ষ্যে ওমানের ওমান ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল (ওটিআই) এর সাথে আরেকটি দীর্ঘমেয়াদি (১০ বছর) এসপিএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ১৪টি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত এলএনজি সরবরাহকারীর সাথে এলএনজি সরবরাহের জন্য একটি মাস্টার সেলস্ পারচেজ এগ্রিমেন্ট (এমএসপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কয়লা:

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এই ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে মোট সঞ্চিতির পরিমাণ ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ১১.৭৮ মিলিয়ন টন কয়লা আহরিত হয়েছে। এ কয়লা ব্যবহার করে ৫২৫ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে জাতীয় গ্রীডে সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে, দেশের একমাত্র কয়লা খনি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া হতে বছর প্রতি ১ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়। ২০২০ এর মার্চে দিনাজপুরের দিঘিপাড়া'তে আরেকটি ভূগর্ভস্থ কয়লা খনি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। এ কয়লা খনি হতে বছর প্রতি গড়ে ২.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন সম্ভব। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার চাহিদা মেটানোর জন্য পেট্রোবাংলা ২০৪১ সালের মধ্যে জামালগঞ্জ এবং খালাসপীর-এ আরো দুটি কয়লা ক্ষেত্র সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

কৌশলগত কারণে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক পরিমাণে কয়লা আহরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। আমদানিকৃত কয়লা অপেক্ষা স্থানীয় কয়লার গুণগত মান অনেক বেশি। ইতোমধ্যে আবিস্কৃত কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজন বড় আকারের প্রারম্ভিক বিনিয়োগ যা ভবিষ্যতে উচ্চ হারে মুনাফা অর্জনে সহায়ক হবে। অপরদিকে, আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন বন্দর, স্টোরেজ এবং পরিবহন অবকাঠামোতে বৃহদাকারের বিনিয়োগ। তাই এক্ষেত্রে পর্যায়ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। বেশ কিছু কর্মসূচি ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে যেমন ভারত থেকে আমদানিকৃত কয়লা দিয়ে পরিচালিত রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মাতারবাড়ী কয়লা ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (সিটিটি)।

জ্বালানি তেল খাত:

পেট্রোলিয়াম দ্রব্য: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিপণন করে থাকে। বিপিসি পর্যাপ্ত পরিমাণে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের স্টক মজুদ করার লক্ষ্যে সংরক্ষণাগার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। বর্তমানে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনের কাছাকাছি। পেট্রোলিয়াম দ্রব্যের সরবরাহ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিপিসি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড (ইআরএল) এর বিদ্যমান রিফাইনারিতে (ইআরএল ইউনিট-২) একটি নতুন ইউনিট স্থাপনসহ কয়েকটি পাইপলাইন প্রকল্প আরম্ভ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর মেয়াদে আমদানিকৃত পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নের সারণি ৫.১৩ এ দেয়া হলো:

সারণি ৫.১৩: পরিশোধিত জ্বালানি পণ্য আমদানি

অর্থবছর	ডিজেল, অক্টেন এবং জেট এ-১ পরিমাণ (মেট্রিক টন)	ফার্নেস তেল পরিমাণ (মেট্রিক টন)
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	৬৯১৭০৫
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	৩৩৫১৫০
২০১৬-১৭	৩৮৭১৪৩২	৫২১১৯৯
২০১৭-১৮	৪৮৯২০৮৯	৬৫০৫৪০
২০১৮-১৯*	২৭২৩২৮৯	২৩০৫৯৩

*উৎস: বিইআর ২০১৯ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ   *ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত।*

জ্বালানি পণ্যে ভর্তুকি: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত তেল আমদানি করে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার অস্থির প্রকৃতির হওয়ায় প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশীয় বাজারে জ্বালানি পণ্যের মূল্য সমন্বয় করতে হয়। কিন্তু, বিপিসি গতানুগতিকভাবে তা না করায় প্রায়শই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সরকারকে সেই সময়ে জ্বালানি পণ্য আমদানির জন্য বিশাল বার্ষিক ভর্তুকি দিতে হয়েছিল। ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য কমে যায়। এ কারণে, সরকারকে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কোনও ভর্তুকি দিতে হয়নি। কিন্তু, ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করায় বিপিসি আবারও ফার্নেস তেল ও ডিজেলে লোকসান দেয়া শুরু করে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ সঙ্কটকালীন সময়ে চাহিদা হ্রাসের কারণে এবং একটি অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক মূল্যযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মুল্য পতন ঘটেছে। ভবিষ্যতেও এটি চলমান থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই এগুলোকে বিবেচনায় রেখে মূল্য সমন্বয়সহ অন্যান্য কৌশল নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি।

আমদানিকৃত তেলে ভেজাল এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের দক্ষতার অভাব: বর্তমানে বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাত আমদানিকৃত তেলের বৃহত্তম গ্রাহক। আমদানিকৃত তেলের গুণগত মান, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, জ্বালানি তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সান্দ্রতা এবং জলীয় পরিমানের মতো বৈশিষ্ট্যসমূহের খুব সীমিত পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিম্নমানের জ্বালানির কারণে জ্বালানি খরচ বৃদ্ধি, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং গ্রাহকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শুল্ক সরাসরি প্রভাবিত হতে পারে। একইভাবে, পরিবহন খাতে নিম্নমানের তেল ব্যবহার করা হলে ইঞ্জিনের ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং মাইলেজহ্রাসের সাথে সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেড়ে যায়। সুতরাং, জ্বালানি তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণমান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তার অভাব এই ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুতর উদ্বেগের কারণ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একে আমলে নিয়ে সংশোধন করা জরুরি। দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ নিয়ন্ত্রণহ্রাস ও মূল্য সংশোধনের মাধ্যমে তেল ও গ্যাসের বাজার উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়েছে। বেসরকারি খাত অংশ নিলে এখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভেজালের সুযোগওহ্রাস পাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে দক্ষতা আনয়নে প্রাথমিক জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন: এলএনজি এবং আমদানিকৃত কয়লা, ভবিষ্যত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল জ্বালানি উৎস হয়ে উঠবে এবং উভয়ই অতিশয় অবকাঠামো-নির্ভর। এই আমদানিকৃত জ্বালানিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করতে বন্দর, সংরক্ষণ সুবিধাদি, এবং রেল ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণে বড় ধরণের বিনিয়োগ এর প্রয়োজন হবে। যথাযথ সমন্বয় ছাড়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ, কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন: জ্বালানি সুরক্ষার পাশাপাশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণহ্রাসের অংশ হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার উৎসাহিত করার প্রবণতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক দেশ ফিড-ইন-ট্যারিফ (এফআইটি) এবং বিভিন্ন প্রণোদনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি নীতি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশও নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। রূপকল্প ২০২১ এবং ঈঙচ-ওঘউঈ-তেও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মোট জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান ২০১৫ সাল নাগাদ ৫% এবং ২০২১ সাল নাগাদ ১০%-এ উন্নীত করা হবে। ২০09 সাল থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরে সরকার টেকসই জ্বালানি তথা নবায়নযোগ্য জ্বালানির পাশাপাশি জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর অধীনে ২০১৪ সালে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) গঠণ করে। আইন অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই নবায়নযোগ্য জ্বালানির কার্যকর ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য স্রেডা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

প্রাথমিক জ্বালানির চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি বাড়ানোর জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে মোট বিদ্যুতের ১০% উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। গ্রিডভিত্তিক সরবরাহ সম্ভব নয় এমন অঞ্চলে চাহিদা পূরণে নবায়নযোগ্য উৎসের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ন্যায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির দুইটি প্রধান ক্ষেত্র- সৌর ও বায়ু বিদ্যুতের ওপর জোর দেয়া হবে। গৃহ বিদ্যুতায়নে সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে । গৃহছাদে সৌর পিভি সিস্টেমসমূহ দেশে সফলভাবে চালু হয়েছে। সারণি ৫.১৪-এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির জন্য স্রেডা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫.১৪: নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা (মেগাওয়াট)

প্রযুক্তি	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সৌর	২০০	১২০	৩৫০	২৫০	৩০০	২৫০	১৪৭০
বায়ু	২.৯	৫০.১	১৫০	৩৫০	৩০০	৩০০	১১৫৩
বায়োমাস	০	৬	৬	৬	৬	৬	৩০
বায়োগ্যাস	৫	০	০.৫	০.৫	০.৫	০.৫	৭
হাইড্রো	২৩০	০	১	১	২	২	২৩৬
মোট	**৪৩৭.৯**	**১৭৬.১**	**৫০৭.৫**	**৬০৭.৫**	**৬০৮.৫**	**৫৫৮.৫**	**২৮৯৬**

সূত্র: স্রেডা

২০২০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে ৬৪৯.৫১ মেগাওয়াট। আরো ৫৪৩ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পসমূহ নির্মাণাধীন এবং ১৪১৬ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প পরিকল্পনার পর্যায়ে ছিল। অতএব, বোঝা যাচ্ছে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবেনা। জীবাশ্ম জ্বালানিতে অব্যাহত ভর্তুকি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অপর্যাপ্ত প্রণোদনাসহ বেশ কয়েকটি কারণ এতে অবদান রেখেছে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা ও যোগানকে বিরূপ প্রভাবিত করেছে। আর এ সমস্যা নিরসনে ৮ম পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতির বাস্তবায়নে নতুন নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

জ্বালানি দক্ষতা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ: সরকার ২০২০ সাল নাগাদ জ্বালানি সংরক্ষণ ১৫% এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ২০% অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা, ইলেক্ট্রিক এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিএসটিআই কর্তৃক জ্বালানি মান ও জ্বালানি স্টার লেবেলিং কর্মসূচি বাস্তবায়নকে সামনে রেখে সপ্তম পরিকল্পনায় জ্বালানি দক্ষতা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। সরকার 'এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান আপটু ২০৩০ এবং এনার্জি এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন রুলস অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান' প্রণয়ন করেছে এবং নির্ধারিত সময়ে তা বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়েছে। জ্বালানি দক্ষতার উন্নতিতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অর্জন নিম্নরূপ

- 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬' প্রণয়ন;
- 'জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮' প্রণয়ন;
- 'জ্বালানি সাশ্রয়ী সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক গ্যাজেটে চার শতাংশ সুদে ঋণ প্রবর্তনের মাধ্যমে শিল্প ও আবাসিক খাতে জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের জন্য অর্থায়ন' প্রকল্প চালুকরণ;
- পরিবেশবান্ধব এবং সবুজ শিল্প বিকাশের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণ সুবিধা চালুকরণ;
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণের বিধানকেবাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড'-এ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- উন্নত চুলার জন্য দেশীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উন্নত ভাত পার্বোলিং পদ্ধতির বাস্তবায়ন;
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ প্রণয়ন;
- সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০ প্রণয়ন।

জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ এবং ভর্তুকি

জ্বালানি তেল এবং গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে বিশাল সমস্যা রয়েছে; বিশেষত বড় চ্যালেঞ্জ হলো ডিজেলের মূল্য নির্ধারণ। অসংখ্যবার সমন্বয় সত্ত্বেও, গড় ব্যয় এবং মূল্যের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত তেল আমদানি করে। আন্তর্জাতিক বাজারে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত তেলের মূল্যের উত্থান-পতন রয়েছে। বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্যহ্রাস পাওয়ায় সরকারকে ২০১৬ এবং ২০১৮ অর্থ-বছরের মধ্যে কোনও ভর্তুকি দেওয়ার দরকার পড়েনি। তবে, ২০১৯ অর্থবছরে জ্বালানি তেলের মূল্য বাড়তে শুরু করায় বিপিসি আবারও ফার্নেস তেল ও ডিজেলে লোকসান দিতে শুরু করে। ফলে, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোসহ অন্যান্য দেশের ন্যায় পরিবর্তনশীল বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিজেল, ফার্নেস তেল এবং অন্যান্য জ্বালানিসমূহের মূল্য দক্ষ এবং নিয়মিতভাবে সমন্বয় করতে আমাদের সক্ষম হওয়ার চ্যালেঞ্জটি থেকেই যায়।

গ্যাসের ক্ষেত্রে, কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি কারণ দেশীয়ভাবে গ্যাস উৎপাদিত হয়। তবে আমদানিকৃত-জ্বালানি সমতুল্যের ক্ষেত্রে সুযোগব্যয়ের তুলনায় গ্যাসের মূল্য অনেক কম। তৎসত্ত্বেও আগামী বছরগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দেশীয় গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় আমদানিকৃত এলএনজির ব্যবহার বাড়বে। এলএনজিও আন্তর্জাতিক মূল্য অস্থিরতার সম্মুখীন হবে এবং টেকসহিতার জন্য নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। ৭ম পরিকল্পনায়ও এলপিজি ব্যবহার উৎসাহিত করা হয়েছিলো দেশীয় গ্যাসের ওপর চাপ কমাতে। পাইপযুক্ত গ্যাসের পরিবর্তে এলপিজির ব্যবহার দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতার কারণে, নিয়মিত মূল্য সমন্বয় না করা হলে ভর্তুকি ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থেকেই যাবে। এলএনজি আমদানি এবং এলপিজির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং গ্যাসের যথাযথ মূল্য নির্ধারণ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত। অষ্টম পরিকল্পনায় বিইআরসি-কে এমনভাবে মূল্য সমন্বয় করার প্রয়োজন হবে যাতে ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যায় এবং জ্বালানি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সংস্থান করা যায়। পরিষ্কার জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস সম্পর্কিত প্যারিস চুক্তির প্রতিশ্রুতিসহ বাংলাদেশের পরিবেশগত লক্ষ্যসমূহ পূরণের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির যথাযথ মূল্য নির্ধারণও অত্যন্ত জরুরি।

৫.২.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি বিনিয়োগের অর্থায়নের কৌশল নির্ধারণে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং এডিপির মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ উভয়কেই বিবেচনা করা হয়েছিলো। বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানিতে বেসরকারি বিনিয়োগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এলেও প্রাথমিক জ্বালানিতে এর পরিমাণ অত্যন্ত কম। উপরের ৫.২ অনুচ্ছেদে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সপ্তম পরিকল্পনার সময় বিদ্যুৎ খাতে যথেষ্ট বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় যেমন ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ আধিপত্য বিস্তার করেছিলো, সপ্তম পরিকল্পনায় তেমনটি করেছে আইপিপি। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে পরামর্শক্রমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে তিনটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে। এগুলো হলো (১) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF), (২) বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল (PSDF) এবং (৩) জ্বালানি সুরক্ষা তহবিল (ESF)। ২০২০ সালের মে পর্যন্ত এই তহবিলগুলিতে জমা পড়েছে মোট ৩৬,৮৯৪ কোটি টাকা (GDF ১৪,৯৫৭ কোটি, PSDF ১০,২৫২ কোটি এবং ESF ১১,৬৮৫ কোটি)। এখন পর্যন্ত মোট ২২,৫০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯ টি প্রকল্প (পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট প্রকল্পে আংশিক অর্থায়ন এবং এলএনজি বিল পরিশোধসহ) হাতে নেওয়া হয়েছে। এই তহবিলগুলো জ্বালানি খাতের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাথমিক জ্বালানিতে, সমুদ্রে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানে নতুন বিনিয়োগ খুব সীমিত ছিল। প্রাথমিক জ্বালানিতে সর্বাধিক নতুন বিনিয়োগ এডিপির মাধ্যমে সরকারিভাবে করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বাস্তবায়নের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা অষ্টম পরিকল্পনায় সমাধান করা প্রয়োজন।

৫.২.৪ জ্বালানিতে প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্কারসমূহের অগ্রগতি

জ্বালানি খাত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ কমিশন ভোক্তা ও শিল্প পর্যায়ে শুল্ক নির্ধারণ করে থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে এবং বিদ্যুৎ খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নীতি ও আইন গ্রহণ করেছে। একটি নতুন সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিপিডিবি উৎপাদন ও বিতরণ খাতে কৌশলগত ব্যবসা ইউনিট (SBU) চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এসবিইউসমূহের কার্যক্রম এবং আর্থিক কর্মক্ষমতা কর্পোরেট সংস্থার মতো পরিচালিত হবে এবং বিদ্যমান বিপিডিবি'র আইনি কাঠামোর আওতায় পৃথকভাবে মূল্যায়িত হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বেঞ্চমার্ক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা: বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য বিইআরসি এখন "বেঞ্চমার্ক মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা" চালু করেছে। বর্তমানে অন্যান্য জ্বালানি যেমন গ্যাস, ফার্নেস তেল, কয়লা, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস, ফার্নেস তেল) ইত্যাদির জন্য বেঞ্চমার্ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে দেশী-বিদেশী বেসরকারি খাত সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে অংশ নিতে পারে। এটি এমন একটি পদক্ষেপ, যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। উচ্চ বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

ফাংশনাল লাইনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পৃথকীকরণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি, মিটারিং ও বিলিং-এর কম্পিউটারাইজেশন, বিল পরিশোধ এবং গ্রাহক পরিষেবার তদারকি প্রভৃতি এ খাতের ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের ইঙ্গিত বহন করে। বিইআরসি প্রতিষ্ঠা ও কার্যকারিতা, আইপিপি নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন, ভারতের সাথে বিদ্যুৎ বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির প্রক্রিয়া শুরু করাও চলমান প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ খাতের কার্যসম্পাদনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ধাপসমূহ হ্রাস করতেও সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলস্বরূপ, গৃহস্থালী সংযোগের জন্য ৭ দিন এবং শিল্প সংযোগের জন্য ২৮ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিচালন দক্ষতা সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যে সরবরাহ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য সরকার একটি খসড়া নীতিও প্রণয়ন করেছে। গৃহছাদে উৎপাদিত অতিরিক্ত সৌর বিদ্যুৎ বিক্রিতে ভোক্তাদের উৎসাহিত করতে সরকার নেট মিটারিং নীতিও প্রণয়ন করেছে ।

সপ্তম পরিকল্পনা আমলে নিম্নলিখিত দুটি আইন গৃহীত হয়েছে-

১. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮; এবং

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৮ (২০২১ পর্যন্ত সংশোধিত)।

তথাপি, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার, যার মধ্যে রয়েছে: ফাংশনাল লাইনের পাশাপাশি যেখানে সম্ভব সেখানে আরও পৃথকীকরণ (আনবান্ডলিং); পরিচালন দক্ষতা এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থাগুলো শক্তিশালীকরণ; বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বিদ্যুতের দাম ধীরে ধীরে গড় ব্যয়স্তরের সাথে সমন্বয়করণ; এবং বিইআরসিকে শক্তিশালীকরণ যাতে লাইসেন্সিং, জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ, জ্বালানি দক্ষতাসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারফরম্যান্সের মান ও ভোক্তাদের সন্তুষ্টি/বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত এজেন্ডাসমূহ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ কৌশল (PSMP ২০১০) ২০১৬ পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়েছে। বিগত ৪ বছরের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে পরিকল্পনাটির প্রাসঙ্গিকতা নিরীক্ষা করার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা এবং প্রাথমিক জ্বালানি খাতের বাস্তবতার আলোকে তা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাক-আপ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে অনাকাংখিত পরিস্থিতি সামাল দেয়া যায়।

৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ খাতের কৌশল

সপ্তম পরিকল্পনায় যেমন বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার অব্যাহত ছিল, অষ্টম পরিকল্পনায়ও তা অব্যাহত থাকবে। বিশেষত, সপ্তম পরিকল্পনার সময় এখাত প্রয়োজনীয় এডিপি বরাদ্দ পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ইতিবাচক ফলাফল উপরের ৫.২ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে বিশেষত নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধিতে। প্রাথমিক জ্বালানিতে নতুন বিনিয়োগ মোটামুটি হলেও প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধিতে অগ্রগতি খুবই সীমিত, যদিও কিছু বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং পাইপলাইনে আমদানিকৃত এলএনজি যুক্ত হয়েছে ।

সপ্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অষ্টম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা হবে। সপ্তম পরিকল্পনায় অসম্পন্ন কাজসমূহ বাস্তবায়ন করাই হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার। অষ্টম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি রাজস্বসাশ্রয়ী, দক্ষ, সর্বনিম্ন ব্যয়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেয়া হবে। সর্বনিম্ন ব্যয়ের এ উৎপাদন ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার থাকবে দক্ষতা অর্জন এবং সঠিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জ্বালানি মিশ্রণে। যেমনটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা হবে। সরকার সর্বনিম্ন ব্যয়ের উৎপাদনের দিকে যেতে চায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় বড় আকারের বেশকিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করেছে যেখানে এইচএসডি এবং ফার্নেস তেলের তুলনায় সাশ্রয়ী কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (নিম্নের সারণি ৫.১৫)। এমন অনেকগুলি সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে উচ্চমূল্যের এইচএসডি এবং ফার্নেস তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে ছোট আকারের আইপিপিসমূহ, যা অতটা দক্ষ নয়। এ অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রেগুলোকে কেবলমাত্র আরও দক্ষ এবং সাশ্রয়ী জ্বালানি দিয়েই প্রতিস্থাপন করতে হবে তা নয়, পাশাপাশি বাড়াতে হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন। একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে অদক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে অবসরে পাঠানো এবং পিপিএ'র দিকে নতুন করে নজর দেওয়া। এর কারণ - ক্যাপাসিটি চার্জের প্রচুর খরচ এবং সেইসাথে উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের বিদ্যমান বিশাল ব্যবধান। প্রাথমিক জ্বালানি খাতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো আগামী ১০-২০ বছরে কীভাবে প্রাথমিক জ্বালানির বর্ধিত চাহিদা পূরণ হবে সে সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অভাব। প্রাথমিক জ্বালানি বিষয়ক নীতি, বিশেষত কয়লা নীতি অত্যন্ত জরুরি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্থ করছে এমন কয়েকটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার সমাধান করা। অষ্টম পরিকল্পনায় প্রাথমিক জ্বালানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে পিপিপি'র কৌশলটিরও সংস্কার হওয়া দরকার। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, বিদ্যুৎ

এবং জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ নীতিসমূহ গতানুগতিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বাজার শক্তির ওপর নির্ভর করে, যা তেলের বাজারে বৃহত্তর বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে, জ্বালানি সংরক্ষণ করবে, আর্থিক ব্যয়ের বোঝা নির্মূল করবে এবং পরিষ্কার জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে, তাই গতানুগতিকতার পরিবর্তন দরকার।

৫.৩.১ বিদ্যুৎ খাতের কৌশল

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ বর্ণিত প্রবৃদ্ধির পথ অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও কোভিড -১৯ এর ফলে এ প্রবৃদ্ধির গতি বাঁধাগ্রস্থ হয়েছে, তথাপি আশা করা যায় যে ২০২১ পঞ্জিকাবর্ষের শুরু থেকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও প্রবৃদ্ধির গতি ফিরে পাবে। ফলে, অষ্টম পরিকল্পনা সময়কালে বিদ্যুতের চাহিদা ৮% এরও অধিক হারে বাড়তে থাকবে। দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করায় চাহিদার তুলনায় উৎপাদন উদ্বৃত্ত রয়েছে। পাশাপাশি হয়েছে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় উন্নয়ন, ফলে বর্তমানে ৯৭% জনগণ বিদ্যুৎসুবিধার আওতায় এসেছে। বিদ্যুৎখাতে ব্যাপক সরকারি বিনিয়োগ, বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, ভারতের সাথে বিদ্যুৎ বাণিজ্যে জড়িত হওয়া এবং সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস কমিয়ে আনার সম্মিলিত কৌশল গ্রহণের ফলেই এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

যদিও বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ও দৃশ্যমান উন্নতি সাধন করেছে, তথাপি এ খাতে কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও রয়ে গেছে, যা অষ্টম পরিকল্পনায় মোকাবেলা করতে হবে। বিশেষত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয়হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা, যাতে করে কৃষি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যবহারের পাশাপাশি শিল্পকারখানায়, বিশেষত রপ্তানি শিল্পে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। ডব্লিউইএফ প্রকাশিত বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সূচক (জিসিআই) অনুযায়ী, প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশকে সামগ্রিক অবকাঠামোর মান বিশেষত বিদ্যুৎ সুবিধার মান বৃদ্ধিতে ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করতে হবে।

বিদ্যুৎ খাতের জন্য কৌশলগত কাঠামো: বিদ্যুৎ খাতে দু'টি প্রধান সমস্যা হলো: (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং (খ) বিদ্যুৎ খাতের অব্যাহত পরিচালন ঘাটতি। অষ্টম পরিকল্পনা কৌশলে উদ্বেগের এই ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই, এ খাতে কৌশলগত লক্ষ্য শুধুমাত্র চাহিদা পূরণে করবে এমন একটি সরবরাহ পাইপলাইন স্থাপনই নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নত মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করা। যেমন- (ক) দেশজ কয়লা ও গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সর্বোত্তম প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রণের মাধ্যমে উৎপাদন; (খ) সিস্টেম লস আরওহ্রাসের মাধ্যমে বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ; এবং (গ) নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জ্বালানি বাণিজ্যের সর্বাধিক ব্যবহার। লক্ষ্য হবে দীর্ঘমেয়াদে স্বল্প খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই বিষয়গুলো সপ্তম পরিকল্পনায়ও ছিলো। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও এ কৌশলগুলোই চলমান থাকবে, তবে মূল লক্ষ্য থাকবে চিহ্নিত কূন্যস্থানসমূহ পূরণে মনোনিবেশ করা, যাতে তা পিএসএমপি ২০১৬ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কৌশলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১. (ক) সর্বোত্তম ও দক্ষ প্রাথমিক জ্বালানি মিশ্রণ এবং (খ) বিদুতের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস আরওহ্রাসের ওপর ভিত্তি করে একটি দক্ষ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন কাঠামোর দিকে অগ্রসর হওয়া;

২. অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র, বিশেষত শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাত থেকে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে মিলিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা, যাতে গ্রিড থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায় এবং যাতে ১০০%জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আসে;

৩. সর্বনিম্ন ব্যয়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় যাওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নিয়মিত বিদ্যুৎ এর মূল্য সমন্বয় করা এবং বর্তমানে প্রচলিত ভর্তুকি থেকে সরে আসা;

৪. উচ্চ বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে আরও অনুকূল এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি, যাতে করে একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে জ্বালানি খাত উন্নয়নে দেশি-বিদেশি বেসরকারি খাতের (আইপিপি এবং পিপিপি) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়;

৫. সর্বোত্তম জ্বালানি মিশ্রণ তৈরি এবং আমদানিকৃত ফার্নেস তেল এবং এইচএসডি নির্ভরতা হ্রাস করার জন্য গ্যাস, কয়লা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি আহরণ বৃদ্ধি এবং প্রতিবেশী ভুটান ও নেপাল থেকে জ্বালানি আমদানি, বিশেষত জলবিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎসের মধ্যে জলবিদ্যুৎ প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে থাকায় এবং প্রত্যাশিত উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ায় জলবিদ্যুৎকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অন্যান্য নবায়নযোগ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বায়ুবিদ্যুৎ, সৌরবিদ্যুৎ, জৈববস্তু ও বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, যেখানে মূল কৌশলগত লক্ষ্য হলো সমস্ত গ্রাহকদের নিকট সর্বোত্তম হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;

৬. গ্যাস সঙ্কট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অদক্ষতা এবং ফার্নেস তেলে ভেজালসহ চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা;

৭. চাহিদা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ উন্নত করা;

৮. সারা দেশে দ্রুত, নিরাপদ, দক্ষ ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য সরবরাহ লাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন;

৯. মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপারক্রিটিকাল কয়লাভিত্তিক পাওয়ারপ্লান্ট কেন্দ্রিক জ্বালানি কেন্দ্রসহ বেশ কয়েকটি জ্বালানি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে মোট বিদ্যুতের ১০% উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাও ছিল সরকারের। বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩,৫৪৮ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ এবং অফগ্রীড নবায়নযোগ্য সহ), জনসংখ্যার ৯৭% বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে এবং মাথাপিছু উৎপাদন পৌঁছেছে ৫১২ কিলোওয়াটে। তবে এই অর্জনের পিছনে ছিলো সরকার কর্তৃক গৃহীত পিএসএমপি ২০১৬ এবং একটি কৌশলগত পরিকল্পনা, যেখানে ২০২১ সাল নাগাদ ২৪০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সাল নাগাদ ৬০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে সাধিত অগ্রগতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পিএসএমপি ২০১৬ এবং বিদ্যুৎ খাতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের জন্য একটি সংশোধিত 'বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সংশোধিত 'বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা' এর ওপর ভিত্তি করেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চাহিদা, উৎপাদন ক্ষমতা, রিজার্ভ মার্জিন ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জাইকা কর্তৃক পিএসএমপি-২০১৬ শীঘ্রই হালনাগাদ করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উৎপাদনের জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়যুক্ত জ্বালানি মিশ্রণ কৌশল নির্ধারণ। অধিকতর দক্ষ বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্রে স্থাপন ও অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ বিশেষত, অদক্ষ তরল জ্বালানি নির্ভর ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রসমূহ ও ছোট আকারের আইপিপিসমূহ বন্ধ করে দেয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় খরচ কমিয়ে আনতে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিএসএমপি-২০১৬ এর নির্দেশাবলী অনুসরণে সচেষ্ট হবে। প্রাথমিক জ্বালানি কোনটি ব্যবহৃত হবে তার ওপর বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট খরচ নির্ভর করে। নিম্নের সারণি ৫.১৫ হতে দেখা যাচ্ছে যে, ডিজেল এবং ফার্নেস তেল উভয়ের জন্য প্রতি ইউনিটের খরচ (টাকা/কি.ও.-ঘন্টা) সবচেয়ে বেশি, আর তাই তরল জ্বালানির ব্যবহার কমালেই তা উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে ইতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলবে। পিএসএমপি ২০১৬-তে জ্বালানি মিশ্রণেরঙ৩উ ঠধষঁব্ব (ইকনমিক, এনভায়রনমেন্টাল এবং এনার্জি সিকিউরিটি ভ্যালু) সর্বোচ্চকরণের মাধ্যমে সর্বোত্তম জ্বালানি মিশ্রণের একটি দৃশ্যকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু কম খরচে গৃহস্থালী বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রাথমিক জ্বালানি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে, তাই সর্বনিম্ন ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের সাফল্য প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে।

সারণি ৫.১৫: প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ (টাকা/কিও-ঘন্টা)

উৎপাদনের জ্বালানি ধরণ	ইউনিট ব্যয় (টাকা/কিও-ঘন্টা)
ফার্নেস তেল (এফও)	১৭
এইচএসডি	২৬
এলএনজি	১৩
আমদানিকৃত কয়লা	৮.১
দেশজ কয়লা	৬
দেশজ গ্যাস	২.৫৭
জল বিদ্যুৎ	১
সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২
আমদানিকৃত বিদ্যুৎ	৬.৪৮

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ

জ্বালানি তেল (ফার্নেস তেল এবং ডিজেল) এর তুলনায় গ্যাস-ভিত্তিক এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হয়। আমদানিকৃত বিদ্যুৎও একটি খুব আকর্ষণীয় বিকল্প, যা সপ্তম পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধি পেয়েছিল, অষ্টম পরিকল্পনায়ও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

পিএসএমপি ২০১৬ এর কৌশলগত লক্ষ্য হলো ব্যয়বহুল তেল-নির্ভর ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা কমানোর কৌশল হিসেবে বৃহৎ আকারের তুলনামূলক কম ব্যয়বহুল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পদ্ধতিগত প্রসার। তবে দুর্গম অঞ্চলসমূহের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চালনক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে ঘাটতি অঞ্চলে তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রাখতে হতে পারে, যদিও তা ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক। এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে অঞ্চলসমূহের মধ্যে গ্রিড সংযোগ বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এই পরিকল্পনায় পারমাণবিক বিদ্যুতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সহজলভ্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিকেও আলোকপাত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ক্রমশই সস্তা হচ্ছে এবং তাই ভবিষ্যতের জ্বালানি মিশ্রণ কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি।

৮ম পরিকল্পনা চলাকালীন আরেকটি কৌশলগত পদক্ষেপ হবে নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের সব সংস্থাসমূহের আর্থিক ক্ষমতা উন্নত করা। সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস আরও হ্রাস এবং স্বল্প ব্যয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং বিদ্যুতের দাম নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।

কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনে আইপিপি'র মাধ্যমে পর্যাপ্ত সরকারি বেসরকারি অর্থ সংস্থান জরুরি: বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন সময়মতো পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র থেকেই আসতে হবে। আইপিপি'র মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের যে সাফল্য তা আরো বাড়ানো উচিৎ। সপ্তম পরিকল্পনায় যেমনটি আশা করা হয়েছিল যে বৃহত্তর এবং দক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হবে (বিশেষত বেসরকারি খাতের দ্বারা), তা ঘটেনি; যার ফলে বাংলাদেশকে ব্যয়বহুল ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু রাখতে হয়েছিলো। ৮ম পরিকল্পনা এবং তৎপরবর্তী সময়ের লক্ষ্য হবে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চুক্তি এবং অদক্ষ ছোট আকারের আইপিপিগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসা এবং কাঙ্খিত ন্যূনতম ব্যয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়া, যেখানে দক্ষতা এবং সাশ্রয়ই হবে কেবলমাত্র বিবেচ্য বিষয়। এর অর্থ হলো দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করে বর্ধিত দক্ষতা আনয়নে প্রণোদনা প্রদান।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং কিছু কিছু অষ্টম পরিকল্পনাকালীন সময়ে সম্পন্ন হবে। ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে মোট ১৫৯২৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৪৪টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রে নির্মাণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে সমাপ্ত হবে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রেগুলোর মধ্যে মোট ৯০৬৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ১৬টি সরকারি খাতের এবং ৬৮৫৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২৮টি বেসরকারি খাতের, যা নিম্নের সারণি ৫.১৬ এ দেখানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০২৩ সাল নাগাদ এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রেগুলির বেশিরভাগই বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাবে।

সারণি ৫.১৬: বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (নির্মাণাধীন)

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	ক্যাপাসিটি (মেগাওয়াট)
সরকারি খাত	১৬	৯০৬৫
ব্যক্তিগত খাত	২৮	৬৮৫৯
মোট	৪৪	১৫৯২৪

সূত্র: বিইআর ২০১৯

৮ম পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নতুন উৎপাদন:

৮ম পরিকল্পনাকালীন সময়ে, বিদ্যুৎ বিভাগ আরো প্রায় ১৫,৭০০ মেগাওয়াট (আমদানিসহ তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যতীত) বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা করেছে। সরকার ৮ম পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ।

সারণি ৫.১৭: ৮ম পরিকল্পনাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (ক্যাপটিভ এবং আরই সহ)

	ভিত্তিবছর (২০২০)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.) (ক্যাপটিভ এবং আরই সহ)	২৩,৫৪৮	২৪,০০০	২৬,০০০	২৮,০০০	২৯,০০০	৩০,০০০

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ

৮ম পরিকল্পনায় বাস্তবায়নের জন্য বৈচিত্র্যযুক্ত জ্বালানি মিশ্রণ সহ নতুন প্রকল্প সনাক্ত: ৮ম পরিকল্পনা সময়কালে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি মিশ্রণের পরিবর্তন। এ পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি গ্যাসভিত্তিক অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বৃহৎ আকারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও। ৮ম পরিকল্পনাকালীন সময়ে আমদানিকৃত কয়লার অংশ বৃদ্ধি পাবে এবং তরল জ্বালানি হ্রাস পাবে, যদিও তখনও তার পরিমাণ খুব একটা কম থাকবেনা। তবে গ্যাসের অংশ বৃহত্তম জ্বালানির উৎস হিসেবে অব্যাহত থাকবে। আমদানিকৃত এলএনজিও সম্প্রতি গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত করা হয়েছে। এলএনজি, তরল জ্বালানির তুলনায় কম ব্যয়বহুল এবং তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার শক্তির উৎস হলেও, দেশীয় গ্যাস এবং কয়লার তুলনায় খানিকটা ব্যয়বহুল ।

কয়লার বর্ধিত ব্যবহার পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশের নিয়ম-নীতিমালা মেনে চলা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকার অনেক সচেতন । পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করতে এবং এর মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে, কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি আধুনিকতম আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিবেচনা করে জিএইচজি নিঃসরণে ন্যুনতম অবদান থাকা সত্ত্বেও, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে নির্গমণ হ্রাসে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমদানিকৃত কয়লা এবং এলএনজি-এর ওপর বর্ধিত নির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা, বিনিয়োগ ব্যয় এবং দেশজ হ্যান্ডলিং লজিস্টিকের চ্যালেঞ্জও রয়েছে। কয়লা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের জন্য, দেশীয় কয়লা খোঁজাও গুরুত্বপূর্ণ; যদিও এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো একটি দেশীয় কয়লা নীতি গ্রহণ এবং প্রয়োগের অভাব। এই সময়কালে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যুৎ বাণিজ্যের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হলেও বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যা আগেও আলোচনা করা হয়েছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ: জ্বালানি ব্যবহারে একটি বড় সংযোজন হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ, যার উৎপাদন ৮ম পরিকল্পনার শেষ সময়ে শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক এবং আবহগত তথ্য বিবেচনা করে, বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন (বিএইসি) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। ইতোমধ্যে রূপপুর কেন্দ্রের ইউনিট ১ ও ২ এর প্রথম কংক্রিট ঢালাই (এফসিপি) শেষ হয়েছে। ইউনিট ১ প্রথমে ১২০০ মেগাওয়াট এবং পরবর্তীতে ইউনিট ২ আরও ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে এবং আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ প্রতিবছর মোট ২৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ যোগ হবে। ২,৩৬২ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের, যা নিম্নে সারণি ৫.১৮ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৫.১৮: গ্রিড ভিত্তিক প্রধান নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পসমূহ

	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর ২০২৫)	মোট
সৌর	১২৭	৫৪২	৮৯৫	৪০০	৫০	২,০১৪
বায়ু		৬০	২৩০		১০	৩০০
বর্জ্য বিদ্যুৎ		৬	৪২			৪৮
মোট	**১২৭**	**৬০৮**	**১১৬৭**	**৪০০**	**৬০**	**২৩৬২**

উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার বাড়াতে বিদ্যুৎ উৎপাদন যৌক্তিকিকরণের প্রয়োজন: বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের জন্য কৌশলগতভাবে রিজার্ভ মার্জিন বজায় রাখা প্রয়োজন, এর অর্থ সর্বদা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় থাকবে যাতে সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। ভবিষ্যৎ বিদ্যুতের চাহিদার সঠিক পূর্বাভাস প্রাপ্তির অসুবিধার কারণে এবং নতুন উৎপাদন ক্ষমতা সিস্টেমে যুক্ত হতে আরো কয়েক বছর সময় নিতে পারে বলে পর্যাপ্ত রিজার্ভ মার্জিন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবে এর একটি নেতিবাচক দিকও রয়েছে, কেননা রিজার্ভ মার্জিন বজায় রাখার জন্য কেবল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণই যথেষ্ট নয়, ক্যাপাসিটি চার্জসহ অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জের জন্যও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। যদি প্রকৃত চাহিদা থেকে রিজার্ভ মার্জিন খুব বেশি হয়ে যায়, তবে অব্যবহৃত রিজার্ভ মার্জিন এর কারণে সুযোগব্যয় অনেক বেড়ে যায়। অতএব, অত্যন্ত সুক্ষভাবে চাহিদা নির্ধারণ এবং আর্থিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিজার্ভ মার্জিন নির্ধারণ করা উচিৎ।

উপরের ৫.২ অনুচ্ছেদে ইতোমধ্যে দেখানো হয়েছে যে, কয়েকবছর যাবৎ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে প্রকৃত উৎপাদন ক্রমশ কমছে। এর ফলে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদকদের তাদের বিদ্যুৎ না কেনার জন্য বেশ বড় অংকের ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটি পিডিবির ওপর মারাত্মক প্রতিকূল আর্থিক প্রভাব ফেলছে, যার ফলে পিডিবি'র দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক টেকসইতা চ্যালেঞ্জের

মুখে পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পিডিবি ওয়েবসাইট অনুসারে, ০২/০৬/২০২০ তারিখে দিনের প্রকৃত সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিলো ৯,১৬৫ মেগাওয়াট এবং সন্ধ্যায় ১০,২২৮ মেগাওয়াট অর্থাৎ গড়ে ১০,০০০ মেগাওয়াটেরও কম। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৯,৫৭০ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ এবং আরই বিদ্যুৎ ব্যতীত), আর ক্যাপটিভ এবং আরই বিদ্যুৎ যোগ করলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২২,৭৮৭ মেগাওয়াট। এর অর্থ হলো সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা, প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৫০% ছিলো। এই ব্যবধান বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে এবং সামনে তা আরো বাড়বে, যেহেতু সারণি ৫.১ থেকে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র সমাপ্ত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে রয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট (সারণি ৫.১৭) এবং চাহিদা ১৯,০০০ মেগাওয়াট হওয়ার কথা রয়েছে, যদিও বর্তমানে সর্বোচ্চ চাহিদা মাত্র ১০,০০০ মেগাওয়াট।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো পুরনো এবং উচ্চ ব্যয় ও কম দক্ষ ভাড়াভিত্তিক ও এসআইপিপি বিদ্যুৎকেন্দ্রেগুলোর পাশাপাশি সরকারি খাতের যে কোনও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে অবসরে পাঠানোর দিকে নজর দেয়া। ভাড়াভিত্তিক এবং এসআইপিপি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,৭৫৪ মেগাওয়াট, যেগুলোকে অবসরে পাঠানোর জন্য সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে সরকার মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে ৩০,০০০ মেগাওয়াট করার পরিকল্পনা করছে (সারণি ৫.১৭)।

অষ্টম পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি: গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের উচ্চ মাত্রার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং এর টেকসই সমাধান সন্ধানের জন্য বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য প্রচলিত জ্বালানি উৎস থেকে সরে এসেছে। বিশ্বজুড়ে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প নেই।

তদানুসারে, আরও টেকসই জ্বালানি কর্মসূচি অর্জন হলো সরকারের একটি কাঙ্খিত লক্ষ্য এবং এ লক্ষ্যে ৮ম পরিকল্পনাও তৎপরবর্তী সময়ে জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (RE) শেয়ার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলমান থাকবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার অংশ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। সপ্তম পরিকল্পনা সময়কালে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছিলো অত্যন্ত সীমিত। সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার ১০% অর্জনের একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম পরিকল্পনা সময়কালে নবায়নযোগ্য জ্বালানির কার্যসম্পাদন খুব দুর্বল হওয়ায় অষ্টম পরিকল্পনায় এর ওপর অধিক জোর দিতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য রেগুলেশন এবং নীতি সহায়তা: এ ক্ষেত্রে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশ-বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সুবিধার্থে সরকার বিভিন্ন নীতি ও প্রবিধান গ্রহণ করছে। ২০০৮ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি সরকার টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর অধীনে ২০১৪ সালে 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)' গঠণ করে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর একটি মূল কৌশলগত লক্ষ্য হলো গ্রিডে সরবরাহের পাশাপাশি জনগণের নিকট সরাসরি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহে বেসরকারি উৎপাদকদের উৎসাহ প্রদান। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগকে সহযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রণ করছে স্রেডা। সিদ্ধান্ত রয়েছে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করবে বেসরকারি খাত (আইপিপি), আর সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সামাজিক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ।

বেসরকারি খাত কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে এমন কয়েকটি চিহ্নিত বাণিজ্যিক প্রকল্প হলো: (ক) সৌর উদ্যান (গ্রিড সংযুক্ত); (খ) সৌর সেচ; (গ) সৌর মিনি-গ্রিড/মাইক্রো-গ্রিড; এবং (ঘ) সৌর ছাদ। সামাজিক প্রকল্পসমূহ হলো: (ক) পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র; (খ) প্রত্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ; (গ) ইউনিয়ন ই-কেন্দ্রসমূহ; (ঘ) দূরবর্তী ধর্মীয় স্থাপনা; (ঙ) অফ-গ্রিড রেল স্টেশন; এবং (চ) অফ-গ্রিড অঞ্চলে সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রবণতা অনুসরণ করে ধীরে ধীরে কূন্য-নিঃসরণ জ্বালানি উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দৃশ্যমান সক্রিয় ব্যবহার বৃদ্ধি এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাসের দিকে একযোগে এগুতে হবে।

ইডকল এর সহযোগিতায় সৌর আবাসন এবং সৌর সেচ প্রকল্প হলো নন-গ্রিড নবায়নযোগ্য জ্বালানি সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৬৪৯.৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। তদুপরি, ৫৪৩.০৮ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং ১৪১৬.৪১ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে। ৮ম পরিকল্পনা মেয়াদে বাণিজ্যিক প্রকল্পের আইপিপিগুলির মাধ্যমে ১০% উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করা হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে আইপিপিগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক

দরপত্র প্রস্তুত করছে, এফআইটি খসড়া প্রণয়ন করছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবসায়ের জন্য অন্যান্য প্রণোদনা (মূলত আর্থিক) সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ যেমন গ্রিড-সংযুক্ত নবায়নযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, তেমন নেটওয়ার্ক এবং পরিচালন ক্ষমতাও উন্নত করা প্রয়োজন।

সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প, ইউটিলিটি স্কেল পিভি প্রকল্পসমূহ এবং বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিপিডিবি এবং আইপিপিগুলির মাধ্যমেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন: আধুনিক, স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এবং বড় বড় পৌরসভাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। তাই, বিপিডিবি বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের একটি মৌলিক পদক্ষেপ হিসেবে আইপিপি (IPP) খাতে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভায় বর্জ্য থেকে জ্বালানি (WTE) উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ/বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে বর্জ্য থেকে জ্বালানি (WTE) প্রকল্পের প্রস্তাব ইতোমধ্যে সরকার অনুমোদন করেছে এবং এ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় (WTE) প্রকল্পের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় (WTE) প্রকল্পের আলোচনা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ বাণিজ্য: অষ্টম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের একটি প্রধান উপাদান হিসেবে বিদ্যুৎ বাণিজ্যের ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ এবং এর উত্তর-পূর্ব প্রতিবেশীদের মধ্যে বিদ্যুত বাণিজ্যের সম্ভাবনা প্রবল এবং এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরও হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভারতের সাথে বিদ্যুৎ বাণিজ্য শুরু করেছে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অষ্টম পরিকল্পনায় ভারতের সাথে বাণিজ্য আরও সম্প্রসারণ করা হবে এবং নেপাল ও ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির সুযোগও সন্ধান করা হবে।

পর্যাপ্ত আঞ্চলিক জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা কাজে লাগানো এবং আন্তঃসীমান্ত সঞ্চালন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তা আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে। বিদ্যুতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গ্রিডে বৃহৎ আকারের জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন বেশ কার্যকর হতে পারে। জাইকা'র একটি জরিপ হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য ২০৩০ সালে আন্তঃসীমান্ত জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা রয়েছে ৩,৫০০-৮,৫০০ মেগাওয়াট, যা প্রধানত নেপাল এবং উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আসবে। তাই, আশা করা যায় যে, বাংলাদেশ এ জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে। PSMP ২০১৬ তে জ্বালানি আমদানি বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীল করার জন্য একটি রোডম্যাপ প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অষ্টম পরিকল্পনা সময়কালে কৌশলগতভাবে বিবেচনা করা হবে এবং বাস্তবায়ন করা হবে। তবে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ/ঝুঁকি রয়েছে যা চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং এলক্ষ্যে ঝুঁকি নিরসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে, চঝগচ ২০১৬ তে প্রদত্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে।

উৎপাদনের সাথে সঞ্চালন ও বিতরণ কর্মসূচির সমন্বয়সাধন: ৮ম পরিকল্পনা সময়কালে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগের সুবিধাদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সঞ্চালন ও বিতরণে বিনিয়োগের যথাযথ সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করবে। বিতরণ ব্যবস্থার পদ্ধতিগত অপচয় ক্রমান্বয়ে আরো কমিয়ে ২০১৯ অর্থবছরে ৯.৩৫% থেকে ২০২৫ অর্থবছর নাগাদ ৭.৫% এর নিচে কমিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে, বিদ্যুৎ সরবরাহের মানের উন্নতি, যেমন নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলকরণ পূর্বশর্ত, আর তাই, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ নিশ্চিত করণ এবং সকলের জন্য ২৪/৭ সেবা নিশ্চিত করতে বৃহৎ সঞ্চালন ও বিতরণ উন্নয়ন কর্মসূচির প্রয়োজন হবে। ২০১৪ সালে ভেড়ামারাতে স্থাপিত ভারতের সাথে সংযোগ কৃত ৫০০ মেগাওয়াট এইচভিডিসি (HVDC) ব্যতীত বাংলাদেশে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার অপারেটিং ভোল্টেজগুলি ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভির নিচে। ভারতের মধ্য দিয়ে ভুটান বা নেপালে অবস্থিত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রেগুলো থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ৫০০-২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এইচভিডিসি (HVDC) আন্তঃসংযোগ প্রয়োজন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পিজিসিবি (PGCB) ৪০০ কেভি এইচভিডিসি (HVDC) সাবস্টেশন, ৪০০/২৩০/১৩২ কেভি স্টেশন, ২৩০/১৩২ কেভি সাবস্টেশন এবং ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশন স্থাপনে, বিশেষত ২০২৫ সাল অবধি প্রায় ৩৩৫৮ সার্কিট কি.মি. নতুন সঞ্চালন লাইন স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিকল্পনা: বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা খুব দ্রুত বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকার সঞ্চালন নেটওয়ার্ক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে ৩৩৫৮ সার্কিট কি.মি. নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সঞ্চালন ধারণক্ষমতা ১৩২/২৩০ কেভি থেকে ৪০০ কেভি তে উন্নীত করা এবং সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য ২০২১-২০২৫ সালে প্রায় ১১২০ সার্কিট কি.মি. সঞ্চালন লাইন স্থাপন। এছাড়াও মহেশখালী থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ৭৬৫ কেভি ক্ষমতার নতুন ৭০০ সার্কিট কি.মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যা ২০২৫ সাল নাগাদ শেষ হবে।

বিতরণ: চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর নিকট ২৪/৭ মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিতরণ নেটওয়ার্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত উৎপাদন খাতের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে গ্রিড থেকে টেকসই মানের বিদ্যুৎ সরবরাহ উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এ গৃহীত প্রবৃদ্ধি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য শিল্পখাত, বিশেষত উৎপাদন খাতই হলো মূল চালিকা শক্তি। ২০২০ সাল নাগাদ শতভাগ জনসংখ্যাকে বিদ্যুতের আওতায় আনার জন্য সঞ্চালন নেটওয়ার্কের বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নত করতে একটি সমন্বিত বিদ্যুৎ বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার পদ্ধতিগত অপচয় আরও কমাতে, বকেয়া বিল আদায় করতে এবং শতভাগ পরিবারের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

বিতরণ সংস্থাগুলো তাদের নকশা, পরিকল্পনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য অসমন্বিত উপায়ে কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। ডিএমএস (ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম), জিআইএস (জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম) এবং এসসিএডিএ (সুপারভাইজরি কন্ট্রোল এন্ড ডাটা একুইজিশান) বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হচ্ছে। পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় ঝঈঅউঅ/উগঝ পদ্ধতির সাথে জিআইএস (GIS) এর সমন্বয়ের জন্য সফটওয়্যার বিকাশে যথেষ্ট বিনিয়োগ প্রয়োজন। জিআইএস (GIS) এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির পাশাপাশি রিয়েল-টাইম এসসিএডিএ (ঝঈঅউঅ) তথ্যাদির মাধ্যমে অধিকতর ব্যবসায়িক উন্নয়ন সম্ভব হবে। বর্তমানে, সকল উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ সংস্থাগুলি জিআইএস (GIS) এবং (SCADA) এসসিএডিএ এর জন্য পৃথকভাবে কাজ করে। কিন্তু পিএসএমপি (চঝগচ) ২০১৬ এ, জিআইএস (GIS) এবং এসসিএডিএকে (SCADA) একটি একক ব্যবস্থায় একীভূত করতে এবং সমন্বিত উপায়ে তথ্য আদান প্রদান করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্মার্ট গ্রিড স্থাপনের জন্যও সুপারিশ করা হয় ; যার জন্য, জিআইএস (GIS) এবং (SCADA) এসসিএডিএ হলো ভিত্তিপ্রস্তর। এগুলো গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুত সরবরাহ নিশ্চিতের পাশাপাশি পদ্ধতিতে অপচয়, চুরি এবং অপব্যয় হ্রাস করতে পারে। সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তর করারও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ কাজগুলো শুধুমাত্র ৮ম পরিকল্পনা নয় তৎপরবর্তীতেও চালিয়ে যেতে হবে।

এসডিজি অভীষ্ট-৭ এর সাথে সম্পর্কিত চাহিদা পূরণ করতে ২০২১-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিতরণ প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, জিআইএস (GIS) বাস্তবায়ন এবং (SCADA) এসসিএডিএ স্থাপন। তাছাড়া রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্যুতের ক্ষতিপূরণের জন্য ৩৬,৫৯০ এমভিএ সাবস্টেশন এবং ৯৫৫ এমভিএআর ক্যাপাসিটর ব্যাংক। এর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ ২০২১-২০২৫ অর্থবছরে মোট ১১৫০ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রাক্কলন করেছে ।

পল্লী বিদ্যুতের প্রবেশগম্যতা এবং সেবা প্রদানের উন্নয়ন: শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশনে বিনিয়োগ করে আসছে। এর অংশ হিসেবে, বিআরইবি (ইজঊই) সিস্টেম আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত তিনটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে: প্রি-পেমেন্ট ই-মিটারিংয়ের জন্য একটি প্রকল্প, ওভারলোডেডট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প এবং লাইন নির্মাণ ও গ্রাহক সংযোগের জন্য আরেকটি প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি ৩৮,৩৭৯ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ ও সংস্কার, ১৯৮ টি সাব-স্টেশন নির্মাণ/বৃদ্ধির পাশাপাশি ২১.৪ লক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযুক্ত করতে এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন ক্যাটাগরীর আওতায় ১০ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনে সহায়তা করবে।

উৎপাদন কেন্দ্রগুলোর পরিচালন দক্ষতার উন্নয়ন:

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও চলমান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুযায়ী, বিভিন্ন কারণে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা যে কোন বছরে উৎপাদিত সর্বোচ্চ বিদ্যুতের চেয়ে বেশি। এটি স্বীকৃত যে, দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের প্রায় ২০% অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকা উচিত। বাংলাদেশে এখন এটি ৩৩% এরও বেশি, যা অত্যধিক এবং এটি বিনিয়োগ ব্যয় ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যেকোন বছরে মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মধ্যকার এই বিশাল ব্যবধানের ফলে প্রাথমিক জ্বালানি বিশেষত গ্যাসের প্রাপ্তিতে ঘাটতি দেখা দেয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচী ও পরিচালনগত নানাবিধ সমস্যার সমন্বয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ প্রাথমিক জ্বালানির সময়মতো প্রাপ্যতা, দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলন এবং উন্নত পরিচালন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর উদ্দেশ্য হলো মোট উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মধ্যকার এই বিশাল ব্যবধান ২০৩১ অর্থবছর নাগাদ ৭০% এবং ২০৪১ অর্থবছর নাগাদ ৮০% এ কমিয়ে আনা, যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ ব্যয় এবং গড় বিদ্যুতের দাম কমিয়ে আনতে তা সহায়ক হয়। ৮ম পরিকল্পনায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর এই কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা হবে এবং একটি মূল লক্ষ্য

হবে পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের ওপর বাড়তি গুরুত্ব প্রদান করে বিদ্যুৎকেন্দ্রেগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করা। একটি উপযুক্ত পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করবে।

সরকার বুঝতে পেরেছে যে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে বরং এক ইউনিট সাশ্রয় করা সহজ এবং তাই বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ও পরিচালন দক্ষতা উন্নয়নে বেশ কয়েকটি নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতেও বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা ৮ম পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়িত হবে। এই লক্ষ্য পূরণের অংশ হিসেবে, সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ১৫% সাশ্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার ২০৩০ সাল পর্যন্ত জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ মহা পরিকল্পনা, জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬, জ্বালানি নিরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এবং সরবরাহ ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

ক্রয়পদ্ধতির উন্নয়ন: বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বৃহৎ উৎপাদন বৃদ্ধি কৌশল অর্জনে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে আগামী বছরগুলোতে বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। তাই, নতুন বিদ্যুৎ বিনিয়োগের যথাসময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ ক্রয় সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বৃহৎ আকারের বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তিগুলো সময়োপযোগী এবং দক্ষতার সাথে প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ক্রয়/চুক্তির দ্রুত সম্পাদন, সাশ্রয়ী ও দক্ষ অর্থায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করে এবং সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতে বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বৃহৎ বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। স্বচ্ছ ও দক্ষ ক্রয় ব্যবস্থাসম্পন্ন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বহুপাক্ষিক দাতা উৎস থেকে সাশ্রয়ী অর্থ প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইপিপি (IPP) এর জন্য আরও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি দক্ষ এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

প্রতিবেশীদের সাথে জ্বালানি বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা ও নিরীক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জ্বালানি চাহিদা সুরক্ষিত করতে আঞ্চলিক সুযোগগুলো ব্যপকভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। বাংলাদেশ ভুটান ও নেপালের জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে পারে। বাংলাদেশ নেপাল ও ভুটানের বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে এবং আন্তঃসীমান্ত বিদ্যুৎ বাণিজ্য চালু করতে পারে।

মূল্য নির্ধারণ নীতি এবং ব্যয় পুনরুদ্ধার: ব্যয়বহুল এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, সরকারি বিনিয়োগ অর্থায়ন করতে, ভোক্তাদের উচ্চমানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদান করতে, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি যথাযথ জ্বালানি মূল্য নীতি অত্যন্ত প্রয়োজন। বিইআরসি প্রতিষ্ঠা ও কার্যকার করা একটি প্রধান ইতিবাচক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, যা নিরপেক্ষভাবে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণে কাজ করছে। এটি ব্যয়ের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিক মূল্য সমন্বয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিযোগিতার অভাবে ব্যয়-ভিত্তিক মূল্য নির্ধারণ সর্বদা কার্যকর হয় না। ৮ম পরিকল্পনায় কয়েকটি বড় আকারের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি আমদানিকৃত এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ব্যয়হ্রাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। তবুও, অভ্যন্তরীণ গ্যাস এবং কয়লা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান এবং খনন করা না হলে, আমদানিকৃত এলএনজি (LNG) এবং কয়লার দামের অস্থিরতার কারণে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারণা করা যায়। বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে টেকসই হতে হবে এবং সম্পদ হতে যুক্তিসঙ্গত হারে আয় নিশ্চিত করতে হবে, যাতে বিশাল বিনিয়োগের আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত করা যায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বিদ্যুতের দাম এমনভাবে করতে হবে যাতে সংস্থাগুলো উৎপাদন ব্যয় পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং তাদের সম্পদ হতে যুক্তিসঙ্গত হারে আয় নিশ্চিত করতে পারে। প্রযুক্তি, পরিচালন দক্ষতা এবং জ্বালানি বাছাইয়ের নিরিখে উপরোল্লিখিত ন্যূনতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের ফলে এই মূল্যনীতিটি কার্যকর হবে এবং গ্রাহকের স্বার্থকে সুরক্ষিত করবে বলে আশা করা যায়। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার উপায় হিসেবে, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য যথাযথ জ্বালানি মূল্য নীতির ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করা যায়না বিধায় যথাযথ মূল্য নির্ধারণ ও আরোপের মাধ্যমে পরিষ্কার প্রযুক্তি গ্রহণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ডিমান্ড-সাইড ম্যানেজমেন্ট (DSM): জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিও উপায় হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে এটি সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে, যাতে বিদ্যমান জ্বালানি উৎপাদন থেকে সর্বাধিক সুবিধা লাভ করা যায়। ডিএসএম (DSM) বাস্তবায়িত হয় গ্রাহকদের জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাস পরিবর্তন, তাদের প্রাঙ্গনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দক্ষ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে এবং নতুন উৎপাদনে বিনিয়োগ ব্যয় ডিএসএম (DSM) বাস্তবায়ন ব্যয়ের চেয়ে অনেক বেশি, তাই সরকার সরবরাহ ও চাহিদা, উভয় ক্ষেত্রেই জ্বালানি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করবে। চাহিদা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিদ্যুতের সঠিক মূল্য নির্ধারণও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সাহায্য করবে। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, একটি সুনির্দিষ্ট ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট (DSM) নীতি সর্বোচ্চ চাহিদা কমাতে এবং কার্যকরভাবে লোডশেডিং নিয়ন্ত্রণে একটি কার্যকর ও ব্যয়সাশ্রয়ী উপায় হতে পারে।

জ্বালানি খাতে দক্ষতা আনার জন্য গঠিত স্রেডা (SREDA)-কে যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলো নিম্নরূপ: (১) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে (ক) জ্বালানি ব্যবস্থাপক এবং জ্বালানি নিরীক্ষক এর প্রত্যয়ন প্রক্রিয়া, এবং (খ) শিল্প ও নির্মাণ খাতে যে সকল গ্রাহক জ্বালানি ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেয়, জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জ্বালানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করে, বার্ষিক জ্বালানি প্রতিবেদন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্রেডার নিকট জমা দেয় এবং প্রতিনিয়ত জ্বালানি নিরীক্ষা বাস্তবায়ন করে, তাদের বৃহৎ জ্বালানি গ্রাহক হিসেবে সম্মাননা প্রদান; (২) জ্বালানি দক্ষতা লেবেলিং কর্মসূচি, যা বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত স্টার রেটিং প্রাপ্ত উচ্চ দক্ষতার পণ্য, প্রধানত গৃহস্থালি সরঞ্জাম, যেমন-এয়ারকন্ডিশনার, ফ্রিজ/ফ্রিজার, টিভি, মোটর, আলোকসজ্জা এবং ফ্যান বিক্রয়কে উৎসাহিত করবে; (৩) জ্বালানি দক্ষতা নির্মাণ কর্মসূচি, যা সরকারি ও বেসরকারি জ্বালানি দক্ষতা নির্মাণে উৎসাহিত করবে; (৪) সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, যা মানুষের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আনতে কাজ করবে, যাতে তারা জ্বালানি সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হয় এবং এভাবে একটি জ্বালানি সচেতন জাতি গঠণে সচেষ্ট হয়।

এ কর্মসূচিসমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট প্রণোদনা এবং প্রচারণা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনায় পছন্দসই করব্যবস্থা, ভর্তুকি এবং স্বল্প সুদের অর্থায়নসহ একাধিক প্রণোদনা প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সরকারের বিদ্যুৎ সংরক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সুস্পষ্ট আদেশেরস মাধ্যমে স্রেডা (SREDA)-কে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার জন্য জোর প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

৫.৩.২ প্রাথমিক জ্বালানি খাতের কৌশল

প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ

দেশের জ্বালানি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে একটি জাতীয় জ্বালানি নীতি (NEP) গ্রহণ করেছিল। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০০৮ সালে তা আবার সংশোধন করা হয়। এরপর ঘউচ আর হালনাগাদ করা হয়নি। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি সুনির্দিষ্ট গ্যাস খাত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়, কারণ বাংলাদেশে ধীরে ধীরে দেশীয় প্রাথমিক জ্বালানির ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে উচ্চমূল্যের আমদানিকৃত এলএনজি ও কয়লার ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই, সপ্তম পরিকল্পনার মতো অষ্টম পরিকল্পনায়ও জ্বালানি সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হবে, প্রাথমিক জ্বালানির দক্ষ সরবরাহ নিশ্চিত করা। সাশ্রয়ী ও দক্ষ প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন দেশীয় সরবরাহকৃত ও আমদানিকৃত জ্বালানির একটি বিচক্ষণ সংমিশ্রণ। আরেকটি কৌশল, যা সরকার অনুসরণ করতে চায় তা হলো নাগরিকদের খাঁটি জ্বালানি প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা। সরকারের কৌশলগত লক্ষ্য হলো, খাঁটি জ্বালানি ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার ২০১৯ অর্থবছরে ১৯% থেকে বৃদ্ধি করে ২০২৫ অর্থবছর নাগাদ ৩০% এ উন্নীত করা।

গ্যাস খাত নীতিমালা

বাংলাদেশ বর্তমানে "গ্যাস খাত মহাপরিকল্পনা ২০১৭ (চূড়ান্ত প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি ২০১৮)" গ্রহণ করেছে, যা পিএসএমপি (চঝগচ) ২০১৬ এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নীতিমালা, বিধিমালা এবং বিনিয়োগ চাহিদা নিরূপনসহ সামগ্রিকভাবে জ্বালানি খাত উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্লেষণাত্মক ভিত্তি তৈরি করেছে। তবে বাংলাদেশে এখনও সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত কোন গ্যাস খাত নীতিমালা নেই। ৭ম পরিকল্পনায় প্রাথমিক জ্বালানি খাতের জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিলো: ১) প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা উঋগ, ২) দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা (DSM), ৩) দেশজ কয়লা ব্যবহার; ৪) জ্বালানি আমদানি ৫) ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট এবং জ্বালানি সংরক্ষণ, ৬) উন্নত মানের চুলা (ICS); এবং ৭) জ্বালানি ভর্তুকি এবং মূল্য নির্ধারণ। ৮ম পরিকল্পনা সময়কালেও এগুলো অনুসরণ করা হবে ।

১) প্রাকৃতিক গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা: সীমিত দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার ৭ম পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ৮ম পরিকল্পনা কালে একটি গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালা গ্রহণ করবে। গ্যাস বরাদ্দ নীতিমালায় ইউনিট খরচ কমানোর লক্ষ্যে একই খাতের মধ্যেও অধিকতর জ্বালানি দক্ষ ব্যবহারকারীদের গ্যাস বরাদ্দের নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এই নীতিমালার একটি অংশ থাকবে গ্যাসের প্রিপেইড মিটার এবং এলপিজি (LPG) বিতরণ সংক্রান্ত। নীতিমালায় দেশজ গ্যাস ও সিএনজি এর ওপর চাপ কমিয়ে এলপিজি (LPG)-এর ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা এবং যুগপৎভাবে জ্বালানি ট্যারিফের (গ্যাস এবং এলপিজি) সংস্কার করা উচিত। এই ট্যারিফ এলিপিজি (LPG) এবং পাইপলাইন গ্যাসের মধ্যকার শুল্ক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে। বর্তমানে, এলপিজি (LPG) ব্যবহারকারীরা পাইপলাইনযুক্ত গার্হস্থ্য গ্যাসের চেয়ে ৯ গুণ বেশি শুল্কের (ক্যালরিফিক মূল্য অনুসারে) মুখোমুখি হচ্ছে, যেখানে একটি ১২.৫ কেজি ওজনের সিলিন্ডারের দাম পড়ে ১২০০ টাকা। গ্যাস ব্যবহার নীতিমালার মাধ্যমে পাইপলাইন প্রাকৃ

তিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে এলপিজি (LPG)-এর পাশাপাশি বায়োগ্যাসের ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। এলপিজি (LPG) ব্যবহার নীতিমালার ন্যায় বায়োগ্যাস ব্যবহার নীতিমালায় কীভাবে প্রাথমিক জ্বালানি, যেমন পাইপলাইন গ্যাস, এলপিজি (LPG) এবং বায়োগ্যাসকে সর্বোত্তম উপায়ে মিশ্রিত করা যায়, তা সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

২) দেশজ গ্যাস অনুসন্ধান নীতিমালা: বাংলাদেশে যেমন একদিকে এখনও অব্যবহৃত গ্যাস সম্পদ রয়েছে, অন্যদিকে সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ সহজতর করার জন্য এলএনজি (LNG) আমদানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য বর্তমানে প্রতিটি ৫০০ এমএমসিএফডি (MMCFD) ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি এলএনজি (LNG) এফএসআরইউ (FSRU) টার্মিনাল (এক্সেলারেট এবং সামিট) চালু আছে। এলএনজি (LNG) আমদানি ব্যয়ের চেয়ে অব্যবহৃত সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন ব্যয় কম হবে বলে আশা করা যায়। তাই অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের বিনিয়োগের দিকে নজর দেওয়া দরকার। তাছাড়া, অনাবিষ্কৃত সম্পদের অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য বাহ্যিক সংস্থানেরও প্রয়োজন হতে পারে। এ অনাবিষ্কৃত সম্পদ উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল বা গভীর সমুদ্র অঞ্চলে থাকতে পারে, যার জন্য প্রয়োজন উচ্চ প্রযুক্তি এবং বিশাল মূলধন। এ জাতীয় প্রযুক্তি ও আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য, বাপেক্স এবং বিদেশী সংস্থাগুলির মধ্যে যৌথ বিনিয়োগ বা কৌশলগত অংশীদারিত্বচ চুক্তি বা আইওসি (IOC)-র সাথে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি বিবেচনা করা যেতে পারে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিজয়ের সাথে সাথে গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধানের একটি নতুন সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। তাই গভীর সমুদ্রে হোক বা স্থলভাগে হোক উভয় ক্ষেত্রে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ।

৩) দেশজ কয়লা ব্যবহার: বাংলাদেশ বিটুমিনাস কয়লায় সমৃদ্ধ, যার সম্ভাব্য মজুদ মোট ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন। বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি, খালাসপীর, দিঘিপাড়া এবং জামালগঞ্জ নামে আবিষ্কৃত পাঁচটি কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল বড়পুকুরিয়া বর্তমানে উৎপাদনক্ষম। বড়পুকুরিয়ার সম্ভাব্য মজুদ ৩৯০ মিলিয়ন টন। এই খনি থেকে প্রতি বছর এক মিলিয়ন টন পর্যন্ত উৎপাদনের সক্ষমতা। বড়পুকুরিয়া থেকে উৎপাদিত কয়লার উত্তাপের মান বেশ ভাল, ৬,০৭২ কিলোক্যালরি/কেজি (২৫.৬৮মি.জু./কেজি) এরও বেশি। এই অতি উচ্চমানের কয়লা কোক কয়লা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে, বড়পুকুরিয়ার কয়লা, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ইটভাটার জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে, এই অতি উচ্চমানের কয়লার আরো দক্ষ ব্যবহারের জন্য তা উচ্চতর দক্ষ কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে (সুপার-ক্রিটিকাল বা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে) বা অত্যধিক জ্বালানি-নির্ভর শিল্পে যেমন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ৭ম পরিকল্পনায় যেরূপ প্রস্তাব করা হয়েছিলো, এই উচ্চমানের কয়লা উচ্চমূল্যের কোক কয়লা বা বাষ্প কয়লা হিসেবে রপ্তানির সুযোগ অনুসন্ধান করে বড়পুকুরিয়া কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কম মানের কয়লা আমদানি করা যুক্তিযুক্ত হবে। এই ধরণের ব্যবহার উচ্চতর মানযুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অবদান রাখবে, এবং তা ৭ম পরিকল্পনার প্রস্তাবনা মোতাবেক ইতোমধ্যে গৃহীত দেশজ কয়লা ব্যবহার নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

৪) জ্বালানি আমদানি

(ক) এলএনজি (LNG)/পাইপলাইন গ্যাস আমদানি: বাংলাদেশের এলএনজি (LNG) আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। ৭ম পরিকল্পনায় যেরূপ প্রস্তাব করা হয়েছিলো, অতি উচ্চ ইউনিট মূল্য হ্রাস করতে এবং দর কষাকষি করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য গ্যাস সরবরাহকারীদের মধ্যে বৈচিত্রতা আনয়ন এবং অন্য দেশের সাথে প্রাকৃতিক গ্যাস যৌথ-ক্রয়ের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি। বিশেষত, বাংলাদেশ বর্তমান উৎসগুলি ছাড়াও বিকল্প উৎস অনুসন্ধান করতে পারে। অতিরিক্ত ক্রয় শক্তি অর্জনের জন্য দেশজ সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সাথে সহ-ক্রয় চুক্তি প্রক্রিয়া অনুসরন করা যেতে পারে এবং চুক্তির আরও অনুকূল শর্তাবলী খোঁজার জন্য নিয়মিত চুক্তি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

(খ) কয়লা আমদানি: সরকার জ্বালানি মিশ্রণের অনুপাত পরিবর্তন করতে এবং কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশীয় কয়লার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জ্বালানির জন্য আমদানি করা কয়লা প্রয়োজন। এর জন্য দরকার হবে বিশাল বন্দর, রেল পরিবহন এবং কয়লা মজুদ করার সক্ষমতাসম্পন্ন অবকাঠামো। তবে, এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প মাতারবাড়ি দ্বীপে চালু রয়েছে, যা ৮০,০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নোংগর করাতে সক্ষম হবে। এটি বর্তমানে শুধুমাত্র মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিকাল কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য নিবেদিত। তবে অদূর ভবিষ্যতে, সরকার গভীর সমুদ্রবন্দরটির সম্প্রসারণ এবং কয়লা কেন্দ্রটিকে “এনার্জি হাব” হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

৫) ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট (DSM) এবং জ্বালানি সংরক্ষণ: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গ্যাসের সীমাবদ্ধতা এবং এর উচ্চমূল্য বিবেচনা করে গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য জোর প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণকে জরুরি নীতি হিসেবে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছিলো। এই নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো- কম দক্ষ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে অধিক

দক্ষ জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন; শিল্পে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ সংরক্ষণ প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান; এবং প্রত্যেক পরিবারের চুল্লি প্রতি মাসিক ফ্ল্যাট হারের পরিবর্তে গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ এবং মিটারিং এর মাধ্যমে গ্যাসের অপচয় হ্রাস। এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে গ্যাস সংরক্ষণের সম্ভাবনা বিপুল এবং নীতিগুলি বাস্তবায়নের খরচের তুলনায় গ্যাস সংরক্ষণের মূল্য অনেক বেশি।

৬) উন্নত চুলা (ICS): উপযুক্ত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে "উন্নত চুলা (ওঈঝ)"-এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সপ্তম পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয়েছিলো। এই প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল-কর সংক্রান্ত বাঁধা এবং ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, যে অভিজ্ঞতা দেশে সোলার হোম সিস্টেমস (SHS) বিতরণকালেও হয়েছিলো। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলমান প্রচেষ্টাসমূহ অষ্টম পরিকল্পনায়ও অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আর্থিক প্রণোদনা ও রেগুলেটরি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষ জোর দেয়া হবে।

৭) জ্বালানি ভর্তুকি এবং মূল্য নির্ধারণ: ৭ম পরিকল্পনার ন্যায় ৮ম পরিকল্পনায়ও জ্বালানি আমদানি আরও বাড়বে, মূলত বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, এলএনজি (LNG), কয়লা এবং তেল আমদানির কারণে। ফলস্বরূপ, জ্বালানিব্যয় আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়। আর তাই, বাজেটে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উচ্চ অগ্রাধিকার খাতে সরকার কী পরিমাণে জ্বালানি ভর্তুকি দিবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং দক্ষ জ্বালানির ব্যবহার, দুটোই নিশ্চিত করতে হলে ভর্তুকি নীতি, জ্বালানি নীতির সাথে সমন্বয় করা জরুরি।

৫.৩.৩ বিদ্যুৎ এবং প্রাথমিক জ্বালানির জন্য অর্থায়ন কৌশল

শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিশাল; এবং যখন এর সাথে সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যয় যুক্ত হয়, তখন তা একটি বড় অর্থায়ন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অষ্টম পরিকল্পনা সময়কালে বিদ্যুৎ খাতে প্রতি বছর জিডিপির ২% হারে মোট বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এমনকি বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বিদ্যুৎ আমদানির যথেষ্ট অবদানের পরেও, সরকারি খাতে প্রতিবছর গড়ে জিডিপির প্রায় ১.২% হারে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। প্রাথমিক জ্বালানিতে বিনিয়োগ (তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উন্নয়ন) মূলত আসবে বিদেশী বিনিয়োগ থেকে এবং প্রাথমিক জ্বালানিতে সরকারি বিনিয়োগ হবে পরিমিত। জ্বালানি খাতে মোট সরকারি বিনিয়োগ (বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি) হবে প্রতিবছর গড়ে জিডিপির প্রায় ১.৪%।

এই বৃহৎ অর্থায়নের চাহিদা মেটাতে এবং বাজেট বরাদ্দ প্রদানে, বিশেষত কোভিড ১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য খাতে এবং সামাজিক সুরক্ষায় বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে, জ্বালানি খাতের জন্য একটি শক্তিশালী অর্থায়ন কৌশল অপরিহার্য। এ কৌশল হবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পিপিপি (PPP) অর্থায়ন এবং ভর্তুকি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সমূহের একটি সমন্বয়। অষ্টম পরিকল্পনায় বিদ্যুতের ওপর আরোপ করা ভর্তুকি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। প্রাথমিক জ্বালানির জন্য অষ্টম পরিকল্পনাকালে ভর্তুকির মাত্রা জিডিপির প্রায় ০.২% এর মধ্যে রাখা হবে। ভর্তুকি রাখা হবে মূলত দরিদ্রদের জন্য এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচির সম্প্রসারণকে সমর্থন দেয়ার লক্ষ্যে। এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রাথমিক জ্বালানি তেলের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানির দাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করা। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরকার নিশ্চিত করবে যে বিদ্যুতের গড় মূল্য অন্তত যেন উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়।

৫.৩.৪ বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

অতীত সংস্কারসমূহ ভাল ফলাফল দিয়েছে। তবুও, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে: সক্রিয় লাইনের পাশাপাশি আনবান্ডলিং চালিয়ে যাওয়া, সঞ্চালন এবং বিতরণকে কর্পোরেটাইজেশন, পরিচালন দক্ষতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থাগুলোকে শক্তিশালীকরণ, বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বিদ্যুতের দাম ধীরে ধীরে উৎপাদন খরচের স্তরে উন্নীতকরণ এবং লাইসেন্স প্রদান, জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ, জ্বালানি দক্ষতাসহ উপযোগিতা কর্মদক্ষতার মান, এবং ভোক্তাদের সন্তুষ্টি/বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত এজেন্ডা সম্পাদনে বিইআরসি-কে শক্তিশালীকরণ। নতুন উৎপাদন সক্ষমতার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিষয়টিও বেশ চ্যালেঞ্জিং।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণ কৌশল (PSMP ২০১০) রয়েছে, যা ২০১১ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তথাপি PSMP ২০১৬ পুনর্বিবেচনা করা এবং এর সাথে বিগত ৪ বছরের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাসঙ্গিকতা যাচাই ও প্রাথমিক জ্বালানি খাতে বাস্তবতার নিরিখে উৎপাদন পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা দরকার। ৭ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে এবং

চাহিদার সম্ভাব্য পরিবর্তন, বিশেষত কোভিড পরবর্তী সময়ে চাহিদা নিরূপন এবং প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনও অনিশ্চয়তা থাকলে তা বিবেচনায় নিয়ে পিএসএমপি চঝগচ ২০১৬ সংশোধন করা প্রয়োজন। এই ফলাফলগুলোর ওপর ভিত্তি করে যেকোন বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা থাকা দরকার।

বিদ্যুৎ খাতের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বেশ কয়েকটি নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্রেডা (SREDA)- এর যথাযথ ভূমিকা পালন একটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হবে।

বিদ্যুৎ খাতটি একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন, সাধারণ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ হিসেবে নয়। অদক্ষ উচ্চ ব্যয়বহুল ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পেলে বিদ্যুৎ খাতের অর্থায়নে আরও উন্নতি হবে। তবুও, বিদ্যুৎ খাতে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতায় যথেষ্ট উন্নতি প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে বিদ্যুতের ব্যয়ও বাড়তে থাকবে। যদিও বিইআরসির (BERC) মাধ্যমে বিদ্যুতের অরাজনৈতিক মূল্য নির্ধারণ একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, তথাপি সেবার মানের যথাযথ উন্নতি না করে বিদ্যুতের দামের ক্রমাগত বৃদ্ধি বিদ্যুৎ খাত ও সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। পাবলিক ইন্টারফেস এবং ভোক্তা পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে এবং পরিষেবা মান, বিলিং ও পেমেন্টের ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আইনী কাঠামো সম্পর্কিত সংস্কার: কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত বিধি এবং তাদের দন্ড বিধান সম্পর্কিত সংশোধনী গ্রহণ করা যেতে পারে, যা গ্রাহকসেবার উন্নতি এবং ভক্তাদের নিকট মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলো স্থগিতকরণ এবং নিয়মিত সেগুলির পরিদর্শন নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি থাকাকালীন সময়ে এটি তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং এই কেন্দ্রগুলোর প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওঅ্যান্ডএম (O&M) এর জন্য আইনী কাঠামো অপর্যাপ্ত ছিল। এ সমস্ত কারণে, বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলো তাদের কাঙ্খিত স্তরে (বিদ্যুৎ উৎপাদন, তাপ দক্ষতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে) উৎপাদন করতে পারছেনা। যেহেতু বাংলাদেশের আইনে নিয়মিত পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা নেই, তাই বাজেট ঘাটতি বা নানা অজুহাতে পরিদর্শন স্থগিত করা হয়, ফলে অপরিকল্পিত এবং অনাকাঙ্খিত শাটডাউন ঘটে। তাই, পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত মানগুলিরও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে দুর্ঘটনাজনিত সমস্যা ও বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর এটি অর্জন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আইনী কাঠামোও থাকা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ এবং প্রাথমিক জ্বালানির প্রয়োজনগুলিকে সুসংগত করার জন্য কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা: বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সহায়তা দিতে প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা সঠিকভাবে প্রতিফলন করতে পারে, এমন একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। বিদ্যুৎ খাত এবং প্রাথমিক জ্বালানি খাত সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং কৌশল প্রণয়ন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দায়িত্ব। তবে, বাংলাদেশে সামগ্রিক জ্বালানি সরবরাহ এবং চাহিদা তদারকি করে, এমন কোনও সাংগঠনিক কাঠামো নেই। যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাসের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কিন্তু জ্বালানির চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকবে, তাই দেশটিকে আমদানি করা জ্বালানি উৎসের ওপর আরও নির্ভর করতে হবে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বিভিন্ন খাতের মধ্যে সীমিত দেশজ জ্বালানি কীভাবে বিতরণ করা হবে এবং কোন খাতে সরবরাহের জন্য কোন জ্বালানি কি পরিমাণে আমদানি করতে হবে তা নির্ধারণের জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্বালানি সরবরাহ পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব কমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জ্বালানি সরবরাহ পরিকল্পনাকে আরও সমন্বিত ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে। সুতরাং, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে নিয়ে উভয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

প্রমাণ-ভিত্তিক নীতি নির্ধারণের জন্য জ্বালানি খাতের উপাত্ত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনা'র পর্যায়ক্রমিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সামগ্রিক জ্বালানি নীতি প্রণয়নের জন্য তথ্যে আরো ভালো প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে জাইকা'র একটি দল বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল উপাত্তের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে "ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাটিস্টিকস ব্যুরো" প্রতিষ্ঠার পরামর্শ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিটি খাতে (আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি) কি পরিমাণে জ্বালানি (বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি, তেল জাতীয় পণ্য, জৈব জ্বালানি) ব্যবহৃত হচ্ছে, সে তথ্য তুলে ধরার মতো কোন একক সরকারি সংস্থা নেই। তাই, যখন গ্যাসের ঘাটতি দেখা দেয় এবং এমন চাহিদা বাড়তে থাকে, তখন আবাসিক খাত এবং পরিবহন খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন সরবরাহকে সীমাবদ্ধ করার মতো

পূর্ব পরিকল্পিত নয় এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা সমাধানের চেষ্টা করা হয়, যা এলপিজি (LPG) ব্যবহারের জন্য এই খাতগুলিকে প্রবৃত্ত করে। যদি এই ধারণাটি বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং চাহিদার দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ ব্যতিরেকে বাস্তবায়িত হয়, তবে তা এলপিজি (LPG) ক্রয়ে প্রভাব ফেলে, যা এলএনজির (LNG) চেয়ে ব্যয়বহুল বিধায় জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘমেয়াদে দেশব্যাপী জ্বালানি ভারসাম্য নিশ্চিত করতে সরকারকে জাতীয় জ্বালানি নীতিটি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা ও সমন্বিত করার জন্য আরও জোরালো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং ইএমআরডির (EMRD) আওতাধীন সংস্থাসমূহের সমস্ত উপাত্ত কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হলে, এটি করা সম্ভব।

৫.৩.৫ জ্বালানি খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

জ্বালানি খাতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। প্রাথমিক জ্বালানি সংক্রান্ত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়নের ওপর একটি দক্ষ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে। আমদানিকৃত প্রাথমিক জ্বালানির ওপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কারণে সর্বোত্তম মূল্য পেতে হলে এবং প্রাথমিক জ্বালানির সময়মতো সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে, বিশ্ব বিদ্যুৎ বাজার সম্পর্কে ভালো দক্ষতা এবং জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর তাই মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কারিগরি ও নেগোসিয়েশন দক্ষতার উন্নয়নে জোর দিতে হবে। দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান, আইওসি (IOC) বিনিয়োগের আলোচনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্মসূচির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ডিএসএম (DSM) উদ্যোগ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। উঝগ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য শিল্প ও পরিবহন খাতের সাথে যথাযথ সংলাপ ও সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রাথমিক জ্বালানিতে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। পিপিপি (PPP) কর্মসূচিগুলো এ জাতীয় অর্থায়নের একটি প্রধান উৎস হতে পারে। পিপিপি (PPP) প্রকল্প বাস্তবায়নে যে কোনও প্রকারের বাঁধা দূরীকরণে সচেষ্ট হতে হবে।

৫.৩.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জ্বালানি খাতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দ

জ্বালানি খাতের জন্য স্থির মূল্যে (২০২০/২১ মূল্যে) এবং চলতি মূল্যে এডিপি বরাদ্দ সারণি ৫.১৯ এবং সারণি ৫.২০ তে দেখানো হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় বরাদ্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি, যার জন্য যথেষ্ট বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি বিনিয়োগ প্রয়োজন, বিবেচনা করে, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতে স্থির মূল্যে এবং চলতি মূল্যে যথেষ্ট এডিপি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে আইপিপি (IPP) গুলিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং জ্বালানি খাতে ক্রমান্বয়ে এফডিআই (FDI) বৃদ্ধি বিবেচনা করেই এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ৫.১৯: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(বর্তমান মূল্য, বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২৪	অর্থবছর ২৫
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০.০	২৪.৭	২৮.৪	৩৩.২	৩৯.৮
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪৫.১	২৬৪.৫	৩৬২.৪	৪১৯.০	৫০২.৮
মোট	২৬৫.১	২৮৯.২	৩৯০.৮	৪৫২.২	৫৪২.৬

উৎস: অধ্যায় ৫, খন্ড ১, সংযুক্তি সারণি এ ৫.১

সারণি ৫.২০: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ
(২০২১ অর্থ-বছরের স্থিরমূল্যে, বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২১	অর্থবছর ২২	অর্থবছর ২৩	অর্থবছর ২৪	অর্থবছর ২৫
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২০.০	২৩.৪	২৫.৭	২৮.৬	৩২.৭
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৪৫.১	২৫১.০	৩২৭.৪	৩৬০.৭	৪১৩.২
মোট	২৬৫.১	২৭৪.৪	৩৫৩.১	৩৮৯.৩	৪৪৫.৯

উৎস: অধ্যায় ৫, খন্ড ১, সংযুক্তি সারণি এ ৫.২

খাত-৬:

পরিবহন ও যোগাযোগ

অধ্যায় ৬

পরিবহন ও যোগাযোগ উন্নয়ন কৌশল

৬.১ পর্যালোচনা

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির যুগে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও দক্ষ পরিবহন সেবা একটি প্রধানতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। আর একটি দেশে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবাণিজ্য এবং বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়ানোর ক্ষেত্রে এ প্রতিযোগী সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক উন্নয়নের ধরণ ও দারিদ্র্যের স্থানীয়করণের ক্ষেত্রেও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আর সেজন্যই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ ঘোষিত প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে একটি দক্ষ ও সাশ্রয়ী পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সাধন অন্যতম প্রধান নির্ধারকের ভূমিকা পালন করবে।

পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই বাংলাদেশ পরিবহন খাতে যুগান্তকারী প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। সার্বিকভাবে পণ্য পরিবহন খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.২ শতাংশ এবং যাত্রী পরিবহনে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এখন পর্যন্ত পরিবহন সেবার চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করা এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির নগরভিত্তিক শিল্প ও আধুনিক সেবাখাত নির্ভরতার দিকে ধাবিত হওয়ার বিষয়টি এ চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গতিসঞ্চারে ভূমিকা রাখছে। পরিবহনের ধরণ বিবেচনায় দেখা যায়, অন্তর্নিহিত কারিগরি ও বিনিয়োগ সুবিধার কারণে সড়ক পরিবহনের আওতা ও ব্যবহার অব্যাহতভাবে বাড়ছে এবং পরিবহন খাতে এটি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা ধরণ অনুযায়ী কয়েকটি মাধ্যমের সমন্বয়ে গঠিত। এসব ধরণের মধ্যে রয়েছে–রেলপথ, সড়ক ও মহাসড়ক, স্থলবন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌপথ, উপকূলীয় নৌপথ ব্যবস্থা এবং বিমানবন্দর ও উড়োজাহাজ সেবা। পরিবহন খাতে সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। মোট পরিবহনের ৯০ শতাংশই সংঘটিত হয় এ দুই মাধ্যমে। রেল যোগাযোগ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব যদিও কম নয়, তথাপি আগামী দিনগুলোতে সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা অধিকতর প্রভাবশালী পরিবহন মাধ্যম হিসেবে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৫৫ হাজার কিলোমিটার প্রশস্ত মহাসড়ক, দুই হাজার ৮৭৭ কিলোমিটার রেলপথ, তিন হাজার ৮০০ কিলোমিটার স্থায়ী নৌপথ (বর্ষা মৌসুমে এটি ছয় হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়), দুটি সমুদ্রবন্দর, তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) এবং আটটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

বাংলাদেশে পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত সরকারের ওপরই ন্যস্ত। এছাড়া বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতও সড়ক পরিবহন, রেলসেবা, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তবে সড়ক পরিবহন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতই নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যদিও সরকারি খাত এখনো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, তথাপি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি খাত এক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রুটে বিমান পরিচালনায়ও বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে রেলসেবা পরিচালনায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতের অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং উন্নত জীবনধারণের অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ও প্রতিশ্রুতিশীল পরিবহন নেটওয়ার্কের ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। সেজন্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। পরিবহন খাত নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ, টেকসই, নিরাপদ ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ন্যায্যতার ভিত্তিতে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন; পরিবহন খাতের একটি মাধ্যম অন্যটির যথোপযুক্ত সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করবে; এবং পরিবহনের একটি মাধ্যমের সঙ্গে অন্যটির সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে। পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা ও গুণগত মানোন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে এ খাতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রতিফলন নিশ্চিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিবহন সংযোগ নিশ্চিত করে দুটি সমুদ্রবন্দরের উন্নয়ন, দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে কার্যকর রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ

নৌযোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে দেশীয় পরিবহন অবকাঠামোর সংযোগ স্থাপনও সপ্তম পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এ সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর স্থলসংযোগ বৃদ্ধি করা ছিল পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ সময় রূপান্তরমুখী পরিবহন অবকাঠামো প্রকল্পের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছিল, যা দেশব্যাপী পণ্য ও সেবার বিস্তৃতি বাড়ানো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ত্বরান্বিতকরণ, পরিবহন ব্যয় কমানো ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এসব রূপান্তরমুখী প্রকল্পগুলো ছিল অত্যন্ত বিনিয়োগনির্ভর, যেগুলোর বাস্তবায়নে কয়েক বছর সময় প্রয়োজন ছিল এবং ব্যয় বৃদ্ধি প্রবণতা ও সময় ক্ষেপণ পরিহারের জন্য শক্তিশালী পরিবীক্ষণের প্রয়োজন হয়। ক্রমবর্ধনশীল নগরায়ণ ও নগর যানজটের বিষয়টি বিবেচনায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঢাকা ও এর সংযুক্ত এলাকার পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) বা মেট্রোরেল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এর অংশ হিসেবে গৃহীত এমআরটি-৬ (দেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল সংযোগ) ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। পরিকল্পনায় পরিবহনের বিভিন্ন ধরণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নেরও প্রয়াস ছিল। বিশেষ করে রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সেবার আওতা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। কারণ এ মাধ্যমগুলো অন্য মাধ্যমগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী ও অনেকটা পরিবেশবান্ধব। পর্যটনশিল্পের বিকাশে বিশেষ করে বিমান যোগাযোগের গুরুত্ব সপ্তম পরিকল্পনায় তুলে ধরা হয়েছিল। এক্ষেত্রে আন্তঃজেলা বিমান সংযোগ উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। সম্পদ সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধনে বিভিন্ন ধরণের গণপরিবহন সেবা ও অবকাঠামো ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের ফি ও মাশুল আদায়ের বিষয়েও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এসব ফি ও মাশুলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–সড়ক ব্যবহারের মাশুল, বন্দর ফি, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও রেলপরিবহনের ভাড়া।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাত নিয়ে বিভিন্ন কৌশল ও উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত প্রাজ্ঞভাবে বর্ণিত হয়েছে। পরিবহনের বিভিন্ন ধরণের মধ্যে আন্তঃসমন্বয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় মহাসড়কগুলোর উন্নয়ন, আন্তঃনগর সংযোগ জোরদার করা, আঞ্চলিক সংযোগ বাড়ানো, বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যক্রমের ব্যয় কমানো এবং পরিবহন নেটওয়ার্ক-সম্পর্কিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো পরিকল্পনায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সড়ক ব্যবহারের ওপর মাশুল আরোপ ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিষয়টিও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। একইভাবে পরিবহন সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনার কৌশলও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছিল।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে পরিবহন খাত বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তিতে সর্বোচ্চ প্রাধিকার পেয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনার কৌশল ও প্রাধিকার বিবেচনায় রেখেই প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলোর এডিপি বরাদ্দ নিশ্চিত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সড়ক পরিবহন ও সেতু খাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন অবকাঠামো যুক্ত হয়েছে। সকল ধরণের পরিবহন সেবার আওতা এ সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিমান পরিবহনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে অধিকাংশ বড় বড় শহর বিমান যোগাযোগের আওতায় চলে এসেছে। সপ্তম পরিকল্পনার অর্জনসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ভিত্তি রচনা করেছে।

৬.২.১ সড়ক পরিবহন খাতে অগ্রগতি

একটি উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক ত্বরিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম নিয়ামক। এটি একদিকে যেমন দুর্গম এলাকার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, তেমনি বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মতো সামাজিক অবকাঠামোয় মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে পিছিয়ে পড়া এলাকায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে।

মহাসড়ক ও জেলা সড়ক: দেশের মহাসড়কগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (RHD) দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ অধিদপ্তরের লক্ষ্য হলো–টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং সমন্বিত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করা এবং তার মাধ্যমে প্রত্যাশিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুপরিকল্পিত ও টেকসই সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২১ হাজার ৫৯৬ কিলোমিটার সড়ক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তন্মধ্যে ১৮ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬২ শতাংশ জেলা মহাসড়ক রয়েছে (সারণি: ৬.১)। সড়ক মহাপরিকল্পনা ২০১০-২০৩০-এর আলোকে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্যের বিস্তৃতর চেয়ে বিদ্যমান সড়কে যান চলাচল আরও সহজতর করাসহ আন্তঃনগর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সড়কে যান চলাচলের সক্ষমতা বাড়াতে এগুলো চার লেন ও ছয় লেনে উন্নীত করার পাশাপাশি স্থানীয় যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সড়ক নেটওয়ার্কের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ থেকে সর্বোচ্চ সুফল আহরণের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। সড়ক খাতের মেগাপ্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতির চিত্র বক্স ৬.১ তে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ৬.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন সড়কের ধরণ ও পরিমাণ (কি.মি.)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	জেলা সড়ক	মোট
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪২৮১	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৩৬	২২৩৬৩

সূত্র: www.rhd.gov.bd

বক্স ৬.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মেগা প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি

- ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের চার লেনে উন্নীতকরণ সম্পন্ন;
- ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা-টাঙ্গাইল চার লেন সড়কের কাজ সম্পন্ন হবে;
- এলেঙ্গা-রংপুর সড়কের নির্মাণকাজ চলমান;
- ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কাজ শুরুর অপেক্ষায়;
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) মদনপুর-জয়দেবপুর সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলমান;
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন;
- হাতিরঝিল-ডেমরা এক্সপ্রেওয়ের কাজ চলমান;
- গাবতলী-নবীনগর এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলমান;
- আশুগঞ্জ নৌবন্দর থেকে আখাউড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত মহাসড়ক; ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়ক এবং কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান;
- বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে পায়রা নদীতে চার লেনের সেতু নির্মাণকাজ চলমান;
- কালনা সেতুসহ ১৭টি স্থানে আন্তঃজেলা সড়ক নেটওয়ার্কের ওপর সেতু নির্মাণকাজ চলমান;
- বাংলাদেশ সেতু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ৮২টি সেতুর নির্মাণকাজ চলমান;
- বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩১৭ কিলোমিটার সীমান্ত সড়কের নির্মাণকাজ চলমান;
- ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন;
- ২০২০-২১ অর্থ-বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়কের (সিলেট-ভোলাগঞ্জ সড়ক) নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

সূত্র: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সেতু বিভাগ: এক হাজার ৫০০ মিটার বা তার চেয়ে দীর্ঘ সেতু ও টানেল, ফ্লাইওভার/ওভারপাস (উড়ালসড়ক), এক্সপ্রেসওয়ে, বাঁধসড়ক ও রিংরোডের মতো অবকাঠামো বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সেতু বিভাগ। উল্লেখ্য, এ খাতে বড় ধরণের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম, এমন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল বর্ণনা করা হয়েছিল। সেই কৌশলের আলোকে সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে–পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প; ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট; সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট; কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ; ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে এবং গাজীপুর থেকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত বিআরটি নির্মাণ (৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড সেকশন)। এর বাইরে উক্ত সময়ে ঢাকা শহরে পাতাল রেল (সাবওয়ে) নির্মাণ; পটুয়াখালী-আমতলি-বরগুণা সড়কে পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ; বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ; ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ; বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেঁতুলিয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ এবং বরগুণা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর ওপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

এ খাতে চলমান প্রকল্পগুলো ফাস্ট-ট্র্যাক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এগুলো ২০২২ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতু অবকাঠামো পদ্মা সেতুর কাজ ২০২১ সালের জুনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। দেশে নদীর তলদেশে প্রথম টানেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের (কর্ণফুলী টানেল) নির্মাণ কাজ ২০২২ সালের সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

গ্রামীণ সড়ক: গ্রামীণ ও শহুরে হাট-বাজারের সঙ্গে গ্রামীণ জনপদের সংযোগ স্থাপনের গুরুত্ব সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৫-২০২৫ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গ্রামীণ পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করেছে। এক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালে অর্জিত অগ্রগতি সারণি ৬.২-এ তুলে ধরা হয়েছে। বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলোর পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ঘটানোই ছিল এলজিইডির প্রধান লক্ষ্য। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রতিবছর গড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার সড়ক অধিকতর ভালো মানে উন্নীতকরণের পাশাপাশি ৩০ হাজার সেতু/কালভার্ট গ্রামীণ অবকাঠামোতে যুক্ত হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে গ্রামীণ সড়কগুলোর যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা মোকাবিলায় গ্রামীণ সড়কের মানোন্নয়নে এলজিইডির গুরুত্বারোপের বিষয়টি যথাযথ বলে প্রতীয়মান। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রামীণ সড়ক সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সারণি ৬.২: এলজিইডির অধীনে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের চিত্র

উপাদান	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯	মোট
মাটির রাস্তা (কি.মি.)	-	-	-	-	৩২৫০০
পাকা সড়ক (কি.মি.)	৪৮১৩	৫২২০	৫৩০০	৪৬৬৩	২১৭২১
সেতু/কালভার্ট (মি.)	২৮৫০০	২৯০০০	২৯৫০০	৯৯৩৩	৯৬৯৩৩

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলোর বিপরীতে সড়ক ও সেতু উপখাতের কর্মসম্পাদনের চিত্র সারণি ৬.৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে যে ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। সড়ক পরিবহন খাতে নিরাপত্তার উন্নয়ন সাধনেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সড়ক নিরাপত্তা দশক ২০১১-২০২০ (Decade of Action for Road Safety 2011-2020)-এর অংশ হিসেবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনা ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রধান পাঁচটি স্তম্ভ হলো–সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সড়ক ও যান চলাচল, নিরাপদ মোটরযান, সচেতন সড়ক ব্যবহারকারী এবং দুর্ঘটনা-পরবর্তী কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। তদানুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (RHD) জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (NRSSAP), ২০১৭-২০ প্রণয়ন করেছে। এসডিজিতে নির্ধারিত সড়ক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের সঙ্গে সংগতি বিধানের জন্য এ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যাহোক, এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও সড়ক ও মহাসড়ক উপখাতে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা একটা বড় বিষয়। এ সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণ ও ব্যয়বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে। সড়ক নিরাপত্তায় গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণি ৬.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৫/১৬-২০১৯/২০) সড়ক ও মহাসড়ক খাতের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত অগ্রগতি

ভৌত কার্যক্রম	পরিমাণ	সপ্তম পরিকল্পনার লক্ষ্য	অর্জিত অগ্রগতি
৪ লেন সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	৩০০	৩৯৩
৪ লেন ব্যতীত অন্য সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	৩৪০	৩৫০
সড়কের উন্নয়ন/পুনর্বাসন	কি.মি.	২,৫০০	৪৯২৫
ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ	মিটার	৭,০০০	৭৫৮০
সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ	মিটার	১৪,৮০০	২৪২৫৪
সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণ	মিটার	৬,৮০০	৬৮৩০

সূত্র: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৬.২.২ রেলসেবা খাতের অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেল যোগাযোগের উন্নয়নের বিষয়টিকে উচ্চ প্রাধিকার হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়। 'রেলপথ মহাপরিকল্পনা ২০১০-২০৩০'-এর আলোকে রেলসেবা খাতের বিনিয়োগ কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে প্রণীত এ মহাপরিকল্পনা ২০১৭ সালে হালনাগাদ করা হয়। 'জাতীয় সমন্বিত বহুমাত্রিক পরিবহন নীতি (NIMTP) ২০১৩' এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে রেলসেবা খাতে ৫ হাজার ৫৩৭ বিলিয়ন টাকা ব্যয়সংবলিত ২৩০টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। নতুন রেললাইন নির্মাণ, যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে কোচ ক্রয় এবং বিদ্যমান রেলস্টেশনগুলোর অধিতকর উন্নয়ন ও সংকেতদান পদ্ধতির উন্নয়নে এ বিনিয়োগ কাজে লাগানো হয়েছে। সেবা সরবরাহ বিবেচনায় দেখা যায়, উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মসম্পাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে (যাত্রী পরিবহন ও পণ্যসেবা উভয় ক্ষেত্রেই) (সারণি: ৬.৪)। তবে আর্থিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

সারণি ৬.৪: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রেলসেবার সার্বিক চিত্র

অর্থবছর	যাত্রী কি.মি. (মিলিয়ন)	পণ্য টন-কি.মি. (মিলিয়ন)	মোট পরিচালন রাজস্ব (মিলিয়ন টাকা)	মোট পরিচালন ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)
২০১৩-১৪	৮১৩৪	৬৭৭	৮০০০	১৬০১০
২০১৪-১৫	৮৭১১	৬৯৩	৯৩৫০	১৮০৮০
২০১৫-১৬	৯১৬৭	৬৭৫	৯০৪০	২২২৯০
২০১৬-১৭	১০০৪০	১০৫২	১৩০০	২৮৩৫০
২০১৭-১৮	১২৮৮৩	১২৩৬	১২৭৬০	২৯১৮০

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯

৬.২.৩ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (IWT)

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (IWT) অত্যন্ত জ্বালানিসাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী একটি পরিবহন মাধ্যম। কিন্তু সড়ক পরিবহন খাত বেশি মাত্রায় অগ্রাধিকার পাওয়ায় নৌ খাত এর সম্ভাবনা অনুপাতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। নদী ও খাল মিলে দেশে প্রায় ১৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ রয়েছে। এর মধ্যে বর্ষা মৌসুমে নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে ৫ হাজার ৯৬৮ কিলোমিটার। আর শুষ্ক মৌসুমে এ নৌপথের পরিমাণ নেমে আসে ৩ হাজার ৮৬৫ কিলোমিটারে।

বিদ্যমান নৌপথ নেটওয়ার্ক কেবল দেশের অভ্যন্তরের পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না, বরং এটি চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বর্ষা মৌসুমে যখন সড়কপথ দুর্গম হয়ে পড়ে, তখন দেশের মানুষের একটি বড় অংশের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয় নৌকা। এভাবে নৌপরিবহন খাত এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এবং পরিবহন খাতে যত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তার প্রায় ৫০ শতাংশই হয়েছে এ খাতে। দক্ষিণের উপকূলীয় যেসব এলাকায় সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা তেমন সুসংহত নয়, সেখানে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যমই নৌপরিবহন। সাম্প্রতিককালে এসব নৌপথ নানা ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে শুষ্ক মৌসুমে নৌ-চ্যানেলে পানির গভীরতা ও প্রশস্ততা কমে যাওয়া, চ্যানেলের তলদেশে পলি জমা, নৌরুটের পাড় ভাঙন, নৌযান থেকে সহজে পণ্য নামিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা ও নৌযান ল্যান্ডিং স্টেশনের সঙ্গে উপযুক্ত সড়ক সংযোগ না থাকা।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের ব্যাপক সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরকার ২০০৯ সালে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ মহাপরিকল্পনায় নৌপরিবহন খাতের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং সংস্কার ও বিনিয়োগ প্রস্তাবের সমন্বিত রূপদান করা হয়েছিল। তবে সে মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন খুব বেশিদূর এগোয়নি। সে প্রেক্ষিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে বিভিন্ন ধরণের সংস্কার আনার বিষয়ে জোরালোভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। এ সংস্কারের ক্ষেত্রে সপ্তম পরিকল্পনায় চারটি প্রধান উপাদানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো–নতুন নতুন নৌরুট সৃষ্টি ও বিদ্যমান রুটগুলোর উন্নয়ন; বাল্ক কার্গো ও কন্টেইনার খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাট ও নৌবন্দর স্থাপন এবং সেগুলোর যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর জোর দেয়া; অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংক্রান্ত সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং সমুদ্রবিজ্ঞানের বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সহজীকরণ। তবে নানা ধরণের সীমাবদ্ধতার কারণে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদকালে এসব কৌশলের বাস্তবায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এসব সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে সম্পদের অপর্যাপ্ততা, নৌরুটগুলোর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজিংয়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডে সমন্বয়ের ঘাটতি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলার পাশাপাশি পরিবহন খাতের নানা মাধ্যমের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহন ব্যয়হ্রাসকরণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

৬.২.৪ সামুদ্রিক পরিবহন উপখাতের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান ননফ্যাক্টর পরিষেবা (NFS) হিসেবে সামুদ্রিক পরিবহন খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে রপ্তানি আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের এনএফএস হিসেবে ঘাটতি বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক কার্গো জাহাজ পরিষেবার আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ এ ঘাটতি কমিয়ে আনতে পারে। এ খাতে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফার হার খুবই ভালো। নৌপরিবহন অধিদপ্তর জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। নৌপরিবহন অধিদপ্তর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ। এটি দেশের নৌ-সংক্রান্ত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করে থাকে। এ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্থাটি সমুদ্রে চলাচলকারী মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তবে পরিচালনগত দিক বিবেচনায় দেশের সিংহভাগ জাহাজ ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)। এটি বাংলাদেশের একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। তবে সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনায় বেসরকারি খাতও যুক্ত আছে। বিএসসির মালিকানায় বেশকিছু জাহাজ ও অয়েল ট্যাংকার রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনের তাগিদে নানা সময়ে সংস্থাটি সমুদ্রগামী জাহাজ ভাড়া নেয়। তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য রপ্তানি পণ্য পরিবহনে এসব জাহাজ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি করা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও ভোগ্যপণ্য পরিবহনেও এগুলো ব্যবহৃত হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাহাজশিল্পের সক্ষমতা বাড়ানো, অটোমেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধন এবং এ খাতের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পকিল্পনার শুরুর বছর ২০১৫ অর্থবছরে এ খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৯ অর্থবছরে যা ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। তবে এ আয় এ খাতের সম্ভাবনার তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া বিদেশে পণ্য পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ অন্য দেশের জাহাজ কোম্পানিগুলোকে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে, তার সঙ্গে বাংলাদেশের জাহাজশিল্পের অর্জিত অর্থের ব্যবধান ব্যাপক। এ খাতে অর্থ উপার্জন কম হওয়ার প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে জাহাজের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা, জাহাজশিল্পে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতার অপর্যাপ্ততা, কর্মী স্বল্পতা এবং ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা।

সারণি ৬.৫: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নৌপরিবহন খাতের কর্মসম্পাদনের চিত্র

উন্নয়ন কার্যক্রম	সপ্তম পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য	সপ্তম পরিকল্পনাকালের অর্জন
জাহাজ ক্রয়	এ সময়কালে ছয়টি নতুন জাহাজ ক্রয় করা হয়েছে (তিনটি নতুন তেলবাহী জাহাজ এবং প্রতিটি ৩৯ হাজার ডিডব্লিউটি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার)	এ ছয়টি জাহাজেরই নির্মাণ, উদ্বোধন ও সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে
সেলুলার কন্টেইনার ক্রয়	প্রতিটি ৯০০-১২০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতার চারটি সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।	ডেনমার্কের ঋণ সহায়তায় জিটুজি ভিত্তিতে সে দেশ থেকে প্রতিটি ১২০০-১৫০০ টিইইউএস ধারণক্ষমতার চারটি সেলুলার কন্টেইনার জাহাজ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম	সপ্তম পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য	সপ্তম পরিকল্পনাকালের অর্জন
সামগ্রিক কার্যক্রম কম্পিউটারভিত্তিক পদ্ধতিতে সম্পাদন	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (BSC) সামগ্রিক কার্যক্রম কম্পিউটারভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে।	বিভিন্ন পর্যায়ে বিএসসির সার্বিক কার্যক্রমের কম্পিউটারভিত্তিক অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। যেমন- i) ই-নথির বাস্তবায়ন ii) অনলাইনের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ বিতরণ (BEFTN) iii) অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ iv) ডিজিটাল হাজিরা বহি চালু করা
আন্তর্জাতিক জাহাজ সেবা থেকে আয়ের প্রবৃদ্ধি	আয়ের লক্ষ্য নির্ধারিত নয়।	প্রতিবছর জাহাজশিল্পের আয় আট শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ অর্থবছরে এ খাতে আয় ছিল ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯ অর্থবছরে তা ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়।

সূত্র: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

৬.২.৫ বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে অগ্রগতি

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জনশক্তি রপ্তানি ও পর্যটনশিল্পের বিকাশের হাত ধরে গত দুই দশকে উড়োজাহাজ সেবার চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) বিমান চলাচল সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বিমান চলাচলের বিভিন্ন রুট নির্ধারণসহ উড়োজাহাজ সেবা-সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে সংস্থাটি। সংস্থাটি বর্তমানে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সাতটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং দুটি খণ্ডকালীন উড্ডয়ন ও অবতরণ বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

ঢাকায় অবস্থিত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম বিমানবন্দর। এ বিমান বন্দরের মাধ্যমে দেশের মোট বিমান যোগাযোগের ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিমানবন্দরটির বছরে ৮০ লাখ (আট মিলিয়ন) যাত্রীর সেবা দেয়ার সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে এটির সক্ষমতার পুরোটাই ব্যবহৃত হচ্ছে। গত তিন বছরে বিমানবন্দরটিতে উড়োজাহাজ চলাচল আট শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে ১৩.০৯ মিলিয়ন যাত্রী উক্ত বিমানবন্দর ব্যবহার করেন এবং ০.৪১২ মিলিয়ন টন পণ্য এটির মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। বিমানবন্দরটিতে দৈনিক গড়ে ২৬০টি ফ্লাইট ওঠানামা করে। অভ্যন্তরীণ বেসরকারি উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোকে এ বিমানবন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার ফলে আয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বিমান সেবার মান ও ফ্লাইটের ঘনত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে বিমান সেবার চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিমানবন্দরের বিদ্যমান টার্মিনাল ও রানওয়ে এ৩৮০ অথবা বি৭৪৭-৮এফ উড়োজাহাজের উপযোগী নয়। ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলা ও কোড এফ সিরিজের উড়োজাহাজের (এ৩৮০, বি৭৪৭-৮এফ) উপযোগী করে তুলতে শাহজালাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বিমানবন্দরের পরিচালন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সাধন ও নতুন বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এ কৌশলে যেসব উপাদান অন্তর্ভূক্ত ছিল তার মধ্যে রয়েছে (i) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালন সক্ষমতা বৃদ্ধি; (ii) প্রশস্ত আকৃতির জেট বিমান ওঠা-নামার সুবিধা যুক্ত করে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপদান; (iii) চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (SAIA) কার্গো সুবিধার সম্প্রসারণ; (iv) শাহ আমানত বিমানবন্দরের রানওয়ে অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ; (v) সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (OIA) রানওয়ে শক্তিশালীকরণ; (vi) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে একটি বিমানবন্দর নির্মাণ; (vii) উপকূলীয় অঞ্চলের বিমানবন্দরগুলোর সঙ্গে রাজধানী ঢাকার বিমানবন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং (viii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (BSMIA) নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন করা।

সপ্তম পরিকল্পনাকালে বিমানবন্দর খাতের উন্নয়নে মিশ্র ফলাফল লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে নতুন বিমানবন্দর স্থাপনে। তবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে এবং এর লেআউট সুবিধা ও সেবার মান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে কার্গো খালাস সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিমান চলাচল ব্যবস্থাপনার মান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরের আধুনিকায়নেও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলোর সুবিধাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেখানে ক্রমবর্ধমান বিমান ফ্লাইট ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোর জন্য প্রদেয় সেবার মানে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ সুবিধার অধিকতর উন্নতির পাশাপাশি

আন্তঃজেলা ফ্লাইট ব্যবস্থাপনা সেবারও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম এখনো সম্পন্ন হয়নি এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তরের প্রক্রিয়াও মন্থর। এছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়নি।

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রধানত যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে- সংগ্রহ কার্যক্রমে জটিলতা, প্রকল্পে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা; বিশেষ করে বৈদেশিক লেনদেন সম্পন্নে দেনদরবারের ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা প্রকট। জাতীয় উড়োজাহাজ সংস্থা ও বাংলাদেশ বিমানের সেবাদানের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেলেও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী উড়োজাহাজ সংস্থা বিশেষ করে কাতার এয়ারওয়েজ, এমিরেটস ও থাই এয়ারওয়েজের তুলনায় এ সক্ষমতা এখনও অনেক কম। ফলে বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আহরণ সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম।

৬.২.৬ সমুদ্রবন্দর উপখাতে অগ্রগতি

দেশের উন্নয়নে সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভর করে সমুদ্রকেন্দ্রিক বাণিজ্যের ওপর। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট সমুদ্রভিত্তিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৪৫ মিলিয়ন টন, যা প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মংলা–কেবল এ দুটি বন্দরই বাংলাদেশের সমুদ্রভিত্তিক বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যম। তবে তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ: চট্টগ্রাম বন্দর দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর এবং এটির মাধ্যমেই দেশের সমুদ্রভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৯২ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বন্দর হিসেবে এটি মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে দেশের স্থল ও সমুদ্র পরিবহনের সংযোগস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। অদূর ভবিষ্যতে এ বন্দর প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান ও ভারতের পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক ট্রানজিট হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (CPA) কার্গো ও কন্টেইনার খালাস-বোঝাই সেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে এবং বন্দরে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পারিচালিত হয়েছে (সারণি ৬.৬)। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে কর্ণফুলী চ্যানেলে কাপিটাল ড্রেজিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং পরিচালনা করেছে।

সারণি ৬.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাফিক কর্মসম্পাদনের চিত্র

অর্থবছর	প্রত্যাশিত ট্রাফিক				প্রকৃত ট্রাফিক সংখ্যা			
	আমদানি (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	রপ্তানি (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	কন্টেইনারের সংখ্যা (TEUS)	আমদানি (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	রপ্তানি (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	মোট (মিলিয়ন মেট্রিক টন)	কন্টেইনারের সংখ্যা (TEUS)
২০১৫-১৬	৪৬.৬৭	৬.০৪	৫২.৭১	২,০৫১,৭৫৯	৫৮.৩২	৫.৯৭	৬৪.২৯	২,১৮৯,৪৩৯
২০১৬-১৭	৪৯.৪৫	৬.৩৫	৫৫.৮০	২,২৫৬,৯৩৫	৬৬.৪৬	৬.৭১	৭৩.১৭	২,৫০৪,৪৭৬
২০১৭-১৮	৫২.২৩	৬.৬৪	৫৮.৮৭	২,৪৮২,৬২৯	৭৮.০৫	৭.০০	৮৫.০৫	২,৮০৯,৩৫২
২০১৮-১৯	৫৪.৭৬	৬.৯৪	৬১.৭০	২,৭৩০,৮০১	৮৩.১১	৬.৮৫	৮৯.৯৬	২,৯১৯,০২৩
২০১৯-২০	৫৭.০০	৭.২৪	৬৪.২৪	৩,০০৩,৯৮১	--	--	--	--

সূত্র: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্প্রসারণের কৌশল নেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে বড় ধরণের অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। এ সময়কালে বন্দর কর্তৃপক্ষ কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ে ১৫০টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। এসব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ১০টি বড় ধরণের ক্রেন, যেগুলো জাহাজ থেকে পণ্য খালাসে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা বন্দরের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ভূমিকা রাখছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কন্টেইনার খালাসের সক্ষমতা ৩৭ হাজার টিইইউস (TEUS) থেকে ৫০ হাজার টিইইউএসে উন্নীত হয়েছে, যার মাধ্যমে বাণিজ্য ত্বরান্বিত হচ্ছে। এছাড়া সরকার ও বন্দর কর্তৃপক্ষ বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD) প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ যোগাচ্ছে, যার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে যাচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারি পর্যায়ে দুটি আইসিডি প্রতিষ্ঠি হয়েছে। বর্তমানে বেসরকারি খাতে মোট ১৮টি আইসিডি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এ সময়ের মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম দক্ষিণে কুতুবদিয়া এবং উত্তরে সীতাকুণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। প্রয়োজন অনুযায়ী, লজিস্টিক সেবা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি টাগবোট (3200 BHP), একটি সমুদ্রগামী ও অপেক্ষকৃত কম সক্ষমতার হার্বার টাগবোট (2000 BHP) এবং দুটি মুরিং লঞ্চ ক্রয় করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর চ্যানেলের গভীরতা (ড্রাফট)-এর সীমা ৯.১৪ মিটার থেকে ৯.৫ মিটারে উন্নীত করেছে। আর চ্যানেলের সর্বনিম্ন প্রশস্ততার মাত্রা ১৮৬ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৯০ মিটারে উন্নীত করেছে। পরিচালন সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এ সময় বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন (CFS) শেড, একটি কার পার্কিং শেড এবং একটি কাস্টমস নিলাম শেড নির্মাণ করেছে। পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল (PCT)-এর নির্মাণকাজ বর্তমানে চলমান এবং ২০২১ সালের জুনের মধ্যে এটি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের অন্যতম পরিকল্পনা ছিল বন্দরের ইয়ার্ড সুবিধার সম্প্রসারণ করা। বে-টার্মিনালের কাছে অধিগ্রহণ করা ভূমিতে এ প্রকল্পের অবস্থান। এছাড়া জাপানের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার মহেশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কয়লা খালাসের জেটি এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নাধীন মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে এটি এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে অবস্থান করছে (সারণি ৬.৭)। সার্বিকভাবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্জন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যান্য সংস্থা (SOEs)-এর জন্যও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

সারণি ৬.৭: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জিত আর্থিক সাফল্য

বছর	খালাস করা জাহাজের সংখ্যা	রাজস্ব আয় (বিলিয়ন টাকা)	রাজস্ব ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	উদ্বৃত্ত রাজস্ব (বিলিয়ন টাকা)
২০১৫-১৬	২৮৭৫	২০.৩	১০.৭	৯.৬
২০১৬-১৭	৩০৯২	২৪.১	১৩.৫	১০.৬
২০১৭-১৮	৩৬৬৪	২৬.৬	১৩.৯	১২.৭
২০১৮-১৯	৩৬৯৯	২৯.৩	১৫.৯	১৩.৪

সূত্র: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ: দেশের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার হিসেবে মোংলা একটি পরিবেশবান্ধব সমুদ্রবন্দর। বন্দরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় লোনাপানির বন (ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট) সুন্দরবন দ্বারা বেষ্টিত। ১৯৫০ সাল থেকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি আন্তর্জাতিক বন্দর হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এখনও এটি বেশ সম্ভাবনাময় একটি বন্দর এবং এ বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, নেপাল, ভুটান এবং সংলগ্ন ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় বাণিজ্য সহজীকরণে এ বন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে মোংলা বন্দরকে জাহাজ নোঙরের বিকল্প রুট হিসেবে কাজে লাগাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বড় জাহাজ বন্দরে নোঙরের উপযোগী চ্যানেল সৃষ্টিতে বড় ধরণের ড্রেজিং করার পাশাপাশি নাব্যতা সংকটের সমাধান করা হয়েছে। ফলে বন্দরের বহির্নোঙর চ্যানেল পশুর নদীতে পানির গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে বর্তমানে ১০ মিটারেরও বেশি ড্রাফটের জাহাজ এ বন্দরে নোঙর করতে পারে। উল্লিখিত বিনিয়োগের ফলে বন্দরটির কর্মচাঞ্চল্য ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে কার্গো খালাস কার্যক্রম প্রতিবছর ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে এখানে ১১.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য খালাস হয়েছিল, পাঁচ বছর আগে যা ছিল মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ: 'পায়রা বন্দর আইন, ২০১৩'-এর ভিত্তিতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার রামনাবাদ চ্যানেলের উপকণ্ঠে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে পায়রা বন্দর স্থাপিত হয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ বন্দর স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। কিছু মৌলিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার পর ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট পায়রা বন্দরে সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় অভ্যন্তরীণ নৌপথের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন করা হয়। বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা নিশ্চিত করতে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ৪৮ একর আয়তনবিশিষ্ট একটি ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইয়ার্ডটি একটি লেন সড়কের মাধ্যমে জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত। সার্ভিস

ইয়ার্ডটিতে রয়েছে আরসিসি সার্ভিস জেটি, কর্মসহায়ক বিভিন্ন ভবন, পানি শোধনাগার, ওয়্যারহাউস প্রভৃতি। বন্দরের প্রধান প্রধান অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য ৬ হাজার ৫০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ১০০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং সম্পন্ন করার পাশাপাশি তিনটি টার্মিনালে ১০.৫ মিটার গভীরতাবিশিষ্ট ১২টি নোঙর চ্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে পায়রা একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রয়্যাল হ্যাসকনিং ডিএইচভি নামের একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত 'জাহাজ চলাচল পূর্বাভাস সমীক্ষা প্রতিবেদন' অনুযায়ী পায়রা সমুদ্রবন্দরে পণ্য খালাস ২০২১ সালের ১১.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৩৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে উন্নীত হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনামাফিক দ্বিতীয় ধাপের ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের পর ২০৩৫ সাল নাগাদ পায়রা বন্দর ১৪.০ মিটার গভীরতাসম্পন্ন চ্যানেল সুবিধা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এতে করে বন্দরটির পণ্য খালাস সক্ষমতা ৮৯.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন বা ৫.১ মিলিয়ন টিইইউএস কন্টেইনারে উন্নীত হবে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA)

'বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১'-এর ভিত্তিতে একটি সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BLPA) প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল স্থলবন্দরগুলোর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। ২০০১ সালে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তার কার্যক্রম শুরু করে। এর পরে আরও ১২টি স্থল শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে দেশে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি। এগুলোর মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারি, তামাবিল, নাকুগাঁও ও সোনাহাট স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর পরিচালিত হচ্ছে বিল্ড অপারেট ট্রান্সফার (BOT) ভিত্তিতে। বাদবাকি স্থলবন্দরগুলোর কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ চলমান আছে। অবশিষ্ট স্থলবন্দরগুলোও সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও পরিচালনা করা হবে।

ভারতের সঙ্গে স্থলবন্দরভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন সেবাদান কার্যক্রমের মানোন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, দক্ষতার উন্নয়ন এবং সেবাসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সময় সাশ্রয়ী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে স্থলবন্দরের সক্ষমতা উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। ১১০ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাহাট ও তামাবিল স্থলবন্দরের উন্নয়ন করা হয়েছে এবং এগুলো পরিচালন কার্যক্রমও শুরু করেছে। এছাড়া এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তার সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল ও বুড়িমারি স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক গুদামঘর (ওয়্যারহাউস) নির্মাণ, পণ্য স্থানান্তর শেড নির্মাণ, সড়ক ও ইয়ার্ডের উন্নয়ন সাধন এবং নর্দমা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংযোগ ও বাণিজ্য বাড়াতে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৬৯৩ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় শেওলা ও রামগড় স্থলবন্দরের উন্নয়ন এবং ভোমরা ও বেনাপোল স্থলবন্দরের আওতা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। চলমান এ প্রকল্পটি ২০২৩ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অন্যান্য স্থলবন্দরের মানোন্নয়নেও উদ্যোগ নিয়েছে। আর স্থলবন্দরগুলোয় ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনে এরই মধ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থলবন্দরগুলোর মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা নেয়ার ফলে এর মাধ্যমে বাণিজ্য (আমদানি-রপ্তানি) ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি হয়েছিল ৩৪ লাখ ২৬ হাজার টন পণ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা দুই কোটি ১৬ লাখ ৬৩ হাজার টনে উন্নীত হয়। এক্ষেত্রে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ২৯ শতাংশ। ২০০৮-০৯ সময়ে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি ৭৪ লাখ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যা ২১০ কোটি ৯৩ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। এ সময়ে প্রতিবছর গড়ে ৩১.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

৬.২.৭ নগর পরিবহন

গত কয়েক দশকে দ্রুত নগরায়ণের ফলে বাংলাদেশে নগর পরিবহনের চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহরাঞ্চলের সড়কে মোটরচালিত ও মোটরবিহীন যানবাহনের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক সুবিধা বৃদ্ধির তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং নগরীর পরিবেশেরও মারাত্মক অবনমন হচ্ছে। নগরায়ণের প্রক্রিয়া চলমান থাকায়

যানজট ও পরিবেশের ক্ষতির এ প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলেই প্রতীয়মান। শহরাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে সড়ক পরিবহন। তবে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) সুবিধা না থাকায় প্রায় সকল নগর এলাকায়ই যানজটের সমস্যা বিদ্যমান। ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে বেশি যানবাহন-সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন। একই সড়কে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিকসহ নানা ধরণের যান চলাচলের সুযোগ থাকায় সড়কে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেয়। ফলে বিদ্যমান পরিবহনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা ম্লান হয়ে পড়েছে।

নগরের পরিবহনগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ মেয়াদকালে বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) 'সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP)' প্রণয়ন করেছিল। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার মারাত্মক যানজট নিরসনে আরএসটিপি পরিকল্পনায় বেশকিছু দ্রুতগতির রেল ট্রানজিট (MRT) ও বাস ট্রানজিট (BRT) চালু করার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। তদানুযায়ী ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকার যানজট নিরসনে মেট্রোরেল পরিচালনায় মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি (DMTCL) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০ প্রণয়ন করেছে, যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি (DMTCL)। পরিকল্পনার আওতায় ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যাতায়াতের জন্য ডিএমটিসিএল ছয়টি মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT) বা মেট্রোরেল লাইন নির্মাণ করবে। এগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য হবে ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৬৭.৫৭ কিলোমিটার হবে ভূ-উপরিস্থ উড়াল অবকাঠামো, আর ৬১.১৭ কিলোমিটার হবে ভূগর্ভস্থ মেট্রোলেন। মেট্রোরেলের মোট স্টেশন হবে ১০৪টি। এর মধ্যে ৫১টি হবে এলিভেটেড পিলারের ওপরে এবং ৫৩টি হবে ভূগর্ভে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের প্রথম মেট্রোরেল যেটি এমআরটি লাইন-৬ হিসেবে পরিচিত, তা ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এর বাইরে আরও চারটি এমআরটি লাইনের (লাইন-১, লাইন-৫: উত্তর রুট, লাইন-৫: দক্ষিণ রুট এবং লাইন-২) নির্মাণকাজের বেশ অগ্রগতি হয়েছে (সারণি ৬.৮)। এছাড়া প্রস্তাবিত তিনটি বিআরটির মধ্যে প্রথমটির কাজ শুরু হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা বাড়ানো এবং যানবাহন আইন ও বিধি বাস্তবায়নেও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এর বাইরে সেতু বিভাগ পুরো ঢাকা শহরকে যোগাযোগের আওতায় আনার লক্ষ্যে ২৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সাবওয়ে নির্মাণের বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের জুনের মধ্যে এ সমীক্ষা সম্পন্ন হবে। যানবাহন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

সারণি ৬.৮: ঢাকা মহানগরে মেট্রোরেল স্থাপন কার্যক্রমের অগ্রগতি

এমআরটি/ বিআরটি	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	ধরণ	সম্পন্নের সময়কাল	প্রকল্পের হালনাগাদ অবস্থা	অর্থের সংস্থান
এমআরটি লাইন-৬	২০.১০	উড়াল	২০২২	নির্মাণাধীন	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার
এমআরটি লাইন-১	৩১.২৪১	উড়াল (১১. কি.মি.)	২০২৬	বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন চলমান	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার
		ভূগর্ভস্থ (১৯.৮৭২ কি.মি.)			
এমআরটি লাইন-৬: উত্তর রুট	২০.০০	উড়াল (৬.৫০ কি.মি.)	২০২৮	মৌলিক নকশা প্রণয়ন চলমান	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার
		ভূগর্ভস্থ (১৩.৫০ কি.মি.)			
এমআরটি লাইন-৬: দক্ষিণ রুট	১৭.৪০	উড়াল (৪.৬০ কি.মি.)	২০৩০	পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
		ভূগর্ভস্থ (১২.৮০ কি.মি.)			
এমআরটি লাইন-১	২৪.০০	উড়াল (১৫.০০ কি.মি.)	২০৩০	বিস্তারিত সমীক্ষা চলমান	পিপিপি পদ্ধতিতে জি২জি (জাপান) মাধ্যমে (মারুবেনি কর্পোরেশন)
		ভূগর্ভস্থ (০৯.০০ কি.মি.)			
এমআরটি লাইন-১	১৬.০০	উড়াল	২০৩০	চলমান	পিপিপি পদ্ধতিতে জি২জি মাধ্যমে
মোট	**১২৮.৭৪১ [উড়াল ৬৭.৫৭ কিমি এবং ভূগর্ভস্থ ৬১.১৭ কিমি কিমি]**				

সূত্র : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ও www.dmtcl.gov.bd

৬.২.৮ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতের কতিপয় ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ

এ সময়কালে পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়নে বেশ অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষ করে সড়ক নেটওয়ার্ক, সমুদ্র ও স্থলবন্দর ও রেলপথ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে। তবে অভ্যন্তরীণ নৌপথ, বিমানবন্দর ও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল কিছুটা ধীর। মূলত পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করায় এ অগ্রগতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। পরিবহন অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করায় অর্থায়নের বিষয়টি কোনো প্রকার বাঁধা হিসেবে কাজ করেনি। এ খাতের অগ্রগতি ও পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন করতে হলে প্রতিযোগী দেশগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতার বিষয়টি তুলনা করতে হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) প্রতিবছর বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচকের (GCI) ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগী সক্ষমতার র‍্যাংকিং প্রকাশ করে থাকে। ২০১৯ সালের সর্বশেষ জিসিআই ও অবকাঠামোর মানবিষয়ক র‍্যাংকিং সারণি ৬.৯-এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৯: বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ও অবকাঠামোর মান, ২০১৯
(মোট স্কোর ১০০; তালিকায় অন্তর্ভূক্ত দেশ ১৪১টি)

দেশ	বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা		পরিবহন অবকাঠামো		সড়কের গুণগত মান	রেলপথের গুণগত মান	বন্দরের গুণগত মান	বিমান পরিবহনের গুণগত মান
	স্কোর	দেশের অবস্থান	স্কোর	দেশের অবস্থান	অবস্থান	অবস্থান	অবস্থান	অবস্থান
বাংলাদেশ	৫২.১	১০৫	৪২.১	১০০	১০৮	৬৫	৯২	১০৯
ভারত	৬১.৪	৬৮	৬৬.৪	২৮	৪৮	৩০	৪৯	৫৯
তুরস্ক	৫১.৬	১০৮	৬৪.৯	৩৩	৩১	৫৬	৪১	৩৪
পাকিস্তান	৫১.৪	১১০	৫১.১	৬৯	৬৭	৪৭	৭০	৯৩
শ্রীলঙ্কা	৫৭.১	৮৪	৫৭.৭	৫০	৭৬	৭২	৬৮	৭২
থাইল্যান্ড	৬৮.১	৪০	৫৬.৮	৫৩	৫৫	৭৫	৪৮	৭৩
চীন	৭৩.৯	২৮	৬৮.৯	২৪	৪৫	২৪	৫২	৬৬
ভিয়েতনাম	৬১.৫	৬৭	৫২.২	৬৬	১০৩	৫৪	৮৩	১০৩

সূত্র: বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা প্রতিবেদন ২০১৯, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম

আগের র‍্যাংকিংগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে প্রতিযোগী সক্ষমতা উন্নয়নে বাংলাদেশ বেশ ভালো করেছে, বিশেষ করে পরিবহন অবকাঠামো খাতের র‍্যাংকিংয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এতে বোঝা যায়, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশও পরিবহন অবকাঠামো সেবার উন্নয়নে বেশ জোরালোভাবে কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ রেলপথ খাতে বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু রপ্তানি বাজারে, বিশেষ করে তৈরি পোশাকের বাজারে যেসব দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার করে, তাদের তুলনায় বাংলাদেশ পরিবহন অবকাঠামো খাতে অগ্রগতি অর্জনে পিছিয়ে আছে। এমন দেশের মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক ও ভিয়েতনাম।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালের অর্জন মূল্যায়নে দেখা যায়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশকিছু খাতে বড় ধরণের নীতিগত মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যে প্রধান চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হলো বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। ফলে প্রকল্পের কাজ সময়মতো শুরু হলেও তা সম্পন্ন হয় বিলম্বে। সড়ক ও সেতু উপখাতে দেখা যায়, এখানে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে বিলম্ব হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। এমন বিলম্বের কারণে একদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে প্রকল্পে ব্যয়িত বিনিয়োগের বিপরীতে অর্থনৈতিক মুনাফার হার কমে যায়। বেসামরিক বিমান চলাচল উপখাতে দেখা যায়, প্রকল্পগুলোর কেনাকাটায় বেশি জটিলতা বিদ্যমান। পাশাপাশি এ উপখাতে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেনদরবার করার সক্ষমতায় ঘাটতি রয়েছে।

পরিবহন খাতের নীতি: নীতিগত দিক বিবেচনায় দেখা যায়, পিপিপির ভিত্তিতে পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, বাস্তব অবস্থান তা থেকে বেশ পেছনে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পিপিপিভিত্তিক কার্যক্রমে বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে, বিষয়টি উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু ফাস্ট-ট্র্যাকভিত্তিক প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। মাশুল আরোপের মাধ্যমে

সড়ক ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে সড়ক তৈরির ব্যয় পুনর্ভরণের জন্য যে ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তেলা দরকার ছিল, তা এখনো কার্যকর হয়নি। রেলপথের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ খাতে সেবার বিপরীতে যে হারে মাশুল আদায় করা হয়, তা খাতটির সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো বাবদ যে বিনিয়োগ করা হয়, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ফলে বিনিয়োগ করা অর্থও যেমন ফেরত আসে না, তেমনি সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পরিচালন ব্যয়ও মেটানো সম্ভব হয় না।

পরিবহন খাতের বিভিন্ন মাধ্যমের ভারসাম্য: পরিবহন সেবার বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নে রেলপথ সেবার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু নৌপথ সেবা সম্প্রসারণে তেমন অগ্রগতি হয়নি, যা উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন একটি ব্যয়সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা আন্তঃনগর যোগাযোগ স্থাপনেও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম, যা ব্যয়বহুল সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার ওপর চাপ অনেকটাই হ্রাস করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সবচেয়ে পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা। তা সত্ত্বেও এ খাতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের আনুপাতিক হার অনেক কম এবং তা আরও নিম্নগামী ধারায় চলছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতে বিদ্যমান সমস্যা বহুমাত্রিক। বিশেষ করে নৌরুটে নাব্যতার সংকট, নিরাপত্তা ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, অপর্যাপ্ত বন্দর সুবিধা এবং অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা এ খাতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এই সম্ভাবনাময় পরিবহন সম্পদের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন হবে।

বন্দর পরিচালনার দক্ষতা: ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে সরকার বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য পায়রা বন্দর প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে নানা ধরণের উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও মোংলা সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা এখনো পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা যায়নি। এক্ষেত্রে বন্দরটির প্রধান চ্যানেল পশুর নদীর গভীরতা বাড়াতে যে কৌশলগত ড্রেজিংয়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত না হওয়া এই বন্দর কাজে লাগাতে হলে কৌশলগত পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য এ বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়া একটি চমৎকার উদ্যোগ। কিন্তু মোংলা বন্দরের পূর্ণ সক্ষমতা ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে সমন্বিত বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

কারখানার সঙ্গে বন্দরের সংযোগ: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রক্ষেপিত উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে রপ্তানি বহুমূখীকরণ করতে হবে। আর সেটি করতে হলে কারখানার সঙ্গে বন্দরের সংযোগ তৈরি-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সেবা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি মূলধনি যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী কাঁচামাল আমদানি করে সময়মতো কারখানা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য বন্দরের সঙ্গে কারখানার উপযুক্ত সংযোগ স্থাপন করতে হবে। রপ্তানি বহুমূখীকরণের উদ্যোগ সফল করার ক্ষেত্রে সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা সহজীকরণের মতো উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমদানি করা বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদনকেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ধরণের পণ্য ও সেবা পরিবহন করে ভোগের গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য।

বিমানবন্দর সেবার মানোন্নয়ন: জনগণের দ্রুত আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রুটের ক্ষেত্রে উড়োজাহাজ পরিবহন সেবার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প শক্তিশালী করারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিবহন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে এখনো বেশকিছু এজেন্ডা অসম্পূর্ণ রয়েছে, যেগুলো সম্পন্ন করা প্রয়োজন। যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন উভয় ক্ষেত্রেই বন্দরের সক্ষমতার জরুরি মানোন্নয়ন প্রয়োজন। বিমানবন্দরের মানোন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হল:

- চাহিদামাফিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
- সহনীয় ব্যয়ে ও সুবিধামতো সময়ে যে কোনো ধরণের পরিবহন সুবিধা গ্রহণে সেবাগ্রহীতার পছন্দ প্রাধান্য পাবে

- সব ধরণের পরিবহন সেবার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে, যেখানে সেবাদানকারী একজন সেবাগ্রহীতাকে অন্য পরিবহনের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের বাঁধা সৃষ্টি করতে পারবেন না।
- একটি শক্তিশালী আন্তঃজেলা পরিবহন কাঠামোর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটি আন্তঃআঞ্চলিক সংযোগও নিশ্চিত করা হবে, যার মাধ্যমে নির্বিঘ্নে যাত্রী, পণ্য ও সেবা পরিবহন নিশ্চিত হবে এবং বিকল্প পরিবহন সুবিধা গ্রহণের সুযোগ অবারিত থাকবে।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি গোটা পরিবহন পদ্ধতি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় আসবে।
- মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (MRT)/মেট্রোরেল নেটওয়ার্ক, বিআরটিসি দ্বিতল বাস/আর্টিকুলেটেড বাস সেবা এবং ব্যক্তিগত যানবাহন সুবিধাসহ মানুষের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক যানজটও পরিহার করা সম্ভব হবে।
- কোনো ব্যক্তির রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক পরিচয় নির্বিশেষে যানবাহন আইন ও পার্কিং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইননানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনের সঙ্গে মানানসই উন্নত সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হবে।
- রেল, সড়ক ও নদীপথ-এর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপিত হবে এবং সকল বন্দরের মধ্যে উন্নত মানের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে এগুলোর স্বাভাবিক কার্যক্রম নিবিষ্টভাবে পরিচালিত হবে।
- সড়ক নিরাপত্তার বিষয়গুলো (সড়ক দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি) মোটরযান ব্যবহারের কারণে হোক আর যাত্রীর কারণে হোক, সেগুলো সুচারুভাবে সমাধান করা হবে।
- সমন্বিত ও সুবিন্যাস্ত ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সময়মতো ও সঠিকভাবে দুর্ঘটনার উপাত্তগুলো সংরক্ষণ করা হবে।
- স্বয়ংক্রিয় নিরীক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে যানবাহনের সড়কে চলার উপযোগিতা (ফিটনেস) নিরীক্ষা করা হবে।
- সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথচারী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- নিরাপদে যানবাহন চালানোর বিষয়ে চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।
- দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত কাঠামো হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট, লক্ষ্য, কৌশল, নীতি ও বিনিয়োগ কর্মসূচি ২০৪১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্য

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এ পরিবহন খাতের যে লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায় খুবই চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু একটি উচ্চ আয়ের অর্থনীতির উপযোগী পরিবহন পদ্ধতির কথা বিবেচনা করলে ঘোষিত লক্ষ্যসমূহ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ২০৪১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্যগুলো বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতের লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। পরপর ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়ন হবে। তার মধ্যে প্রথম ধাপ হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। পরিবহন খাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো সারণি ৬.১০-এ বর্ণনা করা হয়েছে, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। একটি উদীয়মান ও রূপান্তরশীল অর্থনীতির চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় পরিবহনের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে সাশ্রয়ী ও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের আন্তঃসংযোগ স্থাপনের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনয়নের জন্য সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে এনে পরিবহনের আন্তঃমাধ্যমের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে এ পরিকল্পনায়। এক্ষেত্রে রেল যোগাযোগ ও অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় বন্দর ও বিমান পরিবহনের সক্ষমতা দ্রুতগতিতে বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ঢাকা শহর ও এর আশপাশের এলাকায় যাতায়াতের সুবিধার্থে মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (MRT)/মেট্রোরেল সুবিধার হাত ধরে নগর পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হবে। অধিকন্তু বর্তমানে সড়কপথগুলো যেহেতু প্রশস্ত হচ্ছে, তাই সড়ক অবকাঠামোগুলোর মান বৃদ্ধি পাবে, যান্ত্রিক ও পরিবেশগত উভয় দিক বিবেচনায় সড়কে চলাচল উপযোগী যানবাহনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে, চালকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত হবে এবং সড়কের নানা ধরণের ব্যবহারকারীরাও এর যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন হবেন।

সারণি ৬.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহনখাতের লক্ষ্যসমূহ

নির্দেশক		অর্থবছর ২০১৯ (ভিত্তিবছর)	অর্থবছর ২০২৫
যাত্রী পরিবহন সংখ্যা (বিলিয়ন যাত্রী কিলোমিটার)	সড়কপথ	১৬৯	২৪৬
	নৌপথ	১৬	২৩
	রেলপথ	১০	১৫
	মোট	১৯৫	২৮৪
পণ্য পরিবহন (বিলিয়ন-টন কিলোমিটার)	সড়কপথ	২৪	৩১
	নৌপথ	৫	৭
	রেলপথ	২	৩
	মোট	৩১	৪১
বিমান পরিবহন (মিলিয়ন যাত্রী/মিলিয়ন টন)	যাত্রী	১৩.০৯	১৪.৬৩
	পণ্য	০.৪১	০.৫০
সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন (মিলিয়ন সংখ্যা/মিলিয়ন টন)	কন্টেইনার	২.৯	৩.৬
	টন	৯৮.২৪	১২২
নগর মেট্রোরেল	শহরের সংখ্যা	০	১
পরিবহন অবকাঠামোর গুণগত মান	দেশের অবস্থান	১০০	৮০
	প্রাপ্ত স্কোর	৪২	৪৭
দেশভিত্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির হার (WHO 2018)	(প্রতি ১০০,০০০)	১৪.৪৩	১৩.০

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণ

৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের জন্য নির্ধারিত কৌশল

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা,২০২১-এর বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন খাতের কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়নে যতটুকু ঘাটতি রয়েছে, তা মোকাবিলা করাই হবে এ কৌশলের প্রধান অগ্রাধিকার। অন্য প্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে প্রধান প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা নিরসন। যে কারণে পরিবহন খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হয়। তৃতীয় প্রাধিকার হচ্ছে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের নিমিত্ত পিপিপি কৌশলের সংস্কার সাধন। সবশেষে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে যে শিক্ষাটা পাওয়া গেছে তা হলো–পরিবহন খাতের প্রধান প্রধান প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আরও বেশি কৌশলী হতে হবে এবং সেই অনুপাতে সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া রূপান্তরমুখী অবকাঠামো নির্মাণে প্রাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু হয়েছে। সর্বোচ্চ প্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিবহন খাতের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনরুদ্যমে শুরু করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন জোরদারকরণ ও প্রাধিকার নির্ধারণ: পরিবহন খাতের ভৌত লক্ষ্যগুলো অত্যন্ত ব্যাপক, যা সারণি ৬.১০-এ দেখানো হয়েছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে বড় ধরণের বিনিয়োগ ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা প্রয়োজন হবে। এ দুটি বিষয়েরই ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশে। সে কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন কৌশল নির্ধারণে সতর্কভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাধিকার নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরই মধ্যে বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সড়ক অবকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ ২০০৪-২০২৪ মেয়াদি সড়ক খাত মহাপরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনা ২০০৫-২০২৫-এর আলোকে গ্রামীণ রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ২০ বছরের বিনিয়োগ কর্মসূচি-সংবলিত অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ২০০৯ সালে সম্পন্ন হয়। রেল পরিবহন খাতের উন্নয়নের জন্য ২০১০-২০৩০ মেয়াদি রেলপথ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া জাতীয় সমন্বিত বহুমাত্রিক পরিবহন নীতি ২০১৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। এসব পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চলছে অসম উপায়ে ও মন্থর গতিতে। এসব পরিকল্পনার ওপর ভর করে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ২০৪১ সাল মেয়াদি একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিবহন খাত মহাপরিকল্পনা (TSMP-২০৪১) প্রণয়ন করা হবে। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে জাপান, কোরিয়া ও চীনে পরিবহন খাতে উন্নয়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্তম চর্চার উদাহরণ রয়েছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারে। টিএসএমপি-২০৪১ মহাপরিকল্পনায় ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল মেয়াদে পরিবহন খাতে বড় ধরণের বিনিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে, যার মাধ্যমে পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টি এবং প্রাধিকার নির্বাচন করে বিভিন্ন ধাপে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে।

পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ নির্বিঘ্ন পরিবহন সুবিধা প্রতিষ্ঠা: পরিবহন ব্যবস্থায় সড়ক পরিবহনের ওপর বিদ্যমান উচ্চমাত্রার নির্ভরশীলতা বহাল থাকলে একসময় ভূমির স্বল্পতা, পরিবেশকেন্দ্রিক উদ্বেগ ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও রেলপথ সেবার ওপর গুরুত্ব বাড়িয়ে পরিবহন নেটওয়ার্কের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের দিকে এগোতে হবে। এ দুটি যোগাযোগ মাধ্যম এখনো পুরো মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে না। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার ওপর চাপ কমানো ও পরিবহনের আন্তঃমাধ্যম সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নৌপথ ও রেলপথের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নদীপথে যদি বন্দরের সঙ্গে পণ্য উৎপাদন কারখানা এবং কারখানার সঙ্গে বন্দরের সংযোগ সেবা স্থাপন করা যায়, তাহলে সেটি হবে অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব একটি যোগাযোগমাধ্যম। পরিবহনের ক্ষেত্রে আন্তঃমাধ্যম ভারসাম্যের উন্নয়ন সাধনে এ ধরণের উদ্যোগসহ আরও অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া হবে সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। পরিবর্তনশীল পরিবহন পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে নিয়মিতভাবে এ পরিকল্পনা হালনাগাদ করা হবে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি: নানা ধরণের সীমাবদ্ধতার কারণে পরিবহন খাতের অনেক বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয় এবং বাস্তবায়ন ব্যয়ও বেড়ে যায়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে অর্থ ব্যয় হয়, তা থেকে প্রাপ্য সামাজিক মুনাফার হার ও প্রকল্পের গুণগত মানও নিম্নগামী হয়। এজন্য সরকার সকল চলমান প্রকল্পের সময়মতো বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে। পরিবহন খাতের সকল বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার বিষয়ে আরও বেশি জোর দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পনায় সময়মতো অর্থছাড় করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন বিনিয়োগ যুক্ত করা, ক্রয়নীতির উন্নয়ন সাধন, প্রকল্প অনুমোদনের আগে যথাযথভাবে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে সংস্থার বাস্তবায়ন সক্ষমতার বিষয়টিকে অন্যতম শর্ত হিসেবে গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বিশেষায়িত কাজে দক্ষ জনবল নিয়োগ ও বেসরকারি খাত থেকে চুক্তিভিত্তিক দক্ষ জনবল নিয়োগ দিয়ে কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। বৃহৎ ও জটিল প্রকৃতির প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতির অনুসরণ করা এবং সম্মত মানে ও মূল্যে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য কঠোর পরিবীক্ষণ এবং জরিমানার বিধান সম্পর্কিত টার্ন-কী চুক্তি সাক্ষরের বিষয়ে জোর দেয়া হবে।

পরিবহন অবকাঠামোর জন্য টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা: সারণি ৬.১০-এ বর্ণিত লক্ষ্য অনুযায়ী পরিবহন অবকাঠামো খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হলে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে সেই অনুপাতে বাজেট বরাদ্দও দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রায়ই সেই বরাদ্দ পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। সেজন্য আগেই বলা হয়েছে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরিবহন খাতে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জন করতে হলে বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। ২০২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবছর এ খাতে জিডিপির প্রায় পাঁচ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। কিন্তু কেবল বাজেট কাঠামোর মধ্যে এ বিশাল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আর সেজন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণে অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এ উদ্যোগের কার্যক্রম খুবই মন্থর। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পিপিপি পদ্ধতি বেশ জোরালো হলেও এটির পূর্ণ সম্ভাবনা এখনো কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল পরিবহন অবকাঠামো কর্মসূচির জন্য টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পিপিপি পদ্ধতি শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এজন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য অর্থায়ন উৎস হিসেবে বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রণোদনাগত সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে অর্থায়ন পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদনে সরকার-বেসরকারি খাতের মধ্যে যথোপযুক্ত উপায়ে ঝুঁকি বণ্টনের বিষয়ে জোর দেয়া হবে।

পরিবহন সেবার গুণগত মান ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় মূলনীতির উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন: এ খাতে অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও পরিবহন অবকাঠামোর সামগ্রিক রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের মান বিবেচনায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক র‌্যাংকিংয়ে বেশ পিছিয়ে। এটি বাংলাদেশের বৈশ্বিক প্রতিযোগী সক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি বড় ধরণের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। তাই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবহন সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবহন অবকাঠামোর গুণগত মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের অপর্যাপ্ততা, সেবার মানে ঘাটতি, দুর্বল নিরাপত্তা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, সেবার মান নিশ্চিত করার বিষয়ে দুর্বল জবাবদিহি এবং পরিবেশের মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে পরিবহন খাতের ওপর দুর্বল পর্যবেক্ষণের মতো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অবকাঠামো ও সেবার মানোন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেশ কিছুসংখ্যক

নীতি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম সড়ক ব্যবহারের ওপর বিভিন্ন ধরণের মাশুল ধার্য করা। যানজট সৃষ্টি, সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি এবং পরিবেশদূষণের ওপর ধাপে ধাপে মাশুল ধার্য করা যেতে পারে। এ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সড়ক, সেতু ও মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করা হবে। সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে সরকার এরই মধ্যে বেশকিছু নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং সড়কে নিয়ম ভঙ্গ করা ও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেসব নীতি প্রয়োগও শুরু হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথ, রেলপথ ও বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইনি সহায়তায় অনিয়ম রোধ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হবে। সড়কপথসহ সার্বিক পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নয়নে পরিবেশগত বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে। অধিকতর দক্ষ উপায়ে জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ এবং পরিবেশদূষণ রোধে কার্বন কর আরোপের উদ্যোগ নেয়া হবে। স্বচ্ছ জ্বালানিভিত্তিক পরিবহন, যেমন–বিদ্যুৎচালিত আন্তঃনগর ট্রেন, বিদ্যুৎচালিত মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (MRT)/মেট্রোরেল ও ভূগর্ভস্থ এমআরটি/মেট্রোরেল, বৈদ্যুতিক বাস, বৈদ্যুতিক কার প্রভৃতি পরিবহনের উন্নয়ন ঘটানো হবে। বন্দর ছাড়পত্র ও রেলসেবার মানোন্নয়নে সময়োপযোগী, ব্যবহারকারীবান্ধব অনলাইন টিকেটিং ও ছাড়পত্র নথিবদ্ধকরণ সেবা প্রচলন এবং ট্রানজিট সেবা চালু করা হবে।

প্রতিবেশী ও আমাদের সমপর্যায়ের অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে সংগতি বিধান করে যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমনের নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। যানবাহনের স্বয়ংক্রিয় ফিটনেস পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা হবে। গাড়ি চালকদের প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে সড়কপথে নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

গণপরিবহন কর্তৃপক্ষের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ: প্রস্তাবিত পরিবহন অবকাঠামো কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে পরিবহন খাতে বেশ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করার প্রয়োজন পড়বে। এক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বিশেষ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল এবং কৌশলগতভাবে দক্ষ পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি গুণগত মানসম্পন্ন কর্মিবাহিনী গড়ে তোলা। আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো সম্পাদিত কর্ম মূল্যায়নে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা, যা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জনপ্রশাসন খাতের মূল চ্যালেঞ্জ। বিষয়টি পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে জনপ্রশাসন ও গভর্ন্যান্স বিষয়ক আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনকে শক্তিশালীকরণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, যেগুলো এখনো চলমান। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সম্পাদিত কর্মমূল্যায়ন এবং উপযুক্ত প্রণোদনা প্রদান। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এসব উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করা হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ শ্রমশক্তির শিক্ষার মান ও দক্ষতা উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। জনপ্রশাসনের গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে।

৬.৫.১ উপখাতভিত্তিক কৌশলসমূহ

সড়ক পরিবহন খাতের কৌশল

সড়ক ও সেতু উপখাতের লক্ষ্যগুলো সারণি ৬.১১-তে প্রদর্শিত হয়েছে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক পরিবহন খাতের কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

সারণি ৬.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভৌত লক্ষ্যসমূহ

ভৌত কার্যক্রম	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য
৪/৬/৮ লেনের সড়ক নির্মাণ	৫৫০ কিমি
নতুন সড়ক লেন নির্মাণ	১৫০ কিমি
জাতীয় মহাসড়কের উন্নয়ন/পুনর্বাসন	১,৮০০ কিমি
আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন/পুনর্বাসন	১২,৭০০ কিমি
সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	৩৭,৫০০ মিটার
সেতু/কালভার্ট পুনর্নির্মাণ	৪,১০০ মিটার
ফ্লাইওভার/ওভারপাস নির্মাণ	১১,০০০ মিটার
ফুটপাথ নির্মাণ	৩৭৫ কিমি
ওজন সেতু/এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন	৩০টি

সূত্র: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা জোরদারকরণ: এ পরিকল্পনার সর্বোচ্চ প্রাধিকার হচ্ছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন মৌলিক রূপান্তরমুখী প্রকল্পগুলোর সার্বিক বাস্তবায়ন সক্ষমতা জোরদারকরণ এবং সেগুলোর কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা (সারণি ৬.১১)। এসব পুঁজিঘন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতীয় সম্পদের অভাব ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই পরিকল্পনামাফিক এসব প্রকল্প থেকে দেশের অর্থনীতি যে সর্বোচ্চ সুবিধা পায় এবং সেগুলো যেন সময়মতো বাস্তবায়িত হওয়ার পাশাপাশি ব্যয়বৃদ্ধির বিষয়টি এড়ানো যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৌশলী ও প্রকল্পসংক্রান্ত পেশাজীবী জনবল নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রতিমাসে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। আর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) পর্যায়ে তা করা হবে ছয় মাস অন্তর।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, সেইমতো ‘সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর পরিবহন খাত মহাপরিকল্পনা ২০৪১’-এর বড় অংশীদার হবে। এছাড়া জনগণের অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এ খাতের রূপান্তরমুখী প্রকল্পগুলোর যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণে এ সকল জাতীয় নীতি দলিলের সঙ্গে সংগতি বিধান করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০০৯-২০২৯ হালনাগাদ ও সমন্বয় করা হবে।

জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন ও সংহতকরণ: একাধিক নতুন লেন সংযোজন, দূরবর্তী গন্তব্যের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং স্থানীয় সড়কগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সার্ভিস লেন সংযোজনের বিদ্যমান মহাসড়কগুলোর অধিকতর মানোন্নয়ন ও সংহতকরণের বিষয়ে ২০৪১ সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ কৌশলের বাস্তব রূপ দিতে হলে প্রথম অগ্রাধিকার হবে উল্লিখিত মহাসড়কগুলোর সময়মতো বাস্তবায়ন এবং সার্ভিস রোড নির্মাণের মাধ্যমে স্থানীয় সড়ক ব্যবস্থার সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন। বিদ্যমান সম্পদ ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রকল্প বাছাই করে নতুন চার লেন সড়ক উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া হবে।

সড়কের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্কগুলো আমাদের জাতীয় সম্পদ। কাজেই এগুলো এমন দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়। আর সেটা নিশ্চিত করতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্যবোঝাই যানবাহন চলাচল নিরুৎসাহিত করতে কঠোর এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং তা বাস্তবায়ন করা হবে। উচ্চগতির যানবাহন সুবিধা নিশ্চিত করতে এ ধরণের যান চলাচলের উপযোগী গুণগত মানসম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণে মনোযোগ দেয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোয় ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১১০ কিলোমিটার গতির যানবাহন চলাচলের উপযোগী সার্ভিস ‘বি’ পর্যায়ের অন্তত ৯০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির করা হবে। প্রধান অর্থনৈতিক করিডোরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করতে সর্বোচ্চসংখ্যক ইন্টারসেকশনের ব্যবস্থা করা হবে। অধিকতর ভালো মানের ভ্রমণ নিশ্চিত করতে মোট সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে মোটামুটি মসৃণ (ফেয়ার অ্যান্ড গুড) সড়কের হার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। শহরের চারপাশে পরিকল্পিত উপায়ে বাইপাস সড়ক নির্মাণ করা হবে, যাতে শহরের আশপাশের এলাকায় যানবাহনের গতি বিঘ্নিত না হয় এবং মানুষ সহজে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। সড়ক অবকাঠামো দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলার পাশাপাশি সড়ক ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি কাজে লাগানো হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মহাসড়কের যে অংশ জলমগ্ন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কংক্রিটের অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

প্রধান উন্নয়নকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে সড়ক সংযোগ স্থাপন: মহাসড়ক নেটওয়ার্ক থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক মহাসড়ক, অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ, সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কেন্দ্র, রেলস্টেশনসমূহ, রেলপথে পণ্য পরিবহন কেন্দ্র এবং প্রধান প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে সড়কের সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনে এসব বিষয় এরই মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব সংযোগ স্থাপন বিষয়ে আরও বেশি জোর দেয়া হবে।

পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহের মধ্যে সংযোগ: পরিকল্পনার প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে দারিদ্র্যের আলোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন জেলার দারিদ্র্য চিত্রের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। কোনো একটি জেলায় দারিদ্র্যহার বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ অগ্রসরমান জেলার প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া জেলার অপর্যাপ্ত সংযোগ। সে কারণে যেসব জেলা জাতীয় মহাসড়কগুলোর সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলোর সঙ্গে আন্তঃজেলা সংযোগ জোরদারের বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। বিদম্যান সেতুগুলোর অধিকতর উন্নয়নসাধন এবং ক্ষেত্রবিশেষে নতুন সড়ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। পিএসবি এবং সরু ও ভঙ্গুর সেতুগুলো স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা গাইডলাইনের ভূমিকা পালন করবে। ২০৪১

সাল মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল আন্তঃজেলা সড়ক পর্যায়ক্রমে চার লেন সুবিধার আওতায় আনা হবে। হালনাগাদ সড়ক মহাপরিকল্পনাকে এ কাজের প্রাধিকার নির্ধারণের শুভ সূচনা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই জেলা সড়কগুলোর জন্য বিনিয়োগ কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে কম গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মহাসড়ক ও আন্তঃজেলা সড়কের পাশে সেবাকেন্দ্র স্থাপন: সড়কের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সড়ক ব্যবহারকারী ও ভ্রমণকারীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা এবং সড়কে চলাচল নির্বিঘ্ন করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহাসড়ক ও আন্তঃজেলা সড়কের পাশে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বিশ্রামাগার ও খাবারের রেস্তোরাঁসহ অন্যান্য জরুরি সেবাকেন্দ্র স্থাপন এবং গ্যাস স্টেশন ও জরুরি গাড়ি মেরামত কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগে বেসরকারি খাত যদি এগিয়ে আসে, তাহলে সরকার প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুমোদন ও নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করবে।

জেলা ও উপজেলা সড়কের অধিকতর উন্নয়ন: পিছিয়ে থাকা জেলাসমূহে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অপর্যাপ্ত সড়ক সুবিধা বিদ্যমান। সে কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর অন্যতম অগ্রাধিকার হলো–উৎপাদন ও ভোগ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সহযোগী পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা সড়কগুলোর অধিকতর উন্নয়ন। এ বিষয়টি পিছিয়ে পড়া জনপদে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করার পাশাপাশি শ্রম শক্তির চলাচলে সহায়ক হবে। এসব সড়ক হবে কমপক্ষে দুই লেনবিশিষ্ট। কিন্তু যেসব এলাকায় যানবাহনের চাপ বেশি, সেখানে বেশি ভার বহনে সক্ষম চার লেন সড়কও নির্মাণের প্রয়োজন পড়তে পারে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সরু ও অনুন্নত সড়কগুলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে হস্তান্তরের মাধ্যমে সংস্থাটির নিয়মানুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রশস্ততা দান এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে উন্নয়ন ঘটানো হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুরো সময় জুড়ে নিম্নমানের জেলা মহাসড়কগুলো সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে যথাযথ মানে উন্নীত করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন: গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরও ত্বরান্বিত হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর লক্ষ্য হলো সকল গ্রামীণ সড়ককে কমপক্ষে এক লেন প্রশস্ততা দিয়ে পাকা সড়কে উন্নীত করা, যাতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন সহজতর হয়। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হবে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে অকৃষি খাতে গ্রামীণ বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে গ্রামীণ সড়ক সংযোগ স্থাপনে অর্থ ব্যয় করা হবে একটি প্রধানতম বিনিয়োগ।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন: মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট ও সড়কের যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক খাতের প্রাধিকারের অন্যতম কৌশলগত উপাদান হিসেবে বিবেচিত। অর্থায়নের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে অর্থের জোগান নিশ্চিতে সড়ক ব্যবহারকারীদের ওপর মাশুল ধার্য করার উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ব্যয়িত অর্থের সর্বোত্তম সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সড়ক নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপাদান, যেমন মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট ও অন্যান্য সড়ক আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল উদ্যোগ কাজে লাগাতে হবে। মহাসড়ক ও প্রধান প্রধান সেতুর ক্ষেত্রে টোলবাবদ সংগ্রহ করা অর্থ এগুলোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লাগানো হবে। অর্থনীতির বিভিন্ন নীতিকাঠামো ও জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নির্দিষ্ট সমীক্ষার ভিত্তিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত নীতিগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দেয়া হবে।

সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এসডিজির লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে সড়ক নিরাপত্তার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মৌলিক নীতি-সংক্রান্ত কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি বড় প্রাধিকার হবে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনা (NRSSAP), ২০১৭-২০ এর পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন। এছাড়া এসডিজির ৩.৬ নম্বর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে জাতীয় মহাসড়কগুলোয় সংঘটিত দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট জখমের ঘটনা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২৫ শতাংশ কমে আসবে।

বাস রুটের ন্যায্যতা বিধান: গণপরিবহন খাতে শৃঙ্খলা বিধানের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) ঢাকা শহরে বাস রুটের ন্যায্যতা বিধান ও কোম্পানিভিত্তিক বাসসেবা পরিচালনায় পদক্ষেপ নিয়েছে।

সমন্বিত যানবাহন ব্যবস্থাপনা: ডিটিসিএ ঢাকা শহরে যানজট কমিয়ে আনতে ইন্টারসেকশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (ITS) বাস্তবায়ন করছে। এ উদ্যোগের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম খুব শিগগিরই শুরু হবে। আইটিএস পদ্ধতি চালু করার পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ পরীক্ষামূলক (পাইলট) প্রকল্পের আওতায় জাপানি বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও নির্দেশিকা প্রণীত হবে, যার মধ্যে থাকবে–

১. ইন্টারসেকশন উন্নয়ন নির্দেশিকা

২. যানবাহন সংকেত পদ্ধতি (ট্রাফিক সিগন্যাল) স্থাপন ও পরিচালন বিষয়ে নির্দেশনা

৩. সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালন-সংক্রান্ত গাইডলাইন

৪. সমন্বিত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

৫. গাড়িচালক ও পথচারীদের জন্য সড়ক যানবাহন নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা

৬. সড়কে যানবাহন চলাচল-সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা

সেতুবিভাগের জন্য কৌশলসমূহ

মূলত সড়ক পরিবহন বিভাগের অনুরূপ কৌশলই সেতুবিভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। অত্যন্ত পুঁজিঘন ও ব্যয়বহুল হওয়ায় এক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে প্রায়ই আন্তর্জাতিক চুক্তি ও পিপিপি অর্থায়নের সহায়তা নিতে হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেতু বিভাগের কর্মকাণ্ড সম্পাদনে নিম্নোক্ত তিনটি কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করা হবে:

১. সকল চলমান প্রকল্পের সময়মতো বাস্তবায়ন: বিদ্যমান পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম এমন সাতটি প্রকল্প বর্তমানে সেতুবিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন। এগুলো বাস্তবায়নের নানা পর্যায়ে অবস্থান করছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে–পদ্মা সেতু; ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প ও এর সঙ্গে সংযুক্ত পিপিপি-ভিত্তিক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেওয়ে প্রকল্প; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল; ঢাকা-আশুলিয়া উড়াল এক্সপ্রেসওয়ে এবং গাজীপুর-আশুলিয়া বাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের (BRT) ৪.৫ কিলোমিটার এলাকায় উড়াল এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা। এগুলোর প্রত্যেকটি ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে সব ধরণের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে পায়রা নদীর ওপর এক হাজার ৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে ২০২০ সালের ১০ মার্চ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এক হাজার ৪২ কোটি টাকা ব্যয়-সংবলিত একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত নিশ্চিত হবে।

২. আন্তর্জাতিক অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে টার্নকি-ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদন: বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকায় এসব ব্যয়বহুল প্রকল্পে প্রায়ই সময়ক্ষেপণ ও ব্যয়বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে। এমন পরিস্থিতি এড়াতে সরকার বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে টার্নকি মডেল (এ পদ্ধতিতে প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো দায়িত্ব একক প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়) অনুসরণ করবে। প্রকল্পে সময়ক্ষেপণ ও ব্যয়বৃদ্ধি এড়াতে চুক্তিতে বিশেষ প্রবিধান রাখা হবে।

৩. পিপিপি কার্যক্রমের সক্ষমতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধিকরণ: আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে পিপিপি সেলকে শক্তিশালী করে স্থানীয় ও বৈদেশিক অর্থায়নে পিপিপি-ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দর কষাকষির সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাস্তবায়নের জন্য যমুনা নদীর ওপর রেলসেতু ও বরিশাল-ভোলা সেতু নির্মাণসহ বেশকিছু রূপান্তরমুখী প্রকল্প চিহ্নিত করেছে সেতু বিভাগ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রস্তাব আরও সচেতনতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা হবে। এ পর্যালোচনায় প্রকল্পগুলোর প্রাসঙ্গিকতা ও গুণগত মান, অর্থের প্রাপ্যতা ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হবে। সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করার লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন সন্তোষজনক পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত সরকার নতুন করে ব্যয়বহুল প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টিকে নিরুৎসাহিত করছে।

রেলপথ উন্নয়নের কৌশল

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। দেশের উন্নয়নে গতিশীল ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে সপ্তম পরিকল্পনাকালের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলওয়ের উপখাতের লক্ষ্যগুলো বক্স ৬.২-এ দেখানো হলো–

বক্স ৬.২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ের লক্ষ্য

- ৭৯৮ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ;
- সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ৮৯৭ কিলোমিটার রেলপথ ডুয়েল গেজ ও ডাবল ট্র্যাকে রূপান্তর;
- ৮৪৬ কিলোমিটার বিদ্যমান রেলপথকে যথাযথ মানে উন্নয়ন/পুনর্বাসন;
- ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ;
- বিদ্যমান রেল বহরে নতুন ট্রেন সংযোজন ও দক্ষতা বাড়ানো, নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং সময়ানুবর্তিতা ঠিক রাখতে ১৬০টি লোকোমোটিভ (ইঞ্জিন) ক্রয়;
- যাত্রীসেবার উন্নয়নে এক হাজার ৭০৪টি যাত্রী কোচ ও দুই হাজারটি ওয়াগন ক্রয়;
- ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়;
- রেলওয়ে ওয়ার্কশপসহ অন্যান্য অবকাঠামোর আধুনিকায়ন;
- লেভেল ক্রসিং গেট, অন্যান্য অবকাঠামো ও রোলিং স্টকের উন্নয়ন;
- নতুন নতুন আইসিডি নির্মাণ;
- রেলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২২২টি রেলস্টেশনের সংকেত দান ব্যবস্থার আধুনিকায়ন;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসম্পাদানের উন্নয়ন সাধন;
- ২০২৫ সালের মধ্যে নিজস্ব আয় দিয়ে পুরো পরিচালন ব্যয় মেটানো।

সূত্র: বাংলাদেশ রেলওয়ে

সক্ষমতা জোরদারকরণ ও সেবার মানোন্নয়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিকল্পনা হালনাগাদ করেছে। এছাড়া পরিচালন সক্ষমতা বাড়ানো, মোট পরিবহন খাতে নিজেদের মার্কেট শেয়ার বাড়ানো এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থাটি সরকারের অন্যান্য পরিকল্পনা, যেমন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন ২০২১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেদের পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করেছে। এ খাতের হালনাগাদকৃত মহাপরিকল্পনাটি (জুলাই ২০১৬–জুন ২০৪৫) ছয় ধাপে বিভক্ত। এর প্রতিটি ধাপে পাঁচ বছর করে সময় অন্তর্ভুক্ত। রেলওয়ে মহাপরিকল্পনায় ৫ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়-সংবলিত মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রেল খাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালন কর্মসূচিসমূহ ও সহায়ক বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ বিবেচনায় নেয়া হবে, যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

- রেলওয়ের সম্ভাব্য সম্প্রসারণ কর্মসূচির চিত্র বক্স ৬.২-এ তুলে ধরা হয়েছে। অর্জিত সক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চাহিদা অনুযায়ী এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। রেলওয়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে এ খাতের মার্কেট শেয়ার যাতে বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে।
- প্রতিবেশী দেশসহ আঞ্চলিক রেল অবকাঠামোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া।
- আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান সিগন্যাল পদ্ধতির হালনাগাদকরণ/আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি যথোপযুক্ত টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা চালু করা।
- রেললাইনের ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপত্তা মানের সঙ্গে সংগতি বিধান করে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে সংযোগ বাড়াতে উচ্চগতির যাত্রী ট্রেন চালু করা।
- সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহনে নিযুক্ত ট্রেনগুলোর যাত্রাকাল কমিয়ে আনা।

- কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক ট্রেন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলন করা।
- যাত্রীরা যাতে ট্রেন ভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, সেজন্য স্টেশনগুলো পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।
- যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা।
- কম্পিউটারভিত্তিক সেবা চালু করার লক্ষ্যে রেলওয়েতে কর্মরত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে যাত্রীবাহী কোচগুলোর সংস্কার সাধন।
- পণ্য খালাস ও বোঝাইয়ের ক্ষেত্রে বন্দরকেন্দ্রিক সময় কমিয়ে আনা।
- টিকিটের প্রতিযোগিতামূলক দাম নির্ধারণ এবং সময়মতো ও সুলভে টিকিটপ্রাপ্তি নিশ্চিতে অনলাইনে বিক্রয় কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয়া, যাতে ধীরে ধীরে মুনাফার দিকে যাওয়া যায়।
- প্রধান প্রধান করিডোরে সক্ষমতা বাড়ানো।
- চাহিদার ওপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ট্রেন সেবা চালু করা।
- বন্দর থেকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পণ্যবোঝাই কন্টেইনার পৌঁছে দিতে মালবাহী ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো ও আধুনিক অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো (ICD) স্থাপন করা।
- দেশের প্রত্যেক জেলা রেলসেবার আওতায় আনা।
- জাতীয়, আঞ্চলিক ও ট্রান্সএশীয় রেল সংযোগের বিলুপ্ত লাইনগুলো পুনর্নির্মাণ, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা।
- পণ্য পরিবহনের জন্য পৃথক করিডোর স্থাপন করা।
- মেগা শহরগুলোর যানজট কমিয়ে আনতে কমিউটার ট্রেন সেবা চালু করা।
- বৈদ্যুতিক ট্রেন সেবা চালুকরণ।
- নতুন ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ট্রেনের ইঞ্জিন ও কোচ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা।
- নির্দিষ্ট কিছু করিডোরে বিদ্যমান সিবিআই ও সিটিসি ব্যবস্থার পাশাপাশি, মধ্যবর্তী ব্লক পদ্ধতি, ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় পরিবীক্ষণ (ATS) ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি ট্রেনের স্বয়ংক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা (ATP) প্রবর্তন করা।
- রেলসেবার অধিকতর ভালো ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ের আরও দুটি অঞ্চল এবং চারটি বিভাগ সৃষ্টি করা।
- প্রতিবেশী দেশসহ আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য জোরদার করতে কাস্টমস ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন করা।
- রেল কন্টেইনার থেকে সুচারুভাবে সড়ক পরিবহনে পণ্য হস্তান্তর।
- পর্যটক ও ভিআইপি গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সেবা চালু করার পাশাপাশি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে মার্কেট শেয়ার বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শক্তিশালী করা।
- রেলওয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন/নির্মাণ সম্পন্ন করা।
- বাংলাদেশ রেলওয়েকে বহুমাত্রিক যানবাহন মাধ্যমে রূপান্তর করা।
- ২০২৫ সালের মধ্যে রেলওয়ে যাতে নিজেদের আয় দিয়ে পরিচালন ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সেজন্য পুরো ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (IWT) উন্নয়নের কৌশলসমূহ

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলাই প্রধান বা অপ্রধান নদী দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত। প্রধান নদীগুলোর মাধ্যমে সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন খুবই সুবিধাজনক। জলপথের এই আন্তঃসংযোগ যদি পুরোপুরি কাজে লাগানো যেত এবং এগুলোর উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হতো, তাহলে তা বাংলাদেশের উন্নয়নে বড় ধরণের সুফল বয়ে আনত। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (BDP-2100) প্রণয়নকালে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের প্রতিবন্ধকতাগুলো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং সেই মোতাবেক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন উপখাতের প্রকৃত সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য একটি বিস্তারিত কৌশল ও নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সংগতি রেখে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌপথের এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্দেশনা থাকবে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে গৃহীত কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

- যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য প্রবাহের ভিত্তিতে বিভিন্ন রুট প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী নৌ-চ্যানেলের সংস্কার ও নদীবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে যেভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, সেই মোতাবেক কৌশলগত ড্রেজিং, নদীশাসন ও পাড় সংরক্ষণের মাধ্যমে নৌরুটগুলোর নাব্যতা নিশ্চিত করা হবে।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনশিল্পের বিকাশে নদীগুলোর মধ্যে আন্তঃআঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- নৌপরিবহন উপখাত থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে সুফল আহরণে পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমের সঙ্গে এটির সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।
- যথাযথ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা ও নিয়মকানুনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ নিশ্চিত করে নৌ পরিবহনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। নদীতে চলাচলকারী যানগুলোর ফিটনেস নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হবে এবং নৌযানে পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না, বিশেষ করে বেতার যোগাযোগ এবং যাত্রীসংখ্যার বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য বিধিবিধান পুরোপুরি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা হবে।
- ফিটনেস সনদ প্রদান প্রক্রিয়া ন্যূনতম সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সব ধরণের জলযানের নির্ধারিত মান অনুসরণে সহায়ক হবে।
- সব ধরণের লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ ও যোগ্যতাসম্পন্ন পরিদর্শক নিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষকে (IWTA) শক্তিশালী করা হবে। সুশাসনের উন্নয়ন ঘটাতে বিশেষ নজর দেয়া হবে।
- নদীর স্রোতের গতিবিধির ওপর সমীক্ষা পরিচালনা (হাইড্রোলোজিক্যাল সার্ভে), নদীশাসন ও ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিআইডব্লিউটিএ'র সক্ষমতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। পাশাপাশি পিপিপি ভিত্তিতে ব্যক্তিখাতকে এসব কার্যক্রমে অংশ নেয়ার বিষয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- বিপুল পরিমাণ সম্পদের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য পরিপালন করা হবে। এক্ষেত্রে প্রধান অবকাঠামোগুলো সরকারের তরফ থেকে প্রদান করা হবে এবং যাত্রী ও পণ্য সেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হবে ব্যক্তিখাতকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- আধুনিক মানসম্পন্ন সেবা-সংবলিত নৌবন্দর সুবিধার উন্নয়ন ঘটানো হবে, যাতে যাত্রীসেবা, কন্টেইনারসহ অন্যান্য কার্গো সহজে খালাস ও বোঝাই করা সংক্রান্ত সেবা, পণ্য সংরক্ষণ সুবিধা এবং নিরাপত্তা ও পুনরুদ্ধার সেবা নিশ্চিত করা যায়। আন্তর্জাতিক নৌবন্দরগুলোতে কাস্টমস ও পরিবীক্ষণসহ এ-সম্পর্কিত অন্যান্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।
- এ খাতে বিনিয়োগ থেকে ন্যায্য মুনাফা (রিটার্ন) নিশ্চিতে যাত্রী ও পণ্যসেবার মাশুল নির্ধারিত হবে বাণিজ্যিকভাবে।

জাহাজ পরিবহনের জন্য নির্ধারিত কৌশল

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমুদ্র পরিবহন (জাহাজশিল্প) নিয়ে নির্ধারিত প্রধান লক্ষ্য হলো সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (BSC) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সংস্থাটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি করতে পারে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ বাণিজ্য বৃদ্ধির হাত ধরে সমুদ্র পরিবহন ব্যবহারের চাহিদাও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দক্ষতার সঙ্গে সমুদ্র পরিবহন সেবাদানে বিএসসির সক্ষমতা সীমিত পর্যায়ে রয়ে গেছে। রপ্তানি আয় বৃদ্ধিকল্পে রপ্তানি বহুমূখীকরণ করা প্রয়োজন। সেজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রপ্তানি বহুমূখীকরণের কৌশল নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রপ্তানির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য নন-ফ্যাক্টর খাত থেকেও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সেই 'নন-ফ্যাক্টর' খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাহাজ পরিবহন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিএসসির আধুনিকায়নের পাশাপাশি এর বহরে জাহাজের সংখ্যা বাড়ানো, দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী

নিয়োগ দিতে হবে। বিএসসির বহরের আওতা বাড়াতে জাহাজ ক্রয় ও ভাড়া নেয়া উভয় পন্থা অবলম্বন করা হবে। চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের ও যোগ্যতাসম্পন্ন নাবিক তৈরি করে থাকে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জাহাজ সংস্থায় এ একাডেমির পেশাজীবীদের বেশ চাহিদা রয়েছে। একজন নাবিক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে ধরণের সুযোগ-সুবিধা পান, তেমন সুবিধা নিশ্চিত করে মেরিন একাডেমির এই যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের বিএসসিতে কাজে লাগানোর বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্যোগ নেয়া হবে। দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক পণ্য চালান হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কারিগরিভাবে দক্ষ ও বাণিজ্য বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানসম্পন্ন পেশাজীবীদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে বিএসসির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটানো হবে। কর্মীদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। আন্তর্জাতিক রুটে জাহাজ পরিচালনায় দেশের বেসরকারি খাতকেও উৎসাহিত করা হবে।

বিমান পরিবহনের জন্য নির্ধারিত কৌশল

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বর্ধিত চাহিদা মেটাতে বিমান পরিবহন উপখাতে নতুন নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, বিদ্যমান বিমানবন্দরগুলোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, বিমানবন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ (সড়ক, মেট্রো রুট, সমুদ্র সংযোগ প্রভৃতি) এবং অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে আকাশসীমা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে ছিল মিশ্র চিত্র। বাংলাদেশ যেহেতু উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের (UMIC) মর্যাদা অর্জন করতে চায়, তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিমান পরিবহন খাতের আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। বিমান পরিবহন খাতের উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সমন্বয় রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে:

- বিমান পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় একটি নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে।
- অতিরিক্ত রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যমান সকল বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও অধিকতর উন্নয়ন করা হবে। আরও বেশিসংখ্যক উড়োজাহাজ অবস্থানের সুবিধা নিশ্চিত করতে অগমেন্টিং গেট ও অ্যাপ্রোনের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। আরও বেশিসংখ্যক যাত্রীর সেবা নিশ্চিতকল্পে টার্মিনাল সংখ্যা বাড়ানো হবে। দ্রুততম সময়ে উড়োজাহাজের উড্ডয়ন ও অবতরণ প্রক্রিয়া সম্পন্নের লক্ষ্যে বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ ব্যবস্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। নতুন রাডার প্রযুক্তি স্থাপনসহ উড্ডয়নরত উড়োজাহাজ ও আকাশসীমা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো হবে এবং উড়োজাহাজের জ্বালানি সরবরাহ, যাত্রীদের চলাচল ও লাগেজ হ্যান্ডলিং সুবিধা, ওয়্যারহাউস সুবিধা, উড়োজাহাজ মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপ সুবিধা ও হ্যাঙ্গার সুবিধার মতো সহযোগী সেবাগুলো প্রদান করা হবে।
- আধুনিক ও স্মার্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যেমন সমুদ্রবন্দর, পর্যটনকেন্দ্র ও শিল্পনগরীর কাছাকাছি অবস্থিত যেসব বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত আছে, তাদের মানোন্নয়ন করা হবে।
- বিমান পরিবহন সেবার সুফল পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিমানবন্দরের সঙ্গে সড়ক পরিবহনের সংযোগ শক্তিশালী করা হবে।
- ক্রমবর্ধমান উড়োজাহাজ কার্গো হ্যান্ডলিং এবং পণ্যজট ও হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে সময়ক্ষেপণ কমাতে বিশেষায়িত এয়ার কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। এ উদ্যোগ রপ্তানি ও আমদানি পণ্যের জরুরি জাহাজীকরণ কার্যক্রমকে সহজতর করবে।
- বিমানের নির্বিঘ্ন ওঠা-নামা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিমানের নেভিগেশন সেবার (Air Navigation Services) উন্নয়ন ঘটানো হবে। এছাড়া এএনএস-সংক্রান্ত অবকাঠামোগুলোর সমন্বিতকরণ ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির বাস্তবায়ন করা হবে।
- রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও ওভারহোলিং সুবিধার উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে এই অতিমাত্রার প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- দক্ষতা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ ব্যবসা যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরির কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

- বিমানবন্দর উন্নয়নে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বিমানবন্দর সেবায় ব্যয় হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করা হবে। সমুদ্রবন্দরের মতো বিমানবন্দরও একটি বাণিজ্যিক স্থাপনা। কাজেই এটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনও হবে বাণিজ্যিকভাবে।
- উপযুক্ত পরিমাণে মুনাফা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিমানকে সত্যিকার অর্থে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে উড়োজাহাজ শিল্পে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগের পাশাপাশি পেশাদার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা হবে।

সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থাপনার কৌশল

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দেশের জিডিপির অনুপাতে বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সেই বাণিজ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জোরালো মনোযোগ দিতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মসম্পাদনে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে নিজস্ব আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর (SOE) মধ্যে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সংস্থাটি। তা সত্ত্বেও বাণিজ্য বিষয়ক বৈশ্বিক সেবা ব্যবস্থার মানদণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সমুদ্রবন্দরের সুযোগ-সুবিধার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। ফলে প্রতিযোগী সক্ষমতায় পিছিয়ে যাচ্ছে এ বন্দর। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বন্দরের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া ও দক্ষতা উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমুদ্রবন্দর উপখাতের উন্নয়নে যেসব কৌশল নেয়া হবে, সেগুলো নিম্নরূপ:

- মোংলা সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানোর জন্য এর সব ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে কৌশলগত ড্রেজিং এবং কার্গো হান্ডলিং কার্যক্রমে দক্ষতা আনয়নে সহায়ক সব ধরণের সরঞ্জাম স্থাপন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকল্পে সমন্বিত বিনিয়োগ কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে।
- চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে ফাস্ট-ট্র্যাক ভিত্তিতে বিনিয়োগ কর্মসূচি হাতে নেয়ার পাশাপাশি কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বাড়ানো ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন সাধনে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।
- কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে কমপক্ষে ১৬.০ মিটার গভীরতা (ড্রাফট) বিশিষ্ট গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- ২০২২ সালের মধ্যে যাতে কার্যক্রম শুরু করা যায়, সেজন্য সব ধরণের পূর্ত কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে পায়রা সমুদ্রবন্দরে ফাস্ট-ট্র্যাক ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।
- সকল বন্দরের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো জাহাজ নোঙর করার সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আধুনিকায়ন ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে সব ধরণের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হবে।
- প্রতিযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করা ও উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কিছু কিছু এলাকায় কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম ধীরে ধীরে ভাড়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হবে।
- কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়াতে প্রধান সমুদ্রবন্দরগুলোর পুরোপুরি যান্ত্রিকীকরণের বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
- বন্দর এলাকায় পণ্য গুদামজাত সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।
- ব্যক্তিখাতে বন্দর পরিচালনার বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করা হবে।
- বন্দরকেন্দ্রিক ও বন্দরবহির্ভূত নানা জটিলতার সমাধান করে পণ্যবাহী জাহাজের নোঙরপূর্ব অপেক্ষাকালীন সময় কমিয়ে আনা এবং পণ্য খালাস-বোঝাইয়ের পর জাহাজের বন্দর ত্যাগ করার মধ্যবর্তী সময় কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- বৃহদাকারের জাহাজের খালাস কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী চ্যানেল প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং সম্পন্ন করা হবে।
- আরও বেশিসংখ্যক কার্গো খালাসের উপযোগী করে তুলতে বন্দর টার্মিনালের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- গভীর সমুদ্রবন্দরে কন্টেইনার হাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃহদাকারের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা সম্প্রসারণ করা হবে।
- দ্রুততম সময়ে আমদানি পণ্য চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌছানো ও উৎপাদন কারখানা থেকে রপ্তানি পণ্য সহজ উপায়ে বন্দরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বন্দরের সঙ্গে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমের সংযোগ বাড়ানো হবে।

- প্রধান প্রধান বন্দরের কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের আধুনিক কলাকৌশল সংযোজন করা হবে। বিশেষ করে বাল্ক কার্গো ও সাধারণ কার্গো ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি ফলদায়ক হবে।
- বন্দর ব্যবহারকারীদের নানা ধরণের ব্যয় কমানো ও পণ্য সেবার লিড সময় কমিয়ে আনতে কাগজের ব্যবহারবিহীন সমন্বিত বন্দর ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যেতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি/ইন্টারনেট সেবার সহায়তা নেয়া হবে, যার মাধ্যমে বন্দর সেবার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। যেসব প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে এমন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা হবে তার মধ্যে রয়েছে–জাহাজ যান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (VTMS); কার্গো/কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনা ও অপরিচালনগত বিষয়, তথ্যপ্রযুক্তির বিজ্ঞানভিত্তি প্রয়োগ; তদারকি পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং ই-বাণিজ্য (Electronic Commerce)/ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উপাত্ত আদান-প্রদান (Electronic Data Interchange)।

স্থলবন্দরের জন্য নির্ধারিত কৌশল

প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক বাণিজ্যের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ভিত্তিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে এ বিষয়ে আরও বেশি গুরুত্বারোপ করা হবে এবং স্থলবন্দরকেন্দ্রিক নানা ধরণের পরিষেবার ব্যয় কমানোর পাশাপাশি সেবার মানোন্নয়ন করা হবে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান স্থলবন্দরগুলোর সার্বিক কার্যক্রমের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ, দাপ্তরিক কাজে কাগজের ব্যবহার কমানো এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বন্দর থেকে পণ্য খালাসের সময়কাল কমিয়ে আনা হবে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর স্থলবন্দরে কোন প্রক্রিয়ায় পণ্য খালাস সম্পন্ন হয়, তা পর্যালোচনা করে সেখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের স্থলবন্দরগুলোর দক্ষতা উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া হবে।

নগর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কৌশলসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত নগর পরিবহন কৌশলের প্রধান লক্ষ্যই হলো টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করা। সে মোতাবেক নগর পরিবহনসংক্রান্ত কৌশলে যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন, বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চাহিদা মেটাতে পরিবহন ব্যবস্থা ও এ-সংক্রান্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন এবং সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে; যে ব্যবস্থার মধ্যে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক সব ধরণের পরিবহন যাতে স্বচ্ছন্দে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং সার্বিক পরিবহন ব্যবস্থায় নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে। নগর পরিবহন কৌশলের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপঃ

- প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহর ও এর আশপাশের এলাকায় ভূগর্ভে ও মাটির ওপরে মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (MRT)/মেট্রোরেল চালু করা হবে।
- সব বিভাগীয় শহরে নিরবচ্ছিন্ন বাস সেবা বা বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (BRT) চালু করা হবে।
- সব বিভাগীয় শহরে দ্রুতগতির যান প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিআরটিসির ছোট আকৃতির বাস পরিবর্তন করে দূষণমুক্ত/দীর্ঘাকৃতির বৈদ্যুতিক বাস চালু করা হবে।
- বাইসাইকেল ও পথচারীদের জন্য সড়কে পৃথন লেন চালু করা হবে।
- উচ্চ দক্ষতা ও বিকল্প জ্বালানিভিত্তিক যান প্রচলন প্রবর্ধন করা হবে।
- প্রাথমিকভাবে ঢাকা এবং পরবর্তীতে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বুদ্ধিদীপ্ত পরিবহন পদ্ধতির (Intelligent Transportation System) প্রচলন করা হবে। সড়কের টোল আদায়, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার জন্য সমন্বিত টিকেটিং ব্যবস্থা প্রচলন এবং ভ্রমণকারীর তথ্য সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার প্রচলন হবে আইটিএস প্রযুক্তি প্রচলনের প্রধান অনুষঙ্গ। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল প্রধান শহর এবং জনপথ বুদ্ধিদীপ্ত পরিবহন পদ্ধতির আওতায় আনা হবে।
- মেট্রোপলিটন এলাকার আশপাশের শহরগুলোর সঙ্গে নগরীর সংযোগ স্থাপনে নিরবচ্ছিন্ন বাসসেবা বা বিআরটি এবং মেট্রোরেল (MRT) সেবা চালু করা হবে। এ ধরণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহে প্রবেশগম্যতা সহজীকরণ ও আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকল্পে ভূমির যথাযথ ব্যবহার ও পরিবহন পরিকল্পনার উন্নয়নে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা চালু করার বিষয়ে জোর দেয়া হবে।

- ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গাড়ি পার্কিং সুবিধা চালু করা হবে। গাড়ি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরণের অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত বিধানাবলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং নিয়মানুসারে জরিমানা করা হবে।
- দিনের বেলায় ব্যস্ততম সড়কগুলো ব্যবহারের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হবে। আর যেসব সড়কে যান চলাচল খুব বেশি হয়, সেখানে প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফি ধার্য করা হবে।
- ঢাকা শহরে পথচারীদের জন্য সড়ক তৈরির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এ উদ্যোগ ছড়িয়ে দেয়া হবে।

৬.৬ ডাক ও টেলিযোগযোগ সেবা

গোটা বিশ্ব বর্তমানে এক ডিজিটাল বিপ্লবকাল অতিবাহিত করছে, যেখানে একজন নাগরিকের একক ও গোষ্ঠীগত কর্মকাণ্ড ডিজিটাল সংযোগ ও ডিজিটাল সেবার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাপী ডিজিটাইজেশনের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক নেটওয়ার্ক ও টার্মিনাল, নির্ভরযোগ্য সুপ্ত যোগাযোগ, সময়মতো প্রক্রিয়াকরণ এবং একাধারে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডিভাইসের যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে মৌলিক উদ্ভাবন ও তার বিতরণের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার অগ্রভাবেই রয়েছে টেলিযোগাযোগ শিল্প, যে রূপান্তরের মূল নিয়ামক ডিজিটাল বাস্তব্যবিদ্যায় অভিগম্যতা, ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তা, আন্তঃসংযোগ ও এর প্রয়োগ, যার মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লব সংঘটিত হবে। কভিড-১৯ অতিমারি সমগ্র কার্যক্রম ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তাকে আরও বেশি করে উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগে সব ধরণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল রূপান্তরের ঢেউ শুরু হলেও এই নজিরবিহীন কোভিড-১৯ অতিমারি সে রূপান্তর প্রক্রিয়াকে আরও বেশি বেগবান করে তুলেছে। অতিমারি-পরবর্তীকালেও আর্থসামাজিক উন্নয়নে ডিজিটাল সংযোগের বিষয়টি যে প্রধান নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৫-জি প্রযুক্তির ধারণা এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে, বিশেষ করে গণনা ও সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে, যা উদ্ভাবনী ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছে।[৮] চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে দেশকে সংযুক্ত করা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পূর্ণাঙ্গ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে দেশের সার্বিক খাতের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজেশন আবশ্যক। চলমান রূপান্তরধর্মী উদ্ভাবন এরই মধ্যে ভৌত, ডিজিটাল ও জৈবিক বিশ্বের সীমানাকে ম্লান করে দিয়েছে। সে কারণে আগামী দিনে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ ও এর সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে হলে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিতকরণ, প্রক্রিয়া নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি নির্ধারণ, যোগ্যতাসম্পন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করতে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

আধুনিক অবকাঠামো ও সেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং খাতসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে যথাযথ গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর লক্ষ্য অর্জনে ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, প্রধান প্রধান সেবাপ্রদানকারী সংস্থা, উপাদান (কনটেন্ট) সরবরাহকারী, ডিভাইস (মোবাইল টেলিফোন, কম্পিউটার প্রভৃতি) আমদানিকারক ও প্রস্তুতকারক, খুচরা বিক্রেতা, বিপণনকারী কর্তৃপক্ষসহ মূল্য শিকলে (ভ্যালু চেইন) ভূমিকা রাখা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগ। আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে পূর্ণমাত্রায় স্বাগত জানাতে হলে এ খাতের সংঘটিত বিষয়গুলোকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে আগামী দিনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য জাতিকে প্রস্তুতি নিতে হবে।

২০৪১ সাল নাগাদ ডিজিটাল অবকাঠামো ও সেবাসমূহ বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে কমপক্ষে ছয় শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ওই সময় নাগাদ শতভাগ ডিজিটাল ডিভাইস দেশেই তৈরি হবে এবং তা দেশের রপ্তানি আয়েও অবদান রাখবে। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অংশীদার রূপে আবির্ভূত হবে। ওই সময় দেশের মোট রপ্তানি আয়ে ডিজিটাল পণ্য ও সেবার অবদান ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে

8 ITU, 2017. 5G Basics.

চিত্রিত উন্নয়ন লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কৌশলগুলো টেলিকম খাতের লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রকৃত ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে অন্যান্য খাতকে সংযুক্ত করাও এ অধ্যায়ের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু।

৬.৬.১ ডাক ও টেলিযোগযোগ বিভাগের প্রতিষ্ঠানসমূহ

বিভিন্ন অধিদপ্তর, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এ খাতের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। চিত্র ৬.১-এ একনজরে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তুলে ধরা হলো:

চিত্র-৬.১: বাংলাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সেবাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

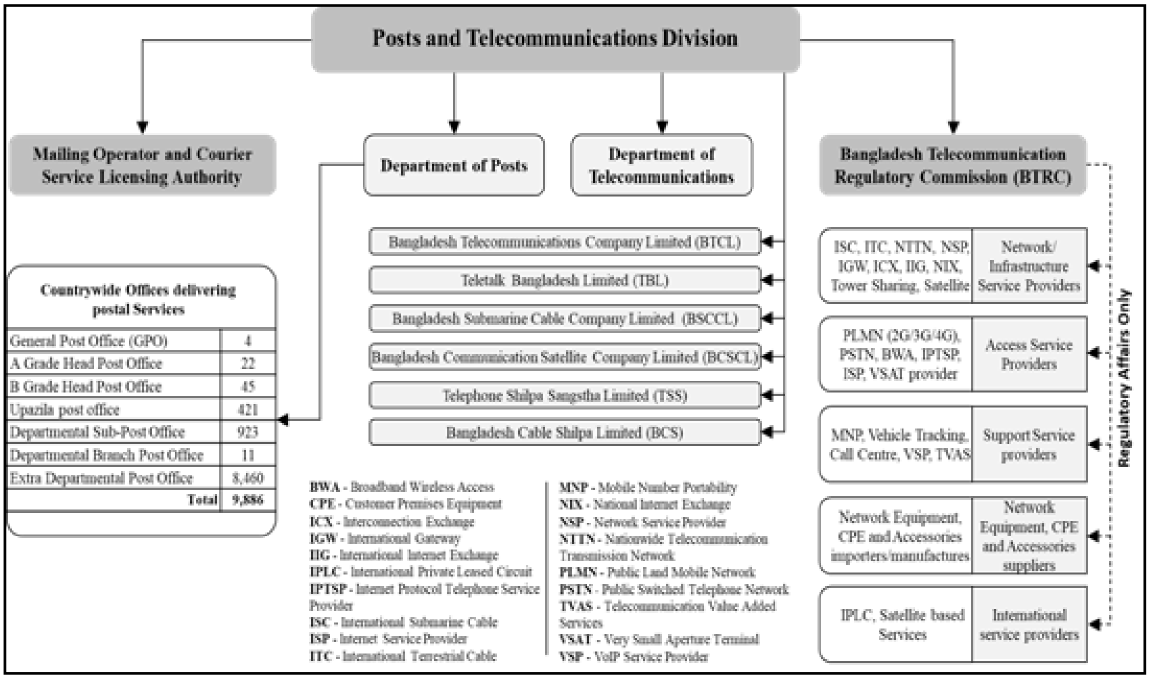

ক. ডাক বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ডাকঘর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ১৮৯৮ সালে ব্রিটিশ ভারতে ডাকবিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ডাক বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশেও সে আইনটি চালু রয়েছে। ডাকবিভাগের সেবা শুরুর প্রথম দিকে এর প্রধান কাজ ছিল ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক চিঠি সংগ্রহ, আদান-প্রদান ও প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়া। পরবর্তীকালে মানি অর্ডারসহ অন্যান্য সেবার প্রচলন ঘটে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমানে ডাকবিভাগ অব্যাহতভাবে তার ঐতিহ্যগত সেবাসমূহের হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। চরম দুর্গম এলাকাসহ দেশের সব অঞ্চলে ৯ হাজার ৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে এ বিভাগ মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ও কুরিয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ডাকঘর আইনের ৪ ও ৫৮ অনুচ্ছেদে ২০১০ সালে সংশোধনী আনা হয়। আইনের এ সংশোধনীর ওপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালে কুরিয়ার সার্ভিস লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও মেইলিং অপারেটর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ. টেলিযোগযোগ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২০১৫ সালে টেলিযোগযোগ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে সরকারকে নানা ধরণের নীতিগত সহায়তা প্রদান ও সেসব নীতির বাস্তবায়ন। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের সমন্বয় ঘটিয়ে সহজলভ্য ও গুণগত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি করাও এ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ।

প্রথম টেলিযোগাযোগ নীতি প্রণীত হওয়ার ২০ বছর পর ২০১৮ সালে নতুন করে এ টেলিযোগাযোগ নীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করা এবং দেশকে বৈশ্বিক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সঙ্গে একীভূত করার মানসে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও সহজলভ্য টেলিযোগযোগ সেবা নিশ্চিত করাই এ নীতির প্রধান লক্ষ্য। টেলিযোগাযোগ খাতের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে এ নীতিতে বেশকিছু মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি

অর্থনীতির অন্যান্য খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে ডাক ও টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এবং এ-সংক্রান্ত সেবাসমূহ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে। এ খাতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নির্ধারিত লক্ষ্যের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১-এর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার বাস্তব রূপদানে বৈশ্বিক প্রযুক্তির পরিবর্তনশীল ধারা ও দেশের বাজারের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সপ্তম পরিকল্পনায় এ খাতের জন্য উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল। ২০১৫ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক. প্রয়োজনীয় সংযোগ নিশ্চিত করে গুণগত ও সহজলভ্য সেবাদান

গত পাঁচ বছরে টেলিসংযোগের ঘনত্ব শতভাগের বেশি অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে পাঁচ কোটিরও বেশি নতুন গ্রাহক সৃষ্টির পাশাপাশি ইন্টারনেট সংযোগের হার দ্বিগুণ হয়েছে। একই সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাত গুণ, যার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দেশের মানুষ ও ব্যবসায় উদ্যোগগুলোর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। গ্রাহকসংখ্যা বিবেচনায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশ বর্তমানে পঞ্চম বৃহৎ মোবাইল সেলফোনের বাজার। আর সমগ্র বিশ্বে এর অবস্থান নবম।[৫]

সারণি ৬.১২: ডিজিটাল সংযোগ ও সহজলভ্যতার উন্নয়ন

নির্দেশক	জুন ২০১০	জুন ২০১৫	ফেব্রুয়ারি ২০২০
টেলিযোগাযোগের ঘনত্ব	৪১.২%	৮১.৯৩%	১০১.৪১%
মোবাইল ফোন সংযোগ সংখ্যা (২জি, ৩জি, ৪জি)	৫.৯৯ কোটি	১২.৬৮ কোটি	১৬.৬১ কোটি
ইন্টারনেট সংযোগ	০.৭ কোটি (মোবাইল ইন্টারনেট ৯৮%)	৪.৮৩ কোটি (মোবাইল ইন্টারনেট ৯৭%)	৯.৯৯ কোটি (মোবাইল ইন্টারনেট ৯৪%)
ইন্টারনেট সংযোগের ঘনত্ব	২.৫%	৩০.৫৬%	৫৮.৯১%
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মাশুল/এমবিপিএস	১৮,০০০ টাকা	৬২৫ টাকা	২৮৫ টাকা
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার	৭.৫ জিবিপিএস	২৩৪ জিবিপিএস	১,৬০০ জিবিপিএস

সূত্র: বিটিআরসি

খ. অবকাঠামোর উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো

১. যোগাযোগ স্যাটেলাইট: ২০১৮ সালের ১২ মে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভ্রালে অবস্থিত এলসি-৩৯এ (LC-39A) উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ফ্যালকন ৯ নভোযান ব্যবহার করে বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর মহাকাশে সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানার ৫৭তম দেশে হিসেবে আবির্ভূত হয়। স্যাটেলাইটটি বর্তমানে টেলিযোগাযোগ ও ব্রডকাস্টিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকা, দুর্গম চরাঞ্চল ও বিভিন্ন দ্বীপসহ দেশব্যাপী নানা ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাংশের দেশগুলো এবং বিভিন্ন ধরণের 'স্তান' দেশগুলো (কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান প্রভৃতি) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সেবা সুলভে গ্রহণ করতে পারবে। এরই মধ্যে দেশের ৩৩টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের চারটি চ্যানেল বিদেশি সেবাদানকারী নানা স্যাটেলাইটের পরিবর্তে 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটের সেবা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়া দেশীয় ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সেবা গ্রহণ করছে। স্যাটেলাইট ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত নানা সেবা ব্যবস্থাপনায় গাজীপুর ও বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। দেশ-বিদেশে এ স্যাটেলাইটের সেবা পৌঁছে দিতে ২০১৭ সালে স্যাটেলাইট পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫ GSMA. (2018). Country Overview: Bangladesh, Mobile Industry Driving Growth and Enabling Digital Inclusion.

২. *চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল সেলফোন সেবা:* দেশব্যাপী উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে চারটি মোবাইল সেলফোন অপারেটর কোম্পানিকে ৪জি লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/মেগাহার্টজ ও ২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার/মেগাহার্টজ মূল্যে অপারেটরগুলোকে যথাক্রমে ১৮০০ মেগাহার্টজ থেকে ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের চতুর্থ প্রজন্মের তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৪জি নেটওয়ার্কের গ্রাহকসংখ্যা ২১ মিলিয়ন (দুই কোটি ১০ লাখ) এবং এ সেবার আওতা দেশের সব উপজেলা ও গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

৩. *দেশীয় বিতরণ অবকাঠামো:* 'এক হাজার ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন করে বিটিসিএল। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ১১৪টি উপজেলার এক হাজার ২১২টি ইউনিয়নে আট হাজার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া 'উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলার ৩৪৯টি উপজেলায় ৯ হাজার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল ও সহযোগী সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪. প্রান্তিক গ্রামীণ অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার 'ইনফো-সরকার (তৃতীয় পর্যায়)' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২,৬০০ ইউনিয়নে ১৯ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন; ৬৩টি জেলা ও ৪৮টি উপজেলায় ডিডব্লিউডিএম নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন/সম্প্রসারণ; জেলা পর্যায়ে ১০০ গিগাবাইট তরঙ্গ ও উপজেলা পর্যায়ে ১০ গিগাবাইট তরঙ্গের নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন; দুই হাজার ৬০০ ইউনিয়নে পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (POP) প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ে এক হাজার ৬০০ ভিপিএন/এমপিএলএস সেবা সম্প্রসারণ এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সুচারুভাবে পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের জন্য নেটওয়ার্ক পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া ৭৭৭টি ইউনিয়নকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনতে 'দুর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন (সংযুক্ত বাংলাদেশ)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

৫. *আন্তর্জাতিক সঞ্চালন নেটওয়ার্ক:* পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেব্‌ল এসইএ-এমই-ডব্লিউই-৫ (SEA-ME-WE-5)-এর ল্যান্ডিং কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান দুটি সাবমেরিন কেব্‌লের মোট ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা হচ্ছে দুই হাজার ৭৫০ জিবিপিএস। দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ চাহিদার ৬০ শতাংশই পূরণ হয় এ দুটি সাবমেরিন কেব্‌লের মাধ্যমে। অবশিষ্ট চাহিদা পূরণ করে সাতটি আন্তর্জাতিক টেরিস্ট্রিয়াল কেব্‌ল (ITC) অপারেটর। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে তৃতীয় সাবমেরিন কেব্‌ল স্থাপনের বিষয়ে এরই মধ্যে এসইএ-এমই-ডব্লিউই-৬ (SEA-ME-WE-6)-এর সঙ্গে সমঝতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ এটির পরিচালন কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ কেব্‌লটির তরঙ্গ সক্ষমতা ১২ টিবিপিএস (টেরাবাইট)।

৬. *নেটওয়ার্ক প্রাপ্যতার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন:* বিটিসিএলের আওতায় 'ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন'/"Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় আইএমএস (IP Multi-Media Subsystem) প্ল্যাটফর্ম, এফটিটিএক্স প্রযুক্তির অ্যাক্সেস গেটওয়ে (AGW), জিপিওন (গিগাবাইট-কেবল প্যাসভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক) এবং দেশের তিনটি স্থানে এমডিইউ (মাল্টি ডুয়েলিং ইউনিট) স্থাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা ও বিটিসিএলের আইপি নেটওয়ার্ক সেবা হালনাগাদকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে। 'সকল সরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৮৭টি বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিটিসিএলের বিদ্যমান অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উচ্চগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। ৪,৯৩৬টি ২জি বিটিএস, ৩,৯০৯টি ৩জি বিটিএস (Node B) এবং ২,৩৪৮টি ৪জি নড-বি-এর মাধ্যমে টেলিটক দেশের সব জেলা ও ৪৮টি উপজেলায় ৩জি মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

৭. *অপারেটর বদল (MNP), টাওয়ার ভাগাভাগি ও টিভিএএস সেবা:* ২০১৮ সালে মোবাইল নাম্বার প্রোর্টেবিলিটি সার্ভিস (MNP) সেবা চালুর বিষয়ে অপারেটরদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। এ সেবার মাধ্যমে মোবাইল নম্বর অপরিবর্তিত রেখে একজন গ্রাহক অপারেটর বদল করতে পারবেন। একই বছর বিদ্যুৎ ও আবাদি জমির অপচয় রোধ করা এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মোবাইল টাওয়ারগুলোর সক্ষমতা যথাযথ উপায়ে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে চারটি সেলফোন অপারেটর কোম্পানিকে টাওয়ার শেয়ারিং (ভাগাভাগি) লাইসেন্স দেয়া হয়েছিলো। সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ, কার্যকর, দক্ষ ও সাশ্রয়ী টেলিকম সেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য ২০১৭ সালে টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবার (TVAS) নিবন্ধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালা জারি করা হয়।

৮. মোবাইল সেলফোন পরিষেবা: সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব নিশ্চিত করা, অবৈধ উপায়ে মোবাইল ফোন আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ এবং একটি কার্যকর আইএমইআই ডেটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে বিটিআরসিতে এনওসি অটোমেশন ও আইএমইআই ডেটাবেজ স্থাপন করা হয়। এ ডেটাবেজ বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং দেশে তৈরি প্রতিটি মোবাইল হ্যান্ডসেটের আইএমইআই সংরক্ষণ করা হবে। সংরক্ষণের এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে বলা হয় এনএআইডি (NOC Automation and IMEI Database)।

৯. ভয়েস কল ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের হার: বাংলাদেশে মোবাইল ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে মিনিট প্রতি সর্বনিম্ন দাম (কলরেট) নির্ধারণ করা হয়েছে ০.৪৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ কলরেট ধার্য করা হয়েছে ২.০০ টাকা। অপারেটরগুলোর ঘোষিত বেশিরভাগ প্যাকেজের কলরেট বর্তমানে ০.৫০ টাকার নিচে নেমে এসেছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে আনা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বৈষম্য কমানো এবং ডিজিটাল সেবায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও এ খাতের উন্নয়ন সাধনে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মাসিক পাইকারি মূল্য ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। ২০০৯ সালে যে ব্যান্ডউইথের দাম ছিল ২৭ হাজার টাকা, ২০১৯ সালে তা নেমে আসে ২৮৫ টাকায়। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক ২০১৬ সালে প্রকাশিত বৈশ্বিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে ভয়েস কলে খরচের পরিমাণ সারা বিশ্বে তৃতীয় সর্বনিম্ন এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাশুল ছিল চতুর্থ সর্বনিম্ন।

১০. সেবার মান: টেলিযোগাযোগ সেবার মানোন্নয়নে এ সেবার মান-বিষয়ক নির্দেশিকা (কিউওএস গাইডলাইন) প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ নির্দেশিকা যেসব সমস্যা নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে কল ড্রপ প্রতিরোধ, নেটওয়ার্কের মানোন্নয়ন, গ্রাহক কর্তৃক অনাকাঙ্খিত সেবার প্যাকেজ বন্ধ করা, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা প্রভৃতি। এসব বিষয় নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করবে বিটিআরসি।

(গ) ডিজিটাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

১. ডিজিটাল হুমকি প্রশমন: জুয়া ও পর্নসাইটসহ যেসব উপাদান (কনটেন্ট) দেশের মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তেমন অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইট/কনটেন্ট থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর 'সাইবার হামলা শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ'(Cyber Threat Detection and Response) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

২. মোবাইল ফোন গ্রাহকদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন: জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সঙ্গে মোবাইল ফোন গ্রাহকদের যাবতীয় তথ্য মিলিয়ে তাদের ব্যবহার করা সিম/রিম কার্ডের পুনর্নিবন্ধন কার্যক্রম ২০১৬ সালের ৩১ মে সম্পন্ন হয়। নতুন সংযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে এ বায়োমেট্রিক নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হুমকি প্রদান, চাঁদাবাজি, জঙ্গি অর্থায়ন, অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকহারে কমে এসেছে।

৩. বৈশ্বিক অনলাইন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয়সাধন: সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন ধরণের অসামাজিক কনটেন্ট ও প্রচার-প্রচারণা, গুজব ও ধর্মীয় উগ্রবাদ ছড়ানোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন অনলাইন নেটওয়ার্ক প্রতিরোধে ফেসবুক, গুগল, মাইক্রোসফটসহ অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমের সঙ্গে যুগপৎভাবে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

(ঘ) স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজিটাল সরঞ্জাম ও এক্সেসরিজ প্রস্তুতকরণ

১. অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল ও এইচডিপিই নালি প্রস্তুতকরণ: টেলিফোন সংযোগের জন্য তামার তার প্রস্তুত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্প লিমিটেড (BCSL) ২০১২ সাল থেকে অপটিক্যাল ফাইবার উৎপাদন শুরু করে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বছরে ৯০০০ কিলোমিটার তার তৈরির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানিটির কারখানায় উচ্চগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়াকরণ লাইন স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০২০ সালের জুন নাগাদ নতুন এ মেশিনটি উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে পারবে বলে প্রত্যাশা ছিল। পাশাপাশি কোম্পিানিটি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তারের বহিঃআবরণ এইচডিপিই সিলিকন নালি তৈরির কাজ শুরু করে। নালি তৈরির সক্ষমতা বার্ষিক তিন হাজার ৫০০ কিলোমিটারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কারখানার অধিকতর উন্নয়ন সাধনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

২. বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর, কেব্‌ল ও তার প্রস্তুতকরণ: বিদ্যুতের বিতরণ কার্যক্রমে ব্যবহার্য ও বিদ্যুৎসংযোগ নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন রাখার কাজে ব্যবহার্য তার উৎপাদনের লক্ষ্যে বিসিএসএল এরই মধ্যে একটি কারখানা তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছে। এ কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা দুই হাজার ৪০০ মেট্রিক টন (প্রতিমাসে ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ)।

৩. টেলিফোন সেট, পিএবিএক্স, ল্যাপটপ ও অন্যান্য টেলিকম সরঞ্জাম: টেলিযোগাযোগ/আইসিটি খাতের প্রয়োজনের নিরিখে এ খাতকে সহায়তার জন্য টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস) বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ডিজিটাল পিএবিএক্স, ল্যাপটপ, বহুমূখী ডিজিটাল জ্বালানি মিটার এবং মোবাইল ফোনের ব্যাটারি/চার্জার উৎপাদন/সংযোজন করছে।

(ঙ) ডাক সেবার আধুনিকায়ন ও তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় সেবা সম্প্রসারণ

১. ডাক সেবার ডিজিটাল কেন্দ্র: 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ডাক ই-সেন্টার' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৮০০০ গ্রামীণ ডাকঘর ও ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ডিজিটাল কেন্দ্রে রূপান্তর করা হয়েছে।

২. ডাক বিভাগের সেবা ও পদ্ধতির মানোন্নয়ন: 'তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৫৯০টি ডাকঘরের ভবন নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১,২৬৩টি ডাকঘর ভবন মেরামত করা হয়েছে। আইসিটি-ভিত্তিক অটোমেশন কার্যক্রমের আওতায় ৭১টি প্রধান ডাকঘর, ১৩টি মেইল (Mail) ও বাছাই কেন্দ্র, ২০০টি উপজেলা ডাকঘর এবং শহরাঞ্চলের উপ ডাকঘরের সেবা কর্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রাহকদের জন্য সর্বোচ্চ ডাকসেবা নিশ্চিতকল্পে পুরনো ৪০/৫০টি মেইল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র প্রতিস্থাপন করে ১৪টি আধুনিক মেইল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আধুনিক কেন্দ্রগুলোয় নিবন্ধন, বাছাইকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হবে। এ লক্ষ্যে 'মেইল প্রক্রিয়াকরণ ও লজিস্টিক সেবাকেন্দ্র' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডাক পরিবহন ও বিতরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে রেলওয়ে ও ভাড়া করা যানবাহনের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে 'ডাক পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের ১১৬টি মোটরযান ক্রয় করা হয়েছে।

৩. ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: ব্যাংক সেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এনে লেনদেনে ভারসাম্যা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডাকবিভাগ 'ডাক টাকা' বা 'Postal Money' শীর্ষক আর্থিক সেবার প্রচলন করেছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২,৬৫০টি ডাকঘরে ইলেকট্রনিক/মোবাইল মানি অর্ডার সেবার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। এছাড়া সকল জেলা ও উপজেলা ডাকঘরসহ সারা দেশের মোট ৬৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সেবা চালু করা হয়েছে। দেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান করতে ডিজিটাল আর্থিক সেবা 'নগদ' চালু করা হয় ২০১৯ সালে, যা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ডিজিটাল আর্থিক সেবার মোট বাজারের একটি বড় অংশ দখলে নিতে সক্ষম হয়েছে।

(চ) ২০১৫-২০২০ সময়ে বিভিন্ন ধরণের আইন/বিধি/নীতি/নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন

১. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন, ২০১৭
২. জাতীয় টেলিযোগযোগ নীতি, ২০১৮
৩. জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি, ২০০৯ (সংশোধন: ২০১৩, ২০১৬, ২০১৭)
৪. ৪জি/এলটিই সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন নির্দেশিকা, ২০১৮
৫. মোবাইল নাম্বার পোর্টেবিলিটি ও লাইসেন্সিং নির্দেশিকা, ২০১৮
৬. টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, ২০১৮
৭. টাওয়ার ভাগাভাগি নিয়ন্ত্রণ ও অনুমোদন নির্দেশিকা, ২০১৮

(ছ) টেলিযোগাযোগ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১. স্যাটেলাইট সেবা প্রদান ও বিপণনসহ যোগাযোগ স্যাটেলাইট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণেল লক্ষ্যে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২. সরকারের কাজে সহায়তা করতে টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সরকারকে কারিগরি সহায়তা দিতে ২০১৫ সালে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(জ) জাতীয় অর্থনীতিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের অবদান

১. জিডিপির ওপর প্রভাব: গত পাঁচ বছরে ডাক ও টেলিযোগযোগ খাত অর্থনীতির অন্যান্য খাতের মতো সমহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যার চিত্র সারণি ৬.১৩-এ প্রদর্শন করা হলো:

সারণি ৬.১৩: জিডিপিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের সরাসরি অবদান (স্থির মূল্যে, ভিত্তিবছর: ২০০৫-০৬)

অর্থবছর	জিডিপি (কোটি টাকা)	জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	জিডিপিতে ডাক ও টেলিকম খাতের অবদান (কোটি টাকা)	ডাক ও টেলিকম খাতে প্রবৃদ্ধির হার (%)	জিডিপিতে ডাক ও টেলিকম খাতের অংশ (%)
২০১৫-১৬	৮৮৩,৫৪০	৭.১১	২২,২৩৩	৬.৮১	২.৬২
২০১৬-১৭	৯৪৭,৯০০	৭.২৮	২৩,৭৮৫	৬.৯৮	২.৬১
২০১৭-১৮	১,০২২,৪৩৭	৭.৮৬	২৫,৩৩৯	৬.৫৩	২.৫৮
***২০১৮-১৯**	১,১০৫,৭৯৩	৮.১৫	২৭,৩৯৭	৮.১২	২.৫৮

*সূত্র: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮; অর্থ মন্ত্রণালয় * বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুসারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের মাধ্যমে পৃথকভাবে সৃষ্ট মূল্য সংযোজনের চিত্র নিম্নে দেখানো হলো (সারণি ৬.১৪) :

সারণি ৬.১৪: ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্য সংযোজনের সারসংক্ষেপ (স্থির মূল্যে; ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬; মিলিয়ন টাকা)

খাত/উপখাত	অর্থবছর ২০১৪-১৫	অর্থবছর ২০১৫-১৬	অর্থবছর ২০১৬-১৭	অর্থবছর ২০১৭-১৮	অর্থবছর ২০১৮-১৯
ডাক ও কুরিয়ার সেবা	৪৭০৯	৫৬৫৭	৬০০৯	৬৫০২	৭০৪০
বাংলাদেশ ডাকঘর	২৭২৮	৩৬০৫	৩৮৮৩	৪৩০০	৪৭৫৯
কুরিয়ার সেবা	১৯৮১	২০৫২	২১২৬	২২০২	২২৮১
টেলিযোগাযোগ	২০৪৪১৩	২১৭৭৬২	২৩৩০৪২	২৪৮২১৬	২৬৮৩০৪
বাংলাদেশ টিঅ্যান্ডটি	৯১৬৫	৯৫৮৫	১০১১৭	৮২০১	৮২০১
মোবাইল ফোন	১৮৫২২৩	১৯৭০২১	২১০৪৬৪	২২৬১১৪	২৪৪৫৯৭
অন্যান্য	১০০২৫	১১১৫৬	১২৪৬০	১৩৯০২	১৫৫০৬

সূত্র: স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক বাংলাদেশ, ২০১৯; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২. *সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ওপর প্রভাব:* গত দুই দশকে দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণের প্রধান খাতে পরিণত হয়েছে টেলিযোগাযোগ। দেশে গত পাঁচ বছরের এফডিআই প্রবাহের চিত্র সারণি ৬.১৫-তে তুলে ধরা হলো। গত কয়েক বছরে অন্যান্য খাতে যেমন জ্বালানি ও তৈরি পোশাকখাকে এফডিআই বৃদ্ধি পেলেও এখন পর্যন্ত দেশে এফডিআইয়ের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ খাত।

সারণি ৬.১৫: টেলিযোগযোগ, কম্পিউটার ও আইটি খাতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ

পঞ্জিকা বর্ষ	মোট এফডিআই (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	টেলিকম খাতে এফডিআই (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	কম্পিউটার সফরওয়্যার ও আইটি খাতে এফডিআই (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট এফডিআইতে টেলিকম, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও আইটি খাতের অংশ (%)
২০১৫	২২৩৫.৩৯	২৫৪.৫৭	৮.২৬	১১.৭৬
২০১৬	২৩৩২.৭২	৫৭২.৭৬	২২.০৫	২৫.৫০
২০১৭	২১৫১.৫৬	২২৯.৬৪	৮৩.৫৫	১৪.৫৬
২০১৮	৩৬১৩.৩০	২১৯.৮৭	২৬.২৬	৬.৮১
২০১৯	২৮৭৩.৯৫	২০৮.৩৫	৪১.৭৫	৮.৭০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

বর্তমানে দেশের টেলিযোগযোগ খাতে বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মরত। ২০১৮ সালে এ খাতে প্রায় ৭.৬০ লাখ মানুষ সরাসরি কর্মরত ছিল, যার মধ্যে ৯২.৫ শতাংশই অদক্ষ এবং ৭ শতাংশ নারী।[৬] গত কয়েক বছরে এ খাতে কর্মসংস্থানের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৯ শতাংশ। ভবিষ্যতে এ খাতের উপখাত হিসেবে উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন সেবায় বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

৬ USAID/Bangladesh, 2019; Comprehensive Private Sector Assessment.

৩. কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্বে এ খাতের অবদান: টেলিযোগাযোগ খাতের সেবা প্রদানকারী, অবকাঠামো স্থাপনকারী, মূল্যসংযোজন সেবা, গ্রাহক প্রিমিজেস সরঞ্জাম (Customer Premises Equipment) /নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম ও আনুষঙ্গিক সেবা সরবরাহকারী, আমদানিকারক, উৎপাদনকারীসহ টেলিকম খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট হতে সরকার সরাসরি যেসব রাজস্ব পেয়ে থাকে তার মধ্যে রয়েছে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, সিম কর ইত্যাদি। কর-বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে রয়েছে অপারেটরের লাইসেন্স নবায়ন ও নবায়ন-বহির্ভূত নানা ফি, তরঙ্গ বরাদ্দকরণ ফি, বার্ষিক তরঙ্গ ফি, রাজস্ব ভাগাভাগি ও অন্যান্য প্রশাসনিক ফি/মাশুল/জরিমানা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় টেলিযোগাযোগ খাত থেকে সরকারের কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহের চিত্র সারণি ৬.১৬-তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.১৬: ডাক ও টেলিকম খাত থেকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের চিত্র

অর্থবছর	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনে কর-বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ (কোটি টাকায়)	
	ডাক	টেলিযোগাযোগ
২০১৩-১৪	২১৯.১৩	১০০৮৪.৯
২০১৪-১৫	২৫৩.১৭	৩৮৫৫.৮৩
২০১৫-১৬	৩০১.১৮	৪১৪২.৯১
২০১৬-১৭	৩৭০	৩৮৫৪.০৯
২০১৭-১৮	৪০৫	৬২০৪.৮৫
২০১৮-১৯	৪৪৫	৩০৪৮.৬৯

সূত্র: ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সংশ্লিষ্ট বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন

৬.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিকম খাতের জন্য নির্ধারিত অভীষ্ট, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

কৌশলগত দিকসমূহ

(ক) ডিজিটাল রূপান্তর

বিশ্বব্যাপী উদীয়মান প্রযুক্তির প্রসার, উপাত্তের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং অধিকতর দক্ষ বিশ্লেষণ ব্যক্তি, ব্যবসা-বণিজ্য ও সরকারের কার্যক্রমের গতিপথ নিয়ত পাল্টে দিচ্ছে। ডিজিটাল রূপান্তর বৈশ্বিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা ডিজিটাল প্রযুক্তি, সমাজ, সরকার, সংগঠন, শিল্প ও বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে প্রক্রিয়াকরণের ওপর জোর দিয়ে থাকে। বৈশ্বিক রূপান্তরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হলে ডিজিটাল সেবাকে বেসরকারিকরণ, ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত সেবা নিশ্চিত করতে পারা, নগদ লেনদেনবিহীন, কাগজবিহীন, সমন্বিত ও সমতাভিত্তিক হতে হবে। এ ধরণের রূপান্তরধর্মী ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশকে খাতনির্দিষ্ট সক্ষমতা ও মৌলিক আধুনিকায়নের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাহলেই কেবল এ সেবা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, কল্যাণ সাধন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে সহায়ক হবে।

দেশে ডিজিটাল রূপান্তর সম্পন্ন করতে হলে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রাধিকার ও উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ, পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ, পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সেজন্য কর্মপন্থাভিত্তিক নির্দিষ্ট লক্ষ্য-সংবলিত একটি সমন্বিত ডিজিটাল রূপান্তরকরণ কৌশল (ডিটিএস) বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এক্ষেত্রে প্রথমে টেলিযোগাযোগ শিল্পেরই রূপান্তর ঘটানো আবশ্যক। রূপান্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী (CSP) প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজিটাল সেবাদানকারী (DSP) প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হওয়া প্রয়োজন। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বহুমাত্রিক উপায়ে ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চিত্র ৬.২: ডিজিটাল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যাবশকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের সার-সংক্ষেপ

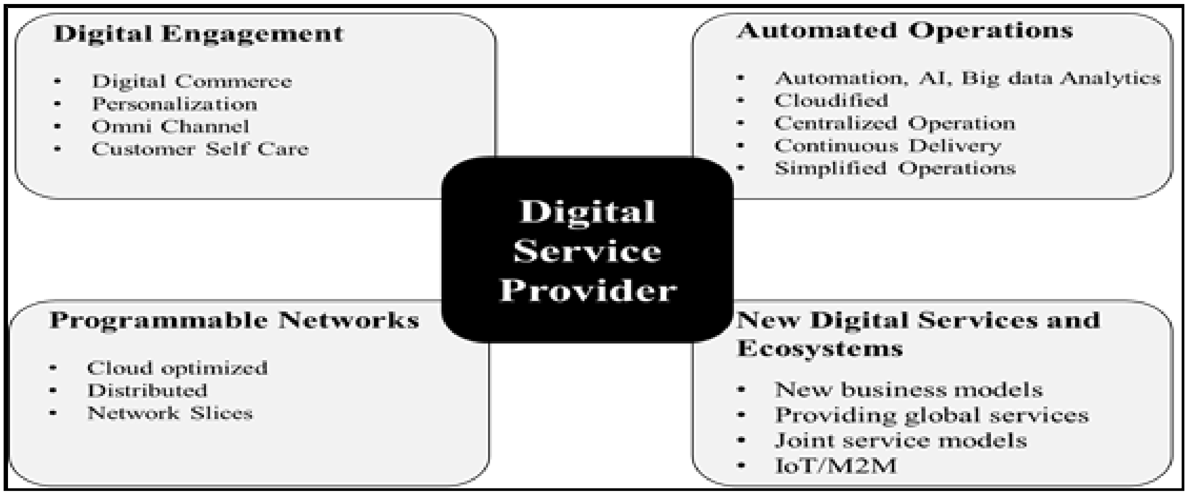

সূত্র: LM Ericsson

(খ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR)

উচ্চ গতির ডিজিটাল সংযোগ নিশ্চিতকরণ এবং অনেক ধরণের স্মার্ট প্রযুক্তি ও মৌলিক সেবার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে টেলিযোগযোগ শিল্পই হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। সেবায় অভিগম্যতা, আন্তঃসংযোগ ও বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনগুলোর যুগপৎ ব্যবহার হচ্ছে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রধান নিয়ামক, টেলিকম বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে যা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আহরণ করতে হলে টেলিযোগাযোগ শিল্পকে এমনভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাতে তা অন্যান্য খাতকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করতে পারে। বিভিন্ন ধরণের উদীয়মান প্রযুক্তি কাজে লাগানো এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের রূপান্তর ঘটাতে টেলিযোগাযোগ খাতে নতুন ব্যবসায় মডেল সংযোজন প্রয়োজন। ডিজিটাল যুগের বিভিন্ন ধরণের সেবা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও মানানসই সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় করপোরেট সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভার্টিকাল শিল্প ও ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি দেশের শিল্পখাতকে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরের জন্য বিদ্যমান নীতি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সংস্কার করা আবশ্যক।

(গ) ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক ও ৫জি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সংঘটিত নানা ঘটনাপ্রবাহ এ খাতের জন্য নতুন নতুন প্রয়োজরীয়তার অবতারণা করেছে। বর্তমান সময়ে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি স্বভাবতই ডিজিটাল অবকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জটিল প্রকৃতির নেটওয়ার্ক ডিভাইস, স্থান, কর্মপদ্ধতি, সম্পদ এবং মানুষ–সবই এ পরিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। পরিবেশগত দিক ও স্থায়িত্বের বিষয় বিবেচনায় ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার জন্য ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি প্রয়োজন হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভৌত বিষয়গুলোর ইন্টারনেট (ইন্টারনেট অব থিংকস), স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট শহর ও পরিবহন ব্যবস্থা, স্মার্ট কৃষি ও ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো নতুন নতুন খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা দ্রুততার সঙ্গে জায়গা করে নিচ্ছে। সিলিকন, অপটিক্যাল ও কম্পিউটিং প্রযুক্তির অগ্রগতি ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে কম খরচ ও কম সরঞ্জাম ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সেবার প্রয়োজনীয়তা মেটানোর বিষয়টি সম্ভবপর করে তুলেছে। ভবিষ্যতের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১১ সালের মে মাসে আইটিইউ-টি ওয়াই.৩০০১ (আইটিইউ-টি ওয়াই.৩০০১) শীর্ষক সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা চিত্র ৬.৩-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ৬.৩: ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্কের জন্য চারটি উদ্দেশ্য ও ১২টি নকশা অভীষ্ট

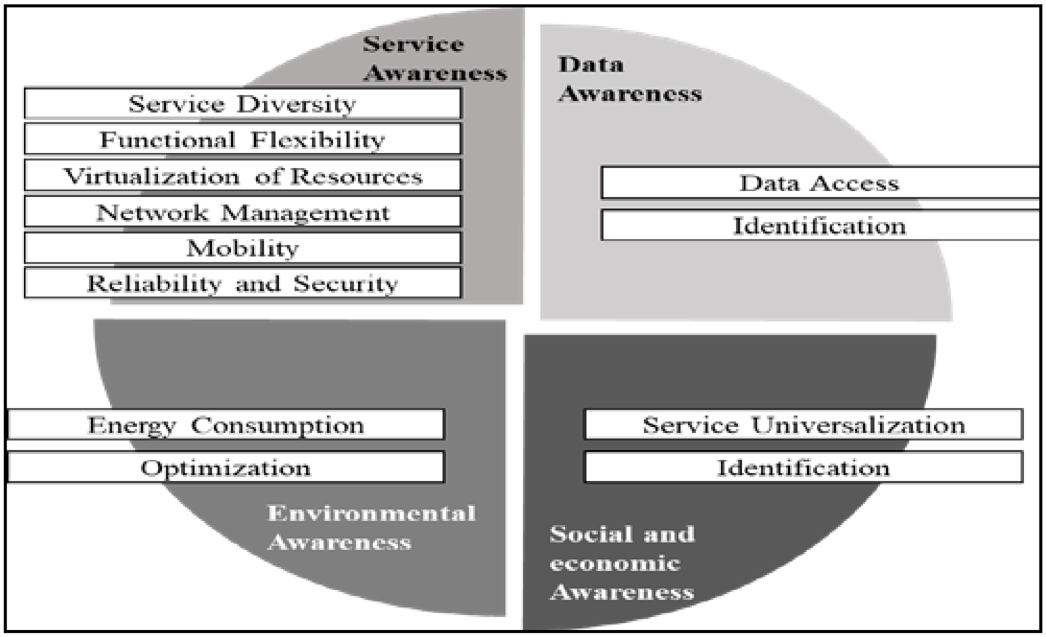

সূত্র: আইটিইউ সুপারিশ আইটিইউ-টি ওয়াই.৩০০১

ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্কের রূপকল্পের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) ২০২০ সালের মধ্যে পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল যোগাযোগ (৫জি) ব্যবস্থা বাস্তবায়নে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ডিজিটাল অর্থনীতির যুগে টেলিকম সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অবস্থানে থাকা দেশগুলোর সেবাদানকারী সংস্থাগুলো এরই মধ্যে তাদের নেটওয়ার্কগুলো ৫জিতে রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু করেছে। সাধারণত ২জি, ৩জি ও ৪জি ছিল বেতারভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা। নতুন প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি মাথায় রেখে ৫জিতে বেতার প্রযুক্তি, মৌলিক টেলিকম ও ওএসএস- এ সবকিছুর সমন্বয় করা হবে। সেবা কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের অংশ হিসেবে নতুন বেতার প্রযুক্তি, ক্লাউডভিত্তিক মৌলিক ভার্চুয়াল সেবা, সেবার প্রান্তসীমার ব্যবস্থাপনা (বহফ-ঃড়-বহফ সধহধমবসবহঃ) এবং অর্কেস্টেশনের মতো বিষয়গুলোর পাশাপাশি নেটওয়ার্ক স্লাইসিংয়ের মতো নতুন ধারণা এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা হবে। ৫জি নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. সর্বোচ্চ ২০ জিবিপিএস পর্যন্ত ডেটা সেবা;
২. ৯৯.৯৯৯ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতা;
৩. ৯৯.৯৯৯ শতাংশ নেটওয়ার্ক প্রাপ্যতা (বছরে সর্বোচ্চ ৫৩ মিনিট নেটওয়ার্ক ডাউন থাকতে পারে);
৪. শতভাগ কাভারেজ;
৫. প্রতি একক এলাকায় ১০০০ী ব্যান্ডউইথ;
৬. উচ্চমাত্রার গতিশীলতা (প্রতিঘণ্টায় প্রায় ৫০০ কিলোমিটার);
৭. নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় জ্বালানি ব্যবহার ৯০ শতাংশ কমিয়ে আনা;
৮. স্বল্প ক্ষমতার আইওটি ডিভাইসের ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত ব্যাটারির কার্যকারিতা;
৯. শক্তিশালী গ্রাহক শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, গ্রাহকের নিরাপত্তা ও নেটওয়ার্কের সুরক্ষা;

চিত্র ৬.৪: অন্যান্য প্রযুক্তির তুলনায় ৫জি প্রযুক্তির গতি

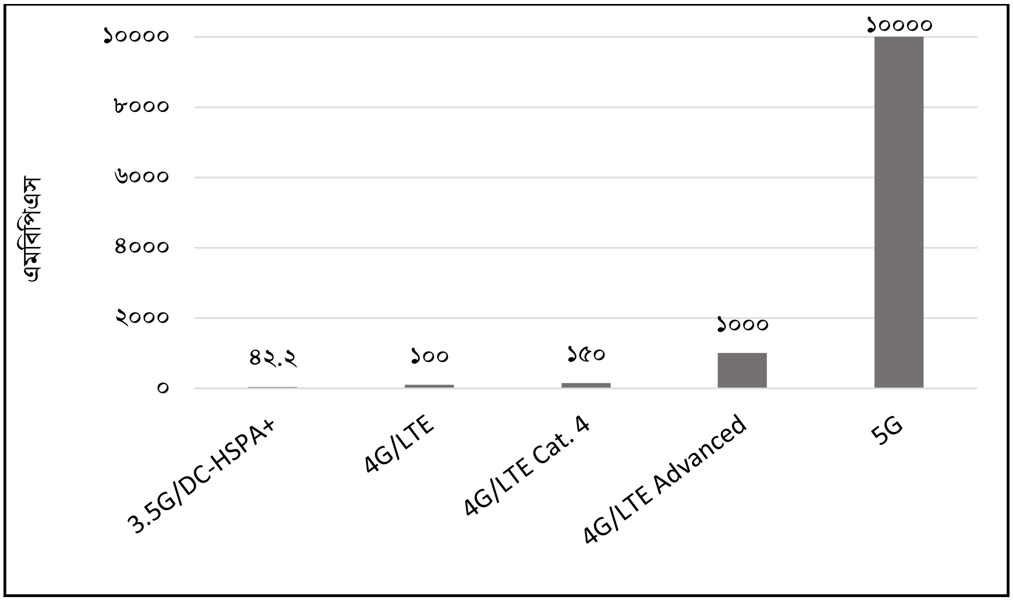

বাংলাদেশ ৩জি ও ৪জি প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে এর শেষ সময়ের দিকে, যখন পরবর্তী ধাপের প্রযুক্তি বাজারে এসে গেছে। সাবমেরিন কেব্‌ল সংযোগের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে দেশকে খাপ খাওয়ানো এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণা এগিয়ে নিতে হলে ৫জি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো স্থাপনের কাজ যথাসময়েই শুরু করতে হবে।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের অবকাঠামোগত সঞ্চালন সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

দেশে ডিজিটাল অর্থনীতির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল সংযোগের পুরোটাই সম্পন্ন হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ও টেরিস্ট্রিয়াল কেব্‌লের মাধ্যমে। যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ নিচ্ছে, তাই আন্তর্জাতিক ডিজিটাল সংযোগের গুরুত্বও অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ দেশে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের প্রবৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দেশে ব্যান্ডউইথ ব্যবহারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৭৮ শতাংশ, ৭২ শতাংশ ও ৫৩ শতাংশ।

বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রাহকপ্রতি ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের গড় হার ১৫ কেবিপিএস। অন্যদিকে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের বৈশ্বিক গড় ৭৬.৬ কেবিপিএস এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এ গড় ৬১.৭ কেবিপিএস।[৭] ফলে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রয়োজন পড়বে। সে কারণে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল সংযোগ অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ এরই মধ্যে দেশের তৃতীয় সাবমেরিন কেব্‌ল এসইএ-এমই-ডব্লিউই-৬ (ঝউঅ-গউ-ডউ-৬)-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে হলে আন্তর্জাতিক সংযোগ বাড়াতে আরও পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় আগামী দিনে ডিজিটাল সংযোগের গতি ও সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে নিয়মিতভাবে নেটওয়ার্ক সঞ্চালন সরঞ্জামের সক্ষমতা যুগোপযোগী করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভবপর হয় এবং সরঞ্জামগুলো ৫জি সেবার জন্য সহায়ক হয়। ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে আরও বেশিসংখ্যক মানুষের হাতে উচ্চগতির ডিজিটাল সংযোগ-সংবলিত ডিভাইস পৌঁছে দিতে হবে এবং ডেটা ব্যবহারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। এ খাতের কল্পিত অভীষ্ট অর্জন করতে হলে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, পরিবীক্ষণ ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি অধিকতর সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি।

৭ ITU, 2018. Measuring the Information Society Report, 2018.

(ঙ) মহাকাশ প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগানো

ডিজিটাল যোগাযোগ ও সম্প্রচার খাতে দেশের বিদ্যমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে মহাকাশের কক্ষপথে বাংলাদেশ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (বিএস-১) নামে দেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে। এ স্যাটেলাইটটি ২৬ কু-ব্যান্ড ও ১৪ সি-ব্যান্ড ট্রান্সপোন্ডার-সংবলিত। স্যাটেলাইটটি দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাংশের দেশগুলো এবং বিভিন্ন ধরণের 'স্তান' দেশগুলোয় (কাজাখাস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ইত্যাদি) সেবা দিতে সক্ষম। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল বিটিভিসহ অন্যসব টিভি চ্যানেল, ডিটিএইচ সেবাসমূহ এবং বাংলাদেশ বেতার বিএস-১-এর সাহায্যে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্যাটেলাইট সেবার ফি বাবদ বিদেশে অর্থপ্রবাহ রোধ করা এবং দেশের দুর্গম এলাকাগুলোয় বিএস-১-এর সহায়তায় সম্প্রচার সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। দেশের সম্প্রচার খাত দেশীয় স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভর করতে শুরু করায় এ মুহূর্তে দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আগামীতে ৫জি ও আইওটি সেবা চালু করার যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা হলে যোগাযোগ উপগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে উপগ্রহভিত্তিক নতুন সেবাসমূহ, যেমন ডিজিটাল অডিও সম্প্রচার (DAB), স্যাটেলাইট ফোন প্রভৃতি চালু করতে হবে।

স্যাটেলাইট বাস্তুতন্ত্রে সংযোগ ব্যবস্থা চারদিকে আবর্তিত হয়। ফলে একে তারভিত্তিক ও যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমের ঝামেলা পোহাতে হয় না। এটি সুনীল অর্থনীতির (ব্লু ইকোনোমি) সব খাত তথা অ্যাকুয়াকালচার, মৎস্য সম্পদ, উপকূলীয় পর্যটন, সামুদ্রিক পরিবহন ব্যবস্থা, গবেষণা প্রভৃতি বিষয়কে সহায়তা করতে সক্ষম। নৌবহরের ধরণ শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা, নিয়ন্ত্রণ এবং যেসব ক্ষেত্রে নজরদারি প্রয়োজন (বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে) সেসব বিষয় স্যাটেলাইটভিত্তিক জাহাজ শনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (VTMS)-এর সহায়তায় সম্ভব হবে। বাংলাদেশের স্যাটেলাইট পদ্ধতির ভিএমএস উপাত্ত অধিকতর উন্নত মওজুদ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়াকেও সহজতর করে তুলবে। ভূমি ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয়, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নৌযান থেকে তেল চুয়ানো পর্যবেক্ষণ, পানির সম্ভাব্য দূষণকারীকে শনাক্তকরণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন ও গভীর সমুদ্রে জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণে স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

(চ) ডিজিটাল সুরক্ষা ও গোপনীয়তা

ডিজিটাল ও উপাত্তভিত্তিক সমাজ এবং অর্থনীতির বিস্তার সাধনে ডিজিটাল নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ডিজিটাল সেবাসংক্রান্ত নানা ধরণের হুমকি (সাইবার থ্রেট) প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভয়ংকর মাত্রায় দ্রুততার সঙ্গে তা রূপ পাল্টাচ্ছে। ডিজিটাল ও ভৌত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা প্রাত্যহিক জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

ডিজিটাল অপরাধসমূহ, যা সাধারণত সাইবার অপরাধ হিসেবে পরিচিত, কম্পিউটার-সম্পর্কিত অপরাধসমূহ, উচ্চ-প্রযুক্তির অপরাধ বা যে অপরাধ বড় মাপের বেআইনি কাজের ঝুঁকি তৈরি করে প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল ডিভাইসের অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। ডিজিটাল ডিভাইস ও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে গতানুগতিক অপরাধ সংঘটনের ঘটনাও পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার শিকার ব্যক্তির সঙ্গে ডিজিটাল অপরাধের সরাসরি কোনো সংযোগ নাও থাকতে পারে। কম দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সম্পদ যেমন তথ্য, উপাত্ত ও নেটওয়ার্ক এ ধরণের অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃত অপরাধ সংঘটনের অনেক পরে ভুক্তভোগী বিষয়টি শনাক্ত করতে পারেন। দুষ্কৃতকারীরা প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে বেশ স্বচ্ছন্দেই বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত চুরি করে নিতে সক্ষম এবং একটি একক অপরাধ অনেকগুলো স্থানের অসংখ্য মানুষের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

ডিজিটাল অপরাধ সংঘটনের সুযোগ অনেক বেশি বিস্তৃত ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। ডিজিটাল অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তা হরণ, অবৈধভাবে কারও সিস্টেমে প্রবেশ (হ্যাকিং, ক্র্যাকিং) করে সহজেই তার ডেটা চুরি, অবৈধ উপায়ে ডেটা অধিগ্রহণ (ডেটার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি), ডেটা অবৈধভাবে আটক করা, ডেটা শোষণ করা (Exploitation of data) এবং সিস্টেমের ওপর হস্তক্ষেপ প্রভৃতি। কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতারণা ও কম্পিউটার-সম্পর্কিত প্রতারণা, কম্পিউটার-সম্পর্কিত জালিয়াতি, পরিচয় নিয়ে প্রতারণা, ডিভাইসের অপব্যবহার প্রভৃতি। কনটেন্ট-সম্পর্কীয় সাইবার অপরাধের মধ্যে রয়েছে পর্নগ্রাফি-সম্পর্কিত বিষয়াদি, শিশু পর্নগ্রাফি, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপরাধসমূহ, অবৈধ জুয়া ও অনুপযুক্ত অনলাইন গেম, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য, স্প্যাম ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত হুমকিসমূহ, অন্যান্য প্রকৃতির অবৈধ কনটেন্ট (যেমন: বিস্ফোরক ও অবৈধ মাদকদ্রব্য তৈরি-সংক্রান্ত ভিডিও) প্রভৃতি। বিভিন্ন ডিজিটাল অপরাধের সমন্বিত রূপের মধ্যে রয়েছে সাইবার যুদ্ধ, সাইবার লন্ডারিং (অর্থ পাচার, মুদ্রা পাচার) এবং ফিশিং।

অপরাধীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অপরাধ সংঘটন করে থাকে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইন্টারনেটের ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে অপপ্রচার চালানো, তথ্য সংগ্রহ, অনলাইনে হামলার প্রস্তুতি, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নথি প্রকাশ, সন্ত্রাসী যোগাযোগ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে হামলা প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ডিজিটাল সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধসমূহ, যেমন ব্রড-সুইম কেলেঙ্কারির মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, অনলাইনে কোনো লিংক বা কোনো ওয়েব পেজ ভিজিট করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে প্রলুব্ধ করা এবং তার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে ম্যালওয়্যারের প্রবেশ ঘটানো, অসাবধানতাবশত সৃষ্ট ব্যক্তিগত কোনো বিষয় খুঁজে বের করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা, মৌলবাদী কোনো ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা, চুরি করা তথ্য নিয়ে ব্যবসা করা, কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করা, বুলিং, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছড়ানো এবং উগ্রবাদ ছড়ানোর মতো কর্মকাণ্ড সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সততা বিনষ্টে ভূমিকা রাখে। অধিকন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোয় মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘন বড় ধরণের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইওটি/এম২এম, সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো নতুন ধরণের প্রযুক্তির আবির্ভাব বিচার বিভাগ, আইনজীবী এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রয়োগ ও কমপ্লায়েন্স পেশাজীবীদের জন্য বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ বয়ে আনছে। যেহেতু সামগ্রিক ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে চূড়ান্ত অভীষ্ট, তাই এক্ষেত্রে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, শিল্প, বাণিজ্য, ভোগ্যপণ্য ও সেবার নিরাপত্তা বিধান করা এবং এগুলোর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ আকারে দেখা দিয়েছে।

আন্তঃসংযুক্ত ডিজিটাল বিশ্বে আরেকটি জরুরি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা বিধান। এ বিষয়টি এ কারণে চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে যে, বর্তমানে সামাজিক যোগযোগমাধ্যম, ইমেইল সেবা, ওয়েবসাইট, ব্লগ, অনলাইন কেনাকাটা, অনলাইন জিজ্ঞাসা প্রভৃতি ডিজিটাল উৎস থেকে একনজরে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার্থে এসব বিষয় নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও আচরণবিধি নির্ধারণ অত্যাবশকীয় হয়ে পড়েছে, কেননা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা একজন ব্যক্তির অধিকার। একজন ব্যক্তি কী উদ্দেশে, কী ধরণের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে রাখবেন, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ অধিকার একজন ব্যক্তিকে তার তথ্য সংশোধন অথবা প্রয়োজনবোধে মুছে ফেলার এখতিয়ার দেয়। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার স্বভাবজাত জীবনাচরণ প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে, যদিও বর্তমান ডিজিটাল যুগে একজন জীবন্ত মানুষের অতীত শনাক্তকরণে এ তথ্য কতটা ফলদায়ক, তা নিশ্চিত নয়। এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় থেকে যায় একজন মৃত ব্যক্তির তথ্যের মালিকানা নিয়ে। তাই নতুন আইন, নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও আচরণবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু বিষয়ে নমনীয়তা থাকতে হবে, যেমন প্রযুক্তির পরিবর্তনশীলতা এবং ভুল তথ্য অথবা গোপনীয়তার ঘাটতির জন্য একজন ব্যক্তির কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পরিমাপ করা।

বর্তমান এই আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে যেসব বিষয়বস্তু অনলাইনে বিদ্যমান আছে, তা তৃতীয় যেকোনো দেশে স্থানান্তর করা সম্ভব। এটি ডিজিটাল অর্থনীতির কোন ধরণের উপজাত পণ্য নয়, বরং এটিই ডিজিটাল অর্থনীতি। ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু নিরাপত্তার বিষয়ে অবশ্যই বিশেষ বিবেচনা প্রয়োজন। কারণ বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা, জনগণের আস্থা ও সরকারের আত্মবিশ্বাস, অথবা সরকারের নির্দিষ্ট কিছু মূল কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সম্পদের অধিকার সংরক্ষণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জাতীয় প্রতিরক্ষার মতো বিষয়গুলো জড়িত।

(ছ) যথাযথ মানে উন্নীতকরণের ঘাটতি পূরণ

ডিজিটাল ডিভাইসসমূহ এবং যোগাযোগ/পরিচালন ব্যবস্থা যথাযথ মানে উন্নীত করার প্রাথমিক অভীষ্ট হচ্ছে ডিভাইস, পদ্ধতি ও সেবাসমূহের মধ্যে সঠিক উপায়ে আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃপরিচালন নিশ্চিত করা, উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা এবং সর্বোপরি এ-সংক্রান্ত বাজারকে উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক রাখা। একই সঙ্গে মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রার পূর্বানুমান, ধারাবাহিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাতে অব্যাহত থাকে। উপযুক্ত মানের টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ডিজিটাল বাজারের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সেবাসমূহের এই বিশ্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের যথাযথ মান নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, গ্রহণ বা মানোন্নয়ন করা না হলে তাতে অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র হতে পারে।

(জ) ভৌত বিষয়সমূহের ইন্টারনেটে প্রযুক্তি (আইওটি) ও যন্ত্র থেকে যন্ত্রে (এম২এম) যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা

গত কয়েক বছরে আইওটি ও এম২এম প্রযুক্তি সমসাময়িক ডিজিটাল অবকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। আইওটি বিদ্যমান ও বিকশিত আন্তঃসংযোগ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ, প্রক্রিয়া এবং বস্তু/দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা সরবরাহের সক্ষমতা দান করে। শনাক্তকরণ, ডেটা ক্যাপচার, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং যোগাযোগের সক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে আইওটি বস্তু/দ্রব্য সামগ্রীর সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে। এম২এম হচ্ছে আইওটির অগ্রদূত, যার ওপরে ভর করে আইওটির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে এম২এম বিভিন্ন যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে যন্ত্রের আন্তঃসংযোগ সম্পন্ন করে থাকে। এসব প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক সংযোগ, পিএসটিএন/ডিএসএল, আইইইই ৮০২.৩ ইথারনেটস, ওয়াই-ফাই (আইইইই ৮০২.১১ এ/জি/এন/এসি/পি), ডব্লিউআই-গিগ (আইইইই ৮০২.১১.এডি), জেড-ওয়েভ (আইটিইউ-টি জি.৯৯৫৯), ডব্লিউপিএএনস (ব্লুটুথ (আইইইই ৮০২.১৫.১), জিগবি/৬ এলওডব্লিউপিএন (আইইইই ৮০২.১৫.৪), ড্যাশ৭ (আইএসও/আইসিসি ১৮০০০-৭) প্রভৃতি), পাওয়ার লাইন সংযোগ (পিএলসি), ২জি/৩জি/৪জি/৫জি, স্যাটেলাইট ইত্যাদি।

আইওটিতে সংযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক শনাক্তকরণ সক্ষমতা এবং মোকাবেলা করা, প্রক্রিয়াকরণ, নেটওয়ার্কিং ও সেন্সিং পদ্ধতি; বস্তুর সঙ্গে বস্তুর এবং বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ, বিভিন্ন উৎস যেমন বস্তু শনাক্তকরণ মাধ্যম, সেন্সর প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; ব্যবহারকারীর সম্মতি ব্যতীত তার যন্ত্রের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ এবং কার্যকারিতার ক্ষেত্রের ভিত্তিতে ভিন্নধর্মী বস্তুসমূহের কার্যক্রম। নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ পরিকল্পনা, পরিষেবার মানোন্নয়ন, গোপনীয়তা রক্ষা, ডেটার সুরক্ষা ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোয় নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয়তা ও বহুধা ব্যবহারের সুযোগের ফলে নেটওয়ার্ক, পরিষেবা প্রদানকারী ও বিভিন্নসংখ্যক ডিভাইসের সঙ্গে আইওটি/এম২এম-এর ক্রমবর্ধমান জটিল সম্পর্ক নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইওটি বিষয়ে দেশে যথাযথ আইনি কাঠামো, প্রযুক্তিগত মান এবং নির্দেশিকা এখনো প্রস্তুত হয়নি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কার্যসিদ্ধির সক্ষমতা অর্জনকারী একটি ডিজিটাল সংযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশনা-সংবলিত আইনি কাঠামো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি করতে হবে।

(ঝ) কম্পিউটিং খাতে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য ক্লাউড অবকাঠামো

সেবাদানের ক্ষেত্রের ভিত্তিতে ক্লাউডকে সরকারি, বেসরকারি, হাইব্রিড ও কমিউনিটি ক্লাউড হিসেবে বিভক্ত করা যেতে পারে। ক্লাউডের পরিষেবার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘অবকাঠামো-হিসেবে-একটি-পরিষেবা (IaaS)’, ‘প্ল্যাটফর্ম-হিসেবে-একটি-পরিষেবা (PaaS) ’, ‘সফটওয়্যার-হিসেবে-একটি-পরিষেবা (SaaS)’ বা পরিচালন, সংরক্ষণ, ডেটাবেস, প্রক্রিয়া, সুরক্ষা, প্রয়োগ, পরীক্ষা-হিসেবে-একটি-পরিষেবা। এনআইএসটি ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সংজ্ঞায়িত করেছে। সেগুলো হলো–নিজস্ব পরিষেবা চাহিদা, ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস, রিসোর্স পুলিং, দ্রুত স্থিতিস্থাপকতা ও পরিমাপসম্পন্ন পরিষেবা।

ক্লাউড অবকাঠামোর সম্প্রসারণের ফলে নিজেদের ডেটা সেন্টারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে যে অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হতো, তার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এখন এসএমইর মতো ছোট উদ্যোগগুলোও শক্তিশালী বিভিন্ন ডিজিটাল সম্পদে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে, আগে যা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ডিজিটাল রূপান্তরকরণের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী কাঙ্খিত কম্পিউটিং সম্পদের প্রাপ্যতা একটি সম্ভাবনাময় নিয়মাক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ডিজিটাল অবকাঠামোতে ক্লাউড ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে কনটেন্টের দ্বৈততা পরিহার, বাজেট হ্রাস করা, পরিষেবাসমূহের অধিকতর সংহতকরণ, নমনীয়তা, জ্বালানি দক্ষতা, উদ্ভাবন-সহায়ক ও তুলনামূলকভাবে ভালো মানের ডেটা সুরক্ষা। আইওটি ও এম২এম-এর উদ্ভব এবং নতুন প্রজন্মের ডিজিটাল সংযোগের (যেমন ৫ জি) মাধ্যমে পুরো ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্র ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে ফলপ্রসূ করে তুলতে ভূমিকা রাখবে ক্লাউড অবকাঠামো।

(ঞ) ডিজিটাল বৈষম্য

যে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলোর সুবিধা পাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে এসব সুবিধা না পাওয়াদের ব্যবধানই হচ্ছে ‘ডিজিটাল বৈষম্য’ (ডিজিটাল ডিভাইড)। ইন্টারনেটসহ ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলোর সহজলভ্যতা এবং তা প্রাপ্তিতে সামর্থ ও ব্যবহারের দক্ষতার বিষয়ে জাতিতাত্ত্বিক, অঞ্চল, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্যই হলো ডিজিটাল ডিভাইড। অন্যদিকে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকরণ বলতে বোঝায় জেন্ডার, স্থান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, ধর্ম ও সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করা, যাতে তারা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে পূর্ণমাত্রায় অংশ নিতে এবং এর সুফল পেতে পারে।

যে সকল মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ করতে পারে না, ডিজিটাল ডিভাইড তাদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার সৃষ্টি করে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে কীভাবে জীবনযাপন, শিক্ষণ ও উপার্জন কার্যক্রম পরিচালিত হবে, তা নির্ধারিত হবে ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যাদের কাছে ইন্টারনেটের সংযোগসহ বিভিন্ন অ্যাপ-সংবলিত স্মার্টফোন রয়েছে (যারা ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহ পরিচালনা ও ক্রয় করতে সক্ষম), তাদের জীবনযাপন সহজতর ও উৎপাদনমুখী হবে। অন্যদিকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে যাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই বা উপযুক্ত সংযোগ-সংবলিত ডিজিটাল ডিভাইস নেই, তাদের জীবনযাত্রা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। সেজন্যই যাদের হাতে প্রযুক্তি আছে আর যাদের হাতে নেই, এ দুই শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য দেখা দেবে। এআই, রোবোটিক্স, আইওটি ও ব্লকচেইনের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তির আবিষ্কার ক্রমান্বয়ে শ্রম শক্তির বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ফলে উদ্ভাবকগণ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধাভোগী হবেন। অন্যদিকে যাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বন্দি এবং বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে যারা পুরোপুরি সংযুক্ত নন, তাদের নির্ভর করতে হবে শ্রমভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অসমতাগুলো যদি সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করা না যায়, তাহলে তা অর্থনীতি ও সমাজের জন্য বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে।

(ট) ডিজিটাল দক্ষতার পরিবর্তনশীল চাহিদা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবটি হবে বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করবে। যাহোক আগামী দিনে শ্রমবাজারের ওপর অধিকতর ডিজিটাইজেশন, রোবোটিকসের ব্যবহার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্বয়ংক্রিয়করণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। নিঃসন্দেহে পরিবর্তনের এ নতুন উদ্যোগ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। তবে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান কোটি কোটি চাকরিও হুমকির সম্মুখীন হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই এ চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হবে।

ম্যাককিনসে গ্লোবাল ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষার সূত্র ধরে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (WEF) জানিয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ সমীক্ষাভুক্ত ৪২ দেশেই ৮০০ মিলিয়ন (আট কোটি) মানুষ চাকরি হারাবে।[৮] এসবের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতির কারণে দেশে-বিদেশে লাখ লাখ অদক্ষ বাংলাদেশি চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে, ২০২০ সালের পরে চাকরির বাজারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে একজন ব্যক্তির মৌলিক (জেনেরিক) দক্ষতা থাকতে হবে। এ দক্ষতার মধ্যে রয়েছে জটিল সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসু চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অন্যের সঙ্গে সমন্বয়, সংবেদনশীল বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, বিভিন্ন ধরণের পরিষেবার সন্নিবেশ ঘটানো, দর কষাকষির সক্ষমতা এবং জ্ঞান সম্পর্কীয় নমনীয়তা। যাহোক, ডিজিটাল দক্ষতা হচ্ছে নির্দিষ্ট দক্ষতা, যা উদ্ভাবনমূলক জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা ও বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তির প্রয়োজনীয়তার একটি মূল্যায়ন হওয়া দরকার, যে জনশক্তি চলমান ডিজিটাল বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করবে। এ জনশক্তি তৈরির জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী বিপুলসংখ্যক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যমান ইনস্টিটিউটগুলোতে সর্বাধুনিক মানের সুবিধাসমূহের সংযোজন ঘটিয়ে এবং উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে যথাযথ মানে উন্নীত করতে হবে। প্রযুক্তির নতুন দিগন্তের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম জনবল তৈরির জন্য শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল যোগাযোগ ও পরিষেবা খাতের গবেষণা পরিচালনা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ও মানব সম্পদ উন্নয়নের পুরো কার্যক্রমকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(ঠ) গবেষণা ও উন্নয়ন এবং ডিজিটাল ডিভাইসের স্থানীয় উৎপাদন

বর্তমানে বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্প লিমিটেডের অপটিক্যাল ফাইবার তার ও তারের নালি বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এটি উৎসাহব্যাঞ্জক যে, বিদেশের বাজারে এরই মধ্যে বেসরকারি খাতের কিছু কোম্পানি নানা ধরণের ডিজিটাল ডিভাইস যেমন মোবাইল হ্যান্ডসেট ও আইওটি ডিভাইস রপ্তানি শুরু করেছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানো ও বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেডও ডিজিটাল ডিভাইস ও সহযোগী উপকরণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রধান কাজই সম্পন্ন হবে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে।

---

৮ McKinsey Global Institute, 2017. Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.

দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়াতে সফটওয়্যার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম তৈরির বৈশ্বিক উদ্যোক্তাদের এখানে কার্যক্রম শুরুর সুযোগ বাড়াতে হবে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য দেশীয় বাজার, আঞ্চলিক বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের সুযোগ করে দিতে হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল পণ্য উৎপাদনে দেশীয় সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের সুযোগ রাখতে হবে। এছাড়া উচ্চ মানসম্পন্ন নতুন পণ্য ও সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে হলে উৎপাদনকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ, পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে একটি ঐকতান প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

৬.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেলিযোগাযোগ খাতের কৌশলসমূহ

(ক) ডিজিটাল রূপান্তর

১. ২০২১ সালের মধ্যে একটি সমন্বিত ডিজিটাল রূপান্তর কৌশল (DTS) প্রণয়ন সম্পন্ন করা।

২. ডিজিটাল রূপান্তর কৌশল (DTS) বাস্তবায়নে ২০২১ সালের মধ্যে কয়েকটি পর্যায়ভিত্তিক রোডম্যাপ প্রণয়ন করা।

৩. জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক সংযোজন/অথবা বিদ্যমান নেটওয়ার্কের বিলুপ্তি ঘটিয়ে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরির রূপরেখা প্রণয়ন।

৪. ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রমকে সহায়তা করতে নির্দেশনা, নির্দেশিকা, আইন, বিধিসহ অন্যান্য আইনি কাঠামো সংশোধন এবং/অথবা প্রণয়ন করা হবে।

(খ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR)

১. শিল্পাঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) ও এসএমই প্রতিষ্ঠান-সমৃদ্ধ এলাকাগুলোয় উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ, আইওটি, ক্লাউড পরিষেবা এবং এআই-ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম সহজলভ্যকরণ।

২. উদীয়মান প্রযুক্তিভিত্তিক পরিষেবা সরবরাহের জন্য এ খাতের সুযোগগুলোর মূল্যায়ন এবং এ ক্ষেত্রগুলোতে এগিয়ে আসার জন্য বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেয়া।

৩. পরিষেবা সরবরাহকারীদের দ্রুত নেটওয়ার্ক এবং সাংগঠনিক রূপান্তরের জন্য লাইসেন্সিং এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার সংস্কার করা।

৪. উৎপাদনকারী সংস্থার সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মার্ট কারখানা ও স্মার্ট উৎপাদনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা।

৫. দেশের বিভিন্ন জায়গায় 'স্মার্ট শহর' ও 'স্মার্ট কৃষি' প্রচলন করা।

(খ) ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক ও ৫জি

১. বিদ্যমান নেটওয়ার্ক ও পরিষেবাগুলোর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং ২০২১ সালের জুনের মধ্যে ৫জির অন্য সহযোগী পরিষেবাগুলো নির্বিঘ্নে স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবর্তনের রূপরেখা নির্ধারণ।

২. ৫জি নেটওয়ার্কের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ তরঙ্গ বরাদ্দের রূপরেখা প্রস্তুত করা।

৩. ২০২১ সালের জুনের মধ্যে দেশে ৫জি নেটওয়ার্ক চালু করা।

৪. কৃষি, পরিবহন, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও উৎপাদন শিল্পের মতো উল্লেখযোগ্য খাতে ব্যবহারের জন্য ৫জি পরীক্ষমূলকভাবে চালু করা।

৫. ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের সকল জেলা ও মেট্রোপলিটন শহর, শিল্প এলাকা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ৫জি নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা।

৬. ৫জি ও এর সহযোগী পরিষেবাগুলো সুচারুভাবে চালু করার জন্য বিদ্যমান নির্দেশনা/নির্দেশিকা/আইন/বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা অথবা প্রয়োজনমতো নতুন আইন প্রণয়ন করা।

৭. ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্কের প্রয়োজনানুসারে বিদ্যমান গণ টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর অবকাঠামো মানোন্নয়ন কার্যক্রম উৎসাহিত করা।

(ঘ) অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সঞ্চালন সক্ষমতা

১. ভবিষ্যতের নেটওয়ার্কগুলোর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ২০১০ সালের আন্তর্জাতিক দূরবর্তী টেলিযোগাযোগ পরিষেবা নীতি সংশোধন করা।

২. বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার এবং প্রত্যাশিত উন্নয়নের কথা বিবেচনায় রেখে আন্তর্জাতিক সাবমেরিন/টেরিস্ট্রিয়াল কেব্‌ল সংযোগ বাড়ানো।

৩. নির্বিঘ্ন আন্তর্জাতিক সংযোগ নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক কেব্‌লগুলোর সঙ্গে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

৪. টার্মিনাল সরঞ্জামের হালনাগাদকরণের মাধ্যমে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সাবমেরিন/টেরিস্ট্রিয়াল কেব্‌লের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫. যতটা সম্ভব দেশের সকল ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সঞ্চালন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা।

৬. প্রত্যন্ত অঞ্চল/নদী চর/উপকূলীয় অঞ্চল/ দ্বীপপুঞ্জ/পার্বত্য অঞ্চলসহ সকল দুর্গম এলাকা যেখানে স্যাটেলাইট পরিষেবা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর নয়, সেখানে অপটিক্যাল ফাইবার/মাইক্রোওয়েভ-ভিত্তিক সঞ্চালন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

৭. আসন্ন আন্তর্জাতিক কেব্‌লগুলো সংযোগ করার জায়গাগুলোতে পর্যাপ্ত ব্যাকহোল সঞ্চালন সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৮. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাকহোল সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তার নিয়মিত মূল্যায়ন এবং তদনুসারে সঞ্চালন সরঞ্জামাদির মানোন্নয়ন।

৯. নেটওয়ার্কের তারগুলো সুবিধামতো স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড লিমিটেডের সাথে সমন্বয় করা।

(ঙ) মহাকাশ প্রযুক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগানো

১. দেশের উন্নয়নের সুবিধার্থে মহাকাশ প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত জাতীয় মহাকাশ কৌশল প্রণয়ন।

২. মহাকাশ প্রযুক্তির সাহায্যে সুনীল অর্থনীতির জন্য সহায়ক কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

৩. সড়ক ও নৌ পরিবহন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে প্রয়োগ উপযোগী যোগাযোগ স্যাটেলাইটভিত্তিক নতুন পরিষেবা উন্নয়ন ও ব্যবহার।

৪. উদ্ভাবনী ডিজিটাল সলুশন ও অ্যাপ্লিকেশনের উন্নয়নে বিনিয়োগ আকর্ষণে বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা।

৫. স্যাটেলাইট পরিষেবার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এবং 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১'-এর ওপর চাপ কমাতে পরবর্তী প্রজন্মের স্যাটেলাইট পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং ২০২৩ সালের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' চালু করার কাজ সম্পন্ন করা।

৬. মহাকাশ প্রযুক্তিতে জাতীয় দক্ষতা এবং অংশীদারিত্বের বিকাশ, গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ, কর্মসূচির সমন্বয় ও জাতীয় উদ্যোগসমূহের সমন্বয় আবশ্যক। একই সঙ্গে লব্ধ জ্ঞান হস্তান্তরের জন্য বিশেষায়িত কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৭. উপগ্রহ পরিষেবার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নদীর চর, উপকূল, পার্বত্য অঞ্চল ও দুর্গম এলাকায় কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৮. জাতীয় দুর্যোগ ও সংকট ব্যবস্থাপনায় উপগ্রহ পরিষেবা ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৯. মহাকাশ প্রযুক্তিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব উৎসাহিতকরণ।

১০. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে মহাকাশ প্রযুক্তি সলুশন হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।

১১. উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় সক্ষমতা বাড়ানো।

১২. অন্যান্য স্যাটেলাইট অপারেটরদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করা।

১৩. ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ মালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এমন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ও কক্ষপথের অবস্থান শনাক্ত করা।

১৪. মহাকাশ খাতে পরিচালনা ও সুশাসন নিশ্চিতে একটি সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ও কতৃত্বের কাঠামো তৈরি করা।

১৫. তরঙ্গ ও কক্ষপথ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিস্থিতিগত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মান ও পদ্ধতির বিকাশ সাধন।

(চ) ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

১. সাইবার হামলা প্রতিরোধ বা প্রশমন, নিরাপত্তার ধারণা, নিরাপত্তার রক্ষাকবজ, নির্দেশিকাসমূহ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চা, নিশ্চয়তা এবং সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারীদের জন্য সমন্বিত প্রযুক্তিসম্বলিত ঝুঁকি হ্রাসে গাইডলাইন প্রকাশ করা।

২. আইটিইউ-টি সুপারিশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চাসমূহ, যেমন টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীদের জন্য সুরক্ষা নির্দেশিকা তৈরি করা ইটিএসআই, এফআইআরএসটি, আইইটিএফ, আইইইই, আইএসও/আইসিসি জেটিসি ১, ওএএসআইএস, ওএমএ, টিসিজি, ৩ জিপিপি/৩ জিপিপি ২ প্রভৃতির মান অনুসরণ করে নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন।

৩. বেসরকারি খাতে নিরাপদ নেটওয়ার্ক ও নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রণয়ন।

৪. সিপিই ও অ্যাপ্লিকেশনসহ টেলিযোগযোগ ব্যবস্থার সমস্ত বিল্ডিং ব্লকের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা মূল্যায়ন করা।

৫. প্রতিশ্রুত কাঠামোর নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে সরকারি টেলিকম নেটওয়ার্কগুলো নিরীক্ষা করা।

৬. সুরক্ষা মূল্যায়ন সম্পাদন এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কগুলোর জন্য সময়াবদ্ধ প্রত্যায়নপত্র জারি করা।

৭. চাহিদা অনুসারে নিরাপত্তা মূল্যায়ন করা এবং সে বিষয়ে প্রতিবেদন/সুপারিশ সরবরাহ করা।

৮. একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিচালনা কেন্দ্র (এসওসি) স্থাপন করা।

৯. ডিজিটাল নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা-সম্পর্কিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো।

১০. ডিজিটাল স্পেসে গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত উপাত্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন।

১১. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করা।

১২. ব্যবস্থাপনা/গভর্ন্যান্স; স্থপতি/নকশাকার (ডিজিটাল অবকাঠামো, সফ্টওয়্যার, প্রমাণীকরণ এবং অনুমোদনের অবকাঠামো প্রভৃতি); প্রশাসক/পরিচালনাকারী (সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম প্রশাসক, টেলিকম/নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার); নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ; ব্যবহারকারী সমন্বয়কারী (ব্যবহারকারীদের সেবাদানে নিয়োজিত প্রধান ব্যক্তি); ব্যবহারকারী এবং বিশেষ গোষ্ঠী; সফটওয়্যার ডেভেলপার; এবং হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার অধিগ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ডিজিটাল সুরক্ষার বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নিবেদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

(ছ) মানোন্নয়নের ঘাটতি পূরণ

১. একটি নিবেদিত জাতীয় টেলিযোগাযোগ ও ডিজিটাল মান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. একটি জাতীয় টেলিযোগাযোগ এবং ডিজিটাল মান কৌশল প্রতিষ্ঠা এবং পর্যালোচনাভিত্তিক আইন, বিধিবিধান ও নীতি প্রণয়ন।

৩. পণ্য ক্রয় বা পণ্য বিকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় ব্যবহার মান প্রয়োগ করা।

৪. জাতীয় মানের ভিত্তিতে ডিজিটাল পণ্য ও বাজারের শেয়ারে স্থানীয় উৎপাদনের অবস্থান শক্তিশালী করা।

৫. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ডিজিটাল মান উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমূহে অংশগ্রহণ।

৬. মান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিল্প ও একাডেমিয়াদের যুক্ত করা।

(জ) ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) এবং যন্ত্র থেকে যন্ত্রে (M2M) যোগাযোগ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা

১. বৈশ্বিক মানদণ্ডের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আইওটি/এমএম২এম-এর জন্য দেশীয় মান নির্ধারণ করা।

২. আইওটি/এম২এম স্থানীয় অঞ্চল নেটওয়ার্ক স্তরের জন্য উপযুক্ত তরঙ্গ বরাদ্দ করা।

৩. আইওটি/এম২এম-এর সংখ্যাগত বিষয়সমূহের সংস্থানকল্পে জাতীয় সংখ্যায়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।

৪. যথাযথ গাইডলাইন বা নির্দেশনার মাধ্যমে আন্তঃঅপারেটর রোমিং ও আন্তঃনেটওয়ার্ক গতিশীলতা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো মোকাবিলা করা।

৫. কেওয়াইসি (KYC) ও গ্রাহক শনাক্তকরণের পাশাপাশি গোপনীয়তা ও ডেটা সুরক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়গুলো মোকাবিলা করা।

৬. আইওটি/এম২এম-এর জন্য সুরক্ষা ও আইনগত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ।

৭. পণ্যের সনদ প্রদানের পাশাপাশি আইওটি/এম২এম ডিভাইসগুলোর দেশীয় উৎপাদন ও বিকাশ উৎসাহিত করা।

৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ।

৯. বিশেষত স্বাস্থ্য, কৃষি, নিরাপত্তা ও নজরদারি প্রভৃতি খাতে আইওটি/এম২এম ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও এটি ব্যবহারের সুবিধা বিষয়ে অবহিত হয়ে এখানে তথ্য দেয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

(ঝ) ভবিষ্যতের কম্পিউটিং প্রয়োজনের নিরিখে ক্লাউড অবকাঠামো

১. দেশে ও দেশের বাইরে ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সনদ/অনুমোদন দানের লক্ষ্যে যথাযথ ক্ষমতা প্রদান করে একটি সরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। এ প্রতিষ্ঠান ক্লাউড কাঠামো প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ, মান নির্ধারণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ, সুরক্ষা ও উপাত্তের নিরাপত্তার বিষয়সমূহ, তদারকি নির্দেশিকা ও প্রাসঙ্গিক আইন বাস্তবায়ন করবে।

২. উত্তরাধিকার ব্যবস্থার রূপান্তর ও স্থানান্তরের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন।

৩. ধারণা প্রমাণের লক্ষ্যে রূপান্তর ও একীকরণের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ।

৪. সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে প্রচার প্রচারণা ও কর্মশালা আয়োজনের পাশাপাশি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. ক্লাউড অবকাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগত ডেটা, গোপনীয়তা, সরকারি সংরক্ষণাগার, বুককিপিং প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত আইনগত বিষয়াদি নিশ্চিত করা।

(ঞ) 'ডিজিটাল ডিভাইড' মোকাবিলা

১. শহর ও গ্রামাঞ্চল নির্বিশেষে সারা দেশে উচ্চ গতির এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারিত করা।

২. সকল নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের ও সহজেই ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল ডিভাইস সহজপ্রাপ্য করা।

৩. স্থানীয় ভাষায় প্রচুর পরিমাণে দরকারি উপাদান তৈরি ও তার বিতরণ।

৪. ব্যবহারকারীবান্ধব উপায়ে ডিজিটাল মাধ্যমে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৫. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সেগুলো থেকে কীভাবে সুবিধা অর্জন করা যায়, সে বিষয়ে দেশের মানুষকে শিক্ষা দান করা।

৬. ডিজিটাল প্রযুক্তির বিষয়সমূহ নতুন প্রজন্মের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা।

৭. ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ন্যূনতম ধারণা প্রদানের জন্য বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮. তথ্য অধিকার, আইনি উপায়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নীতিনির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে নাগরিক অধিকারকে শক্তিশালীকরণ এবং সকল বাংলাদেশির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উন্নয়ন সাধন করে বৈষম্যহীন, সাশ্রয়ী ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

(ট) ডিজিটাল দক্ষতার চাহিদা মোকাবিলা

১. ডিজিটাল ডিভাইড নিরসনে নিয়মিতভাবে এ বিষয়ে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সহায়ক সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে সরকারি উদ্যোগে একটি মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা।

২. ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনতে গৃহীত সরকারের বিদ্যমান নীতি ও কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করা।

৩. অর্থনীতি, সমাজ ও প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে যাতে দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দেয়া হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানকারীদের প্রস্তুত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ।

৪. উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগী সক্ষমতার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োগদানকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে লব্ধ দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়।

৫. উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগী সক্ষমতার উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

৬. শিক্ষার প্রতিটি ধাপে শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও মূল্যায়ন।

(ঠ) টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত পণ্য ও সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ

১. অধিকতর গুণগত মানসম্পন্ন নতুন নতুন পণ্য ও সরঞ্জাম তৈরির লক্ষ্যে উৎপাদনকারী, গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিশেষজ্ঞ, পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য অংশীজনের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

২. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, পণ্যের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।

৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ডিজিটাল সরঞ্জাম ও সফটওয়্যার তৈরিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা।

৪. ডিজিটাল খাতে মানব সম্পদ ও গবেষণা উন্নয়নে একটি জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৫. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের সক্ষমতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে আমদানি হওয়া ডিজিটাল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য সংযোজনের বিষয়টিকে উৎসাহ দান।

(ড) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুনর্গঠন

১. উদীয়মান রূপান্তরধর্মী ও অগ্রবর্তী প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করে এ-সংক্রান্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ন ও তাদের কাজের ক্ষেত্র পুনর্নির্ধারণ।

২. নিজ নিজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৌশলগত দিকনির্দেশনা অনুসারে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

৩. ডিজিটাল রূপান্তর, নেটওয়ার্ক, প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও ডিজিটাল বৈষম্যের (ডিভাইড) মূল্যায়ন, পরিষেবা প্রদানকারীর সঙ্গে সরকারি সংস্থার সমন্বয় সাধন এবং স্থানীয়ভাবে ডিজিটাল সংযোগ ও পরিষেবা-সম্পর্কিত সরকারি নীতির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে সব জেলায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন।

৬.৭ ডাক পরিষেবা খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

১. প্রথাগত ডাক ব্যবস্থার পাশাপাশি ডিজিটাল ডাক পরিষেবার প্রচলন;

২. ডাক পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণ;

৩. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবার প্রচলন;

৪. ডাক পরিবহন, সংগ্রহ ও বিতরণ আইসিটিভিত্তিক কঠোর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনা;

৫. উচ্চমানের আইসিটিভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

৬. গ্রাহক পরিষেবা প্রদান ও কূন্য সহনশীলতার নীতি প্রণয়নে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ;

৭. উন্নত মানের ডাক পরিষেবা প্রদানে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান;

৮. প্রত্যেক গ্রামীণ ডাকঘরের অধিক্ষেত্রের মধ্যে ন্যূনপক্ষে একজন আইটিভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৯. গুণগত সেবা নিশ্চিত করতে ডাকসেবা ও কুরিয়ার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বাড়ানো;

১০. প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র ডিজিটাল আর্থিক সেবা ‘নগদ’-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

১১. দেশের সকল গ্রামকে ডিজিটাল ডাক পরিষেবার আওতায় আনা;

১২. ২০২১ সালের মধ্যে দেশব্যাপী বিজ্ঞাপন ডাক সেবার প্রবর্তন;

১৩. দেশব্যাপী ইন-হাউস ডিজিটাল বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপন;

১৪. স্কুলগামী মেয়েদের জন্য শিক্ষাবিমা ‘সুকন্যা (Sukanya)’ প্রবর্তন।

৬.৮ পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ পরিকল্পনা

সেকশন সি.৫-এ বর্ণিত কৌশল ও প্রস্তাবিত অর্থায়ন কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থির ও চলতি মূল্যে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের জন্য প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ যথাক্রমে সারণি ৬.১৭ ও ৬.১৮-এ প্রদর্শন করা হয়েছে। পরিবহন খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পরিবহন অবকাঠামোর আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। পরিবহন অবকাঠামোর জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, তা হলো–টোলভিত্তিক সড়ক, সেতু, বিমান পরিবহন ও আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়নে পিপিপি-ভিত্তিক বিনিয়োগ আরও বেশি সংহত করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মতো উত্তম চর্চার উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে নীতি জোরদার করা হবে। বিমানবন্দর, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দর, সড়ক ব্যবহারের মাশুল এবং রেলসেবার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ এ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় জোরালো ভূমিকা রাখবে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন বিনিয়োগ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় মেটাতে সহায়ক হবে।

সারণি ৬.১৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৭৭.৯	১৯০.০	২১৫.০	২৩৩.৮	২৭৯.১
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬৫.৬	৭৫.০	১০০.০	১১৫.৪	১৪০.৩
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	৪০.৬	৫০.১	৫৭.৭	৬২.১	৭৪.৫
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮.৩	১০.৩	১১.৮	১৩.৮	১৬.৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১২.১	১৪.৯	১৭.২	২০.০	২৪.০
সেতু বিভাগ	৫৫.৫	৬০.০	৭৮.১	৮৮.৮	১০২.৫
পরিবহন খাতে মোট বরাদ্দ	**৩৬০.০**	**৪০০.৩**	**৪৭৯.৮**	**৫৩৩.৯**	**৬৩৭.০**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, অ্যানেক্সার সারণি এ৫.১

সারণি ৬.১৮: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের স্থিরমূল্য অনুসারে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৭৭.৯	১৮৫.০	২০৩.৭	২১৭.৬	২৫২.৮
রেলপথ মন্ত্রণালয়	৬৫.৬	৭৩.৪	৯৪.১	৯৯.৫	১১৫.০
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	৪০.৬	৪৭.৫	৫৩.১	৫৬.৪	৬১.২
বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮.৩	৯.৭	১১.৭	১২.৯	১৩.৬
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১২.১	১৪.১	১৬.৫	১৭.২	১৯.৭
সেতু বিভাগ	৫৫.৫	৫৮.১	৭২.৪	৮০.০	৯১.৩
পরিবহন খাতে মোট ব্যয়	**৩৬০.০**	**৩৮৭.৮**	**৪৫১.৫**	**৪৮৩.৬**	**৫৫৩.৬**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, অ্যানেক্সার সারণি এ৫.২

খাত-৭:

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

অধ্যায় ৭

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন কৌশল

৭.১ ভূমিকা

কার্যকরভাবে পরিচালিত একটি স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত (evident), যে ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেকগুলো নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে–শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, স্থানীয় পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি। একটি জাতির উন্নয়ন প্রক্রিয়া তখনই যথাযথভাবে অগ্রসর হয়, যখন গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়গুলো যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় প্রয়োজনের নিরিখে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ সরকার সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের নির্দেশনামতো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকার বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওইসব অনুচ্ছেদের ভাষ্য নিম্নরূপ:

‘আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হইবে।’ (অনুচ্ছেদ ৫৯); এবং

‘সংসদ আইনের দ্বারা ওই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।’ (অনুচ্ছেদ ৬০)

একই সঙ্গে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে:

‘নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’

এ ধরণের নির্দেশনা নিশ্চিতভাবেই একটি সুসংগঠিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বারা যথাযথভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে প্রেরণা জোগাবে। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। আইন অনুসারে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করতে হবে। ফলে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। আর পার্বত্য জেলাসমূহে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত চেয়ারম্যানের মাধ্যমে।

৭.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার খাতে অগ্রগতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শহর ও গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সাধনে সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতির উন্নয়নে সমন্বিত নীতি গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সমন্বিত উদ্যোগ নেয়ার ফলে মানুষের উচ্চ আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয়েছে, যার হাত ধরে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে রয়েছে। রূপকল্পের সঙ্গে সংগতি বিধান করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারের দুটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছিল। এগুলো হলো–(১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালীকরণ; এবং (২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন; স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সংস্থাগুলোর কাজের মধ্যে উলম্বী ও সমন্তরাল সমন্বয় সাধন।

৭.২.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন ও মৌলিক পরিষেবাসমূহের উন্নয়ন সাধনকল্পে স্থানীয় সরকার বিভাগ বেশকিছু উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অর্জিত অগ্রগতিসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সক্ষমতা বৃদ্ধি

স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে আরও অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক ও সক্রিয়; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণে যেসব উদ্যোগ জোরালো ভূমিকা রেখেছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলোয় ডিজিটাল রূপান্তর;
- একসেস টু ইনফরমেশন নিশ্চিত করা (এ২আই);
- জনসাধারণের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ;
- নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কারিগরি সহায়তা প্রদান

গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা ও আর্থিক জবাবদিহিতার উন্নয়ন সাধনে স্থানীয় সরকার বিভাগ বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার (PFM) সংস্কার এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান ও নিরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অধিকন্তু ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ওয়েবভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং চালু করা হয়েছে। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার (PFM) সংস্কার কার্যক্রম নিম্নলিখিত উপায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অবদান রাখতে পারে:

- ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বার্ষিক আর্থিক নিরীক্ষা ও কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ।
- ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।
- ইউনিয়ন পরিষদ নিরীক্ষার মানোন্নয়ন।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় কার্যকর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) চালু করা।
- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিষেবা সরবরাহের মানোন্নয়ন।
- অর্থিক লেনদেন পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
- মনোনীত পৌরসভাসমূহে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ (পরীক্ষামূলক)।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা প্রদান।
- জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

নগরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যও অবকাঠামো খাতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই কর্মসম্পাদনভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যবস্থা যে কেবল কিছু বাছাই করা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার সার্বিক গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে তা নয়, বরং এটি অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও সাধারণ চেতনা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পৌর এলাকার উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, নগর উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেশকিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে বেশকিছু পৌরসভায় টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (TLCC) গঠিত হয়েছে। এছাড়া ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্টের (FSM) মতো কিছু প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন: নগরাঞ্চলে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্থানীয় সরকার বিভাগ সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য নির্মাণকাজের মধ্যে রয়েছে দুটি উড়াল সড়ক, তিন হাজার ৩৪৮ কিলোমিটার সড়ক, এক হাজার ১১৬টি ফুটপাথ, এক হাজার ৫০২ কিলোমিটার নর্দমা, পাঁচ হাজার ১৪৪ মিটার সেতু/কালভার্ট, এক হাজার ৪২টি গণশৌচাগার, ২৫টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল, ৪৪০টি নলকূপ, ৮৪৪ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ২৬৬টি ডাস্টবিন, সাতটি পৌরবাজার, ৩০টি কিচেন মার্কেট, ১৫টি উদ্যান ও বিনোদনকেন্দ্র, চারটি নৌঘাট, ১৫টি কমিউনিটি সেন্টার/বহুমাত্রিক ব্যবহারযোগ্য স্থাপনা, ২১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, ১৯ হাজার ৬০০টি সড়ক বাতি, ৬৮টি নদী/খাল ড্রেজিং এবং ২০টি হ্রদ/খাল পাড় সংরক্ষণ। এছাড়া স্থানীয়

সরকার বিভাগ পৌরসভাগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও দুটি ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ, নগরীর ময়লা ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ১.৫ থেকে তিন টন ভারবহন সক্ষমতাসম্পন্ন ৪০টি ট্রাক প্রদান এবং ৬৬টি ভ্যাকিউম ক্লিনার প্রদান করেছে। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ৩৩ হাজার ৪৫৬ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, এক লাখ ৫২ হাজার ৩৪৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ৮৯৬টি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র/গ্রামীণ হাটবাজার, ২৪৩টি নৌঘাট, ৪৫৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ৬৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ করেছে।

গ্রামীণ পরিবহন: ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী এলজিইডি ৮৯.৪৪ শতাংশ উপজেলা সড়ক, ৬৭.৪১ শতাংশ ইউনিয়ন সড়ক এবং ২০ শতাংশ গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন করেছে। নির্দিষ্টভাবে বললে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশে ৩৩ হাজার ৪৫৬ কিলোমিটার পল্লী সড়ক ও এক লাখ ৫২ হাজার ৩৪৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। দেশের পল্লী সড়ক নেটওয়ার্কের হালনাগাদ অবস্থা সারণি ৭.১-এ দেখানো হয়েছে।

গ্রামীণ সংযোগ: পল্লী প্রবেশগম্যতা সূচক (RAI) অনুসারে ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, ওই সময়ে বাসস্থান থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে বছরের সব সময় ব্যবহার-উপযোগী সড়কের সুবিধা নিশ্চিত হয়েছিল ৮৩.৫ শতাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে। তবে হাওর/নিমজ্জন ভূমি/পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে এটি ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়ে যাবে। ২০১৮ সাল নাগাদ দেশের মোট ৮৭ হাজার ২২৩টি গ্রামের মধ্যে ৭০ হাজারের অধিক গ্রামে অধিকতর ভালো মানের সংযোগ নিশ্চিত হয়েছিল।

সারণি ৭.১: দৈর্ঘ্য অনুসারে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামোর চিত্র

সড়কের ধরণ	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)			মোট কাঠামোর সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মি.)	অসম্পন্ন	
		মোট	পাকা সড়ক	মাটির সড়ক			সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (মি.)
উপজেলা সড়ক	৪৭৬৪	৩৭,২৫৪	৩৩,৩২৩ (৮৯.৪৪%)	৩,৯৩১	৬১,৪৩৫	৪২৫,১৪০	২,৩৪০	৮১,১০০
ইউনিয়ন সড়ক	৮০৫৬	৪১,৮২৮	২৮,২০০ (৬৭.৪১%)	১৩,৬২৮	৬২,৩৪৬	৩২৭,২৯৮	৪,৩৬০	৯৫,৪০০
গ্রামীণ সড়ক	৪৮৫১৪	১২৮,৪৭৬	৩৬,৬২৭ (২৮.৫%)	৯১,৮৪৯	৮৭,০১০	৩৮৮,১৯৬	২৭,৪১০	২৪৫,২৪৩
গ্রামীণ সড়ক-খ	৮৯৭৮৬	১৪৫,৭৭৪	১৮,২৬৯ (১২.৫৩%)	১২৭,৫০৫	৫৩,১০৯	১৯৭,১৫৬	৩৬,৬৬৮	২২০,১৩৮
মোট	**১৫১১২০**	**৩৫৩,৩৩২**	**১১৬,৪১৯**	**২৩৬,৯১৩**	**২৬৩,৯৯৯**	**১,৩৩৭,৭৯০**	**৭০,৭৭৮**	**৬৪১,৮৮০**

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ

মৌলিক সেবা সরবরাহ

স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রাম ও নগর উভয় এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্যানিটেশনের উন্নয়নসহ নানা ধরণের বেশ কিছুসংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। শহরাঞ্চলে পরিষেবাগুলো সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা। চারটি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে ওয়াসা স্থিতিশীল অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় এখনো বিপুলসংখ্যক নলকূপে আর্সেনিকের উপস্থিতি বিদ্যমান। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এটি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নিরাপদ পানি নিশ্চয়তা বিধানে সরকার সচেতনতা সৃষ্টি, নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা, বিকল্প সমাধান প্রদানসহ নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। ৫০ পিপিবি মাত্রার আর্সেনিকে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১৯.৬ মিলিয়ন থেকে ১৭.৫ মিলিয়নে নেমে এসেছে (MICS 2019)। অধিকন্তু২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৯ সময়ের মধ্যে নিজস্ব আঙিনায় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়া জনগোষ্ঠীর হার ৭৪.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮২.৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে খোলা জায়গায় মলত্যাগ একপ্রকার লোপ পেয়েছে। দেশের সব মানুষকে মানসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। তবে উপযুক্ত মানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর হার এখনো বেশ নিচেই রয়েছে, যা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৬৪.৪ শতাংশ। দেশের সকল মানুষকে যথাযথ মানের স্যানিটেশন সুবিধার আওতায় আনতে আরও প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।

ভৌত/মহাপরিকল্পনা

স্থানীয় সরকার বিভাগের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এলজিইডি দেশের ২৫৪টি পৌরসভা ও দুটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। অধিকন্তু নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অধীনে আরও ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। বাদবাকি পৌরসভাগুলোর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান। সেগুলোর বিষয়ে অচিরেই স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে গেজেট জারি করা হবে। অধিকন্তু মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনাবিদদের খেয়াল রাখতে হবে যে, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

নানা অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও নাগরিকদের প্রত্যাশিত মানের সেবাদান ও সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হলো:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব ও কার্যক্রম বিষয়ে অস্পষ্টতা: বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়নি। ফলে একই ধরণের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে একাধিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ গ্রহণে দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আহরণ ক্ষমতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তাদের নিজস্ব রাজস্বের অপর্যাপ্ততা। বেশিরভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রাজস্ব আহরণ অত্যন্ত সীমিত এবং তারা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের মুখাপেক্ষী। আর সরকারের তরফ থেকে তারা যা পায়, সেটিও অপর্যাপ্ত এবং প্রত্যাশিত মাত্রার নয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজেটকেন্দ্রিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এসব প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেটকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

জনবল সংকট: গ্রামীণ অঞ্চলে পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবল সংকট। ইউনিয়ন পর্যায়ে বাজেট তৈরি, হিসাব সংরক্ষণ ও নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। আইসিটি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন কোনো জনবল না থাকায় ডিজিটালকরণ প্রক্রিয়া বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট প্রস্তুতকরণ, অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুভাবে সম্পন্ন করা এবং নথি সংরক্ষণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উপজেলা কার্যালয়ে জনবল বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে পৌরসভা কার্যালয়ে কর্মরত জনবল কাঠামো পুনর্মূল্যায়ন ও যৌক্তিকীকরণ করা আবশ্যক। কেননা অনেক পৌরসভাতেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জনবল রয়েছে। এ ধরণের বাড়তি জনবল পৌরসভার প্রশাসনিক ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফলে পৌরসভার ওপর ন্যস্ত পরিষেবা প্রদানের বরাদ্দ কমে যায়।

নাগরিক অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার ঘাটতি: স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে শাসনকাজে নাগরিক অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও সম্পদের দক্ষ বণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যবান্ধব উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেবা সরবরাহের জন্য অপর্যাপ্ত ক্ষমতা অর্পণ: দায়িত্ব পালনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অপর্যাপ্ততা, অপ্রতুল যোগাযোগ এবং জেলা/জাতীয় পর্যায়ে প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় স্থানীয় জনগণকে সেবাদানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এটা করা হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবাদান ব্যবস্থারও উন্নতি হবে।

স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ: আর্থিক সক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক সেবাসমূহের প্রবৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। শহরাঞ্চলের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর রাজস্বের একমাত্র মাধ্যম সম্পদ/হোল্ডিং কর। কিন্তু একটি সুব্যবস্থিত সম্পদ কর ব্যবস্থা না থাকার কারণে এ কর আহরণে লক্ষ্যণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে রয়েছে ভূমির নামজারি (যে কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যায় পড়ে), সম্পদ মূল্যায়ন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু পুরনো দাম ও ব্যয় অনুসারে নির্ধারিত হয়), কর নির্ধারণ, করের নিম্নহার এবং দুর্বল কর প্রশাসন। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যহার পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেই। অধিকন্তু পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিনিময়ে গ্রামীণ ও নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যে অর্থ সংগ্রহ করে, তা এ খাতের ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি এ অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৭.২.২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সংগঠনসমূহ, ক্ষুদ্র ঋণ পরিচালনা, গ্রামীণ পুঁজি ব্যবস্থাপনা, পল্লী অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যসমূহের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ সহজীকরণ, পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র অবকাঠামোর বিকাশ, গবেষণা পরিচালনা ও লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে কৃষি ও কৃষিবহির্ভূত উৎপাদন কার্যক্রম, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, জ্বালানি সরবরাহ, পানি ও স্যানিটেশন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা (বিশেষ করে নারীদের জন্য) এবং কর্মসৃজনের মতো কর্মকাণ্ডে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

অর্জিত অগ্রগতি

- *পানিসম্পদ ও সেচ ব্যবস্থাপনা:* সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) প্রায় ১৮ হাজার সেচ পাম্প ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল। এ সেচ পাম্পগুলো গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। দেশের পানিসম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৮ সালের নভেম্বরে সরকার বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ করে, যা পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা খাতে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এ পরিকল্পনার আওতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়ন, লবণাক্ততা কমিয়ে আনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, খরা ব্যবস্থাপনায় অধিকতর অগ্রগতি সাধন এবং যথোপযুক্ত সেচ সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে। এ পরিকল্পনায় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বৃহৎ সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে অধিকতর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সংস্থাগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রগতি সূচিত হবে।
- *গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও জীবিকা:* সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়িত ১৬৬.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়সংবলিত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ গ্রমীণ জীবিকা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়নের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৩ হাজার ৪০০ জন। এছাড়া আরও প্রায় ২২ হাজার পরিবারকে উন্নত জাতের গাভী সরবরাহ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৯০ হাজার লিটার দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবিসহ অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সুবিধা বঞ্চিত নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং কৃষিতে জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এসব সংস্থার কর্মসূচিসমূহ গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আয় সৃজনে ভূমিকা রেখেছে, যা চূড়ান্ত বিচারে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রেখেছে। 'লিংক মডেল' ধারণার ওপর ভর করে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিআরডিবি কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষণা পরিচালনা, প্রয়োগিক গবেষণা ও স্থানীয় সরকারে কর্মরত ব্যক্তি, সরকারি কর্মচারি, সমবায়ী এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD) ও পল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RDA) পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিত্তহীন বেকার জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BAPARD) কৃষি ও অকৃষি খাতে নানা ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। গত ৫ বছরে (জুলাই/২০১৫ থেকে জুন/২০২০) প্রতিষ্ঠানটি ১৫ হাজার ১৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে, যাদের মধ্যে আট হাজার ২৮২ জন পুরুষ এবং ছয় হাজার ৮৫৩ জন নারী। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সুবিধা বঞ্চিত নারীর জীবনমান উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ সময়ে সংস্থাটি ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন লাখ মানুষের জন্য নানা ধরণের সুবিধা নিশ্চিত করেছে, যার মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এক লাখ ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- *আমার বাড়ি আমার খামার:* গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বাসস্থানভিত্তিক সমন্বিত খামার প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত কৃষিভিত্তিক পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা দান। দেশে মোট এক লাখ ২০ হাজার গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের অধীনে (ভিডিও) প্রায় ৫৫ লাখ দরিদ্র খানা বর্তমানে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

পল্লী উন্নয়নে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্পসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবাদে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির মধ্যকার বৈষম্য কমে আসছে। বাংলাদেশের টেকসই পল্লী উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত এজেন্ডার বাস্তবায়ন এখনো অনেকখানি বাকি রয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণ

গ্রাম ও শহরের মধ্যকার উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এ ব্যবধান কমিয়ে আনতে হলে কৃষিখাতের বহুমুখীকরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অকৃষি কার্যক্রম শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া দারিদ্র্যের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জেলাভিত্তিক দারিদ্র্য চিত্রে বহুমাত্রিকতা বিদ্যমান। যেসব জেলায় গ্রামীণ দারিদ্র্য হার বেশি, সেখানকার বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেখানে অবকাঠামোর ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। পাশাপাশি সেসব জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিদ্যমান এবং সেখানে কর্মসংস্থান ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সীমিত। শহর ও গ্রামের মধ্যকার এবং ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যকার আয় বৈষম্য কমিয়ে এনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামীণ সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নে গ্রামীণ এলাকায় গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিখাতের নানা ধরণের সংগঠন পল্লী এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে থাকে। পাশাপাশি এসব সংস্থা নানা প্রয়োজনীয় পরিষেবাও প্রদান করে। কিন্তু এসব পরিষেবা, উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ফলে যে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, তা বিক্ষিপ্ত, অপরিকল্পিত ও একই সেবা একাধিক উৎস হতে প্রদান করা হচ্ছে। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে ন্যায্যতার ভিত্তিতে ও সমন্বিতভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিআরডিবির পিআরডিপি প্রকল্পটি ইউনিয়ন পরিষদ ও এনবিডির সক্রিয় অংশগ্রহণে গ্রামবাসীর প্রবর্তিত অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি এনবিডি ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত পরিষেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এ ধরণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের ধারণা দেশব্যাপী অনুসৃত হওয়া উচিত।

গ্রামীণ দারিদ্র্য ও অসমতা নিরসন

খানা আয়-ব্যয় জরিপ (ঐওউঝ) ২০১৬ অনুসারে ওই সময়ে দেশের ২৬.৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। অধিকন্তু গ্রামীণ অঞ্চলের আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জিনি সহগের মান ছিল ০.৪৫৪ (বৈষম্যের নির্দেশক)। সুতরাং গ্রামীণ দারিদ্র্য ও অসমতা নিরসন এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

গ্রামীণ বেকারত্ব দূরীকরণ

২০১৬-১৭ সময়ের শ্রম শক্তি জরিপে বিবিএস দেখিয়েছে যে, ওই সময় দেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৬৩.৫ মিলিয়ন (ছয় কোটি ৩৫ লাখ), তার মধ্যে বেকার ছিল ৪.২ শতাংশ। যেহেতু দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে, তাই এই বেকার জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের অবস্থান গ্রামে। সে হিসেবে গ্রামীণ বেকারত্ব দূরীকরণ আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ডিজিটাল ও জিআইএসভিত্তিক ডেটাবেজ ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি

সরকারের কার্যপরিধির বণ্টন (অ্যালোকেশন অব বিজনেস) অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ম্যানডেট হলো পল্লী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয় চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী নীতিনির্ধারণ এবং প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে যথাযথ নীতিনির্ধারণ ও তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একটি শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য ডেটাবেজ অপরিহার্য। বর্তমানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে কোনো প্রকার ডিজিটাল ও জিআইএস-ভিত্তিক (জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম) ডেটাবেজ নেই। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ, সেগুলোর বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাঁধা। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিআইএস-ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য একটি ডেটাবেজ তৈরি অপরিহার্য। একই সঙ্গে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত নীতি ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে এ ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে।

৭.২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে (CHT) দেশের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কারণ সেখানে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, শিক্ষা ও অবকাঠামোর ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার এ পরিস্থিতির উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা (THNPP) বাস্তবায়ন, জাতীয় শিক্ষনীতি ২০১০ বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির তৃতীয় ধাপ (PEDP-3) বাস্তবায়ন এবং পানি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পাহাড়ি এলাকায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সংস্থাটি স্থানীয় খানাগুলোর উপার্জনের সুযোগ বাড়াতে নানা ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় নানা জাতের ফল, বাঁশ ও মসলাজাতীয় পণ্যের আবাদ এবং সেগুলোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্থানীয় ভাষাগুলোর মাধ্যমে স্কুল-পূর্ব শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা দানের লক্ষ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পাশাপাশি নানা ধরণের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে আট হাজার ৫০০-এর অধিক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বৃত্তি দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে সরকারের যে লক্ষ্য রয়েছে, তা অর্জনে এসব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পার্বত্য অঞ্চলে ক্রীড়াক্ষেত্রে নানা ধরণের সুবিধা নিশ্চিত করার ফলে স্থানীয়দের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সহজতর হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে স্টেডিয়াম ও ব্যায়ামাগার স্থাপন করেছে। এর বাইরে আরও সাতটি মিলনায়তন ও কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকদের কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন সাধনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। তাছাড়াও মন্ত্রণালয় থেকে বেকার যুব জনগোষ্ঠীকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ইন্টারনেট, আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

অতীত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

দারিদ্র্যের উচ্চহার

আয়-রোজগার, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যের উপস্থিতি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং অবকাঠামোর প্রাপ্যতার দিক থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার হার দেশের মোট গড়ের চেয়ে অনেক নিচে। এছাড়া খাদ্য দারিদ্র্যের ব্যাপ্তিও বেশি, ফলে সেখানে উচ্চ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য উভয়েরই উচ্চহার বিদ্যমান এবং তা জাতীয় গড় দারিদ্র্যের তুলনায় অনেক বেশি। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় দারিদ্র্যের হার (মাথা গুণতি) যথাক্রমে ২৮.৫%, ৬৩.২% ও ৫২.৭%।

জনবল সংকট

মন্ত্রণালয়ে জনবল সংকটের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম এখনো পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোয় এখনো কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌছেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রত্যন্ত অঞ্চল বিবেচনায় পার্বত্য জেলা পরিষদে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

- প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছে পৌছানো ও সেখান থেকে সম্পদ আহরণ করা অত্যন্ত দূরূহ; (রর) মূলধারার নীতিসমূহের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের চাহিদা ও তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অনুপস্থিতি;
- নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকা এবং শিক্ষার্থী স্বল্পতার কারণে তাদের নিজস্ব পাঠ্যক্রমের বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং পড়াশোনায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে;

- খাদ্যের নিম্ন উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক সুযোগের স্বল্পতার কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা;
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও ব্যক্তিখাতের কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা; এবং
- প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়া এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে নির্মাণ ব্যয় অনেক বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ

- অপর্যাপ্ত সড়ক/পরিবহন ব্যবস্থার কারণে বাজারের সুবিধাপ্রাপ্তি এবং নির্মাণসামগ্রী ও অন্যান্য সেবাপ্রাপ্তি দূরূহ;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চ নির্মাণ ব্যয়;
- অঞ্চলটির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন;
- স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাক্রমের বিকাশ সাধন;
- স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আর্থ-সামাজিক সূচক ও জনমিতির ওপর শুমারি/পরিসংখ্যনগত উপাত্তের ঘাটতি;
- আর্থিক খাতে প্রবেশগোম্যতা না থাকা;
- নিরাপদ পানির প্রাপ্যতায় ঘাটতি;
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার নিম্নমান;
- অকৃষি খাতে কর্ম ও উপার্জনের সুযোগের অভাব;
- শিক্ষার নিম্নহার ও বেকারত্বের উচ্চহার;
- ভূমি সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা; এবং
- নদীগুলোর নাব্যতা সংকট।

৭.২.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি

এডিপি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের বিষয়টিকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। যদিও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ কম ছিল, তথাপি এ পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার খাতে মোট বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৭.২)। এ সময়ে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে গড় বরাদ্দের হার ছিল মোট এডিপি বাজেটের ১৬ শতাংশ। কোনো একক মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে এটিই সর্বোচ্চ বরাদ্দ। তা সত্ত্বেও এ খাতের উন্নয়নের প্রয়োজন মেটাতে আরও অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেজন্য আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

সারণি ৭.২: অর্থবছর ২০১৭-অর্থবছর ২০২১ সময়ে উন্নয়ন ব্যয়সমূহ (কোটি টাকায়)

বছর	স্থানীয় সরকার			পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়			চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল		
	সপ্তম পরিকল্পনায় বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি	সপ্তম পরিকল্পনায় বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি	সপ্তম পরিকল্পনায় বরাদ্দ	বার্ষিক উন্নয়ন ব্যয়	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি
২০১৬/১৭	১৬,৬৫০	১২,৩৭৪	-	১,০২০	১,১৪৫	-	৫১০	৬০৬	-
২০১৭/১৮	২০,৩৪০	২১,৫২৬	৭৪.০%	১,৪৫০	১,৪১৪	২৩.৫%	৭৪০	৮৪৯	৪০.১%
২০১৮/১৯	২৪,২১০	২২,৮৫০	৬.০%	১,৭৩০	১,৭১৫	২১.৩%	৮৮০	৯১৪	৭.৭%
২০১৯/২০	২৮,৩৮০	২৫,৪৬৮	১১.৫%	২,০৩০	১,৬৯৫	১.২%	১,০৩০	৯৮৯	৮.২%
২০২০/২১	৩৩,৩০০	২৯,৯২১*	১৭.৫%	২,৩৮০	১,৮৬৫*	১০.০%	১.২১০	৮৪১	১৫.০%

*সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় (*প্রাক্কলিত অঙ্কসমূহ)*

৭.৩ আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের দুটি নির্দেশকের একটি হচ্ছে সংস্থার মোট ব্যয়ে স্বঅর্থায়নের অংশ বৃদ্ধি এবং আরেকটি হচ্ছে মোট রাজস্ব আয়ে নিজস্ব উৎসের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। স্থানীয় সরকারের নিজস্ব অর্থ ব্যয় ও রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা যত বাড়বে, বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম ততটাই ত্বরান্বিত হবে। মোট সরকারি ব্যয়ের অনুপাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

অংশগ্রহণ কতটুকু, তার মাধ্যমে বিচার করা হয় যে কতটা অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া হয়েছে। যেসব বিষয়ে বিকেন্দ্রীকৃত পরিষেবার বিস্তৃতি আছে, কেবল সেখানেই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয়ের এখতিয়ার ও কার্যক্রম বিদ্যমান।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর রূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাদের অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ধরণের মৌলিক, আর্থিক ও সামাজিক পরিষেবা সরবরাহে দায়বদ্ধ, যেগুলো সরবরাহের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক এখতিয়ারও রয়েছে। এসব পরিষেবার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, নর্দমা ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উদ্যান ও বিনোদন কেন্দ্র পরিষেবা, স্থানীয় গণপরিবহন, স্থানীয় পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা। এসব পরিষেবা সরবরাহের জন্য স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো তাদের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে দায়বদ্ধ। কারণ এসব পরিষেবা নিশ্চিতকল্পে একটি সুসংগঠিত নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। এসব পরিষেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান একটি 'ওয়ানস্টপ' পরিষেবা কেন্দ্রের মতো, যেখানে সরকারের অন্য কোনো পর্যায় থেকে নির্দিষ্ট ঐসব সেবায় যেন দ্বৈততা সৃষ্টি না করে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের সার্ভিস চার্জের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে রাজস্ব আহরণের বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় বেশিরভাগ রাজস্বই আহরিত হয় জাতীয় পর্যায়ের রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এবং পরে তা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার বিধানানুসারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝে বণ্টিত হয়। এর মাধ্যমে রাজস্ব বণ্টনের বিষয়টিকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে অনেকটা মুক্ত রাখা যায়, কারণ জাতীয় সরকারের তুলনায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোয় বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্ব থাকে। যেখানে রাজস্ব বণ্টনের বিষয়ে নির্দিষ্ট ও সাংবিধানিকভাবে বাধ্যবাধকতা নেই, সেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক আদায় করা রাজস্ব এ খাতে বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিতে আরও বেশি অর্থবহ ও শক্তিশালী সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭.৩.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের ধারা

জাতীয় বাজেটের বাজেট দলিল কিংবা ওয়েবসাইটে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অর্থ ব্যয়ের সমন্বিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয় না। অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধানতম প্রকাশনা অর্থনৈতিক সমীক্ষায়ও এ তথ্য থাকে না। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এসব তথ্য একত্রিত করে এবং তা বার্ষিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুকে পরিবেশন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ২০১৩ সালের পর থেকে এ উপাত্ত আর হালনাগাদ করা হয়নি। যাহোক, বিবিএস প্রকাশিত তথ্যে ১৯৭৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় অর্থায়নের একটি চিত্র উঠে এসেছে। মোটাদাগে তাতে দেখা যায়, আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। সারণি ৭.৩-এ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়বস্তুগুলো হলো:

- স্থানীয় সরকারগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অর্থায়ন বৃদ্ধির ধারণা বাস্তবায়নের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। ১৯৭৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকারগুলোর মোট ব্যয়ের ২৬ শতাংশের জোগান দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১১ অর্থবছরে তা ৬২ শতাংশে উঠে যায়। তবে ২০১৩ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়ে সরকারের অংশ কিছুটা কমে গিয়ে ৪৩ শতাংশে নেমে আসে। এটা সম্ভব হয়েছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির কারণে। ২০১১ থেকে ২০১৩–এ দুই বছরের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব সম্পদ আহরণ ১২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে সাত হাজার ৬২০ কোটি (৭৬.২ বিলিয়ন) টাকায় উন্নীত হয়।
- বিভিন্ন ধরণের মাশুল ও ফি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যার পরিমাণ ২৫ শতাংশ।
- তবে কর রাজস্বের পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ১৪ শতাংশ।
- প্রচলিত আর্থিক খাত থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো ঋণ নেই। নিজস্ব অর্থায়নের বাইরে তাদের সব ধরণের বরাদ্দ ও ঋণের জোগান নিশ্চিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট থেকে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া অর্থের সিংহভাগই অনুদান। বড় সিটি কর্পোরেশনগুলো সীমিত পরিসরে ঋণ হিসেবে কিছু অর্থ পেয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নেই, তাই এগুলো বকেয়া হিসেবেই পড়ে থাকে।

সারণি ৭.৩: বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন
(মিলিয়ন টাকায়)

আইটেম	অর্থবছর ১৯৭৪	অর্থবছর ১৯৭৮	অর্থবছর ১৯৯২	অর্থবছর ২০০১	অর্থবছর ২০১১	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১৩
কর	১৪৮	৩০১	২৬২৬	৪৬৪৫	১২৭৯৯	১৩৯৫৩	১৮২০২
মাশুল ও ফি	৩৮	১৬৫	১৭৫০	৩৭৭৪	২১৫৪১	৪২৫৯৯	৫৭৯৮৬
মোট নিজস্ব অর্থায়ন	১৮৬	৪৬৬	৪৩৭৬	৮৪১৯	৩৪৩৪০	৫৬৫৫২	৭৬১৮৮
সরকারি অর্থায়ন	৬৬	১৭২	২৯১৮	১১২১০	৫৫৯৩৪	৫২৭৭৪	৫৭১০০
মোট সম্পদ	২৫২	৬৩৮	৭২৯৪	১৯৬২৯	৯০২৭৪	১০৯৩২৬	১৩৩২৮৮
মোট ব্যয়	**২৫২**	**৬৩৮**	**৭২৯৪**	**১৯৬২৯**	**৯০২৭৪**	**১০৯৩২৬**	**১৩৩২৮৮**

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

৭.৩.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের ধারা

আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় মোট সরকারি ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি শক্তিশালী নির্দেশক। এক্ষেত্রে প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- চিত্র ৭.১-এ সরকারের মোট ব্যয়ে স্থানীয় সরকারের অংশ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে যে নিম্ন ভিত্তির ওপর ভর করে স্থানীয় সরকারে ব্যয় শুরু হয়েছিল, তা থেকে বর্তমানে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও মোট সরকারি ব্যয়ে এখন পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের অংশ মাত্র ৮.২ শতাংশ।
- জিডিপির অনুপাতে স্থানীয় সরকারে মোট বিনিয়োগ জিডিপির মাত্র ১.১১ শতাংশ (চিত্র ৭.২)।
- অর্থবছর ১৯৭৪ থেকে অর্থবছর ২০১৩ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার খাতে প্রকৃত ব্যয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে প্রায় সাত শতাংশ।
- স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সরকারের তরফ থেকে গ্রামীণ ও শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেয়া সরকারি বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ বরাদ্দই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়নের প্রধান উৎস।

চিত্র ৭.১: মোট সরকারি ব্যয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ের অংশ

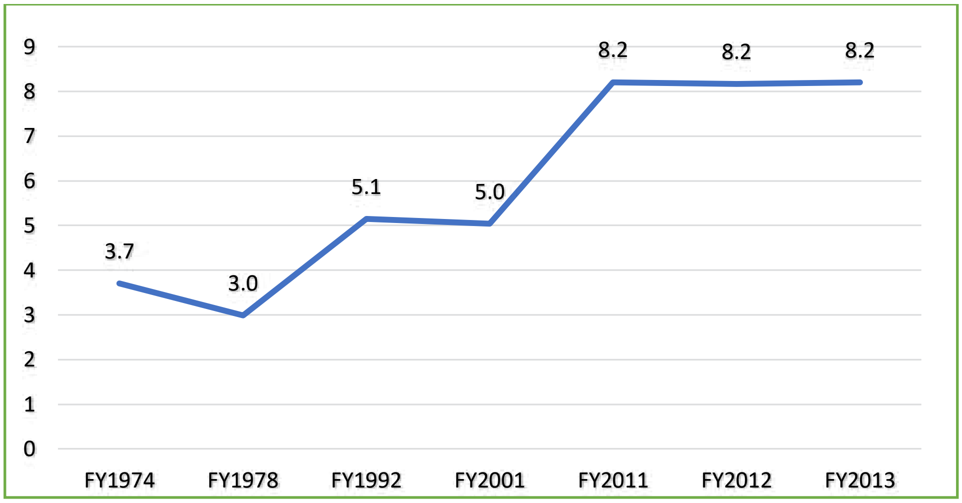

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

চিত্র ৭.২: জিডিপির অনুপাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ের অংশ

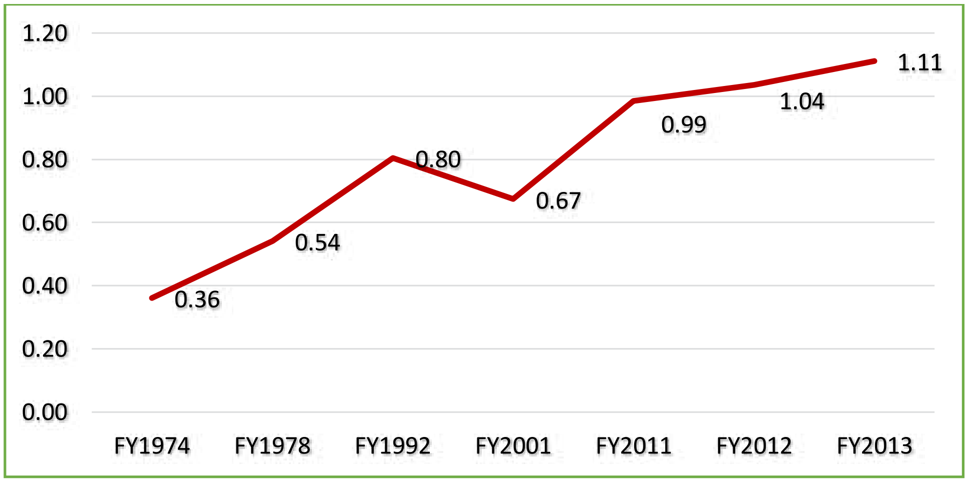

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

স্থানীয় সরকারে কেন্দ্রীয় তহবিল হস্তান্তরের দুর্বল কাঠামো (Poor predictability)

এর আগেই বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশে এক্ষেত্রে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা হলো, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকারে অর্থ হস্তান্তরে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। ফলে এ অর্থ হস্তান্তরে প্রায়ই এক ধরণের অনিশ্চয়তা ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং এক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব ও তহবিল হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায়ই কোনো সাদৃশ্য থাকে না। এ তহবিল হস্তান্তর মূলত নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনা ও জাতীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে।

অতি সম্প্রতি, বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়) বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সর্বনিম্ন পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে তহবিল হস্তান্তরের বিষয়টি একটি ফরমুলার ভিত্তিতে সম্পাদিত হচ্ছে, যে ফরমুলা নির্ধারিত হয় স্থানীয় জনসংখ্যা ও সংস্থার কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে।

৭.৩.৩ দুর্বল নিজস্ব রাজস্ব উৎস

সম্পদ আহরণের ভিত্তিতে যে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি পরিমাপ করা হয়, এক্ষেত্রে তা অত্যন্ত দুর্বল। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যে রাজস্ব আহরণ করে, তা মোট সরকারি রাজস্বের চার শতাংশেরও কম (চিত্র ৭.৩)। বিভিন্ন পরিষেবার বিনিময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো যে কর আহরণ করে, তা মোট ব্যয়ের অনুপাতে খুবই নগন্য। এক্ষেত্রে আহরিত করের পরিমাণ ১৯৭৪ অর্থবছরে ছিল মোট ব্যয়ের ৫.১ শতাংশ, ২০১১ অর্থবছরে যা ২.৫৪ শতাংশে নেমে আসে, যদিও ২০১৩ অর্থবছরে কিছুটা অগ্রগতি হয়ে এ কর ৩.৮২ শতাংশে উন্নীত হয়। স্থানীয় সরকারের রাজস্ব আহরণ এত কম হওয়ার কারণ হলো সম্ভাব্য প্রধান প্রধান রাজস্ব খাত নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর রাজস্ব আহরণের একমাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে সম্পদ কর/হোল্ডিং কর। একটি সুব্যবস্থিত সম্পদ কর ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি থাকায় এ কর আহরণের ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধি অনেক কম। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে ভূমির নামজারি-সংক্রান্ত সমস্যা, সম্পদ মূল্যায়ন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহু পুরনো দাম ও ব্যয় অনুসারে নির্ধারিত হয়), কর নির্ধারণজনিত সমস্যা, করের নিম্ন হার এবং দুর্বল কর প্রশাসন ব্যবস্থা। সম্পদের মূল্য নির্ধারণ বা মূল্য হার পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেই।

চিত্র ৭.৩: মোট সরকারি রাজস্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব রাজস্বের অংশ

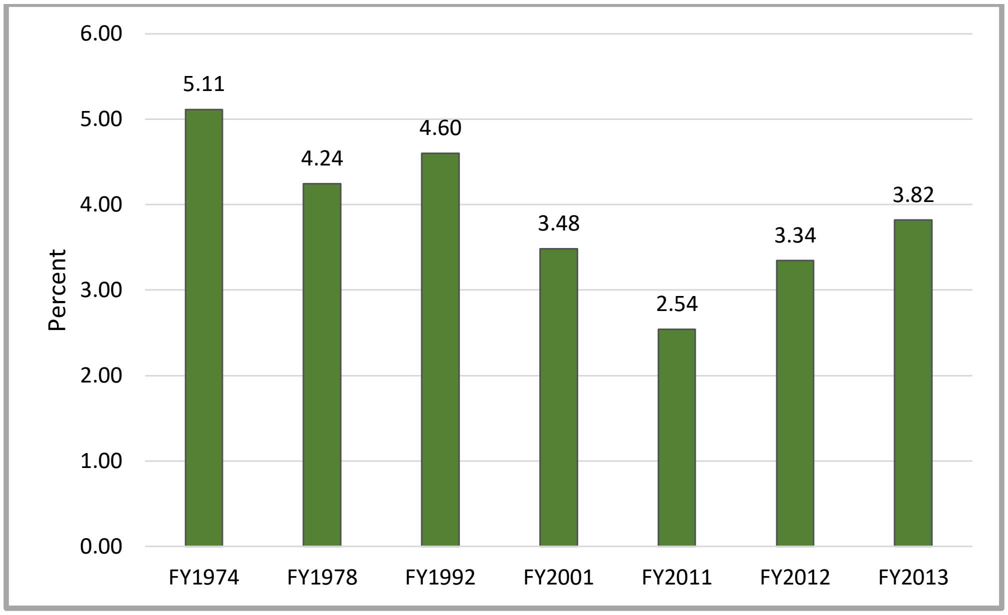

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

নিজস্ব সম্পদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কর রাজস্বের তুলনায় ব্যয় পুনরুদ্ধার অংশে ভালো অগ্রগতি সূচিত হয়েছে (চিত্র ৭.৪)। ১৯৭৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকারের আহরণ করা মোট রাজস্বে করের পরিমাণ ছিল ৭৫ শতাংশ, ২০১৩ অর্থবছর যা নেমে আসে ৪৫ শতাংশে। পুরো দেশজুড়েই কর আহরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরও বেশি প্রকট। ১৯৭৪ অর্থবছরে মোট জিডিপির অনুপাতে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কর সংগ্রহের হার ছিল ০.৩০ শতাংশ, ২০১৩ সালে যা নেমে আসে ০.১৬ শতাংশে। তবে ব্যয় পুনরুদ্ধার খাতে অগ্রগতি একটি উৎসাহব্যঞ্জক নিদর্শন। বস্তুত ২০১১ অর্থ-বছরের পর থেকে স্থানীয় সরকারগুলোর ব্যয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে একটা বড় ধরণের গতি এসেছে, ফলে সংস্থাগুলোয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ হস্তান্তরও ধীরে ধীরে কমে আসছে। এ প্রচেষ্টা স্থানীয় সরকারগুলোর নানা ধরণের ব্যয়ন কর্মসূচির সুরক্ষা দিতে সহায়তা করছে। অন্যথায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ মোট জিডিপির অনুপাতে এক শতাংশের নিচে চলে যেত। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মতো নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে ব্যয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রম একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে আবির্ভূত হবে, কারণ এসব প্রতিষ্ঠান নানা ধরণের নাগরিক পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে। ফলে সেবাগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত মাশুল সমন্বয় করে তারা ব্যয় মেটাতে পারে। তবে গ্রামীণ স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ খুবই সীমিত। জন্মসনদ প্রদান, নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরণের দোকান ও ব্যবসায় উদ্যোগের লাইসেন্স প্রদানের খাত থেকে সীমিত পরিমাণে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ করতে পারে সংস্থাটি।

চিত্র ৭.৪: স্থানীয় সরকারের নিজস্ব রাজস্বে কর ও ব্যয় পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ

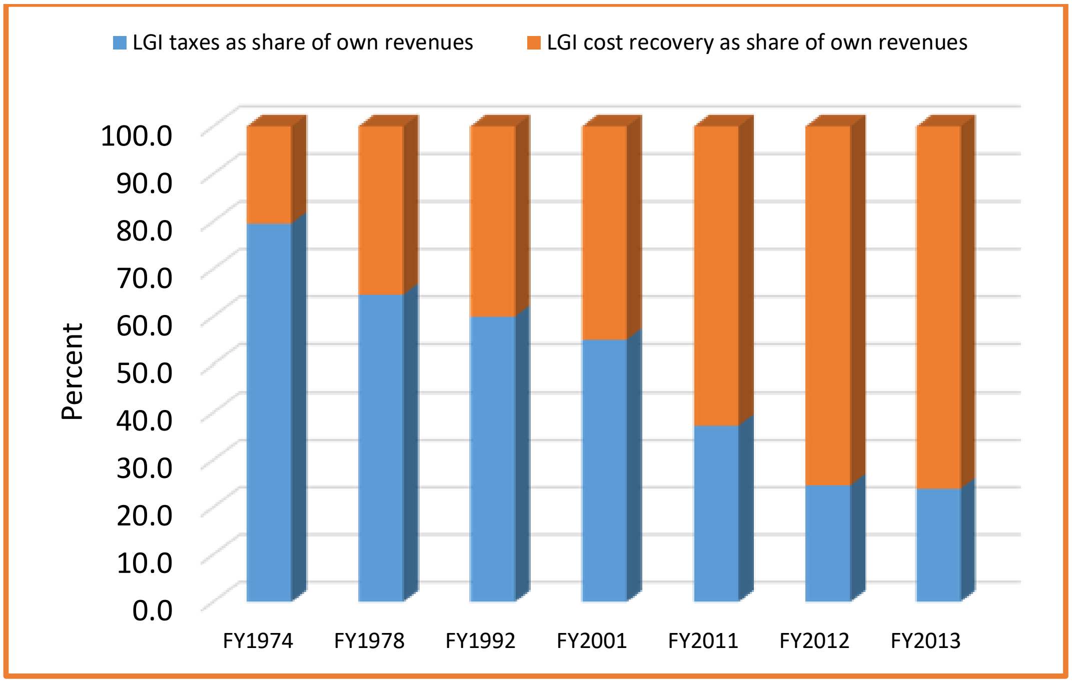

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

৭.৩.৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ ব্যয়ের বৈষম্য

যদিও সকল স্থানীয় সরকার সংস্থারই অর্থের সংকট রয়েছে, তবে তার মধ্যেও কিছু সংস্থার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। মূলতঃ সিটি কর্পোরেশনগুলোর নিজস্ব অর্থায়নের সুযোগ বেশি, ফলে তারা অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর তুলনায় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে (চিত্র ৭.৫)। বর্তমানে দেশে মোট সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা ১২টি। তা সত্ত্বেও এগুলো অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থার তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বেশি সম্পদ পায়। স্থানীয় সরকার খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের ২৭ শতাংশ যায় ইউনিয়ন পরিষদে। কিন্তু এ ব্যয় যখন চার হাজার ৫৫৪টি ইউনিয়নে ভাগ হয়ে যায়, তখন প্রতিটি ইউনিয়নের ভাগে খুব সীমিত পরিমাণ অর্থ পড়ে। ২০১৩ সালে প্রতিটি ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭৯ লাখ (৭.৯ মিলিয়ন) টাকা, যা ওই সময়ের এক লাখ মার্কিন ডলারের সমান মাত্র। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের ছোঁয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে গড় জনসংখ্যা ২৩ হাজার। এত অল্প বরাদ্দ দিয়ে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর চিন্তা করাও আশ্চর্যের ব্যাপার, যে কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা খুবই নগণ্য।

১২টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে অন্যান্য পৌর এলাকাগুলোর আর্থিক অবস্থাও প্রায় একই রকম। অথচ এসব পৌরসভাসমূহ শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নর্দমা পরিষেবা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রতিটি পৌরসভায় গড়ে এক লাখ ২৪ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য এসব জরুরি সেবা নিশ্চিত করতে ২০১৩ অর্থ-বছরের হিসাব অনুযায়ী ওই সময়ে প্রতিটি পৌরসভা গড়ে বছরে ব্যয় করতে পেরেছিল মাত্র ১১ কোটি ৩০ লাখ (১১৩ মিলিয়ন) টাকা, যা ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান মাত্র। এটি সহজেই অনুমেয় যে বছরে মাথাপিছু মাত্র ১১ মার্কিন ডলার ব্যয় করে কী মানের নগর পরিষেবা দেয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনগুলো বিশেষ করে ঢাকার দুটি সিটি কর্পোরেশনের অবস্থা অনেকটা ভালো। কিন্তু নগরের স্থানীয় সরকারগুলোও তাদের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় ধরণের আর্থিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়।

চিত্র ৭.৫: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয়ন অনুপাত

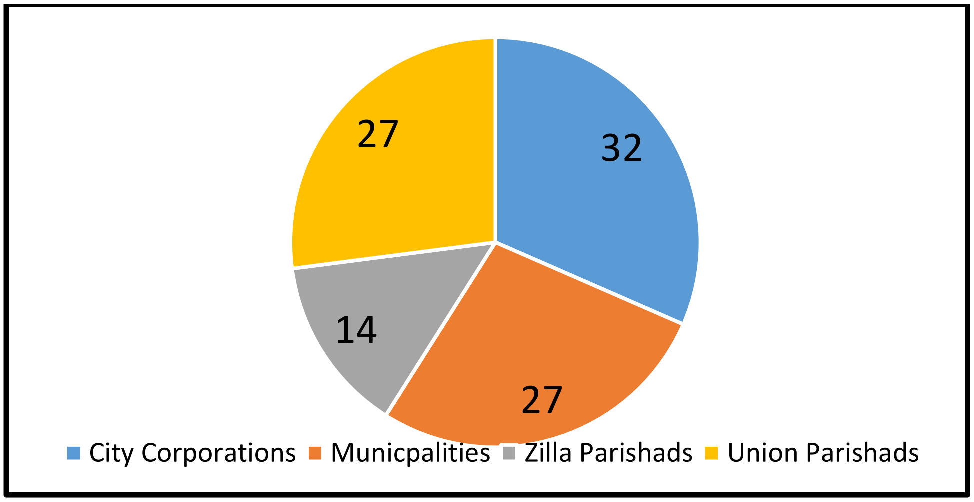

সূত্র: বিবিএস স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ার বুক, বিভিন্ন বছর

৭.৩.৫ আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ: আন্তর্জাতিক তুলনা

বিভিন্ন দেশের বাজেট ব্যবস্থাপনার চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, যেসব দেশে কর আহরণ ও সরকারি ব্যয় ব্যবস্থা বেশি মাত্রায় এককেন্দ্রিক, বাংলাদেশ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম (সারণি ৭.৪)। ১৬টি উন্নয়নশীল ও ২৬টি উন্নত দেশের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় মোট সরকারি ব্যয়ের ১৯ শতাংশ সম্পন্ন হয় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর মাধ্যমে, শিল্পোন্নত দেশগুলোয় এ হার ২৮ শতাংশ, আর বাংলাদেশে তা মাত্র সাত শতাংশ। বাংলাদেশে কর আহরণ কার্যক্রম অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। উপাত্ত বিশ্লেষণ করা ১৬টি উন্নয়নশীল দেশে স্থানীয় সরকারগুলো দেশের মোট রাজস্বের ১১.৪ শতাংশ আহরণ করে, উদাহরণ হিসেবে নেয়া ২৬টি শিল্পোন্নত দেশে এ হার ২২.৭ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আহরণ করে সরকারের মোট রাজস্বের মাত্র ১.৬ শতাংশ।

সারণি ৭.৪: আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক চিত্র, ২০০০ সাল

প্রেক্ষিত	স্থানীয় সরকারের ব্যয়		স্থানীয় সরকারের কর আহরণ	
	মোট সরকারি ব্যয়ে অনুপাত (%)	জিডিপির অনুপাতে ব্যয় হার (%)	মোট করের অনুপাত (%)	জিডিপির অনুপাতে কর হার (%)
উন্নয়নশীল দেশসমূহ	১৮.৮ (n=১৬)	৫.১ (n=২০)	১১.৪ (n=১৬)	২.৩ (n=২০)
শিল্পোন্নত দেশসমূহ	২৭.৮ (n=২৬)	১৩.৯ (n=২৬)	২২.৭ (n=২৪)	৬.৪ (n=২৫)
বাংলাদেশ	৭.০	১.১১	১.৬	০.১৫

সূত্র: ***Bhal, Linn and Wetzel 2013. Financing Metropolitan Governments in Developing Countries. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts.***

শিল্পোন্নত দেশগুলোর শহরগুলোয় যে উন্নততর পরিষেবা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণ সংঘটিত হয়েছে, তা কোনো দুর্ঘটনা নয়। একটি সুব্যস্থিত রাজস্ব ভাগাভাগি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কেবল বড় ধরণের তহবিল সরবরাহই নিশ্চিত করে না, বরং সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহ আরও সহজতর হয়। নগরীর সুশাসন ও অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন পরস্পরের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং এটি অধিকতর ভালো মানের পরিষেবা সরবরাহের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

৭.৩.৬ এককেন্দ্রিক বাজেট কাঠামোর ফলাফলসমূহ

দুর্বল গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা ও আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দুর্বলতা বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক পরিষেবাসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতি ও এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ স্থানীর সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঙ্খিত পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থাকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে:

- রাজস্ব বিকেন্দ্রীকরণের দুর্বলতা চূড়ান্তভাবে সম্পদের অপ্রতুলতাকে নির্দেশ করে, যার ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহের সক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে;
- গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক থেকে জনবলের অপর্যাপ্ততা এসব প্রতিষ্ঠানের পরিষবা সরবরাহে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা;
- অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত স্থানীয় সরকারের জবাহিদিতাকে দুর্বল করে দেয়, বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য;
- কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোনো আইনি কাঠামো না থাকা এবং এ বরাদ্দ বৈষম্যমূলক হওয়ায় অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে আগে থেকে কোনো কিছু অনুমান করা যায় না। স্থানীয় সরকারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পরিষেবা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দুর্বল থাকে। ফলে এক্ষেত্রে তারা যাতে বরাদ্দ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হন, সেজন্য অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও বিচক্ষণতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে;
- কার্যকর সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ঘাটতি, ঋণ গ্রহণের উৎসের অভাব এবং সম্পদ করের কাঠামো নির্ধারণের দুর্বলতার কারণে উদ্ভাবনী উপায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন নিশ্চিতের সুযোগ খুবই সীমিত।

৭.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সংগতি রেখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতের প্রধান অভীষ্ট হলো, 'দেশে একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমতাভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।' এ খাতে গৃহীত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি নেয়া হবে এ অভীষ্টের সঙ্গে সংগতি রেখে। বাংলাদেশকে ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে একটি উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক একটি কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা যেগুলো বৈদেশিক অর্থায়ন পায়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মানদণ্ড গ্রহণ করা হবে। যতদিন না স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মসম্পাদন একটি নির্দিষ্ট মান অর্জন করতে পারে, ততদিন এ অর্থায়ন ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। এ অর্থ এডিপির অতিরিক্ত বরাদ্দ ও লভ্যাংশ হিসেবে দেয়া হবে। একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও সমতাভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সীমিত সম্পদের দক্ষ বণ্টন ও ব্যবহার, শাসন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ধরণের একটি পদ্ধতি যেসব মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

(১) স্থানীয় পর্যায়ে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;
(২) স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সম্পদ আহরণ; এবং
(৩) শহুরে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহ করা।

পল্লী উন্নয়নের বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভূমিকা অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অবদান নির্ভর করছে সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের সক্ষমতার ওপর। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বৃহৎ লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান এবং রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচি 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণা গ্রামীণ রূপান্তরের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে সে পরিকল্পনার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে দর্শনগত পরিবর্তন আনয়ন করেছে।

৭.৪.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগের তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো–স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের লক্ষ্য অর্জন; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ আহরণে অগ্রগতি সাধন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ। এ বিষয়গুলো নিম্নে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হলো:

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

(১) স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিতকরণ

- জনগণের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তাদের পৃথক ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান;
- জাতীয় পরিকল্পনার সঙ্গে স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংযোগ স্থাপনে বিদ্যমান নির্দেশিকার হালনাগাদকরণ;
- স্থানীয় সরকার সংস্থা, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য সংস্থার সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক প্রণোদনার বিষয়টি উৎসাহিতকরণ;
- স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে কার্যক্রমভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা ও তার ফলাফল সকলকে অবহিতকরণ; এবং
- স্থানীয় সরকার সংস্থা ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থাসমূহে নারীর ক্ষমতায়ন উৎসাহিতকরণ।

(২) উন্নততর সেবা সরবরাহ

- গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন এবং টেকসই ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ;
- ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ এ নীতির সঙ্গে সংগতি বিধানকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথ পরিষেবা নিশ্চিত করা;
- টেকসই উপায়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা;
- ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা ও পরিষেবার উন্নয়ন সাধন;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো; এবং
- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি পরিষেবা উৎসাহিতকরণ।

(৩) জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোয় সরকারের বরাদ্দ ছাড়করণ ব্যবস্থার সংস্কারসাধন এবং এ ধরণের প্রতিষ্ঠাগুলোর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে ও অনুমানযোগ্যতার ভিত্তিতে বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ; এবং
- স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সম্পদ আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা দেয়ার বিনিময়ে গৃহীত অর্থ ও সম্পদ কর আহরণে জোর দেয়া।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের প্রধান কৌশলসমূহ

দক্ষতার সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি সরকারি পরিষেবাসমূহ সরবরাহ এবং স্থানীয় সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে স্থানীয় সরকারের জন্য বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি সরকারই দেখভাল করে থাকে। অধিকন্তু যথাযথ গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সংস্কার আনা প্রয়োজন: (i) স্থানীয় সরকারসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম; (ii) সেবা সরবরাহ কার্যক্রম; এবং (iii) সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। এ প্রেক্ষিতে সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় তিনটি কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দেবে, যা হলো:

সিটি কর্পোরেশনের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন কৌশল (SGICC) (২০২০-২০৩০): ২০২০ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে সিটি করপোরেশেনের প্রশাসনে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে এ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলটির চারটি প্রধান অভীষ্ট রয়েছে–

(i) সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন; (ii) সিটি কর্পোরেশনে ধারাবাহিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি অর্জন ও উন্নয়ন; (iii) সিটি কর্পোরেশনসমূহের রাজস্ব কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং বহু বছরভিত্তিক রাজস্ব কাঠামোর ওপর ভর করে বাজেট প্রস্তুতকরণ; এবং (iv) সিটি কর্পোরেশনের মানবসম্পদের ধারাবাহিক উন্নয়ন সাধনে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট পদ্ধতি গৃহীত হবে। এছাড়া বহুমাত্রিক কৌশলগত নির্দেশনার ভিত্তিতে এসব অভীষ্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সিটি কর্পোরেশনে প্রশাসনিক গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

পৌরসভার গভর্ন্যান্স কাঠামোর উন্নয়নে জাতীয় কৌশল (২০১৬-২০২৫): এই কৌশলগত দলিলের উদ্দেশ্য হলো, এটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভাগুলো যেন ২০২৫ সালের মধ্যে এর অধিক্ষেত্রের নাগরিকদের জন্য টেকসই উপায়ে ও সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে নির্ধারিত অগ্রাধিকারমূলক সরকারি পরিষেবাসমূহ নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে চারটি মৌলিক অভীষ্টকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো: (i) পৌরসভাসমূহের রাজস্ব আহরণ বাড়ানো; (ii) একটি যথোপযুক্ত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার যথাযথ আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণ; (iii) আইন, বিধি, নির্দেশনা ও অন্যান্য আইনি বিধিবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন; এবং (iv) পৌরসভার মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কৌশলগত পরিকল্পনায় পৌরসভার উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়টিকে সরকার অগ্রাধিকার দেবে।

উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স কাঠামোর উন্নয়নে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল: একটি দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই কৌশলগত দলিলে মৌলিক নীতি নির্দেশনাসমূহ স্পষ্টীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রথমেই এটিতে উপজেলা পরিষদের কর্মকৌশল নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পিত ও সমন্বিত উপায়ে উন্নততর সরকারি পরিষেবাসমূহ সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টিকে নির্দেশ করে। এতে উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ জোর দেয়া হয়। উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে যখন কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত হয়, তখন উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সরবরাহ কার্যক্রমেরও উন্নতি ঘটে। উপজেলা পর্যায়ের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এ-সংক্রান্ত কৌশল বাস্তবায়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাতটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: (i) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের উলম্বী ও সমান্তরাল সমন্বয় সাধন; (ii) উপজেলা কমিটিকে কার্যকর রূপদান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সঙ্গে অধিকতর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আরও বেশি অবদান রাখা; (iii) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন; (iv) উপজেলা পরিষদের বাজেট ও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এডিপি উভয় ক্ষেত্রেই); (v) সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ উপায়ে বাজেট ও বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ; (vi) স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং কর্তৃক উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমের যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা; এবং (vii) সকল উপজেলা পরিষদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন।

অতীতের সফল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ: বিদ্যমান প্রকল্পগুলোর অতীত সফল অভিজ্ঞতা ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে সরকার শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এমন একটি ইতিবাচক স্থানীয় সরকার গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত কর্মসূচির নাম ‘শরীক (Sharique)’। অধিকতর জবাবদিহিমূলক, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর উপায়ে নাগরিকদের অধিকতর ভালো মানের পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে এ উদ্যোগটি ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল। পাশাপাশি স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষমতায়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীল ও দারিদ্র্যবান্ধব সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করেছিল (বক্স ৭.১)।

বক্স ৭.১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় গভর্ন্যান্সের জন্য ধাপভিত্তিক নির্দেশনা

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা সংস্থার (SDC) সহায়তায় ২০০৬ সালে শরীক প্রকল্প শুরু হয়েছিল এবং এটির বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিল সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হেলভেটাস। যে লক্ষ্য নিয়ে শরীক যাত্রা শুরু করেছিল, তা হলো অধিকতর জবাবদিহিমূলক, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর উপায়ে নাগরিকদের অধিকতর ভালো মানের পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় নাগরিকদের ক্ষমতায়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার সংবেদনশীল ও দারিদ্র্যবান্ধব সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা দান। নাগরিকদের যৌথ ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে সে অধিকার আদায় করে নেয়ার জন্য একটি কার্যকর স্থানীয় গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়সমূহ অর্জনের জন্য এ কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ, জেন্ডার সমতার বিষয়সমূহ, নারী নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণসহ নানা ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান। কর্মসূচিটি নাগরিক সংগঠন (ওয়ার্ড সভা) প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, যে সংগঠনকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম তদারকি ও পরামর্শদানের এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। শরীকের প্রধান লক্ষ্য ছিল দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক পল্লী উন্নয়ন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া।
সুশাসনের চর্চা জোরদার করার জন্য এ কর্মসূচিতে যেসব এজেন্ডা গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল:

- অন্তর্ভুক্তি, সমতা ও বৈষম্যহীনতা: রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে কেউ বাদ পড়বে না এবং হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও নারীদের জন্য বিদ্যমান সরকারি নীতিসমূহের বাস্তবায়ন।
- কার্যকারিতা ও দক্ষতা: রাষ্ট্রীয় সুবিধাসমূহের যথাযথ বন্টন এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি কেনাকাটা সম্পন্ন করা ছিল এ কর্মসূচির অন্যতম এজেন্ডা।
- জবাবদিহিতা: মানুষের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত এবং তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যে সেবা গ্রহণ করেন, সে বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ প্রদানের সুযোগ থাকার পাশাপাশি সেই মতামতের ভিত্তিতে দরকারমতো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত। এক্ষেত্রে যেসব সংস্থা ভালো সাফল্য অর্জন করবে, তাদের পুরস্কৃত করার পাশাপাশি যারা ব্যর্থ হবে তাদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা।
- অংশগ্রহণ: সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসহ সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন এবং ক্ষেত্রমতো নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন।
- স্বচ্ছতা: স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন আনয়ন করে, সে বিষয়ে জনগণের তথ্য জানার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে তথ্যগুলো তৎক্ষণাৎ সবার জন্য উন্মুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।
- আইনের শাসন: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বৈষম্যহীনতা ও সমতা, বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা।

পাঁচটি ধাপে ও দুটি আন্তঃসংযুক্ত উপাদানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে–(i) সচেতনতা সৃষ্টি ও গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার মূল্যায়ন; (ii) কাঠামোসমূহের সমন্বয় শক্তিশালীকরণ; (iii) অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ; (iv) সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন; (v) বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং (vi) জেন্ডার সমতা ও দারিদ্র্যবান্ধব গভর্ন্যান্স। উল্লিখিত বিষয়সমূহ যেসব ক্ষেত্রে কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে সাধারণত স্থানীয় জনগণ যেসব সমস্যার সমম্মুখীন হয় সেগুলো বিশ্লেষণ, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাজেট-সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়। একটি কার্যকর স্থানীয় গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং দায়িত্বশীল কোনো কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন কি না, তা দেখভাল করা।

শরীক প্রকল্পের অন্যতম প্রধান সাফল্য হলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক উভয়ের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, প্রকল্পটি তাদের উভয় পক্ষের স্বার্থ নিশ্চিত করছে। শরীক প্রকল্পে একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল যে, নাগরিকরা প্রায়ই উপজেলা পরিষদ থেকে তথ্য পান না, কারণ যোগাযোগ দক্ষতার অভাবের কারণে তারা জানেন না যে, কোন প্রক্রিয়ায় তথ্য চাইতে হয়। এর ফলে উপজেলা পরিষদ তাদের কাছে অধরাই থেকে যায়। এ প্রেক্ষিতে শরীক ওয়ার্ডভিত্তিক একটি প্ল্যাটফর্ম (সক্রিয় নাগরিক সংগঠন) সৃষ্টি করেছিল, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেবা প্রত্যাশীর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছিল।

উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সঙ্গে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের (এনজিও) কার্যক্রম এখন অনেক বেশি সমন্বিত এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিও আগের তুলনায় ভালো। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর বেসরকারি ব্যবসায়ীদের (বিশেষত কৃষি ব্যবসায়ী) প্রদত্ত পরিষেবাগুলোয় আরও ভালো প্রবেশগোম্যতা রয়েছে এবং তাই দামের কারসাজি দূর করা ও পণ্যে ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হয়েছে। সংক্ষিপ্ত চেকলিস্টসমূহ, যা ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির (UDC) সভা পরিচালনার জন্য শরীক প্রকল্প হতে প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটি ইউডিসি সদস্যদের আরও কাঠামোবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ফলাফল-ভিত্তিক হতে সহায়তা করে। দ্বিমাসিক বৈঠক যোগাযোগের উন্নতি ঘটিয়েছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের উচিত এসব সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলোআপ করা। ইউডিসি এখন পর্যন্ত সেরা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়, সেটা ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত হোক বা এর এখতিয়ারের বাইরের বিষয়ই হোক।

যে কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে আগাম তথ্য সরবরাহের জন্য ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল শরীক। নাগরিকদের আগে বৈঠক সম্পর্কে অবহিত করার ফলে তাদের ইস্যু ও পরামর্শ-সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন সহজতর হয়েছিল, যা শাসন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের আরও ভালো ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল। আরও একটি উপাদান যা আরও বেশি অর্থবহ অংশীদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিল, তা হলো মহিলাদের 'কথা বলার' দক্ষতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া। ফলশ্রুতিতে ওয়ার্ড সভা ও বাজেট সভায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে এসব সভায় প্রায়ই পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। সরকারের উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সংস্থাগুলো কীভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সম্প্রসারণ-সম্পর্কিত সরকারি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, সে সম্পর্কে সংস্থাটি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

শরিকের প্রশিক্ষণের আগ পর্যন্ত আইন অনুযায়ী ধাপে ধাপে কী ধরণের পদক্ষেপ নিতে হয়, সে বিষয়ে তাদের হাতে কোনো প্রকার উপকরণ ছিল না। বাজেট পঞ্জিকা প্রণয়ন ও বাজেট বিষয়ে পূর্বাভাস নির্ধারণের সক্ষমতা অর্জন কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটিয়েছে শরীক। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা (PFM) বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী সংবেদনশীল বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করার ফলে শাসনকাজে নারীর অংশগ্রহণ আরও বেগবান হয়েছে। এখন এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের দাবিসমূহ যথাযথ গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হবে। শরীক প্রকল্প থেকে বেশ কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন–ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে সেবাগ্রহীতাদের সম্মিলিত মতামতের আলোকে জবাবদিহিতা আরও উন্নত করা, নাগরিক এবং ইউপি সদস্য উভয়কেই ব্যবহৃত সমস্ত কার্যক্রম ও সরঞ্জাম সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সবশেষে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ করতে হবে, সংস্থাটি এটি করতে অনেক ক্ষেত্রেই আগ্রহী হয় না।

স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) প্রণয়ন

সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করতে সরকার সক্রিয়ভাবে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সেজন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সেবা সনদ প্রণয়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRS), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), গণশুনানি, ওয়ানস্টপ পরিষেবাকেন্দ্র, ক্ষুদ্র উন্নয়ন কর্মসূচি, তথ্য অধিকার (RTI), ই-গভার্ন্যান্স এবং ই-পরিষেবা সরবরাহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রৈমাসিক তদারকি ও বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এনআইএস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নৈতিকতা বিষয়ে কমিটি গঠন ও শুদ্ধতা নিশ্চিতে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে এনআইএস কৌশলের বাস্তবায়ন করেছে। যাহোক, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ/সংযুক্ত সংস্থা এবং আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোয় প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করে এনআইএস কৌশল বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

নাগরিকদের আরও কার্যকরভাবে ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেবাদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কেন্দ্রীয় ভূমিকার পাশাপাশি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এনআইএসের স্থানীয়করণের ওপর গুরুত্বারোপ করবে। 'এনআইএস সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় ধাপ' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উপজেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনে এনআইএসের কার্যক্রম স্থানীয়করণের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা নৈতিকতা-বিষয়ক কমিটি (এথিক কমিটি) এনআইএস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এনআইএসের ক্ষেত্রে প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওপরে বর্ণিত এনআইএস-সম্পর্কিত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে। এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় গণমাধ্যম এবং উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে এনআইএস প্রবর্তন ও চর্চা শক্তিশালীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোয় (এলজিআই) সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন

কার্যকর উপায়ে সরকারি পরিষেবাসমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে সুস্থ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে থাকে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সেগুলো মোকাবিলার বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বাড়তি নজর দেবে ও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। যেসকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

আইনি কাঠামো: স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার আইন তাদের আর্থিক পরিচালনার সামগ্রিক কাঠামো নির্দেশ করে, তবে এ আইনের অনেক কিছুই এখন নাগরিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অপর্যাপ্ত এবং খুবই সেকেলে। সেজন্য এ আইনগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনবোধে হালনাগাদ করা হবে।

পরিকল্পনা ও বাজেট: স্থানীয় সরকার আইনের বিধান অনুসারে, স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরকে বার্ষিক এবং মধ্যমেয়াদে কয়েক বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার সঙ্গে বাজেট বরাদ্দকে ভালোভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করার যথাযথ প্রক্রিয়া বিবেচনা করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) অনুদান হস্তান্তরের পরিমাণ এবং সময়মতো সে অর্থ ছাড় করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে। তথ্য প্রাপ্তি ও তা প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/বাজেট বাস্তবায়ন ও এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের কাছে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হবে। যেহেতু একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অর্থ ছাড়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগগুলোর সঙ্গে উপজেলা পরিষদেও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ আহরণের সক্ষমতা বাড়ানো: হোল্ডিং করই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রাজস্বের প্রধান খাত। তাই এ খাতে কর আহরণের জন্য প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়ানো হবে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হোল্ডিং ট্যাক্সের পুনর্মূল্যায়ন, কর সংগ্রহের আওতা বাড়ানো, মানসম্মত প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি, নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ভালো করদাতাদের পুরস্কার ও কর ফাঁকিবাজদের জরিমানার ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা ব্যতিরেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কোনো কার্যকর ফল বয়ে আনে না।

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংহতকরণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এটা করা হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরও বেশি মাত্রায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ব্যয়ের জন্য আরও বেশি ক্ষমতা অর্পিত হবে। বরাদ্দে সমতা ও দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে জাতীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলোর জন্য যে অর্থ ছাড় করা হয়, তা পর্যালোচনার পাশাপাশি ব্লক ফরমুলা অনুসরণের মাধ্যমে সে অর্থ ছাড় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসবে। পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা এবং ইউনিয়ন স্তর থেকে স্থানীয় সরকারের উচ্চতর স্তর ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রাজস্ব সরবরাহের যে বিপরীত প্রবাহ রয়েছে, সেটিরও জরুরি পর্যালোচনা প্রয়োজন।

রাজস্ব ভাগাভাগির কার্যকর উপায় উদ্ভাবন: রাজস্ব ভাগাভাগির জন্য একটি নতুন সূত্র তৈরি করা হবে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংহত করার জন্য এমন প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে, যা স্থানীয় নাগরিকদের সেবাদানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। সুপারিশকৃত এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হলে বিশেষভাবে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কর্মীদের মধ্যে বিদ্যমান দক্ষতার মধ্যকার ঘাটতি মেটাতে বিদ্যমান শূন্যপদগুলো পূরণে পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৌলিক হিসাবরক্ষণের সূচনা, আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি এবং নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা চর্চার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সবশেষে একটি শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেভাবে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ বিষয়টির সঙ্গে যেসব বিষয় সম্পর্কিত, তার মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা, জনঅংশগ্রহণ, এনজিও ও নাগরিকদের দ্বারা গঠিত নানা সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং উচ্চমাত্রার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পরিপালন করা।

আন্তঃসরকার অর্থ হস্তান্তর বৃদ্ধিকরণ: যদিও এডিপিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তথাপি এ বরাদ্দ মোট এডিপির আকারের তুলনায় খুবই কম। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপিতে স্থানীয় সরকারের জন্য বরাদ্দ ছিল মোট এডিপির পাঁচ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা মাত্র দুই শতাংশে নেমে আসে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশে যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, তা ধরে রাখতে হলে এডিপিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব প্রকল্পগুলোর জন্য সরাসরি অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট নিজেরাই ব্যবস্থাপনা করতে পারে। একই সময়ে সরকার রাজস্ব বিষয়ে একটি সূত্র প্রণয়ন করবে, যার মাধ্যমে একটি উপজেলা তার এলাকার জনসংখ্যা, ভৌগোলিক এলাকা, দুর্গমতা ও দারিদ্র্যের মতো আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সরকারের তরফ থেকে মূল এডিপি বরাদ্দ পাওয়ার পাশাপাশি এডিপির বরাদ্দের আংশিক পরিমাণ নিজে নির্ধারণ করবে। অন্যদিকে এডিপিতে একটি উপজেলার অংশ নির্ধারিত হবে তার রাজস্ব ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে এবং কর্মসম্পাদন-ভিত্তিক এডিপির (PAADP) বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সময়মতো ও যথাযথ পূর্বানুমানের ভিত্তিতে বাজেট থেকে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় (PFM) জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন: সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা চর্চায় প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন করতে হলে সম্পদের অভ্যন্তরীণ প্রবাহ বাড়ানো ও পিএফএম-সংক্রান্ত সক্ষমতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে (গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) কমপক্ষে একজন বাজেট কর্মকর্তা থাকা আবশ্যক, যার আইটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং মৌলিক কম্পিউটার সুবিধা থাকতে হবে। সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি উপজেলা ও পৌরসভায় একজন করে বাজেট অফিসার, একজন প্রশিক্ষিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা পেশাজীবী, একজন প্রশিক্ষিত আইটি কর্মী এবং কম্পিউটার সুবিধা বিদ্যমান থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তদারকি ও পরিবীক্ষণ সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ: তদারকি, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির ঘাটতি এবং সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার (PFM) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান ও আইন না থাকলে এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে না। এজন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায় পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে।

বাজেট বিষয়ে বাস্তব বোঝাপড়ার অগ্রগতি সাধন: উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং বাজেটের নথিপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। এটি প্রথম দিকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এবং পরে মাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া/পরিচালনা পরিবীক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়াবে। ফলে তারা প্রয়োজনমতো অর্থবছর চলাকালীন পর্যায়ে বাজেটে নানা ধরণের সংশোধনী আনতে সক্ষম হবেন।

বহুবছরভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন: অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় প্রাক্কলন নিশ্চিত করা এবং বাজেটের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নিশ্চিত ও অনিশ্চিত বিষয়গুলো মোকাবিলায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি বহুবছরভিত্তিক বাজেট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে, যা বার্ষিক বাজেটের বিপরীত। এ ধরণের বাজেট প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অস্থিতিশীল ব্যয়ের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের করারোপ ক্ষমতা বৃদ্ধি: সরকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর করারোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যার প্রেক্ষিতে তারা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে যে, কী ধরণের এবং কী পরিমাণের কর নিজেদের অধিক্ষেত্রের জনমিতি, বাজেট ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুযায়ী বাস্তবসম্মত হবে। যথাযথ ও ডিজিটাইজড ভূমি রেকর্ড, ভূমি ও সম্পদের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ এবং যুক্তিসঙ্গত করহার নির্ধারণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এতে ন্যূনতম রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

রাজস্ব আহরণের প্রক্রিয়া সহজ ও শক্তিশালীকরণ: যথাযথ কর নির্ধারণ, নাগরিকদের হয়রানি পরিহার এবং করদাতা ও কমিউনিটির নেতাদের সঙ্গে কার্যকর মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্য অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সম্পদের হিসাব ও রাজস্বের হিসাব সংরক্ষণে সরকার কর প্রশাসনের উন্নয়ন সাধন নিশ্চিত করবে।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ে আইবাস প্লাস প্লাস হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন: জাতীয় বাজেট ও হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইবাস প্লাস প্লাস (IBAS++) ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ার ফলে স্থানীয় সরকার পর্যায়েও যথাযথ হিসাব পদ্ধতি চালু করার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোয় আইবাস প্লাস প্লাস পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করবে।

স্থানীয় সরকারের নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: অর্থপূর্ণ ও বাস্তবানুগ উপায়ে স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের নিরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। সরাসরি যাচাইকরণ এবং বার্ষিক ভিত্তিতে সম্পদের স্টক রেজিস্টার হালনাগাদ করা; নিরীক্ষা ও হিসাব ব্যবস্থা গঠনমূলক ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন; পূর্ববর্তী নিরীক্ষাসমূহের পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু নিরীক্ষা পরিচালনায় উন্নত মানের বেসরকারি নিরীক্ষা সংস্থা নিয়োগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দেয়া হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত অগ্রগতি সাধিত হবে:

- স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব ও সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি পাবে
- পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক তহবিল বণ্টন নিশ্চিত হবে
- উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত হবে
- উলম্বী ও সমান্তরাল উভয় প্রকার সমন্বয় সাধনে অগ্রগতির পাশাপাশি স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের মধ্যে সংযোগ তৈরি হবে
- পর্যাপ্ত হারে সম্পদ আহরণ ও বরাদ্দকরণে যথাযথ নীতি গ্রহণ নিশ্চিত হবে

গ্রামীণ পরিবহন উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

(১) গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কৌশল

- জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অনান্য ঘাত-সহিষ্ণু গ্রামীণ পরিবহন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে, যা একটি শক্তিশালী মধ্যম আয়ের অর্থনীতিকে কার্যকর রূপ দেবে এবং উন্নত অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি জোগাবে;
- অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সড়কের উন্নয়ন সাধন করা হবে, যা ধারাবাহিকভাবে আরও বেশি কর্মসৃজন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেশি বেশি প্রবৃদ্ধি যুক্ত করবে;
- হাওর, জলাভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে এসব অঞ্চলের মানুষ দেশের চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সমান্তরালভাবে এগিয়ে যেতে পারে এবং
- নতুন সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে যাতে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে গ্রামীণ সড়ক মহাপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকবে।

(২) গ্রামীণ সড়ক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল

- গ্রামীণ সড়ক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় নাগরিকদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে। এ প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভূক্ত করার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে একটি কাঠামো তৈরি করা হবে।
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে পরিমাপ করা ও দ্রুত সাড়া দেয়ার লক্ষ্যে সড়ক সম্পদের তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতির প্রচলন করা হবে;
- প্যাচ মেরামত ও গর্ত ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলোর ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে না যায় এবং দ্রুততার সাথে তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায়।
- সড়কের খানাখন্দ মেরামত ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো হবে, যাতে সড়কগুলো তাৎক্ষণিকভাবে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনা যায় এবং আরও বেশি অবনতি না ঘটে;
- বড় ধরণের দুর্যোগের পর গ্রামীণ সড়ক পুনর্বাসনে 'দুর্যোগ ঝুঁকি প্রতিরোধে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক' অনুসরণ করে 'বিল্ড ব্যাক বেটার মেথড' প্রচলন করা হবে;
- নতুন সড়ক তৈরির চেয়ে বিদ্যমান সড়কগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বেশি জোর দেয়া হবে এবং চাহিদা অনুসারে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে যথোপযুক্ত তহবিল বরাদ্দ দেয়া হবে; এবং
- একটি সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল এবং নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো হবে। এছাড়া গ্রামীণ সড়ক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কৌশলের উন্নয়ন ঘটানো হবে।

(৩) গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের জন্য অগ্রাধিকার কৌশল

- মহাপরিকল্পনার আওতায় এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক হালনাগাদকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগ নেবে। সড়ক নেটওয়ার্কসমূহ এমনভাবে উন্নয়ন করা হবে, যাতে সেগুলো বন্যা ও দুর্যোগ-সহনশীল হয় এবং সেগুলো যেন বিভিন্ন ধরণের প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (গ্রোথ সেন্টার)/বাজার, গ্রাম ও উপজেলা সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়। উপজেলা সড়ক নেটওয়ার্ক শিল্পাঞ্চল, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, শিল্পকারখানা, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, সমুদ্রবন্দর এবং রেলস্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হবে। এসব সড়কে সেতু/কালভার্টের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কার্যক্রমও এর অন্তর্ভূক্ত হবে। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের জন্য রেলপথ ও নৌপথের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিদ্যমান পাকাসড়কগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অনুসারে প্রধান সড়কগুলো বাছাই করা হবে;
- দ্বিতীয় অগ্রাধিকারের বিষয় হলো, সড়ক নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ, সংযোগবিহীন গ্রাম ও গ্রামের সিংহভাগ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত সড়ক, রেলপথ, নৌপথ ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে, প্রয়োজনীয় সেতু ও কালভার্ট নির্মাণসহ সেসব সড়কের উন্নয়ন করা হবে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসব সড়ক বাছাই করা হবে; এবং
- তৃতীয় অগ্রাধিকার হচ্ছে এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রাম এবং গ্রামের অভ্যন্তরীণ সড়কসমূহের সংযোগ শক্তিশালীকরণ।

গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টার/বাজার

গ্রামীণ প্রবৃদ্ধিকেন্দ্র (গ্রোথ সেন্টার)/বাজারগুলো সরবরাহ শৃঙ্খল (সাপ্লাই চেইন) ব্যবস্থায় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে এবং স্থানীয় পণ্যসমূহে মূল্য সংযোজন করে থাকে। 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণা একটি শক্তিশালী গ্রামীণ অর্থনীতির রূপকল্প, যেখানে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে, অর্জিত হবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। গ্রামীণ রূপান্তরের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে:

- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামঞ্জস্য স্থাপন এবং তার মাধ্যমে অধিকতর কর্মসৃজনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর আশেপাশে আরও অনেকগুলো গ্রোথ সেন্টার/বাজার স্থাপন করা হবে;
- বিভিন্ন এলাকার বিশেষ পণ্য, যেমন আম, তরমুজ, সবজি, পেয়ারা ইত্যাদির বিপণন শক্তিশালীকরণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশেষ ধরণের গ্রোথ সেন্টার স্থাপন করা হবে;
- গ্রোথ সেন্টারগুলোয় ই-কমার্স সেবা প্রদান, এজেন্ট ব্যাংকিং সুবিধা, হিমাগার সুবিধা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও কৃষিপণ্যের যথাযথ মূল্য শৃঙ্খল (ভ্যালু চেইন) ব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং
- গ্রোথ সেন্টারগুলো গতিশীল অর্থনীতির কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং সেখানে পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এতে স্থানীয় পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থা শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি কৃষি ও অকৃষি পণ্যে মূল্য সংযোজন হবে।

গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন। এক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিম্নোক্ত কৌশলগুলো গ্রহণ করা হবে:

- যেসব গ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি, সেখানে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে; আর যেসব গ্রামে বাড়িগুলো একটি আরেকটি সঙ্গে সংযুক্ত নয়, সেখানে ভিন্ন কৌশল নেয়া হবে। তবে এ সেবার জন্য গ্রামের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত কি না, সে বিষয়ে জানতে অবশ্যই একটি নিবিড় সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নিতে হবে;
- পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আর্সেনিক ও লবণাক্ততাপ্রবণ উপকূলীয় এলাকার মোট ১১৭টি উপজেলাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য উপকূলীয় অঞ্চলে পুকুর খনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে;
- সাধারণ পিট ল্যাট্রিনের স্থলে ধীরে ধীরে উন্নতমানের শৌচাগার স্থাপন করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উন্নতমানের ল্যাট্রিন ব্যবহারের পরিধি ৬১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে; এবং
- গ্রামীণ এলাকায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনায় যথাযথ কৌশল অবলম্বন করা হবে।

গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

গ্রামাঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যেসব কৌশল নেয়া হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হবে। নাগরিকদের সকল পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হবে;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুটি বাণিজ্যিক মডেল অনুসরণ করা হবে; (১) পুরোপুরি ধ্বংস করা, (২) পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা। প্রাথমিকভাবে ১০০ উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে এ উদ্যোগ চালু করা হবে;
- প্রাথমিকভাবে ৫০০টি গ্রোথ সেন্টারে বর্জ্য ব্যস্থাপনায় একটি বাণিজ্যিক মডেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

উপজেলা উন্নয়ন/মহাপরিকল্পনা

গ্রামের রূপান্তর ঘটানোর সময় পরিকল্পিত উপায়ে ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন থাকার প্রয়োজন পড়বে। নগর অঞ্চলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে যৌক্তিক উপায়ে উপজেলা মহাপরিকল্পনা তৈরির বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে উদ্যোগ নেয়া হবে:

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলো ২০২২ সালের মধ্যে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- ২০২৫ সালের মধ্যে উপজেলা মহাপরিকল্পনার আওতায় ২৫০টি উপজেলায় দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদি খাতভিত্তিক পরিকল্পনা এবং স্বল্পমেয়াদী ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান তৈরি করা হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব উপজেলায় এটি চালু করা হবে। বিদ্যমান প্রবৃদ্ধি, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে উপজেলা বাছাইয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে; এবং
- একজন 'জ্যেষ্ঠ পরিকল্পনাবিদ'-এর পদ সৃজনসহ উপজেলা পরিষদে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

কমিউনিটি অবকাশকেন্দ্র ও গ্রামীণ বিনোদন সুবিধা

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিশু, কিশোর, যুব ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে:

- ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী, উপজেলা পরিকল্পনায় মিনি স্টেডিয়াম, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, মিনি থিয়েটার ও যুব ক্রীড়া কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হবে;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ ব্যবহারের সুযোগ দেয়ার বিষয়ে নীতি গ্রহণ করা হবে;
- সেতু উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্মিত সেতুর পার্শ্ববর্তী খালি জায়গাসমূহকে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হবে এবং নদী/খালের পাড়ে ওয়াকওয়ে ও উদ্যান সৃষ্টি করা হবে;
- এলজিইডি ও উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত গণ আবাসিক এলাকায় খোলা চত্বর রাখার বিষয়ে প্রবিধান যুক্ত করার উদ্যোগ নেবে স্থানীয় সরকার বিভাগ; এবং
- ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করা হবে এবং এটিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য একটি শিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা উন্নয়ন

গ্রামীণ রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলার জন্য যেসব উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে:

- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলার সক্ষমতা উন্নয়ন;
- 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কমসূচির আওতায় কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য উপজেলা/ইউনিয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়সাধন;

- ইউনিয়ন পরিষদের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও কৌশল নির্ধারণ; এবং
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য যথাযথ নির্দেশিকা তৈরি করা।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

- জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও অন্যান্য ঘাতসহিষ্ণু উপযোগী করে গ্রামাঞ্চলের প্রধান সড়কগুলোর অধিকতর উন্নয়ন/দুই লেনে উন্নীতকরণ (১৬ হাজার কিমি)।
- গ্রামগুলোর সঙ্গে আরও ভালো সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়কের উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ অভিগম্যতা সূচক (RAI) ৮৪ শতাংশ (২০১৮ সালের জরিপ) থেকে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ (৩৩ হাজার কিমি)।
- প্রধান গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রামীণ সড়কের ওপর নির্মিত এক লাখ ৬৫ হাজার মিটার সেতু নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন/প্রশস্তকরণ।
- জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গে এলজিইডির সড়ক যুক্ত হওয়ার মোড়সমূহে নিরাপত্তা প্রকৌশলের উন্নয়ন সাধন এবং মহাসড়কের সঙ্গে বাছাইকৃত কিছু ইউনিয়ন সড়কের উন্নয়ন (আট হাজার কিমি)।
- ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধাসহ ৫০০ গ্রোথ সেন্টারকেন্দ্রিক নগর কেন্দ্রের উন্নয়ন সাধন।
- এক হাজার ২০০ গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজারের উন্নয়ন।
- যেসব ইউনিয়ন পরিষদে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ বাকি আছে, সেগুলোর সবগুলোয় ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা। (এক হাজার ১৬৬টি ইউনিয়ন), উপজেলা কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ (৪০০টি ইউনিয়ন)।

৭.৪.২ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কৌশলগত লক্ষ্য হলো সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন। এই সামষ্টিক অভীষ্ট এসডিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা কমিয়ে আনা, অসমতা কমানো এবং কৃষির উৎপাদনশীলতা ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ সংগঠন প্রতিষ্ঠা উৎসাহিতকরণ, গ্রামীণ পুঁজি সুবিধা, নাগরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে উদ্দীপনা জোগানোর পাশাপাশি কিছু সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। এই অভীষ্ট অনুসারে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হবে:

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক উদ্দেশ্যাবলি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য নির্ধারিত প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হলো:

(১) কর্মসংস্থান বাড়ানো ও আয় সৃজনের লক্ষ্যে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির বহুমূখীকরণ ত্বরান্বিতকরণ;
(২) ঝুঁকিগ্রস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দারিদ্র্য হার কমিয়ে আনা;
(৩) দরিদ্র অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার মাধ্যমে জেলাগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
(৪) আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি ও উৎপাদন কার্যক্রমে সমবায়ের কর্মকাণ্ড উৎসাহিতকরণ; এবং
(৫) কৃষিপণ্যের বিপণনের জন্য কৃষক, অকৃষি খাতে নিয়োজিত কর্মী এবং বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ

পল্লী উন্নয়ন ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এই উভয় ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে–গ্রামীণ

অবকাঠামো ও সংযোগ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নের সক্ষমতা বাড়ানো, পুঁজিসংক্রান্ত সেবাসমূহ সম্প্রসারণ, গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানচিত্রায়ণ, জীবিকাভিত্তিক গ্রাম প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ ই-কমার্সসহ গ্রামীণ পণ্যের জন্য বাজারের সংযোগ সৃষ্টি, সুবিধাভোগীদের ডেটাবেজ তৈরি, নারীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ, পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ প্রভৃতি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় রক্ষা করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দায়িত্ব পালন করে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগ পল্লী ও শহর উভয় এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত। শহরের অবকাঠামো উন্নয়নের নীতি ও কৌশল নিয়ে নবম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আর গ্রামীণ অবকাঠামোর কৌশলসমূহ এখানে বর্ণনা করা হলো।

কিছু কৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো:

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়নে যেসব বিষয়ে জোর দেয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে–মানব সম্পদ উন্নয়ন, গ্রামীণ জনপদের সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। গ্রামীণ জনসমষ্টিকে তাদের সাধারণ অভীষ্ট নির্ধারণ, অভীষ্ট অর্জনে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ ও তা মূল্যায়নের বিষয়ে সক্ষম করে তোলা উচিত।

পুঁজিসেবার সম্প্রসারণ: স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্যে গ্রামীণ উৎপাদন কার্যক্রমের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। তাছাড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে যদি ঋণ ও অনুদান হিসেবে পুঁজি সরবরাহ করা হয়, তাহলে তা তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। আয়বর্ধক কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের উন্নয়নকল্পে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তাদের নিজস্ব সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, এসএমই ঋণ ও সহায়ক নানা সংযোগ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রাখবে।

গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানচিত্রায়ণ: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানচিত্রায়ণ (ম্যাপিং) এবং তার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জীবনযাত্রাপিডিয়া (Livelihoodpedia) প্রস্তুত করা হবে। এ প্রকাশনায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনযাত্রার ঐতিহ্যগত ও সম্ভাব্য ধারা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হবে এবং এটি হবে এ-সংক্রান্ত একটি উন্মুক্ত ডেটাবেজ। উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিতকরণে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ে যেসব অংশীজন কাজ করে, তারা এ ম্যাপিং ও ডেটাবেজ কাজে লাগাতে পারবেন।

জীবিকাভিত্তিক গ্রাম প্রতিষ্ঠা: প্রশিক্ষণ-ঋণ-উৎপাদন-বিপণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নানা ধরণের জীবিকাভিত্তিক গ্রাম (হাঁস গ্রাম, ছুতার গ্রাম, সূচিকর্মভিত্তিক গ্রাম, দর্জি গ্রাম প্রভৃতি) গড়ে উঠেছে। বিআরডিবি'র 'গাইবান্ধা সমন্বিত গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন (GIRPA)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জীবিকাভিত্তিক গ্রাম প্রতিষ্ঠার ধারণা বিকাশ লাভ করেছিল। এখন সক্ষমতা, ভৌগোলিক অবস্থান, বিপণনের সুযোগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে এ ধরণাটির বিস্তার ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বিআরডিবি ১২৮টি জীবিকাভিত্তিক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করবে।

ই-কমার্স সুবিধাসহ গ্রামীণ পণ্যের জন্য বাজারের সংযোগ: করপোরেট বিপণনের সুযোগ রেখে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সুসংগঠিত ও দক্ষ বাজার সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে বিআরডিবি সময় বুঝে 'গ্রামীণ পণ্য মূল্য' নির্ধারণ করবে। বাজার সুবিধা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচির আওতায় এসব পণ্যের প্রচার ও বিপণন কৌশল সমন্বয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তায় 'গ্রামীণ পণ্যের জন্য ই-কমার্স' ধারণার বিস্তার ঘটানো হবে।

গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ: গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের ওপর একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ পদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যেটার দেখভালের দায়িত্বে থাকবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। এ ডেটাবেজে মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে বিআরডিবি। বিভিন্ন ধরণের পরিষেবা সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্ম সম্পাদনের জন্য গ্রামীণ উন্নয়নে কাজ করা অন্যান্য অংশীজনও এ ডেটাবেজ ব্যবহার করতে পারবে।

গ্রামীণ জনপদে তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) সেবার বিকাশ: গ্রামীণ এলাকায় আইটি সেবার সম্প্রসারণ করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষ যোগাযোগ, তথ্য-উপাত্ত, অনলাইন সেবা, ই-কমার্স ও সংগতিপূর্ণ অন্যান্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগাতে পারে। অংশগ্রহণমূলক উপায়ে বিআরডিবি এর কিছু গ্রামীণ উন্নয়ন সংগঠনের আইটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব সংগঠনের মধ্য থেকে বাছাইকৃত সংগঠনের যোগ্য সদস্যদের ইউপি ও এনবিডির সঙ্গে সমন্বয় করে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে বিআরডিবি।

নারীর ক্ষমতায়ন: বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন কৌশলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি নারীদের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিআরডিবি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অন্যান্য সংস্থা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের গ্রামীণ সমাজের মূল ধারায় আনতে নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে যেসব

বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সহায়তাদান, বাজার সুবিধা নিশ্চিত করা, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক কর্মসূচি প্রভৃতি। গ্রামাঞ্চলে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং রোধে নারীকে ক্ষমতায়িত করা এবং জেন্ডার সমতা আনয়নে বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমন্বিত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

গ্রামীণ সংরক্ষণাগার: গ্রামীণ অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে অধিকাংশ কৃষক ফলন মৌসুমেই তাদের উৎপাদিত পণ্য কম মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। অন্যদিকে ফলন মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়ার পর এসব পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে তখন এসব পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করার প্রয়োজন পড়ে। এতে একদিকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যায়, অন্যদিকে ভোক্তারা বেশি দামে এসব পণ্য কিনতে বাধ্য হন। উৎপাদিত পণ্যের স্বল্পকালীন সংরক্ষণ এবং উৎপাদনকারী ও ভোক্তার মধ্যে ন্যায্য দাম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিআরডিবি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে গোষ্ঠী/সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পণ্য সংরক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসন ও দুর্দশা কমাতে ধারাবাহিকভাবে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আয়বর্ধক কর্মসূচি, কর্মসৃজন, প্রশিক্ষণ, পুঁজি সরবরাহ, পুঁজি গঠন, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতা ও কর্মসূচির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ: সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশ গ্রামীণ জনপদে উন্নয়ন, শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি, ২০০১'-এ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ক্রীড়ার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দেশীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বিকাশ সাধনে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে উদ্যোগ নেয়া হবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তাদের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্রাম উন্নয়ন সংঘগুলোর মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং গ্রামীণ জনপদের সাংস্কৃতিক সম্পদের বিকাশে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সমাজ উন্নয়ন সংঘের যৌথ সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও ভূমি জোনিং: বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ এবং এর অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কৃষির জন্য ভূমি ও মাটি হচ্ছে প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। ভূমির সঙ্গে মানুষের আনুপাতিক হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। ফলে ভূমির অযথার্থ ও অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ করে মাটির গুণাগুণ রক্ষার পাশাপাশি এর যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিতে চাহিদা অনুসারে ভূমির যথাযথ জোনিং করা গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিআরডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক ও কৃষিতে ভূমির ব্যবহার নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারণ করা হবে। টেকসই উন্নয়নের জন্য ভূমির এরূপ যথাযথ ও দক্ষ ব্যবহারের বিষয়ে প্রাধিকার দেয়া হবে।

পল্লী আবাসন: বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে আবাসনের মতো একটি মৌলিক প্রয়োজনের বেশ ঘাটতি রয়েছে। সরকার এরই মধ্যে স্বল্প খরচে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। পল্লী আবাসন একটি নতুন ধারণা, যার আওতায় গ্রামের সুবিধাজনক স্থানে অপেক্ষাকৃত কম জায়গায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে, যাতে অনেক বেশিসংখ্যক গ্রামীণ জনগণ সেখানে বসবাস করতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে দেশে গ্রামীণ আবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড সরকারের গ্রামীণ আবাসনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যথেষ্ট সক্ষমতা রাখে। পল্লী আবাসন কর্মসূচির বিষয়ে এরই মধ্যে বিআরডিবি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেশকিছু আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে বিআরডিবির।

গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন: পল্লী এলাকার প্রতিটি পাড়া (গ্রামের একাংশ), গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে পল্লী জনপদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনের দায়িত্বে নিয়োজিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। উপজেলা সদরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী টাইপ-বি ফিডার সড়ক এবং উপজেলা সদরের সঙ্গে গ্রোথ সেন্টারের সংযোগ স্থাপনকারী টাইপ-বি সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগ। উল্লিখিত এ অবকাঠামো ব্যতীত অন্যান্য যেসব ক্ষুদ্র অবকাঠামো রয়েছে, যেমন নলকূপ বসানো, ক্ষুদ্র সড়ক নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ প্রভৃতি; যেগুলো স্থানীয় সরকার বিভাগ বা অন্য কোন সংস্থার কর্মসূচিতেও নেই। ২০০০ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা হিসেবে বিআরডিবি 'অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন' পদ্ধতির আওতায় পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করে চলেছে। সংস্থাটির

মাধ্যমে এরই মধ্যে দেশব্যাপী বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১২ সালে বিআরডিবির ৪৫তম বোর্ড সভায় সংস্থাটির চেয়ারপারসন এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রীর উপস্থিতিতে 'অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন' পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম উন্নয়নের মূল ধারায় সংযুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা এ অবকাঠামোকে মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবি যাতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে, সেজন্য সংস্থাটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করেছে। তাতে রাজস্ব বাজেটে বিআরডিবির জন্য ক্ষুদ্র অবকাঠামো খাতে নিয়মিতভাবে অর্থ বরাদ্দের জন্য কোড প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই): ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি বড় ধরণের ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিল সংকট, স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার কারণে অধিকাংশ এসএমই উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এসএমই খাতের এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিপর্যায়ে ও বেসরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পল্লী এলাকার এসএমই খাতকে টেকসই করার লক্ষ্যে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরডিবি অর্থ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও কাঁচামালের জোগান নিশ্চিত করে এসএমই খাতকে সহায়তা করছে। উপজেলা পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে এসএমইর পথচলা সুগম করতে বিআরডিবি বর্তমানে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ তৈরি, অর্থ সহায়তা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার মতো উদ্যোগ নিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ এসএমইর উন্নয়ন সাধন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানে বিআরডিবি আরও বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

গ্রামীণ জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন: গ্রামীণ জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা পল্লী জনপদের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের বিভিন্ন চর ও পাহাড়ি অঞ্চলের পাশাপাশি কিছু কিছু অঞ্চলে খুবই সীমিত পর্যায়ের বিদ্যুতায়ন সুবিধা বিদ্যমান। বর্তমানে কিছু এনজিও এসব প্রত্যন্ত গ্রামীণ চর ও পাহাড়ি এলাকায় সোলার ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করছে। তবে এনজিওগুলোর প্রদত্ত এ জ্বালানি সুবিধা সাশ্রয়ী ও সম্ভাবনাময় নয়। বর্তমানে বিআরডিবির মূল সংস্থা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তাদের বিদ্যমান জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে এসব প্রত্যন্ত চর ও পাহাড়ি এলাকার প্রতিটি প্রান্তে তাদের সেবার হাত প্রসারিত করেছে। সুতরাং বাংলাদেশের এসব প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব সহজেই বিআরডিবি জ্বালানি সহায়তাও পৌঁছে দিতে সক্ষম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিআরডিবি এসব কম সুবিধাপ্রাপ্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসমষ্টির জন্য স্বল্প খরচে সম্ভাব্য উপায়ে জ্বালানি সুবিধা পৌঁছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কৃষির যান্ত্রিকীকরণ: লাভজনক ও প্রতিযোগিতামূলক কৃষির জন্য যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ ব্যতীত এক জমিতে একাধিক বার ফসল ফলানো কঠিন। কারণ একই জমিতে বছরে কয়েকবার ফসল ফলাতে হলে জমি প্রক্রিয়াকরণ, চারা রোপণ, আগাছা পরিষ্কার করা, ফসল উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে দেশে বিদ্যমান চাষাবাদ ব্যবস্থায় অনেক বেশি অর্থ ও সময় ব্যয় হয়। অন্যদিকে আধুনিক যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থায় এ খরচ কিছু ক্ষেত্রে অর্ধেকে, আবার কিছু ক্ষেত্রে তা চার ভাগের এক ভাগে নেমে আসে। কৃষক সমবায় সমিতির (KSS) মাধ্যমে কৃষকদের এ যান্ত্রিকীকরণ সেবা প্রদান করা হবে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে ফসল বপন, উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেটজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের কৃষিযন্ত্র বিতরণ। পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের কৃষকদের এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা ও সেগুলোর মেরামতের দক্ষতা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ চরমভাবে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তিনটি প্রধান নদীর অববাহিকা–গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর প্লাবনভূমির বদ্বীপে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান এবং একটি নিচু সমুদ্র উপকূল রেখাসহ নিম্ন প্লাবন সমভূমির বিস্তৃতি থাকায় বাংলাদেশ বহু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে (যেমনঃ বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, লোনাপানির অনুপ্রবেশ, নদীভাঙন প্রভৃতি) এবং ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার সক্ষমতা অর্জনের জন্য গ্রামীণ এলাকায় নানা ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

গ্রামীণ পরিবেশের সুরক্ষায় সেখানে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব উপায় অবলম্বন নিশ্চিত করা হবে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা এবং মাটি, বনজসম্পদ, পানিসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার রোধে বিভিন্ন ধরণের নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং জাতীয় পরিবেশ আইনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হবে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং কৃষিতে অরগানিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হবে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং মাটি, পানি ও বায়ুদূষণ রোধের কার্যক্রমে জনগণ যাতে সক্রিয় অবদান রাখতে উৎসাহিত হয়, সে বিষয়ে তাদের উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন শক্তিশালী করা হবে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পল্লী অঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, টেকসই কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন: দুগ্ধসমৃদ্ধ উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের সম্প্রসারণ; আমার গ্রাম আমার শহর ধারণার বাস্তবায়ন–বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা; হাওর অঞ্চলের মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা; সমবায়ের মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের জীবন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; গ্রামীণ যুব ও নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

টেকসই কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা: সমবায়ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থার উন্নয়ন; ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সমবায়ভিত্তিক কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ঘটানো; ৬১টি জেলায় দুগ্ধ সমবায়ের বিস্তার ঘটানো; কৃষিপণ্যের সমবায়ভিত্তিক বাজার প্রতিষ্ঠাকরণ; দুগ্ধ সমবায়ের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারী, শিশু ও কিশোরী মেয়েদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভূক্তকরণ।

গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন: আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমবায়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন: বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)

'মানব সংগঠনভিত্তিক উন্নত গ্রামীণ সম্প্রদায়' এ রূপকল্প বিবেচনায় রেখে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন ও পল্লী এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। সংস্থাটির কর্মকৌশল হলো, 'সুসংগঠিত জনগণ, প্রশিক্ষণ, পুঁজি, প্রযুক্তি, সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল অঞ্চল প্রতিষ্ঠা।' বিআরডিবি নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করবে:

- আমার গ্রাম, আমার শহর;
- যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান;
- নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা;
- পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান;
- গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসন;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার;

উল্লিখিত কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি গ্রামীণ অংশীজনসমূহের সমন্বয় সাধন, স্থানীয় নেতৃত্বকে জনগোষ্ঠীর অনুঘটক হিসেবে রূপ দেয়া, সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নিজস্ব প্রাত্যহিক কার্যক্রমে অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো ও গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD), কুমিল্লা

ফলিত ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা, বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) হচ্ছে পথপ্রদর্শক প্রতিষ্ঠান। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বার্ড নিম্নোক্ত প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ পরিচালনা করবে:

- গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন;
- টেকসই কৃষির জন্য পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা;
- কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলোর জীবনমানের উন্নয়ন সাধন;
- গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন সাধন;
- করোনা মহামরি-পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রামভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন; এবং
- উপকূল, হাওর ও চর এলাকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনকল্পে বার্ড বরিশাল, চট্টগ্রাম (পার্বত্য এলাকা ব্যতীত) ও সিলেট বিভাগে আঞ্চলিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করবে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA), বগুড়া, রংপুর, জামালপুর, যশোর; এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু একাডেমি (BAPARD), কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ

আরডিএ ও বিএপিএআরডি'র লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণ প্রদান, ফলিত ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা, স্নাতকোত্তর কোর্স পরিচালনা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের গবেষণা কর্ম মূল্যায়ন, পল্লী উন্নয়নের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান এবং দারিদ্র্য বিমোচন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত মডেলের বিস্তার সাধনে সংস্থাটি যশোরে একটি নতুন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আরডিএ ও বিএপিএআরডি বেশকিছু প্রায়োগিক গবেষণা পরিচলনা করবে। এসব গবেষণার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে জীবিকার টেকসই উন্নয়ন; ব্যয়সাশ্রয়ী ও টেকসই কৃষিপ্রযুক্তির বিকাশ ও বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন; নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন; গ্রামীণ উৎপাদনকারীদের জন্য ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকল্পে বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনযাত্রার খাপ খাওয়ানো; গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব ও উত্তরণের উপায়; গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারিদ্র্য ও অসাম্য নিরসন; অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন; পল্লী অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা; টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন মডেলের বিকাশ সাধন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (SFDF)

এ ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান। ক্ষুদ্রঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আয়বর্ধন এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (PDBF)

পিডিবিএফের লক্ষ্য হলো প্রশিক্ষণ, পুঁজি গঠন ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীসহ যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম হাতে নেবে।

দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

- মিল্কভিটার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মিল্কভিটা যেসব কার্যক্রম হাতে নেবে তার মধ্যে রয়েছে, নতুন দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠা, গরু পালন, দুগ্ধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ এবং অকৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কৌশল

গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমূখীকরণ জোরদার করা: কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ও বৈচিত্র্য আনয়নের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বর্তমানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে রূপান্তর চলমান, তার ফলে কৃষিবহির্ভূত কার্যক্রম থেকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর রোজগার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়ের উৎস বহুমূখীকরণ ও কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা হবে। এ কৌশলের বিস্তারিত বিষয়বস্তু পরিকল্পনা দলিলের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া কৃষিখাতের কৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে। গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তরের জন্য নানা ধরণের সহায়ক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব নীতি সহায়তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ, সুনীল অর্থনীতির সুফল আহরণের উদ্যোগের পাশাপাশি মৎস্য আহরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে নীতি সহায়তা প্রদান, গ্রামীণ অবকাঠামোয় সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অকৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে নীতি সহায়তা দান।

ভারসাম্যপূর্ণ গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ: দেশের গ্রামীণ জনপদে নানা সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির বিষয়ে সরকার ওয়াকিবহাল। এজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘাটতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে অবকাঠামো উন্নয়ন, পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে কৃষি ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো এবং কৃষিবহির্ভূত উদ্যোগসমূহ শক্তিশালীকরণে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধিকরণ। পিছিয়ে থাকা এলাকার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়ার ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা শক্তিশালীকরণ: গ্রামাঞ্চলে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে, গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আওতা ও গুণগত মান বাড়ানো হবে এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত নারী ও সামাজিকভাবে বাদ পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃষি বিষয়ে নানা গবেষণা পরিচালনা এবং এ থেকে উদ্ভাবিত শস্যের আবাদ সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেয়া হবে, যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং গ্রামীণ উন্নয়নের সহায়ক নানা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ: প্রয়োগমুখী ও গ্রহণযোগ্য গবেষণা পরিচালনা, যথাযথ জ্ঞান অবহিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রামাঞ্চলে প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ এবং বিএপিএআরডিকে শক্তিশালী করা হবে। টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমিসমূহ, বিআরডিবিসহ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন অন্য সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও এর উন্নয়নের হালনাগাদ অবস্থার বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে একটি জিআইএসভিত্তিক ডেটাবেজ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সমবায় ইউনিয়নগুলোর কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ: স্থানীয় সরকার সংস্থা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায় ইউনিয়নগুলো শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং তাদের ঋণদান কার্যক্রম সমাজে কী প্রভাব রাখছে, তা জানার জন্য ঋণদান কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে। একই সাথে সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায় উদ্যোগ উৎসাহিতকরণে এটি পরামর্শ প্রদানের কাজও করবে। অধিকন্তু পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তর সমবায়, সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায় উদ্যোগ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির তথ্য ডেটাবেজের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের জন্য উন্মুক্ত রাখবে, যাতে সবাই সেখান থেকে সেবা পান। কৃষিপণ্যের মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে সেসব পণ্যের বাজারজাতকরণ, কৃষিপণ্যের মূল্য শৃঙ্খল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, উৎপাদন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত সহায়ক কর্মসূচি এবং বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণ: দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ সুফল আহরণে এসব কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণের গুরুত্বের বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সচেতন। তবে কোভিড-১৯ মহামারিকালে এ কাজটি আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বাছাই করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সহায়ক অন্যান্য সংস্থাগুলো সর্বোচ্চ চেষ্টা প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, যাতে এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি ও বাদ পড়া উভয়ই যৌক্তিক মাত্রায় হয়।

৭.৪.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পরিচিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয় অত্র অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় করবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিতে সহায়তা প্রদান করবে। একই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ, সম্পদের অধিকার এবং কৃষি ও অকৃষি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে:

- পরিবীক্ষণ ও তদারকি জোরদার করা হবে, যাতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাগরিকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি এবং পুষ্টি ও আবাসন সুবিধা নিশ্চিত হয়।
- পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ অনুসারে জেলা পরিষদের নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে।
- ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ওই এলাকায় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।
- 'বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০০১' অনুসরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে ভূমি কমিশন বিরোধ নিষ্পতি সম্পন্ন করবে। এমন পরিস্থিতিতে ভূমির মালিকানার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি বিধি কার্যকর করা হবে, যাতে বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সহজ উপায়ে অত্র অঞ্চলের বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করতে পারে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক চুক্তির বিধানানুসারে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি ভূমি জরিপ অনুষ্ঠিত হবে। অত্র অঞ্চলের বিরোধ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি যথোপযুক্ত ভূমিনীতি গ্রহণ করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সম্প্রসারণ, বাণিজ্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৌচাষ ও মাশরুম চাষ, ফলদ ও ঔষধি গাছের চাষাবাদ এবং কৃষিবহির্ভূত কার্যক্রম সম্প্রসারণে মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সহজতর করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে।
- ফসল মাড়াই-পরবর্তী সংরক্ষণ, ভ্যালু-চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন, প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। স্থানীয় সেবা ও পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কজাতকরণ ও বিপণনের জন্য ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হবে।
- পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিক্ষেত্র অনুযায়ী আয় সৃজনের অংশ হিসেবে পার্বত্য এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশভিত্তিক পর্যটন (ইকোটুরিজম) ও জনসমষ্টিভিত্তিক পর্যটন চালু করার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হবে। টেকসই পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়ন এবং রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। পর্যটন যাতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।
- জীববৈচিত্র্য ধরে রাখা ও বৃষ্টিপাতের মাত্রা ঠিক রাখতে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা হবে এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ছড়া, জলাশয় ও ঝরনায় পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এটি টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমকে জোরদার করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত কৌশল

- তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা বাড়ানো হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনে এসব সংস্থা কার্যকরভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় সমন্বিত কৌশল, উদ্ভাবন, দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, মাসিক সমন্বয় সভা, মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ও অন্যান্য আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ। চুক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী, অন্যান্য মন্ত্রণালয় পার্বত্য অঞ্চলে কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে চাইলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং এ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
- অন্যান্য জেলার তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলে দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি। এ দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে বরাদ্দ প্রাক্কলনে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে অর্থ ছাড় বৃদ্ধিকরণ, সেচ, ড্রেন, সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ-সংক্রান্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা জোরদারকরণ এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো থেকে ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুরক্ষা সম্প্রসারণ করা হবে।

৭.৫ অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মতো প্রধান প্রধান সরকারি অংশীজনদের সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। উন্নয়ন সহযোগীদের স্থানীয় জোট স্থানীয় পরামর্শক গোষ্ঠীর (এলসিজি) মধ্যে নানা ধরণের সেক্টর ওয়ার্কিং গ্রুপ (SWG) থাকায় উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এখানে যদি যথাযথ সমন্বয় না হয়, তাহলে একই ধরণের কাজে একাধিক উন্নয়ন সহযোগীর যুক্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, ফলে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কাজ করা সংস্থা এবং তাদের বিপরীত অংশে নেতৃত্বদানকারী সরকারি সংস্থার চিত্র সারণি ৭.৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। স্থানীয় গভর্ন্যান্স, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং নগরবিষয়ক খাতে উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য সরকারের পক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগ দায়িত্ব পালন করে। অনুরূপভাবে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়; সড়কসংক্রান্ত বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যক্তিখাতের উদ্যোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; এবং পার্বত্য অঞ্চল-সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। যেহেতু স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পল্লী উন্নয়ন, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যোগ এবং পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামীণ অবকাঠামো সংক্রান্ত কাজ করে, তাই এসব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্বও এ সংস্থাটিই পালন করবে এবং এসব কার্যক্রম থেকে সর্বোচ্চ সুফল অর্জনের চেষ্টা করবে।

সারণি ৭.৫: উন্নয়ন সহযোগী ও খাতভিত্তিক কার্যসম্পাদনকারী সংস্থা

ক্রমিক	উন্নয়ন সহযোগী	কার্যসম্পাদনকারী সংস্থা (লিড মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
১.	এডিবি, ডেনমার্ক, ইইউ, জার্মানি, জাপান, ইউএন সংস্থাসমূহ, সুইজারল্যান্ড, বিশ্বব্যাংক	স্থানীয় সরকার বিভাগ (LGD)
২.	এডিবি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইইউ, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইউএন সংস্থাসমূহ, বিশ্বব্যাংক	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (LGD)
৩.	এডিবি, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইউএন সংস্থাসমূহ, বিশ্বব্যাংক	নগর খাত (LGD)
৪.	এডিবি, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ইইউ, জাপান, কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইউএন সংস্থাসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক	কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন (কৃষি মন্ত্রণালয়)
৫.	এডিবি, কানাডা, ডেনমার্ক, ইইউ, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ইউএন সংস্থাসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাংক	ব্যক্তিখাত উন্নয়ন ও বাণিজ্য (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)
৬.	জাপান, এডিবি, আইএসডিবি, কোরিয়া, বিশ্বব্যাংক	সড়ক ও মহাসড়ক (সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়)
৭.	ইউএন সংস্থাসমূহ, এডিবি, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমাক, ইইউ, যুক্তরাষ্ট্র	পার্বত্য চট্টগ্রাম (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)

সূত্র: এলজিআরডি খাত কৌশলপত্র ২০১৮

৭.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বরাদ্দ

স্থানীয় সরকার সংস্থা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য চলতি ও স্থির মূল্যের হিসাব অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দের চিত্র সারণি ৭.৬ ও ৭.৭-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে সকল স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও শহরকেন্দ্রিক সড়কের জন্য গৃহীত প্রধান প্রধান প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহ ও নগর উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত মোট বরাদ্দ স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্য নির্দেশিত বরাদ্দের তুলনায় অনেক বেশি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ করে সম্পদ কর আরোপ ও স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক নাগরিকদের প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীত আদায় করা মাশুলের মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ আহরণের বিষয়টি শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার সংস্থার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সারণি ৭.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাক্কলন

(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৪.৭	২৪০.৪	২৮১.৯	৩১০.৪	৩৫৩.৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৩.৪	২৮.৯	৩৩.৩	৩৮.৮	৪৬.৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১.৮	১৪.৫	১৬.৮	১৯.৬	২৩.৫
খাতভিত্তিক মোট	২৫৯.৯	২৮৩.৮	৩৩২.০	৩৬৮.৮	৪২৩.৯

সূত্র: অধ্যায় ৫, খণ্ড ১ অ্যানেক্সার সারণি এ৫.১

সারণি ৭.৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রাক্কলন

(বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২২৪.৭	২২৮.২	২৫৪.৭	২৬৭.২	২৯০.৮
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৩.৪	২৭.৪	৩০.১	৩৩.৪	৩৮.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১.৮	১৩.৮	১৫.১	১৬.৮	১৯.৩
খাতভিত্তিক মোট	২৫৯.৯	২৬৯.৪	২৯৯.৯	৩১৭.৪	৩৪৮.৪

সূত্র: অধ্যায় ৫, খণ্ড ১ অ্যানেক্সার সারণি এ৫.২

খাত-৮:

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

অধ্যায় ৮

টেকসই উন্নয়ন: পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

৮.১ পর্যালোচনা

গত দশকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ২০০৯ অর্থবছরে যে মাথাপিছু আয় ছিল ৭৫৪ মার্কিন ডলার, ২০১৯ অর্থবছরে তা এক হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। অর্থনৈতিক এ রূপান্তরের মূলে রয়েছে গত চার বছরে গড়ে ৭.৬ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন। উপরন্তু বাংলাদেশ পরিমিত মাত্রার দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য উভয়ই কমাতে সক্ষম হয়েছে। এই দারিদ্র্যবান্ধব অর্থনৈতিক রূপান্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশে টেকসইভাবে শিশুমৃত্যু ও জন্মহার কমেছে, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধিসহ জনগণের পুষ্টি অবস্থার উন্নতি হয়েছে, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতায় উন্নতি হয়েছে এবং শিক্ষাবিস্তারের আওতা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

২০১৯ অর্থবছরে দেশে ৮.১৫ শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ২০২৫ অর্থবছরে এটি ৮.৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ থেকে ২০৪১ অর্থবছরে গড়ে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়নের এই দীর্ঘমেয়াদি উচ্চাশা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই প্রকৃতি ও জলবায়ুর বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং যেসব বিষয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, এমন বিষয়গুলো, যেমন দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী পরিবেশগত বাস্তুতন্ত্রের মানের অবনতি ও দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ যেসব আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম, যেমন রিও সনদ, প্যারিস চুক্তি এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা পরিপালনের বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যদিও কিছু উন্নয়নশীল দেশ 'দূষণসহ উন্নয়ন করে পরে দূষণমুক্ত' হওয়ার নীতি নিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, বাংলাদেশ এক্ষেত্রে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মনে করে প্রবৃদ্ধি তখনই টেকসই হবে যখন তা পরিবেশবান্ধব (সবুজ প্রবৃদ্ধি) উপায়ে অর্জিত হবে। পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি স্বল্পমেয়াদে ব্যয়বহুল ও অর্থনীতির জন্য বোঝা মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে পরিবেশ ধ্বংস করে দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয় না। কেননা পরিবেশের ওপর বেশি চাপ দিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন করা গেলেও এটা করতে গিয়ে ভূমির মান অবনমন, নদীভাঙন, বন্যা, মাটির উর্বরাশক্তি বিনষ্ট হওয়াসহ পানি, মাটি ও বায়ুদূষণের ফলে জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি সাধিত হয় এবং সার্বিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের ওপর যে ক্ষতি হয়, তা থেকে পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। সে কারণেই একটি ঘাত-সহনশীল ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নতির দিকে ধাবিত হওয়া অর্থনীতি থেকে অধিক মাত্রায় সুফল পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (BDP2100)-তে একটি পরিমিত পর্যায়ের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনীতির কী পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে, মোটাদাগে সে বিষয়ে একটি প্রক্ষেপণ দেয়া হয়েছে। এ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, পরিমিত মাত্রার জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে ২০৪১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে দেশের ১.৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ পরিকল্পনায় এটিও তুলে ধরা হয়েছে যে, যদি পরিবেশগত ক্ষতি মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেয়া না হয় (স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেয়া বা Business-As-Usual-BAU), তাহলে প্রবৃদ্ধি কেমন হবে এবং যদি পরিবেশ রক্ষা করে (ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ অন্যান্য উদ্যোগ, যা নীতি চিত্র হিসেবে বিবেচিত) উন্নয়নের পথে এগোনো হয়, তাহলে প্রবৃদ্ধি কেমন হবে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবেশকে গুরুত্ব না দিলেই বরং উন্নয়নের জন্য নানামুখী ব্যয় বেড়ে যায়।

এ দুই প্রেক্ষাপটে (Scenarios) মাথাপিছু আয়ে কী ধরণের পুঞ্জীভূত ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে, তার একটি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০৪১ অর্থবছর পর্যন্ত এ ব্যবধান দাঁড়াবে প্রায় ২৭ শতাংশ। ২০১৫ সালের এক সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৮ সাল থেকে এ সময় পর্যন্ত পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে দেশের মোট জিডিপির ১৫ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। আর বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে সরকারের যৌথ এক প্রতিবেদন অনুসারে ২০১০ সালে জলবায়ু-সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর মানুষের জীবিকা, অবকাঠামো ও উৎপাদন ব্যবস্থার যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা দেশের মোট জিডিপির ০.৫ থেকে এক শতাংশের মতো। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে ওই সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশগত যে ঝুঁকি তৈরি হয়, জনস্বাস্থ্যের ওপর তা মারাত্মক

বিরূপ প্রভাব ফেলে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে নতুন নতুন কীটপতঙ্গ ও রোগসৃষ্টিকারী উপাদানের জন্ম হচ্ছে। এছাড়া বায়ুদূষণ এবং ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ নানা ধরণের পানিবাহিত রোগ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এসব প্রভাব ও অর্থনীতির সম্ভাব্য ঘাত মোকাবেলায় যদি কার্যকর বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়, তাহলে অর্থনীতিতেও তার কার্যকর ইতিবাচক প্রভাব প্রতিভাত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বন্যা ও নদীভাঙনের কারণে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব বাস্তুচ্যুত মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যাপক মাত্রায় শহরে অভিগমন করে। যা হঠাৎ করে নগরীতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং শহরের জীবনযাত্রার মানও নিম্নগামী হয়।

অর্থনৈতিক রূপান্তরকে অর্থবহ করে তুলতে সরকার পরিবেশগত স্থিতিশীলতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। স্বাধীন দেশ হিসেবে যাত্রার পর থেকেই বাংলাদেশ জলবায়ুগত অভিঘাত সহনশীলতা অর্জনে ভালো সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবিলা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অবকাঠামো ও জলবায়ু অভিঘাত সহনশীলতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনে যৌক্তিক মাত্রায় বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে দেশকে জলবায়ু অভিঘাত-সহনশীল ও পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হলে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে একটি উন্নত দেশের পরিবেশের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, ২০৪১ সালের মধ্যে সেসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ২০২১-২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়েছে, যা সারণি ৮.১ ও ৮.২-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিবেশগত বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বড় ধরণের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে বড় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কারণ হলো এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অতীত পারফরম্যান্স সন্তোষজনক নয়। অতিসম্প্রতি ইয়েল ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ২০২০ সালের 'এনভায়রনমেন্ট পারফরম্যান্স ইনডেক্স (PEI)'-এ বাংলাদেশের অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ১৬২তম অবস্থানে। এছাড়া ২০২০ সালের জলবায়ু ঝুঁকি সূচকেও দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ফলে ২০৪১ সালের উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন ও চরম দারিদ্র্য পুরোপুরি নির্মূলের বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করছে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার সক্ষমতার ওপর।

টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে টেকসই পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলবায়ু অভিঘাত-সহনশীল উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপোযুক্ত নীতি প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকারের সকল পর্যায়ে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সর্বাধিক জোর দিতে হবে, কারণ অধিকাংশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে এ পর্যায়ে। অধিকতর পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় 'সবুজ প্রবৃদ্ধি'র (গ্রিন গ্রোথ) বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা অন্তর্ভূক্ত করে অর্থনৈতিক ও পরিবেশ-সংক্রান্ত পরিকল্পনার মধ্যে সংগতি বিধানের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে, যাতে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। দারিদ্র্য নিরসন, ক্ষুধা নিবারণ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিবেশগত উদ্বেগকে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রেক্ষিতে পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া এবং দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের প্রয়োজনীয়তাসমূহ পরিকল্পনায় হাইলাইট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব লক্ষ্য ও কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্ষেপণ করা হয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি বা যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি, অষ্টম পরিকল্পনায় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যাবলি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ বর্ণিত দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এগুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সারণি ৮.১: ২০২১-২০৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় পরিবেশ খাতের উদ্দেশ্যাবলি

ক.	উচ্চ আয়ের দেশগুলোয় মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ শহরে বসবাস করে এবং উন্নতমানের জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এমন অবস্থান অর্জনে উদ্যোগ নেয়া হবে।
খ.	বিদ্যমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশগত বিষয়াবলির মধ্যে উপযুক্ত মাত্রায় ভারসাম্য আনয়নে উদ্যোগ নেয়া হবে। বিশেষ করে ভূমির উৎপাদনশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখা, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করা, দূষণ কমানো এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি স্বল্পতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পানিসম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
গ.	যথোপযুক্ত নালা ও আধুনিক নর্দমা নির্মাণ এবং যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরগুলোকে বন্যামুক্ত রাখার পাশাপাশি বিশুদ্ধ বায়ুর নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
ঘ.	চরম দারিদ্র্যের হার নেমে আসবে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি; কোনো বস্তির অস্তিত্ব থাকবে না এবং সব বাসস্থানই হবে বসবাস উপযোগী সুবিধাসম্পন্ন।
ঙ.	যে কোনো ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে দ্রুততম সময়ে সাড়া দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হবে।
চ.	পরিবেশ সংক্রান্ত গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করতে আইনগত নিয়মনীতি ও প্রণোদনার বিষয়গুলোর মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটানো হবে। এক্ষেত্রে দূষণকারীর কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের বিধান চালু করা হবে এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

সূত্র: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১, জিইডি

সারণি ৮.২: পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ

উদ্দেশ্যাবলি/লক্ষ্যসমূহ	ভিত্তি বছর (২০১৮)	লক্ষ্য (২০৪১)
মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বসবাসকারী জনগণের অনুপাত (%)	৩০	৮০
শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সংযোগপ্রাপ্তদের অনুপাত (%)	৪০	১০০
শহুরে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়াটার-সিলড শৌচাগার ব্যবহারকারী খানার হার (%)	৪২	১০০
আধুনিক নর্দামার সুবিধাপ্রাপ্ত শহুরে খানার হার (%)	প্রযোজ্য নয়	১০০
ট্যাপের পানির সুবিধা পাওয়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর হার (%)	০	৫০
গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়াটার-সিলড শৌচাগার ব্যবহারকারী খানার হার (%)	০	৫০
নিরাপদ নর্দমা সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ খানার হার (%)	০	১০০
চরম দারিদ্র্যের চিত্র (%)	২৪	< ৩%
বস্তিতে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার (%) (জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী)	৫৫	০
নগরীর বর্জ্য পানি শোধনের সুবিধা-সংবলিত কেন্দ্রের অনুপাত	প্রযোজ্য নয়	১০০
মৌলিক পরিবেশগত খাতে বিনিয়োগ (জিডিপির %)	১	৩.৫
পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয় সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা কর্তৃক ব্যয় (জিডিপির %)	০.০০৫	০.৫
দূষণকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় (ঘটনার %)	০	১০০
কার্বন কর (জ্বালানির দামের %)	০	১৫
ঢাকাসহ প্রধান প্রধান শহরে সবুজ বেষ্টনী (ঘনমিটার/মিলিয়ন জনসংখ্যা)	প্রযোজ্য নয়	৫-১২
দুর্যোগ প্রস্তুতি (%)	প্রযোজ্য নয়	১০০
নগরকেন্দ্রিক জলাশয়সমূহের পানির গুণাগুণ রক্ষা (%)	০	১০০
বায়ুর মান (বার্ষিক গড়, µg/m3 PM 2.5)	৮৬	৪০
উপযুক্ত ড্রেন ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যামুক্ত শহরের অনুপাত	০	১০০
মান নিম্নগামী হওয়া ভূমির অনুপাত	১৮	৫
বন দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমির অনুপাত (মোট ভূমির %) [ভিত্তি বছর ২০১৫]	১৪.১	২০
আন্তর্জাতিক র‌্যাংকিং অনুযায়ী আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণের হার	সর্বনিম্ন ৫%	সর্বোচ্চ ৩০%
আন্তর্জাতিক পরিবেশ সূচকে অবস্থান	সর্বনিম্ন ৫%	সর্বোচ্চ ৩০%

সূত্র: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর প্রাক্কলন। সর্বশেষ প্রাপ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ভিত্তিবছর নির্ধারিত

৮.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি

যেকোনো অর্থনীতি উন্নয়নের প্রথম ধাপে অপরিশোধিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান হারে পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে জলবায়ুর ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের পরিবেশ এ দুটি দিক থেকেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে সরকার কিছু মৌলিক কৌশলগত পরিকল্পনা ও আইন প্রণয়ন করেছে। ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'টেকসই উন্নয়নে জাতীয় কৌশল (NSDS) ২০১০-২০২১' গৃহীত হয়, যাতে ২০১০-২০২১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বৃহৎ উদ্দেশ্যাবলি পরিপালনের সুবিধার্থে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে দেশে বনভূমি সুরক্ষা, বায়ুদূষণ রোধ, পানিদূষণ রোধ, জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং নিমজ্জন ভূমি রক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপকভিত্তিক পরিবেশ-বিষয়ক আইন ও বর্তমানে দেশে বিদ্যমান রয়েছে। ভূমিক্ষয় রোধ, মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে প্রণীত কৃষি, ভূমি, পানি ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও দুর্যোগ-বিষয়ক অন্যান্য আইনও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্বেগসমূহ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সরকার সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৮.২.১ পরিকল্পনা, নীতি, কৌশল

সরকার একটি মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করেছে। এক্ষেত্রে প্রধান উপাদানগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮: টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়গুলো প্রতিফলিত করে পরিবেশকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার লক্ষ্যে সরকার 'পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২' পরিমার্জন করে 'জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮' ঘোষণা করেছে। এই নীতিটি পরিবেশ সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য নীতিতে বর্ণিত সমস্ত পরিবেশগত ক্রিয়াকলাপের দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে।

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬: সরকার ১৩টি এলাকাকে জীববৈচিত্র্যগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যেগুলো বর্তমানে সংকটাপন্ন এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত। অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষায় এগুলোকে ইসিএ (পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব বিবেচনায় এর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার 'পরিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬' ঘোষণা করেছে। বিধিগুলোর আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটির মধ্যে রয়েছে–জাতীয় ইসিএ কমিটি, জেলা ইসিএ কমিটি এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন ইসিএ কমিটি।

জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (ঘইঝঅচ), ২০১৬-২০২১

বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের এক সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছে। দেশের অর্থনীতি ও জনসমষ্টি তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকার জন্য বহুলাংশে জৈবিক সম্পদসমূহের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গ্রামীণ জীবনাচার ও ঐতিহ্যগত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে জীববৈচিত্র্য থেকে সেবা পেয়ে আসছে। আমাদের এই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও তার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই ২০১৬ সালে প্রণীত NBSAP অনুসরণ করতে হবে। এনবিএসএপি দেশের বৈশ্বিক লক্ষ্য ও জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ-সংক্রান্ত কর্ম ও কৌশল বাস্তবায়নের বিষয়টির যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এনবিএসএপি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নির্দেশিকা দলিল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ দলিল হালনাগাদকরণে জীববৈচিত্র্য আইনে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় এক্ষেত্রে যেসব প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'এনবিএসএপি ২০১৬-২০২১'-এর উদ্দেশ্যাবলি যেন প্রতিফলিত হয় এবং এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি যাতে এসডিজির লক্ষ্যগুলোর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ২০২১-২০৩০ মেয়াদে বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে ও বাস্তবায়ন করা হবে। এ কাঠামোর আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর এনবিএসএপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করবে।

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য-বিষয়ক কনভেনশনের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৭ সালে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন কার্যকর করে। এ জীববৈচিত্র্য আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। জীববৈচিত্র্য-বিষয়ক কমিটি গঠন, জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত রেজিস্টার প্রতিষ্ঠা এবং জীববৈচিত্র্য তহবিল প্রতিষ্ঠার বিধান চালু করার মাধ্যমে এ আইন স্থানীয় সরকারের সব পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে।

বাংলাদেশের জীবনিরাপত্তা (বায়োসেফটি) নীতি

জীবনিরাপত্তা-বিষয়ক আইনকানুন বাস্তবায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্ষমতা বাড়াতে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কাঠামো (NBF) বাস্তবায়নে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। আইনকানুন বাস্তবায়ন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে এরই মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ওরগানিজম (GMO) ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। কর্টেজেনা প্রটোকলের অংশীজন হিসেবে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এ চুক্তির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জিএমও ব্যবহারের বিষয়ে বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অবহিতকরণ এবং জীবনিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সহায়ক প্রচেষ্টা গ্রহণ। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বায়োসেফটি নীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। জিএমওসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বায়োসেফটিতে নির্দিষ্ট রূপরেখা রয়েছে। রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষাগারে গবেষণা পরিচালনা, মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা, জিএমওগুলোর আন্তঃসীমান্ত চলাচল, ট্রানজিট প্রভৃতি। এছাড়া মানুষ ও প্রাণিকুলের স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যেসব ক্ষেত্রে জিএমওর ব্যবহার বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সেসব বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্যের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

জাতীয় তেল ও রাসায়নিক স্পিল কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন (NOSCOP): নদীমাতৃক প্লাবন সমভূমির দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সমুদ্রসীমার জলপথে নৌযান চলাচলের হার অনেক বেশি। একটি নৌযানের সঙ্গে অন্যটির ধাক্কা লাগা, সংঘর্ষ, পণ্যবাহী নৌযান ডুবি এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সামুদ্রিক নৌপথে যে কোনো ধরণের দুর্ঘটনা উপকূলসহ সামুদ্রিক মৎস্যখাত, স্রোতের মোহনা ও গভীর সমুদের জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া নদীর মৎস্যকুল ও জলজ জীবন, প্লাবন ভূমি ও নিমজ্জন ভূমি; কৃষিপণ্য; অভ্যন্তরীণ ভূভাগ ও সামুদ্রিক পাখি; বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত সমুদ্রসৈকত এবং পর্যটন খাতের রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এছাড়া বাংলাদেশের উপকূল, বঙ্গোপসাগরের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (EEZ), বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে উচ্চতাবিশিষ্ট সমুদ্র অঞ্চল–এগুলোর সবই আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের রুটের কাছাকাছি অবস্থান করে। ফলে এসব অঞ্চল সম্ভাব্য তেল ও রাসায়নিক দ্রব্য চোয়ানোর ঝুঁকিতে থাকে। অতিরিক্ত সংখ্যায় জাহাজ ভাঙা এবং জ্বালানি তেল, পেট্রোলিয়াম-জাতীয় পণ্য ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, শিল্প স্থাপন প্রভৃতি উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিস্তৃতি ব্যাপকহারে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে তা থেকেও বিপজ্জনকভাবে দূষণের ঘটনা ঘটতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ এবং উপকূল ও সমুদ্রের পানিদূষণের হাত থেকে রক্ষায় বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় জাতীয় তেল ও রাসায়নিক স্পিল কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা (NOSCOP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

বন্য জীবন সংরক্ষণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন: বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নে সরকার বিস্তৃত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মহাপরিকল্পনা ২০১৫-২০৩৫ প্রণয়ন করেছে, যা বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নির্দেশ করে। বাংলাদেশ বাঘ কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭), বাংলাদেশ হস্তি সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) ও বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় প্রণীত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বর্তমানে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ: একবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশ উন্নতির যে মহাকর্ষে উন্নীত হবে, তা অর্জনের ক্ষেত্রে ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০’ একটি বৃহৎ উন্নয়ন কৌশল দলিল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে, যার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা। একটি সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক ভবিষ্যৎমুখী সমন্বিত কৌশলসমূহের সমষ্টিগত বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং জলবায়ুর অভিঘাত-সহনশীলতা পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে। ক্ষেত্রবিশেষে ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০’

একটি কারিগরি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, যার মধ্যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক উভয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ২০৩০ সাল নাগাদ একটি কার্যকরী বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ সংহতকরণের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। এটি একটি জুতসই ব-দ্বীপ ব্যবস্থাপনা (ADM) পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়েও নির্দেশ করে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন–বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে নজর দেয়া হবে।

সংক্ষেপে, বিডিপি ২১০০ দুটি সুনির্দিষ্ট নীতি কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে উন্নয়নের পথনির্দেশ করে; একটি হলো–যেমন চলছে চলুক নীতি (business-as-usual-BAU), অন্যটি হচ্ছে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডিপি) নীতি। 'যেমন চলছে চলুক' নীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের বিষয়ে কোনো প্রক্ষেপণ থাকে না; ফলে পরিবেশগত বিপর্যয় ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রবৃদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়ার ঝুঁকি দেখা দেয়। কারণ এ পদ্ধতিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া, উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্য সমস্যা ও নগরায়ণের ওপর অতিমাত্রায় চাপ পড়ার ফলে বিনিয়োগকৃত পুঁজির দক্ষতা কমে যায়। অন্যদিকে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্য ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের পরিকল্পনা থাকে, উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথকে সুগম করে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা নীতিতে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নামক বদ্বীপের স্থায়িত্বের জন্য নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয় পানিসম্পদকে। আর তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০'-কে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার (IWRM) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। আইডব্লিউআরএম-এর উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন, বনভূমি ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি। অধিকন্তু আইডব্লিউআরএম-এর সঙ্গে এই সমন্বয় দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসব অভীষ্টের মধ্যে রয়েছে–জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তা বিধান; পানির ব্যবহার ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিতে এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করে দক্ষতার ঘাটতি পূরণ; এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। আর সম্মিলিতভাবে এসব উদ্যোগ এসডিজির লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উল্লেখ্য, ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০' প্রণীত হয়েছে। পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত করার আগে এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ২৬টি ভিত্তিমূলক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এসব গবেষণার বিয়বস্তুর মধ্যে ছিল–জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা, পরিবেশ সংক্রান্ত গভর্ন্যান্স এবং জ্ঞান-উপাত্ত ব্যবস্থাপনা। পরিকল্পনাটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্বেগের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে–বিনিয়োগ পরিকল্পনা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ, সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সক্ষমতা উন্নয়ন; বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় আন্তঃসমন্বয় ও অন্তঃসমন্বয় নিশ্চিতকরণ; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সঙ্গে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পৃক্তকরণ; এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) সৃষ্টির মডেল উদ্ভাবন।

এনএপি, বিসিসিএসএপি, সিআইপি, এনডিসি, এফআইপি ও এফএমপি: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জিসিএফ-ইউএনডিপি'র সহায়তায় ২০১৯ সালে সরকার ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্ল্যান (NAP) প্রণয়ন করে। একইভাবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ কার্যক্রম এত দিনে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তির প্রাক্কালে উপস্থাপন করা জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) শীর্ষক প্রতিবেদন পরিবেশ ক্ষেত্রে সরকারের প্রধানতম দলিল। এ দলিলে দেশে বিদ্যমান পদ্ধতির (business-as-usual-BAU) মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমণ পাঁচ শতাংশ হারে বা বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্পখাতে ১২ মিলিয়ন মেট্রিক টনের সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিদ্যমান পদ্ধতিতে (business-as-usual-BAU) ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি খাতে বাংলাদেশ গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমণ অতিরিক্ত আরও ১০ শতাংশ বা ২৪ মিলিয়ন মেট্রিক টনের সমপরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েছে। এর বাইরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (ঋঅঙ) সহায়তায় ২০১৭ সালে জলবায়ু বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বর্তমানে বাংলাদেশ এনএপি প্রণয়নের

কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যা ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। যাহোক, জলবায়ু-সংক্রান্ত কার্যক্রমে অধিকতর সমন্বয় ও স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছ বাজেট বরাদ্দকরণ নিশ্চিতকল্পে উল্লিখিত সকল উদ্যোগ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় (BDP) এক ছাতার নিচে আনা আবশ্যক।

ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জলবায়ু রাজস্ব কাঠামো বা Climate Fiscal Framework (CFF)-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ কাঠামো জলবায়ু রাজস্ব নীতি (CFP) প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে নীতিগত ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে, যা জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের চাহিদা ও জোগান (ব্যয়, রাজস্ব বা অর্থ) নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং দীর্ঘ মেয়াদে সিএফপি'র স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। উল্লেখ্য, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের (সিএজি) কার্যালয় প্রথমবারের মতো অর্থ বিভাগের অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট ও জলবায়ু ঘাত সহনশীলতা (IBFCR) শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় পরীক্ষামূলকভাবে জলবায়ু লেন্স ব্যবহার করে দুটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়ার নিরীক্ষা সম্পন্ন করে।

বনভূমির আবর্তন বাড়ানো, বন উজাড়ীকরণ ও অবনমন রোধ করা এবং অংশগ্রহণমূলক/সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বন বিনিয়োগ পরিকল্পনা (FIP) (২০১৭-২০২০) প্রণীত হয়েছে। ২০১৫ সালে পূর্ববর্তী মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার পর জলবায়ু পরিবর্তন ও নৃতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় একটি হালনাগাদ বন মহাপরিকল্পনা (ঋগচ) ২০১৭-২০৩৬ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২.২ কার্যক্রম/উদ্যোগ/ব্যবস্থাসমূহ

উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: পরিবেশ অধিদপ্তরের ক্ষমতা উন্নয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটি ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় এবং আটটি বিভাগ, তথা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর কার্যালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

নদীভাঙন রোধে গৃহীত কার্যক্রম: পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা; ভূমির ব্যবহার এবং দেশব্যাপী ক্ষুদ্র নদ-নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে পরিবেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য সংরক্ষণে ক্লাইমেট স্মার্ট ইনটিগ্রেটেড কোস্টাল রিসোর্স ডেটাবেজ (CSICRD) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নাব্যতা বাড়াতে সরকার এরই মধ্যে ২০২২ সাল নাগাদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বেশকিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে–ভাঙন রোধ করার পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ নিশ্চিতে ৫১০ কিলোমিটার নদী খনন, সেচ কাজের জন্য চার হাজার ৮৮৩ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য ২০০ অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ, তিনটি বাঁধ ও রাবার ড্যাম নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণে ২৫০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা রোধ করা, এক হাজার ৪০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার, ৫৯০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেন অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, এক হাজার ৩২৫ কিলোমিটার পয়ঃনিষ্কাশন, খাল খনন ও পুনঃখনন এবং সীমান্তবর্তী নদীতে ১৯৫ কিলোমিটার পাড় সংরক্ষণ ও ছয়টি ক্রস-ড্যাম নির্মাণ।

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণে উন্নত ব্যবস্থাপনা চালু করা: পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সরকার পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার, উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধ করেছে। একই সঙ্গে শিল্প কারখানাগুলোয় বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন এবং কারখানার ব্যবহৃত পানি জলাশয়ে নির্গমণের আগে তা পরিশোধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলো, এসব নিয়ম-কানুন কার্যকরভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় প্লাস্টিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করেই চলেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ বিষয়ে জোর দেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এরই মধ্যে আইন অমান্য করে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে। এছাড়া দূষণ রোধের পদক্ষেপ হিসেবে হাজারীবাগ থেকে চামড়াশিল্প সাভারের শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে, যেখানে একটি কেন্দ্রীয় ইটিপির মাধ্যমে ট্যানারির তরল বর্জ্য পরিশোধন করে তারপর নির্গমণ করা হবে।

ভূমির অবক্ষয় রোধে পদক্ষেপসমূহ: জাতিসংঘ ঘোষিত 'ইউএনসিসিডি কৌশল ২০০৮-২০১৮'-এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বন উজাড়ীকরণ, ভূমিক্ষয় ও খরা (DLDD) নিয়ন্ত্রণে ২০১৫-২০২৪ সাল মেয়াদি বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই এনএপির লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য নিরসন ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য মরুকরণ/ভূমির অবক্ষয় প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ এবং খরার নেতিবাচক প্রভাব প্রশমনে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।

২০৩০ সালের মধ্যে ভূমির অবক্ষয় নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে (LDN) আনতে এসডিজিতে নির্ধারিত ১৫.৩.১ শীর্ষক লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এলএনডি অর্জনে জাতীয় অঙ্গীকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫১০০ বর্গকিলোমিটার শীর্ষক এলএনডি লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনায় (SLM) উত্তম চর্চা অনুসরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

উপকূলীয় বনায়ন বৃদ্ধিকরণ: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সমুদ্র উপকূলে নতুন করে জেগে ওঠা চরে বনায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়; যার আওতায় প্রায় ২৩ হাজার ৮১৮ হেক্টর ভূমিতে নতুন বনায়ন হয়েছে। উপকূল এলাকা জুড়ে 'সবুজ বেষ্টনী' গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বনায়ন নিশ্চিত করতে ২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর নতুন জেগে ওঠা চর ও অনুর্বর জমি চিহ্নিত করতে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং সে অনুযায়ী একটি মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়।

বন ও কার্বন ইনভেনটরি প্রতিষ্ঠা: বনজ ও বৃক্ষসম্পদের পরিমাণ নিরূপণ, কার্বন ও বায়োমাসের অবস্থা যাচাই এবং বন ও বৃক্ষসম্পদের ওপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতার হার পরিমাপের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ২০১৬-১৯ সময়ে জাতীয় বন ইনভেন্টরি (NFI) পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, দেশের মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির অনুপাত ১২.৮ শতাংশ। বনজ রেফারেন্স স্তর (FRL) নির্ণয়ের জন্য সরকার কৃষি, বন ও অন্যান্য খাতে ভূমির ব্যবহার (AFOLU) থেকে কার্বন নির্গমণ পরিস্থিতির প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা ইউএনএফসিসিসি'তে প্রেরণ করা হয়। বনজ খাত থেকে কার্বন নির্গমণ প্রশমনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় আরইডিডি প্লাস কৌশল (BNRS) প্রণয়ন এবং জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (NFMS) প্রচলন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল ভূ-উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবিসমূহ বিশ্লেষণ করে বৃক্ষ ও বনভূমির আবর্তন নির্ণয়।

সংরক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন: ২০১৭ সালে সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা জারি করা হয়। বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় সহগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করে বন অধিদপ্তর ২২টি সংরক্ষিত অঞ্চলে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

জলাভূমি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন: হাওর এলাকার উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদি একটি হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডেটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর অধীনে হাওর এলাকায় অবকাঠামো, নদী, খাল ও হাওরের পুনঃখনন এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রেখে পরিমিত মাত্রায় জাতীয়ভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সক্ষম হলেও হাওর অঞ্চল এখনো জাতীয় পর্যায়ের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এ কারণে সেখানকার উন্নয়নে এ মহাপরিকল্পনা জরুরি ছিল। বিশেষত, এ মহাপরিকল্পনা সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি বর্তমান জলবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি, ভূমি ব্যবহারের ধরণ, পরিবেশগত সংবেদনশীলতা এবং পানির মানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও ধারণা অর্জনের মাধ্যমে সরকারকে উন্নয়নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলার সুযোগ করে দেয়। তবে এক্ষেত্রে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এখনো সন্তোষজনক নয়। ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ খাতে শক্তিশালী প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার উন্নয়ন: প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের যেসব আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে, সেগুলোর ব্যবস্থাপনায় আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা উন্নয়নের বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত নদীগুলোর পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সাধনে ২০১১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সম্পাদিত কাঠামোগত চুক্তিতে সরকার স্বাক্ষর করে। এছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থানকারী দেশগুলোকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এ সংগঠনের সম্ভাব্য নাম প্রস্তাব করা হয় নদী অববাহিকা সংগঠন/ নদী অববাহিকা কমিশন।

উপাত্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন: উপাত্তের আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা ও অংশীজনদের সঙ্গে হালনাগাদ তথ্য ভাগাভাগির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন তথ্য পদ্ধতি (BFIS) প্রতিষ্ঠায় ২০১৭ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (BCC) সঙ্গে পরিষেবা চুক্তি (SLA) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বনসম্পদ পরিস্থিতির কার্যকর মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা দানের লক্ষ্যে বিএফআইএস-এর আওতায় কয়েকটি ইনফরমেশন মডিউলের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল।

বিকল্প জীবিকায় সহায়তা দান: বনের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার ১০ হাজারেরও বেশি পরিবারকে সহায়তা দিয়েছে। এর ফলে অবৈধ উপায়ে বনের গাছ কর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। বন অধিদপ্তরের বেশকিছু প্রকল্পের আওতায় এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।

জলাশয় ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন: জলাশয় ব্যবস্থাপনা সরকারের অন্যতম প্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। পানিচক্রের অবস্থান ধরে রাখা ও ভূমিধস রোধে পাহাড়ি বনাঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও বৃক্ষরাজির আবর্তন বাড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল।

সামাজিক বনায়নের জন্য অঙ্গীকার বাড়ানো: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বনায়ন স্কিমের মাধ্যমে হাজারো মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা হয়। বর্তমানে দেশে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ সার্বিক সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বেদখল হওয়া বনভূমি, ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চল, খালি প্রান্তিক জমি এবং রাস্তার পাশের খোলা চত্বরে পুনর্বনায়ন করা হয়। এসব বনায়নের প্রধান উপাদান ছিল কাঠ উৎপাদনকারী গাছ, কৃষিভিত্তিক বনায়ন ও দেশব্যাপী রাস্তার ধারে সারিবদ্ধ বনায়ন। প্রতি ১০ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে এসব সামাজিক বনায়নের গাছ কর্তন করে তার সুফল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

সবুজ প্রবৃদ্ধির প্রতিশ্রুত বৃদ্ধিকরণ: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাজেট প্রণয়নকালে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে বিভিন্ন ধরণের কর অবকাশ সুবিধার মতো রাজস্ব-সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর অবকাশ সুবিধার মধ্যে ছিল নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সব ধরণের সরঞ্জাম ও পণ্যসামগ্রীর ওপর থেকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট পরিশোধের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার। এছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ যাতে নবায়নযোগ্য শক্তির বিভিন্ন সরঞ্জাম কিনতে পারে, সেজন্য তাদের অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে। এর বাইরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি-সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহে করপোরেট আয়করে ছাড় দেয়া হয়।

জলবায়ু খাতে রাজস্ব সংস্কার

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (PFM) মূল ধারার সঙ্গে জলবায়ুর বিষয়টির সংগতি বিধান, কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং সংসদীয় পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যে ২০১৪ সালে সরকার জলবায়ু-সংক্রান্ত রাজস্ব কাঠামো গ্রহণ করে। এরই মধ্যে অর্থবিভাগ তাদের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোতে (MTBF) জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বাজেটকে জলবায়ু অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে বাজেট কল সার্কুলারের (BCC) মাধ্যমে কৌশলগত নির্দেশিকা জারি করেছে। এমটিবিএফ প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করে একটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোও প্রতিষ্ঠা করেছে। অধিকন্তু গত পাঁচ বছর ধরে আইবাস প্লাস প্লাস নামক একটি শক্তিশালী আইটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থবিভাগ বার্ষিক জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। অধিকতর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে তাদের নিজস্ব অডিট প্রটোকলের আওতায় জলবায়ু-বিষয়ক কর্মসম্পাদন নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। এ উদ্যোগ এডিপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত এবং বাংলাদেশের জলবায়ু-বিষয়ক অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি পরিবীক্ষণে সহায়ক।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশের সব বড় শহরে শব্দদূষণ অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা। উচ্চমাত্রার শব্দ শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়া, সার্বিকভাবে হজমশক্তিকে বাঁধাগ্রস্ত করা, শিশুদের বৃদ্ধি বাঁধাগ্রস্ত করাসহ নানা ধরণের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। শহরে উচ্চমাত্রার শব্দের জন্য মূলত দায়ী গাড়িচালকদের অবিবেচনাপ্রসূত ও অসহিষ্ণু মাত্রায় হর্ন বাজানো। ২০০৬ সালে সরকার শব্দ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা জারি করে। শব্দ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৭ মেয়াদে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার সমন্বিত ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল শব্দদূষণের ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রচারণা কর্মসূচি। দেশে শব্দদূষণের সমস্যা মোকাবিলায় পরিবেশ অধিদপ্তর 'সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বায়ুদূষণ হ্রাসকরণ ও পরিবীক্ষণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তাদের ১৬টি ধারাবাহিক বায়ু পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) ও ১৫টি সমন্বিত সিএএমএস-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী চারিপাশে পরিবেষ্টিত বায়ুর গুণাগুণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিবীক্ষণ করে চলেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে বায়ুর পাঁচ ধরণের দূষণ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিবীক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রাপ্ত বায়ু মানের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দৈনিক ভিত্তিতে বায়ুর মান সূচক (AQI) নির্ণয় করা হয়। এ সূচক পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পরিবেশন করা হয় এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর এ বায়ুদূষণের কী প্রভাব পড়ে, তা উল্লেখ করা হয়। কার্যকর উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নীতি, আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার ইট প্রস্তুতকরণ ও ইটভাটা স্থাপন আইন, ২০১৩ (সংশোধিত, ২০১৯) কার্যকর করেছে। ব্লকযুক্ত ইট ব্যবহার নিশ্চিত করতে

সরকার ২০১৯ সালের নভেম্বরে একটি গেজেট জারি করে। এ গেজেটে পোড়ানো মাটির তৈরি ইটের ব্যবহার ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে কয়েক ধাপে নির্দিষ্ট মাত্রায় কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সড়ক ও মহাসড়কের ভিত তৈরিতে মাটির পোড়ানো ইট ব্যবহার করা যাবে।

স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর দেশব্যাপী বায়ুদূষণকারী ইটভাটা বন্ধ করে দেয়ার বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের আশপাশের জেলাগুলোয় এ কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। ইটভাটা, নির্মাণকাজ, যানবাহন, উন্মুক্ত স্থানে আবর্জনা পোড়ানো, কলকারখানা ও অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত নির্দেশিকা জারি করেছে। বায়ুদূষণের বিষয়টি সমন্বিত উপায়ে মোকাবিলার লক্ষ্যে ২০২০ সালে পরিচ্ছন্ন বায়ু আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্তকারী উপাদান (ODS) এর বিষয়ে মন্ট্রিয়ল প্রটোকল বাস্তবায়ন: যেসব উপাদান ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য দায়ী, সেগুলোর বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট সম্পাদিত মন্ট্রিয়ল প্রটোকলে বাংলাদেশ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। পাশাপাশি ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে সম্পাদিত প্রটোকলটির লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিয়ল ও বেইজিং সংশোধনীও বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে অনুমোদন করে। এছাড়া ২০২০ সালের ৮ জুন সম্পাদিত মন্ট্রিয়ল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনীতেও বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে, যার মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সম্ভাবনা (GWP) রেফ্রিজারেন্ট এইচএফসিগুলোকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা হবে। বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে ২০১০ সালের জুনের মধ্যে বাংলাদেশ সিএফসি, হ্যালন, মিথাইল ক্লোরোফর্ম এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের আমদানি ও ব্যবহার বন্ধে নির্ধারিত লক্ষ্যের শতভাগ অর্জন করে। অন্য আরেকটি তফসিল অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে এইচসিএফসি গ্যাসের নির্গমণ ১৫ শতাংশ পরিমাণ কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত এ খাতে অর্জন ৩৩ শতাংশ। ২০২৫ সালের মধ্যে এ গ্যাসের নির্গমণ ৬৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রশমনের লক্ষ্য রয়েছে। প্রটোকলটির কিগালি সংশোধনীর সঙ্গে সংগতি রেখে উচ্চ জিডব্লিউপি থাকা রেফ্রিজারেন্ট এইচএফসিগুলো কমিয়ে আনার বিষয়ে বাংলাদেশ কার্যক্রম শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী এইচএফসি কমিয়ে আনার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়িত হলে বৈশ্বিক তাপমাত্রার বৃদ্ধি ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে আসবে। মন্ট্রিয়ল প্রটোকল বাস্তবায়নে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করায় জাতিসংঘের পরিবেশ দপ্তর (UNEP), আন্তর্জাতিক ওজন সচিবালয় ও বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO) যৌথভাবে ২০১২, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে বাংলাদেশকে প্রশংসা সনদ প্রদান করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় পদক্ষেপসমূহ: মা ইলিশ শিকার নিষিদ্ধ থাকার সময়কালে মৎস্য আহরণের ওপর নির্ভরশীল চার লাখেরও বেশি পরিবারের মধ্যে ভিজিএফের মাধ্যমে চাল বিতরণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া জাটকা ইলিশ রক্ষায় এগুলো শিকার করা বন্ধে প্রতিবছর চার মাস যাবৎ আড়াই লাখেরও বেশি পরিবারকে এমন সহায়তা দেয়া হয়। জলজ বন ও জলাভূমি ও পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (ECA) সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে সরকার একটি জাতীয় সংরক্ষণ নীতিমালা ২০১৬-২০৩১ প্রণয়ন করেছে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ সরকার ২০২২ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। একই সঙ্গে বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সুন্দরবন ও অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকায় 'স্মার্ট' (SMART) টহল শুরু করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল: জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবিলায় সরকার ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP) প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল (ঈঈঞঋ) গঠন করে। স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কোনো দেশের স্ব-উদ্যোগে জলবায়ু প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত এটিই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। জলবায়ু তহবিলে অর্থের জোগান নিশ্চিত করতে সরকার এ পর্যন্ত তিন হাজার ৬৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল ৭৮টি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে।

দারিদ্র্যবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশলের বিকাশ: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া, ঘাতসহনশীলতা অর্জন, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, কার্বন নিঃসরণ কমানো, সবুজ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে একটি দারিদ্র্যবান্ধব জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এজেন্ডা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মূলধারায় আনয়ন: জাতীয় পরিকল্পনাসমূহে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সন্নিবেশ ঘটাতে সরকার বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে অত্যন্ত সক্রিয়। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবিলায় সরকার একটি সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় থেকেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বাধিক ঝুঁকিতে পড়া দেশের ৭২টি ইউনিয়ন পরিষদের পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর বিষয়টি মূলধারার বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং তিন লাখ মানুষকে লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যা এবং উপকূল, হাওর ও চরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা জুগিয়েছে। অধিকন্তু সমগ্র সমাজ অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে ভূমিকম্প ও নগর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলার উপযোগী করতে দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশ সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি 'দুর্যোগ পূর্বকালে' বিপর্যয় প্রভাব মূল্যায়ন (DIA) পদ্ধতির বিকাশ সাধনের কাজ চলছে, যার লক্ষ্য হলো সম্ভাব্য বিপর্যয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং তথ্য সংহত করার মাধ্যমে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান উদ্যোগসমূহকে সংযুক্ত করে ডিজিটাল রিস্ক ইনফরমেশন প্ল্যাটফর্ম (DRIP) প্রতিষ্ঠা করছে, যাতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর দুর্যোগ প্রভাব মূল্যায়ন (DIA) পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিপর্যয় ও জলবায়ু ঝুঁকি-সম্পর্কিত উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সম্প্রসারণ ও ভূমির উত্তম ব্যবহার: কৃষিবহির্ভূত কার্যক্রমের কারণে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে কৃষিজমি হারাচ্ছে। আর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন হওয়ায় বিষয়টি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এতে পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে, কারণ শিল্প কারখানার বর্জ্য ও দূষণের কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বদলে যাচ্ছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ (SEZ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ এ পদ্ধতিতে শিল্পায়ন কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পরিপালন দেখভালকারী নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থাগুলোর পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আরও সঠিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এ পর্যন্ত সরকার ১১টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উদ্বোধন করেছে, যেগুলোয় বর্তমানে শিল্পকারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে: বাগেরহাটের মোংলায় মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় আব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক অঞ্চল, গাজীপুর সদরে বে অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে আমার অর্থনৈতিক অঞ্চল, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চল, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ঢাকার কেরানীগঞ্জে ইস্ট-ওয়েস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী ড্রাই-ডক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল। সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে সর্বমোট ৫১টি ও ব্যক্তিখাতে ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিচালনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

সবুজ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা সম্প্রসারণ: বিভিন্ন ধরণের পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, যেমন সৌরবিদ্যুৎ, জৈবগ্যাস প্লান্ট ও বর্জ্য শোধনাগারের (ETP) মতো খাতে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করে। এ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় প্রথমে মাত্র ১০টি পণ্য অন্তর্ভূক্ত থাকলেও পরে তা ৫০টিতে উন্নীত হয়। এ তালিকায় মোট ১১ ধরণের পণ্য রয়েছে। এগুলো হলো: নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প জ্বালানি, পরিবেশবান্ধব উপায়ে ইট পোড়ানো, পোড়ানোবিহীন ব্লকযুক্ত ইট, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন, কলকারখানায় কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। এ প্রকল্প থেকে মূলধন পেতে এ পর্যন্ত ৩৯টি ব্যাংক ও ১৭টি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি করেছে।

চামড়াশিল্প স্থানান্তর: বাংলাদেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন একটি উদীয়মান খাত। তবে পরিবেশের ওপর এ খাতের অতিমাত্রায় বিরূপ প্রভাব থাকায় এটি একটি ব্যয়বহুল খাত হিসেবে বিবেচিত। এ বিরূপ প্রভাব প্রশমনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ঢাকার হাজারিবাগ থেকে চামড়াশিল্প সাভারে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে এ খাতের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয়েছে।

সবুজ জলবায়ু তহবিলের জন্য দেশীয় কর্মসূচি (জলবায়ু কর্মসূচির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থের মূল্যায়নসহ): সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF) সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। বর্তমানে ইআরডির মাধ্যমে জলবায়ু তহবিলের জন্য চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি পাইপলাইন সৃষ্টি হয়েছে এবং এরই মধ্যে চারটি প্রকল্পে জিসিএফ থেকে ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়েছে।

৮.৩ টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

৮.৩.১ সুসংগত প্রতিষ্ঠান, নীতি এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ যেসব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন সেগুলো মোকাবিলায় সরকার ব্যাপকভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও নীতি প্রণয়ন করেছে। তবে এটিও সত্য যে, প্রায়ই আইন, বিধি ও কর্মসূচিসমূহ সমন্বিত ও সংহত টেকসই উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে কাজ করে না। আর এ আইন ও বিধিগুলো পরস্পরের সঙ্গে কতটা আন্তঃসংযোগ রক্ষা করে এবং কীভাবে সেগুলো অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব পুনর্নির্ধারণের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দেশকের ভূমিকা পালনের উপযোগী সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি সরকার স্বীকার করে। বিশেষ করে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা রাখা রাষ্ট্রীয় সংস্থা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত এর প্রধান অঙ্গ সংস্থা পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা, কারিগরি জ্ঞান ও জনবলের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশ-সংক্রান্ত কর্মসম্পাদন বিষয়ে নির্দিষ্ট কারিগরি উপাত্তের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে কী ধরণের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, সে বিষয়ের তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও হালনাগাদ করা হয় না। অনুরূপভাবে বন ব্যবস্থাপনায়ও জনবল ও সহায়ক পরিষেবাসমূহের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। বন অধিদপ্তরে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রয়োজনমাফিক বন-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে সংস্থাটিতে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের ঘাটতি পরিবেশ ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে দুর্বল করে তুলছে; বিশেষ করে পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত না করা এ দুর্বলতার অন্যতম কারণ।

সরকার এসব সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে এবং 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০'-এ বৃহত্তর পরিসরে নির্ধারিত কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রমের পন্থা নির্ধারণ করেছে। এ পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত পরিবেশগত উদ্বেগের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে একটি সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার পরিবেশগত বাজেট কার্যক্রম সংস্কারের (EFR) বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মাধ্যমে পরিবেশত বিষয়াবলি কম গুরুত্ব পাওয়ার বিষয়টি লাঘব হবে। পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জনে বিদ্যমান বাজেট নীতি পর্যাপ্তভাবে কার্যকর নয়। যাহোক, বাজেট সংক্রান্ত প্রণোদনার বিষয়ে একটি মূল্যায়ন সম্পাদন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। অন্যদিকে জ্বালানি খাতের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা অনেকটাই সরকারের ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীল। এ ভর্তুকি একদিকে যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে অধিক হারে কার্বন নিঃসরণের পাশাপাশি বাজেটের ওপর বড় ধরণের বোঝা সৃষ্টি করে, তেমনি এ জ্বালানি বায়ু ও পানিদূষণের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বাজেট সংক্রান্ত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে এসব বিষয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে টেকসই উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে 'দূষণকারী কর্তৃক মূল্য প্রদান' এবং 'সুবিধাভোগী থেকে মূল্য আদায়' এ দুই নীতির মিশ্র প্রয়োগ ঘটানো হবে।

এসব সংস্কারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের নিশ্চয়তা বিধান হওয়া কাম্য। একটা ক্ষুদ্র বিতর্ক প্রচলিত আছে যে, পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমে কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার জন্য মূলত দায়ী সম্পদের সীমাবদ্ধতা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সমন্বয়কারী প্রধান মন্ত্রণালয়ের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) এ খাতে বিনিয়োগ ২০২০ অর্থ-বছরের শেষে এসেও খুবই নগণ্য; এ খাতে সংস্থাটির বরাদ্দ ছিল জিডিপির মাত্র ০.০৫ শতাংশ। আর পানিসম্পদ, ভূমি ও পরিবেশ-সম্পর্কিত পরিষেবা সরবরাহকারী প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়ের মোট বিনিয়োগ ছিল মোট জিডিপির ০.৩৯ শতাংশ। পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন-সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পদের এই সীমাবদ্ধতা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে।

সারণি ৮.৩: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০০০			অর্থবছর ২০১০			অর্থবছর ২০২০		
	পরিচালন	এডিপি	মোট	পরিচালন	এডিপি	মোট	পরিচালন	এডিপি	মোট
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে	৫২	৮০	১৩২	৭৬৯	৬২	৮৩১	৮২০	৬৭৬	১৪৯৬
নমিনাল জিডিপি god GDP	২৩৭০৯০	২৩৭০৯০	২৩৭০৯০	৭৯৭৫৪০	৭৯৭৫৪০	৭৯৭৫৪০	২৮৮৫৮৭০	২৮৮৫৮৭০	২৮৮৫৮৭০
জিডিপির অনুপাত (%)	০.১৪	০.৪	০.৫৪	০.২৩	০.১৬	০.৩৯	০.১২	০.২৬	০.৩৯

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৮.৩.২ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সৃষ্ট পরিবেশগত উদ্বেগ

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম এবং ১৯৭২ সালের তুলনায় দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫ গুণেরও বেশি। ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের মোট জনসংখ্যা ২০ কোটি (২০০ মিলিয়ন) হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণ ও শিল্পায়নও বর্ধিতহারে বৃদ্ধি পাবে, যা বায়ু, পানি ও মাটির দূষণ বাড়িয়ে দিয়ে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ বিষয়টি বাস্তুতন্ত্র, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে হুমকিতে ফেলবে। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ যেসব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে, সেগুলো নিম্নরূপ:

পানির মান: পানিদূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর তার সীমিত সক্ষমতা দিয়ে পর্যবেক্ষণ ও আইন প্রয়োগের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। তবে সারাদেশে যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠন পানিদূষণের জন্য দায়ী, তার সবগুলোকে এ পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে পানিদূষণের জন্য মূলত দায়ী শিল্পকারখানার বর্জ্য, নগর অঞ্চলের বর্জ্য, কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও আর্সেনিক। বছরের পর বছর ধরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সংঘটিত হওয়ার ফলে নদীগুলোর পানির মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তা একটি চলমান স্থায়ী সমস্যায় রূপ নিয়েছে। বিশেষত ভূ-উপরিস্থ পানিদূষণের প্রধান কারণ ভূমিভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন–কল-কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য, মলমূত্র থেকে সৃষ্ট দূষণ এবং নৌযান থেকে চোয়ানো তেল ও অন্যান্য তরল রাসায়নিক দ্রব্য। দেশের নদীগুলোকে প্রায়ই ময়লা-আবর্জনার ভাগাড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এতে করে শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির মান পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানের নিচে নেমে যায়, যদিও বর্ষা মৌসুমে এ মানের উন্নতি ঘটে। এটা স্বীকার করতে হবে যে, দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রম ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও খুলনার মতো গুটিকয়েক জেলায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। সে কারণে ঢাকার প্রধান দুটি নদী বুড়িগঙ্গা ও তুরাগের তীরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্পকারখানা, যেমন–চামড়াশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্পের কাপড় রং করা ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, কারখানার কাপড় ধৌতকরণ, পোশাক প্রস্তুতকরণ, প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কারণে এ দুটি নদীর পানি মারাত্মকভাবে দূষণের শিকার হচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নর্দমার নোংরা পানি ও নগরীর কঠিন বর্জ্যের চূড়ান্ত গন্তব্যে পরিণত হয় নদী। বিভিন্ন ধরণের সমীক্ষা থেকে জানা যায়, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬০টি জেলার এক লাখ ২৬ হাজার ১৩৪ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের খাবার পানি আর্সেনিক দূষণের শিকার। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশে পানি ব্যবস্থাপনা কৌশলে আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি। সেজন্য পরিবেশ-সংক্রান্ত খাতে নির্ধারিত বৃহত্তর উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের অংশ হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পানির মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন জরুরি। আইন প্রয়োগ ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতার স্বল্পতা থাকায় শিল্পকারখানা, নর্দমা ব্যবস্থাপনা ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নদীকে ভাগাড় হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

বিভিন্ন ধরণের শিল্প ও বাণিজ্যক খাতে টেকসই উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিশ্চিত না হওয়ায় দেশের পানি নিরাপত্তা খাতে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে যেকোনো কাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার উন্মুক্ত। পানির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এটির মূল্যমান নির্ধারণ (দাম নির্ধারণ ও নিরীক্ষা) করা হবে। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার ঘাটতি থাকায় উপকূলীয় এলাকায় শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানির দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নগরীর বায়ুদূষণ: বিদ্যমান প্রমাণক থেকে জানা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বায়ুদূষণের শিকার শহরগুলোর তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, তাদের পর্যবেক্ষণ করা ২০২টি দেশের মধ্যে যেসব দেশের বায়ু সবচেয়ে দূষিত, বাংলাদেশ তার অন্যতম। বায়ুর এমন পরিস্থিতি খুবই অপ্রত্যাশিত, কেননা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুদূষণ জনস্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। প্রকট শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ, ফুসফুস ক্যানসার, হৃদরোগের পাশাপাশি মস্তিষ্ক, ধমনী, যকৃৎ ও কিডনির মতো শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গেও ক্ষতিসাধন করে এ বায়ুদূষণ। WHO'র হিসাবমতে, বাসস্থানের বাইরের বায়ুদূষণ বিশ্বব্যাপী বছরে ৪২ লাখ (৪.২ মিলিয়ন) মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ। বায়ুদূষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব রোগের কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে– (i) ২৯ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী ফুসফুস ক্যানসারজনিত রোগ, (ii) ১৭ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী শ্বাসকষ্টজনিত সংক্রমণ, (iii) ২৪ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী স্ট্রোক, (iv) ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী হৃদযন্ত্রকেন্দ্রিক রোগ, এবং (v) ৪৩ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী সিওপিডি। বাংলাদেশে বাসস্থানের বাইরের বায়ুদূষণের জন্য বেশকিছু কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: শক্তি উৎপাদনের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; শিল্পকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, বিশেষ করে ইটভাটার ধোঁয়া; দূষণ নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিশ্চিত না করে ও ধোঁয়া পরিশোধন না করে যানবাহন থেকে

সরাসরি নির্গমণ এবং কঠিন ও তরল বর্জ্য ভাগাড়ীকরণ। সে কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগরের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যাতে বাংলাদেশ বায়ুদূষণের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক মাত্রার জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে পারে।

মেট্রোপলিটন শহর ও আবাসিক ভবন/এলাকায় শিল্পের প্রভাব: শিল্পখাত সাধারণত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ইঞ্জিন হিসেবে বিবেচিত, কারণ এর সঙ্গে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের অগ্রমুখী ও পশ্চাদ্মুখী (ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ) সংযোগ বিদ্যমান। অন্যদিকে মেট্রোপলিটন শহর এলাকা এবং আবাসিক ভবনে কলকারখানা গড়ে তোলা হলে তা অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেশের মেট্রোপলিটন শহরগুলো (সিটি কর্পোরেশন এলাকা) মারাত্মকভাবে এ সমস্যা মোকাবিলা করে চলেছে। সে কারণে মেট্রোপলিটন এলাকা ও আবাসিক ভবন থেকে এসব কলকারখানা স্থানান্তরের জন্য সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে।

ভূমির অবক্ষয়: ৫০ লাখের (পাঁচ মিলিয়ন) বেশি জনসংখ্যা রয়েছে- এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ভূমির অবক্ষয় বাংলাদেশের জন্য এক বিশেষ ধরণের চ্যালেঞ্জ, কারণ এখানে মাথাপিছু জমির প্রাপ্যতা খুবই কম এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় এ প্রাপ্যতাও ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হচ্ছে। এখানে একটি বিষয় অনস্বীকার্য যে, বিদ্যমান ভূ-সম্পদের অবক্ষয়ের কারণে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও তা টেকসই উপায়ে ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও ভূমি ব্যবহারের ধরণ উভয় কারণেই মাটির অবক্ষয় সংঘটিত হতে পারে। প্রাকৃতিক যে কারণে ভূমির উৎপাদনশীলতা কমে যায়, তা হলো জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভাঙন ও ভূমিধস। আর ভূমির যে প্রকারের ব্যবহার এটির অবক্ষয় ঘটায়, তার মধ্যে রয়েছে–চাষাবাদের ধরণ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিল্পায়ন ও কঠিন বর্জ্য স্তূপীকরণ। বাংলাদেশ যে ধরণের ভূমিক্ষয়ের মুখোমুখি হয়, তার মধ্যে রয়েছে–(i) মাটির ভাঙন, (ii) পানির দূষণ, (iii) নদীর পাড় ভাঙা, (iv) উপকূলে লবণাক্ততা, (v) পলির স্তূপ জমে যাওয়া, (vi) মাটিতে এসিড সালফেটের মাত্রা বৃদ্ধি, (vii) অম্লতা, (viii) জলাবদ্ধতা, (ix) মাটির উর্বরাশক্তির নিম্নগামিতা, (x) মাটির দূষণ, (xi) জমি চাষ পদ্ধতির ত্রুটি ও (xii) বন নিধন। ফলে দেশে ভূমির অবক্ষয় প্রশমনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম টেকসই উন্নয়নের বৃহত্তর এজেন্ডা অর্জনেও সহায়ক হবে।

জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি: জীববৈচিত্র্য হচ্ছে সমগ্র জীবন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের সমাহার, যার মধ্যে রয়েছে সমগ্র জলজ জীবন (সামুদ্রিক ও মিঠাপানির প্রাণিকুল) ও সমগ্র বনজ জীবনের (বনের গাছপালা ও প্রাণিকুল) বাস্তুতন্ত্র। জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ নিশ্চিত করে। জীববৈচিত্র্য যেসব বিষয় সরবরাহ করে, তার মধ্যে রয়েছে–খাদ্য, বিভিন্ন আঁশজাতীয় পণ্য, ওষুধ, পানি ও বায়ু পরিশোধন, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টিচক্রের নিশ্চয়তা বিধান ও ভূমিক্ষয় রোধ। আর জীববৈচিত্র্যের যদি ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে মানবগোষ্ঠীর ওপর তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে যেসব মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষি, মৎস্য ও বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল, তারা বেশি ক্ষতির শিকার হয়। জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশের শ্রম শক্তির ৪০ শতাংশই কৃষিতে নিয়োজিত। জনস্বাস্থ্যের ওপরও জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের জীবন রক্ষাকারী ওষুধের প্রাপ্যতা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে; কারণ বাজারে যেসব সিনথেটিক ওষুধ পাওয়া যায়, তার অর্ধেকেরই প্রাকৃতিক উপাদান প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশে ব্যাপকভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ধ্বংসকারী অর্থনৈতিক রূপান্তরের কারণে সে বাস্তুতন্ত্র মারাত্মক হুমকিতে রয়েছে। বন উজাড়ীকরণ ও বনভূমির ক্ষয়, ভূমির অবক্ষয়, সমুদ্র ও নদীর পানিদূষণ, ভূমির আওতা বাড়ানোর জন্য অবিবেচনাপ্রসূত উপায়ে জলাশয় ভরাটকরণ, ভূগর্ভস্থ পানি ও পুকুর, নদী ও হ্রদের পানি ও মৎস্য সম্পদের অটেকসই ব্যবহার এবং অস্থিতিশীল উপায়ে চিংড়ি চাষ সমন্বিতভাবে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের সম্ভাব্য ক্ষতিসাধনে ভূমিকা রেখে চলেছে।

শব্দদূষণ: শব্দদূষণের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা শহর, যা বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর অন্যতম, সেখানে এ শব্দদূষণজনিত স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুমাত্রায় বেশি। জনসাধারণের সচেতনতা ও সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগের অভাব এবং শব্দদূষণ-সংক্রান্ত আইন-কানুন যথাযথভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় দেশের প্রধান প্রধান শহরে সহনীয় মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি শব্দদূষণ বিরাজমান। এ শব্দদূষণের উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে সড়ক, রেল ও বিমান; কলকারখানা, নির্মাণযজ্ঞ ও হাইড্রোলিক হর্ন। বারংবার সহনীয় মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রার শব্দের সম্মুখীন হওয়া জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মানসিক চাপ বৃদ্ধি এবং উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা।

নগরবর্জ্য দূষণ: বাংলাদেশে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা নগরের অধিবাসীদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে নগরবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি কেবল বর্জ্য সংগ্রহ ও তা ভাগাড়ে স্তূপীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ বর্জ্য হ্রাসকরণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশলের মতো ব্যয়সাশ্রয়ী কর্মসূচি গ্রহণের সম্ভাবনা কাজে লাগানো হচ্ছে না। অধিকন্তু বিদ্যমান

ব্যবস্থায় মাত্র ৪৪ থেকে ৭৬ শতাংশ কঠিন নগরবর্জ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, এর বাইরে বাকি বিপুল পরিমাণ বর্জ্য অসংগৃহীত ও অপরিশোধিত থেকে যায়। বিষয়টি সাধারণ নাগরিকদের বিড়ম্বনা ও স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দেখা দেয়। এছাড়া দক্ষ উপায়ে কার্যকরভাবে বর্জ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে তা নানা ধরণের সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০ শতাংশের মতো জৈব চিকিৎসা-সংক্রান্ত (বায়োমেডিকেল) বর্জ্য অত্যন্ত সংক্রামক এবং তা প্রায়ই নগরীর নর্দমায় মিশে যায়। একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর বিষয়টি দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

ই-বর্জ্য: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে প্রযুক্তির সংযুক্তি ঘটছে। সেমিকন্ডাক্টর ও সেন্সরের ব্যবহার পূর্বেও তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। ফলে মনিটর, স্মার্ট হোমস ও টিভিগুলো ইন্টারনেট থেকে সরাসারি প্রোগ্রাম স্ট্রিমের পাশাপাশি আরও অনেক কিছু করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোর অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ধীরে ধীরে কমে আসছে। ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাওয়া, অথবা বাজারে নতুন মডেলের পণ্য আসার পর পুরনো পণ্য নতুন পণ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নতুন ডিজাইন ও সফটওয়্যার-সংবলিত নতুন মডেলের পণ্য বাজারে ছাড়ার পর তার বিপণন বাড়াতে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কোম্পানি বাজারে সহজে প্রাপ্য আগের মডেলগুলোকে অপ্রচলিত হিসেবে ঘোষণা করে পুরনো মডেলের পণ্যগুলোয় মূল্যহ্রাস ঘোষণা দেয়। এতে একজন ব্যবহারকারীর কাছে ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যাওয়া পুরনো পণ্য মেরামতের চেয়ে নতুন নতুন পণ্য ক্রয়ই সাশ্রয়ী হয়ে পড়ে। বিভিন্ন মূল্যবান ধাতুর সংমিশ্রণে একটি যৌগ প্রস্তুত করে, যা ইলেকট্রনিক পণ্যে যুক্ত করা হচ্ছে। এসব মূল্যবান ধাতুর মধ্যে রয়েছে স্বর্ণ, রূপা, পিতল, প্লাটিনাম, প্যালেডিয়াম, লিথিয়াম, কোবাল্ট ও অন্যান্য উপাদান। পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এসব মূল্যবান জিনিসপত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু ইলেকট্রনিক পণ্যে নানা ধরণের ক্ষতিকর ধাতব দ্রব্যসহ বিষাক্ত উপাদানও থাকে, যার মধ্যে রয়েছে সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম ও বেরিলিয়াম, দূষণ সৃষ্টিকারী পিভিসি প্লাস্টিক ও বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন–ব্রোমিনেটেড ফ্লেম রিট্রিডান্ট। এগুলো মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

চিকিৎসা বর্জ্য: সংক্রমণ সৃষ্টিকারী ও বিপজ্জনক চিকিৎসা-সংক্রান্ত (মেডিকেল) বর্জ্যের স্তূপীকরণ পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। এগুলো চূড়ান্তভাবে ভাগাড়ীকরণের আগে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। ঢাকা শহরে ক্রমাগতভাবে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক স্টোরের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে। এ বিষয়ে সমসাময়িককালে পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়ায় সমস্যাটির ব্যাপকতা সম্পর্কে খুব কমই ধারণা রয়েছে। একটি প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে, ঢাকা শহরের স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোয় (HCE) দৈনিক প্রায় ৫৬ টন বিপজ্জনক ও অবিপজ্জনক মেডিকেল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে দৈনিক উৎপন্ন হওয়া বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিমাণ প্রায় ১২ টন। ঢাকা ও আরও কয়েকটি শহর ছাড়া দেশের বাকি শহরগুলোয় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উৎপন্ন স্থল ও এর বাইরে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এমনকি ঢাকা ও অন্য যে শহরগুলোয় মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা রয়েছে, সে ব্যবস্থাও উন্নত দেশগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তুলনাযোগ্য নয়।

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম জটিল একটি চ্যালেঞ্জ। এটি দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টিকে হুমকিতে ফেলে দিয়েছে। ফলে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত উভয় দিক দিয়ে ভঙ্গুরতার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও বিপুলসংখ্যক মানুষের বাস্তুচ্যুতি ঘটে, যা শহরাঞ্চলে উচ্চ দারিদ্র্যহার ও জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী করে দিতে পারে এবং মূল্যবান সম্পদের বিলুপ্তি ঘটায়। নানা প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত কারণে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, যার মধ্যে রয়েছে:

কৃষির ওপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ভঙ্গুরতার শিকার কৃষিখাত। যেসব উপায়ে জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার মধ্যে রয়েছে–(i) তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সৌররশ্মির তারতম্যের কারণে নতুন নতুন কীটপতঙ্গ ও ব্যাধির উদ্ভব এবং ক্ষুদ্র উদ্ভিদযৌগের কারণে মাটির উর্বরতা হ্রাস; (ii) তাপমাত্রার বৃদ্ধি বিভিন্ন জাতের ধানের ফলন কমিয়ে দিতে পারে; (iii) সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং তা দ্বারা মাটির উর্বরাশক্তি ও উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া। বস্তুত খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায়, তাহলে এসব অঞ্চলে আমন ধান আবাদের উপযোগী জমির পরিমাণ কমে যাবে ৬০ শতাংশ। আর এ বৃদ্ধি যদি ৮৮ সেন্টিমিটার হয়, তাহলে অঞ্চলটিতে আমন আবাদের উপযোগী জমি থাকবে মাত্র ১২ শতাংশ। এরই মধ্যে ওইসব অঞ্চলে ৬০ লাখ (ছয় মিলিয়ন) মানুষ উচ্চমাত্রার লবণাক্ততার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এ সংখ্যা ২০50 সালে এক কোটি ৩৬ লাখে (১৩.৬ মিলিয়ন) উন্নীত হবে; (iv) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ধিত মাত্রার বন্যা, ভূমিধস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষির উৎপাদনশীলতা কমবে।

বনজ সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও ঘনঘন ঝড় হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যার ফলে বনজ সম্পদ ও জলবায়ু সংবেদনশীল নানা প্রজাতির প্রাণী মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ লোনাপনির (ম্যানগ্রোভ) বন ও সুন্দরবন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চ বৃদ্ধির কারণে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম মাত্রায় ভঙ্গুরতার শিকার, যা বনের সার্বিক বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করবে। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি অংশ জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মানুষের অহরহ প্রবেশ ও ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এরই মধ্যে বনভূমিতে বৃক্ষরাজির আবর্তন কমে গেছে। মানুষের মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে জলাভূমির অবক্ষয় হওয়ায় নানা ধরণের সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে–বিভিন্ন বন্য প্রাণির বিলুপ্তি ও তাদের সংখ্যা কমে যাওয়া, বন্য পশুপাখি ও স্থানীয় বিভিন্ন জাতের ধানের বিলুপ্তি, বিভিন্ন ধরণের জলজ গাছগাছড়া, তৃণলতা, গুল্ম ও আগাছাজাতীয় উদ্ভিদের বিলুপ্তি, মাটির পুষ্টির জোগানদাতা প্রাকৃতিক উপাদানের ক্ষয়ক্ষতি, বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক জলাধার ও সেগুলো থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিলুপ্তি, ঘনঘন বন্যা সংঘটন এবং জলাভূমিভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র, পেশা, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো ও স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা বড় ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে। আগামী কয়েক দশকে জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভূমি, পানি ও বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার ক্রমাগত কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়বে।

ভূমি ও ভৌত সম্পদের ওপর প্রভাব: ১৫টি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ১৯৮০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায়োগিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিবছর ছয় থেকে ২১ মিলিমিটার হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার মনে করে, ২০৩০, ২০৫০ ও ২১০০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পারমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৪, ৩২ ও ৮৮ সেন্টিমিটার। এর ফলে সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে ভূমি ও ভৌতসম্পদের ক্ষতি সাধিত হবে। একই সঙ্গে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়বে। বস্তুত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি এক মিটার বৃদ্ধি পায়, তাহলে দেশের মোট শুষ্কভূমির একটি বিশাল অংশ স্থায়ীভাবে পানির নিচে চলে যাবে। এতে অর্থনীতির সব খাতের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাবে এবং ভূমির গুণাগুণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার চূড়ান্ত প্রভাব পড়বে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার ফলে সৃষ্ট বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় লগ্নিপুঁজির সম্ভারের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, কারণ এর ফলে ভৌত অবকাঠামোরও ঘাটতি দেখা দেবে। আইপিসিসির পঞ্চম মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি দেশের দুই কোটি ৭০ লাখ (২৭ মিলিয়ন) মানুষকে ঝুঁকিতে ফেলবে, যারা জলবায়ু শরণার্থী হিসেবে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্যখাতের ওপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যসমস্যা বাড়িয়ে দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ এর ফলে ডায়রিয়া ও আমাশয়ের মতো নানা ধরণের পানিবাহিত রোগ এবং ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো মশাবাহিত রোগের বিস্তার হতে পারে (এ রোগগুলো জলবায়ু সংবেদনশীল)। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যাচ্ছে, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়াজনিত অসুস্থতা ব্যাপকহারে বেড়ে যেতে পারে। দূষিত পানির মাধ্যমে আরও বাড়তি স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে আর্সেনিকের দূষণ বৃদ্ধি পেতে পারে। শহরাঞ্চলে দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষিত জলাশয় পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া পরিবেশে আর্দ্রতার অতিরিক্ত ঘনীভূতকরণ নানা ধরণের শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

দুর্গম জলবায়ু হটস্পট এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা: দুর্গম জলবায়ু হটস্পট এলাকা, যেমন–চর, হাওর, পাহাড়ি অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা (WASH) পরিষেবা বিরাজমান। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় এ সমস্যা সবচেয়ে বেশি প্রকট। দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করণের জাতীয় কৌশল ২০১১ অনুযায়ী, পাহাড়ি অঞ্চলের পর উপকূলীয় এলাকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ-সংখ্যক দুর্গম ইউনিয়ন অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার কারণে উপকূলীয় অঞ্চল মারাত্মক ভঙ্গুরতার শিকার। ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাড়তি দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ওয়াশ দারিদ্র্য নির্ণয় (BWPD) সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে এরই মধ্যে প্রায় ২৫ লাখ (২.৫ মিলিয়ন) মানুষ বিশুদ্ধ খাবার পানির চরম সংকটে ভুগছেন। ২০৫০ সাল নাগাদ ওই অঞ্চলে ৫২ লাখ (৫.২ মিলিয়ন) দরিদ্র ও ৩২ লাখ (৩.২ মিলিয়ন) চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠী পানি সংকটের সম্মুখীন হবে। ভূগর্ভস্থ লবণাক্ত পানি পরিহার করার ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অরক্ষিত স্বাদুপানির উৎস, যেমন পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে। এতে তারা মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। ওই সমীক্ষায় দেখা যায়, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবন এলাকায় স্কুলে কিশোরী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারও কমে যাচ্ছে। কারণ এসব কিশোরীকে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পরিবারের জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে হয়।[৯]

৯ Komatsu, H., and G. Joseph. 2016. "Drinking Water Salinity, Burden of Water Collection and School Attendance of Girls: Evidence from Bangladesh and West Bengal." Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে জাতীয় কৌশল ২০১১-তে পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা, হাওর ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় ওয়াশ কার্যক্রমের যে সংকট রয়েছে, তা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, কৌশলটিতে নগরাঞ্চলের বস্তিগুলোর বিষয়েও পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ বেশিরভাগ বস্তিই নিচু ভূমিতে অবস্থিত এবং সেখানকার জনগণ জলাবদ্ধতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভঙ্গুরতার শিকার। এসব অঞ্চলে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকাসমূহ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, সুপেয় পানির অভাব ও ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন। অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন পরিষেবার পাশাপাশি স্বাদুপানির সংকট ও খাবার পানির সরবরাহের বিষয়টি পার্বত্য অঞ্চলের জন্যও একটি বড় ইস্যু। এসব অঞ্চল জলবায়ু সংবেদনশীল এলাকায় পরিণত হয়েছে এবং এসব এলাকায় যথাযথ ওয়াশ পরিষেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ ধরণের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও অন্যান্য ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ নজর দেয়া উচিত।

৮.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশ-বিষয়ক কৌশল ও কার্যক্রমসমূহ

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও বন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অভীষ্ট ও কৌশলসমূহ ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১’-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যসমূহ সারণি ৮.৪-এ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৮.৪: পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার প্রধান কৌশলসমূহ

উদ্দেশ্য/লক্ষ্যসমূহ	ভিত্তিবছর (২০১৮)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
নগরীতে বর্জ্য পানি পরিশোধন সুবিধার হার	প্রয়োজ্য নয়	৫০
পরিবেশ খাতে প্রধান প্রধান বিনিয়োগসমূহ (জিডিপির %)	১	১.৫
পরিবেশগত বিষয়সমূহ সমন্বয়কারী সংস্থার বিনিয়োগ (জিডিপির %)	০.০০৫	০.১
দূষণকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় নীতির প্রয়োগ (দূষণের ঘটনার %)	০	৪০
কার্বন কর আরোপ (জ্বালানির দামের %)	০	৫
ঢাকা অন্যান্য প্রধান শহরের জন্য সবুজ বেষ্টনীভুক্ত এলাকা (বর্গমিটার/মিলিয়ন জনসংখ্যা)	প্রয়োজ্য নয়	১-৪
দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন ও ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি (মোট জনসংখ্যার %)	প্রয়োজ্য নয়	৫০
নগরাঞ্চলের জলাশয়গুলোয় পানির যথাযথ মান বজায় রাখা (%)	০	৫০
বায়ুর মান (বার্ষিক গড়, µg/m3 PM 2.5)	৮৬	৬০
উপযুক্ত নর্দমা ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যামুক্ত শহরের হার	০	৪৫
অবক্ষয়ের শিকার হওয়া মোট ভূমির হার	১৮	১২
বন দ্বারা আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ (মোট ভূমির %) [ভিত্তিবছর ২০১৫]	১৪.১	১৫.২
আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং অনুযায়ী বসতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	সর্বনিম্ন ৫%	সর্বোচ্চ ৫০%
আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে পরিবেশগত কর্মসম্পাদন সূচক	সর্বনিম্ন ৫%	সর্বোচ্চ ৫০%

সূত্র: জিইডির প্রক্ষেপণ, সর্বশেষ হালনাগাদ উপাত্তের ভিত্তিতে ভিত্তিবছর নির্ধারণ করা হয়েছে

৮.৪.১ টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশ-বিষয়ক রাজস্ব কাঠামো সংস্কার (EFR) কার্যক্রম

টেকসই উন্নয়ন ও সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পরিবেশ-বিষয়ক কর্ম সম্পাদনে পরিবেশবিষয়ক রাজস্ব কাঠামোয় ব্যাপকভিত্তিক সংস্কার সাধনে উদ্যোগ নেবে। এ সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে:

- **পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু অন্তর্ভুক্তকরণ:** সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় (PFM) ক্রমাগতভাবে সবুজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলনের মাধ্যমে সরকার বাজেট ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অগ্রাধিকার দেবে, যা নির্ভর করবে হিসাব, কেনাকাটা ও নিরীক্ষা কার্যক্রমে গ্রিন কর্মসূচি প্রচলনের ওপর। সব ধরণের বিনিয়োগ প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত ব্যয়ের হিসেবের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ‘সবুজ পিএফএম’ চালুর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে জোর দেয়া হবে।

- **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জন্য সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ:** পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে পরিপালনের জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বর্ধিত বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং মন্ত্রণালয়টিকে আরও বেশি পরিমাণ সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। ২০২৫ সাল নাগাদ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা খাতে রাষ্ট্রের মোট জিডিপির ০.১ শতাংশ বরাদ্দ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্রমাগত এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ২০৪১ সাল নাগাদ এ বিনিয়োগ দেশের মোট জিডিপির ০.৫ শতাংশে উন্নীত করা লক্ষ্য রয়েছে, যাতে সংস্থাটি অধিকতর ভালো মানের জনবল নিয়োগ, কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগ, প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত একটি উপাত্ত ভাণ্ডারের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (MIS) প্রণয়ন এবং পরিবেশগত নিয়নম-কানুন পরিপালনের বিষয়টি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে।
- **বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ:** ইসিএ বিধিমালা, ২০১৬ অনুসারে, বাংলাদেশ সরকার পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার (ECA) ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে ইসিএর জন্য বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক একটি পদ্ধতির অগ্রগতি সাধনে রাজস্ব বাজেটে একটি আর্থিক কোড সৃষ্টির কাজ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ সরকার তিনটি অঞ্চলকে ইসিএ হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সেখানকার বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা ও অবক্ষয় রোধে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের (CBD) অংশীদার। সিবিডি যেহেতু একটি নতুন দশকে (২০২১-২০৩০) প্রবেশ করছে, তাই এ কনভেনশন ও এর উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এনবিএসএপি ২০১৬-২০২১-এর বিকাশ ঘটিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতেই বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্য পরিকাঠামো ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশকে এনবিএসএপি সংশোধনে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ অনুসারে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং একদম তৃণমূল পর্যায় ও নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ কার্যক্রমের সহজীকরণে বাংলাদেশ সরকার একটি জীববৈচিত্র্য তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
- **বায়ুদূষণকারী শিল্পকারখানার ওপর কর আরোপ:** ইটভাটার দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় নীতির বাস্তবায়ন শুরু করেছে। অধিকন্তু, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে আরও নীতির বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়া হবে। এসব নীতির মধ্যে রয়েছে ‘দূষণকারীর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়’ নীতি। এ নীতির বাস্তবায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার শিল্পকারখানা এলাকায় আরও কঠোরভাবে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বর্তমানে বায়ুর মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি থাকা এবং এ-সংক্রান্ত ডেটাবেজ না থাকায় এ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। বায়ুর যথাযথ পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করা ও এ-সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণে সরকার বায়ুদূষণের ওপর কর আরোপ করবে, যা শিল্পোদ্যোক্তাদের পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে প্রেরণা জোগাবে।
- **শিল্পকারখানার মাধ্যমে পানিদূষণের ওপর করারোপ:** কলকারখানার মাধ্যমে পানিদূষণের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ এবং এ ধরণের কর্মকাণ্ডে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা ও করারোপ কার্যক্রম সরকার অব্যাহতভাবে বাড়াবে। দূষণের বিষয়সমূহ যাতে অধিকতর ভালোভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়, সেজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে পরিবেশ দূষণ রোধে ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা করবে। বর্তমানে শিল্পকারখানা থেকে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্যের কারণে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের ব্যাপক অবনমন হচ্ছে।
- **জীববৈচিত্র্যের নিরাপত্তা:** বাংলাদেশ সরকার একটি জীববৈচিত্র্য নীতি ও জীববৈচিত্র্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য বিধিমালা ২০১২ অনুসারে, মানবস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে জিনগতভাবে বিবর্তিত বিভিন্ন জাত (GMO) হস্তান্তর ও স্থানান্তরের আগে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন জিএমও’র বিষয়টি নিয়ে কাজ করে, তাদের উচিত জীববৈচিত্র্য বিধিমালা ও নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করা। পরিবেশ অধিদপ্তর এনবিএফ বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর একটি প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এবং সক্ষমতা আরও বাড়ানোর জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **জ্বালানির ওপর ভর্তুকি কমানো ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর সবুজ কর আরোপ:** জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও অভীষ্ট বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার ক্রমাগতভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর থেকে ভর্তুকি কমিয়ে আনবে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমণ কমিয়ে আনার কৌশল হিসেবে সরকার জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর সবুজ কর আরোপের মাধ্যমে কার্যকরভাবে রাজস্ব বাড়ানোর ওপর জোর দেবে। এ রাজস্ব পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রচলনসহ পরিবেশ-বিষয়ক অন্যান্য কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে।

- **পানি, স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে মূল্য নির্ধারণ নীতিসমূহ:** সরকার স্বীকার করে, রাষ্ট্রের একার পক্ষে সবার জন্য পানি, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। সে কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি ও পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করবে। এসব পরিষেবা খাতে যে ঘাটতি বিদ্যমান, তা সরকারের একার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব নয়। সে কারণেই এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন পড়বে। এসব পরিষেবার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'সুবিধাভোগী থেকে মূল্য আদায়' নীতি অনুসরণ করা হবে। বিশেষ করে নগর অঞ্চলের উচ্চমধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এটি চালু করা হবে, যাদের এ ব্যয়ভার বহনের সক্ষমতা আছে।

- **গৃহস্থালি আবর্জনার অবৈধ ডাম্পিংয়ের ওপর মাশুল আরোপ:** সরকার এ বিষয়টি স্বীকার করে যে, পানি ও বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ জলাশয় ও যত্রতত্র গৃহস্থালির আবর্জনা ফেলা। পৌর কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নততর উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই স্থানীয় সমস্যা কমিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহস্থালি আবর্জনা যত্রতত্র ফেলার ওপর মাশুল ধার্য করার পদ্ধতি চালু করা হবে, যা বাসস্থানের সার্বিক পরিবেশ ঠিক রাখতে সহায়ক হবে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার প্রাথমিকভাবে উচ্চ আয়ের নাগরিক অধ্যুষিত নগর এলাকায় একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরাপত্তা ক্যামেরা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

- **ব্যক্তিখাত থেকে অর্থের সংস্থান:** পরিবেশ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য তিনটি মাধ্যম রয়েছে। প্রথমত, বিভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে কাঠ উৎপাদনের উপযোগী ও কাঠবহির্ভূত বৃক্ষের মাধ্যমে বনায়ন, মৎস্যপণ্য উৎপাদন, প্রকৃতিকেন্দ্রিক পর্যটন, পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে যথাযথ আইনি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেবার উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। দ্বিতীয়ত, আইন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ খাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, কলকারখানায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানো, ব্যক্তিখাতের হাসপাতাল ও শিল্পকারখানায় ইটিপি স্থাপন এবং লাগসই উপায়ে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মাটির অবক্ষয় রোধ করা। বিশেষ করে ভূমির ক্ষয় রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে জুম চাষ পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হবে। তৃতীয়ত, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশগত পরিষেবার বিকাশ ঘটাতে সরকারি খাত সহ-বিনিয়োগকারীর ভূমিকা পালন করবে।

- **গাছ কর্তনের ওপর করারোপ:** এটা অনস্বীকার্য যে, বন ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চরম ঘাটতি ও গভর্ন্যান্সের দুর্বলতার পাশাপাশি সার্বিক বনসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নানা ধরণের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এটি মোকাবিলায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার যথাযথভাবে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন পদ্ধতির (MIS) মাধ্যমে বন গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। এ বিষয়টির সহায়ক হিসেবে কাঠের আসবাবশিল্পে গাছ কর্তন ও কাঠের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ওপর কর আরোপের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টি রাজস্ব আহরণ ও কাঠপণ্যের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ভালো উদ্যোগে পরিণত হয়ে উঠতে পারে। যেসব কারখানায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য কাঠের গুড়ি ঢোকানো হবে, সেসব কারখানার ফটকে রাজস্ব আহরণের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে সবগুলো কাঠের গুড়ি করজালের আওতায় আসে।

৮.৪.২ পরিবেশগত রাজস্ব ও বাজেট কাঠামো বাস্তবায়নে রাজস্ব কাঠামো সংস্কার

- **ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর সঙ্গে এনএপি, বিসিসিএসএপি, সিআইপি ও এনডিসিরি সমন্বয়:** বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, সমন্বয়সাধন ও উন্নততর গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরণের সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মনন্ত্রণালয়, খাতসংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও ইআরডির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জিইডি এ সমন্বয় প্রক্রিয়ায় প্রধান পরামর্শকের ভূমিকা পালন করবে। অধিকতর ভালো সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় বাজেট সংহতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর জন্য প্রণীত গভর্ন্যান্স কাঠামো প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে তারা জিইডির সঙ্গে পরামর্শ করবে।

- **অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরিবেশগত বাজেট/রাজস্ব সংস্কার কার্যক্রম (উঋজ) একত্রীকরণ:** এটি অনস্বীকার্য যে, পরিবেশ-সংক্রান্ত বাজেট/রাজস্ব কাঠামোতে সংস্কার (EFR) আনতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন হবে। পরিবেশ-সংক্রান্ত বাজেট/রাজস্ব কাঠামো সংস্কারের নীতি প্রণয়নের কাজ সম্পন্নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা প্রয়োজন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যক্রমের সঙ্গে ইএফআর কার্যক্রমের সংগতি বিধানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এ ধরণের অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করবে।

- **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:** অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ইএফআর কার্যক্রম বাস্তবায়ন শক্তিশালীকরণে সরকার পরিবশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেবে। সে অনুসারে সরকার বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরে বিভিন্ন আইন ও নিয়ম-কানুন বাস্তবায়ন ও ইএফআর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরি দক্ষতা, প্রশিক্ষিত জনবল, ভিত্তিমূলক তথ্য ও শক্তিশালী ম্যানেজমেন্ট ইনফরেমেশন সিস্টেমের (MIS) ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের জনবল বারবার পরিবর্তন করার ফলে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাড়তি অর্থ ব্যয়ের সুযোগ তৈরি হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এসব বিষয়ে নজর দেয়া হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তরের জন্য সরকার একটি যথাযথ এমআইএস পদ্ধতির বিকাশ সাধন করবে। এটি বাস্তবায়নে প্রথমে ঢাকায় একটি পাইলট কর্মসূচি চালু করা হবে। পরে সে কার্যক্রম অন্যান্য শিল্পপ্রধান শহরেও বিস্তার করা হবে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের যথাযথ মান অনুসরণের বিষয়টি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সক্ষমতাও বাড়ানো প্রয়োজন, কারণ এটি জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ভবিষ্যতে এ ট্রাস্ট যাতে বিদেশি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে।

- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সম্প্রসারণ:** পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ‘সুবিধাভোগীর কাছ থেকে মূল্য আদায়’ নীতির বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বাড়ানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেবে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথমত সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সাতটি বিভাগীয় শহরে ওয়াসার কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেবে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনায় যথাযথ মানসম্পন্ন উপায়ে আর্থিক হিসাব ও প্রতিবেদন প্রণয়নের ব্যবস্থা করবে, যা পরিষেবার এককপ্রতি ব্যয় ও মূলধন ব্যয়ের যথাযথ প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণে সহায়তা করবে। তৃতীয়ত, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা, উৎপাদিত পানির পরিমাণ ও দৈনিক কয় ঘণ্টা পানি সরবরাহ সচল থাকে সে বিষয়টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামোর গুণগত মান ও সময়, এ পরিষেবা থেকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ, রাজস্বের অনুপাতে অপচয় হওয়া পানির পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে কম্পিউটারভিত্তিক এমআইএস পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো হবে। প্রতিবছর এ এমআইএস হালনাগাদ করা হবে। চতুর্থত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বাড়ানো হবে, যাতে মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে অধিকতর ভালো নির্দেশনা প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এখানকার প্রাথমিক এজেন্ডা হলো–স্থানীয় সরকার স্তরের বিভিন্ন বিভাগে সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং সমন্বয় ব্যবস্থা বিকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া শক্তিশালী করার জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া এবং প্রশাসনিক অবকাঠামোগত ঘাটতি মোকাবিলা করা।

- **একটি পানি ও স্যানিটেশন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ** (WASRA) **প্রতিষ্ঠাকরণ:** অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি পানি ও স্যানিটেশন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (ওয়াসরা) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে, যে সংস্থাটি পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবা সরবরাহকারী বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তাদেও সরবরাহ করা বিভিন্ন সেবার মূল্য নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এসব পরিষেবায় ব্যক্তিখাতকে অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, এই মৌলিক সেবা প্রদানে যেন নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং সেবাগ্রহীতাও যেন ন্যায্য দামে সেবা পান।

৮.৪.৩ পরিবেশ-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

- **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ:** কমপ্লায়ান্স তদারকি ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা, উপাত্ত সংরক্ষণ ও নীতি-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার ব্যক্তিখাত, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও অন্যান্য গবেষণা সংস্থার সঙ্গে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কার্যকর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবে। কমপ্লায়ান্সের উন্নয়ন সাধন ও বিভিন্ন নীতির বাস্তবায়নে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ ও গণশুনানি আয়োজন এবং

অংশগ্রহণমূলক ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতির বিকাশ ঘটানো হবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে পরিবেশ-সম্পর্কিত অবস্থা এবং মাইলফলক অর্জনের জন্য নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশের হালনাগাদ অবস্থার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং তা বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ নেবে।

- **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ:** পরিবেশগত বিষয়াবলি নিয়ে কাজ করা জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে দায়িত্বের বণ্টন ও কর্মবিভাজন কী উপায়ে সম্পন্ন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সরকার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উত্তম চর্চা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। পরিবেশ-সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণে জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনে একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসহ স্থানীয় সরকারের সকল কার্যক্রমের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণে অধিক্ষেত্রভুক্ত নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উপজেলা পর্যায় থেকে এর নিচের দিকের স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন তদারকি কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক নীতি কাঠামো গৃহীত হবে।

৮.৪.৪ খাত-নির্দিষ্ট পরিবেশগত ও ওয়াশ প্রযুক্তি/পদক্ষেপসমূহ

- ***উপকূলীয় অঞ্চল:*** বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ ও মানবসৃষ্ট কারণ, যেমন চিংড়ি চাষের জন্য ঘেরে লোনাপানির প্রবেশ করানোর কারণে যে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটছে, তাতে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ উভয় উৎসের পানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণেও ওয়াশ অবকাঠামোগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানযোগ্য পানি ও স্যানিটেশনের অবকাঠামোগুলো বর্ধিত হারে নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে লোনাপানির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্লান্ট স্থাপন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া যেসব প্রযুক্তি কাজে লাগানোর সুপারিশ করা হতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র আকারে ব্যবহারের জন্য যথাযথ উপায়ে নলকূপের পানি আর্সেনিক ও আয়রনমুক্তকরণ এবং বালুর ফিল্টার ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ উৎস হিসেবে পুকুরের পানি বিশুদ্ধকরণ।
- ***চরাঞ্চল:*** বৃষ্টিজনিত বন্যার কারণে চরাঞ্চলে প্রায়ই ওয়াশ অবকাঠামোগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব চরাঞ্চলে সাধারণত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বসবাস এবং তারা বিভিন্ন ধরণের মৌলিক ওয়াশ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বন্যার কারণে ভঙ্গুরতার শিকার অন্যান্য অঞ্চলের মতো চর এলাকায়ও বর্ধিত সংখ্যায় আবাসন ও ওয়াশ অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এছাড়া বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ পানির আর্সেনিক/আয়রন দূর করার জন্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো হবে।
- ***পার্বত্য অঞ্চল:*** প্রাকৃতিক পানির উৎস, যেমন পাহাড়ি ঝরনা ও স্রোতস্বিনী থেকে যে খাবার পানি সংগ্রহ করা হয়, তার সরবরাহে বছরের বিভিন্ন সময়ে তারতম্য ঘটে। আর বড় ধরণের দূষণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও এটিই পানযোগ্য পানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার্য পানির প্রধান উৎস। যথাযথ সুযোগ-সুবিধার অভাবে পার্বত্য অঞ্চলে এখনো স্যানিটেশন সুবিধা অপর্যাপ্ত। খাবার পানির সংকট নিরসনে ব্যক্তিগত পর্যায় ও নাগরিক উদ্যোগে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সক্ষমতা নিশ্চিত করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।
- ***শহুরে বস্তি:*** উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঘাটতি ও বসবাসের ভূমির আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকার মতো নানা কারণে নগরীর বস্তিবাসীরা ওয়াশের মতো মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। বস্তিগুলো অপেক্ষাকৃত নিচু ও জলাভূমিতে অবস্থিত হওয়ায় সেখানকার অধিবাসীরা প্রায়ই জলাবদ্ধতার শিকার হন। বস্তিগুলো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সেখানে নাগরিক উদ্যোগে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কেন্দ্র স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টিকেই যথোপযুক্ত মনে করা হচ্ছে। এমন নাগরিক উদ্যোগে এসব সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করা হলে সেখানে নারী, শিশু ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বজায় রাখাসহ যথাযথ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এই শেয়ার্ড ব্যবস্থাপনায় বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর সঠিকভাবে ওয়াশ পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে।

৮.৪.৫ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ভঙ্গুরতা প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনায় যেসব মৌলিক নীতি, বিনিয়োগ কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, সেগুলো যদি যথাযথভাবে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ভঙ্গুরতা ও জনগণের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিহিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- বিডিপি ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে একটি 'ব-দ্বীপ উইং' প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- একটি 'ব-দ্বীপ তহবিল' প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টিকরণ।
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহের জন্য নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্ত ধারণ, সংগ্রহ ও ভাগাভাগির মাধ্যমে একটি 'ব-দ্বীপ জ্ঞানভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করা হবে, এ জ্ঞানভাণ্ডার ব-দ্বীপ পরিকল্পনার এজেন্ডাসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- উন্নয়ন সহযোগীদের বিনিয়োগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন সহযোগীদের কর্মসূচি তালিকায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে এ পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে।
- পানি সরবরাহ ও নর্দমা পরিষেবার জন্য সরকার নতুন মূল্যনীতি প্রণয়ন ও পর্যালোচনা করবে।
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর উজানের দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বিনিময় ও সমন্বয় সাধনে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করবে।
- পারস্পরিক সুফল প্রাপ্তি বৃদ্ধির জন্য ১৩টি দেশের সমন্বয়ে একটি 'ব-দ্বীপ জোট' (ডেলটা কোয়ালিশন) গঠনে সরকার সহায়তা করবে। এ দেশগুলো পরিচ্ছন্ন পানির উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে পানি-সংক্রান্ত প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত জ্ঞান বিনিময় করবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাশাপাশি এসডিজি অর্জনে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ইআরডিতে একটি টিম গঠন করা হবে।

সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেগুলো বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এটিতে ছয়টি ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট অভীষ্ট অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো: (১) পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা; (২) পানি সরবরাহের নিরাপত্তা বিধান ও দক্ষতার সঙ্গে পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; (৩) নদী ও নদীর মোহনার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ; (৪) জলাশয় ও বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সেগুলোর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার উৎসাহিতকরণ; (৫) আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সমতাভিত্তিক পানি গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ; এবং (৬) ভূমি ও পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। এছাড়া বর্ণিত লক্ষ্যগুলো অর্জনে সমন্বিত প্রচেষ্টা নেয়া হবে, যা সারণি ৮.৫-এ তুলে ধরা হয়েছে:

সারণি ৮.৫: ২০২৫ সালের জন্য নির্দিষ্ট সূচক ও লক্ষ্য চিহ্নিতকরণ

নং	সূচক	উপসূচক	পরিমাণ	২০১৬-২০১৮	লক্ষ্য ২০২৫
(অভীষ্ট ১: পানি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা)					
১এ	প্রাকৃতিক ঝুঁকি সংবেদনশীল ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল	গড় বন্যার পরিমাণ	বাংলাদেশের মোট আয়তনের %	৩০	২০
		চরম বন্যার পরিমাণ	”	৫০	৩০
		ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ	”	১০	২
		গড় খরার পরিমাণ	”	৯	৯
		চরম খরার পরিমাণ	”	৪৭	২০
		শুষ্ক মৌসুমে লোনাপানির অনুপ্রবেশ	মোট উপকূলীয় অঞ্চলের %	৪০	৩০
		জলাবদ্ধতার পরিমাণ	”	২.৫	০.২৫
		ভাঙন-কবলিত নদীতীরের দৈর্ঘ্য	মোট পাড়ের দৈর্ঘ্যের %	১৫	৮
১বি	প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী	বন্যার কারণে ভঙ্গুরতার শিকার জনগোষ্ঠী	সংখ্যা (মিলিয়ন)	৮৮	৪০
		ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ভঙ্গুরতার শিকার	”	৮	৫
		ভাঙনের কারণে ভঙ্গুরতার শিকার জনগোষ্ঠী	”	১	০.৫
		জলাবদ্ধতার কারণে ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী	”	০.৯	০.১

নং	সূচক	উপসূচক	পরিমাণ	২০১৬-২০১৮	লক্ষ্য ২০২৫
(অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তাবিধান ও পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ)					
২এ	শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা	-	মোট প্রবাহের %	১৫	৩০
২বি	শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্যক্রমের আবর্তন	-	মিলিয়ন হেক্টর	৬	৬.৫
২সি	সেচকার্যে পানির দক্ষ ব্যবহার	-	সরবরাহকৃত পানির %	৩০	৪০
২ডি	নগর এলাকার বাসস্থানে পানির দক্ষ ব্যবহার	-	সরবরাহকৃত পানির %	৬৭	৭৫
২ই	নবায়নযোগ্য অভ্যন্তরীণ পানিসম্পদসমূহ	-	কিউমেক/ব্যক্তি	৭১৪	১,৩০০
২এফ	শিল্পবর্জ্যের মাধ্যমে দূষণের শিকার ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসসমূহ	-	মোট নদীর আয়তনের %	১১	৬
২জি	অন্যান্য বর্জ্যের মাধ্যমে দূষণের শিকার ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসসমূহ		মোট নদীর আয়তনের %	১০	৫
(অভীষ্ট ৩: নদী ও নদীর মোহনার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ)					
৩এ	প্রধান প্রধান নদীগুলো দ্বারা ভাঙন-কবলিত এলাকা	যমুনার পাড়ে ভাঙন-কবলিত এলাকার আয়তন	হেক্টর/বছর	১,৭৫০	১,০৫০
৩বি	পুনরুদ্ধার হওয়া ভূমির পরিমাণ	-	হেক্টর	প্রযোজ্য নয়	৩৫,৫০০
(অভীষ্ট ৪: জলাশয় ও বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সেগুলোর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার উৎসাহিতকরণ)					
৪	আবাসন প্রতিরক্ষা	বহুবর্ষজীবী জলজ বাসস্থানের আয়তন	হেক্টর	১৩,২০০	১৩,২০০
		মৌসুমি জলজ বাসস্থানের আয়তন	”	৩০,৮৮০	৩০,৮৮০
		সামুদ্রিক আবাসের আয়তন	”	৩২,৩০০	৩২,৩০০
(অভীষ্ট ৫: আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানিসম্পদের ব্যবস্থাপনা ও সমতাভিত্তিক পানি গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ)					
৫এ	পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত সক্ষমতাসম্পন্ন জনসংখ্যা	-	গ্রামীণ জনসংখ্যার %	২০	৪০
৫বি	ভোক্তাদের মধ্যে পানির ন্যায্যতাভিত্তিক বণ্টন	-	গুণগত পরিমাপ	দুর্বল	পরিমিত
(অভীষ্ট ৬: ভূমি পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা)					
৬এ	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নর্দমা ও সেচ কার্যক্রমের সক্ষমতা	সেচ প্রকল্পের আওতাধীন এলাকার আয়তন	হেক্টর	৬৭২	৯০০
৬বি	পানির খাতভিত্তিক ব্যবহার	সেচকার্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিমাণ	ঘন কিলোমিটার	৬.৬২	১৫
		সেচকার্যে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের পরিমাণ	”	২৪.৮৮	২২
৬সি	নাব্য রক্ষা কার্যক্রমের সক্ষমতা	বর্ষা মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য	কিলোমিটার	৫,৯৬৮	৫,৯৬৮
		শুষ্ক মৌসুমে নৌপথের দৈর্ঘ্য	”	৩,৮৬৫	৫,৫০০

সূত্র: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

৮.৪.৬ সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে নির্দিষ্ট কর্মসূচিসমূহ

ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করতে সপ্তম পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল। তবে সেসব প্রতিশ্রুতির বেশকিছু অনর্জিত থেকে গেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে:

সবুজ হিসাবায়ন ও সবুজ বাজেট প্রণয়ন উৎসাহিতকরণ: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উভয় পর্যায়ে সবুজ হিসাবায়ন পরিস্থিতির অগ্রগতি সাধনে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। তবে প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাবে বর্তমানে ব্যষ্টিক পর্যায়ে এ কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। উপাত্তের এই ঘাটতির বিষয়টি মেনে নিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) তাদের জাতীয় হিসাব কার্যক্রমে পরিবেশগত কর্মসম্পাদনের পরিসংখ্যানের উন্নয়ন সাধনে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত ক্ষতির ওপর সঠিক উপাত্ত সৃষ্টিতে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বারোপ করা হবে:

- **নির্গমনের হিসাব:** সকল ধরণের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ফলে যেসব নির্গমণ ঘটে, সেগুলোর ওপর একটি সমন্বিত উপাত্তের বিকাশসাধনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে 'দূষণকারীর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়' (polluter pays) নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, যা পরিবেশগত আর্থিক সংস্কারের (EFR) ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে।

- **প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব প্রণয়ন:** প্রাকৃতিক সম্পদের মজুত ও সময়ে সময়ে সেগুলোর পরিবর্তনের বিষয়েও বিবিএস ভৌত পরিসংখ্যান সৃষ্টিতে উদ্যোগ নেবে। প্রাকৃতিক সম্পদহানির ফলে যে আর্থিক ক্ষতিসাধিত হয়, সেটিও এখানে গণনা করা হবে।

- **সবুজ জিডিপির হিসাব নির্ণয়:** নিঃসরণ-বিষয়ক হিসাব প্রণয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের ব্যয় নির্ধারণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিবেশ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের বিকাশের পর সরকার সম্পদসমূহের অবনতি, পরিবেশের অবনতি এবং পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির পরিবেশগত পরিণতিগুলো বিবেচনায় নিয়ে সবুজ জিডিপির হিসাব প্রণয়নে উদ্যোগ নেবে।

- **সবুজ বাজেট প্রণয়ন:** সরকার সামগ্রিক বাজেটকে সবুজ বাজেটে রূপ দেয়ার চেষ্টা করবে এবং সকল উন্নয়ন খাতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসমূহের বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা বা বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমে পরিবেশগত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় আনবে। সরকার সবুজ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর অবকাশ সুবিধা দেবে, সবুজ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপরও কর অবকাশ সুবিধা দেবে এবং সবুজ বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ওপর সবুজ কর (গ্রিন কর) আরোপ করবে। পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা কার্যক্রমে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে, তার ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করা হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে প্রতিশ্রুতি: কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাপকহারে বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। নবায়নযোগ্য খাত থেকে এ সময়ের মধ্য কমপক্ষে তিন হাজার ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার নতুন ধরণের প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাবে, যা ব্যয় হ্রাস করার পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে সহায়ক হবে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়াতে আইপিপিগুলোকে উৎসাহিত করবে এবং গৃহস্থালিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে প্রণোদনা জোগাবে। সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানি লিমিটেডের (IDCOL) কর্মসূচি বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রেখেছে।

কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করা বা একটি নিম্ন কার্বন অর্থনীতি (LCE)

একটি নিম্ন কার্বন অর্থনীতি (LCE), নিম্ন জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক অর্থনীতি (LFFE) বা কার্বন নিঃসরণ প্রশমিত অর্থনীতি হচ্ছে এমন এক ধরণের অর্থনীতি, যেটি গড়ে ওঠে কম মাত্রার কার্বন ডাই-অক্সাইড ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর এবং যা জ্বালানি দক্ষতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে; পাশাপাশি এ অর্থনীতিতে জ্বালানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া পরিবেশে কম মাত্রায় গ্রিনহাউস গ্যাস, বিশেষত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশের জন্যই নিম্ন কার্বনভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়া বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সে দেশটির জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনে। বিভিন্ন প্রান্তের অনেক রাষ্ট্র বর্তমানে একটি দীর্ঘমেয়াদি নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী উন্নয়ন কৌশল (LEDS) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এসব কৌশলে দীর্ঘ মেয়াদে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রচেষ্টা নেয়া হয়। সে কারণে নিম্ন কার্বনভিত্তিক অর্থনীতিকে জলবায়ু পরিবর্তিনজনিত বিপর্যয় পরিহারের উপায় এবং কূন্য কার্বন অর্থনীতির পূর্ব পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন

বর্জ্যও সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আবার যদি যথাযথ উপায়ে এটিকে ব্যবস্থাপনা করা না যায়, তাহলে এটি পরিবেশ দূষণের বড় হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। একটি সমীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের পৌর শহরগুলোয় দৈনিক ৪৭ হাজার টন মিশ্র কঠিন বর্জ্য উৎপাদিত হতে পারে। এক বছরে এ বর্জ্যের পরিমাণ ১৭.২ মিলিয়ন টন। স্থানীয় সরকার বিভাগ তাদের অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে পৌর এলাকার মিশ্র কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর তাদের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহায়তায় কিছু পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান প্রধান শহরগুলোয় বর্তমানে বর্জ্য সংগ্রহের হার ৪৪.৩০ থেকে ৭৬.৪৭ শতাংশের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে উন্নততর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলন অত্যন্ত জরুরি। উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে যথাযথভাবে এগুলো সংগ্রহ করা, পুনর্ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্র পৃথক্‌করণ, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে ভাগাড়ীকরণ। এক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি,

জনসচেতনতা সৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ শক্তিশালীকরণ ও তার প্রয়োগ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া অধিকতর উন্নততর বাস্তবায়নের জন্য সংগতিপূর্ণ বিধিমালা ও নির্দেশিকাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

চলমান এক গবেষণায় দেখা গেছে, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে দেশে ১০ হাজার ৭০৬ মিলিয়ন (এক হাজার ৭০ কোটি) টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমে বর্তমানে মাত্র চার থেকে ১৫ শতাংশ বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। অর্থনীতিতে চক্রাকার পদ্ধতির প্রচলন এ সমস্যার একটি যথাযথ সমাধান হতে পারে, যা পণ্যগুলোর একবার ব্যবহার এবং পরে বাতিল হয়ে পড়ার পরিবর্তে একটি 'ঘূর্ণায়মান লুপ' পদ্ধতির মতো বারংবার ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে। এই চক্রাকার অর্থনীতি বিভিন্ন ধরণের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী জিনিসপত্রের সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চয়তা দেয়, যার মাধ্যমে কয়েক ধরণের সুফল পাওয়া যায়, যেমন–সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করা, কম মাত্রায় বর্জ্য উৎপন্ন হওয়া এবং ভাগাড়ের আয়তন কম হওয়া। সবশেষে, যদি টেকসই উপায়ে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়, তাহলে চক্রাকার অর্থনীতি প্রচলনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ উপযোগী পণ্য, যেমন কাগজ, বিভিন্ন ধাতু, কাচ ও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রণোদনা, সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে নতুন বাজার সৃষ্টি, বর্জ্য থেকে কমপোস্ট সার/বায়োগ্যাস উৎপাদন ও জ্বালানি প্রকল্পে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

পরিচ্ছন্ন কয়লা: ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানি সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য মিশ্র জ্বালানি ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে এটির বহুমূখীকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি এটি ব্যবহারের ফলে কার্বন নিঃসরণ যাতে কম হয়, সেজন্য পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি কাজে লাগানো হবে। এটা ঠিক যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা হলে উৎপাদন খরচ কম হয়। তাই পরিবেশের ওপর এটি ব্যহারের নেতিবাচক প্রভাব যাতে কম হয়, সে লক্ষ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগ নেবে সরকার। প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সুপার ক্রিটিক্যাল গ্যাসিফিয়ার প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

কার্যকরভাবে পরিবেশগত বিধিনিষেধ অনুসরণ করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সম্প্রসারণ: অস্থায়ী ও বিক্ষিপ্ত শিল্পায়ন একদিকে যেমন জমির অপচয় ঘটায়, তেমনি এ ধরণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত নানা বিধিনিষেধ আরোপের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণের সুযোগও সংকুচিত হয়ে পড়ে। এজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার যথাযথ পরিবেশগত বিধিনিষেধ মান্য করে ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধার সমন্বয় ঘটিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে শিল্পকারখানার দূষণের বিষয়টি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ও আইন প্রয়োগ সহজ হবে। এটির ফলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য পরিবেশগত আর্থিক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনাও সহজ হবে, কারণ এ ব্যবস্থায় নিবিড়ভাবে কারখানা পরিবীক্ষণের মাধ্যমে দূষণের জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবেশ সুরক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত জরিমানা আদায় করতে পারবে।

ইট উৎপাদনে সবুজ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ: ভূমির অবক্ষয় ও দূষণের একটি প্রধান খাত গতানুগতিক ইটভাটা। ইটভাটাগুলোয় সাধারণত আবাদি জমির উপরিভাগের মাটি (টপ সয়েল) ব্যবহার করা হয়। ফলে আবাদি জমির তিন-চতুর্থাংশ উর্বরতা হ্রাস পায়। এছাড়া যে প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে ইট উৎপাদন করা হয়, তাতে বিপুল পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদানের নিঃসরণ ঘটে। সরকার এ বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়ে ২০১৩ সালে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে। এ আইন অনুসারে পরিবেশ অধিদপ্তর গতানুগতিকভাবে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ ও বিদ্যমান ভাটাগুলো বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তবে আইনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন কাঙ্খিত মাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে ইট প্রস্তুতকরণে সবুজ পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে সরকার উদ্যোগ নেবে। এছাড়া ইট প্রস্তুতকরণে দক্ষ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ইটভাটাগুলোর পরিবেশ ছাড়পত্রের মেয়াদ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। আবাসিক, সংরক্ষিত, বাণিজ্যিক ও কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য, জলাশয় ও পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় (ECA) ইটভাটা স্থাপনের বিষয়টি ২০১৩ সালের আইনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন অমান্যকারীদের বড় অঙ্কের জরিমানার পাশাপাশি কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ইট প্রস্তুতকারীরা যাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ আইনের কঠোর প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে।

সবুজ বিল্ডিং কোড পদ্ধতি ও নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার উৎসাহিতকরণ ও প্রয়োগ: সার্বিকভাবে সবুজ প্রযুক্তিভিত্তিক ভবনের আন্দোলনের বয়স প্রায় দুই দশক। বিশ্বজুড়ে পরিবেশের ওপর সম্পদের ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা

বৃদ্ধি এবং জাতীয় জ্বালানি সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে সৃষ্ট সচেতনতা নির্মাণশিল্পকে উন্নত ও টেকসই হিসেবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা দান করেছে। ফলে ভবনের বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি স্বেচ্ছা-উদ্যোগে সবুজ ভবন রেটিং পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো হবে। যেটির আওতায় কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভবনগুলো শ্রেণিকরণ করা হবে এবং এ মূল্যায়নে যেসব স্থাপনা পরিবেশগত দিক দিয়ে ভালো বলে বিবেচিত হবে, সেগুলোকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেয়া হবে। এ-জাতীয় রেটিং কর্মসূচি ভবনের পরিবেশগত প্রভাবকে উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস করার লক্ষ্যে জুতসই নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ এবং পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেবে। টেকসই ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক সম্পদ ভাগাভাগি, সনদ প্রদান ও পেশাগত স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি চালু করা হবে।

প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনকারীর বর্ধিত দায়িত্ব (EPR) নীতির প্রচলন: দামে সস্তা ও নানা ধরণের কাজে ব্যবহার-উপযোগী হওয়ায় একবার ব্যবহার-উপযোগী প্লাস্টিকের ব্যবহার অব্যাহতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্লাস্টিকের মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা হয়, এর বাইরে ৪০ শতাংশ নিক্ষেপ করা হয় নির্ধারিত ভাগাড়ে এবং বাকি ২০ শতাংশ পতিত হয় বিভিন্ন ধরণের জলাশয়ে। যেহেতু একবার ব্যবহার-উপযোগী প্লাস্টিক (ওয়ান টাইম কাপ/প্লেট, ললিপপের মোড়ক, শ্যাচেট, স্টায়রিফোম, প্লাস্টিক কাটলারি, সিগারেট ফিলটার, কটন বাড, কফি পানের প্লাস্টিক নল, পানি/জুসের প্লাস্টিক বোতল, প্লাস্টিকের থোলে) এবং বহুস্তরবিশিষ্ট মোড়ক-জাতীয় প্লাস্টিক পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা অনেক কঠিন, তাই পরিবেশসম্মতভাবে এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এর উৎপাদনকারী/প্রস্তুতকারী/আমদানিকারক/নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের স্বত্বাধিকারীদের বর্ধিত দায়িত্ব হিসেবে এগুলোর দায়িত্ব নেয়া উচিত। অন্যদিকে পচনশীল প্লাস্টিক/সুবিধাজনক বিকল্প উদ্ভাবনের মাধ্যমে একবার ব্যবহার-উপযোগী প্লাস্টিকের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার বিষয়ে নির্দিষ্ট 'ফেজ আউট' পরিকল্পনা থাকা উচিত। তবে ইপিআর পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হলে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের পরিবীক্ষণ সক্ষমতা বাড়ানো আবশ্যক। এজন্য এসব সংস্থায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার সুবিধা, ওয়েবভিত্তিক উন্নততর অনলাইন পরিবীক্ষণ সুবিধা এবং সমুদ্র এলাকায় নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া এসব কার্যক্রম কার্যকর করতে হলে সংগতিপূর্ণ বিধিমালা, নির্দেশিকা প্রয়োজন; সেটিতে নমুনা সংগ্রহ, প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ কমানো ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ধার্য থাকবে। পরিবেশের কল্যাণার্থে বিশেষ ধরণের ফি আদায় পদ্ধতি ও পণ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার শতাংশ এবং পণ্যগুলোয় পুনঃপ্রক্রিয়া করা উপাদানের অনুপাত নির্দিষ্ট করা উচিত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইপিআর নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্লাস্টিক দূষণ ব্যবস্থাপনায় জোর দেয়া হবে।

সুনীল অর্থনীতি: ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করছে অনাবিষ্কৃত সম্পদ কাজে লাগানোর সক্ষমতার ওপর। সেই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমুদ্রসম্পদ আহরণের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ খাত থেকে বাংলাদেশ সম্পদ আহরণের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ানোর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। এক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের সামনে এক বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পর বাংলাদেশের অধিকারভুক্ত জলসীমা সম্পদ আহরণের এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলসীমার মালিকানা পেয়েছে। এর মধ্যে অগভীর সমুদ্রের আয়তন ২০ শতাংশ, মহাদেশীয় অগভীর সমুদ্রসীমা ৩৫ শতাংশ এবং ৪৫ শতাংশ গভীর সমুদ্র। ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার টেকসই প্রক্রিয়া ও পর্যাপ্ত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, যা একটি সর্বোত্তম বিনিয়োগের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি এটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও কল্যাণ সৃষ্টি এবং সমুদ্রের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারবে। সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট একটি দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সুনীল অর্থনীতির ধারণা কাজে লাগাতে জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিল থেকে এরই মধ্যে কিছু প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর আওতায় সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে কাজ করা হবে।

তৈরি পোশাকশিল্প (RMG) খাতে সবুজ প্রযুক্তির প্রচলন ও সবুজ কর্মসংস্থান ও এসএমই খাতের সম্প্রসারণ: বর্তমানে যেসব দেশে সর্বোচ্চসংখ্যক সবুজ প্রযুক্তিভিত্তিক তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে, বাংলাদেশ সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারের সহায়ক মুদ্রানীতির কারণে। আরএমজি খাতে সবুজ প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে যেসব বাঁধা বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে–(১) প্রাথমিক পর্যায়ে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হওয়া; (২) বিভিন্ন প্রণোদনাসমূহ বড় কোম্পানিগুলোর দখলে চলে যাওয়া ও অর্থনীতিতে তাদের বাড়তি সুবিধাপ্রাপ্তি; এবং (৩) চাহিদা অংশে বাণিজ্যিক প্রণোদনাসমূহের স্বল্পতা। তা সত্ত্বেও সরকার সুলভ অর্থায়ন সর্মসূচি ও বাজেটে সুবিধাজনক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার সবুজায়নে বাণিজ্যিক প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রাখবে। এর ফলে বাংলাদেশের কার্বন পদাঙ্ক ও পরিবেশগত অবক্ষয় কমে আসবে।

কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে আনা: কৃষিখাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিসমূহের সন্নিবেশ ঘটানোর বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নেবে, যার মাধ্যমে কৃষিতে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এক্ষেত্রে ইউএনডিপির সবুজ পণ্যসামগ্রী কর্মসূচি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হবে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হলো কৃষিকে আরও অধিক মাত্রায় টেকসই করে তোলা।

একটি কার্যকর সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশলের জন্য পাঠ অঙ্কন: অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যেসব কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলো পরিবীক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুফল অর্জন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১১ সালে রুয়ান্ডা সবুজ প্রবৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও উন্নয়নের জন্য জলবায়ু ঘাতসহনশীলতা জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করেছিল। যে কৌশলে নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, টেকসই পানি সরবরাহ ও ভূমির টেকসই ব্যবহার এবং সামাজিক সুরক্ষার (দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনসহ) মাধ্যমে ২০৫০ সালের মধ্যে একটি নিম্ন কার্বন নিঃসরণকারী ও জলবায়ুর অভিঘাতসহিষ্ণু দেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া চিলিও ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশলের প্রচলন ঘটায়। এ কৌশলে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিবেশ-সংক্রান্ত পণ্য ও সেবার জন্য একটি বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নসাধন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে অগ্রগতি পরিমাপ করা। এসব দেশের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সবুজ প্রবৃদ্ধির এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার এমন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সবুজ পরিবহন ব্যবস্থার জন্য প্রতিশ্রুতি: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে গৃহীতব্য উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে অতি পুরনো ও মাত্রাতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমণকারী যানবাহনসমূহ নিষিদ্ধকরণ। হাইব্রিড প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে বাজেটে প্রণোদনা প্রদান এবং পরিবহন খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে যারা পরিবেশের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিভিন্ন বিধিনিষেধ ভঙ্গ করবে, তাদের ওপর কঠোরতার সঙ্গে জরিমানা আরোপ করে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা হবে।

পরিবেশভিত্তিক পর্যটনকে (ইকো-টুরিজম) সহায়তা দান: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার বাজেটে ইকো-টুরিজম খাতে সহায়তা বাড়াবে, যা পর্যটন স্থলসমূহের বাস্তুতন্ত্র এবং বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে।

শিল্পখাতে টেকসই উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা উৎসাহিতকরণ (এসডিজি-১২): অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার টেকসই উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে। এ নীতির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কম সম্পদ ব্যবহার করে বেশি সুফল ভোগ করা। এটি পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস রোধ করা, সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবনযাত্রার বিষয়টিকে উৎসাহিত করবে। টেকসই উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং একটি কম কার্বন নিঃসরণকারী ও সবুজ অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য সহায়ক।

৮.৫ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন কল্যাণ তহবিলে সম্পদ সংহতকরণ: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (CCTF) শক্তিশালীকরণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ তহবিলে আট হাজার কোটি টাকারও বেশি পরিমাণে সম্পদ জোগান দেয়া হবে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে অভিযোজন ও প্রশমনে কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) সরকারের তরফ থেকে সিসিটিএফের কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন নিয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ কার্যক্রমে সহায়তা দেয়া যায়।

সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) ব্যবহার: জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCCC) কাঠামোর আওতায় সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটির দায়িত্ব হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে আর্থিক সহায়তা দানের প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করা। ২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জলবায়ু তহবিলে প্রাথমিকভাবে ১০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ জমা হওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে নিশ্চিত হয়েছে ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ জিসিএফ থেকে অর্থ প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে নির্দিষ্ট শর্ত ও মান অনুসরণ করে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এ তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাশী দেশকে এ তহবিল

ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই একটি জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ (NDA) প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এনডিএ-এর দায়িত্ব হবে জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (NIE)/বহুমাত্রিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার (MIE) জন্য আন্তর্জাতিক তহবিলটি থেকে অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে এনডিএ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া আরও দুটি প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) ও পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) জিসিএফের সঙ্গে অংশীদারিত্বে বিষয়টি বাস্তবায়নে এনআইই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২০ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশ জিসিএফ থেকে চারটি প্রকল্পে অর্থ সহায়তা পেয়েছে, যার পরিমাণ ৯৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাস্তবায়ন পর্যায়ে আরও বেশিসংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে এনআইই হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে সরকার পদক্ষেপ নেবে।

জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের ওপর তদারকি বাড়ানো: তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের (ঈঈঞঋ) ওপর পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে, যাতে কোনো পক্ষ কোনো ধরণের অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ তহবিলের অর্থ অপব্যবহার করতে না পারে। সিসিটিএফ-এর অর্থ যথাযথ উপায়ে কাজে লাগানো এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বচ্ছতার সঙ্গে এ তহবিলের বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে জিসিএফ থেকে অধিকহারে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়টি।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি: জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCCC) অধীন প্রধান কৌশলগত দলিল হিসেবে বিবেচিত। জিসিএফ ও ইউএনডিপির আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ এনএপি প্রক্রিয়াকরণ শুরু করেছে, যা ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সুসংগত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট নতুন ও বিদ্যমান নীতি, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অভিযোজন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধনের বিষয়টি এনএপি ত্বরান্বিত করবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সব খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহে যথাযথ উপায়ে এ সমন্বয় সাধন কার্যক্রমকে সহায়তা করবে। এনএপিতে প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান (NBS) ও বাস্তুতন্ত্রভিত্তিক অভিযোজনের (EBA) বিষয়টিকে প্রাধিকার দেয়া হবে।

অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর: যৌথ ক্রেডিটিং প্রক্রিয়া (JCM) ও জলবায়ু প্রযুক্তি কেন্দ্র ও নেটওয়ার্কের (CTCN) মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম জোরদার করবে।

বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য প্রতিশ্রুতি জোরদারকরণ: বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন শোষণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে বনায়ন। এটা যে কেবল পরিবেশে জীববৈচিত্র্যকেই সমৃদ্ধ করে তা নয়, বরং তা মাটির ক্ষয় রোধ করার পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য ঝড়ের সময় ঢাল হিসেবে কাজ করে। ফলে সরকার বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে এর আবর্তন ২০২৫ সালে দেশের মোট ভূমির ১৫.২ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ২০ শতাংশে উন্নীত করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিদ্যমান উপকূলীয় বনায়ন, অধিকহারে বৃক্ষ রোপণ ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বৃক্ষরাজি সম্প্রসারণের হার অব্যাহত রাখা হবে। সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠায় উপকূলীয় এলাকায় চলমান বনায়ন কর্মসূচি জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে নতুন করে বৃক্ষ রোপণ ও পুনঃরোপণ করা হবে। এর বাইরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরও এক লাখ ৩০ হাজার ৫৮০ হেক্টর এবং সমতলের সাত হাজার ২২০ হেক্টর জমিতে বনায়ন করা হবে। বনায়ন কর্মসূচির উৎপাদনশীলতাও বাড়ানো হবে। বনভূমিতে ব্যবহৃত জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমাত্রিকভাবে কাজে লাগে, এমন বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেয়া হবে। সবশেষে, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সুন্দরবনের সংরক্ষিত বন অক্ষুণ্ন রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার সুরক্ষায় বিশেষ নজর দেয়ার পাশাপাশি সার্বিক বনজ জীবন রক্ষায় ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হবে।

স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বোঝাপড়া জোরদারকরণ: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি প্রধান প্রক্রিয়া হলো–জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে ও কী মাত্রায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় বোঝাপড়া সৃষ্টি করা। এটা করা গেলে অভিযোজন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্থানীয় উদ্যোগে সমাধান বের করা সম্ভব হবে এবং স্থানীয় সরকারের অভিযোজন সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

এনজিও ও সুশীল সমাজের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যাপকভিত্তিক নাগরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্ন এনজিও ও সুশীল সমাজ সংগঠনের মতো অংশীজনদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এ সহযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরণের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে জ্ঞান ভাগাভাগি এবং অধিকতর সমন্বয় ত্বরান্বিত করতে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে স্থানীয় নাগরিক সমাজভিত্তিক অভিযোজন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সাড়া প্রদানে জেন্ডার-অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর বিকাশ: বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP), সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনার (NPDM) সবগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট নারীর অধিকতর ভঙ্গুরতার প্রবণতা ও দুর্যোগের মতো ঘটনায় নারীর অধিক মাত্রার সংবেদনশীলতার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সে কারণে সরকার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে নারীর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ নেবে এবং সে লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানো, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি পরিবেশ-বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের গুরুত্ব দেয়া হবে।

জলবায়ু প্রণোদিত বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলা: ভূমিধস ও পল্লী অঞ্চলে জীবিকা হারানোর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এ জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শহরগুলোকে এমনভাবে নকশা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যাতে শহরের বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে নতুন জনগোষ্ঠীর দক্ষ অন্তর্ভুক্তি, বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে আসা নতুন জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের মধ্যে যারা কাজের অনুসন্ধান করবে তাদের জন্য কর্মের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। উদ্ভূত জনগোষ্ঠীর সব ধরণের প্রয়োজন যাতে যথাযথভাবে পূরণ করা যায়, সে লক্ষ্যে সরকার নগর পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভঙ্গুরতার শিকার এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা জনগোষ্ঠীর জন্যও যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে।

জলবায়ু কর্মসূচিতে জেন্ডার ইস্যুর গুরুত্ব: জলবায়ু কর্মসূচির জেন্ডারভিত্তিক রূপান্তর সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সরকার একটি জেন্ডার রূপান্তরশীল প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের সাত লাখ মানুষকে অধিকতর জলবায়ু ঘাতসহনশীল উপায়ে পানযোগ্য পানি সরবরাহ, জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ প্রকল্পে নারীদের ঘাতসহনশীল জীবনাযাত্রা, সুপেয় পানি ও আগাম সতর্কতা কার্যক্রমের সক্ষমতা অর্জনের নিয়ামক হিসেবে তৈরি করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। সরকারকে এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে যে, স্থলভাগের জলবায়ু-সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলোয় যেন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর বিষয়টি নিশ্চিত হয় এবং এর মাধ্যমে সরকারের জলবায়ু-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের মূল স্রোতে যেন 'কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না (LNOB)' নীতি প্রতিফলিত হয়। কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন হওয়ার পর এর ফলাফল মূল্যায়ন করা হবে। সম্প্রতি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক একটি পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণ: জলবায়ু অর্থায়নের প্রাপ্যতা ও এর যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক প্রস্তুতির জন্য জলবায়ু অর্থায়ন-সংক্রান্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য জলবায়ু অর্থায়নের গভর্ন্যান্স কাঠামোর অগ্রগতি সাধনে জাতীয় সংসদ, আইএমইডি ও এজি অফিসের সক্ষমতা ও ভূমিকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন, বিশেষত জলবায়ু হটস্পট এলাকাগুলোকে অবশ্যই মূলধারার বাজেট পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আওতায় আনা উচিত।

পানিদূষণের উন্নততর ব্যবস্থাপনা: পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের বিষয়টি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম। ভূ-উপরিস্থ পানির গুণগত মানের বিষয়টি দুটি সুনির্দিষ্ট হুমকির সম্মুখীন, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ হুমকি দুটি হলো: লবণাক্ততা ও দূষণ। ফলে পানির গুণগত মানের উন্নতি সাধনে বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কার্যকর কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করবে। এসব পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- আর্সেনিকপ্রবণ এলাকায় নলকূপের পানির মান নিশ্চিতকল্পে নিয়মমাফিকভাবে পানির মান পরিবীক্ষণ ও প্রতিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- সব ধরণের দূষণের উৎস নিয়ন্ত্রণে অববাহিকা সম্প্রসারণ (বেসিন-ওয়াইড) পদ্ধতির প্রচলন।
- নদীগুলো (বুড়িগঙ্গা, বালু, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা) যথাযথ উপায়ে পরিষ্কার করার মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা (ঢাকা, টঙ্গী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ) এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির উৎসসমূহের সুরক্ষা বৃদ্ধিকরণ।
- সরকারি জলাশয়গুলো জবরদখলের কবল থেকে উদ্ধার করে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।
- বৃষ্টির পানি সংগ্রহের উপায় সম্প্রসারণ।
- উন্মুক্ত জলাশয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শীতল পানি নির্গমনের ক্ষেত্রে কার্যকর বিধিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

- শিল্পকারখানা ও উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়ম পরিপালনের (কমপ্লায়ান্স) বিষয়টি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন। অনলাইনে সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্পকারখানার ইটিপি পর্যবেক্ষণ। অপচয় ও দুর্নীতি রোধে আইওটিভিত্তিক মিটার স্থাপন ও পরিবীক্ষণ চালুকরণ।
- অনলাইনে ঢাকার জলাশয়গুলোর পানির মান পর্যবেক্ষণ এবং নগরীর দূষণপ্রবণ কেন্দ্রস্থল ও পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য এলাকায় অনলাইনভিত্তিক পানির মান পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন।
- ভূগর্ভস্থ পানির মজুত ঠিক রাখা এবং বৃষ্টির পানি ব্যবহার জোরদারকরণের মাধ্যমে সুব্যবস্থিত উপায়ে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উদ্যোগের প্রয়োগ ঘটিয়ে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ঠিক রাখতে কার্যকর কৌশলের বিকাশ ঘটানো।
- বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্যের অগ্রগতি সাধনে ইসিএ ও রামসার এলাকার পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুকরণ।
- পরিচ্ছন্ন পানির প্রাপ্যতা বাড়াতে কৃষিতে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি যেসব স্থানে পানি এরই মধ্যে দূষিত হয়ে পড়েছে, সেখানে গৃহস্থালির কাজ এবং যেসব ক্ষেত্রে ব্যাপক মাত্রায় পানি ব্যবহৃত হয়, সেসব ক্ষেত্রে পানি পরিষ্কার করার জন্য ফিল্টারের যথাযথ বণ্টন নিশ্চিতকরণসহ পানি পরিষ্কার করার অন্যান্য পদ্ধতির বিস্তার ঘটাতে হবে।
- প্রাকৃতিক জলাশয়ে বর্জ্য পানির নির্গমণ নিয়ন্ত্রণে শিল্পকারখানা অধ্যুষিত এলাকায় কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপন ও বাস্তবায়ন।
- ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে অনলাইনে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সংযুক্ত করে দেশের সব শিল্পকারখানায় ইটিপি স্থাপন করতে হবে। সম্পদের উন্নততর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্জ্য উৎপন্ন হয়, এমন কারখানায় কূন্য নির্গমণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণঃ এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য শব্দদূষণ অন্যতম প্রধান সমস্যা। সে কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে–(১) 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬' বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ; (২) শব্দদূষণের ক্ষতির বিষয়ে চালকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা কর্মসূচি পরিচালনা; (৩) শব্দদূষণ উল্লেযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনতে সরকার সড়কদ্বীপ, হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আঙিনায় সবুজ বনায়ন ও লতাগুল্ম-জাতীয় গাছ রোপণ করবে; (৪) বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে শব্দের মাত্রার ওপর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ; (৫) আবাসিক এলাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল এলাকায় নীরব এলাকা প্রতিষ্ঠাকরণ।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ দেশের সকল প্রধান প্রধান শহরে কঠিন বর্জ্য পরিশোধনের সুবিধা স্থাপনের বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ বিষয়টি উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধরণের পরিবেশবান্ধব পণ্য, যেমন জ্বালানি দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, পুনঃপ্রক্রিয়াজাত পণ্যসামগ্রী, টেকসই পণ্যসামগ্রী ইত্যাদি উৎপাদনে সরকারের কর অবকাশ ও আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া সরকার বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়েও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের কঠিন বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে।

৮.৬ বন উপখাত

৮.৬.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতের কর্মসম্পাদন অগ্রগতি

বন উপখাতের জন্য প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি মহাপরিকল্পনায় (১৯৯৫-২০১৫) ২০২০ সালের শেষ নাগাদ বনভূমির আয়তন দেশের মোট স্থলভাগের ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে সপ্তম পরিকল্পনা মেয়াদে এক লাখ ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে বৃক্ষ রোপণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ বৃক্ষ রোপণের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (BCCTF), বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন তহবিল (BCCRF) ও সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন সহায়তায় বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

দেশের মোট জিডিপিতে বন উপখাতের অবদান ১.৬ শতাংশ এবং কৃষিখাতের জিডিপিতে এ উপখাতটির অবদান ১২ শতাংশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে এ উপখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১ শতাংশ। আর পরিকল্পনার শেষ বছরে এ প্রবৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী; ৮.৩ শতাংশ। এ খাতকে নিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল সার্বিক পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জন

ও জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা; দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বনায়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও কর্মসৃজন। পরিকল্পনা মেয়াদে এ উপখাতে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, খাতটির প্রবৃদ্ধিতে যার প্রতিফলন দেখা গেছে। পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩ লাখ হেক্টর, যা দেশের মোট স্থলভাগের ১৫.৫৮ শতাংশ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে মোট বনভূমির মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ১১.৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৭৮ শতাংশে উন্নীত হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সরকারিভাবে ব্যবস্থাপনাধীন বনজ সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে এবং এতে বনজ সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত বিনাশ সাধিত হচ্ছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেশ কিছুসংখ্যক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এর মধ্যে ছিল প্রান্তিক ভূমি বনায়নের কাজে ব্যবহারের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আশির দশকের শুরুর দিকে বন উন্নয়ন কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটানো, যে কার্যক্রম বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও চলমান রয়েছে। এ পরিকল্পনা মেয়াদে সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়। উপকূলীয় এলাকায় নতুন করে জেগে ওঠা চরে বনায়ন করার জন্য যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়কের প্রান্তসীমা ও বাঁধসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে মোট ১০৪ মিলিয়ন চারা রোপণ করা হয়েছে। এ সময়ে ১১৩.১ হাজার হেক্টর জমি এবং ২৪ হাজার ৬৩৩ কিমি দীর্ঘ সারিতে নতুন করে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্যমতে, সারাদেশে সাত লাখ এক হাজার ৪৮৮ জন মানুষ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত। পরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীত কর্মসূচির আওতায় ৭৩ হাজার ৪৭১ জন সামাজিক বনায়ন উদ্যোগীর মধ্যে প্রায় ১০৪৭.৭ মিলিয়ন (১০৪ কোটি ৭৭ লাখ) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত জাতীয় বন জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেখা যায়, দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ মোট দেশের মোট সীমার ১২.৮ শতাংশ, যা দেশের মোট স্থলভাগের ১৪.১ শতাংশ। মাঠ পর্যায়ের জরিপে দেখা যায়, দেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক কাঠ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৮৪ মিলিয়ন (৩৮ কোটি ৪০ লাখ) ঘনমিটার এবং নিঃসরিত কার্বনের পরিমাণ এক হাজার ২৭৬ মিলিয়ন (১২৭ কোটি ৬০ লাখ) টন (পাঁচটি কার্বন লুপের তথ্য বিশ্লেষণ অনুযায়ী), হেক্টরপ্রতি বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ৪.৫২ ঘনমিটার এবং প্রতিহেক্টরে চারার সংখ্যা এক হাজার ৪১৯টি। দেশে উৎপাদিত মোট কার্বনের ২২ শতাংশের মজুত বিদ্যমান বনভূমি এলাকায় এবং ৬৬ শতাংশ ক্রমবর্ধমান কার্বন আসে বন এলাকার বাইরের গাছ থেকে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের জিডিপিতে দেশে সংগৃহীত গাছ ও বন-সম্পর্কিত সম্পদের অবদান ছিল ৩.১১ শতাংশ। বিভিন্ন ধরণের মডিউল, যেমন–বাংলাদেশ বন জরিপ (BFI), বিএফআইএস জিওপোর্টাল, নিঃসরণকেন্দ্রিক ডেটাবেজ, গাছ শনাক্তকরণ ডেটাবেজ, অ্যালোমেট্রিস সূচকের ডেটাবেজ প্রভৃতি বিষয়ের বিকাশ সাধন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ বন তথ্য পদ্ধতিতে (BFIS) তা সংযুক্ত করা হয়েছে, যে বিষয়টি গাছ, বন, কার্বন, বায়োমাস প্রভৃতি বিষয়ের হিসাব নির্ণয় ও পরিবীক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ বন রেফারেন্স নির্গমণ স্তর প্রাক্কলন করে এবং তা জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে (UNFCCC) পাঠানো হয়, এটি ইউএনএফসিসি ও বিএফআইএস-এর ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাসহ চট্টগ্রাম বিভাগের পাঁচটি জেলায় (চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি) উদ্ভিদবিষয়ক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মসূচির বিভিন্ন প্রজাতির গাছের ওপর ওয়েবভিত্তিক একটি হালনাগাদ ডেটাবেজ চালু করা হয়েছে, যার ওয়েব লিংক হলোঃ http://bnh-flora.gov.bd/ সপ্তম পরিকল্পনায় বন এলাকার বাইরে (TOF) গাছের আবর্তন ভূমির আয়তন বাড়ানোর বিষেয় গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল, যা পরবর্তী পরিকল্পনা মেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। গাছের আচ্ছাদন বাড়াতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সড়ক ও রেললাইনের পাশের খালি জায়গা, বিভিন্ন বাঁধ, বাড়ির আঙিনাসহ অন্যান্য সমজাতীয় জমি বৃক্ষ রোপণের আওতায় আনা হয়েছিল, যা গ্রামীণ অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ, কাঠ সরবরাহ ও জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। একই সময়ে বনভূমির বাইরের গাছপালা বাংলাদেশে কার্বনের ক্রমধারা নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। উপগ্রহের ছবি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশের বনের আবর্তন মোট ভূমির ২২.৩৭ শতাংশ।

সুন্দরবনসহ দেশের সমগ্র বনভূমি এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। সুন্দরবনে বন অধিদপ্তর ক্যামেরা ফাঁদভিত্তিক বাঘ শুমারি সম্পন্ন করেছে।

পানির চক্র নিয়ন্ত্রণ, ভূমিক্ষয় রোধ করা, বন উজাড়ীকরণ কমানো ও বনের অবক্ষয় রোধ এবং গাছের আবর্তন ও কার্বন ধারণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলাশয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণভিত্তিক সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পরবর্তী পরিকল্পনা মেয়াদেও এ উদ্যোগ চলমান থাকবে। বন্য জীবন ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সংরক্ষিত অঞ্চলে মোট ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬ সালে প্রণীত হালনাগাদ বন নীতি এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। এ নীতিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও বনভূমির বিপজ্জনক হ্রাস প্রাপ্তির ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশগত ও আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার কথা উল্লেখ রয়েছে। বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের বিষয়ে FIP, FMP ও জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলে (NCS) প্রয়োজনীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে দেশের জীববৈচিত্র্যের টেকসই ও কার্যকর সংরক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

৮.৬.২ বন উপখাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

পরিকল্পনা মেয়াদে এ উপখাতে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন পড়বে, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- **ভূমি রেকর্ড ও সীমানা নির্ধারণ:** বনভূমির সীমানা যথাযথ ও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকা এবং আদালতে ভূমি-সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রতার সুযোগে প্রভাবশালী মহল অননুমোদিত ও অবৈধভাবে বনভূমির মালিক দাবি করে এবং অবৈধভাবে ভূমি দখলে রাখে।
- **বন ও বনজ সম্পদের সুরক্ষা:** আসবাবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ, জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের কারণে বনের ওপর অত্যধিক মাত্রায় চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে বনের অবক্ষয়ের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় নানা পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।
- উৎপাদনশীলতা: সরকারি বনে কাঠের উৎপাদনশীলতার হার ০.৫-২.৫ ঘনমিটার/হেক্টর/বছর; গৃহস্থালিতে উৎপাদিত গাছের ক্ষেত্রে এ হার ৭-৯ ঘনমিটার/হেক্টর/বছর। দেশে কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে নিম্ন উৎপাদনশীলতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **মাথাপিছু বনভূমির নিম্নহার:** বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির প্রাপ্যতার হার বিশ্বে সবচেয়ে কম। ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণে ভারসাম্য আনয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে নতুন করে জেগে ওঠা উপকূলীয় চরাঞ্চলে বনায়ন। আইন-শৃঙ্খলা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পার্বত্য বনভূমির অনুপাতেও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীকালে বন উজাড়ীকরণের শিকার এলাকাগুলো আর বনায়নের আওতায় আসে না।
- **সচেতনতার অভাব:** জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা, বন-সংক্রান্ত বাস্তুতন্ত্র ও মানবজাতির জন্য গাছ লাগানোর উপকারিতাসহ বন থেকে প্রাপ্ত নানা ধরণের পরিষেবার বিষয়ে সাধারণের সচেতনতার অভাব।
- **বন অবক্ষয়ের ধরণ পরিবর্তন:** সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভিগমন কক্সবাজার ও বান্দরবানের পাহাড়ি বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এর ফলে দুই হাজার হেক্টরেরও বেশি জমির বন বিলুপ্ত হয়েছে।
- **অর্থায়নের ঘাটতি:** গত পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতে অর্থায়নের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, ফলে বনসম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের লক্ষ্য অর্জন চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, দেশে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগে ইকোট্যুরিজমের সম্প্রসারণের উদ্যোগ খুবই নগণ্য।
- **প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন:** বনভূমি ও বনভূমির বাইরের গাছপালার বাস্তুতন্ত্র থেকে সর্বোচ্চ মাত্রার সুফল অর্জন করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বাড়ানো ও কার্যকরভাবে বহুমাত্রিক সাড়া প্রদান পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে হবে। বনের টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিহিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগসহ যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে, ভূমি প্রশাসন কর্তৃক বনের ভূমির সংরক্ষণ ও ইজারা প্রক্রিয়ায় সময়ক্ষেপণ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বনের ভূমি ব্যবহারের বিষয়ে বিভিন্ন খাতের পরিকল্পনা ও নীতির মধ্যকার সংঘাত বনের ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে বিঘ্নিত করছে।
- **অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও পরিষেবা:** বাংলাদেশ এমন একটি অতি জনবহুল দেশ যেখানে বনভূমি ও বনজ সম্পদের ঘাটতি অব্যাহত মাত্রায় বাড়ছে এবং এসব সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অস্তিত্বও বেশ শক্তিশালী। এমন একটি পরিস্থিতিতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকা মূল্যবান সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিনই বটে। এর বাইরে নানা ধরণের বহুমাত্রিক কার্যক্রম, যেমন–বনজ জীবন ও ইকো-পর্যটন ব্যবস্থাপনা, জাতীয় বন সম্পদ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জাতীয় লাল তালিকা হালনাগাদকরণ, রোপণ ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদকরণ, বাস্তুতন্ত্র-সংক্রান্ত পরিষেবার উন্নয়ন সাধন, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজন, কার্বনের মাত্রা ঠিক রাখা প্রভৃতি বিষয়

বন সংরক্ষণের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বনের টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রশিক্ষিত জনবল সমেত একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বন অধিদপ্তরের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

- **প্রয়োজনীয় জ্ঞান, তথ্য ব্যবস্থা ও শিক্ষণের ঘাটতি:** প্রয়োজনীয় জ্ঞানের নেটওয়ার্ক, তথ্য ব্যবস্থা ও শিক্ষণের ঘাটতির কারণে অন্যান্য উদ্দেশ্য, যেমন–বেসরকারি উদ্যোগে রাবার, কমলার পাশাপাশি চালতা, জলপাই, কদবেল, কাজুবাদাম, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, লটকন ইত্যাদি অন্যান্য অপ্রচলিত ফল চাষের সুযোগ দেয়ার ফলে বাস্তুতন্ত্র থেকে প্রাপ্য নানা সুবিধাদি ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়া বনের গাছপালা ও পশুপাখির প্রজাতির বিষয়েও তথ্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সে কারণে বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান ভাগাভাগির একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৮.৬.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বন উপখাতের লক্ষ্যসমূহ

বন উপখাতের উন্নয়নের রূপকল্পটি বাংলাদেশ বন মহাপরিকল্পনা ২০১৬-৩৬, জাতীয় বন নীতি ২০১৬ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষায় প্রণীত অন্যান্য পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন উপখাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য হলো–বিদ্যমান সব ধরণের বন, বন্য জীবন ও অন্যান্য বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের নীতির সঙ্গে বিষয়টির সংগতিবিধান এবং জলবায়ু ঘাত সহনশীলতা অর্জন; ক্ষয়প্রাপ্ত বন এলাকা সমৃদ্ধকরণ; এবং বন/গাছ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

এ উপখাতের সুনির্দিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক	উদ্দেশ্যসমূহ	লক্ষ্যসমূহ
১	২০২৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির ২৪ শতাংশ গাছের আচ্ছাদনের আওতায় আনা।	• পাহাড়ি বন পুনরুদ্ধার-১,৩০,৫৮০ হেক্টর • সমতলের শালবন পুনরুদ্ধার-৭,২২০ হেক্টর • অরণ্যভূমি-১৫০০ হেক্টর। • কৃষি বনায়ন-৫০০ হেক্টর। • বাঁশ ও বেত রোপণ-২০০০ হেক্টর। • সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণ-১৫,০০০ কিলোমিটার। • আবাসস্থল/প্রাতিষ্ঠানিক বনায়ন ও চারা বিতরণ/বিক্রি-১০০ মিলিয়ন • ঔষধি বৃক্ষরোপণ-১২০০ হেক্টর। • বিরল ও বিপদাপন্ন গাছের চারা রোপণ (বীজতলা তৈরি ও উদ্ভিদ উদ্যান প্রতিষ্ঠা) • বাঁশ পুনরুৎপাদন এলাকার ব্যবস্থাপনা-১০,০০০ হেক্টর।
২	জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সাধনকল্পে বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ।	• বৃক্ষ রোপণে যৌথ ব্যবস্থাপনা-৭২,০০০ হেক্টর • বনজ জীবন সুরক্ষা (সমগ্র বনাঞ্চলে 'স্মার্ট' টহল প্রচলন ও আন্তঃসীমান্ত বন সম্পর্কিত অপরাধ প্রতিরোধ • বিভিন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ (বাঘ, হাতি, ঘড়িয়াল, ডলফিন, শকুন, হাঙর ও রে) • আবাসস্থলে বনায়ন ১০,০০০ হেক্টর। • বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডর চিহ্নিতকরণ ও বৃক্ষরোপণ-৫,০০০ হোক্টর। • একটি জাতীয় বন সমীক্ষা পরিচালনা। • দুটি টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন ও সংগতিপূর্ণ গবেষণা পরিচালনা। • প্রজাতি রক্ষায় দুটি বীজতলা প্রতিষ্ঠা। • সক্ষমতার উন্নয়ন। • বন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) জনবলের সক্ষমতা উন্নয়ন (৪,০৭৮ জন) • স্থানীয় অংশীজন ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী-দৈনিক ৩,২১,৬৩০ জন। • বিভাগীয় ও মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন (১,০০০টি)। • সুন্দরবনে শিকার ও শিকারি প্রাণীর জরিপ পরিচালনা। • বন্যপ্রাণীর গমনাগমের করিডোর ও আবাসস্থল চিহ্নিতকরণ।
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	• লোনাপানির বৃক্ষ (ম্যানগ্রোভ) রোপণ- ৫০,০০০ হেক্টর। • গাছ রোপণ সমৃদ্ধকরণ (ম্যানগ্রোভ)-২,৭০০ হেক্টর। • ঝাউ গাছ রোপণ-৯০০ হেক্টর। • গোলপাতা-১৪০০ কিলোমিটার। • গ্রিনহাউস গ্যাসের একটি সমীক্ষা পরিচালনা।
৪	স্থানীয় দরিদ্র ও বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার অগ্রগতি সাধন।	• ৪০টি সংরক্ষিত এলাকায় পরিবেশভিত্তিক পর্যটনের (ইকোট্যুরিজম) উন্নয়ন • বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য উপার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন-৫৫,০০০ পরিবার। • বনজ সম্পদ ও পণ্যের অংশগ্রহণমূলক/সামষ্টিক ও টেকসই ব্যবস্থাপনা-বনাঞ্চল ৪০টি, পরিবার ৫৫,০০০

৮.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন উপখাতের জন্য নির্ধারিত কৌশলসমূহ

বন উপখাতের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গৃহীত হবে:

প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ: সকল রাষ্ট্রীয় বনভূমির যথাযথ মানচিত্রায়ণ ও সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। অবশিষ্ট পাহাড়ি বনগুলো সুরক্ষার জন্য স্থানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পৃথক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। যেসব বনাঞ্চলে গাছের ঘনত্ব বাড়ানোর জন্য নতুন করে চারা রোপণ করা প্রয়োজন, সেখানে সেটা করা হবে। তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (IEC) বিষয়ে প্রচারণা চালানো হবে। বন সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত আইনি বিষয়াদি পর্যালোচনা ও উন্নয়ন করা হবে। ক্ষেত্রমতো মুনাফা ভাগাভাগির ব্যবস্থা রেখে প্রাকৃতিক বন সুরক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সুন্দরবনের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিশেষভাবে জোরদার করা হবে এবং বনের নদীগুলো তেল নির্গমনের ঝুঁকি হ্রাসে বনের ভেতরকার নদীগুলোয় নৌযান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। পানির প্রবাহ ঠিক রাখা, গাছের আবর্তন বৃদ্ধি করা এবং বন উজাড়ীকরণ ও বনের অবক্ষয় রোধে পাহাড়ি বনাঞ্চলে যৌথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলের বনের আচ্ছাদন পুনরুদ্ধার এবং সেখানে কার্বন ধারণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন নিধন ও বনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট নিঃসরণ প্রশমন (REDD++) প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হবে।

অবক্ষয়ের শিকার রাষ্ট্রীয় বনভূমি পুনরুদ্ধার/পুনর্বনায়ন: অবক্ষয়/বেদখলের শিকার রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বনায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট স্থান ও পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিয়ে বন নিধন ও বনের অবক্ষয় রোধ করা, প্রাকৃতিক উপায়ে বনের পুনরুদ্ধার (ANR) ও চারা রোপণের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা হবে। ভূমির প্রয়োজনানুসারে পুনর্বনায়ন বা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম নির্ধারণ করা হবে। পুনর্বনায়নের ক্ষেত্রে জলাশয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে এবং চারা রোপণ বা এএনআর প্রকল্পের ক্ষেত্রে মাটি ও আর্দ্রতা সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। স্থানীয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করে বন নিধন ও বনের অবক্ষয় রোধে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চলমান রাখা হবে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দান ও ভূমির অবক্ষয় রোধে উপকূলীয় এলাকায় 'সবুজ বেষ্টনী' প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করতে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করা হবে।

উপকূলীয় বনায়ন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী: উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার দেয়া হবে। উপকূলীয় বনায়নের ক্ষেত্রে অব্যবহৃত সরকারি জমি ও জেগে ওঠা চরে জলবায়ু ঘাতসহিষ্ণু ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হবে। যদি সুবিধাজনক সরকারি জমি না পাওয়া যায়, তাহলে উপকূলীয় বনায়নের জন্য প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ করা হবে। উপকূলে সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ম্যানগ্রোভ গাছের চারা রোপণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। সবুজ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আঙিনা, সড়কের পাশের খালি জায়গা, বিভিন্ন বাঁধ, নদীর পাড় রক্ষার ডাইক দেওয়ালসহ প্রাপ্যতার ভিত্তিতে অন্যান্য জমিতে গাছের চারা রোপণ করা হবে। পোল্ডার ও বাঁধ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উপকূলীয় বন ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ প্রাক্কলন ও অর্থ ছাড়করণে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা: বন্যপ্রাণী মহাপরিকল্পনার সঙ্গে সংগতি রেখে বন্য জীবন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। যৌথ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রচলনের পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে সংরক্ষিত এলাকা (PA) নেটওয়ার্ক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সম্প্রসারণ করা হবে। এ সময়ে মোট রাষ্ট্রীয় বনভূমির ২৫ শতাংশ এ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। বন্যপ্রাণী বিভাগের ভূমিকা ও কাঠামো পর্যালোচনা করা হবে। বন্যপ্রাণী সার্কেলের উন্নয়ন ঘটিয়ে এটিকে অধিদপ্তরের একটি শাখায় রূপান্তর করা হবে। অন্যান্য শাখার মধ্যে নবসৃষ্ট বন্যপ্রাণী কেন্দ্র, বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ও ময়নাতদন্ত পরীক্ষাগারের কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে। বেআইনিভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করে বনাঞ্চলের বাইরে পাচার এবং সংরক্ষিত এলাকা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেয়া হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী চলাচলের করিডোর, তাদের আবাসস্থল ও সমুদ্রসম্পদসমূহ চিহ্নিতকরণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা ব্যবস্থাপনায় একটি কাঠামোর বিকাশ ঘটানো হবে।

জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ী ডিভাইস ও প্রযুক্তির প্রসার: দেশে ব্যবহৃত সমস্ত কাঠভিত্তিক জ্বালানির মধ্যে কাঠের পরিমাণ ৮০ শতাংশেরও বেশি এবং এ চাহিদার একটি বড় অংশের যোগান আসে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে। এজন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার কমাতে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও এনজিওগুলোর মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ শক্তিশালী করা হবে এবং বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রান্না করার জন্য উন্নত প্রযুক্তির চুলা, সৌর কুকার, জৈব গ্যাস প্রভৃতির বিস্তার ঘটাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে।

সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা: সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার রক্ষায় বিশেষ নজর দেয়ার পাশাপাশি সামগ্রিক বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে নানা পদক্ষেপ নেয়া হবে। লোকালয়ে চলে আসা বিপথগামী বাঘকে বনের ভেতর ফেরত পাঠানোর জন্য সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামগুলোর স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে 'জরুরি বাঘ সাড়া প্রদান দল' ও 'গ্রাম বাঘ সাড়া প্রদান দল (VTRT)'-এর কার্যক্রম চালু করা হবে। সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্তি জোরদার করা হবে। পরিকল্পনাকালে শিকার ও শিকারি প্রাণীর অবস্থান নির্ণয় করা হবে। সুন্দরবনের বৈশ্বিক মূল্য নিরূপণে একটি কৌশলগত পরিবেশগত মূল্যায়ন (SEA) ব্যবস্থা প্রচলনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এ পরিকল্পনা মেয়াদে সুন্দরবনের জন্য এসইএ প্রতিবেদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (EMP) বিকাশ ঘটানো হবে, যা ২০৪১ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বন ও গাছ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ: বন ও বৃক্ষসম্পদ পর্যবেক্ষণ এবং বন ব্যবস্থাপনায় নীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় বন সমীক্ষা (বায়োফিজিক্যাল, আর্থ-সামাজিক উপাদান ও ভূমি আবর্তন মানচিত্র) এবং গাছের আচ্ছাদন পরিমাপ ও মানচিত্রায়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। বন খাতে গ্রিনহাউস গ্যাস ধারণক্ষমতার অভিসম্বন্ধ তৈরির লক্ষ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের ওপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে বাংলাদেশ বন তথ্য সেবা (BFIS) মডিউলের বিদ্যমান তথ্য হালনাগাদ করা হবে এবং একটি নতুন মডিউল চিহ্নিত করে তা বিএফআইএস-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

সামাজিক বনায়ন ও নগর জীববৈচিত্র্যের সম্প্রসারণ: সামাজিক বনায়নের বিষয়টি বাংলাদেশে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সামাজিক বনায়নের এ কর্মসূচি চলমান রাখার পাশাপাশি উপজেলা নার্সারি, ইউনিয়ন নার্সারি এবং নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম জোরদার করা হবে। পরিকল্পনা মেয়াদে ১৫ হাজার কিলোমিটার সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণের প্রাক্কলন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওগুলোর সহযোগিতায় বন অধিদপ্তর তৃণমূল পর্যায়ে বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবে। দেশে বৃক্ষের আচ্ছাদন বাড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সব নদী ও খালের পাড়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্তনযোগ্য বন সম্ভার সৃষ্টি করা হবে। এ কৌশল কেবল বৃক্ষরাজির আচ্ছাদনই বাড়াবে না, বরং তা বিভিন্ন ধরণের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ প্রশমন ও কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাস্তুতন্ত্রেও নানা পরিষেবা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কিছু মৌলিক কৌশল বাস্তবায়নে জোর দেয়া হবে–প্রথমত, নগরায়ণ যাতে প্রান্তিক অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, তা নিশ্চিত করা এবং দ্বিতীয়ত, পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে শহর ও নগরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

পার্বত্য বন সংরক্ষণ: বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অন্যতম প্রধান প্রাধিকারভুক্ত বিষয় হলো বাস্তুতন্ত্রের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পার্বত্য অঞ্চলের বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি বনের আচ্ছাদন পরিস্থিতির অগ্রগতি সাধন, জলাশয় ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মাটির ক্ষয়রোধে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৃক্ষরোপণ বাড়াতে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে জটিল প্রকৃতির স্থানীয় রাজনীতি ও চলমান ভূমিবিরোধের কারণে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। সে কারণে এ পরিকল্পনা মেয়াদে স্থানীয় জটিল রাজনীতি ও ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় বনের আচ্ছাদন পুনরুদ্ধার ও বন সংরক্ষণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি পাহাড়ি বনের সংরক্ষণ বর্ধিতকরণে বনের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগ বাড়ানো হবে। যুগ যুগ ধরে অশ্রেণীকৃত রাষ্ট্রীয় বন (টঝঋ) খালি ও অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন, বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে এসব ইউএসএফ কাজে লাগাতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ পরিকল্পনাকালে প্রাকৃতিক উপায়ে বনের পুনরুদ্ধার ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বন সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জলাশয় ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণমূলক যৌথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

উদ্ভিদের জিনগত সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তনশীলতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে ১০ বা ২০ বছর অন্তর উদ্ভিদ জরিপ পরিচালনা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্ভিজ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত হালনাগাদ জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উদ্ভিদ-সংক্রান্ত সমীক্ষা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বাকি এলাকাগুলোয় উদ্ভিদ সমীক্ষা সম্পন্নের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বনাঞ্চলের বাইরের বৃক্ষরাজি: দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ প্রাক্কলিত ২৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় জমিগুলোকে (প্রান্তিক ভূমি, সড়কের পার্শ্ববর্তী জমি, বিভিন্ন ধরণের বাঁধ প্রভৃতি) বনায়নের আওতায় আনার মাধ্যমে বনাঞ্চলের বাইরে বৃক্ষের আচ্ছাদন বাড়ানো সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বন খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও সহায়ক পরিষেবার নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত পদসোপানের (অরগানোগ্রাম) অনুমোদন দেয়া অত্যন্ত জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে বন ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বন অধিদপ্তরের সক্ষমতায় কোনো ঘাটতি না থাকে।

বন ও জীববৈচিত্র্য-সংক্রান্ত গবেষণা শক্তিশালীকরণ: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI), বাংলাদেশ জাতীয় হারবারিয়াম (BNH) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় বন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। তাদের নিয়মিতভাবে গবেষণা বাবদ অনুদান দেয়া হবে। বিএফআইআই ও বিএনএইচ কর্মী সংকট, আইটি-সংক্রান্ত অবকাঠামো, গবেষণার সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতার মতো যেসব প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে সমস্যাগুলো দ্রুততম সময়ে সমাধান করা হবে। বন ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিএফআরআইয়ের বিজ্ঞানীদের বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হবে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ: নতুন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড জনবল নিয়োগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও পরীক্ষাগার সুবিধা স্থাপন, বিদ্যমান জনবল পরিস্থিতি শক্তিশালীকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হয়েছে। এগুলো হলো–প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনকারী দেশসমূহের জোট (ANRPC) এবং আন্তর্জাতিক রাবার গবেষণা ও উন্নয়ন বোর্ড (IRRDB)। এ সদস্যপদ প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য হলো–দেশের জন্য সুবিধাজনক রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও আবাদ করা; আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে রাবার নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন এবং রাবারের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। দেশীয় চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাবারের প্রাকৃতিক রস আহরণে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এটির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বন্য জীবনের এই সংকট মোকাবিলা কার্যক্রমে সহায়তা করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

৮.৭ টেকসই উন্নয়ন–অর্জনের উপায়সমূহ

সরকার ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বিস্তৃত কৌশলের সহায়তায় দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছে এবং পরিবেশগত রাজস্ব সংস্কার (EFR) কার্যক্রমকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সংহত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। টেকসই পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও আকাঙ্ক্ষাগুলোর অর্জন নিশ্চিত করাই এ এজেন্ডার লক্ষ্য, যাতে করে পরিবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রোথিত হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। টেকসই উপায়ে এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় বিশেষ নজর দেয়া আবশ্যক। এসব স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে অষ্টম পরিকল্পনা প্রধানতম কৌশলগত দলিল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, গতিশীলতার সহিত সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণে অষ্টম পরিকল্পনা পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে।

যে কোনো ধরণের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও সামাজিক চাহিদার নিরিখে যদি সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের কোনো অগ্রাধিকারে যদি পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে সেটা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অষ্টম পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রবিধান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকার এরই মধ্যে পরিবেশ সংবেদনশীল বেশকিছু কৌশলগত দলিল প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় পরিকল্পনা ও দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশসমূহ। সামগ্রিকভাবে এসব দলিল প্রমাণ করে যে, পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নীতিনির্ধারকরা কতটা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিবেশগত খাতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংহতকরণের পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ওপরও গুরুত্বারোপ করছে। পরিবেশগত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে সরকার 'সেবা গ্রহীতার কাছ থেকে মূল্য আদায়' ও 'দূষণকারীর কাছ থেকে মাশুল আদায়' নীতির বাস্তবায়ন ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অষ্টম পরিকল্পনায় পরিবেশগত রাজস্ব সংস্কার (EFR) কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এজেন্ডা হিসেবে বিবেচিত হবে। সে অনুসারে অষ্টম পরিকল্পনাকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে

(এডিপি) টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে (সারণি ৮.৬)। বাংলাদেশ যাতে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক পথে চালিত হতে পারে, সেজন্যই এ বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৮.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দকরণ

টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা বৈশিষ্ট্যগতভাবে একটি 'ক্রস-কাটিং' বিষয় এবং এটির বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছুসংখ্যক মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আবশ্যক। সুতরাং, টেকসই উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে যে পরিমাণ অর্থায়নের প্রয়োজন হবে, তার অঙ্কটা বিশাল এবং কৃষি, পানিসম্পদ, ভূমি, স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রভৃতিসহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির সঙ্গে এ উন্নয়ন যজ্ঞ সম্পর্কিত। যাহোক, পরিবেশগত নীতিসমূহ প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সমন্বয়কারী ও নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায় রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ও সমন্বয় কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনায় সক্ষম করে তুলতে এই নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়টির সক্ষমতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি করা হবে। অধিকতর উন্নত পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, বিনিয়োগ ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনাও বৃদ্ধি করা হবে। সেই অনুসারে, মন্ত্রণালয়টির জন্য এডিপিতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

সারণি ৮.৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন খাতে এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)					
মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯.৪	১১.৫	১৩.৩	১৫.৫	১৮.৬
খাতভিত্তিক মোট	**৯.৪**	**১১.৫**	**১৩.৩**	**১৫.৫**	**১৮.৬**
(বিলিয়ন টাকা ২০২১, স্থির মূল্যে)					
মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯.৪	১১.০	১২.০	১৩.৪	১৫.৩
খাতভিত্তিক মোট	**৯.৪**	**১১.০**	**১২.০**	**১৩.৪**	**১৫.৩**

সূত্র: অধ্যায় ৫, খণ্ড ১, অ্যানেক্সার সারণি এ৫.১

খাত-৯:

গৃহায়ন ও নাগরিক পরিষেবাসমূহ

অধ্যায় ৯

নগর উন্নয়ন কৌশল

৯.১ ভূমিকা

অধিকাংশ দেশে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে নগরসমূহ যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে, তার বিবেচনায় নগরায়ণ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিশব্দে রূপ নিয়েছে। বিভিন্ন দেশের সামষ্টিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে এই সাধারণীকরণ প্রতিষ্ঠিত বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ যেসব দেশ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে নগরায়ণেরও উচ্চহার বিদ্যমান। অন্যদিকে যেসব দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর, সেখানে লক্ষ্য করা যায়, তাদের শ্রম শক্তির বৃহৎ অংশই কৃষিতে নিয়োজিত এবং সেখানে নগরায়ণের মাত্রাও অনেক কম। বস্তুত জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশকে নগরকেন্দ্রিক জীবিকায় অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকে কোনো দেশের পক্ষেই উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। যে প্রক্রিয়ায় শহরগুলোর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন পরিচালিত হয়, তাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সমন্বয় ঘটে, ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ঘটানো যায়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর ত্বরিত বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৭৪ সালে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে শহরে বসবাসকারীর হার ছিল প্রায় আট শতাংশ, যা ২০১১ সালে ২৮ শতাংশে উন্নীত হয়। যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ শহরে বসবাস করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় একযোগে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে কমে এসেছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবাখাতের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে। চাহিদার অনুপাতে নগরীতে ভূমি, নগর অবকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবার উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান, যা পরিষেবা সরবরাহে সীমাবদ্ধতা ও খরচের বোঝা সৃষ্টি করছে। নগরায়ণের এই চ্যালেঞ্জ যদি কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা না যায়, তাহলে নগরায়ণের চাপে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

৯.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), নতুন নগর এজেন্ডা (এনইউএ) ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা গ্রহণ করে। এ এজেন্ডায় ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৬ সালের ২০ অক্টোবর ইকুয়েডরের কুইটো শহরে অনুষ্ঠিত গৃহায়ন ও টেকসই নগর উন্নয়ন (হ্যাবিট্যাট ৩) শীর্ষক জাতিসংঘ সম্মেলনে নগর উন্নয়নের নতুন এজেন্ডা গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনের ৬৮তম পূর্ণাঙ্গ সভায় এ এজেন্ডা অনুমোদন লাভ করে। নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধাগুলোকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষার ইঞ্জিন হিসেবে গ্রহণ করে আরও উন্নত ও আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অংশীদারিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হচ্ছে নগরায়ণের এই নতুন এজেন্ডা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১১-তে নগর ও জনবসতি অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, ঘাতসহনশীল ও টেকসই হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ অভীষ্ট অর্জনে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসাশ্রয়ী আবাসন এবং মৌলিক সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন।
- অরক্ষিত পরিস্থিতির মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণ মানুষের চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রধানত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত যানবাহনের সম্প্রসারণ দ্বারা সড়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সুলভ ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সকল দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ ব্যবস্থার প্রসার এবং অংশগ্রহণমূলক, সমন্বিত ও টেকসই জনবসতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ২০৩০ সালের মধ্যে পানি

সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে বৈশ্বিক জিডিপির অংশ হিসেবে সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা এবং সেই সাথে এসব দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

- বায়ুর গুণাগুণ এবং পৌর ও অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানসহ অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নগরসমূহের মাথাপিছু পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমিয়ে আনা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিশেষ করে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অবারিত (প্রবেশাধিকারযুক্ত), সবুজ ও উন্মুক্ত স্থানে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদান করা।
- জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জোরদার করে শহর, উপশহর ও গ্রামীণ এলাকাগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ইতিবাচক সংযোগে সমর্থন দান।
- ২০২০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি, সম্পদ-দক্ষতা, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন ও প্রশমন, দুর্যোগে অভিঘাতসহনশীলতা সংবলিত সমন্বিত নীতিমালা ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে এমন নগর ও মানববসতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা এবং সকল স্তরে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেনদাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

নতুন নগর এজেন্ডায় যে রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে নগর ব্যবস্থা ও আমাদের শহরগুলোর বাহ্যিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে অধিকতর টেকসই ভবিষ্যতের আহ্বান জানানো হয়েছে, যা নাগরিকদের জন্য নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাম্যের ভিত্তিতে যাতে এসব সেবার বণ্টন নিশ্চিত হয়, সেদিকে নজর দেবে। এই রূপকল্প অর্জনে নতুন নগর এজেন্ডায় প্রদত্ত নিম্নলিখিত নীতিসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক নগর অঞ্চলের পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্মাণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সাধনে নির্দিষ্ট মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

- পর্যাপ্ত মাত্রায় সুলভ আবাসন সৃষ্টির পাশাপাশি সব ধরণের ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর পাশাপাশি মৌলিক পরিষেবাসমূহের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান প্রাপ্যতা বিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং সব ধরণের বৈষম্যের বিলোপ সাধনসহ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য টেকসই নগর উন্নয়ন।
- পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মের বিষয়ে উৎসাহদান এবং অর্থনৈতিক ও উৎপাদনশীল সম্পদ ও সুযোগসমূহে সবার সমান প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সবার জন্য টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধ নগর ও সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটানো।
- নগর উন্নয়নে ভূমি ও সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎসাহিতকরণ, বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা, নগরের ঘাত-সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজন নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবেশগতভাবে টেকসই ও ঘাত-সহনশীল নগর উন্নয়ন।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও নতুন নগর এজেন্ডা গ্রহণকারী সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এসডিজি ও এনইউএ-এর রূপকল্প বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণে উৎসাহিত করতে এসডিজির অভীষ্ট-১১ ও এনইউএ সুযোগের অবতারণা করেছে। এসডিজি ও এনইউএ'র সুপারিশসমূহের প্রতিফলন ঘটিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল নির্ধারণে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। শহরগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, ঘাতসহনশীল ও টেকসই হিসেবে গড়ে তোলা এবং নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নানা ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে: স্থানিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিষেবা, নগরীর ভূমি ও আবাসন উন্নয়ন, নগর অঞ্চলের পরিবেশগত অগ্রগতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। এগুলো সম্পাদন এবং এসডিজি ও এনইউএ'র রূপকল্প অর্জনে দেশে নগরায়ণের প্রক্রিয়া ও ধরণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ, প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন এবং দৃঢ় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সেসব কৌশলের বাস্তব প্রতিফলন নিশ্চিতকরণ।

৯.৩ বাংলাদেশে নগরায়ণের ধরণ ও ক্রমধারা

৯.৩.১ নগর প্রবৃদ্ধির স্থানিক ও অস্থায়ী ধরণ

উচ্চ আয়ের দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশে নগরায়ণের হার অনেক কম। তবে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, যেসব দেশে নগরায়ণের হার অনেক বেশি, বাংলাদেশ সেগুলোর একটি। সাম্প্রতিক দশকগুলোয় দেশে খুব দ্রুতগতিতে নগরায়ণ ঘটেছে। ১৯৬১ সালে দেশে নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৬ লাখ (২.৬ মিলিয়ন) বা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪.৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা উন্নীত হয় দুই কোটি ২৪ লাখ ৫০ হাজারে (২২.৪৫ মিলিয়ন), যা ওই সময়ের মোট জনসংখ্যার ২০.১৫ শতাংশ। আর ২০১১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ নগরায়ণের আওতায় আসে। ২০১৮ সালে দেশে নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় কোটি (৬০ মিলিয়ন), যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৬ শতাংশ (চিত্র ৯.১)। এ থেকে বোঝা যায়, নগরকেন্দ্রিক জনসমষ্টি ও শ্রম শক্তির বর্ধনশীলতার হার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও শ্রম শক্তির বর্ধনশীলতার হারের তুলনায় অনেক বেশি। বস্তুত, ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে পরিচালিত জনশুমারিগুলোয় দেখা যায়, দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় নগর অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার অনেক বেশি (চিত্র ৯.২)।

চিত্র ৯.১: বিভিন্ন বছরে নগরায়ণের অগ্রগতি

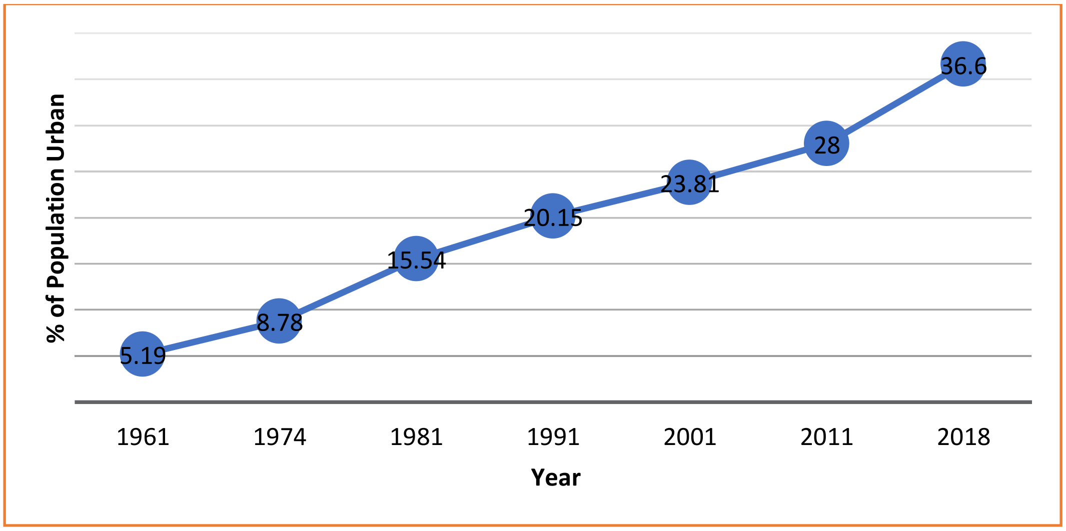

সূত্র: জনশুমারি ২০১১, ডটচ-২০১৮, ২০১৮ প্রাক্কলনের জন্য সংশোধন

চিত্র ৯.২: মোট জনসংখ্যা ও নগরীর জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি

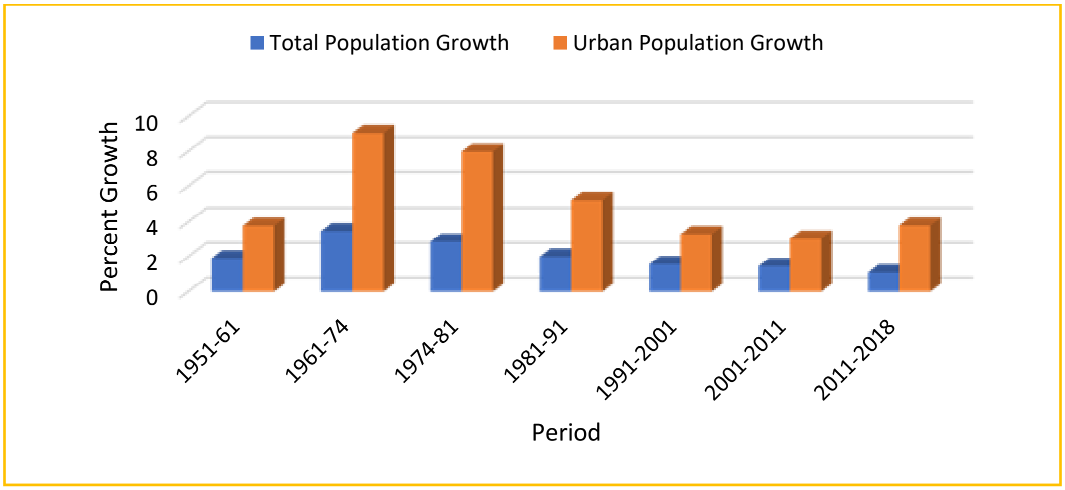

সূত্র: বিবিএস জনশুমারি, ২০১১ (বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন, ২০১৫)

জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের প্রক্ষেপণ মোতাবেক, ২০৫১ সাল নাগাদ বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৮ শতাংশ শহরে বসবাস করবে (চিত্র ৯.৩)। এ থেকে বোঝা যায়, নগরকেন্দ্রিক জনসমষ্টি ও শ্রম শক্তির বর্ধনশীলতার হার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও শ্রম শক্তির বর্ধনশীলতার হারের তুলনায় অনেক বেশি।

দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের নগরায়ণের মাত্রা ও মোট দেশের অনুপাতে জনসংখ্যা ধারণের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি জনশুমারিতেই জনসংখ্যা ধারণ ও নগরায়ণের মাত্রায় ঢাকা বিভাগের অবস্থান ছিল শীর্ষে (চিত্র ৯.৩)। অন্যদিকে নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যা ধারণে সিলেট বিভাগের অবস্থান সবচেয়ে নিচে এবং নগরায়ণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্নে অবস্থান ছিল রংপুর বিভাগের (নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার অনুপাতে)।

চিত্র ৯.৩: বিভাগভিত্তিক নগরের জনসংখ্যার অনুপাত ও নগরায়ণের মাত্রা

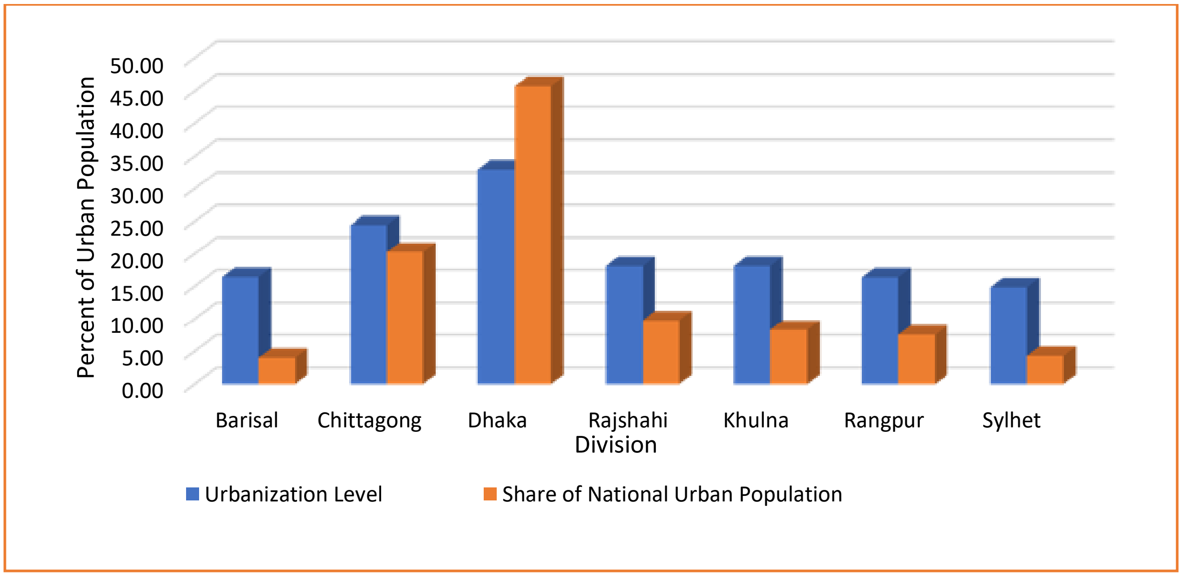

সূত্র: বিবিএস জনশুমারি ২০১১–নগর অঞ্চল প্রতিবেদন (২০১৫)

৯.৩.২ নগরকেন্দ্রের আকার ও সংখ্যা: স্থানিক ও অস্থায়ী ধরণ

২০১১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, দেশে ওই সময় নগরকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৫০৬টি। জনসংখ্যার আকার অনুসারে এসব নগরকেন্দ্রের বণ্টন চিত্র ৯.৪-এ উঠে এসেছে। নগরকেন্দ্রগুলোর প্রায় অর্ধেক (৪৭.৪৩%) আকারে ছোট এবং এগুলোর প্রতিটির জনসংখ্যা ২৫ হাজারের নিচে। এ নগরকেন্দ্রগুলো তাদের সংলগ্ন গ্রামীণ অঞ্চলের পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে থাকে। গ্রামীণ উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এসব নগরকেন্দ্রের যথাযথ উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর বাইরে ২২২টি নগরকেন্দ্র এসব নগরকেন্দ্রের তুলনায় আকারে বড়, যাদের জনসংখ্যা লাখের কম। এগুলো উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং আশপাশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এটি ছোট নগরকেন্দ্রের তুলনায় অধিকতর বৃহদাকারের সেবা প্রদান করে থাকে। আর সে শহরগুলোই আঞ্চলিক নগরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত, যেগুলোর জনসংখ্যা এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি, কিন্তু পাঁচ লাখের চেয়ে কম। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে শিল্পভিত্তিক শহর। অন্যগুলোয় নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতির সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় সেখানে শিল্প উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে বিভিন্ন নগর কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে নগরভিত্তিক জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশ বসবাস করে জেলাশহর ও পৌরসভাগুলোয়। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা মহানগরী এলাকায় এক কোটি ৪১ লাখ ৭০ হাজার (১৪.১৭ মিলিয়ন) মানুষ বসবাস করে, যা দেশের মোট নগরভিত্তিক জনগোষ্ঠীর ৩৩.৭৮ শতাংশ। নগরভিত্তিক জনসংখ্যা ধারণে এর পরের অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম। সেখানে ৩৭ লাখ ২০ হাজার (৩.৭২ মিলিয়ন) মানুষের বসবাস, যা দেশের মোট নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার ৮.৮৮ শতাংশ। এর পরের অবস্থানে রয়েছে খুলনা নগরী। সেখানে ১০ লাখ ৪১ হাজার (১.০৪১ মিলিয়ন) মানুষের বসবাস, যা নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার ২.৪৯ শতাংশ। আর রাজশাহী নগরীতে বসবাসকারী জনসংখ্যা ছয় লাখ ৮০ হাজার (০.৬৮ মিলিয়ন), যা দেশের মোট নগরভিত্তিক জনসংখ্যার ১.৬২ শতাংশ। এই চারটি মহানগরী এলাকায় দেশের মোট নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর ৪৬.৭৮ শতাংশের আবাস।

চিত্র ৯.৪: আকার অনুসারে নগরকেন্দ্রগুলোর বণ্টন

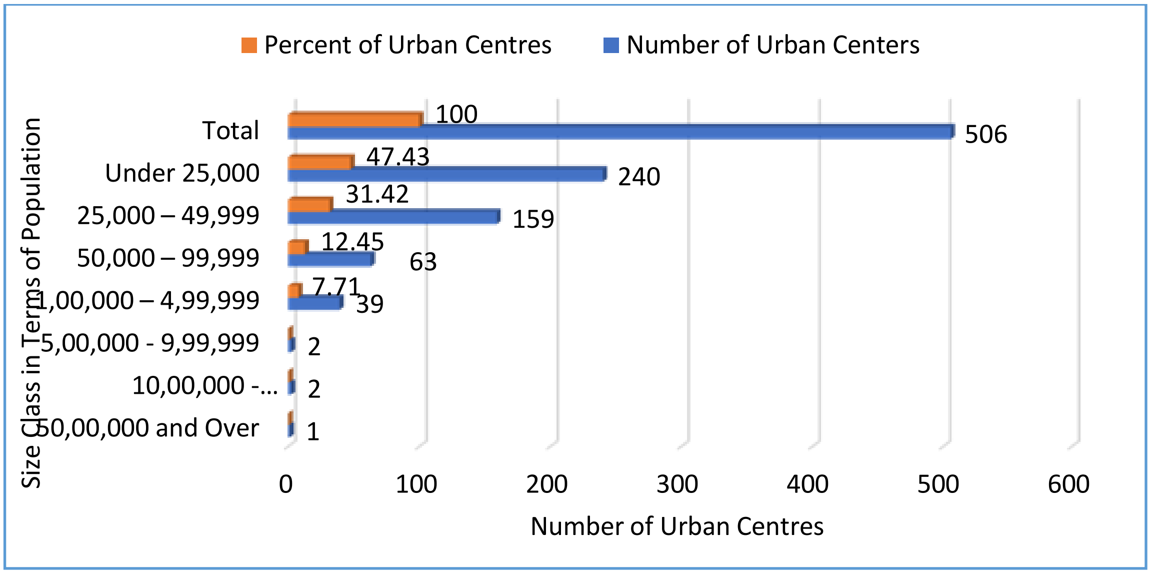

সূত্র: বিবিএস আদমশুমারি ২০১১-নগর অঞ্চল প্রতিবেদন (২০১৫)

৯.৩.৩ ঢাকার প্রাধান্য

ঢাকা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান শহর। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ১২ শতাংশ এবং নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ এ শহরটিতে বসবাস করে (সারণি ৯.১)। এ শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রামের তুলনায় প্রায় চার গুণ। গত ৪০ বছরে সকল দিক থেকে ঢাকা বাংলাদেশের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বস্তুত গত ৪০ বছরে ঢাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ছয় গুণ। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৮০ শতাংশ কারখানা ঢাকা ও এর আশেপাশে অবস্থিত। চূড়ান্ত বিচারে ২০৩০ সাল নাগাদ ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ২ কোটি ৭৪ লাখ (২৭.৪ মিলিয়ন) হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০১১ সালের আদমশুমারিতে প্রাপ্ত জনসংখ্যার তুলনায় ৮৬ শতাংশ বেশি।

সারণি ৯.১: বিভিন্ন বছরে ঢাকা শহরের প্রাধান্য

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	নগর জনসংখ্যার আনুপাতিক হার	মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হার	দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের জনসংখ্যার তুলনায় ঢাকার জনসংখ্যা
১৯৮১	০৩.৪৪	২৫.৪২	০৩.৯৪	২.৪৭
১৯৯১	০৬.৮৪	৩০.৪৬	০৬.১৩	২.৯১
২০০১	০৯.৬৭	৩৪.৪৭	০৮.২০	৩.৩৩
২০১১	১৪.১৭	৩৩.৭৮	০৯.৪৪	৩.৮০
২০১৮	১৯.৫৭	৩২.১১	১১.৭৬	৪.০৬

সূত্র: জনশুমারি প্রতিবেদন (বিবিএস); বিশ্ব শহর প্রতিবেদন-২০১৮ (জাতিসংঘ)

সারণি ৯.২-এ বাংলাদেশসহ এশিয়ার বাছাইকৃত কিছু দেশের প্রধান শহরের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার অনুপাতে লোকসংখ্যা ধারণ ও মোট নগরভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতে লোকসংখ্যা ধারণের দিক থেকে অন্যান্য এশীয় দেশের প্রধান শহরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের প্রধান শহরের প্রাধান্য সর্বোচ্চ। এক মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা ধারণ করা শহরের দিক থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে। অথচ ভিয়েতনামেও এক মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা বসবাসকারী শহর ছয়টি, ইন্দোনেশিয়ায় এ সংখ্যা ১৪টি এবং পাকিস্তানে ১০টি। নগরায়ণের বিষয়টি ঢাকায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এ শহরের বাসযোগ্যতার ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্বল নর্দমা কাঠামো, বায়ুদূষণ, উন্নত মানের ভূমি ও আবাসনের প্রাপ্যতার ঘাটতি, অতিমাত্রায় শব্দদূষণ, যানজট ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও অন্যান্য মৌলিক পরিষেবার ঘাটতির মতো অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত এ শহর। বাংলাদেশ যেহেতু ২০৩১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হতে চায়, তাই শহরের বাসযোগ্যতা সূচকে অগ্রগতি অর্জনের জন্য এসব সমস্যা মোকাবিলায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

সারণি ৯.২: বাছাইকৃত এশীয় দেশসমূহে প্রধান শহরের আকার ও নগর উন্নয়ন

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	মোট শহুরে জনগোষ্ঠীর অনুপাতে প্রধান শহরের জনসংখ্যা (%)	মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রধান শহরের জনসংখ্যা (%)	এক মিলিয়নের বেশি জনবহুল শহরের মোট জনসংখ্যার অংশ (%)	এক মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা বসবাসকারী শহরের সংখ্যা
বাংলাদেশ	১৬৩.০	৩২.১১	১১.৭৬	৩.৫	৩
চীন	১৩৭৮.৭	৩.১	১.৮	২৩.৪	১০২
ভারত	১৩২৪.২	৬.০	২.০	১২.৯	৫৪
ইন্দোনেশিয়া	২৬১.১	৭.৪	৪.০	৬.৬	১৪
পাকিস্তান	১৯৩.২	২২.৬	৮.৯	১৩.২	১০
ভিয়েতনাম	৯২.৭	২৩.২	৮.১	৬.৬	৬

সূত্র: বিশ্বব্যাংক ডেটাবেজ

৯.৪ নগরায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৯.৪.১ অর্থনীতিতে নগরসমূহের ভূমিকা

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরসমূহের ভূমিকার বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জনবল আকর্ষণ, উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগী সক্ষমতা অর্জনের মানব সম্পদ ও ভৌত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে শহরগুলো বর্তমানে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১২৩টি মেট্রোপলিটন শহর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ ধারণ করে বিশ্বের মোট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের নিয়ন্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে এসব শহরের অবস্থান। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় উচ্চমাত্রার নগর উৎপাদনশীলতা অধিকতর শক্তিশালী, সেখানে গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় শহরগুলো অনেক বেশি উৎপাদনশীল। যদিও ক্রমবর্ধমান নগরায়ণ ও দ্রুত জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি বড় শহরগুলোয় প্রায়ই নানা সমস্যার জন্ম দেয়, তা সত্ত্বেও প্রধান শহরগুলোয় সাধারণত এর জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশি কেন্দ্রীভূত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা শহরের কথা বলা যায়, যেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৮.৭ শতাংশের অবস্থান। অথচ দেশের মোট জিডিপিতে এ শহরের অবদান ৩৫ শতাংশ।

চিত্র ৯.৫: বিভিন্ন শহরে মোট দেশজ জনসংখ্যার অংশ ও জিডিপির পরিমাণ

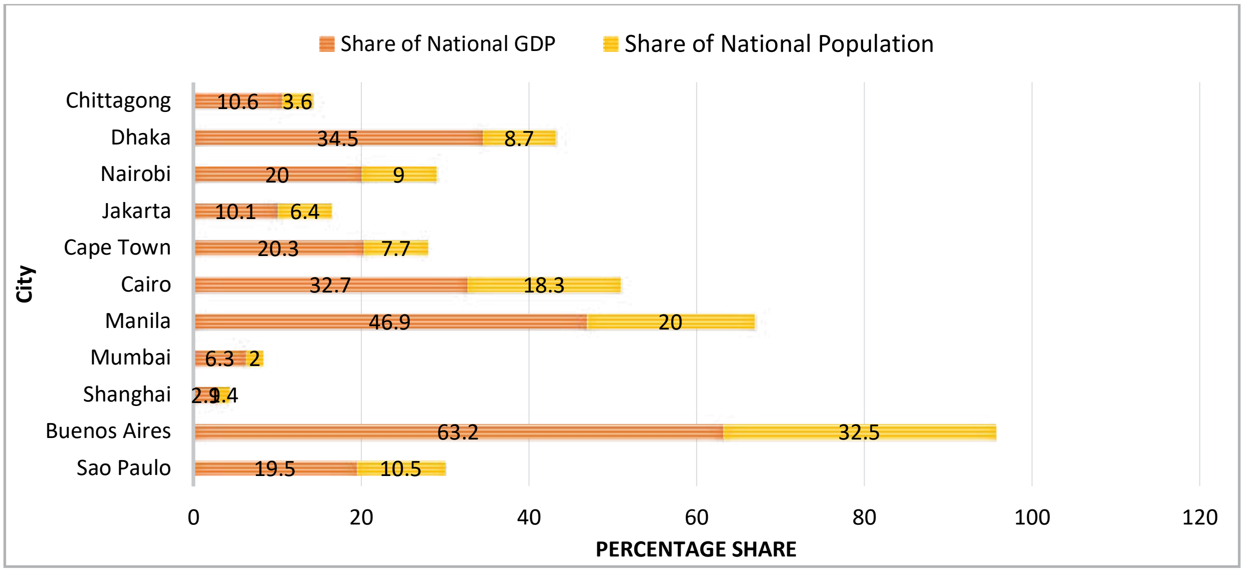

সূত্র: World Development Indicators (WDI)); Economic Role of Cities 2011(UNHABITAT); Economist magazine, September 12, 2019,

শহরগুলো বর্তমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্পদ সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তরিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদ্যমান কর্মসংস্থানের সুযোগ। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ উপকৃত হয়েছে। কারণ প্রতিবছর শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে, যে উদ্বৃত্ত শ্রম শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার সক্ষমতা বর্তমানে দেশের কৃষিখাতের নেই। পরিবারের জন্য কৃষিখাত পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারায় ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল সদস্যদের ভরণপোষণের ব্যয় মেটানোর জন্য সবাই কৃষির বাইরে কর্ম অনুসন্ধানে উৎসাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে মানুষের স্থানান্তরের ফলে শহরের জনসংখ্যা ৪০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে খানাভিত্তিক উপার্জন অনেক বেশি। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬ (বিবিএস, ২০১৭)-এর তথ্য অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের খানার তুলনায় শহুরে খানার মাসিক আয় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। শহরগুলো অন্যান্য আরও নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে, যেগুলো টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর নগরায়ণের ফলে জনঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় সাশ্রয়ী উপায়ে অনেক বেশিসংখ্যক নাগরিকের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

শহরগুলো যে কেবল তার অধিবাসীদের জন্যই নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে তা নয়, বরং তা দেশব্যাপী উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। নগর কেন্দ্রগুলোর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে। ফলে সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। এছাড়া নগর অঞ্চলের রোজগারের একটি অংশ রেমিট্যান্স আকারে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি নগর অঞ্চলে বিকশিত মানব সম্পদ ও নতুন নতুন প্রযুক্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে নগরায়ণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার উপযোগী জাতীয় প্রবৃদ্ধির চালক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

৯.৪.২ অর্থনীতির সামষ্টিকীকরণ ও নগরায়ণ

নগর অঞ্চলে জাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন কার্যক্রমের উচ্চ মাত্রায় কেন্দ্রীকরণ সাধারণভাবে অর্থনীতির স্থানীয়করণ ও নগরায়ণ হিসেবে বিবেচিত হয় (বিষয়টি অর্থনীতির সামষ্টিকীকরণ হিসেবেও পরিচিত)। একটি শিল্পখাতের অনেকগুলো কারখানা একটি নির্দিষ্ট স্থানে কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে অর্থনীতির স্থানীয়করণের আবির্ভাব হয়। স্থানিকৃত অর্থনীতির তিনটি উৎস বিদ্যমান। প্রথমত, শ্রম শক্তির সহজলভ্যতা, যেখানে কারখানাসমূহ নানা ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রম শক্তি পেয়ে থাকে। এই স্থানীয়করণ পর্যায়ক্রমিকভাবে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। দ্বিতীয়ত, একটি পণ্যকে মধ্যবর্তী কাঁচামালে রূপান্তরের মাধ্যমে যথেষ্ট রিটার্ন প্রাপ্তির সুযোগ-সংবলিত শিল্পের বিকাশ এবং তৃতীয়ত, যোগাযোগ, পণ্য সরবরাহ, শ্রমিক ও সৃজনশীল ধারণা–যেগুলোর সঙ্গে কারখানার নিবিড় সান্নিধ্য বিদ্যমান। অন্যদিকে নগরায়ণ অর্থনীতি বলতে সেই অর্থনীতিকে বোঝায়, যেখানে নগরের অবস্থানগত কারণে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে বাজারের সান্নিধ্য, শ্রমিক সরবরাহ, ভালো মানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নানা ধরণের আর্থিক ও বাণিজ্যিক সেবা, যেমন: নিরীক্ষা, বিজ্ঞাপন, বিনিয়োগ, শিল্পকারখানা পরিষ্কারকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। বৃহত্তর শহরগুলোয় ছোট শহরগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধাদির সমন্বয় ঘটে। একটি শহর যত বড় হয়, নির্দিষ্ট চাহিদা ও যোগানের সক্ষমতাও তার তত বেশি থাকে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ৮০ শতাংশই ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকা মেট্রোপলিটন ও বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় কৃষিবহির্ভূত কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর অনুপাত সামগ্রিকভাবে দেশের অন্য সব অঞ্চলের তুলনায় সবচেয়ে বেশি (চিত্র ৯.৬)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় যত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, তাদের মধ্যে শিল্প ও সেবাখাতে নিয়োজিত শ্রম শক্তির অনুপাত যথাক্রমে ৩৪ শতাংশ ও ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক হিসাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কর্মে নিযুক্ত মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ শিল্পে এবং ৩৯ শতাংশ সেবাখাতে নিয়োজিত। আর ঢাকার বাইরে এ অনুপাত আরও অনেক কম (ঢাকা ব্যতীত দেশের অন্য সমগ্র অঞ্চলের হিসাব অনুযায়ী)। এটি খুবই সাধারণ বিষয় যে, অর্থনীতির স্থানীয়করণ ও নগরায়ণ সংঘটিত হয় মূলত দেশের সেসব প্রধান নগরকেন্দ্রে, যেখানে সহায়ক কার্যাবলীর উপযুক্ত সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

চিত্র ৯.৬: খাতভিত্তিক কর্মসংস্থানের অংশ

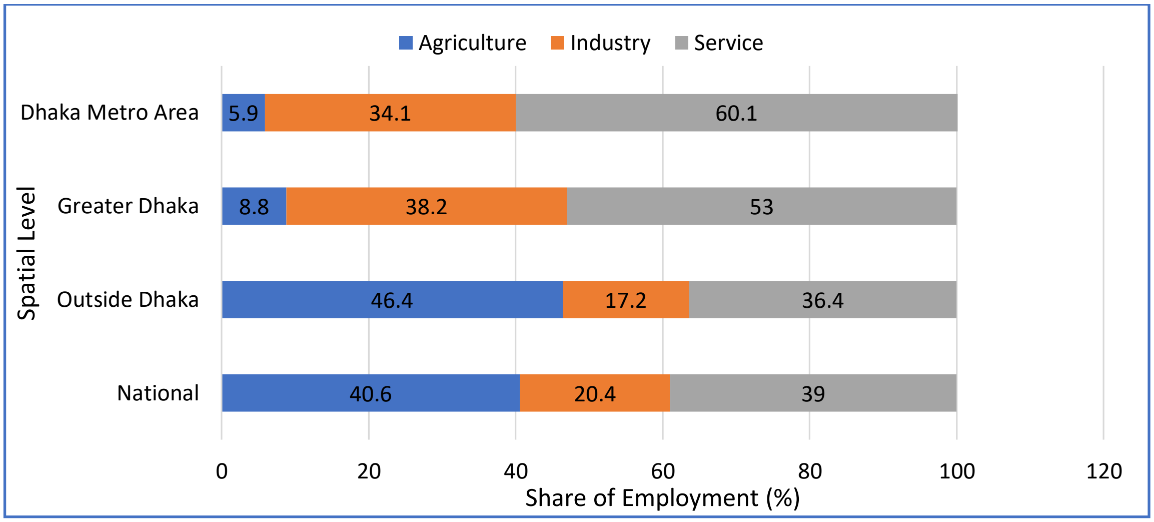

সূত্র: *Ahmed Ahsan (2019): "Dhaka centric-growth: At what cost?" in Policy Insight, November 2019, PRI, Dhaka*

৯.৪.৩ নগরীর প্রতিযোগী সক্ষমতা

বর্তমানে শহরগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে বিবেচিত। ফলে বিভিন্ন দেশ দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকারত্ব কমাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কর্মসৃজনে তাদের শহরগুলোকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ উৎপাদনশীলতা, অধিকতর পুঁজি ঘনত্ব, উচ্চস্তরের মানবপুঁজি এবং ব্যাপক মাত্রার ভৌত ও কোমল অবকাঠামোগত সক্ষমতা অর্জনে নানা কৌশল বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করার মাধ্যমে অনেক উন্নয়নশীল দেশই এগুলো অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সিঙ্গাপুর, হংকং ও ভারতের ব্যাঙ্গালুরু তাদের অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা যেসব কৌশলের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে–সাশ্রয়ী অবকাঠামো, সস্তা শ্রম, নিম্ন করহার, প্রবৃদ্ধি জোরদারকরণে শিল্পপণ্যে মূল্য সংযোজন বাড়াতে দক্ষ কর্মীর ওপর গুরুত্বারোপ, উন্নততর কৌশলগত অবকাঠামো ও উদ্ভাবন।

২০১১ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এক সমীক্ষায় বাংলাদেশের শীর্ষ ১০টি শহর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও কুমিল্লার প্রতিযোগী সক্ষমতা মূল্যায়ন করেছিল। ছয়টি মৌলিক চলকের ভিত্তিতে এ প্রতিযোগী সক্ষমতার মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এগুলো হলো–ব্যবসা করার খরচ, স্থানীয় অর্থনীতির গতিশীলতা, মানব সম্পদ ও প্রশিক্ষণের প্রাপ্যতা, অবকাঠামোর প্রাপ্যতা, ব্যবসায়িক প্রয়োজনের প্রতি সরকারের সাড়া প্রদানের মাত্রা এবং জীবনযাত্রার মান। প্রত্যেকটি চলকেরই নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের বেশকিছুসংখ্যক সূচক ছিল। মোট ১০ নম্বরের মধ্যে এ মূল্যায়ন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৭.৩১ পয়েন্ট অর্জন করে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রতিযোগী সক্ষম শহর হিসেবে আবির্ভূত হয় ঢাকা। ঢাকার এ অবস্থান অর্জন অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ বিপুলসংখ্যক জনসংখ্যা ধারণের পাশাপাশি দেশের প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা যথাক্রমে পরবর্তী সর্বোচ্চ স্কোর অর্জন করে। এ ১০টি শহরের মধ্যে ছয়টি জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সক্ষম নয় (সেগুলোর সূচকের মান ৫ এর নিচে)। এসব শহর মূলত স্থানীয় ভোগের জন্য পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে। চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হিসেবে বিবেচিত। তবে সেগুলোকে রপ্তানিভিত্তিক ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষম অর্থনীতিতে রূপ দিতে হলে আরও লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। এসব শহরের কোনোটিই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সক্ষম নয় (এজন্য ৭.৫-এর ওপর স্কোর প্রয়োজন হয়)। তবে কিছু কিছু খাতে ঢাকা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষম, বিশেষ করে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতে।

৯.৫ নগরায়ণের প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৯.৫.১ নগরের পরিবেশ

নগরীর পরিবেশগত সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল, বহুমাত্রিক এবং একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্বল নর্দমা ব্যবস্থা, বায়ুদূষণ, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতায় ঘাটতি, উচ্চমাত্রার শব্দদূষণ, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা এবং মানসম্মত জীবনযাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়া প্রভৃতি কারণে জীবনমানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। নগরীর পরিবেশের মান ক্রমেই নিম্নগামী হওয়ায় নগরীর অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে যায়; বিশেষত নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য। এটি শহর ও এর আশপাশের এলাকার বাস্তুতন্ত্রেরও অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষতিসাধন করে। ঢাকা এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলোর অন্যতম। বর্তমানে এর জনসংখ্যা প্রায় এক কোটি ৯০ লাখ (১৯ মিলিয়ন)। উন্নত জীবনের আশায় প্রতিবছর গ্রাম থেকে প্রায় চার লাখ মানুষ ঢাকায় এসে আবাস গড়ে। এই দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য ঢাকা মারাত্মক চাপের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে ঢাকা এরই মধ্যে পরিবেশগত হুমকিতে রয়েছে। ২০১৫ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, দেশের নগর এলাকায় এমন পরিস্থিতি ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং ২৬ লাখ মানুষ (২.৬ মিলিয়ন) নানা ধরণের শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে দিনাতিপাত করে (ভঙ্গুর স্বাস্থ্য, অক্ষমতা অথবা সময়ের আগেই মৃত্যু ঘটা)। ঢাকায় এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ৫ লাখ ৭৮ হাজার (সারণি ৯.৩)। দেশের নগর অঞ্চলে পরিবেশগত কারণে সংঘটিত মৃত্যু, রোগবালাই ও শারীরিক অক্ষমতার জন্য যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ ১.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে কেবল ঢাকাতেই ক্ষতি হয় ৩১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান। এটি ২০১৫ সালে বাংলাদেশের মোট জিডিপির যথাক্রমে ০.৭ ও ০.২ শতাংশ। মৃত্যু-সংক্রান্ত কারণে সৃষ্ট বৃহত্তর কল্যাণকেন্দ্রিক ক্ষতির বিষয়টি যদি হিসেবে আনা হয়, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে বছরে এ ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; কেবল ঢাকাতে এর পরিমাণ ১.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৫ সালের জাতীয় মোট জিডিপির যথাক্রমে ৩.৪ ও ০.৭ শতাংশ।

নগরীর পরিবেশের ক্রমাবনতি পরিস্থিতি শহর ও এর সংলগ্ন এলাকার প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। উন্নত জীবনের আশায় প্রতিবছর গ্রাম থেকে প্রায় চার লাখ মানুষ ঢাকায় এসে আবাস গড়ে। এই দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য ঢাকা মারাত্মক চাপের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে ঢাকা এরই মধ্যে পরিবেশগত হুমকিতে রয়েছে। বায়ুদূষণ নগর অঞ্চলের একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। বায়ুদূষণের সম্ভাব্য উৎস, স্থান ও এর তীব্রতা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বায়ুর মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

সারণি ৯.৩: বাংলাদেশের নগর অঞ্চল ও বৃহত্তর ঢাকায় মরণশীলতার প্রাক্কলিত ব্যয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও জাতীয় জিডিপির অনুপাতে তার পরিমাণ

	নগর বাংলাদেশ				বৃহত্তর ঢাকা			
	কল্যাণগত ক্ষতি		উৎপাদনশীলতায় ক্ষতি		কল্যাণগত ক্ষতি		উৎপাদনশীলতায় ক্ষতি	
	পরিমাণ	জিডিপির সমমান	পরিমাণ	জিডিপির সমমান	পরিমাণ	জিডিপির সমমান	পরিমাণ	জিডিপির সমমান
পিএম২.৫ বায়ুদূষণ								
সামগ্রিক	২.৪২	১.২৪%	০.৪৯	০.২৫%	০.৫৩	০.২৭%	০.১১	০.০৬%
খানা	১.২৭	০.৬৫%	০.২৫	০.১৩%	০.২৮	০.১৪%	০.০৬	০.০৩%
অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা								
প্রত্যক্ষ প্রভাব	০.৪৩	০.২২%	০.১৪	০.০৭%	০.০৯	০.০৫%	০.০৩	০.০২%
পরোক্ষ প্রভাব	০.০৮	০.০৪%	০.০৪	০.০২%	০.০২	০.০১%	০.০১	০.০০%
খাবার পানিতে আর্সেনিক	০.৮০	০.৪১%	০.১৮	০.০৯%	০.১৮	০.০৯%	০.০৪	০.০২%
দখলদারিত্বের ফলে সৃষ্ট দূষণ	১.৫২	০.৭৮%	০.২৯	০.১৫%	০.৩৪	০.১৭%	০.০৬	০.০৩%
সর্বমোট	**৬.৫২**	**৩.৩৫%**	**১.৪০**	**০.৭২%**	**১.৪৪**	**০.৭৪%**	**০.৩১**	**০.১৬%**

সূত্র: (World Bank, (2018): Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: country environmental analysis 2018)

বাংলাদেশের নগরগুলোয় বায়ুদূষণ বৃদ্ধির কারণ হলো সড়কে ক্রমাগত হারে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি। বায়ুদূষণের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ইটভাটা, নির্মাণকাজ, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিভিন্ন ধাতু পরিশোধন ইত্যাদি। দূষণের

চারটি উপাদন হলো–সাসপেনডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার (SPM), নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) এবং বায়ুবাহিত সীসা। এগুলো পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। চিত্র ৯.৭-এ এশিয়ার কিছু বাছাই করা মহানগরীর বায়ুর মানের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায়, ঢাকার পরিবেষ্টিত সার্বিক বায়ুর মান সবচেয়ে খারাপ এবং অন্যান্য মহানগরীর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বহুদূষক সূচকেও ঢাকার অবস্থান শীর্ষে। এভাবে বায়ুদূষণ শহরের প্রধান পরিবেশগত সমস্যায় রূপ নিয়েছে। বায়ুদূষণের এ ইস্যু মোকাবিলায় দূষণের সম্ভাব্য উৎস, স্থান ও এর তীব্রতা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বায়ুর মান উন্নয়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

চিত্রঃ ৯.৭ঃ নির্বাচিত মেগাসিটিগুলোয় বায়ুমানের তুলনামূলক মূল্যায়ন

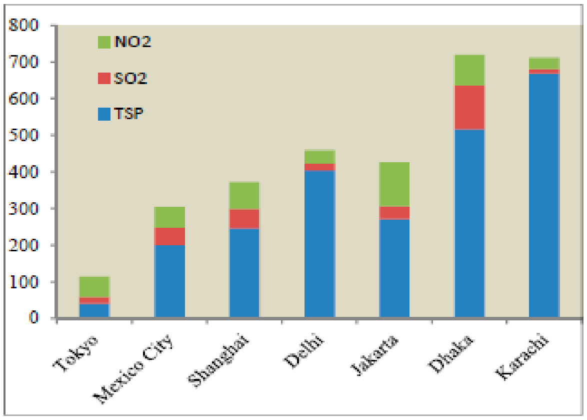

পরিবেষ্টিত বায়ু মানের পরিমাপ (μg m-3) (টিএসপি = মোট স্থগিত কণা)

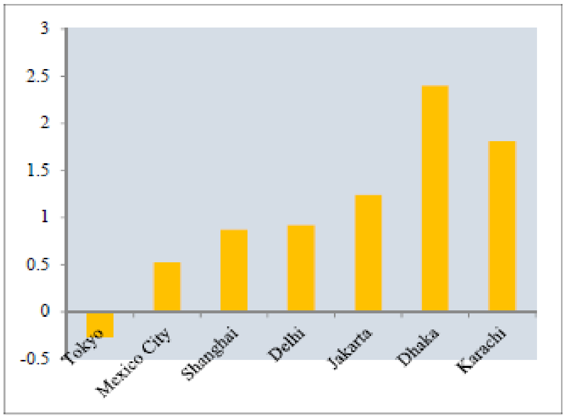

বহু-দূষক সূচক (এমপিআই); এমপিআই তিনটি মানদণ্ডের দূষণকারীদের সমন্বিত স্তরকে বোঝায় (যেমন, টিএসপি, SO_2 Ges NO_2)

সূত্রঃ Swapan et al, Urban Science, October, 2017

৯.৫.২ ভূমি ও গৃহায়ন

গত কয়েক দশকে দেশে জমির দাম আকাশচুম্বী হয়ে গেছে। আর ঢাকা শহরে জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০ গুণেরও বেশি। ভূমির অব্যাহত দাম বৃদ্ধির বিষয়টি গৃহায়ন পরিস্থিতির অবনমনকে ত্বরান্বিত করেছে। কারণ জমির দাম বৃদ্ধির বিষয়টি দরিদ্র পরিবারগুলোকে আনুষ্ঠানিক জমির বাজার থেকে বিতাড়িত করে অনানুষ্ঠানিক বাজারে প্রবেশে বাধ্য করে, যা বস্তি ও বিচ্ছিন্ন জনবসতি হিসেবে বিবেচিত। নগরীর জমির বাজার সরাসরি শহুরে পরিবেশ ও নগরজীবনের মানকে প্রভাবিত করে। ভূমি ব্যবহারে উপযুক্ত পরিকল্পনায় ঘাটতি, জোনিং আইন প্রয়োগ শৈথিল্য, ভবন অনুমোদনের বিধান লঙ্ঘন এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও পরিষেবাদির কারণে এ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এতে করে শহরগুলোর প্রান্তসীমা এলাকার জমিগুলো অপরিকল্পিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

নগর অঞ্চলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং তার ফলে ভূমি ও গৃহায়নের বাড়তি চাহিদার উদ্ভব পরিস্থিতিকে আরও বেশি জটিল করে তুলেছে; বিশেষ করে বড় শহরগুলোয় এ সংকট খুব প্রকট। খুব কমসংখ্যক পরিবারের ভূমি ও ঋণ সুবিধার প্রাপ্যতা রয়েছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পরিস্থিতি আরও বেশি নাজুক। কারণ তারা ক্ষুদ্র ভূমি উন্নয়নকারীর মাধ্যমে নির্মিত প্রান্তিক আবাসনে অথবা দখলদারদের মাধ্যমে তৈরি নিম্নমানের পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয় এবং সে আবাসনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থানের নিরাপত্তা নেই। নির্দিষ্ট সময়সীমার নিশ্চয়তা না থাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গ্যারান্টি পূরণ করতে পারে না। বাড়ি তৈরির জন্য ঋণের প্রচলিত উৎসসমূহ দরিদ্রদের নাগালের বাইরে থাকে। ফলে পুঁজি সংকটে দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিম্নমানের আবাসনে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গাদাগাদি করে বসবাস, নিম্নমানের আবাসন ইউনিট এবং বস্তির বিস্তার ঘটতে থাকে।

১৯৯১ সালে দেশের নগর অঞ্চলে আবাসনের ঘাটতি ছিল ৯ লাখ ১০ হাজার (০.৯১ মিলিয়ন) ইউনিট, ২০১০ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৬ লাখ (৪.৬ মিলিয়ন) ইউনিট (জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ২০১৭)। বিভিন্ন গবেষণার ওপর ভিত্তি করে 'জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ২০১৭'-তে বলা হয়েছে যে, ২০২১ সালের মধ্যে আবাসনের ঘাটতি ৮৫ লাখ (৮.৫ মিলিয়ন) ইউনিটে উন্নীত হয়ে যাবে (চিত্র ৯.৮)। গৃহায়ন পরিস্থিতির এই বিব্রতকর অবস্থান নগর অঞ্চলে অধিক মাত্রার গৃহহীনতার অন্যতম কারণ।

চিত্র ৯.৮: নগর আবাসনের ঘাটতি

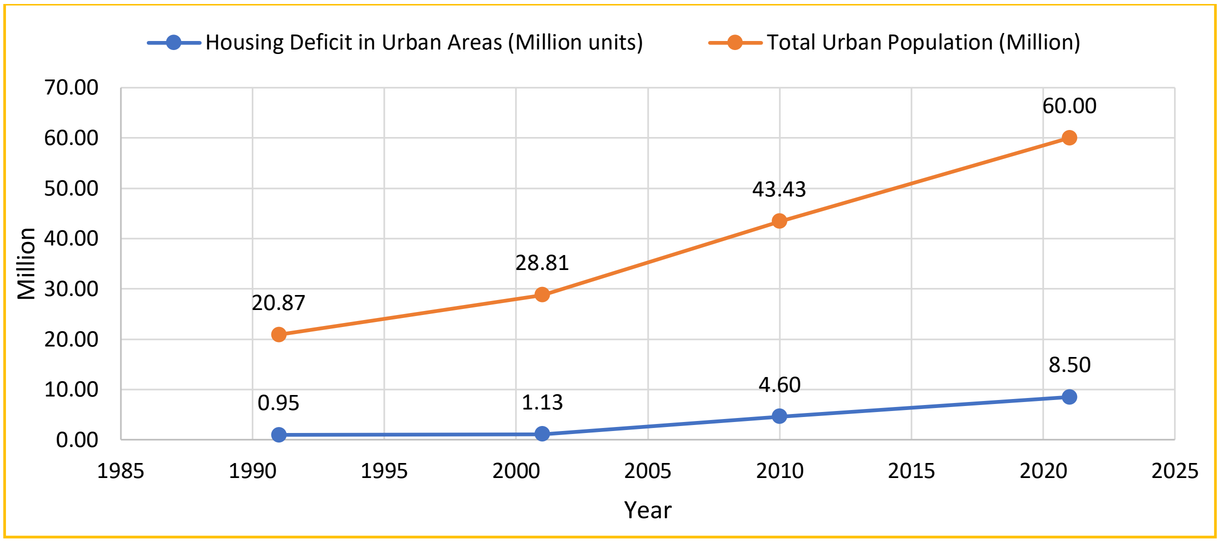

সূত্র: National Housing Policy, 2017

গৃহায়ন পরিস্থিতির বিদ্যমান বিশাল সংকটের পাশাপাশি বেশিরভাগ আবাসিক ইউনিট কাঠামোগতভাবে খুবই দুর্বল। সেখানে প্রয়েজনীয় পরিষেবা ও উপযোগিতার অভাবের পাশাপাশি সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই এসব আবাসন নির্মিত হচ্ছে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬ (বিবিএস ২০১৭) অনুযায়ী, ২০১৬ সালে নগর অঞ্চলের মাত্র ২৫.৭৩ শতাংশ আবাসন ছিল পাকা দালান (ইট/সিমেন্টের তৈরি ঘর)। আর আধা পাকা আবাসন ছিল ৩১.০৪ শতাংশ, বাকি ৪১.৭৭ শতাংশ ছিল কাঁচা বাড়ি। তবে ২০০১ সালের তুলনায় পাকা ও আধাপাকা বাড়ির অনুপাত বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিপরীতে কাঁচা ও ঝুপড়ি ঘরের সংখ্যা কমেছে, যা দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার অগ্রগতির বিষয়টি নির্দেশ করে।

সারণি ৯.৪: কাঠামোর ধরণ অনুযায়ী খানার অনুপাত

কাঠামোর ধরণ	২০০১	২০১০	২০১৬
ঝুপড়ি (ছন ও খড়ের তৈরি বাড়ি)	৭.৫৮	১.৮৫	১.৪৬
কাঁচা (সিমেন্ট/কংক্রিটের ব্যবহারবিহীন বাড়ি)	৪৭.১৫	৪১.৫৬	৪১.৭৭
আধাপাকা বাড়ি (কেবলমাত্র দেয়াল সিমেন্ট/কংক্রিটের তৈরি)	২৩.২৬	২৭.৮৮	৩১.০৪
পাকা বাড়ি (ছাদ ও দেয়াল সিমেন্ট/কংক্রিটের তৈরি)	২২.০১	২৮.৭১	২৫.৭৩
সর্বমোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**

সূত্র: HIES 2010 and HIES 2016

৯.৫.৩ মৌলিক নগর পরিষেবাসমূহ

শহর ও গ্রাম উভয় স্থলের জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা (WASH)। চলমান কোভিড-১৯ মহামারিকালে করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে ওয়াশ কর্মসূচির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে দেশে ওয়াশ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে; বিশেষ করে খানা, বিদ্যলয় ও স্বাস্থ্যসেবা পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে।

খানা পর্যায়ে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে বিশুদ্ধ পানযোগ্য পানি সরবরাহের আওতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশের ৯৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে (চাহিদা এবং এর উপায়)। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায় বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। ভারতে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে এই হার ৯৩ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ৮৯ শতাংশ। এই ৯৭ শতাংশ প্রাপ্যতার মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশের ক্ষেত্রে নিরাপদ ও সুব্যবস্থিত পদ্ধতিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। মাল্টি ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০১৯-এর

তথ্য থেকে জানা যায়, ৯৮.৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক পানি সরবরাহ সেবা নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু নিরাপদ ও সুব্যবস্থিত উপায়ে পানি সরবরাহের অংশ ৪৭.৯ শতাংশে নেমে গেছে। খানা পর্যায়ে পানি সরবরাহের অগ্রগতির বিষয়টি চিত্র ৯.৯-এ উঠে এসেছে।

চিত্র ৯.৯: খানাভিত্তিক পানির প্রাপ্যতায় অগ্রগতি

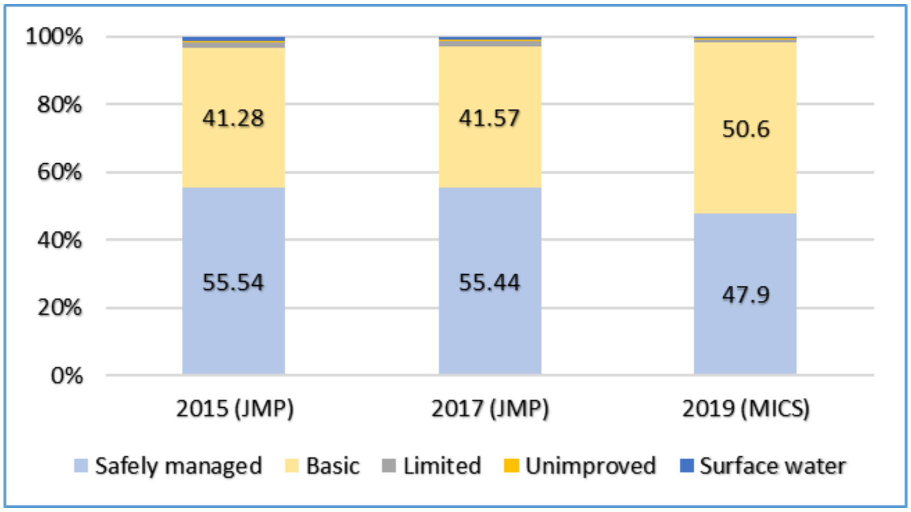

সূত্র: WHO/UNICEF Joint Monitoring Program (JMP), MICS

বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোতে WASH কর্মসূচির বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, মৌলিক ও সীমিত পর্যায়ের পানি সরবরাহের আওতা যথাক্রমে ৮২.১৭ ও ৯.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। এ দুইয়ের সম্মিলনে মোট পানি সরবাহের আওতায় এসেছে ৯২.০৭ শতাংশ বিদ্যালয়। শতভাগ বিদ্যালয় উন্নততর স্যানিটেশন সেবার আওতায় এসেছে। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে সবার জন্য কার্যকরভাবে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে গড়ে প্রতি ১১৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কার্যকর উন্নততর শৌচাগারের ব্যবস্থা হয়েছে।

জাতীয় পরিচ্ছনতা (Hygine) জরিপ ২০১৮ অনুসারে, বিভিন্ন ধরণের সাধারণ কাজ, যেমন: ধোয়ামোছা, গোসল এবং সব ধরণের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে উন্নততর উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। যাহোক, ৭৭ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম-সংবলিত উন্নততর ও কার্যকর উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে এবং সেখানে জলাবদ্ধতা নেই। অনেক স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা পানির প্রাপ্যতার জন্য নলকূপের পানির ওপর নির্ভর করে। প্রায় সব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে উন্নততর স্যানিটেশন ও হাতধোয়ার সেবা নিশ্চিত হয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে কেবল এক-চতুর্থাংশে নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা আছে। ১১ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে মৌলিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিষেবা নিশ্চিত হয়েছে (জেএমপি গ্লোবাল বেজলাইন রিপোর্ট, ২০১৯)। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর অধিকতর ভালো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে ২০১৯ সালে সরকার ওয়াশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS) স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি ওয়াশ কৌশল প্রস্তুত করার কাজ হাতে নিয়েছে।

স্যানিটেশন পরিস্থিতির আওতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এ অগ্রগতির হাত ধরে ২০১৫ সালে বাংলাদেশকে খোলা জায়গায় মলত্যাগ-মুক্ত স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ন্যূনতম মৌলিক স্যানিটেশন সেবাপ্রাপ্ত খানার হার ৪৮ শতাংশ। এ হার কম হওয়ার কারণ হলো–যেসব পরিবার ভাগাভাগি করে (SHARED) শৌচাগার ব্যবহার করে, ডব্লিউএইচও/ইউনিসেফের যৌথ পরিবীক্ষণ কর্মসূচিতে তাদের মৌলিক স্যানিটেশনের মর্যাদা দেয়া হয় না, এগুলোকে সীমিত পর্যায়ের স্যানিটেশন সেবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকা, যেমন বস্তি এলাকায় প্রত্যেক পরিবারের জন্য পৃথক শৌচাগারের নিশ্চয়তা বিধানের বিষয়টি বাস্তবসম্মত নয় এবং সেখানে শৌচাগার ভাগাভাগির বিষয়টিই বাস্তবতা। এ কারণে সীমিত স্যানিটেশন সেবাপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যায় উচ্চহার পরিলক্ষিত হয়। নগর এলাকায় শৌচাগার ভাগাভাগি করা পরিবারের সংখ্যা ৩২ শতাংশ, আর জাতীয় পর্যায়ে এ হার ২৩ শতাংশ। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, সীমিত ও মৌলিক মিলে বর্তমানে দেশে অপেক্ষাকৃত ভালো মানের স্যনিটেশন সেবা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৭১ শতাংশ। যাহোক, দেশে উন্নততর স্যানিটেশন সেবা বিস্তার কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেশ ভালো অগ্রগতি হয়েছে, যা চিত্র ৯.১০-এ উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৮৪.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে উন্নততর স্যানিটেশন

সেবা নিশ্চিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৪.৪ শতাংশ মৌলিক স্যানিটেশনের আওতায় এসেছে। উপাত্তের ঘাটতির কারণে জেএমপি নিরাপদ স্যানিটেশনের হিসাব দিতে না পারলেও এমআইসিএস (MICS) ২০১৯-এ দেখা যায় যে, দেশের ৯০.৭ শতাংশ পরিবারে নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে (এ ব্যবস্থাপনা নর্দমার সঙ্গে সংযুক্ত নয়)।

চিত্র ৯.১০: উন্নততর স্যানিটেশন সুবিধার সার্বিক প্রাপ্যতা (ব্যবহার শৌচাগার ভাগাভাগিসহ)

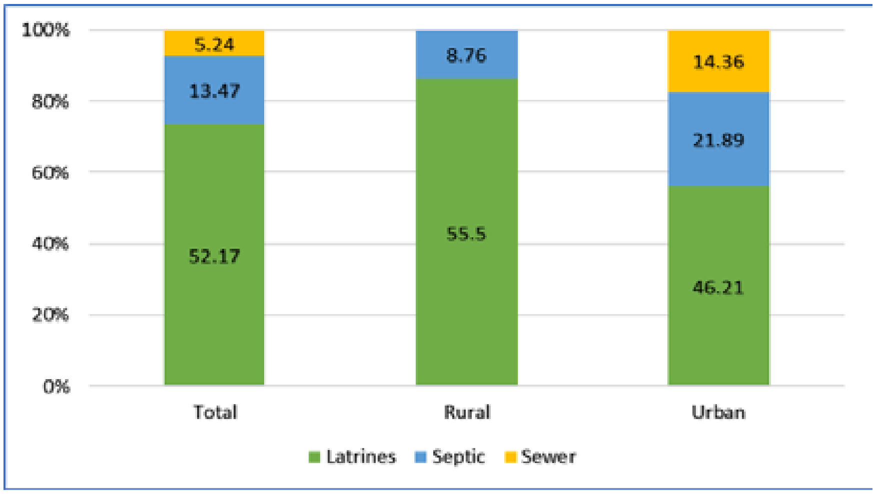

সূত্র: MICS, 2019

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Hygine) সেবার প্রাপ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে: জেএমপির ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, ৩৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মৌলিক হাইজিন সেবা নিশ্চিত হয়েছে। আর ৫৪ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সীমিত আকারে এ সেবা নিশ্চিত হয়েছে। হাইজিনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায় ২০১৮ সালের জাতীয় হাইজিন জরিপ থেকে। এ জরিপের তথ্য অনুসারে, ৬১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শৌচাগারের ৩০ ফুট দূরত্বের মধ্যে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধৌত করার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। দেশের সব জনগোষ্ঠীকে উন্নততর স্যানিটেশন সেবার আওতায় আনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় পদক্ষেপ। তবে দেশের সব মানুষকে উন্নততর স্যানিটেশন সেবার আওতায় আনতে এখনো অনেক পথ পাড়ি দেয়া বাকি।

নগরীর পানি সরবরাহ

১৯৯০ সালে নগরীর ৮১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর উন্নততর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা ছিল। ২০১৫ সালে এ হার ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এর মধ্যে ৩৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী পাইপের মাধ্যমে ট্যাপের পানি সরবরাহ সেবা পায় (সারণি ৯.৫)। তবে নগর অঞ্চলের সিংহভাগ মানুষ (৬০ শতাংশ) এখনো পান করার জন্য নলকূপের পানিই ব্যবহার করে (বিবিএস, ২০১৭)।

সারণি ৯.৫: পানি সরবরাহ সেবার আওতা

বছর	মোট উন্নততর (%)	পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ (%)	উন্নততর অন্যান্য মাধ্যম (%)	অন্যান্য অনুন্নত মাধ্যম (%)	ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ (%)
১৯৯০	৮১	২৩	৫৮	১৭	২
১৯৯৫	৮২	২৫	৫৭	১৬	২
২০০০	৮৩	২৭	৫৬	১৬	১
২০০৫	৮৪	২৯	৫৫	১৫	১
২০১০	৮৫	৩১	৫৪	১৫	০
২০১২	৮৬	৩২	৫৪	১৪	০
২০১৫	৯৯	৩৮	৬১	০১	০

সূত্র: JMP (Joint Monitoring Program), 2014 and 2017, WHO & UNICEF, Progress of Drinking Water & Sanitation

নগর অঞ্চলের সার্বিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নগরীর সব অধিবাসীর জন্য সমতাভিত্তিক উন্নততর পানি সরবরাহ সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়নি। চিত্র ৯.১১-তে ৭টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩১টি পৌরসভায় জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবার আওতা নির্ণয় করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, যেসব শহরে এক মিলিয়ন বা এর চেয়ে বেশি জনসংখ্যার বসবাস, সেখানে গড়ে ৬৪ শতাংশ মানুষ পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবার আওতায় এসেছে; আর যেসব পৌরসভায় জনসংখ্যা এক লাখের কম, সেখানে গড়ে ৩৭ শতাংশ মানুষ এমন পানি সরবরাহ সেবা পেয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায়, পৌরসভা পর্যায়ে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার চিত্র সন্তোষজনক নয়। বস্তি ও ঘিঞ্জি এলাকায়ও পানি সরবরাহের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হয়, সরকারি পরিষেবাগুলো থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। কিন্তু বাস্তবে সবসময় এমনটি ঘটে না। দরিদ্র জনগোষ্ঠী দৈনিক মাথাপিছু যে পানি সরবরাহ পায় তা এতটাই অপর্যাপ্ত যে, এটি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মৌলিক পরিমাণের চেয়েও অনেক নিচে। মাথাপিছু দৈনিক ২০ লিটার পানি সরবরাহের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। নগর অঞ্চল ও যেসব স্থানে দূষণ সৃষ্টিকারী অপরিশোধিত উপাদানসমূহের ঘনত্ব বেশি, সেসব স্থানে জরুরি ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ও অপরিকল্পিত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণে জরুরি ভিত্তিতে ভূগর্ভস্থ পানি পরিবীক্ষণ ও ভূ-উপরিস্থ পানির উন্নততর ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক।

নগর স্যানিটেশন ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

গত তিন দশকে নগর অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সুবিধা ব্যবহারের বিস্তৃতি ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে। সারণি ৯.৬ থেকে এটি স্পষ্ট যে, ১৯৮১ সাল থেকেই দেশের নগর অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারের ধারা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। ১৯৮১ সালে নগর এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহারকারী ছিল ৩২.৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে এ হার ৮২.১২ শতাংশে উন্নীত হয়।

চিত্র ৯.১১: পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সেবা আওতার গড় অনুপাত (মোট জনসংখ্যার %)

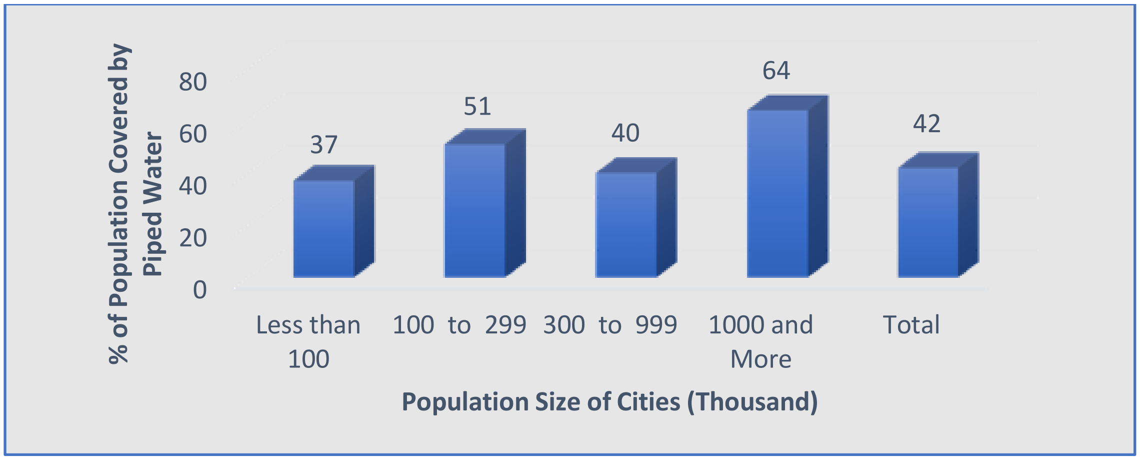

সূত্র: World Bank (WSP), 2014; Bangladesh Delta Plan (2016)

সারণি ৯.৬: স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার সুবিধাপ্রাপ্ত নগর খানার অনুপাত

বছর	শৌচাগার সুবিধা		
	স্বাস্থ্যসম্মত (স্যানিটারি)	অন্যান্য	কোনোটি নয়
১৯৮১	৩২.৪	৫৪.৫	১৩.২
১৯৯১	৫৬.২	৩০.৪	১৩.৩
২০০১	৬৭.৩	২৫.৩৪	৭.৩৬
২০০৫	৭৯.৮	১৮.৫	১.০০
২০১০	৭৬.১২	২৩.১১	০.৭৭
২০১৬	৮২.১২	১৬.৯৪	০.৯৪

সূত্র: BBS, 2005a; HIES (BBS), 2010 and 2016

যদিও জনসংখ্যার বৃহদাংশ (প্রায় ৮৫ শতাংশ) বর্তমানে উন্নতর স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহার করছে, তথাপি এ স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঙ্গে নর্দমা ব্যবস্থার সংযোগের বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণরূপে কেবল নগরকেন্দ্রিক, বিশেষ করে ঢাকাকেন্দ্রিক বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে। এখানে স্যুয়ারেজ সংযোগবিশিষ্ট স্যানিটেশনের হার ২২ শতাংশ। মাত্র দুই শতাংশ মলমূত্র কার্যকরভাবে পরিশোধন হয়, বাকিটা বিভিন্ন মাধ্যমে নির্গত হয় পরিবেশে এবং এগুলোর পরিশোধন ব্যবস্থাও অকার্যকর।

স্যুয়ারেজ সুবিধার আওতার সীমাবদ্ধতার কারণে জনসংখ্যার বিশাল অংশ স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত এমন স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে পিট ল্যাট্রিন ব্যবহার করা হয় এবং এ ল্যাট্রিনের মলমূত্র একটি সেফটিক ট্যাংকে জমা হয়। অব্যাহতভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং পানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে সেপটিক ট্যাংকগুলো দ্রুত পয়োবর্জ্যে পূর্ণ হয়ে যায় এবং ট্যাংক পুনরায় খালি করতে এতে জমা হওয়া মলমূত্র কোনো প্রকার পরিশোধন ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ড্রেন অথবা অন্য কোনো অকার্যকর উপায়ে উন্মুক্ত পরিবেশে ছেড়ে দেয়া হয়। আবার অনেক পরিবারের ক্ষেত্রে শৌচাগারের পাশে কোনো প্রকার সেপটিক ট্যাংকে পয়োবর্জ্য জমা করা ব্যতিরেকে প্রতিনিয়ত সরাসরি বিভিন্ন ড্রেন ব্যবস্থায় নির্গত করা হয়। বর্তমানে খানা পর্যায়ের সেপটিক ট্যাংকগুলো থেকে পয়োবর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর সক্ষমতা খুবই সীমিত। যেসব খানা সেপটিক ট্যাংক-সংবলিত শৌচাগার ব্যবহার করে, এগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার পর তা খালি করার জন্য তারা সাধারণত অযান্ত্রিক (ম্যানুয়াল) পদ্ধতি ব্যবহার করে। এমন ব্যবস্থায় পিট ল্যাট্রিনের মলমূত্র সরাসরি খোলা জায়গায় নিক্ষেপ করা হয় এবং এ মলমূত্র ফেলার জন্য উপযুক্ত জায়গার সংকটের কারণে খুব কম পরিমাণই নিরাপদ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হয়। এভাবে পয়োবর্জ্যের এ দুর্বল ব্যবস্থাপনা মারাত্মক পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরি করে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

দেশের শহর ও নগরের যেসব স্থানে বর্জ্য উৎপন্ন হয়, সেখানে নগরায়ণের প্রভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। নগরকেন্দ্রিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের নগরগুলোয় কঠিন বর্জ্যের পরিমাণও সমান তালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশে উৎপন্ন হওয়া কঠিন বর্জ্যের প্রবৃদ্ধির চিত্র সারণি ৯.৭-এ তুলে ধরা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলাদেশের নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হওয়ার মাত্রাও অব্যাহত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও এখানে মাথাপিছু বর্জ্য উৎপন্নের হার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় কম।

সারণি ৯.৭: ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে কঠিন বর্জ্য বৃদ্ধির হার

বছর	নগরকেন্দ্রিক মোট জনসংখ্যা	নগরের জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার অনুপাতে)	বর্জ্য উৎপন্নের হার (কেজি/মাথাপিছু/দিন)	মোট উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ (টন/দিন)
১৯৯১	২০৮৭২২০৪	২০.১৫	০.৩১	৬৪৯৩
২০০১	২৮৮০৮৪৭৭	২৩.৩৯	০.৪০	১১৬৯৫
২০০৫	৩২৭৬৫৫১৬	২৫.০৮	০.৪০	১৩৩৩০
২০১৪	৪১৯৪০০০০	২৯.০০	০.৫৬	২৩৬৮৮
২০২৫ (প্রক্ষেপণ)	৭৮৪৪০০০০	৪০.০০	০.৬০	৪৭০০০

সূত্র: Waste Concern: Bangladesh Waste Database 2014

দেশের নগর এলাকায় দৈনিক যে পরিমাণ কঠিন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, তা সংগ্রহ করে ভাগাড়ীকরণ করা নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। একটি নগর কর্তৃপক্ষ উৎপন্ন হওয়া বর্জ্যের যে পরিমাণ সংগ্রহ ও তা ভাগাড়ীকরণ করতে পারে, তার ওপর ভিত্তি করেই নগরীটির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। বাংলাদেশে এ কার্যক্রমের মান অত্যন্ত নিম্ন এবং বিভিন্ন নগরীর ক্ষেত্রে এ কার্যক্রমেও ভিন্নতা রয়েছে (চিত্র ৯.১২)। এসব বর্জ্যের একটি অংশ হয় সড়কে পড়ে থাকে, অথবা আশেপাশের খোলা প্রাঙ্গণে পড়ে থাকে। এসব কঠিন বর্জ্যের কিছু অংশ আবার পার্শ্ববর্তী খোলা নর্দমাগুলোয় মিশে যায় এবং তা নর্দমাগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে প্রায়ই সড়কে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং তা নগরীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত স্বাস্থ্যঝুঁকি বড় ধরণের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র ৯.১২: সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য সংগ্রহের দক্ষতা

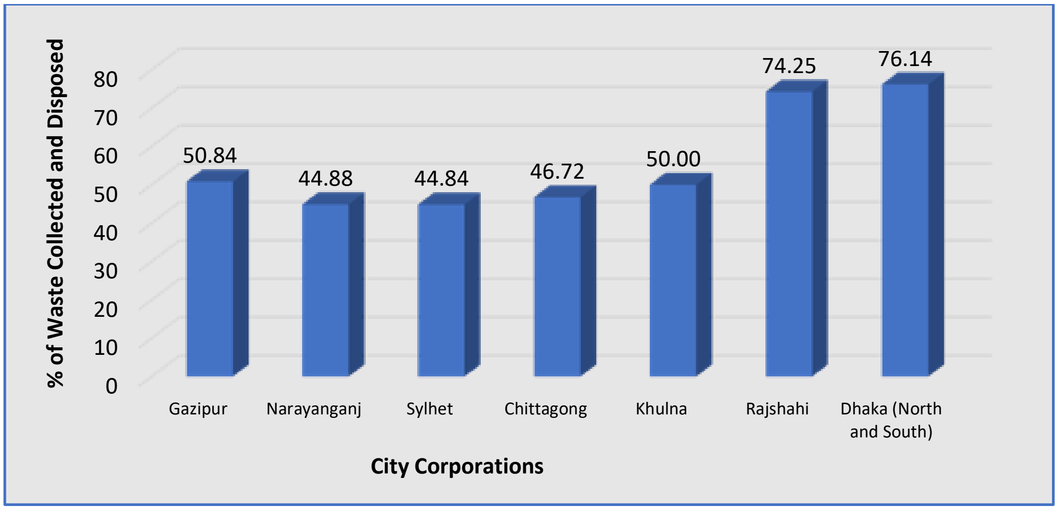

সূত্র: CEGIS: Baseline Survey on Waste Generation 2013; BIGD State of Cities: Solid Waste Management in Dhaka City, 2015; Khulna City Corporation, 2020

নগর পরিবহন

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরগুলোর সড়কে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অব্যাহত মাত্রায় ও দ্রুতহারে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রধানত নগরীর সড়কে যানজট সৃষ্টির জন্য দায়ী (চিত্র ৯.১৩)। এসব কার যে কেবল সড়কে চলাচলের ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করে তা নয়, বরং তা পার্কিংয়ের জন্যও বিপুল পরিমাণ জায়গা দখল করে। ঢাকায় এ সমস্যা সবচেয়ে প্রকট, কারণ এখানে ব্যক্তিগত গাড়ির বৃদ্ধির হার খুব বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে প্রতি ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫.৮৫টি, ১৯৯২ সালে যা ৩৪.৬টিতে উন্নীত হয়; এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৪৯০ শতাংশ। ২০১১ সাল নাগাদ প্রতি ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে কারের মালিকানার সংখ্যা ১৬০টিতে উন্নীত হয়। আর ২০১৭ সালে উঠে যায় ২০০টিতে। এ থেকে বোঝা যায়, নগরীর সড়কে ব্যক্তিগত কারের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ব্যক্তিগত কার নগরীর খুব সীমিত-সংখ্যক মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, কিন্তু এটি যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতার অনুপাতে সড়কে অনেক বেশি পরিমাণ জায়গা দখল করে রাখে।

দেশে সবেচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবহন মাধ্যম হচ্ছে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহন উভয় প্রকারের পরিষেবা সম্পাদিত হয়ে থাকে। নগর অঞ্চলেও যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সড়ক পরিবহন। রেল ও নৌপরিবহন সেবা সাধারণত নগর এলাকাগুলোর মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৯.১৩-তে দেশের ছয়টি সিটি কর্পোরেশন এলাকার সড়ক পরিবহন সেবার স্তরের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। সেবার স্তর (এলওএস) ব্যক্তির পরিবহন সেবা গ্রহণের সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এ বিবেচনায় নগর পরিবহনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করছে বরিশালে। আর সবচেয়ে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি রয়েছে চট্টগ্রামে। যদি সব ধরণের সড়ক পরিবহন সেবার কথা সম্মিলিতভাবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যায় সবচেয়ে ভালো সেবাস্তর রয়েছে বরিশালে। এর পরের অবস্থানগুলোয় রয়েছে যথাক্রমে সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। পাকা প্রশস্ত সড়ক ও শহরের ভেতরকার সব ধরণের সড়কের ভৌত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম শহর। ছয়টি সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে পরিবহন সমস্যা সবচেয়ে প্রকট ঢাকা শহরে। ঢাকা শহরের পরিবহন খাত নানা ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার সমষ্টি। এখানে যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন একই সড়ক ব্যবহার করে। এতে করে সড়কে বড় ধরণের পরিচালনগত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা প্রকারান্তরে বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে।

পরিবহন ব্যবস্থার নানা সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পায় ঢাকা শহর। আর দ্বিতীয় সারির প্রধান শহরগুলো, যথা–চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, বগুড়া ও ময়মনসিংহের মতো শহরগুলো নীতিনির্ধারকদের যথাযথ

সুদৃষ্টি পায় না; যদিও এসব শহর পরিবহনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্যার সম্মুখীন। সম্প্রতিক বছরগুলোয় সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় এ শহরগুলোর সড়ক ছেয়ে গেছে, যা শহরগুলোয় ব্যাপকহারে যানজটের সৃষ্টি করছে। এসব শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অযান্ত্রিক পরিবহন মাধ্যম, যেমন–পায়ে হাঁটা, রিকশা ও বাইসাইকেল ব্যবহার করে থাকেন।

চিত্র ৯.১৩: ছয়টি সিটি কর্পোরেশনে সড়ক ব্যবস্থার সেবার স্তর

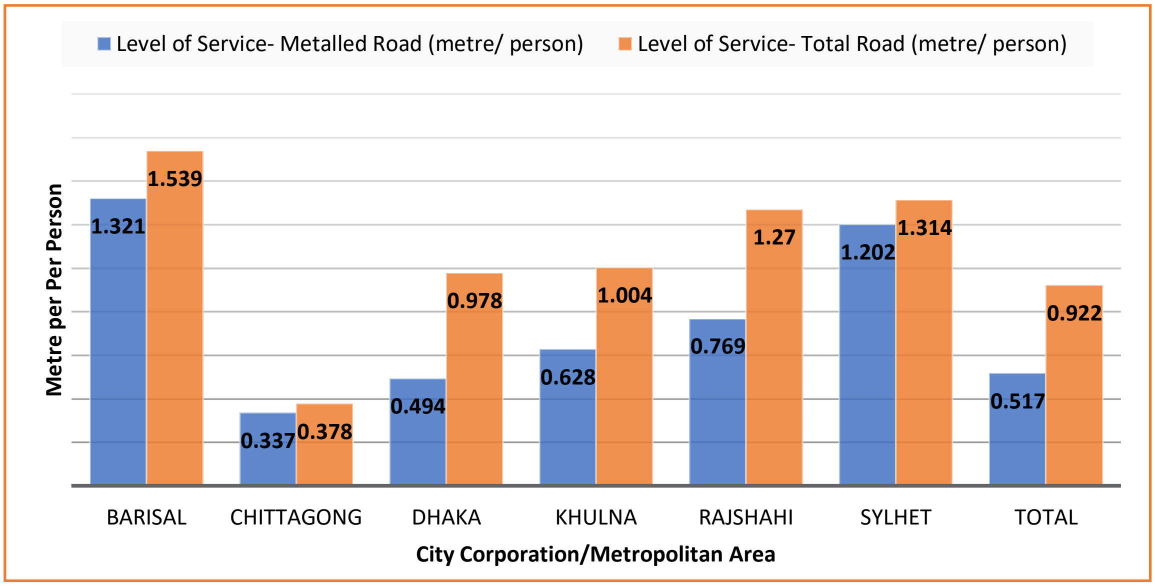

সূত্র: সিটি কর্পোরেশন ও রাজউক, ২০১৯

যথাযথ পরিবহন পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ও যানবাহন প্রকৌশলের অদক্ষতার দরুন যানবাহন ব্যবস্থাপনার মান অনেক নিম্নগামী। গণপরিবহন ব্যবস্থার শৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত দুর্বল এবং অযান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। দিনকে দিন বাড়তে থাকা যাত্রী পরিবহনের জন্য বিদ্যমান বাসের সংখ্যা খুবই কম এবং রেলসেবাও খুবই অপ্রতুল। এছাড়া মেট্রোপলিটন এলাকার অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা টেকসই নগর উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনের বিতর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে; কারণ এ পরিবহন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিদ্যমান। এসব বিষয় বিবেচনায় অধিকতর টেকসই উপায়ে নগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের চাহিদা মেটানোর বিষয়টি বর্তমানে সরকার, পরিবহন পরিকল্পনাবিদ ও প্রকৌশলীদের জন্য এক মহা চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

নগর দারিদ্র্য

গ্রামীণ অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে খানাভিত্তিক আয় অনেক বেশি। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬ (বিবিএস, ২০১৭)-এর তথ্য অনুযায়ী, শহরাঞ্চলের খানাভিত্তিক আয় গ্রামীণ খানাভিত্তিক আয়ের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। ফলে নগর অঞ্চলের তুলনায় গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্যের উপস্থিতিও অনেক বেশি। উচ্চ দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে প্রণীত বিবিএসের প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, ২০০০ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের মাথাগুণতি হার (HCR) ছিল ৪৮.৯ শতাংশ, অথচ গ্রামীণ অঞ্চলে এ হার ছিল ৫২.৩ শতাংশ। আর শুধু শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার ছিল ৩৫.২ শতাংশ (চিত্র ৯.১৫)।

২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু গ্রামীণ অঞ্চলে এর হার ছিল ২৬.৪ এবং শুধু শহরাঞ্চলে তা ছিল ১৮.৯ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, নগর দারিদ্র্যের হার গ্রামীণ দারিদ্র্য হারের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ কম এবং জাতীয় দারিদ্র্য হারের তুলনায় ২৯ শতাংশ কম। নিম্ন দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দেশের চরম দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, গ্রামীণ অঞ্চলের দারিদ্র্য হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। ২০১৬ সালে গ্রামীণ অঞ্চলে নিম্ন দারিদ্র্য রেখার (চরম দরিদ্র) নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ছিল শহরাঞ্চলের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি (চিত্র ৯.১৪)।

চিত্র ৯.১৪: বিভিন্ন বছরে উচ্চ ও নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্যের স্তর (%)

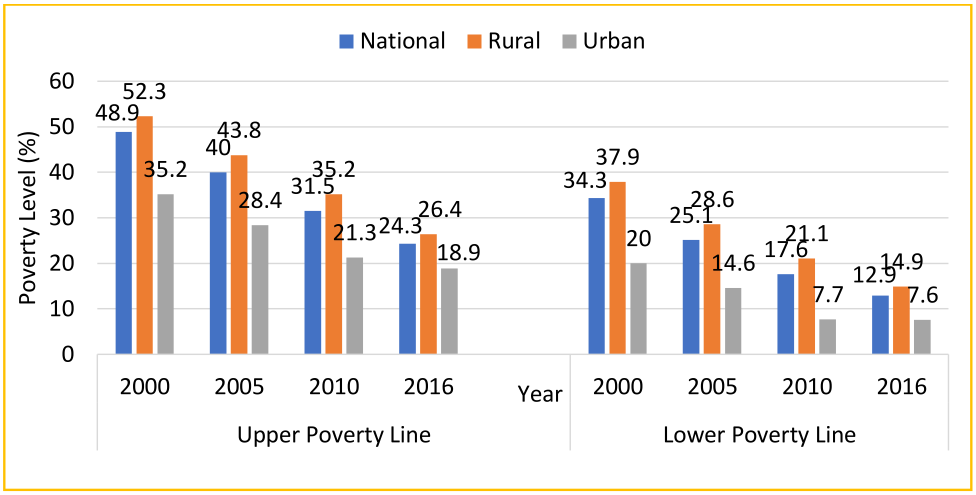

সূত্র: BBS (HIES 2005 and 2010 and 2016)

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে দ্রুততার সঙ্গে নগরায়ণ সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিপুল সংখ্যায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়া এ জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশই দারিদ্র্যের কারণে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসে। নগরে জনগোষ্ঠীর এই দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে সেখানকার জমির দাম গগনচুম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরণের ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাসযোগ্য উঁচু ভূমির নিশ্চয়তা বিধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। নগরীর অধিকাংশ দরিদ্র মানুষ বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করে থাকে, যেখানে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। বাংলাদেশের সব প্রধান শহরেই বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরের দেখা মেলে, যদিও সেগুলোর বিস্তৃতির বিষয়টি নির্ভর করে শহরের আকারের ওপর। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বস্তির অস্তিত্ব দেখা যায় ঢাকা শহরে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী। দ্বিতীয় সারির প্রধান শহরগুলোয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরের অস্তিত্ব দেখা যায়। কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাবের ফলে অর্থনীতিতে যে ধাক্কা লেগেছে, তাতে সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুরতার শিকার হয়েছে শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী (অধ্যায় ৪, খণ্ড ১)। তারা বিভিন্ন ধরণের সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিক সুরক্ষার ঘাটতি বোধ করেছে এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ভোগ করেছে কেবল উচ্চ আয়ের জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে বড় পরিসরে ও দ্রুততার সঙ্গে বর্ধমান শহরের ক্ষেত্রে ছোট শহরগুলোর তুলনায় জীবনযাত্রার মান বেশি মাত্রায় নিম্নগামী হচ্ছে। এ ধরণের পরিবর্তনশীলতা নগরীর গতানুগতিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলছে এবং নানা ধরণের সামাজিক সমস্যার উদ্ভবের শঙ্কার জন্ম দিচ্ছে।

৯.৫.৪ নগর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

নগর এলাকা, বিশেষত বড় শহরগুলোয় বন্যা ও জলাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে এ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। এর প্রভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাপক মাত্রায় নগরীর সড়কগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং টেলিযোগাযোগ সেবা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। বারংবার সংঘটিত হওয়া বন্যা ও জলাবদ্ধতার ন্যায় প্রাকৃতিক ঘটনা, নগরজীবনে মারাত্মক সর্বনাশ ডেকে আনে এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বিঘ্নিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বর্ষাকালে বন্যা, নর্দমায় জলজট ও সার্বিক জলাবদ্ধতা এক নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আর যেসব এলাকায় নগরায়ণ সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি নগরীর সার্বিক গঠন কার্যক্রমের ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে। এর পাশাপাশি নগরায়ণের ফলে এলাকার জলাশয় ও সবুজ বেষ্টনী হারিয়ে যাচ্ছে।

২০০৯ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচার (WWF) ঢাকাকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ 'মেগাসিটি' হিসেবে ঘোষণা করে। গত কয়েক বছরে এ অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমাগত নিঃসরণের কারণে বর্তমান সময় ও ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বলেই ধরে নেয়া হচ্ছে। এর ফলে নগর অঞ্চলে বন্যার তীব্রতা ও বন্যা সংঘটিত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাবে, যা মোকাবিলা করা নগর কর্তৃপক্ষের জন্য বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এ বন্যা নগরবাসীকে বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা সরবরাহকারী অবকাঠামো, যেমন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলবে।

শহরে দুই ধরণের বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এর একটি হচ্ছে নগর বন্যা, অন্যটি নদী থেকে সৃষ্ট বন্যা। নগর বন্যা বলতে নগরীর নর্দমা ব্যবস্থায় সৃষ্ট জলজট ও জলাবদ্ধতাকে বোঝায়। আর নদীর পানি উপচে শহর প্লাবিত হলে সেটাকে নদীর বন্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। এরই মধ্যে ঢাকা শহরের যেসব এলাকার উন্নয়ন সম্পন্ন হয়ে গেছে, সেখানে এ বন্যা এক বড় ধরণের উদ্বেগ এবং নগরের অধিবাসীদের মধ্যে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি ও যান চলাচল বিঘ্নিত করার মাধ্যমে এটি পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে, যা নগরবাসীর জন্য অসহ্য দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং নগরবাসীর ওপর বিষয়টির একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে বন্যা সৃষ্টির জন্য মূলত নিম্নোক্ত কারণগুলো দায়ী:

- আচ্ছাদিত এলাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে না পারার কারণে স্বল্প সময়ে পানি প্রবাহের ব্যাপক বৃদ্ধি;
- নগরীর অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন উন্নয়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগে নগরীর সম্প্রসারণের জন্য জলাশয় ভরাট করা;
- অননুমোদিত ও অবৈধ দখলদারিত্ব এবং প্রাকৃতিক নর্দমা ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন ও পানি ধারণের বিভিন্ন অববাহিকার ধারণক্ষমতা হ্রাস পাওয়া;
- আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টির কারণে উৎপন্ন হওয়া পানি নিষ্কাশনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা;
- নগরবাসীর অবিবেচনাপ্রসূত কঠিন বর্জ্য ফেলার কারণে নর্দমা ব্যবস্থা ভরাট হয়ে যাওয়া এবং স্যুয়ারেজ ও এর ক্যাচপিটগুলো পরিষ্কার করার অপর্যাপ্ততা; এবং
- আশপাশের নদীগুলোয় ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পানিপ্রবাহ।

প্রাকৃতিক নর্দমা ব্যবস্থার বিলুপ্তি নগরীতে জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। নগরীতে জনঘনত্বের দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন, নতুন আবাসিক এলাকা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিকল্পিত উপায়ে জমি ভরাট করা, বিদ্যমান নর্দমাগুলোয় অনিয়ন্ত্রিত ও এলোপাথাড়িভাবে কঠিন বর্জ্য ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা এবং হ্রদ, খাল ও নদী অবৈধ উপায়ে দখল করে স্থাপনা নির্মাণ প্রাকৃতিক উপায়ে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ।

নর্দমা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে একাধিক সংস্থা জড়িত। উদারণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা শহরে নর্দমা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যেসব সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সেগুলো হলো–ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (DSCC), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। ঢাকার নর্দমা ব্যবস্থার দুর্বল কর্মসম্পাদনের জন্য মূলত দায়ী এসব সংস্থার সক্ষমতার ঘাটতি ও সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। ঢাকা শহরের ভূ-উপরিস্থ ড্রেন ও সড়কের পাশের নির্গমণ লাইন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দুই সিটি কর্পোরেশনের ওপর ন্যস্ত। যেহেতু ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ ড্রেনের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এসব কর্তৃপক্ষর কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরি।

চট্টগ্রাম নগরীতের নর্দমা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কোনো একক প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত নয়। শহরের নর্দমা ব্যবস্থাপনার জন্য বেশকিছু বিকল্প সংস্থা রয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রধানত স্থানীয় পর্যায় ও তৃতীয় স্তরের ড্রেন নির্মাণ ও সেগুলো পরিষ্কার রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (CDA) দায়িত্ব হলো–ভূমির ব্যবহার ও অবকাঠামোর পরিকল্পনা প্রণয়ের বিষয়টির সঙ্গে ড্রেন ব্যবস্থাকে সংযুক্ত করা এবং নগরের নকশা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বিষয়টির সন্নিবেশ ঘটানো। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আরেকটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BPDB)। প্রতিষ্ঠানটি নদীর বাঁধের সঙ্গে ড্রেন ব্যবস্থার সংযোগ ঘটানোর দায়িত্বও পালন করে থাকে। চট্টগ্রামের নর্দমা ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতিই মূলত দায়ী।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি ছাড়াও নর্দমা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়নে সুশীল সমাজ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, এনজিও, ব্যক্তিখাত ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি রয়েছে। নর্দমা ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় বেশ ঘাটতি রয়েছে এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর উত্তম কর্মসম্পাদনের জন্য প্রণোদনার অভাব রয়েছে। ফলে এ কাজে উৎকর্ষ সাধনে তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ ক্রেতাবান্ধব নয় এবং ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান।

৯.৬. নগর এলাকার পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা: প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

৯.৬.১ নগর গভর্ন্যান্স ও ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান ব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে নগর উন্নয়নের কার্যক্রম প্রধানত সম্পাদিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। নগর উন্নয়নের সঙ্গে সরকারের কমপক্ষে ১৮টি মন্ত্রণালয় ও ৪২টি সংস্থা জড়িত। নিজেদের ওপর অর্পিত জাতীয় দায়িত্বেও অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলো বিভিন্ন নগর অঞ্চলে সেবা দিয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য নগরকেন্দ্র। এসব সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান হলো–গৃহায়ন ও গণপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD), জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (NHA) ও গণপূর্ত অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED); সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক অধিদপ্তর; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর; এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)। এর বাইরে কিছু মন্ত্রণালয়, যেমন–বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পানিসম্পদ অধিদপ্তর তাদের আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে।

স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ শহুরে স্থানীয় সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সবকটি বিভাগীয় সদর এবং এর বাইরে কিছু বড় বড় শহর, যেমন গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। বর্তমানে দেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৩৫টি পৌরসভা রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও কক্সবাজারের মতো শহরের জন্য পৃথক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ শহরের স্থানীয় নগর ও অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আবাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ও শিল্পায়ন কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ কর্তৃপক্ষগুলো উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগেরও ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

সারণি ৯.৮: নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের ক্রমবিন্যাস

মহানগর	উদাহরণ: ঢাকা মহানগর এলাকা
বিভাগীয় সদর ও বড় শহরগুলোর সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা
পৌরসভা	বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা ৩৩৫টি
নিজস্ব রোজগারের ওপর নির্ভর করে শ্রেণিবিন্যাস	রোজগারের পরিধি কমপক্ষে
‘ক’ শ্রেণির পৌরসভা	৮০ লাখ (আট মিলিয়ন) টাকা বা তদূর্ধ্ব
‘খ’ শ্রেণির পৌরসভা	৪০ লাখ (চার মিলিয়ন) থেকে ৮০ লাখ (আট মিলিয়ন) টাকার মধ্যে নিজস্ব আয়
‘গ’ শ্রেণির পৌরসভা	২০ লাখ (দুই মিলিয়ন) থেকে ৪০ লাখ (চার মিলিয়ন) টাকার মধ্যে নিজস্ব আয়

সূত্র: বিবিএস ও স্থানীয় সরকার বিভাগ

কিছু কিছু বিভাগীয় শহরে নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট বিশেষ সেবা দেয়ার লক্ষ্যেও পৃথক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন–পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা), বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি। ‘পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) আইন, ১৯৯৬’ সরকারকে ওয়াসা প্রতিষ্ঠা এবং ওয়াসার মাধ্যমে পানি সরবরাহ, নর্দমা ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনাসহ পানি-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বর্তমানে দেশে চারটি ওয়াসা রয়েছে। এগুলো হলো–ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা, খুলনা ওয়াসা ও রাজশাহী ওয়াসা। ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) প্রধানত বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অন্যদিকে গ্যাস সরবরাহে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সকল সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯.৬.২ নগর গভর্ন্যান্স ও ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণমূলক, প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামো

এর আগে সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার উভয় প্রতিষ্ঠানই দুটি মৌলিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন; এগুলো হলো–অপর্যাপ্ত প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন ও জবাবদিহিতা এবং আর্থিক স্বায়ত্বশাসনের সীমাবদ্ধতা। নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর পরিষেবা সরবরাহের

সক্ষমতা বাড়াতেও শক্তিশালী বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতির কারণে এসব প্রতিষ্ঠান ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

নগরায়ণের চ্যালেঞ্জের বিশালত্ব ও এর দীর্ঘমেয়াদি বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এও তুলে ধরা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় নগরায়ণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর রূপরেখার প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছিল। পরিকল্পনাটিতে ঢাকাকেন্দ্রিক নগরায়ণের পরিবর্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে নগরকেন্দ্রের বিকাশ ঘটানোর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে নগর গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু পরিবর্তন আনয়নের বিষয়ে এটিতে সুপারিশ করা হয়েছিল। ভূমির ব্যবহার ও বরাদ্দ প্রাক্কলনের বিষয়েও এটিতে সুপারিশ করা হয়েছিল। পরিকল্পনাটিতে নগরীর ভৌত পরিবেশের উন্নয়ন বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই উপায়ে নগর পরিষেবাসমূহ সম্প্রসারণের বিষয়টিও আলোকপাত করা হয়েছিলো এবং এসবগুলোকে একত্র করে ২০১০-এ প্রচলিত উপায় থেকে ভিন্নতর উপায়ে এ পরিকল্পনায় একটি সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ কৌশল বর্ণনা করা হয়েছিল। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এর নগরায়ণ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল।

নগরায়ণের ক্ষেত্রে এই দূরদর্শী পদ্ধতির পাশাপাশি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এ উল্লিখিত নগরকৌশল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা এগুলোর বাস্তবায়নে কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তি বিঘ্নিত করেছে। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর পরিষেবা প্রদান সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে বেশ জোর দেয়া হয়েছিল। ফলে নগরকেন্দ্রিক অবকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়েছে। তবে অসম্পন্ন চাহিদার ব্যাপ্তি এবং নগরায়ণের ধারাবাহিক দ্রুত প্রবৃদ্ধি সেই বিনিয়োগের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়নে শক্তিশালী অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়ে যে রূপরেখা দেয়া হয়েছিল, তা খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারগুলোর সেবা প্রদানের কর্মপরিধি খুবই সীমিত এবং তাদের প্রদত্ত একই সেবা কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য সংস্থাগুলোও সরবরাহ করে থাকে। আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণও বাস্তব রূপ পায়নি। ফলে নগরীর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বহুলাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল থাকে। এসব সংস্থার নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহের হার খুবই কম (সম্মিলিতভাবে দেশের মোট জিডিপির ০.১৬ শতাংশ), যা দিয়ে স্থানীয় সরকারগুলোর বর্তমান ব্যয়ভার মেটানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অর্থবছর ২০১০ থেকে ২০১৮-এর মধ্যে ঢাকার প্রাধান্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারসাম্যহীন নগরায়ণের বিষয়টি নতুন করে আরও গতি পেয়েছে।

নগরায়ণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নানামাত্রিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট আইনি দায়িত্ব অর্পণ, অন্য সংস্থার সঙ্গে কার্যক্রমের দ্বৈততা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, সক্ষমতার অভাব, দুর্বল গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা এবং অর্থায়নের দুর্বলতা।

আইনি কাঠামো

দায়িত্বের যথাযথ বণ্টন ও অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারগুলোর ওপর খুব সীমিতসংখ্যক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এমনকি অর্পিত দায়িত্বসমূহের সীমারেখাও অস্পষ্ট এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাত্ত্বিকভাবে স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক এবং এগুলো নির্বাচনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই সীমিত স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণও খুবই সীমিত। সংস্থাগুলোর খুবই সীমিত পর্যায়ের আর্থিক স্বায়ত্তশাসন রয়েছে, ফলে অর্থের সংস্থানের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে বহুলাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

বিভ্রান্তিকর দ্বৈততাপূর্ণ দায়িত্ব ভার

কমপক্ষে ৯টি বিশেষায়িত সংস্থা এবং কয়েকটি মন্ত্রণালয় নগর অঞ্চলে বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহ করে থাকে। এসব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় নেই বললেই চলে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের অনেক সেবা অন্যান্য সংস্থার সেবার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এর বাইরে রয়েছে সক্ষমতার অভাব ও আর্থিক সীমাবদ্ধতা। ফলে সেবা সরবরাহের মাত্রা খুবই অপর্যাপ্ত এবং জবাবদিহিতাও খুব দুর্বল।

সক্ষমতার অভাব

আর্থিক সম্পদের অভাবের কারণে প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর সক্ষমতার অভাব রয়েছে। তবে সিটি কর্পোরেশনগুলো পৌরসভাগুলোর তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী। কিন্তু সাধারণ বিচারে উভয়ক্ষেত্রেই সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে গুণগত মানসম্পন্ন ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় জনবল নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয় না, যা নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা সেবাসমূহের গুণগত ও পরিমাণগত সীমাবদ্ধতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

গভর্ন্যান্সের ব্যবস্থার সমস্যা

নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো নির্বাচিত ইউনিট হলেও সেগুলোর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব খুবই সীমিত। বাস্তবে এসব সরকারের প্রতিনিধিরা যেসব রাজনৈতিক দলের অনুসারী, সেসব রাজনৈতিক দলের হয়ে বর্ধিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র। যে নগরীর স্থানীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক দলের অনুসারী থাকে, সে স্থানীয় সরকার কেন্দ্র থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে। স্বায়ত্তশাসনের ঘাটতি থাকায় কর্মী নির্বাচন ও ঠিকাদারী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রায়ই স্বজনপ্রীতির সুযোগ থেকে যায়। জেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কর্মী নিযুক্ত থাকেন, প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রায়ই তার সঙ্গে স্থানীয় সরকারের সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়।

দুর্বল অর্থায়ন ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের অনুপস্থিতি

সম্ভবত স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে নিজস্ব সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বল আর্থিক স্বায়ত্তশাসন। আইনি কাঠামোর অধীনে নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে:

(ক) সম্পদ কর;

(খ) নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের মালিকানাধীন বাজার থেকে ভাড়া আদায়;

(গ) ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও অযান্ত্রিক পরিবহনকে লাইসেন্স প্রদান ফি;

(ঘ) বিজ্ঞাপন, সিনেমা ও বিনোদন থেকে প্রাপ্ত ফি;

(ঙ) সম্পত্তি বিক্রয়; এবং

(চ) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ও ঋণ।

তবে বাস্তবতা হলো, এসব খাত থেকে অর্থ প্রাপ্তির পরিমাণ খুবই কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় গড় সম্পদ আহরণের পরিমাণ খুবই অপর্যাপ্ত। একমাত্র সম্পদকর ব্যতীত অন্যান্য সব কর কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে চলে যায়। আর আইনি কাঠামোর আওতায় নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকারগুলোকে অস্থায়ী ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো নীতিমালাও নেই। সপ্তম অধ্যায়ে যেমনটি বলা হয়েছে, নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬১ শতাংশেরই জোগান আসে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে; বিভিন্ন ধরণের মাশুল ও ফি থেকে তারা পায় নিজস্ব বাজেটের ২৫ শতাংশ; বিভিন্ন ধরণের কর থেকে আসে ১৪ শতাংশ; এবং সংস্থাগুলোর জন্য খোলাবাজার থেকে ঋণ গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকারগুলোর ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নেই, তাই সরকারের তরফ থেকে পাওয়া তাদের এসব ঋণ অপরিশোধিতই থেকে যায়। স্থানীয় সরকারগুলোর নিজস্ব রাজস্বের সবচেয়ে বড় খাত সম্পদ কর। কিন্তু এ কর আরোপের ক্ষেত্রে সম্পদের দাম নির্ধারণ বা সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কোনো সুযোগ তাদের নেই। তাছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে করারোপের এখতিয়ারও তাদের নেই।

নগর এজেন্ডা স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। নগর গভর্ন্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি উচ্চস্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিশেষত নগর এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, যেন স্থানীয় সরকারের ওপর অর্পিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য সংস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক (ওভারল্যাপ) পরিস্থিতি এড়ানো যায় এবং আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন ধরণের উত্তম চর্চা থেকে বাংলাদেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। নগর স্থানীয় সরকারের উন্নয়নের বিষয়ে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-তে সুনির্দিষ্ট রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক কৌশলগত কাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর গভর্ন্যান্সের কৌশল নির্ধারণে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হবে।

৯.৭ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নগর খাতের অগ্রগতি/পর্যালোচনা

৯.৭.১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়: সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে সাতটি হলো ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণ প্রকল্প (৮৪৯টি ফ্ল্যাট তৈরি সম্পন্ন হয়েছে) এবং বাকি আটটি প্লট প্রকল্প (এক হাজার ৬০৫টি প্লট)। এসব ফ্ল্যাট ও প্লটের সবগুলোই বরাদ্দ পাওয়া ব্যক্তিদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সবার জন্য সহজলভ্য আবাসন নিশ্চিত করা এবং আবাসন সমস্যার তীব্রতা প্রশমনে বর্তমানে আরও ১৫টি ফ্ল্যাট ও ১৬টি প্লট প্রকল্প (৭২৮৬টি ফ্ল্যাট ও ২৫৫৮টি প্লট) চলমান রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন, জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণে গণপূর্ত অধিদপ্তরের (পিডব্লিউডি) অবদান অনস্বীকার্য। পিডব্লিউডির দায়িত্ব হচ্ছে সরকারি ভবন নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কী পয়েন্ট ইন্সটলেশন (কেপিআই) ভুক্ত স্থাপনা প্রতিষ্ঠা। ঢাকা শহরে সরকারি কর্মকর্মতা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে পিডব্লিউডি এ পর্যন্ত ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যেগুলোর আওতায় ৩০১২টি ফ্ল্যাট সুবিধাভোগীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে করে সরকারি কর্মকর্তাদের মোট আবাসন সুবিধা ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতে ১৭টি প্রকল্পের অধীনে আরও ৯ হাজার ৭৩৪টি ফ্ল্যাটের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবনির্মিত কিছু ভবনে পিডব্লিউডি জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ ও সৌর প্যানেল স্থাপন, নর্দমা পরিশোধন প্লান্ট (STP) স্থাপন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর বাইরে আধুনিক সুবিধার সম্মিলন ঘটিয়ে চট্টগ্রাম শহরে দুটি উদ্যান (১২ একর) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আরও ২১০ একর জায়গা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সময়কালে ২.৫১ লাখ বর্গফুট অফিস স্পেস, মিলনায়তন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ মিলিয়ন বর্গমিটারের সমপরিমাণ সরকারি অফিস ও সরকারি বাসভবনের সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

কয়েক বছর ধরে পিডব্লিউডি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগের অভিঘাত-সহনশীল কাঠামো নির্মাণ এবং এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করে চলেছে। বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে ঘাতসহনশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিডব্লিউডি জাপানের সহায়তায় সিএনসিআরপি নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এটির আওতায় পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে শক্তিশালীকরণে কাঠামো শক্তিশালীকরণ (রেট্রোফিটিং) প্রক্রিয়া (ভবনের বিদ্যমান পিলারগুলোর পাশে রড দিয়ে নতুন করে ঢালাই দিয়ে মজবুতকরণ) এবং ভূমিকম্প সহনশীলন নতুন ভবন নির্মাণে ছয়টি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ ফায়ার স্টেশন ভবন মজবুতকরণে এ প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পুরনো ভঙ্গুর হাসপাতাল ভবন, অফিস ভবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোয় পিডব্লিউডির পর্যবেক্ষণে রেট্রোফিটিং করা হচ্ছে।

সরকারি আবাসন পরিদপ্তর

ঢাকা শহরে বাড়ি বরাদ্দকরণসহ সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য সব ধরণের সেবা ও তথ্য ই-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) ১২৪৯২০৫ বর্গফুট পরিমাণ নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২ কোটি ৩০ লাখ (২৩ মিলিয়ন) বর্গমিটার সরকারি আবাসিক ভবনের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়ে দুটি পরিবেশবান্ধব নর্দমা পরিশোধন প্লান্ট নির্মিত হয়েছে এবং পাঁচটি প্রকল্পের অধীনে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরির জন্য সিএনসিআরপি নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় প্রশিক্ষণ একাডেমি ও পরীক্ষাগার ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪,৯৯৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এই একাডেমিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২৫০টি কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, ৬৫০ একর উদ্যান/খেলার মাঠ সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে ৬০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

স্থাপত্য অধিদপ্তর

স্থাপত্য অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩২টি জেলায় বিচারকদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভবন নির্মাণ প্রকল্প, কড়াইল মৌজায় আইটি ভিলেজ নির্মাণ প্রকল্প এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন ধরণের চার শতাধিক স্থাপত্য নকশা সরবরাহ করেছে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংগতি রেখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) বিভাগীয় শহর, জেলাশহর এবং পৌরসভা ও গ্রামীণ এলাকাবেষ্টিত উপজেলা শহরের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২০২০ সাল নাগাদ ইউডিডি ২৮টি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। এর তিনটি বিভাগীয় শহর ও ২৫টি উপজেলা শহর রয়েছে। এ ২৫টির মধ্যে চারটি জেলাসদর ও ১৯টি পৌরসভা রয়েছে। পরিকল্পনার অধিক্ষেত্র এলাকায় মোট জনসংখ্যা রয়েছে ৭২,৫৮,০১৪ জন। ইউডিডির প্রণয়ন করা পরিকল্পনার আওতায় এ পর্যন্ত ৯৮৮১.৪৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যা দেশের মোট আয়তনের ৬.৭০ শতাংশ।

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক): ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) (২০১৬-২০৩৫) প্রণীত হয়েছে এবং ড্যাপের মধ্যে ট্রানজিট ওরিয়েনটেড ডেভেলপমেন্টের (TOD) সংযুক্তি ঘটানো হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকাল্পনাকালে রাজউক ১৭,০০০ আবাসিক প্লট হস্তান্তর ও এক হাজার ১০১টি প্লটের ইজারা নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। উত্তরায় রাজউক ৪৩৬৬টি ফ্ল্যাট সুবিধাভোগীদের কাছে হস্তান্তর করেছে এবং গুলশানে একটি ১০তলা ভবনে ২৭টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া পূর্বাচল, উত্তরা তৃতীয় ধাপ, ঝিলমিল, হাতিরঝিল এবং গুলশান-বনানী-বারিধারা হ্রদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় রাজউক ৪৬২.৬ কিলোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৬০টি সেতু নির্মাণ, দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণ, চারটি ওভারপাস নির্মাণ, দুটি ইউ-লুপ নির্মাণ, ৭১ কিলোমিটার হ্রদ নির্মাণ, ২২.৩৯ কিলোমিটার হাঁটার রাস্তা (ওয়াকওয়ে) নির্মাণ, ১০টি প্রধান নর্দমা ডাইভারশন লাইন নির্মাণসহ অন্যান্য সৌন্দর্যবর্ধন ও সামাজিক কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে। এগুলোর বাইরেও উত্তরা হ্রদ উন্নয়ন, কুড়িল পূর্বাচল ১০০ ফুট খাল উন্নয়ন এবং মাদানি এভিনিউ থেকে বালু নদী পর্যন্ত সড়ক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA): এ সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসিক এলাকায় তিন হাজার ১৮০টি প্লট হস্তান্তর সম্পন্ন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৫০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিডিএ ১১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের কদমতলী ফ্লাইওভার, ১৩৩১.৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার ও ৬.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মুরাদপুর ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। এছাড়া ডাবলমুরিং থানা থেকে কদমতলির মধ্যে দেওয়ানহাট জংশনসংলগ্ন ৫৬০ মিটার দীর্ঘ ও ৮.৫ মিটার প্রশস্ততাবিশিষ্ট একটি আরসিসি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সিডিএ'র মেহেদীবাগ অফিসার্স কোয়ার্টারে কর্মকর্তাদের জন্য ২৪টি ফ্ল্যাটের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র বিতরণের কার্যক্রমকে 'ফাস্টট্র্যাক' কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রযাত্রা শুরু করেছিল। সংস্থাটি শিরোমণি শিল্পাঞ্চলে ৭.৫২ কিলোমিটার সড়ক পুনর্নির্মাণ এবং ৭৩০টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লটের উন্নয়ন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে ৫০০ প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RDA): রাজশাহী মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০০৪-২০২৪-এর সুপারিশ মোতাবেক শহরের টেকসই পরিবহন অবকাঠামো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরডিএ তিনটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যার মাধ্যমে নগরীর সড়ক নেটওয়ার্ক ও নর্দমা ব্যবস্থায় ৮.৫০ কিলোমিটার নতুন সড়ক এবং প্রায় ১.০০ কিলোমিটার চার লেন ওভারপাস যুক্ত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম কোনো শহরে সকল পরিষেবাকে ভূগর্ভস্থ সাধারণ নালির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন রাজশাহী শহরের যানজট সমস্যা কমিয়ে উত্তরের প্রান্তিক এলাকার সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান আবাসন চাহিদা মেটাতে আরডিএ দুটি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকার বিকাশ ঘটিয়েছে। এগুলো হলো বনলতা আবাসিক এলাকা ও বারনই আবাসিক এলাকা। এসব আবাসিক এলাকায় বরাদ্দপ্রাপ্তদের মধ্যে ৪৯৩টি প্লট বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ২০০৪-২০২৪-এর আওতায় গৃহীত সংশোধিত প্রকল্পের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা ও

উন্নয়ন সেল গঠন এবং শহরের ভৌত আয়তনের মধ্যকার বিভিন্ন স্থাপনার উপাত্ত হালনাগাদ করার মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কক্সবাজার শহরের উন্নয়নের বাতিঘর। শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্থানে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য ও এলইডি লাইট স্থাপন করেছে। সবুজায়ন প্রকল্পের আওতায় শহরজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের প্রায় ১০ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে। লাল কাঁকড়া, সামুদ্রিক কচ্ছপ, ডলফিন ও সামুদ্রিক প্রজাতির লতাপাতাসহ সার্বিক জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুরক্ষা বেড়া স্থাপন করা হয়েছে।

গৃহায়ন ও ভবন গবেষণা ইনস্টিটিউট

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) গৃহভবনের নির্মাণসামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের বিষয়ে ছয়টি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়। এসব গবেষণার আওতায় এক হাজার ৫০০ নির্মাণসামগ্রী ও ১২ হাজার স্থাপনার ভর বহন সক্ষমতা নিরীক্ষা করা হয় এবং গৃহায়ন ও নির্মাণের বিষয়ে এক হাজার ৬০০ ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইনস্টিটিউটের প্রবর্তনকৃত নির্মাণসামগ্রীর অংশ হিসেবে ৩০ হাজার বিকল্প ইট এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী তৈরি করা হয়েছে।

ভূমিকম্পপ্রবণ জেলাগুলো থেকে এ পর্যন্ত দুই হাজার ৩০০ নির্মাণকর্মীকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো সরঞ্জাম তৈরি করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো ভূমিকম্পবিষয়ক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

৯.৭.২ স্থানীয় সরকার বিভাগ (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়): সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

সচিবালয়

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন কার্যকর করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ৮০ হাজার ৯২২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা)

ঢাকা ওয়াসা: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে, যেটির দৈনিক পানি পরিশোধন সক্ষমতা ২২.৫০ কোটি লিটার। এ সময়ের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার দৈনিক পানি পরিশোধন সক্ষমতা ২৪২ কোটি লিটারে উন্নীত হয়েছে। ১৩৬৬.১৬ কিলোমিটার পানি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং ২২৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এর বাইরে ১১ কিলোমিটার বৃহৎ পানি নিষ্কাশন লাইন নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা হয়েছে। পানির সিস্টেম লস ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা: এই পরিকল্পনা মেয়াদে ৪৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও ১৪টি পানির ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পানির গুণগত মান ঠিক রাখতে ভোক্তা পর্যায়ের এক হাজার ৮৫০টি নমুনা ও গভীর নলকূপ পর্যায়ের ৩৬০টি স্থান থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ছয় হাজার ৯৭৪টি নতুন আবাসনে পানি সংযোগ দেয়া হয়েছে এবং পানি পরিষ্কারকরণ ও পাইপলাইনের আওতা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। রাজস্ব আহরণ-বহির্ভূত পানি সরবরাহ ২৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৬-১৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ১৪৮ কিলোমিটার নতুন পানি সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দুটি ভূগর্ভস্থ ও একটি ভূ-উপরিস্থ জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে।

খুলনা ওয়াসা: খুলনা শহরে পানি সরবরাহ সেবার উন্নয়ন ঘটাতে পানি পরিশোধনাগারের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এটি নগরবাসীকে দৈনিক ৬.৭৫ মিলিয়ন লিটার নিরাপদ পানি সরবরাহ করে চলেছে। এছাড়া ২৫.০০ কিলোমিটার পানি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাঁচ হাজার নতুন সংযোগ দেয়া হয়েছে। পানির বিল সংগ্রহের জন্য ‘ফ্লো মিটার’ প্রচলন করা হয়েছে।

রাজশাহী ওয়াসা: রাজশাহী ওয়াসার আওতাভুক্ত এলাকায় ১১৫ কিলোমিটার পানি সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, ২৬টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও মোটরপাম্প-সংবলিত ২৮টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দুটি ভ্রাম্যমাণ পানির ট্যাংকার (ট্রাকে বহনযোগ্য) ও ২০টি ভ্রাম্যমাণ জেনারেটর সংযোজন করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) একটি ফ্লাইওভার, ৬৮২.২৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৫৬১৮ কিলোমিটার নর্দমা খনন, ৪২০ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ, ১৪টি ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ, ১৩টি ইন্টারসেকশন ট্রাফিক সিগন্যাল নির্মাণ, ৪৮টি ট্রাফিক সিগনালে সৌরভিত্তিক সময় গণনা ঘড়ি এবং স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। এর বাইরে ১১ হাজার ৭৮৭টি সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। একটি মহিলা মহাবিদ্যালয়, ১০টি সুইপার কোয়ার্টার ও ১৫টি কমিউনিটি সেন্টার, একটি মাতৃসদন ও একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন: ৪৯০ কিলোমিটার সড়ক ও ৩৪ কিলোমিটার ড্রেনের উন্নয়নকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০ কিলোমিটার ড্রেনের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি ৪০০ কিলোমিটার সড়কে বাতি স্থাপন এবং আরও ৪০০ কিলোমিটারের সড়কবাতির রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর বাইরে ৩৫টি বিদ্যালয়, সুইপার কলোনি ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ, ৯টি মাতৃসদন, ৭৭টি সেতু ও কালভার্ট এবং ৩৩টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন: ২৯০ কিলোমিটার সড়ক, ৮৫.২৪ কিলোমিটার ড্রেন, ২৪.৪ কিলোমিটার ফুটপাথ, ৭৬ কিলোমিটার ড্রেন ও তিনটি আধুনিক মার্কেটের নির্মাণ ও উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২৫ কিলোমিটার সড়কে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন: ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৪৫ কিলোমিটার সড়ক, ৩২৮.৬০ কিলোমিটার ড্রেন, এক লাখ ৩০ হাজার জ্বালানিসাশ্রয়ী বাতি স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত ভাগাড় নির্মাণ, নগরীর সৌন্দর্যবর্ধন ও ফোয়ারা স্থাপন এবং আটটি ওয়ার্ডের নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। স্যনিটেশন পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে ৭৯০টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন: এ পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) ৭৯ কিলোমিটার সড়ক, ৮৩ কিলোমিটার ড্রেন, ১১ কিলোমিটার খাল ও ৭.৫ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৭ কিলোমিটার সড়কে সড়কবাতি স্থাপন ও ১০০টি লোড সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এর বাইরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন: পরিকল্পনা মেয়াদে (২০১৮ সাল পর্যন্ত) ৪৫ কিলোমিটার সড়কের পাশাপাশি ২৮.৪০ কিলোমিটার ড্রেন মেরামত ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২৬ কিলোমিটার আড়াআড়ি ড্রেন (ক্রস ড্রেন) নির্মাণ করা হয়েছে। ১০টি ওয়ার্ড কার্যালয়ও নির্মাণ করা হয়েছে। এর বাইরে বস্তি এলাকায় এক হাজার ২৮০টি স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন: ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৯৮.৪৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ ও ২১.৫০ কিলোমিটার সড়কের মেরামত ও উন্নয়ন সম্পন্ন করার পাশাপাশি ৬৯.২৪ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ১৩৫.৯৭ কিলোমিটার সড়কে সড়কবাতি স্থাপন এবং ১৯.৬৮ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি বহুতল মার্কেট কাম আবাসিক ভবন এবং বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৩২ লাখ ১২ হাজার টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন: ৫৫ কিলোমিটার সড়ক, ৩৬ কিলোমিটার ড্রেন, ৯.৫ কিলোমিটার ফুটপাত নির্মাণ এবং চারটি মার্কেটের উন্নয়ন করা হয়েছে। আবর্জনা পরিবহনের জন্য ছয়টি ট্রাক কেনা হয়েছে এবং ১৮ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে। পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্যবর্ধন কর্মসূচির অংশ হিসেবে 88টি ফোয়ারা, ৩৯টি স্থানে সড়কবাতি ও বিভিন্ন বাগানে দৃষ্টিনন্দন বাতি স্থাপন করা হয়েছে এবং সড়কের পাশের খালি জায়গায় বাগান করা হয়েছে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন: গত তিন বছরে ১৮ কিলোমিটার ড্রেন ও ৮০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ২৮টি গভীর নলকূপ, ৫০ কিলোমিটার পানির পাইপলাইন ও ১০ হাজার সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু ৬৫টি কালভার্ট, একটি বিদ্যালয়, একটি মসজিদ ও দুটি কবরস্থান নির্মাণ করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন: রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ১৬১ কিলোমিটার সড়কের মেরামত ও উন্নয়ন, ৫১ কিলোমিটার সিসি সড়ক ও ১৮.০০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ ও বিভিন্ন বাজার এলাকায় ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)

১৯৯০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে এলজিইডি পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। পাশাপাশি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন, বিশেষত এসব সংস্থার আয় বৃদ্ধি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার নকশা প্রণয়ন করে চলেছে। পানি সরবরাহ, ড্রেন ব্যবস্থা, স্যানিটেশন, শহুরে সড়ক এবং শহুরে বাজারগুলোর উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক নগর অবকাঠামো উন্নয়নে সংস্থাটি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নেও নানা প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৯টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৮টি পৌরসভায় এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় পাঁচ কোটি (৫০ মিলিয়ন) মানুষ উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে নগর এলাকার অর্থনীতি, পরিবেশ ও জীবিকার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এতে করে সার্বিক নগর অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নগর গভর্ন্যান্স কাঠামোর অপর্যাপ্ততার কারণে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন কৌশলের একটি ইনপুট হিসেবে সংস্থাটি অতীতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব ভালো উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছিল এবং যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল, সে বিষয়ে একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

ক. নগরীতে প্রবেশগম্যতা ও পরিবহন

দ্রুত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট অবকাঠামোর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পৌরসভাগুলো ক্রমান্বয়ে এর আশপাশের গ্রামগুলোয় সেবা সম্প্রসারণ করে চলেছে। ফলে সংলগ্ন গ্রামগুলোয় পরিকল্পিত ও বর্ধিত সংখ্যায় অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রয়োজন যথ াযথভাবে মোটানো সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নগর অবকাঠামোতে নর্দমা, সড়ক, ফুটপাথ, সড়ক বিভাজক ও সড়কবাতির অন্তর্ভুক্তি থাকা আবশ্যক। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমজিএসপি) এর আওতায় ২৬টি পৌরসভায় অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার উদাহরণ রয়েছে। এসব পৌর এলাকায় সড়কের সঙ্গে নর্দমা, সড়ক বিভাজক ও ফুটপাতের সমন্বয় ঘটেছে। এখানে সড়কগুলো কমপক্ষে ছয় মিটার প্রশস্ততাবিশিষ্ট, যা বর্তমান সময় ও ভবিষ্যতের যানবাহনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

খ. নগরের নর্দমা ব্যবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গত কয়েক বছর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় ভারী বর্ষণ প্রত্যক্ষ করেছে। এতে করে বর্ষা মৌসুমে অধিকাংশ পৌর এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা একটি নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এতে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাবদ্ধতার কারণে সড়ক ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে যেসব উত্তম চর্চা অনুসরণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- নর্দমা নির্মাণ মহাপরিকল্পনা ও নর্দমার শুরুর স্থান থেকে প্রাকৃতিক জলাশয়ে পতিত হওয়ার স্থান পর্যন্ত পুরো নেটওয়ার্কটির বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে ড্রেন নির্মাণ।
- বর্ষাকালে নগর এলাকার যেসব সড়ক জলমগ্ন থাকে, সেখানে কংক্রিট অথবা কংক্রিটের ব্লক দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সমাধানটি যদিও ভালো, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ কৌশল অথবা কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন জনবলের ঘাটতির কারণে অনেক পৌর এলাকায়ই এ ধরণের সড়ক টেকসই হয় না। ফলে এ বিষয়ে ভালো মানের গবেষণা হওয়া প্রয়োজন, যার মাধ্যমে কংক্রিট অথবা ব্লকের সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে নকশাসহ অন্য দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা যাবে।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- উপকূলীয় জেলাগুলোর নর্দমা ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জোয়ার-ভাটার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। প্রতিটি স্থানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে নকশা প্রণয়ন করা উচিত। ওই এলাকার কারিগরি কর্মীদের জন্য গতানুগতিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ড্রেন ব্যবস্থার জন্য গতানুগতিক নকশা প্রণয়ন উত্তম চর্চা হতে পারে না।

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সঙ্গে যদি নর্দমা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় না ঘটে, তাহলে নগর এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুব একটা কার্যকর হয় না। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না হলে তা পয়ঃনিষ্কাশন লাইনে জলজট সৃষ্টি করবে।

গ. নগরীর নাগরিক সুবিধাসমূহ: উদ্যান, জলাশয়কেন্দ্রিক উদ্যান, শিশুপার্ক, খেলার মাঠ, খোলা চত্বর

পার্ক বা উদ্যানগুলো শহরের ফুসফুস হিসেবে কাজ করে, কারণ এগুলো নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন বায়ু সরবরাহ করে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেশ কয়েকটি পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব উত্তম চর্চার উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

- এলজিইডি, বিআইডব্লিউটিএ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক গৃহীত নদী ও খাল খনন প্রকল্পগুলোর আওতায় জলাশয়কেন্দ্রিক (ওয়াটারফ্রন্ট) উদ্যান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এমনটি করা হলে এ ধরণের প্রকল্পে আরও বেশি হারে মূল্য সংযোজন সংঘটিত হবে।
- সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে এলজিইডি নদীর পাড়গুলোতে (অ্যাপ্রোচ সড়ক তৈরি অথবা নিচের অংশের ভায়াডাক্ট নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ করা জমি) জলাশয়কেন্দ্রিক উদ্যান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।
- শিশুপার্কের ব্যবস্থাপনা নিয়ে পরিকল্পনার পর্যায়েই বেশ দুশ্চিন্তা ছিল। তবে ইজারা ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌরসভাগুলো এটি কার্যকরভাবে পরিচালনায় সক্ষম হয়েছে। এতে জনমনে সন্তুষ্টির পাশাপাশি এসব পার্কে একটি বড়সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- নাগরিকদের জন্য খোলা চত্বর ও পার্কের উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জায়গার স্বল্পতা। উন্নত দেশগুলোয় নদীতীরের খোলা জায়গাগুলোকে পার্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে নদীর পাড়গুলো হয় দখলদারিত্বের কবলে পড়ে আছে, নতুবা সেখানে অবৈধভাবে বিভিন্ন ব্যবসা বা স্থাপনা গড়ে উঠেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও বিআইডব্লিউটিএ এসব নদীর পাড় দখলমুক্ত করে সরকারি জমি উদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এলজিইডিও নদীর পাড় দখলমুক্ত করে পুনরুদ্ধারে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সেখানে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় নানা উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিতে পারে।
- নগর অঞ্চলে পার্ক ও খেলার মাঠ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তীব্র জায়গা সংকট। বিদ্যালয়ের মাঠ এবং অন্যান্য সহজপ্রাপ্য খালি জায়গাগুলোও ছোট পার্ক ও খেলার মাঠ হিসেবে তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া পৌর কর্তৃপক্ষ বিনোদনমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য সামর্থ্যবান নাগরিকদের জমি দান করার বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারে।

ঘ. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখন যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে এগুলো সংগ্রহ ও ভাগাড়ে স্তূপ করা হয়, তা বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও পরিবেশবান্ধব 'সম্পূর্ণ সমাধান পদ্ধতি'র (Complete Solution Method) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ সমাধান পদ্ধতি হচ্ছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যেটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র, কমপোস্ট প্লান্ট, জৈবগ্যাস প্লান্ট, সুনিয়ন্ত্রিত ভাগাড়, পয়োবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। চারটি পৌর শহরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ সমাধান পদ্ধতি প্রয়োগের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এলজিইডি। যশোরে একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট সফলভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ২০২১ সালের জুনের মধ্যে অন্য তিনটি পৌর এলাকায়ও সম্পূর্ণ সমাধান পদ্ধতির প্রচলন শুরু হবে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট যে সকল প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার এ ধারণা সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঙ. নগর গভর্ন্যান্স

নগর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কিত। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান ও গতিশীল কার্যক্রম এ বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যা নাগরিকদের কার্যকরভাবে নানা ধরণের পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সংস্থাটির সক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভাগুলোয় নগর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রকল্পে গৃহীত উত্তম চর্চাগুলো চলমান রাখা খুবই চ্যালেঞ্জিং। তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কৌশল হতে পারে নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনায় মূলধারার পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো।

শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি (TLCC)

নগরের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা জোরদারকরণে পৌরসভাগুলোয় শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এলজিইডির প্রকল্পগুলোয় নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এটি ছিল নগর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার অংশ। তবে সকল পৌরসভায় টিএলসিসি গঠিত হলেও উন্নয়ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকায় ভিন্নতা পরিলিক্ষিত হয় এবং এ কাজটি অনেকটা নির্ভর করে মেয়রের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

রাজস্ব আহরণ ও স্বনির্ভরতা

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো বহুলাংশে সরকারি বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। নিজস্ব সম্পদ আহরণে সাধারণত তারা অনেক পিছিয়ে। এক্ষেত্রে উত্তম চর্চার তেমন কোনো উদাহরণ নেই বললেই চলে। সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের সুপারিশ অনুসারে এই জায়গাটিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি বড় ধরণের ধাক্কা দেয়ার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে।

পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়ন

(ক) আইসিটিভিত্তিক কার্যালয় ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের ভিত্তিতে পানির বিল ও বিভিন্ন ধরণের কর সংগ্রহের জন্য বেশকিছু সফটওয়্যারের বিকাশ ঘটানো হয়েছে। এসব সফটওয়্যার পরিচালনায় সক্ষম করে তুলতে পৌরসভার কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কর নির্ধারণ, স্বচ্ছতার উন্নয়ন, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কার্যালয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইসিটিভিত্তিক কার্যালয় ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(খ) পৌরসভার কর্মীদের প্রশিক্ষণ

পৌরসভার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এলজিইডির ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী, এলজিইডি প্রতিবছর ১.২০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেট এবং ২.৫ কোটি টাকার প্রকল্প (উন্নয়ন) বাজেটের মাধ্যমে বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাঁচ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। একটি সমন্বিত উপায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকল্পে এলজিইডির নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটে আরও বেশিসংখ্যক জনবল নিয়োগের পাশাপাশি এর সার্বিক সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

(গ) ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনা

একটি সমন্বিত, টেকসই ও পরিকল্পিত উপায়ে পৌরসভাগুলোর উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এ পর্যন্ত ২৫৬টি পৌরসভার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বিভিন্ন পৌরসভার জন্য ছয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে রাজউক ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ফলে মোট ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে ৬৭টির ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এখনো বাকি আছে।

৯.৭.৩ ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ

ঢাকা শহরের পরিবহন সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে সরকার কয়েকটি ফ্লাইওভার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং বর্তমানে মেট্রোরেল প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান। ঢাকা শহরের তীব্র যানজট নিরসনের লক্ষ্যে গত ১৫ বছরে রাজধানী ও এর আশপাশে সাতটি ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে। এ ফ্লাইওভারগুলো হলো–মহাখালী, খিলগাঁও, তেজগাঁও, বনানী, কুড়িল, যাত্রাবাড়ী ও মগবাজার। ফ্লাইওভারগুলোর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ২৯ কিলোমিটার এবং এগুলো নির্মাণে চার হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

এর আগে পরিবহন-বিষয়ক অধ্যায়ে (অধ্যায় ৬, খণ্ড ২) উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (মেট্রোরেল) চালু করার লক্ষ্যে বিশাল কর্মসূচি শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে ২০৩৫ সালের মধ্যে ছয়টি এমআরটি ও একটি বিআরটি লাইনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে। এগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এমআরটি-৬-এর (মেট্রোরেল) নির্মাণকাজ ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এটি ঢাকা শহরের যানজট উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সহায়তা করার পাশাপাশি শহরের পরিবহন খাতে একটি বড় ধরণের নতুন মাত্রা যোগ করবে।

৯.৮ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর উন্নয়ন কৌশল

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ নগর খাত বিষয়ে খুবই সুচিন্তিত ও সুসমন্বিত রূপকল্প সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সে রূপকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এ রূপকল্প ও কৌশলে এমন একটি উন্নয়নের রূপরেখা দেয়া হয়েছে, যেটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের নগর অঞ্চলের পরিবেশ ২০৪১ অর্থবছরে এমন উচ্চতায় পৌঁছাবে, যা বর্তমানে বিভিন্ন উচ্চ আয়ের দেশ যেমন কোরিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। সেই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ শহুরে ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর জন্য বড় ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের লক্ষ্য বিধৃত হয়েছে। এ সংস্কার কর্মসূচি শহুরে ও গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভর্ন্যান্স কাঠামোকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করবে, যা বর্তমানে উচ্চ দক্ষতা প্রদর্শনকারী বিভিন্ন উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ ও উচ্চ আয়ের দেশে লক্ষ্য করা যায়:

১. শহরগুলোয় এমন একটি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো হবে, যেখানে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন কাঠামো পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি শক্তিশালী ও জবাবদিহিমূলক নগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এ নগর সরকার হবে সব ধরণের রাজনৈতিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাবমুক্ত এবং এটির জবাবদিহি থাকবে কেবল এর অধিক্ষেত্রে বসবাসরত নাগরিকদের প্রতি।

২. আইনি কাঠামোতে বর্ণিত বিধান অনুসারে নগর সরকারগুলোর দায়িত্বসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকবে। আর এ দায়িত্বসমূহ স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পরিবর্তনযোগ্য হবে না এবং নাগরিকদের প্রদত্ত সেবাসমূহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোনো সেবার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না।

৩. কেন্দ্রীয় সরকার ও নগর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একই ধরণের সেবার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নীতি হবে যে, যে বিষয়ে শহরের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা বেশি, সে বিষয়ে দায়িত্ব সম্পাদনের প্রাথমিক দায়িত্বও নগর সরকারেরই।

৪. আইনগতভাবে নির্ধারিত আর্থিক কাঠামোর মাধ্যমে শহরগুলোর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা হবে; এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজস্ব ভাগাভাগি, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তি ও খোলা বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৫. নগর প্রশাসনের অর্থ আহরণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে প্রাপ্ত মাশুল ও সুবিধাভোগীর কাছ থেকে মূল্য আদায়ের নীতি বড় ধরণের ভূমিকা পালন করবে।

৬. জনস্বার্থ সুরক্ষা ও দেশের জন্য একটি সাধারণ অভিসন্দর্ভ নির্ধারণে পরিবেশের সুরক্ষা, পানির গুণগত মান ও বায়ুর মানের মতো বিষয়ে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক একটি ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং এ মান পরিপালনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে কেন্দ্রীয় সরকার।

৭. বিভিন্ন সেবা/সরকারি সামগ্রীর পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় অনুদান ব্যবস্থা চালু করা হবে, যার আওতায় সহ-অর্থায়ন বা প্রণোদনা কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

৮. নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে দায়িত্বপালন করবে। শহরের নিজস্ব পর্যায়ের পরিকল্পনা নির্ধারিত হবে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে।

একটি বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে নগরায়ণ অবশ্যই নির্ভর করবে প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ওপর। এ বিষয়টিকে মাথায় রেখেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকারের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার সংস্কারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নগরায়ণের ধরণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সরকারি নীতির ভূমিকাটি নির্ভর করবে বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা, প্রবিধানসমূহ, সরকারি বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর। নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যে অভিজ্ঞতা, তা হলো একটি উচ্চ আয়ের দেশে রূপান্তারিত হওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এককের অংশ হিসেবে নগর সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। নগর ব্যবস্থাপনার সংস্কার নিশ্চিত করতে হলে একটি সুষ্ঠু কৌশল নির্ধারিত থাকা আবশ্যক, যে কৌশলে তিনটি পদ্ধতির সন্নিবেশ হওয়া জরুরি–(১) অধিকতর উন্নত সেবা সরবরাহে অংশিদারিত্ব শক্তিশালীকরণে সরকারি-বেসরকারি খাতের ভূমিকার বিষয়টি পুনর্নির্ধারণ; (২) নগর পর্যায়ে সেবাদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ; এবং (৩) একটি জবাবদিহিমূলক নগর সরকার প্রতিষ্ঠাকরণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং জাতীয়

গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ২০২১-২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য সময়াবদ্ধ পরিকল্পনার কর্মপদ্ধতির প্রথম ধাপ উন্নয়নে নেতৃত্ব দিবে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে এবং ২০২২ সালের জুলাইয়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন শুরু হবে।

নগর গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার এই সংস্কারগুলোর পাশাপাশি মৌলিক নগর পরিষেবা সরবরাহ কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধনে বিদ্যমান নগর সংস্থা এবং পরিষেবা সংস্থার কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। যেসব প্রধান প্রধান কৌশলের ভিত্তিতে এ প্রচেষ্টাটি বাস্তবায়ন হবে, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৮.১ স্থানিক উন্নয়ন কৌশল

দ্বিতীয় সারির প্রধান শহরসমূহের বিকাশের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ উৎসাহিতকরণ

বাংলাদেশে নগরায়ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রাজধানী শহর ঢাকার মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য। বাংলাদেশে নগরভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩২ শতাংশই এ শহরে বসবাস করে। ঢাকা কেবল নগরকেন্দ্রিক অধিকসংখ্যক জনসংখ্যা ধারণের ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করে আছে তা নয়, বরং সিভিল প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পায়নের প্রাণকেন্দ্রও এ শহর। বর্তমানে দেশের ৩৪ শতাংশ জিডিপি ঢাকার ওপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে ঢাকা শহর এরই মধ্যে তার ধারণক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা পেরিয়ে গেছে। ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং যেমন ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের জরিপে বিশ্বের বাস-অযোগ্য শহরের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে চলে এসেছে ঢাকা।

ঢাকার মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার দ্বিতীয় সারির গুরুত্বপূর্ণ একাধিক শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে, যা প্রধান শহর বা মেট্রোপলিটন শহরের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে এবং মধ্যম মানের প্রশাসনিক পরিচালনা, রাজনীতি, শিল্পকারখানা, পরিবহন, পর্যটন ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এসব শহরের জনসংখ্যা হবে এক লাখ থেকে ২৫ লাখের (২.৫ মিলিয়ন) মধ্যে এবং এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন ধরণের সহায়ক সেবাসমূহের (লজিসটিকস) কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়টি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, একটি জাতি বা ভৌগলিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মধ্যম সারির বা সেকেন্ডারি শহরকেন্দ্রিক ব্যবস্থার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪২টি দ্বিতীয় সারির শহর রয়েছে। এসব শহরকে আরও বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও বিনিয়োগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার লক্ষ্যে শহরগুলোর অবকাঠামো, পরিষেবা কাঠামো, উদ্ভাবন কার্যক্রম, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে:

- সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন (ওয়্যারহাউস, অবকাঠামো)
- প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন পার্কের বিকাশসাধন
- আমদানি-রপ্তানি অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
- উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ
- অবকাঠামো ও পরিষেবাখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে সেগুলোর উৎপাদন ও বিতরণ খরচ সাশ্রয়ে উদ্যোগ গ্রহণ

এছাড়া সরকার এমন একটি নগরায়ণ কৌশল গ্রহণ করবে, যা দেশব্যাপী ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ ও আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে দিকনির্দেশনা দেবে। এ কৌশল বাস্তবায়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হবে:

- কাঠামোগত পরিকল্পনা, বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (ড্যাপ) ও প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে সকল নগর এলাকা/কেন্দ্রের জন্য নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

- দেশব্যাপী নগর অঞ্চলে বিদ্যমান ইমারত-সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রয়োগ করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- গেজেটের মাধ্যমে যে পৌরসভা পরিকল্পনা জারি করা হয়েছিল, তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

- জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও উপজেলা পর্যায়ে উপ-আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং সেগুলোকে সামষ্টিক (জাতীয়) পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা) সাথে সমন্বয় করা।
- অবকাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (সড়ক, নর্দমা, প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ), যেটিতে দেশব্যাপী নর্দমা ও পয়ঃনিষ্কাশন অবকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিতের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- ভূমিকম্পের ঝুঁকি লাইনে অবস্থানকারী বিভিন্ন শহরের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবস্থাপনা (জিএলডি), ভূমি পুনঃসমন্বয় অথবা ভূমি পুলিংয়ের মতো ব্যবস্থাসমূহের এক বা একাধিক পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটানো।
- সংবিধিবদ্ধ নগর পরিকল্পনার অধিক্ষেত্রের বাইরের যেসব এলাকা খুব শিগগিরই নগরায়ণের আওতায় চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ আইন-কানুন প্রণয়ন এবং সেগুলোর প্রয়োগ ঘটানো।
- পুরনো, ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ নগর এলাকাসমূহে নগর সংরক্ষণ ও সেগুলোর সংস্কারে প্রকল্প গ্রহণ করা। এসব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত উপকরণ কাজে লাগানো হবে। যেমন: অবকাঠামো ও ভবনের নিয়ন্ত্রণের বিধানের পাশাপাশি উন্নয়নের অধিকার হস্তান্তর করা। এছাড়া সংরক্ষণের উপযোগী ভবনের ক্ষেত্রে আরও যে ধরণের যথাযথ প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে এগুলোর হোল্ডিং কর কমানো বা মওকুফ করা।
- সমগ্র দেশের জন্যই একটি সমন্বিত ইমারত বিধিমালা (বিল্ডিং কোড) নির্ধারণ। [বর্তমানে খুব কমসংখ্যক নগর এলাকার জন্য ইমারত বিধিমালা রয়েছে, যেমন: ঢাকা ও চট্টগ্রাম]
- আগুণ লাগাসহ নানা ধরণের ঝুঁকি থেকে ভবনগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইমারত বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ভবনকেন্দ্রিক ক্রমবর্ধমান বিপদসমূহ প্রশমনে ভূমির ব্যবহার ও নগরের সম্প্রসারণে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিডোরের বিকাশসাধন (EDC)

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে ও দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিডোর উৎসাহিতকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। করিডোর হচ্ছে কতিপয় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি ব্যবস্থা, যেটিতে বিভিন্ন অবকাঠামো (সড়ক, রেলপথ ও বন্দরসমূহ), পরিবহন ও আনুষঙ্গিক পরিষেবা এবং বিভিন্ন ধরণের আইন ও বিধিবিধান অন্তর্ভূক্ত থাকে এবং এর মাধ্যমে বিষয়টি বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহর ও দ্বিতীয় সারির শহরগুলোকে সংযুক্ত করে। করিডোরে অন্তর্ভূক্ত মেট্রোপলিটন ও দ্বিতীয় সারির শহরগুলোয় এমনভাবে উন্নয়নের পরিকল্পনা নিতে হবে, যাতে শহরগুলো বিশেষায়িত উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা, মূল্য সংযোজন, পণ্য ও সেবাসমূহের বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের আনুষঙ্গিক পরিষেবাসমূহের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। আইসিটি ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এবং সফটওয়্যার অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধনে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যাতে সেগুলো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তঃসংযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়ন করিডোরসমূহের শহরগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম, বাণিজ্য, পণ্য, পরিষেবা ও তথ্যের প্রবাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের যোগাযোগ সহজীকরণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরণের ভৌত ও কোমল অবকাঠামো (সড়ক, রেল, বিমান সেবা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক সংযোগ) উন্নয়নে জোরালোভাবে গুরুত্ব দেয়া হবে।

ইডিসির বিকাশ সাধন হলে তা বিভিন্ন শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমিয়ে তাদের বন্টনে ভারসাম্য আনয়নের পাশাপাশি দেশব্যাপী বিভিন্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শহরের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিষয়টি দেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ঝঊত) প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকেও সহায়তা করবে। যেসব এসইজেড বৃহৎ শহরগুলোর উপকণ্ঠে অবস্থিত, সেগুলো যথোপযুক্ত বাণিজ্যিক পরিবেশের সহজলভ্যতার দরুণ জ্ঞানভিত্তিক ও উচ্চ প্রযুক্তির শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়ও সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে এসইজেডগুলোর উচ্চ দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত হবে। একই সঙ্গে যেসব এসইজেড মাঝারি ও ছোট শহরের সন্নিকটে অবস্থিত, সেগুলো বিভিন্ন ধরণের কৃষিভিত্তিক ও আধুনিক প্রযুক্তি-সংবলিত ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৯.৮.২ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কৌশলসমূহ

স্থানীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

শহর ও নগরের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ব্যতীত টেকসই নগরায়ণের লক্ষ্য অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সেজন্য নগর উন্নয়নের বিষয়টির মধ্যে প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং নগর খাতের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হবে:

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজনদের অংশগ্রহণ

স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন অবকাঠামো, পরিষেবার উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নে ওইসব প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এ ধরণের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থা, যেমন–স্থানীয় সরকার, সরকারি সংস্থাসমূহ, বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ (এনজিও) এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও একীভূতকরণ প্রচেষ্টায় নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকায় থাকবে স্থানীয় সরকার। এতে করে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহের যথাযথ সংজ্ঞায়ন

নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষমতার স্পষ্ট বিভাজন ও সম্পদের বণ্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অষ্টম পরিকল্পনায় এটি নিশ্চিত করা হবে, যাতে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সংস্থার সঙ্গে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি বা কোনো প্রকার বিভেদ সৃষ্টি না হয়। পৌর পর্যায়ে দায়িত্বপালনকারী বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে পৌরসভা পর্যায়ে ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট বিভাজন ও সম্পদের সুষ্ঠু বরাদ্দকরণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত, কারিগরি, আর্থিক ও আইন-কানুন প্রয়োগ-সংক্রান্ত বিষয় শক্তিশালীকরণের ওপর জোর দেয়া হবে। নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খাতনির্দিষ্ট যেসব বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন, সেগুলো হলো:

- **ব্যবস্থাপনাগত:** নীতিনির্ধারণ, বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রশাসনিক ও জন অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠাকরণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন সাধন।
- **কারিগরি:** নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান ক্ষেত্রেসমূহের পরিকল্পনা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- **আইনগত বিষয়:** আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনা এবং বিধিবিধান-সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ।
- **আর্থিক বিষয়:** মূলধন বাজেট প্রণয়ন-সংক্রান্ত পৌর হিসাবায়ন এবং আর্থিক শুল্ক ও কর কাঠামো, রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি প্রভৃতি।
- **নগর পরিকল্পনা:** মহাপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে পৌরসভাগুলোর সক্ষমতার বিকাশসাধন। নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ দেয়াসহ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংযোজন ও পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মী নিয়োগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ওপর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর নির্ভরশীলতা কমাতে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে জনবলের সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় বিষয়ের ওপরই জোর দেয়া হবে। একথা সত্য যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ করে 'ক' শ্রেণির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার জনবল প্রয়োজন হবে। যেমন: নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, পশু বিশেষজ্ঞ, অর্থ ও ব্যবস্থাপনা-বিষয়ক পেশাজীবী, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি। তাই এসব প্রয়োজনের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

৯.৮.৩ অবকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের কৌশলসমূহ

মৌলিক নগর পরিষেবাসমূহ

এ উপখাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পানি সরবরাহ, পয়োবর্জ্য পরিশোধন, নর্দমা ব্যবস্থাপনা এবং সড়কবাতির মতো পরিষেবাসমূহ। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে এসব পরিষেবাসমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা। এসব পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সংস্থাসমূহের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য অনুঘটক, যেমন–বেসরকারি খাত, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনজিও) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। অধিকতর সমতার ভিত্তিতে পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোসমূহের বণ্টন নিশ্চিত করতে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক অবকাঠামো ও পরিষেবাসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে সহায়ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কেবল পরিমাণগত লক্ষ্য অর্জনই যথেষ্ট নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য অর্জনসমূহ ধরে রাখতে হলে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ বরাদ্দকরণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ উপখাতে যেসব কৌশলগত পদক্ষেপ নেয়া হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

- টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় ক্ষেত্রে)
- হাইড্রো-জিওলজিক্যালি জটিল এবং সমস্যাযুক্ত অঞ্চলে উপযুক্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের প্রযুক্তি ব্যবহারের উন্নয়ন সাধন।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মতো প্রযুক্তির সম্প্রসারণ জরুরি (সুপেয় পানির অভাব মেটাতে বিষয়টি কার্যকর হতে পারে)
- দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- পয়োনিষ্কাশনের মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ
- বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থাপনায় মলমূত্র ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনার (FSM) বাস্তবায়ন।
- বস্তি ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা থেকে পয়োবর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ।
- সকল শহরে পয়োবর্জ্য শোধনাগার ব্যবস্থার বিকাশসাধন।
- জ্বালানিসাশ্রয়ী ও কম রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয় এমন সড়কবাতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে আলোকায়ন পদ্ধতির বাস্তবায়ন।
- নগরীর স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান। এটি ক্ষুদ্রতর নগর এলাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে এখনো বর্জ্য পরিবহনকেন্দ্র ও ভাগাড় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমির প্রাপ্যতা ও সুযোগ রয়েছে।
- কঠিন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
- যথাস্থানে ময়লা-আবর্জনা ফেলার বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

পানি ও স্যানিটেশন সেবা

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকরণ

- টেকসই পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ (ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ উভয় ক্ষেত্রে)
- হাইড্রো-জিওলজিক্যালি জটিল এবং সমস্যাযুক্ত অঞ্চলে উপযুক্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের প্রযুক্তি ব্যবহারের উন্নয়ন সাধন।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মতো প্রযুক্তির সম্প্রসারণ জরুরি (সুপেয় পানির অভাব মেটাতে বিষয়টি কার্যকর হতে পারে)
- দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- একটি পয়ঃনিষ্কাশন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং সেটি যাতে মলমূত্র ব্যবস্থাপনা মহাপরিকল্পনা (FSM) বাস্তবায়নে সহায়ক হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। এফএসএম কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

♦ ***প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাস্তবায়ন:*** ২০১৭ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের অঙ্গসংস্থা নীতি সহায়তা শাখা (PSB) এফএসএম-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (ওজঋ-ঋঝগ) প্রকাশ ও বিতরণ করেছিল। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আইআরএফ-এফএসএম বাস্তবায়ন ও সেবাসমূহ যথাযথ মানে উন্নীত করা, সচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রচারণা চালানো, এফএসএম কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর রূপরেখা তৈরিতে সক্ষমতা উন্নয়ন এবং এফএসএম কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) একটি সেল প্রতিষ্ঠা করেছিল। আইআরএফ-এফএসএম প্রতিষ্ঠার পর সরকার এখন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে এ কাঠামোকে বাস্তবে রূপদান ও বিদ্যমান প্রচেষ্টাসমূহ জোরদারে উদ্যোগ নিচ্ছে।

- ***পৌরসভাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:*** কেবল এফএসএম বাস্তবায়নই নয়, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সার্বিক পরিষেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই পৌরসভাগুলোর প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে খুবই সীমিত পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। টেকসই পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পৌরসভাগুলো যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত জনবলের ঘাটতি, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পৌরসভাগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে, যাতে পৌরসভাগুলো আর্থিকভাবে টেকসই উপায়ে সবার জন্য উন্নততর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। স্যানিটেশন পরিষেবা পরিচালনা ও নারী কর্মীদের নিয়োগদানের বিষয়ে পৌরসভাগুলোকে উৎসাহিত করতে নারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হবে।

- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ: খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (SDP) স্যানিটেশন পরিষেবায় বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এ খাতে ব্যাপক মাত্রায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এফএসএম পরিষেবার সফল পরিচালনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে একটি প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যাহোক, দ্বিতীয় সারির শহরসমূহে এফএসএম বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা খুবই কম। এফএসএম পরিষেবাদির পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যায়েই বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, তা না হলে পরিষেবা সরবরাহের পর্যায়ে গিয়ে ব্যবধান সৃষ্টি হতে পারে। এফএসএম পরিষেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার বিষয়ে বর্তমানে যে ধরণের প্রণোদনা প্রচলিত আছে, তা যথেষ্ট নয়। টেকসই পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ/প্রণোদনা জোগাতে উপযুক্ত ব্যবসায়িক মডেল এবং আকর্ষণীয় বিকল্প অর্থায়নের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।

- ***নিরাপদ স্যানিটেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন:*** ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতিতে পানির নিরাপত্তা বিধানের বিষয়টি উৎসাহিতকরণ এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ এরই মধ্যে একটি পানি সুরক্ষা পরিকল্পনা (WSP) প্রণয়ন করেছে। অনুরূপভাবে ধাপে ধাপে ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে একটি নিরাপদ স্যানিটেশন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হবে, যার লক্ষ্য হবে স্যানিটেশন পরিষেবা শিকলের বিভিন্ন ধাপে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকি নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা। প্রধানত স্থানীয় পর্যায়ের কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে এ নিরাপদ স্যানিটেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। তবে এ খাতের অন্যান্য অনুঘটক, যেমন নাগরিক সংগঠন ও বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাও (এনজিও) এটি কাজে লাগাতে পারবে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় একটি কার্যকর মলমূত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FSM) গড়ে তুলতে যে কৌশল নির্ধারণ করা হবে, তাতে সম্পূর্ণ স্যানিটেশন ভ্যালু-চেইন অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। যে বাহনে করে মলমূত্র পরিবহন করে পরিশোধনস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে, সে প্রক্রিয়ায় কোনো স্তরে যাতে বাহনটির কোনো ছিদ্রপথে বর্জ্যগুলো বাইরে বের হয়ে পরিবেশের ক্ষতি করতে না পারে এবং বর্জ্যগুলো যাতে পুরোপুরিভাবে নিংড়ানো হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাই এ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির লক্ষ্য। মলমূত্রের পরিশোধনাগারটি এমন প্রশস্তভাবে স্থাপন করতে হবে, যেন তা পৌর এলাকার সকল মানববর্জ্য পরিশোধন করতে সক্ষম হয় এবং তা থেকে সার উৎপাদন করে পরবর্তীকালে ব্যবহার-উপযোগী বা এমন পর্যায়ে পরিশোধন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে খোলা জায়গা বা প্রাকৃতিক পরিবেশে ফেলা হলেও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না হয়।

বাংলাদেশে এফএসএম পরিষেবা এখনো শক্তিশালী ভিত্তি পায়নি। তবে বাংলাদেশ সরকার এফএসএম চালু করার বিষয়ে বেশ সক্রিয়। এফএসএম পরিষেবা বাস্তবায়নে ডিপিএইচই ২০০৬ সালে 'সেকেন্ডারি টাউনস ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়। বাংলাদেশ সরকার ও এডিবির যৌথ অর্থায়নের এ প্রকল্পটি ছিল এ খাতের অন্যতম প্রথম উদ্যোগ, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০১৪ সালে। প্রকল্পটির আওতায় মধ্যম সারির ১১টি পৌরসভায় মলমূত্র শোধনাগার (FSTP) স্থাপন করা হয়। ডিপিএইচই পরিশোধন প্লান্টগুলো নির্মাণের পর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পৌরসভার মালিকানায় ছেড়ে দেয়। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, যেমন–বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের (ISDB) সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার অতি সম্প্রতি দেশব্যাপী আরও ১০০টি এফএসটিপি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এসব প্রকল্পগুলোতে যন্ত্রচালিত ভ্যাকুটাগ (ভ্রাম্যমাণ ট্যাংক) অন্তর্ভূক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে যন্ত্রের সাহায্যে মানববর্জ্য সংগ্রহ করে শোধনাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সম্প্রতি ডিপিএইচইতে সিডব্লিউআইএস-এফএসএম (শহরব্যাপী বিস্তৃত স্যানিটেশন এফএসএম) সেল স্থাপন করেছে, যে সেল এসডিজি ৬.২-এ নির্ধারিত স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সার্বিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে। এফএসএম-এর টেকসই পরিচালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্য অনুঘটকগুলোর সঙ্গে সমন্বিতভাবে সিডব্লিউআইএস-এফএসএম সহায়তা সেল কাজ করবে। এফএসটিপিগুলোকে টেকসই করে তোলা এবং দক্ষতার সঙ্গে সার্বিক এফএসএম কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আগের অভিজ্ঞতা এবং এ খাতে চলমান কার্যক্রমগুলোর উত্তম চর্চা থেকে শিক্ষা গ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরণের একটি মডেলের চিত্র বক্স ৯.১-এ তুলে ধরা হয়েছে।

বক্স ৯.১: সখিপুর Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) ও সহ-জৈবসার প্লান্ট

সখিপুর এফএসটিপি ও সহ-জৈবসার প্লান্টটি টাঙ্গাইল জেলাশহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পৌরসভার মালিকানায় থাক প্লান্টটির কারিগরি সহায়তার জোগান দেয় ওয়াটারএইড এবং সহযোগী এনজিও হচ্ছে বিএএসএ। প্লান্টটি ২০১৬ সালে অন্যান্য পরিষেবাসহ কার্যক্রম শুরু করে। এরই মধ্যে এটি এফএসএম খাতে একটি সম্ভাবনাময় কার্যক্রম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পৌর এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলো তাদের সেপটিক ট্যাংক খালি করার জন্য নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে আবেদন করার পর পৌরসভার ভ্যাকুটাগ সেখানে গিয়ে মলমূত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এরপর ভ্যাকুটাগটি সে মলমূত্র পরিবহন করে এফএসটিপি ও জৈবসার উৎপাদন প্লান্টে নিয়ে যায়।

এসব মলমূত্র প্রথমে এফএসটিপির ১০টি আনপ্লান্টেড ড্রাইং বেডে শুকানো হয়। তারপর এগুলোর সঙ্গে জৈব বর্জ্য মিশিয়ে কমপোস্ট প্লান্টে দিয়ে জৈবসারের একটি যৌগ উৎপাদন করা হয়। তারপর সেসব জৈবসার মোড়কজাত করে বাজারে বিক্রি করা হয়। এসব জৈবসার মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর জন্য একপ্রকার কন্ডিশনার হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এটির ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। এসব জৈবসার পুনরায় সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও বিতরণের বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সখিপুর কার্যালয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে প্লান্টটির পারিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যৌথভাবে পরিচালনা করছে পৌর কর্তৃপক্ষ ও ওয়াটারএইড। মানববর্জ্যের এ-জাতীয় ব্যবস্থাপনায় যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার প্রায় ৭০ শতাংশ উঠে আসে মলমূত্র সংগ্রহ ফি ও জৈবসার বিক্রি থেকে। প্লান্টটি যদিও এখন পর্যন্ত আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেনি, তথাপি এটি এফএসএম খাতের পুরো মূল্য শিকল ব্যবস্থায় একটি মডেলের সূচনা করেছে, যা অন্যান্য স্থানে সম্প্রসারণের দাবি রাখে।

নগর পরিবহন

শহর হচ্ছে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস এবং পরিবহন খাত শহরের প্রাণসঞ্চারী রক্তের মতো কাজ করে। দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্ত করে এবং শহরগুলোকে অকার্যকর করে ফেলে। সড়ক ব্যবস্থা, অমোটরযান, যাত্রী পরিবহন এবং গণপরিবহন-সম্পর্কিত সমস্যা, যেমন কর্মসংস্থান ও আবাসনের স্থানগুলোয় পরিবহন প্রাপ্তিসুবিধা, চাহিদা ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে নগর পরিবহন কৌশলে একটি সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়া হবে।

ঢাকা শহরের মতো মেট্রোপলিটন এলাকায় সড়কের যানজট নিরসনের বিষয়টি অনেকটাই নির্ভর করবে ব্যক্তিগত গাড়ি, ট্যাক্সিক্যাব, বেবিট্যাক্সি ও রিকশার মতো অযান্ত্রিক যানবাহনের ওপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট মাত্রায় কমিয়ে আনার ওপর। সেজন্য ঢাকা শহরে রেলভিত্তিক গণপরিবহন ব্যবস্থা এমআরটি এবং বাসভিত্তিক বিশেষ সেবা বিআরটি প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের মতো অন্যান্য প্রধান শহরেও এমন পদ্ধতির প্রচলন ঘটানো হবে। নগর পরিবহনের সমস্যা সমাধানে আরও যেসব কৌশল অবলম্বন করা হবে, সেগুলো নিম্নরূপ:

- প্রধান প্রধান শহরের জন্য সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সড়ক নির্মাণ, ফুটপাত ও পথচারী চলাচলের নিশ্চয়তা বিধান, দক্ষতার সঙ্গে ও টেকসই উপায়ে পরিবহন সেবা প্রদান এবং পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- দক্ষ, নির্ভরযোগ্য, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী পরিবহন সেবা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই ও যথোপযুক্ত গণপরিবহন সেবা নিশ্চিতকরণ।
- গণপরিবহন ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনার আওতায় আনা ও বিভিন্ন প্রকারের করারোপ প্রক্রিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে আনা।
- জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণ মানদণ্ডের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে যানবাহনের দূষিত কণার নিঃসরণ কমিয়ে আনা।
- হাইব্রিড প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি যেসব যানবাহন পরিবেশ বিধিমালা অমান্য করার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করবে, তাদের ওপর উপযুক্ত হারে জরিমানা আরোপ।
- অযান্ত্রিক যানবাহনগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক শহরের অযান্ত্রিক পরিবহন চলাচলের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বৃহৎ, মধ্যম ও ছোট পৌর শহরে সড়ক, ড্রেন, ফুটপাত ও সড়ক বিভাজকের সংযুক্তি ঘটিয়ে সমন্বিত অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। শহরের ভেতরকার সড়কগুলোর প্রস্থ কমপক্ষে ৬.০০ মিটার রাখা।

- সার্কিট ইনফ্রারেড ক্যামেরার সহায়তা নিয়ে সড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।
- গাড়ি চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা নিশ্চিত করা।
- শহরগুলো বেশিসংখ্যক যাত্রী পরিবহনে সক্ষম গণপরিবহন ব্যবস্থার (MRT/LRT/BRT) প্রচলন ঘটাতে ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড উন্নয়ন (TOD) ব্যবস্থার প্রচলনকে উৎসাহিত করা।
- ভালো মানের সড়ক, নৌপথ, রেল অবকাঠামো ও উন্নততর গণপরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রধান শহরের আশপাশের শহরগুলোর সঙ্গে উচ্চতর সংযোগ স্থাপন করা।
- যেসব স্থানে সম্ভব, সেখানে নৌপথ চালু করা হবে এবং সেটির সঙ্গে সড়ক ও রেল যোগাযোগের সংযোগ ঘটানো।
- পরিবহন ও গণপরিবহন পরিষেবা ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন করা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সক্ষমতার উন্নয়ন।
- যত্রতত্র পার্কিং নিষিদ্ধকরণ, জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ, নির্দিষ্ট রুট ব্যবহারের জন্য মাশুল ধার্য করণ, শহরের কেন্দ্রে প্রবেশ সীমিতকরণ, গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান, যানজটপূর্ণ এলাকায় পায়ে হেঁটে চলার বিষয়টি উৎসাহিতকরণ প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে সড়কে যানবাহনের সংখ্যা কমাতে চাহিদা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সড়কের টোল আদায়, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার জন্য সমন্বিত টিকিট ব্যবস্থার প্রচলন এবং অনলাইনের সময় নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক গণপরিবহন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনে ঢাকা শহরে বুদ্ধিদীপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা বা ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম (ITS) প্রবর্তন করা।

৯.৮.৪ নগরীর ভূমি ও গৃহায়ন উন্নয়ন কৌশলসমূহ

শহরে ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

নগরকেন্দ্রিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে সরকার টেকসই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীল উদ্যোগের প্রয়োগ ঘটাতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার ভূমির তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিকাশ সাধন করবে।
- প্রত্যাশিত নির্দেশনা মোতাবেক ভূমির ব্যবহারের ধরণ নির্ধারণে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা অনুষঙ্গ (কাঠামো/কৌশলগত পরিকল্পনা, নগর/ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন) প্রয়োগ করা হবে।
- ভূমি পুলিং/পুনর্বিন্যাসকরণ এবং নির্দেশিত পন্থায় ভূমি উন্নয়নের মতো কৌশলগুলোর প্রয়োগ ঘটানোর মাধ্যমে দক্ষ ও টেকসই উপায়ে ভূমি উন্নয়ন সাধনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হবে।
- নগর সম্প্রসারণ কার্যক্রম সমন্বয় করা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি-বেসরকারি নাগরিক অংশীদারিত্বের মতো সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়নে ভূমি পুলিং ও ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণের মতো উপায়গুলোর প্রয়োগ ঘটানো হবে। বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল ভূমি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশলের বাস্তবায়ন কাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে ভূমি হস্তান্তর, উন্নয়ন ও মালিকানার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন-কানুনগুলো পর্যালোচনা ও সংস্কার করা হবে, যার মাধ্যমে ভূমি পুলিং, জমির পুনর্বিন্যাস, নির্দেশিত উপায়ে ভূমির উন্নয়ন, অনানুষ্ঠানিক খাতের বিকাশ এবং ভূমিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে।
- জাতীয় গৃহায়ন নীতি (NHP)-২০১৬ অনুসরণের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সরকারি জমি (খাস জমি) কাজে লাগানোর মাধ্যমে গৃহায়ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগর ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

গৃহায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন

- গৃহায়নের ক্ষেত্রে বাড়ি প্রদানকারী না হয়ে বাড়ি তৈরিতে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে সরকার। এ কৌশলে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে জোর দেয়া হবে:

- আইনি ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আধুনিকীকরণ, কম্পিউটারভিত্তিক ভূমি রেকর্ড পদ্ধতির প্রবর্তন এবং রেকর্ড ব্যবস্থা, ভূমি নিবন্ধন এবং গৃহের নকশা প্রণয়ন ও গৃহের মালিকানা হস্তান্তর কার্যক্রম দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য ভূমির পুরো বাজার ব্যবস্থাকে সহায়তা করা।
- গৃহায়নের চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষ হাউজিং মার্কেট প্রতিষ্ঠা এবং নিয়মিতভাবে হাউজিং মার্কেটের ওপর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর বিশ্লেষণ ও সাধারণ মানুষকে অবহিত করার উদ্যোগ নেয়া।
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (BHBFC) পুনর্গঠনের পাশাপাশি গৃহায়নের অর্থায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি, গৃহঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বন্ধকি ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং ভূমি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর সংস্কার সাধনের মাধ্যমে গৃহায়ন খাতের অর্থায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি সাধন করা।
- মৌলিক অবকাঠামো ও পরিষেবা সরবরাহকরণ।
- উপযুক্ত নির্মাণ সামগ্রী ও প্রযুক্তির বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।
- ঝুঁকিগ্রস্ত ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, নিম্নআয়ের মানুষ এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহঋণের ব্যবস্থা করা। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ করা।
- সামাজিক আবাসন প্রকল্পের বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলোকে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মহল্লায় পরিণত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের নকশা ও মডেল প্রণয়নের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সামাজিক গৃহায়ন প্রকল্প গ্রহণ।
- বস্তি/অনানুষ্ঠানিক আবাসন ব্যবস্থার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, যা এর অধিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি এসব আবাসন ব্যবস্থাকে নগরীর বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।
- নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর বড় অংশের আবাসনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ভাড়াভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থার বিকাশ সাধন। এ পদ্ধতিতে বস্তিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যাতে সাধ্যের মধ্যে অন্যের সঙ্গে বাসা বা ঘর ভাগাভাগি করে উন্নত পরিবেশে থাকতে পারে, সেজন্য বেসরকারি খাতের ডেভেলপারদের মাধ্যমে গুচ্ছগৃহ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো।
- জনগোষ্ঠীর জন্য সম্মিলিত মেয়াদি সুরক্ষা প্রদানের সম্ভাবনাটি অন্বেষণ করা হবে, যাতে পৃথক উপাধি, জমির মূল্য নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা এবং অহেতুক মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা প্রশমিত করা যায়।
- সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে উন্নয়ন ঘটানো প্লট বরাদ্দে দরিদ্র ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কোটার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন ধরণের নাগরিক সংগঠন ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভূমির উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে (NHP-2016)।
- তৈরি করা বাড়ি সরবাহের ঘাটতি মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP)-কে কাজে লাগানো হবে। এক্ষেত্রে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর আবাসনের ব্যবস্থা করতে পিপিপি-ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি জমি বরাদ্দ দিয়ে আবাসনের উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।
- জাতীয় গৃহায়ন নীতির নির্দেশনা মোতাবেক নিম্নআয়ের মানুষ যাতে সরকারি বরাদ্দের জমি পেতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে। এ ভর্তুকির অর্থের জোগান আসবে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কাছে ন্যায্য মূল্যে আবাসনের জমি বিক্রি এবং শিল্প/বাণিজ্যিক ও সম ধরণের অন্যান্য অনাবাসিক কাজে জমি বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা থেকে। ফ্ল্যাট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।
- গৃহহীনসহ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনের নিশ্চয়তা বিধান করার পাশাপাশি আবাসিক ফ্ল্যাট ও প্লট নির্মাণের মাধ্যমে গৃহায়ন নীতির উদ্দেশ্যাবলি পরিপালন করা হবে।
- নিম্ন আয়ের মানুষ যাতে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, সেজন্য রিয়েল এস্টেট ও আবাসিক ভূমি উন্নয়ন-সংক্রান্ত আইনসমূহের প্রয়োগ ঘটানো হবে।

৯.৮.৫ নগরীর পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশলসমূহ

নগরীর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দুর্বল নর্দমা পরিকাঠামো, নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের প্রাপ্যতায় ঘাটতি, প্রতিনিয়ত সহ্যক্ষমতার অতিরিক্ত মাত্রার শব্দের সম্মুখীন হওয়া এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কারণে পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তা যে কেবল মানুষের জীবনযাত্রার মানেরই অবনতি ঘটায় তা নয়; বরং এটি নগরী ও এর আশপাশের এলাকার প্রাকৃতিক বাস্তুবিদ্যার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। পরিবেশগত সমস্যাগুলো অত্যন্ত জটিল, বহুমাত্রিক ও একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে কারণে এগুলো মোকাবিলা করতে হলে বিভিন্ন খাতের অনুঘটকসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন পড়বে। এসব অনুঘটকের মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার সংগঠন, বেসরকারি খাতের সংগঠন ও সুশীল সমাজ।

আবাসন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকার একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতির ওপর জোর দেবে। এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ব্যয় পুনরুদ্ধারের ওপর। এ পরিকল্পনা মেয়াদে যেসব সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে:

- ঢাকার জন্য প্রণীত ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যানে সকল পুকুর/জলাধার অন্তর্ভূক্ত করে সেগুলোর বাস্তুতন্ত্রগত গুরুত্ব ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সুরক্ষার উদ্যোগ নেয়া।
- বালু দিয়ে জলাশয় ভরাট করে আবাসন প্রকল্প ও শিল্পকারখানা স্থাপন স্থগিত করা।
- সড়ক নির্মাণ, আবাসন প্রকল্প ও শিল্পপ্লট স্থাপনের ক্ষেত্রে জলাধার সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।
- নগর অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- পুকুর, বিল ও খালের মতো জলাশয়গুলোকে হ্রদ হিসেবে চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখে সেগুলো সংরক্ষণ করা।
- পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও অভয়ারণ্যের মতো স্থানগুলোয় কোনো প্রকার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ না করা।
- নিম্ন দূষণ/দূষণবিহীন প্রযুক্তির বিকাশসাধন।
- বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ-সহায়ক ও সবুজ উদ্যোগের প্রচলন এবং তার বিকাশ সাধন; যেমন–সবুজ ভবন নির্মাণ, জ্বালানি দক্ষতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ, কূন্য দূষণ নিঃসরণী ভবন নির্মাণ, সবুজ শহর (গ্রিনসিটি) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।
- আর্থিক নিরীক্ষার পাশাপাশি পরিবেশগত নিরীক্ষা, জ্বালানি নিরীক্ষা ও পানি ব্যবহার-সংক্রান্ত নিরীক্ষা পরিচালনা করা।
- পরিকল্পনা মেয়াদে সারা দেশে নগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে ১০ শতাংশকে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনা হবে এবং সকল প্রকার নর্দমাবাহিত উপকরণ পরিশোধনের আওতায় আনা।
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে একটি সমন্বিত পদ্ধতির আওতায় আনা (বর্জ্য সংগ্রহ, ভাগাড়ীকরণ ও তা থেকে সম্পদ পুনরুদ্ধার) এবং এ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনায় নেয়া, কেননা এটি জলাবদ্ধতা সৃষ্টির মতো নানা ধরণের সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত অভীষ্ট অর্জনে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হবে তার মধ্যে রয়েছে:
  - যেসব স্থানে এখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি, সেখানে এ কাজ সম্পন্ন করতে প্রতিষ্ঠান নিয়োগে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
  - পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের উপযোগী বর্জ্য বাছাইকরণ কার্যক্রম শক্তিশালী করতে সচেতনতা সৃষ্টি।
  - থ্রি-আর ব্যবস্থার বিকাশসাধন (সহজে অর্থের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা)
  - যেসব স্থানে উপযোগী হয়, সেখানে বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া।
  - বিপুল পরিমাণ জৈব বিষয়াবলিকে সম্পদে রূপ দিতে কমপোস্ট ব্যবস্থা উৎসাহিতকরণ।
- শহর-নগরের ভেতর দিয়ে বা কাছাকাছি এলাকা দিয়ে প্রবহমান নদী, যেমন–বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু, বংশী, ময়ূরী (খুলনা), কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি নদীর পরিবেশগত/বাস্তুতন্ত্রগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া।
- গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের গণপরিবহন ব্যবস্থা যেমন–মেট্রোরেল, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, উন্নত রেল নেটওয়ার্ক ও উন্নত নৌ নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ।

- দূষণকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় নীতির প্রয়োগ ঘটানো।
- দূষণ নিরীক্ষা, তদন্ত ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাড়াতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো।

নগরীর জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

আগামী দিনে নগর ও শহরগুলোয় যেসব উদীয়মান সমস্যা মোকাবিলা করা প্রয়োজন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। এটির বিরূপ প্রভাব টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনের সক্ষমতা দুর্বল করে দিতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার ক্ষেত্রে দেশের নগর এলাকায় বেশকিছু প্রতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনাগত ও গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ঘাটতি, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CCA) ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অধিকতর কার্যকর পরিকল্পনা ও নগর ব্যবস্থাপনা অনুশীলন প্রতিষ্ঠায় ঘাটতি, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অর্থায়নের ঘাটতি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ঘাটতি। উপরিউক্ত সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে:

প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

- বেসরকারি খাত, গবেষণা সংস্থা, জাতীয় সংস্থাসমূহ ও পরিষেবা সরবরাহকারী কোম্পানির মতো অংশীজনদের অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (CDMC) শক্তিশালীকরণ।
- নগর প্রশাসন পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আইন ও বিধিবিধানের উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটিয়ে কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতির উন্নতি সাধনকল্পে বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠান (পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DoDM), বিভিন্ন নগরকেন্দ্রিক সংস্থা (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা), বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়সাধন এবং সহযোগিতা জোরদারকরণ।
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান ব্যবস্থার সঙ্গে নগরীর সিসি-ডিআরআর নীতির সমন্বয়সাধন। কারিগরি সহায়তা, গবেষণা ও পরিবেশ-সংক্রান্ত কারিগরি প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সংগতিপূর্ণ সংগঠনগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্ব শক্তিশালীকরণ।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

- পরিবেশ ও দুর্যোগ-সম্পর্কিত তথ্য সমন্বিত এবং পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও মানকে প্রতিফলিত করে–এমন সমন্বিত ও পরিবেশসম্মত নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা হবে। স্থানিক, আন্তঃখাতভিত্তিক, আন্তঃস্থায়ী ও পরিবেশগত মাধ্যম-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়ার পাশাপাশি ভূমি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান প্রধান বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হবে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন পদক্ষেপ (ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় ভূমির প্রাপ্যতা ও সংযোগ নিশ্চিতকরণ) গ্রহণসহ নগরীর সার্বিক পরিবহন পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে। বহু-অংশীজন ও অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার মাধ্যমে সকল প্রধান প্রধান খাতের সঙ্গে সিসি-ডিআরআর-এর সমন্বিতকরণ নিশ্চিত করা হবে।
- দুর্যোগ বিষয়ে পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যার মাধ্যমে সকল মানুষের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছানো, দুর্যোগ থেকে ঘরবাড়ি সুরক্ষা, সরিয়ে নেয়ার জন্য নিরাপদ স্থান চিহ্নিতকরণ এবং যেসব মানুষ দ্রুত চলাফেরা করতে অক্ষম, তাদের আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সহায়তা করা।

নাগরিক অংশগ্রহণ

- স্বেচ্ছাসেবী, স্থানীয় নাগরিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান কার্যক্রমের সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো।

- বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এবং সমস্ত নাগরিক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধন করে অনেক বেশি সমন্বিত কিন্তু নমনীয় পদ্ধতিতে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রক্রিয়াগুলো পরিচালনা করা।
- মৌলিক পরিষেবাসমূহ, সামাজিক সেবাসমূহ ও আশপাশের পরিবেশের উন্নতি সাধনে পৌর এলাকার সকল নাগরিক সংগঠন ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব (MCC) ব্যবস্থার বিকাশ সাধন।

৯.৯ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নগর খাতের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রণালয়/বিভগিভিত্তিক অভীষ্ট, কৌশল ও কর্মসূচিসমূহ

৯.৯.১ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অভীষ্ট

যথাযথ পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত গবেষণা ও পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং সাশ্রয়ী গৃহনির্মাণের জন্য ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে টেকসই ও নিরাপদ অবকাঠামোর বিকাশ সাধন।

প্রধান প্রধান নগর উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ

- দেশের গৃহায়ন সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ।
- সরকারি ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, সেগুলোর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- গৃহায়ন খাতের অগ্রগতি সাধনে সহায়ক আইন ও নীতির বিকাশ সাধন।
- পরিকল্পিত নগরায়ণ, ভূমির যথাযথ ব্যবহার ও উন্নয়ন।
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
- নগরায়ণ, গৃহায়ন, ভবন নির্মাণ এবং নির্মাণ সামগ্রী ও কৌশল বিষয়ে উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিকাশ সাধন ও গবেষণা পরিচালনা।
- ক্রেতার সরবরাহ সেবা পরিবীক্ষণ ও চুক্তি পরিপালনে আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে নগরায়ণ ও গৃহায়ন সমস্যা সমাধানে বেসরকারি খাতকে যুক্ত করার সুযোগ উন্মুক্তকরণ।

সারণি ৯.৯: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহ
পরিকল্পিত নগরায়ণ	ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান, মহাপরিকল্পনা ও কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন/ আধুনিকায়ন ও বাস্তবায়ন	রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, পিডব্লিউডি, আরডিএ, কক্সডিএ
	রাজউক, সিডিএ, কেডিএ ও আরডিএ'র বাইরের এলাকার জন্য ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান, মহাপরিকল্পনা ও কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
	সংযোগ সড়ক, ফ্লাইওভার, আন্ডারপাস, ওভারপাস ও বাইপাস সড়ক নির্মাণ	পিডব্লিউডি, রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ
	উন্মুক্ত চত্বর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, খেলার মাঠ, উদ্যান, হ্রদ, জলাধার নির্মাণ ও সবুজায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন	পিডব্লিউডি, রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ
	বহুতল কার পার্কিং কেন্দ্র ও মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	রাজউক, সিডিএ
	অননুমোদিত ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ ও অপসারণ	পিডব্লিউডি, রাজউক, কেডিএ, আরডিএ
	জনঘনত্ব চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন	রাজউক
বিভিন্ন আয়শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সাশ্রয়ী উপায়ে বাসস্থানের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ	আবাসিক প্লটের উন্নয়নসাধন	এনএইচএ, রাজউক, সিডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ
	ভাড়াভিত্তিক বাড়ির চাহিদা মেটাতে বিক্রির উদ্দেশ্যে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ	এনএইচএ, রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, আরডিএ, কক্সডিএ
	সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মজীবী ও কর্ম-অনুসন্ধানী নারীদের জন্য ডরমিটরি/হোস্টেল নির্মাণ	পিডব্লিউডি
	সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য আবাসিক ভবনের নকশা প্রণয়ন এবং কর্মজীবী ও কর্ম-অনুসন্ধানী নারীদের জন্য ডরমিটরি/হোস্টেলের নকশা প্রণয়ন	স্থাপত্য অধিদপ্তর
	সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে ফ্ল্যাট বরাদ্দকরণ	সরকারি আবাসন পরিদপ্তর
	পিপিপি ভিত্তিতে স্যাটেলাইট শহর নির্মাণ	রাজউক

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহ
পরিকল্পিত গৃহায়ন ও নির্মাণ কৌশলের বিষয়ে সৃজনশীল প্রযুক্তির উদ্ভাবন	অটোক্লেভ এরিটেড কংক্রিট (এএসি) ব্লক ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে স্বল্প মূল্যের পরিবেশবান্ধব আবাসন প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন	এইচবিআরআই
	আবাসন নির্মাণ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা	
	নগর উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর গবেষণা পরিচালনা	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সরকারি কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিতকরণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	পিডব্লিউডি
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরসমূহের জন্য নতুন ভবন ও অবকাঠামোর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন	স্থাপত্য অধিদপ্তর

সারণি ৯.১০: বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ

বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ	কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলি
১. নগর এলাকায় ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ শহুরে অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের কবল থেকে জমিগুলো রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে শহরাঞ্চলে অনেক অপরিকল্পিত আবাসন অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহারকে এক নম্বর অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে	পরিকল্পিত নগরায়ণ
২. নগর এলাকায় পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের ফলে প্রায়ই যানজট দেখা দেয়। পাশাপাশি এর ফলে উন্মুক্ত জলাশয়, খেলার মাঠ ও পার্কের মতো সামাজিক অবকাঠামো বিলুপ্ত হচ্ছে, যা নগর এলাকায় পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে। পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এটিকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	পরিকল্পিত নগরায়ণ
৩. বিভিন্ন আয়শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সাশ্রয়ী উপায়ে বাসস্থানের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ গৃহ মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য উপযুক্ত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপযুক্ত প্লট ও ফ্ল্যাটগুলোর সর্বোত্তম সংখ্যার উন্নয়ন সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে আয়ভিত্তিক জনগোষ্ঠীর সাশ্রয়ী উপায়ে বাসস্থানের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। এটি তাই তৃতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।	বিভিন্ন আয়শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সাশ্রয়ী উপায়ে বাসস্থানের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
৪. গৃহ নির্মাণ এবং আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরায়ণ বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর জন্য ঘর নির্মাণ প্রযুক্তির উদ্ভাবনের গুরুত্ব এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণের গুরুত্বের আলোকে এটিকে মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	পরিকল্পিত গৃহায়ন ও নির্মাণ কৌশলের বিষয়ে সৃজনশীল প্রযুক্তির উদ্ভাবন

৯.৯.২ স্থানীয় সরকার বিভাগ

অভীষ্ট

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, গ্রামীণ ও শহুরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন।

নগর উন্নয়নের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা
- শহর ও পৌর এলাকায় সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণের পাশাপাশি উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
- উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত গ্রোথসেন্টার ও হাটবাজারসমূহের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
- পানযোগ্য পানি সরবরাহ সম্পর্কিত বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা
- গ্রামীণ ও শহর এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদির বিকাশ সাধন
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অফিস/সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে অর্থায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছোট আকারের পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং স্থানীয় সরকার-সম্পর্কিত বিধি ও নীতিমালা প্রবর্তন

সারণি ৯.১১: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থাসমূহ
নাগরিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধার বিকাশ সাধন	নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)
	শহর এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহকরণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন; ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ওয়াসা
	নিয়মিতভাবে পানির উৎসসমূহের গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	ডিপিএইচই; ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ওয়াসা
	বস্তি এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার স্থাপন ও নির্মাণ	ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জ ওয়াসা
	গৃহস্থালির জৈব ও অজৈব আবর্জনা সংগ্রহ ও ভাগাড়ীকরণ	সকল সিটি কর্পোরেশন
	হাসপাতাল বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন
	জন্ম ও মৃত্যু-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়
পরিবেশবান্ধব পরিকল্পিত নগরায়ণ	শহুরে সড়ক, ফুটপাত, নর্দমা, সড়কবাতি, বাস-ট্রাক টার্মিনাল, পার্কিং লট ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সকল সিটি কর্পোরেশন
	গণশৌচাগার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)
	শহর এলাকায় ফ্লাইওভার, ফুট ওভারব্রিজ ও সংযোগ সেতু নির্মাণ শহর এলাকায় কবরস্থান নির্মাণ ও হ্রদ উন্নয়ন নগর এলাকায় পাইকারি ও খুচরা বাজার স্থাপন	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

সারণি ৯.১২: বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ

বিনিয়োগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ/কর্মসূচিসমূহ	কৌশলগত উদ্দেশ্যাবলী
১. সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বিভিন্ন ধরণের পানিবাহিত রোগ প্রশমন ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। এতে করে রোগের প্রাদুর্ভাব ও অকাল মৃত্যুর ঘটনা হ্রাস পায়, যার মাধ্যমে মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।	নাগরিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ
২. নাগরিকদের জন্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ পরিবেশের উন্নতিতে অবদান রাখে, যা পরিবেশ দূষণজনিত রোগ হ্রাস করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।	নাগরিকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ

৯.৯.৩ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

নগর পরিবহন খাতের অভীষ্ট

দেশের প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও গুণগত মানসম্পন্ন সড়ক অবকাঠামো ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ।

নগরীর সড়ক উন্নয়নে গৃহীতব্য প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- দীর্ঘমেয়াদি সড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন
- সড়ক নেটওয়ার্কগুলো এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, যেন তার মাধ্যমে এ অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মূল্য সংরক্ষণ করা যায়
- সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে টেকসই উপায়ে অর্থায়নের নিশ্চয়তা বিধান
- সড়কের পার্শ্ববর্তী কার্যক্রমের যথাযথ ব্যবস্থাপনা
- সড়ক নির্মাণে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যবস্থার বিকাশ সাধন
- অবকাঠামো, পরিষেবা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আরও বেশি মাত্রায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
- আন্তঃশহর সংযোগ শক্তিশালীকরণ
- যানবাহনের ওজন নিয়ন্ত্রণ
- যানবাহন কর্তৃক পরিবেশ দূষণ প্রশমন

সারণি ৯.১৩: উদ্দেশ্যাবলি, কার্যক্রমসমূহ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	কার্যক্রমসমূহ (নীতি/কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রম)	ফলাফল নির্দেশক	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল বা এমআরটি লাইন-৬ সময়মতো চালুকরণ	এমআরটি লাইন-৬-এর কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে সম্পন্ন করা	ঢাকা শহর ও এর সংলগ্ন এলাকাসমূহে যানজট নিরসন ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশের উন্নয়ন	ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (DMTCL)
বাংলাদেশের প্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেল (এমআরটি-১) নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প (লাইন-১) [ই/এস]		
পূর্ব-পশ্চিম এমআরটি করিডোরের (লাইন-৫: উত্তর রুট) ৬০ শতাংশ নির্মাণকাজ সম্পন্নকরণ	ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট উন্নয়ন প্রকল্প (লাইন-৫): উত্তরের রুট		
এমআরটি লাইন-৫ প্রকল্পের দক্ষিণ রুটের অর্থায়ন প্রস্তুতি (PRF) সম্পন্নকরণ	বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন ও দরপত্র নথি প্রস্তুতি সম্পন্ন করা		

সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় (RSTP) ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরে নগর পরিবহন করিডোর ও রিংরোড প্রকল্প বাস্তবায়নের পরামর্শ দেয়া হয়েছে:

পরিবহন করিডোর

(১) সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (সিবিডি)-টঙ্গী, গাজীপুর করিডোর (N-3):

ঢাকার উত্তরের শহর গাজীপুর খুবই দ্রুত বর্ধনশীল একটি শহর। রাজউকের অধিক্ষেত্রের উত্তর দিকের শহরতলি ও ময়মনসিংহ পর্যন্ত করিডোরের প্রধান প্রবেশদ্বার এটি।

(২) সিবিডি-পূর্বাচল করিডোর

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত উপশহর হচ্ছে পূর্বাচল। ঢাকার উত্তর-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও গাজীপুরের কালীগঞ্জের কিছু অংশজুড়ে শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর মধ্যবর্তী এ নতুন উপশহরের আয়তন প্রায় ছয় হাজার ১৫০ একর। বিমানবন্দর/প্রগতি সরণির আট লেনবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে এ শহর সংযুক্ত হবে এবং তা থেকে উপশহরটির দূরত্ব হবে মাত্র ৬.৮ কিলোমিটার।

(৩) সিবিডি-নারায়ণগঞ্জ করিডোর

নারায়ণগঞ্জ দেশের অন্যতম শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, বিশেষ করে দেশের পাট ও বস্ত্রখাতের অনেক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সেখানে বাণিজ্য ও উৎপাদন কারখানার আধিক্য বিদ্যমান। এই করিডোরে একটি চারলেন সড়ক ও সিঙ্গেল লাইন রেল ট্র্যাক রয়েছে। এ পরিবহন করিডোরে বেশ কয়েকটি স্টেশন ও গ্রেড ক্রসিং বিদ্যমান।

(৪) সিবিডি-ঝিলমিল করিডোর

বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষে ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঝিলমিল নতুন উপশহর প্রকল্পের অবস্থান। এ প্রকল্প এলাকার আয়তন ৩৮১.১১ একর। সেখানে প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো ও পরিষেবাসহ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের মধ্যে এক হাজার ৭৪০টি আবাসিক প্লট ও ৯ হাজার ৫০০ অ্যাপার্টমেন্ট বণ্টন করা হবে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর এ পরিবহন করিডোরটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক করিডোর হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

(৫) সিবিডি-সাভার করিডোর

সাভার একটি নতুন শিল্পকেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, বিশেষ করে পাটের ব্যবসাকেন্দ্র ও উৎপাদন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। এ এলাকা-সংলগ্ন ঢাকার একটি প্রধান বাস টার্মিনাল রয়েছে; গাবতলী বাস টার্মিনাল। এটি ঢাকা-আরিচা মহাসড়ককে ঢাকার সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এটি।

রিংরোডসমূহ

<u>অভ্যন্তরীণ রিংরোড</u>

এটি ঢাকা সার্কুলার রোড নামেও পরিচিত। এ সড়কের পশ্চিমাংশ (আবদুল্লাহপুর-ধউর-বিরুলিয়া-গাবতলী-বাবুবাজার-কদমতলী-তেঘরিয়া-পোস্তগোলা-ফতুল্লা-চাষাঢ়া-হাজীগঞ্জ-শিমরাইল-ডেমরা) বাস্তবায়ন করবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। পরিকল্পনায় পরিবর্তন এবং নতুন অবকাঠামোগত কারণে আরএসটিপিতে অ্যালাইনমেন্টের কিছু অংশে কয়েকটি পরিবর্তন আসবে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) পূর্ব বাইপাস অংশে একটি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করবে (২৫.৮৫ কিলোমিটার, ডেমরা-পূর্বাচল সড়ক-তেরমুখ-আবদুল্লাহপুর)। এরই মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ সেকশনের মাঝ বরাবর একটি উড়াল এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির জন্যও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব দিয়েছে।

<u>মধ্যবর্তী রিং রোড</u>

হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু-মদনপুর-ভুলতা (ঢাকা বাইপাস বরাবর)-কোড্ডা (গাজীপুর)-বাইপাইল (ঢাকা ইপিজেড)-হেমায়েতপুর জুড়ে রিংরোডের বিস্তৃতি। পিপিপি এর আওতায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা (জয়দেবপুর-দেবুগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর) বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য এরই মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ চীনা কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষর করেছে, যার নির্মাণকাজ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। জি২জি পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী রিংরোডের (হেমায়েতপুর-কালাকান্দি-তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু-মদনপুর) পশ্চিমাংশের নির্মাণকাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পিপিপি মডেলে কাজটি করছে জাপানের কোম্পানি মারুবেনি কর্পোরেশন। এটিও একই পর্যায়ে রয়েছে। অন্যদিকে বালিপুর (ঢাকা-আরিচা হাইওয়ে) থেকে শুরু করে নিমতলী-কেরানীগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর থেকে লাঙ্গলবন্দ (ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক) পর্যন্ত একটি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে জি২জি ভিত্তিতে এটি নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনাধীন।

<u>বহিস্থ রিং রোড</u>

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (DTCA) এ সড়কটির বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৯.৯.৪ নগর খাতের জন্য উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF)

জাতীয় অগ্রাধিকার

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর উন্নয়ন (এসডিজি-১১)

ফলাফল বিবরণ

পরিকল্পিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই নগরায়ণ, উন্নততর নগর গভর্ন্যান্স এবং উন্নততর অবকাঠামো ও পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও জীবনমানের উন্নয়ন।

সারণি ৯.১৪: উপ-খাতভিত্তিক অভীষ্ট, কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কর্মসম্পাদন সূচক	নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিসীমা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
১. উপখাত: নগরায়ণের ধরণ *<u>অভীষ্ট:</u>* মাধ্যমিক পর্যায়ের শহর ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিডোরের (EDC) ওপর জোর দেয়ার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ উৎসাহিতকরণ							
মোট জনসংখ্যার মধ্যে শহরে বসবাসকারীর অনুপাত (%)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৬ (২০১৮)	৩৭.৭৫	৩৮.২৫	৩৮.৮০	৩৯.৪০	৪০
প্রধান শহরের সংখ্যা	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০২ (২০১৯)	০২	০২	০২	০২	০২
মোট জনসংখ্যার মধ্যে ঢাকা মহানগরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত (%)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৪ (২০১১)	৩৩.৬০	৩৩.২০	৩২.৮০	৩২.৪০	৩২

কর্মসম্পাদন সূচক	নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিসীমা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
নগরকেন্দ্রিক মোট জনসংখ্যার মধ্যে অন্য সাতটি প্রধান শহরের জনগোষ্ঠীর অনুপাত	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১৩ (২০১১)	১৩.৪০	১৩.৮০	১৪.২০	১৪.৬০	১৫
অর্থনৈতিক উন্নয়ন করিডোর: (ক) পরিকল্পিত (খ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অর্থ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	(ক) ০ (খ) ০	(ক)০১ (খ) ০	(ক) ০১ (খ) ০১	(ক) ০১ (খ) ০১	(ক) ০২ (খ) ০১	(ক) ০২ (খ) ০১
২. উপখাত: নগর গভর্ন্যান্স ও ব্যবস্থাপনা *অভীষ্ট:* যথোপযুক্ত দক্ষতা ও সক্ষমতার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ, যাতে করে এসব প্রতিষ্ঠান সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক নগর পরিষেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।							
মোট সরকারি ব্যয়ের মধ্যে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারগুলোর ব্যয়ের অনুপাত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৫ (২০১৭)	৬	৭	৮	৯	১০
জিডিপির বিপরীতে নগরভিত্তিক স্থানীয় সরকারগুলোর মোট ব্যয়ের আনুপাত হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০.৭০ (২০১৭)	০.৮০	০.৯০	১.১০	১.৩০	১.৫০
মোট করের বিপরীতে নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকারগুলোর করের হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.৩০ (২০১৭)	২.৬০	৩.০০	৩.৫০	৪.২০	৫.০০
জিডিপির অনুপাতে নগরীর স্থানীয় সরকারগুলোর করের হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০.২০ (২০১৭)	০.২৩	০.২৮	০.৩৪	০.৪১	০.৫০
নগর পরিকল্পনা আছে এমন শহরের অনুপাত	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫৫ (২০১৮)	৫৫	৬০	৭০	৮০	৯০
ভবন নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণের চিত্র	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০৫ (২০১৮)	০৯	১৩	১৭	২১	২৫
৩. উপখাত: মৌলিক নগর পরিষেবাসমূহ *অভীষ্ট:* সকলের জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় নিরাপদ ও সাশ্রয়ী উপায়ে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, জনস্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌলিক নাগরিক পরিষেবা নিশ্চিতকরণ							
নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়া নগর জনগোষ্ঠীর হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৭৮ (২০১৬)	৮২.৪	৮৬.৮	৯১.২	৯৫.৬	১০০
স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও স্যানিটেশন সুবিধাপ্রাপ্ত নগর জনগোষ্ঠীর হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৮০ (২০১৬)	৮৪	৮৮	৯২	৯৬	১০০
পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার সংযোগ পাওয়া নগর খানার হার	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০৫ (২০১৭)	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা নিশ্চিত হওয়া নগর কেন্দ্রের অনুপাত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০	০২	০৪	০৬	০৮	১০
বর্জ্য পানি সংশোধনের সুবিধা নিশ্চিত হওয়া নগর কেন্দ্রের অনুপাত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০	০২	০৪	০৬	০৮	১০
জনস্বাস্থ্য পরিসেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়া নগর জনগোষ্ঠীর অনুপাত	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৮৭ (২০১৬)	৮৯.৬	৯২.২	৯৪.৮	৯৭.৪	১০০
৪. উপখাত: নগর পরিবহন *অভীষ্ট:* সড়ক ব্যবস্থা, অযান্ত্রিক পরিবহন, যাত্রী পরিবহন, মেট্রোরেল সুবিধা ও সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের জন্য নিরাপদ, সাশ্রয়ী, সহজলভ্য ও টেকসই পরিবহন সেবা নিশ্চিতকরণ।							
শহরের সড়কগুলোতে আধুনিক ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থার সংযোজন	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০১ (২০১৭)	০১	০২	০৩	০৫	০৭
প্রধান প্রধান শহরে মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ব্যবস্থা (মেট্রোরেল) চালুকরণ	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	০	০	০	০১	০১	০১

কর্মসম্পাদন সূচক	নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ভিত্তিসীমা (বছর)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২২)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫)
যানবাহন আইন মান্য করার হার (%)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১০ (২০১৮)	১৪	১৮	২২	২৬	৩০
মেট্রোরেল ট্রানজিট (MRT) নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য (কিমি)	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	০	০	২০	৩০	৪০	৫০
৫. উপখাত: নগর দারিদ্র্য ও গৃহায়ন *অভীষ্ট*: নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য রোজগারের সুযোগ, কর্মসংস্থান, বাসস্থান ও মৌলিক পরিষেবাসমূহের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং বস্তি/অনানুষ্ঠানিক জনবসতিগুলোর অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, যা বিস্তৃত নগর অঞ্চলের সঙ্গে এসব আবাসনগুলোর একীকরণকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করবে এবং এর বাসিন্দাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে।							
নগর দারিদ্র্যের হার (%)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জিইডি	১৫.৭ (২০১৬)	১৪	১৩	১২	১১	১০
বস্তি, অনানুষ্ঠানিক বসতি বা অপর্যাপ্ত আবাসনে বসবাসকারী নগর জনগোষ্ঠীর অনুপাত	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৩ (২০১৬)	৩১.৪	২৯.৮	২৮.২	২৬.৬	২৫
৬. উপখাত: নগরীর পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন *অভীষ্ট*: জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ-সম্পর্কিত তথ্য সমন্বিত এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি এবং মানকে সমন্বিত করে একটি একীভূত, পরিবেশসম্মত নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।							
পার্টিকুলেট পদার্থের মাধ্যমে গড় নগর বায়ুদূষণ (a) PM10 in $\mu g/m^3$ (b) PM2.5 in $\mu g/m^3$	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	(ক) ১৩০.৯ (খ) ৭৮.০ (২০১৩)	(ক) ১২৫.০ (খ) ৭৭.০	(ক) ১২০.০ (খ) ৭৬.০	(ক) ১১৫.০ (খ) ৭৫.০	(ক) ১১০.০ (খ) ৭৪.০	(ক) ১০৫.০ (খ) ৭৩.০
ঢাকায় সবুজ এলাকা (পার্ক, খেলার মাঠ প্রভৃতি) বেষ্টনী (প্রতি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বর্গকিলোমিটার)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	০.৭০ (২০১৪)	০.৮৬	১.০২	১.১৮	১.৩৪	১.৫০
অন্য সাতটি প্রধান শহরে সবুজ এলাকার আওতা (প্রতি ১০ লাখ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে বর্গকিলোমিটার)	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১.৫০-এর চেয়ে কম	১.৫০	১.৭৫	২.০০	২.২৫	২.৫০
পানির মান শতভাগ অক্ষুণ্ণ রেখে শহরের জলাশয়সমূহ সংরক্ষণের অনুপাত	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	০	০২	০৪	০৬	০৮	১০
যথাযথ নর্দমা ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যামুক্ত হওয়া শহরের অনুপাত	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	০	০২	০৪	০৬	০৮	১০

৯.৯.৫ নগর খাতের জন্য সম্পদ সংগ্রহ

সরকারের উন্নয়ন বাজেটে ঐতিহ্যগতভাবেই নগর অবকাঠামো-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। বিগত ১০ বছরে সরকার এ বিনিয়োগ কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশ নেয়ার জন্য সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। সরকারি বিনিয়োগ নীতি ও সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলে অবকাঠামো খাতে অর্থায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের ভূমিকার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে নগর উন্নয়নে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর বড় অংশের বাস্তবায়নে এখনো সরকারি উদ্যোগই মুখ্য। বিশেষ করে যেসব প্রকল্পের ব্যাপক মাত্রায় সামাজিক সুফল বিদ্যমান, কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় নয়, তেমন প্রকল্পে সরকারের উদ্যোগই প্রধান। এ ধরণের প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সড়ক ও মহাসড়ক এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রকল্প। এসব প্রকল্পে বিনিয়োগের অর্থ উঠে আসতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন পড়ে।

স্থানীয় সরকারের সম্পদসমূহ

একটি সুপরিকল্পিত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের সম্পদ সংগ্রহের বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি প্রধান নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হবে। অধ্যায় ৭-এর দ্বিতীয় খণ্ডে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচির বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, উন্নততর পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশগুলো (UMIC) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়িত করতে ও তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে

উল্লেখযোগ্য মাত্রায় আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন করেছে। বাংলাদেশ যেহেতু উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে, কাজেই বাংলাদেশও এ ধরণের মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম চালু করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেই এ সংস্কার কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটবে, কিন্তু এটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে পরবর্তী ১০ বছরে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত সংস্কার কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করা হবে:

- স্থানীয় সরকারের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অর্থ ছাড়ের বিষয়টি আগে থেকেই নির্দিষ্ট করতে হবে। একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাবে তা নির্ভর করবে সেটির অধিক্ষেত্রভুক্ত জনসংখ্যা, দারিদ্র্য হার, সম্পদ সংহতকরণের সুযোগ ও কর্মসম্পাদনের ওপর। স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (খএঝচ) মাধ্যমে এক্ষেত্রে এরই মধ্যে কিছু ইতিবাচক অভিজ্ঞতার দেখা মিলেছে।
- স্থানীয় সরকারগুলোর আয়ের প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে সম্পদ কর (হোল্ডিং কর)। সম্পদের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক হারে এ কর ধার্য করা হবে এবং সম্পদের মালিকের ওপর যাতে বাড়তি চাপ না পড়ে, সেজন্য প্রতি তিন বছর অন্তর সম্পদ পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে করহার পরিবর্তন করা হবে।
- স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো যেসব পরিষেবা সরবরাহ করে, সেসব পরিষেবার বিপরীতে আদায় করা ফি ও মাশুল থেকে যাতে এগুলোর পূর্ণ খরচ উঠে আসে, সে বিষয়ে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

অবকাঠামো প্রকল্পে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ

অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোয় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বিদ্যুৎ প্রকল্প, টেলিযোগাযোগ, বিমানবন্দর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন, সেতুর টোল আদায়, স্থলবন্দর উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করে সরকার সফলতা পেয়েছে। সরকার এখন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মডেলে অবকাঠামো প্রকল্পে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। এছাড়া অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বিষয়ে সম্প্রতি সরকার একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে।

৯.৯.৬ নগর উন্নয়নে স্থানীয় অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের মধ্যে কার্যকর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুফল পাওয়া সম্ভব। বেসরকারি খাতের কোম্পানি, অনানুষ্ঠানিক খাতের উদ্যোক্তাগণ, নাগরিক সংগঠনসমূহ (CBO) এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) বিভিন্ন নগর পরিষেবা সরবরাহ, সম্পদ সংহতকরণ (অথবা স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম), উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রচলন ও ভূমি উন্নয়নের মতো কার্যক্রম পরিচালনায় বড় ধরণের ভূমিকা রাখতে পারে। নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করতে হলে সহায়ক আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৯.৭ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হলে নগর উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। আর সেটি করতে হলে উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতীয় নগর অগ্রাধিকার ও এ-সম্পর্কিত নগর সংস্কারের বিষয়বস্তু নির্দিষ্টকরণ ও নকশাকরণ এবং নগর স্থানীয় সরকারগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরামর্শ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি নগরায়ণের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে, উদীয়মান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলো শনাক্ত করবে এবং সংশ্লিষ্ট নগরকেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করবে।

৯.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নগর খাতের উন্নয়নে তহবিলের জোগান

যেহেতু নগর খাতের উন্নয়নের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাই এ খাতে এডিপি বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রেও তা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ভাগ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে এডিপি বরাদ্দের সিংহভাগই যায় স্থানীয় সরকার বিভাগে, যা সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। নগর পরিবহন অবকাঠামো খাতের বেশিরভাগ প্রকল্পের অর্থায়ন নিশ্চিত হয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে।

গৃহায়ন ও গণপূর্তমূলক কাজের ক্ষেত্রে গৃহায়নের প্রধান কার্যক্রম সম্পাদিত হয় বেসরকারি খাতের মাধ্যমে। আর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্বল্পমূল্যের আবাসন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ আবাসনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভূমিতে বিভিন্ন ধরণের আবাসনকেন্দ্রিক নগর সুবিধাদি সরবরাহ করে থাকে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালায়ের প্রস্তাবিত সামগ্রিক সম্পদ ও আপেক্ষিক ব্যয়ের অগ্রাধিকারগুলোর একটি সুচিন্তিত মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য উন্নয়ন সম্পদের একটি চিত্র সারণি ৯.১৫-এ দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বাংলাদেশের নগর আবাসন খাতের উন্নয়নের অভীষ্ট ও উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নে সহায়তার লক্ষ্যে চিত্রিত কিছু নির্দেশক অঙ্ক।

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি শক্তিশালী ও টেকসই প্রবৃদ্ধিকাল অতিক্রম করছে, ফলে নগরায়ণের বিষয়টিও গতিময় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়টি নগর পরিষেবার ক্ষেত্রে বাড়তি চাহিদার জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু এসব পরিষেবার চাহিদা মেটাতে এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো বেশ হিমশিম খাচ্ছে। পরিষেবাসমূহের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন পড়বে, কারণ এরই মধ্যে পরিষেবা খাতে বেশ ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে বাড়তি সম্পদ আহরণে সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। হোল্ডিং কর, অন্যান্য কর, সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত ফি, ভূমি খাজনা প্রভৃতি খাত থেকে রাজস্ব বাড়ানো হলে তা বেশ ফলদায়ক হবে। এছাড়া পিপিপিভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণে সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাপান সরকার ও অন্যান্য উৎস থেকে সহজ শর্তের ঋণ সরবরাহ বাড়ানো এবং সে ঋণ পরিশোধে দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ইস্যু করার কার্যক্রম জোরদার করতে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। নগর খাতের জন্য উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি কেবল গৃহায়ন ও গণপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং খাতভিত্তিক পরিকল্পনা নির্দিষ্টকরণের ধারাবাহিকতা রক্ষার বিষয়টি স্থানীয় সরকারের ওপরও অনেকখানি বর্তায় (দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায় ৭)।

গৃহায়ন ও গণপূর্তমূলক কাজের ক্ষেত্রে গৃহায়নের প্রধান কার্যক্রম সম্পাদিত হয় বেসরকারি খাতের মাধ্যমে। আর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় স্বল্প খরচের আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে রাজউক আবাসনের ভূমি উন্নয়ন ও নগর আবাসনের অন্যান্য সুবিধা সরবরাহ করে থাকে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত সামগ্রিক সম্পদ ও আপেক্ষিক ব্যয়ের অগ্রাধিকারগুলোর একটি সুচিন্তিত মূল্যায়ন ও সম্ভাব্য উন্নয়ন সম্পদের একটি চিত্র সারণি ৯.১৫ ও সারণি ৯.১৬-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ৯.১৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪২.৮	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১
খাতভিত্তিক মোট	৪২.৮	৫২.৭	৬০.৮	৭০.৯	৮৫.১

সূত্র: অধ্যায় ৫, খণ্ড ১, সংযুক্তি সারণি এ৫.১

সারণি ৯.১৬: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহায়ন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, ২০২১ অর্থ-বছরের স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪২.৮	৫০.০	৫৪.৯	৬১.০	৬৯.৯
খাতভিত্তিক মোট	৪২.৮	৫০.০	৫৪.৯	৬১.০	**৬৯.৯**

সূত্র: অধ্যায় ৫, খণ্ড ১, সংযুক্তি সারণি এ৫.২

খাত-১০:

স্বাস্থ্য

অধ্যায় ১০

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি

১০.১ পর্যালোচনা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) স্বাস্থ্যের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছে, তার মর্মার্থ হলো, 'স্বাস্থ্য বলতে কেবল রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বোঝায় না, বরং এটি একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ বজায় থাকার অবস্থাকে নির্দেশ করে।' শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত। টেকসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুণগত স্বাস্থ্য সেবা ও কার্যকর জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ সাধারণভাবে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও তাদের শ্রম উৎপাদনশীলতা ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলোর বিশাল ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান। সে কারণে ডব্লিউএইচও মানবস্বাস্থ্যকে অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ ঘোষণা করে যে, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অবস্থান এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে। টেকসই স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা ও মানব উন্নয়নের জন্য এমডিজি ও এসডিজি উভয় উন্নয়ন এজেন্ডাতেই সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার গুরুত্বের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সুস্বাস্থ্য শিক্ষা অর্জন এবং আয় সৃজনের সক্ষমতার মতো মানব সম্পদগুলোকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ও সুখী জীবন-জীবিকা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চলমান কোভিড-১৯ মহামারীকালে জাতীয় উন্নয়ন ও কল্যাণ কার্যক্রমে মানবস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ব্যাপক মাত্রায় অনুভূত হয়েছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসজনিত রোগটি সবার অজান্তেই পুরো বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে এবং কোটি কোটি মানুষ এ রোগের সংক্রমণের শিকার হওয়ার পাশাপাশি কয়েক লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। রোগটির বিস্তার রোধে দেশের সরকার কয়েক মাসের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছিল। এ লকডাউনের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা নেমে আসে। অধিকাংশ দেশকে এই অতিমারী এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছে যে, দেশগুলো অর্থনৈতিক মন্দার কিনারে চলে গেছে এবং এর ফলস্বরূপ দেশগুলোয় আয়-রোজগার কমে যাওয়া, উৎপাদন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়া, বিনিয়োগ কমে যাওয়া, রপ্তানি বিঘ্নিত হওয়া ও সরকারি রাজস্ব হ্রাস পাওয়ার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। বাংলাদেশও কোভিড-১৯ মহামারী দ্বারা মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়েছে এবং সরবরাহ ও চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসেবা খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধানগুলো প্রকাশ পেয়েছে। সরবরাহ অংশে যেসব সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সক্ষমতার দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত ভৌত সুবিধাদি, জরুরি প্রস্তুতির ঘাটতি, জনবলের সংকট, গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ও তার সরবরাহের ঘাটতি এবং সারা দেশে স্বাস্থ্যসেবাগত সুবিধাদির ভারসাম্যহীন বণ্টন ব্যবস্থা। চাহিদা অংশে যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য অর্থ পরিশোধের সক্ষমতার ঘাটতি একটি বড় বাঁধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এছাড়া, এটি কোভিড-১৯ পূর্ব স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা এবং সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের সংমিশ্রণের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটানোর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।

জনসংখ্যার বিষয়টি যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলতে হবে, জনসংখ্যা হচ্ছে দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পত্তির যথাযথ পুনরুদ্ধার বলতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানবকল্যাণে এর নিঃশেষ হওয়া উভয় বিষয়টিকেই নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যেসব দেশ জনসংখ্যার উন্নয়নে ভালোভাবে ও প্রাজ্ঞভাবে বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে, তারাই ভালোভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিষয়টি মোকাবিলার বিতর্কটির উদ্ভব হয়েছিল গত শতকের ষাটের দশকে। তখন জনসংখ্যাকে একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। বৈশ্বিক জনসংখ্যার উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যার ঝুঁকি অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশার প্রধান কারণ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে বলে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন এ বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছিল যে, উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যার যথাযথ ব্যবস্থাপনা কেবল জনসংখ্যার মোট প্রবৃদ্ধির হার (TFR) হ্রাসের মাধ্যমেই হয় না, বরং এটি নারীদেরকে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ক্ষমতায়িত করা, ঝুঁকি হ্রাস করার মাধ্যমে জনসংখ্যার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় তথা মাতৃগর্ভ থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর ওপরও নির্ভর করে। এই পুনর্বিবেচনার ফলে ১৯৯৪ সালে কায়রোতে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ICPD) চলাকালে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী চুক্তি হয়েছিল।

একটি দেশের জনসংখ্যার স্বাস্থ্যের বিষয়টি ভালো মানের পুষ্টি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। পর্যাপ্ত পুষ্টি একটি স্বাস্থ্যকর জীবনের ভিত্তি এবং এটি রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সুস্বাস্থ্য অর্জনের বিষয়টি পর্যাপ্ত মাত্রায় ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ওপর নির্ভর করে। দুর্বল পুষ্টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে, রোগের সংক্রমণ বৃদ্ধি করতে পারে, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও মনোস্তাত্ত্বিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দিতে পারে। একইভাবে জনসংখ্যাও বিভিন্ন উপায়ে স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। একটি বৃহৎ জনসংখ্যার স্বাস্থ্যসম্পদ, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং খাদ্য প্রাপ্যতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN) খাতটিকে আরও স্বতন্ত্র উপাদানে বিভক্ত করা যেতে পারে, যার প্রতিটি উপাদানই কৌশলগত ও লক্ষ্যগত দিক দিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। তবে এ বিষয়টি স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, এ তিনটি উপখাত একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, যা এইচপিএন খাতকে একটি সামগ্রিক নীতি কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে তোলে এবং একটি উপখাতের ক্রিয়াকলাপগুলোকে অন্যটির ক্রিয়াকলাপের পরিপূরক হিসেবে করার সুযোগ করে দেয়। এইচপিএন খাতের কার্যকর ফলাফল প্রাপ্তি নির্ভর করে সম্পদের প্রাপ্যতা, সমন্বয়, ভালো পরিকল্পনা, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে কাজ করা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর যথাযথ জবাবদিহিতার ওপর।

১০.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN) খাতে ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশ 'সেক্টর-ওয়াইড অ্যাপ্রোচ (SWAP)' অনুসরণ করে আসছে। এসডাব্লিউএ এমন একটি পদ্ধতি, যা সেক্টর জুড়ে একটি সাধারণ পন্থা অবলম্বন করে সমস্ত তহবিল ছাড়করণ ও হিসাবরক্ষণে সরকারি পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকারি নেতৃত্বে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী (DP) ও অন্যান্য অংশীজনদের একটি একক খাতভিত্তিক নীতি ও ব্যয় কর্মসূচির আওতায় একত্রিত করে। তবে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাইরে (MOHFW) যেসব সংস্থা (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রভৃতি) স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে, সেগুলোকে এসডব্লিউএপি'র স্বাস্থ্য সেবার হিসেবের আওতায় আনা হয় না। তবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কাজে যুক্ত অন্যান্য অংশীজন/মন্ত্রণালয়/সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

দেশের প্রথম এসডাব্লিউএ 'স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (HPSP)' (১৯৯৮-২০০৩) হিসেবে পরিচিত। এ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি 'ওয়ান স্টপ' সেবা মডেল প্রয়োগ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা (FP) প্রদান করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার (PHC) গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্যাকেজের (ESP) সরবরাহ বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় এসডব্লিউএপি পরিচিত ছিল 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি (HNPSP)' নামে। ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল মেয়াদে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারকারীকেন্দ্রিক, কার্যকর, দক্ষ, ন্যায়সংগত, সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য মানসম্পন্ন এইচপিএন পরিষেবাদির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা। ২০১১ সালে গৃহীত তৃতীয় এসডাব্লিউএ'র শিরোনাম ছিল 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)'। ২০১১ সালের জুলাই থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মেয়াদে এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিষেবাসমূহের উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। ২০১৭ থেকে ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন 'চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (4^{th} HPNSP)' বাস্তবায়নে একটি সামগ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেসব কারণে এ কর্মসূচিটি ব্যতিক্রম, তার মধ্যে রয়েছে–(ক) এইচপিএন খাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের গভর্ন্যান্স ও সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত (স্টেওয়ার্ডশিপ) ভূমিকা শক্তিশালীকরণ; (খ) দক্ষ পরিষেবা সরবরাহের জন্য পদ্ধতি/প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ; এবং (গ) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে এইচপিএন পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং সেবার মান বৃদ্ধিকরণ। চতুর্থ এসডাব্লিউএ বা চতুর্থ এইচপিএনএসপি'কে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং এটি হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য (UHC) নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসডিজিতে নির্ধারিত অভীষ্ট বাস্তবায়নে ধারাবাহিক তিনটি ধাপের প্রথম পর্যায়। এইচপিএন খাতের উন্নয়নের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার এসডাব্লিউএ'র যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও সেগুলো চলমান রাখা হবে।

চলমান এসডাব্লিউএ-সহ প্রত্যেকটি এসডাব্লিউএ'তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে দরিদ্রবান্ধব জরুরি সেবা প্যাকেজের (ESP) ওপর। এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যবধান কমার পাশাপাশি এক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম আরও এগিয়ে গেছে। এমন উদ্যোগের ফলে সাধারণভাবে স্বাস্থ্য সেবার বেশকিছু সূচকে বেশ ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, কিন্তু দেশের কিছু এলাকা এক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এই পিছিয়ে থাকার পেছনে ওইসব এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দায়ী। চতুর্থ এইচপিএনএসপি'র লক্ষ্য হলো এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে

বাংলাদেশের মানুষ স্বাস্থ্য সেবার সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌঁছতে পারে এবং তা বজায় রাখতে পারে। দুটি প্রধান উপাদানের অধীনে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা এবং তা কাজে লাগানোর প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে দেশের সব নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন ও ন্যায়সংগত স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি পরিষেবা নিশ্চিত করাই এটির প্রধান অভীষ্ট। এ দুটির প্রথম উপাদানটির লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য, কিশোরী স্বাস্থ্য, অসংক্রামক ব্যাধি, যক্ষ্মা (টিবি) প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতিসহ সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো। আর দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য গভর্ন্যান্স ও স্বাস্থ্য খাতের মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি।

স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন সাধনে সার্বিকভাবে ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে এইচপিএন পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও তার বাস্তবায়ন, মাতৃস্বাস্থ্যের পাশাপাশি পুষ্টি ও জনসংখ্যাবিষয়ক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন এবং নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য কৌশল উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি। স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে দরিদ্র নারীদের জন্য স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা বেড়েছে। ডিজিটালকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশান সিস্টেম (MIS) ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এছাড়াও, ক্রয় কার্যক্রম, বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন, খাতভিত্তিক সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা, তহবিল ব্যবহারের সক্ষমতা উন্নয়ন, পরিবীক্ষণ এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সহায়ক পরিবেশের উন্নয়নের ফলে এনএমআর, আইএমআর, ইউ-৫এমআর, এমএমআর, টিএফআর, পুষ্টিহীনতা, খর্বতা, শিশুর ওজন কম হওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলো কমানো সম্ভব হয়েছে। এতে শিশুর জন্মের পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে দেশের জনগোষ্ঠীর উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তা অর্জনের জন্য একটি একক সেবাকেন্দ্র থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সব ধরণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC) প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়মিত সরকারি চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে পুষ্টি সেবাগুলো মূলধারায় আনার ফলে সেবা ব্যবস্থা আরও সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসহ (সিসি) পরিষেবা সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বয় সাধন পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&WFC) ভিত্তিক নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের জন্য এইচপিএন পরিষেবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জরুরি সেবা প্যাকেজের (ESP) হালনাগাদকরণ ও চতুর্থ এইচপিএনএসপির বাস্তবায়নকাল থেকে জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির সম্প্রসারণের ফলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এইচপিএন পরিষেবার প্রাপ্যতায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২০১০ সাল থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর গুরুত্ব পুনর্বহাল করা এবং পর্যাপ্ত জনবল, সরঞ্জাম ও ওষুধ দিয়ে এগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানো স্বাস্থ্যসেবা খাতের অর্জনে আরেকটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য অর্থায়ন কৌশল (২০১২-২০৩০) এবং ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) অনুমোদন টেকসই অর্থায়নের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতির অগ্রগতি সাধনে সরকারের উচ্চমাত্রার প্রতিশ্রুতির স্মারক। গত দশকে স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন খালি পদে নিয়োগের বিষয়েও বেশ অগ্রগতি হয়েছে। এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিকিৎসক, সেবিকা, ধাত্রী, মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মী প্রভৃতি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এতে করে অনুমোদিত খালি পদের সংখ্যা ২০১১ সালের ২০ শতাংশ থেকে ২০১৮ সালে ১৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এইচপিএন খাতের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ারও উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইচপিএন খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত কর্মসম্পাদনের চিত্র সারণি ১০.১-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ১০.১: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন

ক্রমিক	সূচক	৭ম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬- ২০২০)	২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	জন্ম পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	৭২	৭২.৬ (SVRS, 2019)
২	মোট উর্বরতার হার (TFR) (জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি)	২.০	২.০৪ (SVRS, 2019)
৩	৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার (U54MR)/প্রতিহাজার জীবিত জন্মে	৩৭	২৮ (SVRS, 2019)
৪	নবজাতক মৃত্যুর হার/প্রতিহাজার জীবিত জন্মে	২০	১৫ (SVRS, 2019)
৫	মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর)/প্রতি লাখের বিপরীতে	১০৫	১৬৫ (SVRS, 2019)
৬	৫ বছরের নিচে কম ওজনবিশিষ্ট শিশুর অনুপাত (%)	২০	২২.৬ (MICS, 2019)
৭	৫ বছরের নিচে খর্বকায় শিশুর অনুপাত (%)	২৫	২৮ (MICS, 2019)
৮	সন্তান প্রসবকালে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর সেবাপ্রাপ্ত প্রসূতির অনুপাত (%)	৬৫	৮৩.৫ (SVRS, 2019)
৯	জন্মনিরোধক উপকরণ ব্যবহারকারীর অনুপাত (%)	৭৫	৬৩.৪ (SVRS, 2019)
১০	১২ মাসের মধ্যে প্রযোজ্য শতভাগ টিকাদান সম্পন্ন হওয়া শিশুর অনুপাত (%)	৯৫	৮৬ (BDHS 2017-18)
১১	সম্পদের মাত্রা বিচারে জন্মকালে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যবধানের অনুপাত (সম্পদ মালিকানার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ের অনুপাত)	১: ৩.৫	১: ৩ (BDHS 2017-18)
১২	যক্ষ্মা শনাক্তকরণ হার (%)	৭৫	৭৩ (NTP 2018)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এসভিআরএস=স্যাম্পল ভাইটাল নিবন্ধন পদ্ধতি, এমআইসিএস=বহুমাত্রিক সূচকবিশিষ্ট গুচ্ছ জরিপ, বিডিএইচএস=বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ, এনটিপি=জাতীয় যক্ষ্মা কর্মসূচি

সূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১০.২.১ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এসডিজি অভীষ্টের অগ্রগতি

১৭টি অভীষ্টের মধ্যে এসডিজি-৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং এসডিজি-২ পুষ্টিসংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়টির সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এসডিজি-৩-এর ২৭টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০টি এবং এসডিজি-২-এর দুটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা অর্পিত রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর। একটি অনুমোদিত এসডিজি কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অর্পিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। এসডিজি অর্জনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলোর বিষয়ে অংশীজনদের মধ্যে বোঝাপড়া ও জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসডিজির বিভিন্ন ধারণা ও নীতি সম্পর্কে বিভাগীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মশালা পরিচালনা করেছে, যাতে করে মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর সঙ্গে এসডিজির বিষয়বস্তুর সংগতিবিধান করা যায়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের (HSD) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এসডিজির প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের বিষয়ে ক্ষেত্রভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিচে পর্যালোচনা করা হলো:

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর্যায়ে প্রতি লাখ প্রসূতি মায়ের বিপরীতে মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) ২০১৫ সালে ছিল ১৮১ জন। যা ২০১৯ সালে প্রতি লাখে ১৬৫ জনে নেমে আসে (SVRS, 2019)। পাঁচ বছরের নিচের শিশুর মৃত্যুর হার ধারাবাহিকভাবে কমে এসেছে। ২০১৫ সালে প্রতি হাজার জীবিত জন্মের বিপরীতে এ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৬ জন, ২০১৯ সালে তা ২৮ জনে নেমে আসে (SVRS, 2019)। এক্ষেত্রে এসডিজিতে ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এরই মধ্যে অর্জিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে নবজাতক মৃত্যুর সংখ্যা (NMR) ২০১৫ সালের ২০ জন থেকে কমে ২০১৯ সালে ১৫ জনে নেমে এসেছে। এক্ষেত্রেও ২০২৫ সালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার (সকল বয়সীদের মধ্যে) খুবই নগণ্য (সকল বয়সী প্রতি হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের শিকার <০.০১ জন। আর ৪৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী প্রতিহাজার পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে এ সংখ্যা মাত্র ০.০১৫ জন, ইউএনএইডস, ২০১৮)। ২০১৫ সালে প্রতি এক লাখ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যক্ষ্মা (টিবি) সংক্রমণের শিকার ছিলেন ২২৫ জন (ডব্লিউএইচও, ২০১৫); ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ২২১ জনে নেমে আসে (WHO, 2019)। জাতীয় টিবি কর্মসূচি (NTB) তার বিভিন্ন অংশীজনদের সহায়তায় টিবি নিয়ন্ত্রণের মৌলিক পরিষেবাসমূহ বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ কর্মসূচির আওতায় যক্ষ্মারোগ শনাক্তকরণ ও এর চিকিৎসায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

২০১৫ সালে প্রতি এক হাজার মানুষের বিপরীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২.৯৯ জন (জাতীয় ম্যালেরিয়া নিমূল কর্মসূচি-NMEP, 2015); এ হারও হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৮ সালে প্রতি হাজার মানুষের বিপরীতে ম্যালেরিয়া সংক্রমণের এ সংখ্যা ০.৯২ জনে নেমে আসে (NMEP, 2018)। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওগুলোর সহযোগিতায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া নির্মূল ও জাতীয়ভাবে এটির উপস্থিতি কমিয়ে আনার উদ্যোগে এ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশকে অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (NTD) বোঝা বয়ে বেড়াতে হচ্ছে; এসব রোগের মধ্যে রয়েছে কালাজ্বর, লিমফ্যাটিক ফিলারিয়াসি, ডেঙ্গু প্রভৃতি। এক্ষেত্রে এসডিজিতে নির্ধারিত 'এনটিডি মোকাবিলায় সেবা প্রয়োজন হওয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা' শীর্ষক সূচকে দেখা যায়, বাংলাদেশে এনটিডির সংখ্যা বেড়েছে। ডব্লিউএইচওয়ের হিসাব মতে, ২০১৬ সালে এ কর্মসূচির আওতায় আসা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি (৫০ মিলিয়ন), ২০২০ সালে এ সংখ্যা ৫৬.৩৩ মিলিয়নে (পাঁচ কোটি ৬৩ লাখ ৩০ হাজার) উন্নীত হয় (বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান, WHO, 2020)। ৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৩৫.০ মিলিয়নে (সাড়ে তিন কোটি) নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এনটিডির সংক্রমণ কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমন্বিত মশাবাহিত রোগ ব্যবস্থাপনা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রসার; এবং এসব কার্যক্রমে জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে কার্যক্রম চলমান।

দেশে সৃষ্ট সামগ্রিক রোগের সমষ্টির মধ্যে অসংক্রামক রোগ (NCD) এখন একটি বড় অংশ দখল করে আছে এবং এতে মৃত্যুহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগ, কর্কট রোগ, ডায়াবেটিস ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগের কারণে ২০১৬ সালে সামগ্রিক মৃত্যুহার ছিল ২১.৬ শতাংশ। ২০২০ সাল পর্যন্ত এ পরিস্থিতি অপরিবর্ততই ছিল (বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান, ডব্লিউএইচও, ২০২০)। এনসিডি প্রতিরোধে মানুষের বিভিন্ন অভ্যাস পরিবর্তন করা, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনয়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এনসিডি রোগীদের আরও ভালো মানের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ডব্লিউএইচও ঘোষিত এফসিটিসি ও বাংলাদেশ সরকার প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (HSD) বিভিন্ন ধরণের তামাকবিরোধী কর্মসূচির বাস্তবায়ন করে চলেছে। বৈশ্বিক পূর্ণবয়স্ক তামাক জরিপ (গ্যাটস) ২০১৮ অনুসারে, ২০০৯ সালে দেশে ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাকসেবীর হার ছিল ৪৩.৩ শতাংশ, ২০১৭ সালে যা ৩৫.৩ শতাংশে নেমে আসে। এর মধ্যে ৪৬.০ শতাংশ পুরুষ এবং ২৫.২ শতাংশ নারী। সে হিসেবে দেশে তামাকসেবীর হার কমেছে। তামাকের ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে এটির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (EPI) মাধ্যমে ১৯৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ একটি কার্যকর জাতীয় টিকাদান কর্মসূচির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় যাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কথা (≤১২ মাস বয়সী শিশু), তাদের মধ্যে সব ধরণের টিকা গ্রহণকারী শিশুর শতাংশীয় হার ২০১৪ সালে ছিল ৭৮ শতাংশ (বিডিএইচএস, ২০১৪), ২০১৭-১৮ সময়ে এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬ শতাংশে উন্নীত হয় (বিডিএইচএস, ২০১৭-১৮)। ২০২৫ সালের মধ্যে এ হার ৯৮ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা শতভাগে উন্নীত করতে হবে। ২০২০ সালে চতুর্থ এইচপিএনএসপি কর্মসূচির মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। এ মূল্যায়নে ইপিআই কর্মসূচিতে প্রবৃদ্ধি পরিবীক্ষণ ও প্রসার (জিএমপি) কার্যক্রম যুক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

২০১১ সালে চিকিৎসক, সেবিকা, ধাত্রী, মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মী প্রভৃতি ক্ষেত্রে কূন্য পদের হার ছিল ২০ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য হারে এসব ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগ দেয়ার ফলে ২০১৮ সালে কূন্যপদ ১৫ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৬ সালে প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে স্বাস্থ্য কর্মীর ঘনত্বের সংখ্যা ছিল ৭.৪ জন। এক্ষেত্রে চিকিৎসক:সেবিকা:স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর ক্রম ছিল যথাক্রমে ১:০.৫:০.২ জন (এইচআরএইচ ডেটা শিট, ২০১৪, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)। ২০২০ সালে স্বাস্থ্য কর্মীর এ ঘনত্বের বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বছরটিতে প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ৯.৯ জনে উন্নীত হয় (স্বাস্থ্য এসডিজি প্রফাইল, বাংলাদেশ, ডব্লিউএইচও, ২০২০)। এক্ষেত্রে চিকিৎসক: সেবিকা: স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর ক্রম ছিল যথাক্রমে ১:০.৬:০.৩ জন (এইচআরএইচ ডেটা শিট, ২০১৯, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)। ২০১৯ সাল থেকে সরকারি পর্যায়ে ৪১টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট কার্যক্রম চলমান রেখেছে। মিডওয়াইফারি ক্যাডারের প্রবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি মাইলফলক, যা প্রসূতি, নবজাতক ও প্রজনন স্বাস্থ্য, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে চলেছে। প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু রোধ এবং সন্তান জন্মদান সংশ্লিষ্ট নানা জটিলতা রোধকরণ ও রোগমুক্তির ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (MEFWD) পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্য সেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা সম্পর্কিত দুটি সূচক অর্জনের কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানোর মতো অন্য সূচকগুলো অর্জনেও এটি গভীর প্রভাব ফেলে। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) ৩০ শতাংশ, নবজাতক মৃত্যুও হার ২০ শতাংশ, ৬৬ শতাংশের বেশি পরিমাণ অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ এবং ৪০ শতাংশের মতো গর্ভপাত রোধ করা সম্ভব। বিবিএসের তথ্যানুসারে, বর্তমানে প্রজনন সক্ষম (১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী) নারীদের মধ্যে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণকারীদের মধ্যে এটির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন ৭৭.৪ শতাংশ (MICS 2019)। ২০৩০ সালেল মধ্যে এ হার শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে এমইএফডব্লিউডি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। অন্যদিকে এসভিআরএস ২০১৮ অনুসারে, প্রতি এক হাজার কিশোরীর (১০-১৯ বছর বয়সী) মধ্যে গর্ভধারণকালীন সংখ্যা ৭৪ জন। ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০ জনে নামিয়ে আনার বিষয়ে এমইএফডব্লিউডি জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এসডিজির আরও সাতটি সূচক অর্জনের ক্ষেত্রে এমইএফডব্লিউডি সহ-নেতৃত্বদানকারী এবং ১৩টি সূচকের ক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত এসডিজির অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এমইএফডব্লিউডির সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, যেমন–পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে খর্বতার অনুপাত, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের কৃশতার হার ও বেশি ওজনের শিশুর অনুপাত, মাতৃমৃত্যুর অনুপাত (প্রতি এক লাখ জীবিত জন্মে), শিশুর জন্মকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবাপ্রাপ্তির অনুপাত, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে), নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি এক হাজার জীবিত জন্মে) কমিয়ে আনা এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার আবর্তন নিশ্চিত করা। এসডিজি অর্জনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলোর বিষয়ে অংশীজনদের মধ্যে বোঝাপড়া ও জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসডিজির বিভিন্ন ধারণা ও নীতি সম্পর্কে বিভাগীয় পর্যায়ে এমইএফডব্লিউডি কর্মশালা পরিচালনা করেছে, যাতে করে মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোর সঙ্গে এসডিজির বিষয়বস্তুর সংগতি বিধান করা যায়।

১০.২.২ চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-এর অগ্রগতি

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২২ সালের জুন মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের মার্চে সরকার চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি) অনুমোদন করে। এটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এর মধ্যে ৮৪ শতাংশই সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে। চতুর্থ এইচপিএনএসপি'র অধীনে ২৯টি পরিচালন পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে ১৯টি বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের (HSD) ওপর অর্পিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–হাসপাতাল সেবা ব্যবস্থাপনা; স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা; প্রসূতি, নবজাতক, শিশু ও কিশোরী স্বাস্থ্য সেবা; পুষ্টি সেবা সরবরাহ; সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ; মানব সম্পদ (HR) উন্নয়ন; পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও খাতভিত্তিক ব্যবস্থাপনা; স্বাস্থ্য তথ্য সেবা (HIS) ও ই-স্বাস্থ্য সেবা; স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তনের বিষয়টি উৎসাহিতকরণ; কেনাকাটা, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। এর বাইরে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত আরও ৩৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুণগত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের অধিকতর সমন্বয়সাধন; স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তিখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি; হাসপাতাল সেবার গুণগত মানোন্নয়ন; সমন্বিত স্বাস্থ্য জনবল কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা; জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; জনস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতে আন্তঃখাতের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অসংক্রামক (NCD) রোগগুলোর ক্রমবর্ধমান বোঝা হ্রাসকরণ; বিদ্যমান ও নতুন নতুন সংক্রামক ব্যাধিগুলো মোকাবিলা; তদারকি, উপাত্তের গুণগত মান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ; এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার মতো কৌশলগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে চতুর্থ এইচপিএনএসপি সেবা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে অবদান রেখে চলেছে।

নতুন তহবিল ছাড়করণে অগ্রগতি: চতুর্থ এইচপিএনএসপিতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ ছাড়ের বিষয়টি ফলাফলভিত্তিক অর্থছাড় পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। এটি অর্থছাড়করণ-সংযুক্ত সূচকের (DLI) সঙ্গে সম্পর্কিত বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়ন (IPF) নামে পরিচিত। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক ৫৮৮.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড়করণের বিষয়টি মোট ১৬টি ডিআইএর লক্ষ্যমাত্রাসহ নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বিতরণ-সংযুক্ত ফলাফলের (DLR) বার্ষিক কর্মসম্পাদনের ওপর নির্ভর করছে। এই ডিএলআর যাচাই করার জন্য স্বাধীন যাচাইকরণ সংস্থা (IVA) হিসেবে সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে।

ডিএলআইয়ের অর্জন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট পরিচালকে (লাইন ডিরেক্টর-এলডি) সহায়তা দান এবং আইএমইডি কর্তৃক যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কার্যক্রম তদারকির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি ডিএলআই পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগের (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার

কল্যাণ বিভাগ) সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিকল্পনা শাখার পক্ষ থেকে বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ডিএলআর অর্জনের তাৎপর্য, প্রমাণক তৈরি, প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যাচাইয়ের পদ্ধতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লাইন ডিরেক্টরদেরকে নিয়ে দুটি কর্মশালাও সম্পন্ন করা হয়েছিল। ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের ২৭৫.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় করার কথা ছিল। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে বাংলাদেশ সরকার হাতে পেয়েছিল ১৪০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এক্ষেত্রে অর্জনের হার ৫১ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারীদের জন্য এটি একটি নতুন পদ্ধতি এবং ডিএলআই যাচাই করার ক্ষেত্রে এটি আইএমইডির কাছেও সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয়। সেই বিবেচনায় ৫১ শতাংশ বাস্তবায়নের এ হার যথেষ্ট ভালো ও উল্লেখযোগ্য। অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা দূর করার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, যেমন–লাইন ডিরেক্টর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও বিশ্বব্যাংককে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

জাতীয় ইস্যুসমূহ: পুষ্টিহীনতা (রক্তস্বল্পতাসহ) বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়। এক্ষেত্রে ২০০৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বেশ ভালো অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বললে, কয়েক দশক ধরেই বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতা হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি খর্বকায় শিশুর হার (দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টিজনিত কারণে বয়সের অনুপাতে উচ্চতা কম) ২০০৭ সালের ৪৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ২৮ শতাংশে নেমে আসে। একই সময়কালে কম ওজনের শিশুর হার (বয়স অনুপাতে ওজন কম) ৪১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২.৬ শতাংশে নেমে আসে এবং কৃশতার হার ১৭ শতাংশ থেকে ৯.৮ শতাংশে নেমে আসে (MICS, 2019)। এছাড়া বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ২০১৪ সালের ৫৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়, ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য ডায়েটের (MAD) অনুপাত এ সময়ের ব্যবধানে ২১.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪.১ শতাংশে উন্নীত হয় এবং খাবারে ন্যূনতম বৈচিত্র্যের (MDD) হার ২৪.২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭.৫ শতাংশে উন্নীত হয়। যে কোনো সময়ের বিবেচনায় এগুলো অসামান্য অর্জন এবং এটি বাংলাদেশীদের সামাজিক রূপান্তরের বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

১০.২.৩ স্বাস্থ্য সেবায় অসমতা মোকাবিলায় অগ্রগতি

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ তিনটি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK) নামে সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী (BPL) কার্ডধারী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যা স্বাস্থ্য সেবা খাতে অসমতা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্প (MHVS) নামে আরেকটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প দেশের ৫৫টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এটির সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র ও ভঙ্গুর গর্ভবতী নারীরা। এ প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র মায়েদের নিরাপদ সন্তান প্রসব নিশ্চিত করতে মনোনীত সেবা সরবরাহকারী এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের পাশাপাশি এনজিওগুলো কর্তৃক সুনির্দিষ্ট পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করা হবে।

কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এক ধরণের নারীবান্ধব পরিবেশের নিশ্চয়তা দিচ্ছে এবং সেখানে সেবা নিতে আসা মানুষের মধ্যে ৯৫ শতাংশই নারী ও শিশু, যারা বাড়ির পাশের এ প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC) পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে (নাগরিক সহায়তা গোষ্ঠী এবং নাগরিক ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী)।

তবে স্বাস্থ্য সেবা খাতে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে এখনো বেশ কিছু বিষয় রয়ে গেছে। ভৌগোলিক অবস্থান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জেন্ডার ও বিভিন্ন ধরণের প্রান্তিকীকরণের ফলে স্বাস্থ্য সেবা খাতে এখনো অসমতা বিদ্যমান। চতুর্থ এইচপিএনএসপির আওতায় এসব অসমতার ইস্যুগুলো মোকাবিলায় দুর্গম এলাকায় (HTR) স্বাস্থ্য সেবার আবর্তন ধীরে ধীরে বাড়ানো, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যকর্মী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এসব কার্যক্রম অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও চলমান থাকবে।

১০.২.৪ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (ইউএইচসি) পদ্ধতির অগ্রগতি

বিশেষত গত তিন দশকে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা (HFA), প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC), জরুরি সেবা প্যাকেজ (ESP) প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ নাগরিকদের কাছে জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সেবাসমূহ সহজলভ্য করে তোলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রম হিসেবে ইএসপি সেবা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে

জেলা হাসপাতাল পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টির অধিকার নিশ্চিত করা এবং পুরো জনগণের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়ে এটি সরকারের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। জনগণের দোরগোড়ায় কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক পরিষেবা প্রচলনের বিষয়টি সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের দিকে এক ধাপ অগ্রগতি এনে দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবধান ঘুচিয়ে স্বাস্থ্য সেবা চিত্রের উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রেও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো অবদান রেখে চলেছে।

২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য তিনটি ধারাবাহিক এসডব্লিউএ'র মধ্যে চতুর্থ এইচপিএনএসপি হচ্ছে প্রথম ধাপ এবং এ উদ্যোগের ভিত্তিস্বরূপ, যা আর্থিক কষ্ট ব্যতিরেকেই সকল নাগরিকের জন্য গুণগত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকারের বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে (সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো উপায়ে এটি অর্জিত হতে পারে)। এসডিজি বিষয়ে ডব্লিউএইচও তার অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে (২০২০) বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন দিয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) সূচকে বাংলাদেশ ৫৩ শতাংশ নম্বর পেয়েছে, যা ২০১৭ সালে ৫০ শতাংশ ছিল।

পরিবার পরিকল্পনায় অগ্রগতি: পরিবার পরিকল্পনার অন্যান্য সূচকেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৯ সালে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩২ শতাংশে নেমে আসে, ২০১৫ সালে যা ছিল ১.৩৭ শতাংশ (এসভিআরএস, ২০১৯)। এছাড়া ঝরে পড়া ও অসম্পূর্ণ প্রয়োজনের (আনমেট নিড) হারও বেশ হ্রাস পেয়েছে, যা ছিল যথাক্রমে ৩৭ শতাংশ ও ১২ শতাংশ (ইউঐঝ ২০১৭-২০১৮)। প্রজনন-সক্ষম (১৫-৪৯ বছর) নারীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রতি সন্তুষ্টির হার ৭৭.৪ শতাংশ (MICS, 2019); যা আগে ছিল ৭২.৬ শতাংশ (SVRS, 2014)। প্রসূতি মায়েদের প্রসবকালীন সেবা যন্ত্রের হার ২০১৪ সালে ছিল ৩১.২ শতাংশ, ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ শতাংশে উন্নীত হয় এবং প্রসব-পরবর্তী সেবার আওতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে এটির অনুপাত ছিল ৩৩.৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে তা ৫২.১ শতাংশে উন্নীত হয় (BDHS 2017-2018)। জনসংখ্যা নিবন্ধন ব্যবস্থার (PRS) মাধ্যমে প্রায় এক কোটি জনগোষ্ঠীর খানাভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ ও জন্মনিরোধক পদ্ধতির সম্প্রসারণ, ক্লিনিক্যাল গর্ভরোধ ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারাভিযান প্রভৃতি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, নার্সিং শিক্ষা ও সেবা-সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে এর আধুনিকায়ন এবং আরও কার্যকর নার্সিং সেবা সরবরাহে নার্সদের দায়িত্ব পালনে দক্ষ ও দায়িত্বশীল করে তুলতে সরকার ২০১৬ সালের ৬ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নার্সিং সার্ভিস পরিদপ্তরের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে (DGNM) রূপান্তর করে। এ লক্ষ্যে নার্সিং কাউন্সিলও পুনর্গঠন করে এর নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (BNMC)। একজন মহাপরিচালক ও একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালকের পদ সৃজনসহ মোট ৭৭টি নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ডিজিএনএমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। সারাদেশে সেবা নিশ্চিত করতে তিন হাজার ধাত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩৮টি সরকারি নাসিং ইনস্টিটিউটে বর্তমানে মিডওয়াইফারির ওপর তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চলমান। মিডয়াইফারিতে ওয়েবসাইটভিত্তিক স্নাতকোত্তর কোর্সও চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনে আরও যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–একটি মিডওয়াইফারি নীতিমালার বিকাশ সাধন, মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারি অনুমোদন, গুণগত মিডওয়াইফারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো, মেডিকেল কলেজে স্বতন্ত্র মিডওয়াইফারি অনুষদ প্রতিষ্ঠা, ধাত্রীভিত্তিক মাতৃ ও নবজাতক সেবার প্রচলন, ধাত্রীদের সনদ প্রদান পরীক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত পদ সৃজন।

দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে (মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, দন্ত ইউনিট, নার্সিং কলেজ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, এমএটি, আইএইচটি প্রভৃতি)। ২০০৯ সালে দেশে এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৯০টি, ২০১৮ সালে তা ৭৮৬টিতে উন্নীত হয়। এই একই সময়ে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আসনসংখ্যা ১৭ হাজার ১০৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ হাজার ৪৭৩টিতে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগও নিপোর্টের মাধ্যমে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করেছে। প্রতিষ্ঠানটি আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন–পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর (DGFP), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), ডিজিএমই, ডিজিএনইম ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সেবা সরবরাহ কার্যক্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্ট ৩৬ হাজার ১৯৭ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, সেবা সরবরাহকারী ও মাঠকর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে নিপোর্ট একটি ডিজিটাল নিবন্ধন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৭ সালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবা জরিপ এবং ২০১৭-১৮ সময়ে বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ পরিচালনা করে।

১০.৩ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN) খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

কোভিড-১৯ মহামারীর আগে থেকেই সরকার স্বাস্থ্য খাতে নানা ধরণের পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ প্রত্যক্ষ করেছে। এসব চ্যালেঞ্জের কারণের মধ্যে রয়েছে–জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিভাজনের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তনশীলতা, আয়-রোজগার পরিবর্তনের কারণে চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতিতে পরিবর্তনশীলতা, নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শহরে স্থানান্তরিত হওয়া এবং নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর দ্রুত বর্ধনশীলতা, মহামারী রোগের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এবং চিকিৎসা প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মতো বিষয়গুলোয় পরিবর্তনশীলতা। এ খাতের কিছু প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. শিশু, কিশোরী ও প্রসূতি মায়েদের অপুষ্টি পরিস্থিতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। তবে বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি সাধনে আরও অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশে ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৬৫ শতাংশ পর্যাপ্ত মাত্রায় মায়ের বুকের দুধ পায়। আর ছয় থেকে ২৩ মাস বয়সীদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ শিশু যথাযথভাবে মায়ের দুধ পান করতে পারে (BDHS 2017-2018)। প্রজনন-সক্ষম নারী ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকণার ঘাটতি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনিরাপদ খাবার দেশের জন্য একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা এবং এটি বড় ধরণের জনস্বাস্থ্যগত ঝুঁকি তৈরির মাধ্যমে খাবার গ্রহণ সংক্রান্ত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি করছে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (হাইজিন) ও স্যানিটেশনের মান এখনো সন্তোষজনক নয় এবং শিশুদের খাবার প্রদানকারী কেয়ার গিভাররা শিশুদের খাবার পরিবেশনের আগে কদাচিৎ হাত ধুয়ে থাকেন।

২. ডায়াবেটিস, হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত নানা রোগ ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগ স্বাস্থ্য খাতে নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে, যা রোগাক্রান্ত মানুষ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এছাড়া মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তনের কারণে পুষ্টির ঘাটতি ও মাত্রাতিরিক্ত পুষ্টি পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে; এর পেছনে ভূমিকা রাখছে উচ্চমাত্রায় লবণ, চিনি ও স্নেহজাতীয় খাবার গ্রহণ। এছাড়া আরও কিছু উদীয়মান স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে এসিড নিক্ষেপ ও আগুনে পোড়া ক্ষত, পানিতে ডোবা ও সড়ক দুর্ঘটনাজনিত জখম; বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত নানা রোগ; যক্ষ্মা, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, হেপাটাইটিস বি ও সি, কোভিড-১৯ প্রভৃতির মতো সংক্রামক রোগ, বিভিন্ন ধরণের নতুন রোগ, বিদ্যমান রোগগুলোর পুনর্বার সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব এবং গুরুতর ও তীব্র অপুষ্টি এবং ভূ-জলবায়ুগত দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা।

৩. স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ খাতে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে–শিশুর জন্মের সময় দক্ষ ধাত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, শনাক্তকরণসহ মহামারী রোগের বিবর্তন এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের দ্বিগুণ প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা, বিভিন্ন ধরণের নতুন রোগ ও বিদ্যমান রোগগুলোর পুনর্বার সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণ, সার্বিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো, খাবার ও ওষুধের গুণগত মান ও নিরাপত্তার অগ্রগতি সাধন, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যগত সাড়া প্রদান, মানসিক ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিকৃতি ও বার্ধক্যজনিত স্মৃতিহীনতার চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্গম এলাকায় (এইচটিআর) স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, সেবার মানের উন্নয়ন সাধন প্রভৃতি।

৪. পরিবেশগত স্বাস্থ্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়গুলোয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুক্ত হওয়া একটি সাম্প্রতিক ইস্যু। শিশু, নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের পরিবেশগত স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার ফলে নানা ধরণের পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়ছে, যা রোগের সংক্রমণের হার ও মৃত্যুহার বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসডিজির এজেন্ডার আওতায় স্বাস্থ্যগত অগ্রগতির বিষয়ে নির্ধারিত বিভিন্ন জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নানা পরিবেশগত বিষয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও জনস্বাস্থ্যগত বিষয়গুলোর মধ্যে মানব স্বাস্থ্যের বিষয়টিকে পুনঃঅগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারগুলোর মধ্যে জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান।

৫. নগর এলাকার সম্প্রসারণ এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সেবার আওতা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নগরে স্থানান্তরিত হওয়া ও নগরীতে অব্যাহতভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি নগর এলাকায় কার্যকরভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (পিএইচসি) সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নগরীতে দ্রুততার সঙ্গে বর্ধমান প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার চাহিদা মোকাবিলা এবং বিভিন্ন অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা এসডিজি বাস্তবায়নকালে এক চলমান চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। নগরীর জনমিতিতে যে বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে, সে পরিস্থিতিতে নগর এলাকার বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সরবরাহ পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এ সেবার আওতা বাড়ানো ও গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে নগরীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা একান্ত আবশ্যক।

৬. স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয় (আইট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার) অব্যাহত মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে (২০১২ সালে মোট সেবা ব্যয়ের ৬৪ শতাংশ বহন করতে হতো সেবা গ্রহীতা ও তার স্বজনদের। ২০১৫ সালে এটি ৬৭ শতাংশে উঠে যায়। সামনের দিনগুলোয় এটি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে)। এ বিষয়টি নিম্নআয় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির বিষয়টিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগকে বাঁধাগ্রস্ত করছে। ডব্লিউএইচওর তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশের ২৪.৭ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং তাদের পরিবারের মোট ব্যয়ের অন্তত ১০ শতাংশই চলে যায় স্বাস্থ্য সেবার ব্যয় মেটাতে। বাংলাদেশ যদিও দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় মেটাতে গিয়ে প্রতিবছর সাত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। ফলে স্বাস্থ্য সেবা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় কমানো এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৭. এসডিজির অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্ধারিত সূচকের জন্য স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতির বার্ষিক ফলাফলের ওপর নিয়মিতভাবে প্রতিবছর হালনাগাদ উপাত্ত প্রাপ্তি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য সেবার সকল পর্যায়ে মানবসম্পদের স্বল্পতা, ব্যক্তিখাতের ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর সেবার মান যাচাইয়ে এগুলো কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অভিন্ন নগর স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠা।

৮. পার্বত্য, চর ও উপকূলীয় এলাকায় অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর উপায়ে স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের বিষয়টি আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। এসব এলাকায় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা জনবল নিয়োজন একটি বড় সমস্যা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এসব এলাকায় আবাসনগুলো অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, যে কারণে সেবা গ্রহীতাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এ সেবা গ্রহণের জন্য তাদেরকে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়।

৯. স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টিখাতে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে এখনো বড় ধরণের ঘাটতি বিদ্যমান এবং এটি মোকাবিলা করা জরুরি। সাধারণত নারী, কিশোরী ও শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা কম এবং পুরুষদের তুলনায় তাদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা অনেকটা ভঙ্গুর; যদিও স্বাস্থ্যগত অসমতার ইস্যুটি মোকাবিলায় অব্যাহত প্রচেষ্টা চলমান। এছাড়া আয়ের ভিন্নতা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত ভিন্নতার কারণেও বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যগত সুযোগ-সুবিধা বিতরণে অসমতা পরিলক্ষিত হয়।

১০. কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ইস্যু রয়েছে, যেগুলোর বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এসব ইস্যুর মধ্যে রয়েছে: যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তাদান; কার্যকর ও দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা জনবল কৌশলের (HWS) ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ মানবসম্পদের (HR) প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার হালনাগাদকরণ এবং এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; স্বাস্থ্য খাতের গভর্ন্যান্স, কার্যসম্পদনের নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ; এইচপিএন কার্যক্রমে সম্পদের বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ, নতুন সুবিধা ও উপকরণ এবং সরবরাহের পর্যাপ্ততার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাসহ খাতভিত্তিক বাজেটের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা; এবং গ্রামাঞ্চলে দক্ষ স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের ধরে রাখা।

১১. বাংলাদেশে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতালের বিভিন্ন স্তরে তৃণমূলভিত্তিক আঞ্চলিক সেবা এবং সুবিধাগুলোর আওতায় একটি বিশাল জনস্বাস্থ্য সেবা নেটওয়ার্ক রয়েছে। এ জাতীয় বিশাল নেটওয়ার্কের সম্ভাবনার পুরোপুরি ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জটির স্বীকৃতি দিয়ে সরকার এগুলো সমাধানের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

১০.৩.১ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

- স্বাস্থ্য শিক্ষা, নার্সিং ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের সংকট।
- চিকিৎসক, সেবিকা, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য সহকারী সকল পর্যায়ে গুণগত মান নিশ্চিত করা।
- ব্যক্তিখাতে মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তাদের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ।
- গর্ভনিরোধে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ এবং গর্ভপাত ও গর্ভকালীন সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- বাল্য বিবাহ ও কিশোরীদের গর্ভধারণের হার কমিয়ে আনা।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রচলন।

- জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোয় বাচ্চা প্রসব-পরবর্তীকালে পরিবার পরিকল্পনা, ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্য সেবা (MR/MRM) ও গর্ভপাত-পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা (PAC-FP) সেবার অপ্রতুলতা।
- দীর্ঘমেয়াদি জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি (এলএআরসি) ও স্থায়ী জন্মবিরতিকরণ (পিএম) পদ্ধতি জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো (BCC) কার্যক্রমের অপ্রতুলতা।
- এলএআরসি ও পিএম, সন্তান প্রসব-পরবর্তী ও গর্ভপাত-পরবর্তী (PPFP) সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে দক্ষ চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্সের স্বল্পতা।
- ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেবার মান পর্যবেক্ষণের স্বল্পতা।
- জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের মেডিকেল শিক্ষার পাঠ্যক্রম হালনাগাদ না করা।
- পরিবার পরিকল্পনা সেবা সরবরাহের প্রস্তুতি: সরকারের তরফ থেকে যেসব সংস্থা পরিবার পরিকল্পনা সেবা সরবরাহে নিয়োজিত, তাদের মাত্র ২৫ শতাংশ এ সেবা যথাযথভাবে সরবরাহের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত; এনজিওভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৫০ শতাংশ সেবা সরবরাহ এক্ষেত্রে প্রস্তুত আছে; বেসরকারি খাতে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সরবরাহের প্রস্তুতি মাত্র পাঁচ শতাংশ (ইউঐঝ ২০১৪)।
- মানবসম্পদের স্বল্পতা: উপকূলীয় এলাকা, চরাঞ্চল, পার্বত্য এলাকা প্রভৃতিসহ সব ধরণের দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য সেবা খাতের শূন্য পদের সংখ্যা অনেক বেশি।
- দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ও স্থায়ী জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণের চিত্র: মাত্র আট শতাংশ মানুষ দীর্ঘমেয়াদি জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি (LRC) গ্রহণ করেছে।
- সিপিআর কার্যক্রমে পুরুষের অংশগ্রহণ: এ পদ্ধতির ৯০ শতাংশ ব্যবহারকারীই নারী।
- বাল্য বিবাহ, বাল্য বয়সে গর্ভধারণ ও নবদম্পতির মধ্যে জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের স্বল্পতা।
- বস্তি ও নগর অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সরবরাহের চ্যালেঞ্জ এবং গর্ভপাতের হার ও গর্ভকালীন সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ।
- তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে (MIS) বিক্ষপ্ততা: নগর অঞ্চলে সেবা উপাত্তের অপ্রতুলতা এবং যথাযথ উপায়ে বা পদ্ধতিতে তা সংযুক্ত না হওয়া।
- ঋতুস্রাবকালীন (MR) ও গর্ভপাত-পরবর্তী (PAC) পরিষেবাসমূহ: এমআর ও পিএসি-বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত নেই। বিশেষ করে ঋতুস্রাব-সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে এ ঘাটতি আরও বেশি।
- দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা/ব্যাক-আপ পরিষেবার অপর্যাপ্ততা।
- যেসব ইউনিয়নে পর্যাপ্ত অবকাঠামো আছে, সেখানে ২৪/৭ পরিষেবা সরবরাহের ওপর জোর দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়ে মনোনিবেশ করা।
- ডিজিটাল পদ্ধতির প্রচলন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ।
- সেবা সরবরাহ কেন্দ্রে (SDP) জনবলের পদ শূন্য থাকায় উপাত্তের ঘাটতি বিদ্যমান।

১০.৩.২ কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ ও এটির প্রতি বাংলাদেশের সাড়া প্রদান

কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ দ্রুততার সঙ্গে কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং উন্মুক্ততা, তথ্য ভাগাভাগি ও সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ ‘সমগ্র সরকার পন্থা’ অনুসরণ করেছিল। এ মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও তা ছড়িয়ে পড়া রোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেছিল এবং কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ‘বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান পরিকল্পনা (বিপিআরপি)’ প্রণয়ন করেছিল, যা এক্ষেত্রে এক জীবন্ত দলিল। ডব্লিউএইচওর নির্দেশনা মোতাবেক কোভিড-১৯-এর ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে একটি জাতীয় নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল, যা কোভিড-১৯ ‘শনাক্ত নিশ্চিতকরণ’, ‘সম্ভাব্য রোগী বাছাইকরণ’ অথবা সংক্রমণের ‘সন্দেহজনক’ ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সব ক্লিনিক/হাসপাতালকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল।

কোভিড-১৯ সংক্রমণের শুরু থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয়ভাবে এটির প্রতি সাড়া প্রদান কার্যক্রম তদারকি করে আসছেন এবং নিয়মিতভাবে ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দায়িত্বরত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা ও বিভিন্ন অংশীজনের মাধ্যমে সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও এর ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সংক্রমণের শিকার ব্যক্তিদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও কমিটি গঠন করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান কিছু হাসপাতালকে নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আরও কিছু হাসপাতাল প্রস্তুত করার কাজ প্রক্রিয়াধীন। সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেশ কিছুসংখ্যক বেসরকারি হাসপাতালও করোনাভাইরাস পরীক্ষা ও চিকিৎসায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিভিন্ন খাতের মধ্যে স্তম্ভভিত্তিক সমন্বয় ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে বহু-খাতভিত্তিক সাড়া প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। কোভিড-১৯ মহামারী ছড়িয়ে পড়া রোধে আরও যেসব প্রধান প্রধান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিচে দেয়া হলো:

- করোনা প্রতিরোধে পরীক্ষামূলকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক একটি সহায়ক টিম (CST) গঠন করা হয়েছিল, যে টিমের কাজ ছিল করোনার লক্ষণ আছে এমন ব্যক্তিদের নির্ণয় করা এবং লক্ষণের দিক দিয়ে যারা করোনার ক্লিনিক্যাল মানদণ্ডে, যাদের করোনা-আক্রান্ত হিসেবে সন্দেহ করা হবে, তাদের দ্রুততার সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে পৃথক করা। যাদের সমন্বয়ে এসব সিএসটিগুলো গঠন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিনিধি, ব্র্যাক কমিউনিটি হেলথের প্রতিনিধি, মেডিকেল শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ চিকিৎসক, নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী স্বেচ্ছাসেবকরা। যারা গুরুতর রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য হাসপাতালে যথাযথ সেবা-যত্ন দেয়ার সুবিধাও চালু করেছে সিএসটি।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক করোনা প্রতিরোধের চর্চা, করোনা শনাক্তকরণ এবং লকডাউন অনুসরণ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছে। গুরুতর অসুস্থ ও মারাত্মক রোগীদের সেবা বাড়াতে পিপিই, হাসপাতালের সরঞ্জাম ও অন্য জিনিসপত্রের সরবরাহ বাড়াতে তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। পাশাপাশি করোনা রোগী ব্যবস্থাপনা ও সংক্রমণ প্রতিরোধ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া করোনা মোকাবিলায় সংহতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে ঝুঁকিপূর্ণ যোগাযোগ এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে কভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া রোধে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করা, ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবহিতকরণ ও সমন্বিত নাগরিক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত পাঁচ হাজার নার্স ও দুই হাজার চিকিৎসক নিয়োগদানের পাশাপাশি ৯১টি ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। করোনা রোগী ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধনে স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহে প্রথম সারিতে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রবেশ দ্বারে জনস্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের বিভিন্ন ক্যাম্পে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া রোধে এটির প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করতে প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।
- আইইডিসিআর তাদের ওয়েবসাইটে সর্বদা কোভিড-১৯ বিষয়ে তথ্য হালনাগাদ করে চলেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস কর্তৃক একটি কোভিড-১৯ ড্যাশবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রতি দ্রুত সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে 'স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩' শীর্ষক একটি হটলাইন চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বাতায়ন হচ্ছে একটি অনলাইন আবেদন ব্যবস্থা, যেখানে সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পেতে সক্ষম।
- বিভিন্ন ধাপে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে কোভিড-১৯-এর টিকাদান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত টিকাদান পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি টিকা ক্রয়ের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সাড়া প্রদান কৌশল

করোনাভাইরাসের বিস্তার সীমিত করা ও জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ওপর এর প্রভাব কমানোর জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হয়েছিল:

- মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা এবং কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয় ও গণ-পরিবহনের মতো ঘরের বাইরের স্থানগুলোয় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মান্য করা।
- করোনার বিস্তৃতি রোধে রোগী শনাক্ত হওয়া এলাকাকে পৃথকীকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক করোনা প্রতিরোধ, রোগ শনাক্তকরণ এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে করোনা প্রতিরোধে কোয়ারেন্টাইন কার্যক্রম চালু রাখা।
- যেসব দেশ ও প্রতিষ্ঠান করোনার টিকা উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সময়মতো টিকা কেনা নিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- রোগটির বিস্তার শ্লথ করতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগানো এবং লকডাউন অনুসরণের পাশাপাশি বিদ্যমান আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়গুলো চলমান রাখা।
- সর্বশেষ বিশেষজ্ঞ ও শিল্প নির্দেশিকার ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সামাজিক দূরত্ব নীতিমালা অনুসরণ করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব পর্যায় কর্তৃক এটির প্রয়োগ ঘটানো।
- বিসিসি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং মহামারীটির গতিপথ ঘুরিয়ে দেয়া ও কোভিড-১৯-সম্পর্কিত ভয় ও উদ্বেগ মোকাবিলায় তাদের পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে গড়ে তোলা।
- হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান, সামাজিক দূরত্ব মান্য করার পাশাপাশি অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অব্যাহত রাখার বিষয়ে গণমানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ধারাবাহিক প্রচারণা চালানো।
- কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় তহবিলের জোগান নিশ্চিত করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু মোকাবিলায় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ নিশ্চিত করার পাশাপাশি চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে অতিরিক্ত আরও ১০ হাজার কোটি টাকার (১১৭৬.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রায়) থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিপিআরপি ২০২০ বাস্তবায়নে অর্থায়নের নিশ্চিয়তা বিধানে উন্নয়ন সহযোগীদের (ডিপি) থেকে আরও বেশি অর্থ ছাড় করার বিষয়ে প্রচেষ্টা চলমান থাকবে।

১০.৪ এইচপিএন খাতের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত অভীষ্ট, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কাঠামোর প্রস্তাবিত প্রধান লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা আবর্তন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ বেশ কিছুসংখ্যক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টির উন্নয়ন এবং তা ধরে রাখার জন্য মানব উন্নয়ন কৌশলে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। ভিশন ২০৪১-এ একটি দারিদ্র্যহীন ও উচ্চ আয়ের বাংলাদেশের রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেখানে যে অবস্থার ধারণা দেয়া হয়েছে তা হলো, রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য সেবা পাবেন এবং তা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এটিতে ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য আবর্তন (UHC) কর্মসূচির উদ্দেশ্যাবলি যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য এটি আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি গুণগত মানসম্পন্ন ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যথাযথ কৌশল এবং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প নেই। ফলে দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বড় ধরণের অসুস্থতাকালীন চিকিৎসার ব্যয় বহন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ উভয় ইস্যুকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

অভীষ্ট: এ অভীষ্টটি হলো; সুস্থ পরিবেশে মানসম্পন্ন ও সমতাভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা প্রসারিত করে সমস্ত নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ উপভোগ নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য: প্রধান উদ্দেশ্য হলো ধীরে ধীরে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (UHC)-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিদ্যমান অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এইচপিএন-সম্পর্কিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সমতা, গুণমান ও দক্ষতার উন্নতি সাধন করা।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: বিগত ও চলমান কর্মসূচিসমূহ সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধন করেছে। এ অর্জনের ধারা চলমান রাখা এবং এক্ষেত্রে নিহিত ঘাটতি মোকাবিলার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইচপিএন খাতের জন্য নির্ধারিত কিছু লক্ষ্যমাত্রা সারণি ১০.২-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১০.২: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

ক্রমিক	সূচক	ভিত্তি ও উৎস	৮ম পরিকল্পনায় লক্ষ্য (২০২৫)
১	জন্মের পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	৭২.৬ (SVRS, ২০১৯)	৭৪
২	৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে খর্বতার অনুপাত (%)	২৮% (MICS, ২০১৯)	২০%
৩	৫ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি ক. কৃশতার অনুপাত খ. কম ওজনের শিশুর অনুপাত গ. বাড়তি ওজনের শিশুর অনুপাত	ক) কৃশতাঃ ৯.৮% খ) কম ওজনের শিশুর হার ২২.৬% গ) বাড়তি ওজনের শিশুঃ ২.৪% (MICS, ২০১৯)	ক) ৭% খ)১৫% গ) ১%
৪	মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	১৬৫ (SVRS, ২০১৯)	১০০
৫	সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর সেবা প্রাপ্তির অনুপাত	৫৯% (MICS, 2019)	৭২%
৬	নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	১৫ (SVRS, ২০১৯)	১৪
৭	১ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	২১ (SVRS, ২০১৯)	১৮
৮	৫ বছরের নিচে শিশুর মৃত্যুহার (প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে)	২৮ (SVRS, ২০১৯)	২৭
৯	প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার বিপরীতে যক্ষ্মার উপস্থিতির হার	২২১ (বৈশ্বিক যক্ষ্মা প্রতিবেদন, ডব্লিউএইচও, ২০১৯)	১১২
১০	অসংক্রামক ব্যাধির (এনসিডি) কারণে মৃত্যু হার (হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত রোগ, ক্যানসার, ডায়াবেটিস অথবা দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ)	২১.৬% (স্বাস্থ্য এসডিজি প্রফাইল: বাংলাদেশ, ডব্লিউএইচও, ২০১৯)	১৬.৮%
১১	১২ মাসের কম বয়সী শিশুদের জন্য প্রযোজ্য সবকটি টিকাদান-সম্পন্ন শিশুর অনুপাত (%)	৮৬% (BDHS, ২০১৭-২০১৮)	৯৮%
১২	সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে জন্মকালে নির্ধারিত স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অনুপাত (সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অনুপাত)	১:৩ (BDHS, ২০১৭-২০১৮)	১:১.৫
১৩	মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির (উর্বরতা) হার (টিএফআর)	২.০৪ (SVRS, ২০১৯)	২.০
১৪	জন্ম-বিরতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার (%)	৬৩.৪%(SVRS, ২০১৯)	৭৫%
১৫	গর্ভ-ধারণে সক্ষম (১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী) নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণকারীদের মধ্যে সন্তুষ্টির হার (%)	৭৭.৪% (MICS, ২০১৯)	৮০%
১৬	কিশোরীদের মধ্যে গর্ভধারণের হার	৭৪ (SVRS, ২০১৯)	৬০

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি (HPN)-এর কৌশলসমূহ

পূর্বতন এসডাব্লিউএ’র অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে একগুচ্ছ কৌশল অনুসরণ করা হবে:

- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার আবর্তন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা সরবরাহ কার্যক্রমের ওপর তদারকি বৃদ্ধিকরণ ও আইনকানুনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য খাতের নেতৃত্বের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ।
- সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় সেবা সরবরাহের উন্নয়ন ঘটাতে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী পদ্ধতি (উদাহরণস্বরূপ, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অপ্রতুল পরিষেবার বিষয়টি দূর করার জন্য ক্রয় পরিষেবা) প্রয়োগ করা।
- জরুরি সেবা সরবরাহ (EPS) কার্যক্রমে ব্যক্তি খাতকে অন্তর্ভূক্ত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও এনজিওর সঙ্গে অংশীদারি বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে গুণগত সেবার প্রয়োগ ঘটানো এবং এটিতে সবার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা।
- প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা (SBA); নবজাতকের যত্ন; কিশোরীর যত্ন প্রভৃতি নিশ্চিত করা এবং যেসব স্থানে স্বাস্থ্য সেবার মান ভালো নয় সেসব এলাকায় ও দুর্গম এলাকায় বিভিন্ন উদ্যোগ জোরদার করা।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পুষ্টিসেবা ও সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (EPI) সম্প্রসারণ করা।

- সময়ের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এইচপিএন পদ্ধতি শক্তিশালী করা।
- নজরদারি, উপাত্তের মান এবং তথ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
- দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চূড়ান্ত তহবিলের আকার বৃদ্ধি করা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রম শক্তিশালী করা।
- জেন্ডার সাম্য নিশ্চিত করতে নারীদের অধিকার ও মত প্রকাশের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক পরিচালন পরিকল্পনায় (OP) ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভূক্ত করা এবং বিভিন্ন ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা প্রভৃতি পরিচালনা করা।
- জীবনচক্র জুড়ে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব পুঁজির বিকাশ উৎসাহিতকরণ। এ প্রসঙ্গে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি শিশু, মহিলা ও পুরুষদের বিভিন্ন প্রয়োজন; অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী; গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে।
- যেসব মানুষ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, তারাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত এবং ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সহায়তা চালুকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ধাক্কা সামলাতে তাদের অভিঘাত-সহনশীলতা বাড়ানোর কার্যক্রমে সহায়তা দান।
- প্রজনন ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও নিরাময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সামাজিক সুরক্ষা এবং সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ও আর্থিক ব্যয়ের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত মাত্রায় উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা আবর্তন সম্প্রসারণ করা।
- অর্থনৈতিক বিকাশের পর্যায়ে এবং সামাজিক রীতিনীতি, কাঠামো প্রভৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলো মেটানোর লক্ষ্যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি, যত্ন ও অবকাঠামোর বিকাশ সাধন।
- নারী, কন্যা, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সুরক্ষার বিষয়টি মোকাবিলার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে আরও সুসমন্বিত ও সংগতিপূর্ণ পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ নগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন প্রভৃতিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- স্বাস্থ্য সেবা খাতে প্রয়োজনীয় সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার ব্যবধান চিহ্নিত করে এ খাতের বিদ্যমান ও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের প্রতি যথাযথ সাড়া প্রদান।

১০.৪.১ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচি

২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা (UHC) অর্জনের জন্য আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সেবার সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিতকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যথাযথ মনোযোগ প্রদর্শন করেছে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো তুলে ধরা হলো:

- নাগরিক জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ ও একত্রীকরণ।
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোয় (UHFWC) সার্বক্ষণিকভাবে (২৪/৭) সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এগুলোর হালনাগাদকরণ।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং এইচপিএন সেবা সরবরাহে গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউটের হালনাগাদ করা হবে, পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন করা হবে, নতুন নতুন পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং বিশেষায়িত ও উপবিশেষায়িত চিকিৎসকের পদ সৃজনের পাশাপাশি অন্যান্য উদ্যোগ নেয়া হবে।
- দ্রুত বর্ধনশীল নগরীর জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পুনর্গঠন।
- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা আবর্তনের আওতায় আরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করা এবং সেবাগ্রহীতা ও তার পরিবারের সদস্যদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় হ্রাসকরণে বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা হালনাগাদ করার পাশাপাশি নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে সেগুলোর সম্প্রসারণ করা হবে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বৃহত্তর পরিসরে স্বাস্থ্যসেবার আবর্তন বাড়াতে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সম্প্রসারণ (SSK, MHVS)।

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির সম্প্রসারণের পাশাপাশি ডিজিটাল উপাত্ত ব্যবস্থাপনার বিকাশ এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে আইটির ব্যবহার ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি করা।
- গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার উন্নয়ন, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও বিদ্যমান নীতিমালাগুলোর হালনাগাদকরণ।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত পরিষেবা দক্ষতার সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতের পদ্ধতিগুলো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যেসব উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিচালন কার্যক্রম পুনর্গঠন, প্রধান সংগ্রহ ইউনিট হিসেবে কেন্দ্রীয় ঔষধ সংরক্ষণাগারের (CMSD) পুনর্গঠন এবং অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন। সমতার অভীষ্ট অর্জনের বিষয়ে বিবেচনায় রেখে এসডিজিতে (অভীষ্ট-৩) প্রস্তাবিত সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জনের কৌশল হিসেবে হালনাগাদকৃত ইএসপি বাস্তবায়নের জন্য এ পরিকল্পনায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC), সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (EPI), মাতৃ-নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য (MNCH), অসংক্রামক ব্যাধি (ঘঙ্ক্ষ) প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের গতিশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নির্ধারিত স্বাস্থ্য খাতের উচ্চাভিলাষী স্বাস্থ্য লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, নিরীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচিগুলোয় পর্যাপ্ত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসডিজির লালিত অভীষ্টগুলো উপলব্ধি করার লক্ষ্যে বর্তমানে চলমান যেসব কার্যক্রম থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেসব কার্যক্রম/কর্মসূচিগুলোর বিকাশ সাধন প্রয়োজন। যাহোক, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রভিত্তিক ভবিষ্যৎ কার্যক্রমগুলো নিচে তুলে ধরা হলো।

সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয় হ্রাসকরণ ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের উপায়

ডব্লিউএইচওর সুপারিশ অনুসারে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) অর্জন করতে হলে দেশগুলোকে কমপক্ষে তিনটি মাধ্যম অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে। এগুলো হলো–অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবাসমূহ সম্প্রসারণ, অধিক সংখ্যায় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ ও সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয় হ্রাসকরণ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উচ্চ প্রাধিকারভুক্ত সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় সম্পৃক্তকরণের পাশাপাশি সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয়ের বিলুপ্তি ঘটানো এবং বাধ্যতামূলক প্রগতিশীল পূর্ব অর্থপরিশোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তহবিলের আওতা বৃদ্ধিকরণ। বাংলাদেশ সব সময় সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা (HFA), প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC), জরুরি সেবা প্যাকেজ (ESP) প্রভৃতির মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের পরিষেবাগুলো সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য ও সহজ প্রাপ্য করে তোলার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC) নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে জেলা হাসপাতাল পর্যায় পর্যন্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি সেবা প্যাকেজ (ESP) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির স্মারক বহন করে এবং সমগ্র জনগণকে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করে। মানুষের দোরগোড়ায় কমিউনিটি ক্লিনিক পরিষেবার প্রচলন বাংলাদেশকে ইউএইচসি অর্জনের ক্ষেত্রে আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ অঞ্চলে ধনী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার মধ্যকার ব্যবধান কমানোর ক্ষেত্রেও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো অবদান রেখে চলেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তিনটি ধারাবাহিক এসডাব্লিউএ বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়বে। এ ধারাবাহিক কার্যক্রমের প্রথম উদ্যোগ ও ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করছে চতুর্থ এইচপিএনএসপি। এটি আর্থিক বোঝা ব্যতিরেকে প্রতিটি নাগরিকের গুণগত স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা (ব্যক্তি খাত বা সরকারি খাত যেখান থেকেই সেবা নেয়া হোক না কেন) নিশ্চিত করার অধিকারের বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করে।

তদুপরি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (PHC) পরিষেবাগুলো সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে, যার মধ্যে বিদ্যমান ক্ষেত্রভিত্তিক পরিষেবা সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যালোচনা; বিশেষত দুর্গম (HTR) অঞ্চলে পরিষেবা সরবরাহের জন্য পরিষেবা ব্যবস্থার বহুমুখীকরণ (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বসহ); সমস্ত স্তরের সুবিধার সঙ্গে জড়িত ক্রিয়ামূলক রেফারাল ব্যবস্থার বিকাশ; সেবার মান নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সকল স্তরের সরকারি হাসপাতালে জনগণের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা বাড়াতে অতিরিক্ত শয্যা ও আধুনিক সরঞ্জামের সংযুক্তি ঘটিয়ে হাসপাতালগুলোর সেবামান হালনাগাদ করা হবে।

আগ্রহী উন্নয়ন সহযোগী ও পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের (CHT) জন্য সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-সংবলিত স্বাস্থ্যসেবার বিকাশ সাধনে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে (HDC) বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হবে। বয়স্ক জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য বিশেষ ধরণের জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নততর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিভিন্ন অনুঘটকের (সরকারি, বেসরকারি, এনজিও) সহযোগিতায় মানসিক অক্ষমতার (অটিজম, মানসিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি) বিষয়টি যথাযথভাবে মোকাবিলা করা হবে। এক্ষেত্রে শারীরিক বা মানসিকভাবে যারা অক্ষম, তাদের জন্য প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক পরিষেবার সম্প্রসারণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে আরও বেশিসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা আবর্তনের আওতায় আনা ও ব্যক্তির নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় (OOPE)হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (SSK)' শীর্ষক সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীকে বিনা মূল্যে হাসপাতাল পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র প্রসূতি মায়েদের নিরাপদ সন্তান প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার প্রকল্প (MHVS) নামক আরও একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প দেশের ৫৫টি উপজেলায় চলমান। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উল্লিখিত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হবে। পাশাপাশি আয়ের ভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণির জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার নতুন নতুন ক্ষেত্র, যেমন স্বাস্থ্য বিমার মতো প্রকল্পের বিকাশ ঘটানো হবে।

নগর স্বাস্থ্য সেবা

দ্রুত নগরায়ণ, শিল্পায়নের বিস্তার, আয়-রোজগার বৃদ্ধি ও অসংক্রামক রোগের বৃদ্ধি, আংশিকভাবে দুর্বল পুষ্টি-সম্পর্কিত জীবনধারার পরিবর্তনসহ বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জনমিতিক পরিবর্তনকাল অতিক্রম করে চলেছে। নগর অঞ্চলে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ২.৫ শতাংশ; অথচ জাতীয় পর্যায়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশেরও কম। রাজধানী শহর ঢাকা একাই দেশের মোট নগরকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশের ধারক। গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসা জনগোষ্ঠীর দ্রুত প্রবৃদ্ধি একটি ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীকে নগরীর বিভিন্ন বস্তিতে বসবাসে বাধ্য করছে। এ বিষয়টি নগরীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির ওপর অব্যাহতভাবে মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে। নগর অঞ্চলগুলোয় মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং পরিষেবার প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে শহুরে জনগণের জন্য বিশেষত শহুরে দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি সুবিধাদি খুবই অপ্রতুল। ১৯৯৮ সাল থেকে নগরকেন্দ্রিক তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প (UPHCP) বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা কর্তৃক প্রকল্পের ক্ষেত্রগুলোয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে চুক্তিবদ্ধ এনজিওগুলোর মাধ্যমে পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছে। তবে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (UPHC) অব্যাহত রাখার জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা না রেখেই সেগুলোর কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম এবং স্কুল স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলো শহরাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেকসই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এসব কার্যক্রমের সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়তি প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

টেকসই ও কার্যকর উপায়ে পারস্পরিক বাধ্যতামূলক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দুটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্থায়ী সমন্বয় কাঠামো স্থাপন করা দরকার। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে যৌথভাবে শহরাঞ্চলে এইচপিএন পরিষেবাদির মূল্যায়ন, মানচিত্রায়ণ, প্রকল্প ও পরিকল্পনার জন্য একটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় যোগ দেবে। নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয়ের ওপর জোর দেয়ার বিষয়টি পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলোর তুলনায় একটি নতুন (এবং খুব আলাদা) উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হবে। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অন্যান্য অংশীদার, বিশেষত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এনজিও ও বেসরকারি খাতের পরিষেবা সরবরাহকারী এবং অন্যদের সঙ্গে নতুন উপায়ে কাজ করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করবে।

যে সুবিধাগুলো রেফারাল ব্যবস্থা জোরদারের মাধ্যমে অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সেগুলোর ক্ষেত্রে ডিজিএইচএসের অধীন নগর ডিসপেনসারিগুলোর মাধ্যমে নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (UPHC) পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করবে, যাতে জনগণ উন্নততর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা পেতে পারে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় শহুরে অঞ্চলের মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের বহির্বিভাগের মাধ্যমেও ইউপিএইচসি পরিষেবা প্রদান করবে এবং এ সেবা অধিকতর জোরদার করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তদুপরি চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ইউপিএইচসি পরিষেবার আবর্তন, গুণগত মান ও সেবা সরবারাহে সমতা বিধানের লক্ষ্যে হাপসপাতালগুলোয় সান্ধ্যকালীন সেবা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইউপিএইচসি পরিষেবা আরও জোরদার করা হবে। এক্ষেত্রে আরও কিছু অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে:

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা নিয়ে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সহযোগে নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কৌশলের বিকাশ সাধন।
- কীভাবে নগর জনগোষ্ঠী সর্বোত্তম সেবা পেতে পারে, তা পর্যালোচনার জন্য একটি গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে এবং মানসম্পন্ন এইচপিএন পরিষেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে দুটি মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে।
- নগর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা।
- মানসম্পন্ন পিএইচসি পরিষেবা (প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ পরিমাপের পরিষেবাসহ) সরবরাহে শহুরে ডিসপেনসারিগুলোর কার্যক্রম সম্প্রসারণ/হালনাগাদকরণ।
- বিভিন্ন নগরকেন্দ্র এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের হাসপাতালের মধ্যে পর্যাপ্ত রেফারাল ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো এবং জেনারেল ফিজিশিয়ান (GP) ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।
- নগর স্বাস্থ্য সেবার কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে একটি নগরকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থার বিকাশ ও বাস্তবায়ন।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার উন্নয়ন।
- নগর স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহে ব্যক্তি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন এনজিও'র ভূমিকা নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকরণ।
- স্বাস্থ্য সেবা কৌশলের বহুমূখীকরণ এবং পিপিপির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

প্রসূতি, নবজাতক, শিশু এবং প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্য

প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্য (MNH) পরিষেবাগুলো আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং গর্ভধারণ-পূর্ব, গর্ভকালীন, বাচ্চা প্রসব এবং প্রসবোত্তর তাৎক্ষণিক সেবাসহ এ পরিষেবাগুলো একসঙ্গে সরবরাহ করা প্রয়োজন। এসব সেবাদান কার্যক্রম দক্ষ সেবাদানকারীর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া উচিত। পাশাপাশি পর্যাপ্ত কর্মীযুক্ত ও সজ্জিত জরুরি প্রসূতি যত্ন নিরীক্ষণ (EMOC) সুবিধাগুলোয় ক্রমবর্ধমান জটিলতার তাৎক্ষণিক ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা সেবাদান কার্যক্রমের প্রচলন হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে একটি দ্বিমুখী কৌশল অনুসরণ করা হবে–(১) সমস্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবাগুলোর বিস্তার, এবং (২) স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষত ভৌগোলিক বা সামাজিক বাস্তবতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্থানে খানাভিত্তিক পরিষেবা বজায় রাখা ও তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া।

গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সহযোগিতায় আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের (BCC) বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল নিয়মিত প্রচার করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও জাতীয় পর্যায়ে সন্তান জন্মদানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেয়া হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক (CC) পর্যায়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা গর্ভধারণপূর্ব ও গর্ভকালীন নানা সেবা সরবরাহ করা হবে এবং ক্ষেত্রমতো যেসব স্থানে সম্ভবপর, সেখানে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে যেসব অঞ্চলে প্রসূতি মৃত্যুর হার (MMR) বেশি এবং যেসব অঞ্চল অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও সামাজিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত, সেসব এলাকাকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রেফারেল ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়াতে কৌশলের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। বেসরকারি হাসপাতালগুলো প্রদত্ত সিজারিয়ান সেবার তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে।

নবজাতকের নানা জরুরি সেবা সম্প্রসারণে বিশেষ নজর দেয়া হবে। এক্ষেত্রে নবজাতকের শ্বাসকষ্ট ও নানা ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং কম ওজন নিয়ে জন্মানো নবজাতক ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে অপরিপক্ব অবস্থায় জন্ম নেয়া শিশুর সেবাযত্ন নিশ্চিত করতে বিশেষ জোর দেয়া হবে। এটি বাস্তবায়নে বিদ্যমান নাগরিক ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও নবনিযুক্ত কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের (CHPC) বিস্তৃত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ কাজে তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করতে হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালের মধ্যে দ্রুতগতির রেফারেল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসুস্থ নবজাতকদের জরুরি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে গৃহীতব্য কিছু অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো:

- এনজিওসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং গণ-মাধ্যমের সহযোগিতা নিয়ে নগরীর বস্তিসহ দেশব্যাপী প্রসূতি ও নবজাতক স্বাস্থ্য সেবা (MNH) কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

- মেডিকেল কলেজ থেকে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে গর্ভধারণ-পূর্বকাল থেকে প্রসব-পরবর্তী সময় পর্যন্ত সার্বিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং রক্তক্ষরণ ও এক্লেম্পসিয়া মোকাবিলায় কেসভিত্তিক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।
- জরুরি রেফারেল, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন ম্যাপিং অনুশীলনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিশ্চিত করে মানবসম্পদের বিকাশ, পদায়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে ধীরে ধীরে সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা ইএমওসি পরিষেবা সরবরাহ শক্তিশালীকরণ।
- বাড়িতে ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রসবকালে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জনগোষ্ঠীভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী (CSBA) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কৌশল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।
- প্রসূতি ভাউচার প্রকল্প ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের সম্প্রসারণ।
- রেফারেল প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন প্রসূতি রোগ (ফিস্টুলা, জরায়ু ক্যানসার, স্তন ক্যানসার, জরায়ু স্থির হয়ে যাওয়া) নিরাময়, প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।

বিগত সময়ের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে যেসব রোগ প্রতিরোধে অগ্রগতি এখনো সন্তোষজনক নয়, টিকাদান কর্মসূচির আওতায় তেমন নতুন নতুন রোগ অন্তর্ভূক্ত করার মাধ্যমে এ কর্মসূচির কার্যক্রম আরও শক্তিশালীকরণ ও তা চলমান রাখা হবে। খাতভিত্তিক পরবর্তী কর্মসূচিতে (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে) শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে চলমান সকল উদ্যোগ সম্প্রসারণ ও চলমান রাখা হবে। এক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের কার্যকর সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনীয় ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে এনজিওগুলোর সহায়তা নিয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসব সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রধান প্রধান উদ্যোগগুলোর মধ্যে থাকবে:

- শিশুর পুষ্টি সেবাসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক শিশুর অসুস্থতার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (IMCI) কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।
- আইএমসিআই কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে শিশুদের এআরআই ও ডায়রিয়া প্রতিরোধ কার্যক্রম দুর্গম এলাকাসহ সারাদেশে সম্প্রসারণ।
- মাতৃদুগ্ধদান কার্যক্রম নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিশুর সঠিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।
- রুটিনভিত্তিক টিকাদান কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ ও তা বজায় রাখার পাশাপাশি সম্পূরক টিকাদান কার্যক্রম, জাতীয় টিকা দিবস (NID), হাম/এমএনটি প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণা।
- শিশুর জখম, পানিতে ডোবা, দুর্ঘটনাজনিত বিষক্রিয়া ও অন্যান্য জখম প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- স্কুলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ও তার চর্চা এবং পুষ্টি শিক্ষার মতো কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে চলমান স্কুল হেলথ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও চলমান রাখা।
- প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকস এবং মাঠকর্মী ও নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।

জাতীয় প্রজনন স্বাস্থ্য কৌশল ও কিশোরী স্বাস্থ্য কৌশল জাতীয় মানদণ্ড অনুসরণ করে স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে। এসব কৌশলের ভিত্তিতে প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), পরিবার পরিককল্পনা অধিদপ্তর (DGFP), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে সংগতিপূর্ণ আইনগত ও জেন্ডার সংশ্লিষ্ট সমতার বিষয়টির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্রজনন স্বাস্থ্য (আরটিআই/এসটিআই, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি) ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ে নারী, পুরুষ ও বিশেষত কিশোরীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টিকরণ।
- ব্যক্তিগত পর্যায়, বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক, শক্তিশালী সামাজিক/নাগরিক সংহতি ও কিশোরী পরামর্শদান কর্নার স্থাপন করে প্রথম সারির স্বাস্থ্য কর্মী ও সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মীদের মাধ্যমে প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্য সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।
- কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের সুরক্ষাদানকারীদের (বাবা-মা, অভিভাবক, শিক্ষক, ধর্মগুরু, সহকর্মী প্রভৃতি) আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন।
- মাঠ কর্মী ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের মতো সেবা সরবরাহকারীদের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি

(ক) সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (CDC)

অগ্রাধিকারভুক্ত সংক্রামক রোগগুলোর সঙ্গে দারিদ্র্য এবং সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার পরিস্থিতি ও পুষ্টির অবস্থার উন্নতির যোগসূত্র বিদ্যমান। যা খানার আয় বৃদ্ধি অবহেলিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসহ সার্বিক সংক্রামক রোগ (NTD) প্রশমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একটি কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা প্রচলনের পাশাপাশি সরাসরি পর্যবেক্ষণ চিকিৎসা (ডট) কার্যক্রমের আওতা সম্প্রসারণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব ধরণের যক্ষ্মার উপস্থিতি ও বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি চলমান রাখা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকার ১৩টি জেলায় প্রায় এক কোটি ২০ লাখ (১২ মিলিয়ন) মানুষ ম্যালেরিয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং দেশে ম্যালেরিয়া-আক্রান্তদের ৯৮ শতাংশই এ অঞ্চলে সংঘটিত হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ রোগ শনাক্তকরণ জোরদার করতে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষা (RDT) চালু করার পাশাপাশি ম্যালেরিয়া নিরাময়ে নিযুক্ত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হবে। বাংলাদেশে এইচআইভির উপস্থিতি খুবই কম। কিন্তু দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। ফলে তাদের শরীরে এইচআইভির সংক্রমণ বিস্তারের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এজন্য এইচআইভি প্রতিরোধে ধারাবাহিক তদারকি কার্যক্রম চলমান রাখা হবে। এক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জাতীয়ভাবে একটি এইডস/এসটিডি কর্মসূচি (NASP) চালু করা হবে। যে কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো–এইচআইভি/এইডস মহামারীর প্রভাব প্রশমন করা। পাঁচটি জেলা ব্যতীত জাতীয়ভাবে কুষ্ঠরোগ ১৯৯৮ সালে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় (প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটিতে আক্রান্তের সংখ্যা একজনেরও কম)। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের সব জেলাকে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যক র্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যেসব অঞ্চলে এ রোগটির প্রাদুর্ভাব রয়েছে, সেখানে সক্রিয়ভাবে এগুলো শনাক্ত করে রোগী ব্যবস্থাপনায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

হেপাটাইটিস বি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম চারটি (বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও থাইল্যান্ড) দেশের একটি। এখানে পাঁচ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের মধ্যে এক শতাংশেরও কমসংখ্যক শিশু এ রোগে আক্রান্ত। তবে হেপাটাইটিস বি ও সি নিয়ন্ত্রণ এখনো একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা। এটির নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বহুখাতভিত্তিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম গ্রহণ, উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে টিকাদান এবং হেপাটাইটিস ভাইরাস শনাক্তকরণে তদারকি ব্যবস্থা চলমান রাখার মতো সরকারি উদ্যোগ চালু রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে হেপাটাইটিস বি ও সি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ-সম্পর্কিত কার্যক্রম আরও জোরদার করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা হবে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবহেলিত বিভিন্ন উষ্ণমণ্ডলীয় রোগ (NTD), যেমন–ফিলারিয়াসিস, কালাজ্বর, মাটি থেকে উৎসারিত হেলমিথস্ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ নজর দেয়া হবে। সংগতিপূর্ণ এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এনটিডি নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের বিভিন্ন কৌশলসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও হালনাগাদকরণ করা হবে। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, এভিয়ান ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, তড়কা, গণ-মনোস্তাত্ত্বিক রোগ ও হেপাটাইটিস প্রভৃতিসহ নতুন নতুন সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এজন্য বৈশ্বিক মান অনুসরণ করে সংক্রমণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (IPCU) প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন।

(খ) অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (NCDC)

গতানুগতিক অসংক্রামক ব্যাধির (NSD) কারণে সৃষ্ট অসুস্থতা ও অকাল মৃত্যু কমাতে সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিরোধ থেকে চিকিৎসা প্রদান ও পুনর্বাসন পর্যন্ত কার্যক্রমসমূহ সমন্বিত উপায়ে সম্পন্ন করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি খাতকে সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর সহযোগিতায় সরকার বৃহদাকারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার ও জীবনধারা সম্পর্কিত প্রধান প্রধান এনসিডি, যেমন–হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত রোগ, ক্যানসার ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহ করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, রসদ সরবরাহ ও তহবিলের জোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার প্রাপ্যতা বাড়িয়ে এনসিডিগুলোর বিদ্যমান প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার ও প্রসারিত করা হবে। অধিকন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UHFWC) এনসিডি কর্নার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

চোখের যত্ন: গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে চার থেকে ১১ শতাংশ বাংলাদেশি অন্ধত্বের কারণে স্থায়ীভাবে অক্ষমতার শিকার। অন্ধত্ব প্রতিরোধ, রোগ শনাক্তকরণ, রেফারেল ব্যবস্থা জোরদারকরণ, ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে

এ-সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার (PHC) সঙ্গে, বিশেষত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর পরিষেবার সঙ্গে সংহত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল দৃষ্টি পরীক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং অতীতের সফল ভিটামিন 'এ' বিতরণ কার্যক্রম জোরালোভাবে অব্যাহত রাখা হবে। স্কুল শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মীদের মাধ্যমে সন্তান প্রসবোত্তর ভিটামিন 'এ' বিতরণ কর্মসূচি জোরদারকরণে আরও বেশি মনোযোগ দেয়া হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জাতীয় চক্ষু সেবা পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ ও তার প্রয়োগ ঘটানো হবে।

মানসিক ও অটিজম স্বাস্থ্য সেবা: জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ এ পরিস্থিতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের পর্যাপ্ত মাত্রার কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা প্রদান এবং মানসিক রোগীদের প্রতি উপযুক্ত মনোভাব প্রদর্শন ও তাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ নিশ্চিতে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য গণমাধ্যম ও এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। মানসিক রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার রোধ ও মানসিক রোগী শনাক্তকরণ ও পরামর্শ দেয়ার জন্য সরকারি খাত, এনজিও/নাগরিক সংগঠনের (CBO) কর্মী এবং স্কুল ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সহজ চিকিৎসা প্রদান, মানসিক রোগী ব্যবস্থাপনায় জীবনদক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুরুতর রোগীর ক্ষেত্রে রেফারেল ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য জনগণকে প্রস্তুতকরণের এ রোগের সার্বিক চিকিৎসা সুবিধাগুলো সম্প্রসারণ করা হবে। অটিজমের চিকিৎসার উন্নয়নে মেডিকেল কলেজ, উপজেলা হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলোয় অটিজম ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোয় অটিজম চিকিৎসা জোরদার করতে জিন পরীক্ষা (জিনগত উৎপত্তি) কার্যক্রম চালু করা হবে।

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সেবাযত্ন: দেশের মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে এটি ৭২.৬ বছর। এতে করে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি যথোপযুক্ত বয়স্ক ও প্রৌঢ় স্বাস্থ্য সেবা (EPHC) ব্যবস্থার বিকাশ সাধনে চিকিৎসা সরবরাহ বাড়াতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও জনবল নিশ্চিত করতে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য দেশে কার্যকরভাবে ইপিএইচসি সরবরাহে একটি সহায়ক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয় (উদাহরণস্বরূপ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়), ব্যক্তিখাত, এনজিও, সুশীল সমাজ সংগঠন (CSO) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহুমাত্রিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে এ স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বয়স্ক সেবা ইউনিট চালুকরণ এবং বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসায় সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক ওষুধ ও সরঞ্জামাদির সন্নিবেশ ঘটানো, স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি উদ্যোগ নেয়া হবে। হাসপাতালগুলোয় বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা ব্যয়ের বোঝা কমাতে স্বাস্থ্য কার্ডের প্রচলন ঘটানো হবে। জেরিয়াট্রিক রোগী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

শ্রবণ অক্ষমতা (বধিরতা): বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ (১৩ মিলিয়ন মানুষ) বিভিন্ন মাত্রায় শ্রবণশক্তি হারানোর (এইচএল) সমস্যার সম্মুখীন। এর মধ্যে ৩০ লাখ (তিন মিলিয়ন) মানুষ গুরুতর মাত্রায় শ্রবণশক্তি হারিয়েছে। এটি মানুষের অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হওয়া সত্ত্বেও এ সমস্যায় চিকিৎসার বিষয়টি খুবই অবহেলিত। শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ এবং এর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে স্থায়ী শ্রবণ অক্ষমতা রোধ করা সম্ভব। এ সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (বধিরতা) নিয়ন্ত্রণের জন্য মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের রোগগুলো ব্যবস্থাপনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ওরাল স্বাস্থ্য: মুখের পরিচ্ছন্নতা (ওরাল হাইজিন) বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও সচেতনতার অভাই মুখের নানা রোগের প্রধান কারণ। এটি একটি বড় ধরণের জনস্বাস্থ্যগত সমস্যা। গণশিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি প্রতিরোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখা এবং বিভিন্ন ধরণের বদ অভ্যাস (যেমন ধূমপান, পান চিবানো, মাত্রারিক্ত চিনিযুক্ত খাবার গ্রহণ প্রভৃতি) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুখের বিভিন্ন ধরণের গতানুগতিক রোগ ও অন্যান্য জটিল রোগগুলো প্রশমন করা সম্ভব। জীবনের শুরুর দিকেই ওরাল স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এ বিষয়টি সম্পন্ন করার সর্বাধিক উত্তম উপায় হচ্ছে বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে শিশুদের দাঁত ব্রাশ করাসহ মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখার বিষয়ে তাগিদ প্রদান এবং এর গুরুত্বগুলো স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তকরণ। এ বিষয়ে জনসচেতনতা ও যথাযথ জ্ঞান সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় প্রচারণা চালানোও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

অপ্রচলিত অসংক্রামক রোগসমূহ

সড়ক নিরাপত্তা ও জখম প্রতিরোধ: প্রতিবছর দেশে নানা ধরণের জখমের কারণে (অগ্নিদগ্ধ হওয়া, পানিতে ডোবা, এসিড নিক্ষেপ ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা) প্রায় ৭০ হাজার প্রাণহানি ঘটে। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ জখমের কারণ নগর এলকার সড়ক দুর্ঘটনা এবং এ দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের ৫৪ শতাংশই পথচারী। সুরক্ষা নীতি ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংলাপ, আহত রোগী ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (DGHS) সেবা সরবরাহকারীদের দক্ষতা বাড়ানো এবং পথচারীদের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। যেসব বিষয় জনগণকে ওয়াকওয়ে ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে, এমন বাঁধাসমূহ দূর করতে নগর এনজিও এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় নাগরিক উৎসাহিতকরণ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা: নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা জীবনের প্রতি সর্বনাশ ডেকে আনে, নাগরিক বন্ধন দুর্বল করে দেয় এবং উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ আক্রান্ত নারীদের সেবা প্রদানের জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদার করবে। পাশাপাশি সকল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রাসঙ্গিক কর্মসূচির মাধ্যমে সহিংসতা থেকে বেঁচে যাওয়াদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়ার বিষয়ে সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করবে।

জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান: অতীত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাত বিষয়ে গৃহীতব্য প্রধান কৌশলের মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল স্তরে প্রস্তুতির মাত্রা বৃদ্ধিকরণ এবং সমন্বিত দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটাতে খাতটির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। জনসাধারণের দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনের প্রতি যথাযথ সাড়া প্রদানের জন্য ম্যানুয়াল জারি করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: গুণগত মান ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিষেবা খুবই অপর্যাপ্ত। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের একটি বড় অংশই প্রকট ও দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। কারণ তারা কর্মক্ষেত্রে নানা ধরণের বিষাক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক ও সারের সংস্পর্শে আসার পাশাপাশি নানা ধরণের রোগ ও দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি, রোগ ও ঝুঁকি মোকাবিলায় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মন্ত্রণালয়ের (যেমন- শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) সহযোগিতায় সাশ্রয়ী উপায়ে প্রতিরোধমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত রাখবে।

তামাক ও নেশাজাতীয় পদার্থের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ: তামাক বাংলাদেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক মৃত্যু ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কারণ।[১০] সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারী আরও একবার প্রমাণ করেছে যে, এ ধরণের মহামারী তামাক ব্যবহারকারীদের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ।[১১] তামাক নিয়ন্ত্রণে ডব্লিউএইচও প্রণীত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (FCTC) শীর্ষক দলিলে অনুস্বাক্ষর করেছে।

পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) প্রতিষ্ঠা করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পরামর্শমূলক ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক প্রচারাভিযান চালানোর জন্য এনটিসিসির সক্ষমতা বাড়িয়ে এটিকে আরও শক্তিশালী করা হবে। তামাক ও নেশাজাতীয় পদার্থ সেবনের ক্ষতিকর দিকগুলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীভিত্তিক উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনা, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের বিকাশ, মাদকের অপব্যবহারের বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

মাদকদ্রব্য ও নেশাজাতীয় বিভিন্ন পদার্থের অপব্যবহার বর্তমানে বাংলাদেশে একটি উদীয়মান সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইয়াবা, ফেনসিডিল ও হিরোইনের মতো মাদকদ্রব্যের বেআইনি ব্যবহার রোধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচিতে নেশাজাতীয় পদার্থের

১০ Tobacco-attributable diseases caused nearly 126,000 deaths in 2018 and tobacco-induced diseases cost the economy BDT 305.6 billion (USD 3.6 billion) in Bangladesh, which is equivalent to 1.4% of the national output (GDP) in 2017-18. Source: The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach 2018, According to the study by Bangladesh Cancer Society. Available at: *https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf*

১১ According to World Health Organization (WHO), smokers are likely to be more vulnerable to COVID-19 as the act of smoking means that fingers (and possibly contaminated cigarettes) are in contact with lips which increases the possibility of transmission of virus from hand to mouth. Smokers may also already have lung disease or reduced lung capacity which would greatly increase risk of serious illness. Available at: *https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds*

অপব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাদকাসক্ত রোগীদের নিরাময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বিশেষায়িত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সাম্প্রতিক সময়ে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একটি উদীয়মান উদ্বেগের কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা মোকাবিলা করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর বিদ্যমান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এসব হাসপাতালের সেবাসমূহকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। এসব বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এগুলোর পরিশোধন, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও ভাগাড়ীকরণের ক্ষেত্রে একটি যথোপযুক্ত, নিরাপদ ও ব্যয়সাশ্রয়ী কৌশলের বিকাশ ঘটানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যার মাধ্যমে পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সরবরাহ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হবে।

পরিবেশগত স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ক্রমাগতভাবে সুস্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ ব্যবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, হিট স্ট্রোক, হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত অসুস্থতা ও বিভিন্ন মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব, যেমন- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু; পানিবাহিত রোগ, যেমন কলেরার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস পাওয়ায় অপুষ্টির উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ-পরবর্তী স্বাস্থ্যের ঝুঁকির হাত থেকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত পন্থা অবলম্বন করা এখনো সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। স্বাস্থ্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর করতে জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ইউনিট (CCHPU) শীর্ষক একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রম জোরদার করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য খাতের সকল পর্যায়ে প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে; দুর্যোগ-পরবর্তী সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকল খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। গণদুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনায় মানসম্পন্ন জাতীয় নির্দেশিকা এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যগত সাড়া প্রদানে প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল জারি করা হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং স্বাস্থ্য সেবার জরুরি সরঞ্জামের সরবরাহ ও সেগুলোর মজুত ব্যবস্থা যথাযথ মানে উন্নীত করা হবে। দুর্যোগের জরুরি প্রস্তুতি, প্রতিরোধ ও দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করা হবে। বিদ্যমান স্বাস্থ্য গবেষণা এজেন্ডায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং স্বাস্থ্য খাতের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

রোগ তদারকি কার্যক্রম

স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সংহতকরণ ও বণ্টন, মহামারীর পূর্বাভাস প্রদান ও প্রথম দিকেই তা শনাক্তকরণ, অতিমারির জন্য সতর্কতা জারি ও সাড়া প্রদান এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে একটি কার্যকর রোগ তদারকি ব্যবস্থা প্রয়োজন। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষাগার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মহামারী-সংক্রান্ত রোগ পরিস্থিতির তদারকি কার্যক্রম শক্তিশালী করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং এটিকে এ খাতের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত করা হবে। একটি সমন্বিত রোগ তদারকি কার্যক্রমের প্রধান অভীষ্ট হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে রোগের বর্ণনা প্রদান, শনাক্তকরণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, এমন সংক্রামক রোগের প্রতি সাড়া প্রদানে সক্ষম করে তোলা। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি সমন্বিত রোগ পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির বিকাশ ঘটানো হবে, যে কর্মসূচির কাজ হবে সময়মতো, পূর্ণাঙ্গ, নিয়মিত ও উচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন তথ্য সরবরাহ করা; মহামারী প্রাথমিক স্তরে থাকা অবস্থায় তা শনাক্তকরণ (প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা); মহামারীকালে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মূল্যায়ন এবং দক্ষতার সঙ্গে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ পর্যবেক্ষণ করা। বিকেন্দ্রীকৃত পরীক্ষাগারভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) শক্তিশালীকরণ/রক্ষণাবেক্ষণ এবং মহামারীর প্রাথমিক স্তরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোধে প্রশিক্ষিত ত্বরিত সাড়া প্রদান দলের (RRT) মাধ্যমে দ্রুত সাড়া প্রদান নিশ্চিতকল্পে একটি কেন্দ্রীয় তদারকি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের চিহ্নিত বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে বিদ্যমান কার্যক্ষম পরীক্ষাগারগুলোর সঙ্গে অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রের পাশাপাশি সংলগ্ন জেলা ও উপজেলাগুলোকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার মুহূর্তে মহামারীপ্রবণ রোগের নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে দেশের অভ্যন্তরে একটি রেফারেল ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে। একটি কার্যকর অসংক্রামক রোগ (ঘঈউ) পর্যবেক্ষণ

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিজিএইচএস বর্তমানে চলমান সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট/সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় করবে। রোগ পর্যবেক্ষণ ও নির্ণয় কার্যক্রম জোরদার করতে দেশের সকল হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। গতানুগতিক মহামারী রোগগুলোর ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য শনাক্তকরণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এনজিও কর্মী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। অধিকতর উন্নয়ন রোগ পর্যবেক্ষণ, অবহিতকরণ, রেফারেল ব্যবস্থার প্রচলন ও রোগ ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ও উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় প্রধান প্রধান রোগসমূহের মানচিত্রায়ণ সম্পন্ন করা হবে।

বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা (AMC)

জেলা হাসপাতালগুলোর বহির্বিভাগে ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে হারবাল সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। দুর্বল চাকরির সুযোগ, গবেষণা, প্রকাশনা, তথ্য এএমসি বিষয়ে সচেতনতার ঘাটতি এবং এ ব্যবস্থার যথাযথ মান অনুসরণ না হওয়ায় তা দুর্বল অবস্থায় রয়ে গেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় গবেষণা, পরিবীক্ষণ, উৎপাদন ও প্রকাশনা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। বিদ্যমান দুটি এএমসি কলেজ ও হাসপাতালে বহির্বিভাগ সেবা যুক্ত করার মাধ্যমে এগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (BCC)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো (BHE) কর্তৃক পরিচালিত বিসিসি কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো–নিরাপদ মাতৃত্ব, স্তন্যদান, জলবায়ু পরিবর্তন, উদীয়মান ও পুনঃপুন আবির্ভাব হওয়া রোগসমূহ, খাদ্য নিরাপত্তা, টিকাদান, ভিটামিন 'এ' কার্যক্রম পরিচালনা, নবজাতকের যত্ন, নারীর প্রতি সহিংসতা, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে মানুষের আচরণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা। প্রসূতি, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সৃজনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত বিসিসি কর্মসূচির বিকাশ ঘটানো হবে এবং স্কুল/মাদ্রাসায় শিশু ও তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা হবে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবাসমূহ জোরদারকরণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ফিচার ফ্লিম, পোস্টার, স্থানীয় নাটিকা প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রেরণামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে, যা বিসিসি কার্যক্রম জোরদার করতে ভূমিকা রাখবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

স্বাস্থ্য খাতের জনবল: স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি মোকাবিলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি খাতে চিকিৎসা-পূর্ব কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবলের গুণগত মানোন্নয়নে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে; সেবা সরবরাহের সকল পর্যায়ে অধিকতর ভালো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো হবে; প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করতে মানব সম্পদ তথ্য ব্যবস্থা (HRIS) চালু করা হবে; এবং লাইসেন্স প্রদান ও স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার গুণগত মান শক্তিশালীকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কূন্য পদে ধীরে ধীরে জনবল নিয়োগ দেয়া হবে। গুণগত এইচপিএন সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করতে সকল ধরণের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংস্থাসমূহের জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) তাদের কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা হবে।

মেডিকেল গভর্ন্যান্স ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা: সরকারি অথবা ব্যক্তিখাত/অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মানের বিষয়ে মোটাদাগে সাধারণ মানুষ যে ধারণা পোষণ করে তা হলো–এসব সংস্থার স্বাস্থ্য সেবার মান নিম্ন। রাষ্ট্রায়ত্ত স্বাস্থ্য খাতে দুর্বল গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার কারণে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে পদায়ন করা ব্যক্তিকে কর্মক্ষেত্রে না পাওয়া, ওষুধ ও অন্যান্য জরুরি সরঞ্জামের অব্যবস্থাপনা, ভুল চিকিৎসা ও অবহেলার অভিযোগ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিনিময়ে বেআইনি ও অননুমোদিত অর্থ আদায় এবং স্বাস্থ্য খাতের নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রমের দুর্বলতা। এই দুর্বল গভর্ন্যান্স ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হয় দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী। এতে একদিকে যেমন তাদের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে উপযুক্ত চিকিৎসা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়।

চতুর্থ এইচপিএনএসপি চলমান থাকাকালে মেডিকেল গভর্ন্যান্স ও এর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকার বিষয়টিকে এটির গুরুত্বানুসারে অগ্রাধিকারভিত্তিক উপাদান হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি এ ব্যবস্থাটির উন্নয়নে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা গ্রহণ চলমান রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে রোগীর নিরাপত্তা বিধান এবং সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার গুণগত মান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা অধিকতর শক্তিশালী করা হবে। সেবাগ্রহীতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা বাড়াতে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সকল স্তরে ডিজিএইচএস নিয়মিত ভিত্তিতে সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবাদির একটি পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করবে।

আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে পরিচালিত প্রধান প্রধান নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে–(১) বিভিন্ন হাসপাতাল, ব্যক্তিখাতের স্বাস্থ্যসেবা, রোগনির্ণয় কেন্দ্র (ডায়াগনস্টিক সেন্টার) ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউশনগুলোর (মেডিকেল কলেজসহ) স্বীকৃতিদান; (২) ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে কিছু ক্যাডারের লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ; এবং (৩) বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা ও মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক স্বাস্থ্যখাতের জন্য নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের বিভিন্ন কর্মপরিধি ও কর্মকাঠামোর হালনাগাদকরণ অব্যাহত রাখা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার কার্যকারিতা জোরদার করার লক্ষ্যে এগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তরের কাঠামো ও সক্ষমতা পর্যালোচনা করবে। বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ এবং নতুন নতুন প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

জরুরি ওষুধ সরবরাহ ও পরিমিত ব্যবহার

এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (EDCL) একটি রাষ্ট্রীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি। এটি সকল স্তরের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের (কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) জন্য জরুরি ওষুধ প্রস্তুত করে থাকে। ঢাকা ও বগুড়ায় কোম্পানিটির উৎপাদন কারখানা রয়েছে। এছাড়া খুলনায় এটির একটি ল্যাটেক্স প্লান্ট রয়েছে, যেখানে কনডম প্রস্তুত করা হয়। গোপালগঞ্জে একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ওষুধ কারখানা স্থাপনের জন্য ইডিসিএল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জরুরি ওষুধ সামগ্রী ছাড়াও কারখানাটি জন্মবিরতিকরণ পিল, ইনজেকশন, আয়রন ট্যাবলেট ও আইভি ফ্লুইড উৎপাদন করবে।

রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান উদ্বেগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওষুধের অপরিমিত ব্যবহারের বিষয়টি। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের অপরিমিত ব্যবহার দেশে এমডিআর-টিবি (বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগে অনিরাময়যোগ্য যক্ষা) ও অন্যান্য কিছু সংক্রামক রোগের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। দেশে ওষুধের পরিমিত ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে ওষুধের ব্যবহার মাত্রা বিষয়ে রোগী ও স্বজনদের সীমিত জ্ঞান, দোকানগুলোয় প্রেসক্রিপশন ওষুধের (স্বীকৃত চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যা ভক্ষণ করা উচিত নয়) সহজলভ্যতা এবং নিম্নমানের ওষুধের অবৈধ আমদানি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে একটি জাতীয় ক্লিনিক্যাল নির্দেশিকা ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নির্দেশিকা প্রস্তুত করে তা স্বাস্থ্য খাতের পেশাজীবীদের সরবরাহ করা হবে। এন্টিবায়োটিকের অপরিমিত ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ওষুধের পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

জেন্ডার, সমতা ও সহিংসতা

নারীর ও কন্যার প্রতি বৈষম্যের বিলোপ সাধন ও জেন্ডার সমতার উন্নয়ন ঘটানোর বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান অব্যাহত রাখবে। জেন্ডারকেন্দ্রিক নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বিদ্যমান জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়ন করে চলেছে। এ কৌশলের অংশ হিসেবে সেবা প্রদান পর্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন, গৃহায়ন, নারীর কর্ম-পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চল ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও বিকেন্দ্রীকৃত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও বিশেষ তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও সমন্বয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সার্বিক স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে গভর্ন্যান্স ও নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মতামত প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে মূলধারার কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যক্রমগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি স্থানীয় জবাবদিহিতা কার্যক্রমের বিকাশ ঘটানো হবে।

স্বাস্থ্য কার্ড ও ডিজিটালকরণ

একবিংশ শতাব্দী ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার দেশের নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রবর্তনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এ কার্ড হবে যন্ত্রে পাঠযোগ্য এবং রোগীর ইলেকট্রনিক মেডিকেল প্রতিবেদন এ কার্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার তথ্য-উপাত্ত কেন্দ্রীয় ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ কাজে লাগানোর বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে জোরালো প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অটোমেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতের সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পুরো প্রক্রিয়াটির ডিজিটালকরণ সম্পন্ন হবে। এটি একদিকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হ্রাস করবে, অন্যদিকে সেবার মানেরও উন্নয়ন ঘটাবে। পাশাপাশি তা রোগ ও সম্পদের তদারকিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়টি অধিকতর উন্নত পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ সংগ্রহ এবং অন্যান্য রসদ ও ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ইলেকট্রনিক মেডিকেল রেকর্ড (EMR) ডেটাবেজের সঙ্গে সংযুক্ত করে স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হবে এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নাগরিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা হবে। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজন ও সংস্থায় স্বাস্থ্য তথ্য ও ই-হেলথ প্ল্যাটফর্ম সংযুক্ত করা হবে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো (এনজিও) বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহের একটি উদীয়মান ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দেশে কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী এনজিও কার্যরত রয়েছে। এগুলো যেসব ভূমিকা পালন করে থাকে তার মধ্যে রয়েছে–(১) স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ, (২) সেবা সরবরাহে বহুমুখী মাধ্যমের উদ্ভাবন, (৩) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেবা সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, (৪) গবেষণা ও উন্নয়ন এবং (৫) স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্তকরণ ও চাহিদা সৃষ্টিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন। দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য এইচপিএন সেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা দানের জন্য এনজিওগুলোর সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ প্রতিষ্ঠা একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

একটি কার্যকর স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) চর্চা স্বাস্থ্য খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। সেবার পদ্ধতি উদ্ভাবন ও ব্যবস্থাপনা, সেবা গ্রহীতার ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অধিকারভিত্তিক সেবা সরবরাহের বিষয়গুলো মোকাবিলায় পিপিপি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সেবা সরবরাহ এবং মেডিকেল ও আনুষঙ্গিক খাতের শিক্ষা বিস্তারে পিপিপি-ভিত্তিক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও জোরদার করা হবে।

চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ

এইচপিএন পরিষেবা সরবরাহে মানসম্পন্ন মানবসম্পদে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ডিজিএইচএস, ডিজিএফপি, ডিজিএমই এবং ডিজিএনএম দক্ষতা সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি ভালো রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার প্রচলন ও দক্ষতার ব্যবধান নিরসনে দক্ষতা বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবাগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাক-পরিষেবা কাজ ও পরিষেবা কাজে নিয়োজিতদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবেষণা/অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রস্তুতকরণ করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করবে, তার মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতকরণ; নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার, চিকিৎসক, স্বাস্থ্য প্রকৌশলী ও অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবীর জন্য পরিচিতিমূলক ও চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন; প্রশিক্ষকদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষণ কারিকুলাম হালনাগাদকরণ ও মুদ্রণ; নতুন চিন্তা/ধারণার বিকাশ এবং প্রযোজ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তথ্য/উপাত্ত বিনিময়; এবং স্বাস্থ্যসেবা ও সুযোগ-সুবিধার ওপর রোগ/ক্ষেত্র নির্দিষ্ট জরিপ, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য সংস্থা (যেমন বিআইএইচএম) কর্তৃক দক্ষতা উন্নয়নে একই ধরণের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

বহুখাতভিত্তিক পদ্ধতি

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারি খাতসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান প্ল্যাটফর্মগুলোর আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হবে এবং সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাপ্য সম্পদের প্রাচুর্য

বাড়ানোর জন্য সম্ভাব্য নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধান করা হবে। এ ধরণের সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হবে, তার মধ্যে রয়েছে নগর স্বাস্থ্য (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়) ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য (পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়) খাতের জন্য সম্পদ ভাগাভাগি, কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা; সেবার দ্বৈততা এড়াতে সমধর্মী প্রকেল্পর (সরকারি অর্থায়ন ও বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট উভয় ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে) কাজে সমন্বয় ও সম্পূরক সেবা কার্যক্রমের বিকাশ সাধন; অকার্যকর সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনা/পরিচালনার জন্য এনজিও/ব্যক্তিখাত এবং/অথবা নতুন পরিষেবা/প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা অনুসন্ধানের জন্য দুর্গম এলাকায় পরিষেবা সরবরাহ; স্থানীয় পর্যায়ে সেবা কার্যক্রমের প্রসারের জন্য সম্পদ সংহতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি জোরদারে নাগরিক সংগঠন, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকারের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব বিষয় স্বাস্থ্যখাতের অর্জনকে বাঁধাগ্রস্ত করে (যেমন অপুষ্টি, অসংক্রামক রোগ) সেগুলো মোকাবিলায় বিভিন্ন খাতের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় ও সহযোগিতা সৃষ্টি করা হবে; নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার আবর্তন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে এবং সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বেসরকারি খাতের অংশীজন, উন্নয়ন সহযোগী (ডিপি) ও অন্যান্য অংশীদারদের সহযোগিতায় স্বাস্থ্যকর জীবনধারা উৎসাহিতকরণ ও তার জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সমন্বিত সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (SBCC) কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নয়নের উপায়সমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি সম্বন্ধে উপলব্ধি সহজতরকরণ এবং কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটাতে ধারাবাহিক ও নতুন নতুন কার্যক্রম গৃহীত হবে। এ ধরণের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে:

- ব্যবস্থাপক/প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সেবা সরবরাহের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত সকল কর্মী ও কারিগরি সহায়তাদানকারী কর্মীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকবে।
- অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ সেবা সরবরাহে বিভিন্ন সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের (DGHS, DGFP, DGNM) পরিচালন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়সাধন।
- মুখ্য জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রমাণ, প্রয়োজন ও ফলাফলভিত্তিক বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার বিকাশ সাধন।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহের বিদ্যমান সক্ষমতা ও দুর্বলতা পর্যালোচনা করা।
- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) নিশ্চিতকরণে এসডাব্লিউএ কর্মসূচির বাইরের প্রকল্পগুলো হ্রাসকরণ ও যুক্তিযুক্তকরণ এবং ঝুঁকি নির্ণয় ও ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠাকরণ।
- স্বাস্থ্য জনবল কৌশল (HWS) হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন এবং চিকিৎসক ও সেবিকা তৈরির কার্যক্রম চলমান রাখতে (দক্ষতা মিশ্রণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি) পাঁচ বছর মেয়াদি অন্তর্ভুক্তিকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদির সুসমন্বিত সন্নিবেশ ঘটানো হবে। এছাড়া পেশাগত ব্যবস্থাপনা জোরদার করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুবিধার সুফল প্রাপ্তি বাড়ানো হবে।
- স্বাস্থ্যকর্মী, বিশেষত যারা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্থানীয় কর্মস্থলে পদায়ন করা প্রয়োজন।
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত স্বাস্থ্য খাতের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কর্মস্থলে অবস্থান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
- স্বাস্থ্যখাতের কর্মীদের জন্য চাহিদাভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষা সহজলভ্য করা প্রয়োজন, বিশেষত চিকিৎসকদের জন্য।
- ক্রয় ব্যবস্থাপনার যৌক্তিকীকরণ।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ তথা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ সরকারের বিদ্যমান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন নিয়মিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে থাকে। এসব পর্যালোচনা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–মাসিক এডিপি পর্যালোচনা, আইএমইডির ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা, বার্ষিক কর্মসূচি পর্যালোচনা (APR),

অন্তর্বর্তীকালীন পর্যালোচনা (MTR) প্রভৃতি। এর বাইরে ওপি/প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বহুখাত ভিত্তিক ইস্যু, যেমন- পুষ্টি, নগর স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি রয়েছে। এ কমিটি অর্পিত দায়িত্ব নিয়মিতভাবে যথাযথ প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করে। অধিকন্তু এইচপিএন খাতের কর্মসূচিগুলোয় উন্নয়ন সহযোগীরাও অর্থায়ন করে থাকে। ফলে উন্নয়ন সহযোগী ও সরকারের প্রতিনিধিদের সহযোগে যৌথ পরিবীক্ষণ দলের মাধ্যমেও এ কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। এমন একটি পরিবীক্ষণ উদ্যোগের নাম স্বাস্থ্য খাতের স্থানীয় পরামর্শক গোষ্ঠী। এছাড়া নির্দিষ্ট এইচপিএন পরিষেবা এবং এর সহায়ক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুফল উন্নত করার বিষয়ে বিভিন্ন টাস্ক গ্রুপ এবং স্টিয়ারিং কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

পাশাপাশি চতুর্থ এইচপিএনএসপির আওতায় অর্থায়নের মাধ্যমে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সক্ষমতা বৃদ্ধি, যথাযথ উপায়ে কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন কার্যক্রমে সহায়তা দানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সংখ্যক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব কার্যক্রম ফলাফল কাঠামোতে (RFW) বর্ণিত অর্জনসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ওপি পর্যায়ের সূচকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্তমানে ওপিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের ওপর নিয়মিতভাবে ষাণ্মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে চলমান বৈশ্বিক (এসডিজি), জাতীয় (সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক (অর্থছাড়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সূচক) প্রতিশ্রুতি, ষাণ্মাসিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের (SMPR) বিকাশ, বার্ষিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (APIR), ওপি বাস্তবায়ন এবং এ খাতের কর্মক্ষমতা অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে স্বতন্ত্র পর্যালোচনা দল (IRT) দ্বারা অভ্যন্তরীণ এবং বার্ষিক কর্মসূচি পর্যালোচনা (APR); ডিএলআই মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে ডিএলআই অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কিত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে অনুসরণ করার বিষয়টি অব্যাহত থাকবে।

১০.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নতুন বিভাগের অধীনে স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে মাঝপথে শুরু হয়েছিল। তবে এসডিজির লালিত লক্ষ্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের জন্য মানসম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরি করার ওপর জোর দিয়ে ভবিষ্যতে চলমান কার্যক্রম/কর্মসূচিগুলো আরও সম্প্রসারণ ও উন্নত করা দরকার। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যেসব প্রধান প্রধান কার্যক্রম গৃহীত হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

মেডিকেল ও নার্সিং শিক্ষা

- স্বাস্থ্য শিক্ষার সমস্ত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এক প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন।
- মেডিকেল অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকরণ।
- পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ এবং মেডিকেল/ডেন্টাল/নার্সিং/প্যারামেডিক্যাল শিক্ষার পাঠ্যক্রমে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন/বিশেষায়িত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা। সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো হবে।
- নার্সিং ও প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- গুণগত স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন সাধনে নিয়মিতভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহে শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রম আরও বাড়ানো হবে।
- স্নাতকোত্তর স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে প্রত্যেক বিভাগে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দেশের প্রত্যেক জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা।
- ডিজিটাল উপাত্ত ব্যবস্থাপনার বিকাশ, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির বর্ধিত মাত্রায় ব্যবহার এবং মানসম্পন্ন মেডিকেল ও নার্সিং শিক্ষা পরিষেবা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।
- মেডিকেল শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রমের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মেডিকেল ও নার্সিং শিক্ষার বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- মানসম্পন্ন চিকিৎসা, নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা ও পরিষেবাদি প্রসারে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি, পদ্ধতি ও নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ করা হবে।
- নতুন নতুন ভৌত সুযোগ-সুবিধা স্থাপন ও বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর হালনাগাদকরণ এবং সেগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- বেসরকারি খাতে মেডিকেল ও নার্সিং শিক্ষার যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের বুনিয়াদি বিষয়সমূহের বিশেষায়িতকরণ প্রক্রিয়াকে উৎসাহিতকরণ।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সেবাসমূহ

- নার্সিং প্রতিষ্ঠানে বাড়তি আসন সৃষ্টির মাধ্যমে নার্স ও মিডওয়াইফের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।
- গুণগত মানোন্নয়ন ও কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করা।
- অ্যাক্রিডিটেশন নির্দেশিকার মাধ্যমে নার্সিং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ।
- অনলাইন নার্সিং সেবা শক্তিশালীকরণ ও সম্প্রসারণ।
- এসডিজির অভীষ্টসমূহ অনুধাবনের জন্য নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্ম-পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং চাকরির প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের চাহিদার নিরিখে বিশেষায়িত নার্স তৈরি করা হবে।
- গুণগত মানসম্পন্ন নার্স তৈরির লক্ষ্যে একটি নার্সিং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

এইচপিএন পরিষেবাগুলোর আওতায় পুষ্টি পরিষেবা সরবরাহ ও তার প্রসারের জন্য মানসম্পন্ন মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিপোর্টকে দক্ষতা বিকাশ এবং গবেষণা/অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য উৎপন্ন করা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে চাকরিকালীন পরিষেবা প্রশিক্ষণ প্রদান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে নিপোর্ট নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন অব্যাহত রাখবে:

- প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, মডিউল প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার, সিনিয়র স্টাফ নার্স, এফডাব্লিউএ, এফডাব্লিভি, অন্যান্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (FP) পেশাদার এবং পুষ্টি কর্মীসহ স্বাস্থ্যসেবা খাতে নিয়োজিত সকল কর্মীর জন্য ওরিয়েন্টেশন কোর্স পরিচালনা করা হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, পাঠ্যক্রম হালনাগাদকরণ ও মুদ্রণ।
- প্রশিক্ষণের জন্য নতুন ধারণা/চিন্তাধারা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্ত বিনিময় করা।
- এইচপিএন পরিষেবাদিগুলোর উন্নয়ন ও গবেষণা সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিচালন-বিষয়ক গবেষণা ও সহযোগী গবেষণা পরিচালনা করা হবে।
- বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সুবিধা, জনমিতি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জরিপ, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং এসব কার্যক্রমের ফলাফল অবমুক্তকরণ।
- নিপোর্টের প্রধান কার্যালয়ের জন্য নতুন বহুমূখী (অফিস/একাডেমিক/হোস্টেল) ভবন নির্মাণ এবং আধুনিক সরঞ্জামাদি সংযোজনসহ বিদ্যমান সুবিধাগুলোর হালনাগাদকরণ।

সুযোগ-সুবিধার বিকাশ সাধন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (HED)। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর কাছে এইচপিএন পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে দরকারি অবকাঠামোর প্রয়োজন মেটাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এ সময়কালে যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান অবকাঠামোর হালনাগাদকরণ, নতুন অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা, পুনর্নির্মাণ ও মেরামত, বিদ্যমান ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর সংস্কার, মেরামত, আরডি/ইউনিয়ন সাব-সেন্টারগুলোর সংস্কার ও নতুন মডেল স্থাপন, মাতৃ ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) প্রতিষ্ঠা, নতুন নতুন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI), আইএইচটি, এমএটিএস নির্মাণ ও বিদ্যমানগুলোর মানোন্নয়ন, নার্সিং ইনস্টিটিউটগুলোর সংস্কার ও নতুন মডেল প্রবর্তন, বিভিন্ন স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ প্রভৃতি। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন অবকাঠামোর সেবাসমূহ পূর্ণাঙ্গরূপে সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে মানব সম্পদ, সরঞ্জামাদি, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়েরও উন্নয়ন প্রয়োজন হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের গতি ও কাজের পরিধির সমন্বয়সাধন করা আবশ্যক। এজন্য অতিরিক্ত দক্ষ জনবল, আনুষঙ্গিক সুবিধা, প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রভৃতির সাহায্যে এইচইডিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইচইডির পুনর্গঠন করা দরকার।

১০.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পুষ্টি কর্মসূচি

বাংলাদেশে তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টির অবস্থা ডব্লিউএইচওর নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় বেশি, যা স্বাস্থ্য খাতের একটি জরুরি বিষয়। তবে অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে দেশে যথেষ্ট অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে চরম পুষ্টিহীনতা ও পুষ্টিকণার ঘাটতি কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান। কিন্তু বর্তমানে জীবনধারায় পরিবর্তন ও নগর অঞ্চলে 'জাংক ফুড' গ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত পুষ্টি এক উদীয়মান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ বিষয়টি নতুন করে নানা ধরণের অসংক্রামক রোগ, যেমন- স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত রোগের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে যেসব কার্যকর কৌশল ও কর্মসূচি গৃহীত হবে, তার মধ্যে রয়েছে–সরকারের বিদ্যমান ব্যবস্থাদির মাধ্যমে পুষ্টি সেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, পুষ্টিকণার পরিপূরকতা বাস্তবায়ন, মারাত্মক ও তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা, ভালো মানের পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিসিসিকে শক্তিশালীকরণ, বিভিন্ন খাতে পুষ্টি কার্যক্রমের সমন্বয় ও পুষ্টি কর্মসূচিতে জেন্ডারের বিষয়টি মূলধারায় আনয়ন এবং তা বণ্টনে সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ। একইসঙ্গে উন্নত সরবরাহ শিকল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পর্যাপ্ত দক্ষ মানব সম্পদ ও পুষ্টি সরবরাহ এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ও পণ্যাদি সরবরাহের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি তা নিশ্চিত করা হবে।

পুষ্টিখাতের কৌশল

এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, পুষ্টি একটি বহু খাতভিত্তিক ইস্যু। কাজেই এটি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বহুমূখী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। খাবার গ্রহণের গুণগত মান ও পরিমাণের সঙ্গে পুষ্টির বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের সমস্যাসহ খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য-সম্পর্কিত পুষ্টির বিষয়গুলো অধ্যায় ১৪-তে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পুষ্টি একটি বহু খাত ভিত্তিক ইস্যু। কাজেই এটি মোকাবিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বহুমূখী পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সারণি ১০.৩-এ পুষ্টি খাতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপালনকারী সরকারি খাতের প্রধান প্রধান সংস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের নীতিমালা ও নির্দেশিকার (যেমন: এনপিএএন-২, সিআইপি-২, এনএসএসএস, এফএসএনপি, ৪র্থ এইচপিএনএসপি) বিকাশ সাধনের মাধ্যমে এই বহু খাতভিত্তিক ও বহুমূখী প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, যা পুষ্টি সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে সক্ষম করে তোলে। পুষ্টি খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য এ খাতের বিদ্যমান অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল নির্ধারণ করা হবে। পুষ্টিখাতের অংশীজনদের ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ পুনরায় আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে এবং পূর্বোক্ত সক্রিয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত সমন্বয় ও সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। পুনরুজ্জীবিত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি কাউন্সিলের (BNNC) মাধ্যমে পুষ্টি-সম্পর্কিত নীতিগত নির্দেশিকা এবং আনঃমন্ত্রণালয়/মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সংযোগসমূহ ত্বরান্বিত করা হবে। তদুপরি খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যমান মন্ত্রিসভা কমিটিগুলো পুষ্টি কর্মসূচির কার্যকর সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সমাধানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম এগিয়ে নেবে।

সারণি ১০.৩: পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে বহুখাত, বহুসংস্থাভিত্তিক পদ্ধতি

ক্ষেত্র	পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে ভূমিকা ও কার্যক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
শিক্ষা	• স্কুলে সবজি বাগান তৈরি ও রান্নার ব্যবস্থাকরণসহ পুষ্টি ও হাইজিনের বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণ • বিদ্যালয়ের দিনপঞ্জিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিষয়ক দিবসসমূহের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ • মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিতকরণ • যেসব স্থানে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চলমান, সেখানে উন্নতমানের খাদ্যাভ্যাসের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ ঘটানো • বিদ্যালয়ে স্যানিটেশন সুবিধার উন্নয়ন সাধন	শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; তথ্য মন্ত্রণালয়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	• হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অগ্রগতি সাধন • নিরাপদ পানযোগ্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ • বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে স্যানিটারি সুবিধাদির প্রাপ্যতায় অগ্রগতি সাধন • কৃষি ও মৎস্য ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার প্রদান	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
খাদ্য	• মানসম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের খাবারের প্রাপ্যতার উন্নতি নিশ্চিতকরণ • কৃষিখাতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা, খাদ্যের বণ্টন ব্যবস্থা এবং খাদ্যের মূল্য শিকল ব্যবস্থায় উত্তম চর্চার প্রসার ঘটানো • খাদ্য নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর নিশ্চয়তা বিধান ও পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ	খাদ্য; শিল্প; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; কৃষি মন্ত্রণালয়
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	• বিভিন্ন ধরণের খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন (প্রাণিজ আমিষের উৎস) • কৃষি সম্প্রসারণ সেবা ও সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন • কৃষি সম্প্রসারণের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে পুষ্টির মৌলিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তকরণ • পুষ্টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষির ইনপুট সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণের বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের কথা বিবেচনাধীন	কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ; পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক খাত	• নিজের ও নিজের শিশুদের কল্যাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ • বাল্য বিবাহ/কম বয়সে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান এবং পুষ্টি পরিস্থিতির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে গুরুত্বারোপ • সব খাতে সবেতনে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান	মহিলা ও শিশু বিষয়ক; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, তথ্য মন্ত্রণালয়
শিল্প	• পুষ্টিসমৃদ্ধ লবণ ও তেলের মতো খাদ্য উপকরণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিকরণ • বিজ্ঞাপন/বিপণনে উচ্চমান অনুসরণ এবং শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান	শিল্প, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়
পরিবেশ, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ	• প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ বৃদ্ধিকরণ অথবা পুনরুদ্ধারকরণ • বনের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বন থেকে উৎসারিত খাদ্য উপকরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী/নারীদের লাভবান করে তোলার বিষয়টি উৎসাহিতকরণ • দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (যেমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, জরুরি সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী) জন্য ভূমি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানা নিশ্চিতকরণ • বিভিন্ন ধরণের পানিবাহিত রোগের মতো নেতিবাচক প্রভাব নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি একটি দরিদ্রবান্ধব, দক্ষ ও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার প্রচলন ঘটানো • পর্যাপ্ত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ, পানি সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত অভিযোজন প্রক্রিয়া সহজীকরণের মাধ্যমে পানির সঙ্গে সম্পর্কিত নানা দুর্যোগের ঝুঁকি (যেমন খরা, বন্য, পানির নিরাপত্তাহীনতা) প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা • আগাম সতর্কতা ও পুষ্টি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ • বিশেষত জরুরি পরিস্থিতিতে খানা/স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঘাত-সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাতের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ানো এবং যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত সূচকসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরণ	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও ন্যায়বিচার	• অধিকার ও বৈষম্যহীনতা সুরক্ষা, সম্প্রসারণ ও পরিবীক্ষণ: পর্যাপ্ত খাবার প্রাপ্তি ও মর্যাদার সঙ্গে নিজেকে খাওয়াতে সক্ষম হওয়া; এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ (কর্মসংস্থান, শিশুদের অধিকার, নারীর অধিকার, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবার এবং মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর প্রদান) • দীর্ঘমেয়াদি সংকটে শরণার্থী এবং মানবিক আইন গ্রহণ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক; আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিশু, কিশোরী ও মাতৃ অপুষ্টি মোকাবিলা

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে শিশু, কিশোরী ও প্রজনন-সক্ষম নারী (১৫-৪৯ বছর) এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপুষ্টির হার কমিয়ে আনার বিষয়ে বাড়তি মনোযোগ দেয়া হবে। এটি পুষ্টি-সম্পর্কিত কর্মসূচিসমূহে জেন্ডারের বিষয়টি মূলধারার উপাদান হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার প্রচেষ্টারও অংশবিশেষ। সে লক্ষ্যে, মানুষের জীবনচক্রের ওপর স্বাস্থ্যের প্রভাব মোকাবিলায় সরকার বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করবে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ-জাতীয় পদ্ধতির মধ্যে শিশু/মহিলাদের পুষ্টি, খাদ্য মূল্য এবং খাদ্যের বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, যেমন এক বছরের নিচের শিশু এবং ছোট বাচ্চাকে

খাওয়ানো এবং গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী নারী ও কিশোরী মেয়েদের মধ্যে লৌহের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা কমাতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পূরক পুষ্টিকণা উপাদান হিসেবে আয়রন-ফলিক অ্যাসিড বিতরণ ও তা গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। এক বছরের কম বয়সী শিশু ও অল্প বয়স্ক শিশুদের খাদ্যচাহিদা মেটাতে এক্ষেত্রে গৃহীত জাতীয় কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। শিশুদের জন্য বিদ্যমান অর্ধ-বার্ষিক ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ অব্যাহত থাকবে। মায়ের দুধের মাধ্যমে নবজাতকের ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা মেটাতে বাচ্চা প্রসব-পরবর্তীকালে মায়েদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' বিতরণ করা হবে। লবণে আয়োডিন যুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পর্যবেক্ষণ জোরদার করা হবে। ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য জিংকের বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। আলবেনডাজল ট্যাবলেট বিতরণসহ অন্ত্রের পরজীবী চিকিৎসা কার্যক্রমের বিস্তারের জন্য একটি পৃথক কৃমিনিধন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। আইএমসিআইয়ের আবর্তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে বিনা মূল্যে আয়রন ট্যাবলেট সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পুষ্টি পরিষেবা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে গৃহীতব্য কিছু কার্যক্রমের বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

- হামের টিকা দেয়ার সময় এবং ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পরিচালিত জাতীয় কর্মসূচি চলাকালে ভিটামিন এ, আয়রন ও আয়োডিনের সুরক্ষা-সংবলিত খাদ্য সম্পূরক হিসেবে উচ্চতর শক্তিসমৃদ্ধ ভিটামিন 'এ' ও কৃমিনাশক সরবরাহ করা হবে।
- সম্পূরক পুষ্টিকণা হিসেবে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে (আয়রন ফোলেট) এবং প্রসবোত্তর সময়কালে মা ও নবজাতকদের জন্য ভিটামিন-এ পরিপূরক সরবরাহ করা।
- কিশোরী মেয়ে, গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের যথাযথ যত্ন নেয়া ও উপযুক্ত খাবার প্রদান অনুশীলন, স্তন্যদান, খাদ্য পরিপূরক উপাদান খাওয়ানো, পুষ্টিকণা বিতরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান।
- কৃশতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কর্মসূচির মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার আওতায় অন্যান্য পুষ্টি পরিষেবাদি জোরদার করা হবে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পরিচালিত কর্মসূচি এবং স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিহীনতার বিষয়টি ব্যবস্থাপনা, আইওয়াইসিএফ প্রভৃতির পাশাপাশি অপুষ্টিজনিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সি-আইএমসিআই কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিক সংগঠনভিত্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা রোধ ও পুষ্টি সেবাসমূহ সম্প্রসারণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।
- সামাজিক আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগের (SBCC) মাধ্যমে ইতিবাচক পুষ্টি অভ্যাসগুলোর উন্নতি করার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাদি থেকে পুষ্টি পরিষেবা গ্রহণ; খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের পাশাপাশি এর পরিপূরক বিষয় হিসেবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, ইপিআই কার্যক্রম পরিচালনা ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয়া হবে।
- পুষ্টি পরিষেবার বিষয়ে সময়মতো ও গুণগত মান বজায় রেখে অবহিতকরণ এবং এর ফলোআপ করা।
- পুষ্টি পরিষেবার জন্য আন্তঃখাতভিত্তিক ও আন্তঃওপি সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ এবং দক্ষতার সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
- পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে তাদের পাঠ্যক্রমে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যুক্তকরণ।
- ইপিআই কর্মসূচিতে শিশুদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি সংযুক্তকরণ।
- নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বিকাশ ও শক্তিশালীকরণ; এ-সম্পর্কিত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং পুষ্টি, খাদ্য সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ক্রিয়াকলাপের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- মাতৃভাতা ও স্তন্যদানকারী মায়েদের ভাতা/শিশু বেনিফিট কর্মসূচির মতো অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রাসঙ্গিক পরিষেবা ও কর্মসূচির সঙ্গে সংগতিবিধান করে পরিষেবাগুলোর সম্প্রসারণ।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সরকারি সুবিধার পর্যায়ে প্রয়োজন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পুষ্টিকর্মীদের নিয়োগের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টি

স্বাস্থ্য কর্মীদের জ্ঞানের ভিত্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের পাশাপাশি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র/উপকেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় পুষ্টির বিষয়টিকে মূলধারার উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়াকে সহজ করবে। আইপিএইচএন-এর এনএনএস পরিচালন পরিকল্পনার মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য

ও কৃষি শ্রমিক, স্কুল শিক্ষক এবং নারী কৃষকদের পুষ্টির ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সচেতনতা জোরদার করা হবে। নাগরিক সম্প্রদায়ভিত্তিক ব্যবস্থাগুলো স্বল্পমূল্যের পুষ্টিকর খাবার প্রস্তুতকরণ এবং ক্ষুদ্র পুষ্টিকণাসমৃদ্ধ খাবার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের বিষয়টিকেও জোরদার করবে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, খাদ্যাভ্যাস, টিকাদান কর্মসূচি (EPI) এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো যেসব বিষয় পুষ্টির পরিপূরক এবং পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে, সেগুলো একটি বিস্তৃত পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা

নিয়মিত তথ্যগুলোর আন্তঃব্যবহারযোগ্যতা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নতি সাধনের মাধ্যমে নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রমাণক তৈরির জন্য পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা শক্তিশালীকরণ; জরিপ, মূল্যায়ন ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা; গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তির প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সাম্য, প্রাপ্যতা, আবর্তন ও মানের দিক থেকে টেকসইযোগ্যতা ও জবাবদিহিতার স্তর বোঝার জন্য অবহিত নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য প্রমাণক সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পদ্ধতির সঙ্গে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পরিষেবাদির সরবরাহ ও ব্যবহারকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

১০.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন ও কাঠামোসমূহ কীভাবে চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি সুযোগ সৃষ্টি করে, তা বাংলাদেশ এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে। সামাজিক নীতিমালা বাস্তবায়নের সাফল্যের হাত ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাসকরণ এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোর পরিবর্তনের পাশাপাশি গত ৪৮ বছরে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা পরিস্থিতির অগ্রগতিসহ শিশু মৃত্যু, মাতৃ মৃত্যু ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ প্রণয়নের ফলে পরবর্তী ২০ বছর বা তার বেশি সময়কালে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি ভূমিকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যার কাঠামো এখন যা আছে এবং পরবর্তী ২০ বছরে যা বিকশিত হবে, তার সঙ্গে ২০-৩০ বছর আগের চিত্রের অনেক বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (UMIC) এবং উচ্চ-আয়ের দেশে (HIC) রূপান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষাপট নিম্ন-আয়ের (১৯৭২-২০১৪) দেশ এবং নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের (LMIC) (২০১৫ থেকে চলমান) প্রেক্ষাপটের থেকে অনেক আলাদা। যে কারণে এ ক্ষেত্রে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পূর্ণ আলাদা এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে আসন্ন উন্নয়ন এজেন্ডার যাত্রা হচ্ছে, তাতে এসব বিষয় যথাযথ একীকরণের জন্য একটি কৌশলগত পর্যালোচনা দরকার।

১০.৬.১ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম জাতীয় জনশুমারিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৪ মিলিয়ন (সাত কোটি ৪০ লাখ)। ওই শুমারিতে দেখা যায়, দেশে মোট জনসংখ্যা উর্বরতার হার (TFR) ছিল ৬.৯ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিবছর ২.৫ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশু (০-১৪ বছর বয়সী) ৪৮ শতাংশ এবং নির্ভরতা অনুপাত সর্বোচ্চ ১০০ পর্যন্ত। প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৪৮ বছর, এক বছরের নিচের শিশু মৃত্যুর হার ছিল উদ্বেগজনক, প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৩৯ জন এবং মাতৃ মৃত্যুর হার ছিল প্রতি এক লাখ জীবিত জন্মে ৭৫০ জন (সারণি ১০.৪)। জনসংখ্যার এই হতাশাজনক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সত্যিই উদ্বেগজনক। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন। ৪০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সে প্রচেষ্টার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া গেল। ২০১১ সালে যখন দেশের সর্বশেষ জনশুমারিটি অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেখা গেল বাংলাদেশ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। টিএফআর নাটকীয়ভাবে ২.৩-এ নেমে এসেছে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ১.২ শতাংশ, প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ বছর হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার নাটকীয়ভাবে নেমে এসেছিল প্রতি হাজারে ৩৯ জনে। মাতৃ মৃত্যুর ঘটনা হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছিল, যদিও এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে পরিমিত ছিল। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের হাত ধরে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশু জনসংখ্যার অংশ হ্রাস পেয়ে ৩৫ শতাংশে নেমে আসে এবং নির্ভরতা অনুপাত হ্রাস পেয়ে ৬৭ শতাংশে নেমে আসে। নমুনা সমীক্ষার উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা খাতের অগ্রগতি গত আদমশুমারির পর থেকেও অব্যাহত রয়েছে (সারণি ১০.৪)।

সারণি ১০.৪: বাংলাদেশে জনসংখ্যার অগ্রগতি ১৯৭৪-২০১৯

জনসংখ্যা সূচক	১৯৭৪	২০১১	২০১৯
মোট জনসংখ্যা উর্বরতার হার (TFR)	৬.৯	২.১	২.০
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)	২.৫	১.৪	১.৩২
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	৪৬.২	৬৯.০	৭২.৬
এক বছরের নিচের বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	১৩৯	৩৯.০	২১
মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি এক লাখ জীবিত জন্মে)	৭৫০	২৩৯	১৬৫
মোট জনসংখ্যার মধ্যে ০-১৪ বছর বয়সীদের অনুপাত (%)	৪৮.১	৩৫.৪	২৮.৫
নির্ভরতার হার (%)	১০০.০	৬৭.২	৫১.০

সূত্র: বিবিএস

ইউএনএফপিএ বিশ্ব জনসংখ্যার চ্যালেঞ্জের অগ্রগতি পরিস্থিতির ওপর প্রতিবছর একটি বার্ষিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এতে কায়রো সম্মেলনে (ICPD 1994) গৃহীত জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা এজেন্ডার অগ্রগতির বিষয়ে দুটি সংক্ষিপ্ত সারণি উপস্থাপন করা হয়। এর একটি হচ্ছে একটি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের অগ্রগতি সম্পর্কিত এবং অন্যটি যুব ও কিশোর বয়সী জনগোষ্ঠী-সম্পর্কিত। এর বাইরে একটি তৃতীয় সারণিতে মূল জনসংখ্যার সূচকগুলোর অগ্রগতির তুলনা তুলে ধরা হয়। এই তিনটি সারণি সম্মিলিতভাবে আইসিপিডি কাঠামোর প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের যে অগ্রগতি হয়েছিল তার ওপর একনজরে একটি ধারণা সরবরাহ করে এবং আগামী দিনে সামনের দিকে এগিয়ে চলার এজেন্ডার সংক্ষিপ্ত-সার প্রদান করে।

সারণি ১০.৫-তে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের বিষয়ে আইসিপিডি এজেন্ডায় নির্ধারিত সূচকের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করা হয়েছে। গর্ভনিরোধক গ্রহণে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা বিশ্ব গড়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় অগ্রগতির তুলনায় অনেক উন্নত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো। তবে বাংলাদেশে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা সন্তান প্রসব করানো ও প্রসবকেন্দ্রিক নারীদের মৃত্যু হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কর্মসম্পাদন এখনো বেশ দুর্বল। ১৯৭৪ সালের তুলনায় এবং বৈশ্বিক গড় হার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যুর প্রকোপ কমানোর ক্ষেত্রে বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে মাতৃ মৃত্যুর প্রকোপ কমাতে গতিশীল পূর্ব এশীয় দেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের শক্তিশালী কর্ম সম্পাদনের তুলনায় বাংলাদেশ এখনো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পিছিয়ে রয়েছে। শিশুর জন্মকালে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এমনকি এক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্জিত গড় কর্ম-সম্পাদনের চেয়েও বাংলাদেশ নিচে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে কর্ম-সম্পাদনে গুরুতর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় এবং তা মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণি ১০.৫: যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের ক্ষেত্রে আইসিপিডি অভীষ্টে বাংলাদেশের অগ্রগতি

অঞ্চল/দেশসমূহ	জন্মনিরোধক ব্যবহারের পরিস্থিতি, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী, যেকোনো পদ্ধতি (%)	জন্মনিরোধক ব্যবহারের পরিস্থিতি, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী, আধুনিক পদ্ধতি (%)	পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থায় ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে অপূরণীয় প্রয়োজন	চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির হার; ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী	আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে সন্তুষ্টির অনুপাত; ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী	মাতৃমৃত্যুর হার (এমএমআর) (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)	সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হার (%)
বছর	**২০১৯**	**২০১৯**	**২০১৯**	**২০১৯**	**২০১৯**	**২০১৫**	**২০১৭**
বৈশ্বিক	৬৩	৫৮	১২	৮৪	৭৮	২১৬	৭৯
অধিকতর উন্নত অঞ্চল	৬৮	৬১	১০	৮৮	৭৯	১২	
অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চল	৬২	৫৭	১২	৮৪	৭৭	২৩৮	
স্বল্পোন্নত অঞ্চল	৪২	৩৭	২১	৬৭	৫৯	৪৩৬	৫৬
এশিয়া ও প্যাসিফিক	৬৭	৬২	১০	৮৭	৮১	১২৭	৮৪
বাংলাদেশ	**৬৪**	**৫৭**	**১১**	**৮৫**	**৭৬**	**১৭৬**	**৫০**
ভারত	৫৭	৫১	১২	৮২	৭৪	১৭৪	৮৬
পাকিস্তান	৪২	৩৩	১৯	৬৮	৫৪	১৭৮	৫২
শ্রীলঙ্কা	৬৫	৫৪	৮	৯০	৭৪	৩০	৯৯
নেপাল	৫৪	৪৮	২২	৭১	৬৩	২৫৮	৫৮
মালয়েশিয়া	৫৩	৩৯	১৭	৭৬	৫৬	৪০	৯৯
থাইল্যান্ড	৭৮	৭৬	৬	৯৩	৯০	২০	৯৯
ভিয়েতনাম	৭৯	৬৫	৬	৯৪	৭৭	৫৪	৯৪

সূত্র: UNFPA, 2019

কিশোরী ও যুবাদের বিষয়ে আইসিপিডিতে অভীষ্টের তুলনামূলক অগ্রগতির চিত্র সারণি ১০.৬-এ প্রদর্শিত হয়েছে। ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই, বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ দুর্দান্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত হয়েছে এবং এ পর্যায়ে তাদের ভর্তির হার ছেলেদের নিট ভর্তিও হারের তুলনায় বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেদের নিট ভর্তির তুলনায় মেয়েদের ভর্তির হার বেশি। তবে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি বৈশ্বিক গড় ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর গড় অগ্রগতির চেয়ে বেশি এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গড়ের খুব কাছাকাছি। তবে বাল্য বিবাহ ও কিশোরীদের সন্তান প্রসবের হার নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি অর্জনে বাংলাদেশ এখনো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

সারণি ১০.৬: কিশোরী ও যুবাদের ক্ষেত্রে আইসিপিডি অভীষ্টে বাংলাদেশের অগ্রগতি

অঞ্চল/দেশসমূহ	১৫-১৯ বছর বয়সী প্রতি হাজার কিশোরীর মধ্যে মাতৃত্বের হার	১৮ বছরের নিচে বাল্য বিবাহর হার (%)	প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে শিক্ষার্থীদের নিট ভর্তির হার (%)	প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের নিট ভর্তির হার (%)	প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা সূচক	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে শিক্ষার্থীদের নিট ভর্তির হার (%)	মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে শিক্ষার্থীদের নিট ভর্তির হার (%)	মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা সূচক
বছর	২০১৮	২০১৭	২০১৭	২০১৭	২০১৭	২০১৭	২০১৭	২০১৭
বৈশ্বিক	৪৪	২১	৯২	৯০	০.৯৮	৬৬	৬৬	১.০০
অধিকতর উন্নত অঞ্চল	১৪		৯৭	৯৭	১.০০	৯৩	৯৩	১.০১
অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চল	৪৮		৯১	৮৯	০.৯৮	৬২	৬২	০.৯৯
স্বল্পোন্নত অঞ্চল	৯১	৪০	৮৩	৮০	০.৯৬	৩৮	৩৬	০.৯৫
এশিয়া ও প্যাসিফিক	২৮	২৬	৯৫	৯৪	০.৯৯	৬৭	৬৮	১.০২
পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা	৯৩	৩৫	৮৬	৮৩	০.৯৭	৩৫	৩৩	০.৯৩
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	১১৪	৪২	৭৯	৭১	০.৯০	৩৯	৩৪	০.৮৬
বাংলাদেশ	৭৪	৫৯	৯২	৯৮	১.০৭	৫৭	৬৭	১.১৭

সূত্র: UNFPA, 2019

জনমিতির অগ্রগতির বিষয়টির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বাংলাদেশ খুব ভালো স্কোর অর্জন করেছে। টিএফআর ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে এর অগ্রগতি বৈশ্বিক গড়, উন্নয়নশীল দেশ এবং পূর্ব এশীয় দেশগুলোর গড়ের অগ্রগতিকে ছাড়িয়ে যায়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের কর্ম-সম্পাদনের চেয়ে ভালো। এ অঞ্চলে কেবল শ্রীলঙ্কা গতিশীল; যারা পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মতো ভালো করেছে। মালয়েশিয়া একমাত্র প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের দিক দিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে যায়। তবে টিএফআর ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে এর কার্যসম্পাদন বেশ নিম্ন। তবে শ্রমবাজারে অতিরিক্ত চাহিদার পরিস্থিতি এবং বর্ধমান মজুরির কারণে জন্মহার বাড়ানোর বিষয়টি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এটি মালয়েশিয়ার একটি সচেতন নীতি। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় দৃঢ় অগ্রগতি অর্জন করেছে। টিএফআর হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, শিশু মৃত্যু হ্রাস, আয়ু বৃদ্ধি এবং মেয়েদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস করা, সন্তান প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর হার বাড়ানো, বাল্যবিবাহ হ্রাস করা, কিশোরী বয়সে সন্তান ধারণের হার হ্রাস করা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার মারাত্মক সমস্যা মোকাবেলা করা।

সারণি ১০.৭: জনমিতির নানা সূচকে তুলনামূলক অগ্রগতি

সূচক/দেশসমূহ	টিএফআর	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)	প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল (বছর)
	২০১৯	২০১৯	২০১০-১৯
বৈশ্বিক	২.৫	১.১	৭২
অধিকতর উন্নত অঞ্চল	১.৭	০.৩	৮০
অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চল	২.৬	১.৩	৭১
স্বল্পোন্নত অঞ্চল	৩.৯	২.৪	৬৫
পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক	২.১	১.০	৭২
বাংলাদেশ	**২.০**	**১.১**	**৭৩**
ভারত	২.৩	১.২	৬৯
পাকিস্তান	৩.৩	২.০	৬৭
শ্রীলঙ্কা	২.০	০.৪	৭৬
নেপাল	২.০	১.১	৭১
মালয়েশিয়া	২.০	১.৬	৭৬
থাইল্যান্ড	১.৪	০.৩	৭৬
ভিয়েতনাম	১.৯	১.১	৭৭

সূত্র: UNFPA 2019

১০.৬.২ জনমিতিক লভ্যাংশ ও বয়োবৃদ্ধি

জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগকাল বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যখন ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেশের মোট নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি হয়। অর্থাৎ ০ থেকে ১৪ বছর বয়সী তরুণ নির্ভরশীল জনসংখ্যা এবং ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী বার্ধক্য নির্ভর জনসংখ্যার চেয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি হয়। এমন পরিস্থিতি বিরাজ করার অর্থ হলো কর্মক্ষম জনসংখ্যা কর্মহীন জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। সুতরাং, এমন বাস্তবতায় অন্যান্য পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক থাকে, তাহলে এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। অন্য কথায়, এটি একটি দেশের বিকাশের জন্য 'উপযুক্ত সময়কাল'। যাহোক, একটি দেশে জনমিতিক লভ্যাংশের ব্যাপ্তিকালের আওতা অন্য দেশের তুলনায় পৃথক হবে কীভাবে, তা নির্ভর করে সেই দেশে স্বাস্থ্য ও জনগণতান্ত্রিক রূপান্তরের ওপর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, দেশের কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অংশটি ১৯৭৮ সালে মোট জনসংখ্যার পরিমাণের তুলনায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, এ সময়টিতেই বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের শুরু। আর এটি সংকুচিত হতে শুরু করবে ২০৩৫-২০৩৬ সালের দিকে, যা জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগের শেষ সীমা হিসেবে চিহ্নত হবে।

চিত্র ১০.১: বাংলাদেশে জনমিতির চিত্র

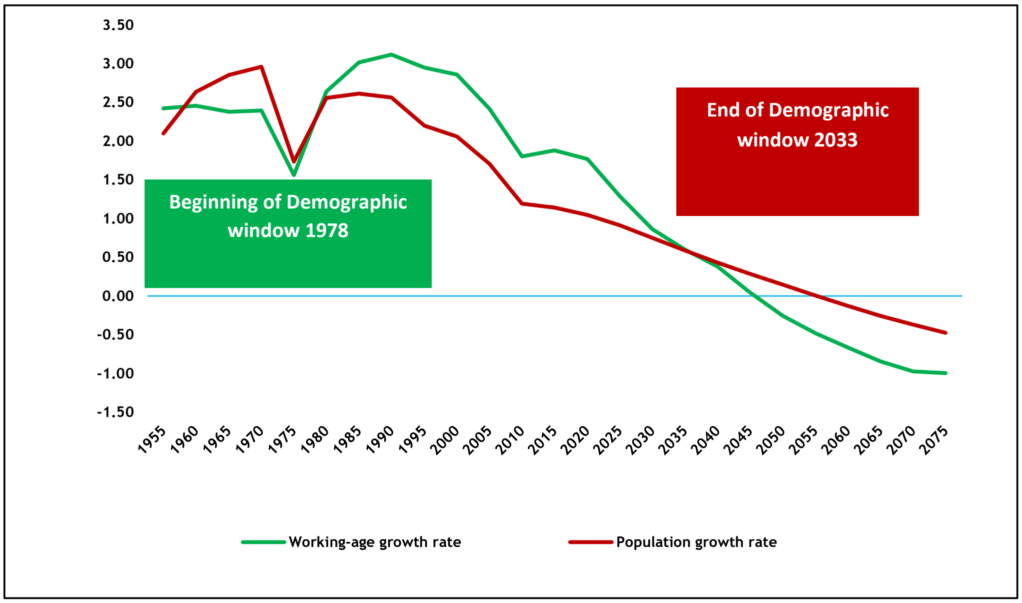

যদিও বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা কাঠামো এখনো তরুণ, তবে পরবর্তী কয়েক দশকে খুব দ্রুত এটির বয়স বাড়তে থাকবে। ওজুমি (২০১৩) এবং অন্যদের মতানুসরে, যদি কোনো সমাজে মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই সমাজ 'বয়স্ক' হয়ে পড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একটি সমাজে মোটি জনগোষ্ঠীর ১৪ শতাংশের বয়স যদি ৬৫ বা তার বেশি হয়, তাহলে সেই সমাজকে 'বৃদ্ধ' সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত সংজ্ঞাটি অনুসারে, বাংলাদেশের বৃদ্ধ সমাজে রূপান্তরের যে সময় প্রয়োজন হবে, তার চিত্র ১০.২-এ দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ২০২৯ সালে বয়স্ক হওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছাবে, ২০২০ সাল থেকে যা মাত্র ৯ বছর পরে। 'বয়স্ক' পর্যায় থেকে একটি জনগোষ্ঠীর 'বৃদ্ধ' পর্যায়ে রূপান্তরিত হতে মাত্র ১৮ বছর সময় লাগবে (সে হিসেবে বাংলাদেশ ২০৪৭ সালে বৃদ্ধ সমাজে রূপ নেবে)। এই ১৮ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ যে গতিতে 'বয়স্ক' পর্যায় থেকে 'বার্ধক্য' পর্যায়ে পরিবর্তিত হবে (অর্থাৎ ২০৪৭-২০২৯), তা এশীয় উন্নত দেশ ও সমৃদ্ধ ইউরোপীয় দেশগুলোর গতির তুলনায় দ্রুত (চিত্র ১০.৩)। সমসাময়িক ও ঐতিহাসিক (যেমনঃ ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও সুইডেন) বিচারে, জনগোষ্ঠীর বয়স্ক পর্যায়ে রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত রূপান্তরশীল সমাজের একটি। ওপরের পরিসংখ্যানগুলোর মতে, বাংলাদেশ এশীয় উন্নত দেশ এবং ইউরোপীয় ধনী দেশগুলোর তুলনায় উন্নতির অনেক নিম্ন পর্যায়ে থাকা অবস্থায় এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারে, যেখানে ওইসব সমাজের উন্নতির একটি সুবিধাজনক পর্যায়ে এ রূপান্তর ঘটেছিল।

চিত্র ১০.২: বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর বার্ধক্যের প্রবণতা

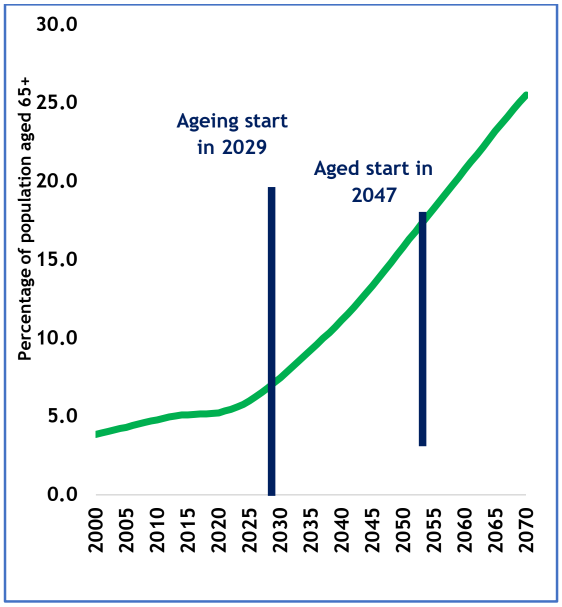

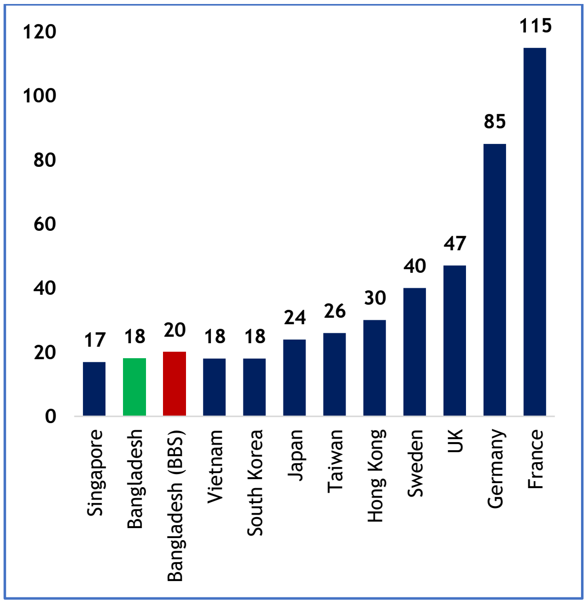

সূত্রঃ UNICEF (2020), "Emerging Trends and Implications for Policy: Demographic Diversity of Bangladesh"

জনগোষ্ঠীর বয়স্ক হয়ে ওঠার প্রণতার একটি নিদর্শন হলো–সেখানে সম্ভাব্য সমর্থ জনগোষ্ঠীর অনুপাত হ্রাস পায়। এক বয়স্ক ব্যক্তিকে (৬৫+) সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মক্ষম বয়সী জনসংখ্যা (১৫ থেকে ৬৪) হ্রাস পায় এবং ভবিষ্যতে তা আরও দ্রুত হ্রাস পাবে বলে প্রত্যাশা করা হয় (চিত্র ১০.৩)। ১৯৬০ সালে প্রায় ২০ জন কর্মক্ষম বয়সীর বিপরীতে একজন প্রবীণ নির্ভরশীল ছিলেন, যারা ৫৯ বছরেরও বেশি সময় (অর্থাৎ ২০১৯-১৯৬০) কর্মক্ষম থাকার অনুপাতে ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই সহায়তা অনুপাতটি ২০১৯ সালের মধ্যে ১৩-তে নেমে এসেছে। এ অনুপাতটি অনুযায়ী, ২০৪০ নাগাদ প্রতি ছয়জন কর্মক্ষম বয়সী জনগোষ্ঠীর বিপরীতে একজন প্রবীণ নির্ভরশীল ব্যক্তি থাকবে, অর্থাৎ ২০১৯ সাল থেকে ২১ বছর পর এ অনুপাত বর্তমানের অর্ধেকে নেমে আসবে। চূড়ান্তভাবে ২০৬৫ সালে এ অনুপাত দাঁড়াবে, প্রতি তিনজন সমর্থ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে একজন নির্ভরশীল বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যা ২০১৯ সালের ৪৬ বছর বর্তমানের এক-চতুর্থাংশে নেমে আসবে। এটি কেবল তখনই সম্ভব, যদি এখনকার শিশুরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে, তখন তাদের উৎপাদনশীলতা এখনকার প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে দ্বিগুণ ও চারগুণ বেশি হবে। সুতরাং, এখনকার শিশুদের সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে তাদের পেছনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং অত্যন্ত সময়-সংবেদনশীল বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে মধ্যপথে অবস্থান করছে। এ অবস্থায় দেশটিতে জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা আবশ্যক। বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক খাত, যেমন–স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ওয়াশ, শিক্ষা, শৈশবকালীন বিকাশ এবং শিশু ও নারীদের সুরক্ষা কার্যক্রমে অত্যন্ত সময়-সংবেদনশীল উপায়ে বিনিয়োগ করা দরকার।

চিত্র ১০.৩: বাংলাদেশে কর্মক্ষম বয়সী (১৫-৬৫ বছর) জনগোষ্ঠীর বিপরীতে নির্ভরশীল বয়োবৃদ্ধ (৬৫ বছর+) জনগোষ্ঠীর অনুপাত

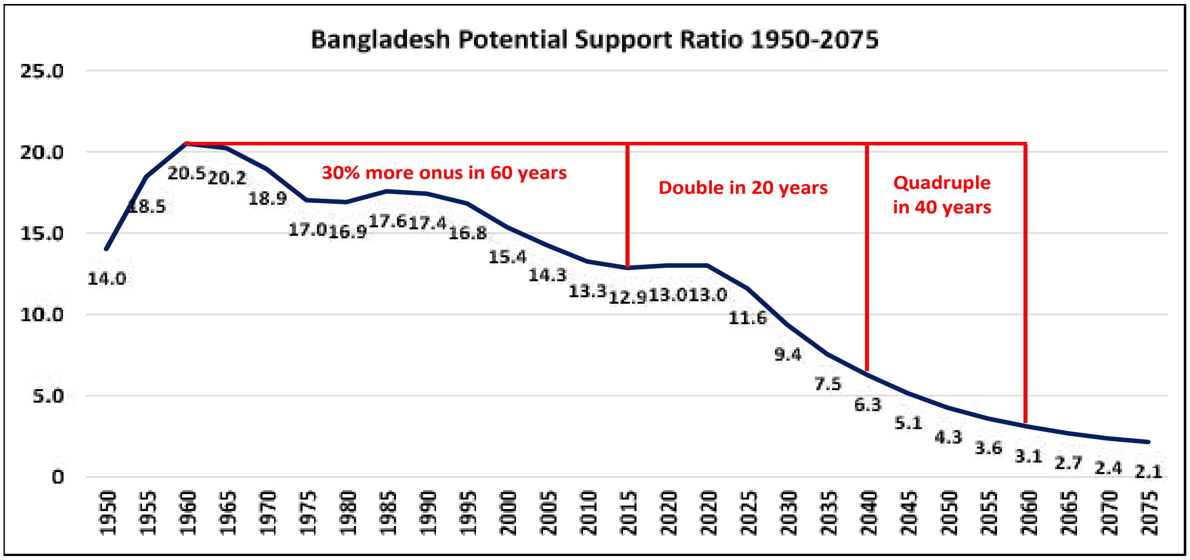

সূত্র: UNICEF (2020), "Emerging Trends and Implications for Policy: Demographic Diversity of Bangladesh"

১০.৬.৩ জনসংখ্যা খাতের চ্যালেঞ্জসমূহ

জনসংখ্যা খাতে অগ্রগতি সত্ত্বেও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও উঠে এসেছে। জনসংখ্যার অগ্রগতি বিবেচনায় দেখা যায়, দেশে এখনো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতিবছর ১.৩%, যা যথেষ্ট অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে বেশ সাফল্য অর্জিত হলেও আধুনিক গর্ভনিরোধক পদ্ধতিগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলার মধ্যে অসমতা রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে। তবে তৃতীয় স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এখনো জেন্ডার ব্যবধান বিদ্যমান। দেশে সংশ্লিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা এখনো বিরাজমান। উন্নয়ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে পড়েছে, যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের উচ্চহার বিদ্যমান, যুব জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ (NEET) কোনো পর্যায়েই নেই, শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার খুবই নিম্ন, শিক্ষার গুণগত মান দুর্বল, পরিবর্তনশীল জনসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য সেবার সুবিধাদি ও প্রাপ্যতা খুবই অপর্যাপ্ত এবং বয়সভিত্তিক কাঠামো অনুসারে মানুষের জীবনচক্রের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম খুব বেশি সহায়ক নয়।[১২] এগুলো থেকে বোঝা যায়, পরিবর্তনশীল জনমিতিক বৈশিষ্ট্যাবলি সরকারের উন্নয়ন কৌশল এবং এ-সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহে পুরোপুরি অন্তর্ভূক্ত হয়নি। আগামী দিনে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ উদ্ভূত হতে পারে, তার সারসংক্ষেপ নিচে দেয়া হলো:

১. বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে (১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে) এখনো উচ্চহার বিদ্যমান, যা কিশোরী মায়েদের সন্তান জন্মদানের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২. এশীয় দেশগুলোর গড় হারের তুলনায় আধুনিক জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণের হার অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন জেলা, গ্রাম, শহর এবং আয়-রোজগার ও বয়সভিত্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

৩. মাতৃমৃত্যুর ক্ষেত্রে এখনো উচ্চহার বিদ্যমান।

৪. সন্তান প্রসবকালে মাত্র ৫৯ শতাংশ (MICS 2019) মা দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা পায়, যা বিশ্বের সর্বনিম্ন হারের অন্যতম।

৫. জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার (GBV) উচ্চহার বিদ্যমান। এটি নারীর ক্ষমতায়ন এজেন্ডায় অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে মারাত্মক হুমকি।

১২ The Bangladesh Employment Challenge Policy Briefs, Sadiq Ahmed, Report Prepared for World Bank and the ILO, July 2020. Also, Implications of Emerging Demographic Profile for Bangladesh Development Strategy, Sadiq Ahmed and Bazlul Khondker, Report Prepared for UNFPA, Dhaka, February 2020.

৬. তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে জেন্ডার ব্যবধান বিদ্যমান।

৭. বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বার্ধক্যজনিত পেনশন সহায়তা নিশ্চিত করা ও বার্ধক্যকালীন স্বাস্থ্য সেবার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এ দুটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটির জন্যও বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

১০.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা কর্মসূচি

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনা হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তাই এটা আশা করা যায়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২০২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে জাতীয় ও খাতভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল এবং নীতি নির্ধারণে জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল গতিবিধি এবং এ সম্পর্কিত জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার এজেন্ডাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ এবং ওপরে উপস্থাপিত সংক্ষিপ্তসারের ওপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিগত সংস্কার এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার সম্ভাব্য কার্যকারিতার সংক্ষিপ্তসার নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- পিছিয়ে পড়া জেলা, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, শহুরে বস্তি ও কিশোরীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আধুনিক গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যৌন শিক্ষা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচার-প্রচারণা জোরদার করা হবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোয় (কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র) আধুনিক গর্ভনিরোধক ডিভাইস এবং পরামর্শের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংযুক্ত করা হবে। নগরীর বস্তিগুলোয় নারীদের কাছে সেবা পৌঁছানো এবং গ্রামীণ নারীদের দোরগোড়ায় বিভিন্ন পরিষেবা সরবরাহের লক্ষ্যে এনজিওভিত্তিক কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক এবং জেলা স্তরের হাসপাতালে বরাদ্দ বাড়ানো ও পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল নিয়োগদানের মাধ্যমে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদের শেষ নাগাদ বাচ্চা প্রসবকালে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির হার বর্তমানের ৫৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭২ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাকর্মী, এনজিওভিত্তিক স্বাস্থ্য ও সমাজকর্মী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতাদের সহায়তায় বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে আইন জোরদার করা হবে। যেসব পরিবার এ আইন লঙ্ঘন করবে, তাদের প্রতি আইনের বিধান সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা হবে। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে শিক্ষামূলক প্রচারণা জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়াকে কাজে লাগানো হবে।
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার (GBV) কারণে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এবং প্ররোচিত অর্থনৈতিক ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরি করার জন্য একটি সমন্বিত গবেষণা পরিচালনা করা হবে। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার ওপর ভিত্তি করে জিবিভি মোকাবিলায় একটি সামষ্টিক নীতিকাঠামো ও কৌশল প্রণয়নে গবেষণা কর্মটি যাতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা হবে। জিবিভি মোকাবিলায় প্রতিরোধ, বিধান ও সুরক্ষা–তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে যে 'সামগ্রিক পদ্ধতি' রয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ তার কৌশলগুলো তৈরি করতে পারে। এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি উচ্চ-অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।
- চলমান জনমিতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শ্রমশক্তির দ্রুত বর্ধনকে সহায়তা করবে। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির সাম্প্রতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে এটি যাতে জিডিপি বৃদ্ধির কর্মসংস্থান স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা গৃহীত হবে, তার মধ্যে রয়েছে–তৈরি পোশাক খাতের (RMG) প্রবৃদ্ধি জোরদার করার লক্ষ্যে মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হারের তীব্র তেজিভাব ফিরিয়ে আনা ও ব্যয় হ্রাস করা এবং অবকাঠামো ও বাণিজ্য-সহায়ক পরিষেবাদির মানোন্নয়ন করা; যেসব বাণিজ্যিক সুরক্ষা কার্যক্রম রফতানি নিরুৎসাহিত করে, সেগুলো দ্রুততার সঙ্গে হ্রাস করা এবং রফতানি বৈচিত্র্য আনয়ন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ ও অন্যান্য সহায়ক পদক্ষেপের প্রাপ্যতায় উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে একটি গতিশীল কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) ব্যবসায় উদ্যোগ খাতের বিকাশ সাধন।
- শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ মোট নারী জনগোষ্ঠীর ৩৬ শতাংশে স্থির হয়ে রয়েছে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় এ হার অনেক কম। সরকারের উচিত ২০৪১ সালের মধ্যে নারী শ্রম শক্তির অংশগ্রহণের হার ৬৪ শতাংশের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, যেমনটি দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী শ্রম শক্তির হার ৪৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে ওপরে যেসব নীতিমালার কথা উল্লেখ করা

হয়েছে, সেগুলোর পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা (GBV) রোধ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এছাড়া অল্পবয়স্ক মায়েদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণে সক্ষম করার জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের সেবার আওতা বাড়াতে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগ ও এনজিওগুলোর সহযোগিতায় এটি করা হবে।

- জনমিতিতে ধারাবাহিকভাবে বিবর্তন চলতে থাকায় যুব কর্মসংস্থান বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ক্রমেই বাড়বে। এক্ষেত্রে জনমিতিক লভ্যাংশ যাতে অপচয় না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি নীতি প্রণয়নের বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হবে। আইএলওর অনুরোধের ভিত্তিতে যুব কর্মসংস্থান চ্যালেঞ্জের বিষয়ে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে একটি বিশদ পর্যালোচনা এবং নীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত মূল নীতিগত সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে–শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সরকারি ব্যয় ব্যাপকহারে বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন করা; প্রশিক্ষণের কাজের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধিতে বেসরকারি খাত, দাতা সংস্থা ও এনজিওগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টি; উচ্চ হারের কর হ্রাস করে আইসিটির বিস্তার সম্প্রসারণ করা; প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও যুবকদের স্ব-কর্মসংস্থান বাড়ানো; এবং যেসব জেলা জনমিতিক লভ্যাংশ ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছে না, সেখানে প্রশিক্ষণ, অর্থ ও তথ্যের প্রাপ্যতা বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন ত্বরান্বিত করা।
- দ্রুত বর্ধমান বয়স্ক জনসংখ্যার বিষয়টি মোকাবিলায় দৃঢ় নীতিগত সুদৃষ্টি প্রয়োজন। বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাদানের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য সেবা ও শারীরিক সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন মেটাতে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। বাংলাদেশে একটি 'বয়স্ক ভাতা' বা ''ওল্ড এজ অ্যালাউন্স (OAA)'' কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু এ কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী নির্বাচনের ব্যবস্থাটি অত্যন্ত দুর্বল এবং ভুল টার্গেটিংয়ের কারণে অধিকাংশ দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। আর মাসিক ভাতার পারমাণও দারিদ্র্য সীমা স্তরের নিচে। জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য বয়োবৃদ্ধ জনগণের আকার দ্রুততার সঙ্গে বাড়িয়ে দেবে। এতে করে তাদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত অর্থ বণ্টনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ আরও বেশি ঘনীভূত হবে। স্বাস্থ্য সেবা খাতে বয়স্ক জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেই। এক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে–আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসারে অবসর গ্রহণ এবং পেনশন প্রাপ্তির বয়সসীমা নতুনভাবে ৬০+ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫+ বছর পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে; এনএসএসএস ২০১৫-তে বর্ণিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন; প্রতিবেদনের বর্ণনামতে, সরকারি ও বেসরকারি তহবিলের সংমিশ্রণের ভিত্তিতে এবং আংশিকভাবে স্বেচ্ছাসেবামূলক ভিত্তিতে একটি সর্বজনীন বার্ধক্য পেনশন প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করা হবে; সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়িত স্বাস্থ্য বিমা এবং ব্যয় সাশ্রয়ী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মিশ্রণের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (UHC) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হওয়া।

পরিবার পরিকল্পনা (FP)

অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়া পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অব্যাহত থাকবে। এ সময়ে যেসব অঞ্চলে কর্মসূচিটির ব্যাপ্তি কম, সেসব এলাকা এবং যেসব কিশোরী মেয়ে কম বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকিতে পড়ে তাদের এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। অষ্টম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা খাতে যেসব কার্যক্রম গৃহীত হবে, তার মধ্যে রয়েছে:

- ২০২৫ সাল নাগাদ অর্জনের জন্য নির্ধারিত সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করা হবে। ওই সময়ের মধ্যে সিপিআরের ব্যবহার ৭৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, এসবিএ ও সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সন্তান প্রসবের হার ৭২ শতাংশে উন্নীতকরণ প্রভৃতি। এছাড়া, গর্ভপাত ও অনর্জিত প্রয়োজনের হার যথাক্রমে ১৫ শতাংশ ও ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
- সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ, শিশু, প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাসমূহ শক্তিশালীকরণ।
- সিটমহলগুলোয় ইউনিটভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- আরও ২০০টি কিশোরীবান্ধব সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকরণ।
- সারা দেশে ইএমআইএস কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ডিএইচআইএস২ কার্যক্রম; ডিজিএফপিতে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- পরিবার পরিকল্পনা খাতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সব এনজিওর ডিজিএফপিতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তর।

- নতুন ভৌত অবকাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ ও বিদ্যমান ভৌত সুবিধাদির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সন্তান প্রসবের হার বৃদ্ধিকরণ এবং মাতৃ, শিশু, প্রজনন ও কিশোরী স্বাস্থ্যের (MCRAH) গুণগত মানোন্নয়নে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর (MCWC) হালনাগাদকরণ।
- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা সেবার সম্প্রসারণ।
- জনমিতিক লভ্যাংশের সর্বোত্তম সুফল নিশ্চিত করতে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও প্রথম সন্তান গ্রহণে বিলম্ব ঘটানো।
- প্রয়োজনমাফিক ইমপ্লান্ট, আইইউডির মতো জন্মনিরোধকের প্রাপ্যতা বাড়াতে এর উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জন্মনিরোধ উপকরণ প্রস্তুতকরণ কারখানা স্থাপন।

১০.৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জনমিতিক লভ্যাংশের ব্যবহার

- জনমিতি ভাগ্যের ব্যাপার নয়। একই সঙ্গে এটি স্পষ্ট ও শক্তিশালী মানদণ্ড নির্ধারণ করে, যার মধ্য দিয়ে দেশগুলোকে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি সময়সীমাবদ্ধ পদ্ধতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। দেশগুলোকে একটি জনসংখ্যার পর্যায়ে প্রদত্ত পরিস্থিতি থেকে সেরাটি তৈরি করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। ওপরে বর্ণিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটি সঠিক যে, নৈতিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে উভয় ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতে প্রজন্মের পেছনে বিনিয়োগের বিষয়টি ন্যায়সংগত ও প্রয়োজনীয়ভাবে 'ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ' হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের বার্ধক্যে সহায়তাদানের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আমাদের সমাজকে উন্নতির দিকে ধাবিত করবে। আর বৃদ্ধ বয়সীদের সুবিধা প্রদানের ধারণা ও তা অনুশীলনের বিষয়টি বর্তমানে আইনগতভাবে 'সুবিধাপ্রাপ্তি পরবর্তী মূল্য পরিশোধ' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কেননা এখন যারা বয়োবৃদ্ধ তারা তখন কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং আমাদের বেড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশে এখন অনেক প্রয়োজন।
- পুষ্টির ঘাটতি শৈশবকালীন বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত করার পাশাপাশি ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা ও জীবনকালের ব্যাপ্তির ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে পুষ্টির বর্তমান অবস্থা (খর্বতা, কৃশতা ও কম ওজন) নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। বাংলাদেশে পুষ্টির ঘাটতির ক্ষেত্রে দুটি চিহ্নিত কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাব। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে পর্যাপ্ত ও কার্যকর বিনিয়োগ প্রয়োজন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বাস্থ্য খাতে কমপক্ষে জিডিপির ২ শতাংশ বিনিয়োগ করতে হবে, বর্তমানে যা এক শতাংশেরও কম। অনুরূপভাবে সামাজিক সুরক্ষা খাতেও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে জিডিপির ২ শতাংশ বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, বর্তমানে যা জিডিপির ১.২ শতাংশ (অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন ব্যতীত)। এই অতিরিক্ত বরাদ্দের একটি বড় অংশ (অর্থাৎ জিডিপির ০.৮ শতাংশ) শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেয়া হবে।
- বিশ্বে এমন অসংখ্য নজির রয়েছে যে, অর্থনৈতিক বিস্তৃতির বিষয়টি কেবল জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে নয়, শৈশবকালেও শিক্ষাগত অর্জনের সঙ্গে ইতিবাচকভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ২০১৯ অর্থবছরে এ বিনিয়োগের হার ছিল মোট জিডিপির ২.৫ শতাংশ; অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ যখন শেষ হবে, তখন এ বিনিয়োগ কমপক্ষে জিডিপির ৩.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- সবশেষে এই বিনিয়োগের গুরুত্ব ও সময়-সংবেদনশীলতার বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হবে। বাংলাদেশে সুযোগের সম্ভার খুবই সীমিত। সেজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

  ক) বাংলাদেশের জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগটি আর মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। জনগোষ্ঠীর বার্ধক্যের হার দ্রুত বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই শিশুদের পেছনে তাৎক্ষণিক বিনিয়োগের গুরুত্বের বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়ে বয়োবৃদ্ধদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে লড়াই করে চলা বয়স্ক সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং বয়োবৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর সমর্থন নিশ্চিত করার কৌশল অবলম্বন করা হবে।

  খ) এই বিষয়গুলো অর্জনের জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শিশুদের পেছনে এই মুহূর্তে বিনিয়োগ বাড়ানো অপরিহার্য, কারণ জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগটি অত্যন্ত সময়সীমাবদ্ধ।

  গ) বাংলাদেশ এরই মধ্যে ২০২০ সালে জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগের ৬৬ শতাংশ সময় পার করে ফেলেছে, যার সূচনা হয়েছিল গত শতকের আশির দশকের গোড়ার দিকে এবং ২০৩৫-৩৬ সময়ে এটি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং, অবশিষ্ট ১৮ বছরের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শিশুদের ওপর এখন পর্যাপ্ত ও কার্যকর বিনিয়োগ নিশ্চিত করা একেবারে অপরিহার্য।

ঘ) বাংলাদেশ যখন তুলনামূলকভাবে কম উন্নয়নের পর্যায়ে ছিল, তখন থেকেই এদেশ জনসংখ্যা উর্বরতার হার ও মৃত্যু হার কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করেছে। এদেশে জনমিতিক রূপান্তরের বিষয়টির সূচনা হয়েছিল জনগোষ্ঠীর বিয়ের বয়স ও প্রথম সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে বিলম্বের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে, যা নতুন ধরণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। বেশি বয়সে বিয়ে ও দেরিতে সন্তান গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগটি দীর্ঘায়িত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১০.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দকরণ

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দ্রুত সাড়া প্রদান এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সক্ষমতা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ানোর জন্য এ খাতে সার্বিক বাজেট ও এডিপি বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের যে প্রাক্কলন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে এ খাতে এডিপি বরাদ্দ ২০১৯ অর্থবছরে জিডিপির ০.৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০২৫ অর্থবছরে ২.০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। তদানুসারে চলতি মূল্য ও অর্থ-বছর ২০২১ সময়ের স্থির মূল্যের ভিত্তিতে পরিকল্পিত উন্নয়নে অর্থের সংস্থানের চিত্রটি সারণি ১০.৮ ও ১০.৯-এ দেখানো হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য সেবা খাতের উদ্দেশ্যাবলি পূরণের জন্য এডিপি বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ১০.৮: অষ্টম পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, চলতি মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫১.৭	১৯৫.৮	২৫২.৭	৩১০.৪	৩৭২.৪
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৮.৪	২২.৬	২৬.১	৩০.৪	৩৬.৫
স্বাস্থ্য খাতে মোট বিনিয়োগ	**১৭০.১**	**২১৮.১৪**	**২৭৮.৮**	**৩৪০.৮**	**৪০৮.৯**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্তি সারণি এ৫.১

সারণি ১০.৯: অষ্টম পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(বিলিয়ন টাকা, অর্থবছর ২০২১-এর স্থির মূল্যে)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫১.৭	১৮৬.০	২২৮.৩	২৬৭.২	৩০৬.১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৮.৪	২১.৫	২৩.৫	২৬.২	৩০.০
স্বাস্থ্য খাতে মোট বিনিয়োগ	**১৭০.১**	**২০৭.৫**	**২৫১.৮**	**২৯৩.৪**	**৩৩৬.১**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্তি সারণি এ৫.২

খাত-১১:

শিক্ষা ও প্রযুক্তি

অধ্যায় ১১

শিক্ষা খাত উন্নয়ন কৌশল

১১.১ সূচনা

একটি দেশের মানব মূলধন বিনির্মাণে শিক্ষা খাতের উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। তাত্ত্বিকভাবে একটি দেশ মানব ও বস্তুগত মূলধন গঠন করার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছাড়াই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলোয় শিক্ষায় বিনিয়োগের সুফল অনেক বেশি। যুগ যুগ ধরে শিক্ষায় বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়, যা বিশ্বব্যাপী শিক্ষা প্রসারকে (ইন্টারভেনশন) একটি কার্যকর নীতি নির্ধারণী হাতিয়ারে পরিণত করে। তার ওপর মানব মূলধন একটি দেশের কাঠামোগত রূপান্তরে সহায়তা করে। কৃষিভিত্তিক থেকে উৎপাদনশীল ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরেও কার্যকর হয়। এটিকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসকরণ এবং সমাজ উন্নয়নে।

বাংলাদেশ ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, দারিদ্র্য কমানো ও মানব মূলধন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম অংশেও বিবৃত হয়েছে। এই সফলতাগুলো অর্জন করার জন্য শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল ও নীতিমালা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। এই কৌশল ও নীতিগুলো প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ (NEP) দ্বারা নির্দেশিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে, আওতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য, শিক্ষার মান উন্নয়নে, প্রায়োগিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং আইসিটি শিক্ষা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা অর্জন থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাসে। এটাও প্রমাণিত যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশ নাগরিকদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অগ্রগতি করেছে, শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় (টারশিয়ারি) শিক্ষিত কর্মশক্তির অংশগ্রহণের হার বেড়েছে।

'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১' বাস্তবায়নে সফলতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ এখন 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১' বাস্তবায়নে উপনীত হয়েছে। 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১'-এ মানব মূলধন উন্নয়নে ব্যাপক অন্তর্নিহিত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত আংশিক দক্ষ কর্মশক্তিই বাংলাদেশকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্পে কাঠামোগত রূপান্তরে ভালোভাবে সহায়তা করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের (UMIC) মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্য রেখে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও আরও উন্নতির জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সাক্ষরতার হার ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তির (এনরোলমেন্ট) বাইরে মনোযোগ বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের তথাকথিত 'মধ্য আয়ের ফাঁদ' অতিক্রম করার জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেখা যায়, যে দেশগুলো শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, তারা দ্রুত 'মধ্য আয়ের ফাঁদ' এড়াতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জনমিতিক লভ্যাংশ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড চলমান রয়েছে। এছাড়া মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে। এই বয়সের জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন কর্মশক্তিতে পরিণত করা না গেলে এই সম্ভাবনাময় জনমিতিক সুবিধা অপচয় হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন কর্মকাঠামোসহ জোরালো ও সামগ্রিক শিক্ষা কৌশলের ওপর জোর দেয়া। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী সব সফল নীতিমালা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া এতে শিক্ষা খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশল ও নীতিমালা বিবৃত করা হবে।

১১.২ মানব মূলধন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মানব 'মূলধন' বলতে বোঝায় দক্ষতা অথবা সক্ষমতা, যা একজন কর্মী শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে। এই গুণগুলো সে নিয়োগদাতাকে 'ভাড়া দেয়'। মানব মূলধনে উচ্চ বিনিয়োগ করা হলে তা কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও ইতিবাচক প্রভাব রাখে। এই দক্ষতা ও সক্ষমতার আপেক্ষিক চাহিদা তার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করে, যা শ্রম মজুরি। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামো যেভাবে রূপান্তরিত হয়, এতে কিছু শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় হিসেবে পরিগণিত হয়। আর নতুন দক্ষতাবিশিষ্ট শ্রমিকদের চাহিদা বাড়ে। এ কারণেই একটি দেশের অর্থনীতি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তনের জন্য উচ্চ দক্ষতা ও সক্ষমতাবিশিষ্ট 'মানবসম্পদের' প্রয়োজন হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বুনিয়াদি শিক্ষাই পর্যাপ্ত হতে পারে। তবে বিষয়টি বৈশ্বিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংযোগ ও অর্থনৈতিক প্রসারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের

জন্য, দেশের মানব মূলধন ভিত্তি বাড়াতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা বিজ্ঞান হালনাগাদকরণ এবং স্নাতকদের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সমৃদ্ধ করার দরকার হবে। এই গুণাবলি দিয়ে বিকাশমান অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় নতুন দক্ষতা ও সক্ষমতার চাহিদা মেটানো যাবে।

জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা হয় তিনটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে মানব মূলধন অর্জিত হয় নিষ্ক্রিয়ভাবে, অন্যদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক আচরণ, সংস্কৃতি এবং স্কুলের শুরুর (আর্লি স্কুল) দিকের মতো বিষয়গুলো মানব মূলধনের অংশ, যা বুনিয়াদি মৌখিক ও সংখ্যাগত দক্ষতা, শিক্ষার প্রতি মনোভাব প্রভৃতি বিষয় নির্দেশ করে। তবে এই পর্যায়ে জ্ঞানভিত্তিক এবং আচরণগত বিকাশের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় পর্যায়ে, শিক্ষার্থীরা স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি থেকে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। তৃতীয় ধাপে প্রাপ্তবয়স্করা চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। তারা সরাসরি কাজ, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, খণ্ডকালীন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ প্রকল্প, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতির মাধ্যমে মানব মূলধন পুঞ্জীভূত করে। কাজেই বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি এই তিনটি পর্যায়েই অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে।

মানব মূলধন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ কীভাবে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিকাশে অবদান রাখতে পারে, তার একটি অসাধারণ উদাহরণ হতে পারে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। ১৯৬০ সালের আগে এই দেশগুলো খুব দরিদ্র ছিল। বিশেষত দক্ষিণ কোরিয়া মৌলিক শিক্ষায় প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করেছিল। একই সঙ্গে অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা উন্নত করতে পদক্ষেপ নিয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রাথমিক দক্ষতাবিশিষ্ট শ্রম শক্তি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে সহায়তা করেছিল। সরকার দেশের উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে মানব মূলধনের (মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি) ব্যাপক প্রসার সহজতর করেছিল। একইভাবে অন্যান্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো জনগণের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ বিনিয়োগের সঙ্গে তাদের বৃদ্ধির পথ প্রত্যক্ষ করেছে। একইভাবে ভিয়েতনাম সাক্ষরতা ও সংখ্যাগত জ্ঞানের পর্যায়ে এমন অর্জন করেছে, যা উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। দেশটির অভাবনীয় উন্নয়ন সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয় মানব উন্নয়নে এই গুরুত্ব প্রদানকে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা যায়, গড় পারিশ্রমিক হার নির্ধারিত হয় প্রধানত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির বৃদ্ধির ভিত্তিতে। ফলে অশিক্ষিত শ্রমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষিত কর্মীর পারিশ্রমিকের মধ্যে দূরত্ব কমে আসে। এটি হতে পারে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার তালিকাভুক্তি সম্পন্ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে বিদ্যালয় পাঠ গ্রহণ মেয়াদ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় এখনো কম, বা ৫.১ বছর। এটি ভারতে ৫.৮ ও শ্রীলঙ্কায় ১০.৯ বছর। এই প্রবণতায় পরিবর্তন আনতে হবে, কেননা দেশ এখন একটি সেবাভিত্তিক অর্থনীতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এজন্য নানা ধরণের কর্মী প্রয়োজন হবে। তবে যখন চাহিদার ধরনে পরিবর্তন আসবে, তখন শিক্ষার মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্নাতক তৈরি করতে হবে। বিষয়টি ইঙ্গিত করে একটি দীর্ঘমেয়াদি মানব মূলধন উন্নয়ন নীতিমালা তৈরির বিষয়ে। অন্যথা হলে এই খাতের কঠোরতা বা অনমনীয়তা দেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাঁধা হতে পারে।

১১.৩ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে শিক্ষা খাতের অগ্রগতি এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ

সর্বশেষ শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশে জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সী ৩১ শতাংশ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা নেই। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রাথমিক শিক্ষায় উচ্চ তালিকাভুক্তি ও সম্পন্নের উচ্চহার থেকে বোঝা যায়, এখন নিরক্ষরতা মূলত বয়স্ক শ্রেণির মধ্যে বিদ্যমান। শহুরে নিরক্ষরতা (২২ শতাংশ) গ্রামীণ নিরক্ষরতার (৩৪.৮) চেয়ে কিছুটা কম। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে তালিকাভুক্তি কম, তবে এই ধারা উর্ধ্বমুখী। প্রাথমিক পর্যায়ে সাক্ষরতার হারে লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্তিকরণ ও পাঠ গ্রহণ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, এই দূরত্ব ভবিষ্যতে কমে আসতে থাকবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে তালিকাভুক্তিকরণ কম। মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় খুব জনপ্রিয় কওমি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। এগুলো সরকারি আওতার বাইরে থাকায় গুণগত মান নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা/তৃতীয় পর্যায়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়েছে। তবে শ্রম শক্তিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) জন্য তৈরির প্রক্রিয়া আরও জোরালো করতে হবে। কেননা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কলা ও গণিতে (STEM) শিক্ষার্থীদের আগ্রহে ঘাটতি দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (TVET) খুব বেশি জনপ্রিয় নয়। কেননা এটাকে দ্বিতীয় সারির শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিল্পখাত ও শিক্ষা খাতের মধ্যে প্রায়ই সংযোগ ঘটে না। পরিণামে দক্ষতা ঘাটতি ও নিয়োগ-অযোগ্য স্নাতক তৈরি হয়।

১১.৩.১ প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশব শুরুর শিক্ষায় অগ্রগতি

সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্কুল-পূর্ব শিক্ষায় বিনিয়োগকে সামাজিক অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবের শুরুর দিকে যদি ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানো হয়, তাহলে তা শিশুদের বুৎপত্তি, সংখ্যাতাত্ত্বিক জ্ঞান ও ভবিষ্যতে সাক্ষরতার হার বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে আগের উদাহরণ থেকে প্রমাণিত যে, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাষা ও শব্দভাণ্ডার, মৌখিক যুক্তি ও অমৌখিক যুক্তি, মৌলিক সংখ্যা জ্ঞান এবং স্কুলের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত থাকে। প্রাক-প্রাথমিক অংশগ্রহণের হার ২০১২ সালে ০.৯ মিলিয়ন (৯ লাখ) থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ১৭ লাখে পৌঁছেছে। আরও ১.৯ মিলিয়ন (১৯ লাখ) শিক্ষার্থী অন্য ধরণের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণকারী প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হার ১০ বছরেরও কম সময়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে; ২০১০ সালের ৪২.২৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ৯২.৭ শতাংশ (সারণি ১১.১)।

২০১৯ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, যারা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও মনঃসামাজিকভাবে বেড়ে ওঠার ঠিকঠাক পথে ছিল, তাদের অনুপাত ছিল ৭৪.৫ শতাংশ। মূল ধারার প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অংশগ্রহণ পিইডিপি-৪ প্রকল্পের মূল উপাদান। ২০১৮ সালে মোট ২৫ হাজার ১৫৬ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ডিপিইর ব্যবস্থাপনায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

সারণি ১১.১: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী (%)

শিক্ষার্থী	২০১০	২০১৪	২০১৮
ছাত্র	৪০.৫৮	৫০.৫৫	৯১.৬
ছাত্রী	৪৩.৯৪	৫১.৬৩	৯৩.৫
মোট	৪২.২৫	৫১.০৭	৯২.৭

সূত্র: বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি, ২০১১, ২০১৪ ও ২০১৮

প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশব শিক্ষার প্রধান চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। কেননা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিজ্ঞান প্রাথমিকের (অথবা আরও উঁচু পর্যায়) চেয়ে ভিন্ন। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের গুণগত মান উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়া খুব জরুরি।

১১.৩.২ প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গঠিত প্রথম শ্রেণি (গ্রেড-১) থেকে পঞ্চম শ্রেণি (গ্রেড-৫) পর্যন্ত। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ সূচক বেড়েছে। ২০১৮ সালে মোট ১৭.৩ মিলিয়ন (এক কোটি ৭৩ লাখ) শিশু সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ছিল। প্রাথমিক শিক্ষায় নিট তালিকাভুক্তির হার ২০১৪ সাল থেকে ৯৭.৭ শতাংশ থেকে ৯৭.৯ শতাংশে ওঠানামা করছে। এই প্রবণতা ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান; উভয় ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৯৭ শতাংশ ও ৯৯ শতাংশে স্থির রয়েছে। এই হার প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ অর্থবছর নাগাদ ১০০ শতাংশের চেয়ে কম। তবে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক ঝরে পড়ার হার ধীরে ধীরে কমেছে। ২০০৬ সালে ৫০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮ সালে ২০ শতাংশের নিচে ঠেকেছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত তারতম্য হ্রাস পাওয়াও এ খাতের একটি সাফল্যগাথা। ২০১২ সালের ৪২ থেকে এই অনুপাত কমে ২০১৮ সালে ২৫-এ পৌঁছে। ৩৪ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো ও অন্য অনুষঙ্গ সংযোজন করেছে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ২০১২ সালের পর পর্যায়ক্রমে বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে তিন লাখ ৪৯ হাজার। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাতও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। ২০১৮ সালের পিইডিপি-৪-এর আওতায় প্রায় ৯২.৭ শতাংশ প্রধান ও সহকারী শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বেড়েছে। ২০১২ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এক লাখ চার হাজার ১৭। সরকারি-বেসরকারি এবং মাদ্রাসা ও এনজিওদের নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয় এ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০১৮ সাল নাগাদ হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ১৪৭। এই বৃদ্ধির মূল কারণ নতুন নতুন সরকারি বিদ্যালয়।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বড় বড় কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও নিয়োগে, পাঠ্যবই হালনাগাদকরণে ও আইসিটি সূচনার মাধ্যমে। এছাড়া রয়েছে ইন্টারনেট সংযোগ-সংবলিত ল্যাপটপ বিতরণ এবং বিদ্যালয়ের নানা সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো। এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে ২০১৮ সালে পিইডিপি-৪ শুরু করা হয়। এর উদ্দেশ্য বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের সব শিশুকে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। পিইডিপি-৪-এর লক্ষ্য যথাযথ বয়সে সব শিশু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ নেবে এবং বিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষা অর্জন করবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে এই শিশুদের পরিবারকে প্রণোদনা দেয়া হবে, যেন তারা শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখে।

প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি (PES) প্রকল্প সূচনা করা হয়েছিল ২০০২ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মায়েদের মাসিক ভাতা দেয়া। এর জন্য বাধ্যবাধকতা ছিল নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন (পারফরম্যান্স) ও প্রয়োজনভিত্তিক শর্ত পূরণ করা। এই কর্মসূচিকে সর্বজনীন করা হয় ২০১৬ সালে। এর সুবাদে যোগ্যতার বিবেচ্য বিষয়ের মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্ধারণে আর চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়নি। তবে মাসিক ১০০ টাকা উপবৃত্তি চালু হয় ২০০২ সালে এবং তা বাড়ানোর জন্য পুনর্বিবেচনা করা হয়নি। অধিকন্তু পরোক্ষ ও উপরি ব্যয় (ওভারহেড কস্ট) অনেক বাড়তে থাকে। উপরি ব্যয় কমাতে ২০১৭ সালের মাঝামাঝি থেকে সরকার সরাসরি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তি পাঠাচ্ছে। তা পৌঁছে যাচ্ছে এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত ১৩ মিলিয়ন (এক কোটি ৩০ লাখ) শিশুর ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) মায়ের কাছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের কাছে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা সরকারের একটি চলমান জনপ্রিয় কার্যক্রম। ২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ৩৫ কোটি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয় চার কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে। বার্ষিক এই কর্মসূচি শুরু হয় ২০০৯ সালে। সেই থেকে এ পর্যন্ত ২.২ বিলিয়ন (২২০ কোটি) বই বিতরণ করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী সরকারের জাতীয় বিদ্যালয় আহার নীতির (ন্যাশনাল স্কুল মিল) অন্তর্ভুক্ত। এতে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনকারী শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হয়, যা অন্তত ৩০ শতাংশ ক্যালরি ও ৫০ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট চাহিদা মেটায়। লক্ষ্য রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিশুকে সর্বজনীন দুপুরবেলার আহার কর্মসূচির আওতায় আনার। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা পর্যালোচনা করা হচ্ছে, যেন পাঠ্যপুস্তক আধুনিক করা যায় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড চালু করা যায়।

পিইডিপি-৩-এর আওতায় ৬০ হাজার প্রধান শিক্ষককে নেতৃত্ববিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইন্টারনেট সংযোগ-সংবলিত কম্পিউটার দেয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ের ১,১৩৯ দপ্তরে। এগুলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেখানে ৩৫ হাজার শিক্ষক ও ৪০০ কর্মকর্তা নিয়োজিত। আধুনিক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৫০টির বেশি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (PTI)। ৫,৪৩২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮,৯২৫টি শ্রেণিকক্ষে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সাউন্ড সিস্টেম ও মডেম দেয়া হয়েছে।

সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তালিকাভুক্তির হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা ১০০ শতাংশের কাছাকাছি। ঝরে পড়ার হার কমেছে ২০ শতাংশের নিচে এবং পুনরাবৃত্তির হার ১০ শতাংশের নিচে। তালিকাভুক্তিতে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর মায়েদের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমিক উপবৃত্তি বিতরণ করার মতো কর্মসূচি নেয়া হয়েছে, যেন সুবিধা বঞ্চিত পরিবারের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত হয়। মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও আইসিটি প্রচলনের মধ্য দিয়ে গুণগত মানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অন্যতম চ্যালেঞ্জ ঝরে পড়ার হার রোধ করা, যা এখনও অনেক বেশি প্রায় ২০ শতাংশ; ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এই হার বেশি। সরকারের নির্ধারিত 'সবার জন্য শিক্ষা (EFA) ' শীর্ষক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির হারও বেশি। বার্ষিক খাত পারফরম্যান্স (এএসপিআর) ২০১৯ প্রতিবেদন অনুসারে, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য স্কুলে অবস্থানকাল (স্কুল কনটাক্ট আওয়ারস) নির্ধারিত হয়েছিল প্রতি বছরে ৭৯১ ঘণ্টা। এই সংখ্যা অনেক উন্নত দেশের মানের (স্ট্যান্ডার্ড) চেয়ে কম। আন্তর্জাতিক মানে প্রাথমিক পর্যায়ে এক হাজার ঘণ্টা শিক্ষণ সময় সুপারিশ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় (PECE) গড় পাসের হার ২০১০ সালে ৯২ শতাংশ থেকে ২০১৮ সালে ৯৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (NSA) অনুযায়ী, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ে খুব বেশি শেখে না। এনএসএ তথ্য অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির তুলনায় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গণিত ও বাংলা শেখার সক্ষমতা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে কম। বাংলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৃতীয়

শ্রেণিতে ৭০ শতাংশ স্কোর করতে দেখা যায়, যা পঞ্চম শ্রেণিতে হঠাৎ করেই ২৫ শতাংশে নেমে যায়। গণিতে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ২০১৫ ও ১৭ সালে ৪১ শতাংশ স্কোর করে, যা যথাক্রমে ২০১১ ও ২০১৩ সালের ৫০ ও ৫৮ শতাংশ স্কোরের চেয়ে অনেক কম। এটি একটি খারাপ প্রবণতা ইঙ্গিত করছে। পঞ্চম শ্রেণিতে গণিত শেখার পরিস্থিতি আরও খারাপ। এক্ষেত্রে ২০১১ সালে শিক্ষার্থীদের অর্জিত গড় স্কোর ছিলো ৩৩ শতাংশের বেশি, ২০১৫ সালে এ গড় স্কোর ১০ শতাংশে নেমে যায়।

বহু নির্দেশক গুচ্ছ জরিপ (MICS) সমীক্ষার ২০১৯ সালের তথ্য অনুসারে, অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার মান একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিকস ২০১৯-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষার মানের বিষয়ে সাত থেকে ১৪ বছর বয়সীদের পঠন ও সংখ্যাগত দক্ষতা বিবেচনায় আনা হয়। পঠন দক্ষতার ক্ষেত্রে দুটি সূচক দিয়ে এবং সংখ্যাগত দক্ষতা তিনটি সূচক দিয়ে গুণগত মান যাচাই করা হয়। পঠনের জন্য সূচকগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ‘একটি গল্পের ৯০ শতাংশ শব্দ সঠিকভাবে পড়তে সক্ষম নয়’ এবং ‘মৌলিক পঠন দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম নয়’। সংখ্যাগত সূচকের মধ্যে রয়েছে ‘সংখ্যা পড়তে অসমর্থ’, ‘সংখ্যাসমূহের পার্থক্য বুঝতে পারে না’ এবং ‘প্যাটার্ন বা ধারাবাহিকতা বুঝতে ও সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়’। এসবের ভিত্তিতে বোঝা যাচ্ছে, ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু সঠিকভাবে একটি গল্পের সব শব্দ পড়তে পারেনি। অর্ধেকের বেশি শিশু মৌলিক পঠন দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়। একইভাবে সংখ্যাগত জ্ঞানে এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু সফলভাবে সংখ্যা পঠন ও সংখ্যার পার্থক্য করতে পারেনি। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্যাটার্ন উপলব্ধি করার কাজ শেষ করতে পারেনি। এ ধারা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, শিশুদের গড় যোগ্যতা খুবই নিচু পর্যায়ে রয়েছে। আর এ কারণেই শিক্ষার গুণগত মান সত্যিই উদ্বেগের বিষয়।

চিত্র ১১.১: প্রাথমিক শিক্ষার মানের সূচকসমূহ (২০১৮)

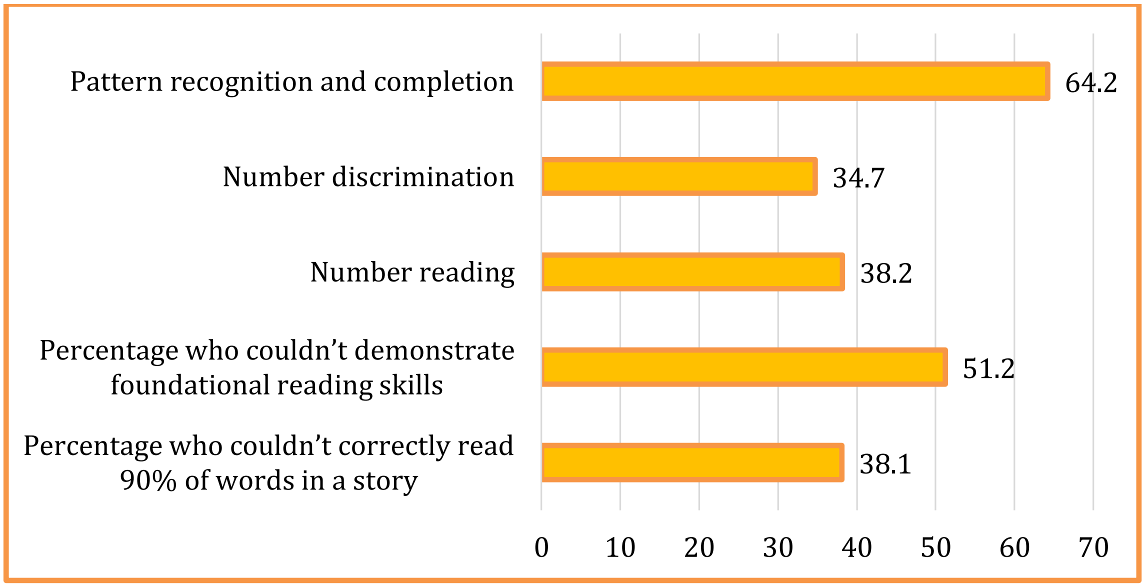

সূত্র: MICS, 2019

১১.৩.৩ মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষায় মাধ্যমিক শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষাকে তাদের চাকরির প্রস্তুতি বিনির্মাণে একটি সেতু হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা একটি সেতুবন্ধন, যার মাধ্যমে তারা তৃতীয় পর্যায় বা অন্য উচ্চ শিক্ষার গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং সমাপনীর হার দৃঢ়ভাবে বাড়ার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার চাহিদাও বেড়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলে-মেয়ে উভয়ের তালিকাভুক্তির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বেড়েছে। ২০১৯ সালে ২০ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানে ১০.৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হতো। এতে অংশ নিতেন ২,৪৬,৮৪৫ জন শিক্ষক। ১০.৫ মিলিয়ন তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫.৬ মিলিয়ন মেয়ে, (৫৪.৪১ শতাংশ) যা দিয়ে বোঝা যায় লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়েছে। গত দশকে এই অনুপাত পর্যায়ক্রমে বেড়েছে। সহস্রাব্দের শুরুতে মাধ্যমিকে মেয়েদের তালিকাভুক্তির হার ছিল ৪০ শতাংশের নিচে। বর্তমানে মেয়েদের

তালিকাভুক্তি ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে, যা পুরুষের একই হারের চেয়ে বেশি। আর্থিক সহায়তা দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের তালিকাভুক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত কয়েকটি প্রকল্প এতে ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে রয়েছে নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহায়তা কর্মসূচি (FSSAP) ১ ও ২ এবং মাধ্যমিক নারী উপবৃত্তি প্রকল্প (HSFSP)। তবে মাধ্যমিক সমাপনীর হার কম বা প্রায় ৬৪ শতাংশ। এই হার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে বেশি। ২১.৭৭ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী অবকাঠামো ও উপকরণ অবলম্বন করেছে। সরকার ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ৮০ শতাংশে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় আইসিটি কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোয় কম্পিউটার সেন্টার বসানো হয়েছে এবং তা ব্যবহারে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় (গড়উ) এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoPME) দুটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। একটি হলো মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম (MMC), আরেকটি শিক্ষকের নেতৃত্বে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি। মন্ত্রণালয় দুটির অধীনে আলাদা দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের ডিজিটালাইজেশন করার প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি কার্যক্রম। এই দুই প্রকল্পে লক্ষ্য রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০ হাজার ৫০০ এমএমসি প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে থাকবে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুবিধা, একটি ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। ২০১৯ সাল নাগাদ ৯৪.৮৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছেছে। ২০২৫ সাল নাগাদ তা শতভাগে নেয়ার লক্ষ্য রয়েছে। একইভাবে পাঠদান কাজের জন্য ৭৬.৭২ শতাংশ মাধ্যমিক স্কুলে কম্পিউটার এবং ৩৭.৬৪ শতাংশে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার রয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ তাও শতভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে।

যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়েছে, শিক্ষকের সংখ্যা একই হারে পারেনি, যা দুশ্চিন্তার বিষয়। প্রতিষ্ঠান প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১২ সালের ৪১৩-এর চেয়ে বেড়ে ২০১৯ সালে ৫০০ হয়েছে। ২০১২ ও ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১২ জন। এই সময় শিক্ষকপ্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৪৪-এ উপনীত হয়েছে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মান উন্নয়নে কিছু প্রকল্প নেয়া হয়েছে। যেমন মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকতা মান উন্নয়ন প্রকল্প। এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২,২০,০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এই সংখ্যা মোট শিক্ষকের ৯৮ শতাংশ। মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এই প্রকল্প তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এতে অন্তর্ভূক্ত ছিল প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সক্ষমতা বিনির্মাণ, উন্নত শিক্ষক প্রশিক্ষণ সুবিধা, কার্যকর চাকরিরত ও চাকরিপূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আরও বেশি প্রবেশাধিকার সমতা এবং আরও বেশি গোষ্ঠী সম্পৃক্তকরণ।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান ও প্রবেশাধিকার বাড়ানোর লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE) এখন বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সবচেয়ে বড় এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-২০২৩) (SESIP)। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ ও ভিশন ২০২১-এ উল্লেখিত অভীষ্ট অর্জন করা, যার মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও মান উন্নয়ন; উন্নত প্রবেশাধিকার ও শিক্ষার্থীকে ধরে রাখা (রিটেনশন), যা সমাপনীর হার বাড়াবে এবং প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও গভর্ন্যান্সের উন্নয়ন। সারণি ১১.২-এ এসইএসআইপির লক্ষ্য ও ফলাফল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সারণি ১১.২: এসইএসআইপির ফলাফল আওতা (এরিয়া)

লক্ষ্যসমূহ	নির্ধারিত ফলাফলসমূহ
বর্ধিত মান ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা	উন্নত মান ও পাঠ্যসূচির প্রাসঙ্গিকতা
	শিক্ষকদের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ
	উন্নত শ্রেণিকক্ষ মূল্যায়ন ও জাতীয় পরীক্ষাসমূহ
	শিক্ষাপ্রক্রিয়ার জন্য আইসিটির উত্তম ব্যবহার
	উন্নত শ্রমবাজার প্রাসঙ্গিকতা
বর্ধিত সমতা প্রবেশাধিকার ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ধরে রাখা	বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন
	নমনীয় শিক্ষণ উপায়সমূহ
	উন্নত প্রবেশাধিকার ও ধরে রাখা
শাসন, ব্যবস্থাপনা ও গভর্ন্যান্স শক্তিশালীকরণ	শক্তিশালী বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
	জোরালো শক্তিশালী শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা
	উন্নত শিক্ষক ব্যবস্থাপনা
	কার্যকর পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় এবং সংগতি
	পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনকরণ জোরদার করা

সূত্র: এসইএসআইপি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার

অন্য ডিএসএইচই প্রকল্পসমূহ

২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল মেয়াদে 'মাধ্যমিক শিক্ষা মান ও অভিগম্যতার উন্নয়ন কর্মসূচি (SEQAEP)' প্রকল্পটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। এটি ভূমিকা রাখে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং শেখানোর ফলাফল পরিবীক্ষণে। এছাড়া একটি ভূমিকা রাখে প্রকল্প উপজেলায় শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও সমতা বাড়াতে। এই প্রকল্পের আগে ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রবেশকারী ৩০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী দশম শ্রেণি সম্পন্ন করার সম্ভাবনা ছিল। প্রকল্প শেষে এই অনুপাত প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে ৬০ শতাংশে উপনীত হয়, যা মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়া থেকে রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা রাখে। প্রকল্পটির অন্যান্য লক্ষ্য নিয়েছিল নারী শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি বাড়ানো এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শতাংশ কমানো। এগুলো ভালোভাবে অর্জিত হয়। এর বাইরে সরকার বাস্তবায়ন করছে ফলাফলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার রূপান্তর (TSER) কর্মসূচি। এর লক্ষ্য মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকতা প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন; আর্থিক সহায়তার উপবৃত্তি ও স্কুল অনুদানের মাধ্যমে দরিদ্র খানার শিক্ষার্থী এবং নারী শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ আলোকপাত সহকারে স্কুলে টিকে থাকা ও শিক্ষা সমাপনীর উন্নয়ন; পাঠ্যসূচির আধুনিকায়ন এবং শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা সহজতর করা। ২০০৯ সাল থেকে প্রতি ডিসেম্বরে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হচ্ছে।

প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জ

শিক্ষা খাতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো মাধ্যমিক শিক্ষায় কম তালিকাভুক্তি। ২০০৯ সালে তালিকাভুক্তি ছিল ৬১ শতাংশ ও নেট তালিকাভুক্তি ছিল ৫৩ শতাংশ। এমনকি আরও বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে কম তালিকাভুক্তি। ২০ বছর আগে এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীর ৫০ শতাংশের কিছু কম ছিল বিজ্ঞানের। এই সংখ্যা সংখ্যা ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৮ শতাংশে। ২০১৯ সালে বাণিজ্য বিভাগ থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর হার ছিল ১৯ শতাংশ, যা ১৯৯৮ সালে ছিল মাত্র ৭ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৯ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের মাত্র ২১ শতাংশ ছিল বিজ্ঞান বিভাগের। বিভাগভিত্তিক শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তির এই পরিবর্তনশীল ধারা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আগামী বছরগুলোয় দেশে প্রচুর বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক প্রয়োজন হবে। তবে বর্তমান ধারায় সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সাধারণ উপলব্ধি রয়েছে যে, বিজ্ঞানের বিষয়গুলো কঠিন। এটি হয়তো সত্য, যে কারণে শিক্ষার্থীরা তা অধ্যয়নে অনিচ্ছুক। মানসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবও একটি বড় সমস্যা। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, ৩৬.৮ শতাংশ শিক্ষক সমিতি (অ্যাসোসিয়েশন) থেকে প্রশ্নপত্র ক্রয় করে, ১৪.৫ শতাংশ ক্রয় করে খোলা বাজার থেকে। প্রায় ৩৭ শতাংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর জন্য গাইড বই ব্যবহার করেন। প্রায় ৩৩ শতাংশ গণিত শিক্ষক ও ২৩ শতাংশ বিজ্ঞান শিক্ষক অননুমোদিত গাইড বই ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। সংক্ষেপে, বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কম অংশগ্রহণের কারণের মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব, বিষয়টি কঠিন বলে প্রচলিত ধারণা ও চাকরির বাজারের কম প্রাসঙ্গিকতা। প্রাথমিক শিক্ষার মতো তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি কিছুটা উন্নতি প্রদর্শন করে, যদিও তা ঝরে পড়ার হারে প্রতিফলিত হয় না। দরিদ্র ও অ-দরিদ্রদের তালিকাভুক্তির হার যথাক্রমে ২৪ শতাংশ ও ৭৬ শতাংশ। এই হার উচ্চ অসমতা নির্দেশ করে, যা আরেকটি চ্যালেঞ্জ।

১১.৩.৪ মাদ্রাসা শিক্ষায় অগ্রগতি

বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বহুবিধ শিক্ষার ধারা–বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা একটি বিতর্কের বিষয়। সবগুলোর মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা মান ও শিক্ষার পাঠ্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন। সেখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের নিয়োগ-যোগ্যতা ও শ্রমবাজারে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিবন্ধিত ধারা (আলিয়া) ও অনিবন্ধিত ধারার (কওমি) উপস্থিতি এই পরিস্থিতি আরও খারাপ করেছে। কেবল ফলাফল ও নিয়োগ-যোগ্যতাই নয়, বরং বিবিধ শিক্ষা ধারার উপস্থিতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিভাজন আরও বাড়াচ্ছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসা ছিল ৯,২০০টি ও কওমি মাদ্রাসা ছিল ১৪,০০০। সব মাদ্রাসার ৮৬ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। এগুলো বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীর যথাক্রমে ৩.১ শতাংশ ও ৩.৮ শতাংশকে পাঠদান করে। আলিয়া মাদ্রাসা শিক্ষার পাঁচটি পর্যায় নিয়ে গঠিত–ইবতেদায়ী (প্রাথমিক সমমান; প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি), দাখিল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি), আলিম (উচ্চমাধ্যমিক সমমান), ফাজিল (বিএ ডিগ্রি সমমান) এবং কামিল (মাস্টার্স ডিগ্রি সমমান)। দাখিল ও আলিমে চারটি ধারা রয়েছে–সাধারণ, মুজাব্বিদ, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা। ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে বিশেষায়িত ধর্মীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত, যেমন তাফসির, হাদিস, আরবি ও ফিকহ। ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা চালু করা হয়েছে, যা অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষার সমতুল্য।

শিক্ষা প্রষ্ঠিানের সংখ্যা এক দশক ধরে প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে। ২০০৮ সালে দেশে মোট ৯,৩৮৪টি আলিয়া মাদ্রাসা ছিল (এর মধ্যে মহিলা আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ছিলো ১,১৮৬টিরও কম), ২০১৮ সালে আলিয়া মাদ্রাসার এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,২৯৪টিতে (যার মাধ্য মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো ১,১৩৪টি, যা মোট আলিয়া মাদ্রাসার মাত্র ১২ শতাংশ)। বিভিন্ন ধরণের মাদ্রাসার সংখ্যা এক দশক ধরে প্রায় স্থির রয়েছে। একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ছেলে-মেয়ের অনুপাত কয়েক বছর ধরে একরকম অপরিবর্তনীয় রয়েছে। ২০১১ সালে ১,০৭,০০০ নিবন্ধিত মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন। সংখ্যাটি ২০১৯ সাল নাগাদ বেড়ে হয়েছে ১,১৩,০০০ (মাত্র প্রায় ১৬ হাজার নারী শিক্ষক, যা মোটের সাত শতাংশ)। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১১ সালে ছিল ২.২০ মিলিয়ন (১.১৭ মিলিয়ন নারী), যা ২০১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৩.৮ মিলিয়ন (২.০৩ মিলিয়ন নারী); মাদ্রাসায় বালকের তুলনায় বালিকা বেশি। ২০১৯ সালে মোট মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ছিল ২৪ লাখ ৯১ হাজার। এর মধ্যে ৫৫.২৪ শতাংশ ছিল মেয়ে। কয়েক বছর ধরে ছাত্রীর সংখ্যা ২০১১ সালের ১১ লাখ ৭০ হাজার থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ১৩ লাখ ৭০ হাজারে পৌঁছে।

২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠানপ্রতি গড়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা ছিল ৪১০ এবং শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১২। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ছিল ১:২১। তবে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী এই অনুপাতগুলোয় বহুধা রয়েছে। প্রায় ৬০ শতাংশ তালিকাভুক্তি রয়েছে দাখিল বা প্রাথমিক সমমান পর্যায়ে। সর্বোচ্চ পর্যায়, কামিলে সবচেয়ে কম তালিকাভুক্তির হার। দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষার্থী-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-প্রতিষ্ঠান অনুপাত কম। অথচ তা কামিল পর্যায় অনেক বেশি। অল্প কিছু ওঠানামা ছাড়া ২০১১ সাল থেকেই এই অনুপাতগুলো প্রায় একই রয়েছে।

দেশে বর্তমানে ছয় হাজার ৩০০ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। এগুলোকে মাসিক পে-অর্ডারভুক্ত (এমপিও) করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই নির্দেশনা অনুযায়ী ইবতেদায়ী শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান সুবিধা পাবেন। আশা করা যায়, ভালো আর্থিক সুবিধা দেয়া হলে তা আরও মানসম্পন্ন শিক্ষককে এ খাতে আগ্রহী করবে। বর্তমানে প্রায় ৩৩,৮০০ ইবতেদায়ী শিক্ষক ও কর্মচারী বেতন ও সুবিধাদি পাচ্ছেন। ২০১৯ সালের শেষে ১৯,২০০ মাদ্রাসা শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। একইসঙ্গে ৯,৬০০ শিক্ষককে বিশেষ কমিউনিকেটিভ আরবি কোর্সের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এছাড়া ৫৬০টি সিনিয়র মাদ্রাসায় স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠার কথা ছিল এবং ১,২০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে বুনিয়াদি আইসিটি, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ছিল।

কওমি মাদ্রাসা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে অচিহ্নিত জায়গা। কওমি মাদ্রাসাগুলো নিবন্ধিত নয়, বেশিরভাগই ব্যক্তি অনুদানে পরিচালিত হয়। শিক্ষা ও পাঠ্যসূচির বিবেচনায় কওমি মাদ্রাসা আলিয়া থেকে আলাদা। কওমি শিক্ষার ছয়টি পর্যায় রয়েছে, যা সম্পন্ন করতে গড়ে সাত-আট বছর সময় লাগে। প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুরা আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষা পড়ার শিক্ষা পায়। খুবই স্বল্প পরিসরে বাংলা, গণিত ও ইংরেজি শেখানো হয়। প্রাথমিক শেষে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় কোরআন, হাদিস, ইসলামিক আইন ব্যবস্থা ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে। সাধারণ বিদ্যালয় ও আলিয়া মাদ্রাসার মতো বিজ্ঞান শেখানো হয় না বললেই চলে। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে কোনো বড় সংস্কার বা পর্যালোচনা গত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোয় নেয়া হয়নি। তবে অল্প কিছু পরিবর্তন এসেছে। মাদ্রাসা বোর্ড ২০১৯ সালে নতুন জাতীয় পাঠ্যক্রমে স্পোকেন আরবিকে গুরুত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশি চাকরিপ্রত্যাশীদের মাঝে মধ্যপ্রাচ্য আগে থেকেই জনপ্রিয় গন্তব্য। শিক্ষাবোর্ডের এই সর্বশেষ গুরুত্ব অনেক শিক্ষার্থীকে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ারের পথ দেখাচ্ছে। তবে শুধু স্পোকেন আরবি মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের ভালো চাকরির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য যথেষ্ট নয়। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিষয়ে পাঠ (লেসন) বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এর পরিবর্তে আন্তঃধর্মীয় ঐক্য সম্পর্কে পাঠ্যসূচিতে সংযোজনের কথা। কওমি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সরকার খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নেয় ২০১৭ সালে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা চাকরির বাজারে বৈষম্য কমাতে কওমি মাদ্রাসার দাওরা ডিগ্রিকে মাস্টার্স ডিগ্রির সমমান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যা সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে দাওরা পাঠ্যসূচিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে ছয়টি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একীভূত করে এক ছাতার নিচে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলোকে পাঠ্যসূচি আধুনিকায়ন, প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষা নেয়া এবং সার্টিফিকেট প্রদানের কাজে দেয়া হবে। এই বোর্ড গঠনের সঙ্গে দাওরার ডিগ্রির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি কওমি ব্যবস্থায় ডিগ্রি অর্জনকারী ১.৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে অধিতর ভালো ও পরিচ্ছন্ন কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মান ও প্রকৃত অর্থে চাকরির বাজারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা খুবই সীমিত। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, কারিগরি ও অন্য নিয়োগযোগ্য শিক্ষা বাড়াতে ব্যাপক মনোযোগ দিতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষকদের মান ও সুযোগ-সুবিধার (বই-পুস্তক, সরবরাহ আইসিটি প্রভৃতি) প্রাপ্যতা একটি সমস্যা। গবেষণায় জানা যায়, সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিখন-ফলের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। এই ধারার পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কোর কম। অন্য বড় একটি সমস্যা হলো

কওমি মাদ্রাসা, (যা আলিয়া মাদ্রাসার চেয়েও জনপ্রিয়) সরকারি কোনো বিনিয়োগ/হস্তক্ষেপ (ইনপুট) ছাড়াই স্বাধীনভাবে চলে। এর ফলে তাদের পাঠ্যসূচি ও শেখানোর পদ্ধতি হালনাগাদ করা এবং সময়মতো পর্যালোচনা করার বিষয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। তহবিল ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা একটি বড় সমস্যা বিশেষ করে কওমি ব্যবস্থায়। কেননা তারা ব্যক্তি অনুদানের সহায়তায় পরিচালিত হয় এবং তাদের হিসেবের খাতা প্রকাশ করে না।

মাদ্রাসায় তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে স্বকীয় নির্বাচন পক্ষপাতিত্ব কাজ করে। অসমানুপাতিক সংখ্যক দরিদ্র গ্রামীণ পরিবার তাদের সন্তানকে সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিবর্তে মাদ্রাসায় পাঠান। যেহেতু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ-সুফল (লার্নিং আউটকাম) কম, চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা কম, তাই তারা শিক্ষা থেকে কম সুফল পায়। অতএব শিক্ষাবিজ্ঞানের বর্তমান কাঠামো নিয়ে মাদ্রাসা ব্যবস্থার উপস্থিতি দারিদ্র্য চক্রকে চিরস্থায়ী করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগমন এই পরিস্থিতিকে আরও খারাপই করবে।

অধিকন্তু বর্তমান কাঠামোয় মাদ্রাসা শিক্ষার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে এবং সংস্কারের আহ্বান জানানো হয়েছে। দারিদ্র্যের একটি দুষ্টচক্র চিরস্থায়ী করা ছাড়াও সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর মধ্য দিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণ ও মাদ্রাসার শিক্ষা প্রবাহের মধ্যে কাঠামোগত ও শিক্ষাগত পার্থক্য সমাজে নানা বৈষম্য তৈরি করছে; সমাজে আয় ও সংস্কৃতিগত এক ধরণের কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করছে/বজায় রাখছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য ছিল মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষায় বহু রকমফের কমানো। আরও লক্ষ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষায় মাদ্রাসা ও সাধারণ ধারায় পুঁজি (রিসোর্স) ও সুবিধার ব্যবধান কমানোর। এ বিষয়ে অগ্রগতি কম সন্তোষজনক হয়েছে।

১১.৩.৫ উচ্চ শিক্ষায় অগ্রগতি

উচ্চ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে একটি দেশের দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে। তার ওপর এটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান ও পরিণাম/ফলাফল উন্নয়নে। প্রাক-তৃতীয় পর্যায় ও তৃতীয় পর্যায় এককভাবে প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি করতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করে, যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে উল্লেখ করার মতো ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় যুগপৎ মনোযোগ দিতে হবে, যেহেতু তাদের বিনির্মাণ আন্তঃসংযুক্ত। অধিকন্তু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে এসে বাংলাদেশে তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় মনোনিবেশ করা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার একটি কাঠামোগত ব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–সাধারণ শিক্ষার অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় পর্যায়ের মহাবিদ্যালয় এবং টিভেট ব্যবস্থার অধীন পলিটেকনিকসমূহ।

বাংলাদেশ ২০০৯-২০১৮ সময়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় ব্যাপক প্রবৃদ্ধি দেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৮ সালের ৮২টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ১৪৫টি। এর মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা একই সময়ে ৫১ থেকে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১০৩। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে অনেক। ২০০৯ সালে যা ছিল ০.৪ মিলিয়ন, তা ২০১৮ সালে হয়েছে এক মিলিয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ার যে হার, তার চেয়েও বেশি হারে শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়েছে। অর্থাৎ কেবল বেশি সুযোগ থাকার কারণেই নয়, বরং উচ্চ শিক্ষার চাহিদার জন্য শিক্ষার্থীসংখ্যা বেড়েছে। প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষকসংখ্যা ২০০৮ সালে ছিল ২৪৫, তা বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ৩৪৫। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সালে শিক্ষক প্রতি ২১ শিক্ষার্থী ছিল, অথচ ২০০৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪৯-তে। তৃতীয় পর্যায়ের কলেজের সংখ্যাও এই সময় বেড়েছে, যেহেতু সেগুলো মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করে। এই অগ্রগতি সহজতর হয়েছে সরকারের নীতির কারণে, যেখানে উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি সরবরাহ অনুমতি পেয়েছে। এর প্রতিফলন ঘটেছে উল্লেখিত সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ার মধ্য দিয়ে। এই ইতিবাচক ধারা ধরে রাখতে বাংলাদেশ সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২০৩১ অবলম্বন করেছে।

এই অগ্রগতির পরেও দেশে উচ্চ শিক্ষার আওতা (কাভারেজ) এখনো খুবই সীমিত। বাংলাদেশের ১২.১ শতাংশ মানুষের উচ্চ শিক্ষা রয়েছে। এই হার নারীদের মধ্যে ৮.৭ শতাংশ ও পুরুষের মধ্যে ১৫.৫ শতাংশ। ভৌগোলিকভাবে শহর এলাকার ১৯.৯ শতাংশ ও গ্রাম এলাকার ৮.৮ শতাংশ মানুষের উচ্চ শিক্ষা রয়েছে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২৬ শতাংশ নারী। কাজেই লিঙ্গভেদে ও আর্থসামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।

পেশা-সংক্রান্ত শিক্ষা সরবরাহ করে পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান, যেমন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, আইন কলেজ ও আর্ট কলেজ প্রভৃতি। পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ২৪২, যা বেড়ে ২০১৮ সালে হয় ৪২৫। মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০১০ সালের ৪৮ (১৮ সরকারি, ৩০ বেসরকারি) থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ১১১ (৩৭ সরকারি, ৭৪ বেসরকারি)। ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা ২০১০-২০১৮ মেয়াদে ১১ (১ সরকারি ও ১০ বেসরকারি) থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৫ (৯ সরকারি, ২৬ বেসরকারি)। মাত্র তিনটি বস্ত্র প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সময়ে (আটটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১১টি)। লেদার টেকনোলজি কলেজের সংখ্যা একটিতেই অপরিবর্তিত আছে। এই সময়ে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকপ্রতি শিক্ষার্থীসংখ্যা ব্যাপকভাবে ১২ থেকে কমে ছয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এই সময় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখতে পাই ১৭ থেকে ১৯-এ দাঁড়িয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষ, দরিদ্র ও অ-দরিদ্র এবং শহরে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষায় তালিকাভুক্তির দূরত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। একুশ শতকের চাহিদা ও প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি সাজানোর জন্য সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতীয় সংসদে ২০১৭ সালে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিল পাস হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন পরিষদ গঠনের নির্দেশনা দেয়া এই বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবীক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) বাস্তবায়ন করা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের মাধ্যমে ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায়। বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ও প্রাসঙ্গিকতা উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে–(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, (খ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আরও ব্যাপক দায়বদ্ধতা প্রত্যাশা করা বা চাওয়া এবং (গ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সার্বিকভাবে এ খাতের সক্ষমতা বিনির্মাণ করা। ২০০৯-২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়, যা আলোকপাত করে শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতামূলক গবেষণায়। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল চারটি বড় বিষয়–পাঠদান, পাঠগ্রহণ ও গবেষণায় একাডেমিক উদ্ভাবনকে জনপ্রিয় করা; ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (UGC) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিনির্মাণ; গবেষণা কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য কানেক্টিভিটি সক্ষমতা বিনির্মাণ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য ইউজিসিকে আরও দৃঢ় ও ক্ষমতাশালী করার ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে যথাযথ পাঠ্যসূচি উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য সহায়তা, গবেষণায় উৎসাহদান ও আগামী প্রজন্মকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা।

প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

উচ্চ শিক্ষায় মূল চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মান, কম তালিকাভুক্তি এবং শ্রমবাজারের প্রাসঙ্গিকতা। দেশের বর্তমান উন্নয়ন পর্যায়ে বেশি বেশি বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (STEM) স্নাতক থাকা আবশ্যক, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে। আরেকটি শীর্ষ চ্যালেঞ্জ হলো লিঙ্গ সমতা আনয়ন; তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় (বিশ্ববিদ্যালয়) কমবেশি ৪৫ শতাংশ (২৬ শতাংশ) নারী শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে চূড়ান্ত শিক্ষা সমানীর হার খুবই কম, ২০ শতাংশেরও নিচে।

যদিও উচ্চ শিক্ষায় সাম্প্রতিক বছরে তালিকাভুক্তি বেড়েছে, এই বৃদ্ধির বড় একটি অংশ তালিকাভুক্ত হয়েছে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে। সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় নেয়া হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (STEM) তালিকাভুক্তি মোট তালিকাভুক্তির মাত্র ২১ শতাংশ হবে। স্নাতকদের মান ও চাকরিযোগ্যতা প্রত্যাশার চেয়ে কম। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্নাতকদের নিয়ে ট্রেসার গবেষণায় জানা যায়, শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও চাকরি-প্রস্তুতিতে ঘাটতি রয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের নিয়ে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, তাদের ৩৮.৬ শতাংশ কর্মহীন। ৩৪ শতাংশ উচ্চ শিক্ষিতরা স্নাতক সম্পন্ন করার দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে চাকরি পায়। শ্রমবাজারের প্রাসঙ্গিকতার জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলো শিল্প-শিক্ষার মধ্যে সহযোগিতার অনুপস্থিতি। এর ফলে যা শেখানো হচ্ছে এবং কর্মক্ষেত্রে যা ঘটবে, তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব তৈরি হয়। শিল্পের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে তালিকাভুক্তি বাড়ানো ও সম্পন্ন হলে তা কেবলই উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু চাকরিতে নিয়োগ-অযোগ্য স্নাতক তৈরি করবে, গবেষণায় এমনটাই ইঙ্গিত পাচ্ছে।

১১.৩.৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি

প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে স্বাক্ষর করার জ্ঞান থাকতে হয়, তার বয়স যেমনই হোক। এটি সামাজিক পরিবর্তনের একটি কার্যকর হাতিয়ার, যা সংখ্যা জ্ঞান, যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা দিয়ে ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলে। 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১' কৌশলের অন্যতম মনোযোগের বিষয় 'সবার জন্য শিক্ষা' (EFA) অর্জন করা। সরকারের ইএফএর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার (NFE) আওতা। নন-ফরমাল এডুকেশন (NFE) বিশেষ করে সাক্ষরতাও সব মানুষের জন্য মৌলিক একটি হাতিয়ার, যা সবারই অর্জন করা উচিত। প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণ উভয়ের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষ করে অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা চলমান রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে আরও থাকতে হবে জীবন দক্ষতা ও জীবিকা দক্ষতা উন্নয়ন। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া হিসেবে, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখে।

সরকার ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বিভিন্নভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচি (এনএফই) বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অঙ্গীকারের কারণে সরকার নব্বইয়ের দিকে বড় ধরণের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে, যার মূল আলোকপাত ছিল মৌলিক সাক্ষরতার ওপর। সরকার ২০০৬ সালে এনএফই নীতি হাতে নিয়েছে। এর লক্ষ্য নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা কমানো, প্রয়োজনভিত্তিক চলমান শিক্ষা কার্যক্রম অফার করা, সম্প্রদায়গত মালিকানা নিশ্চিত করা ও এনএফই কর্মসূচিগুলোকে টেকসই করা।

বাংলাদেশ প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার উন্নয়নে অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। এই হার ২০১০ সালের ৫৮.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে হয়েছে ৭৫.০ শতাংশ। চিত্র ১১.২ এ প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষরতা সামলানোর কাজে অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। ধীরে হলেও নারী ও পুরুষ উভয়ের সাক্ষরতার হার স্থিতিশীল অগ্রগতি অর্জন করেছে। নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য কমে এসেছে। এই অগ্রগতি ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় বজায় ছিল।

চিত্র ১১.২: প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার অগ্রগতি (%)

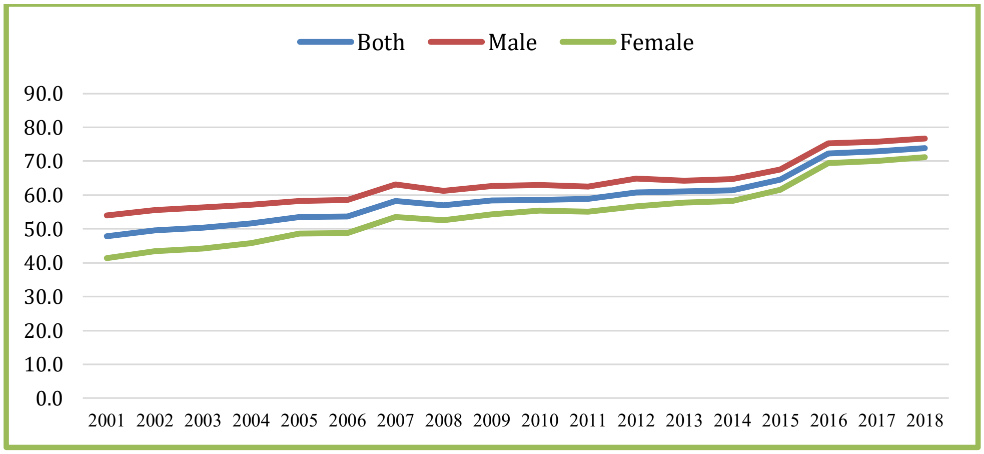

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইয়ারবুক, বিভিন্ন বছর

প্রাপ্তবয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আইনি কাঠামো তৈরি ও তা পূরণে বাধ্যবাধকতার জন্য ২০১৪ সালে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন (NFEA) করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো বা বিওএনএফই ২০১৪ সাল থেকে বুনিয়াদি সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে (৬৪ জেলা)। এর লক্ষ্য ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪.৫ মিলিয়ন মানুষকে রূপান্তরশীল বুনিয়াদি সাক্ষরতার দক্ষতা প্রদান করা। দেশজুড়ে মোট ৩৯,৩৩১ চলমান শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে, যেখানে রয়েছে ৭৮ হাজার ৬২১ জন শিক্ষক (সমানসংখ্যক পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং ১,৯৬৭ সুপারভাইজার বা তত্ত্বাবধায়ক। এ পর্যন্ত প্রায় ২.৪ মিলিয়ন শিক্ষার্থী কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছে।

উদ্ভূত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ: এই অগ্রগতি সত্ত্বেও কিছু অসম্পূর্ণ এজেন্ডা রয়েছে। ২৯ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও ২৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অক্ষরজ্ঞানহীন রয়েছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে, গ্রামে গড় সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৬ শতাংশ। গ্রামের

প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা বিশেষ করে মৌলিক অক্ষরজ্ঞান-বঞ্চিত; ৩৭ শতাংশ নারী নিরক্ষর। অধিকন্তু যে সাক্ষরতা অর্জিত হয়েছে, তার সীমিত আওতা সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে। বিশেষ করে সংখ্যাগত দক্ষতা নিয়েও। এসডিজির অধীনে যে আজীবন শিক্ষার ধারণা রয়েছে, তার সঙ্গেও এর সংযোগ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন। এটি এনএফই-র পটভূমি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ব্যুরো এনএফই নীতি কাঠামোর চওড়া দৃষ্টি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পুরোপুরি সুবিধাপ্রাপ্ত নয়। আজীবন-শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ব্যুরোর সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হালনাগাদ করা দরকার। সমন্বয়, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, মানুষের অংশগ্রহণ ও পরিবীক্ষণ কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বহুমুখী ও বহুস্তরের গভর্ন্যান্স ব্যবস্থায় মনোযোগ দিতে হবে।

১১.৪ দক্ষতা উন্নয়নের অগ্রগতি

নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করে, যা স্বল্পমেয়াদে কিছু শ্রমিককে বাহুল্যে পরিণত করে এবং ‘প্রযুক্তিগত বেকারত্ব’ তৈরি করে। যথাযথ শিল্প সংযোগসহ একটি হালনাগাদকৃত টিভেট খাত সহায়তা করতে পারে বিচ্যুত ও শ্রমিকদের নতুন দক্ষতা অর্জনে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে টিভেট অনেক ব্যক্তির জন্য একটি বিকল্প সুযোগ তৈরি করতে পারে, যারা গতানুগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না, অথবা পারিবারিক বিষয়সহ যে কোনো কারণে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করতে সমর্থ নন। দক্ষ কর্মশক্তি বিনির্মাণে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে টিভেটের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ভূমিকার ওপর। এসডিজি ৪-এর একটি উপ-অভীষ্ট হলো সব নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী/ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ও মানসম্পন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। গড়পড়তার চেয়ে নিচে থাকা শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে টিভেট শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুফল বেশি বলে গবেষণায় জানা যায়। বাংলাদেশ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে অভিযাত্রায় টিভেটতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে বলা হয় যে, একটি দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে টিভেট খাত প্রসারিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমগুলো সব শিশুকে (যারা এখন বর্তমান জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ) শিক্ষাদানে সমর্থ হবে না। এছাড়া ভবিষ্যতে যেসব দক্ষতা প্রয়োজন হবে, তার সবগুলোও তারা শেখাতে পারবে না। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক টিভেটর মধ্যে নিহিত রয়েছে এসএসসি, এইচএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ, এইচএসসি (বৃত্তিমূলক), এসএসসি (বৃত্তিমূলক) ও এইচএসসি (BM)। এই কোর্সগুলো করা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (TSC), টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (ঞঞঞঈ), ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (VTTI), বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এবং অন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে।

বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বুনিয়াদি শিক্ষার স্বল্প ও অদক্ষ কর্মীরা এই পরিবর্তনে এখন পর্যন্ত অবদান রেখেছে। কিন্তু ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে অনেক কিছু করতে হবে। এর মধ্যে নিরূপণযোগ্য (হার্ড স্কিল) ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক (সফ্ট স্কিল) দুই ধরণের দক্ষতারই আরও উন্নয়ন করা দরকার। হার্ড স্কিলের মধ্যে পড়েছে চাকরি-নির্দিষ্ট দক্ষতা, যেমন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ক্লাউড কম্পিউটিং, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার, উপাত্ত বিশ্লেষণ (ডেটা অ্যানালাইসিস), বিপণন প্রভৃতি। সফট স্কিলের মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধান করা, কর্মনীতি, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, দল ব্যবস্থাপনা, সৃজনশীলতা, সময় ব্যবস্থাপনা, মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা প্রভৃতি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে টিভেটসহ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এই ধরণের বিশেষ দক্ষতা উন্নয়নে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেয়। এ কারণে কর্মীদের দক্ষতার পর্যায় ও উৎপাদনশীলতা পর্যাপ্ত বাড়েনি। বেসরকারি খাত প্রতিনিয়তই তাদের যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করে আসছে।

এলএফএস ২০১৬-১৭ অনুসারে, বাংলাদেশে ৪১.২৫ মিলিয়ন কর্ম-বয়সী তরুণ জনগোষ্ঠী (১৫ ও ২৯ বছরের মধ্যে) রয়েছে। শ্রম শক্তির বিভিন্ন বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি। দেশে তরুণদের বেকারত্বের হার ১০.৭ শতাংশ, এবং তা মোট বেকারত্বের ভরযুক্ত গড়ের ৭৯.৬ শতাংশ। তরুণদের প্রায় ৩০ শতাংশ ২০১৭ সালে কোনো ধরণের কর্মসংস্থান, শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণের (NEET) মধ্যে ছিল না। এই গোষ্ঠীর মধ্যে ৯৭.৮ শতাংশ পুরুষ ও ৯৮.৭ শতাংশ নারী ১৫+ দের প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার ছিল না। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে বেশিরভাগই দুই সপ্তাহের স্বল্পমেয়াদী কোর্স। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET) হিসেবে, ২০২০ সালের শুরুতে ১৩ মিলিয়ন বাংলাদেশি বিদেশে কাজ করত। তাদের অধিকাংশই স্বল্প বা অর্ধ-দক্ষ। বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ অভিবাসী জনগোষ্ঠী দেশের জন্য আরও বেশি প্রবাসী আয় আনতে পারবে।

টিভেটতে তালিকাভুক্তির হার ২০০৯ সালের এক শতাংশের চেয়ে বেড়ে ২০১৮ সালে ১৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০০৮ ও ২০১৮ সালের মধ্যে টিভেট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে (চিত্র ১১.৩)। এর মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান ৩৩৫ ও ৮৬৬; বাকিগুলো বেসরকারি। একই সময়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা ২০০৮ সালে চার লাখ ৬৪ হাজার থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ১০,৬৭,০০০ (চিত্র ১১.৪)। সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই বৃদ্ধি ছিল ১,২৩,০০০ থেকে ৩,২৯,০০০ হাজার। বাকিটা ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত খানিকটা কমে ২২:১ থেকে ২১:১ হয়েছে। তবে এনইপি ২০১০ সুপারিশ করে, এই অনুপাত হওয়া উচিত ১২:১।

চিত্র ১১.৩: টিভেট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

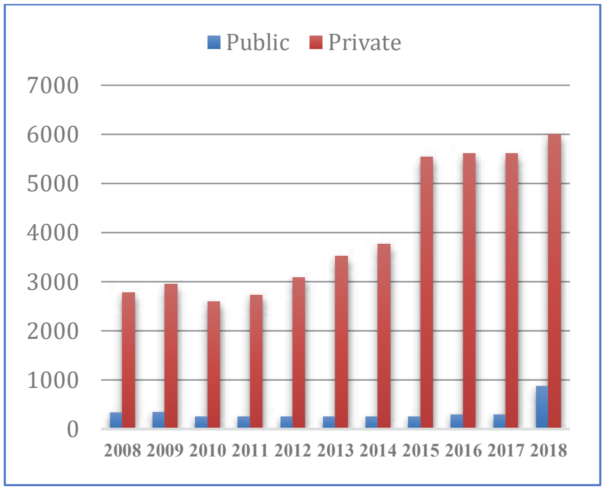

চিত্র ১১.৪: টিভেট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ('০০০)

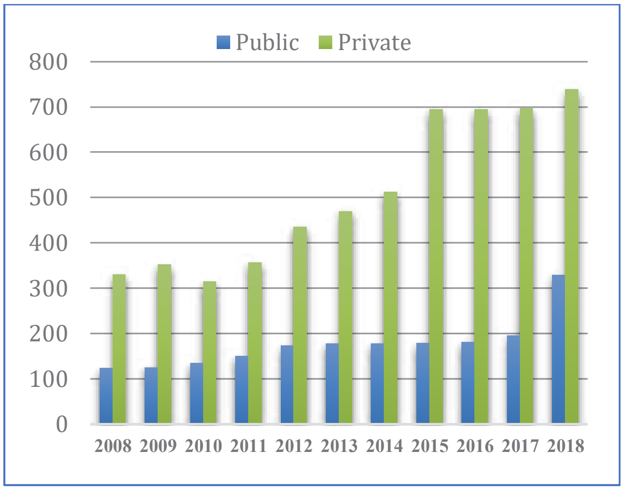

সূত্র: ব্যানবেইস ২০১৯

টিভেট খাতে বড় সমস্যা হলো মেয়েদের কম অংশগ্রহণ। যেমন আগেই বলা হয়েছে, গত এক দশকে টিভেটতে তালিকাভুক্তি খুব দ্রুত বেড়েছে। বিষয়টি নারী ও পুরুষ উভয়ের তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে সত্য। তবে নারী শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্তি প্রবৃদ্ধির হার পুরুষ তালিকাভুক্তির হারের সঙ্গে সমানুপাতিক। ফলে লিঙ্গ-মিশ্র অনুপাত গত ১০ বছর ধরে প্রায় ২৫ শতাংশে স্থির হয়ে আছে। (চিত্র ১১.৫)। এটি প্রতিনিধিত্ব করে একটি লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতাকে, যা সামাল দেয়া প্রয়োজন। এসডিজির অভীষ্ট ৪.৩ লিঙ্গ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সব নারী ও পুরুষের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ টিভেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে।

চিত্র ১১.৫: লিঙ্গ ভেদে টিভেটে তালিকাভুক্তি

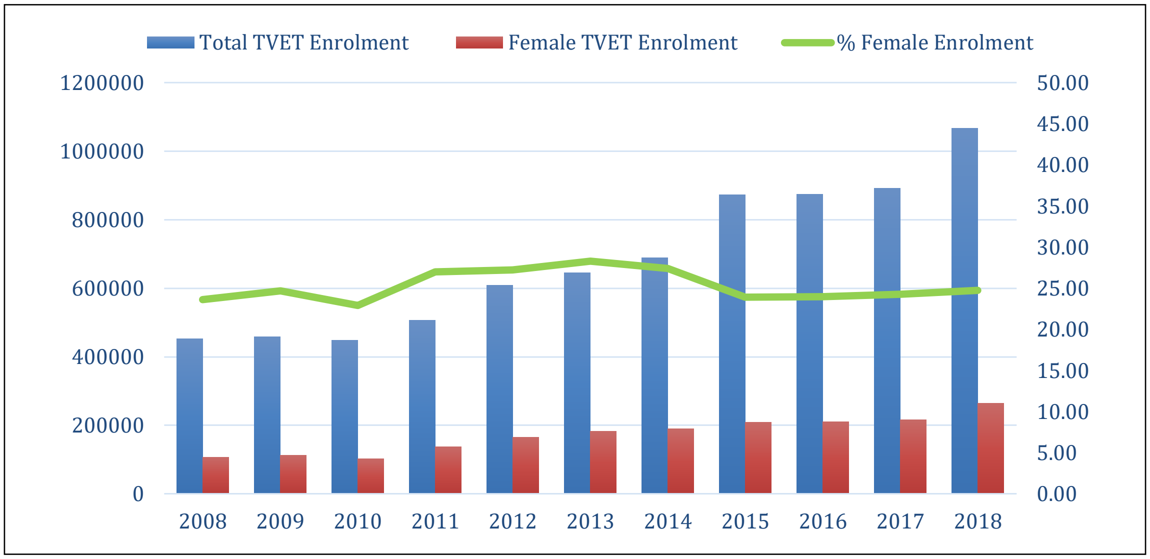

সূত্র: ব্যানবেইস ২০১৯

সরকার টিভেট ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং এ খাতের সমস্যা মোকাবিলায় জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০১০) ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (২০১১) বাস্তবায়ন করেছে। দক্ষতা ঘাটতি পূরণে সরকার শুরু করেছে ২০০৮-১৫ সালের টিভেট সংস্কার প্রকল্প, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ২০১১ (NSDP 2011) ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষতা কর্মসূচি (এসটিইপি)। সরকার দক্ষতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আরও গতিশীল করেছে (সারণি ১১.৩)। এই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো থেকে আশা করা যায়, বাংলাদেশে দক্ষতা সরবরাহে বড় রূপান্তর ঘটবে।

এছাড়া এনএসডিপির অধীনে জাতীয় প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কর্ম কাঠামো (NTVQF) নকশা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতার মান প্রণয়ন করা। এই কর্ম কাঠামো প্রণিধানযোগ্য এবং আন্তর্জাতিক শীর্ষ অনুশীলনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। কর্মসংস্থান বিনিয়োগের জন্য দক্ষতা (SEIP) বলে পরিচিত একটি কর্মসূচির মাধ্যমে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সরকারকে এনএসডিপি ২০১১ বাস্তবায়নে সহায়তা করছে। এর আওতায় বেসিস, বিটিএমএ, বিজিএমইএ, এইওএসআইবিসহ অনেকগুলো শিল্প সমিতির সঙ্গে অংশীদারত্ব হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত দক্ষতার সনদ দেয়া হবে। মাদ্রাসার টিভেট প্রচলনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ (TMED) সৃষ্টি করেছে।

এসব নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি দক্ষতাসুলভ করার ক্ষেত্রে সুফল দিতে শুরু করেছে। একটি বিশেষ কার্যকর উপকরণ হলো এসইআইপি, যা ফলাফল সরবরাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার দেখিয়েছে (সারণি বক্স ১১.১)। বিভিন্ন এনজিওদের গৃহীত কর্মসূচিগুলো অনানুষ্ঠানিক খাত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দক্ষতার ভিত্তি উন্নয়নে সহায়তা করছে। তবুও দক্ষতার ঘাটতি অনেক বেশি এবং তা কমিয়ে আনতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে। এর ওপর চতুর্থ শিল্প বিপ্লব থেকে উদ্ভূত নতুন দক্ষতার চ্যালেঞ্জগুলো পূরণে প্রয়োজন হবে ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ ও বাজার চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে পরিবর্তন আনার।

সারণি ১১.৩: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগসমূহ

নীতি উপকরণ	উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৮ (NSDA)	এনএসডিএর লক্ষ্য হলো দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কৌশল তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করা। এছাড়া দক্ষতার প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয় করা। এনএসডিএ বিল নির্ধারিতভাবে সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার দেয়।
শিল্প দক্ষতা পরিষদ (ISC)	আইএসসি শিল্প এবং টিভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। শ্রমিক, নিয়োগদাতা এবং সরকারকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে আইএসসি দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করে। বাংলাদেশে ১২টি আইএসসি রয়েছে। আইএসসিগুলোর কার্যাবলী নিম্নরূপ: (ক) দক্ষতার প্রশিক্ষণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সর্বশেষ কর্মসংস্থান এবং প্রযুক্তির ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। (খ) সরকারি-বেসরকারি দাতার অংশীদারত্ব উৎসাহিত করতে সামাজিক আলোচনার (ডায়ালগ) উন্নয়ন। (গ) তথ্য সংগ্রহ ও চাহিদা পাশের তথ্য সঠিক কি না, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকা জোরদার করতে দক্ষতাসমূহের তথ্য ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা।
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)	বর্তমানে বহু প্রতিষ্ঠান একই বিষয়ে দক্ষতা-প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় কিছু বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না কোনো প্রতিষ্ঠানই। অথবা দিলেও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে দক্ষতা বিনির্মাণের সমন্বয় উন্নয়নে অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হলো এনএসডিএ। সম্পদ ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে এনএসডিএ। সংস্থাটির কাজের মধ্যে আরও রয়েছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামোয় (ফ্যাসিলিটিস) বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতাদের প্রবেশাধিকার সহজ করা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানো।
সক্ষমতা নির্ভর প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন (CBT&A)	এই প্রশিক্ষণ উপকরণটি তৈরি করা হয়েছে চাহিদা-চালিত প্রশিক্ষণ সরবরাহের জন্য। প্রাথমিকভাবে তা করা হবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারি শিল্পের অংশীদারত্বকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে। সুতরাং আশা করা যায় শিল্প প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক (এনগেজমেন্ট) বাড়াবে এবং সমর্থন বাড়াবে। এতে কর্মসূচিগুলো (প্রোগ্রামস) ও স্নাতকদের ব্যবহার করে নিয়োগদাতা ও তার কর্মীদের প্রয়োজন মেটানোর সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

বক্স ১১.১: এসইআইপির পারফরম্যান্স	
প্রথম অংশের ফলাফল: পুরুষ ও নারীর জন্য দক্ষতা এবং অগ্রাধিকার খাতে বর্ধিত কর্মসংস্থান। এসইআইপিএর প্রথম অংশে (ট্র্যান্স ১) লক্ষ্য ছিল ২,৬০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে, যার অন্তত ৩০ শতাংশ নারী, ৩০ জুন, ২০১৯ নাগাদ নিম্নলিখিত অর্জন সংঘটিত হয়েছে: • ২,৫৬,৭১৫ প্রশিক্ষণার্থী তালিকাভুক্ত (৩০.৭ শতাংশ নারী) ২,২৯,৩২৫-কে সনদ দেয়া হয়েছে (৩২.০১ নারী); • ২৮০ প্রশিক্ষক বিদেশে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে; ৮২০ জন প্রশিক্ষক স্থানীয়ভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে এবং ২০৫ জন মূল্যায়নকারী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে; • সনদ গ্রহণকারী নতুন প্রবেশকারীর সংখ্যা ছিল ১,৮৮,২৪৭, যাদের মধ্যে ১,৩২,৬৩৮ (৭০.৫ শতাংশ) কাজের সুযোগ পেয়েছে; • মোট ৪৫,৬৭৫ সুবিধা বঞ্চিত প্রশিক্ষণার্থী বিশেষ উপবৃত্তি পেয়েছে (৪৪ শতাংশ নারী) • বর্তমানে ৪৫ জন জব প্লেসমেন্ট অফিসার (জেপিও) নিয়োজিত আছে; এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণদাতাদের মধ্যে ১৫০ জন অধ্যক্ষ ও টিভেট ম্যানেজারদের জন্য ব্যবস্থাপনা ও রিফ্রেশারদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	**দ্বিতীয় অংশের ফলাফল:** অগ্রাধিকার খাতে প্রাথমিক, মধ্যম পর্যায় ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবেশাধিকার বেড়েছে। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত এসইআইপি দ্বিতীয় অংশে নিম্নলিখিত অর্জন হয়েছে: • ৫৪,৭৩২ প্রশিক্ষণার্থী সনদ পেয়েছে, যাদের মধ্যে ৩৬,২৩১ জন কাজের সুযোগ পেয়েছে; • ৩,০০৮ প্রশিক্ষণার্থী আরও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে। ২৩২৭ জন সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে বর্তমানে ১,৮৪৮ জন চাকরিতে আছে; • শিল্প সমিতি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ৭৮,৮১২ প্রশিক্ষণার্থী তালিকাভুক্ত রয়েছে (৩২.৭৯ শতাংশ নারী)। প্রশিক্ষণার্থীরা মাঝামাঝি পর্যায়ে দক্ষতা কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে (৪০.৫৭ শতাংশ নারী); নির্বাহী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখন পর্যন্ত ৬৬৯ প্রশিক্ষণার্থী তালিকাভুক্ত; • বিশেষ শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হয়েছে ১৬,৩৬৩ প্রশিক্ষণার্থীকে (৩০.৫১ শতাংশ নারী); এবং • জাতীয় সংসদে এনএসডিএ বিল পাস হয়েছে। বিস্তারিত কর্ম পরিচালনার পরিকল্পনা তৈরি হবে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে, যার অধীনে এনএসডিএ পরিচালিত হবে।

১১.৫ শিক্ষার সমতার দিকসমূহ

বাংলাদেশের মতো বাজার অর্থনীতিতে, দীর্ঘ মেয়াদে দারিদ্র্য ও অসমতা দূর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষায় সমতা উন্নয়নে সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সবার জন্য শিক্ষা (EFA) নীতি গ্রহণ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বজনীন শিক্ষা নীতি অনুসরণ, মেয়ে ও দরিদ্রদের জন্য বৃত্তি প্রদান, প্রত্যন্ত এলাকা ও থানা পর্যায়ে শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধায় উন্নতর সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতা বাড়ানো। এ নীতিমালাগুলো উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছে, যা প্রতিফলিত হয়েছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায়, মাধ্যমিকে তালিকাভুক্তির হারে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে এবং পুরুষ ও নারী সাক্ষরতার হার ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে। তথাপি সরকার বিষয়টিকে এখনো একটি অসম্পূর্ণ এজেন্ডা হিসেবে চিহ্নিত করে।

তবে অগ্রগতি সত্ত্বেও স্কুলে উপস্থিতির হারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। ২০১৬-১৭ এইচআইইএস ও ২০১০ এইচআইইএস-এর তথ্য অনুসারে, সব বয়স গোষ্ঠীর মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক (৬-১১ বছর), মাধ্যমিক (১২-১৮ বছর বছর) এবং উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (১৯-২৪ বছর)। শিক্ষা পর্যায়ে অগ্রগতির সঙ্গে বিদ্যালয় থেকে দরিদ্র শিশুদের দূরে সরে যাওয়ার হার বাড়তে থাকে। এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায় (সারণি ১১.৪)। ২০১০ ও ২০১৬-এর মধ্যে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতির হার শিক্ষার সব পর্যায়ে বেড়েছে, যা একটি ভালো খবর। তবে বিত্তশালী ও দরিদ্রদের মাঝে ফারাক এখনো চোখে পড়ার মতো।

সারণি ১১.৪: দারিদ্র্য পরিস্থিতির ভিত্তিতে শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি ২০১০-২০১৬

বছর	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	স্কুলে উপস্থিত না হওয়া শিশু		
		৬-১১ বছরের শিশু	১২-১৮ বছরের শিশু	১৯-২৪ বছরের তরুণ
২০১০	দরিদ্র	২৪.৭	৩৮.৮	৬০.৯
	অ-দরিদ্র	১২.০	২৪.৫	৩৩.৩
	মোট	**১৬.২**	**৩৫.২**	**৪৮.৮**
	দরিদ্র ও অ-দরিদ্রের অনুপাত	**২.১**	**১.৬**	**১.৮**
২০১৬	দরিদ্র	১০.৮	২৮.৫	৪৯.২
	অ-দরিদ্র	৫.১	১৯.১	২৮.৭
	মোট	**৭.৯**	**২২.৬**	**৩১.৩**
	দরিদ্র ও অ-দরিদ্রের অনুপাত	**২.১**	**১.৫**	**১.৭**

সূত্র: এইচআইইএস ২০১০ ও ২০১৬-এর ভিত্তিতে জিইডির হিসাব

মিকস ২০১৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়ে ৭-১৪ বছর বয়সীদের জন্য পঠন ও সংখ্যাগত দক্ষতা বিবেচনায় আনা হয়। আমরা এখানে দুটি সূচক বিবেচনায় নিয়েছি পঠনদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য এবং তিনটি সূচক নিয়েছি সংখ্যাগত দক্ষতার জন্য। পঠনের জন্য এই সূচকে অন্তর্ভূক্ত হলো ‘একটি গল্পের ৯০ শতাংশ শব্দ সঠিকভাবে পড়তে সমর্থ নয়’ ও ‘মৌলিক পঠন দক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থনে নয়’। সংখ্যার দক্ষতার জন্য সূচকগুলো হলো ‘সংখ্যা পড়তে সমর্থ নয়’, ‘সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ নয়’ এবং ‘প্যাটার্ন বুঝতে ও সম্পন্ন করতে সমর্থ নয়’। এসব বিবেচনায় ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এক-তৃতীয়াংশ শিশু সঠিকভাবে একটি গল্পের শব্দগুলো পড়তে পারেনি এবং অর্ধেকের বেশি শিশু মৌলিক পঠন দক্ষতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়। সংখ্যাগত দক্ষতায় এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু সঠিকভাবে সংখ্যা পড়া ও পার্থক্য নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। এছাড়া দুই-তৃতীয়াংশ শিশু প্যাটার্ন বোঝার কাজ শেষ করতে পারেনি (সারণি ১১.৫)। এ থেকে পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিশুদের গড় যোগ্যতার পর্যায় এখনো কম, আর এ কারণেই শিক্ষার মান প্রকৃত অর্থেই একটি উদ্বেগের বিষয়।

সামগ্রিক পর্যায়ে মান নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে দরিদ্র ও সবচেয়ে ধনী পরিবারের শিশুরা যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তার গুণগত মানে অসমতা রয়েছে। উপাত্তে দেখা যায়, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ধনী পরিবারের শিশুদের তুলনায় মানসম্মত শিক্ষা না পাওয়ার আশঙ্কা দুই গুণ বেশি (সাধারণ পঠন ও সংখ্যাগত দক্ষতা বিচারে) (সারণি ১.১৩)। আপেক্ষিকভাবে আরও একটু জটিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে (যেমন গঠনের জন্য বুনিয়াদি দক্ষতা সংখ্যাগত দক্ষতা প্যাটার্ন অনুধাবন সম্পন্ন করা), এখনো পার্থক্য রয়েছে। (দরিদ্র শিশুরা ধনী শিশুদের তুলনায় কাজগুলো সম্পন্ন করতে না পারার আশঙ্কা ১.৫ গুণ বেশি)। তবে এর মাত্রা সহজ পরীক্ষার চেয়ে কম।

সারণি ১১.৫: বাংলাদেশে ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষার মান, ২০১৮

বছর	সম্পদের মালিকানার ভিত্তিকে ধনী গোষ্ঠীর সঙ্গে দরিদ্র গোষ্ঠীর অনুপাত	পঠন দক্ষতা		সংখ্যাগত দক্ষতা**: শিশুদের শতাংশ, যারা নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারেনি		
		যারা একটি গল্পের ৯০% শব্দ সঠিকভাবে পড়তে পারেনি, তাদের শতাংশ	যারা একটি বুনিয়াদি পঠন দক্ষতা দেখাতে পারেনি, তাদের শতাংশ	সংখ্যা পঠন	সংখ্যার পার্থক্য নির্ণয়	প্যাটার্ন বোঝা ও সম্পন্ন করা
২০১৮	সবচেয়ে কম	৫২.৩	৬৪.৬	৫২.৩	৪৯.৫	৭৩.৩
	দ্বিতীয়	৪৩.০	৫৬.১	৪২.১	৩৮.৮	৬৭.৩
	মধ্যম	৩৫.৯	৪৯.৪	৩৬.৬	৩৩.৪	৬৪.০
	চতুর্থ	৩২.০	৪৫.৫	৩২.৩	২৮.৮	৬০.৬
	সর্বোচ্চ	২৩.৪	৩৬.৪	২৩.৮	১৮.৯	৫২.৯
	মোট	**৩৮.১**	**৫১.২**	**৩৮.২**	**৩৪.৭**	**৬৪.২**
	সবচেয়ে দরিদ্র-ধনী অনুপাত	**২.২**	**১.৮**	**২.২**	**২.৬**	**১.৪**

সূত্র: এমআইসিএস ২০১৯

বিদ্যালয়গুলোয় সমতার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধায় প্রবেশাধিকার। শেখার পরিবেশ উন্নয়ন ও মেয়েদের উপস্থিতি বাড়াতে এগুলো পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলোয় ওয়াশ-সংক্রান্ত তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ৯২ শতাংশ স্কুলে ২০১৯ সালে বিদ্যালয় উন্নত পানি সরবরাহের আওতায় এসেছে। সব বিদ্যালয়ে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা রয়েছে। যদিও ৬৫ শতাংশ স্কুলে ছেলেমেয়েদের আলাদা টয়লেট রয়েছে, পানি ও সাবান থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হলে সংখ্যাটি নেমে আসে ৩৯ শতাংশে। গড়ে প্রতি ১১৩ শিক্ষার্থীর জন্য একটি চালু, উন্নত ও তালা-চাবির ঝামেলামুক্ত টয়লেট থাকে।

বিদ্যালয়গুলোয় ওয়াশ-সংক্রান্ত একটি বড় বিষয় হলো এর গুরুত্ব দিতে সরকারের স্বীকৃতি। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি-বিষয়ক সমীক্ষা ২০১৪-এর ফলাফল কাজে লাগিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের জুনে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করে। এতে স্কুলে ওয়াশ পরিস্থিতি উন্নয়ন করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে লিঙ্গসহায়ক স্যানিটেশন ও এমএইচএম। মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে আরেকটি পরিপত্র জারি করে বিদ্যালয়গুলোয় কার্যকর পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করতে। এটিতে বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা আলাদা ওয়াশ ব্লক রাখার কথা বলা হয়েছে। স্কুলগুলোয় কার্যক্রমের প্রকৃত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত এসব কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়, বিদ্যমান পার্থক্য ঘোচাতে সরকারের পূর্ণ অঙ্গীকার রয়েছে।

১১.৬ শিক্ষা ও টিভেটের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের যেসব প্রধান লক্ষ্য অর্জন করা হবে তার সারাংশ সারণি ১১.৬ ও ১১.৭-এ তুলে ধরা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা এসডিজি ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর অভীষ্টের ভিত্তিতে নির্ধারিত। নির্ধারিতভাবে অভীষ্টগুলো নিম্নলিখিত কয়েকটি এসডিজি লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ–এসডিজি-৪ মানসম্মত শিক্ষা; এসডিজি-৫ লিঙ্গ সমতা; এসডিজি-১০ আয় অসমতা কমানো। গুরুত্বপূর্ণভাবে এসব অভীষ্ট অর্জিত হলে তা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর চরম দারিদ্র্য লাঘব ও সহনীয় দারিদ্র্য কমানোর লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। উচ্চ শিক্ষা খাত ও টিভেটের অগ্রগতির মাধ্যমে পিপি ২০৪১-এর অন্য বিষয়গুলো, যেমন শিল্পায়ন ও সেবা খাতের উন্নয়ন সহজ হবে।

সারণি ১১.৬: শিক্ষা ও টিভেট-এর জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্টসমূহ

সূচকসমূহ	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	এসডিজি লক্ষ্য
	প্রাথমিক শিক্ষা[১]						
মোট তালিকাভুক্তির হার (%)	১১০	১০৯	১০৭	১০৬	১০৫	১০৪	৪, ৫, ও ১০
নিট তালিকাভুক্তির হার (%)	৯৯	৯৯	১০০	১০০	১০০	১০০	৪, ৫, ও ১০
পুনরাবৃত্তির হার (%)	৬	৬	৬	৬	৫	৫	৪
ঝরে পড়ার হার (%)	১৫	১৪	১২	১০	১০	৯	৪ ও ১০
টিকে থাকার হার (%)	৮৫	৮৬	৮৮	৮৮	৮৮	৯১	৪ ও ১০
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:৩১	১:৩০	১:২৯	১:২৯	১:৩০	১:৩০	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষার্থী	১৪২	১৩৯	১৩৮	১৪০	১৪২	১৪০	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষক	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৪
শিক্ষক টু শিক্ষার্থী (জিপিএস)	১:৩৪	১:৩৩	১:৩১	১:৩০	১:২৯	১:২৮	৪
শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণ জিপিএস)	২৪০	২৩৮	২৩৭	২৩৮	২৪০	২৩৯	৪
শিক্ষক/প্রশিক্ষণ জিপিএস)	৭	৭	৮	৮	৮	৯	৪
	মাধ্যমিক শিক্ষা[২]						
মোট তালিকাভুক্তির হার (%)	৬৪	৬৬	৬৭	৬৯	৭০	৭২	৪, ৫, ও ১০
নিট তালিকাভুক্তির হার (%)	৫৬	৫৮	৫৯	৬১	৬২	৬৪	৪, ৫, ও ১০
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:৪০	১:৩৮	১:৩৬	১:৩৪	১:৩২	১:৩০	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষার্থী	৪৯৮	৫০২	৫০২	৫০২	৫০০	৫০২	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষক	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	৪
	মাদ্রাসা শিক্ষা[৩]						
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:২৫	১:২৬	১:২৬	১:২৭	১:২৮	১:৩০	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষার্থী	২৬৩	২৬৪	২৬৪	২৬৪	২৬৪	২৬৪	৪

সূচকসমূহ	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫	এসডিজি লক্ষ্য
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষক	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	৪
বিজ্ঞানে তালিকাভুক্তি	১৭%	২০%	২৩%	২৮%	৩২%	৩৫%	৪
	টিভেট[৪]						
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:১৮	১:১৬	১:১৫	১:১৪	১:১৩	১:১২	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষার্থী	১৭১	১৬০	১৬৫	১৬১	১৫৬	১৫৬	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষক	১০	১০	১১	১২	১২	১৩	৪
	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা[৫]						
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১:২৮	১:২৭	১:২৬	১:২৩	১:২০	১:১৭	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষার্থী	৬,৭৭৯	৬,৭০৪	৬,৭৭৮	৬,৮৬৪	৬,৮১৯	৬,৭৯৯	৪
প্রতিষ্ঠানপ্রতি শিক্ষক	২৪২	২৪৮	২৬১	২৯৮	৩৪১	৪০০	৪

নোট: [১] পিইডিপি অভীষ্টসমূহ; [২] এসইএসআইপি অভীষ্টসমূহ; [৩] মানীয় (স্ট্যান্ডার্ড) মাধ্যমিক হার; [৪] এনইপি ২০১০ অভীষ্টসমূহ; [৫] বিশ্বের সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়। এসডিজি ৪: মানসম্মত শিক্ষা–সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা এবং আজীবন শিক্ষার সুযোগের প্রসার নিশ্চিতকরণ। এসডিজি ৫: লিঙ্গ সমতা–লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন। এসডিজি ১০: অসমতা হ্রাস–দেশের অভ্যন্তরে আয় বৈষম্য কমানো।

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণ

সারণি ১১.৭: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতের অতিরিক্ত লক্ষ্য ও অভীষ্টসমূহ

সূচকসমূহ	ভিত্তিবছর (২০১৮ উপাত্ত)	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে (অর্থবছর ২০২৫)
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র শিশুদের উপস্থিতির শতাংশ	৭২	৮০
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দরিদ্র শিশুদের উপস্থিতির শতাংশ	৫১	৬০
তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় দরিদ্র শিশুদের (পরিবারের সন্তানদের) শতাংশ উপস্থিতির শতাংশ	১৮	৩০
তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ অনুপাত (%)	২৫	৬০
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার (%)	৭৭	১০০

সূত্র: জিইডি প্রক্ষেপণসমূহ

১১.৭ শিক্ষা খাতের উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশলসমূহ

এই নথির পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ও আওতা উন্নত হওয়া সত্ত্বেও কিছু গুরুতর সমস্যা রয়ে গেছে, যা শিক্ষা খাতের উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, তালিকাভুক্তি ও লিঙ্গ সমতা হলেও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করেনি। গুণগত মানের বিষয়টি টিভেটসহ শিক্ষার সব মাধ্যমের জন্যই একটি চিন্তার কারণ। মানের বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিম্ন অনুপাত, শিক্ষার সুফল, সীমিত উপলব্ধি দক্ষতা, বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বহু রকমফের, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও শিক্ষার্থীদের বেতন-খরচ (টিউশন ফি), ভালো পারফরম্যান্সের জন্য প্রণোদনার অনুপস্থিতি বা কম থাকা এবং তহবিল ব্যবহারে সীমিত পর্যায়ের দায়বদ্ধতা। উচ্চ পর্যায়ে সব ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ কম, বিশেষ করে দরিদ্র ও নারীদের ক্ষেত্রে। অধিকন্তু মানবিক, সমাজবিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা প্রভৃতির তুলনায় বিজ্ঞানে স্নাতকসংখ্যা খুবই কম। এই ধারা বিশাল ফারাক তৈরি করছে নিয়োগদাতাদের প্রয়োজন ও স্নাতকদের দক্ষতার মধ্যে। ধারণা করা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ৫৪ শতাংশ তরুণ পরবর্তী দশকে একটি ভালো চাকরি পাওয়ার দক্ষতা অর্জন না করেই স্কুল ছেড়ে যায়।[১৩] মাধ্যমিক-বয়সী শিক্ষার্থীদের মাত্র ২৬ শতাংশ ২০১৯ সালে স্কুল সমাপনী ও কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক দক্ষতা অর্জনের সঠিক পথেই ছিল, যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৪৬ শতাংশ বাড়াতে হবে। এই সংখ্যাটি ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জন্য ছিল ২৬ শতাংশ, ২০৩০ সাল নাগাদ ৫৫ শতাংশ হতে হবে।

পরিণামে বিপুল স্নাতক বেকার থাকে অথবা যোগ্যতার চেয়ে নিচে কর্মসংস্থান হয়। নিম্নমানের শিক্ষক, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা পদ্ধতি বিজ্ঞান ও গণিতের মতো বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘কঠিন’ করে তোলে। আর এসব মিলিয়ে তৈরি হয় নিম্নমানের স্নাতক। শিক্ষিত তরুণদের উচ্চ বেকারত্বের হার থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশলগুলো চাকরির সুযোগ তৈরির সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত হতে হবে।

১৩ UNICEF & Global Business Coalition for Education (2019). 2030 Skills Scorecard, South Asia Edition.

২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব মূলধন বিনির্মাণ কৌশলকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে একই রেখায় আনা হয়েছে। দক্ষতা বিনির্মাণে একটি সামগ্রিক উপায় ও নিয়ন্ত্রক কর্ম কাঠামো অবলম্বন করা হবে, যেখানে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সব পর্যায়কে আন্তঃসংযুক্ত করা হবে। সব শিক্ষা ও দক্ষতা-সম্পর্কিত নীতিমালা একটি আরেকটির পরিপূরক হবে, যেন জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক সমাজ তৈরির বৃহৎ লক্ষ্য অর্জিত হয়। এর পাশাপাশি, দক্ষতা বিনির্মাণ নীতি নির্ধারণ করবে যে, কীভাবে কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগকারীদের প্রণোদনা দেয়া যায়। কেননা চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই শিল্প পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা অথবা দক্ষতা অর্জিত হয়। উপরন্তু সফট স্কিলের গুরুত্ব একীভূত করা হবে এবং কীভাবে এই দক্ষতাগুলো শেখানো যায় তার ভিত্তিতে কৌশলগত নীতিমালা তৈরি হবে। এই প্রশিক্ষণ শুরু হবে শিক্ষার প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে এবং তা হবে পাঠ্যসূচির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সারণি ১১.৮: দক্ষিণ এশিয়ায় ২০৩০ সাল নাগাদ মাধ্যমিক স্কুল সমাপনী ও মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সঠিক প্রক্রিয়ায় পথে থাকা শিশুরা

দেশ	২০১৯	২০৩০ প্রক্ষেপণ
বাংলাদেশ	২৬	৫৫
ভুটান	৪৭	৮১
ভারত	১৯	৪৭
মালদ্বীপ	১৬	৪৬
নেপাল	১৩	৪৬
পাকিস্তান	১৮	৪০
শ্রীলঙ্কা	৬১	৬৮

সূত্র: ইউনিসেফ ও জিবিসি-শিক্ষা, ২০১৯

১১.৭.১ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ক্রস-কাটিং বিষয়গুলো সামলানো

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা খাত বিনির্মাণের লক্ষ্য ও অভীষ্ট অর্জনে প্রধান প্রধান কৌশল ও নীতিমালাগুলো সারণি ১১.৫ ও সারণি ১১.৬ এ আলোকপাত করা হয়েছে। এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে কয়েকটি ক্রস-কাটিং (কোনাকোনি পথ) কৌশল ও নীতিমালা যা পুরো শিক্ষা খাতকে আওতাবদ্ধ করে। ক্রসকাটিং কৌশল ও নীতিমালাসমূহের অন্তর্ভূক্ত:

জিডিপির শতাংশ হিসেবে সরকারি শিক্ষা খাতে দ্রুত ব্যয় বৃদ্ধি করা: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অগ্রগতি সীমিত করে দেয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো সরকারি সংস্থান বা পুঁজিস্বল্পতা। প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সরকারি শিক্ষা খাতে ব্যয় নিচের দিকেই থাকছে, ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ জিডিপির ২.৪৭ শতাংশে পৌঁছে। কিন্তু পরের বছরগুলোয় তা নেমে গিয়ে জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ হয়। অধিকাংশ উন্নত দেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির পাঁচ শতাংশের ওপরে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। ভারতের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। পিপি ২০৪১-এ সরকারি শিক্ষা খাতে ব্যয় ২০৩১ অর্থবছর নাগাদ জিডিপির ৪ শতাংশ ও ২০৪১ অর্থ-বছরের মধ্যে জিডিপির ৫ শতাংশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অভীষ্টের সঙ্গে সংগতি রেখে ২০২৫ অর্থবছর নাগাদ সরকারি ব্যয় জিডিপির ৩.৫ শতাংশে পৌঁছার লক্ষ্য রয়েছে।

পাঠ্যক্রম উন্নয়ন ও শিক্ষায় বিনিয়োগে বেসরকারি খাতকে জড়িতকরণ: ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতকে শিক্ষায় অবদানের জন্য যথাযথভাবে উৎসাহিত করা হয়েছিল, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। এ উদ্যোগের দারুণ সুফল পাওয়া গেছে। তা প্রতিফলিত হয়েছে বেসরকারি শিক্ষা খাতে, বিশেষ করে উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দ্রুত প্রসার পাওয়ার মধ্য দিয়ে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই নীতি অব্যাহত থাকবে। বেসরকারি খাতগুলোই স্নাতকদের সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের জায়গা। এ কারণেই তাদের পাঠ্যসূচি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যসূচি উন্নয়নে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বেসরকারি ব্যবসাসমূহ থেকে ইনপুট চাওয়া হবে। কর্মসংস্থান কর্মসূচির জন্য দক্ষতা বিনির্মাণ এবং সরবরাহে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব উন্নয়ন করা হবে।

অভিভাবক পরামর্শ প্রক্রিয়া জোরালোকরণ: শ্রমবাজারে বিশেষ বিশেষ দক্ষতার জন্য চাহিদার বিষয়ে নাগরিকদের অবগত করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল ডিগ্রি অথবা একটি সনদ নয়, বরং বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চাহিদাদাতাদের সহায়তা শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সঠিক প্রবাহ পছন্দ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। গড়ের চেয়ে নিচু মানের শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষার বদলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হলে বেশি সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুফল পেতে হলে শিক্ষার্থীদের (এবং তাদের বাবা-মায়ের) দক্ষতার চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এ বিবেচনায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শিক্ষা উন্নয়নে অভিভাবকদেরও অন্তর্ভূক্ত করার উপায় খুঁজবে।

দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা মজবুতকরণ: বাংলাদেশের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের সুফল পর্যাপ্ত না হওয়া। একটি সম্ভাব্য সাশ্রয়ী উপায় হতে পারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শৈশব-শুরু উন্নয়ন। সমীক্ষায় দেখা যায়, শৈশবের শুরুতেই হস্তক্ষেপ করা হলে তা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব রাখে। প্রমাণিত যে শৈশবের শুরুতেই পাঠ গ্রহণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলে তা উপলব্ধি ক্ষমতা বাড়িয়ে স্কুলের জন্য শিক্ষার্থীদের আরও বেশি প্রস্তুত করে। ধুঁকতে থাকা শিক্ষার্থীদের প্রতিকারমূলক সহায়তা দেয়াও গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহণে অগ্রগতির জন্য নিয়মিত সময়ের পরে স্কুলে থাকতে আগ্রহী, তাদের বাড়তি শিক্ষা সরবরাহ করা যেতে পারে। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, প্রতিকারমূলক সহায়তা শিক্ষার্থীদের বেশিক্ষণ স্কুলে ধরে রাখে ও ঝরে পড়ার হার কমায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা জোরালোকরণে প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নেবে।

শিক্ষকের দক্ষতা ও মান বাড়ানো: শিক্ষকের মান ও পাঠ্যসূচির গুণাগুণ যত ভালো হয়, শিক্ষার ফলাফলও অনুরূপ হবে। ভবিষ্যৎ পাঠ্যক্রমের পর্যালোচনা আলোকপাত করবে দক্ষতা উন্নয়নে, বিষয়বস্তু শেখার (কনটেন্ট লার্নিং) ক্ষেত্রে নয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কৌশলের সঙ্গে পরিচিত করানো হবে। তাদের চাকরি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রণোদনা দেয়া হবে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষার্থীরা, যারা অনেক উন্নত দেশের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো কর্মসম্পাদন (পারফর্ম) করে। এর কারণ তাদের গতানুগতিক শিক্ষা থেকে সরিয়ে এনে সমালোচনামূলক চিন্তা (ক্রিটিক্যাল থিংকিং) ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্ব দিয়েছিল শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আর্থিক সুবিধা ও অন্য প্রণোদনায়। একই ধরণের কৌশল গ্রহণ করা হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ: বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সরবরাহ ব্যাপকভাবে কেন্দ্রীভূত। সারা দেশে শিক্ষার্থী রয়েছে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি), শিক্ষক ১ (১০ লাখ) মিলিয়ন ও প্রতিষ্ঠান ২ লাখ। এর পরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত শিক্ষা গভর্ন্যান্সের কাঠামো রাজধানী শহর কেন্দ্রিক। এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সংস্কার করা হবে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার পুঁজি সংস্থাপন, বাজেট প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সেবা সরবরাহ জোরালো করা হবে। আর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপজেলা ও জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা হবে। শিক্ষা সংস্কারের প্রভাব ও অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নির্দেশনা, তদারকির জন্য ব্যবহার হবে একটি স্থায়ী সংবিধিবদ্ধ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, যা শিক্ষা নীতি ২০১০-এ প্রত্যাশিত হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষা গবেষণা জোরদারকরণ: বিভিন্ন খাতে দক্ষতায় অসামঞ্জস্য চিহ্নিত করার জন্য গুণগত উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে। কার্যকর শিক্ষা ও দক্ষতার নীতিমালার বিকাশ ঘটানো অপরিহার্য। এজন্য বিবিএস নিয়মিত দক্ষতা বিষয়ে আলাদা সমীক্ষা পরিচালনা করবে এবং একটি আলাদা তথ্যভাণ্ডার (ডেটাবেজ) তৈরি করবে। আরও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত দিক পরিমাপের জন্য নতুন সূচক উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তা করা হলে ভবিষ্যতে শিক্ষার লক্ষ্যকে শিল্প চাহিদা ও শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার সঙ্গে একরেখায় আনা সহজ হবে।

১১.৭.২ প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশব শুরুর শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ

শৈশব শুরু ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন বাংলাদেশে এখনও সূচনা পর্যায় রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জোরালো গুরুত্ব দেয়া হবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়ে। এজন্য প্রাসঙ্গিক বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে।

- *বৈষম্য কমানোর হাতিয়ার:* শৈশব শুরুতে হস্তক্ষেপ হলো প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা দিয়ে একটি দেশের অসমতার আকার কমানো যায়। দেশে আয় ও সম্পদ অসমতা কমাতে সুবিধা বঞ্চিতদের লক্ষ্য ধরে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিতদের মধ্যে যারা প্রথমবারের শিক্ষার্থী, তাদের সহায়তা করতে হবে তারা যেন অন্য সুবিধাপ্রাপ্তদের তুলনায় পিছিয়ে না পড়ে। এটাই দশম এসডিজি। কাজেই অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমতার ভিত্তিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হবে।
- *প্রাক-প্রাথমিকের জন্য যথাযথ পাঠ্যসূচি উন্নয়ন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ:* এই পর্যায়ে যথাযথ পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো একজন শিক্ষার্থীকে উপলব্ধি দক্ষতার ভিত্তি সরবরাহ করা। পাশাপাশি তাকে আজীবন শিক্ষা, সমস্যা সমাধানের সৃজনশীলতা ও পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করা। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এসব জীবনদক্ষতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যর্থ হতে পারে।

বাংলাদেশে একটি সফল প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচির অর্থ হলো শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্তর্ভূক্ত হয় শিশু মনস্তত্ত্ব এবং যত্নসহকারে প্রস্তুত করা ক্রীড়া-ভিত্তিক পাঠ্যসূচির উন্নয়ন হয়েছে। অতএব অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে একদল নতুন শিক্ষক যারা শৈশব শুরুর শিক্ষাদানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত হবে এবং এর আওতা বাড়াতে সম্পৃক্ত থাকবে।

- *সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব জোরালোকরণ:* সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি শিক্ষার্থী এনজিও এবং অন্য বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহ প্রদান বজায় রাখা হবে, যেন তারা তাদের আওতা আরও বাড়াতে কাজ করে। এছাড়া আগ্রহী বেসরকারি অংশীদারদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব জোরালো করা হবে।

১১.৭.৩ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ এবং অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে।

- *ঝরে পড়া, অনুপস্থিতি কমানো:* উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুলে দুপুরের খাবার, বিনা মূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম থাকার পরও প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার প্রায় ২০ শতাংশ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে ঝরে পড়ার অর্থ শিক্ষার্থীর জীবনে মান-মূলধন হিসেবে কোনো মূল্য সংযোজন হয়নি এবং তা এক ধরণের পুঁজি-অপচয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবারগুলোকে ব্যাপক প্রণোদনা দেয়ার ব্যবস্থা উন্নয়ন করা হবে তাদের শিশুদের স্কুলে নিয়মিত রাখার বিষয়ে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। উপরন্তু শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে নিয়মিতভাবে অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অভিভাবকদের অবহিত করা হবে বর্তমান ব্যবস্থা ও শিশুদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে। নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখতে শিক্ষকবৃন্দ ও প্রধানদের ব্যাপক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য ডিজিটাল কর্তব্য-সূচি উন্নয়ন এবং আইসিটি ব্যবহার করা হবে।
- *শিক্ষায় আরও ভালো সুফল:* শিক্ষার ফলাফলের গুণগত মান উন্নয়নে জোর দেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে হালনাগাদকৃত পাঠ্যসূচি, শিক্ষা বিজ্ঞান, উন্নত ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা পেশাজীবী, পাঠ্যক্রম বই ও উপকরণ এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষায় অভিভাবকের অংশগ্রহণ। ব্যাপক মনোযোগ দেয়া হবে আইসিটি বিষয়গুলোয়।
- *উত্তম নাগরিক সৃষ্টি:* পাঠ্যসূচির হালনাগাদকরণে প্রাথমিক এবং সম্ভবত সব পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে মৌলিক নীতি, নিরাপত্তা ও দৈনন্দিন জীবনের সচেতনতামূলক বিষয়; যেমন নৈমিত্তিক স্বাস্থ্য যত্ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামাজিক দায়বদ্ধতা উন্নয়নের জন্য পাঠ্যক্রমে গোষ্ঠীসংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড/বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্তর্ভূক্ত *হতে পারে।*
- *পাঠদানের ফলাফল পরিমাপে আরও ভালো পদ্ধতি উন্নয়ন:* অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের সুফল সঠিকভাবে পরিমাপ করার পদ্ধতি উন্নয়নে। এটি দক্ষতা ও হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে আলোকপাত করে, শুধু পরীক্ষায় পাস করার সক্ষমতায় নয়।

১১.৭.৪ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ

পিইডিপি-৪ ও এসইএসআইপি প্রকল্পগুলো খুবই প্রণিধানযোগ্য এবং এতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের সব দিক অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন আরও জোরদার করা হবে। এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অঙ্গীভূত হবে নিম্নলিখিত কাজগুলো:

- *পাঠদানের সুফল পরিমাপে আরও ভালো পদ্ধতি উন্নয়ন:* তৃতীয় পর্যায় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মাধ্যমিক পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ বিপদগ্রস্ত হতে পারে মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ গ্রহণ সঠিকভাবে না হলে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা থেকে পরিমাপযোগ্য সুফল বাড়াতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। ডিপিই (DPE) পরিচালিত এনএসএ'তে দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ালেখার সুফল সন্তোষজনক নয়। এ কারণে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য একই ধরণের জাতীয় মূল্যায়ন করা হবে।

- *শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পদ্ধতি মূল্যায়ন ও পরীক্ষা সংস্কার:* শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পরীক্ষার সংস্কারে উপনীত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। না বুঝে মুখস্থ করা নয়, বরং গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করার ওপরে। বাংলাদেশে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির গুণগত মান, যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিগগিরই একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার (এনইএসি) প্রতিষ্ঠা করা হবে। এরই মধ্যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'ন্যাশনাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্ট, ২০২০' আইন করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- *বিজ্ঞানে তালিকাভুক্তি বাড়ানো:* এসএসসি ও এইচএসসিতে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করে। এই সংখ্যা সরকারের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে এই প্রবণতায় পরিবর্তন আনা হবে। বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, অল্প বয়স থেকেই উচ্চ-সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিজ্ঞান ধারায় স্ট্রিমলাইন করে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবকের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ক্যারিয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ধুঁকতে থাকা শিক্ষার্থীদের প্রতিকারমূলক সহায়তাও দেয়া হবে।
- *দশম শ্রেণি পর্যন্ত সবার জন্য একই (কমন) পাঠ্যসূচি সূচনা করা:* হান্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ ভারতে একটি একক প্রবাহের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এ কমিশন গঠিত হয়েছিল স্যার উইলিয়াম উইলসন সেন্টারের নেতৃত্বে। সেই ধারা চলমান ছিল ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত। ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত অনেকগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। সবগুলো কমিশনই মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্য একই পাঠ্যসূচি বজায় রাখার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু হাজার ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ভাগ করা হয় তিনটি ভাগে: বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার ১৯৭২ সালে ডক্টর কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৯৭৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিট্র্যাক (সবার জন্য এক) পাঠ্যক্রম চালুর সুপারিশ করেন। নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর জন্য তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া এই বয়সে (১৩+ বছর) কঠিন। বিষয়টি তার ওপর ব্যাপকভাবে মানসিক চাপ তৈরি করে, যা তার মানসিক ও শারীরিক উন্নতি বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে। উপরন্তু সব মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সমান ও ন্যায়সংগত শিক্ষা দিতে হবে। এটি এসডিজি ৪-এর অন্যতম একটি লক্ষ্য। আসন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে দক্ষ মানব সম্পদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সমানভাবে বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও মানবিক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। এসব দিক বিবেচনা করে সরকার দশম শ্রেণি পর্যন্ত বহুবিভাগীয় পাঠ্যসূচির পরিবর্তে একটি সমন্বিত পাঠ্যসূচি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- *সমতা বৃদ্ধি:* মাধ্যমিক পর্যায়ের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো বৈষম্য। মাধ্যমিক পর্যায়ে দরিদ্র ও দরিদ্রদের মোট তালিকাভুক্তির হার যথাক্রমে ২৪ শতাংশ ও ৭৬ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, এই পর্যায়ে উচ্চ অসমতা বিদ্যমান। ধুঁকতে থাকা দরিদ্র মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে ছেলেরা অভিভাবক কর্তৃক পারিবারিক কৃষিকাজ/ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এই অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সুফল দেখতে পান না। অন্যদিকে মেয়েদের পাঠানো হয় মজুরিবিহীন/মজুরিযুক্ত গৃহস্থালির কাজে। আইনি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ ঘটছে। দরিদ্র পরিবারগুলোর সাধারণ একটি সমস্যা হলো- তারা ছেলেদের স্কুলে পাঠায় এবং মেয়েদের মজুরিবিহীন/মজুরিযুক্ত গৃহস্থালির কাজে নিয়োগ করে। এই বৈষম্য কমাতে শিক্ষার্থীদের উদার উপবৃত্তি ও অভিভাবকদের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে।
- *আইসিটিনির্ভর শিক্ষার বৃহৎ ভূমিকা:* মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে যথেষ্টসংখ্যক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে সব প্রতিষ্ঠানকেই আধুনিক আইসিটি ল্যাব দিয়ে সজ্জিত করা হবে। শিক্ষকদের আইসিটি বিষয় এবং আইসিটি-নির্ভর পাঠদান ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষকে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এরই মধ্যে ১৫ শতাংশ শ্রেণিকক্ষকে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বাকি শ্রেণিকক্ষগুলো ২০২৩ সালের মধ্যে পরিবর্তন করা হবে। মহামারির সময় আইসিটি-নির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রমাণ করেছে যে, এটি জরুরি পরিস্থিতিতে একটি কার্যকর হাতিয়ার। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থায়ী আইসিটি-নির্ভর শিক্ষার কাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিক্ষার্থীদের ক্ষতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে সহায়তা করবে। শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আইসিটি সমন্বয় ত্বরান্বিত করতে সরকারের এটুআই প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ উদ্যোগের অসাধারণ একটি উদাহরণ হলো শিক্ষক বাতায়ন। এতে ৯৫৩ মডেল কনটেন্টসহ ২,৪৫,০৪৯ কনটেন্ট রয়েছে। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ২০২১ সালের মধ্যে এতে ৯ লাখ শিক্ষককে অন্তর্ভূক্ত করার। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি

কর্মকাঠামো অবলম্বন করবে, যা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখবে যেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তত এক ঘণ্টা এসব ওয়েব কনটেন্ট ব্যবহার করা হয়।

- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় প্রাক-বৃত্তিমূলক (প্রি-ভিওসি) এবং বৃত্তিমূলক (ভিওসি) শিক্ষা চালুকরণ: মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রাক-ভিওসি এবং ভিওসি চালু করা হবে। এর সুবাদে শিক্ষার্থীরা কিছু বৃত্তিমূলক দক্ষতা নিয়ে তাদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করবে। ৬৪০টি বিদ্যালয়ে এরই মধ্যে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৩ সাল নাগাদ মাধ্যমিকের সব শিক্ষার্থী এতে তালিকাভুক্ত হবে।

- *টিভেট শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ:* বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় টিভেট শিক্ষার মর্যাদা কম বলে মনে করা হয়। সে কারণে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের এ শিক্ষাকার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নিরুৎসাহিত হন। প্রথম ধাপ হবে খুব শুরুতেই প্রাথমিক পর্যায়ে টিভেট কোর্স চালু করা। শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারকে যদি দেখানো যায় যে, টিভেট শিক্ষা থেকে সুফল পাওয়া যায় ও ভালো কর্মসংস্থান হয়, তা হবে সমাজে টিভেটের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর একটি উপায়। অনেক উন্নত দেশে টিভেট শিক্ষা জনপ্রিয়। যেমন সুইজারল্যান্ডে কমবেশি ১৬ বছরে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষার্থী পূর্ণকালীন শিক্ষা বন্ধ করে দেয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচি শুরু করে। আর এতে অংশ নেয় দেশটির এক-তৃতীয়াংশ কোম্পানি। শিক্ষার্থীরা বাজার চাহিদা সম্পর্কে আগেভাগেই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পায় এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুবাদে সব শিক্ষার্থী তাদের মাধ্যমিকের অভিজ্ঞতার মাঝপথে সহজেই কারিগরি কিংবা উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে। যখন সময় হয়, তারা প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি মাধ্যমিক শিক্ষা ও টিভেট একই ছন্দে কার্যকর হওয়ার একটি উদাহরণ। একই ধরণের পরিস্থিতি সূচনা করা হবে বাংলাদেশেও, যেখানে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ/শিক্ষানবিশ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। এতে তারা কম্পিউটার প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করবে এবং অন্য হার্ড স্কিল আয়ত্ত করবে। এর ফলে শিল্প, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও ভালো এবং দৃঢ় সংযোগ তৈরি হবে। এদের মধ্যে অব্যাহত যোগাযোগের ফলে আগেভাগেই দক্ষতার অভাব চিহ্নিতকরণ ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা সহজ হবে। কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে আগেভাগেই পরিচিতি হওয়ার ফলে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আসবে। তারা বুঝতে পারবেন, বিশেষ কোনো শিক্ষাপ্রবাহ, যা ডিগ্রি কিংবা সার্টিফিকেট প্রদান করে, কর্মক্ষেত্রে তার চেয়ে দক্ষতা বেশি দরকারি।

- *আরও বেশি শিল্প-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগ:* গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-অ্যাকাডেমিয়া সহযোগিতার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কর্ম কাঠামোর উন্নয়ন সীমিতই থাকছে। এর জন্য দায়ী কিছু কাঠামোগত বাধ্যবাধকতা ও প্রণোদনার অভাব। এই পরিস্থিতি অনুকূল করতে শিল্পগুলোর জন্য আর্থিক প্রণোদনা, শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি এবং টিভেট প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হবে, যেন তারা শিক্ষার্থীদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়। শ্রম আইন ২০১৩-তে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, শিল্পগুলো কমপক্ষে ৫০ জন শ্রমিক নিয়োগ দেয়। তাতে অন্তত ১০ শতাংশ শিক্ষানবিশ থাকতে হবে। এই আইন কার্যকর করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পগুলোকে প্রণোদনা দেয়া হবে। একই ধরণের সমর্থন দেয়া হবে টিভেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যেন তারা স্থানীয় পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতা বাড়াতে পারে। দক্ষতা কর্মসূচি প্রশিক্ষণে তরুণদের টানতে সরকার ভর্তুকি দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সরবরাহ করবে, যাতে কর্মসংস্থান-বিষয়ক পরামর্শও দেয়া হবে।

- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ অনুযায়ী সব শিশুকে প্রথম ১২ বছরে বিনা মূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে। এর ফলে ১৫ থেকে ১৮ বছরের শিশুরা বিদ্যালয়ে থাকবে, যা শিশু শ্রম এবং কোনো ধরণের কর্মহীন বা বৃত্তিহীন (NEET) তরুণদের সংখ্যাও কমাবে। এ লক্ষ্য অর্জনে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শিক্ষায় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হবে।

১১.৭.৫ মাদ্রাসা প্রবাহ উন্নয়নের কৌশলসমূহ

মাদ্রাসা প্রবাহের মানোন্নয়নে সহায়তা করবে পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বহিঃস্থ অংশীদারদের ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা এবং উদ্ভাবনী নতুন শিক্ষা পদ্ধতির বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে কার্যকরী করা হবে এবং জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা হবে। যেহেতু বিজ্ঞান, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান (অ্যাক্রেডিটেশন) সহজ করবে, সেহেতু উত্তীর্ণ স্নাতক শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান পাওয়ার যোগ্যতা নিশ্চিত হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ: পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা বিজ্ঞানে পরিবর্তন আনা হলেও সুফল দেবে না, যদি না তাতে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা থাকে। আলিয়া মাদ্রাসায় মাত্র ২৩ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষিত। ১,১৩,৩৬৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৯.৬৬ শতাংশের বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) আছে। যেহেতু পাঠ্যসূচির মানোন্নয়ন হয়েছে এবং নতুন বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেহেতু বর্তমান শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যেন তারা নতুন উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাদানে সক্ষম হন। উপরন্তু এই ধারার শিক্ষায় আরও নারী শিক্ষক প্রয়োজন; ৫৫.২৪ শতাংশ ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করে ১২.৭ শতাংশ নারী শিক্ষকের কাছ থেকে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎসাহদান, প্রশিক্ষণ ও মাদ্রাসার জন্য আরও প্রশিক্ষিত নারী শিক্ষক নিয়োগে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হবে।

টিভেট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে আরও উন্নত সংযোগ: গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো করতে পারছে না, তাদের টিভেট প্রবাহে নেয়া হলে ভালো আয়ের সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিপুলসংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকেও টিভেট প্রবাহের মাধ্যমে সহায়তা করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দাখিল ও আলিম পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা সূচনা করা হবে। মাদ্রাসায় শিক্ষা বিজ্ঞানের স্থাপত্য পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা রাখবে মাদ্রাসা-টিভেট অংশীদারত্ব।

মাদ্রাসায় আইসিটি: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসায় কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস, আইসিটি-ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রোগ্রামিং কোর্স চালু করা হবে। এসবের ফলে মাদ্রাসা প্রবাহ থেকে উত্তীর্ণ স্নাতকদের মানোন্নয়ন হবে এবং সাধারণ শিক্ষায় ও মাদ্রাসা-উত্তীর্ণদের মধ্যে শিক্ষার দূরত্ব কমে আসবে।

আরও ভালো স্বচ্ছতা ও তহবিল ব্যবস্থাপনা: কওমি মাদ্রাসাগুলো ব্যক্তিগতভাবে তহবিলপ্রাপ্ত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অনুদান। এ মাদ্রাসাগুলোর ব্যবস্থাপনা জোরালো করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে।

১১.৭.৬ উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ

উচ্চ শিক্ষায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই উচ্চ শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সরকার এটিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। এই কৌশলগুলো নেয়া হয়েছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ থেকে। এসব কৌশল জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এই কৌশলগুলোর বাস্তবায়ন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও একীভূত করা হবে। এছাড়া নেয়া হবে নিম্নে উল্লেখিত কর্মকাণ্ড:

- *বিজ্ঞান, কারিগরি প্রকৌশল ও গণিত (এসটিইএম) বিষয়গুলোয় মনোযোগ বাড়ানো:* দেশের বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উচ্চ শিক্ষা বা তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষার গুণগত মানে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়গুলোয় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীসংখ্যা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে কম। এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় আরও উচ্চপর্যায়ে, যেখানে বিপুলসংখ্যক বিজ্ঞান শিক্ষার্থী বিভাগ বদলে ব্যবসা/বাণিজ্য/সামাজিক বিজ্ঞান প্রবাহ বেছে নেয়। বিজ্ঞান বিষয়গুলোয় আবার ফিরে আসার মতো ঘটনা হয় না বললেই চলে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের (এবং তাদের অভিভাবককে) এসটিইএম বিষয়গুলো আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করা হবে। তা করা হবে বৃত্তি, ক্যারিয়ার পরামর্শ ও গণমাধ্যমে তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে। যেহেতু কঠিন পাঠ্যসূচির জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক প্রয়োজন, তাই এসটিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকদের গড়ে তুলতে প্রচুর পুঁজির সংস্থান করা হবে।
- *সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা:* শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (PPP)। এনইপি ২০১০ ও এনএসডিপি ২০১১-তে নতুন নতুন টিভেট প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি ও ব্যবস্থাপনার জন্য পিপিপি আবশ্যক। বর্তমানে দেশে কয়েকশ বড় ও ছোট এনজিও রয়েছে, যারা চার থেকে ছয় মাস মেয়াদি সংক্ষিপ্ত ও অস্বীকৃত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের শিক্ষার্থী তালিকাভুক্তির সক্ষমতা কম। এই প্রেক্ষাপটে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) মধ্যে অংশীদারত্ব জোরালো করবে।
- *প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি:* প্রশিক্ষকদের অবিরত প্রশিক্ষণ প্রদান টিভেট ব্যবস্থার গতিশীলতা (ডায়নামিক) উন্নয়নে সহায়তা করবে। সারাদেশে বিভিন্ন টিভেট প্রতিষ্ঠান শিক্ষক নিয়োজিত শিক্ষকের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। অথচ তাদেও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে মাত্র ৩৭ জন শিক্ষক নিয়ে দুটি সরকারি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এজন্য প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ সংস্থার সংখ্যা বাড়াতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পদক্ষেপ নেয়া হবে ।

- *লিঙ্গ-পার্থক্য কমানো:* প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও তৃতীয় পর্যায়/উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছেলে শিক্ষার্থীরা মেয়ে শিক্ষার্থীদের তুলনায় ৩:১ অনুপাতে বেশি। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (NWDP) গ্রহণ করেছে। তবে নারীবিরোধী সামাজিক পক্ষপাত এই নীতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক। নারী কর্মশক্তি অংশগ্রহণের হার (৩৬ শতাংশ) পুরুষের হারের (৮২ শতাংশ) তুলনায় খুবই কম। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু নারীদের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন এই দূরত্ব কমিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যতে পুরোপুরি মোচনে সহায়ক হবে।
- *আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ব্যাপক সহযোগ:* প্রতিযোগিতা বাড়াতে বিশ্বের নামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাংলাদেশে ক্যাম্পাস খোলার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শিক্ষার্থী-বিনিময় কর্মসূচি, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অতিথি শিক্ষক, শেয়ারড/জয়েন্ট কোর্স ও ডিগ্রি প্রস্তাব করা যেতে পারে। এসব সহযোগিতা স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন ও একাডেমিক কাজে জনবলের পারফরম্যান্স ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বাড়তি প্রভাব রাখতে পারবে। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ, মালয়েশিয়া ও চীন এ ধরণের কর্মপ্রচেষ্টা অনেক আগেই শুরু করেছে এবং তা থেকে সুফল পাচ্ছে। এসটিএম-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। যদি এই প্রক্রিয়া গ্রহণ দেরি বলে মনে হয়, সংক্ষিপ্ত মেয়াদে ইউজিসি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারত্ব করতে পারে। তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করে নিয়মিত পাঠ্যসূচি হালনাগাদ করতে পারে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এই সহযোগিতাকে আরও দ্রুততর করবে।
- *গবেষণা ও প্রকাশনায় মনোযোগ বাড়ানো:* ফ্যাকাল্টি গবেষণা ও প্রকাশনায় অনেক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এজন্য প্রকাশনার মান এবং সংখ্যা দুটোতেই জোর দিতে হবে। মূল্যায়নের অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, মেয়াদ প্রভৃতি বিষয় গবেষণা ও প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
- *শিল্প-শিক্ষা সংযোগ ও পদায়ন কর্মসূচি:* শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা পাঠ্যক্রম হালনাগাদকরণে সহায়তা করে এবং একদিকে শিক্ষার্থীদের মানানসই চাকরি পেতে ও অন্যদিকে শিল্পকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা খুঁজে পেতে সহায়তা করে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সহযোগিতা সহজতর করা হবে।
- *পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট (স্নাতকোত্তর) কলেজে দক্ষতা-চালিত কোর্স চালু করা:* দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজগুলোয় বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা-চালিত কোর্স সূচনা করা হবে। এই কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের নিয়োগ যোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক হবে।
- *বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) শক্তিশালীকরণ:* উচ্চ শিক্ষার প্রসারে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হলো ইউজিসি। এটি বাংলাদেশে বেসরকারি সরবরাহকারীদের স্বীকৃতি দেয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদনের মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষা সরবরাহ প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উচ্চ শিক্ষায় তালিকাভুক্তি ও মানোন্নয়নে ইউজিসিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইউজিসিকে শক্তিশালী করা হবে, যেন এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও অ্যাডভান্স উচ্চ পর্যায়ের একাডেমিক গবেষণা জোরালো করতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে। এ প্রচেষ্টার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে নীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউজিসির সক্ষমতা বাড়াতে এর পুনর্গঠন। এছাড়া সংস্থাটির আওতায় থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলোয় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। এ খাতে অভিন্নতা ও স্বচ্ছতা আনতে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগে একটি সমন্বিত শিক্ষক নিয়োগ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১১.৭.৭ প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কৌশলসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নির্মিত হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রগতির ওপর। এই পরিকল্পনায় শেষ নাগাদ নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে শতভাগ সাক্ষরতার হার অর্জনে কার্যক্রম চলমান থাকবে। এই কৌশলে গুরুত্ব দেয়া হবে বুনিয়াদি সাক্ষর দক্ষতা তৈরিতে, যেন জীবনব্যাপী শিক্ষার বৈশ্বিক ধারণার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এসডিজির শিক্ষা-বিষয়ক লক্ষ্য ও অভীষ্টসমূহে। এটি সম্পন্ন হবে বুনিয়াদি দক্ষতা বিনির্মাণ ও আজীবন শিক্ষা সুযোগের সঙ্গে সাক্ষরতাকে সংযুক্ত করে। এতে বিবেচনা করা হয় শিক্ষার রসদ, সুযোগ-সুবিধা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক ও পরিপূরক পুঁজি নিয়ে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হবে দেশজুড়ে আইসিটি সংস্থানের ব্যাপক ব্যবহার এবং স্বশিক্ষা সুযোগের সম্প্রসারণ। সমন্বিত উপায়ে জীবনব্যাপী শিক্ষা কৌশলে বেশ কিছু বিষয়ে সহায়তা দেয়া হবে ও প্রসার করা হবে। এ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার সাক্ষরতার পর্যায়,

উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জীবিকা এবং জীবনদক্ষতার বিকাশ। এছাড়া রয়েছে তথ্য এবং আইসিটি-ভিত্তিক স্বশিক্ষা উপকরণ ও রিসোর্স প্রবেশাধিকার। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে অগ্রগতি পরিবীক্ষণে বিভিন্ন লক্ষ্য, অভীষ্ট এবং ইনপুট, আউটপুট ও সূচকের সারসংক্ষেপ করা হয়েছে সারণি **১১.৯** এ।

সারণি ১১.৯: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ ও পরিবীক্ষণ সূচকসমূহ

লক্ষ্যসমূহ	যে অভীষ্ট অর্জন করা হবে	ইনপুট সূচকসমূহ	আউটপুট সূচকসমূহ	প্রভাব সূচকসমূহ
নিরক্ষরতা দূরীকরণ/ বুনিয়াদি সাক্ষরতা প্রদান	৩৩.৭৯ মিলিয়ন' কিশোর-কিশোরী ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ককে বুনিয়াদি সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে	অর্থনৈতিক বরাদ্দ, শিক্ষা উপকরণের উন্নয়ন প্রভৃতি	৩৩.৭৯ মিলিয়ন কিশোর-কিশোরী ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক বর্ণজ্ঞান সম্পন্ন হবে	আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনধারা পরিবর্তন, মানুষের মধ্যে শিক্ষার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি
কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য সুযোগের প্রসার	মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের ৫ মিলিয়ন স্নাতক	আর্থিক বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ উপকরণ হালনাগাদ করা প্রভৃতি।	মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের ৫ মিলিয়ন স্নাতক বিভিন্ন বৃত্তিতে দক্ষ হয়েছে	জীবনধারায় উন্নয়ন
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা	০১ এনএফইবি প্রতিষ্ঠিত	আর্থিক বরাদ্দ, নিয়ম প্রণয়ন প্রভৃতি	এনএফই বোর্ড প্রতিষ্ঠা।	আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে

সূত্র: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুরো ২০১৯

১১.৮ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) অধীনে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দক্ষতার সীমাবদ্ধতা মোকাবিলা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উৎপাদন প্রক্রিয়াকে রূপান্তরিত করেছে। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা পেশায় দক্ষতা চাহিদার ধরনে পরিবর্তন এনেছে। কম দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক দিয়েই গতানুগতিক পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ এখন অনেক ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বল্পদক্ষ শ্রমঘন বিষয়ে তুলনামূলক যে সুবিধা পেত, তা হারিয়ে ফেলবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে একটি কাঠামোগত পরিবর্তন আনবে। যেখানে উচ্চ আয়ের জ্ঞান নির্ভর চাকরি, নিম্ন আয়ের প্রচলিত কাজ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিচালন ও রক্ষণবেক্ষণ-সংক্রান্ত কাজের চাহিদা অনেক বাড়বে। এর অর্থ হলো ৪আইআরে তাল মেলাতে এমন কর্মশক্তির প্রয়োজন হবে, যাদের হার্ড স্কিল, সফট স্কিল–দুটোই রয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আইসিটি বিশেষজ্ঞ দক্ষতা ও মৌলিক প্রোগ্রামিং দক্ষতা এখন আর পর্যাপ্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চতর প্রকৌশল ও মেশিন লার্নিংয়ের অভিজ্ঞতা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। উপরন্তু আইসিটি বিশেষজ্ঞদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞান রাখতে হবে। তাদের জানতে হবে ব্যবসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পে আইসিটির সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কেও। স্নাতকদের ক্রিটিক্যাল থিংকিং, পারস্পরিক সহযোগিতা, নিয়মিত শেখা ও মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তুলতে পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে পুনরায় ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। অন্য প্রয়োজনীয় সবগুলো সফট স্কিল বাছাই করার বিষয়ে আগ্রহী হতে হবে। 4IR-এর জন্য দক্ষতার সীমাবদ্ধতা মোকাবিলায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে কৌশল ও নীতিমালা নেয়া হবে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

পড়ালেখায় জীবনব্যাপী শিক্ষার মডেলসমূহ অবলম্বন: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কৌশল অভিযোজন করে শিক্ষার্থীর কৌতূহল, সৃজশীলতা ও অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপিত করা হবে। যেন তারা প্রাক-প্রাথমিক, টিভেট, মাদ্রাসা প্রবাহসহ সব পর্যায়ে জীবনব্যাপী শিক্ষায় আগ্রহী হয়। সব ধরণের কর্মক্ষেত্রের নতুন পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে উদার এবং মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। এর অর্থ হলো সিলেবাস, শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি ও মূল্যায়নের ধরণসহ শিক্ষার সম্পূর্ণ কর্ম কাঠামো পরিবর্তন করা। কর্মক্ষেত্রের চাহিদা খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে যাচ্ছে এবং তা আসন্ন শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বদল হতে থাকবে। বৈশ্বিক ধরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনোভাবেই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আশা করতে পারে না যে তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনীয় সব দক্ষতা শিখিয়ে দিতে পারবে। শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার, শিক্ষকমণ্ডলী ও নীতিনির্ধারকদেরও এই উপলব্ধি রাখতে হবে। কর্মীরা একটি ক্যারিয়ারই পছন্দ করে শুধু তা নিয়েই এগিয়ে যাবে বলে এখন আর আশা করা যায় না। বর্তমানে প্রচলিত অনেক ধরণের চাকরিই ভবিষ্যতে থাকবে না এবং ভবিষ্যতের অনেক নতুন চাকরি এখনও দেখাই যাচ্ছে না। আর এ কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী উন্নয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু শিক্ষা ও আইসিটি প্রয়োজনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সঠিক মূল্যায়ন দরকার। গৃহীত কর্মসূচি ও উদ্যোগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা করা এবং ইতিবাচক ফলাফল পেতে শিক্ষার্থী কর্মীদের পছন্দ নির্ধারণে পথ দেখানোও গুরুত্বপূর্ণ।

আইসিটিতে মনোযোগ বাড়ানো: এসডিজি অভীষ্ট ৪.৪-এর আওতায় মানসম্পন্ন চাকরি ও উদ্যোক্তা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ককে প্রাসঙ্গিক কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের (DBI) অধীনে সরকার বেশকিছু আইন ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে–'আইসিটি নীতি, ২০০৯', 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য অগ্রাধিকার কৌশলসমূহ, ২০১১' এবং 'আইসিটি নীতি, ২০১৫'। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প শুরু করা হয়েছে সরকারি সব অফিসে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা উন্নয়ন এবং নাগরিকদের আরও উন্নত সেবা দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। এনইপির অধীনে আইসিটিভিত্তিক শিক্ষাকে মূলধারায় আনা হয়েছে। এর আওতায় যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে অনেক তরুণ নিজেদের আইসিটিতে প্রশিক্ষিত করছে এবং বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থান করেছে। অনলাইন কর্মী সরবরাহে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয়। এ অগ্রগতির ভিত্তিতে এগিয়ে যাবে এবং এ খাতে ব্যাপক জোর দেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এ লক্ষ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইসিটি বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে বিশেষ করে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে এবং উচ্চ কর হারের বিষয়টি সমাধান করা হবে। এছাড়া কর্মীদের জন্য আইসিটির বিশেষ দক্ষতাসহ কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতার বিষয়ে গুরুত্ব বাড়ানো হবে, যেন এই কর্মীরা ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্রকে সত্যিকার অর্থেই সচল রাখতে পারে এবং ডিজিটাল অবকাঠামো উদ্ভাবন ও এতে সহায়তা দিতে পারে।

কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের জন্য দক্ষতা (SEIP): দক্ষতা উন্নয়নে সরকারের নেয়া বড় একটি উদ্যোগ এসইআইপি কর্মসূচি, যা এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের মদতপ্রাপ্ত। এসইআইপি কর্মসূচি তুলনামূলকভাবে সফল হয়েছে বিপুলসংখ্যক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে, তাদের কাজের সুযোগ দিতে এবং এই কর্মীরা তাদের চাকরি বজায় রেখেছে। এটি একটি বহু-পর্যায়ের কর্মসূচি, যা ২০১৪ সাল থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। আরও উন্নত দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে অগ্রাধিকার খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোই এই প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল। এই প্রকল্পে রয়েছে চারটি বড় অংশ/আউটপুট– শ্রমবাজারের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া প্রদান উপযোগী অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ; জোরালো গুণগত মান নিশ্চয়তা ব্যবস্থা; প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং কার্যকর কর্মসূচি ব্যবস্থাপনায় গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অভিজ্ঞতাকে পরিণত করা হবে একটি অর্থনীতিব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে, যাতে থাকবে সব আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম। এসইআইপি অর্থায়নের প্রথম দুই অংশের সফল কর্মসম্পাদনের চিত্র তুলে ধরা হলো বক্স ১১.২ এ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, কলা ও গণিত বিভাগে (STEM) মনোযোগ বাড়ানো: সফট ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং সফট ও হার্ড স্কিল উন্নয়নে সহায়তা করে এসটিইএম বিষয়গুলো। ৪আইআর-এর সুবিধা নেয়ার জন্য এগুলো অপরিহার্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসটিইএম বিষয়গুলোয় তীক্ষ্ণভাবে গুরুত্ব বাড়ানো হবে শিক্ষাবৃত্তি, চাকরি পরামর্শ ও গণমাধ্যমে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে। স্কুল পর্যায়ে অভিভাবক-শিক্ষক সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অভিভাবকদের সচেতন করা হবে–তারা যেন সন্তানদের এসটিইএম বিষয়গুলোয় উৎসাহিত করেন।

বাজারনির্ভর প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম তৈরি করা: নতুন শিল্পের চাহিদা ও পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার বাজার পরিস্থিতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানানসই হতে হবে। বাংলাদেশ চাহিদা ও জোগানের অমিল এবং স্নাতকদের কম নিয়োগযোগ্যতার প্রধান কারণ পাঠ্যসূচির অনমনীয়তা এবং বহু বছরের পুরনো শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি। এনএসডিএ পাঠ্যসূচিকে হালনাগাদ ও নমনীয় করার চেষ্টা করেছে, যাতে অল্প সফলতা পাওয়া গেছে। এর পেছনে দায়ী দুটি বড় প্রতিবন্ধকতা–প্রথমত, পাঠ্যক্রম পরিবর্তনে শিল্প থেকে যথাযথ ও সময়মতো ইনপুটের অভাব। দ্বিতীয়ত, সেকেলে পাঠ্যসূচিকে আধুনিকায়ন করতে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামোর অভাব। সরকার অবশ্যই এগিয়ে আসতে পারে এবং প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্দক্ষতার সেই সুযোগগুলো সরবরাহ করতে পারে, যেগুলো পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বারংবার হালনাগাদ হচ্ছে। কিন্তু এই কার্যক্রম সফল করতে হলে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করা আবশ্যক। একটি বিষয়ে শিক্ষা পাওয়ার অর্থ হলো একটি ট্রেড অথবা দক্ষতা অর্জন করাই নয়, বরং যা দিয়ে নিজের মতো করে কিছু শুরু করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

টিভেটের ভূমিকা: চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সম্ভাব্য সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য টিভেট উপকারী হতে পারে। তবে এজন্য টিভেট শিক্ষাক্রমের পুনর্যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন কোর্স অন্তর্ভূক্ত করে পাঠ্যক্রমটি হালনাগাদ করা হবে। এটি কর্মশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে উচ্চ পর্যায়ের বুৎপত্তিগত বিষয়ে, যেমন প্রকল্প পরিচালনা, ক্লাউড কম্পিউটিং, কম্পিউটার প্রযুক্তি, ডেটা বিশ্লেষণ, বিপণনসহ অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে। এই ধারায় 'ভালো' শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্ত করার জন্য মানসিক স্থিতির পরিবর্তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত। ২০০৮-১৫ টিভেট সংস্কার প্রকল্প, এনএসডিপি ২০১১ এবং এসটিইপি ও এসইআইপি প্রকল্প অবলম্বন এই উদ্বেগ সামলানোর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে। টিভেটতে শিক্ষাক্রম আধুনিক ও হালনাগাদ করা ছাড়াও গুরুত্ব দিতে হবে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুনর্দক্ষতা উন্নয়নে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল অবকাঠামো সৃষ্টিতে।

১১.৯ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কর্মসূচি

সব ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দক্ষ শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ মানবসম্পদের ভিত্তি প্রস্তুত করা হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সেই প্রয়োজনের প্রতি যথোপযুক্ত সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে এই অনুচ্ছেদে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা কৌশল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইসিটিতে বিনিয়োগ নিয়ে অনুচ্ছেদ ১২-তে আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশের দক্ষতা বৃদ্ধি হালনাগাদকরণ সম্পূরক ভূমিকা পালন করবে। দেশের উচ্চমর্যাদা অর্জনে এগুলো দরকার হবে। শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও আইসিটিতে মোট বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যহারে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাড়ানো হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোয় এডিপি বরাদ্দ সারণি ১১.১০ ও সারণি ১১.১১-তে ২০২১ অর্থ-বছরের চলতি ও স্থির মূল্যে দেখানো হয়েছে। সীমিত পুঁজি সত্ত্বেও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হবে সুশাসন, সুষ্ঠু কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়নে অবদান রাখা সব মন্ত্রণালয়/সংস্থার আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ে।

সারণি ১১.১০: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(চলতি মূল্যে শতকোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর২০২১	অর্থবছর২০২২	অর্থবছর২০২৩	অর্থবছর২০২৪	অর্থবছর২০২৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৯.৫	১১৩.০	১৩৩.০	১৫৮.৩	১৯৩.৭
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৬১.৪	৯২.৩	১০৬.৪	১৩৬.৬	১৭১.৩
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮.৫	১৩.৮	২১.৩	৩১.০	৩৭.২
মোট শিক্ষা	**১৫৯.৪**	**২১৯.১**	**২৬০.৭**	**৩২৫.৯**	**৪০২.২**

সূত্র: অনুচ্ছেদ ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি ক৫.১

সারণি ১১.১১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব উন্নয়নের জন্য এডিপি বরাদ্দ

(স্থির মূল্যে শতকোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	অর্থবছর২০২১	অর্থবছর২০২২	অর্থবছর২০২৩	অর্থবছর২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৮৯.৫	১০৭.৩	১২০.১	১৩৬.৩	১৫৯.২
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	৬১.৪	৮৭.৬	৯৬.১	১১৭.৬	১৪০.৮
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৮.৫	১৩.১	১৯.২	২৬.৭	৩০.৬
মোট শিক্ষা	**১৫৯.৪**	**২০৮.০**	**২৩৫.৪**	**২৮০.৬**	**৩৩০.৬**

সূত্র: অনুচ্ছেদ ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি ক৫.২

খাত-১২:

ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

অধ্যায় ১২

উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইসিটি কৌশল

১২.১ পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে ডিজিটাল বিপ্লবের আওতায় আসছে। এর সুবাদে পরিবর্তন আসছে অনেক বিষয়ে; যেমন আমাদের কাজেকর্মে–আমরা যেভাবে একজন মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করি, পণ্য উৎপাদন করি ও সেবা দিই এবং সীমান্ত বাণিজ্য পরিচালনা করি সেক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে। মানবসভ্যতার এই দ্রুত বিকাশমান আলোচিত বিষয়ের মূলে রয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ইন্টারনেট ও ডিজিটাল ইকোসিস্টেম। এগুলো সীমাহীন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সমন্বয়, যা একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলশ্রুতিতে তৈরি হচ্ছে একটি ডিজিটাল অর্থনীতি, যার বৈশিষ্ট্য হলো বাড়তি উৎপাদনশীলতা। একদিক থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দেশজুড়ে সব ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বর্ধমান উৎপাদনশীলতার সমষ্টি।

খুবই মৌলিক অর্থে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন (আউটপুট) বাড়ানোর উপায় দুটি–(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িত ইনপুটের পরিমাণ বাড়ানো; অথবা (খ) একই পরিমাণ ইনপুট থেকে বেশি ফলাফল (আউটপুট) পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করা। উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধির মূল বৈশিষ্ট্য হলো 'কম দিয়ে বেশি করা'। ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য প্রবৃদ্ধি হিসেবের (অ্যাকাউন্টিং) পদ্ধতি হলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টর ইনপুটের বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন: বস্তুগত মূলধন (পুঁজি জমাকরণ), দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রম শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা এবং সেই দক্ষতা যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, সেই উপাদানগুলোর সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির অবশিষ্ট উপাদানগুলোর ভূমিকা সন্নিহিতকরণ (মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা–টিএফপি)। ইদানীং প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে টিএফপি এর প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উচ্চ উৎপাদনশীলতার বিষয় নির্ভর করে পুঁজি বিনিয়োগ (মানুষ ও বস্তুগত), প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা ও সুশাসনের ওপর। আর এদের প্রভাব ডিজিটাল অর্থনীতির অগ্রগতি দ্বারা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে।

গত ২৫ বছরে উন্নত দেশগুলো উচ্চ টিএফপি প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এজন্য অবদান রেখেছে সার্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশকে টিএফপি প্রবৃদ্ধি তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রখতে পারেনি। প্রবৃদ্ধির প্রথম চালিকাশক্তি ছিল মাথাপিছু শ্রমিকপ্রতি পুঁজি বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে শ্রম উৎপাদনশীলতায় উল্লম্ফন। তবে ২৫ বছর ধরে টিএফপি প্রবৃদ্ধির অবদান বাড়ছে। অনেকাংশেই আইসিটি বিস্তার এবং অর্থনীতি ও সমাজজুড়ে ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল সিস্টেমগুলোর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বৃদ্ধি এতে অবদান রাখে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে প্রযুক্তিগত রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ একই সঙ্গে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উৎস আবার ফলাফলও। আইসিটিখাতে আধুনিক প্রযুক্তির সব দিক উন্মোচনে গুরুত্ব পেয়েছে এই এজেন্ডা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর আওতায় বাংলাদেশ ২০৪১ সাল নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশের (HIC) মর্যাদা অর্জন করতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো নতুন ধারণা ও জ্ঞানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্যমান সম্প্রসারণ করা; যেন প্রক্রিয়া ও পণ্য উদ্ভাবনে বাংলাদেশ ফ্যাক্টরচালিত পর্যায় থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। গত কয়েক দশক ধরে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজের কম্পিউটারাইজেশন হিসেবে আইসিটির যাত্রা শুরু হয় বিশেষ কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে সরকারি সেবার ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে এটি জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) পথে শক্ত ভিত রয়েছে আইসিটিতে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। কেননা আইসিটিচালিত ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা যেমন নিতে হবে, তেমনি চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে।

অগ্রগতি সত্ত্বেও সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি মূল্যায়নে উল্লেখ রয়েছে যে, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বৈশ্বিক মান বিবেচনায় জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করছে। বিশ্ব ব্যাংকের নলেজ ইকোনমি সূচকে তলানির একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান।' এই বাস্তবতাই ডিজিটাল ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির শক্তি পরিমাপের সূচকগুলোয় দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্য নির্ধারণের প্রতিবন্ধকতাকে বড় করে তুলছে।

যখন অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি তখন কোভিড-১৯-এর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আঘাত থেকে উত্তরণের পর্যায়ে থাকবে। মহামারী সব খাতেই ব্যাপক দুর্গতি ঘটিয়েছে। তবে এই সময় বোঝা গেছে যে, ক্রান্তিলগ্নে টিকে থাকা ও সংযোগের (কানেক্টিভিটি) জন্য আইসিটি খুবই তাৎপর্য ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা খাত অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে, কৃষকরা ই-কমার্সের মাধ্যমে ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বাণিজ্যের বড় চ্যানেলে পরিণত হয়েছে মোবাইলে অর্থ লেনদেন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য জনপ্রিয় হয়েছে টেলিমেডিসিন। অর্থায়ন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের জীবনরেখায় পরিণত হয়েছে আইসিটি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেরই মৌলিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে ডিজিটাল রূপান্তর। এসব কারণে আইসিটির গুরুত্ব অনেক বেশি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে অগ্রগতির লক্ষ্য অর্জন ও কর্মসম্পাদনের মান উন্নত করতে এটি শুধু উর্ধ্বমুখী অগ্রগতিই নয়, বরং সহজ পথ (ভার্টিকাল ও ক্রস-কাটিং) বাতলে দেয়ার ভূমিকাও পালন করবে।

১২.২ উচ্চ প্রবৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল অর্থনীতিকে কাজে লাগানো

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংযোগের প্রসার ও স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল উপাত্ত এবং প্রযুক্তির ভূমিকা আরও সম্প্রসারণের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের জন্য প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা তৈরির লক্ষ্যে উপাত্তে প্রবেশাধিকার এবং উপাত্তকে ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তায় (ইনটেলিজেন্স) পরিণত করার সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের পদচিহ্ন সাধারণ অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থা থেকে প্রসারিত হয়ে খুচরা লেনদেন ও ইউটিলিটি বিল দেয়ার জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এই অগ্রগতি আইসিটির ভূমিকাকে কানেক্টিভিটি, তথ্য আদান-প্রদান সহায়তা ও অটোমেশনের মতো বিষয় থেকে ডিজিটাল অর্থনীতির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে পণ্য ও সেবা উৎপাদন; বণ্টন ও ভোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দ্বারা অর্থনৈতিক আউটপুট এবং সর্বোপরি প্রবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলে বর্তমানে ডিজিটাল অর্থনীতির ধারণাটি সুপরিচিতি লাভ করেছে। আমাদের জীবন ও জীবিকায় ডিজিটাল অর্থনীতির ব্যাপক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই প্রযুক্তিগত বিকাশের সুবিধাকে কাজে লাগানো হলে তা কৌশলগতভাবে অর্থবহ হবে। ডিজিটাল অর্থনীতি কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

ডিজিটাল অর্থনীতির মান ও ধারা: বিকাশমান ডিজিটাল অর্থনীতি নানা আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং উপাত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সকল আধুনিক প্রযুক্তির মধ্যে সেন্সর, ডেটা অ্যানালিটিকস, এআই, থ্রিডি প্রিন্টিং, রোবোটিকস, ক্লাউড কম্পিউটিং ও ফাইভজি কানেক্টিভিটি অন্যতম। এগুলো চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্যও মদত জোগায়। বৈশ্বিক আইপি ট্রাফিকে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৯২ সালে দৈনিক যা ছিল ১২০ জিবি, ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে সেকেন্ডে ৪৬ হাজার ৬০০ জিবি। ২০২২ সালে তা বেড়ে প্রতি সেকেন্ডে হবে ১৫ লাখ ৭০০। এত প্রবৃদ্ধির পরও বর্তমানে পৃথিবী উপাত্ত-চালিত (ডেটা ড্রিভেন) অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিটিআরসির প্রতিবেদন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ২০১৮ সালের জুনে ৬৭২ জিবি প্রতি সেকেন্ড (GBPS) থেকে ২২৮ জিবিপিএস বেড়ে নভেম্বরের শেষে দাঁড়িয়েছে ৯০০ জিবিপিএস-এ।

দেশে আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার ২০১৭ সালের জুলাইতে ছিল ৪১১ জিবিপিএস। ২০১৬, ২০১৫ এবং ২০০৯ সালে এ ব্যবহারের মাত্রা ছিলো যথাক্রমে ২৬৫, ১৮৬ এবং ৮ জিবিপিএস। মূলত গত ১০ বছরে বাংলাদেশে ডেটা ট্রাফিক বেড়েছে ১০০ গুণেরও বেশি। এই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার মাত্র এক মিলিয়নের (১০ লাখ) কম থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডেটা ব্যবহারের এই প্রসার আর্থসামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কোনো ভূমিকা রাখছে না। তবে মোবাইল ফোন ব্যবহার বৃদ্ধি অথবা ইন্টারনেট সংযোগ ক্যাজুয়াল এম্পায়ারিসিজম বা উদ্দেশ্যহীন প্রয়োগবাদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। সরকারি সেবার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ইন্টারনেট ডেটা উৎপাদন ও শেয়ারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

অধিক পরিমাণে উপাত্তের (ডেটা) সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা মূল উপাদানগুলো হলো–(১) যোগাযোগ ও প্রবেশাধিকারসুবিধা-সংবলিত ডিভাইস ও নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি; (২) ডিজিটাল ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) খাতসমূহ, যারা মৌলিক ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র অথবা সেবা তৈরি করে; (৩) ডিজিটালাইজেশন খাতের একটি ব্যাপক সমষ্টি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ই-কমার্স ও ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) এবং (৪) সেন্সর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, ফাইভ-জি ব্রডব্যান্ড, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও ক্লাউড কম্পিউটিং এর মতো প্রযুক্তিসমূহ।

ডিজিটাল অর্থনীতিতে মূল্য সৃষ্টি সংক্রান্ত বৈশ্বিক পর্যালোচনা: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর ক্রমবর্ধমান শক্তির বৈশ্বিক প্রভাব রয়েছে, যা বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপী মোট বিজ্ঞাপনের রাজস্বে ইন্টারনেট বিজ্ঞাপনের বাজার দখল ছিল ১৫ শতাংশ। যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে হয়েছে ৩৮ শতাংশ। ২০২৩ সালের মধ্যে এ বাজার ৬০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। ২০১৭ সালে এই বিজ্ঞাপনের উপার্জনের ৬৫ শতাংশ কেড়ে নিয়েছিল দুটি মার্কিন বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান গুগল ও ফেসবুক। কোম্পানি দুটি ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে রাজস্ব অর্জন করে এক হাজার কোটি টাকা। পরিণামে সংবাদপত্রসহ কিছু ব্যবসার রাজস্বের মূল উৎস বিজ্ঞাপন কমে যাওয়া একটি উদ্বেগের বিষয়। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা, বাজারে অবস্থান জোরালো করতে বিভিন্ন কোম্পানির চেষ্টা, অন্য খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ, তথ্য-উপাত্ত অসামঞ্জস্য এবং বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে সংশ্লিষ্টতা চাপ তৈরি করছে ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে। বিশেষত এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মূল্য সৃষ্টির সুযোগ মূল্যায়ন ও বাংলাদেশে এর দখল: যেহেতু বৈশ্বিক উপাত্ত প্ল্যাটফর্ম এরই মধ্যে একচেটিয়া হয়ে গেছে, তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উচিত নতুন পণ্য শ্রেণির বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। এগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য মনোযোগ দিতে হবে কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়, যার মধ্যে রয়েছে–(ক) ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত স্থানীয় বাজার, (খ) অপর্যাপ্ত উদ্যোক্তা-বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা, (গ) উচ্চ দক্ষতাসুলভ কর্মশক্তির অভাব, (ঘ) অর্থায়নের সীমিত প্রবেশাধিকার এবং (ঙ) কম মেধা সম্পদভিত্তিক ও গবেষণা-উন্নয়ন (R&D) সক্ষমতা।

বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে আমাদের মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মনোযোগী হতে হবে। সুদূরপ্রসারী ডিজিটাইজেশন এখনো একটি অধরা সুযোগ। ২০০৫-২০১৬ মেয়াদে টিএফপি প্রবৃদ্ধি ছিল গড়ে ০.৩। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, উচ্চ ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে ২০৩১ অর্থবছর নাগাদ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ ও ২০৪১ অর্থবছর নাগাদ উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। এজন্য শ্রমিকপ্রতি পুঁজি বৃদ্ধি করা ছাড়াও ২০২১-২০৩১ মেয়াদে গড় টিএফপি প্রবৃদ্ধি হতে হবে ২.৭ শতাংশ এবং ২০২১-২০৪১ মেয়াদে হতে হবে ৩.৬ শতাংশ। গত দশকের গড় টিএফপি ০.৩ কে ২.৩ থেকে ৪.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে একটি বিশাল কর্মভার এবং এর জন্য উৎপাদনের সব চলককে (ফ্যাক্টর) বাড়াতে হবে। আর এমন পরিস্থিতিতেই সামনে আসে আইসিটি ও ডিজিটাল অর্থনীতি। ২০১৮ সালে ওইসিডি'র একটি প্রতিবেদনে জানা গেছে, অন্য ব্যবসায়ের তুলনায় আইসিটি ব্যবহারকারী ব্যবসার মোট ফ্যাক্টর উৎপাদনশীলতার (TFP) স্তরের গড় ভিয়েতনামে ছিল ১৯৭%, ইন্দোনেশিয়ায় ১৫৩%, মিয়ানমারে ১৩৯% এবং চীনে ১৩৯%।

১২.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি অগ্রগতির পর্যালোচনা

ডিজিটাইজেশন ও সেবা রূপান্তর সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এর সুবাদে জাতিসংঘ প্রকাশিত ই-গভর্ন্যান্স উন্নয়ন সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ১৯৩টি দেশের মধ্যে ৯ ধাপ এগিয়ে ১১৫তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত মনোযোগের ফলেই আইসিটি বিপ্লবের প্রসার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সরকারের রূপকল্প ২০৪১-এর অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগে চারটি মৌলিক অগ্রাধিকার হলো:

- একুশ শতকের জন্য উপযুক্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- সবচেয়ে অর্থপূর্ণ উপায়ে নাগরিকদের সংযুক্ত করা।
- নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো।
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেসরকারি খাত ও বাজারকে আরও উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বানানো।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় বাংলাদেশ এই চারটি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশ সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে সরকারি সেবা নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (ICTD) আইসিটি-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড উৎসাহিত ও এতে সমর্থন জোগানের উদ্যোগ নিয়েছে। এর কার্যক্রমের মধ্যে আরও রয়েছে জাতীয় আইসিটি কৌশল ও নীতিমালা তৈরি করা, প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারি সংস্থার জন্য আইসিটি টুলের মানদণ্ড ও স্পেসিফিকেশন সৃষ্টি, আইসিটি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করা, এছাড়া সরকারি ও অন্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়ন করা। ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশনে রয়েছে চারটি খুঁটি–(১) কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো, (২) ই-গভর্নমেন্ট, (৩) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও (৪) শিল্পের প্রসার।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন সম্পূর্ণ করতে আইসিটি বিভাগ অনেকগুলো কার্যক্রম, প্রকল্প ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। আইসিটির আওতায় রয়েছে বিশাল এলাকা; আর এ কারণে আইসিটি বিভাগের নিম্নলিখিত অনেকগুলো উদ্যোগ ব্যাপকভিত্তিক শ্রেণির আওতায় পড়বে।

১২.৩.১ কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো

ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল অংশ হলো কানেক্টিভিটি ও অবকাঠামো। বাংলাদেশের সর্বত্র কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করছে আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)। বিসিসি বাংলা-গভ নেট প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ২৪০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর, ৬৪ জেলা ও ৬৪ উপজেলায় আইসিটি ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য। 'ইনফো সরকার-২' এই নেটওয়ার্ককে উপজেলা পর্যায়ে প্রসারিত করেছে এবং সংযুক্ত করেছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসগুলোকে। ইনফো সরকার পর্যায়-৩ প্রকল্প ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে দেশজুড়ে দুই হাজার ৬০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের এক হাজার পুলিশ কার্যালয়ে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠাকরণ ('কানেক্টেড বাংলাদেশ') প্রকল্প দেশের ৭৭২টি প্রত্যন্ত ইউনিয়নে আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। বিসিসি 'ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার (টায়ার-৩)' স্থাপন করেছে। সেখানে ২৫ হাজারের বেশি সরকারি ডোমেইন, ২৬০টি অ্যাপ্লিকেশন, ৪১৭ ভিপিএন, ফাইল সার্ভার, ১০৯ ম্যানেজড সার্ভিস, ১৬ কলোকেশন সার্ভিস এবং ১৮ হাজার ৫৯ নেটওয়ার্ক সার্ভিস হোস্ট করা হয়েছে। এমনকি ফোর টায়ার ডেটা সেন্টার সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা পৃথিবীতে সপ্তম বৃহত্তম। বিসিসি ৩৫৪৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। আইটি/আইটিইএস খাতের প্রসার ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলো বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ ও দক্ষ মানব সম্পদ চাহিদা তৈরি করবে। এতে দেশে জ্ঞান ও মূলধনভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন হবে। বাংলাদেশে আইটি/আইটিইএস খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রগুলো হলো তথ্যপ্রযুক্তি, সফটওয়্যার প্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি, সবুজ প্রযুক্তি, আইটি হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ, আইটি এন্যাবলড সার্ভিসেস এবং আরঅ্যান্ডডি প্রভৃতি।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA) চারটি পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে: (১) বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কালিয়াকৈর, (২) শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর, (৩) সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, জনতা টাওয়ার, এবং (৪) শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর। আইটি/আইটিইএস কোম্পানিগুলোকে ৭.৪১ লাখ বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। পার্কগুলোয় এরই মধ্যে মৌলিক অবকাঠামো, যেমন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ, গ্যাস সংযোগ, পানির লাইন, ইলেকট্রিসিটি সংযোগ, নিষ্কাশন সংযোগ, পানি শোধন প্লান্ট এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সংযোগ সড়ক, সৌর সড়কবাতি প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইটি/আইটিএস খাতের প্রসারের লক্ষ্যে সরকার আকর্ষণীয় প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। আইটি কোম্পানিগুলোকে হাইটেক/আইটি পার্কে প্রণোদনা দেয় বিএইচটিপিএ। প্রণোদনাগুলো নিম্নরূপ:

- পার্ক উন্নয়নকারীদের ১২ বছরের জন্য আয়কর থেকে অব্যাহতি;
- বিনিয়োগকারীদের ১০ বছরের জন্য আয়কর থেকে অব্যাহতি;
- এটিএম মেশিন ও সিসি ক্যামেরার স্থানীয় উৎপাদনের জন্য আমদানি শুল্ক, রেগুলারিটি শুল্ক এবং সম্পূরক শুল্ক থেকে অব্যাহতি;
- বিনিয়োগকারীদের মূলধনি যন্ত্র নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক অব্যাহতি;
- হাইটেক পার্কগুলোকে বন্ডেড ওয়্যারহাউজিং স্টেশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে;
- বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ, শেয়ার হস্তান্তর, রয়ালটি, কারিগরি (টেকনিক্যাল) ফিতে আয়কর অব্যাহতি
- বিদেশি কর্মীদের জন্য আয়কর অব্যাহতি;
- পার্ক উন্নয়নকারীদের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশে আয়কর অব্যাহতি;
- পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য ভ্যাট থেকে অব্যাহতি ;
- পার্ক উন্নয়নকারীদের দ্বারা হাইটেক পার্কের উন্নয়নে ব্যবহারের জন্য আনা পণ্য/সামগ্রী আমদানিতে শুল্ক থেকে অব্যাহতি;
- বিনিয়োগকারীদের পরিবহন আমদানিতে শুল্ক থেকে অব্যাহতি;
- চুক্তিনামা নিবন্ধন/বন্ধক চুক্তিনামা নিবন্ধনে স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে অব্যাহতি;

সেবা সরবরাহ সহজ ও দ্রুত করতে বিএইচটিপি অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেছে ওয়ানস্টপ সার্ভিস আইনের আওতায়। এর ফলে একজন বিনিয়োগকারী খুব সহজেই বিনিয়োগ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সব সেবা ও তথ্য পেতে পারেন। এরই মধ্যে এই উইন্ডোগুলোর মাধ্যমে সাত ধরণের সেবা সরবরাহ হয়েছে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদ শেষে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ পৌঁছাবে প্রায় ২৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। হাইটেক পার্কে কার্যক্রম পরিচালনা করছে মোবাইল ফোন সংযোজনকারী কোম্পানি, ফাইবার অপটিক ক্যাবল নির্মাতা কোম্পানি, বায়োটেক কোম্পানি, সফটওয়্যার উন্নয়নকারী কোম্পানি এবং বিপিও, কেওপি ও কল সেন্টার-সম্পর্কিত বিভিন্ন কোম্পানি।

১২.৩.২ ই-গভর্নমেন্ট

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রকল্পের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়ন করা। এজন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছে বাংলাদেশ। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগ/সংস্থাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার নেটওয়ার্কের অধীনে আনতে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ই-গভর্নমেন্ট মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এতে নির্দেশিত ৪৬টি উদ্যোগের একটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'ডিজিটাল পৌরসভা সেবা ব্যবস্থা'র অধীনে। পরীক্ষামূলকভাবে তা বাস্তবায়িত হয়েছে একটি সিটি কর্পোরেশন ও ৯টি পৌরসভায়, যার মাধ্যমে ২০ লাখের বেশি মানুষকে পাঁচটি অনলাইন নাগরিক সেবা দেয়া হবে। সিলেটকে দেশের প্রথম স্মার্ট সিটিতে পরিণত করতে 'ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প' নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় অটোমেশনের জন্য বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প একটি কমন ইআরপি সফটওয়্যার (৯টি মডিউল) উন্নয়ন করেছে। প্রাথমিকভাবে এগুলো পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের অধীনে ৯টি সংস্থায় ব্যবহার হবে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সলিউশন ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল দ্বীপ মহেশখালী প্রকল্প বিচ্ছিন্ন একটি এলাকায় সরকারি সেবার মান উন্নয়ন করেছে। সরকারি বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক তৈরিকৃত/উন্নয়নকৃত/ক্রয়কৃত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ব্যবহারযোগ্যতা নিশ্চিত এবং গুণগত মান বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC) একটি সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার প্রকল্প দেশের বিদ্যমান কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সেরা মান, উন্নত চর্চা ও কর্ম-কাঠামোর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাজুড়ে আন্তঃপরিচালনা (ইন্টারঅপারেবিলিটি) কর্মকাঠামোর নকশা, বিকাশ এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাকে কমপিউটিংয়ে একটি নেতৃত্বদানকারী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে নেয়া হয়েছে 'বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আইসিটি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' (প্রথম সংশোধিত)। এটি কাজ করছে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ফিচারের মান তৈরি এবং বাংলা কমপিউটিংয়ের জন্য হাতিয়ার, প্রযুক্তি ও কনটেন্ট উন্নয়নে। বাংলাদেশ সরকারের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়াতে বিসিসি উন্নয়ন করেছে বিজিডি ই-গভ সিআইআরটি (কম্পিউটার ইনসিডেন্স রেসপন্স টিম)।

এই ৬টি সিএ সংস্থা এখন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট ও এ-সম্পর্কিত সেবা প্রদান করছে। এরই মধ্যে ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার হচ্ছে ই-টিআইএন, এটুআই-এর ই-ফাইল ব্যবস্থা, জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তির জন্য। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যাংক এরই মধ্যে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর জারির জন্য ব্যবহারকারীর তথ্য যাচাই করতে নির্বাচন কমিশনের এনআইডি ডেটাবেসের সঙ্গে লিঙ্ক তৈরি করার জন্য ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (VPN) সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইয়িং কর্তৃপক্ষের অফিসে ই-টেন্ডার এবং ই-ফাইল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই অফিস ওআইসি-সিইআরটি (অরগানাইজেশন অব দ্য ইসলামিক অপারেশন–কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিমস) সদস্য পদ পেয়েছে। ন্যাশনাল পোর্টাল প্ল্যাটফর্মের অধীনে এই অফিসের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্ত করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব। এটি হয়েছে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিস্টেম) ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব সিসিএ অফিস' প্রকল্পের অধীনে। একটি বিশ্বমানের পিকেআই সিস্টেম গঠন করে অনলাইন লেনদেন ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের প্রবর্তনের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বালিকা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তাদের মতো বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে সাইবার দুনিয়ার নানা বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাইবার অপরাধ, সংশ্লিষ্ট আইন, সামাজিক যোগাযোগ প্ল্যাটফর্মে নিরাপত্তা কৌশলসমূহ, অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার উপায়, অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত পদ্ধতি প্রভৃতি। অপরাধ দমনে অনলাইনে তৎক্ষণাৎ অপরাধীর পরিচয় শনাক্ত ও তদন্তের জন্য সিসিএ অফিসে 'ডিজিটাল এভিডেন্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিপোর্টিং সিস্টেম (DEMRS)' নামে একটি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে।

১২.৩.৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন

আইসিটি খাতের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন করা আইসিটি বিভাগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি ও আইটিইএস খাতের জন্য গত পাঁচ বছরে ৩২ হাজার দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করেছে। ডব্লিউআইডি প্রকল্পের অধীনে ৫৩৬ জন নারী অফিস অ্যাপ্লিকেশন ও ইউনিকোড বাংলায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এনডিডিসহ অন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করতে আইসিটি প্রকল্প শুরু করেছে বিসিসি। এই প্রকল্পের অধীনে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক হাজার ৪৮০ জন মানুষ আইসিটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আইটিইই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সক্ষমতা বিনির্মাণের মাধ্যমে বিসিসি আইসিটি পেশাজীবীদের পেশাগত সনদায়ন (ITEE) পদ্ধতি চালু ও জনপ্রিয় করতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার্থীরা জাপানি ভাষা, আইটি দক্ষতা (আইটিইই লেভেল ২ পরীক্ষা প্রস্তুতিসহ) ও জাপানি ব্যবসায়িক আচরণসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।

আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিটি অধিদপ্তর (DOICT) আইসিটি-ভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসার এবং আইটিতে জনশক্তি বিনির্মাণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' শীর্ষক একটি মাইলফলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে পুরো দেশে ও সৌদি আরবের ১৫টি জায়গায়। এই প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার হাজার ১৭৬ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে, সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আরও ১৫ হাজার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রণিধানযোগ্য পরিকল্পনা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলো 'ভবিষ্যতের স্কুল'কে নেতৃত্ব দেবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের এক লাখ শিক্ষার্থীকে 'মৌলিক প্রোগ্রামিং, আইটি নিরাপত্তা ও এমএস অফিস' বিষয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভবিষ্যতে ৩ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষককে মাস্টার প্রশিক্ষক হিসেবে ও ২০ হাজার তরুণকে ৯টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

আইসিটির মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়নের জন্য একটি প্রকল্প এরই মধ্যে শুরু হয়েছে যার নাম 'শি পাওয়ার প্রজেক্ট: আইসিটির মাধ্যমে নারীর জন্য টেকসই উন্নয়ন'। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো আইসিটির মাধ্যমে দেশজুড়ে নারীর ক্ষমতায়নের তাৎপর্যের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং নারীর আত্মকর্মসংস্থান ও নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। 'আইসিটির মাধ্যমে নারীর জন্য টেকসই উন্নয়ন' প্রকল্পের অধীনে চার হাজার নারীকে ফ্রিল্যান্স হতে উদ্যোক্তা পর্যন্ত, চার হাজার নারীকে আইটি সেবাদাতা হিসেবে এবং আড়াই হাজার নারীকে কলসেন্টার এজেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.৩.৪ আইসিটি শিল্পের প্রসার

স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আইসিটি শিল্পকে জনপ্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। আইসিটি প্রকল্প স্থানীয় আইটি ও আইটিইএস সক্ষমতাকে বৈশ্বিক বাজারে প্রচার করেছে, যার ফলে আইটি ও আইটিইএস ব্যবসার জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে বৈশ্বিক সচেতনতা উন্নত হয়েছে। এই প্রকল্প বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প পরিচালনা করেছে এবং ৮০ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে। ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ত্রেপ্রেনিয়ারশিপ একাডেমি (আইডিয়া) প্রকল্প দেশব্যাপী উদ্ভাবন ও উদ্যোগের প্রসারে কাজ করছে। ৬৪টি স্টার্টআপের জন্য মোট পাঁচ কোটি টাকার তহবিল জোগাড় করেছে। স্থানীয় আইসিটি শিল্প প্রসার করতে বিসিসি সফলভাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭-এর আয়োজন করেছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ উৎসাহ প্রদান করছে আইটি স্টার্টআপ/আইটি উদ্যোক্তাদের, যেন তারা গুগল/অ্যাপল/মাইক্রোসফট/অ্যামাজন/আলিবাবার মতো জায়ান্ট আইটি কোম্পানি তৈরি করতে পারে। এ লক্ষ্যে বিএইচটিপিএ ১০০+ নির্বাচিত স্থানীয় আইটি স্টার্ট-আপ/আইটি উদ্যোক্তাদের বিনা মূল্যে অফিস জায়গা, ইন্টারনেট ও ইলেকট্রিসিটি সুবিধা দিয়েছে; কিছু প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে বিপিও/কেপিও/আইটি কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বিপিও/কেপিও/ আইটি কোম্পানিকে আন্তর্জাতিক মানসনদ, যেমন সিএমএমআইএল-৫, সিএমএমআইএল-৩, আইএসও-৯০০১ এবং আইএসও-২৭০০১ প্রভৃতি পেতে সহায়তা করছে। এরই মধ্যে দুটি কোম্পানি সিএমএমআইএল-৫, ২১ কোম্পানি সিএমএমআইএল-৩, ৪৭ কোম্পানি আইএসও-৯০০১, ৬ কোম্পানি আইওএস-২৭০০১ মানসনদ পেয়েছে বিএইচটিপিএর পৃষ্ঠপোষকতায়।

১২.৩.৫ আইসিটি বিভাগের আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা ও নীতিমালা

আইসিটি-সম্পর্কিত আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে আসছে আইসিটি বিভাগ। আইসিটি বিভাগ গত পাঁচ বছরে যা কিছু প্রণয়ন করেছে তম্মধ্যে– জাতীয় আইসিটি নীতি ২০১৫, ২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, সরকারি ইমেইল নীতি ২০১৮, জাতীয় ডিজিটাল বাণিজ্য নীতি ২০১৮, সাইবার নিরাপত্তা কৌশল, বিএনডিএ নির্দেশিকা, জাতীয় উপাত্ত কেন্দ্রের (ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার) ব্যবহারকারী নীতি, নিরাপদ কোডিং নির্দেশিকা, জাতীয় বাংলা কিবোর্ড (বিডিএস-১৭৩৮: ২০১৮), বাংলার জন্য আন্তর্জাতিক ফোনেটিক অ্যালফাবেট (IPA) (বিডিএস ১৯৭০:২০১৯), বাংলা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ (BDSL) (বিডিএস ১৯৭১: ২০১৯), উদ্ভাবন নির্দেশিকা কৌশল ও নীতি, জাতীয় ব্লকচেইন কৌশল, জাতীয় রোবটিক্স কৌশল, বিগ ডেটা কৌশল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কৌশল, ইন্টারনেট অব থিংস (IOT) কৌশল, বাংলাদেশ মাইক্রোপ্রসেসর নকশা সক্ষমতা প্রসারের কৌশল, ই-সেবা কৌশল, ডিজিটাল সেবা প্রণয়ন নির্দেশিকা ও কৌশল, শিক্ষা প্রযুক্তি পোর্টাল কর্মকাঠামো, ই-লার্নিং বিধিমালা ও কৌশল, কোভিড-১৯ সুরক্ষা ও প্রতিকার নির্দেশিকা, ক্রিটিক্যাল থিংকিং ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা কৌশল, সমন্বিত সেবা সরবরাহ প্ল্যাটফর্ম কৌশল, সমন্বিত পেমেন্ট নীতি, গভর্নমেন্ট টু পার্সন কৌশল, ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম কৌশল, গবেষণা-উন্নয়ন যন্ত্র আমদানি নীতি, গবেষণা-উন্নয়ন কাঁচামাল আমদানি নীতি, গবেষণা-উন্নয়ন পণ্য মান নির্ধারণ কৌশল ও নীতি, আইপি নীতির সংশোধন, জাতীয় হটলাইন নীতি, ই-নথি নির্দেশিকা, ই-নথির জন্য ডিজিটাল সরকার আইনের সংশোধন, ই-নথি বাস্তবায়ন রোড ম্যাপ, সেক্রেটারিয়েট নির্দেশনা ও রুলস অব বিজনেস সংশোধন, ৪আইআর-ভিত্তিক ভবিষ্যৎ দক্ষতা নীতি, বাংলাদেশের জন্য কাজের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ধারণাগত কর্মকাঠামো প্রভৃতি অন্যতম।

বিভিন্ন নীতিনির্দেশিকা, যেমন–ডিজিটাল সার্টিফিকেট ইন্টারঅপারেবিলিটি নির্দেশিকা, পিকেআই অডিটিং গাইডলাইন এবং সার্টিফিকেশন প্র্যাকটিস স্টেটমেন্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে ডিজিটাল সিগনেচার প্রক্রিয়া সক্ষম করার জন্য। সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য একটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। সার্টিফাইং অথরিটির জন্য টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভিসেস নির্দেশিকা প্রস্তুত হয়েছিল ২০১৬ সালে। সাইবার নিরাপত্তা কৌশলগত নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। আরও তৈরি করা হয়েছে সাইবার অপরাধ ও তদন্ত বিধির খসড়া। এছাড়া আইসিটি বিভাগ কর্তৃক এআই, আইওটি, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে পরিচালিত সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের (BHTP-এর আওতার বাইরের গুলো) ঘোষণার জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত হয়েছে। 'মেড ইন বাংলাদেশ' নীতি খুব শিগগিরই চূড়ান্ত হতে যাচ্ছে।

১২.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য কৌশলগত নির্দেশনাসমূহ

সফলতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও ধারণার মুনাফাজনক ব্যবহার আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এসব ধারণা ও উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডা, আইসিটি অবকাঠামোয় বিনিয়োগের মাধ্যমে আইসিটি ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং বেসরকারি খাত দ্বারা এই মডেলগুলো বড় পরিসরে নিয়ে চাহিদা তৈরির জন্য নীতিমালা গ্রহণ করা। সার্বিক কৌশল হলো–(১) লাইন মন্ত্রণালয়গুলোর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ডিজিটাল উদ্ভাবনগুলোর জন্য সরকারকে স্মার্ট নেতৃত্বদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা, (২) বস্তুগত অবকাঠামোর জোগান জোরালো করা, (৩) মানব সম্পদ বিকাশ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি ও তা ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়া, (৪) প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সামাল দিতে আইসিটি উদ্ভাবনকে কাজে লাগাতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা, (৫) স্থানীয় বাজারকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে বৈশ্বিক সাফল্যের গল্পগাথা তৈরির লক্ষ্যে বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবনের পরিসর বাড়িয়ে আইসিটি শিল্পের ক্ষমতায়ন করা, (৬) ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলো থেকে পুনরায় নকশার ক্ষমতা অর্জন করা, যাতে বাংলাদেশের সব উৎপাদনকাজে বেশি সুফল পাওয়া যায় এবং উপাদান ও জ্বালানি চাহিদা কমার সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্যও কমে আসে, (৭) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্যতা কাজে লাগানো এবং এসডিজি অর্জনের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা নেয়া এবং (৮) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব থেকে সুবিধা নেয়া এবং এর বিকাশের সঙ্গে তাল মেলানো। যেসব ক্ষেত্রে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে কৌশলগত ব্যবস্থা গৃহীত হবে তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতির সুযোগসমূহ কাজে লাগানো;

২. ‘পাঁচ হেলিক্স’ কৌশল অবলম্বন;

৩. শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি;

৪. মেধাসম্পদ এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারকেন্দ্রিক স্টার্ট-আপের সফলতা সৃষ্টি করা’ এবং স্থানীয় সুযোগ কাজে লাগানোর সময় যুবকদের ক্ষমতায়ন করা;

৫. উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্র ও উদ্ভাবনে সফলতা সৃষ্টি করার জন্য পুনঃনকশা সক্ষমতা কাজে লাগানো;

৬. হাই-টেক পার্কগুলোকে ডিজিটাল, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবন অর্থনীতির কেন্দ্রে পরিণত করা;

৭. ৪আইআর উৎপাদনশীল জ্ঞান অর্জন করা;

৮. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নিতে ডিজিটাল অর্থনীতি;

৯. ব্যাপক স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সেবা সরবরাহের জন্য আইসিটি;

১০. বৈশ্বিক ডিজিটাল ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের সমতাভিত্তিক ও পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

১১. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতিকে কাজে লাগানো;

১২. কার্যকারিতা ও দক্ষতা বাড়ানো এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহ দেয়া;

১৩. জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সুবিধা আদায়ের জন্য সংস্কৃতি ও জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা বিনির্মাণ; এবং

১৪. কোভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে উত্তরণে আইসিটির শক্তিকে কাজে লাগানো। এছাড়া স্বাস্থ্য সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও আইসিটির ক্ষমতা কাজে লাগানো।

এই কৌশলগত ক্ষেত্রগুলো আরও ব্যাখ্যা করা হলো। এর সঙ্গে প্রস্তাবিত নীতি, প্রোগ্রাম ক্রিয়াকলাপ এবং সূচকসমূহ উল্লেখ করা হলো।

১২.৪.১ লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতির সুযোগ কাজে লাগানো

প্রত্যেক লাইন মন্ত্রণালয়কে যার যার মিশন অর্জনে এবং স্মার্ট ও পার্সোনালাইজড সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল উদ্ভাবনকে কৌশলগতভাবে কাজে লাগাতে হবে। স্থানীয় আরঅ্যান্ডডি, উদ্ভাবন স্টার্টআপ ও শিল্পকে সহায়তাকারী উদীয়মান ডিজিটাল উদ্ভাবনকে কাজে লাগানোর বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উচিত কানেক্টিভিটি ও সড়ক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তি কাজে লাগানো। যানবাহনে ও রাস্তার পাশে সেন্সর বসানো এবং গাড়িচালকদের গতিবিধি পরিবীক্ষণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করা যেন সড়ক দুর্ঘটনা কমানো যায় এবং ট্র্যাফিক পরিস্থিতি উন্নত করা যায়। মূলত প্রতিটি লাইন মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল দুনিয়া (স্পেস) নিয়ে অনেক সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু মিশনের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবনগুলো অন্য আরও কাজে আসে। এগুলো এসডিজির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক, যা জ্বালানিশক্তি, নির্গমণ এবং পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কোভিড-১৯-এর প্রভাব উপশমে লাইন মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হতে পারে আইসিটি। কোভিড পরিস্থিতির জবাবে লাইন মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য মূল হস্তক্ষেপের জায়গা অথবা কার্যসূচি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

১২.৪.২ পাঁচ হেলিক্স

বাস্তবায়নকারী লাইন মন্ত্রণালয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট বিকাশমান ডিজিটাল সুবিধাগুলোর সুযোগ গ্রহণের জন্য মনোযোগ দিতে হবে পাঁচ-হেলিক্স পদ্ধতির দিকে, যা হলো–(১) সরকার, (২) শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থাসমূহ, (৩) শিল্প, (৪) স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা এবং (৫) বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি এটি স্থানীয় ইকোসিস্টেমের ডিজিটাল রূপান্তরের প্রসার বাড়াবে। তবে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে ‘একাধিক হেলিক্স’ পদ্ধতিতে নিহিত চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কেও সচেতন হওয়া দরকার। এই জাতীয় বহু-অংশীদার প্রক্রিয়াগুলির সংগঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি বেশ জটিল এবং প্রায়শই তা রোডম্যাপ অনুসরণ পূর্বক নির্ধারিত দায় দায়িত্ব মেনে আরোপিত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতি কৌশল রূপরেখা সারণি ১২.১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.১: লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক ডিজিটাল অর্থনীতি কৌশল রূপরেখা

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্যসমূহ	পরিপূরক কর্মকাণ্ড
বৈশ্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা ও লাইন মন্ত্রণালয়-নির্ধারিত বিকাশমান ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলো নিয়ে পরিকল্পনা করা	প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সংখ্যা অনুসৃত এবং সম্ভাবনার সংখ্যা চিহ্নিত।	ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত আমদানি পণ্য ক্রয়ে বিক্রেতার চালিত প্রক্রিয়ায় আরও কিছু বিষয় সংযোজন করা প্রয়োজন। এতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিবেচনায় স্থানীয় মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করতে, একাডেমিয়াকে শক্তিশালীকরণে এবং উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপস ও শিল্পকে উৎসাহ দেয়ার জন্য স্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়নকে সমর্থন দেয়া।
মূল মিশন লক্ষ্য সামাল দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় নির্ধারিত ডিজিটাল কর্মসূচি উন্নয়ন করা		
লাইন মন্ত্রণালয়-নির্ধারিত ডিজিটাল কর্মসূচিতে সমন্বয় এবং দেশজুড়ে কর্মসূচি গ্রহণ	গবেষণা-উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় মূল্য সংযোজন।	
ডিজিটাল সুযোগ ব্যবহারের জন্য গবেষণা-উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্য চিহ্নিত করা এবং তা বজায় রাখতে শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতাকে সমর্থন দেয়া		
স্থানীয় মূল্য সংযোজনের সুযোগ বাড়াতে ও বাস্তবায়নের ঝুঁকি কমাতে শিল্প-শিক্ষার অংশীদারত্বের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের একটি ধারা গ্রহণ করা	সরকার, শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে সহযোগিতা।	
সরকারের প্রযুক্তিগত প্রয়োজন পূরণে ও স্থানীয় ডিজিটাল উদ্ভাবন শিল্পে সহায়তা দিতে প্রকৌশলগত কর্মসূচি পুনর্নকশা করা		

এটা বিবেচনায় আনতে হবে যে উচ্চতর ডিজিটাল প্রযুক্তি অবলম্বন ও প্রসারণের অর্থ হলো ট্রায়াল অ্যান্ড এরর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া। নতুন নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির সুযোগসমূহ ব্যবহারে তাৎপর্যপূর্ণভাবে অবদান রাখতে, সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ রাখা উচিত। লাইন মন্ত্রণালয়গুলোর নির্ধারিত মিশন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ভবিষ্যৎ ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন একাডেমিক গবেষণা ও উন্নয়ন, সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, নিজেদের সামর্থ্য কাজে লাগানো, পরীক্ষামূলকভাবে ঝুঁকি গ্রহণ এবং সর্বোপরি এগুলো কোন প্রেক্ষাপটে কী কাজ করে তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

১২.৪.৩ শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা

ডিজিটাল জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সুবিধা কাজে লাগাতে শিল্প শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ শিক্ষা মহলে ব্যাপক প্রচলিত একটি ধারণা হলো, শিক্ষা খাতের সাধারণ গবেষণা ভবিষ্যতে শিল্প উদ্ভাবনে সক্ষম। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে সরকারের দায়িত্ব হলো প্রাথমিক গবেষণার তহবিল জোগাড় করা। অন্যদিকে শিল্প আশা করে শিক্ষা ব্যবস্থা এমন মানব সম্পদ সরবরাহ করবে, যারা অনতিবিলম্বে উৎপাদন কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত। যেহেতু বাংলাদেশ প্রযুক্তি আমদানিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে হাঁটছে, তাই শিল্পে খুবই সামান্য শিক্ষা ও উদ্ভাবন কর্মসূচি রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাথমিক গবেষণা থেকে শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবনের রৈখিক মডেল অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এমনকি তা শিল্প ও শিক্ষার মধ্যে অর্থবহ সংযোগ স্থাপনে অনেক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এভাবে শিক্ষা খাতকে উন্নয়ন গবেষণায় ভবিষ্যৎ বিবেচনা, অভিযোজন ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই অন্তর্ভুক্তি ঘটবে সরকার ও শিল্পের জন্য বিদ্যমান পণ্য ও সেবা পুনর্নকশার দ্বারা। শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সংযোগ ঘটানোর কার্যক্রম সারণি ১২.২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.২: শিল্প, শিক্ষা ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য কর্মকাণ্ড

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্যসমূহ	পরিপূরক কর্মকাণ্ড
পণ্য ও প্রক্রিয়াকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনে শিল্পকে পুনর্নকশায় উদ্বুদ্ধ করা।	ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলো কাজে লাগিয়ে পুনরায় ডিজাইন করা পণ্য এবং প্রক্রিয়াগুলোর সংখ্যা এবং এর কারণে এমভিএ ও সেবা মানে বৃদ্ধি।	যথাযথ লক্ষ্যে মনোযোগ বাড়াতে ও অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহে পর্যাপ্ত গবেষণা দরকার।
যে খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহ কাজে লাগিয়ে এমভিএ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, শিল্পকে সেইসব পণ্য উৎপাদন শুরুর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।		
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ঘিরে উদ্ভাবনী সমাধান সৃষ্টিতে শিল্পকে আগ্রহী করা।	ডিজিটাল কনটেন্টসহ নতুন পণ্য প্রবর্তন করা হচ্ছে।	অর্থবহ সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রকাশনা এবং মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ভালো ব্যবস্থাপনা হতে হবে।
ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে শিল্পকে নমনীয় ও বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন অবলম্বনে উৎসাহী করা; সরবরাহ শৃঙ্খল কানেক্টিভিটি, পণ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ও লজিস্টিকস; কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।	পেটেন্ট ও প্রকাশনা উৎপাদন হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক পেটেন্টের ওপর রয়্যালটি অর্জিত হচ্ছে।	
সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও নিশ্চিত পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে চক্র-অর্থনীতি (সার্কুলার ইকোনমি) অনুসরণে শিল্পকে উৎসাহিত করা; পণ্য ও যন্ত্রাংশ পুনরুৎপাদন, পুনর্নির্মাণ এবং পুনরায় ব্যবহার; সেবা হিসেবে পণ্য উৎপাদন, মডেল শেয়ারিং এবং ভোগের ধরনে পরিবর্তন।		
উপরোক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিষয়গুলো শনাক্ত করতে প্রণোদনা দেয়া এবং তা অনুসরণে শিক্ষাকে (একাডেমিয়া) যুক্ত করা।	পেটেন্ট ব্যবহার থেকে এমভিএ	

এই অংশীদারত্ব থেকে অর্থবহ ফলাফল পেতে একাডেমিয়াকে পেটেন্ট উপযোগী ও প্রকাশযোগ্য জ্ঞান তৈরির দায়িত্ব দিতে হবে। আর শিল্পকে সক্ষম করতে হবে সেই জ্ঞানকে মুনাফাযোগ্য উদ্যোগের জন্য সক্ষম করে তুলতে। সমন্বিত মনোযোগের অনুপস্থিতিতে সরকারি তহবিল ব্যবহার করে বেসরকারি খাতচালিত গবেষণা ও উন্নয়ন সক্ষমতার মডেল সৃষ্টি না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পরে।

১২.৪.৪ মেধাসম্পদ এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারকেন্দ্রিক স্টার্ট-আপের সফলতা সৃষ্টি করা এবং স্থানীয় সুযোগ কাজে লাগানোর সময় যুবকদের ক্ষমতায়ন

স্টার্টআপ থেকে প্রবৃদ্ধির অসীম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ধরণের প্রযুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতার হার ৯০ শতাংশ, যা একটি উদ্বেগের বিষয়। একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের আইডিয়া ও শক্তি যত বড়ই হোক না কেন, তাকে লোকসানের মধ্য দিয়েই উদ্ভাবনী ধারণাটি বিপণন শুরু করতে হয়। এই লোকসানকে মুনাফায় পরিণত করতে অবিরত গবেষণা ও উন্নয়ন চালিয়ে যেতে হয় উদ্ভাবনটিকে আরও উন্নত ও সাশ্রয়ী করে তুলতে। সফলতার কৌশলে গুরুত্ব দেয়া উচিত অব্যাহত গবেষণা-উন্নয়ন এবং মেধাসম্পদ ও বৈশিষ্ট্যের পোর্টফোলিও সৃষ্টির দিকে। ডিজিটাল উদ্ভাবন সফলতার গল্প সৃষ্টিতে আরও গুরুত্ব দিতে হবে গুণগত মান উন্নয়ন এবং খরচ কমানোর দিকে। স্টার্টআপ সফলতার উদাহরণ বাড়াতে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে সারণি ১২.৩ এ।

সারণি ১২.৩: স্টার্ট-আপ সফলতার উদাহরণ বাড়াতে কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহ

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্যসমূহ	পরিপূরক কর্মকাণ্ড
পেটেন্ট তৈরি ও মেধাসম্পদ ভিত্তি প্রসারের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রণোদনা দেয়া	স্টার্ট-আপ কর্তৃক আবেদন ও পেটেন্ট গ্রহণ করা হচ্ছে এবং পণ্য ও প্রসেসে একীভূত হচ্ছে।	স্টার্ট-আপ সাফল্যের গল্প তৈরিতে আইএ/এপির ওপর মনোযোগ বাড়ানো হলে শিল্প-একাডেমিয়ার ব্যবধানসহ একাধিক সমস্যা মোকাবিলা করা হবে।
ডিজিটাল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আগ্রাসী দরনির্ধারণ-ভিত্তিক স্টার্ট-আপের প্রতিযোগিতা নিরুৎসাহিত করা	ডিজিটাল স্টার্ট-আপ স্পেসে একচেটিয়াকরণে আগ্রাসী দরনির্ধারণ সীমিত রাখতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।	
মেধাসম্পদ-ভিত্তিক স্টার্ট-আপ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা জন্য একাডেমিক গবেষণা-উন্নয়নকে প্রতিপালন করা	একাডেমিক ও আরঅ্যান্ডডি থেকে সৃষ্ট স্টার্ট-আপদের আইএ/এপি পোর্টফোলিও	
মেধাসম্পদ (আইএ) পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এবং এটিকে কাজে লাগানোর জন্য ও তহবিল উত্তোলনে সচেতনতা সৃষ্টি ও স্টার্ট-আপগুলোকে সহায়তা দেয়া	স্টার্টআপদের মূল্যায়ন ও তহবিল উত্তোলনে আইএ ও পেটেন্টের ভূমিকা।	

তরুণদের মধ্যে ডিজিটাল স্টার্টআপ নিয়ে বেশি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে। স্মার্টফোন অ্যাপ ও মোবাইল কানেক্টিভিটি ঘিরে নতুন আইডিয়া সৃষ্টি করা তরুণদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে এই আইডিয়াগুলো শুরুতেই মুনাফা দিতে শুরু করে না, যার ফলে তহবিলের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই তরুণদের মেধাস্বত্ব/মেধাসম্পদ (আইএ/আইপি) ভিত্তি ক্ষমতায়ন করা দরকার, যেন এই আইডিয়াগুলোকে লাভজনক উদ্যোগে পরিণত করা যায়। অন্যথায় হলে, ভর্তুকির মাধ্যমে এই আইডিয়াগুলো বাস্তবায়ন চেষ্টায় সময় এবং অর্থ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। চূড়ান্তভাবে তা বড় ধরণের ব্যর্থতা ও হতাশায় পর্যবসিত হতে পারে।

১২.৪.৫ হাই-টেক যন্ত্র ও উদ্ভাবনে সফলতা সৃষ্টি করার জন্য পুনর্নকশা সক্ষমতা কাজে লাগানো

উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যে শ্রমের গুরুত্ব দ্রুত কমে আসছে, এতে শ্রমভিত্তিক উৎপাদন মূল্য সংযোজন (ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু এ্যাডেড–এমভিএ) কৌশল দুর্বল হচ্ছে। অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির সুবাদে কম খরচে বিদ্যমান উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যের গুণগত মান বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুনর্নকশার আইডিয়ার মাধ্যমে বর্ধিষ্ণু এমভিএ'র জন্য এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। উপরন্তু এই পদ্ধতির প্রক্রিয়া (প্রসেস) পুনর্নকশার ক্ষেত্রেও আলোকপাত করা উচিত। উচ্চপ্রযুক্তির উৎপাদনশীল জ্ঞান সরবরাহ বৃদ্ধি করবে এই পুনর্নকশা সক্ষমতা অর্জন। এই কৌশল উচ্চপ্রযুক্তির পেটেন্ট পোর্টফোলিও বাড়াতে শুরু করবে। এছাড়া শিল্পের উদ্ভাবন প্রয়োজনীয়তায় সমর্থনের জন্য শিল্প গবেষণা-উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংযোগ এর সুযোগ উন্মোচন শুরু করবে।

উচ্চপ্রযুক্তিতে এমভিএ বাড়াতে বাংলাদেশের অবশ্যই উচিত পেটেন্ট পোর্টফোলিও বিনির্মাণ শুরু করা। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রথম সারির ১০টি অর্থনীতির হাতে রয়েছে ৯০ শতাংশ পেটেন্ট এবং ৭০ শতাংশ রপ্তানি। বৈশ্বিক উচ্চ ডিজিটাল প্রযুক্তি ঘরানার ৯১ শতাংশ সমন্বিতভাবে দখলে রয়েছে মাত্র ১০টি দেশের কাছে। পুনর্নকশা সক্ষমতা অর্জন ও কাজে লাগানোর জন্য কর্মসূচি সারণি ১২.৪ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১২.৪: পুনর্নকশা সক্ষমতা অর্জন ও কাজে লাগানোর জন্য কর্মসূচি

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্যসমূহ	পরিপূরক কর্মকাণ্ড
পুনর্নকশা আইডিয়ার মাধ্যমে কর ও অন্য প্রণোদনার সঙ্গে এমভিএর সংযুক্তি	পুনর্নকশার মাধ্যমে এমভিএ প্রবৃদ্ধি	সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহের অর্জনযোগ্য ও আকর্ষণীয় মান নির্ধারণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত প্রেক্ষাপট গবেষণা করা দরকার
ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহ কাজে লাগিয়ে পণ্যের পুনর্নকশার জন্য গবেষণা-উন্নয়নকে সমর্থন দেয়া	পেটেন্টসমূহ	
পণ্যের পুনর্নকশায় সমর্থন দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহের অভিযোজন ও অগ্রগতির জন্য গবেষণা-উন্নয়নকে সমর্থন দেয়া	পেটেন্ট ও প্রকাশনাসমূহ	
সেইসব উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য উৎপাদনে অবকাঠামো সহায়তা ও প্রণোদনা দেয়া, যেই পণ্য আইডিয়ার মাধ্যমে এমভিএ বাড়ানোর জন্য পুনর্নকশার উপযুক্ত	নতুন করে প্রবর্তিত উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যসমূহের সংখ্যা	
বিদ্যমান উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য পুনর্নকশার সক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্য নতুন পণ্য উদ্ভাবনে গবেষণা-উন্নয়নকে সমর্থন দেয়া	বাজারে প্রবর্তিত উদ্ভাবনের সংখ্যা	

১২.৪.৬ হাই-টেক পার্কগুলোকে ডিজিটাল, জ্ঞানভিত্তিক ও উদ্ভাবন অর্থনীতির কেন্দ্রে পরিণত করা

উচ্চপ্রযুক্তির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা দিতে বাংলাদেশ সরকার বিশেষায়িত শিল্প পার্ক প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। বর্তমানে ২৮টি সরকারি হাই-টেক ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক এবং ১২টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি) নির্মাণকাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই পার্কগুলোর কয়েকটিতে নানা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। অধিকন্তু সরকার চুয়েটে একটি উচ্চপ্রযুক্তির ইনকিউবেটর উন্নয়ন কাজ করে আসছে। বিশেষভাবে উচ্চপ্রযুক্তির উৎপাদন কাজে যাত্রা শুরু হয়েছে শ্রমনির্ভর মূল্য সংযোজনে প্রাথমিকভাবে আমদানি করা যন্ত্রাংশ সংযোজনের মাধ্যমে। কিন্তু এই মূল্যসংযোজন এখনো নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। প্রায়ই তা চূড়ান্ত উৎপাদিত পণ্যের খরচের ১০ শতাংশেরও কম হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে সংযোজিত ও আমদানিকৃত উচ্চপ্রযুক্তির পণ্যে কর পার্থক্য ৫৭ শতাংশ পর্যন্ত। এজন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকারীরা আমদানি বিকল্প পণ্য স্থানীয়ভাবে সংযোজন করে সফলতা পাচ্ছেন। কিন্তু এত কম মূল্য সংযোজন দেশের জন্য সন্তোষজনক নয়, আবার রপ্তানির জন্য প্রতিযোগিতামূলক নয়। নামমাত্র মূল্য সংযোজনের কারণে ১০% প্রণোদনা পাওয়ার পরও উৎপাদনকারীরা দেশে সংযোজিত তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। মূল্য সংযোজন বাড়ানোর লক্ষ্যে যন্ত্রাংশ তৈরির উদ্যোগ প্রায়ই আকর্ষণীয় দর প্রস্তাবনার অফার করে না। উৎপাদনের পরিমাণ, সুযোগ ও মেধাস্বত্ব (আইপি) প্রভাবের কারণে উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে তৈরি করার চেয়ে আমদানি করাই সাশ্রয়ী বলে জানা যায়। এই সমস্যা সমাধানের কৌশল হিসেবে হাই-টেক পার্কগুলোর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার, মধ্যস্থ পণ্য ও সেবা সরবরাহকারী এবং স্টার্ট-আপ উদ্যোগসহ সংশ্লিষ্টদের যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। এতে বাংলাদেশের উদ্ভাবন অর্থনীতির নিউক্লিয়াসে পরিণত হবে হাই-টেক পার্কগুলো। উদাহরণস্বরূপ, সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন সেবাদাতারা শ্রমের পাশাপাশি তাদের আইডিয়া দিয়ে উচ্চপ্রযুক্তির প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূল্য সংযোজনের জন্য তাদের পণ্য পুনর্নকশার সেবা সরবরাহ করতে পারে। হাই-টেক পার্কগুলোকে উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত করার কার্যক্রম সারণি ১২.৫ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১২.৫: হাইটেক পার্কগুলোকে উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত করার প্রোগ্রাম কার্যক্রম

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	সূচক/লক্ষ্যসমূহ
উচ্চপ্রযুক্তির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানভিত্তিক ইনপুট সরবরাহ করতে ইকোসিস্টেমকে প্রণোদনা দেয়া।	সহযোগিতার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন
উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য সংযোজনকারীদের স্থানীয়ভাবে নকশাসেবা ও আইডিয়া সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের পণ্য পুনর্নকশার জন্য উৎসাহ দেয়া	পুনর্নকশা পর্যায়ে থাকা পণ্য ও আবেদিত পেটেন্টের সংখ্যা
উচ্চপ্রযুক্তির পণ্য উদ্ভাবন ও হাই-টেক পার্কসমূহে স্থানান্তরিত হতে স্টার্ট-আপসমূহকে সমর্থন দেয়া	হাই-টেক পার্কসমূহে স্থানান্তরিত স্টার্ট-আপসমূহের সংখ্যা
উচ্চপ্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান থেকে পুনর্নকশার অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা-উন্নয়নের সহায়তা প্রস্তাব দেয়া	গবেষণা-উন্নয়ন প্রকল্প, পেটেন্টসমূহ, প্রকাশনাসমূহ
হাই-টেক পার্কসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত কোম্পানি ও বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক ইনকিউবেটরের সহযোগিতামূলক প্রকল্পগুলোকে সহায়তা দেয়া	সহযোগিতার সংখ্যা
হাই-টেক পার্কসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত কোম্পানি, আইসিটি শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সহযোগিতাকে সমর্থন দেয়া, যেন স্থানীয় শিল্প স্ব স্ব লাইন মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সফল হতে পারে	উদ্ভাবন, স্থানীয় উৎপাদন ও ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা
বাংলাদেশি হাই-টেক পার্কসমূহে দেশি ও বিদেশি কোম্পনিগুলোকে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ পণ্য তৈরিতে উৎসাহ দেয়া। বাংলাদেশকে ডিজিটাল ডিভাইসের জন্য বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র (হাব) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তার মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়ন।	হাই-টেক পার্কসমূহে কোম্পানির সংখ্যা
আইটি/আইটিইএস কোম্পানিগুলোকে হাই-টেক পার্কসমূহে স্বল্প খরচে স্থাবর সম্পদ ক্রয় ও সাশ্রয়ী অফিস স্পেস বরাদ্দসহ কম সুদে আর্থিক সহায়তা সরবারাহ করা।	যে কোম্পানিগুলো আর্থিক সহায়তা ও হাই-টেক পার্কসমূহে কম খরচে জায়গা বরাদ্দ পেয়েছে তাদের সংখ্যা

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও উৎপাদনশীল জ্ঞানের ভিত্তি বিনির্মাণে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, বিশেষ করে প্রযুক্তিখাতে। এটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন করছে ও উদ্ভাবন অর্থনীতিকে কাজে লাগাচ্ছে। যেহেতু জটিল পণ্য উদ্ভাবন ও তৈরি করা এখনো সুদূর-স্বপ্ন, তাই বাংলাদেশের প্রয়োজন সর্বোত্তম উৎপাদনশীল জ্ঞান অর্জন করতে থাকা। এর উদ্দেশ্য হলো যেন দেশের যুবকরা উদীয়মান বিশ্ব শ্রমবাজারে অংশ নিতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে দক্ষতার চাহিদা ক্রমাগতভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (AI) কেন্দ্র করে বিনির্মাণ করা হবে।

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রচলিত শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করা হলে তা উচ্চ-পর্যায়ের উৎপাদনশীল জ্ঞান অর্জনের দিকে পরিচালিত হবে না। বরং জটিল পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত থেকে কাজ করে শেখা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সেরা সুযোগ বলে মনে করা হয়। এই বাস্তবতা প্রায়ই সমস্যা তৈরি করে। আর এ অচলাবস্থা থেকে উত্তরণের পন্থা খুঁজে পাওয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই অন্য বিকল্পগুলো নিয়ে ভাবা দরকার। এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে অসীম সম্ভাবনার উৎপাদনশীল এআই নিয়ে জ্ঞান অর্জন করা। এর উদাহরণ হতে পারে মনুষ্যবিহীন আকাশযানের (UAV) দূর নিয়ন্ত্রণ, বা কৃষিকাজ এবং স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে শ্রম উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সফ্টওয়্যার-নির্ভর উদ্ভাবনগুলো। উৎপাদনশীল জ্ঞান সৃষ্টির জন্য কার্যক্রমগুলো সারণি ১২.৬ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.৬: উৎপাদনশীল জ্ঞান সৃষ্টির জন্য প্রোগ্রাম কার্যক্রমসমূহ

নীতিমালা ও প্রোগ্রাম কার্যক্রম	ফলাফল
সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (PPP) ও ৪আইআর-এর প্রযুক্তিগুলোর দিকে মনোনিবেশ করে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা। এর উদ্দেশ্য হবে সচেতনতা ও বোধগম্যতা তৈরি, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, অভিযোজন এবং আরও অগ্রগতিকে সহায়তা, মেধাসম্পদ বিনির্মাণ এবং জ্ঞানের স্থানান্তরকে সহায়তা করা।	১. বিভিন্ন খাতে ৪আইআর-এর সম্ভাবনা সম্পর্কে বাস্তব জীবনের সচেতনতা ২. গবেষণা-ও-উন্নয়ন সহায়তা স্টার্ট-আপগুলোকে তাদের আইডিয়া বাজারজাতকরণ সহজ করবে ৩. ৪আইআর উৎপাদনশীল জ্ঞানের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে ৪. আইটি কোম্পানিগুলো 4IR R&D গ্রহণের জন্য সুবিধাটির (ফ্যাসিলিটি) ভালো ব্যবহার করবে
4IR উদ্ভাবনের চাহিদা ও সরবরাহের সক্ষমতা তৈরি করার জন্য মনোনিবেশ করতে হবে নির্ধারিত 'ইউজ কেইসেস' উন্নয়ন ও বৈশ্বিক উত্তম চর্চাগুলোর নথিকরণে। পাশাপাশি গুরুত্ব দিতে হবে এগুলোর বিনির্মাণ, অবলম্বন ও প্রচারের বিষয়ে।	4IR ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সুবিধাগুলোর স্পষ্টতা এবং বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলনগুলো স্থানীয় 4IR উদ্ভাবনী বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা উভয়কেই জোরদার করবে।

১২.৪.৭ ব্যাপক স্বচ্ছতা, সুশাসন ও সেবা সরবরাহের জন্য আইসিটি

বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকারি সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারে অগ্রগতি লাভ করেছে (সারণি ১২.৭)। ডেটা অ্যানালিটিক্সসহ নতুন প্রযুক্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা উচিত। বক্স ১২.১ এ আরও অগ্রগতি প্রয়োজন এমন ক্ষেত্রেসমূহ উল্লেখ করা হলো:

সারণি ১২.৭: বাংলাদেশে ই-সরকারের উন্নয়ন পর্যায়ের বিবর্তন

আলোকপাতের ক্ষেত্র			গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মেয়াদে ই-সরকার বিনির্মাণ পর্যায়সমূহ			
	২০১৮ পর্যন্ত		২০২০-২০২৫		২০৩১-২০৪১	
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়-সংক্রান্ত বিভাগের তৈরি ই-সরকার উন্নয়ন সূচকে অবস্থান						
সূচক	স্কোর (০-১)	র‍্যাংক /১৯৩	স্কোর (০-১)	র‍্যাংক /৯৩	স্কোর (০-১)	র‍্যাংক /৯৩
ই-সরকার উন্নয়ন সূচক	০.৪৮৬২	১১৫	০.৬৫	৮০	০.৭৪	৪০
অনলাইন সেবার অংশ	০.৭৮৪৭	-	০.৮৬	-	০.৯০	-
টেলিকম: অবকাঠামো উপাদান	০.১৯৭৬	-	০.৫৪	-	০.৭	-
মানব পুঁজি উপাদান	০.৪৭৬৩	-	০.৭৩	-	০.৮৫	-

বক্স ১২.১: আইসিটির জন্য আরও উন্নতি অর্জনের ক্ষেত্রগুলো

- অপর্যাপ্ত দক্ষ সংস্থানসমূহ (রিসোর্স): এটি সময়ে সময়ে একক বৃহত্তম বাঁধা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সংস্থা ও নাগরিকদের মধ্যে বহুস্তরে দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত:
  - বুনিয়াদি আইসিটি ও নাগরিকদের, বিশেষ করে প্রবীণদের মাঝে স্মার্টফোন সাক্ষরতা অর্জন করা
  - ডিজিটাল সেবা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
  - ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া রূপান্তর
  - সুরক্ষিত উপায়ে ডেটা সেন্টার ও আইসিটি সিস্টেম পরিচালনা
  - অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সিস্টেমের মধ্যে সংহতকরণ, আন্তঃসংযুক্তি (ইন্টারঅপারেবিলিটি) এবং তথ্য বিনিময়
  - কৌশলগত আইসিটি পরিচালনা ও দূরদর্শিতা।
- নাগরিকদের জন্য অপ্রতুল প্রভাব: কয়েকটি ডিজিটাল সেবা এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো সাধারণত প্রচলিত কাগজভিত্তিক ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিচালিত হয় (ফলে সেবাদানে খরচ ও জটিলতা বৃদ্ধি পায়, যদিও কিছু ব্যবহারকারী উপকারিতা পাচ্ছে)।
- আইসিটি অনুলিপি (ডুপলিকেশন): সরকারি সংস্থাগুলো চলছে পৃথক পৃথক ডেটা সেন্টার, আইসিটি স্থাপত্য (অর্কিটেকচার) ও সফটওয়্যার উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। এতে একই ধরণের (ডুপলিকেটেড) প্রয়োজন ও বিনিয়োগ দরকার হচ্ছে।
- আন্তঃব্যবহারের (ইন্টারঅপারেবিলিটির) অভাব: সাধারণভাবে (আইটি) সিস্টেমগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উন্নয়ন করা হয়েছে, তাই এগুলোকে সংহত করা কঠিন। ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার এবং ই-গভর্নমেন্ট ইন্টারঅপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কে আমাদের মাঝে সচেতনতা কম। যারা এ সম্পর্কে অবগত, তারা আবার অনিশ্চিত যে তাদের মন্ত্রণালয়গুলো কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে।
- বিদ্যমান শেয়ারড সেবার অপর্যাপ্ত সক্ষমতা: বিসিসি এরই মধ্যে শেয়ারড সার্ভিস (যেমন জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে হোস্টিং, কম্পিউটার ইমার্জেন্সি ইনসিডেন্ট রেসপন্স) সরবরাহ করছে। এই সেবাগুলো প্রশংসার দাবিদার, তবে এটি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার সক্ষমতা আমাদের নেই।
- উপাত্ত সুরক্ষা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সাইবার সুরক্ষা: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক সাইবার সুরক্ষা চ্যালেঞ্জ নিয়ে অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সরকারি সংস্থাগুলো জনপ্রশাসনকে অব্যাহত ও বিকাশমান সাইবার হুমকি থেকে নিরাপদ করতে মনোযোগী হয়েছে। তবে তা করতে দক্ষতা, প্রক্রিয়া ও সংস্থানের অভাব রয়েছে।

১২.৪.৮ গ্লোবাল ডিজিটাল ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের সমতা ও ন্যায্য শেয়ার নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণমূলক দুর্বলতা এবং অ্যান্টিট্রাস্ট ও উপাত্ত গোপনীয়তার বিষয় মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ডিজিটালাইজেশনের অগ্রগতির সুবাদে স্থানীয় ব্যবসাও পর্যায়ক্রমে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দখলে চলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তদুপরি তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন নাগরিকদের নাজুক পরিস্থিতিতে ফেলছে। তাদের বৈষম্যের শিকার ও বিড়ম্বনায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। পরিণামে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং একই পর্যায়ের মানুষের মধ্যে বর্ধিষ্ণু অসমতা তৈরি হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মোট বিজ্ঞাপনের বাজারের আকার ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানা গেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কাঙ্খিত ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য ফেসবুক ও গুগলের মতো প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল বিপণনের জন্য প্রতিবছর প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে টিভি বা বিলবোর্ডের মতো প্রচলিত প্ল্যাটফর্মের চেয়ে অনলাইন বিজ্ঞাপন অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে স্মার্টফোনের দ্রুত সম্প্রসারণ, কাঙ্খিত কনটেন্ট-সংবলিত ওয়েবসাইটগুলোয় সম্ভাব্য ক্রেতার ঘনঘন পরিদর্শন এবং অ্যালগরিদমগুলোর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা। অনলাইন বিজ্ঞাপনের বিশ্বব্যাপী বাজারে কার্যত একচেটিয়া রাজত্ব করছে দুটি প্রতিষ্ঠান–গুগল ও ফেসবুক। এই ধরণের পরিস্থিতি অতীতে ছিল না। এই ধরণের একচেটিয়া কর্তৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। তারা কীভাবে সফল হয়েছিল? ব্যাপক বাজার দখল নিয়ে এই কোম্পানিগুলো কি বাজারব্যবস্থার অপব্যবহার করছে এবং ব্যবহারকারীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করছে? বিভিন্ন দেশ কীভাবে বাজার শক্তি, অ্যান্টিট্রাস্ট ও প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত উদ্বেগ প্রকাশ করছে?

অন্যদিকে আইসিটি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে দেশের সাম্প্রতিক অগ্রগতি মূলত সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে পৌঁছেছে। সম্প্রতি স্মার্টফোনের স্থানীয় সংযোজনের সুবাদেও খুব বেশি পরিবর্তন আসছে না। কেননা স্থানীয় মূল্য সংযোজন ১০ শতাংশের নিচে। যেহেতু ডিজিটাল ডিভাইস ও সফটওয়্যার উদ্ভাবনে শ্রমভিত্তিক মান সংযোজন

১০ শতাংশের চেয়ে কম, তাই পেটেন্টকৃত আইডিয়া-সংবলিত শক্তিশালী পোর্টফোলিও থাকা সংস্থা ও দেশগুলো ডিজিটাল পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্য সংযোজনে কর্তৃত্ব করছে। ইউএনআইডিওর সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, '১০টি সম্মুখ সারির অর্থনীতি পেটেন্টের ৯১ শতাংশ, রপ্তানির ৭০ শতাংশ এবং নতুন প্রযুক্তি আমদানির ৪৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।' ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলোয় কার্যত কোনো পেটেন্ট পোর্টফোলিও না থাকায় বাংলাদেশের ডিজিটাল এজেন্ডা প্রাথমিকভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রিত। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে বাংলাদেশকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত কার্যক্রমগুলো সারণি ১২.৮ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি ১২.৮: বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারিত্ব বাড়ানোর জন্য প্রোগ্রাম কার্যক্রম

নীতি এবং প্রোগ্রাম কার্যক্রম	ফলাফল
ডিজিটাল দুনিয়ায় নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাধারণ ডেটা সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিধির সঙ্গে সংগতি রেখে উপাত্ত সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা হালনাগাদকরণ	নাগরিক, করপোরেট ও সরকারের উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।
নিয়ন্ত্রক দুর্বলতাগুলো মোকাবিলা এবং অ্যান্টিট্রাস্ট ও উপাত্ত গোপনীয়তার সমস্যাগুলো মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারকরণ।	বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোকে প্রতিযোগিতাবিরোধী আচরণ থেকে প্রতিহত করা হয়েছে এবং স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে ডিজিটাল বিশ্বে বড় হওয়ার সুযোগ দেয়া হচ্ছে।
ডিজিটাল প্রযুক্তি বিশ্বে পেটেন্ট পোর্টফোলিও তৈরিতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ করা।	বাংলাদেশি সংস্থাসমূহ পেটেন্ট আইডিয়াগুলো কাজে লাগিয়ে তাদের মূল্য সংযোজন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা শুরু করে
বিশ্ববাজারে স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রচার করা	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং বিপিওর জন্য আইসিটি গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করা

১২.৪.৯ দারিদ্র্য কমানোর জন্য আইসিটি ব্যবহার করা

ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (ডিএফএস) লেনদেনের ব্যয় কমিয়ে আর্থিক সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে বহু দরিদ্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে এ সেবা পৌঁছে যাচ্ছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে আনুষ্ঠানিক আর্থিক খাত থেকে বাদ পড়ে ছিল। সামাজিক সুরক্ষা কল্যাণ ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র ও নাজুক গোষ্ঠীগুলোর কাছে পৌঁছাতে বাংলাদেশ মোবাইলে আর্থিক পরিষেবা ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশে মোবাইল সেলুলার ফোন ব্যবহারের দ্রুত বৃদ্ধি এবং নিয়মকানুনের পরিবর্তন আনার সুবাদে ব্যাংকগুলোকে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর ফলে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ডিএফএসের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করার আরেকটি বড় নীতিসিদ্ধান্ত ছিল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় অর্থ বিতরণ। এতে সরকার থেকে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে (জিটুপি) সরাসরি তার ব্যাংক বা এমএফএস অ্যাকাউন্টে টাকা হস্তান্তর করা হয়।

তবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডিএফএস/এমএফএস ব্যবস্থাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে ব্যবহার করা হবে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে এ ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে। এর মধ্যে রয়েছে–জাতীয় পরিচয় ডেটাবেসকে শক্তিশালীকরণ, ডিজিটাল আর্থিক সেবাদাতাদের মধ্যে আন্তঃপরিচালনা (ইন্টারঅপারেবিলিটি) প্রতিষ্ঠাসহ পেমেন্ট অবকাঠামোর উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রবৃদ্ধিতে ডিএফএস সেবাকে আরও সহায়ক করার জন্য উদ্ভাবনকে জনপ্রিয় করা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ক্রমবর্ধমান লিঙ্গবৈষম্যের মোকাবিলা করাসহ অন্যান্য বিষয়। বিশেষত, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা গৃহীত হবে:

- ***আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা:*** বিগত দশকে লক্ষণীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ক্রমবর্ধমান জেন্ডার বৈষম্য (২০১১ সালে ১১ শতাংশীয় পয়েন্ট থেকে ২০১৭ সালে ২৯ শতাংশীয় পয়েন্ট) একটি উদ্বেগের বিষয়। গ্রামীণ, দরিদ্র, প্রান্তিক ও ভঙ্গুর পরিস্থিতির নারীদের লক্ষ্য করে অর্থ স্থানান্তরের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি জিটুপি ডিজিটাইজেশন আরও উন্নত করার উদ্যোগ রয়েছে। তবুও সামগ্রিক ডিএফএস কাঠামোকে আরও জেন্ডার অন্তর্ভুক্তিমূলক করার প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নারী ডিএফএস ব্যবহারকারীদের বিদ্যমান সেবার আওতা বাড়ানোসহ অন্যান্য বিষয়।
- ***জাতীয় পরিচয় (NID) ডেটাবেস শক্তিশালীকরণ:*** জাতীয় পরিচয় (NID) ডেটাবেস মূলত ভোটারদের পরিচয় নাম্বার দেয়ার জন্য শুরু করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রায় ১১০ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নিবন্ধিত রয়েছে। এগুলো কাজে লাগিয়ে ইলেকট্রনিক 'নো ইয়োর কাস্টমার' (E-KYC) পরিচয় যাচাইকরণ ব্যবস্থা চালুর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর ফলে দ্রুত একজন গ্রাহককে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে এবং এই প্রক্রিয়ায় খরচ কমে আসায় ডিএফএসএর ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এটি এরই মধ্যে মোবাইলে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার আট শতাংশ

এনআইডি ডেটাবেসে নেই বলে জানা গেছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী বিবেচনায় আনা হলে ৩২ শতাংশ বাংলাদেশি নাগরিকের ডিজিটাল আইডি নেই। জনসংখ্যার পুরো আইডি কাভারেজ অর্জন বিশেষত নারী, দরিদ্র ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে সহায়ক হতে পারে। তাদের আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার প্রয়োজন হয়। এনআইডি ডেটাবেস হালনাগাদ করার অংশ হিসেবে যে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য সংশোধন বা হালনাগাদ করারও সুযোগ থাকবে। কেননা জানা গেছে যে, ভুল জন্মতারিখের কারণে অনেক বয়স্ক নাগরিক সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতায় বার্ধক্য ভাতা পেতে অযোগ্য বিবেচিত হয়।

- ***সুবিধাভোগীদের একক তালিকা (রেজিস্ট্রি) তৈরি করা:*** বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় পরিচালিত পৃথক ডেটাবেসগুলো থেকে উপকারভোগীর একক সামাজিক রেজিস্ট্রি (তালিকা) তৈরি করা। পৃথক উপকারভোগীদের ডিজিটাল আইডি এবং উপকারভোগীদের ইলেকট্রনিক ডেটাবেস ব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের একটি শক্তিশালী একক রেজিস্ট্রি তৈরিতে সহায়তা করতে পারে।
- ***জিটুপি পেমেন্টের সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন:*** অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হলো জিটুপি পেমেন্ট ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন অর্জন করা। সামাজিক নিরাপত্তা /এনআইডিতে নিবন্ধকরণের জন্য উপকারভোগীদের সংযুক্ত করা হবে। পাশাপাশি সুবিধাভোগী বাছাইয়ের সময় বর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের ভুলত্রুটি কমিয়ে আনার জন্য ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডেটাবেজ (জাতীয় খানা তথ্যভান্ডর) কাজে লাগানো হবে।

১২.৪.১০ এসডিজি অর্জনের জন্য ডিজিটাল অর্থনীতি অর্জন করা

এটি ভালোভাবেই স্বীকৃত যে, এসডিজি অর্জনের পথে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। প্রযুক্তি বিশেষত ডিজিটাল টেকনোলজি বিশেষভাবে কাজে আসতে পারে। এআই থেকে ব্লক চেইন পর্যন্ত এক ডজনেরও বেশি সম্মুখ সারির প্রযুক্তি ৪আইআরের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে রিসোর্স ব্যবহার, সেবা সরবরাহ, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং সহযোগী অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও দক্ষতা উন্নয়ন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পরিষ্কার যে প্রতিটি লক্ষ্য ও অভীষ্টে ডিজিটাল প্রযুক্তির আলাদা আলাদা সম্ভাবনা রয়েছে। উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্ভাব্য আপেক্ষিক সম্ভাবনা (নিম্ন, মাঝারি ও উচ্চ)-এর গুণগত পর্যবেক্ষণ কীভাবে এসজিডি'র ১৭টি অভীষ্টের অন্তর্গত, ১৬৯ লক্ষ্যমাত্রার প্রত্যেকটি অর্জন করে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার মধ্যে ১২৬টি হলো এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা এবং ৪৩টি হলো বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কিত, যেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি স্ট্যাকের সমর্থন প্রয়োজন। ডিজিটাল সুযোগগুলোর কয়েকটি উদাহরণ সারণি ১২.৯ এবং ১২.১০-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.৯: এসডিজি অর্জনের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবনের উদাহরণ

সম্পর্কিত এসডিজির লক্ষ্যগুলো	ডিজিটাল উদ্ভাবনী সম্ভাবনা
এসডিজি ২.৪ টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এসডিজি ১২.৩ বিশ্বব্যাপী খুচরা ও ভোক্তা পর্যায়ে মাথাপিছু খাদ্য অপচয় অর্ধেক হ্রাস করা এবং উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলায় খাদ্য অপচয়ের পাশাপাশি ফসল উত্তোলন পরবর্তী অপচয় কমানো।	(১) অনুকূল ফসল, (২) যথার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুত, মোড়কজাতকরণ ও পরিবহন, (৩) সরবরাহ শৃঙ্খল অনুসরণ, (৪) সর্বোত্তম খুচরা বিক্রির মাধ্যমে খাবারের অপচয় হ্রাস করা উন্নত পূর্বাভাসের মাধ্যমে খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ ও চাহিদার সমন্বয় করা
এসডিজি ২.৩ খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করা এসডিজি ২.৪ টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা	২.১ ইউএভি-ভিত্তিক মাটির উর্বরতা এবং শস্যের স্বাস্থ্য ম্যাপিং এবং সার, কীটনাশক ও পানির মতো ইনপুটগুলোর সঠিক বিতরণ; কৃষিকাজের ক্ষতি কমানো এবং কৃষিকাজের ফলন আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সারণি ১২.১০: এসডিজির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা আদায়ে প্রোগ্রাম কর্মকাণ্ডসমূহ

নীতিমালা এবং প্রোগ্রাম কার্যক্রম	ফলাফল
এসডিজির প্রতিটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়তা প্রয়োজন। প্রযুক্তিনির্ধারিত তদন্ত পরিচালনার জন্য, বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাবনা শনাক্তকরণের জন্য এবং এসডিজি অর্জনের দিকে ফলাফলকে রূপান্তর করতে মধ্যস্থতার রূপরেখা তৈরির জন্য সহায়তা প্রয়োজন।	যথাযথ উপলব্ধির ভিত্তিতে সঠিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা যায়, আইডিয়া সৃষ্টি থেকে শুরু করে উদ্ভাবন আওতাভুক্ত হয়, প্রসার ঘটে।
এসডিজির লক্ষ্য পূরণে ডিজিটাল প্রযুক্তি থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য লাইন মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক দায়িত্ব মানচিত্র এবং কর্মসূচি উন্নয়ন করা।	সুসংহত, সমন্বয়, হস্তক্ষেপ
সমিতির (অ্যাসোসিয়েশন) মাধ্যমে শিল্পকে জড়িতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্পনিবিষ্ট উদ্ভাবনগুলোয় সংযুক্ত করতে গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধা সরবরাহ করা	সীমিতকরণ এবং বর্জ্য কমাতে পণ্য ও প্রক্রিয়া পুনর্নকশা করা হচ্ছে।

১২.৪.১১ ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেয়া

একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে (এটুআই, ২০১৯) পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের বড় পাঁচটি খাতে ২০৪১ সাল নাগাদ ৫.৫ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারাবে। এই পূর্বাভাস বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চাকরি কমার শঙ্কার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে পাল্টা আলোচনাও রয়েছে। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রযুক্তির আওতায় উৎপাদনশীলতায় প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন মেটাতেই অর্থনৈতিক ও শ্রমিক চাহিদার প্রসার ঘটবে। অতীতেও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে শ্রমের চাহিদা বেড়েছে। তবে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রযুক্তির কারণে চাকরি মেরুকরণ প্রভাব তৈরি হয়। নতুন ধরণের কাজ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি অনেক কাজ মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে যন্ত্রকে ন্যস্ত করে। এ প্রবণতায় বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও দেশগুলো। এ বিষয়টি সাধারণভাবে জব মেরুকরণ হিসেবে পরিচিত। বিশ্বজুড়ে সংযুক্ত এই অর্থনীতিতে প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট চাহিদার বাস্তবতা থেকে পরিষ্কার হয় যে, শ্রমের চাহিদা ও দক্ষতা রূপান্তরের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে সাড়া পাওয়া দরকার। উপরন্তু অন্য তিনটি শিল্প বিপ্লবের তুলনায় ৪আইআরে প্রযুক্তির পরিসর, সুযোগ ও গতি অনেক বেশি গভীর হবে। কাজেই ভবিষ্যৎ নিয়ে পূর্বাভাস ও প্রয়োজনমতো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বও আগের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশগুলো সারণি ১২.১১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১২.১১: 4IR কাজে লাগানো এবং এর সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য ডিজিটাল সম্ভাবনাগুলোকে ব্যবহার করা

ক্রম	পর্যবেক্ষণসমূহ	কৌশলগত সুপারিশসমূহ
১	প্রযুক্তির অগ্রগতি নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে-(১) বিভিন্ন কাজের অটোমেশন, (২) নতুন নতুন কাজ তৈরি এবং (৩) অবশিষ্ট কাজগুলো। ফলে *টাস্ক কনটেন্ট প্রোডাকশন* পরিবর্তনশীলতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। এ ধরণের গতিশীলতা বিভিন্ন ধরণের মেরুকরণ প্রভাব রাখছে সব শ্রেণির কাজের ওপর, একই সঙ্গে জেন্ডারের ক্ষেত্রেও।	লক্ষ্যে নির্ধারিত শিল্পগুলোয় পেশার ক্ষেত্রে কার্যস্তর (টাস্ক লেভেল) বিশ্লেষণ করা উচিত। এবং টাস্ক কনটেন্ট রূপান্তর সম্পর্কে প্রক্ষেপণ করা উচিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রযুক্তির সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে।
২	প্রযুক্তির উন্নতি, ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং যে কোনো সীমবদ্ধতা অতিক্রম করেও মানুষের শেখার প্রয়োজনীয়তা থেকেই ডিজিটাল শিক্ষার (লার্নিং) ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আগামী দিনে অনলাইন মিডিয়ার মাধ্যমে শিখন এবং শেখার জন্য একটি ডিজিটাল সেন্টার অব এক্সেলেন্স শিক্ষার কেন্দ্র হতে পারে।	ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ নেয়া উচিত।
৩	কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা টাস্ক কনটেন্ট প্রোডাকশনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল প্রিন্টিং চালু হওয়ার পরে আরএমজি ভ্যালু চেইনের মুদ্রণ বিভাগে উৎপাদনের টাস্ক কনটেন্ট পরিবর্তন হয়ে যায়।	টাস্ক কনটেন্ট উৎপাদনের সম্ভাব্য রূপান্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। অধিকন্তু দক্ষ নারী শ্রমিকদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধির জন্য বিশেষ জোর দেয়া উচিত, কারণ তারা অটোমেশনের ফলে বেশি ভুক্তভোগী।
৪	সহজাত ক্ষমতাকে জোরালো করা (সফট স্কিলসহ) হলে তা নিম্নস্তরের ম্যানুয়াল কাজ সম্পাদনে শ্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে। ফলস্বরূপ, প্রযুক্তি উন্নয়নকারীরা সেই কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করা আরও কঠিন বলে মনে করবে, যার ফলে স্বল্প দক্ষ শ্রমের টিকে থাকার সম্ভাবনা দীর্ঘ হবে।	স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সহজাত ক্ষমতা এবং সফট স্কিল বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু বিদ্যমান শ্রম শক্তিকে সফট স্কিল ও পাশাপাশি সহজাত সক্ষমতা বাড়ানোর প্রশিক্ষণও দিতে হবে।
৫	পণ্য ও সেবা উভয় ক্ষেত্রেই ৪ আইআর-এর জন্য চালক প্রযুক্তিগুলো থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হবে। ফলস্বরূপ অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরিতে নতুন কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, এআর/ভিআর-ভিত্তিক ফিচারগুলো হসপিটালিটি ও পর্যটনশিল্পে পর্যটক ব্যবস্থাপনা (গাইড) কাজ প্রসারণের জন্য সূচনা করা যেতে পারে	বিদ্যমান ও নতুন উভয় শ্রম শক্তিকে ৪ আইআর প্রযুক্তিভিত্তিক বৈশিষ্ট্য তৈরিতে সেই কাজগুলো সম্পাদন করার প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এই সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলোর কয়েকটি হলো আরএমজি পণ্যগুলোয় এম্বেড করা ইলেক্ট্রনিক্স; ভিআর/এআর-ভিত্তিক পর্যটক গাইড, বা রান্নার আধুনিক সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রেতাকে খাবার পরিবেশন।
৬	৪আইআরের এর আওতায় থাকা প্রযুক্তিগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে টাস্ক কনটেন্ট প্রডাকশনের রূপান্তর ঘটবে, দক্ষতার আরও উন্নয়নের (আপস্কিলিং) জন্য প্রশিক্ষণের চাহিদা বাড়বে।	আপ-স্কিলিং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন করতে টাস্ক কনটেন্ট প্রোডাকশন রূপান্তরের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন এবং পূর্বাভাসের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া উচিত।
৭	দক্ষতার চাহিদা কেবল অটোমেশেনের মাত্রার ওপর ওপর নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে পণ্যের ওপর, যা সামগ্রিকভাবে কোনো প্রতিষ্ঠান, শিল্পসমূহ এবং দেশগুলো উৎপাদন করে।	আমদানি ও রফতানি-বিকল্প পণ্য হিসেবে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষত ৪ আইআরকে কাজে লাগিয়ে (যেমন দূর থেকে কাজের তদারকি ও রোবটের সহায়তায় সেবা সরবরাহ) যেন কাজ সরবরাহের পরিমাণ বাড়ে।
৮	অনুমান করা হয়, প্রায় দুই মিলিয়ন চাকরিপ্রার্থী বাংলাদেশের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ দেশ ছাড়ছে।	দক্ষতার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, জব কনটেন্ট প্রোডাকশনের রূপান্তর বিবেচনায় আনা উচিত কাজের প্রকৃতিকে, যেগুলোয় বাংলাদেশি প্রবাসীদের যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।
৯	আইআর ৪.০ প্রযুক্তি অনুষঙ্গগুলো নতুন পণ্য এবং প্রক্রিয়া স্তরের উভয় ক্ষেত্রেই উদ্ভাবনকে সমর্থন করে, যা নতুন কাজের (টাস্ক) সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, ইউএভি-ভিত্তিক উর্বরতা এবং শস্যের স্বাস্থ্য ম্যাপিং এবং সঠিক পদ্ধতিতে কৃষি ইনপুটগুলো প্রয়োগ করা।	উদ্ভাবনের পূর্বাভাস তৈরি করা উচিত এবং তা সহজীকরণের সুবিধা সরবরাহ করা উচিত। ফলস্বরূপ কার্য (টাস্ক) সরবরাহ বাড়বে। নতুনভাবে চালু হওয়া এই টাস্কগুলো সম্পাদনের জন্য দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

ক্রম	পর্যবেক্ষণসমূহ	কৌশলগত সুপারিশসমূহ
১০	আইএলওর সঙ্গে অংশীদারিত্বে এটুআই পরিচালিত সমীক্ষাসহ বেশিরভাগ গবেষণায় বৃত্তিমূলক পর্যায়ে চাকরি হারানোর বিষয়ে বলা হয়। এই গবেষণাগুলোয় চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির ফলে টাস্ক কনটেন্ট প্রোডাকশনে সম্ভাব্য রূপান্তরের বিষয়ে আলোকপাত করা হয় না। ফলে এই গবেষণাগুলোয় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তার মূল্যায়ন সম্পর্কে পর্যাপ্ত স্পষ্টতা দেয়া হয় না।	বিদ্যমান গবেষণাগুলোয় পরপূরক হিসেবে টাস্ক লেভেল যাচাই-বাছাইয়ের (ইনভেস্টিগেশন) বিস্তারিত ফলোআপ থাকা উচিত। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে থাকবে টাস্ক অটোমেশন। বাকি টাস্কের ইন্টারফেস পরিবর্তন, অটোমেশন অবলম্বনে নতুন টাস্কের প্রবর্তন এবং পণ্যে ফিচার যোগ করায় নতুন টাস্কের প্রবর্তন।
১১	আইআর ৪.০ প্রযুক্তিগুলোর দ্রুত অগ্রগতির কারণে টাস্ক কনটেন্ট প্রোডাকশন পরিবর্তন হতে থাকবে। ফলস্বরূপ দক্ষতার পর্যায়ে দ্রুত প্রতিনিয়ত হালানাগদ করার চাহিদার দাবি থাকবে।	বিদ্যমান শ্রম শক্তি ও ভবিষ্যতের চাকরি প্রার্থীদের–উভয় ক্ষেত্রেই জীবনব্যাপী শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মনোভাব বিনির্মাণ হওয়া উচিত। অনলাইন সংস্থান থেকে শেখার দক্ষতার বিকাশ জীবনব্যাপী শেখার দক্ষতা গড়ে তোলার একটি উদাহরণ।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তর্নিহিত প্রযুক্তির বিরামহীন অগ্রগতি ৪আইআরকে মেলে ধরছে। হুমকি মোকাবিলায় ও সুযোগ কাজে লাগাতে অন্তর্নিহিত প্রযুক্তিগুলোকে পরিবীক্ষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মূল্যায়ন করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের (HR) প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে। উদ্ভাবনের সুযোগগুলো শনাক্ত করতে হবে এবং যথাযথ মধ্যবর্তিতা (ইন্টারভেনশন) গ্রহণ করতে হবে।

১২.৪.১২ কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহ দেয়া

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে আইসিটি খাত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচিতে অর্থায়নে প্রাধান্য বিস্তার করেছে সরকারি বিনিয়োগ। লক্ষণীয় যে, চার বছরের ব্যবধানে আইসিটি খাতে সরকারি ব্যয় প্রায় চার হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে চলে গেছে। দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি বিনিয়োগ এই সরকারি বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। আইসিটি খাতের বিভিন্ন অংশে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

(ক) আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটি, অভ্যন্তরীণ ট্রান্সমিশন, এক্সেস নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবাঃ আন্তর্জাতিক কানেক্টিভিটিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বেসরকারি কোম্পানি (অপারেটর) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইডথের পাইকারি মূল্য হ্রাস করেছে। কিন্তু এই পাইকারি পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দরপতন ব্যবহারকারীর পর্যায়ে আনুপাতিক হারে প্রতিফলিত হয় না। এর অন্যতম কারণ হলো অভ্যন্তরীণ ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক। এই খাতে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, কিংবা থাকলেও খুব দুর্বল। সমস্ত ইউনিয়নকে সংযুক্ত করে এই খাতকে শক্তিশালী করতে সরকারের আগ্রাসী বিনিয়োগ পরিপূরক সমর্থন পাচ্ছে না বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে। বরং এনটিটিএন অপারেটররা সরকারের প্রকল্পগুলোর যোগাযোগকারী (কনটাকটর) হয়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ, সরবরাহ-চালিত প্রতিযোগিতার কৌশল কার্যকর হয়নি। অন্যদিকে এক্সেস নেটওয়ার্কে কার্যত একক আধিপত্যের কারণে প্রযুক্তি হালনাগাদ করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো আগ্রাসী বিনিয়োগ হয়নি। মোবাইলকেন্দ্রিক ইন্টারনেট সংযোগ এবং সরকারি বিনিয়োগের অগ্রগতি সত্ত্বেও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যয় এবং গুণগত মান এখনও উদ্বেগের বিষয়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতিযোগিতা তীব্র করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া উচিত আরও বেশি সরকারি তহবিল বিনিয়োগের বিপরীত ধারণা হিসেবে।

(খ) ক্লাউড অবকাঠামোঃ বিদেশি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের ক্লাউড সেবার বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে। তবে এই কোম্পানিগুলোর বাংলাদেশে কোন অবকাঠামো নেই। উপরন্তু তারা বাংলাদেশের ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোকে আইনত প্রতিরোধমূলক গ্রহণযোগ্য এসএলএও প্রদান করে না। এ ধরণের ভিনদেশি (গ্লোবাল) ক্লাউড সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত উপাত্ত গোপনীয়তা এবং এসএলএ'র সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নেয়া উচিত। টায়ার ৪ ডেটা সেন্টারে সরকারের বিনিয়োগ পরিপূরক করতে স্থানীয় ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নের জন্য আনুপাতিকভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ হয়নি। ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় নীতিমালা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(গ) সফ্টওয়্যারঃ কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষার প্রসার এবং সরকারি অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সত্ত্বেও আইসিটি শিল্পের সফ্টওয়্যার খাতকে সম্প্রসারণের জন্য খুব সীমিত বেসরকারি বিনিয়োগ হয়েছে। সফটওয়্যার খাতকে আরও কাজে লাগানোর জন্য কৌশলগত মনোযোগ থাকা উচিত সফটওয়্যারের সঙ্গে বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানোর দিকে, যা সমাধান উদ্ভাবন করবে। এগুলো সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের ফলাফল, মান ও অপচয় মোকাবিলায় কাজে আসবে।

(ঘ) উচ্চপ্রযুক্তির উৎপাদন: জানা গেছে, বাংলাদেশে এখন প্রায় ৬০ শতাংশ স্মার্টফোন বিক্রি হচ্ছে স্থানীয়ভাবে সংযোজন করে। মূলত আমদানি করা যন্ত্রাংশের ওপর খুব কম কর এবং সম্পূর্ণরূপে তৈরি আমদানি পণ্যগুলোয় উচ্চতর কর (৫৭% পর্যন্ত বেশি) আরোপের ফলে কর পার্থক্য বেশি হওয়ার কারণে স্থানীয় সংযোজন লাভজনক হয়েছে। তবে এই অগ্রগতিতে শ্রমভিত্তিক স্থানীয় মান সংযোজন খুব কম। ফলস্বরূপ, চাকরি সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উভয়ই অত্যন্ত কম। মূল্য শৃঙ্খলের (ভ্যালু চেইনের) সঙ্গে সমান তালে অগ্রগতিতে যন্ত্রাংশ উৎপাদনের প্রচলিত কৌশলও তা সমাধান করে না। পুনরায় নকশা ধারণার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করার জন্য আর অ্যান্ড ডি'তে আলোকপাত করা উচিত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই সূত্রে অগ্রগতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। মান বাড়ানো ও খরচ কমানোর জন্য কর ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাগুলোকে (বেনিফিট) সংযুক্ত করতে হবে পেটেন্ট অর্জন এবং তাদের পণ্য ও প্রসেসগুলো পুনর্নকশার কাজের সঙ্গে। সংযোজিত পণ্যের পরিমাণের চেয়ে মূল্য সংযোজন ও উচ্চ বেতনের চাকরি সৃষ্টিতে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।

(ঙ) ই-কমার্স: এই খাতের সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য কার্যকারিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ই-কমার্সের প্রসার বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে বাড়িয়ে তুলতে ইন্টারঅপারেবল স্মার্ট লজিস্টিকস এবং ওয়্যারহাউস উন্নয়নে সহায়তা করা যেতে পারে। স্মার্টফোনভিত্তিক সেবা ব্যবহার ও লেনদেনের জন্য সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল পেমেন্টের বিষয়টিও সমাধান করা উচিত। নগদ অর্থ প্রদানের বিপরীতে ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে।

(চ) বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং: বাংলাদেশের অনুকূলে বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে পারিশ্রমিকের বড় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিপিওতে রফতানি আয় এখনও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখাতে পারেনি। মোবাইল ফোন ও মাথাপিছু ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি মোবাইল ফোনেই গ্রাহকসেবাসহ বিভিন্ন সেবা সরবরাহের সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। গ্রাহকসেবা ও ব্যাক-অফিস সেবাগুলোকে আউটসোর্সিংয়ে উৎসাহিত করার জন্য নীতি ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হবে রফতানি আয় ব্যাপকভাবে বাড়ানোর জন্য স্থানীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা বিনির্মাণ করা।

(ছ) ফ্রিল্যান্সিং: বিপুলসংখ্যক (প্রায় পাঁচ লাখ) যুবকের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও এ খাত থেকে উপার্জন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জানা গেছে, এই ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশই বাজার থেকে আকর্ষণীয় উপার্জন করছে। বেশিরভাগ ফ্রিল্যান্সার পর্যাপ্ত উপার্জনে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশে সক্রিয় ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা কমার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মাথাপিছু আয় বাড়ানোর জন্য উচ্চ-মানের পেশাদার সেবা সরবরাহের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য বাজারমুখী দক্ষতা বিনির্মাণে আলোকপাত করা উচিত। দেশের বাইরে থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ তাদের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে জানা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শীর্ষস্থানীয় ফ্রিল্যান্সারদের সহায়তা দিয়ে তাদের সফলতার প্রসার বাড়ানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যায়। পণ্য উন্নয়নের জন্য ত্বরান্বিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু হস্তক্ষেপ হতে পারে।

(জ) স্টার্ট-আপস ও ভেনচার ক্যাপিটাল অর্থায়ন: বাংলাদেশ ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম ভেনচার ক্যাপিটাল অর্থায়ন আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, যা ভারতের রেকর্ড ১৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। বিপুলসংখ্যক আন্তর্জাতিক ভেনচার ক্যাপিটাল (ভিসি) ভারতের স্টার্ট-আপগুলোয় বিপুল ঝুঁকিপূর্ণ মূলধন জুগিয়েছে। বাংলাদেশের স্টার্ট-আপগুলোয় বিদেশি ভিসি তহবিলকে আকর্ষণ করার কৌশলে বেশ কিছু কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। এর মধ্যে থাকবে প্যাকেজিং স্টার্ট-আপগুলোর নেতৃত্বাধীন উদ্ভাবনের সুযোগ এবং তাদের প্রসার, গবেষণা-উন্নয়নকে সহায়তা দেয়া ও মেধাসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্টার্ট-আপগুলোকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশে ভেনচার ক্যাপিটালের কার্যক্রম সহজ করা উচিত। উল্লেখ করার মতো বিষয় যে স্টার্ট-আপগুলোর মাধ্যমে ডিজিটাল উদ্ভাবনের সুযোগগুলো কাজে লাগানোর জন্য আন্তর্জাতিক ভিসি অর্থায়ন এসডিজি অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন কৌশল হতে পারে। এছাড়া এটি কাজে আসতে পারে স্থানীয় উদ্ভাবনের সুযোগগুলো থেকে ৪আইআরকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে।

১২.৪.১৩ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির সুবিধা আদায়ের জন্য সংস্কৃতি ও জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা বিনির্মাণ

ডিজিটাল সুযোগসমূহ থেকে সুবিধা নেয়া ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি তৈরি করার বিষয়টি একটু আলাদা। এটি বাংলাদেশের আমদানির বিকল্প আরএমজি ও তৈরি পোশাক রফতানির ট্র্যাক রেকর্ডের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উৎকর্ষের পথ অনুসরণ ও শেখার সংস্কৃতির ধারণাটি শ্রমভিত্তিক উৎপাদন মূল্য সংযোজনের চেয়ে একেবারেই আলাদা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ডিজিটাল যুগে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে অনুকূল সংস্কৃতি লালন করতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের বিশেষ করে জাপানের শিক্ষা এই ক্ষেত্রে কার্যকর।

যেকোন উদ্ভাবনী ধারণা থেকে সফলতা লাভের মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কারসমূহ থেকে পরিপূর্ণতা অর্জনের সংস্কৃতি। পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে বিবেচনাপূর্ণ লালন-পালনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাড়তে থাকে। উদ্ভাবনী অর্থনীতির ভিত্তিতে এই মূল্যবান সামর্থ্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত সূচকগুলোয় অগ্রগতি ছাড়াও এখন সময় এসেছে অসীম উৎকর্ষের পথে প্রতিনিয়ত অনুসরণ চর্চায় গুরুত্বসহকারে মনোনিবেশ করার। এর লক্ষ্য হবে বিভিন্ন ধারণা থেকে মুনাফা লাভে সফল হতে কম খরচে উন্নত মানের পণ্য সরবরাহ করা।

জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা: বাংলাদেশে উন্নয়নের মূল অগ্রাধিকার হলো জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি বিনির্মাণ। এজন্য কৌশলগত গুরুত্ব দিতে হবে জ্ঞানের নেটওয়ার্ক ও 'জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা' জনপ্রিয় করার বিষয়ে। তার অংশ হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা বিনির্মাণের জন্য বাংলাদেশের উচিত কোরিয়া, ভারত ও তাইওয়ানের মতো কয়েকটি দেশ থেকে শিক্ষা নেয়া। কোরিয়ার উদাহরণ থেকে শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার বক্স ১২.২ এ দেখানো হয়েছে।

বক্স ১২.২: জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি থেকে সুবিধা নেয়ার জন্য জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থা তৈরির পাঠ

কোরিয়ার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সূত্র ধরে পণ্যের ক্রমবর্ধমান মানোন্নয়নের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্য রোল মডেল হতে পারে। কোরিয়া সরকারি তহবিল ব্যবহার করে শিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর অ্যান্ড ডি'র সুবিধা প্রদর্শন করার কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশল বেসরকারি খাতকে করপোরেট গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাব স্থাপনে উৎসাহ দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই অগ্রগতি থেকে উপকার পেতে কোরিয়া সতর্কতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক গবেষণা ক্ষমতা উন্নয়ন করে। পরে এগুলোকে বেসরকারি খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাব এবং সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে। জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থা উন্নয়নে এ ধরণের কৌশল বাংলাদেশের পক্ষে খুব উপযুক্ত বলে মনে হয়। ফলে কোরিয়ার আর অ্যান্ড ডি ব্যয় যদিও ২০১৫ সাল নাগাদ জিডিপির ৪.৩ শতাংশের ওপরে পৌঁছেছে, তবে এই গবেষণা ও উন্নয়ন বিনিয়োগের প্রায় ৯০ শতাংশ শিল্প খাতের আওতায় রয়েছে। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ মানব সম্পদ-সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করে চলেছে।

আইসিটি বিভাগ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ভূমিকা হবে উদ্ভাবন মধ্যস্থতাকারীর এবং জ্ঞান নিয়ে নেতৃত্বদানের। এটি নেতৃত্ব দেবে দেশের নতুন উন্নয়ন পদ্ধতির সন্ধান, হৃদয়ঙ্গম করার এবং এতে সমন্বয় করার সক্ষমতায়। এর কাজ হবে সরকার এবং সমাজের সবকিছুর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র স্থাপন করা। আর এটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক, নাগরিককেন্দ্রিক গভর্ন্যান্স ও সামাজিক উদ্ভাবন প্রতিপালনে। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আইসিটি বিভাগ একটি জাতীয় উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম ত্বরান্বিত করবে, যে ইকোসিস্টেম পৃথকভাবে নাগরিকদের এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে ক্ষমতাবান করবে যেন তারা উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে বাস্তব সমাধানে রূপান্তরিত করতে পারে। এই সমাধানগুলো যেন এসডিজি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ভিশন ২০৪১-এর বাস্তবায়নে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন করতে পারে।

১২.৪.১৪ কোভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে উত্তরণে আইসিটির শক্তিকে কাজে লাগানো। এছাড়া স্বাস্থ্য সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, অথবা প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও আইসিটির ক্ষমতা কাজে লাগানো।

খাত-নির্ধারিত চ্যালেঞ্জ ও সুযোগগুলো নিয়ে কাজ করা: কোভিড-১৯ আমাদের বিদ্যমান ব্যবস্থায় (সিস্টেম) নিহিত ত্রুটিরেখাগুলো উন্মোচন করেছে। এটি আমাদের দুর্বলতার অজানা ক্ষেত্র (ব্লাইন্ড স্পট) শনাক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া প্রবৃদ্ধির জন্য পদ্ধতিগত বাঁধা ও সুযোগগুলো চিহ্নিত করার সুযোগ দিয়েছে। কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জগুলো কিছু কার্যক্রম শুরু করতে বাধ্য করেছে, যা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হলে বাংলাদেশকে 'মেড ইন বাংলাদেশ' এজেন্ডার সঙ্গে ডিজিটাইজেশনের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারে। প্রধার প্রধান খাতের জন্য কোভিড-১৯ দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো ও প্রাসঙ্গিক আইসিটি নেতৃত্বাধীন কৌশলগুলোর সারবস্তু নিচে উল্লেখ করা হয়েছে:

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: মহামারী ও পরবর্তী লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতাগুলো অর্থায়নের প্রবেশাধিকার সীমিত হওয়া দীর্ঘদিনের পুরনো সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে গতি আনতে কয়েক বছর ধরে প্রবল প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু একাধিক সমস্যার কারণে তা হচ্ছে না। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, এনবিএফআই, এমএফআই, এমএফএস এবং ডিএফএস প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে অপ্রতুল মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃযোগাযোগের (ইন্টারঅ্যাকশন) অভাব। জটিলতা রয়েছে মোবাইল ফোন অপারেটরদের উপাত্ত ভাগাভাগি (শেয়ারিং) নিয়েও। এসব জটিলতায় পিরামিডের নিচের অংশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আর্থিক চ্যানেলগুলোয় অন্তর্ভুক্ত করার কাজ আটকে আছে। এটি বর্তমানের মহামারীর সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে আর্থিক সহায়তা

পেতে বাঁধা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী সেরা অনুশীলন থেকে শিক্ষা অর্জন পূর্বক সুবিধা নেয়ার জন্য আইসিটি বিভাগ নিম্নোক্ত স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপ প্রস্তাব করেছে–(ক) ২০২১ সাল নাগাদ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ১০ গুণ বাড়ানোর জন্য আন্তঃপরিচালন (ইন্টারঅপারেবিলিটি) ব্যবস্থার প্রসার করা; (খ) ২০২১ সালের মাঝামাঝি নাগাদ আর্থিক সেবা গ্রহণের জন্য সরাসরি প্রণোদনা দেয়া; (গ) ৪ গুণ প্রবৃদ্ধির জন্য এসএমইগুলোর ডিজিটাল ক্রেডিট স্কোর সরবরাহের জন্য এমএফআই এবং মোবাইল অপারেটরদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করা; (ঘ) অভিঘাত-সহনশীল আর্থিক ইকোসিস্টেম সুরক্ষিত করতে একটি ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা; (ঙ) ২০২০ সালের শেষের দিকে কোনো নীতি অনুমোদনের আগে পাইলট পরীক্ষার অনুমতি দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রক স্যান্ডবক্স উন্নয়ন করা।

স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম: উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে স্টার্ট-আপগুলো অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে আছে, যা ভিশন ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১.৫ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান এবং ২০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আন্তর্জাতিক ভেনচার ক্যাপিটাল আকর্ষণ করেছে। তবে তহবিলে প্রবেশাধিকারের অভাব, নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনার অনুপযুক্ত জ্ঞান, প্রণিধানযোগ্য সরকারি সহায়তার অভাব এবং আইনি ও নিয়ন্ত্রক চ্যালেঞ্জগুলো এ খাতের প্রসার বাঁধাগ্রস্ত করে। কোভিড-১৯ সংকট এই ইকোসিস্টেমকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে একটি সমীক্ষায় জানা যায়, ১৬০টিরও বেশি স্টার্ট-আপের রাজস্ব ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। আইসিটি বিভাগ স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপের জন্য অবিলম্বে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করে–(ক) ২০২০ সাল নাগাদ ইক্যুইটি/কোয়াসি-ইক্যুইটি আকারে ১৫০ বিশেষ স্টার্ট-আপের জন্য ১৫০ কোটি টাকা জরুরি স্টার্ট-আপ তহবিলের বরাদ্দ করা; (খ) ২০২১ সালের মধ্যে দেশি/বিদেশি মূলধনি বাজার বিনিয়োগকে আকর্ষণ করার জন্য তহবিলের তহবিল (ফান্ডস অব ফান্ডস) চালু করা ; (গ) পরিচালন ব্যয় হ্রাস করার জন্য ২০২১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থ ব্যতীত অন্য সুবিধা প্রদানের জন্য স্টার্ট-আপ-সহায়তা কর্মসূচি চালু করা; (ঘ) স্টার্ট-আপ থেকে উৎসায়ন (সোর্সিং) করার জন্য কর্পোরেশনগুলোকে বাধ্য করতে ক্রয়-সংক্রান্ত 'মেড ইন বাংলাদেশ' আইন জারি করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে সামগ্রিক তারল্য বৃদ্ধির জন্য এঞ্জেল বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেয়া; এবং (ঙ) ২০২৫ সালের মধ্যে স্টার্ট-আপগুলোর জন্য সামগ্রিক তথ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে 'বিনিয়োগ বাংলাদেশ' স্থাপন করা।

ডিজিটাল বাণিজ্য: ২০১৩-১৪ সাল থেকে ডিজিটাল বাণিজ্য পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০২ মিলিয়নেরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং অনলাইন কেনাকাটায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০২১ সালের মধ্যে এই খাতটি ৭০ বিলিয়ন টাকা (৮২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সমমূল্যের হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব এই খাতটিকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে; প্রতিষ্ঠানগুলো ৬৬৬ কোটি টাকার (৭৮.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ক্ষতির কথা জানিয়েছে। এফ-কমার্স এবং অ-নিত্যপণ্য ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এসএমই খাতের জন্য প্রযুক্তিগত অবলম্বন এবং প্ল্যাটফর্ম সেবার অভাব, ই-কমার্সের ইউটিলিটিগুলোয় সীমিত সচেতনতা ও স্বল্প অভিজ্ঞতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান, অনুকূল কর ও ভ্যাট নীতিমালার অভাব এই খাতটির বৃদ্ধিকে সীমিত করে রেখেছে এবং অধিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। এক্ষেত্রে আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপ প্রস্তাব করেছে–(ক) দেশের সর্বত্র ই-কমার্স প্রসারের জন্য ই-কমার্স নীতির পাশাপাশি একটি কোভিড-১৯ আচরণবিধি বিকাশ করা; (খ) ২০২০ সালের মধ্যে অনলাইন শপিং এবং ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জন্য কর সংস্কার; (গ) অনলাইন শপিংয়ের পদ্ধতিগুলো সহজভাবে গ্রহণের জন্য সহায়ক (এসিস্টেড) ই-কমার্স সেবা চালু করা; (ঘ) বিটিআরসির সহযোগিতায় মোবাইল ইন্টারনেটের সাশ্রয়ী দাম নিশ্চিত করা; এবং (ঙ) বিদ্যমান ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের স্টার্ট-আপ ও সেবাসমূহ জনপ্রিয় করা এবং ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল রূপান্তরকরণের জন্য এসএমইগুলোর জন্য নতুন প্ল্যাটফর্ম প্রবর্তন করা।

শিক্ষা: পড়াশোনা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং তরুণদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ স্বর্গ হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারী ১৬ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে ঝুঁকিতে ফেলেছে। সেশন জট এবং ঝরে পড়ার উচ্চ হার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সংকটটি সম্ভবত শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ (বিশেষত মেয়েদের) বাড়িয়ে দিতে পারে, অসামাজিক/অবৈধ ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতের আয় সৃষ্টি প্রভাবিত করতে পারে। একটি জাতীয় শিক্ষা-প্রযুক্তি (এডু-টেক) এজেন্ডার অভাব এই খাতকে আরও প্রভাবিত করে। শিক্ষার্থীরা কানেক্টিভিটি/ক্রয়ক্ষমতার অভাবে সংযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কেবল কয়েকটি নগর ও সেমি-নগরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে পাঠদানের কাজ চালিয়ে গেছে, যদিও দেশব্যাপী বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বাদ পড়েছে। আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক এবং স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে–(ক) ২০২১ সালের আগে মিশ্রিত (ব্লেন্ডেড) শিক্ষার বৃদ্ধির সুবিধার্থে নীতিমালা; (খ) ২০২০ শেষ হওয়ার আগে ভার্চুয়াল স্কুলিংয়ের জন্য বহুবিভাগীয় অংশগ্রহণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (গ) ২০২১ সালের মধ্যে আইটি অবকাঠামো নির্মাণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান; (ঘ) গ্রামীণ অঞ্চলে গোষ্ঠী শিক্ষার পদ্ধতিগুলোকে উৎসাহিত করা; এবং (ঙ) ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার উন্নত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগগুলোকে সক্ষম করা।

সরবরাহ-শৃঙ্খল: কোভিড-১৯ সংকট এবং পরবর্তী সময়ে লকডাউন/চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ সরবরাহ-শৃঙ্খল (সাপ্লাই-চেইন)-এ নানা সমস্যা, যেমন স্টক আউটস, স্টকপাইলিং এবং প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যস্ফীতি তৈরি করেছে। ক্ষুদ্র জোতদার কৃষকরা মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে কৃষি-ইনপুট কিনতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে ডিজিটালাইজড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সমস্যার অভাবে এফএমসিজি বিতরণ ব্যাহত হচ্ছে। চীনের মন্থরতার কারণে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের (গ্লোবাল ভ্যালু চেইন) মাধ্যমে ১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এতে ক্ষতির ৯৪ শতাংশ চামড়াশিল্প বহন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাড়তি মোবাইল ডেটা ব্যয়ের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। যেমন কৃষিভিত্তিক অ্যাপ, লজিস্টিক অ্যাপ্ ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম। আইসিটি বিভাগ অবিলম্বে স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছে−(ক) কৃষি সরবরাহ-শৃঙ্খল জোরদার করতে প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা; (খ) এফএমসিজি সরবরাহকে আরও দক্ষ ও স্থিতিশীল করে তুলতে ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজ করা; (গ) ২০২০ সালের মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট প্যাকেজের ব্যয় হ্রাস করার জন্য নীতিনির্ধারকদের অন্তর্ভুক্ত (অন বোর্ডিং) করা; (ঘ) গ্রামীণ অঞ্চলে স্মার্টফোনের ব্যবহার জনপ্রিয় করা; এবং (ঙ) ২০২০ সালের মধ্যে কর্পোরেশনদের দ্বারা ফ্লিট লেন্ডিং আইনটি সংশোধনের জন্য নীতি সংস্কার।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা: গত এক দশকে বাংলাদেশ প্রতিবছর ১.১৫ মিলিয়ন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। তবে শ্রম-বয়সের জনসংখ্যার বৃদ্ধি চাকরি সৃষ্টির হারকে ছাড়িয়ে গেছে বলে যুক্তি উঠছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ ও যুব বেকারত্বের হার ১০ শতাংশ। আর স্নাতক/উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৪ শতাংশ। শ্রম শক্তির গুণমান কম; ৩২ শতাংশ জনবলের শিক্ষা নেই, ২৬ শতাংশ মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে এবং ছয় শতাংশেরও কম মানুষের রয়েছে তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষা (এলএফএস ২০১৬-১৭)। নারীদের কম অংশগ্রহণ, যুব বেকারত্ব ও এনইইটি যুবক (বৃত্তিহীন যুবক) এবং প্রকৃত বেতনের ক্ষয় (ইরোশন) শ্রম শক্তি বাজারের বড় চ্যালেঞ্জ। কোভিড-১৯ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড টলায়মান করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি সৃষ্টি বাঁধাগ্রস্ত করেছে, লাখ লাখ মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানকে ক্ষতির দিকে নিয়ে গেছে, বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র পর্যায়ের উৎপাদন, সেবা ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। আইসিটি বিভাগ তৎক্ষণাৎ পাঁচ স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে−(ক) সর্বজনীন কর্মসংস্থান নিবন্ধন (রেজিস্ট্রি) প্রতিষ্ঠা; (খ) সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশের পাঠ্যক্রম পুনর্নির্মাণের জাতীয় কৌশল বিনির্মাণ; (গ) সিএমএসএমইদের ক্ষুদ্রঋণের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালু করা; (ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা স্থাপন; এবং (ঙ) স্বল্প-মেয়াদি বেকারত্ব ভাতা (বেনিফিট) শুরু করা।

সফটওয়্যার: লাখ লাখ লোকের চাকরির সুযোগ তৈরি ও বর্ধমান সম্ভাবনা নিয়ে সফটওয়্যার শিল্প একটি অবিস্মরণীয় আশাবাদী ভবিষ্যৎ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তবে এই খাতের প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখতে সরকারের যথাযথ হস্তক্ষেপ এবং মানানসই নীতি সংস্কার প্রয়োজন। কোভিড-১৯-এর ফলে খাতটির জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে; বেসিসের অনুমান, আন্তর্জাতিক আদেশের প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ এবং ৫০০ মিলিয়ন ডলারের অভ্যন্তরীণ কাজের অর্ডার গত কয়েক মাসে বাতিল করা হয়েছে। সংকটের সময় ব্যবসায়ের ধারায় কিছু পরিবর্তন এলেও মাত্র কয়েকটি সফটওয়্যার শ্রেণির চাহিদা বেড়েছে। খাতটি এরই মধ্যে স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারের ইন্টেলিজেন্স, অকার্যকর প্রচারমূলক ব্র্যান্ডিং কৌশল, দক্ষ কর্মীদের ধরে রাখতে অক্ষমতা, অর্থের প্রাপ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং উচ্চ সংক্রমণ ব্যয়ের কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রাহক পর্যন্ত পৌঁছনোর অক্ষমতায় ভুগছে। আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপ প্রস্তাব করছে−(ক) স্থানীয় ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদা এবং সুযোগগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে বাজার ইনটেলিজেন্স উন্নয়ন করা; (খ) প্রচারণা কৌশলগুলো পুনর্নকশা ; (গ) সফল অপারেশন শিফটের জন্য অন্যান্য লাইন মন্ত্রণালয় এবং শিল্পকে সহায়তা; (ঘ) দক্ষ কর্মীদের ধরে রাখতে এবং এফডিআই দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কৌশলগুলো সমর্থন করা; এবং (ঙ) স্থানীয় সফটওয়্যার পণ্য ও সেবা, কর্মসংস্থান এবং স্ব-স্থায়িত্বকে প্রচার করা।

ডিজিটাল ডিভাইস: ডিজিটাল ডিভাইস সেক্টরে বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক মজুরিতে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির সহজলভ্যতা, দেশীয় বাজার চাহিদা এবং অনুকূল নীতি কাঠামো বাংলাদেশকে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের জন্য একটি আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত করার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। কোভিড-১৯ সংকটের সময় দূর থেকে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা তৈরির মত পরিবর্তনের ফলে কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং নেটওয়ার্কিং ডিভাইসের চাহিদা বেড়েছে। তবে আমদানি ব্যাহত হওয়ার ফলে বাজারে দাম বেড়েছে এবং লকডাউন/ছুটি স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে নিয়ে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের নিজস্ব ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিনিয়োগের উন্নয়নের জন্য এবং অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে নীতিমালা সক্ষম করা প্রয়োজন। উচ্চ মূলধনি ব্যয় (ক্যাপেক্স), দক্ষতা নির্ধারণের মান, গুণগত মানের নিশ্চয়তা ও আন্তর্জাতিক সনদের প্রয়োজনীয়তা এবং মহামারীটির সময় আর্থিক প্রণোদনার অভাবের মতো কয়েকটি কারণ এই খাতটির প্রসার বাঁধাগ্রস্ত করেছে। আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত বিষয়ে অবিলম্বে স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপ পরিচালনা করার প্রস্তাব

দিচ্ছে–(ক) সরকারি তহবিলপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলোয় স্থানীয়ভাবে সংযোজিত পণ্য ক্রয়কে উৎসাহিত করা; (খ) স্থানীয় ডিজিটাল ডিভাইস পণ্যগুলোর গুণমান নিশ্চিতকরণের সনদায়ন উৎসাহিত করা; (গ) স্থানীয়/বৈশ্বিক বাজারে 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্য প্রচার; (ঘ) হাই-টেক পার্কগুলোয় বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি সংস্থাগুলোকে আকৃষ্ট করা; (ঙ) স্থানীয় উৎপাদন/সংযোজন উৎসাহিত করার জন্য নীতি সহায়তা সরবরাহ; এবং (চ) দক্ষ জনশক্তির অভাব বা দক্ষ জনবলের অভিবাসন-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা।

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং: বিগত দশকে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া আউটসোর্সিংয়ে (বিপিও) দারুণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শক্তিশালী আইটি অবকাঠামো, দক্ষ মানব সম্পদ এবং অনুকূল সরকারি নীতিগুলো এতে সমর্থন জোগাচ্ছে। শিল্পটি ৫০ হাজার জনেরও বেশি লোককে কাজের সুযোগ দিয়েছে এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার গ্রাহকদের কাছে সেবা রফতানি করে। তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদায়নের অনুপস্থিতি, বিদেশি ক্লায়েন্টদের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগে ঘাটতি, বাজারের দুর্বল ইন্টেলিজেন্স, সীমিত দেশীয় ব্র্যান্ডিং এবং আর্থিক প্রণোদনার অভাব এই খাতকে সীমাবদ্ধ করেছে। কোভিড-১৯-এর কারণে বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ বিপিও প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব কমেছে। বিপিও কোম্পানিগুলো স্থানীয় বাজার থেকে প্রায় এক হাজার ৭৩০ কোটি টাকা লোকসান করেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যার মধ্যে নেট পরিচালন লোকসানের সঙ্গে রাজস্ব অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বেশিরভাগ সংস্থার জন্য আইটি বাজেট সংকুচিত হয়েছে। তবে আশা করা যায়, বিপিও সেবার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। এর মূল কারণ হতে পারে ব্যয় সংকোচনের কারণে অন্য দেশ থেকে সেবা নেয়ার প্রবণতা। এক্ষেত্রে আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক স্বল্প-মেয়াদি হস্তক্ষেপ প্রস্তাব করেছে–(ক) কর্মীদের জন্য সর্বজনীন গ্রেডিং সিস্টেম বা পেশাদার সনদপত্র তৈরি করা; (খ) প্রচারণা কৌশল ও ব্র্যান্ডিংয়ের নতুন করে মডেল তৈরি; (গ) আগ্রাসী বিপণন; (ঘ) কোভিড-১৯-পরবর্তী অভীষ্ট বাজারে প্রবেশ; এবং (ঙ) নতুন সুযোগগুলো থেকে সুবিধা নিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিকাশে বিনিয়োগ করা।

আইএসপি ও অবকাঠামো: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ত্বরিত বৃদ্ধি (২০২০ সালের জুন পর্যন্ত ১০৩ মিলিয়ন) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে, যা সরকারের 'ভিশন ২০২১'-এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোভিড-১৯-এর সময় মানুষ ইন্টারনেটের ওপর বেশি বেশি নির্ভর করছে, যা অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। অবশ্য সংকটটি আইএসপি এবং অবকাঠামো খাতের জন্যও নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে। বর্ধিত ইন্টারনেট ট্র্যাফিক মাথাপিছু ব্যান্ডউইডথকে হ্রাস করেছে। ধীরগতির সঙ্গে বাড়ি থেকে কাজ করা আরও কঠিন করে তুলেছে। সাধারণ ছুটি/শাটডাউন ঘোষণার সঙ্গে আইএসপিরা দুই-তিন মাসের বিল সংগ্রহ করতে সমস্যায় পড়ে। সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ব্যাংক থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল পেতে খাতটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। এছাড়া আইএসপি মূল্য শৃঙ্খলে জটিল ভ্যাট কাঠামো, নগদ অর্থের অভাব, জাতীয় উপাত্ত সুরক্ষা এবং স্থানীয়করণের বিধি এ খাতের ব্যবসায়িক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে। আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপগুলো সংগ্রহ করে–(ক) আইএসপিগুলোর ভ্যাট প্রত্যাহার; (খ) প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে প্রবেশাধিকার সহজ করা; (গ) দ্রুত বন্দর ছাড়পত্র সহজতর ও শুল্ক হ্রাস করা; (ঘ) যথাযথ সুরক্ষা সামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সহায়তা সরবরাহ; এবং (ঙ) অবকাঠামো স্থাপনে স্থানীয় ডেটা সেন্টার এবং ক্লাউড অপারেটরদের নীতি সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত করা।

কৃষি ও খাদ্য সুরক্ষা: বিশ্বব্যাপী অন্যান্য কোভিড-১৯-আক্রান্ত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য খাদ্য উৎপাদন এবং মজুত সত্ত্বেও খাদ্য সুরক্ষা অনিশ্চিত রয়েছে। খাদ্য সুরক্ষার মধ্যে পড়ে খাদ্যের যথাযথ বণ্টন, খাদ্যের সহজলভ্যতা এবং লোকের ক্রয়ক্ষমতা। কোভিড-১৯ লকডাউন চলাকালে কৃষকরা আনুমানিক ৫৬৫ বিলিয়ন টাকা ডলার (৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) হারিয়েছেন। কৃষিতে জড়িত মানুষের নিট আয় হ্রাস পেয়েছে ৮০ শতাংশ (৬৬ শতাংশ কোনো আয় না করার তথ্যসহ)। দেশে কর্মরতদের মধ্যে প্রায় ১৫.৫ মিলিয়ন (বা ৬৬ শতাংশ) মানুষ এই খাতে কর্মরত রয়েছেন। গর্ভবতী মহিলা ও প্রান্তিক শিশুদের পুষ্টি, এবং স্বল্প আয়ের মানুষ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তথ্যে আংশিক প্রবেশাধিকার, বিঘ্নিত বাজার, জাতীয় সমন্বয়ের অভাব, ই-কমার্স থেকে বিচ্ছিন্নতা, পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এবং বাজারমূল্যের পরিবীক্ষণের অভাব এই খাতকে বাঁধাগ্রস্ত করে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকার কৃষিতে আইসিটি প্রয়োগে বিনিয়োগ করছে। তা সত্ত্বেও কৃষকদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতার হার কম রয়েছে এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোনো রিয়েল টাইম উপাত্ত নেই। আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত প্রস্তাব করে–(ক) পিপিপির মাধ্যমে কিওস্ক-ভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন; (খ) কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়ার জন্য অনলাইন বাজার; (গ) কৃষকদের ই-কমার্স ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা; (ঘ) কৃষকদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয়করণকৃত কৃষি উপদেশ এবং ই-প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম; এবং (ঙ) পিপিপি ও বেসরকারি খাতের নেতৃত্বাধীন মডেলগুলোর মাধ্যমে ডিজিটাল মার্কেট প্লেস ও পণ্য বিনিময়।

স্বাস্থ্যখাত: বোঝাক্রান্ত জনস্বাস্থ্য সেবা ও বেসরকারি খাতের বেপরোয়া স্বাস্থ্যসেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। এছাড়া চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি, ভুয়া কোভিড-১৯ প্রতিবেদন, কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানোর জন্য সারাদিন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবসহ কিছু অভিযোগও রয়েছে। চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো হলো- গভর্ন্যান্স, ব্যবস্থাপনা

ও বেসরকারি ক্ষেত্র পরিচালনা। এছাড়া বেসরকারি খাতের বিষয়ে কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অভাবও রয়েছে। এ বিষয়ে আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছে–(ক) রোগীর চিকিৎসা বৃত্তান্ত ব্যবস্থাপনা সম্বলিত একটি শক্তিশালী রেফারাল সিস্টেম স্থাপন; (খ) রোগীদের, আইসিইউ, এইচডিইউ এবং অন্যান্য সুবিধাগুলোর রিয়েল-টাইম উপাত্ত পেতে সমস্ত বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রের সঙ্গে সরকারের সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা; (গ) সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন এবং বিকেন্দ্রীভূত ক্রয় ব্যবস্থা প্রবর্তন; (ঘ) আইসিটি ব্যবহার করে অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা করার নীতি তৈরি করা, যেখানে সেবাগ্রহীতারা তাদের অভিযোগ জমা দিতে পারেন এবং সমাধান পেতে পারেন; এবং (ঙ) কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফার্মেসিগুলোকে সংশ্লিষ্ট করে সমন্বিত ও মান বজায় রেখে টেলিমেডিসিন প্রবর্তন এবং সেবার মান নিশ্চিত ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সর্বাগ্রে রাখতে নীতিমালা সংশোধন।

ফ্রিল্যান্সিং: বাংলাদেশ মোট বৈশ্বিক অনলাইন কর্মীদের ১৬ শতাংশ সরবরাহ করে (বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম)। ফ্রিল্যান্সিং বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী যুবকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোভিড-১৯ মহামারী ফ্রিল্যান্সারদের বিগত বছরগুলোয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পাওয়া অর্জনকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে। বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (বিএফডিএস) মতে, কার্যাদেশ ৬০-৭০ শতাংশ কমে যাওয়ায় প্রায় ৮০ শতাংশ ফ্রিল্যান্সার এখন কাজের বাইরে রয়েছেন। কেবল দেশীয় বাজারে যুক্ত ফ্রিল্যান্সাররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। মহামারী চলাকালে ব্যাংকের লেনদেন শুরুর দিকে কিছুটা হলেও বন্ধ ছিল। তবে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আগে থেকে বিদ্যমান জটিলতা মহামারীর সময়েও বড় একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। খাতটি এরই মধ্যে পারিশ্রমিক স্থানান্তরের (পেমেন্ট) সমস্যায় ভুগছে। বৈশ্বিক/স্থানীয় বাজার বিশ্লেষণের অভাব, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শদাতার অভাব রয়েছে। আরও অভাব রয়েছে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রত্যন্ত জায়গায় (লাস্ট মাইল) এবং সাশ্রয়ী মূল্যের উচ্চ গতির ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকারের। উপযুক্ত আর্থিক প্রণোদনার অভাব এই খাতকে আরও প্রভাবিত করে। আইসিটি বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নলিখিত স্বল্পমেয়াদী হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছে–(ক) দেশের বাইরে (ক্রস বর্ডার) থেকে পারিশ্রমিক স্থানান্তরের সমস্যাগুলোর সমাধান; (খ) বৈশ্বিক/স্থানীয় বাজার বিশ্লেষণের প্রসার; (গ) পেশাগত উন্নয়নের কর্মসূচি চালু করা; (ঘ) আইসিটি দক্ষতার গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করা; এবং (ঙ) প্রত্যন্ত অঞ্চলেও (শেষ মাইল) সাশ্রয়ী মূল্যের ও দ্রুতগতির সংযোগ (কানেক্টিভিটি) স্থাপন করা।

উদীয়মান প্রযুক্তি: নতুন বাজার চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো অন্তর্ভূক্ত করছে উদীয়মান প্রযুক্তিগুলো (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, এআই, বিগ ডেটা, ব্লক চেইন প্রভৃতি)। উদীয়মান প্রযুক্তির জন্য সরকার একটি ইকোসিস্টেম তৈরি ও প্রচারের জন্য নীতি ও কৌশলসমূহ চালু করেছে। কোভিড-১৯ সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদীয়মান প্রযুক্তি অবলম্বন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে সহযোগিতা করেছে। বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলের ব্যাঘাতের কারণে কিছু প্রভাব পড়বে, তবে কিছু উদীয়মান প্রযুক্তির নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়ের জন্য মহামারীটি প্রবৃদ্ধির একটি সুযোগে পরিণত হয়েছে। উদীয়মান প্রযুক্তির অনুসরণে মূল বাঁধার মধ্যে পড়ে অপর্যাপ্ত দক্ষতা ও সক্ষমতা বিনির্মাণ, পদোন্নতি এবং তহবিলের অভাব। শিক্ষা খাতে এ-জাতীয় প্রযুক্তির বিষয়ে রয়েছে অপ্রতুল জ্ঞান এবং নীতিমালার অভাব। আইসিটি বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নলিখিত স্বল্প-মেয়াদি হস্তক্ষেপ সুপারিশ করেছে–(ক) উদীয়মান প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করা; (খ) উদীয়মান প্রযুক্তি স্টার্ট-আপগুলো জনপ্রিয় করা; (গ) উদীয়মান প্রযুক্তি সমাধানগুলোর প্রচার ও অর্থায়ন; (ঘ) শিক্ষা খাতে উদীয়মান প্রযুক্তির প্রচার; এবং (ঙ) উদীয়মান/ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি সমাধানগুলোকে সমর্থনকারী নীতি ও কৌশলগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সরকারি খাতের রূপান্তর ও উদ্ভাবন: ২০০৯ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রবর্তনের পর থেকে নানা ধরণের জনসেবা ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী উদাহরণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। সরকার বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের জন্য মন্ত্রণালয়সমূহ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনগুলোর প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের জন্য জাতীয় আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক দ্বিতীয় পর্যায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি এরই মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উপজেলা অফিসে ৮০০ ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করেছে। এ নেটওয়ার্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল উপজেলা পর্যায়ে ১০ জিবিপিএস এবং জেলা পর্যায়ে ১০০ জিবিপিএস সক্ষমতার নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করা। সরকারের ই-গভর্ন্যান্স উদ্যোগে পাঁচটি উপাদান রয়েছে–সেবা প্রক্রিয়া সরলীকরণ বা সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (এসপিএস), 'কম কাগজের অফিস,' সরকারি সেবা পোর্টাল, ভূমি তথ্য সেবা এবং সরকারের ফরম পোর্টাল। এসপিএসের লক্ষ্য সরকারি সেবা সরবরাহের সঙ্গে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো সহজ করা এবং তা সরবরাহে প্রয়োজনীয় সময় কমানো। ২০২০ সালের গোড়ার দিকে মোট ৪২৪টি সরকারি সেবা অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং আরও অন্তর্ভূক্ত করা হবে। কোভিড-১৯ মহামারী 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১'-এ (পিপি ২০৪১) বর্ণিত রূপান্তরশীল উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করেছে। প্রস্তাবিত শীর্ষ পাঁচটি কার্য এজেন্ডা হলো–(ক) ২০০০+ নাগরিককেন্দ্রিক সেবা কার্যকর ও আওতা বাড়ানো; (খ) কাগজবিহীন সরকার; (গ) উদ্ভাবনী সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; (ঘ) উদ্ভাবনী সংস্কৃতিতে নাগরিকের অংশগ্রহণ; এবং (ঙ) উপাত্ত-চালিত নীতি কাঠামো।

বেসরকারি খাত রূপান্তর: বেসরকারি খাত বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগ, উৎপাদন ও রফতানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে। বাংলাদেশে জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল ২৩.৪০ শতাংশ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)। কোভিড-১৯ বাংলাদেশের সব খাতকে প্রভাবিত করেছে এবং বেসরকারি খাতও এর কারণে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, ভোক্তা ব্যয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি বড় নেতিবাচক ধাক্কার মাধ্যমে প্রভাবিত হতে পারে বেসরকারি খাত। আর্থিক খাতও খারাপভাবে প্রভাবিত হবে। কোভিড-১৯-এর কারণে বেসরকারি খাতে সৃষ্ট মূল প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে রয়েছে নির্মাণ ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, বিকল্প চ্যানেলে বিক্রয় স্থানান্তর, বিতরণ ও সরবরাহ-শৃঙ্খল নেটওয়ার্কগুলোয় বাঁধা, আইসিটি এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলোয় প্রবেশাধিকার ও তা ব্যবহার। এছাড়া কঠোর নিয়ন্ত্রক আদেশের কারণে বিশ্ববাজারে প্রবেশাধিকার এবং প্রণিধানযোগ্য কর্মশক্তি ডেটাবেসের অভাবে। এ বিষয়ে আইসিটি বিভাগ নিম্নলিখিত হস্তক্ষেপের প্রস্তাব দেয়: (ক) ডিজিটাল বিভাজন সামলানো; (খ) ডিজিটাল অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা; (গ) স্থানীয় উৎপাদনকারীদের বৈশ্বিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা; এবং (ঘ) কর্মশক্তি ডেটাবেস ডিজিটাইজ করা।

একটি ডোমিনো প্রভাব তৈরি করা: অগ্রাধিকার খাতগুলোয় প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপ বা অ্যাকশন এজেন্ডা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই হিসেবে, একটি খাতে হস্তক্ষেপ বেশ কয়েকটি খাতজুড়ে প্রভাব ফেলতে পারে। এটিকে ডোমিনো ইফেক্ট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আইসিটি বিভাগ বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাতে নিম্নলিখিত অগ্রাধিকারের হস্তক্ষেপ গ্রহণ করবে:

অ্যাকশন এজেন্ডা	নীতি সংশ্লেষ	বাস্তবায়নের সময়রেখা
আইসিটি ও উদীয়মান প্রযুক্তিগুলোয় 'মেইড ইন বাংলাদেশ' জোরদার	• দেশি ও বিদেশি বাজারের জন্য ডিজিটাল ডিভাইসগুলোর জন্য 'মেড ইন বাংলাদেশ' নীতি উন্নয়ন ও আইন প্রণয়ন	অর্থবছর ২০২১
স্টার্ট-আপগুলোর জন্য জাতীয় নীতি এবং এজেন্ডা	• বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে ইকোসিস্টেমের বিকাশের লক্ষ্যে স্টার্ট-আপগুলোর জন্য জাতীয় নীতি প্রবর্তন	অর্থবছর ২০২১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ১০ গুণ গতিশীল করতে আর্থিক তথ্য আন্তঃপরিচালনা (ইন্টারঅপারেবিলিটি)	• উপাত্ত আন্তঃপরিচালন (ইন্টারঅপারেবিলিটি) আইন করা • উপাত্ত সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা আইন কার্যকর করা [যেমন, জিডিপিআর] • উপাত্ত সুরক্ষা ও গোপনীয়তা-সম্পর্কিত স্বাধীন আইনের সঙ্গে সংযোগ রাখতে ডিজিটাল সুরক্ষা আইন, ২০১৮-এর সংশোধন	অর্থবছর ২০২১
ডিজিটাল ডিভাইসে সর্বজনীন সাশ্রয়ী মূল্যের প্রবেশাধিকার	• 'ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেটে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার' কর্মসূচির আওতায় সব নাগরিকের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করা	অর্থবছর ২০২১
ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সংযোগে সর্বজনীন সাশ্রয়ী মূল্যের প্রবেশাধিকার	• জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি, ২০০৯ হালানাগাদ করার জন্য– • ব্রডব্যান্ড সেবা দেয়ার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিনিয়োগকারীদের এবং স্টার্ট-আপগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো • ইন্টারনেটের দাম হ্রাস করতে কর, ভ্যাট ও সারচার্জের সংশোধন	অর্থবছর ২০২২
আন্তঃপরিচালনযোগ্য (ইন্টারঅপারেবল) এবং সংযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম	• স্বাস্থ্য ব্যবস্থা 'ডাক্তারকেন্দ্রিক' থেকে 'স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রিক'-এ রূপান্তরিত • সরকারি ও বেসরকারি উভয় সেবাদাতার জন্য একটি জবাবদিহির কাঠামো বিনির্মাণ • একটি বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য তথ্য আন্তঃপরিচালনযোগ্য (ইন্টারঅপারেবল) প্রোটোকল তৈরি ও এবং প্রয়োগ • সরকারি ও বেসরকারি সেবাদাতার জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থা চালু করা	অর্থবছর ২০২২
কাগজবিহীন সরকার	• কাগজবিহীন সরকারি আইন প্রবর্তন	অর্থবছর ২০২২
বহু উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রোফাইলিংসহ ইউনিভার্সাল আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (ইউআইএস) প্রবর্তন করা	• ইউআইএসের উপযুক্ত নকশা এবং রোডম্যাপের জন্য আন্তঃএজেন্সি কর্মী-গোষ্ঠী • উপাত্ত আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা (ইন্টারঅপারেবল) আইন কার্যকর করা • উপাত্ত সুরক্ষা ও গোপনীয়তা আইন (যেমন, জিডিপিআর) কার্যকর করা	অর্থবছর ২০২২
সিএমএসএমই এবং নাজুক নাগরিকদের জন্য বিকল্প ঋণমান পদ্ধতি	• ১৯৭২ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯২২-এর অধীনে ক্রেডিট ব্যুরো ডেটাবেসের ওপর জোর দিয়ে সিএমএসএমই ঋণমান পদ্ধতির জন্য একটি আইন কার্যকর করা	অর্থবছর ২০২২
স্থানীয় উৎপাদক এবং কুশলীদের (আর্টিসান) জীবিকা নির্বাহের জন্য বটম-আপ ই-কমার্স সহজ করা	• ইন্টারনেটের দাম কমাতে কর, ভ্যাট ও সারচার্জ পর্যালোচনার জন্য জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতি, ২০০৯ হালনাগাদ করা, • ডিজিটাল বাণিজ্য ও বিজ্ঞাপনে আরোপিত করের ছাড়ের জন্য জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতি, ২০১৮ হালনাগাদ করা	অর্থবছর ২০২২

অ্যাকশন এজেন্ডা	নীতি সংশ্লেষ	বাস্তবায়নের সময়রেখা
কৃষি উৎপাদন কৃষকদের দোরগোড়ায় সংযুক্ত করতে ডিজিটাল কমোডিটি এক্সচেঞ্জ	• বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জন্য মানীয় মানের (কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড) জন্য জাতীয় নীতি • জাতীয় কৃষি-পণ্য বিনিময় নীতি	অর্থবছর ২০২২
আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় অর্থনীতির জন্য জাতীয় দক্ষতা রেজিস্ট্রি	• জাতীয় দক্ষতা নিবন্ধন নীতি প্রবর্তন	অর্থবছর ২০২২
ডিজিটাল আর্থিক সেবাগুলোর সর্বজনীন কভারেজ	• জনসংখ্যাজুড়ে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করার জন্য ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতি	অর্থবছর ২০২৩
সকল নাগরিকের জন্য ৪আইআর-এর সঙ্গে সাযুজ্যপূণ মিশ্র শিক্ষার পদ্ধতিতে শিক্ষার রূপান্তর	• ডিজিটাল শিক্ষা নীতি (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ) • যথাযথ এনক্রিপশন নিশ্চিত করতে এবং অনলাইন শিক্ষার সরবরাহকারীদের সুরক্ষার জন্য মেধাসম্পদ অধিকার (আইপিআর) নীতিমালার হালনাগাদকরণ	অর্থবছর ২০২৩
ডিজিটাল সাক্ষরতার সর্বজনীন সাশ্রয়ী প্রবেশাধিকার	• সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি দ্বারা প্রতিটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতার পাঠ্যক্রমের নির্দেশিকা উন্নয়ন • ডিজিটাল সাক্ষরতার জন্য পাঠ্যক্রম এবং বিষয়বস্তু উন্মুক্ত করা (ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সিং)	অর্থবছর ২০২৫
২০২৫ সালের মধ্যে সহজে ব্যবসা করার সূচকে ৫০ (অবস্থান)	• ১৮টি খাতের প্রতিটির জন্য সহজে ব্যবসা করার সূচক নীতি চালy	অর্থবছর ২০২৫

আশা করা যায়, এই পদক্ষেপগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে নিম্নলিখিত ডায়াগ্রামে বর্ণিত ডোমিনো প্রভাব অর্জিত হবে:

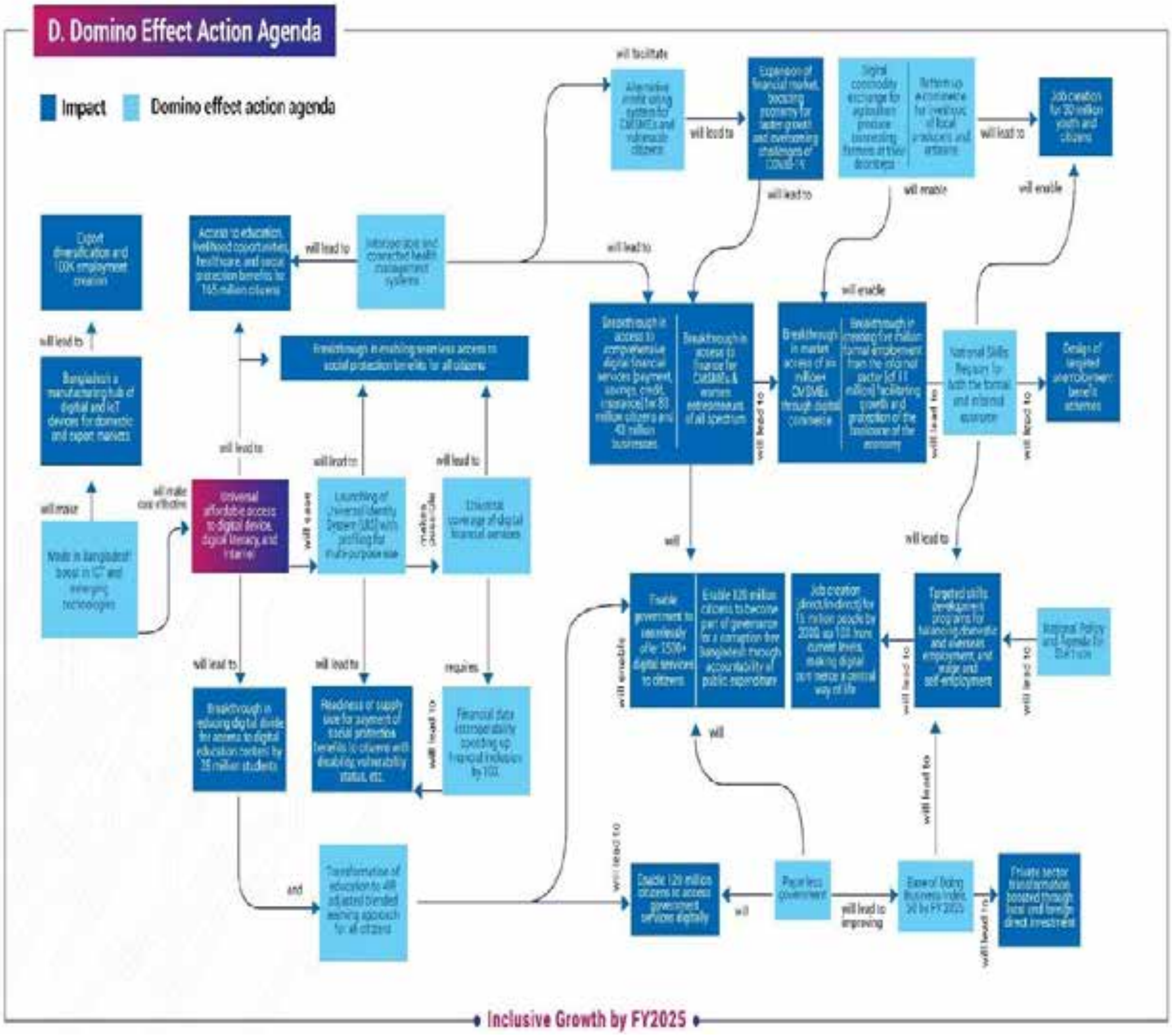

১২.৫ সার্বিক পর্যবেক্ষণ, ঝুঁকির বিষয় ও সুপারিশমালা

সরকারি সেবা সরবরাহ উন্নয়নে, আন্তর্জাতিক ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটাতে এবং নতুন শিল্প সৃষ্টিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রযুক্তিগত হালনাগাদ করার ওপর। কিন্তু আমদানি-নির্ভর প্রযুক্তি হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষুণ্ন করার ঝুঁকি তৈরি করে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মূল্য সংযোজনের জন্য প্রযুক্তিগত বিকাশ ও উদ্ভাবনের বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ করা উচিত।

শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল বাষ্প দিয়ে, পরবর্তীতের ক্রমান্বয়ে আসে বিদ্যুৎ এবং কম্পিউটিং-চালিত শিল্পবিপ্লব। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক পরিসরে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত বড় সাফল্যগুলো আরও আধুনিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেটাকেই সাধারণত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (৪আইআর) বলা হচ্ছে। ৪আইআর-এর যুগে বাংলাদেশের প্রযুক্তি-আমদানি-নির্ভর, শ্রমভিত্তিক মূল্য সংযোজন কৌশল ভয়ানক হুমকির মধ্যে রয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের উচিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব কাজে লাগিয়ে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণে মনোযোগ দেয়া।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডা, আইসিটি এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি হলো মূল ভিত্তি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চাকরি ও আয়ের সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে এই দক্ষতার বিকাশ এবং তা কাজে লাগানোর দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। অন্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে নতুন শিল্প গঠন, পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলা, জ্বালানি ও উপাদান ব্যবহার হ্রাস করা, শিল্প প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় উন্নতি করা ও পুঁজি উপযোগিতা বাড়ানো। এছাড়া রয়েছে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতির মূল চলকগুলোর মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও উদ্ভাবন থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ, আইসিটি ও জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির সুযোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মারাত্মক সক্ষমতার ঘাটতিতে রয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাজার ব্যবস্থা ও নির্দেশনা-সংক্রান্ত ব্যর্থতা–দুটোই মোকাবিলা করা উচিত। এ ধরণের ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক এজেন্ডা প্রাথমিকভাবে প্রযুক্তি আমদানি চালিত। চাকরি সৃষ্টি, স্থানীয় মূল্য সংযোজন এবং অর্থনীতিজুড়ে মূল্য-সংযোজিত প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করার উপযুক্ত সময় এখনই, যা গতানুগতিক আইসিটি শিল্পের সরকারি ব্যয়কেন্দ্রিক রাজস্বের বিপরীত।

উচ্চতর ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেটেড, সংযুক্ত ও স্মার্ট উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের সুযোগ করে দেয়। পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে তথ্য প্রবাহিত হয় ও রিয়েল টাইম ফিডব্যাক দেয়, যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থন দেয়া যায়। এর অনুষঙ্গ হলো স্মার্ট সেন্সর, মেশিন-থেকে-মেশিন যোগাযোগ, রোবট, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, ক্লাউড কম্পিউটিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং থ্রিডি প্রিন্টিং। অ্যানালগ পর্যায় থেকে এই স্মার্ট উৎপাদনের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের মনোনিবেশ করা উচিত জ্ঞানার্জন ও সীমাহীন যথার্থতাকে (পারফেক্ট) অনুসরণ করার শিল্পকুশলতার সংস্কৃতি অবলম্বনে। এর মাধ্যম হবে প্রযুক্তি অভিনিবেশ ও অভিযোজন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন। এটি আমদানি-নির্ভর প্রযুক্তি চালিত উল্লম্ফন কৌশলের বিপরীত ধারণা।

ডিজিটাইজেশন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হুমকি তৈরি হচ্ছে উপাত্ত গোপনীয়তায়, স্থানীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বিদেশিদের হাতে, দেখা দিয়েছে অসাধু প্রতিযোগিতা। এছাড়া স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলোর অনুৎপাদনশীল ব্যবহার হচ্ছে। তরুণদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব এবং প্রযুক্তি আসক্তি বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন ধরণের ডিজিটাল বৈষম্য। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়া দরকার।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে এবং এসডিজি অর্জনের মিশনে রয়েছে বাংলাদেশ। নিম্ন মধ্য আয়ের দেশের মর্যাদা থেকে ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনেও এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ফ্যাক্টরচালিত অর্থনীতি থেকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণের জন্য উচ্চতর ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার বাংলাদেশের জন্য অতীব প্রয়োজন। অর্থনৈতিক মাইলফলক অর্জনের পথে ৪আইআর ও এসডিজি থেকে সুবিধা নিতে এবং তা কাজে লাগাতেও উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এই মিশনে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করতে হলে বর্তমানে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে।

নিম্নগামী ই-পার্টিসিপেশনের (যেভাবে উঠে এসেছে ইউএন ই-গভ সমীক্ষায়) বিষয়গুলোর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। সংস্থা ও নাগরিকদের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার ঘাটতি কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এটি। এর অন্তর্ভূক্ত থাকবে নৃতত্ত্ব (এথনোগ্রাফি); ক্রেতার অন্তর্দৃষ্টি জানার গবেষণা, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ডিজাইন ভাবনা, বোধ তৈরি ও ভবিষ্যৎ ভাবনা।

কোভিড-১৯-এর জবাবে আইসিটি বিভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি পটভূমিতে মানিয়ে নিতে সহায়তা করবে। এটি শিক্ষার প্রযুক্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তথ্য জানাতে প্রমাণের ব্যবহারকে সহজতর করবে।

উপরন্তু সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো দিয়ে সজ্জিত করে আইসিটি বিভাগ একটি ডিজিটাল শিক্ষা ইকোসিস্টেম বিনির্মাণ করবে। ভবিষ্যৎ উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতির প্রস্তুতির জন্য এটি একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থান ভাণ্ডার নির্মাণ করবে। এই বিভাগ শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে, যেন তারা শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন/দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা আয়োজন করতে পারে। যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বা অন্য কোনো উপায়ে শিক্ষার্থী-নিয়ন্ত্রিত মূল্যায়ন ও ব্যক্তিগতকরণ শিক্ষা পরিস্থিতির নকশা প্রবর্তন করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সূচকসমূহ ডিজিটাল বাংলাদেশ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সূচকসমূহে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে সারণি ১২.১২ ও ১২.১৩-তে। ২০৪১ সালের লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত লক্ষ্যসমূহও সারণি দুটিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.১২: ডিজিটাল দুনিয়া ও সূচকসমূহে বাংলাদেশের সক্ষমতার বিবর্তন

আলোকপাতের ক্ষেত্র ও সূচকসমূহ	তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যায়সমূহ					
	২০১৭ পর্যন্ত		২০২১-২০২৫		২০৩১-২০৪১	
বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক, ২০১৮						
	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক	স্কোর (০-১০০)	র‍্যাংক
আইসিটি প্রবেশাধিকার*	৩০.৫	১১১	৫০	৫০	৮৫	২০
সরকারের অনলাইন সেবা	৬২.৩	৬০	৭৫	৪৫	৯০	১৫
ই-পার্টিসিপেশন	৫২.৫	৮২	৭০	৪০	৮৫	২০
আইসিটি ও ব্যবসায়িক মডেল সৃষ্টি	৪৮.৯	১০৮	৬৫	৫০	৭৫	২০
আইসিটি ও প্রাতিষ্ঠানিক মডেল সৃষ্টি	৪২.৪	১০৪	৫৫	৬০	৬৫	৩০
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা প্রতিবেদন, ২০১৮ সালে ১২৭ দেশের মধ্যে র‍্যাংকিং						
	স্কোর (১-৭)	*র‍্যাংক*	*স্কোর (১-৭)*	*র‍্যাংক*	*স্কোর (১-৭)*	*র‍্যাংক*
বিদ্যালয়ে ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার	৩.৩	১১৫	৫	৬০	৬	৩০
ফিক্সড-ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক/১০০ জনে+	৩.৮	৯২	২৫	৫০	৪০	২০
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ কেবিপিএস/ব্যবহারকারী+	৯.২	১১১	৪০	৬০	৫৫	৪০
মোবাইল-সেলুলার টেলিফোন *গ্রাহক/১০০ জনে+	৭৭.৯	১২১	১০০	৭০	১২০	৪০

** ওয়্যারলাইন ব্রডব্যান্ড প্রবেশাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে + স্কোর ১-৭ স্কেলে নয়*

সারণি ১২.১৩: উদ্ভাবন সমর্থনে পরিবর্তনশীল উৎপাদন অগ্রাধিকার

আলোকপাতের ক্ষেত্র ও সূচকসমূহ	তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মেয়াদে বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যায়সমূহ					
	২০১৭ পর্যন্ত		২০২০-২০২৫		২০৩১-২০৪১	
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তৈরি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে অবস্থান						
সূচক	*স্কোর (১-৭)*	*র‍্যাংক /১৩৭*	*স্কোর (১-৭)*	*র‍্যাংক /১৩৭*	*স্কোর (১-৭)*	*র‍্যাংক /১৩৭*
উৎপাদন প্রক্রিয়া জটিলতা	৩.৭	৭৯	৪.৫	৫০	৬	৩০
উদ্ভাবনের জন্য সক্ষমতা	৩.৮	৯৭	৪.৫	৬০	৫	৩৫
আরঅ্যান্ডডিতে কোম্পানির ব্যয়	২.৮	১১৩	৩.৮	৬৫	৪.৫	৩০
আরঅ্যান্ডডিতে বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প সহযোগ	২.৫	১৩০	৩.৯	৭০	৪.৫	৩৫
জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে টিএফপির অবদান	০.৩ শতাংশ		২.৫ শতাংশ		৪.৫ শতাংশ	

১২.৬ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বরাদ্দ

আইসিটি সেবার সম্প্রসারণ অর্থায়ন মূলত বেসরকারি খাত থেকে হবে। গত এক দশকে বিদেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উচ্চ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখে স্বস্তি পাওয়া যায় এই ভেবে যে, বাংলাদেশের আইসিটি খাত তহবিল সংকটে ভুগবে না। সরকার কর-বিষয়ক সমস্যার বিষয়ে সচেতন এবং সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করার বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে। আইসিটি বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে নিশ্চিত করতেও উদ্যোগ নেবে। সরকারি বিনিয়োগের বিষয়ে বলা যায়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় শক্ত ভিত্তি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধান বিনিয়োগ অগ্রাধিকার হবে:

- চলমান সব আইসিটি প্রকল্পের সন্তোষজনক ও দ্রুত সমাপ্তি নিশ্চিত করা।
- আইসিটি সেবার প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত গতি নির্ভরযোগ্যতার মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো হালনাগাদ করা।
- আইসিটি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরঅ্যান্ডডির জন্য তহবিল সরবরাহ।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের আইসিটি সক্ষমতা বিনির্মাণের জন্য তহবিল সরবরাহ।
- গ্রামীণ এলাকায় সেবা সম্প্রসারণে আইসিটি উদ্যোগকে সহায়তা দেয়া (ক্লাউডনির্ভর সেবা, জাতীয় হেলপলাইন, বিপিও, ইনকিউবেশন সেন্টার, আইসিটি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি প্রভৃতি।
- ই-গভর্নমেন্ট মহাপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন
- পণ্য উদ্ভাবন ও ইকোসিস্টেম সৃষ্টিতে সহায়তা দেয়া
- যথাযথ বিনিয়োগ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে বস্তুগত প্রণোদনা দেয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
- ভার্চুয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, মাল্টিমিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, বিপিও, ফ্রিল্যান্সিং ও আইসিটি উদ্ভাবনের বাজার হিসেবে বিপণনে সহায়তা।

আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সম্পর্কিত এডিপি সারণি ১২.১৪ ও ১২.১৫-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২.১৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইসিটি খাতে এডিপি বরাদ্দ
(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৯১.০	৯২.৩	১০৬.৪	১২৪.২	১৪৯.০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭.০	২৫.৪	৩৯.৯	৫৫.৯	৭৪.৫
খাতে মোট	**১০৮.০**	**১১৭.৭**	**১৪৬.৩**	**১৮০.১**	**২২৩.৫**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি এ৫.১

সারণি ১২.১৫: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আইসিটি খাতে এডিপি বরাদ্দ
(২০২১ অর্থবছর স্থির মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৯১.০	৮৭.৬	৯৬.১	১০৬.৯	১২২.৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭.০	২৪.১	৩৬.০	৪৮.১	৬১.২
খাতে মোট	**১০৮.০**	**১১১.৭**	**১৩২.১**	**১৫৫.০**	**১৮৩.৬**

সূত্র: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি এ৫.২

খাত-১৩:

বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

অধ্যায় ১৩

সংস্কৃতি, তথ্য, ধর্ম, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন

১৩.১ প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা

বিভিন্ন জাতির বিকাশ তার জনসংখ্যার সমন্বয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের ওপর নির্ভর করে। কেননা এটি জাতি গঠনে অনেক মানুষের প্রচেষ্টা, প্রতিক্রিয়া ও সক্ষমতা সম্পর্কে আগাম তথ্য দেয়। এছাড়া তারা তাদের জীবনে যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাও প্রভাবিত করে। সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখার অর্থ একটি জাতির জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে সমর্থন ও সমুন্নত রাখা। একটি দেশের মানুষ যেভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তার প্রবল প্রভাব জাতির কল্যাণেও রয়েছে। বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস রয়েছে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। তা ছাড়া সাহিত্য, সংগীত ও চারুকলার ক্ষেত্রেও দেশের বুদ্ধিজীবীরা অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান বৈশ্বিক গ্রাম (গ্লোবাল ভিলেজ) প্রেক্ষাপটে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ও বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করা নাগরিকের দায়িত্ব। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনেও কোনো জাতির পরিচয় অন্তর্নিহিত রয়েছে। এটি আবার আমাদের জাতির সাংস্কৃতিক গঠনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ও ধর্মচর্চার সহ-অস্তিত্ব সহনশীল একটি সমাজ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে একজনের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুশীলনের বৈষম্যহীন স্বাধীনতা এবং সব ধর্মের মর্যাদা প্রদর্শন করা বিভিন্ন জাতির বিকাশের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে দারুণভাবে সক্রিয় থাকার জন্যও তা প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাই ধারাবাহিকভাবে দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুশীলনের বিস্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও ন্যূনতম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা জরুরি। এই বিষয়গুলো এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়, সেইসঙ্গে রয়েছে যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়ার বিকাশ। বাংলাদেশ এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জনসংখ্যার সমন্বিত একটি দেশ। জনসংখ্যার এই অংশ আমাদের জাতীয় জনমিতিক সম্পদ। বাংলাদেশের জন্য যুবসমাজের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের স্বার্থে তাদের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন করা জরুরি। কেননা তা দেশের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য দরকার। এছাড়া দেশে জলবায়ু পরিবর্তন, জঙ্গিবাদ, বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং দারিদ্র্য-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বা আজকের যুবসমাজে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে।

দেশের যুবসমাজের উন্নয়নে সরকার নিবেদিত। তাই সরকার আগামী পাঁচ বছরে তাদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে, যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি, যেমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের পথ প্রশস্ত করা যায়।

১৩.২ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন সংস্থা/ইউনিটের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়টি মূলত সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কলা ও সাহিত্যের সংরক্ষণ, গবেষণা ও বিকাশের মাধ্যমে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান সমৃদ্ধ করার দিকে আলোকপাত করছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, যা সারা দেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুস্থ বিকাশ ঘটাবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি সংস্থা সারা দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সংরক্ষণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে–বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, জাতীয় জাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, কপিরাইট অফিস এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাতটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যা তিনটি নতুন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করতে হবে।

১৩.২.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে অগ্রগতি

ব্যাপক গুরুত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য রেফারেন্স গ্রন্থ বিকাশে গৃহীত কর্মসূচি অব্যাহত ছিল। জাতীয় ঐক্য কাঠামোর অধীনে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। বিলুপ্তির পথে থাকা বহু দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য ডিজিটালাইজেশন প্রচেষ্টা কার্যকর করা হয়েছিল। মন্ত্রণালয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর গুরুত্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে, যা প্রতিফলিত হয়েছে আরও উন্নয়নের জন্য জাতীয় সমীক্ষা ও সংরক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে। জাদুঘর ও লোকশিল্প বিকাশের জন্য কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। চারুকলার মর্যাদা বাড়াতে জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চারুকলার বিভিন্ন বিষয় চালু করা হয়েছিল।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন সংস্থার ধারাবাহিক প্রয়াস অতীতে দারিদ্র্য হ্রাস এবং জেন্ডার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে প্রভাব রেখেছে। ভবিষ্যতেও এতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্প ও সংস্কৃতি অনুসরণের সুবিধার্থে অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। দুঃস্থ সাংস্কৃতিক কর্মীদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের দারিদ্র্য হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এজন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল, যা এখনো বাস্তবায়নাধীন আছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং গণগ্রন্থাগার বিভাগের অধীনে যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমি এবং গ্রন্থাগার স্থাপন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। দরিদ্র শিক্ষার্থী ও জনগণকে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় গ্রন্থাগার থেকে বিনা মূল্যে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিল। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক নিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক সংস্কার, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোর সংরক্ষণ ও বিকাশও দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘরগুলোয় বিপুল পর্যটকদের আনাগোনা স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

জনসাধারণের জন্য পঠন সেবা সরবরাহ ও সম্প্রসারণের জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে। শিখন ও জ্ঞান বিতরণকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এই নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। তদুপরি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাবলিক লাইব্রেরি থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশোনা ও চিত্তবিনোদনের জন্য পড়াশোনায় প্রবেশাধিকার অর্জনে সক্ষম হয়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থার আওতায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণমূলক গৃহীত কার্যক্রম জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর আরও শেখার পথ প্রশস্ত করেছে। এতে অবদান রেখেছে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গৃহীত লোকশিল্প ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও বিকাশ। তদুপরি, সাংস্কৃতিক অবকাঠামো উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ থেকেই দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এর ফলে নারীর বৃহত্তর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা, মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়েছে, যা মহিলাদের সামগ্রিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। গত তিন অর্থবছরে আটজন নারীকে কোশী পদক এবং ৩.৯৫ মিলিয়ন নারীকে পঠনসেবা দেয়া হয়েছিল এবং ৩৬০ জন মহিলাকে সংগীতের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘অমর একুশে বইমেলা’ অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য প্রচুর স্টল বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৮৩ জন নারীকে লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এই কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশের নারীদের আস্থা, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আরও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ছিল।

সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল বেশি। এছাড়া লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগের মাধ্যমে মহিলাদের দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিকাশ, সচেতনতা ও অনুশীলনগুলো জাতির তরুণদের মন-মানসিকতা ও চেতনা তৈরিতে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্তি ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি সমাজে সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা, মাদকের আসক্তি বা অনুরূপ নেতিবাচক প্রভাবের (বিশেষত তা যুবসমাজের মধ্যে) বৃদ্ধি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নানা বিষয়ে যুবসমাজের মূল্যবোধ ও মানসিকতা গঠনে সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা সম্পর্কে ইতিবাচক ও মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিযোগিতা, প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক বিনির্মাণ।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো

বাংলাদেশের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ের ব্যক্তিদের জড়িত করা প্রয়োজন। বেশকিছু অস্পর্শযোগ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যেমন ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, পারফর্মিং আর্টস, সংগীত প্রভৃতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে। এগুলো নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ ও সমুন্নত করার জন্য জরুরি প্রচেষ্টা এবং হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। ঐতিহ্যের এই প্রতীকগুলোর পুনঃস্থাপন, সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। এ জাতীয় সূক্ষ্ম কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনের পাশাপাশি মানবসম্পদেরও অভাব রয়েছে। এই সংস্থানগুলোর জরুরিভাবে উন্নয়ন করা দরকার। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রচার ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নগদ প্রণোদনার মাধ্যমে সরকার কোভিড-১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পীদের সহায়তা করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাসমূহ প্রসারিত করতে চায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটগুলো অমূল্য সম্পদ এবং বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস চিহ্নিত করে। দুর্ভাগ্যক্রমে তহবিলের ঘাটতি, দক্ষ মানব সম্পদ এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার মতো বিষয়গুলোর কারণে এই স্থানগুলোর বেশিরভাগই অনাবিষ্কৃত রয়েছে এবং এখনো সংরক্ষণ বা পুনরুদ্ধার করা যায়নি। এটিকে মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত ও নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা করা দরকার। অন্যান্য খাতের মতো প্রেক্ষিত, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন শিল্প, সংগীত, নৃত্য, থিয়েটার প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে বিপুলসংখ্যক বিষয় ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা দরকার।

১৩.২.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় দেশজুড়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জনপ্রিয় করা হবে। সাহিত্য, চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টস প্রসারের পাশাপাশি অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতার দিকে সংস্কৃতি-সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ তৈরি ও প্রচারের দিকে মনোযোগ দেয়া হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১.৪-এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রাগুলো অন্তর্ভূক্ত করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে ‘বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার’-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ রয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো:

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার বিকাশে প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রচার; ঐতিহাসিক ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, স্মৃতিসৌধ (প্লাজা), গণকবর প্রভৃতি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, বিশেষত যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ী কর্মসূচি পরিচালনা।
- মানসম্পন্ন বইয়ের উৎপাদন ও প্রকাশনায় সহায়তা ও প্রচার করা এবং এগুলো যুক্তিসংগত মূল্যে জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করা।
- জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- আমাদের জাতির কীর্তিমান পুরুষ ও নারীদের জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।
- ‘অমর একুশে’ উপলব্ধির প্রস্ফুটন ঘটানো।
- জাতীয় থেকে গ্রামীণ স্তরে একটি গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ এবং পুরো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি চালু করা।
- জনগণের মূল্যবোধ, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে সারাদেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও নাগরিকের অংশগ্রহণ বিষয়ে প্রচার এবং তা প্রতিপালন করা।
- নাটক, থিয়েটারসহ চারুকলা ও পারফর্মিং আর্টের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধাগুলো উন্নয়ন করা এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করা।
- জাতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা।

- অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সংবেদনশীলতার মাধ্যমে সুনাগরিকত্ব জনপ্রিয় করা।
- মেধাসম্পত্তির কপিরাইট অধিকার রক্ষা করা।
- জাতীয় ঐক্য ও সচেতনতার কর্মকাঠামোর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং প্রচার করা।
- সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উপাদান বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা, যার মধ্যে তাদের নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, ঐতিহ্য, কারুশিল্প, ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মূর্ত ও অমূর্ত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এগুলোকে আরও দৃশ্যমান ও উন্নত করার জন্য উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালিত করা।
- প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সংস্কৃতি বিনিময় করা।
- তরুণ প্রজন্মকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে সন্ত্রাসবাদ, মাদকাসক্তি ও আধুনিকায়নের অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ঐতিহ্যবাহী বা স্থানীয় সংস্কৃতির চর্চা উৎসাহিত করা হবে।

১৩.২.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কৌশলসমূহ

- প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর সুরক্ষা জোরদার করার জন্য পুরাকীর্তি আইনের সংশোধন করা।
- সাংস্কৃতিক খাতের স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রসারে সহায়তা করার জন্য কপিরাইট আইন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন করা।
- সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের শিক্ষা, বিনোদন, সংস্কৃতি ও তথ্যের প্রয়োজন মেটাতে জাতীয় থেকে গ্রামীণ পর্যায়ে গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং সেবাসমূহ বিকাশের জন্য নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে।
- প্রত্নতাত্ত্বিক জায়গাগুলোয় জাতীয় সমীক্ষা চালানো হবে এবং প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন বৃদ্ধির জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন করা হবে।
- সংগীত, চিত্রকলা, শিল্পকলা ও কারুশিল্প, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য, নাট্য পরিবেশনা, নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের মতো সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো শিক্ষা নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তন করা হবে।
- সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুশীলনের আরও ভালো সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য অবকাঠামোগত সুযোগগুলো তৃণমূল পর্যায়ে প্রসারিত করা হবে।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে রেফারেন্স গ্রন্থ বিকাশের জন্য গৃহীত কর্মসূচি আরও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে চলমান থাকবে।
- বইয়ের বিকাশ ও পড়ার অভ্যাস বিনির্মাণের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- দেশের কীর্তিমান ব্যক্তিদের জীবন ও কাজ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্মারক গ্রন্থাগার এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে।
- বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি প্রচার ও সংরক্ষণ করা হবে, যেমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অঞ্চলে আরও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ও ভাষা কেন্দ্র স্থাপন।
- তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের প্রচার চালিয়ে যাওয়া। সারাদেশে স্কুলভিত্তিক নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে এই কর্মসূচি জোরদার করা হবে।
- প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট, জাদুঘর ও নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘরের আরও উন্নয়নে কর্মসূচি হাতে নেয়া হবে এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো শনাক্ত ও সংরক্ষণ করা হবে;
- সাংস্কৃতিক বিকাশে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পদ ও কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হবে।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সংরক্ষণ কাজের সম্প্রসারণ করা।
- ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় আরও নতুন নতুন স্থান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গবেষণা, জরিপ ও নথিবদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রসারিত করা।
- ভিশন ২০৪১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মাধ্যমে সকল ধরণের সামাজিক অবমাননা, সন্ত্রাসবাদ ও জেন্ডার বৈষম্যের মতো সামাজিকভাবে নেতিবাচক দিকগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মোকাবিলা করা হবে। সব ধরণের নেতিবাচক সামাজিক বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে।

১৩.৩ তথ্য

সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচির বিষয়বস্তু জাতির কাছে সময়মতো তথ্য তুলে ধরার মাধ্যমে তথ্য মন্ত্রণালয় একটি বড় উন্নয়নমূলক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক তথ্য বিনিময়ের সুবিধামতো পরিবেশ তৈরি করতে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি

বিজ্ঞাপন ও তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের কারণে পৃথিবী একটি বৈশ্বিক গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। এই আলোকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ-ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা, সম্প্রচার ও পরিচালনার জন্য 'কমিউনিটি রেডিও নীতি ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সময়ে বাংলাদেশে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশনে রূপান্তর ২০14 রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় রোডম্যাপ টিম (NRT) এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) এতে সহায়তা করেছে। গুজব ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই নীতিগুলোকে বাস্তবে রূপান্তর করতে তথ্য মন্ত্রণালয় বিগত পাঁচ বছরে প্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই উদ্যোগগুলোর মূল লক্ষ্য গণযোগাযোগ নেটওয়ার্কিংয়ের তাক লাগানো উন্নয়নের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও বিশ্বায়নের উৎকর্ষের কারণে বিশ্বজুড়ে এই উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত কার্যক্রম এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে:

১. বাংলাদেশ বেতারের মিড-ওয়েভ ট্রান্সমিটারের ডিজিটালাইজেশন ও আধুনিকীকরণ।
২. বাংলাদেশ টেলিভিশনের সদর দফতর নির্মাণ।
৩. বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।
৪. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ বিল্ডিং নির্মাণ।
৫. বিএফডিসিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সূচনা এবং বিএফডিসির আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।
৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি প্রতিষ্ঠা (প্রথম ধাপ)।
৭. শিশু ও মহিলাদের উন্নতির জন্য যোগাযোগ কার্যক্রম।
৮. ময়মনসিংহ ও গোপালগঞ্জে দুটি সম্পূর্ণ ১০ কিলোওয়াট রেডিও স্টেশন স্থাপন।
৯. বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রোগ্রাম প্রস্তুতির জন্য মানবসম্পদের সক্ষমতা বিকাশ।
১০. চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে তথ্য ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন।
১১. বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচার।

সেরা অনুশীলন ও সীমাবদ্ধতা

তথ্য মন্ত্রণালয় দেশের জনগণের কাছে সরকারের বিভিন্ন ধরণের সংবাদ এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পৌঁছে দিতে প্রতিনিয়ত সক্রিয় রয়েছে। সেইসঙ্গে গণমাধ্যমের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদারকিও করছে। উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সময়ে সময়ে অসংখ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেগুলো হলো: উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাজেট ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রণয়ন। ফলস্বরূপ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১. উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদনের পরপরই প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।
২. প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প অঞ্চলগুলোতেই থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
৩. প্রকল্পগুলোর সমস্ত ক্রয় (প্রকিউরমেন্ট) ই-জিপি পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে।
৪. প্রকল্পের তদারকির জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে।

তবে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সংযুক্ত দপ্তরগুলোয় দক্ষ কর্মকর্তাদের অভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি পেয়েছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) বাস্তবায়নে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন লক্ষ্য ও উদ্যোগসমূহ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেয়া অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, সেইসঙ্গে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, নির্বাচনী ইশতেহার, ভিশন-২০৪১, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ প্রভৃতির জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় অসংখ্য উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশ টেলিভিশন

- সারা দেশে বিটিভির একটি পূর্ণ নিউজ নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি জেলায় বিটিভির নিউজ টিম গঠন।
- ২০২১ সালের মধ্যে বিটিভি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে (ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার) শতভাগ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।
- ২০২২ সালের মধ্যে বিটিভি ওয়ার্ল্ড স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি পৃথক স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে ভার্চুয়াল স্টুডিও স্থাপন এবং সর্বাধুনিক অ্যানিমেশন ইউনিট তৈরি করা হবে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে সারাদেশে বিটিভির ১০০ শতাংশ টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার ব্যবস্থার ডিজিটালাইজেশন করা হবে।
- স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ টিভি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে বিটিভির নিজস্ব সম্পূর্ণ ডিজিটাল সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিটিভির সম্প্রচার নেটওয়ার্ক পুরো বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ বেতার

- ২০২১ ও ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারের ১২টি নতুন এফএম সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে; উপকূলীয় অঞ্চলসহ পুরো দেশকে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।
- ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা হবে ও ডিজিটাল সরঞ্জাম স্থাপন করা হবে।
- বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারটি ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব জায়গায় সরকারি কোয়ার্টার স্থাপন করা হবে।
- ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারের সাংবাদিকদের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কিত তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি করা হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বেতারের অনলাইন নিউজলেটার, স্ব-সংরক্ষণাগার (সেলফ-আর্কাইভিং) সেল প্রতিষ্ঠা, স্পট রিপোর্টিং, পৃথক নিউজ স্টুডিও, মোবাইল সাংবাদিকতা এবং পূর্ণাঙ্গ করেসপনডেন্স কাঠামো চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

গণযোগাযোগ

- সরকারকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে গণযোগাযোগ বিভাগের ২৬টি জেলা তথ্য অফিস ও জেলা তথ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হবে এবং বাকি ৪২টি ২০৩০ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হবে।
- ২০২২ সালের মধ্যে সারা দেশে পুষ্টি সচেতনতা বাড়াতে বিশেষ প্রচার চালানো হবে।
- গণযোগাযোগ বিভাগের ডিজিটাল যোগাযোগ ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার ২০২৫ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে সুস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগণের জন্য পর্যাপ্ত ফিল্ম প্রদর্শনী, গান, কর্মশালা, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)

- আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ চলচ্চিত্রশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- বিএফডিসি কমপ্লেক্স ২০২২ সালের মধ্যে নির্মিত হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে বিএফডিসির অবকাঠামো উন্নয়ন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশজুড়ে ডিজিটাল ফিল্ম ডিসপ্লে সিস্টেম চালু করা হবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংরক্ষণাগার (ফিল্ম আর্কাইভ)

- ২০২১ সালে ঢাকায় ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভস (ঋওঅঋ) সম্মেলনের আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংরক্ষণাগারের সক্ষমতা বাড়ানো হবে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্টগুলো দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে জোগাড় করে আর্কাইভে রাখা হবে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ

- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রমকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি স্থাপন করা হবে।
- গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ৫৯৬ টিভি ফাইলারস, ৮৩টি ডকুড্রামা এবং ১৯২টি ডকুমেন্টারি বিটিভি ও বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারের জন্য বিতরণ করা হবে।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

- ২০২২ সালের মধ্যে বাসস-এর অডিও ভিজুয়াল নিউজ চালু করা হবে। এ লক্ষ্যে অডিও ভিজুয়াল নিউজ তৈরি করতে বাসস-এর সাংবাদিকদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি)

- ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সেল ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হবে ২০২২ সালের মধ্যে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)

- ২০২২ সালের মধ্যে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও সাংবাদিকদের সুরক্ষায় সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

- ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো স্থাপন করা হবে।
- ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের দক্ষতা এবং পেশাদার দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

- ২০২৫ সালের মধ্যে নতুন বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট তাদের নিজস্ব আঙ্গিনায় (ঈধসঢ়ঁং) প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করবে।

মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বিনির্মাণ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্যে প্রবেশাধিকার এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ আবশ্যক। এক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমস্ত সংযুক্ত বিভাগ থেকে সম্ভাব্য প্রকল্প পরিচালকদের প্যানেল প্রস্তুতকরণ এবং নির্বাচিত কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান। এছাড়া তাদেরকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কর্মবন্টন এবং দায়িত্ব-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সরবরাহ করা যেতে পারে।
- উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) পর্যায়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা উচিত।
- দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রচার কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা উচিত এবং বাকি বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করা উচিত।

১৩.৪ ধর্ম বিষয়ক:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সাল থেকে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে চালু রয়েছে। দেশের প্রধান চারটি প্রচলিত ধর্ম ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্মকে ঘিরে সরকারের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম এই মন্ত্রণালয় পরিচালনা ও তদারকি করে চলেছে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান প্রধান কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো হলো–ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ হজ অফিস ঢাকা এবং জেদ্দা/মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মন্ত্রণালয়ের কিছু প্রশাসনিক শাখা। মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য হলো দেশে ধর্মীয় বিষয় ও এ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড উন্নত করা। মানব সম্পদ উন্নয়নের অব্যাহত উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব (ঐক্য), মূল্যবোধ, সম্প্রীতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কাজ করা।

ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি;
২. হজ্জ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন;
৩. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ;
৪. জাকাত ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;
৫. ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ রোধে জনসচেতনতা কার্যক্রম।

১৩.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে চলাকালীন অগ্রগতি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এগুলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, শিক্ষা কর্মসূচি এবং ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে। মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলো বিভিন্ন কর্মসূচিতে জড়িত রয়েছে, যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি যুব উন্নয়নে অবদান রেখেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি বড় উন্নয়ন সাফল্য নিম্নরূপ:

(ক) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণসাক্ষরতা কর্মসূচি (ষষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প: এই প্রকল্পের আওতায় ৭৩ হাজার ৭৬৮ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলো ৯.৮৬ মিলিয়ন (৯৮ লাখ ৬০ হাজার) শিশু ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের বুনিয়াদি সাক্ষরতা, ইসলামি মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সহায়ক ছিল।

(খ) মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ (দ্বিতীয় ধাপ): এই প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকার মসজিদে ৪ হাজার ৫০০টি নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছিল। এগুলো পাঠাভ্যাসের সুবিধা সরবরাহ করে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং জ্ঞান বিস্তারে অবদান রাখে।

(গ) বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলাগুলোয় ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন: এই উদ্যোগের অধীনে নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। এর উদ্দেশ্যের মধ্যে আরও রয়েছে দিনমজুরদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় সুবিধা সরবরাহ করা।

(ঘ) শিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং বায়তুল মোকাররম ডায়াগনস্টিক সেন্টার শক্তিশালীকরণ প্রকল্পসমূহ: শিরতা, ময়মনসিংহ ও কালকিনি, মাদারীপুর ইসলামিক মিশন হাসপাতাল কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন। এগুলো সমাপ্ত হওয়ার পর দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা সরবরাহ করা হবে।

(ঙ) গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প: বর্তমানে নির্মাণাধীন গোপালগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সের লক্ষ্য হলো ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেয়া, যেন তারা সামাজিক উন্নয়নে আরও অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি তারা যেন আরও স্বাবলম্বী হয় এবং সমাজের দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে মৌলিক/প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা সরবরাহ করার জন্য জ্ঞান অর্জন করে।

(চ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জাতীয় পর্যায় এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলোয় বইয়ের সংগ্রহ ও পাঠকসেবার সম্প্রসারণ প্রকল্প: এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ইসলামি ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে বই সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার এবং ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। এটি গ্রন্থাগারের বইয়ের মজুতকে প্রসারিত করেছে, সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জানার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার বাড়িয়ে দেয়।

(ছ) ইসলামি বইয়ের প্রকাশনা প্রকল্প (দ্বিতীয় ধাপ): এই প্রকল্পের আওতায় ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৮ হাজার ৯৮ ফরম্যাট বই প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ যেন তা কিনতে পারে, সেজন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন জেলা অফিসগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে।

বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, পবিত্র কোরআন শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ৯৬ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

এই প্রকল্পগুলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় বাস্তবায়িত হয় এবং কয়েক বছর ধরে অন্যান্য পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো ধর্মীয় শিক্ষার উন্নয়নে এবং আরও ভালো নৈতিক ও দায়িত্বশীল আচরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উপলব্ধি তৈরিতে অবদান রেখেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার তাৎপর্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসার ও ধর্মচর্চার স্বাধীনতায় বাংলাদেশ গর্ব করে। তা সত্ত্বেও আরও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। যথাযথ বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে প্রভাব রাখার জন্য এখনো যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পর্যাপ্ত দক্ষ মানব সম্পদ ও সক্ষমতা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে। সামগ্রিক প্রকল্পগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নানাভাবে বাঁধার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে রয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাজেট বরাদ্দ ছাড়করণের ক্ষেত্রে দেরি, অপ্রতুল প্রশিক্ষণ সুবিধার কারণে দক্ষ জনবলের অভাব, প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়মতো মানব সম্পদ নিয়োগ এবং নির্মাণ প্রকল্পের জন্য পণ্য, সেবা বা জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব প্রভৃতি। এই নির্মাণাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর যথাযথ ও সময়োপযোগী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে এবং সবচেয়ে কার্যকর ও সুফল নিশ্চিত করতে উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাগুলো সমাধান ও অনুমোদনের (অথোরাইজেশন) প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৩.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো দেশের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য বিবেচনায় আরও আনা হয়েছে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ভিশন ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০। উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বছর বা তার বেশি বয়সের শিশুদের তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি করা, নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী ও প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা এবং তাদের নৈতিকতা উন্নয়ন ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শেখার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা প্রভৃতি সংস্কার, মেরামত ও নির্মাণ করা।
- সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় বইয়ের প্রকাশনা এবং তা দেশব্যাপী বিতরণ করা।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা, সংস্থাটির সম্প্রসারণ, মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ ও নির্মাণকাজসমূহের ব্যাপ্তি বাড়ানো।
- পেশাগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতার কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ।
- জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য ইমাম ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ, একই সঙ্গে হাওর ও জলাভূমি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

১৩.৪.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল এবং লক্ষ্যসমূহ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলো অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন কৌশল/লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই কৌশলগুলো/লক্ষ্যগুলো সংস্থাভিত্তিক নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাপ্তবয়স্কদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখা। মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষা, ইসলামি শিক্ষা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি অর্জনের সুযোগ তৈরিতে দারুল আকরাম মাদ্রাসাগুলোকে প্রস্তুত করা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ৮.৭৬ মিলিয়ন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী ও বস্তিতে কাজে থাকা শিশুদের জন্য পবিত্র কোরআন শেখার সুযোগ তৈরি ও তা সহজতর করা।
- গড়ে চার মিলিয়ন মানুষের জন্য নামাজের সুবিধার্থে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা।
- বাংলাদেশের এক হাজারটি ঐতিহাসিক মসজিদ সংস্কার, মেরামত ও নির্মাণ।
- বিভিন্ন ইসলামি বিষয় ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ইস্যুতে আজীবন শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য দেশজুড়ে ১০ হাজার মসজিদ গ্রন্থাগার স্থাপন করা।
- স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং ভালো জীবনযাত্রার চর্চা প্রচারে সহায়তা করার জন্য সারা দেশে ইসলামিক মিশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা। এর লক্ষ্য হলো সংক্রামক এবং অ-সংক্রামক রোগগুলো প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা করা।
- ইসলামি গবেষণা ও ইসলামি বিশ্বকোষের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর ধর্মীয় বই প্রকাশ করা। ইমাম/ধর্মীয় নেতাদের বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু, যেমন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, বাল্য বিবাহর ঝুঁকি, কৃষিকাজ, বনায়ন, যৌতুক, নারী নির্যাতন এবং সন্ত্রাসের নেতিবাচক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সহায়তার মাধ্যমে সারা দেশের ইমাম মুয়াজ্জিনদের সুদমুক্ত ঋণ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট, যেন তারা জীবনমান উন্নত করতে পারে।
- জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ কৌশল উন্নত করা।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

- মন্দির ও দুর্গা মণ্ডপে আর্থিক সহায়তা দেয়া।
- বাচ্চাদের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।
- তীর্থযাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা কর্মসূচির আয়োজন করা।
- ধর্মীয় বইয়ের প্রকাশনা।
- মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকাভুক্তকরণ।
- পুরোহিত ও সেবীদের (সেবাত) প্রশিক্ষণ দেয়া।
- মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা।
- মন্দির এবং হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও বিকাশ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

- প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের তালিকাভুক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা, যা নতুন প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতির অন্যতম লক্ষ্য।
- প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যা প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিমালারও অন্যতম লক্ষ্য।
- মঠ/প্যাগোডা চত্বরের মতো ধর্মীয় স্থান ব্যবহার করে ত্রিপিটক শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে পবিত্র বিষয় এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসের ওপর যথাযথ শিক্ষা ও জ্ঞান বাড়াতে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া।
- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধাগুলো উন্নত ও সম্প্রসারণে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামত ও সংস্কার করা।
- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য প্যাগোডাভিত্তিক গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- বৌদ্ধ পরিবার আইন-সম্পর্কিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

- বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণাদের দক্ষতা এবং জ্ঞানের প্রসার ও উন্নতির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের স্বনির্ভরতা অর্জন করা।
- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংস্কৃতি ও অনুষ্ঠান অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ নিশ্চিত করা এবং অব্যাহত রাখা।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ

- গির্জাগুলোকে আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করা।
- শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান।
- জাতীয় দিবস ও আধ্যাত্মিক পার্বণসমূহে আলোচনা সভার আয়োজন করা।
- ধর্মীয় বইয়ের প্রকাশনা।
- চার্চভিত্তিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা।
- গির্জা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও উন্নয়ন।

১৩.৫ ক্রীড়ার উন্নয়ন

১৩.৫.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে প্রাথমিক স্তরে স্কুল পর্যায়ে খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং ধীরে ধীরে তা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত উন্নয়ন ও পদ্ধতিবদ্ধ করা হয়েছে। খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায়ে উন্মুক্ত স্টেডিয়াম এবং ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা ও ফিটনেসকে উৎসাহিত করার জন্য দেশজুড়ে সুইমিং পুল তৈরি। বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও সিলেটের ফুটবল একাডেমির সংগঠিত পরিচালনার মাধ্যমে ফুটবল খেলার উন্নয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান পূরণের জন্য বিভিন্ন অবকাঠামো ও সুবিধা হালনাগাদ করাসহ নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রিকেটের মানও উন্নীত হয়েছে। সারা দেশের গ্রামীণ পর্যায়ে ফুটবল, ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৩.৫.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খেলাধুলার উন্নয়নে উদ্দেশ্যসমূহ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় (অ্যাথলেট) ও খেলাধুলার মান উন্নয়নে নিবেদিত। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) মতো সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা হচ্ছে। আশা করা যায়, মেধাবী প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়রা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করবে এবং দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে। এটিই অন্যান্য লক্ষ্যসহ মন্ত্রণালয়ের মূল অভীষ্ট, যা নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো:

- জাতীয় ক্রীড়া ও খেলাধুলার মান আন্তর্জাতিক মানে বাড়ানো।
- সব ধরণের খেলাধুলার জন্য প্রতিভা অন্বেষণ এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে যথাযথ প্রতিভা শনাক্তকরণ।
- বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া এবং খেলাধুলার মান উন্নত করা।
- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে খেলার মাঠ এবং ক্রীড়া-সম্পর্কিত সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা।
- পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ক্রীড়া অবকাঠামোগত সুবিধার পাশাপাশি ইনডোর গেমসগুলোর জন্য সুবিধা উন্নয়ন।
- উপজেলা পর্যায়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা।

১৩.৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খেলাধুলার উন্নয়নে লক্ষ্যসমূহ

- যথাযথ সুযোগ-সুবিধাসহ আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়ন।
- আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ ও তা ধরে রাখতে জাতীয় ক্রিকেট এবং ফুটবল স্টেডিয়ামগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন ও সংস্কার।
- জেলা পর্যায়ে টেনিস খেলার অবকাঠামোর উন্নয়ন করা।
- বিভাগ পর্যায়ে জাতীয় ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।

- উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া-সম্পর্কিত অবকাঠামো স্থাপন করা।
- জেলা পর্যায়ে ইনডোর স্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল তৈরি করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে দেশে এক হাজারেরও বেশি খেলার মাঠের উন্নয়ন করা।
- সমস্ত বিভাগে মহিলাদের ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং বিদ্যমান মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের আরও উন্নয়ন করা।
- জেলা পর্যায়ে যুবকদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা।
- ঢাকা ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের (পারসনস উইথ ডিজঅ্যাবিলিটি–পিডব্লিউডি) জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা।
- আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট ও ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।

১৩.৬ যুব উন্নয়ন

১৩.৬.১ যুব উন্নয়নের জন্য চ্যালেঞ্জ

ক্রমবর্ধমান যুব জনসংখ্যার পটভূমির বিপরীতে, যুব-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা থেকে যে সংক্ষিপ্ত চিত্রটি উঠে এসেছে, তা নিম্নরূপ:

- যুবকদের সংখ্যা ১৯৭৪ সালে ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে পৌঁছেছে ৪৪ মিলিয়নে (চার কোটি ৪০ লাখ) এবং তা ২০২৬ সালে আরও বেড়ে ৪৮ মিলিয়নে (৪.৮ কোটি) উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তারপর আবার কমতে শুরু করবে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে, চলমান জনমিতিক লভ্যাংশের সম্ভাবনা বাংলাদেশে আরও বেশ কয়েক বছর ধরে বিদ্যমান থাকবে, তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।
- এই সম্ভাবনার তুলনায় প্রকৃত ব্যবহার খুব বেশি নয়। শ্রম শক্তি জরিপ (এলএফএস) ২০১৬-১৭ অনুসারে মাত্র ২০ মিলিয়ন যুবক (৪৪%) শ্রমবাজারে ছিল, যার মধ্যে ১৭.৯ মিলিয়ন কাজে নিয়োজিত ছিল (৮৯.৫%)।
- কর্মসংস্থানের এই চিত্র (প্রোফাইল) থেকে বোঝা যায়, যুবসমাজ ব্যাপকভাবে কৃষিক্ষেত্র থেকে শিল্প, সেবা খাত ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনে ঝুঁকছে।
- তবুও যুব শ্রম শক্তির গড় উপার্জন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রম শক্তির (৩০-৬৪ বছর) চেয়ে খুবই কম এবং অসমানুপাতিক হারে যুবকদের একটি বিরাট একটি অংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কর্মসংস্থানে কাজ করে।
- ২০১৬-১৭ সালে যুব শ্রম শক্তির প্রায় ২.১ মিলিয়ন বেকার ছিল, যার হার ১০.৬ শতাংশ। এটি জাতীয় বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।
- আনুমানিক ১২.৩ মিলিয়ন যুবক (মোট তরুণ জনগোষ্ঠীর ২৯.৮%) কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণে (NEET) ছিল না।
- দেশের মোট বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৫-১৯ বছর বয়সীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মোট বেকারের ১২.৭ শতাংশই এ বয়সী। একই সঙ্গে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ (NEET) কোন কিছুতেই অন্তর্ভুক্ত না থাকা মোট জনগোষ্ঠীর ২৩ শতাংশেরই বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছর। এমন পরিস্থিতিতে এই সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের গৃহীত শিক্ষা নীতির কার্যকরিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক।
- বেকারত্বের চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেকার যুবকদের শিক্ষার স্তর সার্বিক জাতীয় শ্রম শক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি। বেকার যুবকদের ৬৪ শতাংশ মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষা এবং প্রায় ৩৬ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বা তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত।
- বেকার যুবকের ৬০ শতাংশের বেকারত্বের সময়কাল ছয় মাস বা তারও কম, যা একটি ইতিবাচক বিষয়। তবুও ২১ শতাংশ এক বছর অবধি বেকার ছিল এবং ১৯ শতাংশ দীর্ঘ সময় বা এক বছরের বেশি সময় বেকার ছিল। বেকারত্বের এই বিশাল মেয়াদ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যুবসমাজের অংশগ্রহণে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে। এটি শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নমান ও চাকরির বাজারের সঙ্গে দুর্বল প্রাসঙ্গিকতার প্রতিচ্ছবি।
- লিঙ্গভিত্তিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যুব মহিলাদের বেকারত্বের হার যুব পুরুষদের তুলনায় সকল বয়সের ক্ষেত্রে বেশি। যুব পুরুষদের তুলনায় কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের গড় অপেক্ষার সময় আরও দীর্ঘ। গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যুব মহিলারাই এনইইটি যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৭%)।

১৩.৬.২ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে যুব উন্নয়নে অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে অগ্রগতি

যুবাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি একটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জ উন্নয়নের পথে একটি বড় উদ্বেগ হয়ে উঠছে বলে সরকার সার্বিকভাবে সচেতন রয়েছে। সরকার বুঝতে পারে, চলমান জনমিতিক লভ্যাংশ চিরকাল স্থায়ী হবে না। এই লভ্যাংশের সহজলভ্যতা এবং এর প্রকৃত ব্যবহারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-সহ সমস্ত জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে/নথিতে জনমিতিক লভ্যাংশ এবং সংশ্লিষ্ট তরুণ জনসংখ্যাকে যথাযথভাবে ব্যবহারের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে, যেন এ সম্পর্কিত উন্নয়নের অভীষ্ট ও লক্ষ্য অর্জন করা যায়। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুবসমাজের উন্নয়ন সম্পর্কিত লক্ষ্যগুলো, বিশেষত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

যুবসমাজকে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় শক্তিতে রূপান্তর করার বিষয়ে সরকারের জোরালো গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে 'জাতীয় যুবনীতি' গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সরকারের যুবকৌশল ও নীতি কর্মকাঠামোর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭। এটি অভীষ্ট ও নীতিমালার একটি বিস্তৃত সংকলন/সমষ্টি, যা যুবসমাজকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত করতে চায়। জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর মূল প্রতিপাদ্য এবং উদ্দেশ্যগুলো সারণি ১৩.১ এ চিত্রিত হয়েছে।

ঠিক যেভাবে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-তে পাঁচটি মূল প্রতিপাদ্য এবং ১৩ উদ্দেশ্য চিহ্নিত রয়েছে। আত্ম-উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন এবং জাতি গঠনসহ পূর্ণাঙ্গ জাতীয় উন্নয়নের জন্য যুবকদেও এগুলোয় জড়িত হওয়া জরুরি। এনওয়াইপি ২০১৭ লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, অবস্থান নির্বিশেষে সমস্ত যুবকদের অন্তর্ভুক্তিতে জোর দেয়। যুবনীতি ২০১৭ গুরুত্ব দেয় যুব উন্নয়ন নীতির ওপর, যা এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১-এর (এবং এ সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১) সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নীতি সমন্বয় করার দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। এনওয়াইপি পাঁচ বছর পরপর হালনাগাদ করা হবে।

সারণি ১৩.১: জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর মূল প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিপাদ্য	উদ্দেশ্য
আত্ম-উন্নয়ন	ক. যুবসমাজকে ন্যায়নিষ্ঠ, প্রগতিশীল, আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন এবং ইতিবাচক মানব হিসেবে গড়ে তোলা।
	খ. যুবকদের সহজাত সম্ভাবনা অর্জনের জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করা;
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	গ. যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করা;
	ঘ. যুবকদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমস্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
কর্মসংস্থান	ঙ. যুবসমাজের দক্ষতা অনুসারে কর্মসংস্থান ও পছন্দের পেশার ব্যবস্থা করা;
	চ. যুবকদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ জনপ্রিয় করা;
সামাজিক সুরক্ষা	ছ. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবকদের অধিকার নিশ্চিত করা;
টেকসই উন্নয়ন	জ. পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ মোকাবিলা ও দেশ গঠনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুবকদের স্বেচ্ছাসেবী কাজ করতে উৎসাহিত করা
জাতি গঠন	ঝ. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুবকদের জড়িত করা
	ঞ. পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং দেশ গঠনে যুবকদের স্বেচ্ছাসেবক করতে উৎসাহিত করা
	ট. সমাজে যারা পিছিয়ে পড়েছে এবং শারীরিক, মানসিক বা অন্যভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার, তাদের জন্য তরুণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সংবেদনশীলতা ও দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করে দেয়া।
	ঠ. যুবসমাজকে তাদের জীবন পরিচালনায় আদর্শিক উগ্রবাদ ও আগ্রাসন থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করা।
	ড. যুবসমাজের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা অনুপ্রাণিত করা।

সূত্র: জাতীয় যুবনীতি ২০১৭, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে যুব উন্নয়নের জন্য অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা জোরদার করা, ৬৪টি জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদফতরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের দুই দফায় উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলায় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যুবকদের জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যেমন বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত পল্লি যুবকদের জন্য ভ্রাম্যমাণ (অন হুইল) প্রযুক্তি ক্ষমতায়ন কেন্দ্র প্রকল্প এবং প্রণিধানযোগ্য

প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সংস্থানসমূহের উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা (ইমপ্যাক্ট) প্রকল্প। জাতীয় যুবনীতি ও যুব উন্নয়ন সূচক বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বিনির্মাণ করতেও সহায়তা দেয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কিছু বড় অর্জন এবং সংস্থার অব্যাহত প্রচেষ্টা নিম্নরূপ:

- ১.৬১ মিলিয়ন যুবককে বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫২১ জন আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে।
- দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মোট ২ লাখ ২৯ হাজার ৭৩৭ যুবককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২ লাখ ২৭ হাজার ৪০২ জন নিযুক্ত ছিল জাতি বিনির্মাণে নিবেদিত বিভিন্ন সংস্থায়।
- মূল পরিমাণ ও ক্রমপঞ্জিত তহবিল থেকে ঋণ হিসেবে প্রশিক্ষিত ১ লাখ ২৫ হাজার ৩৩৫ যুবককে ৬.২১৩ বিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছিল আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারণের জন্য। গড় ঋণ আদায়ের হার ছিল স্মরণাতীত ৯৫.৫৩ শতাংশ। এই বিনিয়োগগুলো থেকে যুবকদের আয় ছিল মাসে ৬ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে মাসে আয় ছিল এক লাখ টাকারও বেশি।

এতো অগ্রগতি সত্ত্বেও যুব বেকারত্ব সমস্যার ক্রমবর্ধমান আকারের পাশাপাশি যুবসমাজে এনইইটির প্রসারিত সংখ্যাও বিদ্যমান। এ অবস্থা দেখে বোঝা যায়, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য কৌশলে আরও শক্তিশালী প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

একটি প্রণিধানযোগ্য জাতীয় যুবনীতি প্রণয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি এখন একটি পরিবীক্ষণযোগ্য লক্ষ্য, কৌশল, অর্থের সংস্থানসহ পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনায় রূপান্তর করা দরকার। যেহেতু বাস্তবায়ন কাজে একাধিক লাইন মন্ত্রণালয় জড়িত, তাই একটি সঠিক সমন্বয় ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার। বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিমাপের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা দরকার। এজন্য পর্যাপ্ত সংস্থান/পুঁজি প্রয়োজন হবে।

১৩.৬.৩ যুব কর্মসংস্থানের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

যুবকদের উন্নয়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হবে জাতিসংঘের যুব কর্মসংস্থানের লক্ষ্য দ্বারা, যার বিস্তারিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি) প্রকাশিত/প্রতিফলিত হয়েছে। এটি জাতিসংঘের 'বিশ্ব যুব প্রতিবেদন ২০১৮'-এ (UN-2018) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্ব যুব প্রতিবেদন যুবকদের সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে, যার মধ্যে একটি উপ-অংশ (সাবসেট) হলো যুব কর্মসংস্থান। যুব কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জগুলো এসডিজির যে সকল লক্ষ্যসমূহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার নিচে বক্স ১৩.১ এ দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের এই প্রতিবেদনে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচকগুলো উন্নয়নের গুরুত্ব নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এসডিজিতে স্বাক্ষরকারী হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব যুব কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই বিস্তারিত লক্ষ্যটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। যুব কর্মসংস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নীতি কাঠামোর উন্নয়ন করা এবং যুব কর্মসংস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতি কাঠামো বিনির্মাণেও এই বিস্তারিত লক্ষ্যটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

বক্স ১৩.১: যুব কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ

লক্ষ্য ৪.১: ২০৩০ সালের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে যেন সব বালক ও বালিকা পুরোপুরি বিনা খরচে ন্যায়সংগত এবং মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করে, যা প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষার কার্যকর ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে

লক্ষ্য ৪.৩: ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী ও মানসম্পন্ন, কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় সব নারী ও পুরুষের জন্য সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.৪: ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান, শালীন চাকরি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জনকারী যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

লক্ষ্য ৪.৫: ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তি ও শিশুসহ সবার জন্য সব পর্যায়ের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৪.৬: ২০৩০ সালের মধ্যে সব যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের উল্লেখযোগ্য একটি অংশের সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত জ্ঞান অর্জন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ৮.৩: উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড, মর্যাদাকর চাকরি সৃষ্টি, উদ্যোক্তা, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে সমর্থন করে এমন উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা জনপ্রিয় করা। আর্থিক পরিষেবাগুলোয় প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি মানের উদ্যোগের প্রসার এবং আনুষ্ঠানিকীকরণ উৎসাহিত করা।

লক্ষ্য ৮.৫: ২০৩০ সালের মধ্যে সব নারী, পুরুষ, যুবক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শালীন কাজের সুযোগ তৈরি করা। সমান কাজের জন্য সমতাভিত্তিক সম্মানী দেয়া।

লক্ষ্য ৮.৬: ২০২০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান, শিক্ষা, অথবা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা যুবকদের অনুপাত যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা।

সূত্র: জাতিসংঘ ২০১৮

১৩.৬.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব উন্নয়নের উদ্দেশ্য/লক্ষ্যসমূহ

উদ্দেশ্য: এসডিজিতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত সকল লক্ষ্যসমূহ যুবকদের জন্য সুযোগগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। বৈশ্বিক পর্যায়ে এ বিষয়গুলো যুব উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা নয়। ওপরে বর্ণিত বাংলাদেশ পরিস্থিতির সার-সংক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশেও একই অবস্থা বিরাজমান। সুতরাং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুব উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো যুব জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, সেই বিষয়গুলোয় নিবদ্ধ। যুবকদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই মূল লক্ষ্য।

- যুব-সম্পর্কিত এসডিজি এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনের জন্য যুবকদের সক্ষম ও ক্ষমতায়িত করা।
- জাতীয় টেকসই উন্নয়ন এবং প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিশ্চিতে অবদান রাখা।
- জীবন দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান দক্ষতা সরবরাহ করে যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমাজ ও জাতির সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- দশম অধ্যায়ে আলোচিত সব স্তরে শিক্ষার মান ও পরিমাণকে জোরদার করা।
- দশম অধ্যায়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা।
- সরকারের নারী ক্ষমতায়ন কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, ঠিক যেভাবে ১৪তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য যুব মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পক্ষপাতিত্ব দূর করা এবং তাদের সমস্ত প্রাসঙ্গিক মানব কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে অংশীদার করতে সক্ষম করা।

লক্ষ্যসমূহ: যুব কর্মসংস্থানের সময়ভিত্তিক ও নিরীক্ষণযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এসডিজির যুবসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহকে ভিত্তি (রেফারেন্স পয়েন্ট) হিসেবে গণ্য করা। এর সদ্ব্যবহার করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে বৃত্তিহীন (এনইইটি) জনসংখ্যাকে দুই শতাংশে নামিয়ে আনার একটি পরিমাণগত লক্ষ্য সম্প্রতি নির্ধারণ করেছে। এটি একটি প্রশংসনীয় লক্ষ্য এবং এটি অর্জনের জন্য সরকারের উচিত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। এসডিজির ওপর ভিত্তি করে আরও বড় পরিসরে ২০২১ থেকে ২০৩১ সময়কালের অন্তর্ভূক্ত অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদের জন্য প্রস্তাবিত যুব কর্মসংস্থানের লক্ষ্যগুলো সারণি ১৩.২-এ দেখানো হয়েছে। এই লক্ষ্যগুলো এসডিজি ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ নির্ধারণ করা লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে বিস্তৃতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

সারণি ১৩.২: যুব কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্থবছর ২০২১–অর্থবছর ২০৩১

সূচক	ভিত্তিবছরে মান (২০১৬-১৭ এলএফএস)	অর্থবছর ২০২৫ (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে)	অর্থবছর ২০৩১ (নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে)
বেকার যুবকদের হার	১০.৬	৫.০	২.০
এনইইটি যুবকদেও হার	২৯.৮	১৫.০	৫.০
স্কুলে ১৫-১৯ বছর বয়সীদের শতাংশ	৭৫	৮৫	১০০

সূত্র: এনইইটি লক্ষ্যমাত্রা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত; অন্য লক্ষ্যমাত্রা জিইডি থেকে প্রাপ্ত।

১৩.৬.৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় যুব উন্নয়নের জন্য কৌশল ও নীতিসমূহ

যুব উন্নয়নের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল ও নীতিগুলো তিনটি বিষয়বস্তুর আওতায় সংগঠিত করা যেতে পারে। এগুলো হলো- শ্রমবাজার চাহিদা পক্ষের নীতি পদক্ষেপ; শ্রমবাজার সরবরাহের পক্ষের পদক্ষেপ; এবং আত্ম-কর্মসংস্থান ও অন্যান্য যুব কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নীতি প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপসমূহ।

ক. সরবরাহ অংশের নীতিমালাসমূহ

বিদ্যমান যুব শ্রম শক্তির দক্ষতা ভিত্তি শক্তিশালী করা: সরবরাহ পক্ষের নীতিগুলো সম্ভাবনাময় যুব শ্রম শক্তির দক্ষতার ঘাটতিগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে। এরই মধ্যে কর্মসংস্থানে বিদ্যমান যুব শ্রম শক্তির জন্য দক্ষতার ঘাটতি খুব মারাত্মক। এই যুবকদের আবার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে এনে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায় না। শ্রম শক্তিতে নিযুক্ত দুই ধরণের অদক্ষ যুবক, যাদের নামমাত্র শিক্ষা আছে, অথবা একেবারেই নেই (কূন্য: প্রাথমিক স্তর); এবং যাদের স্কুল ব্যবস্থার সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা রয়েছে (মাধ্যমিক ও ওপরের)।

প্রথম ধরণটি এসডিজির লক্ষ্য ৪.৬-এর আওতায় স্বীকৃত, যা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে ২০৩০ সালের মধ্যে সমস্ত যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সাক্ষরতা এবং সংখ্যাগত দক্ষতা অর্জন করবে। মৌলিক চ্যালেঞ্জ হলো সরকারি তহবিলপ্রাপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এই শ্রম শক্তিকে মৌলিক সাক্ষরতা ও সংখ্যার দক্ষতা প্রদান করা। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (এনএফই) প্রোগ্রাম দক্ষতার এই ঘাটতি সমাধান করার চেষ্টা করে। প্রধান উদ্বেগ হলো এনএফই সাক্ষরতার একটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের কেবল সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির হিসেবে কাজটি দেখছে। এটি প্রবৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এখন ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে, বিষয়টি মানুষের জীবনযাত্রায় খুব কম পার্থক্য করে, কিংবা তারা সমাজ ও অর্থনীতিতে কম অবদান রাখতে পারে। এই কারণেই জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারণাটি এসডিজি শিক্ষার অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলোয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন সাক্ষরতা, বুনিয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন এবং জীবনব্যপী শিক্ষার সুযোগগুলো সংযুক্ত করা। এছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক শিক্ষার বিধান, সুযোগ-সুবিধা এবং সংস্থানগুলো নিয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং আজীবন শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হতে হবে আইসিটি অবকাঠামোর (রিসোর্স) ব্যাপক ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত শিক্ষা কেন্দ্রগুলো এবং নিজে নিজে শিক্ষার সুযোগগুলো বাড়াতে। জনসংখ্যার সাক্ষরতার স্তর, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক জীবিকা এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং তথ্য ও স্ব-শিক্ষার সরঞ্জাম এবং সংস্থানসমূহে আইসিটি-ভিত্তিক প্রবেশাধিকারকে জীবনব্যাপী শেখার কৌশলটির মাধ্যমে সমন্বিত উপায়ে সমর্থন ও প্রচার করতে হবে। এনজিও, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাদের মধ্যে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত তহবিল ও সংস্থান প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ধরণের জন্য মূল চ্যালেঞ্জটি হলো তাদের চাকরিরত অবস্থায়ই বেসরকারি (ব্যবসা) খাতের সঙ্গে দৃঢ় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে এ ধরণের প্রশিক্ষণের ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে বিপ্লবের শুরুর বছরগুলোয় নিয়োজিত মহিলারা তাদের কর্মস্থলেই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন, যেন তারা যে কাজের জন্য নিযুক্ত হন, তা ঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বাজার ব্যর্থতার কারণে এই ধরণের নিয়োগদাতাদের বিনিয়োগে কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের খুব বেশি উদাহরণ নেই। বেসরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশিক্ষণের জন্য নিজস্ব পুঁজি ব্যয় করে ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, কারণ অন্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত কর্মীর চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটি সরকারের নীতিমালা হস্তক্ষেপের জন্য একটি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ (কেস)।

চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের জন্য একটি কৌশল তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে সরকারি খাত থেকে তহবিল সরবরাহ করা হবে, আর বেসরকারি খাত প্রশিক্ষণ দেবে। এই কৌশলে দুটি উপাদান আছে। প্রথম উপাদানটি আনুষ্ঠানিক খাতে বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে অংশীদারিত্ব নিয়ে সম্পর্কিত। এসইআইপি প্রকল্পে এর কিছু উপাদান

রয়েছে। এসইআইপি অভিজ্ঞতায় শিক্ষার ভিত্তিতে চাকরিরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের জন্য একটি ব্যাপক সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রশিক্ষণ প্রকল্প তৈরি করা যেতে পারে। দ্বিতীয় উপাদানটিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণে মনোযোগ দিতে হবে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত যুবকদের দিকে, যারা আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যারা এনইইটি গ্রুপের অন্তর্ভূক্ত এবং যারা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ খুঁজছে। যুবসমাজের বড় একটি অংশ এই শ্রেণির। এই যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলো সরবরাহ করার মতো পুঁজি বা সক্ষমতা সরকারের নেই। এই যুবকদের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণের জন্য সবচেয়ে প্রত্যাশাপূর্ণ বিকল্প হলো উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্ব করা।

উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতায় এনজিওদের সঙ্গে অংশীদার হয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণ-সম্পর্কিত উদ্ভাবনী এবং ব্যয়-কার্যকর পরীক্ষামূলক (পাইলট) প্রকল্পসমূহের বেশ কয়েকটি ভালো উদাহরণ রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির (এসডিপি) অধীনে ব্র্যাক পরিচালনা করে এনজিও-নেতৃত্বাধীন সবচেয়ে বড় যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ব্র্যাকের তথ্য অনুসারে, এসডিপি হলো বহুমাত্রিক উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে গৃহীত কর্মসূচি। এর আওতায় গত আট বছরে প্রায় চার লাখ যুবক অকৃষি খাতে বিভিন্ন ধরণের নিয়োগযোগ্য দক্ষতার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি বড় অংশ হলো নারী। অন্যান্য ভালো উদাহরণের অন্তর্ভূক্ত–ইউএসএআইডি'র (EDU-2009) পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ যুব কর্মসংস্থান পাইলট (BYEP); অক্সফামের (অক্সফাম ২০১৯) পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ এমপাওয়ার ইয়ুথ ফর ওয়ার্ক (BYEP); এবং ইউএনডিপি (UNDP-2019) সমর্থিত দক্ষতার মাধ্যমে যুব কর্মসংস্থান (ওয়াইইএস) উদ্যোগ। বিওয়াইইপি প্রোগ্রামটি মিঠাপানির চিংড়ি চাষ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত যুবকদের কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। বিওয়াইইপি পাইলট জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে গ্রামীণ যুবকদের জন্য উপযুক্ত চাকরি এবং জলবায়ুবান্ধব উদ্যোক্তার প্রসারের চেষ্টা করছে। ওয়াইইএস উদ্যোগটি ছয় মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবকদের আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্রাউড ফান্ডিং সংহত করতে নিয়োজিত। এই পাইলট প্রকল্পগুলোর প্রত্যেকটি তাদের পদ্ধতির ক্ষেত্রে অভিনব, তবুও প্রশিক্ষণ দেয়ার সাধারণ নীতি অনুসরণ করে, যা বাজারের চাহিদা-সম্পর্কিত নিয়োগযোগ্য দক্ষতার দিকে পরিচালিত করবে। কম সুফল প্রদানকারী জাতীয় সেবা কর্মসূচির (ন্যাশনাল সার্ভিস প্রোগ্রাম) তুলনায় এই ধরণের প্রশিক্ষণ অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও টেকসই। সরকারের উচিত এই প্রকল্পগুলো সাবধানতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা এবং উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ ও এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বের অনুদান সহায়তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টাগুলোর প্রসার বাড়ানো।

কোভিড-১৯ মহামারী এবং এর বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে শ্রেণিভিত্তিক প্রশিক্ষণকে একটি অনলাইন ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণে রূপান্তর করার দাবি উঠেছে। এই জাতীয় ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম দেশের মধ্যে তাদের বয়স, লিঙ্গ ও ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রশিক্ষণ ও জীবন-দক্ষতার সুযোগগুলো সরবরাহ করবে।

সবার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ: এসডিজি অভীষ্ট ৪.৫-এর লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তি, শিশুসহ সবার জন্য সব পর্যায়ের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিসহ সমাজে সব ধরণের সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে অনুকূল নীতিমালা তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকার এ বিষয়ে ভালো করেছে। সম্পর্কিত নীতিমূলক উদ্যোগগুলো সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত আছে। নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে আরো বেশি সক্রিয়ভাবে গুরুত্বারোপের জন্য সরকার এনডব্লিউডিপি ২০১১ গ্রহণ করেছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো এই নীতিগুলো আরও দৃঢ়তার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা। সরকার বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরির বাধ্যবাধকতাসহ সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়গুলোকে পরিবীক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে, যা অধিকতর পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদে জমা প্রদানে লাইন মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

এনইইটির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা: এনইইটির স্টক একটি জটিল চ্যালেঞ্জ সামনে তুলে ধরে। এটি কেবল আরও ভালো প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয় নয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্সকে এই জটিল বহুমাত্রিক সমস্যার নিখুঁত বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া উচিত। সেই ধারাবাহিকতায় একটি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বের করা উচিত। পরিস্থিতির অবনতি রোধে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

প্রথমত, এনইইটির প্রায় ৮৩ শতাংশ নারী। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর কঠোর বাস্তবায়ন এবং তৃতীয় পর্যায়ের ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে লিঙ্গ বৈষম্য নির্মূল করাই এনইইটিতে নারীদের অংশ কমাতে একটি বড় পদক্ষেপ হবে। দ্বিতীয়ত, ১২ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার বাস্তবায়ন এনইইটি জনসংখ্যা হ্রাস করতে সহায়তা করবে। তৃতীয়ত, ওপরে

আলোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গুণগত মান বৃদ্ধি কর্মহীন যুবক এবং এনইইটি জনসংখ্যা উভয়ই হ্রাস করতে সহায়তা করবে। চতুর্থত, এনজিও/সিবিও'র সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে সরকার সম্প্রসারণ কার্যক্রম (আউটরিচ স্কিম) উন্নয়ন করতে পারে, যা বিদ্যমান এনইইটি জনগণকে কর্মসংস্থান-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পগুলোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা জোগাবে। চূড়ান্তভাবে সরকারের বর্তমান যুব কর্মসংস্থান নীতিতে একটি প্রধান অনুপস্থিত উপাদান হল আত্ম-কর্মসংস্থান কৌশল জনপ্রিয় করা (পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে)। এটি যুব বেকারত্বের আওতা কমিয়ে আনার পাশাপাশি এনইইটির উদাহরণ কমাতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

খ. চাহিদা পক্ষের নীতিমালা

যুব কর্মসংস্থানের জন্য চাহিদা পক্ষের নীতিমালা এমন কর্মসংস্থান তৈরির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা যুবকদের, বিশেষত শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত, যদিও উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকর্মী উভয়ই কাজে আসবে। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে কৌশলগত যুবকেন্দ্রিক নীতিগুলো সহায়তা করবে।

উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে যুবাদের আত্ম-কর্মসংস্থান জনপ্রিয় করা

বাংলাদেশ কর্মসংস্থান কাঠামোর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মী গোষ্ঠীর আধিপত্য (চিত্র ১৩.১)। শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুসারে কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার ৫৫.৬ শতাংশ আত্ম-কর্মসংস্থান করেছিল হয় নিজস্ব কর্মী হিসেবে (৪৪.৩%), অথবা পরিবারের সহায়ক হিসেবে (১১.৫%)। অবাক করা বিষয় নয়, শহুরে অর্থনীতির তুলনায় (৪০.৪%) গ্রামীণ অর্থনীতিতে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত জনসংখ্যা অনেক বেশি ছিল (৬১.৭.%)। এর কারণ হলো পরিবারভিত্তিক কৃষি খাতের প্রভাবশালী ভূমিকা।

চিত্র ১৩.১: কর্মসংস্থানের অবস্থার ভিত্তিতে কাজে নিয়োজিত জনসংখ্যার বিতরণ (%)

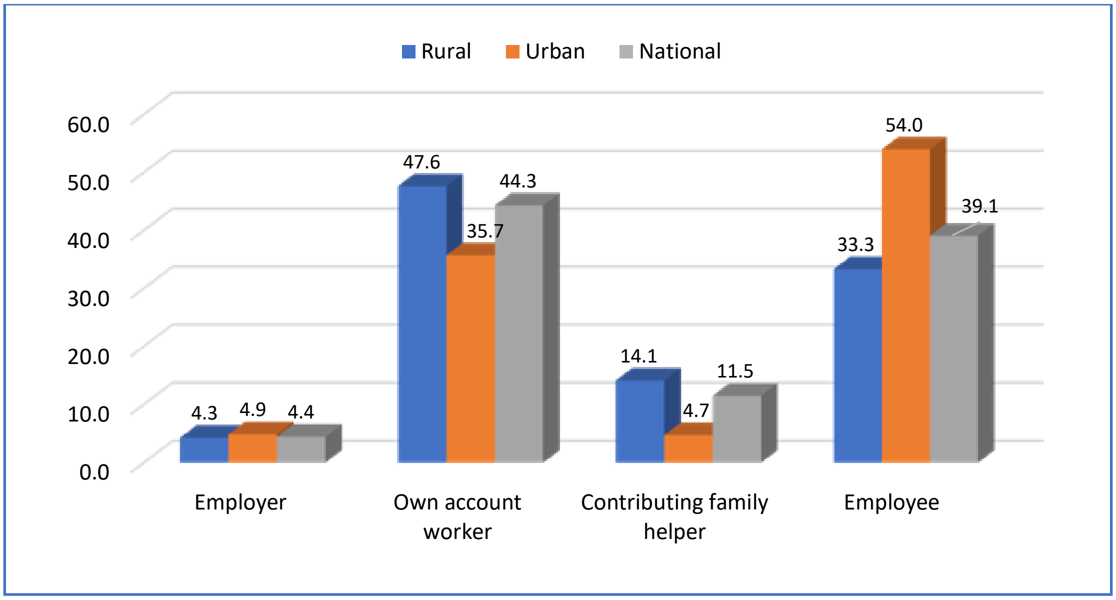

সূত্র: শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-২০১৭

কম মজুরির কর্মসংস্থানের সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বাজার প্রতিক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হলো আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্মীদের উচ্চ শতাংশ। আত্মকর্মসংস্থানে (ওউন অ্যাকাউন্ট ওয়ার্কার) নিয়োজিত কর্মীদের সম্পৃক্ততায় যুবকদের অনুপাত (৩০.৬%) প্রাপ্তবয়স্কদের (৩০-৬৪) তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে কম (৪৯.১%)। বিষয়টির দুটি কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে–প্রথমত, আত্ম-কর্মসংস্থানে (ওউন অ্যাকাউন্ট ওয়ার্কার) থাকা যুবকরা গতানুগতির এক ধরণের শিক্ষানবিশ হিসেবে সাধারণত পরিবার বা পরিচিতজনের তত্ত্বাবধানে পরিবার/বন্ধুর মালিকানাধীন ব্যবসায় পরিশ্রমের বিপরীতে সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করে। এভাবে পরিবারের মালিকানার অধীনে কাজ করার অনীহা রয়েছে যুবসমাজের, বিশেষত শিক্ষিত যুবকদের। দ্বিতীয়ত, যুবকদের সাধারণত নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রারম্ভিক মূলধনে অগ্রাধিকার থাকে না। যুব কর্মসংস্থান নিয়ে কাজ করা একটি প্রধান নীতি ক্ষেত্র। যুবকল্যাণ ও কর্মসংস্থানে বড় উন্নয়ন ঘটাতে প্রশিক্ষণ ও প্রারম্ভিক পুঁজিতে প্রবেশাধিকার দেয়ার মাধ্যমে প্রসার ঘটানো যেতে পারে।

অ-আইসিটিভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থান: শ্রমবাজারের এই বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায়, আত্ম-কর্মসংস্থান কৌশলের মাধ্যমে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরির শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহৎ অর্থে, সিএমএসএইগুলো আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্পের একটি অঙ্গ। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে সিএমএসএইগুলোর প্রাধান্য রয়েছে এবং কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। এর আওতায় কর্মকাণ্ডের পরিসীমা বিশাল এবং এই শ্রমবাজারে অংশ নিতে আগ্রহী সব বেকার ও যে কোনো বৃত্তিহীন (NEET) যুবকদের সুযোগ করে দিতে পারে। সুতরাং ওপরে উল্লিখিত সিএমএসএইগুলোকে জনপ্রিয় করার নীতিমালা আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকা যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে।

তবে বিদ্যমান কর্মহীন ও বৃত্তিহীন যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা শুরুতেই অনেকটা এগিয়ে নেয়ার (জাম্প স্টার্ট) জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে। দুটি নির্ধারিত কাজ প্রয়োজন হবে। প্রথমত, উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে। সরকার এই ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিওদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পারে। দ্বিতীয়ত, ঋণে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে প্রবেশাধিকার বাড়ানোর এই নীতি একটি মৌলিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ, যার মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি এটি চাকরি সৃষ্টির জন্য একটি বড় নীতি সংস্কার।

আইসিটিভিত্তিক স্ব-কর্মসংস্থান: শিক্ষিত যুবকদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় হলো আইসিটিভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থান জনপ্রিয় করা। শ্রমবাজারে আইসিটি দক্ষতার চাহিদা ব্যাপক। এর ওপর ওয়েব ডিজাইন, মোবাইলে আর্থিক সেবা, ই-কমার্স এবং পরিবহনসহ বিভিন্ন সেবার একটি সমৃদ্ধ আইসিটিভিত্তিক আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ উদ্ভূত হয়েছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবার (MFS) দ্রুত প্রসারযোগ্য এমএফএস এজেন্টদের জন্য একটি বড় বাজার তৈরি হয়েছে। তারা মূলত আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত এবং বেশ কয়েকটি এমএফএস সেবাদাতার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ওয়েব ডিজাইনারদের একটি বিকাশমান গোষ্ঠীও রয়েছে, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনলাইন সেবা সরবরাহ করছে। আইসিটি ব্যবহারের ভিত্তিতে ই-কমার্স ও পরিবহন সেবায় আত্ম-কর্মসংস্থান ঢাকা শহরের নগর পটভূমিতে বড় পরিবর্তন আনছে।

বিশ্বব্যাপী অনলাইন শ্রমবাজারের অগ্রগতি থেকে দেশে যুবকদের আইসিটিনির্ভর আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা চিত্র সম্পর্কে জানা যায়। এটি 'ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সিং ও গিগ ওয়ার্কিং কাজ' হিসেবেও পরিচিত। ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের ওপর ভিত্তি করে অনলাইন শ্রমবাজার বিশ্বজুড়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন সেবা সরবরাহের জন্য অনলাইন কাজের প্ল্যাটফর্মগুলো ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে মেলবন্ধনে সহায়তা করে, যা ইন্টারনেট ব্যবহার করে দূর থেকে সম্পাদন করা যেতে পারে। এই সেবাগুলোর উদাহরণের মধ্যে রয়েছে–সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডেটা এন্ট্রি, অনুবাদ, মাল্টি মিডিয়া, বিক্রয় ও বিপণন সমর্থন এবং পেশাদার সেবাসমূহ। অনলাইন শ্রমবাজারের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো কাজটি একাধিক দেশের মধ্যে ও অনেকগুলো লেনদেনের জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে সম্পাদিত হয়। এর মূল অর্থ হলো, অনলাইন কর্মীকে অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা উচিত নয় এবং সক্রিয়ভাবে যেন বিশ্বব্যাপী অনলাইন কাজের জন্য দর প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

অনলাইন শ্রমবাজারের প্রসারের দিকে চোখ রাখতে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট একটি শ্রম প্রকল্প (লেবার প্রজেক্ট) চালু করেছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে গবেষক অটো কাসি ও ভিলি লেহডনভির্টা 'অনলাইন শ্রমসূচক' (কাসি ও লেহডনভির্টা ২০১৮) তৈরি করেছেন। সূচকটি উৎপাদনের ধরণ এবং দেশের শ্রেণিভেদে ইন্টারনেটভিত্তিক শ্রমের চাহিদা এবং সরবরাহের প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করতে চেষ্টা করে। সর্বশেষ প্রণীত অনলাইন শ্রম উপাত্ত অনুসারে, বিশ্বব্যাপী অনলাইন সেবার বেশিরভাগ চাহিদা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে আসে। এই সেবাগুলোর সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী যুক্তরাষ্ট্র (৪৪%), তার পরে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৮%) ও অস্ট্রেলিয়া (৬%)। সরবরাহের দিক থেকে, অনলাইন শ্রমের বৃহত্তম সরবরাহকারী হলো ভারত (২৬%), তারপর বাংলাদেশ (২১%) ও পাকিস্তান (১৪%)। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি স্মরণাতীত খবর যা আরও ভালো ও কার্যকর আইসিটি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরেছে।

অনলাইন সেবাগুলোয় কাজের ধরণের চাহিদা দেখে বিশ্বব্যাপী অনলাইন শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ওপর আরও কিছু অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। সর্বাধিক চাহিদা হলো সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তি সেবাসমূহ (৩৬%), এর পরে রয়েছে সৃজনশীল ও মাল্টিমিডিয়া (২৫%)। ডেটা এন্ট্রি এবং গতানুগতিক রুটিন দাপ্তরিক কাজ অনলাইন মার্কেটের নিচের দিকে রয়েছে (১৩% মার্কেট শেয়ার)। বাংলাদেশের সফটওয়্যার উন্নয়ন ও প্রযুক্তি অনলাইন সেবা সরবরাহ কম এবং ভারতের তুলনায় খুবই কম। এই সেবার জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদা ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। এই দক্ষতা ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে নীতিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা দারুণ সুফল পেতে পারে।

বিশেষ করে আইসিটি-নিবিড় সেবাগুলোর ক্ষেত্রে শিক্ষিত যুবকদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার সম্ভাবনা বিশাল। কেননা সেখানে যুব মহিলারা বাড়ির সুরক্ষিত পরিবেশে অবস্থান করে দূর থেকে কাজ করে মজবুত অবস্থান তৈরি করতে পারে। আত্ম-কর্মসংস্থান বিকল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে সক্ষম করতে বেশ কয়েকটি নীতিগত সংস্কার প্রয়োজন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণে প্রবেশাধিকার। এমএসএমই ফিন্যান্সিং সমীক্ষায় (স্টাডি) সুপারিশকৃত সংস্কারগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সমীক্ষাটি ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্বতন্ত্র উদ্যোগগুলোয় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবরাহের জন্য লেনদেনের ব্যয়কে তাৎক্ষণিকভাবে হ্রাস করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও আইসিটিভিত্তিক সমাধানগুলোর ব্যবহার পক্ষে সুপারিশ করেছে।

দ্বিতীয় নীতি পদক্ষেপ হচ্ছে আইসিটি অবকাঠামো ও আইসিটিভিত্তিক সেবাসমূহের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। আইসিটি ব্যবসায়িক সমাধানগুলো অবলম্বনে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটলেও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়। তা সীমিত থাকছে মানসম্পন্ন নেটওয়ার্ক সুলভ না হওয়ার সীমাবদ্ধতায় (সারণি ৬)। দেশে ইন্টারনেট ও স্মার্ট ফোনের ব্যবহার এখনও অন্য দেশের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো আইসিটি সেবাগুলোয় করের ভারী বোঝা। চাহিদার ক্ষেত্রে এটি স্মার্ট ফোন এবং ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করেছে। অন্যদিকে সরবরাহের ক্ষেত্রে এটি বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে আইসিটি অবকাঠামোগত সরবরাহ সীমিত করেছে এবং সেবার মান কমিয়েছে। সুতরাং আইসিটিতে কর সংস্কার হলো একটি অত্যাবশকীয় নীতি সংস্কার। এটি যুব কর্মসংস্থানসহ বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের দ্রুত প্রসারে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, আত্ম-কর্মসংস্থানে থাকা আইসিটি বিশেষজ্ঞদের জন্য কর্মকাঠামোটি ও অন্য আইসিটিভিত্তিক সেবার নিয়ন্ত্রক কর্মকাঠামোটি তাদের প্রসারের সঙ্গে সহায়ক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ওয়েব ডিজাইনার, ই-কমার্স ও আইসিটিভিত্তিক পরিবহন সেবা সরবরাহকারীদের জন্য নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিং বাধ্যবাধকতা অবশ্যই সহজ ও সাশ্রয়ী হতে হবে। আন্তর্জাতিক ই-লেবার (ইন্টারনেট শ্রম) সেবা থেকে প্রাপ্ত উপার্জন ধরে রাখা এবং হিসাবরক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের বিধিবিধানগুলোর সরলীকরণ দরকার। এগুলো অভিবাসী শ্রমের সুবাদে আসা রেমিট্যান্স আয়ের মতোই গুরুত্ব দিয়ে মূল্যায়ন করা উচিত। এর ওপর কর নথিকরণ (কর ফাইলিং) প্রয়োজনীয়তাগুলোও সহজ হওয়া উচিত। সিএমএসই এবং স্ব-কর্মসংস্থানযুক্ত উদ্যোগে কর আরোপ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা যত্নসহকারে অধ্যয়ন এবং কার্যকরভাবে সমাধান করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন

বিপুল বৈধ অভিবাসী শ্রমিক প্রবাসে থাকায় বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমিকদের সুবাদে বাংলাদেশ দারুণভাবে উপকৃত হয়েছে। এই ধারা কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এবং রেমিট্যান্স আয়ের বিশাল প্রবাহ–উভয় ক্ষেত্রেই সুফল এনেছে। প্রবাসী আয় এখন জিডিপির পাঁচ শতাংশেরও বেশি। সরাসরি আয় স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যালান্স অব পেমেন্টে ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের কার্যক্রম সম্পাদনে সুবিধা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও চাকরি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। রেমিট্যান্স আয় থেকে সৃষ্ট ব্যয়ের সার্বিক চাহিদা বৃদ্ধি এতে ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশলের একটি অংশ। এটি পৃথক কৌশল নথিতে বিবৃত রয়েছে। অভিবাসী শ্রম শক্তি অংশগ্রহণ বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত নীতি এর অংশ। যেমন প্রশিক্ষণ, অভিবাসী শ্রম সরবরাহের ব্যয়-হ্রাস, অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য ঋণের প্রাপ্যতা এবং তথ্যের সহজলভ্যতা। পাশাপাশি রয়েছে শ্রমিক সুরক্ষা এবং শোষণ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার নীতিগুলোও। এ সবকিছুই যুবসমাজের উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে যুব জনগোষ্ঠীই আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের সর্বোচ্চ উপকারভোগী।

শ্রমবাজারের তথ্য

যখন চাকরির বিজ্ঞপ্তি থাকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা যুবকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে এগুলো সরবরাহ করে তথ্য ও কর্মসংস্থান বিনিময় (এক্সচেঞ্জ) সেবা সরবরাহ করে যুবকদের সহায়তা করা যেতে পারে। নতুন প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার, বিশেষত মোবাইল ফোনভিত্তিক, যুবকদের জন্য কাজের সন্ধানের নেটওয়ার্কগুলো প্রসারণে সহায়তা করতে পারে। প্রযুক্তির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এই নেটওয়ার্কগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানো যায়। এসব থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় কোন কোন বিষয়ে সরকারকে আরও মনোযোগ দিতে হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

'জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭' যুব কর্মসংস্থান ও যুব ক্ষমতায়নের জন্য প্রশংসনীয় অভীষ্ট নির্ধারণ করেছে। তবে অভীষ্ট ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো পরিচালনা কৌশল নেই। এটি বাস্তবায়ন নীতি দিয়ে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য সময়-সীমাবদ্ধ লক্ষ্যগুলোও সংজ্ঞায়িত করে না। একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কার হলো এই নীতিটিকে আরও গতিশীল/কার্যকর করা। সেই সূত্রে বাস্তবায়নের সঙ্গে অগ্রগতি পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা সহায়ক হবে। এই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কর্মকাঠামোর অংশ হিসেবে 'জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭'-তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বেকার ও বৃত্তিহীন (NEET) যুবকের সংখ্যাও কমিয়ে আনতে হবে। বিষয়টি ওপরের সারণি ১৩.২-তে তুলে ধরা হয়েছে।

১৩.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সংস্কৃতি, ধর্ম, খেলাধুলা এবং যুবাদের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ

জনসংখ্যার নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির পূর্ণ বিকাশের জন্য বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সমস্ত অগ্রাধিকার কর্মসূচির প্রয়োগকে সমর্থন করতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলতি মূল্যে এবং ২০২১ অর্থবছরে স্থিরমূল্য বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সারণি ১৩.৩ এবং ১৩.৪-এ।

সারণি ১৩.৩: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর জন্য এডিপি বরাদ্দ
(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
তথ্য মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৯	৩.৪	৩.৯	৪.৭
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৩	৩.৮	৪.৪	৫.৩
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০.৯	১৩.৫	১৫.৫	১৮.১	২১.৭
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৬	৪.৪	৫.১	৫.৯	৭.১
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মোট	**১৯.৬**	**২৪.১**	**২৭.৮**	**৩২.৩**	**৩৮.৮**

উৎস: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি এ৫.১

সারণি ১৩.৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তথ্য, বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়গুলোর জন্য এডিপি বরাদ্দ
(বিলিয়ন টাকা স্থির মূল্যে, অর্থবছর ২০২১)

মন্ত্রণালয়/খাত	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
তথ্য মন্ত্রণালয়	২.৪	২.৮	৩.০	৩.৪	৩.৯
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.১	৩.৪	৩.৮	৪.৩
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০.৯	১২.৮	১৪.০	১৫.৬	১৭.৯
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩.৬	৪.২	৪.৬	৫.১	৫.৮
বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মোট	**১৯.৬**	**২২.৯**	**২৫.০**	**২৭.৯**	**৩১.৯**

উৎস: অধ্যায় ৫, অংশ ১, সংযুক্ত সারণি এ৫.২

খাত-১৪:

সামাজিক সুরক্ষা

অধ্যায় ১৪

সামাজিক সুরক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

১৪.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ সামাজিক ক্ষেত্রে নানা অর্জনের সাফল্যে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়বিচারের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে একজন যত্নশীল ও মানবিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই দেশ জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও জেন্ডার নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমান চোখে দেখে। এখানে সব নাগরিকের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার সমান সুযোগ রয়েছে এবং উন্নয়নের সুফলগুলো সমানভাবে ভাগ করা হয়েছে। দ্রুত আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে মনোনিবেশ করা শেখ হাসিনা সরকারের একটি প্রধান অগ্রাধিকার। নানা বিষয়ের ভিত্তিতে এই অগ্রাধিকারটি সমন্বিতভাবে প্রতিফলিত হয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস ও মানব উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং দরিদ্র ও দুর্বলদের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা। এছাড়া রয়েছে মানবকল্যাণের জন্য হুমকিস্বরূপ সব ধরণের ঝুঁকি কমানো এবং উন্নয়নে সব নাগরিককে অংশগ্রহণে সক্ষম করতে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রচার ও প্রসার।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে দারিদ্র্য হ্রাস ও মানব উন্নয়নের অগ্রগতি এবং এই খাতকে আরও এগিয়ে নিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে কৌশল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অংশে এরই মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় সামাজিক সুরক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি-সম্পর্কিত মানবকল্যাণের অন্যান্য নির্ধারকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে। অতীতের অগ্রগতির পটভূমির বিপরীতে এই অধ্যায়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ বিনির্মাণ করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ প্রাসঙ্গিক এসডিজি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৪.২ সামাজিক সুরক্ষা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছে। মাথা গুণতি দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৫০ শতাংশ থেকে অর্ধেক কমে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে চরম দারিদ্র্য নির্মূলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য (যা বিভিন্ন বৈষম্য সূচক–জিনি সহগ; এবং পালমা অনুপাত দ্বারা পরিমাপ করা হয়) থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' পুরোপুরি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় (চিত্র ১৪.১)। এই ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিদ্যমান দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা ব্যবহার করে দারিদ্র্যের প্রক্ষেপণগুলো ইঙ্গিত করে যে, এই স্থিতিস্থাপকতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত চরম দারিদ্র্য কমানো সম্ভব হবে না। এজন্য আয়/ভোগবৈষম্য কমাতে হবে, নতুবা জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ থেকে ৯ শতাংশ হলেও ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে তা চরম দারিদ্র্য নির্মূলে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। একটি আধুনিক আয়কর পদ্ধতির প্রচলন এবং তার মাধ্যমে আহরিত অর্থ ন্যায়সঙ্গতভাবে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যথাযথ উপায়ে বিতরণ করা সম্ভব হলে তা জিডিপি প্রবৃদ্ধির বিপরীতে দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং ২০৩১ অর্থ-বছরের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক হতে পারে।

চিত্র ১৪.১: বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য ও বৈষম্যের ধারা (%)

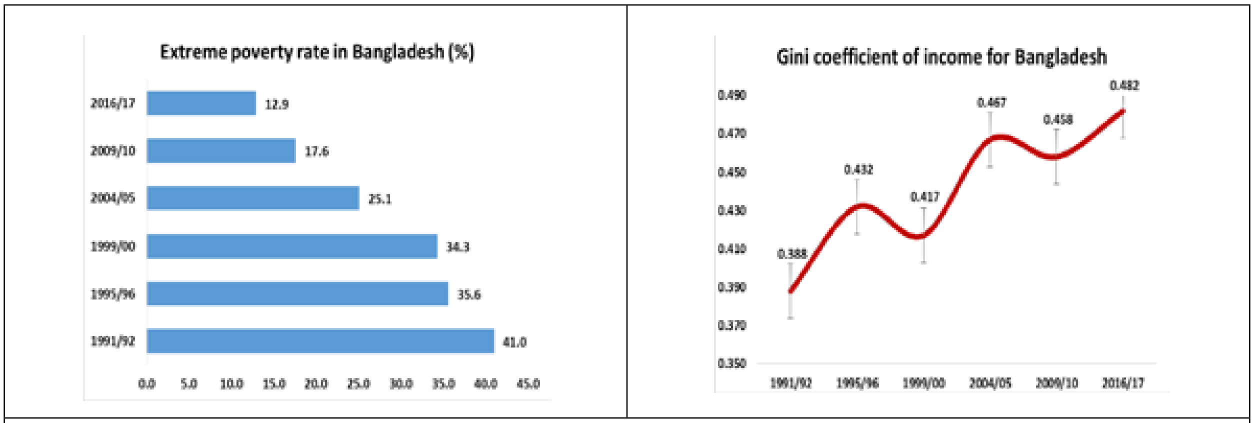

উৎস: এইচআইইএস (HIES) ২০১৬-এর ওপর ভিত্তি করে

আর্থিক নীতিমালার একটি মূল উপাদান হলো সামাজিক সুরক্ষা। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রসার করা, পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন। বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির প্রায় ২.২ শতাংশ ব্যয় করে আসছে। তবে এর একটি বড় অংশ (জিডিপির ১%) সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন তহবিলের জন্য অর্থায়ন কাজে ব্যবহার হয়। তদুপরি বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের (M&E) সূচকগুলো থেকে বোঝা যায়, ব্যবস্থাটি আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর নয় এবং ব্যয়সাশ্রয়ীও নয়। ফলস্বরূপ বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক মান খুব বেশি নয়। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের (NSSS) ওপর ভিত্তি করে জীবনচক্র কৌশল অবলম্বন করে সামাজিক সুরক্ষা বা সোশ্যাল প্রটেকশন (SP) পদ্ধতিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তবে বাস্তবায়নে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে, যা চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ফলাফল হিসেবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতি পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। এ কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এনএসএসএসে নির্ধারিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সংশোধনের বিষয়সমূহ ত্বরান্বিত করার তাগিদ রয়েছে। কোভিড-১৯-এর ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়গুলো প্রতিরোধ করার জন্য একটি প্রশস্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব এই মুহূর্তে সর্বাধিক।

১৪.২.১ বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ

বিপুলসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচি (স্কিম): সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সংখ্যা এখনও অনেক বেশি। বিগত পাঁচ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের আওতাধীন স্কিমের সংখ্যা ২০১৭ এবং ২০১৯ অর্থ-বছরের মধ্যে ১১৫ থেকে ১৩০-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। কেবল অ-উন্নয়ন বাজেটের আওতাধীন স্কিমগুলো বিবেচনা করা হলে স্কিমের সংখ্যা ৫৫টির কাছাকাছি হবে। তবে সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের গভীর পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, অ-উন্নয়ন সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের ৭৫ শতাংশেরও বেশি ৩০টি বৃহৎ স্কিমের জন্য বরাদ্দ থাকে। এর আওতায় থাকে সুবিধাভোগীদের বড় একটি অংশ। অ-উন্নয়ন বাজেটের সঙ্গে যখন উন্নয়ন বাজেট বিবেচনা করা হয়, ৩০টি বড় কর্মসূচিতে বরাদ্দ কমে প্রায় ৫০ শতাংশ হয়। ছোট স্কিমগুলো বিবেচনা করা হলে কিছু ক্ষুদ্র কর্মসূচি এত ক্ষুদ্র যে সেগুলো খুবই কম প্রভাব রাখে। সেগুলোকে বড় কর্মসূচির সঙ্গে একীভূত করা হলে কিংবা যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায়ই রেখে দেয়া হলেও বলার মতো প্রভাব ফেলতে পারে না বললেই চলে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মসূচি সমন্বয়করণ-সম্পর্কিত গবেষণাটি এই বিষয়ে সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। এতে বলা হয়েছে, বাজেটের কার্যকারিতায় খুব বেশি প্রভাব ছাড়াই প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অনুরূপ ছোট স্কিমগুলোর সমন্বয় করতে যাচাই-বাছাইয়ের সম্ভাব্য সুযোগ রয়েছে।[১৪]

স্বল্প-প্রচেষ্টা ব্যবস্থাপনা: প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে নগদ ও সিসিটির (শর্ত সাপেক্ষে নগদ হস্তান্তর) প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় ৪ শতাংশ, অথচ খাদ্য কর্মসূচির প্রশাসনিক ব্যয় প্রায় ১০ শতাংশ। সিসিটি/নগদ কর্মসূচির জন্য এটি বৈশ্বিক গড় ৮.২ শতাংশ এবং খাদ্য-সহায়ক প্রোগ্রামগুলোর ২৫ শতাংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। এই কম প্রশাসনিক ব্যয় কর্মসূচি সম্পাদনের দক্ষতা

১৪ Social Security Policy Support (SPPS) Programme (2019) 'Harmonisation of Small Social Security Programmes: Issues and Policy Options' in General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. A Compendium of Social Protection Researches.

প্রতিফলিত করে না; বরং এগুলো ব্যবস্থাপনায় স্বল্প প্রচেষ্টার ফলাফলের প্রতিফলন। এতে বর্জন ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বড় সড় ত্রুটি এবং সংস্থানসমূহে ছিদ্র থাকার কথাই ইঙ্গিত করে।

আওতা

সুবিধাভোগী আওতা: মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে সুবিধাভোগী আওতাভুক্তির পরিমাণ ২০১৫ অর্থবছর ও ২০১৮ অর্থবছরে ৩২ থেকে ৩৪ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো সুবিধাভোগী কাভারেজ বিদ্যমান দারিদ্র্যের হারের চেয়ে বেশি (প্রায় ২০ শতাংশ)। এই তথ্য থেকে মনে হতে পারে, সমস্ত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রয়েছে। আবার এতে বড় ধরণের ভুলবশত অনেককে বাদ দেয়া বা ভুলবশত অন্তর্ভূক্ত করার ঘটনাও রয়েছে। এগুলো বিবেচনায় নেয়া হলে দরিদ্রদের আওতাভুক্তি কম হয়ে যায়।

শিশুদের জন্য কম আওতাভুক্তি: অর্থ মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের উপাত্ত ব্যবহার করে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) একটি সমীক্ষা (২০১৯) পরিচালনা করে। এতে দেখা গেছে, ২০১০ অর্থবছরে মোট সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের ৩.৫ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছিল ৫.৬ শতাংশ শিশু সুবিধাভোগকারীদের জন্য। ২০১৬ অর্থবছরে মোট সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের ২.৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছে ২.৩ শতাংশ শিশু সুবিধাভোগীর জন্য। শিশু-যত্ন নেয়ার ভূমিকায় থাকা পরিবার এবং পরিচর্যাকারীদের (কেয়ারগিভার) সহায়তার কোনো কর্মসূচি নেই। কেবল শহরাঞ্চলে নারী সরকারি কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি শিশু-যত্ন কেন্দ্র রয়েছে। বাল্য বিবাহতে ছেদ টানতে ইউনিসেফের বাজেট বরাদ্দের (২০১৮) বিশ্লেষণ ৬৪টি সরকারি কর্মসূচি এবং প্রকল্প (২০১১-২০১৬ অর্থবছরে মোট সরকারি বাজেটের ১.১৫ শতাংশের গড় বরাদ্দসহ) চিহ্নিত করেছে, যেগুলো প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ বন্ধে অবদান রেখেছে। তবে এখনো বাল্য বিবাহর উচ্চ প্রবণতা বাংলাদেশে বাল্য বিবাহর অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিগুলোর পর্যাপ্ততার পাশাপাশি কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। এতিম ও অন্যান্য নাজুক শিশুর জন্য গ্রহণ করা কর্মসূচির সংখ্যাও অপর্যাপ্ত।

নগর অঞ্চলে কম সুবিধাভোগী আওতা: বর্তমানে নগর এলাকায় সুবিধাভোগীর আওতা আনুপাতিকভাবে কম। বাংলাদেশে দ্রুত হারে নগরায়ণ ঘটছে। ২০১৫ অর্থবছরে যে হার লিপিবদ্ধ হয়েছে ৩৫ শতাংশ হারে, ২০৩৫ সালের মধ্যে তা ৫০ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের শহরাঞ্চলে স্থানান্তর (অভিবাসন) শহরে দারিদ্র্য কমার হারকে মন্থর করেছে। গ্রামাঞ্চলে ২৫ শতাংশের তুলনায় শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হ্রাস মাত্র ১০ শতাংশ। গড়ে, অর্থবছর ২০১৪ অর্থবছর ২০১৮-এর সময় স্থানীয়ভাবে বরাদ্দের চিত্র বিবেচনায় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বরাদ্দ তিনটি বিষয় সামনে আনে–(১) সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলোর ৪৯ শতাংশ গ্রামীণ এবং শহর উভয় অঞ্চলে (সরকারি পেনশনসহ) সেবা সরবরাহ করে; (২) সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলোর ৪৭ শতাংশ কেবল গ্রামাঞ্চলে যায়; এবং (৩) সামাজিক সুরক্ষা স্কিমগুলোর মাত্র চার শতাংশ শুধু শহরাঞ্চলের জন্য। বরাদ্দের এই অমিলের ফলাফলসমূহ হলো–(১) শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের তুলনায় কম আওতাভুক্তি (যেমন ১৮.৯% দারিদ্র্যের হারের বিপরীতে ১০.৬% আওতাভুক্ত); (২) গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্যের চেয়ে বেশি আওতাভুক্তি, যেখানে দরিদ্র ২৬.৫ শতাংশ (২০১৬) অথচ সুবিধাভোগী ৩৪.৫ শতাংশ। শহর অঞ্চলে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে ঘনীভূত অর্থনৈতিক প্রভাব বিবেচনায় সেখানে সামাজিক সুরক্ষা (এসপি) কার্যক্রমের পার্থক্য চিহ্নিত করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সুরক্ষা-সম্পর্কিত দরিদ্রদের নগর-চাহিদা নিয়ে জিইডির গবেষণা রয়েছে। তা থেকে জানা যায়, শহুরে সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনার ওপর একটি নতুন ও নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, বিশেষত দেশে অব্যাহত শহরমুখী অভিবাসনের প্রবণতা বিবেচনা করা হলে। এই গবেষণাকর্ম থেকে পাওয়া বড় একটি সুপারিশ হলো এনএসএসএস-এর বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নগর খাত নীতি গ্রহণ করা।[১৫]

সম্পদের বণ্টন

সামাজিক সুরক্ষা বাজেট স্থিতিশীল তবে কম: সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় (সামাজিক ক্ষমতায়নসহ) বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ২.২ শতাংশ ব্যয় করে আসছে। সরকারি কর্মচারী পেনশন স্কিমের অংশ বাদ দিলে এই বরাদ্দ জিডিপির ২.২ শতাংশেরও কম হয়। মূল সরকারি পরিকল্পনাগুলোয় (যেমন এনএসএসএস, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজির অর্থায়ন কৌশল) সামাজিক সুরক্ষা বাজেটকে বাড়িয়ে প্রায় ২.৫ শতাংশে এবং জিডিপির তিন শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

---

১৫ Social Security Policy Support (SPPS) Programme (2019) 'Diagnostics for Urban Poverty and the Social Security Needs of the Urban Poor in Bangladesh' in General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh. A Compendium of Social Protection Researches.

অপর্যাপ্ত অনুদান: উপকারভোগীদের কাছে গড় হস্তান্তর পরিমাণ (অনুদান বা জেনেরোসিটি হিসেবেও পরিচিত) বাংলাদেশে কম। প্রাক্কলিত গড় হস্তান্তর পরিমাণ গত কয়েক বছরে নামমাত্র (নমিনাল টার্ম) পর্যায়ে বেড়েছে। এটি ২০১৫ অর্থ-বছরের প্রতিমাসে ৩৩২ টাকার কম ছিল, যা কিছুটা বেড়ে ২০১৮ অর্থবছরে প্রতি মাসে গড়ে হয়েছে প্রায় ৫৯৫ টাকা। জাতীয় দারিদ্র্যসীমার সঙ্গে তুলনা করা হলে এই তহবিল হস্তান্তরের পরিমাণ উপকারভোগীদের দারিদ্র্য পরিস্থিতির ওপর তেমন কোনো অর্থবহ প্রভাব ফেলে না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের জন্য প্রাক্কলিত উচ্চ দারিদ্র্য রেখা প্রতি মাসে ব্যক্তিপ্রতি ২০২৫ টাকা। সুতরাং ৫৯৫ টাকা প্রদানের ফলে একজন দরিদ্র ব্যক্তির প্রয়োজনের মাত্র ২৯ শতাংশের সংস্থান হয়।

১৪.২.২ সপ্তম পরিকল্পনার সামাজিক সুরক্ষা কৌশল

সপ্তম পরিকল্পনা ২০১৫ সালের জুনে গৃহীত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের (NSSS) সফল বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়, কেননা কৌশলটির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসবে। সপ্তম পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, 'প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো সহায়ক হবে ত্রুটি দূরীকরণ, লক্ষ্যমাত্রা উন্নতকরণ ও তহবিল হস্তান্তরের গড় মূল্য বৃদ্ধিতে, দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে, দারিদ্র্য হ্রাস করতে, আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে এবং সামাজিক মূলধন বিনির্মাণে।' এছাড়া দেশের পরিবর্তনশীল জনমিতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে, যেন স্বাস্থ্যের মতো নির্দিষ্ট সেবাগুলোর চাহিদা-জোগান ঠিক থাকে।

বক্স ১৪.১: জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্রের (NSSS) সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এনএসএসএস (NSSS) একটি শক্তিশালী কৌশল যা দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী কর্তৃক মোকাবিলা করা জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিকে সংজ্ঞায়িত করে। এটি সার্বিকভাবে প্রণয়ন করা একটি আয় হস্তান্তর ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই ঝুঁকিগুলো হ্রাস করার চেষ্টা করে এবং এর অর্থ সঠিকভাবে পৌঁছায় জনসংখ্যার দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠীর কাছে (ছোট শিশু, স্কুলপড়ুয়া শিশু, দুর্বল নারী এবং বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম)। জাতি, ধর্ম, পেশা, অবস্থান বা গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলে এনএসএসএসের অন্তর্ভুক্ত। এই কৌশল শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য অবদানমূলক সামাজিক বিমা এবং কর্মসংস্থান বিধিবিধানের সঙ্গে কর-তহবিল সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির সমন্বয় করে বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের চেষ্টা করে। এটি নানা উপায়ে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায়ও যথেষ্ট উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। একই সঙ্গে পরিপূরক কর্মসূচি একীভূত করে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে। এছাড়া একটি আধুনিক এমআইএস সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে, আর্থিক খাতভিত্তিক জিটুপি (সরকার থেকে জনগণ) সিস্টেম ব্যবহার করে খাদ্যভিত্তিক হস্তান্তর করে অর্থ দেয়ার পরিবর্তে নগদ-ভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এবং প্রকৃত ফলাফল-ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্কারগুলো ত্রুটি দূরীকরণ, লক্ষ্যমাত্রা উন্নীতকরণ, হস্তান্তরের গড় মূল্য বৃদ্ধি, দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি ঝুঁকি কমিয়ে আনতে, দারিদ্র্য হ্রাস করতে, আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে এবং সামাজিক মূলধন বিনির্মাণে সহায়তা করবে (উৎস: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)

সপ্তম পরিকল্পনার আওতায় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি

এনএসএসএস বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য জিইডি ২০১৯ সালে একটি প্রণিধানযোগ্য পর্যালোচনা প্রবর্তন করেছে। এই পর্যালোচনা অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ৮৬টি সূচক বিবেচনায় নিয়েছে। সম্পাদিত কার্য চারটি মানদণ্ডের বিপরীতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে বিভিন্ন সূচকে ন্যস্ত স্কোর দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে সেইগুলো সঠিক পথেই আছে কি না (অর্থাৎ ঘঝঝঝ এবং অ্যাকশন প্ল্যানে বর্ণিত কার্যসম্পাদন সূচকগুলো সম্পূর্ণরূপে অর্জিত/পরিচালিত হয়); প্রায় সঠিক পথে (যখন পূর্বনির্ধারিত কার্যসম্পাদন সূচকগুলোয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তবে কিছু ঘাটতি রয়েছে); সঠিক পথ থেকে খানিকটা বিচ্যুত (যখন কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তবে পরিকল্পিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ থেকে বাস্তবায়ন অনেক পেছনে রয়েছে); এবং সঠিক পথ থেকে সাংঘাতিকভাবে বিচ্যুত (যখন খুব অল্প বা কোনো অগ্রগতিই হয়নি)। উপরের বিশ্লেষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পাঁচটি পূর্ণ স্কোর পাওয়া সূচককে সঠিক পথে বা 'অন ট্র্যাক' হিসেবে বিবেচনা করা হয়; চার স্কোর পাওয়া সূচক 'প্রায় সঠিক পথে' হিসেবে; তিনটি স্কোর পাওয়া সূচকগুলো 'সঠিক পথ থেকে খানিকটা বিচ্যুত' হিসেবে; এবং একটি বা দুটি স্কোর পাওয়া সূচকগুলো 'সঠিক পথ থেকে সাংঘাতিকভাবে বিচ্যুত' হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্মসম্পাদনের (পারফরম্যান্সের) সংক্ষিপ্ত ফলাফলটি জীবনচক্র-ভিত্তিক কর্মসূচির দ্বারা পুনরায় উৎপাদিত হয় (ঘঝঝঝ, ২০১৫-তে যেভাবে প্রস্তাবিত)।

চিত্র ১৪.২: স্বতন্ত্র সূচকগুলোর বাস্তবায়নের অবস্থা

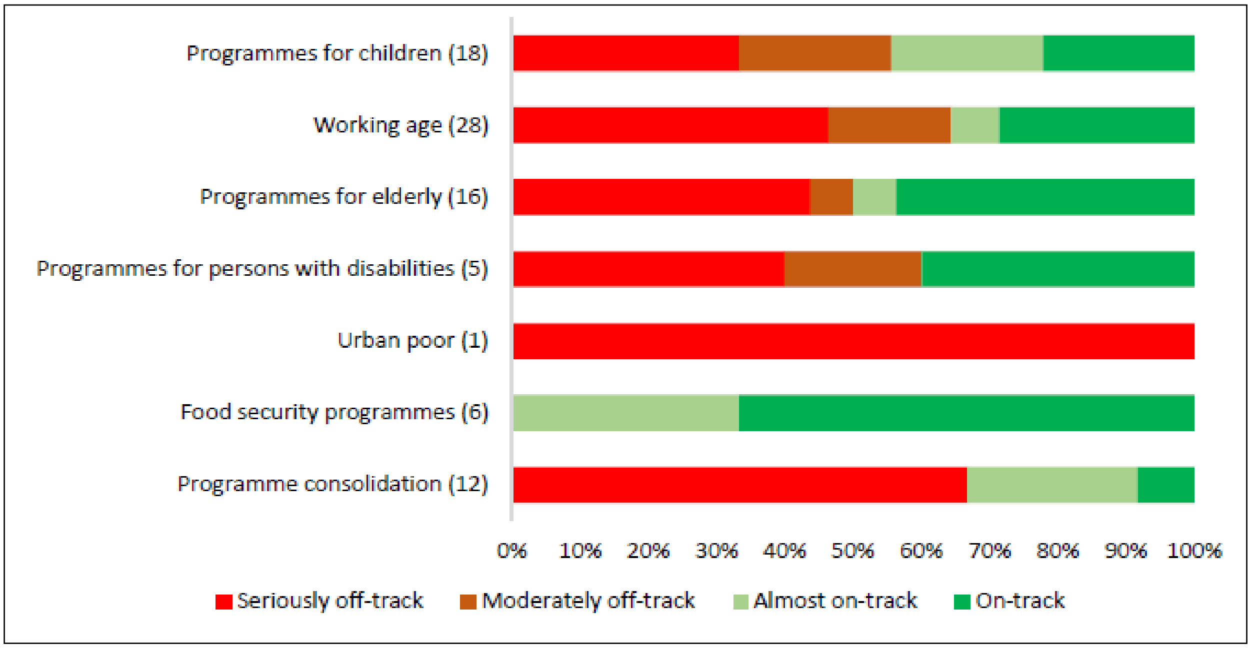

সূত্র: NSSS-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

এনএসএসএস-এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন অনুসারে, ৮৬টি কার্যসম্পাদন সূচকের মধ্যে ২৬টি সূচক (প্রায় ৩০ শতাংশ) সঠিক পথে আছে। মোট ৩৭টি সূচক (৪৩ শতাংশ) গুরুতরভাবে সঠিক পথ থেকে দূরে–অর্থাৎ খুব অল্প অগ্রগতি হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা এবং বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি সম্পর্কিত সংস্কারগুলোর বেশিরভাগ সময়মতো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শহুরে দরিদ্রদের সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্কারগুলোয় সর্বনিম্ন অগ্রগতি দেখা গেছে। এর কারণ এনএসএসএস-এ যে একটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছিল (অর্পিত স্টাডি), পর্যালোচনা চলাকালে সেটি ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর্মসূচি একীভূতকরণ তার উদ্দেশ্য অর্জন থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ১২টি সূচকের মধ্যে এটি কেবল একটি সূচকের সময়োচিত বাস্তবায়ন অর্জন করেছে। আটটি সূচক রয়েছে, যেখানে এই সংস্কার গুরুতরভাবে পিছিয়ে রয়েছে (অফ-ট্র্যাক)।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংস্কার সূচকের কেন্দ্রে রয়েছে কর্মক্ষম বয়সের দরিদ্রদের নিয়ে কর্মসূচিসমূহ। ২৮টি সূচকের মধ্যে সন্তোষজনক অগ্রগতি (অন ট্র্যাক/প্রায় অন ট্র্যাক) হিসেবে ১০ সূচককে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখনো ১৩টি সূচক রয়েছে, যেখানে বাস্তবায়ন এনএসএসএস ভিশনের চেয়ে গুরুতরভাবে পিছিয়ে রয়েছে।

জিটুপি ও জিআরএস-সম্পর্কিত সংস্কারের ক্ষেত্রে সূচকসমূহের সঠিক পথে থাকার তুলনামূলকভাবে উচ্চ অনুপাত লক্ষ্য করা গেছে। এই দুটি বড় বিষয়কে (জিটুপি ও জিআরএস) মূল্যায়ন করার জন্য তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক সূচক রয়েছে। সূচকগুলোর সর্বাধিক সংখ্যা ধারণাগত গুচ্ছ (থিম্যাটিক ক্লাস্টার) উপাদানগুলোয় কেন্দ্রীভূত হয়। ২১টি সূচকের মধ্যে পাঁচটি সঠিক পথে রয়েছে এবং অন্য ১৪টি সঠিক পথ থেকে গুরুতর বা অনেকটা বিচ্যুত। অন্যগুলোর মধ্যে একক রেজিস্ট্রি এমআইএসের জন্য সমস্ত সূচক, হয় মোটামুটি অথবা গুরুতরভাবে বিচ্যুত। সুবিধাভোগী বাছাই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছয়টি সূচকের মধ্যে চারটি গুরুতরভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। সুবিধাভোগীদের একটি একক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে জিইডি বিভিন্ন ডেটাবেজ পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি একক নিবন্ধন ব্যবস্থা পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছে। জিইডির এই মূল্যায়নের মাধ্যমে পরামর্শ দেয়া হয় যে, একটি একক নিবন্ধন ব্যবস্থার বিকাশ সাধনের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের সহযোগী ডেটাবেসগুলোর অগ্রগতি সাধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। প্রথমত যা করতে হবে তা হলো নীতিমালাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পরিচালনগত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। এ কারণে, জাতীয় খানাভিত্তিক উপাত্ত ভান্ডার বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, যা একক রেজিস্ট্রি গঠন করবে এবং পরবর্তী উন্নয়ন সময়ে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৬]

১৬ Social Security Policy Support (SSPS) Programme (2019) Assessment and Road Map Report: Situation Assessment for Establishing a National Social Protection Management Information System in Bangladesh

১৪.২.৩ অষ্টম পরিকল্পনার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কৌশল

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো এনএসএসএসের সফল প্রয়োগ, যেহেতু সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল না। এনএসএসএসের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশের দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ সামাজিক সুরক্ষা প্রসারে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করবে। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো সহায়ক হবে ত্রুটি দূর করতে, লক্ষ্য নির্ধারণের মান উন্নতকরণে, তহবিল হস্তান্তরের গড় মূল্য বৃদ্ধি করতে, দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে, দরিদ্ররা যে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে তা কমিয়ে আনতে এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করতে। সামাজিক মূলধন বিনির্মাণে এনএসএসএসের মূল উপাদানগুলো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জগুলো নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার রূপকল্প

দীর্ঘমেয়াদে এটির উদ্দেশ্য হবে একটি শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যাওয়া। যাদের সহায়তার প্রয়োজন এমন সব বাংলাদেশিদের জন্য সুলভ হওয়ার এবং ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দেয়ার পাশাপাশি এমন একটি বিস্তৃত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্য প্রয়োজন, যারা আঘাত ও সংকটের মধ্য থেকে আরও দরিদ্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। সুতরাং সামাজিক সুরক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হলো:

- সকল বাংলাদেশির জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা, যা ফলপ্রসূভাবে দারিদ্র্য ও বৈষম্য মোকাবিলা করতে পারে; এছাড়া ব্যাপক পর্যায়ে মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

একটি প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরিতে পরবর্তী পাঁচ বছরে লক্ষ্য হবে:

- সম্পদের আরও কুশলী ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে এসএসএসের সংস্কার করা। এই সংস্কারের মধ্যে আরও থাকবে সেবা ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সামাজিক সুরক্ষার আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক গঠনের দিকে অগ্রগতি, যা কার্যকরভাবে জীবনচক্রের ঝুঁকি মোকাবিলা করে এবং একই সঙ্গে সমাজের দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে চরম দারিদ্র্যের ঘটনা যতটা সম্ভব দূর করা।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় সামাজিক সুরক্ষার (SP) জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে তিনটি গুচ্ছে–(১) সামাজিক সহায়তা; (২) সামাজিক বিমা; এবং (৩) পদ্ধতির মানোন্নয়ন

সামাজিক সহায়তার বিস্তার

কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষিতে বর্ধিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

কোভিড-১৯-এর মারাত্মক আঘাতের পরে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও বিপর্যয় ব্যাপক বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর মারাত্মক সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দরিদ্র ও দুর্বল গোষ্ঠীসমূহের সঞ্চয় ও সংস্থানের অভাব রয়েছে। সরকারি উদ্দীপনামূলক প্যাকেজগুলোর মনোযোগের মূল বিষয় হওয়া উচিত স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপদগুলো সামাল দেয়া (চিত্র ১৪.৩)। সেই অনুসারে প্রথম অগ্রাধিকার হলো কোভিড-১৯ আক্রান্ত পরিবারগুলোকে ত্রাণ সরবরাহ করা। এ কারণে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১ অর্থবছরে দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারগুলোয় আয়ের হস্তান্তর হিসেবে জিডিপির অতিরিক্ত ২-৩ শতাংশ ব্যয়ের পরিকল্পনা করবে। এই বাড়তি তহবিল কোভিড-১৯ এর কারণে আয় কমে যাওয়া ও কর্মসংস্থান হারানো দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারগুলোকে অস্থায়ীভাবে সাহায্য করবে। মধ্য মেয়াদের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দকে জিডিপির ১.২ শতাংশ (সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন বাদ দিয়ে) থেকে ২০২৫ অর্থ-বছরের মধ্যে জিডিপির প্রায় ২.০ শতাংশে বাড়িয়ে তুলবে।

মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (MCBP)

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে অপুষ্টি হ্রাসে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে মাতৃত্বকালীন ও শিশুদের দুর্বল পুষ্টির কারণে সুস্থ শিশুর বিকাশ, উন্নয়ন সম্ভাবনা ও প্রাপ্তবয়স্কদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অব্যাহতভাবে হুমকির মুখে পড়ছে। জাতীয়

সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫-তে বিদ্যমান মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং স্তন্যদানকারী মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিশু সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। এনএসএসএসের দিকনির্দেশনা এবং এর কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MoWCA) এরই মধ্যে ২০১৮-১৯ সালে উভয় কর্মসূচির একটি আরও উন্নত সংস্করণ তৈরি করেছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ২৪ জুলাই মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি নামে ব্র্যান্ডিং করে একটি রূপকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এমসিবিপিতে দরিদ্র পরিবারগুলোর গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারীদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় পুষ্টিসংক্রান্ত দুর্বলতার ভিত্তিতে। তাদের সহায়তা দেয়া হয়, যাদের রয়েছে সর্বোচ্চ দুটি শিশু (প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান) এবং বয়স ০-৪ বছরের মধ্যে। কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো মাসিক নগদ-ভিত্তিক হস্তান্তর (৮০০ টাকা) এবং সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের যোগাযোগ (SBCC) বিধানের মাধ্যমে পুষ্টিকর আহারে পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। সুস্থ-সবল প্রসবের সুফল, কাঙ্খিত শিশু ও নবজাতকদের খাওয়ানোর সেরা অনুশীলন বিনির্মাণ এই কর্মসূচির লক্ষ্য। সেইসঙ্গে মানসিক বিকাশে বা সব ধরণের অপুষ্টি কমাতে অবদান রাখায় সহায়তা করাও এর লক্ষ্য। উপযুক্ত সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর সর্বাধিক কাভারেজ নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল স্ব-তালিকাভুক্তি প্রক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে এমসিবিপি (MCBP) আরও উন্নত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ২০২০-২১ সালের মধ্যে এমসিবিপির প্রসার ৬৬টি উপজেলায় উন্নীত করার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ৭.৫ মিলিয়ন পরিবারের গর্ভবতী মহিলা এবং ০-৪ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম প্রসার অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রমের সফল প্রয়োগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি আরও বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করবে।

স্কুল উপবৃত্তিতে এনএসএসএস (NSSS)-এর সুপারিশ বাস্তবায়ন

গ্রামাঞ্চলজুড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং তাদের পরিবার প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি স্কিমের মূল লক্ষ্যভোগী। এটি শর্তসাপেক্ষে নগদ হস্তান্তর করার একটি কার্যক্রম। এই কর্মসূচিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নগদ সহায়তা দেয়ার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক ও স্কুলবয়সী বাচ্চাদের তালিকাভুক্তির হার বৃদ্ধি করা, উপস্থিতি হার বাড়ানো, সমাপনী চক্র বৃদ্ধি, টিকে থাকার হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প (PESP)। পিইএসপি কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০১০ অর্থবছরে ছিল ৫২ লাখ (বা ৫.২ মিলিয়ন), যা ২০১৮ অর্থবছরে বেড়ে এক কোটি ৩০ লাখে (বা ১৩ মিলিয়ন) উন্নীত হয়েছে। ২০১০ ও ২০১৮ অর্থবছরে বাজেটে যথাক্রমে বরাদ্দ ছিল ৫৭৪ কোটি ৮৪ লাখ টাকা (বা ৫,৭৪৮.৪ মিলিয়ন টাকা) এবং এক হাজার ৪৫০ কোটি (বা ১৪,৫০০ মিলিয়ন) টাকা। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিদ্যমান প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

চিত্র ১৪.৩: প্রয়োজনীয় বাড়তি বিনিয়োগ (বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা ও জিডিপির শতাংশ)

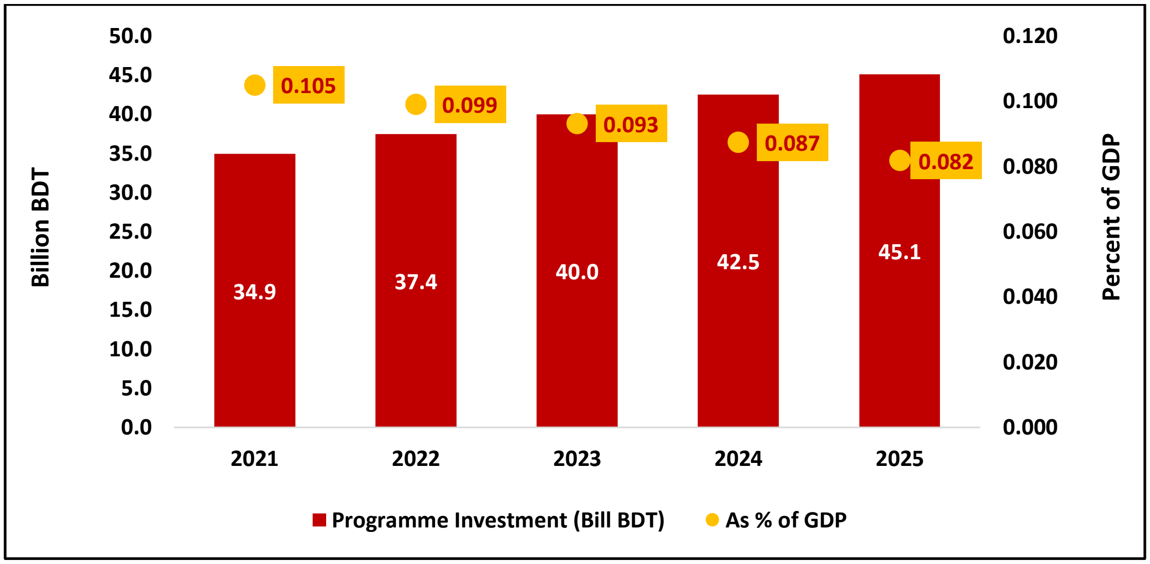

এনএসএসএসের (২০১৫) একটি সুপারিশ ছিল প্রতি মাসে শিক্ষার্থীর জন্য স্কুল উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা। এই উদ্যোগটি এখনো কার্যকর করা হয়নি। স্কুল উপবৃত্তির পরিমাণের প্রকৃত মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এ প্রেক্ষিতে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে এনএসএসএসের সুপারিশটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা কমবেশি ১৩ মিলিয়নের কাছাকাছি থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের প্রতিমাসে ৩০০ টাকা দেয়া হবে (যা মূল্যস্ফীতির সূচকযুক্ত)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি কার্যক্রমের প্রাক্কলিত অতিরিক্ত ব্যয় ২০২১ অর্থবছরে জিডিপির ০.১০৫ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে জিডিপির ০.০৮২ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালীন (কিশোরী) মেয়েদের বিষয়ে পদক্ষেপ

বাংলাদেশের বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার এবং বাল্য বিবাহর শিকার হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি। স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও বাল্য বিবাহর দুটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার বিষয়কে। স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার কমাতে এবং পাশাপাশি বাল্য বিবাহকে দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে যে পদক্ষেপসমূহ নেয়া হয়েছে তা মৃত্যুহার হ্রাস, পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সেই অনুসারে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরীক্ষামূলক (পাইলট) প্রকল্প নিয়ে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। বাল্য বিবাহ পিছিয়ে দিতে এবং পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়া হ্রাস করার ক্ষেত্রে এই হস্তক্ষেপগুলো ইতিবাচক ফলাফল এনেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে ইতিবাচক ফলাফলগুলো বেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল বলে যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই তা পরবর্তীকালে আরও বড় পরিসরে বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়েছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, কিশোরী মেয়েদের ঝরে পড়া হ্রাস এবং বাল্য বিবাহকে বিলম্বিত করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের নকশা প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ:

- উঠতি কিশোরীর প্রায় ৩৩ শতাংশ (১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী) বিবাহিত এবং ১৮.৫ শতাংশ জীবিত শিশু প্রসব করেছে অথবা তারা প্রথম সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। সুতরাং এই হস্তক্ষেপের জন্য লক্ষ্য নির্ধারিত গোষ্ঠীর বয়স ১০ ও ১৮ বছরের মধ্যে বা ১৯ বছর বয়সের মেয়েরা।
- প্রায় ৪৫ শতাংশ কিশোরী স্কুলে যায় না। অতএব, কমপক্ষে দুই ধরণের মেয়েদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বিবেচনা করা যায়–একটি স্কুলপড়ুয়া মেয়ে, কিন্তু ঝরে পড়া ও বাল্য বিবাহর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে; এবং অন্যটি এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে যারা এরই মধ্যে স্কুল থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি বাল্য বিবাহর শিকার হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।
- দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ কার্যক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া যাতে করে এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ‘বিচ্যুতি’ না ঘটে। এক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য অর্থ হস্তান্তর পদ্ধতি হতে পারে এমন যে, প্রতিমাসে বর্ধিত হারে সমতার ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৯০০ টাকা প্রদান করা হবে। এই অর্থ তিনটি অংশে ভাগ করে দেয়া হবে। তা হলো শিক্ষা বৃত্তি হিসেবে ৩০০ টাকা; বিভিন্ন ধরণের পরিচ্ছন্নতা উপকরণ ক্রয় বাবদ ৩০০ টাকা; এবং স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ব্যয় মেটানোর জন্য ৩০০ টাকা। এর বাইরে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী সকল নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয়ে সমতার ভিত্তিতে উন্নততর মেধাভিত্তিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে ও নাগরিক উদ্যোগে তাদের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- সুবিধাভোগী বাছাই এবং পরবর্তী কর্মসূচির গভীর পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান অবশ্যই বরাদ্দ করতে হবে।

ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কিশোরী মেয়েদের জন্য কর্মসূচি বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিশোরীদের জন্য দুই ধরণের পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে: যারা স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং যারা স্কুলে যাচ্ছে না তাদের জন্য।

চিত্র ১৪.৪: কিশোরী মেয়েদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের জন্য প্রাক্কলিত বিনিয়োগ

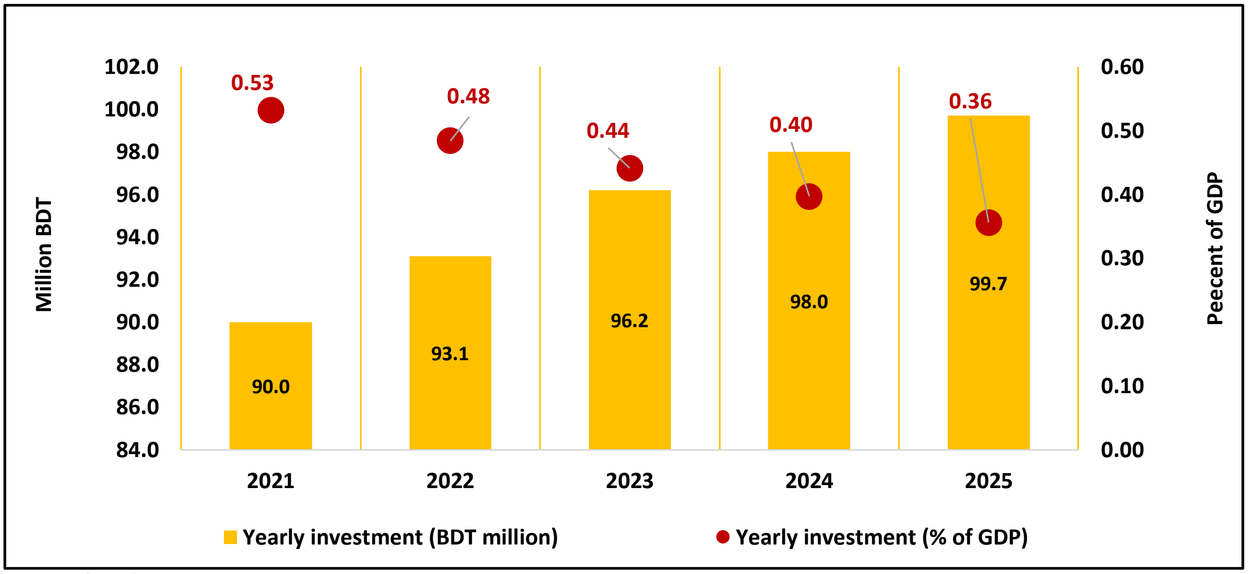

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণসমূহ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব শিক্ষায় হস্তক্ষেপের জন্য বিনিয়োগ নিশ্চিত করা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিডিপির বর্তমান ২ শতাংশের পরিবর্তে প্রস্তাবিত বর্ধিত ৩.০ শতাংশ বরাদ্দের অংশ হিসেবে)। অন্য হস্তক্ষেপের জন্য বিনিয়োগগুলো সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের পাশাপাশি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটেরও অন্তর্ভূক্ত থাকা উচিত। তবে পুরো জাতির জন্য বড় পরিসরে সেটি কার্যকর করার আগে সরকারের প্রথমে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

দুর্বল জনগোষ্ঠী উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের (MoWCA) অধীনে সবচেয়ে বড় সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি হলো দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি। ভিজিডি কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের দারিদ্র্যপ্রবণ ও দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা, যাতে তারা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি ও আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদার ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারে। সারা দেশে একটি চক্রে (দুই বছর) প্রায় ১০ লাখ ৪০ হাজার প্রত্যক্ষ অতি-দরিদ্র সুবিধাভোগী পরিবার মাসিক খাদ্য রেশন (৩০ কেজি চাল) এবং একটি বিকাশ-সংক্রান্ত সেবা (জীবন দক্ষতা ও আয় সৃষ্টির দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় এবং ঋণে প্রবেশাধিকারসহ অন্যান্য) পেয়ে থাকেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচির আওতা আরও বৃদ্ধি করবে।

শারীরিকভাবে অক্ষম নাগরিকের জন্য কর্মসূচিসমূহের সম্প্রসারণ

বাংলাদেশে প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ মানুষ কয়েক ধরণের শারীরিক অক্ষমতায় ভুগছে। জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে অক্ষমতার প্রবণতাও পাওয়া গেছে। তবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতার হার বেড়ে যায়। জনসংখ্যার প্রায় ১.৫ শতাংশের কোনো একটি গুরুতর অক্ষমতা চিহ্নিত করা হয়েছে। সাংঘাতিকভাবে অক্ষমতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য হস্তান্তরিত তহবিলের গড় পরিমাণের চেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারে এমন একটি সর্বজনীন স্কিম প্রণয়ন করা উচিত। শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাংলাদেশে যে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত করা যেতে পারে, তা জীবনচক্র-ভিত্তিক কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করে নিচের চার্টে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ১৪.৫: শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি সম্প্রসারিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা

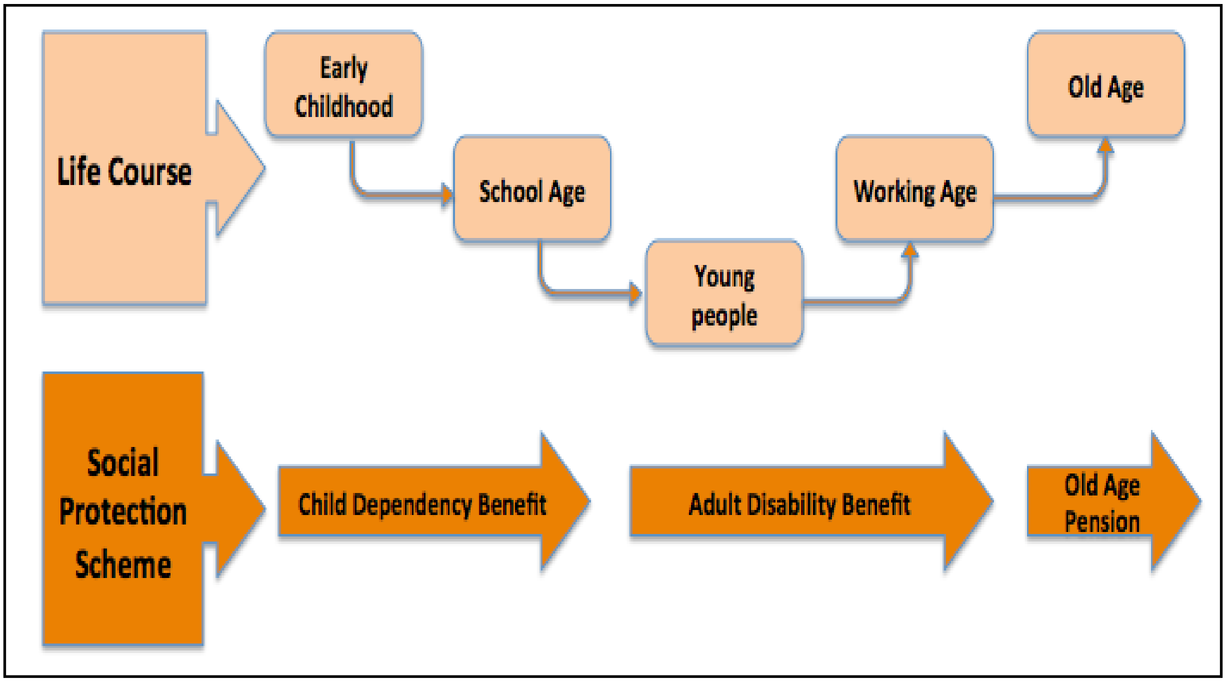

একটি প্রণিধানযোগ্য কৌশলের এই স্তম্ভগুলোর প্রতিটি নিচে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

নির্ভরশীল শিশুদের যত্ননির্ভর সুবিধাদি: বিভিন্ন ভাবে অক্ষম শিশুদের যত্ন নেয়া পরিবারগুলোর জন্য যত্ননির্ভর সুবিধাদি প্রতিষ্ঠা/প্রসারিত করা যেতে পারে। স্কুলে উপস্থিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় না রেখে সব ধরণের গুরুতর অক্ষম শিশুদের এই কর্মসূচিতে আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। শিশুদের একবার এই স্কিমে আনার পরে তাদের নিয়মিত ভিত্তিতে পুনরায় যাচাই করে সনদ দেয়ার প্রয়োজন হবে না। শিশুরা ১৯ বছর বয়সে পৌঁছালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মসূচির বাইরে চলে যাবে। তারা প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমতা সহায়তা কর্মসূচিতে স্থানান্তরিত হবে, যদি তাদের অক্ষমতা মারাত্মক বলে যাচাই করা হয়। পুনরায় অনুমোদনের প্রয়োজন না থাকায় প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস পাবে এবং কার্যক্রম পরিচালনা করার কাজ সহজ হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমতা সহায়তা: গুরুতর অক্ষমতার শিকার ১৯-৬০ বছর বয়সী সব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য একটি প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমতা সহায়তা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারিত করতে হবে। তবে একপর্যায়ে যখন তারা সামাজিক পেনশন বা অন্যান্য পেনশন পাওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে, তখন প্রাপ্তবয়স্ক অক্ষমতা সুবিধা তাদের জন্য বন্ধ করা হবে। কারণ তখন এই সুবিধাভোগীরা অন্য পেনশন স্কিমের আওতায় আসবে।

মোট জনসংখ্যার ১.৫ শতাংশের শারীরিক সীমাবদ্ধতার তীব্রতার হার ব্যবহার করে এবং গত ছয় বছরে জীবনযাত্রার মূল্য বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ২০২০ সালের মূল্য অনুযায়ী প্রতি মাসে তিন হাজার টাকার যুক্তিসংগত একটি হস্তান্তর পরিমাণ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই তিন হাজার টাকা ২০২০ অর্থ-বছরের ব্যক্তিপ্রতি দারিদ্র্যরেখার প্রায় সমান হবে। এছাড়া অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে মোট কর্মসূচির ব্যয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ১০ শতাংশ প্রশাসনিক ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কর্মসূচির ব্যয় প্রায় তিন হাজার ৯০০ কোটি টাকা (৩৯ বিলিয়ন টাকা)। জিডিপি ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে এটি ক্ষুদ্র, যেটি ২০২১ অর্থ-বছরের ০.১১ শতাংশ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ০.০৬ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা মনে করা হচ্ছে।

চিত্র ১৪.৬: শিশু অক্ষমতা বিষয়ক বিনিয়োগ (বিলিয়ন বাংলাদেশি টাকা এবং জিডিপির শতাংশ)

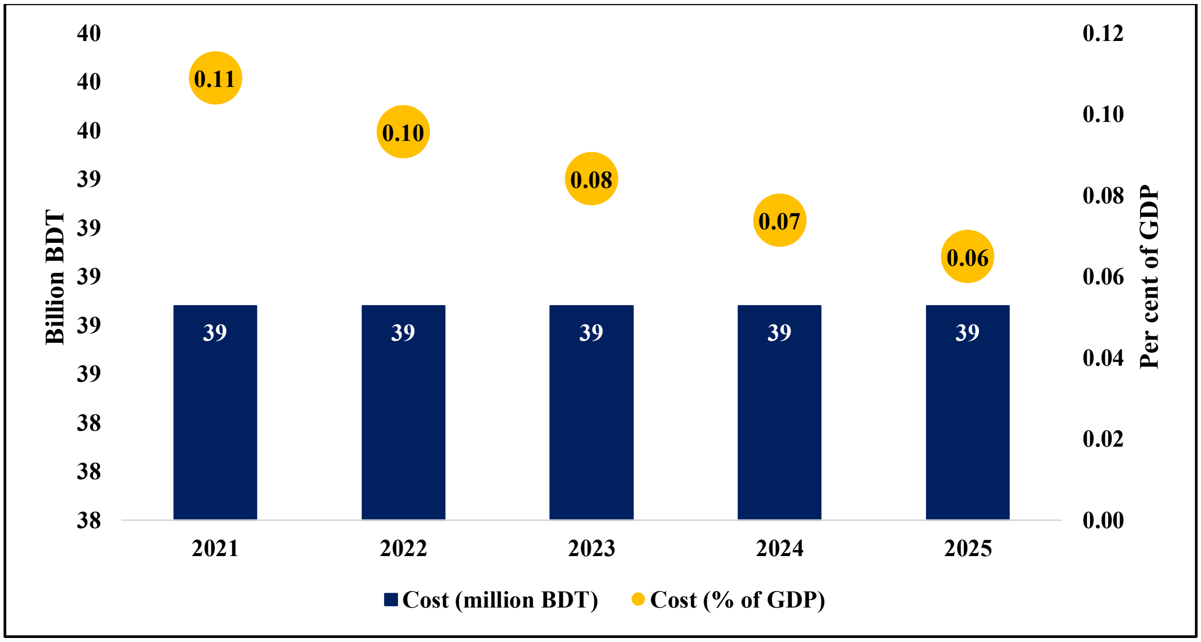

উৎস: জিইডি প্রক্ষেপণসমূহ

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বরাদ্দের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে। এই মন্ত্রণালয় সাধারণ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করবে।

সামাজিকভাবে বাদ পড়ে যাওয়া জনসংখ্যার কাছে পৌঁছানো

একটি বিশাল জনগোষ্ঠী সামাজিকভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে, যারা ধর্ম, জাতিসত্তা, পেশা বা শারীরিক অসামর্থ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন। আইনগত ও ইতিবাচক স্বীকৃত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সকল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সব ধরণের আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করতে সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল। এটি সরকারের বিস্তৃত সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাঠামোর একটি প্রধান এজেন্ডা। সরকার এটাও নিশ্চিত করবে যে এই গোষ্ঠীগুলো সব সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্য মানুষের মতো সমান প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। এছাড়াও নিশ্চিত করবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন-সম্পর্কিত সরকারি সব সেবায় বাকিদের মতো সমান সুযোগ। সরকার বিশ্বাস করে, সরকারি নীতির এই দুটি সূত্র নানাভাবে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের পক্ষে সেরা উপায় হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও সরকার সচেতন যে, এই গোষ্ঠীর অনেক সদস্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য বিশেষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে শনাক্তকরণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সংস্থাগুলোকে সংবেদনশীল করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার ও এনজিওগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে আনতে একটি কার্যকর অভিযোগ-নিরসন ব্যবস্থাও সহায়ক হবে।

সামাজিক বিমা

সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি এখন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য খুঁটির দিকে মনোনিবেশ করার সময় এসেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমন পণ্য বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে, যা বাংলাদেশের বর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আকর্ষণ করতে পারে। তারা যেন প্রয়োজনের সময় ভোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বিমা কিনতে পারে।

সামাজিক বিমার একটি পরিকল্পিত নকশা

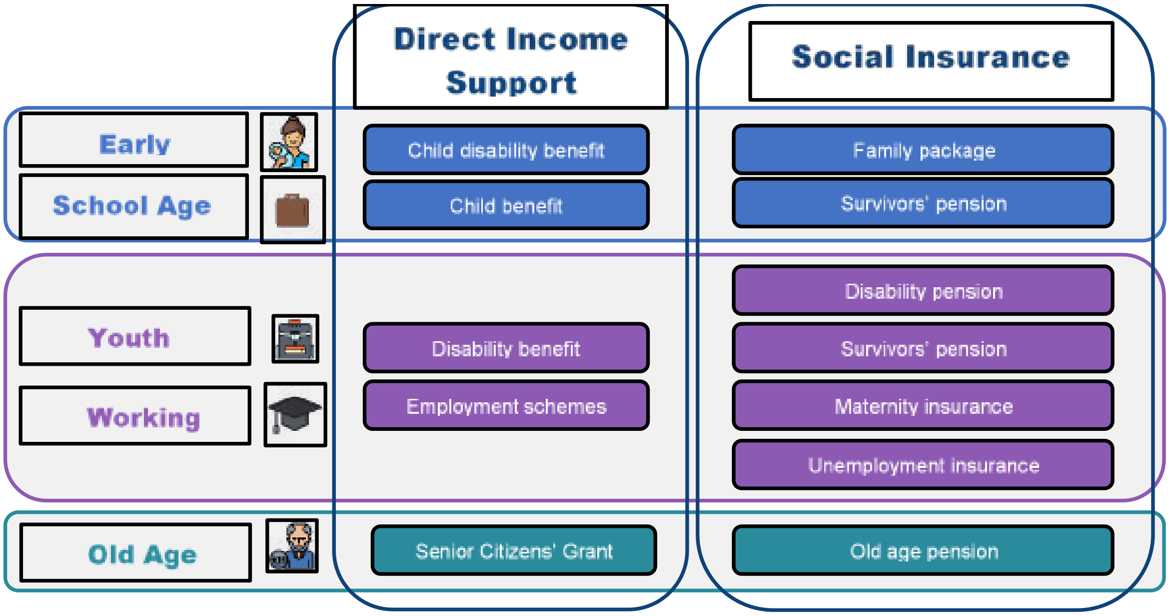

কর্মবয়সের জন্য বিমা

উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব এবং যুব মহিলা কর্মীদের শ্রমবাজারে উৎসাহিত করতে না পারা বাংলাদেশের কর্ম-বয়সী জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। তদুপরি, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বিমা পরিকল্পনাগুলো বাংলাদেশে কার্যত অনুপস্থিত। আগামী প্রজন্মের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমগুলোয় পরিবর্তন এনে এ-সংক্রান্ত কিছু সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতের কর্মীদের জন্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বেকারত্ব বিমা প্রকল্পে প্রবেশাধিকার এবং পরিচর্যা সেবায়ও প্রবেশাধিকার (যেমন শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের জন্য)। এর ফলে যেন শ্রমবাজারে নারী কর্মীদের আরও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

আইএলওর দেয়া কিছু সুপারিশ কর্মক্ষম বয়সের জন্যও বিবেচিত হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে–

(১) সামাজিক বিমা এবং কর্মসংস্থান প্রচারের কর্মসূচির মধ্যে পদ্ধতিগত সংযোগ স্থাপন, যেমন কর্মসংস্থান প্রসারে কর্মসূচিগুলোতে প্রবেশাধিকারের শর্ত হিসেবে সামাজিক বিমা নিবন্ধকরণ বাধ্যতামূলক করা। সক্রিয় শ্রমবাজার নীতিমালার সঙ্গে বেকারত্ব বিমা সুবিধার যোগসূত্র বাড়ানো, যার উদাহরণ হতে পারে উপকারভোগীদের প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রণয়ন করা।

(২) বিশেষত তরুণ বেকারদের উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক বিমায় নিবন্ধনের সঙ্গে কর্মসংস্থান প্রসারের কার্যক্রম উন্নয়ন করা। কেবল ঋণ কর্মসূচিতে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে উল্লেখযোগ্য পরিষেবাগুলো নগর ও গ্রামীণ যুবকদের জন্য মানানসই করার চেয়ে বিশেষ করে ক্যারিয়ার/কর্মসংস্থান/প্রশিক্ষণ কাউন্সেলিং, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা পরামর্শ ও সরকারি কর্মসংস্থান সেবা পুনরায় শক্তিশালী করা।

(৩) কর্মক্ষেত্রে কাজ করার সময় আঘাত পাওয়া এবং পেশাগত রোগের কারণে বিভিন্নভাবে অসামর্থ্যের শিকার ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রণিধানযোগ্য কর্মসূচি (যা প্রশিক্ষণ ও পুনরায় প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তাদের পরামর্শ এবং কর্মজীবনের পরামর্শের সমন্বয় করে) উন্নয়ন করা।

অবদানমূলক পেনশন

বয়সের কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনো একটি তরুণ দেশ। তবে এটি দ্রুত বয়স্ক হয়ে উঠছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বয়স্ক জাতির পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। ৫০ বছর বা তার চেয়েও বেশি বয়সের লোকের সংখ্যা ২০২০ সালে মাত্র ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) থেকে ২০৫০ সালে চার কোটিরও (৪০ মিলিয়ন) উর্ধ্বে পৌঁছে যেতে পারে। সুতরাং পরবর্তী তিন দশকের প্রত্যেকটি সময়কালই ১০ মিলিয়ন অতিরিক্ত প্রবীণ নাগরিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার তার প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সর্বজনীন পেনশনের একটি পদ্ধতি পরিচালনা করে আসছে। অন্তর্ভুক্তিকরণে সামাজিক পেনশন উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করেছে। তবে প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অন্তর্ভুক্তি এখনো কম এবং হস্তান্তরিত অর্থ প্রদান অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দেশের প্রতিটি প্রবীণ নাগরিককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কর-অর্থায়িত সামাজিক পেনশন প্রসারিত করা হয়তো সম্ভব হবে না। সামাজিক পেনশন স্কিমের পরিপূরক হিসেবে অবদানমূলক পেনশন স্কিম চালু করা দরকার। অবদানমূলক পেনশন স্কিমগুলোয় অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের বৃহৎ গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে। কেনিয়ার অভিজ্ঞতা (বক্স ১৪.২) বলে, অনানুষ্ঠানিক খাত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের জড়িত করে অবদানমূলক পেনশন প্রবর্তন করা সম্ভব।

কেনিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলাদেশের সর্বজনীন পেনশন নিম্নলিখিত চারটি স্কিম নিয়ে গঠিত হতে পারে (সারণি ১৪.১)।

সারণি ১৪.১: সর্বজনীন সামাজিক পেনশনের জন্য অর্থায়ন পরিকল্পনা

পেনশন পরিকল্পনা	আওতা ও যোগ্যতা	নিয়ন্ত্রক
কর-অর্থায়িত সামাজিক পেনশন	সবচেয়ে দুর্বল প্রবীণ নাগরিকদের ৩০%	সরকারি খাত
অবদানমূলক সরকারি খাতের পেনশন	০.৫%; সরকারি খাতের কর্মচারী	সরকারি খাত
অবদানমূলক জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তহবিল (NSSF)	১৫%; বেসরকারি আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মচারী (বাধ্যতামূলক)	অবসরগ্রহণ সুবিধাভোগী কর্তৃপক্ষ (RBA)
এমবাও (Mbao) ধরণের অবদানমূলক পেনশন তহবিল	৫০%; আনুষ্ঠানিক বেসরকারি খাতের কর্মচারী (স্বেচ্ছাসেবক)	আরবিএ

বক্স ১৪.২: কেনিয়ায় পেনশন স্কিম

কেনিয়ার পেনশন স্কিমগুলো সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরণেরই। এটি কর-অর্থায়িত পরিকল্পনা (যেমন Inua Jamii Senior Citizens' Grant), জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা তহবিল–এনএসএসএফ (NSSF) এবং এমবাও (Mbao) পেনশন পরিকল্পনার মতো অবদানমূলক স্কিমগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এমবাও (Mbao) পেনশন পরিকল্পনা হলো একটি উদ্ভাবনী কর্মসূচি, যা ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের লক্ষ্যবস্তু করে তাদের দলগত সঞ্চয় (Pooling) ও বিনিয়োগের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী কৌশল সরবরাহ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ব্লু এমএসএমই জুয়া কালী ইনডিভিজুয়াল রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট স্কিম (Blue MSMEs Jua Kali Individual Retirement Benefits Scheme) হিসেবে পরিচিত, এমবাও পেনশন পরিকল্পনাটি একটি ব্যক্তিগত, স্বেচ্ছাধীন সঞ্চয় পরিকল্পনা। যদিও এটি অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য বেশি উপযুক্ত, তবে ২০১১ সাল থেকে এটি সব কেনীয় নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এটি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট অথোরিটি (RBA)-এর একটি ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ। ২০১৮ পর্যন্ত এমবাও পেনশনের ১০০,০০০ সদস্য রয়েছে এবং এর তহবিলের মূল্য ১,৩৪২,০০০ মার্কিন ডলার। এমবাও (Mbao) পেনশন পরিকল্পনায় অংশ নেয়ার শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. *আবেদনকারীদের অবশ্যই আইডি কার্ডসহ কেনিয়ার নাগরিক এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সের হতে হবে;*

২. *আবেদনকারীদেও ১০০ কেইএস (১ ডলার) রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে এই স্কিমের জন্য নিবন্ধন করতে হবে;*

৩. *আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র উপস্থাপন করার সময় একটি নিবন্ধন ফর্ম পূরণ করতে হবে;*

৪. *আবেদনকারীদের নিজ অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে একটি মোবাইল ফোন থাকতে হবে।*

এমবাও পেনশন পরিকল্পনার আর্থিক সেবার অবকাঠামো

সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক সংস্কার

কর্মসূচি একত্রীকরণ

ক্ষুদ্র স্কিমসমূহ একত্রীকরণ: এনএসএসএস-এ অনেকগুলো ছোট স্কিম একত্রীকরণের সুপারিশ করা হয়েছিল, যার অনেকগুলো উন্নয়ন সহযোগীদের নেতৃত্বে পরিচালিত, যেগুলো এনএসএসএসের জীবনচক্রের মধ্যে খাপ খায় না, এমনকি আর কার্যকরও নেই। মূল জীবনচক্র কর্মসূচিগুলোয় কর্মসূচি একত্রীকরণ এবং ছোট স্কিমগুলো ধাপে ধাপে বিলুপ্ত করার প্রক্রিয়ায় তেমন অগ্রগতি ঘটেনি। সম্পদ সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা জোরদার করতে এটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।

খাদ্য স্থানান্তর কর্মসূচি একত্রীকরণ: এখনো খাদ্য স্থানান্তরের অনেকগুলো কর্মসূচি রয়েছে, যা এনএসএসএসের সুপারিশের পাশাপাশি আরও পর্যালোচনা এবং একত্রীকরণ প্রয়োজন। এনএসএসএস গ্রামীণ কর্মসূচির জন্য খাদ্য-স্থানান্তর কার্যক্রমকে নগদভিত্তিক কর্মসূচিতে রূপান্তর করারও সুপারিশ করেছিল। যেহেতু কোভিড-১৯ গ্রামীণ ও শহুরে বেকারত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই সমস্ত খাদ্যভিত্তিক কর্মসূচিকে নগদে রূপান্তর করা মূল সংস্কার কাজ হবে।

জিটুপি আওতার সম্প্রসারণ

বর্তমানে একাধিক অর্থ প্রদানের পদ্ধতি ব্যবহার করে সুবিধাভোগীদের কাছে তহবিল হস্তান্তর করা হয়। ২০১৭ সালে সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য পেমেন্ট ব্যবস্থার ওপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এতে উঠে আসে যে, বর্তমান অর্থ প্রদান পদ্ধতিগুলোর বেশ কয়েকটি অসুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি হলো–(১) তহবিল প্রাপ্তিতে বিলম্ব; (২) সুবিধাভোগীদের জন্য অসুবিধা–সময়, সুযোগ ও অর্থের ভিত্তিতে; (৩) বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম, অসুস্থ, সন্তানসহ মা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য বাড়তি অসুবিধা; (৪) লেনদেনের উচ্চ ব্যয় (০-২.৫%); (৫) অর্থ প্রদানে পুনরাবৃত্তি (Duplication) বা এবং জালিয়াতির আশঙ্কা; এবং (৬) নগদ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি। এই অসুবিধাগুলো বিবেচনা করে, অর্থ বিভাগ (FD) জিটুপি (এ২চ)-এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে তহবিল স্থানান্তর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অর্থ বিভাগের তথ্য অনুসারে জিটুপির প্রত্যাশিত সুবিধার মধ্যে রয়েছে–(১) কোষাগার থেকে সরাসরি উপকারভোগীদের অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান; (২) কোনো প্রকার খরচ ছাড়াই অল্প সময়ের মধ্যে, নিয়মিত ও ঝামেলাহীনভাবে সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় ভাতা বিতরণ; (৩) সুবিধাভোগীদের তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভাতাপ্রাপ্তির মাধ্যম–ব্যাংক, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS), ডাকঘর প্রভৃতি পছন্দ করার সুযোগ প্রদান; (৪) একই ব্যক্তি একাধিকবার, নকল ও অশরীরী (ঘোস্ট) ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি দূর করার মাধ্যমে ত্রুটি প্রতিরোধ এবং (৫) সরকারের জন্য নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করা। তবে জিটুপি পাইলটটিতে কেবল কয়েকটি প্রোগ্রাম অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এখনও জিটুপির পরিসর খুব সীমিত। উদাহরণস্বরূপ ১১টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (এসএসপি) নগদ ভাতা জিটুপির মাধ্যমে আংশিক বিতরণ করা হয়েছে। এই সুবিধার পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর সক্ষমতা বিবেচনা করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জিটুপির মাধ্যমে মোট সামাজিক সুরক্ষা (SP) তহবিল স্থানান্তরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ডিজিটাল পেমেন্ট প্রক্রিয়াটি ব্যবহারে নানা সুবিধা রয়েছে। এটি কার্যকর হয়েছে সময়, অর্থ খরচ ও যাতায়াত কমানোর ক্ষেত্রে, যা জিইডি কর্তৃক পরিচালিত র‍্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড ট্রায়াল স্টাডি ২০১৯-এর এসএসপিএস প্রোগ্রাম দ্বারা প্রমাণিত।[১৭] এই গবেষণায় পাওয়া গেছে ম্যানুয়াল ব্যাংক সংগ্রহের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির তুলনায় দুটি ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহার করা হলে তা উপকারভোগীর জন্য তাৎপর্যপূর্ণ কার্যকর সুবিধা তৈরি করে। একই সঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়ায়।

প্রশাসনিক সংস্কারের মানদণ্ড নির্ধারণ ও সহযোগী প্রশাসনিক ব্যয়

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের উদাহরণগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান বরাদ্দ করা বিভিন্ন কর্মসূচির সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের বাস্তবায়ন উন্নত করতে প্রয়োজন প্রশাসনিক সম্পদ ব্যয়, যা নির্ভর করবে প্রশাসনিক সংস্কারের ওপর। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিম্নলিখিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করবে–(১) মূল জীবনচক্র পরিকল্পনায় বহুমাত্রিক কর্মসূচিগুলোর যথাযথ একত্রীকরণ; (২) কাউকে বাঁধা দেয়া এবং অন্তর্ভুক্তি করার সময় ত্রুটিগুলো হ্রাস করতে সুবিধাভোগীদের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করা; (৩) পর্যাপ্ত এমআইএস (MIS) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা; (৪) একটি উপযুক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ব্যবস্থা উন্নয়ন করা; এবং (৫) অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করা এবং সময়ভিত্তিক ফলোআপ ও অভিযোগগুলোর সমাধানের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRS) আরও জোরদার করা। এই সংস্কারগুলোয় যথেষ্ট কর্মী ও প্রযুক্তি সংস্থান এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। আনুষঙ্গিক ব্যয় সম্পর্কে যথাযথভাবে প্রাক্কলন করতে হবে এবং এনএসএসএসের বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করার জন্য এই সংস্থানগুলো সরবরাহ করতে হবে।

---

১৭ Social Security Policy Support (SSPS) Programme (2019) Social Security Digital Cash Transfers: Strengthening G2P in Bangladesh

সামাজিক সুরক্ষা স্কিমে গ্রহীতা বাছাই করার প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ

প্রকৃত ব্যক্তির কাছে তহবিল পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা তহবিল স্থানান্তর-সংক্রান্ত একটি মৌলিক প্রশাসনিক সংস্কার কাজ। এমনকি প্রকৃত লোক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত চ্যালেঞ্জ এটি। বিশেষ করে দারিদ্র্যভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়াগুলো ব্যবহার করার সময় এই চ্যালেঞ্জ দেখা যায়। লক্ষ্য নির্ধারণ যথাযথ না হলে অতি মাত্রায় যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ পড়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি ঘটে (বাদ পড়ে যাওয়ার অর্থ হলো- মোট দরিদ্রের অনুপাত হিসেবে প্রকৃত দরিদ্রের সমষ্টিকে ভুলক্রমে অ-দরিদ্র হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা)। আবার ভুলক্রমে অনেক অন্তর্ভুক্তি ত্রুটির ঘটনাও ঘটে (বিচ্যুতি যা 'অন্তর্ভুক্তি ত্রুটি' নামে পরিচিত, মোট দরিদ্রের অনুপাত হিসেবে প্রকৃত অ-দরিদ্রকে ভুলভাবে দরিদ্র হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করে মোট দরিদ্রের যোগফলে ভুল তথ্য দেয়)। উচ্চ বর্জন ও অন্তর্ভুক্তি ত্রুটির বিদ্যমান ঘটনা একটি অকার্যকর সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয় তুলে ধরে। অধিকন্তু আওতাভুক্তকরণে (Coverage) ব্যাপক ঘাটতি এবং উচ্চ স্তরের ত্রুটির কারণে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে কাঙ্খিত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় না।

অকার্যকারিতার এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার সমস্ত পরিবারের জন্য একটি প্রণিধানযোগ্য ডেটাবেজ তৈরির জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে (ন্যাশনাল হাউসহোল্ড ডেটাবেস হিসেবে পরিচিত– NHD) এবং দরিদ্রের বাছাই আরও সুচারু করতে 'প্রক্সি মিনস টেস্ট (PMT)' মডেলের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এর ফল হিসেবে ব্যাপক পরিমাণে বাদ দেয়ার ঘটনা এবং অন্তর্ভুক্তি ত্রুটিগুলো হ্রাস পায়। এনএইচডি (NHD) প্রকল্পে (২০১৯) উল্লিখিত পিএমটি মডেলের মূল লক্ষ্যগুলো–(১) প্রদত্ত সীমিত বাজেটে দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর আওতা সর্বাধিক করা; (২) দরিদ্রদের সর্বজনীন আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যের সঙ্গে পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; এবং (৩) দরিদ্রদের চিহ্নিত করতে ব্যয়-কার্যকর ব্যবস্থা তৈরির মূল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

আওতাভুক্তির নিম্নস্তরের সুবিধাভোগী নির্বাচনের মানোন্নয়ন করতে পিএমটি মডেলটির অসামর্থ্য বিবেচনা করে সামাজিক সুরক্ষা অনুশীলনকারীগণ উপকারভোগীর সর্বজনীন কাভারেজ গ্রহণ করার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেখানে আর্থিক সংগতি কম এবং অর্থনীতির জায়গা সংকুচিত, সেখানে সর্বজনীন কাভারেজ টেকসই হতে পারে না বলে যুক্তি উঠতে পারে। তবে কিছু কর্মসূচির জন্য সর্বজনীন আওতা সম্ভব হতে পারে (যেমন শিশু সহায়তা ও সামাজিক পেনশন), যেখানে সরকারি ব্যয় (কর-অর্থায়িত সুবিধা) এবং বেসরকারি ব্যয় (সামাজিক বিমা যেমন পারিবারিক প্যাকেজ, বেকারত্ব বিমা ও অংশগ্রহণমূলক পেনশন) একসাথে কাজ করবে। এ জাতীয় কৌশল অনুসরণ করার জন্য একটি আর্থিক ও প্রশাসনিক উদাহরণ রয়েছে। তদুপরি কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য সর্বজনীন কাভারেজ বিবেচনা করা যেতে পারে। এই পটভূমির বিপরীতে এইচআইইএস ২০১৬ ব্যবহার করে সমস্ত পরিবারের পুঞ্জীভূত ভোগ অপেক্ষক (Function) তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন দারিদ্র্যসীমার বিপরীতে, যার লক্ষ্য হলো– বাংলাদেশে কারা শিশু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হওয়ার যোগ্য, তা নির্ধারণ করা।

বিভিন্ন দারিদ্র্যসীমার বিপরীতে এইচআইইএস ২০১৬ উপাত্ত ব্যবহার করে প্রাপ্ত পুঞ্জীভূত ভোগ অপেক্ষকের (Cumulative consumption function) তুলনা থেকে বোঝা যায়, দরিদ্র ও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠীর (টচখ*১.২৫) এনএসএসএস সংজ্ঞা ব্যবহার করা হলে ২০১৬ সালে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ দরিদ্র ছিল। ভঙ্গুর লোকদের, যারা টচখ*১.৫ পর্যায়ে ভোগ করে, অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সংজ্ঞাটি যদি আরও বিস্তৃত করা হয়, তবে ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যার অনুপাত ৬০ শতাংশে পৌঁছে যায়। এ বিষয়টি থেকে বোঝা যায়, প্রায় ৪০ শতাংশ পরিবারেরই নানা ধরণের প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে ওঠার মতো সামর্থ্য রয়েছে (চিত্র ১৪.৭)।

চিত্র ১৪.৭: ২০১৬ সালে দারিদ্র্য রেখাগুলোর দ্বারা পরিবারগুলোর মধ্যে ভোগের বিন্যাস

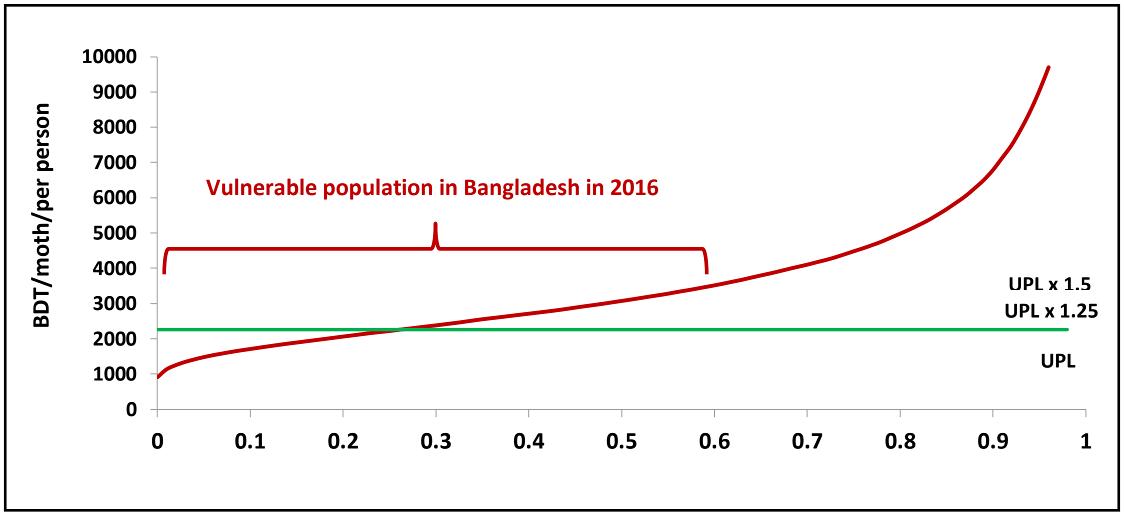

উৎস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES-2016)-এর ভিত্তিতে

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জন্য ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা

নীতিনির্ধারকদেও সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া, ফলাফল নথিকরণ, বিকল্প পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অব্যাহত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণের প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি এর উদ্দেশ্য হলো কৌশল সমন্বিত কর্মসূচিগুলোর স্থায়িত্ব এবং সম্প্রসারণের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন জড়ো করা।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের (M&E) জন্য সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়কারী ভূমিকা: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম তিনটি উপাদানে বিভক্ত করা হবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো তাদের নিজ নিজ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে; আইএমইডি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। সবশেষে জিইডির ভূমিকা হবে নির্দিষ্ট সূচকগুলোর সমন্বয়ে একটি ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে ফলাফলের কাঠামো প্রস্তুত করা ও হালনাগাদ করা। এছাড়াও সামগ্রিক কৌশলের মাধ্যমে এনএসএসএস বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা। জিএইডি এমঅ্যান্ডই কাঠামোর সামগ্রিক সমন্বয় ও মূল্যায়ন ফলাফল প্রচারের ভূমিকাও পালন করবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) একটি গুরুত্বপূর্ণ তদারকি ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, সিএমসির ভূমিকা হবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কর্মসম্পাদন পর্যালোচনা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, সমস্য সমাধান এবং সংকট নিরসন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ফলাফলের প্রচার ও ব্যবহার: সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় করা সংস্থান থেকে যেন সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য এমঅ্যান্ডইতে জোর দেয়া হয়েছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এমঅ্যান্ডইএর ফলাফলগুলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। সব অংশীজনের জন্য সমস্ত তথ্য প্রস্তুত অবস্থায় সহজলভ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী, মন্ত্রণালয় এবং এনজিওরা অংশীজন হিসেবে জড়িত। সুবিধাভোগীদের প্রতিটি কর্মসূচির ফলাফল এবং এতে অন্তর্ভুক্তিতে যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এই লক্ষ্য সবচেয়ে ভালোভাবে হাসিল হতে পারে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলো ও পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটগুলোয় সমস্ত পরিবীক্ষণ উপাত্ত এবং মূল্যায়ন ফলাফল সহজলভ্য করার মাধ্যমে। সমস্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ এবং দায়িত্বশীল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সঙ্গে ভাগাভাগি করা হবে। মন্ত্রিসভায় প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দায়িত্বশীল সংস্থা হলো জিইডি। পরবর্তীকালে মূল্যায়নের প্রতিবেদনের ফলাফলগুলোর প্রেক্ষিতে কী ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তা আবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দায়িত্বশীলদের অবহিত করবে জিইডি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা-সম্পর্কিত একটি নিবেদিত সমীক্ষা

২০০৫ সাল থেকে ৩০টি বৃহৎ কর্মসূচি আওতাভুক্ত করে এইচআইইএস সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি বিভাগ অন্তর্ভূক্ত করেছে। এর লক্ষ্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য উপাত্ত সৃষ্টি করা। এইচআইএস সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাটি মূল্যায়নের জন্য তথ্যের একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে কাজে আসছে। তবে এইচআইইএস এ সামাজিক সুরক্ষা উপাত্ত ভাণ্ডার

অনুসারে ভুলক্রমে বাদ দেয়া এবং অন্তর্ভুক্ত করার ত্রুটির পরিমাণটি বেশ বড়। তদুপরি এইচআইইএস সামাজিক সুরক্ষা ডেটাবেসের গভীর বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, বিপুলসংখ্যক মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাইরে রয়েছেন। সম্ভবত ভুলক্রমে বাদ দেয়া এবং অন্তর্ভুক্ত করার ত্রুটিসমূহ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কিত অন্য ঘাটতিগুলোকেও প্রভাবিত করছে। সমাজসেবা অধিদফতরের (DSS) কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা থেকেও বোঝা যায়, তারাও এইচআইএসই উপাত্ত থেকে উচ্চ বর্জন এবং অন্তর্ভুক্তির ত্রুটিগুলোর বিস্তারের বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তারা ইঙ্গিত করেছেন, এইচআইইএসের মাঠ পর্যায়ের গণনাকারীরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করেছিল, তা যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না। সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি প্রণিধানযোগ্য উপাত্ত ভাণ্ডারের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি নিবেদিত সমীক্ষা চালানো যেতে পারে। তদুপরি নগদ, সিসিটি (CCT), খাদ্য ও জীবিকা নির্ধারণের কর্মসূচিগুলোকে আওতাবদ্ধ করে, এমন প্রধান প্রধান ১৫ থেকে ২০টি সামাজিক সুরক্ষা স্কিমের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রণিধানযোগ্য পর্যালোচনা করে এটি পরিপূরক করতে হবে।

১৪.৩ খাদ্য নিরাপত্তা

বাংলাদেশ সরকার নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে দেশের জনগণের জন্য খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। এসডিজি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা নিবারণ, খাদ্য সুরক্ষা ও উন্নত পুষ্টি অর্জন এবং টেকসই কৃষি জনপ্রিয় করা হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮' তৈরি করেছে। নীতিটির প্রধান লক্ষ্য হলো খাদ্য সুরক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এর মাধ্যম হবে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়নো, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র্যকরণ, নিরাপদ খাবার উৎপাদন করা এবং কৃষিক্ষেত্রে লাভজনক বিপণন ব্যবস্থার বিকাশ করা। এসডিজির সঙ্গে সংগতি রেখে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়কে কাভার করার জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নীতি ২০২০ এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। খাদ্য পরিকল্পনায় সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশকে প্রত্যাশিত অগ্রগতির সঠিক পথে রাখার চেষ্টা করা হবে। এ-সম্পর্কিত কাজ বাস্তবায়নের সময় এই পরিকল্পনাটি কোভিড-১৯ থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যাওয়ার জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

কোভিড-১৯ মহামারীটির প্রাদুর্ভাব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপর্যয় ডেকে এনেছে। এই সংক্রামক রোগ থেকে বাদ পড়েনি কৃষি সরবরাহ শৃঙ্খল ও উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত অন্যসব কর্মকাণ্ডও। এতে জীবিকা ও আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে দরিদ্র ও নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলোর ওপর, বিশেষ করে যারা অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়েছে। এ সবকিছু সম্ভাব্য খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করছে। সাধারণত একটি বড় বৈশ্বিক সংকটের পর নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেহেতু অনেক কৃষিপণ্য রফতানিকারক দেশ নিজের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে (রফতানিতে) নির্বিচার বিধিনিষেধ আরোপ করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) পূর্বাভাস দিয়েছে যে, কোভিড-১৯ মহামারীটির ছোবলে বছরের শেষ দিকে বিশ্বজুড়ে এক বিলিয়নের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি লোককে তীব্র ক্ষুধায় পড়তে দেখা যাবে। এই প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় কৃষিক্ষেত্র উন্নয়নের কৌশলগুলো বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন।

১৪.৩.১ খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির চ্যালেঞ্জ

কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা: বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিকভাবে কৃষি প্রবৃদ্ধি অন্যান্য অনেক বিষয়ের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল। বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আট শতাংশের ওপরে বজায় রাখতে এটি প্রায় চার শতাংশে স্থিতিশীল হওয়া দরকার। একটি ধীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জিডিপির গঠন শস্যভিত্তিক থেকে অ-শস্যভিত্তিক খাতগুলোয় রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষির জিডিপির শ্লথ ও পরিবর্তনশীল প্রবৃদ্ধি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাদ্য জোগানোর জন্য উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখা দরকার। ফসল ও অ-ফসলি খাতের জন্য কৃষির বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যকরণের চ্যালেঞ্জগুলো এই পরিকল্পনা দলিলের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

খাদ্যে সামাজিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ: খাদ্যে প্রবেশাধিকারের তিনটি মাত্রা রয়েছে–অর্থনৈতিক, বস্তুগত ও সামাজিক। অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকার আয়, মূল্য ও পরিণতি হিসেবে প্রাপ্ত ক্রয়ক্ষমতার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। ক্রয়ক্ষমতার অভাব দরিদ্র লোকদের খাদ্যে প্রবেশাধিকার অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। জনগণের খাদ্যে প্রবেশাধিকার বস্তুগত কারণে বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে (যেমন উদাহরণস্বরূপ, পরিবহন অবকাঠামোর মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণে)। অন্যান্য কারণে কিছু নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্য সরবরাহের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে।

বিগত বছরগুলোয় মাথাপিছু আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্যের মোটামুটি হ্রাস দেশের আয় বণ্টন পরিস্থিতিতে তেমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেনি। সামগ্রিক জিনি সহগ ২০০০ সালে ০.৪৫১ থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ০.৪৮৩-এ পৌঁছেছে। এ থেকে বোঝা যায়, বিগত বছরগুলোয় আয়ের বণ্টন পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেছে। এইচআইএস উপাত্ত অনুসারে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে নিচের দিকে পাঁচ শতাংশ পরিবারের উপার্জিত সঞ্চিত আয় ০.৭৮ শতাংশ থেকে কমে ০.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে শীর্ষস্থানীয় পাঁচ শতাংশ পরিবারের সংশ্লিষ্ট শেয়ারের হার ২৪.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৭.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক আয়ের বৈষম্য খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উদ্বেগের বিষয় এবং এটি সামাল দেয়ার জন্য গুরুতর নীতিগত মনোযোগ প্রয়োজন। দরিদ্র ও দুর্বলদের খাদ্য সুরক্ষা উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির (SSNP) ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণে উচ্চ ত্রুটি রয়েছে। অনেক দরিদ্র ও দুর্বল পরিবার, বিশেষত শহরাঞ্চলে, সুরক্ষা বেষ্টনীর বাইরে থাকে। কোভিড-১৯ সংকট-পরবর্তী সময়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যে সামাজিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার গুরুত্ব আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সরকারি খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম ঐতিহাসিকভাবে দরিদ্রদের খাদ্য সুরক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খোলা বাজারে বিক্রি (OMS) ও ফেয়ার প্রাইস কার্ডের (FPC) মাধ্যমে জনসাধারণের খাদ্য বিতরণ কয়েক বছর ধরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে সরকার তার খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। তাই সরকার আরও কিছু উচ্চমানের আধুনিক গুদামজাতকরণের অবকাঠামো সুবিধা তৈরি করে খাদ্যশস্যের সংরক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর ও উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

খাদ্যাভ্যাসে (ডায়েটারি) বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জসমূহ: অধিকতর ভালো স্বাস্থ্যের জন্য খাদ্যাভ্যাসে পুষ্টি পর্যাপ্ততা উন্নত করার লক্ষ্যে বৈচিত্র্য আনা গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি আহারকৃত প্রধান খাদ্যশস্য চাল। চালের ব্যবহার কমেছে। তবুও এটি গ্রহণের মাত্রা কাঙ্ক্ষিত মানের কাছাকাছি। এইচআইএস প্রতিবেদনে প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা গেছে, ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু দৈনিক শক্তি গ্রহণের জন্য খাদ্যশস্য ব্যবহার ছিল ৬৪ শতাংশ, যা আগের ২০১০ সালের ৭০ শতাংশ থেকে কমেছে। খাদ্যশস্য থেকে মাথাপিছু শক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ৬০ শতাংশ। মাংস, ডিম, ফলমূল ও শাকসব্জির মতো পুষ্টিঘন খাবারের ব্যবহার গত বছরগুলোয় বেড়েছে। পুষ্টিতে ভরপুর খাদ্যদ্রব্য ডায়েটে পুষ্টির ঘাটতি বন্ধ করতে সহায়তা করে। HIES-2016 অনুসারে ফল ও সবজি আহারের পরিমাণ হলো ২০৩ গ্রাম। পরিমাণটি ডব্লিউএইচও/এফএও কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিপ্রতি দৈনিক ৪০০ গ্রামের প্রায় অর্ধেক।

প্রজনন বয়সী মহিলাদের মধ্যে খাদ্যতালিকায় (ডায়েটারি) বৈচিত্র্য আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ন্যূনতম খাদ্যাভ্যাস বৈচিত্র্য স্কোর (তাদের খাবারে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পর্যাপ্ততার জন্য একটি বিকল্প) দেখায় যে, ২০১৫ সালে মাত্র ৪৬ শতাংশ নারীর ন্যূনতম ডায়েটারি স্কোর ছিল। ২০১৬ সাল থেকে মহিলাদের জন্য ন্যূনতম ডায়েটারি ডাইভারসিটি (MDDW) নামে একটি নতুন সূচক ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এমডিডি-ডাব্লিউয়ের ৭৫ শতাংশ অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায়, খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত পথে নেই। ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ন্যূনতম খাদ্যতালিকা বৈচিত্র্য অর্জনের অনুপাত প্রায় ২৯ শতাংশ অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এটি বেড়ে ৩১ শতাংশে পৌঁছেছে (FPMU, ২০১৯)। প্রকৃত ভোগের উপাত্তের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ডায়েটারি নমুনা উপাত্তের তুলনা থেকে বোঝা যায়, প্রধান প্রধান খাদ্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিরাজ করছে। পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করার জন্য পুষ্টিঘন খাবারের সরবরাহ ও ভোগ বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে নীতিমালায় মানুষের খাদ্যাভ্যাস বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তোলার জন্য পুষ্টিঘনত্ব এবং ডায়েটের গুণগত মানকে চিহ্নিত করা এবং বাড়ানো দরকার।

দ্রুত নগরায়ণ: বাংলাদেশে দ্রুত গতিতে নগরায়ণ সংঘটিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ শহরাঞ্চলে বসবাস করত। অথচ ২০১৮ সালে শহরে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৭ শতাংশে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের নগরায়ণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। ফলস্বরূপ ক্রমবর্ধমান শহুরে জনসংখ্যার বড় একটি অংশ বস্তির বাসিন্দা। নগরায়ণের সঙ্গে মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে কম পরিশ্রমের কাজ থাকে এবং খাদ্যাভ্যাসে অনেক অদল-বদল দেখা যায়। এ কারণে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই যখন অব্যাহত রয়েছে, স্থূলতা ও জীবনধারা-সম্পর্কিত অসুস্থতার সমস্যাও তখন একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা, খাদ্যে ভেজাল ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের গুণমান: খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা অস্বাস্থ্যকর চর্চা বাংলাদেশের একটি সাধারণ বিষয়। অগণিত রেস্তোরাঁ, রাস্তার পাশের ছোট খাবার বিক্রেতা, ফাস্টফুডের দোকান প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার রান্না

হচ্ছে। আর এসব কারণে ভেজালযুক্ত খাবার এখন মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির হুমকি হিসেবে কাজ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবারের দূষণ শুরু হয় শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপাদানের রাসায়নিকের অবশিষ্ট দ্বারা। জ্ঞান ও সচেতনতার অভাবে কৃষকরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় সার ব্যবহার করেন। বিশেষ করে তাজা ফল এবং শাকসবজির জন্য এই চর্চা বেশি ক্ষতিকারক। অন্যান্য শিল্পবর্জ্য থেকে রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশগুলো প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যজাতীয় পণ্যের জন্য উদ্বেগজনক। কারণ সেগুলো পাখির খাবার, পশুর খাবার, পানি, ওষুধ ও অন্যান্য অনেক কিছু প্রভাবিত করে। এছাড়া প্রিজারভেটিভ, কৃত্রিমভাবে পাকানোর রাসায়নিক, কৃত্রিম বর্ধনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নকি বা গ্রোথ হরমোন, রং ইত্যাদির অতিরিক্ত ও অবৈধ ব্যবহার খাদ্যদ্রব্যকে বিপজ্জনক করে তুলছে। ফলে লাখ লাখ ভোক্তার স্বাস্থ্য নিরাপত্তা প্রভাবিত হচ্ছে।

ভারী ধাতু দ্বারা খাদ্যশৃঙ্খলের দূষণও খাদ্য সুরক্ষার জন্য ভয়ানক উদ্বেগের বিষয়, কেননা তা দূষিত জল, মাটি ও সেচের জলের মাধ্যমে জৈব ব্যবস্থায় সঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মাটিতে ভারী ধাতব দূষণের প্রধান উৎস হলো শিল্পবর্জ্য নিষ্কাশন, সার, দূষিত সেচের পানি, জীবাশ্ম জ্বালানি, নর্দমার নোংরা পানি এবং পৌরসভার বর্জ্য ইত্যাদি (ইসলাম, ২০১৩)। ভারী ধাতুগুলো পরে মাটি থেকে ফসল শুষে নেয়। বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক, কাঁচামাল/উপাদান, মোড়কের উপাদান, জন্তু ও পাখি, পোকামাকড়, ইঁদূর, আবর্জনা এবং নর্দমা, মাটি, বায়ু/ধূলিকণা, পানি, ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়া এবং শিল্পবর্জ্য বাংলাদেশের খাদ্যদূষণের প্রধান প্রধান উৎস। খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইনি বিধানগুলোর ঘাটতি এবং তাদের প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োজিত বেশ কয়েকটি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাবও রয়েছে। সরকার নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর করেছে এবং একটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। তবে খাদ্যপণ্যগুলোর মান পরীক্ষা যাচাইকারী কর্তৃপক্ষের সংস্থান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব অন্যতম বড় সমস্যা।

১৪.৩.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির জন্য কৌশল ও উদ্দেশ্য

খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার বিষয়টি কেবল তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন 'সমস্ত মানুষের সব সময়ে স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবারে বস্তুগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাপ্যতা নিশ্চিত থাকে। এই খাবারগুলো তাদের খাদ্যতালিকাগত চাহিদা এবং খাদ্য পছন্দগুলো পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ও গুণগত মান ঠিক রাখতে ব্যবহার করা হয়; যা একটি পর্যাপ্ত স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা ও যত্নের পরিবেশ দ্বারা আবর্তিত একটি স্বাস্থ্যকর এবং প্রাণবন্ত জীবনের সুযোগ করে দেয়' (ঈঋঝ ২০১২)। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিভাগের জন্য অষ্টম পরিকল্পনার উন্নয়ন রূপকল্প জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, দ্বিতীয় দেশ বিনিয়োগ পরিকল্পনা (পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য ব্যবস্থা) [২০১৬-২০২০], খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নীতি ২০২০, এবং এসডিজির সঙ্গে সমরৈখিক। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা (FNS) সম্পর্কিত এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা পরিস্থিতির মানোন্নয়ন করা। একই সঙ্গে ২০৩০ সালের মধ্যে অন্যান্য সম্পর্কিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা। এজন্য সরকারের খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে উন্নতি, খাদ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো হলো:

- স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকার নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; সাশ্রয়ী দামে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- পুষ্টির উন্নতি অর্জনের জন্য স্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় খাদ্যতালিকার চাহিদা এবং ভোগ বাড়ানো; প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে পুষ্টির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য ডায়েটারি বৈচিত্র্যে উন্নত করতে পদক্ষেপসমূহ জনপ্রিয় করা। এজন্য বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কিশোরী মেয়েদের এবং ছোট বাচ্চাদের প্রতি। ব্যবহার করতে হবে বিদ্যমান এন্ট্রি-পয়েন্ট ও একাধিক সম্প্রদায় এবং বিভাগীয় প্ল্যাটফর্মসমূহ।
- নাজুক জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের প্রতি আলোকপাত করে জীবনচক্র জুড়ে পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বেষ্টনীসমূহের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। সেইসঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা ও সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচি এবং পরিষেবাদির মধ্যে রেফারাল সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচিতে (বৈচিত্র্যময় খাবারের জন্য ই-ভাউচার, টেলি বার্তা, ই-প্রশিক্ষণ প্রভৃতি) সহায়তা করার জন্য উদ্ভাবনী পদ্ধতি বিনির্মাণ ও এতে সহায়তা প্রদান।
- ফসল কাটার পর সংরক্ষণ, রূপান্তর ও বিতরণে খাদ্যশস্যের বৃদ্ধি ও পুষ্টির সংরক্ষণের উৎপাদনশীলতার উন্নতি অব্যাহত রেখে পুষ্টিকেন্দ্রিক কৃষিক্ষেত্রের বৈচিত্র্যকে ত্বরান্বিত করা।

- ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার পাশাপাশি খাদ্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুবিধাদি বিনির্মাণ ও মানোন্নয়ন করা।
- কার্যকরভাবে নীতি বাস্তবায়নের জন্য বহু-বিভাগীয় খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা গভর্ন্যান্স, সমন্বয় ও অংশীদারিত্বকে জোরদার করুন।
- আইসিটি-ভিত্তিক গণখাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিনির্মাণ ও উন্নত করা।
- জাতীয় কোডেক্স কমিটি স্থাপন ও পরিচালনাসহ একটি প্রণিধানযোগ্য জাতীয় পর্যায়ের খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সমন্বয়ের কৌশল জোরদার করা।
- বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের রেফারেন্স ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যান্য সরকারি পরীক্ষাগারগুলোর মানোন্নয়ন করে খাদ্য পরীক্ষার পরিস্থিতির সক্ষমতা জোরদার করা।
- আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে বিশাল পরিমাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অন্বেষণ করা।
- খাদ্য লোকসান এবং অপচয় কমিয়ে আনার জন্য একটি উপযুক্ত জাতীয় কৌশল/নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

কৃষি প্রবৃদ্ধি টেকসই করা ও পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষির উন্নয়ন: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর এবং সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করা হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আহার জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কৃষি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং এক-ফসলি উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা ও বৈচিত্র্য জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ফসলি ও অ-ফসলি খাতের কৌশলগুলো এই অধ্যায়ের সামনের অংশে শস্য এবং অ-শস্য বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতিসহ অপুষ্টি ও ক্ষুধা নির্মূলের লক্ষ্যে পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি এবং খাদ্যভিত্তিক উপায় হলো টেকসই কৌশল। এই কৌশলসমূহের অংশ হলো খাদ্য উৎপাদন, খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং খাদ্যে বাড়তি উপাদান যোগ করে গুণগত মান বাড়ানো (ফর্টিফিকেশন)। এগুলো খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা, খাদ্যাভ্যাসে মানোন্নয়ন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি মোকাবিলা নিশ্চিত করে (FAO 2014)। খাদ্যভিত্তিক কৌশলগুলো শাকসবজি, ফলমূল, মাছ ও মাংসের মতো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-সমৃদ্ধ খাবারের উৎপাদনকে জনপ্রিয় করে। বেশিরভাগ গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র মানুষের খাদ্যতালিকায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বৃদ্ধির জন্য শাকসবজি উৎপাদন ও ভোগ সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও ব্যয়সাশ্রয়ী পদ্ধতি। শাকসবজি ও টমেটো ভিটামিনের বিশেষ উৎস, বিশেষত ভিটামিন এ। বায়ো-ফর্টিফাইড কৃষির জন্য বাংলাদেশ উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। বিআরআরআই ধান ৬২ (জিংকসমৃদ্ধ) নামে প্রথম বায়ো-ফর্টিফাইড ধানের জাত উন্মোচন করা হয়েছে। এই চাল ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াজনিত শৈশবকালীন মৃত্যু এবং শিশু খর্বকায় (Stunting) হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। বর্তমানে বাজারে বিপণন হওয়া ভোজ্যতেলের প্রায় ৬০ শতাংশ তেল ভিটামিন এ ফর্টিফাইড (FPMU, 2014)। পুষ্টি সংবেদনশীল খাদ্য উৎপাদন প্রচারে কৃষি গবেষণা আরও বর্ধিত করা প্রয়োজন।

মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান ও আয়ের উন্নতি: মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানো তিনটি ব্যাপক কৌশলের সঙ্গে জড়িত। এগুলো হচ্ছে–ক্ষণস্থায়ী প্রতিকূল পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আয় বাড়ানো এবং লক্ষ্য-নির্ধারিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলোয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে কৃষিতে দুর্যোগ প্রশমনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, বাজার ও সরকারি বিতরণের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো গ্রামীণ অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো প্রসারিত করা। কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি স্মরণাতীত কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে অকৃষি কার্যক্রমের দ্রুত সম্প্রসারণের পূর্বশর্ত হলো গ্রামীণ পরিবহন অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ। গ্রামীণ অকৃষি কর্মসংস্থানের জন্য নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে অকৃষি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেয়া দরকার। এই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে।

আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বিনির্মাণ: এই উদ্যোগের অধীনে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচির কার্যকারিতা, লক্ষ্যমাত্রা ও বিষয়বস্তুর মানোন্নয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে রয়েছে বিভিন্ন দুর্বল গোষ্ঠীর আরও ভালো সুরক্ষা প্রদানের জন্য পুষ্টি শিক্ষা জোরদার করা এবং তা প্রচার করা। এটি নিম্নলিখিত উপ-কর্মসূচির মাধ্যমে করা হয়–(১) জীবনচক্র জুড়ে দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীসমূহের জন্য সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচি প্রসারিত ও জোরদার করা; (২) দুর্বল ও সুবিধা বঞ্চিত ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জন্য কর্মসূচিসমূহ প্রসারিত ও জোরদার করা এবং (৩) খাদ্য ফর্টিফিকেশন ও পুষ্টি জনপ্রিয় করার অন্তর্ভুক্তিসহ পুষ্টি সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ চালু করা। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীতে ব্যয়ের দুটি উপাদান রয়েছে–সামাজিক সুরক্ষা

ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর গুরুত্ব ও সামাজিক সুরক্ষার আওতা জোরদার করার কৌশল নিয়ে এই দলিলের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চ দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যোগ করা ফর্টিফাইড বিস্কুট সরবরাহ করছে। এই কর্মসূচিতে শিশুদের জন্য শেখার প্যাকেজ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং অন্যান্যদের জন্য রয়েছে সবজি বাগান তৈরি, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর বিষয়ে শেখার প্যাকেজ। শিশুদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি উপজেলায় স্কুলে আহারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যা জাতীয়ভাবে চালু করা হবে। জনসাধারণের জন্য খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও পুষ্টি সংবেদনশীল করার জন্য চেষ্টা করা হবে। এজন্য খোলা বাজার কার্যক্রমে এবং সুরক্ষা বেষ্টনী চ্যানেলগুলোর মাধ্যমে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট-ফর্টিফাইড খাদ্যশস্য দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। সরকার উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে এবং বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি হ্রাস করার জন্য ফর্টিফাইড ধান (পুষ্টি চাল নামে পরিচিত) প্রবর্তন করছে।

খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা: এটি আগামী বছরগুলোয় বাংলাদেশের জন্য একটি অগ্রাধিকার খাত হবে। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও খাদ্যে ভেজাল দেয়ার চর্চার পেছনে সচেতনতার অভাবও একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করতে পারে। কাজেই উৎপাদনের দিক দিয়ে কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে ভালো কৃষি অনুশীলন (GAP) বিষয়ে সচেতনতা বিনির্মাণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে চাষাবাদের অনুশীলনগুলো কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ, বৈচিত্র্য ও পুষ্টির মান উন্নত করতে পারে। সম্পর্কিত নীতিগুলো কেবল প্রবৃদ্ধির হারের দিকে মনোনিবেশ করবে না, একই সঙ্গে গুণগত মানেরও হবে। চুক্তিভিত্তিক চাষের মতো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের যথাযথ উন্নয়ন করা হলে তা কৃষিপণ্যের মূল্য শৃঙ্খলের গুণগত মানের বিষয়ে নজর দেয়ার মাধ্যমে খাদ্যে দূষণ বা ভেজালের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। ক্ষুদ্র কৃষকসহ চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষসমূহের স্বার্থ রক্ষা করতে চুক্তিতে বিধানগুলোর প্রয়োজনীয় শর্তসহ চুক্তিভিত্তিক কৃষিকে প্রাতিষ্ঠানিক করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে। কৃষিনির্ভর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে সম্মত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তারা ইনপুট সরবরাহ, সম্প্রসারণ পরামর্শ এবং তাদের চত্বরে পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা করতে সম্মত হয়। খাদ্য সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রচার করতে বাজারের কুশীলবদের ওপর নজরদারি বাড়ানো অপরিহার্য।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা ও সঠিক পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পদ্ধতিগুলো প্রয়োজন, যেন মান, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও প্রয়োগকারী সেবাসহ আইন ও বিধিমালার সংমিশ্রিত একটি কাঠামো কার্যকর করা যায়। আইন প্রয়োগের জন্য মানসম্পন্ন খাদ্য পরীক্ষার সুবিধাও প্রয়োজন। পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন পেশাজীবী এবং পরীক্ষাগারগুলো পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরীক্ষার কিট সরবরাহ করা প্রয়োজন। এই কাজের জন্য ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারগুলো সহায়ক হতে পারে। শুধু বিএসটিআই পরীক্ষাগারগুলো যথেষ্ট নাও হতে পারে। অন্তত প্রতিটি বিভাগীয় শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে খাদ্য পরীক্ষার সুবিধা থাকা উচিত। বিশেষভাবে খাদ্যপণ্য নিরাপত্তার বিষয়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে বাধ্য সংস্থাগুলোর তাদের কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের বিধান বরাদ্দ করা উচিত।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' পাস করেছে। এর আওতায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (BFSA) গঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের খাতিরে আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং আন্তঃসংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা। ২০১৫ সালে সরকার ৬৪টি জেলা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত এবং ছয়টি মহানগর বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করেছিল। ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন এবং সুরক্ষা মান নির্ধারণের বিষয় বিবেচনা করে বিএফএসএ (ইঋঝঅ) নিম্নলিখিত বিধিবিধান খসড়া করেছে–(১) নিরাপদ খাদ্য (নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ) বিধি ২০১৫; (২) নিরাপদ খাদ্য (রাসায়নিক দূষক, বিষ ও ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ) প্রবিধানমালা ২০১৫; (৩) নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য সংযোজনী) প্রবিধানমালা ২০১৫; (৪) স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রস্তুতি প্রবিধানমালা ২০১৬; (৫) প্যাকটজাত খাদ্য লেবেলিং প্রবিধানমালা ২০১৬, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সেবা বিধিমালা ২০১৬ এবং (৭) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৬ (FPMU 2017)। এইসব বিধি, বিধান ও নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার পরে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইনের কার্যকর প্রয়োগ ত্বরান্বিত করা হবে।

সংরক্ষণাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণ: দ্রুত সাড়াপ্রদান ও বিতরণ কৌশল নিশ্চিত করতে খাদ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা আরও জোরদার করা দরকার। আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিক উপায়ে ওজন পরিমাপ ও হ্যান্ডলিং সক্ষমতাসহ বৃহৎ পরিসরে গুদামজাত করার সুবিধা প্রভৃতি পুষ্টি-সংবেদনশীল খাদ্য সংরক্ষণের বিকাশের জন্য অনিবার্য। অষ্টম পরিকল্পনা চলাকালে খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের মধ্যে গুদামজাত করার সক্ষমতা ৩.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- মেয়াদ-উত্তীর্ণ হওয়ার আগে খাদ্যের ব্যবহার উপযোগীতা বৃদ্ধি এবং মান বজায় রাখা: আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, বৃহৎ পরিসরে সংরক্ষণ সুবিধা প্রয়োজন।
- জমির ব্যবহার হ্রাস করা: সমতল গুদামের পরিবর্তে খাড়া সসংরক্ষণাগারের প্রসার করা।
- এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়া ও সংরক্ষণের ব্যয় হ্রাস: আধুনিক ব্যাগিং, ওজন ও পরিচালনা করার সরঞ্জামগুলোর সঙ্গে সঙ্গে বড় পরিসরের খাড়া সংরক্ষণাগার স্থাপন।
- কৃষকদের জন্য নিবিড় উৎপাদন অঞ্চলে শুকানোর ব্যবস্থা সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা বাড়াতে দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোয় সংরক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ফর্টিফাইড খাবারের সংরক্ষণের জন্য পুষ্টির প্রয়োজন মেটাতে গুদাম নির্মাণ করা।
- আইসিটি-সংবলিত খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা, যেন লেনদেন-সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত দ্রুত ভাগাভাগি করে নেয়া যায় এবং হালনাগাদ করা যায়। একই সঙ্গে সরবরাহ/উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো প্রস্তুত করা।
- বাফার গুদাম বজায় রাখা এবং দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

খাদ্য অধিদপ্তরের কর্তৃত্বে বর্তমানে সাতটি সাইলো এবং তিন হাজার ৮১টি প্রচলিত সমতল গুদাম রয়েছে, যার মধ্যে কিছু আবার ব্যবহার-অনুপযোগী। ব্যবহার-অযোগ্য গুদামগুলোর প্রায় ৭৫ শতাংশ এরই মধ্যে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং বাকিগুলো পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন আটটি আধুনিক ইস্পাত সাইলো নির্মাণের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সরকার আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণ সুবিধাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৪.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ তীব্র ঝড়, বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় ও খরার মতো দুর্যোগের শিকার হয়। প্রায়ই এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ২০১৯ সালে জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশ সপ্তম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে জায়গা পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের পানি-ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দেশটির বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কার বিষয়ে নাজুকতা ব্যাপক পরিমাণে বাড়িয়ে তোলে। কারণ বাংলাদেশের ৮৮ শতাংশ ভূমি প্লাবনভূমি নিয়ে গঠিত। এছাড়া গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) নদী অববাহিকার কারণে এই অঞ্চলটির বর্ষা মৌসুমে মোট বৃষ্টিপাতের ৯২ শতাংশেরও বেশি পানি খালবিলে প্রবাহিত করতে হয় কেবল সাড়ে চার মাসের মধ্যে (জুন থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি)। বর্ষার চূড়ান্ত সময় উপকূলীয় সমভূমিগুলোয় প্রবেশের জন্য মরা কাটালের (Neap tide) জোয়ার যথেষ্ট প্রবল থাকে। একটি উল্টানো ফানেল-আকৃতির তটরেখার কারণে এবং ভারত মহাসাগর থেকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পথে অবস্থিত হওয়ায় দেশটি ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়ে গেছে। বন্যার রিমডেলিং থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, মোট বন্যাকবলিত অঞ্চলের পরিমাণ ২০২০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে। ২০৩০ সালের পরের দশকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্লাবন ভূমি (Inundation area) বৃদ্ধি পাবে ছয় শতাংশ, ২০৫০ সালের পরের দশকে বাড়বে ১৪ শতাংশ। এই তুলনার ভিত্তিবছর ২০০৫ সাল। ১৯৫৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে সবগুলো মারাত্মক বন্যার ঘটনাগুলোর মাত্রা চিত্র ১৪.৮-তে তুলে ধরা হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোয় বিভিন্ন জলবায়ু দৃশ্যপটে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস প্রভাবের আধুনিক মডেলিং সারণি ১৪.২-তে সরবরাহ করা হয়েছে।

চিত্র ১৪.৮: ১৯৫০-এর দশক থেকে ইতিহাসে বড় বড় বন্যায় ডুবে যাওয়া অঞ্চল (শতাংশে)

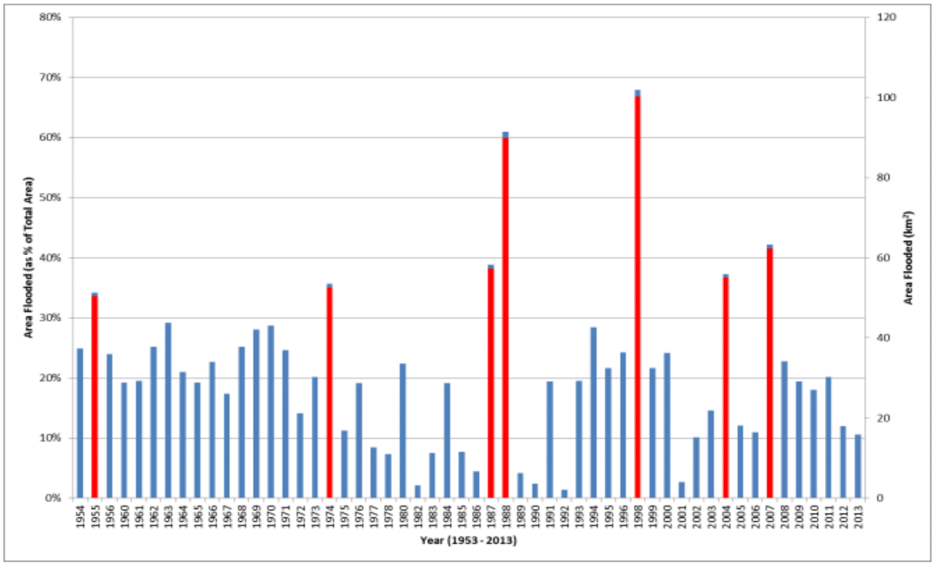

সূত্র: বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)

সারণি ১৪.২: ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অনুমান (কিমি ২)

প্লাবন গভীরতা	২০৫০ জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া (কিমি^{২})	২০৫০ জলবায়ু পরিবর্তনসহ (কিমি^{২})	% পরিবর্তন
১ মিটারের বেশি	২০,৮৭৬	২৩,৭৬৪	+ ১৪%
৩ মিটারের বেশি	১০,১৬৩	১৭,১৯৩	+ ৬৯%

দাশগুপ্ত প্রমুখ (২০১৪)

সরকার এই দুর্যোগ প্রবণতার বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা বিনির্মাণে সরকার বিভিন্ন আইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার রূপকল্প হলো নাগরিকের জন্য ঝুঁকি কমানো, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের ঝুঁকি হ্রাস করা। এছাড়া প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মানুষের প্ররোচিত ঝুঁকির প্রভাবগুলো একটি ব্যবস্থাপনাযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য মানবিক স্তরে নামিয়ে আনাও রূপকল্পের অংশ। সরকারের লক্ষ্যের মধ্যে আরও রয়েছে বড় আকারের বিপর্যয় মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি কার্যকর জরুরি সাড়া প্রদানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৈরি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সারণি ১৪.৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত দুটি কেন্দ্রীয় আইন ও কর্মপরিকল্পনা রয়েছে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অধীনে নীতিমালা ও নানা কর্মকাণ্ডকে দিকনির্দেশনা দেয়। এই দুটো হলো 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫' ও 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১০'। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো অন্তর্নিহিত ঝুঁকি হ্রাস করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর সঙ্গে অভিযোজনের বিষয়ে প্রচার করা। এর ফলে বিভিন্ন ধরণের লোকসান, প্রাণহানি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্পদের ক্ষতি এবং ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও দেশের সম্পদ বিনষ্টের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে।

সারণি ১৪.৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত জাতীয় আইন ও নীতিমালা

নীতি দলিল	বিস্তারিত
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	ঘাত-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে নিয়ম-নীতি প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ড সমন্বিত, উদ্দেশ্যনির্ভর ও জোরালো করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫	উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং টেকসই জীবিকা নির্বাহ ব্যবস্থা সৃষ্টিতে উপকূলীয় মানুষকে সহায়তা করে।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা, ২০০৮-২০১৫	সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও নীতিমালায় ব্যাপকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন (DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CAA) ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। তা করা হবে যোগাযোগের সুবিধা ও জরুরি প্রতিক্রিয়া জোরদার করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মূল্যায়ন, সম্প্রদায়ভিত্তিক কর্মসূচির ওপর জোর দেয়া, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির মাধ্যমে।
জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা, ২০০৫	এটি অভিযোজন-বিষয়ক কর্মের জন্য ১৫টি অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বিনির্মাণ, এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্প বাস্তবায়ন। এজন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কৃষিক্ষেত্র ও পানিসম্পদকে।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৫	এটি দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন এবং জরুরি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে এবং বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত কর্মকাঠামো ও জাতীয় মূলনীতিগুলো বর্ণনা করে।
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০	এনপিডিএম (NPDM) ২০০৮-২০১৫-কে হালানাগাদ করে।
দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯	সকল পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অনুধাবন এবং সেই অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে বর্ণনা করে।

১৪.৪.১ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালীন অগ্রগতি

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য ছিল বিগত সাফল্য এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কৌশল-সম্পর্কিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিক্রিয়া এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। 'কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'কে অন্যতম প্রধান উপ-অভীষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে 'রূপকল্প ২০২১'। এটি গুরুত্ব দেয় মৌসুমি বন্যা ও খরা প্রশমনে, কার্যকর আগাম সতর্কবার্তা এবং দ্রুত উদ্ধার করে লোকজনকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার কৌশল তৈরিতে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ভৌত ও বস্তুগত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিমা প্রকল্পের উন্নয়ন। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রে (NSDS) এনপিডিএম বাস্তবায়নের জন্য বিধান রয়েছে এবং এতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় পর্যায় (উপজেলা) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তাব সংশোধন করা হচ্ছে। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের (MoDMR) নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন হবে, যেন দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য এটি আরও কার্যকর হয়ে ওঠে।

এমওডিএমআর কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ছিল:

- 'সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচি (EGPP)'-এর আওতায় প্রায় ৮০ লাখ গ্রামীণ শ্রমিককে কর্মসংস্থান দেয়া হয়েছিল, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করে।
- সরকার মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২১ লাখেরও বেশি সুবিধাভোগীকে খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে, একই সময়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগে হারিয়ে যাওয়া গৃহ নির্মাণের জন্য সিআই শিট (টিন) পেয়েছিলেন।
- ভঙ্গুর দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আহার জোগানো (ভিজিএফ) কর্মসূচির আওতায় ৮০ লাখেরও বেশি সুবিধাভোগীকে খাদ্যশস্য বিতরণ।
- বিপুলসংখ্যক সুবিধাভোগীর মাঝে শীতের পোশাক (কম্বল) বিতরণ।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)/কাজের বিনিময়ে টাকাসহ (কাবিটা) এফএফডব্লিউ (FFW)/এমএফডব্লিউ (MFW) কর্মসূচির আওতায় ৮০ লাখেরও বেশি গ্রামীণ শ্রমিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছেন।
- টেস্ট রিলিফ (টিআর) প্রোগ্রামের আওতায় ১০ মিলিয়নের (এক কোটি) চেয়েও বেশি গ্রামীণ শ্রমিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিলেন।
- ছয়টি হাওর জেলায় আকস্মিক বন্যায় আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে খাদ্য ও আয়ের সহায়তা উভয়ই দেয়া হয়েছিল।
- পার্বত্য ভূমি ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে গৃহ পুনর্নির্মাণের জন্য সিআই শিট (টিন) ও চাল বিতরণ করা হয়েছিল।
- গ্রামীণ পরিবারগুলোয় দুই লাখেরও বেশি সৌর প্যানেল স্থাপন এবং গ্রামীণ রাস্তায় ও হাট-বাজারে ৩০ হাজারেরও বেশি সৌর সড়কবাতি স্থাপন।

১৪.৪.২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলাকালে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে তৈরি হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া পাঠগুলোও এই সময়ে অনুশীলন করা হবে। এই পাঠগুলো নিম্নরূপ:

- দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) কোনো আইন নয়, বরং শুধুই একটি আদেশ। এসওডির বাস্তবায়নকারীদের জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতাও নেই। একটি সুদূরপ্রসারী আইনি কাঠামো তৈরি হলে তা এসওডিতে নির্ধারিত কর্মকাণ্ডগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের কাজ সহজ করবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সরকার কার্যকর আইনি কাঠামো তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি এসওডিকে একটি আইনি ভিত্তি প্রদান করে।
- এসওডি সমন্বয় করার জন্য সংস্থাগুলো যথেষ্ট কার্যকর নয়। অংশীজনদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আরও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। উন্নত প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ, কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রভৃতিও আয়োজন করা হবে। অংশীজন অনুপ্রাণিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হলে কোনো কাজ ফলপ্রসূভাবে করা যায় না। সরকার প্রণোদনাগুলো পুনর্গঠন করে আরও ভালো কর্মসম্পাদনের জন্য ব্যাপকভাবে অনুপ্রেরণা জোগাবে। যেমন: সেরা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে (UDMC) পুরস্কৃত করা, সেরা ইউডিএমসি (UDMC) সদস্যকে পুরস্কৃত করা, সেরা স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কার দেয়া প্রভৃতি।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা যায় না। তবে প্রস্তুতির জন্য কার্যকর ও সময়োচিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রাণহানি, সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যায়। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (টউগঙ্গ) ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ইউডিএমসিগুলোকে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব বোঝার এবং কর্ম সম্পাদনের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আর এ কারণে সরকার এসওডিগুলো আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ কমাতে কাজ করবে। তা হবে যৌথ সহযোগিতা এবং বহু-বিভাগীয় পদ্ধতির অবলম্বনের মাধ্যমে।
- চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে উপলব্ধি করতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং অগ্রগতির বিষয়ে নজর রাখার জন্য পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যে সরকার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UDMC) নিয়মিত তদারকি করতে উপজেলা দুর্যোগ পরিচালনা কমিটি (UDMC) যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, তা নিশ্চিত করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী স্বপ্রণোদিত সহায়তাও সরবরাহ করবে।
- সংস্থানসমূহ শনাক্তকরণ, সংহতকরণ ও উপযোগিতা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। সরকার এই উদ্বেগের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবে, যেন এসওডি ও আকস্মিক (কন্টিনজেন্সি) দুর্যোগ পরিকল্পনাকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য ইউডিএমসিগুলোর কাছে পর্যাপ্ত সংস্থান থাকে। বাংলাদেশ অনেক ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই সাফল্যের অন্যতম অন্তর্নিহিত কারণ হলো ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে এই উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা। একইভাবে সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে অকস্মাৎ দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিলের বিধান নিশ্চিত করবে। এই তহবিলটি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং দুর্যোগকালে আগাম সতর্কতা, সন্ধান ও উদ্ধার, আশ্রয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির কৌশল উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (টউগঙ্গ) স্থানীয় পুঁজি/সংস্থান সংহত করার মাধ্যমে অকস্মাৎ দুর্যোগ তহবিল তৈরির জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন করার কাজটি বহু-খাতের সম্মিলিত একটি প্রচেষ্টা। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতা না হলে একা সরকারের পক্ষে দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। অংশীজন যেমন সরকার, এনজিও, গবেষক, বিজ্ঞানী, সিভিল সোসাইটি, বেসরকারি খাত, গণমাধ্যম প্রভৃতির মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং তা ধরে রাখা দরকার। সর্বস্তরে প্রস্তুতির কার্যক্রম জোরদার করতে এবং দুর্যোগের প্রভাব হ্রাসে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- গোষ্ঠী পর্যায়ে এই প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে কাজ করে, যেখানে এটি দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হয়। দারিদ্র্যসীমার নিচের বা খুব সীমিত আয়ের লোকেরা তাদের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা নিতে পারে না। এর মূল কারণ তাদের দুর্বল ক্রয়ক্ষমতা। এই প্রবণতা প্রতিফলিত হয়–কীভাবে সীমিত আয়ের লোকেরা ঝুঁকিপূর্ণ আবাসন সুবিধা বেছে নেয়, তা দেখলে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে কাদামাটি বা হালকা উপাদান ব্যবহার করে গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ এসব উপাদান ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সুতরাং সরকার এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বাড়াতে আরও বেশি বিনিয়োগ করবে অবকাঠামো নির্মাণ/স্থাপনে, যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘাত-সহনশীল।

- আগাম সতর্কবাণীতে প্রবেশাধিকার পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষত সেবা সরবরাহকারীদের সংস্থান/পুঁজির মাধ্যমে সহায়তা করা হবে, যেন তারা দুর্যোগের সময় তাদের দায়িত্ব ঠিকঠাকভাবে সম্পাদন করতে পারে।
- আরও একটি চ্যালেঞ্জ হলো প্রচার, কারণ বৃহত্তর একটি শংকাকুল জনগোষ্ঠীর কাছে তা এখনো পৌঁছানো যায়নি। সরকার দুর্যোগ প্রশমনের ব্যবস্থাগুলো ব্যাপক পরিসরে নেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন করবে, যাতে আরও বেশি লোককে এর আওতায় আনা যায়।
- সরকারের উপলব্ধি রয়েছে যে, নাগরিকদের সহযোগিতা ও বিষয়টির পক্ষে গণমাধ্যমে আলোচনা করা হলে তা ভূমিকা রাখতে পারে ঝুঁকি কমাতে এবং সময়মতো সম্পদের বরাদ্দ প্রদান ও বিতরণে। এ কারণে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতির কাজে ক্রমেই তাদের একীভূত করা হবে।
- দুর্যোগের সময়ে উন্নততর সামাজিক ঘাত-সহনশীলতা বিনির্মাণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পানির মতো মৌলিক সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার, এমনকি তা দুর্যোগের সময়ও। এই লক্ষ্যে সরকার আরও কার্যকর দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া কর্মকাঠামো (DRF) তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালে কিছু উদ্ভাবন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন লকডাউনের সময় স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়েছে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে। এতে সংকটের সময় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকার ক্ষতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমিকম্পের ঝুঁকি প্রভৃতির ওপর নজরদারি জোরদার করতে সরকার তথ্যসেবা ব্যবস্থাপনায় (MIS) বিনিয়োগ করবে।
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন এখনো আদর্শিক পর্যায়ে রয়েছে। প্রায়ই তা পরিমাপে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। এটি দুর্যোগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য অনুমান করা অসম্ভব করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও প্রতিকূল ঘটনাগুলো থেকে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মূল্যায়ন করাও কঠিন। সুতরাং সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষায়িত দল গঠন করবে। এর লক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং বেসলাইন, মানদণ্ড ও লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা। এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ঘাত-সহনশীলতা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবে।
- দেশে বেসরকারি খাতের ঘাত-সহনশীলতা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার ঝুঁকি-অবহিত বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য শিল্প খাতের দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির বৃত্তান্ত তৈরি করবে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের নমনীয়তার জন্য কৌশলগুলোর বিকাশ ঘটাবে। এর লক্ষ্য হলো- বেসরকারি খাতে দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চরম দুর্যোগের ঘটনা এড়ানো এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা ধরে রাখা।

তদুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো বা হারিকেনের মতো মারাত্মক বিপর্যয়ের ঘটনা এবং অন্যটি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, সেইসঙ্গে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এবং মরুকরণের মতো দীর্ঘসময় নিয়ে ঘটা বিপর্যয়। দুই ধরণের দুর্যোগ থেকে লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির সমাধান করতে সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের একাত্মকরণ সম্পর্কে একটি প্রণিধানযোগ্য নীতি তৈরি করবে।
- সরকার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নীতি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৈরি করবে কারিগরি সংস্থাসমূহ। এগুলো জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের লস অ্যান্ড ড্যামেজ পলিসি উইংকে যথাক্রমে ডিআরআর (DRR) ও সিসিএ (CCA)-এর জন্য দক্ষতা সরবরাহ করবে। এটি বিপর্যয় ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সব ধরণের লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সহায়তা করবে।
- একটি সাধারণ ব্যবস্থার অধীনে চরম দুর্যোগের ঘটনা এবং ধীরে ধীরে ঘটা দুর্যোগ–উভয়ই লোকসান ও ক্ষতির সমাধানের জন্য সরকার বহুস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় ডিআরআর ও সিসিএকে একীভূত করবে।
- আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ব্যবস্থার সহায়তায় প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য বিদ্যমান জাতীয় তহবিল সংস্থাগুলোর (NFE) জাতীয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থার (NIE) স্বীকৃতি অর্জন করা। জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCC) ভেতরে ও বাইরে দুই ধরণের অর্থায়ন ব্যবস্থাই এর অংশ। এর লক্ষ্য অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণের মাধ্যমে লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতির সমাধান করা।

- আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আন্তঃসীমান্ত অববাহিকায় অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করে নেয়াকে সহযোগিতা ও আস্থা বৃদ্ধি করার দিকে প্রথম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে গাঙ্গেয় অববাহিকার দেশগুলোয় তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্যতায় সীমাবদ্ধতা অব্যাহত রয়েছে। দেশগুলো প্রায়ই পানিবিষয়ক তথ্য ভাগ করে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ও সতর্ক থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আরও দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সংশ্লিষ্টতা গড়ে তুলবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যেন এই অঞ্চলে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সবই মোকাবিলা করার লক্ষ্যে আরও সুসংহত কৌশল বিকাশ করে, তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার আরও বেশি দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পৃক্ততা বাড়াবে।

পরিশেষে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত উন্নতি নিশ্চিত করতে সরকার সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এই ব্যবস্থাগুলোর সংক্ষিপ্তসার সারণি ১৪.৪-তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ১৪.৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে আরও ফলপ্রসূভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম

১.	ডিআরআর এবং সিসিএর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।
২.	উন্নত সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে বেসরকারি খাতের ঘাত-সহনশীলতা প্রসার করা।
৩.	দুর্যোগ ও জলবায়ু-সংক্রান্ত বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ গবেষণার মানোন্নয়ন।
৪.	প্রমাণিত প্রযুক্তিসমূহ গ্রহণ করা।
৫.	একটি ভঙ্গুরতা সূচক তৈরি করা, যা লক্ষ্যকৃত জেলাগুলোয় ন্যায়সংগত সংস্থানসমূহ স্থানান্তরে (চ্যানেলাইজ) সহায়তা করবে।
৬.	পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোর সামগ্রিক পারফরম্যান্স অনুসরণে (ট্র্যাকিংয়ে) একটি কেন্দ্রীভূত এবং নির্দিষ্ট ডিআরআর-সিসিএ সূচক উন্নয়ন করা।
৭.	যে কোনো দুর্যোগের পরে সমাজকল্যাণ/সুরক্ষা বেষ্টনী বরাদ্দ গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
৮.	এমওডিএমআর ও ডিডিএম এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোর ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলো উন্নত করা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার শুরু করা।
৯.	মন্ত্রণালয় ও সরকারের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয়ের একটি কৌশল গড়ে তোলা।
১০.	দুর্যোগে সাড়া দেয়া ও উদ্ধারকাজের ব্যয় হ্রাস করার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল ডিআরআর এবং জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
১১.	সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তাদের এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বিকাশের সহায়তা করা। 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি' ক্ষমতা উন্নত করতে এনজিওগুলোর সঙ্গে আরও বেশি অংশীদারিত্ব বিকাশ করা।
১২.	বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বজুড়ে ঘটা সেরা অনুশীলন ও প্রযুক্তি সংযুক্ত করা।
১৩.	সড়ক ও পানি সুরক্ষার জন্য নির্দেশিকা উন্নত করা।
১৪.	শিল্পসংক্রান্ত নিরাপত্তার জন্য নির্দেশিকা উন্নত করা।
১৫.	দুর্যোগ আশ্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা উন্নত করা।
১৬.	দুর্যোগ প্রভাব ও ঝুঁকি মূল্যায়নের নির্দেশিকা শক্তিশালী করা।
১৭.	জরুরি তহবিল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা উন্নত করা।
১৮.	প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি অবলম্বনের মাধ্যমে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা।
১৯.	চরম বিপর্যয় মোকাবিলায় জরুরি সাড়াদানকারীদের প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।
২০.	দেশের সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চলজুড়ে একটি বড় কর্মসূচির মাধ্যমে বনায়ন বৃদ্ধি করা।
২১.	স্থানীয় অভিযোজন কৌশলের গাইডবুক শক্তিশালী করা।
২২.	সম্প্রদায়গত ঝুঁকি মূল্যায়নের নির্দেশিকা জোরদার করা।

১৪.৫ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশ গত ১৫-২০ বছরে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার বিষয়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম এবং সামাজিক সূচকের দিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় ভালো করার কারণে বাংলাদেশ জেন্ডার ব্যবধান কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাফল্য দেখিয়েছে। ২০০১-২০১৫ সময়কালে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) বেশিরভাগ অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। তবে এখন সময় এসেছে জেন্ডার সমতা সম্পর্কে বিশেষত উচ্চতর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলোর দিকে বাংলাদেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা; বিশেষ করে বৈশ্বিক নতুন অভীষ্ট, যেমন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে (এসডিজি)। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এসডিজির সঙ্গে সুসংহত ছিল, যা জেন্ডার সমতা অর্জনে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। নারীদের জন্য সংস্থান ও সুযোগে প্রবেশাধিকার বাড়াতে কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই নেয়া হয়েছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশলসমূহ। উদ্দেশ্য ছিল, 'স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বৈষম্যমূলক বাঁধা হ্রাস করা।' এই বিষয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মূল লক্ষ্যগুলো ছিল:

- টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষের অনুপাত বর্তমান ৭০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা।
- ২০-২৪ বছর বয়সী সাক্ষর নারী ও পুরুষের অনুপাত বর্তমান ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় নারীদের তালিকাভুক্তিকে উৎসাহিত করা।
- বর্তমান আয়ের বৈষম্য ০.৪৫ থেকে কমানো বা বজায় রাখা।
- জিডিপির অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়কে জিডিপির ২.৩ শতাংশে বৃদ্ধি করা।

১৪.৫.১ সপ্তম পরিকল্পনায় অগ্রগতি

এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্য সমন্বিত একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনার রূপরেখা করা হয়েছে–(১) নারীদের মানবিক সক্ষমতা উন্নত করা; (২) নারীদের অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি; (৩) নারীদের কণ্ঠস্বর ও সংগঠন বাড়ানো; এবং (৪) নারীদের অগ্রগতির জন্য একটি সক্ষমকারী পরিবেশ তৈরি করা। এ বিষয়গুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল নীতি ও আইনি কর্মকাঠামো প্রদানের মাধ্যমে। একই সঙ্গে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং (এজই) ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রমগুলো সাতটি মূল ক্ষেত্রের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

১. মানব উন্নয়নের সুযোগগুলোয় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি।
২. উৎপাদনশীল সংস্থানগুলোয় প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো।
৩. অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৃদ্ধি।
৪. অনুকূল আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা।
৫. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও তদারকি উন্নত।
৬. সংকট ও আঘাত থেকে সুরক্ষা এবং ঘাত-সহনশীলতা বৃদ্ধি।
৭. ইতিবাচক সামাজিক রীতিনীতি জনপ্রিয়।

১৪.৫.২ বাস্তবায়ন

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রগতি পরিবীক্ষণে উন্নয়ন ফলাফল কর্মকাঠামো (DRF) জেন্ডার ও অসমতার অগ্রগতি অনুসরণ করার জন্য ছয়টি মূল কর্মসম্পাদন সূচক শনাক্ত করেছে। সারণি ১৪.৫-তে ২০১৬-২০২০ সময়কালে প্রতি বছরের জন্য লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই সূচকগুলোয় অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১৪.৫: জেন্ডার ও অসমতার সূচকগুলোয় অগ্রগতি

কর্মসম্পাদন (পারফরম্যান্স) সূচক	বেসলাইন (বছর)	২০২০-এর মধ্যে লক্ষ্য	বর্তমান অবস্থা	উৎস
জাতীয় সংসদে নারীদের অধীনে থাকা আসনের শতাংশ	২০ (২০১৪)	৩৩	২০.৬৩ (২০১৯)	http://www.ipu.org/
২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে যাদের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের শতাংশ	৬৫ (২০১১)	৩০	৫১.৪ (২০১৯)	এমআইসিএস (MICS), বিবিএস
টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনুপাত	০.৭ (২০১৫)	১	০.৭২ (২০১৮)	ব্যানবেইস
মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে জেন্ডার বাজেট	২৭.৭ (২০১৪)	৩০	৩০.৮২ (২০১৯*)	এমওএফ (MoF)
সরকারি খাতে নিয়োজিত নারী কর্মকর্তাদের (প্রথম শ্রেণি) শতাংশ	২১ (২০১৪)	২৫	নতুন উপাত্ত প্রাপ্য নয়	

** মোট বাজেটের তুলনায় নারীদের জন্য বরাদ্দ (শতাংশ)*

*** বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা (২৬.৪৬); পেশাগত শিক্ষা (২৬.৯২)*

২০-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে যাদের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়েছিল, তাদের সংখ্যা হ্রাস করার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। ২০১১ সালের ৬৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ৫১.৪ শতাংশে সেটি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য থেকে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে থাকায় একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। সরকার নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর লক্ষ্য বাল্য বিবাহ রোধ এবং কৈশোরব্যাপী স্বাস্থ্যের প্রচার, শিশু, তাদের বাবা-মা ও সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে নানা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষভাবে বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও ইভটিজিংয়ের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। সরকার এ বিষয়ে 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে।

এমডিজির সময়কালে বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। মাধ্যমিক স্তরে সমাপ্তির হার ছিল ছেলেদের জন্য ৬৩.৯৯ শতাংশ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৫৯.৮১ শতাংশ। টিকে থাকার বয়স গোষ্ঠী ২০১৭ সালের ৬২.৩৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ৭২.৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়। গত এক দশকে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০১৮ সালে তালিকাভুক্ত ৪.২৭৮ মিলিয়ন কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ছিল ৪৭.৩৮ শতাংশ এবং কলেজের এক লাখ ২৩ হাজার ৫১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৪.২৩ শতাংশ নারী ছিল।[১৮] স্নাতক স্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। মেয়েদের মাঝে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে (STEM) শিক্ষার বিষয় প্রচার করা হচ্ছে। জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা (৯৭.৪১ শতাংশ) এবং মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট (৯৫.৫৯ শতাংশ) তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুগুলোয় এখন জেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

এছাড়া প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের শিক্ষায় নারী শিক্ষকের শতাংশ ভিত্তিবছর থেকে বেড়েছে (সূত্রঃ ব্যানবেইস)। বাংলাদেশের জন্য এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ তৃতীয় স্তরের শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করার বিষয়ে একই পর্যায়ের আগ্রহ প্রদর্শন করা। ২০১৯ সালে উচ্চস্তরের শিক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনুপাত ০.৭২, যা খানিকটা উন্নতি প্রদর্শন করলেও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম ছিল। অনুপাতে উন্নতির অভাব আরও বেশি নারীকে তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় তালিকাভুক্তিতে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্ভাবনী এবং নতুন উদ্যোগ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাই জানান দেয়। উচ্চ শিক্ষায় নারীর এই কম অংশগ্রহণের পেছনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, বাল্য বিবাহ, নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা/ছাত্রীনিবাসের অভাব প্রভৃতি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডার কৌশল এবং লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং মানব সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করেছে, যেখানে জেন্ডার বিষয়গুলো এমটিবিএফ প্রক্রিয়াতে একীকরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপ এবং নারীদের অধিকারের অগ্রগতির মধ্যে যোগসূত্রের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। জেন্ডার বাজেটের প্রতিবেদনের লক্ষ্য, নারীর অগ্রগতির জন্য সরকারের উদ্যোগের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। সকল মন্ত্রণালয় প্রতিটি অর্থ-বছরের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের অর্জন এবং চ্যালেঞ্জসমূহের খতিয়ান সরবরাহ

১৮ Bureau of Educational Information and Statistics, Education Statistics, 2017

করে। এতে জেন্ডার সমতা এবং নারী অধিকারের জাতীয় স্তরের পরিবর্তনের প্রবণতা ও ধরণগুলো দেখা যায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শতাংশ হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০২০ সালের মধ্যে মোট বাজেটের ৩০ শতাংশ জেন্ডার বাজেটের জন্য বরাদ্দ

রাখা। ২০১৯ সালে মোট বাজেটের শতাংশ হিসেবে জেন্ডার বাজেট ছিল ৩০.৮। অর্থাৎ ২০২০ সালের আগেই লক্ষ্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

নারীদের জন্য নিরাপদ ও কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার প্রতিফলনে সরকার আরও কিছু নীতি হাতে নিয়েছে। সমান অধিকার নিশ্চিত করা এবং জনজীবন ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণে সরকার 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০'-এর অধীনে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য সরকার প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২; শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি, ২০১৩; গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতি, ২০১৫ এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন, ২০১৭। এছাড়া সরকার ও সুশীল সমাজের সংস্থাগুলো নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এবং বাল্য বিবাহ রোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সরকার পাবলিক প্লেস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যৌন হয়রানি কমাতে কাজ করছে।

জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস সম্পর্কে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি জেন্ডার সমতা সূচকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কৃতকর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (WEF) প্রণীত বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন (GGGR) চারটি থিমেটিক মাত্রা জুড়ে জেন্ডার বৈষম্য বন্ধ করার বিষয়ে অগ্রগতির ভিত্তিতে দেশগুলোকে অবস্থান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছে–(১) অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ, (২) শিক্ষাগত অর্জন, (৩) স্বাস্থ্য ও টিকে থাকা এবং (৪) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। জিজিজিআর (GGGR) অনুসারে, বাংলাদেশ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে জেন্ডার বৈষম্য বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। টানা চতুর্থ বছরে জেন্ডার সমতায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্য সফলতার সঙ্গে দূর করেছে। পাশাপাশি তৃতীয় স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে জেন্ডার ব্যবধান হ্রাস করেছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ২০১৬-তে (ইউএনডিপি, ২০১৬) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে ২০২৬ সালের মধ্যে শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশীদারিত্ব ৩৪ শতাংশ থেকে ৮২ শতাংশে উন্নীত করার। এছাড়া বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন, ২০২০-এ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন উপসূচকের আওতায় শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে (বিশ্বের ১৫২টি দেশের মধ্যে সপ্তম)। কিছু সূচকে আপাতভাবে অগ্রগতি সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নতির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সারণি ১৪.৬ সামগ্রিক জেন্ডার বৈষম্য সূচকের পাশাপাশি উপ-সূচকে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনামূলক অবস্থান ও স্কোর উপস্থাপন করেছে।

সারণি ১৪.৬: জিজিজিআর (GGGR) উপ-সূচকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর তুলনামূলক সাফল্য (পারফরম্যান্স)

দেশ	সার্বিক		অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুযোগ		শিক্ষাগত অর্জন		স্বাস্থ্য ও টিকে থাকা		রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	
	র‌্যাংকিং	স্কোর	র‌্যাংকিং	স্কোর	র‌্যাংকিং	স্কোর	র‌্যাংকিং	স্কোর	র‌্যাংকিং	স্কোর
বাংলাদেশ	৫০	০.৭২৬	১৪১	০.৪৩৮	১২০	০.৯৫১	১১৯	০.৯৬৯	৭	০.৫৪৫
মালদ্বীপ	১২৩	০.৬৪৬	১৩১	০.৫১৮	১	১	১৪৭	০.৯৫৩	১১৫	০.১১১
ভারত	১১২	০.৬৬৮	১৪৯	০.৩৫৪	১১২	০.৯৬২	১৫০	০.৯৪৪	১৮	০.৪১১
শ্রীলঙ্কা	১০২	০.৬৮০	১২৬	০.৫৫৮	৮৮	০.৯৮৮	১	০.৯৮	৭৩	০.১৯৩
নেপাল	১০১	০.৬৮০	১০১	০.৬৩২	১৩৩	০.৮৯৫	১৩১	০.৯৬৬	৫৯	০.২২৭
ভুটান	১৩১	০.৬৩৫	১৩০	০.৫৪৪	১১৬	০.৯৫৪	১৪৪	০.৯৬০	১৩২	০.০৮২
পাকিস্তান	১৫১	০.৫৬৪	১৫০	০.৩২৭	১৪৩	০.৮২৩	১৪৯	০.৯৪৬	৯৩	০.১৫৯

সূত্র: বৈশ্বিক জেন্ডার বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২০, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF)

চিত্র ১৪.৯-তে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এই চারটি সূচকে বাংলাদেশের সাফল্য উঠে এসেছে। বাংলাদেশ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ধারাবাহিকভাবে ভালো করে চলেছে। সংসদে নারীরা ২০.৮৬ শতাংশ আসন দখল করেছেন। সাংবিধানিক ও আইনি বিধানের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ এবং স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে নারীদের সংরক্ষিত আসনের বিধান ৫০টিতে বাড়ানো হয়েছিল।

চিত্র ১৪.৯: সাম্প্রতিক বছরগুলোয় জিজিজিআর উপ-সূচকগুলোতে বাংলাদেশের সাফল্য (পারফরম্যান্স)

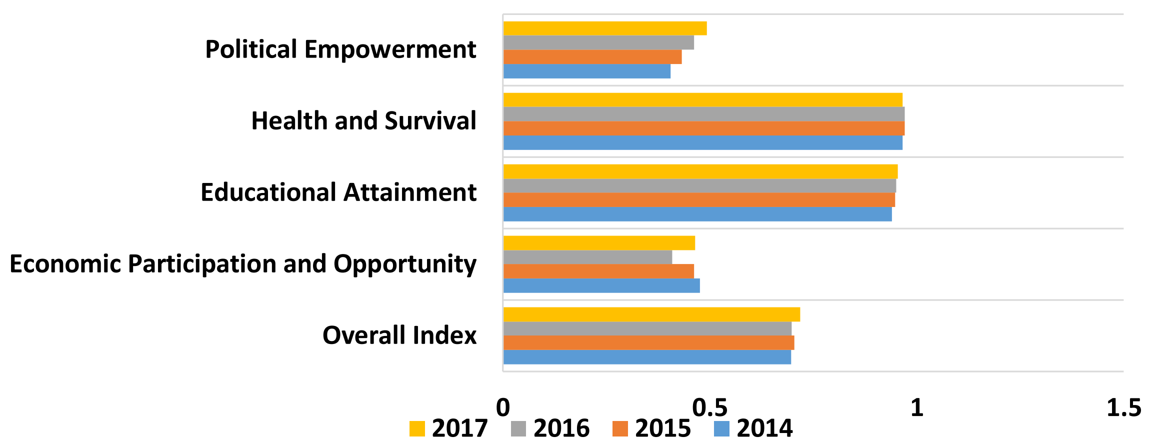

Source: The Global Gender Gap Reports, World Economic Forum

সামগ্রিকভাবে জেন্ডার সমতা-সম্পর্কিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অগ্রগতির বিশ্লেষণগুলো থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ বৃহত্তর জেন্ডার সমতা অর্জনের পথে রয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন রয়েছে নারী ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা বাড়ানো। বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ, (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করা, যৌতুক ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মতো ক্ষতিকারক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ অনেকাংশেই অব্যাহত রয়েছে। এর কারণ প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, যেখানে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পক্ষ বেশি নেয়ার শিকড় প্রোথিত রয়েছে। বাড়ি, কর্মক্ষেত্র ও উন্মুক্ত জায়গায়ও সহিংসতা সংঘটিত হয়। অ্যাসিড হামলা নিষিদ্ধ করার প্রথম আইনটি ২০০২ সালে বাংলাদেশে পাস হয়েছিল এবং পরে এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রবর্তন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ বাংলাদেশে অ্যাসিড হামলা ২০০২ সালের ৪৯৪টি ঘটনা থেকে ২০১৫ সালে ৫৯টিতে নেমেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সচেতনতা বাড়ানো এবং অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করার। এর লক্ষ্য জেন্ডার বৈষম্য বৃদ্ধিতে ক্ষতিকারক অনুশীলনগুলো হ্রাস করা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

এই অগ্রগতি সত্ত্বেও কিছু বাঁধা রয়ে গেছে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো:

- সামাজিক আইন প্রয়োগ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীর পরিত্রাণের পক্ষে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হলো সরকারের বাস্তবায়ন সক্ষমতার অভাব।
- সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যমান সহিংসতা নারীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যৌতুকের দাবি ও স্ত্রীকে মারধর করা অজ্ঞতার কারণে প্রায়ই সমাজে স্বাভাবিকভাবে নেয়া হয়। অনুপ্রেরণা, সচেতনতা এবং এগুলো মোকাবিলায় আইনের বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ।
- আইনি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক ব্যবস্থায় পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাল্য বিবাহর প্রাদুর্ভাব রয়ে গেছে। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং দেখাশোনা করার জন্য অভিভাবক না থাকায় বাল্য বিবাহ ঘটছে।[১৯] বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের অ্যাকশন প্ল্যানের বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জ। এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে বাল্য বিবাহ এবং নিবন্ধনবিহীন বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অকাল গর্ভধারণ নির্মূল করতে এবং মেয়েদের বিকাশের জন্য বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে।
- সবার জন্য সর্বজনীন ও সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা, সম্পূর্ণ টিকা কাভারেজ, পরিবার পরিকল্পনা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার, মাতৃত্ব ও নবজাতকের যত্ন, মাতৃমৃত্যু হ্রাস এবং বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভধারণ কমানো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা সমাধান করা দরকার। প্রশিক্ষিত কর্মীদের অধীনে ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সব শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা এবং মাতৃমৃত্যুর অনুপাত কমানোও অগ্রাধিকারের কয়েকটি বিষয়। এছাড়া কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় কমানো এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সেবা নেয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা নিশ্চিত করা দরকার। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা পৌঁছানোও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯ Ministry of Women and Children Affairs Annual Performance Assessment Report, 2019-2020

- জাতীয়ভাবে ১৬ শতাংশ নারী কম ওজনের, যাদের মধ্যে দুই শতাংশের ওজন মারাত্মক কম এবং বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের মধ্যে সাত শতাংশের ওজন কম, যাদের মধ্যে এক শতাংশ মারাত্মক কম। আবার স্থূলতাও একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি, রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি, স্তন্যদানের কম হারের মতো ইস্যুগুলো সাধারণ পুষ্টির প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়, যা বিবেচনা করা দরকার।
- অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি পিছিয়ে রয়েছে। সপ্তম পরিকল্পনা চলাকালে অগ্রগতি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এখনো নারীদের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার কম। শ্রমবাজারে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরও নারীরা বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। যোগ্যতার তুলনায় নিচু কর্মসংস্থান এবং কম মজুরি পাওয়ার প্রবণতা এবং উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পেশাগত জেন্ডার বৈষম্য আছে। জিজিআর ২০১৪ অনুসারে, নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় বেতনের মাত্র ৫৭ শতাংশ পায়। পেশাজীবী ও কারিগরি কর্মীদের এক-তৃতীয়াংশেরও কম নারী। সাম্প্রতিক আরও উপাত্তেও পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য দেখা যায়। এলএফএস (LFS) ২০১৬-১৭ অনুসারে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান (মজুরি/বেতন) থেকে গড় মাসিক আয় পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় যথাক্রমে গ্রামে ৯৫.৭ শতাংশ, শহরে ৭৭.৯ শতাংশ এবং জাতীয় পর্যায়ে ৯০.২ শতাংশ।
- সুরক্ষিত, সঞ্চয়, ঋণ, বিমা ও পেমেন্ট সেবাগুলো থেকে সহায়তা এবং নারীদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রচুর সংখ্যক নারীর প্রাথমিক আর্থিক সেবা এবং আনুষ্ঠানিক অর্থায়নের প্রাপ্যতার অভাব রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০২০) অনুসারে, প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক আর্থিকভাবে বাদ পড়ে যায়। স্বল্প সুদে অর্থের সহজ প্রাপ্যতা নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফি, জামানত, গ্যারান্টি, জটিল আইন ও আর্থিক সাক্ষরতার অভাবে দরিদ্র ও নারীদের জন্য আনুষ্ঠানিক আর্থিক বাজার সহজে অভিগম্য হয় না।
- শিশু পরিচর্যা, পরিবহন, পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসহ জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মপরিবেশের অভাব নারীদের চাকরির বাজারে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করে। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের লাঞ্ছনা, বৈষম্য, অনিয়মিত কর্মসংস্থান, স্বল্প বেতন এবং দীর্ঘ সময় কাজের মতো বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে কোনো আইনি সুরক্ষা নেই। যদিও নীতিমালা ব্যবস্থা রয়েছে এবং সরকার নারীদের ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিয়েছে, প্রায়ই বেসরকারি খাত বা এনজিওগুলো তা প্রতিপালন করে না।

১৪.৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার কৌশল

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিতকরণে ও বাঁধাসমূহ উত্তরণে মূল বিষয় হিসেবে জেন্ডার সমতা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এটি করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের বিষয়ে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে এ বিষয়গুলোকে মূলধন হিসেবে বিকাশ ঘটিয়ে এবং সেগুলো সম্পূর্ণ কাজে লাগানোর মাধ্যমে নারীদের চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প হলো এমন একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করা, 'যে দেশে পুরুষ ও নারী সমান সুযোগ ও অধিকার পাবে এবং নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমান অবদানকারী হিসেবে স্বীকৃত হবে।' এর উদ্দেশ্য হলো স্বাবলম্বী মানব হিসেবে নারীর অগ্রগতি নিশ্চিত করা। সেইসঙ্গে উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে বৈষম্যমূলক বাঁধা হ্রাস করা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা এবং নারীদের ক্ষমতায়নের এজেন্ডা, কৌশল ও কার্যক্রম অনুসরণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যা নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংস্থান ও সুযোগে প্রাপ্যতা বাড়ায় এবং কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের বাঁধাগুলোও মোকাবিলা করে। সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করা এবং তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়গুলোও পরিকল্পনার মধ্যে সংহত করার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে। পরিবীক্ষণ, তদারকি ও জবাবদিহিতা কৌশল বিনির্মাণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নারীদের ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার জন্য কাঠামোটিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যগুলোর পাঁচটি ক্ষেত্র রয়েছে:

১. নারী ক্ষমতার মানোন্নয়ন করা
২. নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সুবিধা বৃদ্ধি করা
৩. নারীদের কণ্ঠস্বর বাড়ানো এবং নারী সংগঠনের প্রতিবন্ধকতা দূর করা
৪. জেন্ডার সমতা অর্জনের পরিবেশ সক্ষম/উন্নত করা
৫. মা ও শিশু সহায়তার কর্মসূচি বাড়ানো

- **নারী ক্ষমতার মানোন্নয়ন:** এটি নারী ও মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা, প্রত্যাশিত আয়ু, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্য, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবায় প্রবেশাধিকার নিয়ে কাজ করে। ফলে নারীরা আরও ভালো স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এগুলো শ্রমবাজারে প্রবেশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করার পাশাপাশি পীড়া, অসুস্থতা, অপুষ্টি ও মাতৃমৃত্যুর মতো বিষয় অতিক্রম করতে নারীদের সহায়তা করে। এর মধ্যে সহিংসতা ও জবরদস্তি থেকে নারীদের স্বাধীনতাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।
- **নারীদের অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধি:** এটি আয়, চাকরির বাজার ও অর্থনৈতিক সংস্থানগুলোয় প্রবেশাধিকারে নারীদের সক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। উৎপাদনশীল সম্পদ, সংস্থান, সেবা, দক্ষতা, সম্পত্তি, কর্মসংস্থান, আয়, তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থিক সেবা, কাজের পরিবেশ, উদ্যোগ/ব্যবসা ও গোষ্ঠীগত সম্পদের (জমি, জল, বন প্রভৃতি) ওপর নারীর প্রাপ্যতা বা অর্থনৈতিক সুফল আহরণের অধিকার নিশ্চিত করে। নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে বাঁধা অপসারণ ও সহায়তামূলক সেবা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের অর্থনৈতিক সহায়তা তাদের মর্যাদা বাড়ায় এবং পরিবারের উন্নত জীবনযাপনে সহায়তা করে।
- **নারীদের কণ্ঠ ও সংগঠন জোরদার করা:** এটি রাজনীতি ও নারী নেতৃত্ব জনপ্রিয় করাসহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে নারীর ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত। নারী ও বালিকাদের অধিকার সম্পর্কে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি, নিজ অধিকার সম্পর্কে নারীদের বর্ধিত জ্ঞান এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টি এতে প্রতিফলিত হয়।
- **নারীদের অগ্রগতির জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি:** সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ, আইনি ও নীতি সহায়তা এবং অনুকূল সামাজিক রীতিনীতি এক্ষেত্রে মূল বিষয়। সেইসঙ্গে রয়েছে নজরদারি, আইন প্রয়োগ, নিয়মিত জেন্ডার-বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহ, জেন্ডার ও সামাজিক বিশ্লেষণ দক্ষতাসহ জেন্ডার কৌশল বিকাশ, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের ক্ষমতা এবং এ খাতের জেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপলব্ধি করা।
- **মা ও শিশুর সহায়তা/ কর্মসূচি বাড়ানো:** এটি নগদ ও ইন-কাইন্ড (In Kind) হস্তান্তরের বিধানের মাধ্যমে মা ও শিশুদের সুবিধাগুলো বাড়ানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। অংশগ্রহণকারী কিশোরীদের বিকাশের জন্য ও বাল্য বিবাহ নির্মূলের জন্য সামাজিক ক্লাব ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শৈশবকালীন বিকাশ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে শিশুদের রক্ষা এবং শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্যও বিস্তৃত কর্মসূচি ও প্রকল্প চালু করা দরকার।

এই কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত আটটি কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এই পাঁচটি ক্ষেত্রে ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রাখবে:

১. মানব উন্নয়নের সুযোগে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি
২. বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সংস্থানসমূহের প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো
৩. সকল স্তরে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৃদ্ধি
৪. জেন্ডার সমতার জন্য অনুকূল আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা
৫. নারীদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ সেবা সরবরাহ
৬. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা এবং তদারকির মানোন্নয়ন
৭. সংকট ও আঘাত থেকে সুরক্ষা এবং ঘাত-সহনশীলতা বৃদ্ধি
৮. ইতিবাচক সামাজিক রীতিনীতি জনপ্রিয় করা

১. মানব উন্নয়নের সুযোগসমূহে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি

সুযোগের সমতা প্রতিপালনের লক্ষ্যে নারীর মানব মূলধন গড়ে তোলা অপরিহার্য। ন্যায়সংগত অর্থনৈতিক প্রসারে মেয়েদের জন্য মানব উন্নয়নে অগ্রিম ও অব্যাহত বিনিয়োগ জরুরি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সহিংসতা থেকে মুক্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয় মানব উন্নয়নের সুযোগকে অনুকূল করার জন্য বিবেচিত হয়। এই কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অষ্টম পরিকল্পনাটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোয় আলোকপাত করবে।

জীবনচক্রভিত্তিক রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবাসমূহ: বাংলাদেশের নারীদের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করে তৃতীয় পর্যায়ের (টারশিয়ারি) যত্নসহ একটি জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবায় সাশ্রয়ী ব্যয়ের মধ্যে নারীদের প্রবেশাধিকার থাকবে। এটিতে প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য, মাতৃ, প্রজনন, বৃদ্ধ বয়স এবং তৃতীয় পর্যায়ের যত্ন অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। স্বাস্থ্যসেবা

ব্যবস্থায় প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সব এলাকায় স্বল্প ব্যয়ে সব বয়সের নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত। সমস্ত শিশু, কিশোর ও নারীর জন্য টিকাদান, প্রতিরোধমূলক যত্ন এবং স্ক্রিনিং সেবার প্রাপ্যতার জন্য তথ্য ও প্রেরণামূলক প্রচারাভিযানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা উচিত। গর্ভবতী নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান, প্রসূতি ও প্রসব-পূর্বের যত্ন এবং প্রসবোত্তর যত্ন সব ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়েদের জন্য টিকাদান সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও এইচআইভি/এইডসের মতো ক্ষতিকারক রোগ এবং প্রসবের সঙ্গে জড়িত রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য তথ্য ও প্রেরণামূলক প্রচারাভিযানগুলো বাড়াতে হবে। এই রোগগুলোর জন্য পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয় সারাদেশে কম খরচে প্রাপ্য হতে হবে। নারী ও শিশুবান্ধব হাসপাতালগুলো সব জেলা এবং উপজেলায় প্রসারিত করতে হবে। জেলা পর্যায়ে শল্য চিকিৎসা ও বৃদ্ধদের যত্নসহ বড় ধরণের রোগের জন্য তৃতীয় পর্যায়ের যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সেবার নিবন্ধন ও অনুসরণ এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমা প্রবর্তন করতে হবে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের জীবনসঙ্গীদের জন্য এইচআইভি পরীক্ষা এবং কাউন্সেলিংয়ের প্রসার বাড়ানো উচিত।

পুষ্টিতে সমান প্রবেশাধিকার: শিশু ও নারীদের মধ্যে অপুষ্টির উচ্চহার বহুমাত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের উৎসাহ দেয়। পুষ্টিঘাটতি মোকাবিলায় এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে শিশু/নারীদের পুষ্টি, আন্তঃপ্রজন্মগত স্বাস্থ্যের প্রভাব, খাদ্যমূল্য, খাদ্যবৈচিত্র্য, স্বল্প ব্যয়যুক্ত পুষ্টির বিকল্পসহ অন্য বিষয়ে তথ্য ও সচেতনতা। চলমান আয়রন অ্যাসিড (আইএফএ) পরিপূরক, প্রসবোত্তর ও শিশু ভিটামিন 'এ' পরিপূরক, অন্ত্রের পরজীবীর চিকিৎসা, আলবেনডাজোল ট্যাবলেট বিতরণ এবং কৃমিনাশক কর্মসূচিগুলো আরও জোরদার ও প্রসারিত করা উচিত। স্থূলতা ও অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণ, শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাস্থ্যকর খাবার, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের বিষয়ে সচেতনতার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সর্বজনীন লবণে আয়োডিন যুক্ত করা, বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক শারীরিক অনুশীলন ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের জন্য লক্ষ্য-নির্ধারিত খাদ্য ফর্টিফিকেশনের বিষয়ে প্রচার করা উচিত। খাদ্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে বিশেষভাবে নারীদের/শিশুদের পুষ্টির ঘাটতিগুলো সমাধান করা উচিত, বিশেষ করে দুর্যোগ/দারিদ্র্যপ্রবণ দুর্গম অঞ্চলে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করার মাধ্যমে। বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টির জন্য অতিরিক্ত যত্ন নেয়া উচিত। প্রোটিন ও ভিটামিন গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জলবায়ু-সহনশীল জাতগুলো প্রবর্তন করে বাড়ির ভিটায় বাগান ও হাঁস-মুরগি পালনের বিষয়ে প্রচার ও সম্প্রসারণ করা আবশ্যক।

আধুনিক প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য ও আচরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা-সম্পর্কিত পরামর্শ সেবাসমূহ গ্রামীণ ও শহুরে উভয় অঞ্চলে গোষ্ঠীপর্যায়ে চলমান থাকা ও প্রসারিত হওয়া উচিত। শহুরে বস্তি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক গর্ভনিরোধক বিষয়ে উৎসাহ এবং স্বল্প ব্যয়ে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ উপাদানগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল পাঠ্যক্রমের কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার পাঠদান নিশ্চিত করা উচিত। সর্বনিম্ন কর্মসম্পাদনকারী জেলাগুলোয় সচেতনতা বাড়াতে এবং ভবিষ্যতের প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য উঠতি বালক ও বালিকাদের মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে পাঠদানে অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন।

মানসম্পন্ন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা: মেয়ে ও ছেলেদের জন্য বর্ধিত সমাপনীর সঙ্গে সর্বস্তরে মানসম্মত শিক্ষার সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পদাধিকার অর্জনের পূর্বশর্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। অতএব সমস্ত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় রূপান্তর করার পরিকল্পনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত। শিক্ষকদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, পাঠ্যক্রমের মানোন্নয়ন (সমতা ও অন্তর্ভুক্তি প্রচার) এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ও শিক্ষায় ফলাফলের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কার্যক্রমের প্রবর্তন নিশ্চিত করা উচিত। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য প্রাথমিক থেকে পরবর্তী ধাপে রূপান্তর এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সমাপ্তির জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত, যার মাধ্যম হবে দারিদ্র্যকেন্দ্রিক উপবৃত্তি, বিনা মূল্যে শিক্ষা, বই, প্রচারণা প্রভৃতি। বৃত্তি, বিশেষ কোটার বিধান, কলেজের নৈকট্য, মেয়েদের আবাসন ব্যবস্থা, পরিবহন, পানি/স্যানিটেশনসহ অবকাঠামো এবং কলেজ ও তৃতীয় স্তরে ধারাবাহিকতার জন্য এ-জাতীয় সহায়তা নিশ্চিত করা দরকার। প্রশিক্ষিত নারী শিক্ষকের বর্ধিত অনুপাত, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং মেয়েদের শিক্ষার পরিবেশকে নিরাপদ করা অপরিহার্য। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর জন্য নিবন্ধন এবং লাইসেন্সিংয়ের প্রক্রিয়ায় মেয়েদের সুবিধা ও কোটার জন্য মানদণ্ড থাকা উচিত। ভাষা শেখার ওপর জোর দেয়া উচিত এবং পাঠ্যক্রম ও পাঠদানে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রস্তুত করা উচিত।

মেয়েদের জন্য এসটিইএম ও আইসিটি শিক্ষা: নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপের মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (ঝঞঊগ) শিক্ষার ধারাগুলো স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যোগ্য ফ্যাকাল্টিসহ জনপ্রিয় করা করা উচিত। সেইসঙ্গে লক্ষ্য স্থির করে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো দরকার। বিদ্যালয় ও তৃতীয় স্তরের শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় মেয়েদের এসটিইএমে পাঠানোর জন্য জনসচেতনতা ও অনুপ্রেরণা দানকে জোরদার করতে হবে। এসটিইএমে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মেয়েদের অতিরিক্ত উপবৃত্তি ও সহায়তা, বিজ্ঞানমেলা,

শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধাকে প্রসারিত করতে হবে। মেয়েদের আইসিটিতে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং আইসিটিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত।

আইসিটিসহ বিপণনযোগ্য প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: চাকরির বাজারে প্রবেশের মূল প্রয়োজনীয়তা হলো বাজারজাত করার উপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতা। দেশের প্রয়োজন ও পরিবর্তনীয় বৈশ্বিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমটি পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা উচিত, যার ভিত্তি হবে বাজার বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতের প্রক্ষেপণ। বাজারের চাহিদা এবং কর্ম জীবনের পরামর্শ অনুযায়ী মেয়েদের জন্য শিক্ষার ধারাটি বাছাই করা উচিত। অধিকসংখ্যক মেয়েদের আকর্ষণ করার জন্য কারিগরি শিক্ষার ধারা আরও জোরদার করা উচিত। আলোকপাত করার ক্ষেত্রগুলো হলো আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার মান নির্ধারণ ও সমতা। চাহিদা-ভিত্তিক দক্ষতা বিনির্মাণের ব্যবস্থায় আলোকপাত করে একে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সবার জন্য আইসিটিতে দক্ষতা, গাড়ি চালনার মতো বাণিজ্য দক্ষতা শিক্ষার আধুনিকায়ন; আন্তর্জাতিক ভাষা শেখা; হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ; বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য প্রশংসাপত্র ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। নিয়মিতভাবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা মূল্যায়ন এবং পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্য আনা উচিত। ছাত্রীদের হোস্টেল, উপবৃত্তি, স্যানিটেশন সুবিধা, বাজার-সম্পর্কিত তথ্য, কারিগরি খাতে ইন্টার্নশিপ এবং প্রণোদনার মতো সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা: পানীয় ও গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ পানিতে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হলে পানির খোঁজে ব্যয় করা সময় কমে যাওয়ায় নারীরা উৎপাদনশীল প্রচেষ্টায় নিযুক্ত থাকার সময় ও সুযোগ পায়। পানি ও স্যানিটেশন সেবাগুলোয় প্রবেশাধিকার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবার জন্যও প্রয়োজনীয়। এটি পরিবারকে অতিরিক্ত ব্যয় থেকে এবং নারীদের সময় (যত্ন ও সেবা থেকে) বাঁচাতে পারে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সহজ করার জন্য বাড়িতে ও সর্বজনীন জায়গায় এই সেবাগুলো সম্প্রসারণ করা হবে। আর্সেনিক ও লবণক্ততা যাচাইয়ের পর নিশ্চিত করা হবে এবং প্রচলিত ফিল্টারিং পদ্ধতিগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এছাড়া পানির ওপর চাপ কমিয়ে আনার জন্য এবং লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করার জন্য উত্তরাঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য পানি সংরক্ষণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ।

বাল্য বিবাহর সমাপ্তি: বাল্য বিবাহ এখনো বহুল প্রচলিত। এটি মেয়েদের সম্ভাবনা অনুযায়ী অবস্থানে পৌঁছানো, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ৩৩ শতাংশ নারী এরই মধ্যে ১৯ বছর বয়সে মা হয়েছে। পরিণামে তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির পাশাপাশি শিশুদের খর্বাকৃতি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এর জন্য একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য বিয়ের বিদ্যমান আইনসিদ্ধ বয়স কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সন্তানের জন্মের পরে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। সংশোধিত বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৩-এ অভিভাবক ও নিবন্ধক উভয়কেই দণ্ডিত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের আন্দোলন জোরদার করতে হবে। বাল্য বিবাহ দূরীকরণে গোষ্ঠীভিত্তিক উন্নতি এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ধারাবাহিকতার জন্য সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ: মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য স্কুলপর্যায় থেকেই নারীদের খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যত্র পাঠ্যক্রম-বহির্ভূত কার্যক্রম উৎসাহিত করতে হবে এবং এতে সমর্থন দেয়া হবে।

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী নারীদের সুরক্ষা ও বিকাশ: প্রায় ১০ শতাংশ জনসংখ্যা শারীরিক বা মানসিকভাবে অসামর্থ্যের শিকার। কাজেই আসন্ন প্রতিবন্ধী জরিপটি জেন্ডার-বিভাজিত অসামর্থ্যের ধরণ ও ব্যাপ্তি শনাক্ত করবে। নতুন জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের (ঘঝঝঝ) ওপর ভিত্তি করে শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষত নারীদের আরও বেশি আওতাভুক্ত করতে উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও প্রসারিত ও দীর্ঘায়িত করা হবে। মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেন্ডার মধ্যেও এই ধরণের মানুষের প্রয়োজন সমাধান করা হবে।

২. উৎপাদনশীল সংস্থানগুলোয় প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা

উৎপাদনশীল সংস্থানগুলোয় বেশি বেশি প্রবেশাধিকার নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে ও আয় বাড়ায়। আয়ের উদ্দেশ্যে শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য নারীদের সক্ষমতা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ। আয় সহজ করার সুবিধার্থে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো–চাকরির সৃজন; যেসব উৎপাদনশীল চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা, অথবা আত্ম-কর্মসংস্থানে নিজস্ব চাকরি তৈরিতে সহায়তা পাওয়া এবং বিদ্যমান কাজে নারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

উপযুক্ত কর্মসংস্থানের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ তৈরি করা: শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান অপরিহার্য। অপ্রচলিত খাতে নারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা ও প্রণোদনা দেয়া উচিত। শ্রম আইন অনুসারে নারী ও পুরুষের জন্য সমান মজুরি ও আর্থিক সহায়তা বাস্তবায়নের জন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে। নারী ও পুরুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রণীত সুরক্ষা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলো টেকসই কর্মসংস্থানের দিকে রূপান্তর করা উচিত। সমান মজুরি প্রদানের লক্ষ্যে নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নারীদের জন্য স্বল্পমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত।

দেশে-বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি: সরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের পদে নারীদের কোটা পূরণ করতে হবে। বিদ্যমান কূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হলে বিপুলসংখ্যক নারীকে যথাযথ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেয়া যাবে। সরকারি চাকরিতে নারী কর্মীদের জন্য ১৫ শতাংশ কোটা বাড়ানো উচিত। আউটসোর্স করা কর্মসংস্থানের জন্য সরবরাহকারীকে নারীদের চাকরি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়া উচিত। চাকরিতে শর্তসমূহের মানোন্নয়ন করা উচিত নিয়োগে ও পদোন্নতিতে, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের ক্ষেত্রে; মাঠ পর্যায়ে নিরাপত্তা ও সুরক্ষাজনিত উদ্বেগ সমাধানে; উপযুক্ত কাজের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে। স্বচ্ছ নিয়োগ, পদোন্নতি ও বার্ষিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য বেসরকারি খাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কর্মস্থলে নারীর পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

দেশে-বিদেশে সুযোগ বাড়ানোর জন্য শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করার উদ্যোগ: নিয়মিত শ্রমবাজার বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে প্রবেশাধিকার ও গতিশীলতার জন্য নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা উচিত। তথ্য হালনাগাদকরণ; ভারসাম্য, আধুনিকায়ন, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ (ইগজঊ) সমর্থন; বাণিজ্য দক্ষতার আধুনিকীকরণ; পণ্যের বৈচিত্র্য, বাজারের প্রয়োজন মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়োগযোগ্য শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রাখা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করার জন্য শ্রমবাজারের চাহিদার বিষয়ে শিক্ষা খাতকে অবহিত করতে হবে।

বিভিন্ন পেশার বিস্তৃত পরিসরে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ: বহিস্থ বাজারের সম্ভাবনা অন্বেষণের জন্য বাজার নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত এবং নতুন নতুন উপায় অনুসন্ধান করা উচিত। দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদেশে যাওয়ার আগে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, ভাষার দক্ষতা, আত্মরক্ষার দক্ষতা, যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং নারী ও পুরুষের নিবন্ধনের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা উচিত। বাংলাদেশি নারী অভিবাসীদের অধিকাংশই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। এই কাজপ্রত্যাশী নারীদের আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত এবং তাদের স্ক্রিনিংয়ের ভিত্তিতে বাছাই করা উচিত। পরিস্থিতি সামলে ওঠার সক্ষমতা, ভাষার দক্ষতা, আত্মরক্ষার দক্ষতা এবং কাজের দক্ষতার ভিত্তিতে তাদের যাচাই-বাছাই নিশ্চিত করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা ও কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলোয় মনোযোগ দেয়া উচিত, উদাহরণস্বরূপ স্বল্প বেতনের ও শোষণমূলক কাজের শর্ত, যৌন নির্যাতন, অভিবাসনের সুযোগ ও ঝুঁকি-সম্পর্কিত তথ্যের অভাব এবং শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের অপর্যাপ্ততার সমস্যা সমাধান করা উচিত। অভিবাসী কর্মীদের জন্য আইনি ও আশ্রয় সহায়তা প্রসারিত হওয়া দরকার সেই দেশগুলোয়, যেখানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। প্রত্যাবাসিত অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের সময় বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোয়ারেন্টাইন সেবা দেয়া প্রয়োজন। শ্রম অভিবাসনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের শর্ত নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগদাতা এজেন্সিগুলোকে উপযুক্ত কাজের শর্ত/অবস্থা নিশ্চিত করতে জবাবদিহি করতে হবে এবং ব্যর্থ হলে দণ্ডিত হতে হবে। পেশাজীবী খাতে নারীদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সংযোগ, তথ্য ও সহায়তার মাধ্যমে প্রচার করা উচিত।

উচ্চমূল্যের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা: সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে নারীদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি সেসব নারীর জন্যও একটি বিকল্প সুযোগ, যাদের বিপণনযোগ্য দক্ষতার ও শিক্ষার অভাব রয়েছে, পরিবারের দায়বদ্ধতার কারণে চাকরির জন্য ঘরের বাইরে যেতে পারে না। সুযোগ, বাজার, দক্ষতা, অর্থায়ন, সময়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ-সম্পর্কিত তথ্য নারীদের কৃষি এবং অ-কৃষিকাজে অংশ নিতে সহায়তা করতে পারে। উচ্চমানের ফসল উৎপাদনে, উচ্চস্তরের মূল্য শৃঙ্খলে ও সেবাসমূহে নারীদের প্রবেশাধিকারের সুবিধার্থে সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত। বেসরকারি খাত, এনজিওসমূহ, ব্যবসায়িক সমিতি এবং গণমাধ্যমগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায় উন্নয়ন সেবাসমূহের প্রচার: অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য উদ্যোগ ও ব্যবসা সহায়তা প্রয়োজন। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও বিপণনের জন্য উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা উচিত। দেশে-বিদেশে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ও বিপণনের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। চেম্বার অব কমার্স ও বণিক সমিতির উচিত

নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ের পরিকল্পনা উন্নয়নে এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা দরকার। এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এবং জেএমএস (JMS)-এর জেলা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ওয়ান স্টপ সহায়তা বিধানের সম্প্রসারণ করা উচিত। চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মাধ্যমে ব্যবসায় ইনকিউবেটর সেবাসমূহ প্রসারিত করা উচিত। মানদণ্ড, পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং গ্যারান্টি, সিলিং, সুদের হার প্রভৃতিসহ নারীদের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তার বিবরণ-সংবলিত প্রণিধানযোগ্য তথ্য এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিকাশিত হওয়া উচিত। উদ্যোক্তাদের জন্য তা বছর বছর হালনাগাদ করা উচিত। ডিডব্লিউএ (DWA), জেএমএস (JMS), জয়িতা ও অন্যদের মাধ্যমে নারীদের বিপণন সহায়তা সরবরাহ করতে হবে। জয়িতা মডেলটি দেশে প্রসারিত করতে হবে। বিসিক সমিতি ও রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (EPB) উচিত দেশ-বিদেশে মেলায় নারীদের অংশগ্রহণ সহজতর করা এবং আইসিটি ও সামাজিক যোগাযোগ-ভিত্তিক তথ্য প্রচার করা। নারী উদ্যোক্তাদের শিল্প, কর, শুল্ক ও অর্থায়ন নীতিমালায় যাবতীয় পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। সমস্ত প্রাসঙ্গিক নীতিমালায় নারী উদ্যোক্তাদের প্রবৃদ্ধি ও প্রসারণ নিশ্চিত করা উচিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উচিত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা এবং নারীদের প্রতিষ্ঠিত নতুন উদ্যোগের জন্য কর-অব্যাহতি, বিশেষ প্রণোদনা, কর-ছাড়ের মতো সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন করা।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মানোন্নয়ন: সঞ্চয়পত্র, উৎপাদনশীল বিনিয়োগ ও ভোগের সুযোগগুলোয় নারীদের সহজ প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। সহজ শর্তে, বিনা সুদে বা কম সুদে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। দরিদ্রদের জন্য মূলধন ও দক্ষতা সরবরাহের জন্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিনিয়োগ উপাদান (ICVGD) আইসিভিজিডি) মডেল প্রসারিত করা উচিত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগুলো সহজসাধ্য করা উচিত। তাদের বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষীয় প্রতিনিধি নির্ধারণ করে দেয়া উচিত একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত নারীদের ঋণ দিতে, যেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দেয়া প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের সুযোগগুলো গ্রহণ করতে পারে। সব সামাজিক ভাতা ও অর্থ হস্তান্তর আইসিটি ব্যবহার করে জিটুপির মাধ্যমে হওয়া উচিত।

কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন : নিরাপত্তা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং মাতৃত্বকালীন বেকারত্বের সহায়তার মাধ্যমে কর্মপরিবেশের মানোন্নয়ন করা দরকার। কর্মক্ষেত্রের সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত। শ্রমবাজারে যোগ দেয়া ও চলমান রাখা উৎসাহিত করার জন্য নারীর চিকিৎসা, শিশুর যত্ন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মানোন্নয়ন করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে শিশুকে স্তন্যদান করানোর সুবিধাসহ নারীদের জন্য অবকাঠামো এবং লজিস্টিকস সহায়তা নিশ্চিত করা উচিত। তদুপরি অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এবং পুরুষ ও নারীদের জন্য মজুরির সমতা প্রয়োগ করতে হবে। প্রসূতি ও শিশুর যত্ন-সহায়তা প্রদানের বিধান নিশ্চিত করা উচিত। বিপজ্জনক কাজ ও শিশু শ্রম নিরসন এবং উপযুক্ত কাজ সৃষ্টি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা, কর্মহীনদের বেকারত্বের সুবিধা এবং কাজে নিযুক্তদের মানব উন্নয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজে প্রকাশ্যে সহিংসতা ও যৌন হয়রানির সমাধান: যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে সম্প্রদায়গত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুপ্রেরণার মাধ্যমে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিবাদে জনমত তৈরির ওপর জোর দেয়া হবে। কর্মক্ষেত্রের সহিংসতা প্রতিরোধের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশাবলি অনুযায়ী কমিটি গঠন ও অভিযোগ বাক্স স্থাপনের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে সমস্ত মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অফিস ও বেসরকারি খাতের করপোরেট অফিসগুলোকে। নির্দেশাবলি মেনে চলার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সব মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারি খাতের জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী যৌন হয়রানি মোকাবিলার আইন প্রণয়ন একটি অগ্রাধিকার হবে। আইনে/উন্মুক্ত জায়গায়/কর্মস্থলে সংঘটিত সহিংসতার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ এবং আইনি বিধান বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আইনের প্রতি অভিমুখীকরণের (ওরিয়েন্টেশন) বিষয় দুটি নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার এবং উৎপাদনশীল সম্পদে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ: প্রযুক্তি, বাজার-সম্পর্কিত তথ্য, উৎপাদন কৌশল, কাঁচামালের উৎস প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের কাছে সহায়তা পৌঁছাতে সব সরকারি সংস্থার (প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, কৃষি প্রভৃতি) সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত করতে সম্প্রসারণ সেবাগুলো নারীদের কাছে পৌঁছানো উচিত। নারী কৃষক দলগুলোর মাধ্যমে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণের ব্যবস্থা করা উচিত। নারীদের জন্য বিভিন্ন চেইন শপ, আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মসহ বাজার সংযোগ স্থাপন এবং বাজার-সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করা উচিত। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং দূতাবাসগুলোর নতুন ও বৈচিত্র্যময় পণ্যের জন্য নতুন বাজার চিহ্নিতকরণ এবং এ কাজে সহায়তা দিতে হবে। আঞ্চলিক ব্যবসায়ের সুযোগগুলো কাজে লাগাতেও প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা করা উচিত।

কৃষি ও শিল্প মূল্যশৃঙ্খলে উচ্চ মূল্যমানের কার্যক্রম জনপ্রিয় করা: নারীদের কৃষি ও অকৃষি পণ্যগুলোর বিভিন্ন স্তরের মূল্যশৃঙ্খল সম্পর্কে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা উচিত। নারীদের ব্যবসায় উন্নয়নের কর্মসূচিতে কৃষিব্যবসা উন্নয়নের সুযোগ, শিল্পপণ্যগুলোর পশ্চাৎপদ সংযোগগুলোয় প্রবেশাধিকার এবং ওয়ান স্টপ সেবা সুবিধাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। নারীদের বিভিন্ন পণ্যবাজারের তথ্য, বাণিজ্য ও রফতানি মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে সহায়তা করা উচিত। নারীদের জন্য বিভিন্ন পণ্যের মূল্যশৃঙ্খল চিহ্নিতকরণ, প্রচার এবং প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ দিয়ে সমর্থন করা উচিত। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগত কারুপণ্যগুলোর উচ্চমূল্য সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য আনার জন্য সমর্থন জোগানো প্রয়োজন।

জমি ও উৎপাদনশীল [জমি, বীজ, উপাদান (ইনপুট) ও সম্প্রসারণ সেবা] সম্পদের মালিকানা: উৎপাদনশীল সম্পদে নারীদের প্রবেশাধিকার বাড়ানো উচিত। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির যথাযথ অংশ নারীদের দেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক নীতি অনুযায়ী আইন কার্যকর এবং প্রয়োগ করা উচিত। দরিদ্র পরিবারের স্বামী ও স্ত্রী দুজনের নামে খাস জমি বিতরণের বর্তমান অনুশীলনটি অব্যাহত রাখা ও প্রসারিত করা উচিত। পাশাপাশি বনজ সম্পদে সহ-ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীদের প্রবেশাধিকার চলমান রাখা এবং তা সম্প্রসারণ করা দরকার। দুর্যোগজনিত অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীদের আবাসন বা জমি সহায়তার জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। একটি অভিন্ন পারিবারিক আচরণের জন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য দেশগুলোয় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সিইডিএডাব্লিউ-এর (CEDAW) চেতনা ও প্রয়োগের বিষয়টি মূল্যায়ন ও বিবেচনা করা উচিত।

সম্প্রদায়গত সংস্থানগুলোর সুরক্ষা এবং ব্যবহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও প্রবেশাধিকার: সম্প্রদায়ের সংস্থান-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা উচিত কিছু বিধি-বিধানের আওতায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক বনায়ন বিধি, পানি ব্যবস্থাপনা নীতি, বনজ খাত নীতি, ওয়াটসান (WATSAN) নীতি এবং এ-জাতীয় অন্যান্য বিষয়। সমস্ত খাতের বিবেচনা করা উচিত সম্প্রদায়গত সম্পদ, যেমন বাজারে দোকান বরাদ্দ, বা খাস জমিতে কৃষিকাজে নারীদের প্রবেশাধিকারের বিষয়ও। পানি, বন অথবা এ-সংক্রান্ত অন্যান্য সমিতি ও গোষ্ঠীতে নারীর অংশগ্রহণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছানো এবং তা থেকে উপকার পাওয়ার জন্য পরিবীক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণে নারীদের প্রস্তুত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথ্য সরবরাহের বিধান অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

আইসিটি ও প্রযুক্তিতে আসন্ন সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার: ব্যবসা ও চাকরি-সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার কম খরচে প্রসারিত করা উচিত। গণমাধ্যম ও আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের বাজার, কর্মসংস্থান বা ব্যবসায়ের সুযোগ-সম্পর্কিত তথ্যগুলোয় প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, রেডিও ও সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য প্রচার বাড়াতে হবে। তথ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এটুআইয়ের উচিত কম বয়সী মেয়ে এবং কম শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে সেবার আওতা পৌঁছানো। আউটসোর্সিং, আইসিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে হবে, প্রচার করতে হবে এবং এতে নারীদের প্রবেশাধিকারের জন্য তাদের সহায়তা করতে হবে।

৩. অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বৃদ্ধি করা

জাতীয় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকারে অংশগ্রহণ: গত দশকগুলোয় জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে মূলত কোটার বিধানের কারণে। সংসদ বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিকারের পক্ষে নারীর কথা বলার সুযোগ বাড়ানোর জন্য শিক্ষানবিশি, প্রশিক্ষণ, প্রচারণা ও সহায়তা কর্মসূচিসমূহ প্রসারিত করা উচিত। নিয়মিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে সক্ষমতা বিনির্মাণ ও আরপিও (RPO) বিধানের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং তা প্রসারিত করা উচিত। বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের ভূমিকা জোরদার করার জন্য তদারকিও গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে সমর্থন করার জন্য সম্প্রদায়কে ভিত্তিযুক্ত করতে হবে। সেইসঙ্গে সংরক্ষিত আসনের নারীদের তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনের লক্ষ্য থাকতে হবে, নেতৃত্ব গ্রহণ এবং ধীরে ধীরে নিয়মিত আসনে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

আরপিও বিধান ও লক্ষ্য এবং মানদণ্ড ও দায়িত্বসমূহ: রাজনৈতিক দলগুলোয় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব-সম্পর্কিত আরপিও ২০১৩-এর বিধানগুলো নিবন্ধনের শর্তসমূহ দ্বারা প্রয়োগ করে নিশ্চিত করা উচিত। সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান তাদের কোনো সম্প্রদায়কে অবদান রাখার এবং তাদের নির্বাচনী এলাকায় জবাবদিহি করার সুযোগ দেবে। তাদের নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার দায়িত্ব দেয়া ও সরাসরি নির্বাচনের জন্য সাংবিধানিক বিধানের পরিবর্তন নাগরিক সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি। সংরক্ষিত আসনে ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের মেয়াদ আরো ২৫ বছর বর্ধিত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নারী সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের বিষয়টিও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধানের সঙ্গে সমন্বয় করা উচিৎ।

আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান, সক্ষমতা ও জনসমক্ষে অংশ নেয়ার সুযোগ: সরকারি খাতে নিযুক্ত সমস্ত নারীকে প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন এবং জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করতে হবে। বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে অভিজ্ঞ ও জেন্ডার সম্পর্কে প্রশিক্ষিত ফ্যাকাল্টির মাধ্যমে। নারী সরকারি কর্মীদের জেন্ডার সহায়ক, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। অতিরিক্ত পাঠ্যক্রমের ক্রিয়াকলাপে দৃষ্টিভঙ্গি, সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো উচিত।

সরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা ও বাণিজ্যে নারীদের প্রতিনিধিত্ব/নেতৃত্ব: শিক্ষাদান ও নির্দেশনার মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা উচিত। নারীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তাকে প্রাতিষ্ঠানিক করা উচিত। বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্য সংস্থাগুলোকে তাদের নিজস্ব জেন্ডার কৌশলগুলো তৈরি করতে এবং বিভিন্ন স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিতে হবে। বেসরকারি খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফোরামগুলোয় নারীদের ভূমিকা বিভিন্ন প্রণোদনা পাওয়ায় যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। বোর্ডগুলোয় নারীদের আনতে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দেয়া উচিত। নীতি বিধানের মাধ্যমে বাণিজ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য প্রতিনিধি দল ও কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা উচিত। বিভিন্ন খাত ও ব্যবসায়ের নিয়ম-কানুনগুলোয় নারীদের সহজ প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

সর্বস্তরে নারী প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যসমূহ: সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও সংস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে। নারীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিত্বে এবং এতদিন ধরে শুধুই পুরুষদের কর্তৃত্বের জায়গা হিসেবে বিবেচিত ক্ষেত্রগুলোয়ও নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন খাতে নারীদের উপস্থিতি মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়া নারীদের স্বল্প উপস্থিতিযুক্ত খাতগুলোকে আরও বেশি নারী অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া উচিত। এটি তখনই করা যেতে পারে, যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে নারীদের সক্ষমতা বাড়ানো হয় এবং কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ সংঘটিত না হয়।

জোরালো কণ্ঠস্বর ও নারীদের ভূমিকার জন্য স্থানীয় নাগরিকদের কমিটি: ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি, পৌরসভাসমূহের আওতাধীন টাউন ও ওয়ার্ড স্তরের সমন্বয় কমিটি, উপজেলা নারী ফোরাম ও ইউনিয়নের অধীনে স্থায়ী কমিটিগুলোকে আইন অনুসারে নারী নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণে তা কার্যকর করা ও তদারকি করা উচিত। এই ফোরামে নারীদের আনার জন্য যথাযথ যোগাযোগ, তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার বাজেটের ব্যবহারের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিশ্চিতকরণ ও তদারকি করতে হবে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে অবহিত এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ: নিজস্ব প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ের ওপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে তাদের জন্য তথ্য এবং শিক্ষা প্রাপ্য হওয়া উচিত। নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের জন্য কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক লাভের জন্য শিক্ষার মধ্যে প্রজনন স্বাস্থ্যের যত্নের উপাদানগুলো এবং এই জাতীয় যত্নের তথ্য নারীদের কাছে থাকা উচিত। পুরুষ, নারী ও দম্পতিদের জন্য সমস্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরামর্শ সেবাগুলো সরবরাহ করতে হবে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এমন একক নারীদের জন্যও পাওয়া উচিত, যাদের চাহিদাগুলো অস্বীকৃত/অজানা।

সংগঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফোরামগুলোয় সদস্যপদ ও নেতৃত্ব: ব্যবসায়িক সংগঠনসহ বিভিন্ন খাতের কমিটি ও সমিতির সদস্যপদে আরও বেশি নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন খাতে মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুসারে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি, স্যানিটেশন কমিটি, পানি সরবরাহ কমিটি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, বন ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এ-জাতীয় অন্যগুলোয় স্পষ্ট টিওআর (TOR) সমেত নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। নারীদের তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। তাদের পুরুষ সহযোগীদের সমান অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যুব ফোরাম ও ক্লাবসমূহ: নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠিত যুব ফোরাম এবং কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলো সম্প্রসারণ ও জোরদার করতে হবে। এগুলোয় অন্তর্ভূক্ত করা উচিত তরুণ নারীদের নেতৃত্বের দিকনির্দেশনের বিধান, উন্নয়নের প্রেক্ষিত এবং এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে যুবাদের ভূমিকা। ক্ষতিকারক চর্চাগুলোর প্রশমন, প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও মানব উন্নয়নে তরুণদের ভূমিকা অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

৪. সুবিধাজনক আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা

সিডো (CEDAW)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও নীতিগুলোয় সমস্ত বৈষম্যমূলক বিধানসমূহ বিলোপ করা: ভালো আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও কিছু আইন ও নীতি এখনও সিইডিএডাব্লিউয়ের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আইন/নীতিগুলো সবার জন্য অভিন্ন ও সমান করার জন্য এগুলোর পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন। উত্তরাধিকার আইন ও ব্যক্তিগত আইন সিইডিএডাব্লিউ-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য তাদের পর্যালোচনা করা উচিত। নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে নীতিগুলোকে আরও অনুকূল করার জন্য সমস্ত খাতের নীতিগুলো জেন্ডার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা উচিত। এ-জাতীয় আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন করতে লাইন মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা আরও জোরদার করতে হবে। নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারি এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। আইন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সিইডিএডব্লিউর ওপর বিশেষত অনুচ্ছেদ-২-এর ওপর যে রক্ষণশীলতা রয়েছে, তা প্রত্যাহার করা উচিত।

নারী ও বালিকাদের অধিকার বজায় রাখার জন্য সব আইন প্রয়োগ করা: যদিও আইনি ও নীতি বিধানগুলোয় অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবে সেগুলো প্রয়োগের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করা উচিত। তা করা হবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোয় কার্যকর কৌশল প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। শারীরিক অসামর্থ্য ব্যক্তিদের মতো সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর অধিকার-সম্পর্কিত 'অধিকার এবং সুরক্ষা আইন, ২০১৩' যত্নসহকারে প্রয়োগ করা উচিত অক্ষম নারীদের সব ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য। জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং নারীদের সুরক্ষার সাংবিধানিক বিধানগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। আইনি সহায়তা তহবিল বাড়াতে হবে এবং ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থাটি সরল ও দ্রুততর হতে হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতির অনুশীলন, নারীদের সমর্থনে আইন চর্চাকারীদের ধরে রাখা, নারী ও মেয়ে নির্যাতন এবং মানব পাচার মোকাবিলায় আরও ট্রাইব্যুনাল এবং ন্যায়বিচার প্রার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশাবলি অনুযায়ী যৌন হয়রানির বিষয়ে আইন তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন: ২০১০ সালে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলের মতো উন্মুক্ত জায়গায় যৌন হয়রানির বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা দরকার। বিধিনিষেধ (কমপ্লায়ান্স) তদারকি করার বিষয়ে হাইকোর্টের ২০১৯ সালের নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত। উচ্চ আদালতের আদেশ অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের সব প্রতিষ্ঠানকে যৌন হয়রানি সমাধানের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে নির্দেশনা দেয়া উচিত। সরকারি-বেসরকারি খাতের দ্বারা কমপ্লায়ান্স পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

যৌন হয়রানির বিষয়ে আইএলও কনভেনশনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জাতীয় আইন: সহিংসতা ও হয়রানির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রতিবাদের কারণে সম্প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি কনভেনশন, ২০১৯ (নং ১৯০) এবং সুপারিশ (নং ২০৬) গৃহীত হয়েছে। কনভেনশনটির লক্ষ্য হলো মর্যাদা ও শ্রদ্ধার ওপর ভিত্তি করে এবং সহিংসতা ও হয়রানির কবল থেকে মুক্ত করে কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা। এর মধ্যে রয়েছে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যোগাযোগগুলো, যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আইসিটিনির্ভর যোগাযোগ, পারিবারিক সহিংসতা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানিসহ তৃতীয় পক্ষের হিসাব (যেমন ক্লায়েন্ট, গ্রাহক, সেবা সরবরাহকারী এবং রোগী)। শ্রম, অভিবাসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা-সম্পর্কিত দেশীয় আইন ও নীতিসমূহ এবং বাংলাদেশের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন পর্যালোচনা করে কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত।

আইন ও নীতিমালায় মেয়েশিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান এবং এটি সমুন্নত রাখা: মেয়েশিশুদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া উচিত, কারণ মেয়েরা সহিংসতা ও শোষণের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। তাদের অধিকার ও প্রগতি সমস্ত প্রাসঙ্গিক নীতিমালা এবং আইনসমূহে বহাল রাখা উচিত। এটি নিশ্চিত করার জন্য সব নতুন আইন ও নীতিমালা অনুমোদন ও কার্যকর করার আগে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে শিশু অধিকার গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব জনপ্রিয় করা উচিত।

বিভাগীয় আইন ও নীতিতে নারীদের অধিকার: বিভিন্ন খাতে প্রণীত কিছু নতুন আইন ও নীতি জেন্ডারের দিকগুলোকে গুরুত্ব দিলেও অন্য নীতিমালা তা করে না। সমস্ত বিভাগীয় আইন ও নীতিতে জেন্ডারভিত্তিক প্রয়োজনগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। তাদের উচিত আইনি ও নীতি বিধানগুলোর মধ্যে নারীদের/মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সুবিধা অর্জন করা। সব নতুন আইন ও নীতিমালা অনুমোদন এবং কার্যকর করার আগে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পর্যালোচনা করা উচিত।

আইন প্রয়োগকারীদের জবাবদিহিতা: ক্ষমতাসীন সরকার নারীর বিরুদ্ধে সব ধরণের সহিংসতা নিরসনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ও সক্রিয় করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তাৎক্ষণিক সাড়া

সবচেয়ে দুর্বল নারী ও শিশুদেরও রক্ষা করতে পারে। সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনে সাড়া দিতে বর্তমান ৯৯৯ অ্যাপস সত্যিই একটি ভালো উদ্যোগ। তবে এটির সাফল্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে। আইন প্রয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ ও অনুপ্রেরণা দেয়া যেতে পারে এবং তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে বালক-বালিকাদের যথাযথ অনুপ্রেরণা ও লালনপালন: সারা দেশে ক্লাব সংগঠিত করে সরকার বাল্য বিবাহর খারাপ দিক, নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নারীদের প্রতি বৈষম্যের মতো বহুবিধ বিষয় নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের সচেতন করতে চায়। বিভিন্ন খেলাধুলা এবং নানা ধরণের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আয়োজনের সুবিধার্থে নানা উদ্যোগ নিতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা: সরকারের উচিত মানব সম্পদ নীতিগুলোয় (নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি) অন্তর্ভূক্ত করার বিধানের মাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া। সেইসঙ্গে নারীদের প্রগতিতে বাঁধা দেয়, এমন সমস্ত বিধান অপসারণ করা। প্রতিটি সংস্থাকে নারীদের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। ন্যূনতম টার্ন ওভারের চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি বাধ্যতামূলক অগ্রগতির প্রতিবেদনের আওতায় আনা উচিত।

৫. নারীদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ সেবা প্রদান করা

জলবায়ু অভিঘাত-সহনশীল অবকাঠামো: প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোয় সমস্ত অবকাঠামো (পরিবহন, শক্তি, পানি, স্যানিটেশন, বাজার, সেবাকেন্দ্র) নকশা এবং নির্মাণকাজে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রাখা উচিত। এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিঘাত-সহনশীল হওয়া উচিত। জনগণ, পুরুষ ও নারীর অব্যাহত গতিশীলতা, সেবা ও জীবিকা নির্বাহের সুবিধার্থে অবকাঠামোসমূহের জেন্ডারভিত্তিক চাহিদাগুলো নিয়ে কাজ করা উচিত। স্বাস্থ্যকর পানি ও স্যানিটেশন সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আগাম সতর্কতার জন্য যোগাযোগের অবকাঠামো, সব ধরণের আবহাওয়ায় উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোয় পানি, স্যানিটেশন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, নারীদের প্রয়োজন ও শিশুর যত্ন, শারীরিক অক্ষমতা-সম্পর্কিত, শিশু জন্ম এবং নারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উদ্বেগ অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

নারীদের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার বিবেচনা করে অবকাঠামো নকশা করা: ভবন, পরিবহনসহ (বাস, ট্রেন ও জলপথ বাহন) সমস্ত অবকাঠামো নারী, শিশু ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য সুবিধাজনক হওয়া উচিত। জনসাধারণের ভবন নির্মাণ নিয়মে (বিল্ডিং কোড) নারীদের জন্য পৃথক কিছু অবকাঠামোগত সুবিধা রাখার বিধান রাখতে হবে। অফিস, স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নৌপথের টার্মিনাল, ক্লাব, প্রেক্ষাগৃহ, বিপণি কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আদালত, জাদুঘর, থিয়েটার, পর্যটন স্পট, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ-জাতীয় অন্যান্য স্থানে পৃথক জল, স্যানিটেশন, স্তন্যদানের সুবিধা (২০১৯ সালে হাইকোর্টের নির্দেশাবলি অনুসারে) অন্তর্ভূক্ত থাকা উচিত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা ভবনের নকশা অনুমোদনের আগে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত। বিদ্যমান ভবনগুলোয় ধীরে ধীরে সুবিধাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবহন (সড়ক, নৌ, আকাশ) সেবা ও অবকাঠামো: জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত জায়গাগুলোয় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর চাবিকাঠি হলো অবকাঠামো ও পরিবহন সেবা। নারীদের ও শিশুদের চলাফেরা বাড়ানোর জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উচিত। নারী, বয়স্ক ও গর্ভবতী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ সাশ্রয়ী মূল্যের পরিবহনের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। সবচেয়ে ব্যস্ততার সময়ে কেবল নারীদের বাসের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। এজন্য পরিবহন সেবা সরবরাহকারীদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত এবং এজন্য আইনি বিধান প্রতিষ্ঠা ও তা প্রয়োগ করা উচিত। যেসব কারখানা/নিয়োগকর্তারা বেশি বেশি নারী কর্মী নিযুক্ত করে, তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দিতে হবে। তাদের কর্মীদের জন্য পরিবহন সেবা পরিচালনার জন্য ঋণের সুবিধা সরবরাহ করা যেতে পারে। কমপক্ষে দেশের সব শহরে বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর জন্য বাসসেবা বাড়ানোর নীতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য গণপরিবহন স্টেশনে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা (আলোর ব্যবস্থা, পুলিশ টহল, নিরাপদ টয়লেট, অপেক্ষা কক্ষ) ব্যবস্থা নেয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। ফুটপাথ পরিষ্কার করা, রাস্তা পারাপারের জন্য ওভারব্রিজের বাধ্যতামূলক ব্যবহার, বর্ধিত গণপরিবহনে নারীদের গতিশীলতা বাড়ানোর কয়েকটি উপায়। ট্র্যাফিক আইন ও নিয়ম প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। স্কুল ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি সেবা সরবরাহকারীদের ট্র্যাফিক সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ/অভিমুখীকরণ প্রদান করা উচিত। আসন্ন মেট্রোরেল ও দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে স্টেশনগুলোয় নিরাপদে টিকিট কাটা, অপেক্ষায় থাকার জায়গা, ভ্রমণ, টয়লেট এবং স্তন্যদানের সুবিধা অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। রেলপথ ও নৌপথ স্টেশনগুলোকে পানি, স্যানিটেশন, অপেক্ষার জায়গা ও স্তন্যদানের সুবিধাসহ সেখানে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সেইসঙ্গে নারীদের নিরাপত্তা এবং গতিশীলতাও নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও টঙ্গীর মতো পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন সেবায় সবচেয়ে ব্যস্ততর সময়ে নারীদের জন্য আলাদা বগি চালু করা উচিত। নারী, শিশু ও বয়স্কদের ওঠানামার সুবিধার্থে ট্রেনগুলোয় পর্যায়ক্রমে নিচু লোকোমোটিভ চালু করা উচিত।

অবকাঠামোয় প্রবেশাধিকারে ভৌগোলিক সমতা: অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। অবকাঠামোগত সমতা অর্জনের জন্য পশ্চাৎপদ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সব শ্রেণি, জাতি, ধর্ম, শারীরিক সক্ষমতা ও ভৌগোলিক অবস্থানে সব ব্যক্তির প্রবেশাধিকার থাকা উচিত; বিশেষ করে গতিশীলতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি ও বিভিন্ন সেবার জন্য প্রাথমিক অবকাঠামোসমূহে। পিছিয়ে পড়া গ্রাম ও শহরে সড়ক অবকাঠামো, রেলপথ ও নৌপরিবহন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। পার্বত্য ও প্রত্যন্ত নদী অঞ্চলগুলোয় মসৃণ পরিবহন, আইসিটি যোগাযোগ এবং সেবাগুলোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা উচিত। পার্বত্য জেলাগুলো, উপকূলীয় লবণাক্ততা ও ঘূর্ণিঝড়-প্রবণ অঞ্চলগুলো এবং উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলা যেখানে সেবায় প্রবেশাধিকার কম, সেখানে পানি ও স্যানিটেশনের সেবার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

সহায়ক অবকাঠামোয় প্রবেশাধিকার (যেমন নিরাপদ, সুরক্ষিত কর্মক্ষেত্র ও আবাসন): কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা উদ্বেগ, শিশুযত্ন, আবাসন ও টয়লেট সুবিধাসমূহ প্রভৃতির জন্য অবকাঠামো বেসরকারি খাত কর্তৃকও নিশ্চিত করা উচিত। কর্মীদের জন্য কম খরচে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাসহ আবাসন, শিশু পরিচর্যার সুবিধা এবং পরিবহন সেবা বিকাশে বেসরকারি খাতের জন্য অনুপ্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গণজায়গায় (পাবলিক প্লেস) স্তন্যদানের বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশাবলির পরিপালনের বিষয়ে কঠোর নজরদারি করা উচিত। পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়া অপরিহার্য। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন) সহযোগিতায় গ্রামীণ বাজারে ও একই জাতীয় অবকাঠামোতে নারীদের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারিত করা উচিত।

জ্বালানি সেবায় প্রবেশাধিকার: উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের কঠোর পরিশ্রম কমাতে ও সময় সাশ্রয়ে এবং তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার বাড়ানোর লক্ষ্যে জ্বালানিতে (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও সবুজ) নারীদের প্রাপ্যতা বাড়ানো উচিত। গ্রিড ও অফ-গ্রিড–দুই ধরণের এলাকায়ই নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ সহজ করার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে নারীর ব্যাপক প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জ্বালানি নীতি হতে হবে সৌরশক্তি, জৈব-গ্যাস, কুক-স্টোভ প্রভৃতিতে নারীদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি সহায়ক।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ও তদারকির মানোন্নয়ন

সংসদ, মন্ত্রণালয় ও এলজিআই স্তরে কার্যকর/শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: নারীদের অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটি জবাবদিহিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। এনসিডাব্লিউসিডি থেকে নিয়মিত দিকনির্দেশনা, কমিটিসমূহের কার্যকারিতা এবং জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজির লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে জেন্ডার সমতার বিষয়ে প্রচারের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও নির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা উচিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উচিত নিয়মিত জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত সরবরাহ করা, যা জাতীয়, বিভাগীয় এবং এসডিজি সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি এ সকল উপাত্ত সিইডিএডব্লিউ (CEDAW), এসডিজি, আইসিপিডি, সিআরসি ও সমজাতীয় অন্য সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। রাজস্ব বাজেটের অধীনে থাকা কর্মসূচিসহ প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জেন্ডার সমতার ফলাফল পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডিকে দায়বদ্ধ হতে হবে। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে ফলাফল মূল্যায়নের জন্য জেন্ডার বাজেটের ব্যয়ের নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। একইভাবে প্রয়োজনীয় জেন্ডার গবেষণার জন্য বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে (বিআইডিএস) দায়িত্ব প্রদান এবং শ্রমবাজার সংক্রান্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করার জন্য বিএমইটিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। অন্যান্য পরিসংখ্যান আহরণকারী সংস্থা, যেমন বাংলাদেশ শিক্ষামূলক তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানকে (নিপসম) শক্তিশালী করা উচিত, যেন তারা লব্ধ উপাত্তের জেন্ডার বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে পারে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে যে কার্যক্রমগুলো জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেই কার্যক্রমগুলো সমন্বয় করা প্রয়োজন।

শক্তিশালী মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ: বিবিএস, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়: কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যেমন–নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিডব্লিউএ (DWA) ও পিএলইউ (PLU) এবং আইএমইডি, বিবিএস, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন প্রভৃতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওপর

অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী জেন্ডার সমতা ও নারীদের অগ্রগতি-সম্পর্কিত পদক্ষেপের নকশা, পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ভূমিকা পালন করতে পারে। শক্তিশালী তদারকির ভূমিকা পালন এবং জেন্ডার সমতা পর্যবেক্ষণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। জেন্ডার ও এসডিজি সূচক অনুসরণে বিবিএসকে বিভিন্ন খাতের উপাত্ত নিয়মিত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জেন্ডারভিত্তিক বিশ্লেষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এ সংস্থাগুলোকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে অধিকতর সক্ষম করতে অতিরিক্ত কর্মী, সংস্থান এবং সক্ষমতা বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান করা উচিত। জেন্ডার ইস্যুকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে এলজিআই ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জেন্ডার সমতার জন্য আর্থিক ও মানব সম্পদ: বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা এবং তাদের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ও মানব সম্পদ খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। জেন্ডার সক্ষমতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। কর্মসূচি পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরির কার্যক্রমে কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার ইস্যুকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে বরাদ্দের সময় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তিগুলো রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

জেন্ডার সমতার জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন: জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রতিবেদনে বরাদ্দের বিষয়ে ৪৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উপযোগিতা লাভের প্রণিধানযোগ্য মূল্যায়নসহ ফলাফলের জন্য জেন্ডার বাজেটের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। এছাড়া জেন্ডার সমতা প্রসারে নারী উন্নয়ন ফোরামের জন্য এলজিআইগুলোয় বরাদ্দ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নারী ও মেয়েদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দ এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার তহবিল ব্যবহারের দিকনির্দেশগুলো পর্যালোচনা করা উচিত। জিআরবির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রশিক্ষণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা চালু করা উচিত। জেন্ডার বাজেট বিশ্লেষণে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টের সক্ষমতা নিশ্চিত করা উচিত। বড় প্রকল্পগুলোয় জেন্ডার নিরীক্ষণের বিষয়টি প্রবর্তন করা হলে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটিং (GRB)-এর উদ্যোগ জোরদার করা সম্ভব হবে।

সরকারের সকল কার্যক্রমে জেন্ডার কৌশলের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির ক্ষমতা: জেন্ডার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও তদারকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা অপরিহার্য। নীতিনির্ধারকদের অভিমুখীকরণ (ওরিয়েন্টেশন), বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে খাতগুলো 'বা বিভাগগুলোর' পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে জেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে একীভূত করা প্রয়োজন। পলিসি নেতৃত্ব ও অ্যাডভোকেসি ইউনিট (PLU) এবং ডিডব্লিউএ (DWA)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে কর্মীরা কর্মসম্পাদন তদারক করতে সক্ষম হয় এবং প্রয়োজনে অন্য সংস্থা ও মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। জেন্ডার বিশ্লেষণ সকল বুনিয়াদি (ফাউন্ডেশন) প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হওয়া উচিত। বেসরকারি খাতসমূহকে তাদের ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ইস্যুটি অন্তর্ভূক্ত করতে এবং প্রয়োজনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিত। বিভিন্ন বিভাগীয় কার্যক্রমে জেন্ডার ইস্যু কীভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়, সে সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অতিরিক্ত কোর্স চালু করার বিষয়ে উৎসাহিত করা উচিত।

জেন্ডার প্রভাব অনুসরণ (ট্র্যাক) করার স্বচ্ছ ও কার্যকর পরিবীক্ষণ পদ্ধতি: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজির পর্যালোচনায় কার্যকরভাবে জেন্ডার সমতা ফলাফল পরিবীক্ষণকে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। আইএমইডির পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় প্রকল্পের/কর্মসূচির লক্ষ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার অগ্রগতির পর্যবেক্ষণকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। এজেন্সি, সেক্টর ও মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে জিআরবির পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের নিরীক্ষণের মাধ্যমে জেন্ডার-সংক্রান্ত ব্যয় এবং ফলাফল পরিবীক্ষণ করা উচিত। বিভিন্ন স্তরের স্বচ্ছ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উন্মুক্ত সভা, সর্বজনীনভাবে লভ্য আর্থিক ঘোষণা এবং বাজেট পর্যালোচনা অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় জাতীয় জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত এসডিজি সূচকসমূহ: বৃদ্ধি, বিনিয়োগ, ঘাটতি ইত্যাদি পরিমাপের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সরকারের কর্মসম্পাদনের সকল অগ্রগতি পরিমাপের সূচকের মধ্যে জেন্ডার সংক্রান্ত সূচককে সমন্বিত করা উচিত। বেশিরভাগ এসডিজি সূচকে জেন্ডার ইস্যুটি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য চিহ্নিত জেন্ডার সূচকগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত। সকল খাতের পরিকল্পনা নথিতে এসডিজির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নির্ধারিত জেন্ডার ফলাফল এবং বিভাগীয় কর্মসম্পাদন সমন্বয় করা উচিত। দারিদ্র্য মূল্যায়ন ও আয়ের উপাত্ত সকল গোষ্ঠীতে জেন্ডারভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন, যাতে নারীদের দারিদ্র্য হ্রাস কার্যকরভাবে পরিমাপ করা যায়। এ সূচকগুলো অনুসারে ফলাফল অর্জনের জন্য কার্যক্রমগুলো এপিএ-তেও সমন্বিত করা উচিত।

জেন্ডার সমতা ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তিদের দায়িত্ব: জেন্ডার সমতার লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জনের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রকল্প/কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের উচিত প্রকল্পের নথি অনুযায়ী জেন্ডারের জন্য সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং যে কোনো ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ হওয়া। প্রকল্প/কর্মসূচির কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের মানদণ্ডে জেন্ডার সংক্রান্ত লক্ষ্য এবং ফলাফলের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা উচিত। কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদনের মানদণ্ডে জেন্ডারের গুণমান এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও বৈষম্য হ্রাসকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল নাগরিক জবাবদিহিতা কৌশল: অংশীদারিত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং পারস্পরিক জবাবদিহিতা জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধির বিষয়টি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সরকার, বেসরকারি খাত, সংসদ, স্থানীয় উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা, নারী সংগঠনসহ সুশীল সমাজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় নারীর উন্নয়ন কৌশলগুলোর জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের উচিত তদারকি নিশ্চিত করা ও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। নারী/মেয়েদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে নাগরিক সমাজ এবং নারী গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কৌশল আরও জোরদার করতে হবে।

৭. সংকট ও আঘাত থেকে বর্ধিত সুরক্ষা ও ঘাত-সহনশীলতা

সামাজিক সুরক্ষায় দারিদ্র্য ও আঘাতের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য ও জেন্ডারমাত্রা চিহ্নিতকরণ: জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের উদ্বেগ ও ঝুঁকির বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য এনএসএসএস প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জেন্ডার-নির্দিষ্ট জীবনচক্রের ঝুঁকি মোকাবিলায় অপরিহার্যভাবে পরিপূরক হবে। প্রস্তাবিত সামাজিক বিমার প্রবর্তন করা বিশেষভাবে কর্মজীবী নারীদের জন্য ঝুঁকি প্রশমনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা।

পরিবেশগত ও জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের প্রভাব থেকে সুরক্ষা: পরিবেশ রক্ষা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ এবং এতে নারীদের সম্পৃক্ত করে উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষার জন্য শিশু ও যুবকদেরকেও এই কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। দূষণ নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের মানোন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষা ও সম্পদ নিঃশেষ প্রশমনে সহায়তা করবে। ঝুঁকিসমূহ হ্রাসে বন সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ রক্ষায় নারী ও পুরুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, প্রশমন, ঘাত-সহনশীলতা, মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা: নারীসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, অভিযোজন সক্ষমতা বিনির্মাণ এবং নারী ও পুরুষের জন্য জলবায়ু ঘাত-সহনশীল জীবিকা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। নারী ও বালিকাদের দুর্যোগের আগে, সম্পদ রক্ষায়, অধিকতর ঘাত-সহনশীলতা এবং শক্তিশালী সতর্কতা, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জীবিকায় বৈচিত্র্যকরণের আগাম সতর্ককারী হিসেবে কাজ করতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। অভিযোজিত ও বৈচিত্র্যময় জীবিকার সম্প্রসারণ করতে হবে। যেমন, অল্প সময়ে ফসল ফলানো ও কম পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন, খাদ্য মজুত ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি, পুষ্টি এবং দুর্যোগের সময় খাদ্য সংরক্ষণ। এ সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য জলবায়ুজনিত কারণে শহুরে অঞ্চলের অভিবাসীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নারীদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা স্কিম, গণপূর্ত কর্মসূচি, দক্ষতা বিকাশ, প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা সহায়তা এবং প্রশিক্ষণে আরও বেশি প্রবেশাধিকার প্রদান করা উচিত। কম কার্বন নিঃসরণ, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পানি ব্যবস্থাপনা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব প্রশমনের প্রযুক্তিতে নারীর সংশ্লিষ্টতা ও সক্ষমতা বাড়ানো উচিত।

জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ও আঘাতে ঘাত-সহনশীলতা শক্তিশালীকরণে তথ্য সেবাসমূহ: দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এর লক্ষ্য দুর্যোগ চলাকালে ও পরবর্তী সময়ে (আগুণ, ভূমিকম্প, অসুখ-বিসুখ) প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সকল সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে পুলিশ ও অগ্নি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ও সহজলভ্য সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। জলবায়ু ঘাতসহনশীল তথ্যসেবা নিশ্চিত করে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে জনগণের অব্যাহত গতিশীলতা এবং সেবাসমূহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কমিউনিটি রেডিও, ক্যাম্পেইন ও সম্প্রদায়ভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলোকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মাঝে সেবা, আশ্রয়কেন্দ্র, জীবিকানির্বাহ প্রভৃতিবিষয়ক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের সময় প্রশমন ব্যবস্থা: বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সময় অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ঘটনা ঘটে। এতে নারীরা বাস্তুচ্যুত হয়, তাদের জীবিকানির্বাহ ব্যাহত হয় এবং তাদের সম্পদ বিনষ্ট হয়। এ কারণে নারীদের ক্ষতির হিসাব মূল্যায়ন করা এবং তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া প্রয়োজন। অবকাঠামো নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের সময় পুনর্বাসনের পরিকল্পনায় জীবিকা ও সম্পদ হারানোর মাধ্যমে নারীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে পুনর্বাসনের পরিকল্পনার মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণের সময় তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য জীবিকা এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

স্বল্প আয়ের ও ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের জন্য জাতীয় বিমা এবং সর্বজনীন পেনশনের আওতা: সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতায় স্বল্প ব্যয়ের স্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন পরিচর্যা বিমা, পেনশনের বিধান এবং বেকারত্ব বিমায় নারীদের প্রবেশাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত,যা জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের অধীনে একটি জাতীয় সামাজিক বিমা ব্যবস্থার (NSIS) পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ভিত্তিতে চালু করা হবে। এনএসআইএস (NSIS)-এর আওতায় জনগণকে নিজের সামাজিক সুরক্ষায় বার্ধক্য, প্রতিবন্ধিতা, বেকারত্ব এবং মাতৃত্বের ঝুঁকিগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিমায় বিনিয়োগে সক্ষম করে তুলবে। প্রয়োজনে ভর্তুকি সরবরাহের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সহযোগিতায় একটি স্বল্প ব্যয়ে বিমা মডেল চালু করা প্রয়োজন, যাতে নারীরা সীমিত অবদানের মাধ্যমে সহায়তাটি পেতে পারে।

৮. সামাজিক নিয়মকে প্রভাবিত করা এবং নারী ও বালিকাদের মূল্যায়নে পরিবর্তন আনা

সকল গণমাধ্যমে নারী/বালিকাদের প্রতি সমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি চিত্রায়ণ: নারীদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রচার করা হবে। প্রতিবেদন/ফিচারের বিষয়বস্তু হবে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, যৌতুক, বাল্য বিবাহ এবং এ-জাতীয় গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে। নারীদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের পাশাপাশি পণ্য হিসেবে চিত্রায়ণ প্রতিরোধ করা হবে। গণমাধ্যমের মালিকসহ মিডিয়াকর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের ইতিবাচক চিত্র প্রচার করা হবে। ভোগ্য পণ্যগুলোর প্রচার ও নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের জন্যও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ প্রয়োগ করা হবে।

পুরুষ ও নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে রীতিনীতি পরিবর্তনে পুরুষদের জন্য কর্মসূচি: সকল কর্মসূচিতে পুরুষের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হবে। যার লক্ষ্য সকল খাতে নারীর অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ ও নারীর জন্য ক্ষতিকারক অনুশীলনে পুরুষদের অংশগ্রহণ ও সমর্থন হ্রাস করা। পুরুষেরা জেন্ডার সমতা প্রসারে অন্তর্ভূক্ত এবং এ বিষয়ে অবহিত থাকবে, যেহেতু কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই সামাজিক আচরণ, বাড়ির বাইরে নারীদের চলাফেরা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রভাবিত করে। সামাজিক আচরণ পরিবর্তন, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ, পরিবারের দায়িত্ব বণ্টন, জেন্ডার সমতা প্রচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণকারী অন্যান্য পুরুষকে জবাবদিহি করানোর লক্ষ্যে পুরুষদের সংঘবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে আরও সমতাবাদী সম্পর্ক গড়ে তুলতে কাজ করা: ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সামাজিকীকরণ খুব দ্রুত পরিবার এবং সম্প্রদায় থেকে শুরু হয়। তাই তাদের মনোভাব ও আচরণের রূপান্তরের লক্ষ্যে অল্প বয়সে পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ। শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের গড়ে তোলার জন্য সময় মাফিক ও অব্যাহত বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে শিক্ষা পাঠ্যক্রম, খেলাধুলা ও সংস্কৃতি, সামাজিক আচরণ, মিডিয়া এবং অন্যান্য সব মাধ্যমে মেয়ে ও ছেলেশিশুদের মধ্যে সমতার সংস্কৃতি এবং তাদের সমান মানবাধিকারের বিষয়ে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যাতে পুরুষরা নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে না ওঠে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের জনগোষ্ঠী দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ, যারা দক্ষ জনশক্তি হয়ে গড়ে উঠতে পারে। কিশোরীদের জ্ঞান ও দক্ষতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রণীত বালিকাকেন্দ্রিক কর্মসূচি তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং আন্তঃপ্রজন্মের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্বল স্বাস্থ্য এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে অবদান রাখতে পারে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি থেকে মুক্তি: নারীদের ওপর সর্বাধিক প্রচলিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ হলো জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, যা কেবল তাদের মর্যাদাকেই ক্ষুণ্ন করে না, বরং তাদের আত্মসম্মান ও বিকাশের সুযোগকেও হ্রাস করে। এটি নারীদের জীবন, সমাজ এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকবিলায় বহুমুখী কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া অপরিহার্য। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে আইনি বিধান বাস্তবায়ন, পরিবারকে অনুপ্রেরণা দান, সম্প্রদায়ের সমর্থন বাড়ানো, যুব গোষ্ঠীর অভিমুখীকরণ, নারীদের মানবিক দক্ষতার মানোন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্য করা এবং নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। বর্তমানে চলমান বহু-খাতের কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো সম্প্রসারিত করতে হবে। নারীর প্রতি সহিংসতার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্য প্রভাব সম্পর্কে নারীদের ও সম্প্রদায়ের সচেতনতা ও প্রতিরোধ সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আইনি সহায়তা, আশ্রয় ও পরামর্শে প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে নারীদের জন্য তথ্য ও সহায়তা সেবাগুলো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পক্ষে সমর্থন অব্যাহত রাখতে হবে। প্রবীণ নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও আইসিটির মাধ্যমে অধিকার লঙ্ঘন মোকাবিলায়

আইনি ও কর্মসূচিভিত্তিক বিধান থাকা প্রয়োজন। আইটিভিত্তিক অপরাধ থেকে রক্ষা এবং সারা দেশে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত। কর্মক্ষেত্র/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে নারীদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সব বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণ নির্দেশিকা জারি করা উচিত। বৈবাহিক ধর্ষণও আইনি বিধানের আওতায় আনতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সদস্যদের নারী নির্যাতন মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যক্রমের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সামাজিক কর্মকৌশলের উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিককরণ নিশ্চিত করা উচিত। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করতে এবং তা প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সামাজিক গবেষণা চালানো উচিত।

১৪.৫.৪ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশল বাস্তবায়ন

অষ্টম পরিকল্পনার জন্য জেন্ডার এজেন্ডাটি ব্যাপক এবং পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য এ খাতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। অগ্রাধিকার খাতগুলো বেছে নেয়া হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নারীদের ক্ষমতায়ন ও কিছু কার্যক্রম থেকে, যা উভয় ক্ষেত্রে অবদানের মাধ্যমে একাধিক ক্ষেত্রে ফলাফলকে সহজতর করতে পারে। মূল ক্ষেত্রগুলো হলো মানসম্পন্ন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান সুবিধা নিশ্চিত করা; নারীর উৎপাদনশীলতা এবং সম্ভাবনা সর্বাধিকীকরণে বিপণনযোগ্য দক্ষতা; সমানভাবে যোগ্য পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির ব্যবধান কমিয়ে আনা; কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব নির্মূল; পুষ্টি এবং আজীবন স্বাস্থ্যসেবা; অবকাঠামো যা নারীর মানব উন্নয়ন, গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অর্জনে সহায়তা করে এবং এমন কর্মকাণ্ড যা ইতিবাচক সামাজিক রীতি সমূহকে বৃদ্ধি করে এবং নারী নির্যাতন ও অন্যান্য ক্ষতিকারক অনুশীলনগুলো হ্রাস করে। পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। জেন্ডার বৈষম্য বন্ধ এবং সম্পদ বরাদ্দের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য বিভিন্ন জেন্ডারসমতা সূচক দ্বারা পরিমাপ করে একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করা হবে। গভর্ন্যান্স ও প্রশাসনের জন্য আইন ও নীতি প্রয়োগ এবং কার্যকর পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য লভ্য সম্পদের খতিয়ান পর্যালোচনা করা হবে। জেন্ডার সমতার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনুমান এবং প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত সম্পদের অনুসন্ধান করা উচিত।

জেন্ডার ইস্যুকে মূলধারায় আনার কাজ অব্যাহত থাকবে এবং সমস্ত সামষ্টিক, অর্থনৈতিক ও খাতভিত্তিক নীতিমালা জেন্ডারকে ক্রসকাটিং থিম হিসেবে সমন্বিত করবে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ জেন্ডারের অসমতা হ্রাস ও জেন্ডারের মধ্যে সমতার প্রসারের লক্ষ্যে তৈরি করা উচিত। জেন্ডার সমতা-সম্পর্কিত কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিশ্চিত করতে এসডিজির এজেন্ডা-সম্পর্কিত জাতীয় অগ্রগতির সমস্ত প্রতিবেদন জেন্ডার-বিভাজিত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত হতে হবে। এটি জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। উন্নয়ন সংস্থা ও অ্যাডভোকেসি গোষ্ঠীসহ সুশীল সমাজের সংস্থার (ঈঝঙ) সঙ্গে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা জোরদার করা হবে। এর লক্ষ্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও সহায়তার সম্প্রসারণ এবং ভালো ফলাফল অর্জন করা। জেন্ডার সমতা-সম্পর্কিত সমস্যা এবং ক্ষতিকারক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য উন্নয়ন ও অ্যাডভোকেসি উদ্যোগ যৌথভাবে গ্রহণ করা হবে। বিশেষত গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবাসমূহ আরও ভালোভাবে সরবরাহের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে, জেন্ডার কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যবস্থাগুলো নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জোরদার করা হবে:

ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল: নারীদের অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটিকে জবাবদিহিতা, সক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মাধ্যমে আরও ফলপ্রসূ করা হবে। এনসিডব্লিউসিডি (NCWCD) থেকে নিয়মিত দিকনির্দেশনা, কমিটিগুলোর কার্যকারিতা এবং ডাব্লিউআইডি ফোকাল পয়েন্ট কৌশল নিশ্চিত করা হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যেমন–নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ডিডাব্লিউএ ও পিএলইউ এবং আইএমইডি, বিবিএস, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন প্রভৃতির সক্ষমতা জোরদার করতে হবে, যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী জেন্ডার সমতা ও নারীদের অগ্রগতি-সম্পর্কিত পদক্ষেপের নকশা, পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অন্যান্য নিয়ন্ত্রক মন্ত্রণালয়ের মতো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট পর্যালোচনাসহ সম্পদ বরাদ্দ ও জেন্ডারসমতা নিরীক্ষণে এর ভূমিকা বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উচিত নিয়মিত জেন্ডারভিত্তিক উপাত্ত সরবরাহ করা, যা জাতীয়, বিভাগীয় ও এসডিজি সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি এ সকল উপাত্ত সিইডিএডব্লিউ, এসডিজি, আইসিপিডি, সিআরসি ও সমজাতীয় অন্য সংস্থাগুলোর জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। জেন্ডার সমতা ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য আইএমইডির দায়বদ্ধতা থাকবে এবং অডিটর জেনারেল অফিসকে জেন্ডার বাজেটের ব্যয় নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা প্রয়োজন।

জেন্ডার ইস্যুটি মূলধারায় আনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল বরাদ্দকরণ: সাধারণত, নারীদের অধিকার এবং জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারক সংস্থাগুলোর পুঁজির অভাব রয়েছে। একইভাবে এই ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য গতানুগতিক ক্ষমতার অভাব এবং মানব সম্পদ বরাদ্দে ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহে সাধারণত সুনির্দিষ্ট জেন্ডার-সম্পর্কিত কার্যক্রমের অভাব থাকে। প্রায়ই এই খাতের কার্যক্রম পরামর্শকের ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি সংস্থা ও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক সম্পদের এবং সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তাসহ প্রতিষ্ঠানসমূহে মানবসম্পদের বরাদ্দ প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার জন্য বরাদ্দ প্রদানের সময় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সহায়তা সেবা: জেন্ডার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ করতে পারে–এমন প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু প্রতিষ্ঠান কোর্স চালু করেছে, বিভিন্ন খাতের কার্যক্রমে জেন্ডার ইস্যুকে কীভাবে দৃষ্টিগোচর করা যায়, সে সম্পর্কে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিকাশের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বাড়তি কোর্স শুরু করতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পিএলএইউ এবং ডিডব্লিউএর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে সেখানকার কর্মীরা কর্মসম্পাদন তদারকির পাশাপাশি প্রয়োজনে অন্যান্য সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দিতে পারে। জেন্ডার বিশ্লেষণের প্রশিক্ষণ সমস্ত কর্মীর প্রশিক্ষণের অংশ হওয়া উচিত।

সরকারি নীতিমালা ও কর্মসূচিসমূহের প্রভাব পরিমাপ করতে স্বচ্ছ পরিবীক্ষণ কৌশল প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগ করা হয়েছে: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচিগুলোর পর্যালোচনায় জেন্ডার সমতা ফলাফলের পরিবীক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। আইএমইডির পরিবীক্ষণ প্রকল্পের/ কর্মসূচির লক্ষ্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতার অগ্রগতির তদারকির সমন্বয় করবে। সংস্থা, খাত ও মাঠ পর্যায়ে জেন্ডার বাজেটের আরও কঠোর তদারকি অপরিহার্য। জেন্ডার সাম্যের ক্ষেত্রে ব্যয় এবং ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য ওএজি নিয়োগ করা উচিত। ওএজি অফিসকে জেন্ডার সমতার ক্ষেত্রে ব্যয় ও ফলাফল নিরীক্ষণের দায়িত্ব দেয়া উচিত। বিভিন্ন পর্যায়ে স্বচ্ছ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত সভা করা, প্রকাশ্যে লভ্য আর্থিক ঘোষণার বিবৃতি জারি করা এবং বাজেট পর্যালোচনার আয়োজন করা।

সরকার এবং খাতসমূহে জেন্ডার কৌশলগুলোর উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষণের সক্ষমতা: জেন্ডার-সংক্রান্ত সমস্যাগুলো বোঝার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের নিজস্ব কর্তৃত্বের জায়গার মধ্যে পরিবর্তন এবং সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রেরণা প্রদান করা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের ওরিয়েন্টেশন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কর্মী বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে এবং প্রসারিত করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে একীভূত করা প্রয়োজন। যে বিষয়গুলো খাতসমূহ বা বিভাগসমূহ পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এতে নির্ধারিত কর্মকাণ্ড চিহ্নিত রয়েছে, তা পরিবীক্ষণ করা দরকার। বেসরকারি খাতগুলোকে তাদের কার্যক্রমসমূহে জেন্ডার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে এবং প্রয়োজনে জেন্ডার বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

জেন্ডার সমতার বিষয়ে নির্ধারিত জাতীয় ও খাতভিত্তিক কার্যক্রমের ফলাফল: প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, ঘাটতি প্রভৃতি পরিমাপের পাশাপাশি জেন্ডার সম্পর্কে সরকারের পারফরম্যান্সের সূচকটি নির্ধারণ করা হবে। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সূচকসহ নির্ধারিত জেন্ডারসমতা ফলাফলের একটি সংকলন সব খাতের জন্য পরিকল্পনার নথিতে একীভূত করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে জেন্ডারসমতা সূচকগুলোর একটি তালিকা চিহ্নিত, গৃহীত এবং পর্যবেক্ষণ করা হবে। দারিদ্র্য পরিমাপ ও আয়ের উপাত্তগুলো সব সম্পদ গোষ্ঠীতে জেন্ডারের ভিত্তিতে পৃথককৃত হবে, যাতে নারীদের দারিদ্র্য লাঘব কার্যকরভাবে পরিমাপ করা যায়।

জেন্ডার সমতার ফলাফলের জন্য দায়বদ্ধতা: জেন্ডার সমতা লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল অর্জনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের নথিতে বর্ণিত জেন্ডার সমতার জন্য প্রকল্প/কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং যে কোনো ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে। জেন্ডার সমতা লক্ষ্যসমূহ থেকে সম্পদ সরিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্বরাদ্দ সীমিত করতে হবে। প্রকল্প/ কর্মসূচিগুলোর পারফরম্যান্স মূল্যায়নের মানদণ্ডে জেন্ডার সমতা লক্ষ্যমাত্রা এবং ফলাফলের মূল্যায়নও নিশ্চিত করা উচিত। জাতীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতার অর্থ সরকারি-বেসরকারি খাত, সংসদ, স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, নারী সংগঠনসহ নাগরিক সমাজ, ব্যক্তিখাত ও জাতীয় নারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক স্বচ্ছ এবং বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি দেয়া, নিজস্ব এলাকায় জেন্ডার সমতার জন্য কাজ করা এবং জবাবদিহির মধ্যে থাকা। সরকার নির্দেশিকা প্রদান করবে, তদারকি নিশ্চিত করবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন: ভালো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কৌশল প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জেন্ডার সমতার অগ্রগতি পরিমাপের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সম্মত জেন্ডার সমতা সূচকের একটি তালিকা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান, টারশিয়ারি পর্যায়ের শিক্ষা, নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাস, মাতৃমৃত্যু ও অপুষ্টি লাঘব, নারী নেতৃত্বাধীন পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচন এবং এ ধরণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত। এগুলো এনএপি ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সূচকগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। খাত পর্যায়ে প্রতিটি খাতে কয়েকটি প্রধান কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) চিহ্নিত এবং তদারক করা হবে। পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি সংশ্লিষ্ট খাতের মন্ত্রণালয়সমূহের সমর্থন নিয়ে সূচকগুলো চূড়ান্ত করবে। এই খাতে কর্মরত সকল সংশ্লিষ্ট অংশীদারকে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচক সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, যাতে তারা সেই ফলাফলগুলোর জন্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকির বিষয়ে সক্রিয় থাকে।

১৪.৬ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

মহিলাদের পাশাপাশি বাংলাদেশে আরও ভঙ্গুর জনগোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী, যেমন–শিশু, বয়স্ক, জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অক্ষমতা বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষ এবং নিম্নবর্ণের গোষ্ঠীসমূহ। ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত এসব গোষ্ঠীই সাধারণত চরম দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য বাহ্যিক আঘাতের জন্য ঝুঁকির মধ্যে থাকে, যা তাদের কল্যাণকে প্রভাবিত করতে পারে। একইভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবাগুলোয় তাদের প্রবেশাধিকার প্রায়ই সীমিত থাকে এবং শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ ও অর্জনও কম হয়। কাজেই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা করার সময় এই সামাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশি বেশি অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হলো এই লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে দক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়। এটি সরাসরি ইতিবাচকভাবে একটি জাতির বিকাশকে চাঙ্গা করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করে এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের কল্যাণ সাধন করে।

১৪.৬.১ সপ্তম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি

সংবিধানের মাধ্যমে সরকার সব ধরণের সামাজিক বর্জন দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডা এবং এজন্য অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সপ্তম পরিকল্পনার জন্য তাদেরকে সমাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ক্ষমতায়নের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলো অন্বেষণ করার পর উক্ত জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে অভীষ্ট ও কৌশলগত পদ্ধতি চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রতিটি গোষ্ঠীর বাদ পড়ে যাওয়া সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অগ্রগতি নিচে পর্যালোচনা করা হলো:

শিশু: শিশুদের অবস্থা, তাদের বেঁচে থাকা এবং কল্যাণের প্রসারে বড় ধরণের অগ্রগতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এসডিজির যে সকল লক্ষ্যে শিশুমৃত্যুর হার এবং তাদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলোয় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। তবুও ২০১৬ সালে পরিবারগুলোর প্রায় ৩০ শতাংশ দরিদ্র ছিল, যা জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশের তুলনায় তাৎপর্যপূণ পরিমাণে বেশি। এছাড়া শিশুরা নির্যাতন, শোষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল। অপুষ্টি, দারিদ্র্য ও কম শিক্ষার বা শিক্ষার অভাবের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা অতিরিক্ত সময়ের জন্য স্থায়ী হয়।

সপ্তম পরিকল্পনা কৌশল: সপ্তম পরিকল্পনার জন্য অন্তর্ভুক্তির কৌশলটির ভিত্তি ছিল সংবিধানের বাস্তবায়ন, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা পেশা নির্বিশেষে সব নাগরিককে সমান অধিকার এবং সুযোগ প্রদান করে। সপ্তম পরিকল্পনা মূলত তাদের কল্যাণের পাশাপাশি তাদের আইনি সুরক্ষা এবং তাদের অধিকারগুলোয় মনোনিবেশ করে। কিছু কার্যক্রমের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হয়েছিল–(১) সংক্রামক এবং অ-সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, সুস্থতা ও স্বাস্থ্যকর অনুশীলনগুলো বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যালয়ে আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে; (২) বাচ্চাদের খাদ্য ও পুষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং (৩) শিশুদের পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস করতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে। শৈশবের শুরুতে বিকাশের কৌশলসমূহ এবং আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাপ্যতার মাধ্যমে গুণগত ভালো মানের শিক্ষায় শিশুদের প্রবেশাধিকার আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হয়। যে সকল কাজের মাধ্যমে শিশুদের আইনি সুরক্ষা অর্জনের আশা করা হয়েছিল–(১) শিশুদের নিজেদের প্রয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়ার জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা; (২) শিশু নির্যাতন, পাচার, শোষণের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ ও সমন্বয় সাধন; (৩) সমস্ত জন্ম নিবন্ধনের জন্য পৌর কর্পোরেশনগুলোকে সচল করা; (৪) জাতীয় শিশু শ্রম নির্মূল নীতি ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক শিশু শ্রম নিরসন; (৫) বাল্যবিবাহ আইন ২০১৭ প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ নিরসন এবং শিশুদের অবমাননাকর ও শোষণমূলক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়ন: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন কার্যকর করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে পাশকৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলোর মধ্যে একটি ছিল 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭'। এই আইনটি মেয়েদের ১৮ বছর বয়সে এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়সে বিয়ের জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করে। তবে এটি 'বিশেষ পরিস্থিতিতে' উল্লিখিত বয়সের চেয়ে ছোট কনে ও বরকেও বিয়ের অনুমতি প্রদান করে। ২০১৮ সালে প্রণীত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' এ ওয়েবসাইট বা যে কোনো বৈদ্যুতিক মাধ্যমে নানা ধরণের আপত্তিকর উপাদান প্রচার ও বিতরণের মাধ্যমে শিশুসহ যে কোনো ব্যক্তির মানহানি ও প্ররোচনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এই আইনগুলোর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শিশু বাজেটের সমন্বয়সাধন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কালে শিশু সংক্রান্ত বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের হিসাব অনুযায়ী শিশু সংক্রান্ত বাজেট বাস্তবায়নে ১৫টির মতো মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত রয়েছে।

চিত্র ১৪.১০: ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের শিশুকেন্দ্রিক বাজেটের বৈশিষ্ট্য

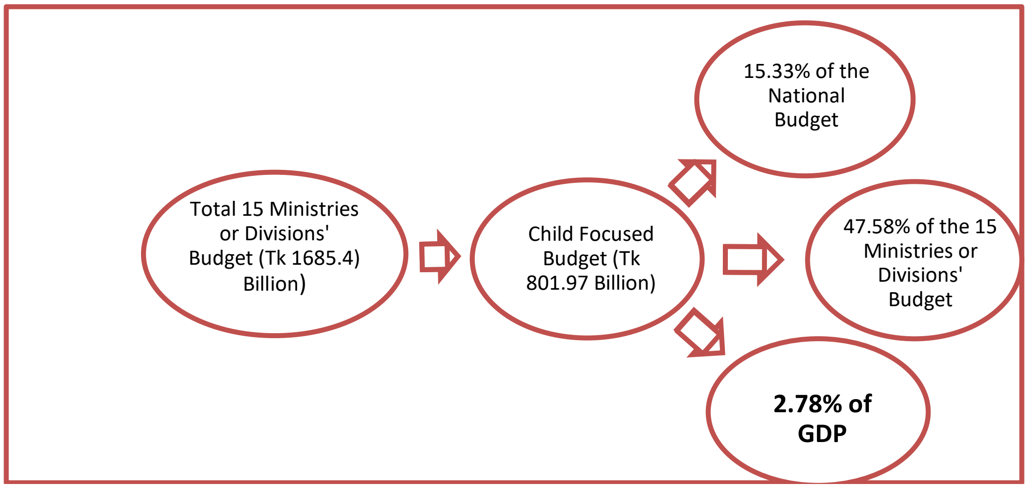

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়, শিশু বাজেট, ২০১৯-২০।

নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী: 'আদম শুমারি, ২০১১' অনুসারে ১.৬ মিলিয়নের (১৬ লাখ) বেশি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশে বাস করে। তাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় বাস করে, যেখানে বিভিন্ন নৃ-ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমির মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো ১১টি বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর নিবাস। অন্যান্য নৃগোষ্ঠী সমতলভূমিতে বিশেষত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। 'জাতীয় ঐক্য' ধারণার প্রয়োগ যা, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীল নয়; নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিশেষত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবসান ঘটিয়েছে। ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা মূলধারার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমিত প্রবেশাধিকার পায় এবং তারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জাতিগত অসমতা, দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য, শিক্ষার অভাব, জমিতে অল্প প্রবেশাধিকার এবং কর্মসংস্থানের অভাবের মতো জটিল আন্তঃক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো মূলধারার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক জমি দখল। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকদের জমি রক্ষার নীতিমালা অপর্যাপ্ত ।

আয়, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, নারী কর্মসংস্থান, অবকাঠামো ও জাতীয় নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার, আন্তঃসম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ইত্যাদির মতো প্রায় সমস্ত বড় উন্নয়ন সূচকগুলোর ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের অন্যতম সুবিধা বঞ্চিত ও ভঙ্গুর অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাপনীর হার (যথাক্রমে ৬২.৯% ও ১৫.৪%) জাতীয় সমাপনীর হারের তুলনায় (যেমন: যথাক্রমে ৯৮.৫% ও ৬২.২%) কম। এই অঞ্চলে খাদ্য সংক্রান্ত দারিদ্র্য ব্যাপভাবে বিস্তৃত। ২০১৬ সালে ক্ষুদ্র জাতিগত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের প্রকোপ ছিল যথাক্রমে ৪৫.৭ শতাংশ ও ২৮.৪ শতাংশ, যা জাতীয় দারিদ্র্যের হারের ২৪.৩% এবং চরম দারিদ্র্যের হারের (১২.৯%) প্রায় দ্বিগুণ। সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর চরম দরিদ্র লোকেরা চাকরি পেতে কম সক্ষম হয়, যা তাদের পরিস্থিতি আরও সংকটাপন্ন করে তোলে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সরকারের কৌশলসমূহ ও প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পরিকল্পনার নথির সপ্তম অধ্যায়ে দ্বিতীয় অংশে।

দলিত ও চরম দরিদ্র গোষ্ঠী: দলিত পরিচয় ঐতিহাসিকভাবে অপবিত্র হিসেবে বিবেচিত পেশাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশে দলিতদের শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে তাদের কাজ, ধর্ম ও জাতিসত্তার ভিত্তিতে। বাংলাদেশে ৩০টিরও বেশি দলিত গোষ্ঠী রয়েছে, যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪.৫ মিলিয়ন থেকে ৫.৫ মিলিয়ন লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। এই গোষ্ঠীর মানুষগুলো যারা অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত, তাদেরকে মূলধারার সঙ্গে মিশ্রিত করার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে সামাজিক বৈরিতার শিকার হয়। ঐতিহাসিকভাবে দলিতদের নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা হয়েছে। দলিত সম্প্রদায়গুলো বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তীয় এবং সামাজিকভাবে সবচেয়ে বঞ্চিত গোষ্ঠী।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে তাদের দীর্ঘ উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও দলিত সম্প্রদায়গুলোর উন্নয়নে মনোনিবেশ করা হয় না। তাই প্রায়ই তাদের 'নিখোঁজ দরিদ্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কেবল অর্থনৈতিক বৈষম্যই নয়, এই প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো অনেক অ-অর্থনৈতিক সমস্যারও মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে রয়েছে–(১) অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক বর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘৃণা, (২) আত্মসম্মান ও মর্যাদার অভাব, (৩) বেশিরভাগ জীবিকানির্বাহের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, (৪) ভূমি থেকে জোর করে উচ্ছেদ, (৫) পরিবার ও সমাজের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা, (৬) অজ্ঞতা ও তথ্যের অভাব, (৭) পরিবেশগত বিপর্যয়, (৮) আইনি সহায়তা সেবাগুলোর প্রাপ্যতার অভাব, (৯) সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকারের অভাব। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে দলিতদেরকে প্রায়ই সামাজিকভাবে বয়কট করা হয় এবং তাদের নিকট হতে জোর করে শ্রম আদায় করা হয়।

সপ্তম পরিকল্পনা কৌশলসমূহ: সপ্তম পরিকল্পনার রূপকল্প ছিল–বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায় যে বৈষম্য ও শোষণের মুখোমুখি হয়, তা নির্মূল করা, যাতে তারা দেশের পরিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সপ্তম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো এই সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করা এবং বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাদের অধিকার রক্ষা করা। একটি মূল কৌশল হবে স্থানীয় সংস্থা ও এনজিওগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের চিহ্নিত করা এবং সেইসঙ্গে তাদেরকে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিতে সক্ষম করা। সরকার এই প্রত্যাশা নিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে সমুন্নত রাখবে যে স্কুলগুলো সমস্ত শিশুদের জন্য বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যে সরকারি স্কুল ও কলেজগুলোয় দলিত ও অন্যান্য বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ কোটার সংস্থান রাখা হবে এবং সরকারি মালিকানাধীন সমস্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দলিত কিশোর ও যুবকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া খাস জমি বরাদ্দে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। চা বাগান মালিকদের তাদের এস্টেটের মধ্যেই চরম দরিদ্র শ্রমিকদেরকে তাদের নিজস্ব বাগান তৈরির উপায় হিসেবে কিছু জমি বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা হবে। সর্বোপরি এসব বিষয়ো কার্যকর গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করতে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সকল স্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করতে হবে।

বাস্তবায়ন: সরকার প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে রক্ষার জন্য আইনি বিধান রয়েছে। তবুও সরকারি প্রশাসনিক সক্ষমতার দুর্বলতা এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের অনুপস্থিতি সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করেছে। নতুন জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা (ঘঝঝঝ) প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীগুলোকে সামাজিক সুরক্ষার ছত্রছায়ায় আনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। এনএসএসএস (NSSS) অবলম্বন এবং পর্যায়ক্রমে এর চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হবে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

প্রান্তীয় গোষ্ঠীসমূহ: এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এইচআইভি/এইডস-আক্রান্ত নারী, মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী। যৌনতার ভিত্তিতে সমস্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বর্জনের মুখোমুখি হয়, যা মূলধারার সমাজে তাদের অভিগম্যতাকে সীমাবদ্ধ করে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-আক্রান্ত মানুষের প্রতি ভীতি ও বৈষম্য দেখা যায় এবং ফলশ্রুতিতে যারা হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV) বহন করে, তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা উভয়ই বাঁধাগ্রস্ত হয়। ভীতির কারণে বাংলাদেশ থেকে এইডস মহামারি প্রতিরোধের কৌশলগুলোও বাঁধাগ্রস্ত হয়; যার ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিলম্ব, যৌন সঙ্গীদের কাছে এইচআইভি পরিস্থিতি প্রকাশে অনীহা এবং এইচআইভি প্রতিরোধের কর্মসূচিগুলো ব্যাহত হয়।

মহিলা যৌনকর্মীরা যত ধরণের সামাজিক বর্জনের মুখোমুখি হয়, তার মধ্যে তাদের সন্তানদের সামাজিকভাবে বর্জন করা সবচেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক। তাদের সন্তানদের বিশেষত কন্যাসন্তানদের মধ্যে যৌনকর্মী হওয়ার প্রবণতা বেশি। মূলধারার সমাজে প্রবেশের সুযোগের ক্ষেত্রে যৌনকর্মীর শিশুদের পাশাপাশি অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো বৈষম্যের শিকার হয়। হিজড়াদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও খারাপ। তারা তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। ২০১৩ সালের নভেম্বরের আগ পর্যন্ত তাদের ভোটার আইডি কার্ড

রাখারও অনুমতি ছিল না, যার অর্থ তাদেরকে নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার পাওয়ার যোগ্য হিসেবেও বিবেচনা করা হয়নি। তবে হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় ২০১৩ সালে তৃতীয় জেন্ডার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যৌন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অনেক বিষয় বিদ্যমান আইনগুলোর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ, যেমন পুরুষদের সমকামিতা ফৌজদারি দণ্ডবিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য আইন।

সামাজিক সেবাসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রেও সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। হিজড়া ও যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য বিমার জন্য বিবেচনা করা হয় না, অথচ এটি অন্যদের চেয়ে তাদেরই বেশি প্রয়োজন। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ থেকে সুরক্ষা ও আইনি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমস্যা বিরাজ করছে। হিজড়াদের জন্য আরেকটি বড় বাঁধা হলো, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক–কোনো খাতের চাকরির জন্যই তাদের বিবেচনা করা হয় না। এ সকল কারণ যৌন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে মূলধারা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে এবং তাদের প্রান্তিককরণ ও সামাজিক পরিচয়ের অভাবের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।

জ্ঞানের অভাব, ভুল ব্যাখ্যা, ভুল তথ্য, ধর্মীয় বিদ্বেষ, শাস্তিমূলক আইন এবং অনুশীলনের সংমিশ্রণ অনেক যৌন ও জেন্ডার সংখ্যালঘু মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে তাদের মাঝে মূল্যহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। এর ফলে নেতিবাচক স্বাস্থ্য পরিণতি, যেমন ক্ষতিকর মানসিক স্বাস্থ্য, আত্মহত্যার প্রবণতা এবং আত্মসম্মানের অভাব ও উচ্চতর ঝুঁকি গ্রহণের আচরণের সৃষ্টি হয়।

শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি: অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশে তিন মিলিয়ন (৩০ লাখ) শিশুসহ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ লোক শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন, যার মধ্যে অর্ধ মিলিয়ন (পাঁচ লাখ) লোক বহু-প্রতিবন্ধিতার শিকার। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে। এত বড় পরিসরে প্রতিবন্ধিতা কেবল স্বাস্থ্য সমস্যারই প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং এটি দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ এবং প্রতিবন্ধী শিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। জীবনের যে কোনো পর্যায়ে শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে, জীবনচক্রের বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং কমবেশি ৫০ বছর বয়স থেকে তা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এটি উদ্বেগজনক যে বয়স্ক জনসংখ্যার সঙ্গে মোট অক্ষমতার পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প থেকে বাদ দেয়া হয়, তাদের জমির মালিকানা কম থাকে এবং যে কোনো অর্থনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। তাদের বেশিরভাগকেই চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের ৮০ শতাংশের বেশির শিক্ষা নেই। যদিও অক্ষম ব্যক্তিরা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণির লোক হিসেবে বিবেচিত হয়, তাদের সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের নিজস্ব জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত থাকে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রসার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকটা পথ এগিয়েছে। শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার-সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সাম্যতার বিষয়ে বেইজিং ঘোষণাপত্রকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ২০০৬ সালে একটি পাঁচ-বছরমেয়াদি জাতীয় প্রতিবন্ধী কর্মপরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়েছিল, এতে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে দায়বদ্ধ করা হয়।

তবে শিক্ষায় প্রবেশ থেকে শুরু করে চাকরিতে প্রবেশে সমান সুযোগের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো রয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্য অনেক বেশি (সারণি ১৪.৭)।

সারণি ১৪.৭: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে ভঙ্গুরতা ও দারিদ্র্য

শ্রেণি	ভঙ্গুরতা	দারিদ্র্য	চরম দারিদ্র্য
ক. অক্ষমতার মাত্রা			
কিছু অসুবিধাসহ পরিবার	৪৭.৪	২৬.৬	১২.৭
তীব্র অসুবিধাসহ পরিবার	৪৮.৭	২৬.৫	১৪.৭
পুরোপুরি অসুবিধাসহ পরিবার (দেখতে/শুনতে/হাঁটতে/মনোযোগ/স্ব-যত্ন নিতে/ যোগাযোগ করতে পারে না)	৫৬.৫	২৭.৪	১২.৮
খ. অক্ষমতা-সংবলিত পরিবারের বয়স শ্রেণি			
বয়স ০-৫	৫৭.২	৩৩.২	১৭.০
বয়স ৬-৯	৫৭.৫	৩৩.১	১৭.৬
বয়স ১০-১৮	৪০.৭	২০.২	৮.০
বয়স ১৯-৬৪	৩০.৫	১৩.৯	৫.৬
বয়স ৬৫+	৩৯.২	২১.৯	১০.৯

সূত্র: এইচআইইএস (HIES) ২০১৬

সপ্তম পরিকল্পনা কৌশলসমূহ: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় আনা হবে। সরকার মূলধারার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সহজীকরণের জন্য তাদের অধিকারের অগ্রগমণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং সমাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় প্রাপ্যতার মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও অর্থবহ জীবনযাপন নির্বাহের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। সংবিধানের অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেননা সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া সরকার শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার-সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সাম্যতার বিষয়ে বেইজিং ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কর্তৃক একাধিক কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা চারটি শ্রেণির আওতায় পড়ে–শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্তর্ভুক্তি ও গভর্ন্যান্স।

১৪.৬.২ বাস্তবায়ন

শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৌশল বাস্তবায়নে কিছু ভালো অগ্রগতি হয়েছিল (সারণি ১৪.৮)। তথাপি একটি উল্লেখযোগ্য অসমাপ্ত এজেন্ডা রয়েছে, যার জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সারণি ১৪.৮: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার অগ্রগতি

কার্যক্রমসমূহ	পারফরম্যান্স সূচকসমূহ	সময়সীমা	অগ্রগতি
প্রতিবন্ধীদের শনাক্তকরণের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা	বিজ্ঞপ্তি জারি	জুলাই ২০১৭	নির্দেশিকাটি সঠিক আছে, তবে এটি পরিষ্কার নয় যে, নির্দেশিকাটি অক্ষমতার তীব্রতা শনাক্ত করার জন্য বিবেচিত এনএসএসএসএর মানদণ্ডকে অন্তর্ভূক্ত করে কি না। বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়নি।
ব্যক্তিনির্ভর আয়ের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করা	বিজ্ঞপ্তিটির সংশোধন	জুলাই ২০১৭	পূর্ববর্তী সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়নি। পরিবারের আয়ভিত্তিক নির্বাচনের মানদণ্ড এখনো বিদ্যমান রয়েছে।
১০ শতাংশ আওতা বাড়ানো	আওতা বাড়ানো	পরবর্তী পাঁচ বছরের প্রতিবছর	প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৫ সাল থেকে উপকারভোগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে (চার লাখ থেকে প্রায় এক মিলিয়ন)।
শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রকল্পগুলোর তদারকি জোরদার করা	একটি পরিবীক্ষণ কর্মকাঠামো বিনির্মাণ	-	কোনো পরিবীবক্ষণ কর্মকাঠামো তৈরি করা হয়নি।

সূত্র: MTIR of NSSS

১৪.৬.৩ অষ্টম পরিকল্পনার জন্য অন্তর্ভুক্তির কৌশল

সংবিধান বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত অষ্টম পরিকল্পনা কৌশল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ বা পেশা নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান অধিকার ও সুযোগ প্রদান করে। এটি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত হবে, যাতে সেই বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে, যে সকল বিষয়ে অগ্রগতি সীমিত ছিল।

শিশুদের জন্য কৌশল: শিশুদের অগ্রগতি ও অধিকার-সম্পর্কিত রূপকল্প হলো জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও শিক্ষাসহ সকল অপরিহার্য সেবাগুলোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের পূর্ণ বিকাশ এবং অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব ধরণের সহিংসতা, অপব্যবহার ও শোষণ থেকে সুরক্ষিত রাখা।

যে অভীষ্টগুলো অর্জন করা হবে, তা হলো–(১) সরকারি নীতি ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা; (২) শিশুদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করা; (৩) তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পুষ্টির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা; (৪) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেয়েদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা; (৫) শহরে বসবাসরত দরিদ্র শিশুদের কিছু বিষয়ে, যেমন শৈশবের শুরুতে বিকাশ, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, যা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নতি সাধন করে; (৬) শিশুদের সব ধরণের অপব্যবহার, শোষণ ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করা; (৭) পরিষ্কার পানি, স্যানিটেশন এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিশেষত শহুরে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা; (৮) তাদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, কর্মসূচি উন্নয়ন, মধ্যবর্তিতা বাস্তবায়ন এবং সাফল্যের মূল্যায়নে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; (৯) যাদের ওপর বাচ্চাদের নির্ভর করতে হয়, সেইসব দায়িত্ব পালনকারী, বাবা-মা এবং অন্যান্য যত্নদাতাদের সহায়তা নিশ্চিত করা; এবং (১০) শিশুদের টিকে থাকা ও বিকাশের জন্য জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন নিশ্চিত করা।

নিম্নে উল্লিখিত মধ্যবর্তিতা এবং নির্দেশিত পদক্ষেপগুলো অষ্টম পরিকল্পনার সময় গ্রহণ করা হবে। কিছু কিছু কৌশল রয়েছে যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ও 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১'-এর বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **শিশুস্বাস্থ্য:** নারী ও শিশুদের যত্নের অনুশীলন বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে নিরাপদে শিশু ভূমিষ্ঠের ব্যবস্থা, পোলিও নির্মূল, হাম ও নবজাতকের টিটেনাস নির্মূল, পুষ্টির উন্নতি এবং স্কুলে স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা। কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে স্বাস্থ্যব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুফল অর্জন ও ব্যয়ের কার্যকারিতা এবং গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন করা। সুনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপগুলোর মধ্যে থাকবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সংকটপূর্ণ শিশুস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, স্বাস্থ্যকর অনুশীলন ও কৃমির আক্রমণ বিষয়ে সংবেদনশীল করা এবং ছাত্রীদের জন্য আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট সরবরাহ করা। স্কুল পাঠ্যসূচিতে এ-জাতীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য কৌশল বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পরামর্শ, স্বাস্থ্যকর অনুশীলন, পুষ্টি, বয়ঃসন্ধি, আরটিআই/এসটিডি এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতা বৃদ্ধি। ডায়রিয়ার চিকিৎসার জন্য ওআরটি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈচিত্রের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। টিকাদানের আওতায় অসমতা হ্রাস করতে কার্যকর কর্মসূচি-সংক্রান্ত মধ্যবর্ত্তিতার মাধ্যমে টিকাদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা হবে।
- **খাদ্য ও পুষ্টি:** পুষ্টি-সম্পর্কিত কর্মসূচির আওতা বাড়ানো হবে। এতে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার পুষ্টি-সংবেদনশীল পদ্ধতি এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শিশুসহ দরিদ্র পরিবারগুলোর অগ্রাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। ২৪ মাস বা তার কম বয়সী শিশুদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়ের জন্য পুষ্টিকর পরিপূরকের বিধান কার্যকর করা হবে। ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতি এবং রাত্রিকালীন অন্ধত্বের প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভিটামিন 'এ'-এর পরিপূরকগুলো ভিটামিন 'এ'-এর ঘটতি হাম, নিয়মিত ডায়রিয়া বা মারাত্মক অপুষ্টির শিকার শিশুদের এবং প্রসবের ছয় সপ্তাহের মধ্যে প্রসবোত্তর নারীদের মাঝে বিতরণ করা হবে। লবণে আয়োডিন সংযোজনের মাধ্যমে আয়োডিনের ঘাটতিজনিত সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহ যথা: আয়রন-ফলিয়েট পরিপূরক, অ্যানথেমেটিক চিকিৎসা, ফর্টিফিকেশন ও বিসিসি এর মাধ্যমে আয়রনসমৃদ্ধ খাবারের গ্রহণ এবং আয়রন শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার শিশুদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে একটি কৌশল তৈরি করা হবে।
- **শিশুশিক্ষা:** শৈশবকালীন বিকাশের জন্য মধ্যবর্ত্তিতার অন্তর্ভূক্ত থাকবে অভিভাবকদেরকে শৈশবের শুরুতেই বিকাশের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি, পরিবারগুচ্ছের জন্য সম্প্রদায়ভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্রগুলো প্রসার, যেখানে শিক্ষিত মায়েদের সেবাদানকারী হওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষনবিশদের জন্য সুযোগ-সুবিধা পরিকল্পনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য) বৃদ্ধি করা হবে। তালিকাভুক্তির হার বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, স্কুলে অবেস্থানের সময় বৃদ্ধি এবং অর্জন ও অভিগম্যতার ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। ভবিষ্যতে লাভজনক কর্মসংস্থানের জন্য আরও উন্নত পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হবে। পথশিশু ও অনাথ শিশুদেরকে চিহ্নিত করা এবং তাদেরকে শিশুশিক্ষার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হবে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশু যেমন তালিকাভুক্ত হয়নি অথবা ঝরে পড়া ও যাদের কাছে সহজে পৌঁছানো যায় না– এমন বিভিন্ন ধরণের শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নিয়োগযোগ্যতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
- **পানি ও স্যানিটেশনে প্রবেশাধিকার:** সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো বিকল্প ব্যবস্থা সরবরাহের মাধ্যমে পানীয় জলের আর্সেনিক সমস্যার উপশম করা, গ্রামীণ ও শহুরে বস্তিতে স্যানিটারি ল্যাট্রিনগুলোর প্রাপ্যতা বাড়ানো, বর্তমানে পর্যাপ্ত সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত পৌরসভা অঞ্চলে পানি ও স্যানিটেশন সেবা সম্প্রসারণ এবং মোটেও সুবিধা না পাওয়া বা কম সুবিধা পাওয়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- **শিশু ক্ষমতায়ন:** শিশুদের পরিবার, সমাজ ও জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে শিশুদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা এবং তা পূরণের উপায় সম্পর্কে মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করে দেয়ার জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করার প্রয়োজন দেখা দিবে।

- **শিশু সুরক্ষা:** সকল শিশুকে সব ধরণের অপব্যবহার, শোষণ ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে, বিশেষত যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; যেমন পথশিশু ও এতিম শিশুরা। বিদ্যমান এনপিএর নীতিগুলো শিশু নির্যাতন, শোষণ এবং শিশু পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। শিশুদের বিষয়ে বিদ্যমান আইনগুলো সমন্বয় ও প্রয়োগ করা হবে। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আদালত, সমাজকর্মী ও প্রবেশন কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট করে আইনী হেফাজতে শাস্তির বিকল্প হিসেবে একটি ভিন্নমুখী কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়া হবে। শিশুদের প্রতি বিশেষত মেয়েদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ নির্বিশেষে শিশুদের সুরক্ষার প্রয়োজনে বাবা-মা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ইতিবাচক মনোভাব বাড়ানোর লক্ষ্যে সুরক্ষা বিষয়ে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা প্রচারণা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্তিরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- **জন্ম নিবন্ধন ও বাল্য বিবাহ:** সকল জন্ম নিবন্ধনের জন্য পৌর কর্পোরেশন এবং পৌরসভাকে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বাল্য বিবাহের চর্চা নিরসন করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমে এবং ইমামসহ সামাজিক নেতাদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়া হবে।
- **শিশু শ্রম:** শিশু গৃহকর্মী, অভিবাসী, শরণার্থী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে শিশু শ্রম হ্রাস এবং শিশু নির্যাতন দূরীকরণে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে নিকৃষ্টতম শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের বিষয়ে লক্ষ্য রেখে আনুষ্ঠানিক খাতে শিশুদের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা হবে। পথশিশুদেরকে তাদের অধিকার অর্জণ এবং তাদেরকে সকল ধরণের অপব্যবহার ও শোষণ থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। পথশিশুদের কার্যকরভাবে পুনর্বাসন ও বিকাশের জন্য সরকারি সংস্থা, শিশু বিষয়ে কাজ করা এনজিও, বাবা-মা এবং সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সমন্বয় করা প্রয়োজন। কর্মজীবী শিশু যেমন বর্জ্য সংগ্রহকারী, চামড়া শ্রমিক, ইটভাঙা কর্মী, অটো-ওয়ার্কশপ কর্মী এবং টেম্পো হেল্পারদের আনুষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে শেখার ক্ষেত্রে অভিগম্যতা থাকবে। যেসব চরম দরিদ্র পরিবারে শিশুশ্রমের ঘটনা সবচেয়ে বেশি, সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক উপার্জনকারীদের জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
- **শিশু নির্যাতন:** শিশুদের অবমাননাকর ও শোষণমূলক পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার ও স্থানান্তরের জন্য কিছু মধ্যবর্তিতা যেমন এই শিশুদের জন্য সম্প্রদায়গত সহায়তা প্রদান, জীবিকার বিকল্প সরবরাহ, মৌলিক সেবা ও দত্তক দেয়া এবং নির্যাতন, বৈষম্য, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও আইন প্রয়োগ করা হবে। অধিকতর সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ ও পাচার প্রতিরোধে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- **ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুদের কল্যাণ ও অধিকারের জন্য তাদের পক্ষ সমর্থন এবং বিভিন্ন মধ্যবর্তিতার সমন্বয় করবে। শিশুদের পোর্টফোলিও এবং শিশুদের ম্যান্ডেটের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। এটি শিশু আইন ২০১৩, সিআরসি, সিডিইএডাব্লিউ এবং ওয়ার্ল্ড ফিট ফর চিলড্রেন প্ল্যান অব অ্যাকশন (World Fit for Children Plan of Action) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করবে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যার জন্য কৌশল: সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনসংখ্যার জন্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী পরিচয় ধরে রাখার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও বিদেশি কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকার এবং জমি ও অন্যান্য সম্পদের নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। তাদের জন্য কৃষির বিকল্প ও অকৃষি-ভিত্তিক জীবন-জীবিকার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা হবে। জনগণের উন্নয়নে অবদান রাখে এবং পাহাড় এবং সমতলের ভূমিগুলোর মধ্যে উন্নয়নের ব্যবধান কমিয়ে আনার বিষয়ে কাজ করে, সিএইচটির (CHT) এমন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য এসব প্রকল্পে অগ্রাধিকার হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। মূল অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে সিএইচটি'র উন্নয়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সিএইচটি'র বৈশিষ্ট্য এবং জাতিগত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিএইচটি ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের মতো সরকার সমতল জমিতে সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কৌশলগত অভীষ্ট ও নীতি নির্দেশনা: পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে নিম্নলিখিত কৌশলগত অভীষ্ট ও নীতি নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে:

সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার, মৌলিক মানবাধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত পরিচয় ধরে রাখার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিএইচটির জাতিগত সম্প্রদায়গুলোর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান ও বিদেশি কর্মসংস্থানে তাদের অভিগম্যতা এবং ভূমি ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য সম্পদে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। তাদের জন্য বিকল্প খামার ও খামারভিত্তিক জীবিকা নিশ্চিত করা হবে। তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা হবে। সিএইচটি'র জনগণের উন্নয়ন এবং পাহাড় ও সমতলের মধ্যে উন্নয়নের ব্যবধান কমিয়ে আনতে অবদান রাখে এমন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য এসব প্রকল্পে অগ্রাধিকার হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রসমূহ: সিএইচটি'র নির্দিষ্ট চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতা রয়েছে বিধায় অঞ্চলটির জন্য প্রয়োজন পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ও কৌশল এবং বিতরণ পদ্ধতি, যা স্থানীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে যথোপযুক্ত।

- **জাতিসংঘ ঘোষণা:** সরকার নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার-সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র ২০০৭ বাস্তবায়ন এবং আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুমোদনের বিষয়ে বিবেচনা করবে।
- **পার্বত্য শান্তি চুক্তি:** সরকার ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি এবং উপজাতি শরণার্থী প্রত্যাবাসী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিষয়ে গঠিত টাস্কফোর্স আরও জোরদার এবং পার্বত্য শান্তি চুক্তি-সম্পর্কিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে, এই তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য সিএইচটি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সিএইচটি আঞ্চলিক পরিষদ এবং তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে আরও শক্তিশালী করা হবে। শান্তি চুক্তির বিধান অনুসারে, প্রশাসন, অর্থ ও উন্নয়ন তহবিলের ক্ষেত্রে বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট অফিস এবং সংস্থাগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদ বা এইচডিসিতে স্থানান্তরিত হবে।
- **ভূমির অধিকার:** জমি অধিকার নিশ্চিত করতে সংশোধিত ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ অনুযায়ী, ভূমি কমিশন সিএইচটিতে জমি-সংক্রান্ত বিরোধগুলো সমাধান করবে। শীঘ্রই সিএইচটি জমি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিধিমালা কার্যকর করা হবে, যাতে ভূমির ওপর গোষ্ঠীগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিএইচটি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। শান্তি চুক্তির বিধান অনুযায়ী মূল অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি ভূমি জরিপ চালানো হবে। একটি উপযুক্ত ভূমি নীতিমালা তৈরি করা হবে, যা জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর জমি-সংক্রান্ত বিরোধ সমাধান করতে পারে। একটি সুরক্ষিত জমির মালিকানা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- **নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন:** সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং বিভিন্ন জাতিগত মানুষের চিরাচরিত রীতিনীতি ও অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি প্রদান করবে। সরকার ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তির প্রবর্তনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। সরকার তাদের পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞানের বিকাশের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান করবে।
- **শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রবেশাধিকার:** নৃতাত্ত্বিক মানুষের ভাষাসমূহের সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় ভাষা নীতিমালা তৈরি করা হবে। ছোট ছোট গোষ্ঠী থেকে শিশুদের মূলধারার শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে বরাদ্দ ছাড়াও খাতভিত্তিক শিক্ষা ও বৃত্তির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। তদুপরি নৃতাত্ত্বিক মানুষের ভাষাসমূহের সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় ভাষা নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ জোরদার করা হবে। সরকারের পক্ষ হতে পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে অত্যন্ত দরিদ্র বাবা-মায়ের শিশুদের জন্য আবাসিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য বহুভাষী শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জাতিগত সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **আয় সৃজনকারী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করা:** ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, বাণিজ্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ এবং অন্যান্য মাধ্যমে আয় সৃজনকারী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে, ফল ও ঔষধি গাছের চাষ এবং অকৃষি কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করা হবে। যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ কৃষি ও অকৃষি খাতে সমান জোর দেয়া হবে।

- **বিপণনের অবকাঠামো প্রসার:** বিপণন বাজার অবকাঠামো এবং গ্রামীণ সড়ক ও বাজার সুবিধার উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে, যাতে কৃষক/উৎপাদকরা তাদের পণ্য বিক্রি করে আরও ভালো দাম পেতে পারে। বাঁধা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে কৃষিজ এবং অন্যান্য স্থানীয় পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে। ফসল আহরণ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, মূল্যশৃঙ্খল উন্নয়ন প্রক্রিয়া, মোড়কীকরণ ও বাজারে প্রবেশাধিকার এবং বেসরকারি খাতের বাজার সংযোগ স্থাপন জোরদার করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলের পণ্য ও সেবা প্রক্রিয়াকরণ, মোড়কীকরণ ও বিপণনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেয়া হবে।
- **মানব উন্নয়ন বৃদ্ধি:** নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজনগুলো সমাধান এবং তাদের পেশাগত ও সামাজিক দক্ষতা জোরদার করার জন্য বিদ্যমান মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো জোরদার করা হবে। যুবকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রম জোরদার করা হবে; যাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা জাল এবং পুষ্টি ও আবাসনের সুবিধা নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়। জাতীয় ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বিদেশি কর্মসংস্থানসহ অন্য সুবিধাদি গ্রহণের জন্য নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়গুলোকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে, যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। পার্বত্য অঞ্চলের যুবকদের কারিগরি ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা সরবরাহ করা হবে।
- **ইকো ট্যুরিজম প্রচার:** শান্তি চুক্তি ও পরবর্তী আইনগুলো অনুসরণ করে স্থানীয় জনগণের উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে পর্যটন, বিশেষত পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পর্যটনকে উৎসাহ দেয়া হবে। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকদের সম্পৃক্ত করে স্থানীয় ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে টেকসই পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদি বিকাশে উৎসাহিত করা হবে। পর্যটন যাতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে, সে বিষয়ে যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।
- **জ্বালানি নিশ্চিতকরণ:** পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত যে অঞ্চলগুলোয় জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয়, সেসব জায়গায় সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানো প্রয়োজন। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করে একটি আধুনিক জীবনযাত্রা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- **ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ:** ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং দরিদ্রদের মধ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- **টেকসই উন্নয়নের প্রসার:** জীববৈচিত্র্য ও জলাশয় (বা ঝিরি) সংরক্ষণ এবং পানিতে স্থানীয় জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে পার্বত্য এলাকায় গ্রাম/মৌজা সম্প্রদায়ভিত্তিক বন তৈরি ও সম্প্রসারণ করা হবে। পার্বত্য অঞ্চলে বনায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করা হবে। বন্যজীবন ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাকৃতিক উৎস সংরক্ষণ ও সমন্বিত জলাশয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঝিরি, জলাশয় ও জলপ্রপাতগুলোয় পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- **জলবায়ু-সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো প্রশমিত করা:** পার্বত্য অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমিধসের প্রভাব বিবেচনা পূর্বক জলবায়ু পরিবর্তন-সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ উপশম এবং অভিযোজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে জনগণ ও পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য উদ্ভাবনী ও টেকসই অভিযোজন কৌশল এবং পদ্ধতিগুলো নিশ্চিত করা হবে।
- **বাস্তবায়ন ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ:** ১৯৮৯ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুসারে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নির্বাচন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা হবে। জনবল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সিএইচটিআরসি (CHTRC), সিএইচটিডিবি (CHTDB) এবং এইচডিসি (HDC)-গুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস-সম্পর্কিত বিপর্যয় নিরসনে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রাস্তা, বাঁধ, সেতু, কালভার্ট প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।
- **পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি:** সরকার মূল স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে সিএইচটি'র উন্নয়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পার্বত্য শান্তি চুক্তি এবং এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী আইনগুলো অর্থাৎ এইচডিসি আইন, সিএইচটিআরসি আইন এবং এমওসিএইচটিএর ব্যবসায়িক বরাদ্দ হবে অঞ্চলটিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির ভিত্তি।

- **পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ:** ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাস ও মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। পাহাড়ি অঞ্চলের উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়ের সমস্ত তহবিল পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে। পার্বত্য এলাকায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোয় নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

দলিত ও চরম দরিদ্র গোষ্ঠীগুলোর জন্য কৌশল: সরকারের রূপকল্প হলো বাংলাদেশে দলিত সম্প্রদায় যে বৈষম্য ও শোষণের মুখোমুখি হয় তা নিরসন করা; যাতে তারা দেশের পরিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে তাদের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়।

- স্কুলগুলো যাতে সকল শিশুদের জন্য বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দলিত সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার অধিকারকে সমুন্নত রাখবে। এর ফলশ্রুতিতে আর্থসামাজিক গতিশীলতার জন্য শিক্ষাকে মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্ধিত আগ্রহ ও দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি স্কুল-কলেজগুলোয় দলিত ও অন্যান্য বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ কোটা রাখা হবে এবং সরকারি মালিকানাধীন সমস্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দলিত কিশোর-কিশোরীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- সুবিধা বঞ্চিত দলিতদের শনাক্তকরণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে এনজিওদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হবে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের সকল কমিটিতে দলিতদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।
- আশ্রয়ণ ধরণের আবাসন প্রকল্পের আওতায় বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় দলিত সম্প্রদায়ের লোকদেরকে খাস জমির বরাদ্দ প্রদানকে অগ্রাধিকার দেবে। চা শ্রমিকদের জন্য বাগানের মধ্যেই জমি দেয়ার জন্য আবাদকারী/মালিকদের উৎসাহিত করা হবে, যাতে শ্রমিকরা নিজেদের আবাস তৈরি করতে পারে। সুইপার কলোনি নির্মাণের মতো বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
- দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার ধারণা পোষণ বন্ধে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।
- সরকার বর্তমান পরিস্থিতি ও বৈষম্যের মাত্রা মূল্যায়নের লক্ষ্যে দলিতদের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করবে এবং বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবে।
- সরকার প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভার আওতাধীন কলোনিসমূহে বরাদ্দ নীতি পর্যালোচনা করবে এবং নিশ্চিত করবে যে, দলিতদের প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো কোনো হয়রানি ছাড়াই বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ সেবাগুলোর বরাদ্দে প্রাপ্যতা পাচ্ছে।
- সিটি কর্পোরেশনের গণশৌচাগার ইজারাসহ পৌরসভায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজের ক্ষেত্রে দলিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে।
- বাস্তুচ্যুত দলিত পরিবারগুলোর জন্য উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
- দলিত পরিবারগুলোকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে। এসব কার্যক্রম তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করবে। এর মূল লক্ষ্য এই গোষ্ঠীগুলোর ক্ষমতায়ন করা, যাতে তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে এবং একটি কার্যকর অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা লাভ করতে পারে।
- সমতা-অন্তর্ভুক্তিকরণের সপক্ষে ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণশিক্ষা প্রচার করা হবে, যা সামাজিক নিরীক্ষা ও গণশুনানির মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা তৈরি করবে।

প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর জন্য কৌশল: এই কৌশলের রূপকল্প হলো এমন একটি সমাজ গঠন, যেখানে যৌন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারে এবং সহনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে। এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একটি এইচআইভি/এইডসমুক্ত সমাজ, যেখানে এ রোগে কূন্য নতুন সংক্রমণ, কূন্য বৈষম্য এবং কূন্য মৃত্যু ঘটে।

- এইচআইভি/এইডস এ আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, যত্ন ও সহায়তা সেবাগুলোয় সর্বজনীন প্রবেশাধিকার দেয়া হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে অধিকতর এইচআইভি পরীক্ষা এবং পরামর্শ সেবা। এইচআইভিতে আক্রান্ত ব্যক্তিসহ মূল জনসংখ্যার জন্য মধ্যবর্তিতার আওতা বাড়ানো হবে। এই মধ্যবর্তিতার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বুনিয়াদি শিক্ষাগত,

পরামর্শ সংক্রান্ত, রেফারেল ও আইন-সহায়ক সেবাসমূহ। পাশাপাশি নতুন এইচআইভি সংক্রমণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া মাদকসেবী ব্যক্তিদের জন্য আফিম-বিকল্প থেরাপি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। পর্যাপ্ত ও সময়োপযোগী অ্যান্টেরেট্রোভাইরাল চিকিৎসার জন্য কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে সরকার তথ্য প্রদান করবে, যেহেতু এ বিষয়ে জানা না থাকায় অনেক মানুষ পরীক্ষা করতে নিরুৎসাহিত হতে পারে।

- ভীতি ও বৈষম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ইন্ধন জোগায়। বাংলাদেশে এইচআইভি বাহক যৌনকর্মী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি ভীতি এবং বৈষম্য নিরসন করার লক্ষ্যে সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সরকার যৌন সংখ্যালঘু ও বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে প্রচার করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও এইচআইভি-বিষয়ক সেবাগুলোয় অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে সরকার সুশীল সমাজ সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এইচআইভি ও এইডস-সম্পর্কিত জনসচেতনতা এবং জনসংখ্যা-নির্দিষ্ট সচেতনতা ও শিক্ষা প্রচারণা চালাবে।

- সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করবে, যেহেতু বেশিরভাগ সময়ে বেসরকারি সংস্থাগুলো গ্রাহকের, বিশেষ করে যৌনকর্মী ও মাদকসেবীদের মতো উচ্চ-ঝুঁকির গোষ্ঠীগুলোর কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকে। সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলো, বিশেষত ছোট ছোট এনজিওর সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধ এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রমের সাথে সরকারের সম্পদ ও কৌশলগত কর্মসূচির মিশ্রণ ঘটাবে।

- সরকার এনজিও ও বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যৌনকর্মী ও হিজড়াদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিধান প্রবর্তন করবে। যারা যৌনকর্ম থেকে বেরিয়ে এসে ছোট ছোট উদ্যোগ বা ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি আকারে নিরাপদ পেশা গ্রহণ করতে উচ্ছুক, তারা এতে অংশ নেবে।

- সামাজিক স্বাস্থ্য বিমা বা অন্যান্য তহবিলে প্রবেশাধিকার দেয়ার মাধ্যমে যৌন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোকে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হবে। এর লক্ষ্য মানবাধিকার এবং সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সামাজিকভাবে বাদ পড়া ব্যক্তিদের মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

- কার্যকর বহু খাতভিত্তিক এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে সমন্বয় ও পরিচালনা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। এছাড়া উদাহরণ-ভিত্তিক কর্মসূচির জন্য কৌশলগত তথ্য ব্যবস্থা এবং গবেষণা আরও জোরদার করা হবে।

- সরকার এরূপ আইন ও নীতিমালা তৈরি করবে, যা এইচআইভি প্রতিরোধ সহজতর করবে এবং অভিজ্ঞতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিন্ন সেবা সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

শারীরিক অসামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কৌশল: শারীরিকভাবে অসামর্থ্য ব্যক্তিদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সরকার মূলধারার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সহজ করার লক্ষ্যে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা ও সুরক্ষা প্রদান করবে, যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং সমাজে নিরাপত্তা লাভের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও অর্থবহ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। সংবিধানের অনুসরণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও অধিকারের জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ও মর্যাদার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার-সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ এবং সমতার বিষয়ে বেইজিং ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেছে।

অষ্টম পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে: অসামর্থ্য ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে আইনটি কার্যকর করা হবে। আইনটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় সমন্বয় কমিটির শক্তিশালীকরণ করা হবে। মহিলা ও শিশুসহ দরিদ্র ও দুস্থদের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে সকল কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।

সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় এনএসএসএসএসে প্রস্তাবিত অসামর্থ্য সহায়তা কর্মসূচিগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। সরকার মারাত্মক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত প্রতিটি শিশুকে যাতে নিয়মিত অর্থ প্রদান করা হয়, যা শিশু প্রতিবন্ধী সুবিধা হিসেবে পরিচিত, তা নিশ্চিত করবে। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত শিশু প্রতিবন্ধী অনুদানকে বর্ধিত করবে। শিশুদের মধ্যে গুরুতর

অক্ষমতা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এতে শারীরিকভাবে অক্ষম বাচ্চাদের পাশাপাশি অটিজম, বোধ, মানসিক, ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতির মতো অন্যান্য অক্ষমতাও অন্তর্ভূক্ত করা হবে। ধারণা করা হয়, এই প্রকল্পের জন্য প্রায় তিন লাখ ৫০ হাজার শিশুকে বিবেচনা করা হবে। রাস্তায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অপসারণের জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত থাকা যাবে না, এমন শর্ত সাপেক্ষে শিশুদের শিশু প্রতিবন্ধী বেনিফিট বাস্তবায়ন করা হবে। যারা ভিক্ষুক হিসেবে শিশুদের নিয়োগ দেয়, তাদের জরিমানা করার জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা হবে।

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী অনুদানকে একটি স্কিমে রূপান্তর করা হবে, যা বাংলাদেশের সকল প্রতিবন্ধী দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের নিয়মিত অর্থ প্রদান করে। এই স্কিমে প্রবেশাধিকার পাবেন ১৯-৫৯ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী। ৬০ বছর বয়সে তারা বয়স্ক নাগরিকদের পেনশনের আওতায় স্থানান্তরিত হবেন। গুরুতর অক্ষমতা চিহ্নিতকরণের জন্য সরকার শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং যারা অন্যায়ভাবে বাদ পড়েছেন বলে বিবেচনা করা হবে, তাদের জন্য একটি আপিল প্রক্রিয়া প্রবর্তন করবে।

একটি পরিবর্তিত অসামর্থ্য সুবিধা প্রবর্তন করা হলে, যারা দরিদ্র ও শারীরিক অক্ষমতার শিকার, তাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। তারা শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে ও ছোট ব্যবসায় বিনিয়োগের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান, পেশাগত শিক্ষা ও ছোট ব্যবসায়িক স্কিমগুলোয় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শ্রমবাজারে বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে অক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করবে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের পাশাপাশি শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের শিক্ষায় আরও বেশি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। সরকার, এনজিও ও বেসরকারি খাতসমূহকে সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে, নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে এবং প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণে একটি সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হবে।

স্বাস্থ্য খাতে কিছু লক্ষ্য যেমন–(১) অক্ষমতার লক্ষণগুলোর শুরুর দিকে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ; (২) গর্ভবতী মহিলাদের জন্য পুষ্টি কর্মসূচি গ্রহণ; (৩) প্রতিবন্ধিতার সমস্যা মোকাবিলায় প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তার, সেবিকা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা; এবং (৪) স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোয় সহায়ক যন্ত্র ও সরঞ্জাম সহায়তা সেবা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে সমস্ত ভৌত সুযোগ-সুবিধা এবং তথ্য ও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিভিন্ন জাতীয় ও সম্প্রদায় স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে। সম্প্রদায়ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ এবং সময়মতো চিকিৎসা কার্যক্রম, কৃত্রিম সহায়তা উপকরণ ও যন্ত্রপাতি, বিশেষ ও সমন্বিত স্কুলে শিক্ষাগত সেবা, ক্ষুদ্র ঋণ ও কারিগরি পুনর্বাসনের মতো সেবা সরবরাহ করা হবে।

সমাজে অসামর্থ্য ব্যক্তিরা মূলত দরিদ্র ও প্রান্তিক। তাই অসামর্থ্য ব্যক্তিদের 'দৃশ্যমান' করার জন্য এবং মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম করার জন্য তাদেরকে সংগঠিত করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত সহায়তা সেবা, সহায়ক যন্ত্র এবং চাকরিতে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শালীন কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।

১৪.৭ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক সুরক্ষা, সমাজ কল্যাণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্নয়ন সংস্থান

দারিদ্র্য হ্রাস, আয়ের অসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা– এ সকল বিষয়ই আন্তঃসম্পর্কিত এবং এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জড়িত। এ সকল বিষয়ের ক্রস কাটিং এবং ওভার-আর্চিং প্রকৃতির কারণে অন্তর্নিহিত কৌশলগুলো প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক সংস্থানগুলো শনাক্ত করাও সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, দারিদ্র্য বিমোচনে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সরকারের প্রবৃদ্ধি কৌশলের এবং সেইসঙ্গে সরকারি বিনিয়োগের সফল বাস্তবায়ন। একইভাবে যেহেতু বেশিরভাগ কর্মসংস্থান বেসরকারি খাতের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়, সেহেতু বেসরকারি বিনিয়োগও দারিদ্র্য কমানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

বর্তমান বাজেট থেকে সামাজিক সুরক্ষা খাতে সরকার একটি পৃথক বরাদ্দ দেয়, যা সরকারি কর্মচারিদের পেনশন বাদ দিয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় জিডিপির প্রায় ১.২ শতাংশ ছিল। অষ্টম পরিকল্পনার জন্য সর্বাধিক অগ্রাধিকার হলো এনএসএসএস বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি সামাজিক সুরক্ষা চলাকালে দারিদ্র্যকেন্দ্রিক ব্যয়কে জিডিপির ১.২ শতাংশ থেকে ২.০ শতাংশে উন্নীত করার প্রক্ষেপণ করেছে।

উপরোল্লিখিত পটভূমির বিপরীতে কিছু বিশেষায়িত লাইন মন্ত্রণালয় রয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সেবা প্রদান করে এবং তা তদারক করে। এ সকল মন্ত্রণালয়গুলো হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়; খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দসমূহ সারণি ১৪.৯ এবং ১৪.১০-এ তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, বেশিরভাগ কর্মসূচি যেগুলো মন্ত্রণালয় পরিচালনা করে, সেখানে দরিদ্র ও দুর্বলদের আয়ের মধ্যবর্তি আয় বর্তমান বাজেট থেকে অর্থায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে তাদের আওতাধীন মোট তহবিল এডিপি বরাদ্দে নির্দেশিত তহবিলের থেকে অনেক বড়।

সারণি ১৪.৯: সামাজিক সুরক্ষার জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

(চলতি মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.৪	৩.৯	৪.৫	৫.৪
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.১	৫.১	৫.৯	৬.৮	৮.২
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.১	৭.৫	৮.৭	১০.১	১২.২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫৬.২	৬৪.৬	৬৯.১	৮০.৭	৮৯.৪
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩.৩	৪.০	৪.৬	৫.৪	৬.৫
খাত মোট	৭২.৪	৮৪.৬	৯২.২	১০৭.৫	**১২১.৭**

উৎস: অধ্যায় ৫, সংযুক্তি সারণিএ ৫.১

সারণি ১৪.১০: সামাজিক সুরক্ষার জন্য অষ্টম পরিকল্পনায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

(২০২১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০২১	অর্থবছর ২০২২	অর্থবছর ২০২৩	অর্থবছর ২০২৪	অর্থবছর ২০২৫
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২.৭	৩.২	৩.৫	৩.৯	৪.৫
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪.১	৪.৮	৫.৩	৫.৯	৬.৭
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬.১	৭.২	৭.৮	৮.৭	১০.০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫৬.২	৬১.৩	৬২.৫	৬৯.৫	৭৩.৫
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩.৩	৩.৮	৪.২	৪.৭	৫.৩
খাত মোট	**৭২.৪**	**৮০.৩**	**৮৩.৩**	**৯২.৭**	**১০০.০**

উৎস: অধ্যায় ৫, সংযুক্তি সারণি এ৫.২এস

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার